বনফুল উপন্যাস সমগ্র

(সপ্তম খণ্ড)

শ্রীবলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রী প্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০০

প্রচ্ছদ ঃ
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রক ঃ
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটিড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

সূচীপত্র

জঙ্গম (দ্বিতীয় অধ্যায় ও তৃতীয় অধ্যায়)	১
তুমি	১৮১
অসংলগ্না	২৫৫
নবদিগন্ত	৩১৭
সীমারেখা	৫১৯
ত্রিবর্ণ	৫৬৯
অলঙ্কারপুরী	৮২৯

।। সৃষ্টি বৈচিত্র্যে বনফুল

জন্ম ১৮৯৯, প্রয়াণ ১৯৭৯। লেখার চর্চা শুরু করেন বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকার বয়সেই। প্রধানত কবিতা। হাতে লেখা মাসিক পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। জন্ম পুর্ণিয়া জেলার মণিহারি-তে। কিন্তু পিতা মণিহারি-র লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় পুত্র বলাইচাঁদকে বালক বয়সেই সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভরতি করেছিলেন এবং রেখেছিলেন ছাত্রাবাসে। লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন বলাইচাঁদ। মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছিলেন মণিহারি স্কুল থেকে। সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে স্কুল ছিল সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে ভালো স্কুল।

সেখানেই ছাত্রাবাসে, নিয়মিত লেখাপড়ার অবকাশে প্রকাশ করতে লাগলেন হাতে লেখা পত্রিকা 'বিকাশ'। সেই হাতে লেখা পত্রিকায় বালক-কবির কবিতাই চোখে পড়ে গেল কোনো কোনো পাঠকের। কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'মালঞ্চ' পত্রিকায় মুদ্রিত হল প্রথম কবিতা ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে। বন্ধুরা খুশি হল কিন্তু শিক্ষকেরা ততটা হলেন না। কিশোর ছাত্রকে মনোনিবেশ করতে বললেন স্কুলের পড়ায়। কিন্তু স্ফুটনোন্মুখ সাহিত্য-প্রতিভা তাতে নিবৃত্ত হল না। বয়োজ্যেষ্ঠ এক বন্ধুর পরামর্শে ছদ্মনাম নিয়ে নিলেন 'বনফুল'।

এই সময় থেকেই অনর্গল লিখেছেন তিনি। প্রধানত গল্প আর উপন্যাস, স্মৃতিকথা, কিছু নাটক আর প্রবন্ধ, কিছু কবিতাও। যে-কবিতা দিয়ে শুরু হয়েছিল বালক কালের সাহিত্যচর্চা তা কিন্তু কোনোদিনই ছেড়ে যায়নি তাঁকে। তাঁর অনেক গল্পের ভাষায় ও বিন্যাসে কবিতা মিশে থাকে; তাঁর উপন্যাসে প্রায়ই কবিতা ও গানের স্থান হয় পূর্ণ মর্যাদায়। তাঁর স্মৃতিকথাগুলি প্রতিফলিত করে তাঁর রোমান্টিক কবি-মনের বর্ণ-বিচ্ছুরণ।

বনফুলের রচনাধারা অব্যাহত ছিল মৃত্যুর অব্যবহিত প্রাক্-কাল পর্যন্তই। নিঃসংশয়েই তাঁকে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় বলা যায় 'শতাব্দীর সমানবয়সী'। এই শতাব্দী হল বিংশ শতাব্দী। এই বিশ শতক যেমন বিশ্বের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসে, তেমনই ভারতীয় উপমহাদেশের অস্তিত্বে বিপুল গুরুত্বের দ্যোতক। এই শতাব্দীতেই দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং পারমাণবিক বোমায় সম্পূর্ণ জনপদ বিধ্বস্ত হয়ে যাবার নিষ্ঠুর সত্য প্রত্যক্ষ করেছি আমরা। এই শতাব্দীতেই জগৎ জুড়ে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ ধীরে ধীরে অপসারিত হয়েছে। ফ্যাসিবাদ এবং সাম্যবাদী রাষ্ট্রিক প্রশাসনের প্রযুক্তি দুই-এরই উত্থান

ঘটলেও কোনোটিই টিকে থাকতে পারেনি এই শতকে। বাণিজ্যিক পুঁজিবাদের নির্মম বিস্তার সত্ত্বেও ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতার স্বীকৃতিতে গণতন্ত্রের দিকে অভিমুখী হওয়ার লক্ষ্যেই এই শতাব্দীর গতিপথ সচল ছিল। ক্ষমতা-কেন্দ্রগুলি আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। সেটাই ক্ষমতা কেন্দ্রের ধর্ম। কিন্তু এই শতাব্দীতেই ক্ষমতা-কেন্দ্রের চাপের বিপরীতে ব্যক্তি-নাগরিকের পাশে দাঁড়াবার মতো মানুষও পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলিতে যার দৃষ্টান্ত সুলভ ছিল না।

ভারতের ইতিহাসেও বিংশ শতাব্দী অন্যতম ঘটনাবহুল এক কালপর্ব। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম জেগে ওঠা। জঙ্গি প্রতিরোধ হিসেবে এই সময়েই দেখা দিল—বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধ আন্দোলন, সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন। অতঃ পর গান্ধীজি পরিচালিত অসহযোগ কর্মসূচি, লবণ আইন-অমান্য অভিযান, ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও স্বাধীনতার শেষ পর্ব অন্তে গান্ধীজি-র মৃত্যু। এই শতাব্দীতেই দুটি বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে ভারত; মন্বন্তরের দুর্বহ অভিশাপ বহনে বাধ্য হয়েছে। বারবার বিক্ষত হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। মানসিক সংস্কৃতির দিক থেকে সাম্যবাদের ধারার উদ্ভব এই শতাব্দীতে সারা বিশ্বেরই একটি ঘটনা। যদিও মার্কস-এঙ্গেল্‌স্‌-এর লেখার প্রকাশ উনিশ শতকেই। তবু ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লবের সাফল্যের পর এই আর্থ-সামাজিক তত্ত্ব ছায়া ফেলতে শুরু করে বিশ্ব-রাষ্ট্র নীতিতে। ভারতে, বিশেষ করে বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক বাতাবরণে শতাব্দীর মধ্যভাগে এই তত্ত্বের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

ভারতের স্বাধীনতা, দেশ বিভাগের ফলে পাঞ্জাব ও বাংলার দ্বিখণ্ডীকরণ, বিপুল উদ্বাস্তু সমস্যার চাপ—এসবই বিশেষ ভাবে বাংলার জনজীবনকে আর্ত-সংকুল রেখেছিল যাটের দশকের শেষ লগ্ন পর্যন্ত। এই প্রবল আলোড়িত সময়ের মধ্যে দিয়ে বাংলার সমাজ-জীবনের পরিবর্তনও হয়েছে বিস্ময়করভাবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বাংলার গ্রামগুলির অর্থনৈতিক পরিকাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে যায় মধ্যবিত্ত বাঙালির কৃষিভিত্তিক উপার্জনের সংস্থান হ্রাস পায়। বাড়ে শহর-অভিমুখিতা এবং চাকরির চাহিদা। বেকার সমস্যা বেড়ে যেতে থাকে। ভেঙে যেতে থাকে একান্নবর্তী পরিবার। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার এবং সাংসারিক অকুলানের কারণে মেয়েরা ধীরে ধীরে উপার্জনের রাস্তায় চলে আসতে থাকেন। মেয়েদের চাকরি করাও শুরু হয়। দুটি যুদ্ধ ও দেশ-বিভাগের পরিণামে প্রবলভাবে আছড়ে পড়া বাস্তুহারা-সমস্যার চাপে মধ্যবিত্ত বাঙালির পরম্পরা-শাসিত মূল্যবোধগুলিও বিচলিত হয়, অনেকক্ষেত্রে ভেঙেও পড়ে।

আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণে এত ব্যাপ্ত ও গভীর পরিবর্তন আসার ফলে এই শতাব্দীর সাহিত্যিকদের সৃষ্টিতেও দেখা গেছে বহুমুখী বৈচিত্র্য। পূর্ববর্তী শতাব্দীর সাহিত্যে এই পরিব্যাপ্ত অনেকান্ততা ছিল না। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস' (১৮২৩) এবং ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী' (১৮৯২) একই শতাব্দীতে লেখা হলেও মধ্যে আছে সাত দশকের

বেশি ব্যবধান। তবু এই দুটি রচনা এবং মধ্যবর্তী পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্তের ও স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনায় যে সমাজের ছবি ফুটে উঠেছে তার মধ্যে পরিকাঠামোগত খুব বেশি ফারাক নেই। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের মধ্যে অনুরূপা, নিরূপমা দেবীব উপন্যাস আর বিশ শতকের শেষ দুই দশকে বাণী বসু, সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে নারী-পুরুষ সম্পর্কের সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের রূপায়ণ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস আর দেবেশ রায়, দিব্যেন্দু পালিত এবং আবুল বাশার যেন ঔপন্যাসিক রূপে ভিন্ন গ্রহের অধিবাসী।

কোনো কোনো কথাসাহিত্যিক এই বিংশ শতাব্দীতে দেখা দিয়েছেন যাঁদের লিখন-পটে এই বিবর্তন বিচিত্রা প্রতিফলিত হয়েছে অনেকটাই। বিশেষভাবে-দুজন সাহিত্যিকের নাম মনে পড়ে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনফুল। তাঁরা দুজনেই, অনতিস্ফুট তারুণ্যের যুগের লেখা বাদ দিলে—প্রস্তুতি নিয়ে লিখতে শুরু করেছিলেন চতুর্থ দশক থেকে— ১৯৩১ থেকে ১৯৩৫-এর মধ্যে। তাঁরা দুজনেই অবিরাম লিখে গেছেন ১৯৭০-৭২ পর্যন্ত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত আর সতীনাথ ভাদুড়ী, ১৯৫০-১৯৬০-এর মধ্যে প্রয়াত হওয়ায় স্বাধীনতা উত্তর ভারত তথা বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির বিবর্তনের সার্বিকতা—যা ষাটের দশকের পরেই প্রধানত আমাদের চোখে পড়তে শুরু করেছে—তা তাঁদের লেখায় ততটা জীবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি। বনফুল ও তারাশঙ্করের জীবন-পরিক্রমায় আরও এক ধরনের সাদৃশ্য ছিল। দুজনেই গ্রামের বাল্যজীবন, মফস্‌সল শহরের কর্মজীবন অন্তে কলকাতা মহানগরীতে শেষ জীবন অতিবাহিত করেছেন। গ্রাম, মফস্‌সল, নগর—বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের অবস্থানগত এই বিবর্তন তাঁদের লেখাতেই ধরা পড়েছে সর্বাধিক।

বনফুলের বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি উপন্যাসের ভূমিকা-কথন রূপে এই প্রেক্ষাপট মনে রাখার প্রয়োজন। এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে তাঁর বহু-পরিচিত 'জঙ্গম' উপন্যাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড। এই দুটি খণ্ডের প্রকাশ কাল ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ। এই খণ্ডে সংকলিত শেষ উপন্যাসটি হল 'তুমি' ১৯৭১-এ প্রকাশিত। কাজেই যে-সময়টির কথা আমরা এতক্ষণ বললাম, তার অনেকটাই এই উপন্যাসগুলির পাদপীঠ। সময়-পর্ব ১৯৪৫ থেকে ১৯৭১।

বনফুল সম্পর্কে আরও একটি বলবার কথা থাকে এই লেখকের ব্যক্তিগত জীবনও অনেক দিক থেকে অনেক অভিজ্ঞতার সঙ্গে লগ্ন। উত্তর বিহারের একটি ছোটো গ্রাম মণিহারিতে জন্ম ও বাল্যশিক্ষা। তাই তিনি ভারতের দারিদ্র্য ও অশিক্ষা লাঞ্ছিত গ্রামের মানুষকে চিনতেন। নিম্নবর্গের ভারতীয় জনতা সম্পর্কে তাঁর সংবেদনশীল মনের পরিচয় তাঁর কথাসাহিত্যের ছত্রে ছত্রে নিষিক্ত। তাঁর পিতা ছিলেন প্রতিষ্ঠিত ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় চিকিৎসক। তাই সম্পন্ন একটি পরিবার ভারতের গ্রামে কীভাবে জীবনযাপন করে তা-ও তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল। 'উদয়-অস্ত' উপন্যাসে বনফুল এমনই একটি

পরিবারের অপরূপ, অনুপঙ্খ চিত্র এঁকেছেন। সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে স্কুলে পড়বার সময় তুলনামূলকভাবে অগ্রসর মফস্‌সলের সমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। ঔপনিবেশিক প্রশাসন সম্পর্কেও তাঁর প্রাথমিক জ্ঞান অর্জিত হল এখানেই। তারপর ডাক্তারি পড়বার জন্য মেডিক্যাল কলেজের পাঠ গ্রহণ। প্রথমে কলকাতা, পরে পাটনায়। ডাক্তারি পড়া মেধাবী ছাত্র অর্থাৎ সমকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজের মনো-নির্যাস শোষণ করে নেবার সর্বতো-সুযোগ ছিল তাঁর। বনফুলের লেখার মধ্যে এই বিচিত্র রসায়ন অনুভব করা যায়। একদিকে ভারতের গ্রাম সভ্যতার সহস্র অনগ্রসরতা সত্ত্বেও তার বিরাটত্ব ও মহত্ত্বের উপলব্ধি বর্তমান তাঁর সৃষ্টিতে। অন্যদিকে বিশ শতকের মধ্যভাগে শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির মনন-চর্যার পরিচয়, তার বহুবিধ ভাবনার মানচিত্রও আমরা পেয়ে যাব তাঁর লেখায়।

ডাক্তারি পাঠ শেষ করে বনফুল ভাগলপুর শহরে চিকিৎসক (প্যাথলজিস্ট, নিজের ল্যাবরেটরি ছিল) রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। এই সূত্রে একদিকে যেমন প্রচুর উপার্জনও করেন, অন্যদিকে ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র সর্বশ্রেণির মানুষের সংস্পর্শেই ঘনিষ্ঠ থাকেন তিনি। চিকিৎসকের কাছে মানুষই সবচেয়ে বড়ো। জাতিভেদ, ধর্মভেদ, লিঙ্গভেদ তার কাছে তুচ্ছ। বনফুলের ভাবনা-চিন্তায় যদিও কোথাও কোথাও কিছুটা রক্ষণশীলতা ছিল। কিন্তু তা প্রধানত মানবিক মূল্যবোধজনিত চিন্তনের ক্ষেত্রে। জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ জনিত উচ্চ-নীচতার ধারণা তাঁর মানবীয় অবলোকনকে গ্রাস করেনি কখনও।

যখন ডাক্তারির ছাত্র তখন থেকেই তিনি লেখক রূপে পরিচিতি পেয়ে গেছেন। তাঁর লেখার জনপ্রিয়তায় কখনও ভাঁটা পড়েনি; কখনও তাঁর লেখার চাহিদা কমেনি পত্রিকা সম্পাদক এবং প্রকাশকের কাছে। সেদিক থেকে বিহারের ভাগলপুরে থাকলেও কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের হৃৎস্পন্দনও তাঁর অজানা ছিল না। নিয়মিত যাওয়া-আসা ছিল কলকাতায় ও বাংলার বিভিন্ন সাহিত্য-সভায়। কলকাতার সাহিত্যিকেরাও ভাগলপুরে যেতেন প্রায়ই বনফুলের বন্ধু-বৎসলতা ও আতিথেয়তা ছিল উদার। জীবনের শেষ বারো/তেরো বছর বাস করেছিলেন স্বগৃহে কলকাতায়—১৯৬৮ থেকে ১৯৭৯। তখন নিজের জীবনের অভ্যাসে না হলেও নিজের চারিদিকে নিজের পরবর্তী তৃতীয় প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদেব দেখলেন তিনি। শিল্পী বনফুলের হৃদয় কখনও বিমুখ-স্বভাবী ছিল না। যা তাঁর নিজের অভ্যাস-বলয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা হয়তো সর্বদা তাঁর মনোমতো হয়নি; সমালোচনাও করেছেন; কিন্তু তাকে বিরাগবশত ঠেলে সরিয়ে দেননি কখনও। তাঁর মন ছিল প্রসন্ন ও গ্রহণশীল। বিনা চিন্তায় ও সংস্কারবশত কোনো কিছুকেই তিনি বর্জন করতেন না। তিনি সর্বদাই বোঝবার চেষ্টা করেছেন পরিবর্তনের কারণ, সূত্র, ফলাফল। সর্বত্রই তাঁর মনোভুবনে মানুষের অধিকার আর মানবতার দাবিই শেষ মর্যাদা পেয়েছে। মানব-চরিত্রের বৈচিত্র্য তাঁকে

আকর্ষণ করত। তিনি এমনও বিশ্বাস করতেন—'মানুষ কোথাও ভালো রয়ে গেছে'। বিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্বে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে রেখে এই মানুষকেই তিনি নানা রঙের আলো ফেলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছেন। মানুষও তাঁর শিল্প-কুশলী করতলে দামি পাথরের মতো ঝলক দেখিয়েছে বারবার।

'জঙ্গম' উপন্যাসটি সুপরিসর। উপন্যাসের পাঁচটি অধ্যায়ের মধ্যে চারটি অধ্যায়ই স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে। তিনি খণ্ডে বিন্যস্ত উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে ও তৃতীয় খণ্ডে আছে যথাক্রমে দ্বিতীয়-তৃতীয় এবং চতুর্থ পঞ্চম অধ্যায়ের সমাবেশ। উপন্যাসের কাল নির্দিষ্ট করা যায় বিশ শতকের চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার প্রাক্-মুহূর্ত পর্যন্ত। অর্থাৎ ১৯৩৫-৩৬ থেকে শুরু করে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এক দশক। কিন্তু আমরা লক্ষ করি, সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনাবলির প্রত্যক্ষতা গুরুত্ব পায়নি উপন্যাসের কোনো খণ্ডেই। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে তখন বিশ্বের শান্তিবাদী মানুষ সরব হয়েছেন। বাংলাতেও লেগেছিল তার হাওয়া। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী শান্তি-সম্মিলনে প্যারিস-এ ও ব্রাসেলস্-এ ভারত থেকে যোগ দিয়েছেন প্রতিনিধিরা ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে; প্রেরিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বাণী ; ভারতে গঠিত হয়েছে 'প্রগতি-লেখক-সংঘ', তার সভাপতি হয়েছেন প্রেমচন্দ্। কিন্তু 'জঙ্গম' উপন্যাসে এসব তথ্যের কোনো উল্লেখ নেই। যদিও উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শঙ্কর একজন লেখক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছে। আমাদের মনে হতে পারে, এর মূলে ভিন্ন কারণ আছে। রুশ বিপ্লব ১৯১৭-তে সফল হবার পর বিশের দশকের মধ্যভাগ থেকে তিরিশের দশকের ভাবতে, বিশেষ করে বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে সাম্যবাদী ভাবধারা ; প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে 'কমিউনিস্ট পার্টি অব্ ইন্ডিয়া'। কিন্তু মতবাদের দিক থেকে রুশ-পন্থী কমিউনিজ্ম্-কে কোনোদিনই ঠিক পুরোপুরি পছন্দ করে উঠতে পারেননি বনফুল। ভূসম্পত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের বা বিত্তবান মানুষকে ঘৃণা করা, তাদের শ্রেণিশত্রু ও পরস্বাপহারক মনে করবার ঐকান্তিক মতবাদের যান্ত্রিকতা তিনি সমর্থন করতে পারেননি। তাই শঙ্কর নামের যুবকটি তিরিশের দশকের মধ্যভাগের কলকাতায় বসবাস করা শিক্ষিত যুবক হলেও কমিউনিজ্ম্ সম্পর্কে তার কোনো আগ্রহই লক্ষ করা যায় না।

বনফুল ব্যক্তি জীবনে মোটের উপর গান্ধীজি ও কংগ্রেস দলের সমর্থক ছিলেন। সেই কালের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালিরা অধিকাংশই তাই ছিলেন। সকলেই গান্ধী ভক্ত না হলেও প্রথমে চিত্তরঞ্জন দাশ, পরে সুভাষচন্দ্র বসুব অনুরাগী ছিলেন অধিকাংশ বাঙালি। দল হিসেবে কংগ্রেসের কোনো বিকল্প ছিল না তখন। কমিউনিস্ট পার্টি নিজেদের কিছুটা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন—মন্বন্তর ও গণনাট্য সংঘের কালে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে এবং তার পরে তে-ভাগার সময়ে ১৯৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

কংগ্রেসি রাজনীতিতে তখন লবণ-আইন-অমান্য আন্দোলনের উদ্দীপনা অতীত। গান্ধীজি ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তখন পরিস্ফুট—১৯৩৭-৩৮-৩৯ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু 'জঙ্গম' উপন্যাসে সেসব প্রসঙ্গেরও কোনোই উল্লেখ নেই। এই উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে শঙ্করসেবক রায়। বিহারের এক সম্পন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তার পিতা বেশ কিছু জমিজমার মালিক, কিন্তু যথেচ্ছ ব্যয় করবার মতো বড়োলোক নন। শঙ্কর কলকাতায় বিজ্ঞান নিয়ে কলেজে পড়তে এসেছে; থাকে ছাত্রাবাসে।

শঙ্করকে লেখক একজন সময়োপযোগী সাধারণ মানুষ করে গড়বার চেষ্টা করেছেন। তার ভূমিকা প্রধানত দ্রষ্টার। বিহারের গ্রাম থেকে আসা শঙ্করের কাছে কলকাতা শহরের শিক্ষিত ও নব্য আধুনিক মহিলারা অচেনা। সে প্রথমে খানিকটা মোহগ্রস্ত হয়। কিন্তু কলকাতা শহরের আরও বহু ধরনের মানুষ দেখে দেখে তার মনে হয় ওখানে—ওই সমাজে, ওই মেয়েদের মধ্যে সে যথার্থ মনের আশ্রয় পাবে না। উপন্যাসের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অধ্যায় তাই শঙ্করের মনকে আমরা মানব-সংসারের বিচিত্র-ব্যাপ্ত পরিসরে সঞ্চরণ করতে দেখি। আবারও মনে রাখতে হবে, শঙ্করের মনের বিস্তার ঘটানোর ব্যাপারে কিন্তু রাজনীতির কোনো ভূমিকা নেই। সে নিজের মনে থাকে, কবিতা লিখে পত্রিকায় পাঠায়, তার দৃষ্টিপথে যে নর-নারীরা আসে তাদের সঙ্গে সে সহানুভূতির সঙ্গে মেশবার চেষ্টা করে। এভাবেই দিন কাটে তার।

লেখক যে সবসময়ে শঙ্করের দৃষ্টিরেখা অনুসরণ করেছেন—তা-ও নয়। সর্বজ্ঞ লেখকের ভূমিকা নিয়েই গল্প বয়নে অগ্রসর হয়েছেন তিনি। লেখকেরও যেন আনন্দ বিভিন্ন মানুষ দেখায়। কোনো অনূঢ়া তরুণী নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। কোনো অভাবের সংসারে এক যুবক ও তার বউদি কষ্টের মধ্যে বহু পরিশ্রমে গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টা চালিয়ে যায় কিন্তু নির্বাপিত হতে দেয় না মনের আনন্দ। ভাগ্যান্বেষী জ্যোতিষী, দেহজীবিনী, নারীলুব্ধ প্রৌঢ়, কন্যাদায় গ্রস্ত পিতা, শান্ত শ্রী তরুণী, নির্মোহ সমাজসেবক, প্রকৃত প্রেমিক ভদ্রলোক —খোলা মনে ও খোলা চোখে সকলকে দেখতে দেখতে তার মন আপনা থেকেই পরিণত হতে থাকে। দ্রষ্টা থেকে সে সহসা এক সক্রিয় চরিত্রে পরিণত হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে দেখা যায়—এক দরিদ্র ভদ্রলোকের কন্যার সঙ্গে শঙ্করের বিবাহ-সম্বন্ধ হবার কালে শঙ্করের পিতা যখন পণের টাকা কম করতে রাজি হচ্ছেন না—তখন হঠাৎ শঙ্কর ঘোষণা করে—বিণা পণেই সে মেয়েটিকে বিবাহ করবে, এমনকি মেয়েও দেখবে না। শঙ্করের পিতা শঙ্করের জন্য সব খরচ পাঠানো বন্ধ করে দেন।

উপন্যাসের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে শঙ্করের জীবন-সংগ্রাম চলে। তার পত্নী অমিয়ার জীবনে শঙ্কর ছাড়া আর কেউ নেই। শঙ্করের জন্য সে উৎসর্গ করে দিতে পারে তার প্রাণ। ক্রমে শঙ্কর লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু তার মনের মধ্যে ক্রমে জেগে উঠতে থাকে এক সমাজ-কর্মী। তাকে আকর্ষণ করতে থাকে তার গ্রাম, তার শিকড়।

পঞ্চম অধ্যায়ের শুরুতেই দেখি শঙ্কর চার বৎসর ধরে বাস করছে গ্রামে। চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে দেখেছি তার বাল্যবন্ধু উৎপল গ্রামে নিজের বিস্তীর্ণ জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়েছে শঙ্করকে। শঙ্করের পিতাও মৃত্যুকালে দিয়ে গেছেন সম্পত্তি। গ্রামের মানুষের সেবায় নিজেকে ঢেলে দিয়েছে শঙ্কর। অমিয়া তার যোগ্য সহধর্মিনী—মানুষের সেবায় সমর্পিত প্রাণ। শিশুকন্যা নিয়ে তার সুখের সংসার।

কিন্তু এখানে একটি চমৎকার শিল্পীর তুলির টান দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। অমিয়া ও সন্তানকে নিয়ে কোনো অপূর্ণতা নেই শঙ্করের। অমিয়াকে ভালোবাসে, তার ঔদার্য আর মহত্ত্বকে শ্রদ্ধাও করে। কিন্তু তার অন্তরের অধিবাসিনী চির-প্রিয়া সে নয়। সেখানে উৎপলের স্ত্রী সুরমার অধিষ্ঠান। সুরমাকে উৎপলের পত্নী রূপেই প্রথম দেখেছিল শঙ্কর। সুন্দরী, সপ্রতিভ, শোভনরুচি, বুদ্ধিদীপ্ত মেয়েটিকে সে কখনও মন থেকে সরাতে পারেনি। তাদের মধ্যে কখনও প্রণয়-সম্ভাষণের অবকাশ ঘটেনি। এতটুকুও অতিরিক্ত অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠেনি তাদের মধ্যে। তবু শঙ্করের আরাধ্যা নারী থেকে গেছে সুরমা। সুরমাও তা জানে। জেনে সে তৃপ্ত। এই মাত্র।

উপন্যাসের শেষে দেখা যায়, গ্রামে লেগেছে কলেরার মড়ক। স্ত্রী-কন্যাকে পিত্রালয়ের নিরাপত্তায় পাঠিয়ে দিয়ে শঙ্কর গ্রাম-সেবায়, মড়ক-নিবারণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে সে গ্রামের মানুষ সম্পর্কেও অন্যরকম ভাবে। সে স্থির করে—এভাবে গ্রামের মানুষের কল্যাণ করবার প্রয়াস যদি সার্থকও হয়—তবু এ-পথ সর্বোত্তম পথ নয়। গ্রামের মানুষের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে স্বয়ম্ভরতা। তারাই স্থির করবে গ্রাম-উন্নয়নের লক্ষ্য ও পদ্ধতি। নিজেদের কাজ করে নেবে নিজেরাই। নির্বাচন করে নেবে কর্মীদের। শঙ্কর আর উদ্যোক্তা থাকবে না—হবে সাধারণ কর্মী।

'জঙ্গম' উপন্যাসটিকে 'এপিক' উপন্যাস বলেছেন অনেকেই ; আবার অনেকে তা বলতে চাননি। এপিক বলি তাকেই—যে-আখ্যানে থাকে এক জাতি গোষ্ঠীর সামগ্রিক দেশ-কাল ও জাতীয় চরিত্রের পরিচয়। 'জঙ্গম'-কে 'এপিক' বলবার পক্ষে যে আপত্তি তার উল্লেখ আমরা প্রথমেই করেছি। এই উপন্যাসে সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ নেই। উপন্যাসটির কাল-পরিসরও খুব বিস্তৃত নয়। বারো / তেরো বছর মাত্র। ফলে সমাজ-বিবর্তনের তেমন স্পষ্ট পর্বান্তরও এখানে দেখানো হয়নি। তবু উপন্যাসটিকে 'এপিক' অভিধা দেওয়া একেবারে অযৌক্তিক নয়। এই উপন্যাস যেন মহানগরীর মহারণ্যে সুবিপুল মানব-বৈচিত্র্যের জীবন্ত প্রতিবিম্ব। মানুষের মন, ভাবনা, আকাঙ্ক্ষার কত যে রহস্যময় গলিপথ আছে ; আছে কত অন্ধকার সুড়ঙ্গ আর আলোকিত সম্পাতবৃত্ত—তারই জটিল নকশা এই কথাবৃত্তে অঙ্কিত। মানুষের মন কোথাও থেমে থাকে না। তার কর্মজীবন আপাতভাবে খুব বিস্তৃত না-ও হতে পারে। যেমন শঙ্করের চলা ছিল গ্রাম থেকে শহরে, আবার শহর থেকে গ্রামে। কিন্তু এর মধ্যেই তার মন পার হয়ে গেছে যেন অনেক আলোকবর্ষ। অনভিজ্ঞ কলেজ-ছাত্র শেষ পর্যন্ত জীবনকে এতটাই চিনেছে যে, নিজের অধিকারের একার আসনটি সে

জনগণের জন্য ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। এসেই আমরা বলতে পারি প্রকৃত অর্থে জঙ্গমতা, আলোর পানে প্রাণের চলা। এই এপিক ঠিক দেশকালের হয়তো নয়; এ-মহাকাব্যকে বলা যায় মানব-হৃদয়ের এপিক।

'নবদিগন্ত' উপন্যাসটি আক্ষরিক অর্থেই সিনেমার জন্য লেখা। রচনাকাল ১৯৪৯-৫০। কিন্তু লেখাটি নিয়ে সিনেমা শেষ পর্যন্ত হয়নি। বনফুল 'মন্ত্রমুগ্ধ' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। সেটির চলচ্চিত্র রূপ দেওয়া হয় নিউ থিয়েটার্স থেকে। সিনেমাটি জনপ্রিয় হওয়ায় নিউ থিয়েটার্স-এর মালিক বীরেন্দ্রনাথ সরকার বনফুলকে অনুরোধ করেন একটি 'নাচগানওয়ালা' বই লিখে দেবার জন্য। বনফুল রাজি হয়ে যান। এমন প্রস্তাবে রাজি হওয়া একজন বড়ো সাহিত্যিকের পক্ষে উচিত কি না সে-প্রশ্নের উত্তরে অনেক কথাই বলা যায়। প্রথমত, মনের মতো পরিবেশে লেখার জন্য তিনি ভাগলপুরে গঙ্গার ধারে 'গোলকুঠি' বাড়িটি কিনেছিলেন। তখন বাড়ি কেনার ঋণসহ তাঁর বেশ ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, সিনেমার জন্য গল্প লেখাকে তিনি অবজ্ঞা করবার মতো কাজ ভাবতেন না। তাঁর ছোটোভাই অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ছিলেন চলচ্চিত্র-পরিচালক। তৃতীয়ত, ফরমায়েশি একটি কাজ এবং লিখতে হবে স্ক্রিপ্ট্-এর মতো করে। বনফুলের বৈচিত্র্যপ্রিয় এবং চ্যালেঞ্জিং মনোভাব কাজটিতে তাঁকে প্রবৃত্ত করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই কাহিনি নিয়ে চলচ্চিত্র হল না। মনঃক্ষুন্ন বনফুল লেখাটিকে উপন্যাসে রূপান্তরিত করেন এবং ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দেই সেটি প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। তিন বছরের মধ্যেই ১৯৫৩ তে দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছিল বইটির।

সিনেমার গল্পের ছাঁচ স্বাভাবিক ভাবেই লেখাটির মধ্যে আছে। ধনবান উকিল সূর্যকান্ত চৌধুরী তাঁর এম. এস-সি পাস ছেলে দিবসকে আইন পড়াতে চান। কিন্তু দিবস বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে চায় এবং সরোদ বাজায়। আইন-ব্যবসাকে সে শ্রদ্ধা করে না। সূর্যকান্তর বন্ধু গোবিন্দ সান্ডেল তাঁকে ইন্ধন জোগান। বাড়ির পুরাতন ভৃত্য ব্রজ সব দিক সামাল দেবার চেষ্টা করে।

কিন্তু সামাল দেওয়া যায় না। দিবস বাড়ি ছেড়ে একটি বস্তিতে আশ্রয় নেয়। ক্রমে তার আলাপ হয় রঙ্গনার সঙ্গে। রঙ্গনার বাবা আপনভোলা, মার্গ সঙ্গীতশিল্পী, তাঁর তবলিয়া হিন্দু, সারেঙ্গি-বাদক মুসলমান। সাম্প্রদায়িক ঐক্যের অবকাশও এখানে রচিত হয়েছে। সঙ্গীতশিল্পীর সূত্রে নাচগানও এসে যায় গল্পে। শেষ পর্যন্ত দিবস ও রঙ্গনার মন জানাজানির পালা সম্পন্ন হয়। গবেষণার সুযোগ পেয়ে দিবস উড়ে যায় বিদেশে। এয়ারপোর্টে তাকে বিদায় দিতে মিলিত সবাই। পুত্র গর্বে তখন পিতা সূর্যকান্তও উদ্‌ভাসিত।

একটি সিনেমার গল্প। এ-নিয়ে আলোচনার হয়তো কিছুই থাকত না যদি না বনফুলের লিখন শক্তিতে গল্পটি থেকে বেরিয়ে আসত অন্য একটি আলো। সে-আলো কেবল শিল্প-কৌশল-জাত নয়। সে-আলোর উৎস বনফুলের

জীবন-বিশ্বাস। তিনি তরুণ প্রজন্মের উদারতায় আর আত্মনির্ভরতায় আস্থাবান ছিলেন। ভারতের মতো দেশে অভিভাবকেরা সন্তানদের স্বাধীনতা দিতে চান না। তাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে চান নিজেদের অনুশাসনে। এই মনোভাব বনফুলের সমর্থন পায়নি। তাঁর বহু গল্প উপন্যাসে সন্তান—ছেলে এবং মেয়ে—উভয়েই নিজেদের পথ নিজেরা বেছে নিতে চায় এবং সে-পথ অন্যায় নয়। উপন্যাসটিতে দিবস ও রঙ্গনার প্রণয় দৃশ্যের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে সূর্যকান্তর আত্মানুসন্ধান এবং দিবস ও রঙ্গনার স্বাধীন ইচ্ছা তথা উদার মনের টুকরো টুকরো ছবি। 'নবদিগন্ত' উপন্যাসটি তাই, সিনেমার গল্প হিসেবে নয়, অতি সু-পাঠ্য একটি মানবসম্পর্ক-রসমধুর একটি আখ্যান হয়ে থাকে।

বনফুলের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'ত্রিবর্ণ'—প্রকাশ ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে। এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট—কঠিন বাস্তব। ভারতের স্বাধীনতার পটভূমিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু সমস্যা। তবু বলা যেতে পারে—এখানেও উদ্বাস্তু সমস্যার মূল সন্ধান ও বাস্তবের অনুপুঙ্খ চিত্র তুলে ধরবার পাশাপাশি হয়তো তার চেয়েও বেশি প্রাধান্য পেয়েছে মানব-চরিত্রের বিচিত্র রহস্য।

উপন্যাসটি দীর্ঘ—বহু মানুষের সমাবেশ। প্রধান চরিত্র তিনজন। দু-জন ডাক্তার ও একজন পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে আসা মানুষ। উদ্বাস্তু ব্যক্তির নাম গণেশ হালদার। ঘুরতে ঘুরতে তিনি আশ্রয় পেয়েছেন এক মহানুভব ডাক্তারের গৃহে। যদিও অনেক আঘাত পেয়েছেন তবু মানুষের মহত্ত্বে ও শুভবোধে আস্থা হারাননি গণেশ হালদার। উপন্যাসে লেখক তাঁকে সবুজ বর্ণ-সংকেতে চিহ্নিত করেছেন। যে-ডাক্তারের গৃহে আশ্রয় পেয়েছেন গণেশ হালদার—তাঁর নাম সুঠাম মুখোপাধ্যায়। ধনী কিন্তু তাঁর মহত্ত্ব সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। তিনি দরিদ্রকে অকাতরে দান করেন, অসহায়ের সেবা করেন। বিনা ভাড়ায় গণেশ হালদারের আহার্য-বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি ভালোবাসেন বৃক্ষলতা, পশু-পাখি। তিনি যেন পশুপাখির ভাষাও বোঝেন। মানুষই তাঁর কাছে সর্বাধিক বিবেচ্য—রাজনীতি বা প্রশাসন নয়। তাঁর সংকেত বর্ণ সাদা—শান্তি ও সমন্বয়ের রঙ। উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্র উগ্রপন্থী। বাস্তুত্যাগী বাঙালির যে সংকট তার সমাধানে সশস্ত্র আক্রমণের পথে তারা সমাজের বিভিন্ন স্তরে আঘাত করে উদ্বাস্তুদের জন্য দাবি ও অধিকার আদায় করে নিতে চায়। এই গোষ্ঠীর নেতৃত্ব যাদের হাতে তাদের এক প্রতিনিধি এই উপন্যাসে ঝিনুক নামের মেয়েটি। তাদের রঙ বনফুলের মতে লাল। এই তিন রঙের মানুষের ও মানব-প্রবৃত্তির সমন্বয়ে গড়া উপন্যাস 'ত্রিবর্ণ'।

উপন্যাসটির অনেকগুলি দিক আছে। প্রথমত, সেই যুগের অনেকের মতোই দেশ বিভাগ সমর্থন করতে পারেননি বনফুল। বাস্তবকে স্বীকার করতেই হয়েছিল কিন্তু তার জন্য ছিল ক্ষোভ। দ্বিতীয়ত, দেশভাগের ফলে বিশেষভাবে বাঙালিকে যে বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছিল তার জন্যও ক্রোধ

সঞ্চারিত ছিল তাঁর অন্তরে। এই উপন্যাসে সেই সংক্ষুব্ধ লেখক-মানসের পরিচয় আছে। দেশ-বিভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে খুবি বেশি বাংলা গল্প-উপন্যাস লেখা হয়নি বলে অনেকে মনে করেন। যদিও পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে তেমন বাংলা উপন্যাসের সংখ্যা খুব কমও নয় যেখানে উদ্বাস্তু সমস্যা ও দেশ-বিভাগের সংকট হয় কেন্দ্রীয় বিষয় অথবা প্রেক্ষাপট রূপে গৃহীত হয়েছে। তবে তেমন উপন্যাসের অনেকগুলিই খুব শিল্প-সার্থক হয়ে ওঠেনি।

বনফুলের 'ত্রিবর্ণ' উপন্যাসের শিল্পগুণ নিয়ে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। উপন্যাসটি বহু ঘটনা ও বহু চরিত্রের ভিড়ে কিছু ভারাক্রান্ত। বিশেষ করে এমন অনেক চরিত্র আছে যারা কিছু অদ্ভুত ধরনের। তাদের নিজস্ব রুচি, আচরণ ও খামখেয়াল নিয়ে তারা উপন্যাসে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। যেমন ডাক্তার রাঘব ঘোষাল। আপাত অসৎ কিন্তু মনের গভীরে অকপট এই মানুষটি উপন্যাসে অনেকটা জায়গা নিয়েছেন। হয়তো ততটাই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'ত্রিবর্ণ' উপন্যাসটিও বনফুলের অন্যান্য উপন্যাসের মতোই বিচিত্রের শোভাযাত্রা হয়ে উঠেছে। মানুষের রঙ তিন নয় বহু। এই সহস্র রঙের মানব-রূপ দেখতে দেখতে তিনি হারিয়ে ফেলেন নিজেকে। এখানেই তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মতোই 'ত্রিবর্ণ' উপন্যাসেরও প্রধান আকর্ষণ। এই উপন্যাসের তিনটি ভর-চরিত্র। তাদেব মধ্যে সদাশয় ডাক্তার সুঠাম মুখোপাধ্যায় বনফুলের একটি প্রিয় টাইপ। নিজের পিতার এবং নিজের চিকিৎসক-মনের ভালো দিকগুলি ছেঁকে নিয়ে এমন ডাক্তার চরিত্র তিনি অন্যান্য উপন্যাসেও গড়ে তুলেছেন। 'হাটেবাজারে', 'অগ্নীশ্বর' উল্লেখযোগ্য। 'সীমারেখা' (১৯৬৫) উপন্যাসটি নিয়ে বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। সুবিখ্যাত রুশ কথাসাহিত্যিক এ.পি.শেখভ্-এর 'ছয় নম্বর ওয়ার্ড' গল্পের নির্যাস নিয়ে নির্মিত একটি ছোটো উপন্যাস 'সীমারেখা'। বনফুল পাশ্চাত্য কথাসাহিত্যের আগ্রহী পাঠক ছিলেন। শেখভ্-এর গল্পটির বঙ্গীকরণ করেছেন তিনি। পরিবেশ ও চরিত্রগুলি হয়েছে বাঙালি সমাজের। বলবার কথা এটুকুই — যে সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে তীব্র তিক্ততা নিয়ে শেখভ্ লিখেছিলেন 'ছয় নম্বর ওয়ার্ড' নামক পাগলা গারদ ও তার অসহায় চিকিৎসকের কাহিনি ঠিক ততটা তিক্ততা বনফুলের ছিল না। তাঁর উপন্যাসে অসহায় ডাক্তার যামিনীভূষণ দত্ত শেষ পর্যন্ত মারা গেছেন। কর্তৃপক্ষের দিক থেকে বিনা ঔষধ-পত্র ও সহানুভূতিতে নিরুপায় হয়ে পাগলা গারদের দেখাশোনা করতে গিয়ে শেখভ্-এর ডাক্তার নায়কের মতো ততটা পাগল হয়ে যাননি। তবে মনের গঠনে শেখভ্-এর নিরাসক্তি না থাকলেও সমকালীন সমাজের বিপথগামিতা এবং সর্বস্তরের অন্যায়-অবিচার-দুর্নীতি-স্বার্থপরতার প্রতি ঘৃণাই তাঁকে এই অনুবাদ-উপন্যাসটি লিখতে প্ররোচিত করেছিল—তাতে সন্দেহ নেই।

এর পর আমরা চলে আসি বনফুলের উপন্যাসের একেবারে শেষ পর্বে। 'অসংলগ্ন' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে এবং 'তুমি'-র প্রকাশ

১৯৭১-এ দুটি উপন্যাসকেই বলতে হবে প্রতীকী কল্পনাময়। সাধারণ আখ্যানধর্মী উপন্যাসের সঙ্গে তুলনাও করা যাবে না। প্রথাসিদ্ধ উপন্যাসের মানদণ্ডে বিচার করাও যাবে না এই লেখা দুটিকে।

'অসংলগ্না' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র প্রৌঢ় লেখক সুভদ্র সেন। অনেকের কাছে তিনি 'পাগল' আখ্যায় ভূষিত। তিনিও তাঁর চারিদিকের মানুষ ও প্রকৃতিকে নিজের মতো করে দেখেন এবং যা মনে হয় তা লিখে রাখেন খাতায়। খাতার নাম 'মেঘ'। তাঁর সংসারে আছে বিধবা কন্যা শ্যামলী আর কুড়িয়ে পাওয়া নাতনি—সাঁওতাল জননীর অনাথ কন্যা মহুয়া। তিন পর্বে সাজানো অনতিপ্রশস্ত রচনাটির প্রথম পর্বে সুভদ্র ও মহুয়ার সংলাপ, প্রকৃতির প্রাণলীলায় শুদ্ধতাকে অনুভব করবার উপলব্ধি। দ্বিতীয় পর্বে অলৌকিক বাতাবরণে মহাকালের আবির্ভাব ও কয়েকটি কাল্পনিক চরিত্রের কাব্যময় ও দার্শনিক ভাবনা-সমৃদ্ধ কথোপকথন। তৃতীয় পর্বে বহুকাল কেটে গেছে। সুভদ্র যেন আর মহুয়া পরিণত হয়েছে দুটি দেবদারু গাছে। মহাকালের গতিকে এভাবেই অনুভব করেছিলেন বনফুল।

'তুমি' উপন্যাসটির প্রকাশ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে এবং এই উপন্যাসও এক লেখকের কল্প-কাহিনি। লেখকের নাম দিগন্ত সেন। বনফুল যেমন সদাশয় ডাক্তার চরিত্রকে প্রতিনিধি করে তুলেছিলেন তাঁর অনেক উপন্যাসে তেমনই কল্পলোকচারী সাহিত্যিকও তাঁর অনেক আখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্র। বিশেষ করে লেখকজীবনের শেষের দিকে এই রচনাকৌশল তিনি গ্রহণ করেছিলেন। যদি কোনো সমালোচক এমন অভিযোগ করেন যে জীবনের শেষ পর্বে আখ্যান বয়নের কারণ-কার্য-শৃঙ্খলা সমন্বিত যৌক্তিক আখ্যান নির্মাণ করবার সাবধানতার দায় থেকে মুক্তি পাবার জন্য এই কৌশল তাহলে সেই অভিযোগের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হওয়া যাবে না। কল্পলোকচারিতা ছিল বনফুলের অন্যতম মানস-বৈশিষ্ট্য। আমাদের মনে পড়তে পারে বালক বলাইচাঁদ ঘুরে বেড়াতেন তাঁদের প্রকৃতি-নিবিড় দেশের বাড়ির আনাচে-কানাচে। বৃক্ষ-লতা, কীট-পতঙ্গ, হরিণ-খরগোস-পাখির সঙ্গে নিবিড় সখ্যের কারণে তাঁর দেশের বিহারি সঙ্গী-সাথি এবং অনুচরেরা তাঁর নাম দিয়েছিল 'জংলি বাবু'। সেই নামের শোভন সংস্করণ হিসেবে তিনি ছদ্মনাম নেবার প্রয়োজন হলে 'বনফুল' নামটি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বহু লেখায় প্রকৃতিমুগ্ধ চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর একাধিক গল্প-উপন্যাসে বাস্তব মানুষের সাংসারিক ঘটনাবলির ঘনিষ্ঠ সমান্তরালতায় সপ্রাণ হয়ে উঠেছে প্রকৃতি; কথা বলেছে নদী, পাহাড়, গাছ, পাখি। সে সব কথা তাঁর কথাসাহিত্যের চরিত্ররা শুনতেও পায়, বুঝতেও পারে। আমরা এই খণ্ডে এর আগে যে উপন্যাসগুলির আলোচনা করেছি তার অনেকগুলিতেই এই লক্ষণ দেখা গিয়েছে।

বনফুলের কল্পলোক বিহারের আর এক দৃষ্টান্ত হল কল্পচরিত্রের নির্মাণ। মাঝে মাঝেই তিনি মনোলোকবিহারী কোনো এক মানব বা মানবীকে কল্পনা করে নেন। সেই চরিত্রটিকে স্থাপন করেন কোনো এক বাস্তব চরিত্রের অন্তর-

কেন্দ্রে। সেই মানস চরিত্রের সঙ্গে বাস্তব চরিত্রের যে ভাববিনিময় চলে সেই উপলব্ধির বাতাবরণেই গড়ে ওঠে তাঁর উপন্যাস। তাকে উপন্যাস না বলে কল্পকথার বয়নও বলা চলে।

'তুমি' লেখাটিও তেমনই। অন্তরস্থিত এক 'তুমি'-কে সম্বোধন করে লেখক দিগন্ত সেন কথা বলেন, লিখে রাখেন কিছু কিছু ভাবনা। তিনি বাস্তব জীবনের স্বাভাবিক কাজকর্মও করেন কিন্তু সব কাজের মধ্যে যেন যোগসূত্র রচনা করে যায়। এই 'তুমি'-র সঙ্গে তাঁর অন্তরের আবেগ।

লেখাটিতে ধারাবাহিক কোনো আখ্যান নেই। আছে টুকরো টুকরো ছবি। সে সব ছবিতে জীবনের গভীর উপলব্ধি এবং সুন্দরের রূপ নির্মাণই প্রধান হয়ে উঠেছে। তেমন একটি চিত্র আছে এক সরস্বতী প্রতিমার বর্ণনায় ; বর্ষণ-মন্দ্রিত অপরাহ্নে, ঝড়ের হাওয়ায়, অথবা মানব-সম্পর্কের গভীর সংকটের মধ্যেও উঠে আসে সেই 'তুমি'-র স্পর্শ। দিগন্ত সেনের মনোলিখনের একটি অংশ—"তুমি হাসছ, তা দেখতে পাচ্ছি। তোমার হাসিটা দেখতে পাচ্ছি সামনের গাছটায় প্রচ্ছন্ন হলদে পাখির পালকের ঝলকে। অথচ তুমি রয়েছ আমার মনের নেপথ্যে। এই ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানির খেলা আর কতদিন চালাবে তুমি। এই নিরবচ্ছিন্ন বহু রাগ-রাগিণী-সমন্বিত সংগীত কি সমে এসে কোনোদিন থামবে না? দেখা দেবে না সংগীত সরস্বতী? নির্জন ঘরে একা বসে আছি। এ সময়ে যদি আসতে .... মূর্তিমতী হয়ে বলতে যদি কিছু....."—ঔপন্যাসিক বনফুলের অন্তরে চিরকালই এক কবি বাস করেছিলেন—একথা আমাদের ভোলবার উপায় থাকে না।

এই খণ্ডের শেষ উপন্যাসটি ১৯৭২-৭৩-এ লেখা। উপন্যাসটি কিশোরদের জন্য পরিকল্পিত এক আধুনিক রূপকথা। আধুনিক হলেও সেই পুরোনো সংস্কৃত কথাসাহিত্যের গল্পের ধরনটি খানিকটা পাওয়া যায়। রাজ্যের নাম অলঙ্কারপুরী। উপন্যাসটিরও নাম 'অলঙ্কারপুরী'। রাজার নাম সমূহগুণ, রাজকন্যার নাম রত্নাবলী। রূপবান গন্ধর্বরাজ শুদ্ধসুরের সঙ্গে রত্নাবলীর বিয়ে হল। গল্পটির বাঁকে বাঁকে অনেক মোহন দৃশ্যের সমাবেশ।

বনফুল ছোটোদের জন্যও অনেক গল্প লিখেছেন। উপন্যাস তুলনায় কম। 'অলঙ্কারপুরী' উপন্যাসটি একটি সুন্দর নিদর্শন। কোনো জায়গায় আখ্যানটির বাঁধুনি শিথিল হয়ে যায়নি। বিচিত্র দৃশ্য সমাবেশে আকর্ষণ ও শেষ পর্যন্ত বজায় আছে। উপন্যাসটিতে লেখকের কল্পনা-প্রতিভার চমৎকার অভিব্যক্তি অনুভব করা যায়।

এই খণ্ডটিতে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঔপন্যাসিক বনফুলের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের চমৎকার একটি ধারাবাহিক পরিচয় ফুটে উঠেছে যে-কোনো পাঠকেরই ভালো লাগবে এই সংকলন।

সুমিতা চক্রবর্তী

জঙ্গম

দ্বিতীয় অধ্যায় ও তৃতীয় অধ্যায়

।। এক ।।

শিরীষবাবুর বাড়ির অন্তঃপুরে বসিয়া মুকুজ্জেমশাই শিরীষবাবু এবং শিরীষবাবুর পত্নী সুশীলাসুন্দরী কথাবার্তা বলিতেছেন। সুশীলাসুন্দরী অবশ্য বিশেষ কোনো কথাবার্তা বলিতেছেন না, তিনি একটু দূরে বসিয়া মাথায় আধ-ঘোমটা টানিয়া সুপারি কাটিতেছিলেন এবং ইঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। গুরুজনদের সম্মুখে অকারণে বাচালতা প্রকাশ করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ এবং স্বভাবতই তিনি নীরবপ্রকৃতির। সব কিছু মন দিয়ে শোনেন, কিন্তু বেশি কিছু বলেন না।

চিন্তিতমুখে শিরীষবাবু বলিলেন, আপনি যাবেন না, তা হলে কি করে হবে? আমার পক্ষে একা—

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, হলেই বা একা, তারা তো আর বাঘ-ভালুক নয় যে, তুমি গেলেই খপ করে খেয়ে ফেলবে। তুমি মেয়ের বাপ; তুমি না গেলে চলবে কেন?

শিরীষবাবু মাথাটা উঁচু করিয়া চিবুকের তলাটা চুলকাইতে লাগিলেন। মুকুজ্জেমশাই সহাস্য দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, ছেলেটিকে একবার দেখাও হবে, আর ভদ্রলোকের মনোভাবও খানিকটা বোঝা যাবে। চিঠিপত্রে তিনি খোলাখুলি কিছু বলতে চান না, সে তো দেখছ।

শিরীষবাবু চিবুক চুলকানো শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং জানালা দিয়া মাথাটা বাহির করিয়া সশব্দে নাকটা ঝাড়িয়া ফেলিলেন। কোঁচা দিয়া নাকটা মুছিতে মুছিতে বলিলেন, সর্দিও করেছে, ভাবছি, ট্রেনে আবার এক্স্‌পোজার লাগবে। পরের শনিবার গেলে কেমন হয়? রাজমহলে কদিন লাগবে আপনার?

আদালতের ব্যাপার তো, ঠিক বলা যায় না। সাক্ষী-ফাক্ষিগুলোও সব ঠিক করতে হবে, তা ছাড়া, মনু হয়তো ছাড়তে চাইবে না, অনেক দিন যাইনি।

সুশীলাসুন্দরী চকিতে একবার মুকুজ্জেমশাইয়ের মুখের পানে চাহিয়া আবার সুপারি কুঁচানোতে মন দিলেন।

মনু অর্থাৎ মনোরমা নামক বিধবাটির সহিত মুকুজ্জেমশাইয়ের প্রকৃত সম্পর্কটা যে কি, কেহ তাহা জানে না। সম্পর্ক একটা নিশ্চয়ই আছে, কারণ মুকুজ্জেমশাই তাঁহার সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করেন। মনোরমার বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি, খুব নিষ্ঠাবতী বিধবা। মুকুজ্জেমশাই যদিও তাঁহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন, কিন্তু কখনও নিকটে রাখেন না। নানা স্থানে মুকুজ্জেমশাইয়ের পরিচিত লোকের অভাব নাই, কাহারও না কাহারও পরিবারে মুকুজ্জেমশাই মনোরমাকে রাখিয়া দিয়া নিজে অন্যত্র চলিয়া যান। সাধারণত যে সকল পরিবার মুকুজ্জেমশাইয়ের অর্থসাহায্যের ওপর নির্ভর করে, সেই সব পরিবারেই মনুকে তিনি রাখিয়া থাকেন। সম্প্রতি মনোরমা রাজমহলে যে পরিবারে রহিয়াছে, সেই পরিবারের কর্তাটি জেলে

গিয়াছেন. আপিসের টাকা ভাঙিয়াছেন—এই তাঁহার অপরাধ। মুকুজ্জেমশাইয়ের ধারণা—লোকটি নিরীহ, তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে! তিনি এই অপবাদ খণ্ডন করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। উকিল-ব্যারিস্টার দ্বারা যতটা করা সম্ভব সবই করিয়া দেখিবেন ঠিক করিয়াছেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি অমিয়ার বিবাহ-ব্যাপারে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন এবং এ সম্বন্ধে একটা পাকাপাকি ঠিক না হওয়া পর্যন্ত কোথাও নড়িবেন না ঠিক করিয়াছিলেন; কিন্তু গতকল্য মনুর একখানি পত্র আসিয়াছে যে, অন্তত দুই-একদিনের জন্য রাজমহলে আসা তাঁহার নিতান্ত দরকার, না আসিলে মকদ্দমার ক্ষতি হইবে। সেই জন্য নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুকুজ্জেমশাইকে যাইতে হইতেছে।

শিরীষবাবু অকূল পাথারে পড়িয়া গিয়াছেন।

শিরীষবাবু মুখের ওপর হাতটা একবার বুলাইয়া বলিলেন, আপনি ঘুরে আসুন, তারপর যাওয়া যাবে। এতদিন যখন গেছে, তখন দু-চার-দশ দিন আর কি এমন এসে যাবে! তা ছাড়া, যতই তাড়াতাড়ি করুন, বোশেখের আগে তো আর বিয়ে হচ্ছে না।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, হাতে কি খুব বেশি সময় আছে মনে কর তুমি? তিরিশটি পাত্রের সন্ধান পেয়েছিলাম, চিঠিপত্র লেখালেখি করে তো জন পনেরোকে বাতিল করা গেছে, কুষ্ঠির মিল জন-ছয়েকের সঙ্গে হল না। বাকি আছে ন জন, এদের সঙ্গে চিঠিপত্রে যতটা হবার হয়েছে, এইবার দেখাশোনা করা দরকার। সব কটিই সুপাত্র। ন জনের সঙ্গে দেখা করতে তোমার অন্তত ন সপ্তাহ লাগবে, তোমার তো শনি রবি ছাড়া ছুটি নেই।

শিরীষবাবুকে স্বীকার করিতে হইল, ছুটি নাই। কিন্তু তিনি অবুঝের মতো বলিলেন, ন জনকেই দেখতে না হতে পারে। এই শঙ্কর ছেলেটিকেই আমাদের পছন্দ, শঙ্করের বাবা অম্বিকাবাবু আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়ও। সেজদার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে কি যেন সম্পর্ক আছে ওঁদের। ওইখানেই হয়তো হয়ে যাবে। কুষ্ঠি অনুসারে তাই হওয়া উচিত।

ধর, যদি না হয়!

শিরীষবাবু অবশ্য ধরিতে রাজি নহেন, কিন্তু যুক্তির আবশ্যকতা অস্বীকার করা মুশকিল। ও-পথে না গিয়া সুতরাং তিনি বলিলেন, বুঝছেন না. আপনি সঙ্গে না থাকলে বেশ জোর পাওয়া যায় না, তা ছাড়া আপনিই সব করেসপন্‌ডেন্‌স করেছেন। আপনি ঘুরে আসুন, তারপরে যাওয়া যাবে। ভাগ্যে যা আছে তা হবেই। একা একা সব ব্যাপারে যাওয়া ঠিক নয়, আমি এর ভালো-মন্দ তেমন বুঝিও না। তা ছাড়া নিজের দায়িত্বে একটা কিছু করে ফেলে শেষে যদি গোলমাল হয়, সুশীলা আমাকে—

কথাটা শিরীষবাবু শেষ করিলেন না, সুশীলার দিকে একবার চাহিয়া উঠিয়া গিয়া পুনরায় নাকটা ঝাড়িলেন। মুকুজ্জেমশাই ও সুশীলা পরস্পরের দিকে তাকাইয়া সহাস্য দৃষ্টি বিনিময় করিলেন।

অগত্যা স্থির হইল, মুকুজ্জেমশাই রাজমহল হইতে ফিরিয়া আসিয়া শিরীষবাবুকে লইয়া অম্বিকাবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। তৎপূর্বে কিছুই হইবে না।

মুকুজ্জেমশাই উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, যাই, তা হলে মনুকে একটা চিঠি লিখে দিই, কাল সকালের ট্রেনেই যাব।

মুকুজ্জেমশাই বাহিরে চলিয়া গেলেন।

মুকুজ্জেমশাই চলিয়া গেলে সুশীলা স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন ও বলিলেন, সত্যিই তোমার শরীরটা খারাপ হয়েছে নাকি? দেখি—

কি দেখবে?

সুশীলা উঠিয়া স্বামীর কপালে হাত দিয়া দেখিলেন।

শিরীষবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, ও তেমন কিছু নয়, সামান্য একটু সর্দির মতো।

গা-টা কিন্তু ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে, আজ বরং ভাত খেয়ে কাজ নেই, রুটি দুখানা করে দিই, শুকনো-শাকনা খেয়ে থাকাই সর্দির ওষুধ—সাবধান হওয়াই ভালো, মোজা পায়ে দাও।

শিরীষবাবু মহা বিপদে পড়িয়া গেলেন। সুশীলা আলনা হইতে গরম মোজা আনিয়া দিলেন। শিরীষবাবু মোজা পরিতে পরিতে বলিলেন, রুটি কিন্তু খাব না, বুঝলে?

তোমার কথা শুনছি কিনা আমি!

সুপারির ডালা লইয়া সুশীলাসুন্দরী বাহির হইয়া গেলেন।

শিরীষবাবু মুখবিকৃতি করিয়া গরম মোজাকে গোড়ালি পার করাইতে লাগিলেন। এ কি বিপদে পড়িয়া গেলেন তিনি!

রান্নাঘর হইতে অমিয়াকে দেখিয়া সুশীলা মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, ঠাকুর, ওর শিবপুজো যেন সার্থক হয়, শঙ্করের সঙ্গেই যেন ওর বিয়ে হয়।

অমিয়া উঠানের ও-ধারে মাটির শিব গড়িয়া ভক্তিভরে পূজা করিতেছিল। যদিও মুকুজ্জেমশাই শিব লইয়া যখন-তখন তাহাকে ঠাট্টা করেন, তবু সে শিব-পূজা ছাড়ে নাই। তাহার মনের গহনে যে চিরন্তনী উমা বসিয়া আছে, তাহার তপস্যায় বাধা দিবার সামর্থ্য তাহার নিজেরও নাই।

।। দুই ।।

বেলা মল্লিকের বাসায় প্রফেসার গুপ্ত বসিয়া ছিলেন।

বেলা বাড়িতে নাই, বাহিরে গিয়াছেন, এখনও ফেরেন নাই। জনার্দন সিংহের 'জেরাসে ঠাহর যাইয়ে হুজুর' এই কথাগুলির ওপর নির্ভর করিয়া প্রফেসার গুপ্ত বাহিরের ঘরটাতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বেলার নিকট আসিবার একটা অজুহাত অবশ্য প্রফেসার গুপ্তের আছে, সর্বদাই থাকে, এবং সে অজুহাতগুলি যে যুক্তিসহ নহে, তাহাও প্রফেসার গুপ্ত এবং বেলা উভয়েই জানেন। কিন্তু না-জানার ভান করেন। আজ প্রফেসার গুপ্ত আসিয়াছিলেন বেলাকে জানাইতে যে, তাঁহার কন্যা মান্তু মামার বাড়ি গিয়াছে, আজ আর বেলার সন্ধ্যাকালে পড়াইতে যাইবার দরকার নাই। এ খবরটা কোনো চাকরকে দিয়া পাঠাইলেই চলিত, কিন্তু—

আধ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, বেলাদেবীর দেখা নাই। কখন যে তিনি ফিরিবেন, তাহা জনার্দন ঠিক বলিতে পারিল না। বোসসাহেবের পত্নীকে বেলা সকালের দিকে এস্রাজ শিখাইতে যান, তাহা প্রফেসার গুপ্ত জানেন। সেখানে এতক্ষণ দেরি হইবার কথা নয়। প্রফেসার গুপ্ত আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, আর একবার হাতঘড়িটা দেখিলেন, অবশেষে হতাশ

হইয়া এক টুকরা কাগজে তাঁহার আগমনবার্তা এবং আগমনের হেতু লিখিয়া জনার্দনের হাতে দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার 'কার'টা যখন গলি হইতে বাহির হইয়া গেল এবং সাত নম্বরের বাড়ির দ্বিতলের বাতায়ন হইতে বেলা যখন তাহা দেখিতে পাইলেন, তখন তিনিও নামিয়া আসিলেন।

এই গলির সাত নম্বরের বাড়ির বাসিন্দাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়াতে বেলার ভারি সুবিধা হইয়াছে। প্রফেসার গুপ্তের সান্নিধ্য এড়াইবার প্রয়োজন যখনই ঘটে (এবং সে প্রয়োজন অধুনা প্রায়ই ঘটিতেছে), বেলা সাত নম্বরের বাড়িতে আত্মগোপন করেন এবং যতক্ষণ না প্রফেসার গুপ্তের 'কার'টা চলিয়া যায়, ততক্ষণ সেখানে বসিয়া গল্পগুজব করিতে থাকেন। একটা জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ব্যতীত সাত নম্বরের বাড়িতে পুরুষ কেহ নাই। বেলার সমবয়সী একজন এবং বেলার চেয়ে ছোট তিনজন মেয়েকে লইয়া বিপত্নীক বৃদ্ধ হলধরবাবু সাত নম্বরে বাস করেন। হলধরবাবু পিতৃভাবাপন্ন, মেয়েগুলি মিশুকপ্রকৃতির, বেলার সহিত বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছে। বড় মেয়েটি কলেজে এবং বাকি মেয়েগুলি স্কুলে পড়ে। বড় মেয়েটি বেলাকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে এবং বেলা তাহাকে গান বাজনা শিখিতে সহায়তা করিবেন, এরূপ একটা বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।

আজ শৈলদের বাড়ি হইতে ফিরিয়া গলিতে ঢুকিয়াই প্রফেসার গুপ্তের 'কার'খানা চোখে পড়িতেই বেলা সোজা সাত নম্বরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন। 'কার' চলিয়া গেলে নিশ্চিন্ত চিত্তে নামিয়া আসিলেন এবং জনার্দন সিংহের নিকট হইতে প্রফেসার গুপ্তের গমন ও আগমন সংবাদটা এমনভাবে শুনিলেন, যেন তিনি কিছুই জানেন না। প্রফেসার গুপ্তের লেখা কাগজখানাও অত্যন্ত নির্বিকারে দেখিলেন।

আজ রবিবার, তাড়াতাড়ি স্নানাহারটা সারিয়া কোথাও বাহির হইয়া পড়িতে হইবে, তাহা না হইলে আবার কেহ হয়তো দয়া করিয়া আসিয়া জুটিয়া যাইবেন। বিগত কয়েকটি রবিবারের অভিজ্ঞতা হইতে বেলাদেবী স্থির করিয়াছেন যে, রবিবারটা তিনি বাহিরেই কাটাইবেন। একের পর এক পুরুষ বন্ধুর অভ্যাগম, আর কিছু না হউক, দৃষ্টিকটু।

স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া বেলাদেবী বাহির হইতে যাইবেন, এমন সময় প্রিয়বাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ভদ্রলোকের শুষ্ক মুখ, চুল উস্কখুস্ক, চোখে এমন একটা দৃষ্টি যাহা কথায় বর্ণনা করা শক্ত। ভয় এবং মরিয়া ভাব, ভালোবাসা এবং রাগ, বিশ্বাস এবং অনিশ্চয়তা প্রিয়বাবুর চকিত দৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া ছিল।

দাদা যে হঠাৎ?

প্রিয়বাবু নীরবে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, ভেতরে চল, বলছি।

উভয়ে ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রিয়বাবু ইতিপূর্বে নিজে বেলার নিকট আসেন নাই, তিনি এই প্রথম আসিয়াছেন। ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া এবং বেলার ঘরখানি পরিপাটিরূপে সজ্জিত দেখিয়া তিনি কেমন যেন একটু থতমত খাইয়া গেলেন। মনে মনে বেলার যে দৈন্য-নিপীড়িত অবস্থা তিনি কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে বাস্তবের কিছুমাত্র মিল নাই। দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন না, ভয় পাইয়া গেলেন। বেলা তো বেশ সুখেই আছে! আর যাই থাক, বেলার আধিভৌতিক কোনো দুঃখ নাই, তাহা ঠিক।

তাঁহার চিন্তাধারায় বাধা দিয়া বেলা প্রশ্ন করিলেন, তিন মাস পরে আজ হঠাৎ এসে পড়লে যে? বিয়ের নেমন্তন্ন করতে নাকি?

প্রিয়বাবুর সহসা যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়া গেল, চোপ রও, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

প্রিয়বাবু ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন। প্রিয়বাবুর ক্রোধের আকস্মিকতা এ অযৌক্তিকতার পরিচয় বেলা ইতিপূর্বে বহুবার পাইয়াছেন, সুতরাং তিনি বিস্মিত হইলেন না, একটু মৃদু হাসিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

প্রিয়বাবু কিছুক্ষণ গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, হঠাৎ তিনি এ কি করিয়া বসিলেন। আসিয়াছেন বেলাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য, তাহার সহিত ঝগড়া করিবার জন্য নয়; কিন্তু হঠাৎ তিনি এ কি বলিয়া ফেলিলেন! রাগারাগি করিবার জন্য তো তিনি আসেন নাই! নিকটেই একখানা চেয়ার ছিল, তাহার ওপর বসিলেন এবং নিস্তব্ধ হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন; আত্মধিক্কারে তাঁহার সমস্ত মন যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই খাপছাড়া রাগের জন্য জীবনে তাঁহাকে বহুপ্রকারে বহুবার লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার স্বভাব বদলাইল না। হঠাৎ পাশের ঘরে স্টোভ জ্বালার শব্দে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, বেলা স্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চড়াইতেছে।

তুমি ওই ঘরেই বস, চা করে নিয়ে যাচ্ছি এখুনি।

কোনো কথা না বলিয়া প্রিয়বাবু পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিলেন, তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, মেয়েটার শরীর রক্ত-মাংসের, না, পাথরের?

একটু পরে বেলা রেকাবিতে কিছু জলখাবার এবং এক বাটি চা আনিয়া তাঁহার সামনে একটি ছোট টিপয়ে সাজাইয়া দিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, খাও।

খাব? আমি কি এখানে খাবার জন্যে এলাম?

বেলা এক গ্লাস জল আনিয়া টিপয়ের উপর রাখিতে রাখিতে বলিলেন, খাবার জন্য কেউ কারও বাড়িতে যায় নাকি? তবে অতিথি এলে চা জলখাবার দেওয়াটা ভদ্রতার একটা অঙ্গ।

আমি কি অতিথি নাকি, যে আমার সঙ্গে ভদ্রতা করতে হবে?

বেলা কিছু না বলিয়া পুনরায় বাহির হইয়া গেলেন এবং একটা ডিসে কয়েক খিলি পান লইয়া পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

প্রিয়বাবু বলিলেন, আগে আমার কথার একটা জবাব দে, তা না হলে কিছু খাব না আমি।

বল।

আমাব কাছে ফিরে যাবি কি না?

না।

রাগের মাথায় একটা কথা বলে ফেলেছি, সেইটেকেই বড় করে দেখতে হবে?

বড় করে দেখতাম না, যদি সেটা সত্যি কথা না হত। আমি ভেবে দেখেছি, তুমি সেদিন যা বলেছিলে, সেটা খুব সত্যি কথা, তার জন্যে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ আমি।

কি সত্যি কথা?

মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই যে চিরকাল তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে—এর কোনো মানে নেই। নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা মানুষ মাত্রেরই থাকা উচিত—তা সে মেয়েমানুষই হোক আর পুরুষমানুষই হোক।

তার মানে?

তার মানে, আমি স্বাধীনভাবে থাকতে চাই।

আমার কাছে থাকা মানে তা হলে পরাধীনতা বলতে চাও? আমি কী তোমার পর?

পর কেন হতে যাবে, কিন্তু আমি মেয়েমানুষ বলেই চিরকাল তোমার উপার্জনে ভাগ বসাব কেন? তাতে আমারও সম্মান নেই, তোমারও সম্মান নেই।

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

চা-টা খাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

চায়ের দিকে মনোযোগ না দিয়া প্রিয়বাবু বলিলেন, বেশ তো, রোজগার করতে চাও রোজগার কর, কিন্তু আমারই কাছে থাক, আলাদা বাসা করবার দরকার কি?

আলাদা থাকলে যে পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করা যায়, একসঙ্গে থাকলে তা সম্ভব নয়। পরস্পরের স্বাধীনতা খর্ব করে একসঙ্গে বাসা করার কোনো সার্থকতা দেখতে পাই না আমি।

খুব লম্বা লম্বা কথা শিখেছিস তো!

বেলা কোনো উত্তর দিলেন না।

যাবে না তা হলে ফিরে?

না।

প্রিয়বাবু উঠিয়া পড়িলেন।

উঠলে যে, খাবে না?

খাবার জন্য আমি আসিনি। চললাম।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়া প্রিয়বাবু পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, আমার মনে এই যে কষ্ট দিচ্ছ, এর ফল ভালো হবে না জেনে রেখো। শুধু আমার মনে নয়, অনেকের মনে কষ্ট দিয়েছ তুমি, লক্ষ্মণবাবুর মতো ছেলে তোমারই জন্য আত্মহত্যা করেছে। এ সবের ফল কখনও ভালো হয় না—কখনও না, কখনও না। এই তেজ বেশি দিন থাকবে না।

তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতে গিয়া প্রিয়বাবুর মাথাটা চৌকাঠে ঠুকিয়া গেল, কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করিলেন না, একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না।

বেলা নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

লক্ষ্মণবাবুর তরুণ বিহ্বল মুখচ্ছবিটা মানসপটে ফুটিয়া উঠিল।

খুট করিয়া শব্দ হইল।

বেলা চাহিয়া দেখিলেন, শঙ্কর দাঁড়াইয়া আছে।

শঙ্করবাবু যে, আসুন।

শঙ্কর ভিতরে প্রবেশ করিল।

শঙ্কর আসাতে বেলা যেন অনেকটা আত্মস্থ হইলেন। হাসিয়া বলিলেন, এমন অবস্থা কেন আপনার? চান করেননি নাকি।

শঙ্কর সত্যিই কয়েকদিন স্নান করেন নাই। কাপড় ময়লা, গরম জামার পিছন দিকটায় দেওয়ালের চুন লাগিয়াছে, চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ, চুল উস্কখুস্ক।

শঙ্কর মিথ্যা কথা বলিল, শরীরটা ভালো নেই, জ্বর হয়েছে বোধ হয়।

সেইজন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন?

একটা ভীষণ দরকারে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। কিছু টাকা চাই—ধার।

ওমা, টাকা ধার চাইবার আর লোক পেলেন না আপনি? ক টাকা?

গোটা দশেক হলেই আপাতত চলবে।

এখন দশ টাকা তো আমার হাতে নেই। কাল শৈলদি মাইনে দেবেন, কাল বরং দিতে পারি।

শৈলদি কে?

মিসেস এল. কে. বোস। তিনি তো আপনাকে চেনেন।

ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া শঙ্কর বলিল, সে কি গান শিখছে আজকাল আপনার কাছে?

গান নয়, বাজনা আর একটু একটু ইংরেজি।

আপনার সঙ্গে যে আলাপ আছে আমার—সে কথা বলেছেন শৈলকে?

না, বলিনি।

বলবেন।

বলে চাকরিটি খোয়াই আর কি!

তার মানে?

আপনার সঙ্গে আর কারও ভাব থাকতে পারে—এ শৈলদির পক্ষে অসহ্য।

শঙ্কর একটু হাসিল।

বেলা বলিলেন, চা খাবেন?

খেতে পারি।

প্রিয়বাবুর চা ও জলখাবারটা বেলা শঙ্করকে বসাইয়া খাওয়াইলেন।

খাইতে খাইতে শঙ্কর প্রশ্ন করিল, শৈলর মনোভাবটা কি করে বুঝলেন আপনি?

অনেক কথা আমরা—মেয়েরা—বুঝতে পারি।

তবু বলুন না একটু, শুনি।

তা হলে চলুন, রাস্তায় যেতে যেতে বলছি। আমাকে এক জায়গায় বেরোতে হবে, কাজ আছে।

রাস্তায় বাহির হইতেই শঙ্কর বলিল, এইবার বলুন।

বেলা হাসিয়া বলিলেন, এই ধরুন, একটা উদাহরণ দিচ্ছি। রিনির সঙ্গে আপনার বিয়েটা যখন ভেঙে গেল, তখন শৈলদি ভারি খুশি। একমুখ হেসে বললেন,—শঙ্করদাকে জানি তো ছেলেবেলা থেকে, ওর নাড়িনক্ষত্র সব জানি, রিনির মতো মেয়েকে দেখে গলে পড়বার ছেলেই ও নয়। আমার তখুনি মনে হয়েছিল, ওসব বাজে গুজব, শঙ্করদা বিয়ে করবে রিনিকে—তবেই হয়েছে!

এই পর্যন্ত বলিয়া বেলাদেবী থামিলেন, চকিতে একবার শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে শেষ পর্যন্ত ভেঙে গেল কেন বলুন তো?

শঙ্কর কোনো উত্তর দিল না, নীরবে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল।

বেলাদেবী এই নীরবতা-প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় পাশের একটি গলি হইতে একটি সুদৃশ্য মোটরকার নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল এবং একবার হর্ন

দিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মোটরের দালাল অচিনবাবু গাড়ির ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া শঙ্করকে সম্বোধন করিলেন, নমস্কার শঙ্করবাবু, আপনাকেই খুঁজছি কদিন থেকে।

আমাকে? কেন বলুন তো?

অচিনবাবু গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং স্মিত মুখে বলিলেন, হস্টেলে যাচ্ছিলাম; আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল আমার।

তাহার পর বেলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ইনি কি আপনার সঙ্গেই যাচ্ছেন? চলুন না, কিছু যদি মনে না করেন, লিফট দিয়ে দিই আপনাদের।

বেলা বলিলেন, না, ধন্যবাদ, আমি অন্য জায়গায় যাব। শঙ্করবাবু, আপনি যান ওঁর সঙ্গে, আমি একাই যাচ্ছি।

সকলেই যখন কি করিবেন ইতস্তত কবিতেছেন, তখন অচিনবাবু শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ইনি কি প্রফেসার মিত্রের কেউ হন নাকি? মিষ্টিদিদির ওখানে ওঁকে দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।

শঙ্কর পরিচয় করাইয়া দিল।

না, মিষ্টিদিদির কেউ হন না ইনি। ইনি হচ্ছেন মিস বেলা মল্লিক, গান-বাজনা খুব ভালো জানেন, অনেককে শিখিয়েও থাকেন। আর ইনি হচ্ছেন অচিনবাবু, মোটরকারের দালালি করেন।

উভয়ে উভয়কে নমস্কার করিলেন।

অচিনবাবু নামটা শুনিয়া বেলা মনে মনে একটু উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই ভদ্রলোকই তাহা হইলে শিক্ষয়িত্রীর বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন এবং ইঁহারই আশ্রয় পরিহার করিয়া চলিতে প্রফেসার গুপ্ত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন! অচিনবাবু বেলাদেবীকে এক নজর আপাদমস্তক দেখিয়া বলিলেন, কিছুদিন আগেই আপনিই কি আমার কাছে শিক্ষয়িত্রীর একটা পোস্টের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন? বেলা মল্লিক নামটা মনে পড়ছে যেন।

প্রথম প্রথম অনেক জায়গায় দরখাস্ত করেছিলাম, আপনার কাছেও হয়তো করে থাকব!—বেলাদেবী হাসিয়া উত্তর দিলেন।

অচিনবাবু বলিলেন, বাইরে—মানে, কলকাতার বাইরে মেয়ের সঙ্গে থাকবার জন্যে একজন শিক্ষয়িত্রীর দরকার আমার একজন বন্ধুর। ভালো লোক পাইনি এখনও তেমন। আপনি যান তো এখনও জোগাড় করে দিতে পারি। মাইনে পঞ্চাশ থেকে শুরু, একশো পর্যন্ত হবে। রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল জমিদার-ফ্যামিলি—

না ধন্যবাদ। আমার আর দরকার নেই।

একটু থামিয়া বেলাদেবী বলিলেন, আপনারা যান তা হলে। আমি চললাম, আমার একটু কাজ আছে, নমস্কার।

বেলাদেবী চলিয়া গেলেন।

তাঁহার প্রস্থানপথের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া অচিনবাবু বলিলেন, বেশ সপ্রতিভ মহিলাটি।

শঙ্কর বলিল, হ্যাঁ।

শঙ্কর অচিনবাবুর মোটরে চড়িয়া বসিল, অচিনবাবু স্টার্ট দিলেন। কিছুদূর গিয়া অচিনবাবু

বলিলেন, হস্টেলেই ফিরবেন এখন? চলুন না, একটু বেড়িয়ে আসা যাক, সন্ধেবেলা হস্টেলে পৌঁছে দেব আপনাকে।

চলুন।

কয়েক মিনিট নীরব থাকিয়া শঙ্কর বলিল, দরকারটা কি?

চলুন, বলছি।

শঙ্কর কিন্তু অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। সন্ধ্যার সময় মুক্তোর সহিত দেখা করিতেই হইবে। অচিনবাবুর পাল্লায় পড়িয়া আবার দেরি না হইয়া যায়!

গড়ের মাঠের কাছাকাছি আসিয়া অচিনবাবু গাড়ির গতিবেগ কমাইলেন এবং নির্জন একটা স্থান দেখিয়া গাড়ি থামাইলেন। সিগারেট-কেস হইতে সিগারেট বাহির করিয়া শঙ্করকে দিলেন ও নিজেও খাইলেন।

চলুন, একটু বসা যাক।

উপবেশন করিলে শঙ্কর বলিল, ব্যাপার কি বলুন তো?

ভণ্টুবাবুর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব আছে?

আছে।

মৃন্ময়বাবু বলে ভণ্টুবাবুর একজন বন্ধু আছে, জানেন আপনি?

জানি।

মৃন্ময়বাবু লোকটি ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন, তিনি অকারণে আমার পেছনে লেগেছেন।

আপনার পেছনে? কেন, কারণটা কি?

কিছুই কারণ নয়, পুলিশের লোকদের কারণের অভাব থাকে নাকি, খাড়া করলেই হল একটা।

একটু নীরব থাকিয়া শঙ্কর বলিল, আমাকে কি করতে হবে?

আপনি ভণ্টুবাবুকে বলে একটু ইনফ্লুয়েন্স্ করতে পারেন যদি, বড় ভালো হয়।

বেশ বলব আমি ভণ্টুকে।

তাহার পর হাসিয়া শঙ্কর বলিল, এই ব্যাপারের জন্য এত! আগে বললেই হত।

অচিনবাবু সিগারেটের ছাইটা ঝাড়িয়া বলিলেন, না, আর একটা কথাও আছে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটু ইতস্তত করিয়া অচিনবাবু বলিলেন, একটা গুজব শুনেছিলাম—রিনির সঙ্গে আপনার বিয়ে হচ্ছে; এখন আবার গুজব শুনছি—হচ্ছে না। কোনটা সত্যি বলুন তো?

দুই-ই সত্যি, হবে ঠিক হয়েছিল, এখন ভেঙে গেছে।

ভেঙে গেছে কেন?

সে অনেক কারণে।

অচিনবাবু প্রশ্ন করিলেন, ভেঙে গেছে—এটা ঠিক?

ঠিক।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, এসব কথা জিজ্ঞেস করবার মানে?

আমার একটা উপকার করবেন?

কি বলুন?

আমরা স্বজাতি, আমার একটি মেয়ে আছে, নেবেন তাকে? দেখতে সে সুশ্রী, পণও আমি যথাসাধ্য দেব। ওই আমার একমাত্র মেয়ে, আর আমার কেউ নেই। আপনার মতো ছেলের হাতে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হই।

আমার মতো ছেলের হাতে! আমার কতটুকু জানেন আপনি?

যা জানি, তাই যথেষ্ট। আপনি রাজি কি না বলুন, আপনি মত দিলে আপনার বাবাকে চিঠি লিখব।

আমি বিয়েই করব না।

একেবারেই না?

একেবারেই না। তবে আপনার মেয়ের জন্য অন্য পাত্র চেষ্টা করতে পারি। মেয়েটি কোথায়?

মেয়েকে দেশে রেখেছি মশাই, এ কলকাতা শহরে যা কাণ্ডকারখানা, তাতে মেয়েকে এখানে রাখতে ভরসা পাই না। দেশে আছে সে। দরকার হলে আনতে পারি।

ওরই জন্যে কি শিক্ষয়িত্রী খুঁজছিলেন নাকি?

না, ওর জন্যে নয়, আমি অত টাকা কোথায় পাব বলুন? ও আর একজনের জন্যে।

অচিনবাবু সিগারেটে আর একটা টান দিয়া বলিলেন, আপনি বিয়েই করবেন না ঠিক করে ফেলেছেন?

হ্যাঁ।

কারণটা জানতে পারি কি?

শঙ্কর একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, আমাদের মতো ভালো ছেলের পক্ষে বিয়ে করে গোল্লায় যাওয়া উচিত নয়। জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্র আমাদের আহ্বান করছে।

অচিনবাবু একটু হাসিলেন।

বিবাহ-প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। নানারকম মামুলি কথাবার্তা চলিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে তাহাও বন্ধ হইল। নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। শঙ্কর ভাবিতে লাগিল মুক্তোর কথা; এবং অচিনবাবু ভাবিতে লাগিলেন, বেলার সহিত তিনি আর একবার দেখা করিবেন কি না, করিলে কিভাবে কোথায় করিবেন!

।। তিন ।।

শ্রীমৎ মুক্তানন্দ স্বামী ওরফে উমেশচন্দ্র অতিশয় চিন্তিত বিব্রতভাবে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার বুকের ভিতরটা ধড়াস-ধড়াস করিতেছিল। চতুর্দিকে গাঢ় অন্ধকার, বাহিরে খরস্রোতা গঙ্গায় অবিরাম কলকলধ্বনি, রাত্রির নিস্তব্ধতা যেন ছন্দ লাভ করিয়াছে। মুক্তানন্দ একা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। নানাস্থানে ঘুরিয়া কিছুদিন হইল তিনি হরিদ্বারে কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার আতিথ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সন্ন্যাসীর বেশবাস দেখিয়া পাণ্ডাজি তাঁহাকেই

ভক্তিভরে আশ্রয় দিয়াছেন। মুক্তানন্দ সুখেই ছিলেন, বেশ সুন্দরই লাগিতেছিল, এমনকি মনে মনে কল্পনাও করিতেছিলেন যে, অবশিষ্ট জীবনটা এখানেই বোধ হয় অতিবাহিত করিয়া ফেলিতে পারিবেন। নিকটস্থ চণ্ডীপাহাড়ে বা অন্য কোনো নির্জন স্থানে একটা আস্তানা বানাইয়া ঠাকুরের নির্দেশ অনুযায়ী নাম-জপ করিয়া বাকি জীবনটা বেশ সুখেই কাটিয়া যাইবে। বিশ্বাসমহাশয় নামক স্থানীয় ভক্ত ব্যক্তিটি এ বিষয়ে তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন বলিয়াও প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু সহসা এ কি হইল, একটা সামান্য স্বপ্ন দেখিয়া সমস্ত মন বিকল হইয়া গেল।

স্বপ্নে তিনি দেখিলেন, ভণ্টু যেন প্রকাণ্ড একটা রোলারের তলায় চাপা পড়িয়া তারস্বরে চিৎকার করিতেছে। রোলারের চাপ এত ভীষণ যে ভণ্টুর মুখ দিয়া, নাক দিয়া, এমন কি চোখ দিয়া রক্ত ফাটিয়া বাহির হইতেছে। পথ দিয়া জনতার স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, কিন্তু কেহই ভণ্টুর দিকে দৃক্‌পাত করিতেছে না। ভণ্টু আর্তকণ্ঠে চিৎকার করিতেছে, তাহার রক্তে রাস্তার খানিকটা ভিজিয়া গিয়াছে, কাহারও কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। এমন সময় ঠাকুর আসিলেন, ভণ্টুর দিকে চাহিয়া একবার হাসিলেন, তাহার পর বলিলেন, আমি কি করিব বল, তোমার নিজের লোকই যখন তোমাকে ছাড়িয়া মুক্তির জন্য দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন আর আমি কি করিতে পারি?

ঠাকুর চলিয়া গেলেন, ভণ্টু আর্তনাদ করিতে লাগিল। এ রকম স্বপ্নের মানে কি? স্বপ্নের কি কোনো অর্থ আছে? এ স্বপ্নের অর্থ কি হইতে পারে? সত্যই ভণ্টু বিপন্ন নয় তো? বিমূঢ়ের মতো একা বসিয়া মুক্তানন্দ আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। কলনাদিনী গঙ্গার কলকলধ্বনি আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

।। চার ।।

পরদিন দ্বিপ্রহর।

শঙ্কর মুক্তোর বিছানায় চুপচাপ একা শুইয়া ছিল। মুক্তো ঘরে ছিল না। মুক্তোর ঘরখানি ছোট, কিন্তু বেশ গোছানো। দুইখানি তক্তপোশ রহিয়াছে, একখানি অপেক্ষাকৃত নীচু ও ছোট, অপরটি উঁচু ও বড়। বড় খাটটিতে পুরু গদি, ফরসা চাদর, ফরসা বালিশ। শঙ্কর ইহারই ওপর শুইয়াছিল। শুইয়া শুইয়া সে বহুবার-দেখা আসবাবপত্রগুলি পুনরায় দেখিতেছিল। ছোট গ্লাসকেসটি বেশ পরিচ্ছন্ন, নানা রঙের রঙিন শাড়ি পাট করা রহিয়াছে অনেক। দেওয়ালে নানা রকম ছবি—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, মেম-সাহেব, কালীঘাটের পট, পুরীর জগন্নাথ! গত কার্তিক পূজার কার্তিকের ময়ূরের পালকগুলি এক কোণে টাঙানো আছে। এক ধারে একটি আলনা। আলনায় মুক্তোর নিত্য-ব্যবহার্য কাপড়-জামা এবং তাহারই এক ধারে একটি লুঙ্গি ও গেঞ্জি ঝুলিতেছে। মুক্তোর বাঁধা বাবুর লুঙ্গি ও গেঞ্জি। তিনি প্রত্যহ রাত্রি দশটায় আসেন, সমস্ত রাত্রি থাকেন। মুক্তোর সহিত তাঁহার বন্দোবস্ত খুব পাকাপাকি রকম। রাত্রি দশটা পর্যন্ত মুক্তো ইচ্ছে করিলে অপর লোক বসাইতে পারে, কিন্তু দশটার পরে মুক্তোর কক্ষে অপর কাহারও প্রবেশ নিষেধ। তবে যদি কোনো দিন কোনো কারণে আসিতে না পারেন, সেদিন মুক্তোর ছুটি এবং সে ছুটি

মুক্তোর নিজের ইচ্ছেমতো ব্যয় করিতে পারে। ওরিজিনাল ওরফে দশরথবাবু ব্যবসায়ী ব্যক্তি এবং খাঁটি লোক, সুতরাং তাঁহার ব্যবস্থায় কোনো রকম খুঁত নাই। দশরথবাবুর বয়স হইয়াছে, তিনি রোজ যে আসেন তাহা নয়; কিন্তু তাঁহার ব্যবস্থা এইরূপ। বলাবাহুল্য, মুক্তোর সহিত তাঁহার হৃদয়ঘটিত কোনো ঝামেলা নাই, সম্পর্কটা নিতান্তই আধিভৌতিক। প্রথম দিনই আসিয়া শঙ্করের চোখে পড়িয়াছিল, আজও আবার পড়িল, কবে কে যেন দেওয়ালের ওপর লাল পেন্সিল দিয়া লিখিয়া গিয়াছে, 'সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়!' কে এই দার্শনিক? এমন মর্মান্তিক একটা বচন এমন মর্মান্তিক স্থানে লিখিয়া গিয়াছে! রোজই শঙ্কর লেখাটি পড়ে। মুক্তোকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, লেখকটি কে? মুক্তো বলে, জানি না বাবু, কত লোক আসে যায়, কে কখন লিখেছে, অত খেয়াল করিনি। বলে আর মুচকি মুচকি হাসে।

অদ্ভুত মেয়ে এই মুক্তো! এতদিন ধরিয়া শঙ্কর এখানে যাতায়াত করিতেছে, কিন্তু মেয়েটির স্বরূপটি যে কি, তাহা আজও সে বুঝিতে পারে নাই। কিছুতেই যেন ধরা-ছোঁয়া দেয় না। হাসে, নাচে, গান গায়, মদ খায়, বৈকালে গা ধুইয়া চুল বাঁধিয়া চোখে কাজল দিয়া রঙিন শাড়িটি কায়দা করিয়া পরিয়া গালে ঠোঁটে রঙ মাখিয়া খোঁপায় ফুলের মালা পরিয়া রাস্তার ধারে গিয়া দাঁড়ায়, ভঙ্গিভরে সিগারেট টানে, কথায় কথায় খিলখিল করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে, চটিয়া গেলে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে, অন্ধ-আতুর দেখিলে পয়সা দেয়, গঙ্গাস্নান করিতে যায়, মেনি বেড়ালকে আদর করে, দশরথের জন্য প্রত্যহ হাঁসের ডিমের ডালনা ও পরোটা বানায়, সামনের চপ-কাটলেটওয়ালাদের সঙ্গে দুই-এক পয়সার জন্য ইতরের মতো কলহ করে, ঘরে লুকাইয়া মদের বোতল রাখে এবং তাহা সুযোগ মত শাঁসালো কাপ্তেনের নিকট দুর্মূল্যে বিক্রয় করে। কিন্তু শঙ্করের মনে হয়, আসল ব্যক্তিটি অন্তরালে আছে, সে কখনো ভুলিয়াও পাদ-প্রদীপের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে না। তাহাকে একটু যেন চেনা যায়, যখন সে দুপুরে ফালি বারান্দাটুকুতে বসিয়া রোদে পিঠ দিয়া চুল শুকায়। মনে হয়, উহাই যেন তাহার জীবনের সত্য আকাঙক্ষা, ও যেন আর কিছু চায় না, নিশ্চিন্ত চিত্তে নিজের ঘরের দাওয়াটিতে বসিয়া রোদে পিঠ দিয়া চুল শুকাইতে শুকাইতে প্রতিবেশিনীর সঙ্গে সুখদুঃখের আলোচনা করিতে চায়।

শঙ্কর উঠিয়া বসিয়া একবার উঁকি দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল, মুক্তো বারান্দায় বসিয়া চুল শুকাইতেছে কি না! দেখিল, মুক্তো নাই। তাহার চোখে পড়িল উষা নাম্নী ওধারের ঘরের মেয়েটি তাহাকে দেখিতে পাইয়া মৃদু হাসিয়া নিজের ঘরের জানালাটি বন্ধ করিয়া দিল। মুক্তো কোথায় আছে, কে জানে! রোজই দুপুরে শঙ্করকে নিজের ঘরটি ছাড়িয়া দিয়া মুক্তো বাহিরে চলিয়া যায়, কাছে বসিতে চায় না। অথচ শঙ্কর কলেজ পলাইয়া আসে তারই সঙ্গ-কামনায়। কিন্তু মুক্তো কেমন যেন ধরা-ছোঁয়া দিতে চায় না। আসছি, বসুন।—বলিয়া অঙ্গ দোলাইয়া সে বাহির হইয়া যায় এবং পাশের ঘরে হাসি-গল্প করিয়া অনেকক্ষণ কাটাইয়া তবে আসে। আসিয়াই আবার কোনো ছুতায় বাহির হইয়া যাইতে চায়। দশরথের সহিত মুক্তোর সম্পর্কটা যেরূপ সুনির্দিষ্ট, শঙ্করের সহিত মুক্তোর সম্পর্কটা এখনও সেরূপ হয় নাই। শঙ্কর মুক্তোকে একদিন দশটা টাকা জোর করিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু খোলাখুলিভাবে দর-কষাকষি করিতে তাহার যেন বাধ-বাধ ঠেকে। তা ছাড়া শঙ্করের সামর্থ্যই বা কতটুকু? তাহার বাবা মাসে মাসে

তাহাকে যাহা পাঠাইয়া থাকেন, তাহাই তাহার সম্বল। বলা বাহুল্য, তাহা এসব ব্যাপারের পক্ষে মোটেই প্রচুর নয়। এমনিই তো হস্টেলের অনেকের কাছে ধার জমিয়া আছে। কি করিয়া শঙ্কর যে কি করিবে, তাহা সে নিজেই জানে না। অতিশয় আঁকা-বাঁকা বিপদসঙ্কুল পথে অন্ধ নিয়তির ওপর নির্ভর করিয়া সে চলিয়াছে। নিজের দুর্দম বাসনার আবেগেই তাহার শক্তি, আর কোনো সম্বল তাহার নাই। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই পতিতা নারীটির মধ্যেই সে মানসীকে খুঁজিতেছে।

মানুষের কত দ্রুত পরিবর্তন হয়! দুপুরে কলেজ হইতে পলাইয়া গণিকা-পল্লীতে আসিয়া একটি গণিকার বিছানায় সে শুইয়া থাকিবে—কিছুদিন পূর্বে ইহা কি তাহার সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল? রিনিকে ঘিরিয়া যখন সে স্বপ্নস্বর্গ রচনা করিতেছিল, তখন কোথায় ছিল এই মুক্তো? মুক্তোর মতো মেয়ের সান্নিধ্য সে কি তখন কল্পনাতেও সহ্য করিতে পারিত? কিন্তু ঘটনাচক্রের আবর্তে সে আর মুক্তো কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে এবং পাশাপাশি ভাসিয়া চলিয়াছে। রিনি কোথায় তলাইয়া গিয়াছে। শঙ্কর সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছে, রিনির সংস্পর্শে তাহার মনের তন্ত্রীতে যে সুর বাজিয়াছিল, মুক্তোর সংস্পর্শে আসিয়াও ঠিক সেই সুরই বাজিতেছে। মুক্তো অশিক্ষিত গণিকা বলিয়া সে সুর কিছুমাত্র কম উন্মাদনার সৃষ্টি করিতেছে না। প্রথম দুই-চার দিন তাহার তথাকথিত ভদ্র-অন্তঃকরণে একটু দ্বিধা জাগিয়াছিল, কিন্তু সে দুই চারি দিন মাত্র। প্রথম প্রথম নিজের প্রতি ধিক্কার হইয়াছিল. কিন্তু সে প্রথম প্রথমই। এখন শঙ্করের কাছে মুক্তো গণিকা—এই কথাই বড় নয়, মুক্তো নারী—এই কথাই বড়। শুধু নারী নয়, লাঞ্ছিতা অবনমিতা নারী। সমাজের অত্যাচারে, পারিপার্শ্বিক ঘটনার চাপে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া উদরান্নের জন্য দেহ বিক্রয় করিতেছে। উহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। পঙ্ক হইতে পঙ্কজিনীকে আহরণ করিয়া প্রেমের মন্দিরে নির্মাল্য রচনা করিতে হইবে। মুক্তোকে তাহার চাই, একান্তভাবে চাই, তাহার চরিত্রের সমস্ত মলিনতা সত্ত্বেও চাই। আর কেহ তাহার কাছে আসিতে পাইবে না—যেমন করিয়া হোক দশরথকে তাড়াইতে হইবে। সমস্ত কলুষ সত্ত্বেও মুক্তোর নারীত্ব অক্ষুণ্ণ আছে এবং সে নারীত্বের সম্মান শঙ্কর যদি না করে, তাহা হইলে বৃথাই তাহার শিক্ষা। ক্ষুধা—মানুষের এই আদিম ক্ষুধাটা মানুষকে কত স্বপ্নই না দেখায়! রিনির জন্য মাঝে মাঝে দুঃখ হয়, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে মোহ যেন ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইতেছে। তাহাকে না পাইলে সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হইয়া যাইবে মনে হইত, এখন তো আর তাহা মনে হয় না। অথচ মাত্র দুই মাস কাটিয়াছে। কিন্তু মনে হইতেছে, যেন অতি দীর্ঘকাল কাটিয়া গিয়াছে, রিনি যেন অতিদূর বিগত জীবনের একটা সুখ-স্মৃতি মাত্র, আর কিছু নয়। মিষ্টিদিদি? মিষ্টিদিদির সম্বন্ধে ঘৃণা ছাড়া আর কোনো মনোভাব শঙ্করের নাই। মুক্তো গণিকা বটে, কিন্তু মুক্তোকে দেখিয়া তো ঘৃণা করিতে প্রবৃত্তি হয় না! সে রূপোপজীবিনী, ওই তাহার পেশা। মিষ্টিদিদির মতো ছদ্মবেশী ঘৃণ্য জীব সে নয়। আর একটু তলাইয়া দেখিলে শঙ্কর বুঝিতে পারিত, যে কারণে মুক্তো অ-ছদ্মবেশী, সেই কারণেই মিষ্টিদিদি ছদ্মবেশী। নিরপেক্ষ বিচারে মুক্তো ও মিষ্টিদিদির কোনো তফাৎ নাই। কিন্তু মানুষের মন বিচিত্র জিনিস, সে নিরপেক্ষতার ভান করে, কখনও নিরপেক্ষ হইতে পারে না, হইলে সে কখনও ভালোবাসিতে পারিত না।

শঙ্কর একা শুইয়া শুইয়া মুক্তোর কথা ভাবিতেছিল. মুক্তো পাশের ঘরের জানালার ফুটো

দিয়া নির্নিমেষ নয়নে শঙ্করকে দেখিতেছিল। গণিকাজীবনে অনেক রকম লোক সে দেখিয়াছে, কিন্তু এমনটি আর কখনও দেখে নাই। এত অসহায়। মুখের দিকে চাহিয়া থাকে ঠিক যেন ভিখারির মতো। আজ পর্যন্ত যত লোকের সংস্পর্শে মুক্তো আসিয়াছে, সকলেই ঝনাৎ করিয়া টাকা ফেলে, গায়ের জোরে দাবি করে—এ তো সে রকম নয়? এ অন্য জাতের মানুষ। অমন বলিষ্ঠ দেহ, কিন্তু শিশুর মতো অসহায়; লাজুকও কম নয়, মুখ ফুটিয়া সহজে কিছু বলতে চায় না; যদিই বা কিছু বলে, তাও এমন ভদ্র ভাষায়, শুনিলে হাসি পায়। নিশ্চয় বিদ্বান খুব, সেদিন একখানা বই হাতে করিয়া আনিয়াছিল, কত মোটা আর কত ভারী—আগাগোড়াই ইংরেজি। অথচ কথাবার্তা যেন ছেলেমানুষের মতোন, কে বলিবে অত লেখাপড়া জানে! অমন লোকের এসব আঁস্তাকুড়ে আসা কেন বাপু? মাসিটিকে তো চেনে না। সেদিন তো মাসি তাহাকে বলিয়াই দিয়াছে, ওসব কাব্যি-মার্কা ছোঁড়াকে যেন আমল না দেয় সে। অথচ মাসি নিজের মুখেই তাহাকে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, এখন বলিতেছে বিদায় করিয়া দিতে! কোনো দিন হয়তো মুখের ওপর কি বলিয়া বসিবে? হঠাৎ খোঁপায় টান পড়িল।

ফিরিয়া দেখিল, টিয়া। এটি তাহারই ঘর।

টিয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল, ঢঙ দেখে আর বাঁচি না। ঘরে গিয়ে নয়ন ভরে দেখ না! উঁকি দেওয়া কেন?

মুক্তো উঠিয়া দাঁড়াইল। হাসিয়া বলিল, খোঁপাটা খুলে দিলি, জড়িয়ে দে ভালো করে।

আর জড়িয়ে দেয় না, এলো খোঁপাতেই বেশ দেখাচ্ছে। এমনিতেই গলে পড়েছে, কিছু করতে হবে না, যা।

সবাই তো আর তোর মালবাবু নয়।—মুচকি হাসিয়া খোঁপাটা জড়াইতে জড়াইতে মুক্তো বাহির হইয়া গেল। নিজের ঘরে ঢুকিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিল, অতিথির খবর কি, চা আনাব?

শঙ্কর শুইয়াছিল, উঠিয়া বসিল।

না, চা দরকার নেই।

তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, আমাকে তুমি অতিথি বলে ডাক কেন বল তো?

অতিথিকে অতিথি বলব না তো কি বলব, আপনি তো খদ্দের নন ঠিক।

শঙ্কর ইহা শুনিয়া গম্ভীর হইয়া পড়িল। ইহার উত্তরে ঠিক কি বলা উচিত, সহসা তাহার মাথায় আসিল না।

একটু পরে বলিল, খদ্দের মানে কি?

মুক্তো পা দোলাইয়া হাত নাড়িয়া বলিল, 'ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর'—এই কথা যাকে বলতে পারা যায়, সেই হল খদ্দের।

আমাকে সে কথা বলতে পার না?

মুক্তো বলিল, নিশ্চয় পারি, আজ না পারি কাল না পারি একদিন পারতেই হবে, রোজগার করতে বসেছি, দানছত্র তো খুলিনি।

মুক্তো বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর বলিল, একদিন না একদিন আপনাকেও খদ্দের হতে হবে। ওই দেখুন, একজন খদ্দের ঘুরঘুর করছে। আপনি কি থাকবেন এখন? না থাকেন তো রোজগার করি কিছু।

শঙ্কর জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিল, আবক্ষ কাঁচাপাকা-দাড়ি এক ব্যক্তি সতৃষ্ণ নয়নে মুক্তোর দিকে চাহিয়া আছে।

শঙ্কর উঠিয়া পড়িল।

উঠছেন নাকি সত্যি সত্যি?

অগত্যা উঠতে হবে বইকি, টাকা যখন সঙ্গে নেই—

মুক্তো বিস্ময়ের সুরে বলিল, সত্যি? আজ এতক্ষণ বসে আছেন দেখে আমি ভাবলাম বুঝি—

মুক্তো মুখ টিপিয়া একটু হাসিল।

শঙ্করের কান দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছিল, সে আর কোনো দিকে না চাহিয়া সোজা বাহির হইয়া গেল।

শঙ্কর বাহির হইয়া যাইতেই মুক্তোর মুখের হাসি নিবিয়া গেল। দাড়িওয়ালা লোকটি একমুখ হাসি লইয়া আগাইয়া আসিতেছিল। মুক্তো তিক্ত কণ্ঠে বলিল, এখন এখানে হবে না।

সহসা তাহার নজরে পড়িল, শঙ্কর আবার ফিরিয়া আসিতেছে। মুক্তো তাহা দেখিয়া দাড়িওয়ালা লোকটিকে পুনরায় আহ্বান করিল, আচ্ছা আসুন আসুন, তাড়াতাড়ি আসুন।

দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক ঢুকিতেই মুক্তো ঘরে খিল দিল। দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া শঙ্কর বলিল, আমার বইখানা ফেলে গেছি।

কোনো উত্তর আসিল না। শঙ্কর কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল। ঘরের ভিতরে মুক্তো বইখানার পাতা উল্টাইতেছিল, সাড়া দিল না। তাহার মনে হইল, ভালোই হইয়াছে, বইখানার জন্যও অন্তত আর একবার আসিবে। কি অন্যমনস্ক লোক বাপু!

।। পাঁচ ।।

সকাল হইতে টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, সমস্ত দিনে বৃষ্টি ছাড়িবে বলিয়া আশা হয় না। শুধু বৃষ্টি নয়, এলোমেলো হাওয়াও বেশ জোরে বহিতেছে। বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ ছুটির দিন নয়, ভণ্টু বেচারাকে আপিস যাইতেই হইবে। তাহা ছাড়া নানা স্থানে ঘুরিতেও হইবে। একটা গুজব শুনিতেছে, মেজকাকা নাকি পুনরায় আসিয়াছেন এবং গোয়াবাগানে সেই বন্ধুটির বাসায় অবস্থান করিতেছেন। সেখানে একবার যাওয়া দরকার। আস্‌মি-দার্জির পিতা নিবারণবাবু নাকি অসুস্থ, সেখানে একবার না গেলে অন্যায় হইবে। তৃতীয়ত, তাহারই আপিসের একজন সহকর্মী তাহাকে অনেক করিয়া ধরিয়াছেন, বক্‌সী মহাশয়কে দিয়া তাঁহার কোষ্ঠীখানা গণনা করাইয়া দিতে হইবে, তিনি গরিব মানুষ; দুই টাকার বেশি দিতে পারিবেন না। ভণ্টু প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, চেষ্টা করিবে, সুতরাং বক্‌সী মহাশয়ের নিকটেও যাইতে হইবে। চতুর্থত, চাম গ্যান্‌ঢঅ শঙ্করের বহুদিন কোনো খবর নাই, সে ছোকরার কি হইল তাহা জানিবার জন্যও মনটা ছটফট করিতেছে। পঞ্চমত, দাদার কাল একটি পত্র আসিয়াছে, লিখিয়াছে, তাঁহার একটু একটু করিয়া জ্বর হইতেছে। বউদিদির নিকটে সংবাদটি সে সযত্নে গোপন রাখিয়াছে বটে, কিন্তু ইহারও একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

অন্তত পক্ষে ধীরেন ডাক্তারের সহিত একটা পরামর্শ করা দরকার। ধীরেন ডাক্তার তো পাড়াতেই থাকে, এখন পর্বটা সারিয়া রাখিলে মন্দ হয় না। পাশের ঘরে ছেলেরা তারস্বরে পড়া করিতেছে। ভণ্টু যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, ছেলেদের পড়ার চাড় ভয়ানক বেশি, একটু অন্যমনস্ক হইলে, এবং কাকা তাহা দেখিতে পাইলে রক্তারক্তি হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং ভণ্টু যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, এক মিনিটের জন্য তাহারা পড়া বন্ধ করে না। ভণ্টুর মনে হইল, ধীরেনবাবু ডিস্পেনসারিতে আছেন কি না একবার খোঁজ লওয়া দরকার। এই বাদলার বাজারে যদি তাঁহার পুরাতন ওয়াটার-প্রুফটাও আজিকার মতো বাগাইতে পারা যায় মন্দ হয় না।

শণ্টু!

শণ্টু শুনিতে পাইল, কিন্তু এক ডাকে সাড়া দিলে পড়ায় মনোযোগ দেখানো হয় না। সে আরও জোরে পড়িতে লাগিল— The boy stood on the burning deck, whence all the–

শণ্টু!

আজ্ঞে?

ভালো মানুষটির মতো শণ্টু আসিয়া দাঁড়াইল। বেশি মনোযোগ দেখাইলে অন্যরূপ বিপদ ঘটিয়া যাইবে হয়তো।

কটা বেজেছে দেখ তো।

শণ্টু ঘড়ি দেখিয়া আসিয়া বলিল, পৌনে আটটা।

চট করে দেখে আয় তো একবার, ধীরেন ডাক্তার ডিস্পেনসারিতে আছে কি না!

শণ্টু চলিয়া গেল।

ভণ্টু উঠিয়া বউদির ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ রান্নাঘরের দিকে গেল। গিয়া দেখিল, বউদিদি সশব্দে ডালে ফোড়ন সংযোগ করিয়া নাক-মুখ কুঁচকাইয়া হাঁড়ির ভিতর হাতা সঞ্চালন করিতেছেন। ভণ্টুও অনুরূপভাবে নাক-মুখ কুঁচকাইয়া বউদিদির পিছনে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। বউদিদি মুখ ফিরাইতেই বলিল, বাকুর কোনো সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না আজ। লেটেস্ট বুলেটিন কি?

বাবার আজ সকাল থেকে হাঁফটা বেড়েছে, ঠাণ্ডার জন্যে বোধ হয়।

উপায়?

খাওয়া-দাওয়া চুকলে সরষের তেল আর কর্পূর গরম করে বুকে পিঠে মালিশ করে দেব। ওষুধ তো উনি খাবেন না কিছুতে।

চা খাননি এখনও আজ?

এইবার করে দেব। বলেছেন আখনির চা করে দিতে।

বউদিদি একটু হাসিলেন।

ভণ্টুও হাসিয়া বলিল, লর্ড বাকু কি সোজা চিজ! আমাকেও এক ঢোঁক দিও।

বাকুর সর্দি হইলে তিনি সাদা জলে চা খান না। এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতি পোলাওয়ের মসলা জলে সিদ্ধ করিয়া এবং তাহার পর তাহাতে চায়ের পাতা দিয়া চা প্রস্তুত করিতে হয়। ডালের হাঁড়িটা নামাইয়া বউদিদি বলিলেন, দাঁড়াও, একটা কথা জিজ্ঞেস করে আসি।

ভণ্টুকে কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া বউদিদি চলিয়া গেলেন।

ভণ্টু মসলার থালা হইতে কিছু মসলা লইয়া চিবাইতে লাগিল। বউদিদি ফিরিয়া আসিলেন ও বলিলেন, আদার রস মিশিয়ে দিলে একটু উপকার হত—তা কিছুতে রাজি নন।

ইউস্‌লেস অ্যাফেয়ারের একটি গুরুমশাই তুমি। এতদিনেও তুমি বাকুকে চিনলে না! হিজ এক্সেলেন্সি লর্ড বাক্‌লান্ড চা-ও চান না, আদাও চান না, উনি চান—লিকুইড পোলাও। বাকুর কুর কুর কুর।

বলিতে বলিতে ভণ্টু শরীরের উপরার্ধ নাচাইতে লাগিল।

আদার রস দিলে সর্দিটার উপকার হত। ভয়ানক ঝামরে রয়েছেন। আদার ফাদার এলেও ঝামরানো কমবে না।

একটু থামিয়া ভণ্টু পুনরায় বলিল, হ্যাঁ, ভালো কথা, কাল মোজাজোড়া দেখে চটেননি তো, একটু 'চিপিস' অ্যাফেয়ারে ঢুকেছিলাম, তাও বারো গণ্ডা পয়সা সাফ হয়ে গেল!

বউদিদি একটা ফরসা ন্যাকড়ায় আখনির জলের মশলাগুলি বাঁধিতেছিলেন। এই কথায় মুচকি হাসিয়া বলিলেন, উল্টে-পাল্টে দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে। বলেননি কিছু।

তার মানেই চটেছেন। পছন্দ হলে বলতেন।

শণ্টু আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল যে, ধীরেন ডাক্তার ডিস্পেনসারিতেই আছেন।—বলিয়া সে চলিয়া গেল এবং ক্ষণপরেই চিৎকার শুরু করিল— The boy stood on the burning deck–

ভণ্টু উঠিয়া পড়িল এবং বলিল, তুমি চা-টা ততক্ষণ কর, চট করে আমি ধীরেন ডাক্তারের কাছ থেকে ঘুরে আসি।

ধীরেন ডাক্তারের কাছে কেন?

আসল সত্যটা গোপন করিয়া ভণ্টু বলিল, দেখি যদি ওয়াটার-প্রুফটা বাগিয়ে আনতে পারি। কিন্তু বাই দি বাই, বিড়্‌ডিকার, একটু তাড়াতাড়ি ভাত চাই আজ।

এই বাদলায় সকাল সকাল বেরিয়ে কি হবে?

অনেক জায়গায় খজলাখজলি করতে হবে আজ।

খজলাখজলি কি?—বউদিদি হাসিয়া ফেলিলেন।

এই কথাটা ভণ্টু নূতন সৃষ্টি করিয়াছে, বউদিদি ইতিপূর্বে কথাটা শোনেন নাই।

ফইজত।—বলিয়া ভণ্টু বাহির হইয়া গেল।

বউদিদি কেৎলিতে জল দিয়া তাহাতে মসলার পুঁটুলিটি দিলেন এবং সেটি উনানে চড়াইয়া দিলেন। তাহার পর ক্ষণকাল ভাবিয়া চারটি পোস্ত বাহির করিলেন এবং তাহা বাটিতে লাগিলেন। ডাল ভাত হইয়া গিয়াছে, তরকারি যদি না-ও হইয়া ওঠে, কয়েকটা পোস্তর বড়া ভাজিয়া দিলে ঠাকুরপোর খাওয়া হইয়া যাইবে।

জীর্ণ ওয়াটার-প্রুফটা গায়ে দিয়া ভণ্টু একটু সকাল সকালই বাহির হইল। উদ্দেশ্যটা ছিল, যাইবার মুখে গোয়াবাগানটা একটু ঘুরিয়া মেজকাকার সন্ধানটা লইয়া যাওয়া। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই সে দেখিতে পাইল, শঙ্কর ভিজিতে ভিজিতে ও-ধারের ফুটপাথ দিয়া যাইতেছে। শঙ্কর তাহাকে দেখিতে পায় নাই। ভণ্টু বাইক ঘুরাইল।

চাম গ্যানঢঅ। চাম গ্যানঢঅ!

শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল।

এ রকম অগাধ জলে ডুব মেরে বসে আছিস, ব্যাপার কি তোর?

শঙ্কর একটু বিব্রত হইয়া পড়িল, ভণ্টুকে সে এতদিন ইচ্ছা করিয়াই এড়াইয়া চলিতেছিল। হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হইয়া যাওয়ায় কি যে বলিবে, ভাবিয়া পাইল না। একটু মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃদু হাসি অনেক সময় মানুষকে কথা কহিবার দায় হইতে রক্ষা করে।

ভণ্টু বলিল, মিছিমিছি ভিজে লাভ কি, চল, ওই গাড়ি-বারান্দাটার তলায় দাঁড়ানো যাক। থাম থাম, সর্বাঙ্গে কাদা ছিটিয়ে দেবে এক্ষুনি।

একটা মোটর বেগে বাহির হইয়া গেল।

নির্বিঘ্নে গাড়ি-বারান্দার তলায় পৌঁছিয়া ভণ্টু বলিল, তোর ব্যাপার খুলে বল দিকিন। ডিটেলে ঢুকিসনি, সংক্ষেপে শাঁসটুকু দে।

অকস্মাৎ শঙ্করের সন্দেহ হইল, ভণ্টু বোধ হয় জানিতে পারিয়াছে। বলিল, ব্যাপার মানে?

মানে, তোর টিকি আনট্রেসেবল। কোথা থাকিস আজকাল তুই?

প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস থেকে ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে যায়।

রাত্তির নটা-দশটা পর্যন্ত প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস? কাকে ধাপ্পা মারছিস তুই!

শঙ্কর বলিল, এখন তুই যা, পরে সব বলব তোকে। এখন আমি একটা জরুরি কাজে যাচ্ছি এক জায়গায়। যাব একদিন তোদের বাড়ি।

আসছে রবিবারে আসিস। মেজকাকা আবার ফিরেছেন।

তাই নাকি?

শুনছি তো। উঠেছেন গোয়াবাগানে, সেখানেই যাচ্ছি আমি।

গোয়াবাগানে কেন?

ঘোড়েল বাবাজির কাণ্ডকারখানাই আলাদা।

এ সংবাদ দুই মাস আগে শঙ্করেব মনে আর কিছু না হোক কৌতূহল উদ্রিক্ত করিত, এখন তেমন কিছু করিল না। আচ্ছন্নের মতো ভণ্টুর মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া শঙ্কর বলিল, আশ্চর্য তো!

ভণ্টু বাইকে চড়িয়া বলিল, এখন চললাম আমি, আসিস।

ভণ্টু চলিয়া গেল। শঙ্কর যাইতেছিল প্রফেসার গুপ্তের নিকট টাকার চেষ্টায়। কিছু টাকার জোগাড় না করিতে পারিলে মুক্তোর নিকট আর মান থাকে না। ভিজিতে ভিজিতে সে প্রফেসার গুপ্তের বাসার উদ্দেশ্যে চলিতে লাগিল।

ভণ্টু গোয়াবাগানে গিয়া শুনিল যে, উমেশবাবু আসিয়াছেন বটে, কিন্তু এখন বাড়িতে নাই, কখন ফিরিবেন তাহারও কোনো স্থিরতা নাই। প্রত্যাবর্তন করিতে করিতে ভণ্টু ভাবিতে লাগিল, বাবাজি আসিয়াছেন তাহা হইলে! কিন্তু নিজের বাড়িতে না গিয়া বন্ধুর বাড়িতে অধিষ্ঠান করিবার মানে কি? এ রহস্যের উদ্ভেদ ভণ্টু করিতে পারিল না। বাবাজি আসিলে গব্যঘৃত প্রভৃতির জন্য খরচ বেশ একটু বাড়ে, বাবাজি বন্ধুগৃহে অবস্থান করাতে খরচের দিক দিয়া

ভণ্টুর কিছু সুরাহা হইয়াছে, তথাপি ভণ্টুর আত্মসম্মানে কেমন যেন আঘাত লাগিল। বাবাজির এ কি ব্যবহার? রাস্তার একটা ঘড়িতে সে দেখিল, সাড়ে নয়টা বাজিয়াছে। ইচ্ছা করিলে নিবারণবাবুর খবরটাও এ বেলা সে লইতে পারে। বখেড়া মিটাইয়া রাখা ভালো; ও-বেলা করালীচরণের ওখানে যাইতে হইবে। সে খপ্পর হইতে সহজে বাহির হওয়া মুশকিল।

সার্পেনটাইন লেনে নিবারণবাবুর বাড়িতে গিয়া ভণ্টু বিস্মিত হইল। কাল দোকানে মাস্টারের কাছে শুনিয়াছিল যে, নিবারণবাবু ভয়ানক অসুস্থ, শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছেন। অথচ ভণ্টু দেখিল, ভদ্রলোক তো দিব্যি বসিয়া আছেন, অসুখের কোনো লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। ভণ্টুকে দেখিয়া নিবারণবাবুর মুখে আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল।

আসুন আসুন ভণ্টুবাবু, তারপর—হঠাৎ অকাল বোধন যে! এমন সময় তো আসেন না কোনো দিন। আপিসে রেনি-ডে হয়ে গেল নাকি?

বাইকটা ঠেসাইয়া রাখিতে রাখিতে ভণ্টু বলিল, ভুলে যান সেসব কথা। আপনি কেমন আছেন তাই বলুন আগে।

যেমন রেখেছেন তেমনি আছি। আমাদের আর থাকাথাকি কি, দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছি।

ওসব তো মামুলি লদ্‌কালদ্‌কি। অসুখ করেছে শুনলাম, কেমন আছেন তাই বলুন।

হাস্য-স্নিগ্ধ চক্ষে ভণ্টুর প্রতি চাহিয়া নিবারণবাবু বলিলেন, মাস্টার বলেছেন বুঝি?

হ্যাঁ! কাল আর আসবার সময় পাইনি, আজ আপিস যাওয়ার মুখে ভাবলাম, খবর নিয়ে যাই।

বেশ করেছেন, বসুন। খিচুড়ি খাবেন?

আমি ইটিং আপিস খুলে তবে বেরিয়েছি।

ইটিং আপিস মানে?

বিরাট ইটিং আপিস খুলেছি, আজ বউদিদি খুলিয়ে তবে ছেড়েছেন।

ইটিং আপিস কি মশাই?

খেয়ে বেরিয়েছি। তবু আনতে বলুন একটু খিচুড়ি, পুনরায় আপিস খোলা যাক। প্লেটে করে সামান্য একটু আনতে বলুন, চেখে দেখা যাক। আপনার গিন্নির হাতের রান্না খাইনি কখনও। এ সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না।

গিন্নির রান্না নয়, তিনি বাতের ব্যথায় কাতর, আজ ঠাণ্ডায় আরও আউরেছে। রেঁধেছে আস্‌মি।

ভিতর হইতে আস্‌মির উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

আমায় অমন টিকটিক করো না বলে দিচ্ছি, পোড়া কড়া মেজে গা-গতর টাটিয়ে গেছে আমার, ব্যাসনটা তুমিই ফেনাও না। শেলাই-ফেলাই পরে করো!

নিবারণবাবু হাঁকিলেন, ওরে আস্‌মি, শোন এদিকে ।

তাহার পর অনুচ্চকণ্ঠে ভণ্টুকে বলিলেন, আজ আবার ঝি-মাগি আসেনি, সব ওকেই করতে হচ্ছে, দার্জিটা তো কুটোটি পর্যন্ত নাড়বে না।

আস্‌মি দ্বারপ্রান্তে উঁকি মারিল।

খিচুড়ি হয়েছে তোর?

আস্‌মি মাথা নাড়িয়া জানাইল, হইয়াছে।

আর কি হয়েছে?

মাছভাজা।

একটু খিচুড়ি আর মাছভাজা নিয়ে আয় ভণ্টুর জন্যে।

আস্‌মি চলিয়া গেল।

ভণ্টু বলিল, আপনার অসুখের খবরটা সর্ব্বৈব ভুয়ো তা হলে?

ওই ছুতো করে দিনকতক রেহাই নিয়েছি। কাঁহাতক তার সেতার বাজাই মশাই!

নিবারণবাবুর হাসি আবার আকর্ণবিশ্রান্ত হইয়া উঠিল, ভণ্টু হেঁট হইয়া তাঁহার পদধূলি লইল।

আহা-হা, আবার বাই চাপল দেখছি!

ভণ্টু স্মিত মুখে নীরব রহিল।

একটু পরেই নিবারণবাবু বলিলেন, কাল ফের দু ব্যাটা জলখাবার খেয়ে সরেছে মশায়। এর একটা বিহিত করুন। মেয়ের বিয়ে দেওয়া যা ফ্যাসাদ হয়ে দাঁড়াল দেখছি।

আস্‌মি খিচুড়ি ও মাছভাজা লইয়া প্রবেশ করায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল।

।। ছয় ।।

বৃষ্টি ছাড়ে নাই। আকাশে মেঘের ওপর মেঘের স্তর জমিতেছে, বাতাসের বেগ বাড়িতেছে। নিতান্ত দায়ে না পড়িলে এমন দিনে লোকে ঘরের বাহির হয় না, কোষ্ঠীগণনা করাইতে কে আসিবে! করালীচরণ বক্‌সীর হাতে আজ কোনো কাজ নাই, এমন দিনে কাজ আসিবার সম্ভাবনাও নাই। একটা সিগারেট ধরাইয়া একচক্ষুর দৃষ্টি দিয়া তিনি কর্দমাক্ত গলিটার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। নিজেকে নিতান্ত রিক্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এমন কর্মহীন দিন তাঁহার জীবনে বহুকাল আসে নাই। প্রতিদিন একটা না একটা কাজ হাতে থাকে এবং তাহা লইয়াই সমস্ত দিনটা কাটিয়া যায়। বিগত তিন-চার বৎসরের মধ্যে একদিনও তাঁহার অবসর ছিল না; আজ এই মেঘমেদুর দিনের পরিপূর্ণ অবসরটা লইয়া তিনি যে কি করিবেন, ভাবিয়া পাইতেছিলেন না।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন, টেবিলের ওপর হইতে বোতলটা তুলিয়া দেখিলেন, আর কতটা বাকি আছে। দেখিলেন, আধ বোতল রহিয়াছে। বোতলে মুখ লাগাইয়া খানিকটা পান করিলেন এবং হাতের উল্টা পিঠ দিয়া মুখটা মুছিয়া সিগারেটটায় আরও গোটা দুই টান দিলেন।

এইবার? এইবার কি করা যায়? মদ খাওয়া এবং সিগারেট খাওয়া দুইটাই তো হইল অতঃপর?

সহসা করালীচরণের কানে আসিল, সামনের খোলার বাড়িতে যে কোচোয়ান-দম্পতি বাস করে, তাহারা উচ্চকণ্ঠে কলহ শুরু করিয়াছে। উভয় পক্ষই চোখা চোখা ভাষা ব্যবহার করিতেছে। বেশ জমাইয়া তুলিয়াছে তো; বাই নারায়ণ! সাগ্রহে কান পাতিয়া করালীচরণ

তাহাদের অশ্লীল ভাষার গালাগালিগুলি শুনিতে লাগিলেন। অসভ্য বুড়ো কোচোয়ানটাকে হিংসা হইতে লাগিল। আর যাই হোক, সময় কাটাইবার জন্য বুড়োকে পরের ওপর নির্ভর করিতে হয় না, ঘরের সঙ্গিনীটিই আসর জমাইয়া রাখিয়াছে। সঙ্গিনী! সঙ্গিনীর কথায় করালীচরণের অজ্ঞাতসারেই একটি দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হইল। সকলেরই তো একটা না একটা সঙ্গিনী আছে। তাঁহার বেলাতেই বিধাতা-পুরুষ এমন কৃপণ হইলেন কেন? বিবাহের বয়স তাঁহার এখনও পার হইয়া যায় নাই বোধ হয়। নিজের বয়সটা ঠিক কত তাহা তাঁহার জানা নাই, কারণ নিজের জন্মসময়ই ঠিক তিনি জানেন না। এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার সময় মায়ের নিকট হইতে বয়সের একটা খবর আনিতে হইয়াছিল, সে হিসাবে তাহার বয়স এখন পঁয়তাল্লিশ বৎসর। কি আর এমন বয়স! এমন বয়সে কত লোকই তো বিবাহ করিতেছে। বিবাহের কথা মনে হওয়ায় তাঁহার মুখে একটু হাসি ফুটিল। কে এমন নিষ্ঠুর মেয়ের বাপ আছেন, যিনি সজ্ঞানে তাহার মতো কানা কালো কুৎসিত একটা মাতালের হাতে স্বেচ্ছায় কন্যা সম্প্রদান করিবেন! রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া যাহারা দেহ বিক্রয় করে, তাহারাও তাঁহাকে চাহে না। অর্থই যাহাদের পরমার্থ, করালীচরণের অর্থ তাহাদের নিকটও নিরর্থক।

অদৃষ্টে কি আছে কে জানে! ভণ্টুবাবুর পাস-বুকে কত টাকা জমিল একবার খোঁজ লইতে হইবে। যেমন করিয়া হোক, দ্রাবিড়ে গিয়া করকোষ্ঠী-গণনার চূড়ান্ত করিয়া নিজের অদৃষ্টলিপিটা পাঠ করিতে হইবে।

সহসা কোচোয়ান-দম্পতির কলহ থামিয়া গেল। আকাশের মেঘ ঘনতর হইয়া উঠিল। দমকা বাতাসে ওদিককার জানালাটা খুলিয়া গিয়া সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। জানালাটার ছিটকানি নাই, সকাল হইতে ক্রমাগত ওইরূপ হইতেছে।

করালীচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আর একটি সিগারেট ধরাইলেন। ভণ্টু কয়েকদিন হইতে আসে নাই, হাতে গোটা-পনেরো টাকা জমিয়া গিয়াছে। মদ এবং সিগারেট যাহা আছে, তাহাতে খানিকক্ষণ চলিবে। কিন্তু তাহার পরই মুশকিল। ফুরাইলে এই বর্ষায় আনিয়াই বা দেয় কে? পাশেই একটা ছোঁড়া বিড়ির দোকান খুলিয়াছে, ইদানীং তাহাকেই দুই-চারি আনা পয়সা দিয়া করালীচরণ ফাই-ফরমাশ খাটাইয়া থাকেন। কিন্তু এই বর্ষায় সেও আসে নাই। করালীচরণের অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হইতে লাগিল। বাই নারায়ণ! সমস্ত দিনটা আজ কাটিবে কি করিয়া?

সিগারেটে টান দিতে দিতে করালীচরণ আলমারি ও তাকের বইগুলির দিকে চাহিলেন। সমস্তটাই পড়া, একবার নয়—বহুবার। তবুও যদি উহারই মধ্যে এই দিনের মতো কোনো খোরাক পাওয়া যায়! করালীচরণ আলমারি খুলিয়া বইগুলি নামাইতে লাগিলেন। পাঁজি পাঁজি, ক্যাল্‌কুলাস, Tale of Two Cities, পাঁজি, Scarlet Lady, Statics, পাঁজি, পাঁজি, পাঁজি, Paradise Lost, Race tips, রুবাইয়াৎ, আরব্য উপন্যাস, Astronomy, পাঁজি—বিরক্তিকর! বইয়ের গাদা ঠেলিয়া দিয়া করালীচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার নজরে পড়িল, বইগুলোর পিছন হইতে একজোড়া টিকটিকি বাহির হইয়া দেওয়ালে উঠিয়াছে। ইহারা করালীচরণের আলমারিতে বহুকাল হইতে আছে। অপরিচিত নয়, চেনা। আজ কিন্তু করালীচরণ ইহাদের নূতন দৃষ্টিতে দেখিলেন। ইহারা দম্পতি। টিকটিকিদের পর্যন্ত দম্পতি আছে।

টেবিলের ওপর হইতে আয়নাটা তুলিয়া লইয়া করালীচরণ নিজের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঠোঁট দুইটা আজকাল আরও হাজিয়া গিয়াছে। সহসা খেয়াল হইল, পাথরের চোখটা আর একবার পরিয়া দেখা যাক না, দিনের আলোতে কোনো দিন পরিয়া দেখা হয় নাই। চোখটা পরিয়া আয়নার দিকে নির্নিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ তিনি চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত মুখের ভাব কঠিন হইয়া উঠিল, নিদারুণ ক্রোধ ও ঘৃণায় আয়নাটা নামাইয়া রাখিয়া তিনি চোখটা খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। পাথরের চোখে কখনও মানুষ ভোলে! ওটা পরিলে চেহারাটা আরও যেন বীভৎস হইয়া ওঠে। করালীচরণ উঠিয়া বোতলে মুখ লাগাইয়া আরও খানিকটা সুরা পান করিলেন এবং বাহিরের দিকে চাহিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন।

টিপ-টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়ার বিরাম নাই, সমস্ত গলিটাময় প্যাচ-পেচে কাদা। বৃষ্টি পড়িতেছে, কিন্তু বর্ষার মহিমা নাই। শতচ্ছিন্ন মলিন কাপড় পরা একটা ভিখারিণী বুড়ি যেন দুঃখের ভারে অবনমিত হইয়া পথ চলিতেছে, মাঝে মাঝে দুই-চারি ফোঁটা অশ্রু উদগত হইয়া উঠিতেছে, দুই-একটা বুক ভাঙা দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে। শ্রীহীন বেদনার মূর্তি। পাশের বাড়ির ঘড়িটা বাজিয়া ওঠায় করালীচরণের হুঁশ হইল, বেলা বাড়িয়াছে। বারোটা বাজিয়া গেল।

যে হোটেলটায় তিনি রোজ আহার করেন, সে হোটেলটা আজ খুলিয়াছে কি না কে জানে! খুলিয়াছে নিশ্চয়ই।

করালীচরণ উঠিলেন, কোটটা গায়ে দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন।

হোটেলে গিয়া কিন্তু তাঁহার মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। ইহারা মানুষ, না, পশু! এমন বর্ষার দিনেও সেই সনাতন কলায়ের ডাল, বড়িচচ্চড়ি, শাকভাজা, উরশুনি মাছের ঝোল! অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল, ওই অখাদ্যগুলাই দুই-চারি গ্রাস মুখে পুরিতে হইল। কিন্তু নাঃ, অসম্ভব; ক্ষুধা সত্ত্বেও করালীচরণ উঠিয়া পড়িলেন।

দাম দিতে দিতে হঠাৎ চোখে পড়িল, সেই পানওয়ালীটা তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে এবং হাসিতেছে। হোটেল এবং পানওয়ালীর দোকান ঠিক সামনাসামনি। করালীচরণ এতক্ষণ পানওয়ালীকে লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু পানওয়ালী করালীচরণের সমস্ত আচরণ লক্ষ্য করিতেছিল। তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। পানওয়ালীর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া হনহন করিয়া তিনি চলিতে লাগিলেন। নিরুদ্দিষ্ট ভাবে খানিকক্ষণ চলিয়া অবশেষে একটা চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া করালীচরণ ভিড় দেখিতে লাগিলেন। তিনিই শুধু কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না, বাহিরের পৃথিবীর তো ব্যস্ততার সীমা নাই! মোটর, ট্রাম, রিক্‌শা, ঘোড়ার গাড়ি, পদাতিক—সকলে মিলিয়া কাদা ছিটাইয়া চৌরাস্তাটাকে যেন মথিত করিয়া ফেলিতেছে। সকলেরই কাজ আছে। থাকিবে না কেন? তাঁহার মত— । করালীচরণ আবার ফিরিলেন, মদ কিনিতে হইবে। এক বোতল মদ ও কিছু সিগারেট কিনিয়া ফেলা অবিলম্বে দরকার। ভন্টুবাবু কখন যে হানা দিয়া টাকাগুলি লইয়া যাইবেন স্থিরতা নাই!

ভিড় ঠেলিয়া পিছল কদর্মাক্ত ফুটপাথ দিয়া প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে করালীচরণ মদের দোকানের উদ্দেশে ছুটিতে লাগিলেন, যেন কোনো জরুরি দরকারে ট্রেন ধরিতে ছুটিয়াছেন।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে কর্দমাক্ত করালীচরণ মদ ও সিগারেট লইয়া ফিরিলেন। ফিরিয়া

দেখিলেন, ঘরের কপাট খোলা, হাঁ-হাঁ করিতেছে। মনে পড়িল, যাইবার সময় বন্ধ করিয়া যান নাই। ঘরে ঢুকিতেই নজরে পড়িল, টেবিলের ওপর একটা থালায় কি যেন ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। কি এ! আগাইয়া গিয়া ঢাকা খুলিয়া দেখিলেন, কয়েকখানা পরোটা ও হাঁসের ডিমের ডালনা। কে রাখিয়া গেল। পর-মুহূর্তেই কিন্তু তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্রে কে যেন তপ্ত লৌহশালাকা বিদ্ধ করিয়া দিল। তিনি একটা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, ক্রোধে তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। এক টানে থালাটা রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কপাটে খিল বন্ধ করিয়া তিনি বলিলেন, হারামজাদি! যাহারা তাঁহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়, তাহাদের সহিত তাঁহার কোনো সম্পর্ক নাই। একদিন দুর্মতি হইয়াছিল, ওই ডাকিনীদের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু আর নয়, যথেষ্ট শিক্ষা হইয়া গিয়াছে। বেশ্যারা আবার মানুষ! দুই-চারি টাকার জন্য যাহারা—। করালীচরণ পূর্বেকার নিঃশেষিতপ্রায় বোতলটাতে মুখ লাগাইয়া বাকি মদটুকু ঢকঢক করিয়া পান করিয়া ফেলিলেন। মাগীর তাড়কা রাক্ষসীর মতো চেহারা, সোহাগ জানাইতে আসিয়াছে! একটুও যদি রূপ থাকিত, দেমাকে মাটিতে পা পড়িত না, আমাকে দেখিয়া তখন হয়তো মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া যাইত। এখন বোধ হয় কেউ পৌঁছে না, তাই আমার কাছে ভিড়িয়াছে। এবার আসিলে চাবকাইয়া পিঠের চামড়া তুলিয়া ফেলিব।

ঘরে খিল দেওয়ায় ঘরটা অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছিল। করালীচরণ মোমবাতির সন্ধান করিযা দেখিলেন, মোমবাতি নাই। বাই নারায়ণ! আবার বাহির হইতে হইবে। করালীচরণ তালাটা খুঁজিতে লাগিলেন। এবার তালা দিয়া যাইতে হইবে। তালাটা লাগাইতে লাগাইতে করালীচরণ এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, থালাটা কে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। কিছুদূর গিয়া চোখে পড়িল, ওই দিকের গলিতে কতকগুলো ছোঁড়া একটা দাঁড়কাক ধরিয়াছে এবং তাহার পায়ে দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে নানা রকম যন্ত্রণা দিয়া আনন্দ পাইতেছে। করালীচরণ খানিকক্ষণ সেদিকে চাহিয়া মোমবাতির খোঁজে চলিয়া গেলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় ভণ্টু আপিসের ফেরত করালীচরণের বাসার দরজা পর্যন্ত আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। শুনিতে পাইল, করালীচরণ উন্মাদের মতো চিৎকার করিয়া চলিয়াছেন—

It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair—we had everything before us, we had nothing before us–

ভণ্টু দরজা ঠেলিয়া ঢুকিতেই করালীচরণ বইটা বন্ধ করিলেন।

বাই নারায়ণ! সমস্ত দিন কোথায় ছিলেন আপনারা? একা একা পাগল হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছি—'টেল অফ টু সিটিজ' খানা পড়ছিলাম, কি আর করি।

ভণ্টু কাজের কথা পাড়িল।

আমাদের আপিসের একজন বড্ড ধরেছে, তার ছকটা যদি একটু দেখে দেন। বেচারা ভারি গরিব, দু টাকার বেশি—

ছকটা এনেছেন? কই?

করালীচরণ উন্মুখ হইয়া উঠিলেন।

ভণ্টু ছকটা বাহির করিতেই করালীচরণ তাহার হাত হইতে তাহা প্রায় ছিনাইয়া লইলেন ও তৎক্ষণাৎ ঝুঁকিয়া দেখিতে শুরু করিলেন।

ভণ্টু স্মিতমুখে করালীচরণের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর একটা খড়খড় শব্দ শুনিয়া আলমারির মাথার ওপর নজর পড়িতেই বিস্মিত হইয়া গেল।

ওটা কি আবার?

করালীচরণ চকিতে একবার সেদিকে চাহিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন, পুষলাম।

কি পাখি ওটা?

দাঁড়কাক।

দাঁড়কাক! কোথা থেকে পেলেন?

রাস্তার ছোঁড়াগুলোর কাছ থেকে কিনলাম এক টাকা দিয়ে। একটা সঙ্গী না হলে চলে না মশাই, একা একা আজ জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

ভণ্টু আলমারিটার নিকট গিয়া সবিস্ময়ে দেখিল, মস্ত একটা দামি খাঁচায় সত্যই একটা দাঁড়কাক রহিয়াছে। করালীচরণের দিকে চাহিয়া দেখিল, তিনি তন্ময় হইয়া গণনায় মন দিয়াছেন। ভণ্টু আর কথা বলিতে সাহস করিল না।

।। সাত ।।

মানুষ ভাবে এক রকম, হইয়া যায় আর এক রকম। পথের নেশায় মাতিয়া মানুষ পথটাকেই বড় মনে করে, লক্ষ্যের কথা ভুলিয়া যায়। লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য যে পথকে সে আশ্রয় করে, সেই পথই শেষে তাহাকে পাইয়া বসে, পথ চলার উন্মাদনায় সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

মৃন্ময়েরও তাহাই হইয়াছিল। মজফ্‌ফরপুরগামী একটা ট্রেনের কামরায় বসিয়া বসিয়া মৃন্ময় সহসা অনুভব করিল, সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। হারানো পত্নীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সে পুলিসে চাকুরি লইয়াছিল, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আজ সহসা সে অনুভব করিল যে, সে উদ্দেশ্যটা গৌণ হইয়া গিয়াছে, চাকরিই এখন মুখ্য। কই, সে তো বিগত এক মাসের মধ্যে স্বর্ণলতাকে একখানি চিঠিও লেখে নাই! কাজের চাপ পড়িয়াছে সত্য কথা, কিন্তু কাজের চাপই কি একমাত্র কারণ? তাহার উৎসাহও কি কমিয়া আসে নাই? স্বর্ণলতাকে হারাইয়া যে তীব্র বেদনা সে অনুভব করিয়াছিল, যাহার তাড়নায় পুনরায় বিবাহ করিয়া পুলিসের চাকুরি লইয়াছিল, সে বেদনা কি এখনও তেমনই তীব্র আছে? তীব্রতাটা কি এতটুকু কমে নাই? নিজেকেই নিজে এই প্রশ্ন করিয়া, নিজেরই অন্তরের মধ্যে সত্য সন্ধান করিয়া ডিটেক্‌টিভ মৃন্ময় স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। এ কয়দিন সে যে শুধু স্বর্ণলতাকে চিঠি লিখিবার সময় পায় নাই তাহা নহে, স্বর্ণলতাকে ভাবিবারও সময় পায় নাই। এ কয়দিন সে শুধু মিস্টার ঘোষের কথা এবং মিস্টার ঘোষের আচরণের কথা ভাবিয়াছে।

মজুমদারের মতো মিস্টার ঘোষও তাহার সহকর্মী। সম্প্রতি বাহিব হইতে বদলি হইয়া

আসিয়াছেন। কর্মতৎপরতা তাঁহার যেন অসাধারণ রকম প্রখর, মনও তাঁহার তেমনই অসাধারণ রকম বিষাক্ত। মৃন্ময় নিজের কর্মকুশলতার জোরে উন্নতি করিতেছে, উপরওয়ালার প্রিয়পাত্র হইতেছে, এই বম্ব্ কেসটার তদন্তের ভার পাইয়াছে—মিস্টার ঘোষের পক্ষে ইহা অসহ্য হইয়াছে। মিস্টার ঘোষও এই বম্ব্ কেসে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারও সাহেবের নিকট প্রতিপত্তি আছে, কিন্তু মৃন্ময়ের উন্নতি তিনি ভালো চক্ষে দেখিতেছেন না। কাহারও কোনো উন্নতি কখনও তিনি ভালো চক্ষে দেখেন না। তাঁহার স্বভাবই ওইরূপ। তাঁহার বক্রোক্তি, আচরণের অন্তর্নিহিত তিক্ততা, গোপনে চক্রান্ত পাকাইয়া তুলিবার ক্ষমতা—মৃন্ময়কে এ কয়দিন এমন ক্ষুব্ধ ও ব্যাপৃত করিয়া রাখিয়াছিল যে, তাঁহার অন্য কথা ভাবিবারই অবসর ছিল না। তাহার মোটর-চাপা-পড়া সম্পর্কে তদন্ত করিয়া মিস্টার মজুমদার যখন অচিনবাবুকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন, তখন মিস্টার ঘোষ স্বচ্ছন্দে ও শান্তভাবে বলিয়া বসিলেন যে, অচিনবাবুর ইহাতে যদি লাভ থাকে, তাহা হইলে মৃন্ময়বাবুও নিশ্চয়ই কোনো নারীঘটিত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছেন। লোকটার ব্যবহার কথাবার্তা আশ্চর্য রকম ভদ্র, আশ্চর্য রকম হাস্য-লিপ্ত, অথচ আশ্চর্য রকম তীক্ষ্ণ ও বিষাক্ত। মজুমদার ঠিক ইহার বিপরীত। ভদ্রতার ধার ধারে না, চিৎকার করিয়া কথা বলে, অশ্লীল কথা মুখে লাগিয়াই আছে, মন কিন্তু পরিষ্কার। মৃন্ময় অল্প সময়ের মধ্যে উন্নতি করিয়াছে—ইহা মিস্টার ঘোষের বিদ্বেষ এবং মিস্টার মজুমদারের আনন্দ উৎপাদন করিয়াছে। মজুমদারের সাবধানবাণী মৃন্ময়ের মনে পড়িল। কাজে কোনো রকম খুঁত যেন না হয়, হইলে তাহা ঘোষের দৃষ্টি এড়াইবে না এবং সেই খুঁতটুকুকে নিখুঁতভাবে উপরওয়ালার নয়নগোচব করিতেও সে পশ্চাৎপদ হইবে না। এই 'চুগলি'-পটুতার জন্যই নাকি উপরওয়ালার নিকট তাহার প্রতিপত্তি। মৃন্ময় স্বভাবতই কর্তব্যপরায়ণ এবং বুদ্ধিমান। জ্ঞাতসারে সে কোনো খুঁত ঘটিতে দিবে না। যে কাজে সে যাইতেছে, কিভাবে করিলে তাহা সুসম্পন্ন হইবে, তাহারই ভাবনায় সে পুনরায় নিমগ্ন হইয়া পড়িল। স্বর্ণলতার কথা একবার মাত্র মনে হইয়াছিল, আর হইল না।

বরং হাসির মুখখানা মনের মধ্যে দু-একবার উঁকি দিয়া গেল। মনে পড়িল, হাসি মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছে—টিফিন-কেরিয়ারে যে লুচি, আলুর দম ও মোহনভোগ সে করিয়া দিল, মনে করিয়া ঠিক সময়ে তাহা যেন সে খায়। মৃন্ময় টিফিন-কেরিয়ারটা নামাইয়া দেখিল, হাসি করিয়াছে কি! এ যে তিনজনের খাবার! কিন্তু আশ্চর্য, হাসির এই অপব্যয়প্রবণতায় মৃন্ময়ের রাগ হইল না, মন স্নেহসিক্ত হইয়া উঠিল।

।। আট ।।

হাসি একা দুপুরে বসিয়া হাতের লেখা লিখিতেছিল। চিন্ময় আজকাল তাহাকে বাড়িতে লেখাপড়া শিখাইতেছে। আগ্রহ অবশ্য হাসিরই বেশি। বাংলা লেখাপড়াটা বাড়িতে শিখিয়া ফেলিতেই হইবে। সবাই কেমন নানারকম বই পড়ে, স্বামীকে চিঠি লেখে, হাসি কিছুই পারে না। চিন্ময়ের সাহায্য লইয়া তাই সে বর্ণ-পরিচয় হইতে শুরু করিয়া দিয়াছে, সবাই পারে, সেই বা পারিবে না কেন? প্রথম ভাগ শেষ হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় ভাগেরও বেশি বাকি নাই। প্রত্যহ

দশখানা করিয়া হাতের লেখা লিখিতেছে। হাতের লেখাটা তাড়াতাড়ি ভালো করিয়া ফেলিতে হইবে। কবে সে স্বামীকে ভালো করিয়া চিঠি লিখিতে পারিবে? ও-বাড়ির কুসুম কেমন সুন্দর করিয়া স্বামীকে চিঠি লেখে, স্বামীর কত সুন্দর চিঠি পায়।

অতিশয় মনোযোগ সহকারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সম্মুখে প্রসারিত লিখনপ্রণালী দেখিয়া হাসি হাতের লেখা লিখিতে লাগিল। দুপুরবেলায় ঘুমানো তাহার বহুদিনকার অভ্যাস; মাঝে মাঝে হাই উঠিতেছে; কিন্তু না, কিছুতেই না, হাতের লেখাগুলি শেষ করিয়া ফেলিতেই হইবে। একখানি কম হইলে চিন্ময় ঠাট্টার চোটে অস্থির করিয়া তুলিবে। এমনিই তো তাহার লেখাকে কাগের ঠ্যাঙ বগের ঠ্যাঙ নাম দিয়াছে। হাসি ঝুঁকিয়া লিখিতেছিল, এই কথা মনে হওয়াতে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল এবং ঘাড় বাঁকাইয়া নিজের হস্তাক্ষরগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কাগের ঠ্যাঙ বগের ঠ্যাঙ কেন হইবে? আগেকার চেয়ে তো অনেকটা ভালো হইয়াছে। আবার সে ঝুঁকিয়া লিখিতে শুরু করিল।

।। নয় ।।

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর।

নিবারণবাবু ও মাস্টার দোকানে গিয়াছে, আস্‌মি কাজকর্ম সারিয়া পাড়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, মা পাশের ঘরে নিদ্রিত। দার্জি ওরফে শ্যামলী একা বসিয়া একটি কাপড়ে রঙিন সুতা দিয়া ফুল তুলিতেছে আর ভাবিতেছে, সকলে তাহাকে ইহার জন্য এত বকে কেন? সকলের ইহা খারাপ লাগে, অথচ তাহার ইহা ভালো লাগে কেন? বাবা বকে, মা বকে, আস্‌মি বকে; সে কিন্তু কিছুতেই ইহা ছাড়িতে পারে না। তাহার ফুলিপিসির কথা মনে পড়ে। ফুলিপিসিই প্রথমে তাহাকে সেলাইয়ের কাজ শিখাইয়াছিল। বেচারি মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার হাতের কাজ কার্পেটের আসনটা এখনও আছে! সেই কার্পেটটার প্রতি ফুলে ফুলে রঙিন হইয়া ফুলিপিসি এখনও বাঁচিয়া আছে! ফুলিপিসিও তাহারই মতো কুৎসিত ছিল, বিবাহ হইয়াছিল বটে, কিন্তু স্বামী-সুখ কখনও পায় নাই। সুন্দরী দেখিয়া স্বামী আর একজনকে বিবাহ করিয়াছিল। ফুলিপিসি চিরকাল বাপের বাড়ির লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করিয়া চক্ষের জল ফেলিয়া সারা জীবনটা কাটাইয়া গিয়াছে। ফুলিপিসির দুঃখের অন্ত ছিল না। কিন্তু শত দুঃখের মধ্যেও সে নিজেকে ভুলিয়া থাকিত, যখন সে তাহার সেলাই লইয়া বসিত। ওই ছিল তাহার একমাত্র মুক্তির ক্ষেত্র।

দার্জি সেলাই করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল, তাহার কি বিবাহ হইবে? কত সুন্দরী মেয়েব বিবাহ হইতেছে না, তাহাকে বিবাহ করিবে কে? কত লোকই তো আসিল, দেখিল, চলিয়া গেল—কই, কেহই তো পছন্দ করিল না! আস্‌মিটাকে বরং দুই-একজন পছন্দ করিয়াছে। আস্‌মি যদিও কালো, কিন্তু তাহার মুখ-চোখ হাব-ভাবে লোকে মুগ্ধ হয়। কিন্তু তাহার বিবাহ না হইলে তো আস্‌মির বিবাহ হইবে না। তাহাকে কে বিবাহ করিবে? কোথায় সেই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, যে তাহার বাহিরটাকে তুচ্ছ করিয়া ভিতরটা দেখিতে পাইবে? কোথায় সে?

দার্জি ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। ক্ষণিকের জন্য তাহার মানসপটে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন একটি মুগ্ধ যুবকের অজানা মুখ ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই। অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া সে আবার সুতা দিয়া ফুল তুলিতে লাগিল।

।। দশ ।।

নানা স্থান হইতে ঋণ করিয়া শঙ্কর কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়াছে এবং তাহা লইয়া দ্রুতপদে পথ অতিবাহন করিতেছে। এ কয়দিন সে মুক্তোর কাছে যাইতে পারে নাই। সেদিনকার সেই ঘটনার পর শূন্যহস্তে সেখানে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। কয়েকদিন ক্রমাগত ঘুরিয়া পঞ্চাশটা টাকা অনেক কষ্টে সংগৃহীত হইয়াছে। শঙ্কর ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে, গিয়াই টাকাগুলি মুক্তোর হাতে দিয়া বলিতে হইবে, তোমার ব্যবসায়ের ক্ষতি আমি করিতে চাহি না, নোটগুলি ভালো করিয়া গনিয়া দেখিয়া লও। মনে করিও না, আমি তোমার ভালোবাসার মূল্য দিতেছি। টাকা দিয়া ভালোবাসা ক্রয়ও করা যায় না, বিক্রয়ও করা যায় না, আমি তাহা জানি। কিন্তু আমি ইহাও জানি, অর্থহীন ভালোবাসাবাসি করিবার সঙ্গতি তোমার নাই। সেই জন্য তোমার ব্যবসায়ের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ কিছু আনিয়াছি। কয়েকদিনের জন্য অন্তত ব্যবসাটা বন্ধ কর। তুচ্ছ টাকার অজুহাতে আমাকে ফিরাইয়া দিবে, তাহা আমি সহ্য করিব না। টাকাটাই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জিনিস নয়। এতকাল টাকা চিনিয়াছ, এইবার মানুষ চিনিতে শেখ। সামান্য টাকার জন্য এমনি করিয়া নিজেকে যেখানে সেখানে বিলাইয়া দিও না। নিজেকে চেন।

কে. শঙ্কর নাকি? আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমাকেই খুঁজছি।

শঙ্কর ফিরিয়া দেখিল, ভণ্টুর মেজকাকা দাড়ির মধ্যে অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে করিতে স্মিতমুখে আগাইয়া আসিতেছেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শঙ্করকে দাঁড়াইতে হইল।

আমাকে ডাকছেন?

তোমাকে ছাড়া আর কাকে ডাকব ভাই? তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করার দরকার আছে। তোমার মাথা যে কত সাফ, সে তো আমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না।

ইহা কিসের ভূমিকা বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মুক্তানন্দ বলিলেন, চল স্কোয়ারটার ভিতর বসা যাক।

বেশি দেরি হবে কি? আমার একটু দরকারি কাজ ছিল।

না না, বেশি দেরি হবে না, দুটো কথা খালি।

কলেজ স্কোয়ারে ঢুকিয়া একটা নির্জন জায়গা বাছিয়া মুক্তানন্দ বলিলেন, অঙ্কের ব্যাপার ভাই; তুমি ঠিক পারবে। ন্যায়সঙ্গতভাবে একটা মূল্যনির্ধারণ করে আমাকে রেহাই দিয়ে দাও তোমরা। বস।

উপবেশন করিতে করিতে শঙ্কর বলিল, কিসের মূল্য নির্ধারণ?

আমার।

আপনার! মানে?

মানে-টানে কিছু নেই, আমারই।

শঙ্কর কিছু বুঝিতে পারিল না। একবার মনে হইল, হয়তো বাবাজি বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছেন এবং নিজের বাজার-দর কত হওয়া উচিত, তাহাই তাহার কাছে জানিয়া লইতে চান। কিন্তু মুক্তানন্দের প্রশ্নে এ ধারণা অচিরেই অপনোদিত হইল।

অ্যাভারেজ বাঙালির পরমায়ু কত ধরতে চাও তুমি? পঞ্চাশ? পঞ্চাশের কমই বরং হবে, বেশি নয়।

শঙ্কর বলিল, না।

আমার বয়স এখন বিয়াল্লিশ চলছে, বাকি রইল তাহলে আট বছর। এই আট বছরে কত উপার্জন করতে পারি আমি, একটা হিসাব কর দিকি। খুব বেশি করে ধরলেও গড়পড়তা মাসে ত্রিশ টাকার বেশি নয়। আট বছরে তাহলে কত হচ্ছে?

তিরিশ ইনটু বারো ইনটু আট—

ওসব ইনটু-মিনটু ছাড়, থোক টাকা কত হয় তাই বল।

শঙ্কর মনে মনে গুণ করিয়া বলিল, দু হাজার আটশো আশি টাকা।

আচ্ছা, এইবার ওর থেকে আমার খাই-খরচ কাপড়-চোপড়ের খরচ সব বাদ দাও।

শঙ্কর ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না।

বাবাজি বলিয়া চলিলেন, অ্যাভারেজ কত ধরবে? আমি মাছ মাংস খাই না অবশ্য, কিন্তু আলোচালে গাওয়া ঘি আমার চাই, কাপড়ও কম করে বছরে খান-দশেক, জামা অন্তত গোটা চারেক ধর, তারপর ধর টুকিটাকি নানারকম খরচা, বাঁচতে গেলেই হরেক রকম বখেড়া আছে তো!

আপনার উদ্দেশ্যটা ঠিক ধরতে পারছি না আমি।

পারবে, পারবে গো। তুমি পারবে না তো পারবে কে? আগে অঙ্কটা কষে ফেল দিকি, আমার নিজের পারসোনাল খরচ কত ধরতে চাও তুমি?

শঙ্কর যদিও কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না, তথাপি আজকালকার হিসাবে একটা লোকের খাওয়া-পরার খরচ ন্যূনকল্পে কত পড়িবে তাহা আন্দাজে বলিল, মাসে দশ টাকা ধরুন।

বাবাজি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

দশ টাকায় কি চলে আজকালকার দিনে। সস্তাগণ্ডার দিন কি আর আছে! তাহার পর সস্মিতমুখে শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলিলেন, বেশ, দশ টাকাই ধর, তোমার কথা ঠেলব না আমি। দশ টাকা ধরেই হিসাব কর। তা হলে কিন্তু থাকারও একটা খরচ ধর। কলকাতা শহরে অমনই তো কেউ থাকতে দেবে না, মেসে থাকলেও সিট-রেন্ট দিতে হবে। সেটাও ইনক্লুড কর। কত ধরবে সেটা—পাঁচ টাকা?

বেশ, পাঁচ টাকাই ধরুন। হ্যাঁ, পনেরো টাকার কমে চলে না একজনের আজকাল—

তা কি চলে কখনও! অথচ ভণ্টু কথাটা কিছুতেই বুঝছে না। হ্যাঁ, আর একটা জিনিস ধরতে ভুল হয়েছে—দুধ। দৈনিক অন্তত আধ সের করে দুধ দরকার আমার। মাসে তা হলে কত হল?

পনেরো সের।

টাকায় চার সের হিসেবে ধরলে—

প্রায় টাকা চারেক।

তা হলে পনেরো আর চারে উনিশ হল?

হ্যাঁ।

তা হলে এই বার অঙ্কটা কষে ফেল দিকি। ত্রিশ টাকা করে মাসে আয়, উনিশ টাকা করে খরচ, বাঁচছে তা হলে—

মাসে এগারো টাকা।

আট বছরে কত হয়, সেটা হিসাব কর এবার।

এগারো ইনটু বারো ইনটু আট—

মোটমাট কত বল, ইনটু কেন?

শঙ্কর পুনরায় মনে মনে হিসাব শুরু করিল।

এক হাজার ছাপ্পান্ন টাকা।

মোটে! অথচ আমার নিজের অংশেই যে বিষয় রয়েছে, পৈতৃক নয়, মায়ের দিক থেকে পেয়েছি আমি, তার দামই অন্তত তিন হাজার টাকা। আমি অবশ্য সে বিষয়টা বন্ধক দিয়ে আমার গোয়াবাগানের সেই বন্ধুটির কাছ থেকে শ-পাঁচেক টাকা নিয়েছি, তবু তো আড়াই হাজার টাকা থাকে। ভণ্টু মাসে মাসে কিছু কিছু দিয়ে পাঁচশো টাকা শোধ করে ফেলে বিষয়টা নিয়ে নিক, ওর নামে আমি লেখাপড়া করে দিচ্ছি। আমাকে রেহাই দিক, এসব কচকচি আমার ভালোই লাগে না।

এ রকম ব্যবস্থা করতে চাচ্ছেন কেন আপনি?

নিজের বিবেকের কাছ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে! ভণ্টু কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছে। আমি তার কাকা—আর তা ছাড়া, স্নেহও করি আমি ওকে, আমার উচিত তার কিছু ভার লাঘব করা। কিন্তু তুমিই তো হিসেব করে দেখলে ভাই, বর্তমান বাজারে ওই এক হাজার ছাপ্পান্ন টাকার বেশি সাহায্য করা আমার সাধ্যাতীত—তাও যদি আমি ত্রিশ টাকার মাইনের একটা চাকরি পাই এবং এক-নাগাড়ে আট বছর খাটতে পারি। তার চেয়ে অত হাঙ্গামার দরকার কি, আমার মামার বাড়ির তরফ থেকে যে বিষয়টুকু আমি পেয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, নিয়ে আমায় রেহাই দাও। মাসে মাসে কিছু ফেলে দিলেই পাঁচশো টাকা দেখতে দেখতে শোধ হয়ে যাবে, তখন তিন হাজার টাকার বিষয় স্বচ্ছন্দে ভোগ কর না তুমি।

মামার বাড়ির বিষয়টা কি আপনার একার?

নিশ্চয়ই। ভণ্টুর বাপ আর আমি তো সহোদর ভাই নই, বৈমাত্রেয় ভাই। আমার মায়ের বিষয় আমি পেয়েছি; ওতে আর কারও হক্ নেই। দাদামশাই ওটা মাকে দিয়েছিলেন আলাদা করে।

কোথায় আছে বিষয়টা?

আমার মামার বাড়িতে—হুগলি থেকে কিছুদুর ইন্‌টিরিয়রে।

ভণ্টু কি বলছে?

ওসব হাঙ্গামার মধ্যে আমি যেতে চাই না। এতে হাঙ্গামাটা কি, তুমি বল তো ভাই।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, আপনিই বা অত জোর-জবরদস্তি করছেন কেন?

ওই যে বললাম, নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়তে পারি তা হলে। একটা পিছুটান থাকলে তো ধর্মে কর্মে মন বসে না। হরিদ্বারে দিব্যি একটা আস্তানা পেয়েছিলাম, কোথাও কিছু নেই এক স্বপ্ন দেখে বসলাম। স্বপ্নের দোষ নেই, কর্তব্যে খুঁত ছিল, স্বপ্নে তার আভাস পেলাম। ফিরে আসতে হল। এবার ভাবছি, কর্তব্যের জড় মেরে তবে বেরুব। কিন্তু ভণ্টু বাগড়া লাগাচ্ছে। হিসেব-টিসেব তুমি তো দেখলে ভাই, একটু বুঝিয়ে বলো তাকে।

আচ্ছা।

শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। মনে মনে সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। মুক্তানন্দও উঠিলেন এবং পুনরায় বলিলেন, ভণ্টুর মাথায় গোবর পোরা, হিসেব-টিসেব ও কিছু বোঝে না, তুমি একটু ভালো করে বুঝিয়ে দাও ভাই। তোমার সঙ্গে আবার কখন দেখা হবে, বল তো?

কোথায় আছেন আপনি?

আমি আছি গোয়াবাগানেই। ভণ্টুর ওখানে উঠিনি, দাদা আমাকে দেখলে বড় বিচলিত হয়ে পড়েন, তা ছাড়া ওদের টানাটানির সংসার, আমি গেলে বাড়তি একটা খরচ হবে তো। তার চেয়ে বিনোদের বাসাতেই আছি ভালো। দুজনেই একতন্ত্রের লোক।

বিনোদবাবুও কি সন্ন্যাসী?

না, ঠাকুর তাকে ঘরে থেকেই সাধনা করতে আদেশ দিয়েছেন। তেল মাখতে মানা খালি—

শঙ্কর অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। বলিল, আমি তা হলে চলি এবার!

এস।

রাত্রি আটটা হইবে। শঙ্কর গিয়া দেখিল, মুক্তো নিজের ঘরে নাই। শুনিল আঙুরের ঘরে একজন বড়লোক বাবু বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন। সেখানে আমোদের এবং মদের স্রোত বহিতেছে। তাঁহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য দশ-বারোজন নর্তকীর প্রয়োজন হওয়াতে পাড়ার যত নাচনেওয়ালি সেখানে আহূত হইয়াছে। মুক্তোও সেখানে আছে। সংবাদটি দিয়া কালোজাম বলিল, আপনি বসুন, আমি খবর দিচ্ছি তাকে।

শঙ্কর অনুভব করিল, খবর দিলে মুক্তো আসিবে না। বলিল, আঙুরের ঘর কত দূর এখান থেকে, চলুন না, সেইখানেই যাওয়া যাক।

কালোজামকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া শঙ্কর বলিল, আমাকে সেখানে যেতে দেবে না?

কালোজাম মুচকি হাসিয়া বলিল, ওদের কারুর এখন মানা করবার ক্ষমতা নেই, চারটে থেকে ক্রমাগত মদ খাচ্ছে সবাই। তবে পরের ঘরে বিনা নেমন্তন্নে যাওয়াটা ঠিক নয়।

মুক্তো কি করছে, একবার দেখতে ইচ্ছা করছে ভারি।

দেখাতে আমি পারি। জানালা খোলা আছে, ওদিকের ওই বারান্দার কোণটায় দাঁড়ালে সব দেখা যাবে। আসুন তা হলে চুপিচুপি।

চুপিচুপি! শঙ্করের আত্মসম্মানে একটু যেন আঘাত লাগিল। কিন্তু ইহা লইয়া অধিক বিশ্লেষণ করিবার সময় ছিল না। কালোজাম বলিল, আসুন!

সে অনুসরণ করিল।

কালোজাম তাহাকে লম্বা সরুগোছের বারান্দার একটা অন্ধকার কোণে লইয়া গিয়া একটা

খালি উপুড়-করা কেরোসিন-কাঠের বাক্স দেখাইয়া বলিল বসুন তাহলে এইখানে। র‍্যাপার দিয়ে পা-টাগুলো একটু ঢেকে বসুন। মশা কামড়াবে না হলে। জানালাটা বন্ধ হয়ে গেছে দেখছি দাঁড়ান, গিয়ে খুলে দিয়ে আসি।

কালোজাম চলিয়া গেল। নিটোল কালোজামের মতো এই মেয়েটির সহৃদয়তায় শঙ্কর মুগ্ধ হইল।

সামনে একটু ছোট উঠানের মতো, তাহার ও-পারেই আঙুরের ঘর। সেখান হইতে বাজনার আওয়াজ আসিতেছে। হার্মোনিয়ম ও বাঁয়া-তবলা পুরাদমে চলিতেছে। কালোজাম গিয়া আঙুরের ঘরে উঁকি দিতেই অভ্যর্থনাসূচক একটা হৈ-হৈ হল্লা উঠিল। কালোজাম ঘরে প্রবেশ করিল, এবং মিনিট-পাঁচেক পরে জানালাটা খুলিয়া গেল।

শঙ্কর সবিস্ময়ে দেখিল, মুক্তো নাচিতেছে। মাথার ওপর মদের গ্লাস রাখিয়া অপরূপ লীলায়িত ভঙ্গিতে সর্বাঙ্গ হিল্লোলিত করিয়া তবলার তালে তালে মুক্তো নাচিতেছে। বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া শঙ্কর চাহিয়া রহিল; মুক্তোর এমন রূপ তো সে দেখে নাই, কল্পনাও করে নাই। চক্ষু দুইটি আবেশময়, প্রতি অঙ্গ হইতে রূপ যেন উপচাইয়া পড়িতেছে। কয়েকটা মাতাল লুব্ধদৃষ্টিতে বসিয়া দেখিতেছে, একটা মোটাগোছের লোক মদ খাইতেছে, জড়িতস্বরে কি যেন বলিতেছে এবং নাচের তালে তালে বীভৎসভাবে গা দোলাইতেছে।

শঙ্কর আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া পড়িল। উঠিয়া সে কি করিত বলা যায় না; কিন্তু কালোজাম আসিয়া পড়িল এবং বলিল, চলুন, ভেতরেই বসবেন, এখানে যা মশা। মুক্তোকে চুপিচুপি বলে এসেছি, সে আসবে এখুনি।

শঙ্কর ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর কালোজামের পিছু পিছু আসিয়া মুক্তোর ঘরে প্রবেশ করিল।

কালোজাম বলিল, আপনি এইখানেই বসুন একটু, আমি যাই, আমার লোক এসেছে।

লোকে যেমন নির্বিকার ভাবে আপিস-ঘরে ঢোকে, তেমনিই নির্বিকার ভাবে কালোজাম নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। শঙ্কর বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল। মুক্তোর নাচ দেখিয়া সে কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

হঠাৎ আঙুরের ঘর হইতে একটা খুব হাসির হররা উঠিতেই শঙ্কর বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দ্রুতপদে গিয়া বারান্দার সেই অন্ধকার কোণটায় পুনরায় হাজির হইল! দেখিল মুক্তো নয়, আর একটি মেয়ে উঠিয়া নাচিতেছে। বীভৎস ভয়াবহ দৃশ্য! মেয়েটি আসন্নপ্রসবা। পুরুষের মতো মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া, পুরুষের জুতা পায়ে দিয়া নাচিতেছে। তাহার গালের হাড় উঁচু, চোখ দুইটা ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। এত মদ খাইয়াছে যে পা ঠিক রাখিতে পারিতেছে না, তথাপি নাচিতেছে, এবং তাহার নাচ দেখিয়া সকলে হো-হো করিয়া হাসিতেছে, মেয়েটিও হাসিতেছে। হঠাৎ শঙ্করের মাথায় যেন খুন চড়িয়া গেল। সে বারান্দা হইতে নামিয়া আঙুরের ঘরের দিকে যাইবে বলিয়া পা বাড়াইতেছে, এমন সময়ে মুক্তো আসিয়া দাঁড়াইল এবং হাত দুইটি প্রসারিত করিয়া পথরোধ করিয়া বলিল, ও-দিকে কোথা যাচ্ছেন? আমার ঘরে চলুন। এতদিন পরে আজ এলেন যে?

শঙ্করের আর প্রতিবাদ করিবার শক্তি রহিল না। মুক্তোকে কাছে পাইয়া আসন্নপ্রসবা-নর্তকী-

সমস্যার তীক্ষ্ণতা সহসা ভোঁতা হইয়া গেল, মুক্তোর পিছু পিছু সে মুক্তোর ঘরে আসিয়া হাজির হইল।

মুক্তো আঁচলের ভিতর হইতে এক ডিশ মেটেচচ্চড়ি বাহির করিয়া বলিল, খান।

শঙ্কর স্থিরদৃষ্টিতে মুক্তোর পানে চাহিয়া রহিল। মুক্তো মদ খাইয়াছে, চোখ মুখ লাল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। চোখে মুখে অপূর্ব এক মদির প্রাখর্য!

নিন, এইগুলো খান!

শঙ্কর বলিল, খিদে নেই।

তবু খান।

খেতে আমি আসিনি, আমি এসেছি তোমার কাছে। সম্ভব হলে এই নরক থেকে তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাব আমি।

ভ্রূভঙ্গি করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া মুক্তো বলিল, নরক!

নরক নয় তো কি?

আস্পর্ধা তো কম নয় আপনার! এ নরকে এসে আমাদের উপকার করবার জন্য কে পায়ে ধরে সেধেছিল আপনাকে, শুনি? কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল? নরক! আপনাদের সগ্‌গে আপনারাই থাকুন গিয়ে, আমরা সেখানে যেতে চাই না, সেখান থেকে পালিয়ে বেঁচেছি আমরা।

মুক্তোর চোখ মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, শঙ্কর নির্বাক হইয়া রহিল।

নিন, খান।

খাব না।

আশ্চর্য লোক আপনি। এই সেদিন ইনিয়ে-বিনিয়ে বলেছিলেন—তোমায় ভালোবাসি মুক্তো। আজ বলছেন—এখানটা নরক। এত বাজে কথাও বলতে পারেন আপনারা!

সত্যি তোমাকে ভালোবাসি।

সত্যি?

ফিক করিয়া মুক্তো হাসিল এবং বলিল, তা হলে খান এগুলো।

আমি খাব না।

লক্ষ্মীটি।

অতিশয় স্নেহভরে গায়ে মাথায় হাত দিয়া মুক্তো শঙ্করকে বিছানায় বসাইল এবং নিজে মেঝেতে বসিয়া খাইবার জন্য তাহাকে সাধ্যসাধনা করিতে লাগিল, মা যেমন অবাধ্য ছেলেকে ভুলাইয়া খাওয়ায়।

শঙ্কর বলিল, আমাকে তুমি ভালোবাস না? সত্যি করে বল তো?

খান আগে, তারপর বলছি।

শঙ্কর আর প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না, খাইতে লাগিল।

খাওয়া শেষ হইতেই মুক্তো উঠিয়া পড়িল। বলিল, আমি যাই এবার ও-ঘরে।

না, ওখানে যেতে দেব না আমি।

সে কি হয়? টাকা নিয়েছি—

টাকা ফেরত দাও, এই নাও।

পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া শঙ্কর মুক্তোর হাতে দিল। মুক্তো স্মিতমুখে নোটগুলি গনিয়া দেখিতেছিল—শঙ্কর বাধা দিয়া বলিল, আমাকে ভালোবাস কি না বল আগে।

সত্যি কথা শুনবেন?

বল।

মুচকি হাসিয়া মুক্তো বলিল, একটুও না। আপনার মতো গঙ্গাজলমার্কা ছেলে দেখলে আমার গায়ে জ্বর আসে।

তবে আমাকে আসতে দাও কেন?

ভদ্রতার খাতিরে। অত সগ্‌গ-নরক বিচার করে যারা তাদের আমরা ভালোবাসতে পারি না। আপনারা জাপানি ফানুস, দুদিন একদিনই দেখতে বেশ।

তাহার পর নোটগুলি গনিয়া বলিল, এ কটা টাকায় আমার কি হবে? ওদের সাতদিন মাইফেল চলবে, একশো টাকা অগ্রিম দিয়েছে, বকশিশটা-আশটাও মিটবে। নিন আপনার টাকা, আপনি বাড়ি যান। গরিবের ছেলের এসব ঘোড়ারোগ কেন বাপু? সোন্দর দেখে বিয়ে করলেই পারেন একটা। মুখ টিপিয়া হাসিয়া কোমর দোলাইয়া মুক্তো বাহির হইয়া গেল। শঙ্কর বজ্রাহতবৎ বসিয়া রহিল।

মুক্তো ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল বটে, কিন্তু চলিয়া গেল না। বারান্দায় দাঁড়াইয়া জানালার ফুটা দিয়া শঙ্করকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। শঙ্কর কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো বসিয়া থাকিয়া যখন উঠিয়া বাহির হইয়া গেল, মুক্তোর ইচ্ছা করিতে লাগিল, তাহাকে ডাকিয়া ফিরায়! কিন্তু পর-মুহূর্তেই সে ছুটিয়া চলিয়া গেল এবং আঙুরের ঘরে ঢুকিয়া বলিল, এইবার নতুন ধরনের নাচ দেখাব একটা, তিনটে গেলাস চাই, মাথায় একটা নেব, দু হাতে দুটো।

এই নতুন প্রস্তাবে বাবুরা হৈ-হৈ করিয়া উঠিলেন।

মুক্তো পুনরায় নাচ শুরু করিল।

শঙ্কর ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিল, একটু দূরে ওরিজিনাল দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। শঙ্করকে দেখিয়া তিনি নীচের ঠোঁট দিয়া উপরের ঠোঁটটাকে চাপিয়া চক্ষু দুইটি ছোট করিলেন এবং তাহার পর গরম-জামার বুক-পকেট হইতে একটা বৃহদাকৃতি নিকেলের ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন দশটা বাজিয়া দশ মিনিট হইয়াছে। তাঁহার নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিল, ওষ্ঠাধরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী গোঁফ-দাড়ি অন্তর্নিরুদ্ধ আলোড়নে সংক্ষুব্ধ হইল, মনে হইল, যেন এখনই বোমার মতো সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া পড়িবেন; কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না। এই নাবালকটার সহিত বিতণ্ডা করিয়া নিজের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন করিবার ইচ্ছা তাঁহার হইল না। শঙ্করের প্রতি একটা অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া তিনি সোজা মুক্তোর ঘরে ঢুকিয়া গেলেন এবং সশব্দে কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন।

উদ্‌ভ্রান্ত শঙ্কর ফুটপাথের ওপর দিয়া দ্রুতপদে হাঁটিতেছিল। অপমানে, অক্ষমতায়, বিরাগে, অনুরাগে, হতাশায়, ক্ষোভে তাহার সমস্ত অন্তঃকরণে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তাহার ভাষা নাই। মুক্তো তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু মুক্তোকে তো মন হইতে সে তাড়াইতে পারিতেছে না। সেই নৃত্যপরা তন্বীকে—

মেমসায়েব আপনাকে ডাকছেন।

শঙ্কর থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

মেমসায়েব? কোন্ মেমসায়েব?

ওই যে গাড়িতে বসে রয়েছেন।

শঙ্কর দেখিল, রাস্তার ওপারে একটি মোটরকার দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নিকটে যাইতেই শৈল জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, এস শঙ্করদা, তুমি এমন সময়ে এখানে যে?

শঙ্কর একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, এমনিই ঘুরে বেড়াচ্ছি। তুই এখানে হঠাৎ?

আমি থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম, বাড়ি ফিরতে ফিরতে হঠাৎ তোমাকে দেখতে পেলাম, তাই ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললাম। তুমিও থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলে নাকি?

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, ঠিক ধরেছিস তো! তোর কাছে ফাঁকি দেওয়া শক্ত।

আহা!

সহাস্য সকোপ কটাক্ষে চাহিয়া শৈল ভ্রূলতা আকুঞ্চিত করিল। তাহার পর বলিল, চল, তোমাকে হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে যাই। এই রাত্তিরে ঠাণ্ডায় অতটা দূর হেঁটে যেতে হবে তো আবার!

হাঁটা আমার খুব অভ্যেস আছে, তুই যা।

অতটা অহঙ্কার ভালো নয়, এস।

তুই যা না।

এস বলছি, ভালো হবে না।

শঙ্কর গাড়িতে না উঠিয়া পারিল না, উঠিয়া গিয়া শৈলর পাশে বসিল এবং ড্রাইভারকে হস্টেলের ঠিকনাটা বলিয়া দিল। শৈল বলিল, 'শিরিফরহাদ' কেমন লাগে?

চমৎকার!

বড্ড আজগুবি কিন্তু!

এটা শৈলর মুখের কথা। আসলে সে 'শিরিফরহাদ' দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শৈল বলিল, রাগ করেছ আমার ওপর কেন বল তো?

বিস্মিত শঙ্কর বলিল, রাগ করব কেন?

নিশ্চয় রাগ করেছ, একবারও তো যাও না আজকাল। আমি কেমন এস্রাজ বাজাতে শিখেছি, তোমায় শোনাতে ভারি ইচ্ছে করে, কিন্তু তুমি তো আজকাল যাওয়াই ছেড়েছ। কেন যাও না শঙ্করদা, একবারটি গেলে পড়ার কি এমন ক্ষতি হয় বল তো?

রিনির কথা শৈলর মনে পড়িল, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই সে প্রসঙ্গ সে তুলিল না।

শঙ্কর বলিল, যাব একদিন।

তোমাকে চিনি না আমি, যাবে না তা আমি জানি।

হস্টেলের নিকট গাড়ি থামিল।

শঙ্কর নামিতে নামিতে বলিল, ঠিক যাব।

কবে?

উত্তরের জন্য শৈল সাগ্রহে শঙ্করের মুখের পানে চাহিল।

তা ঠিক বলতে পারি না এখন।

শৈল কেমন যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সে প্রত্যাশা করিয়াছিল আগেকার মতো

শঙ্করদা বলিবে, কালই যাব নিশ্চয় এবং তাহার নিশ্চয়তার অনিশ্চয়তা লইয়া শৈল তাহাকে একটু ঠাট্টা করিবে। কিন্তু শঙ্করদা বেশ ওজন করিয়া কথা বলিতে শিখিয়াছে। আগে তো শঙ্করদা এমন ছিল না!

এস একদিন, বুঝলে?

যাব।

গাড়ি চলিয়া গেল।

শঙ্কর পিছনের লাল বাতিটার পানে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুদূর গিয়াই গাড়ি মোড় ফিরিল। শঙ্কর তবুও দাঁড়াইয়া রহিল। নির্জন পিচ-ঢালা রাস্তাটা রহস্যময় ভাষায় তাহাকে কি যেন বলিবার চেষ্টা করিতেছে।

।। এগারো ।।

রাজমহলে মুকুজ্জেমশাই তাঁহার স্বাভাবিক রীতি-অনুযায়ী একদল ছেলে জুটাইয়া খেলায় মত্ত ছিলেন। এ খেলাটা অবশ্য বাঘ-বকরি নয়, কলসী-ভাঙা খেলা। বাঘ-বকরি অপেক্ষা অধিক উত্তেজনাজনক। মাঠের মাঝে একটি খালি কলসী উপুড় করিয়া রাখা হইয়াছে। এক-একটি বালকের চোখে কাপড় বাঁধিয়া তাহাকে বেশ দুই-চারি পাক ঘুরাইয়া তাহার হাতে একটি লাঠি দেওয়া হইতেছে। চোখ বাঁধা অবস্থায় যদি সে কলসীটিকে গিয়া লাঠির ঘায়ে ভাঙিতে পারে, তাহাকে নগদ এক টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে—মুকুজ্জেমশাই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং বেশ একদল বালক জুটিয়া জটলা করিতেছে। মুকুজ্জেমশাই এক একজনের চোখ বাঁধিয়া ছাড়িতেছেন এবং বসিয়া বসিয়া মজা দেখিতেছেন। কেহ ঠিক বিপরীত মুখে চলিয়া যাইতেছে, কেহ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া কেবল ইতস্তত করিতেছে, কেহ কলসীর পাশ ঘেঁষিয়া চলিয়া যাইতেছে, কেহ বারম্বার দিক পরিবর্তন করিতেছে, কেহ অভিযোগ করিতেছে যে চোখ বড় বেশি জোরে বাঁধা হইয়াছে, —নানা বালক নানা রকম করিতেছে, কিন্তু কেহই কলসী ভাঙিতে পারিতেছে না। মুকুজ্জেমশাই হাসিতেছেন।

একে একে অনেকগুলি বালকই চেষ্টা করিল কিন্তু কেহই লক্ষ্যভেদ করিতে পারিল না। পারিলে মুকুজ্জেমশাইয়ের পক্ষে ভালো হইত, এক টাকার বেশি খরচ হইত না। কিন্তু সকলেই ব্যর্থমনোরথ হওয়াতে সকলকে সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়োজন মুকুজ্জেমশাই অনুভব করিলেন এবং নিকটেই একটি ময়রার দোকান থাকায় তাহা অসম্ভবও হইল না।

মোট কথা, মহানন্দে খেলা-পর্ব শেষ হইয়া গেল।

মুকুজ্জেমশাই যে বাড়িটাতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই বাড়িরই সম্মুখে অবস্থিত খোলা মাঠটাতে এই সব হইতেছিল। মুকুজ্জেমশাই বাসায় ঢুকিতে যাইবেন, এমন সময় দুই-তিনটি বালক আসিয়া তাঁহাকে ধরিল যে, আজ কিছুতেই তাঁহার যাওয়া হইবে না। গতকল্য ক্লিওপেট্রার যে গল্পটা রাত্রে তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেটা শেষ করিয়া যাইতে হইবে।

মুকুজ্জেমশাই হাসিয়া বলিলেন, আজ আমাকে যেতেই হবে, উপায় নেই।

তবে আপনি গল্প আরম্ভ করলেন কেন?

অত্যন্ত অভিমান-ভরে আট-নয় বছরের একটি বালক ঠোঁট ফুলাইল। মুকুজ্জেমশাই ভারি বিপদে পড়িয়া গেলেন। অবশেষে বলিলেন, আচ্ছা, আমি গিয়েই একটা ভালো বই পাঠিয়ে দেব তোমাদের। তাতে ক্লিওপেট্রার গল্প আছে, আরও অনেক ভালো গল্প আছে।

পরশুদিন সেই জাহাজ-ডুবির গল্পটা বললেন, সেটাও আছে?

ওটা তো গল্প নয়, সত্যি কথা।

না, আপনি আজকের দিনটি খালি থেকে যান।

কলকাতায় আমার বড্ড দরকার আছে যে কাল। না গিয়ে উপায় নেই। তা না হলে তোমাদের ছেড়ে কি আমার যেতে ইচ্ছে করছে কলকাতার সেই ভিড়ে?

আবার কবে আসবেন আপনি?

আবার শিগ্‌গিরই আসব।

কথাটা বলিয়াই মুকুজ্জেমশাইয়ের মনে পড়িল, সেবার অর্থাৎ প্রায় বৎসরখানেক পূর্বে তিনি সাহেবগঞ্জে গিয়াছিলেন, তখনও একদল বালক-সঙ্গী তাঁহার জুটিয়াছিল এবং আসিবার সময় তাহাদেরও তিনি আশ্বাস দিয়া আসিয়া ছিলেন যে শীঘ্রই ফিরিবেন। কর্মের আবর্তে পড়িয়া তাহাদেরও বিস্মৃতই হইয়াছেন, যাওয়া দূরের কথা।

তথাপি তিনি হাসিয়া আবার বলিলেন, শিগ্‌গিরই আসব আবার।

ছেলের দল ক্ষুব্ধ মনে চলিয়া গেল।

মুকুজ্জেমশাই বাসায় ঢুকিতেই মনোরমা আসিয়া দাঁড়াইল এবং শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল আজই তো আপনি যাবেন?

মুকুজ্জেমশাই স্মিতমুখে তাহার পানে একবার চাহিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। মনোরমা মুকুজ্জেমশাইয়ের এ হাসি চেনে, বুঝিল, আজই তিনি যাইবেন।

মনোরমার বয়স যদিও চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু দেখিয়া তাহা মনে হয় না। ছিপছিপে গড়নের চেহারা। এই বয়সে মেয়েরা সাধারণত একটু মোটা হয়, কিন্তু মনোরমা তাহাও হয় নাই, এখন সে তন্বী আছে। সৃষ্টিকর্তা মনোরমা-নির্মাণে অদ্ভুত সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। মনোরমার অঙ্গে কোথাও এতটুকু বাহুল্য নেই। ঠোঁট দুইটি এত পাতলা, দাঁতগুলি এত ক্ষুদ্র এবং সূক্ষ্মাগ্র, চোখ দুটি বড় বড় না হইয়াও এমন শ্রীসম্পন্ন, চিবুকটি ছোট হইয়াও এমন মানানসই, সমস্ত দেহটা লঘু হইয়াও এত লালিত্যময় যে, বিধাতাকে তারিফ না করিয়া পারা যায় না। কিন্তু এই তন্বী নারীটির সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া অদৃশ্য কি যেন একটা আছে, তাহার মুখের দিকে বেশিক্ষণ চাহিয়া থাকা যায় না, দৃষ্টি আপনিই ব্যাহত হইয়া আসে। সমস্ত মুখচ্ছবিতে যেন একটা নীরব নিষেধ লেখা রহিয়াছে। যেন বলিতেছে, এদিকে চাহিও না। তাহার পরিমিত আলাপে, শান্ত কণ্ঠস্বরে, ধীর গমন-ভঙ্গিমায় তাহার সম্বন্ধে ধারণা হয়, যে ধারণার প্রতিবাদ তাহার কঠিন মুখভাবে, সূক্ষ্ম নাসার সূক্ষ্মতর কম্পনে, দৃঢ়নিবদ্ধ পাতলা ঠোঁট দুইটিতে এবং সর্বোপরি তাহার কালো চোখের দৃষ্টিতে যেন মূর্ত হইয়া রহিয়াছে। শান্তকণ্ঠে তাহার মৃদু কথাগুলি শুনিলে মনে হয়, তাহার মনে কোনো ক্ষোভ বা অশান্তি নাই, কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিলেই বুঝিতে দেরি হয় না যে, প্রাণপণ শক্তিতে সে একটা বিরাট আর্তনাদের কণ্ঠ রোধ করিয়া রাখিয়াছে এবং অন্তরের এই নিদারুণ দ্বন্দ্বকে গোপন করিতে গিয়াই তাহার সমস্ত

শক্তি যেন নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। জোরে কথা কহিবার অথবা চলিবার ক্ষমতাও যেন আর অবশিষ্ট নাই। দৈনিক জীবনযাত্রার অনিবার্য প্রয়োজনে যদি বলিতে অথবা চলিতে না হইত সে নির্বাক নিশ্চল হইয়া নির্জনে বসিয়া থাকিত। কিন্তু সমাজে বাস করিতে হয়, সমাজ তো নির্জন নয়।

বালবিধবা মনোরমাকে তাই চলিতে হয়, বলিতে হয়, কাজকর্ম করিতে হয়। কিন্তু সে এত সংক্ষিপ্ততার সহিত এগুলি করে যে, দেখিলে বিস্ময় জন্মে। তাহাকে দেখিলেই মনে হয়, সঙ্গোপনে কি একটা গোপন বেদনাকে সে সর্বদা পালন করিতেছে এবং পাছে কেহ তাহা বুঝিতে পারে—এই আশঙ্কায় নিরুদ্বেগের একটা মুখোশ পরিয়া আছে। তাই কেহ তাহাকে নিরীক্ষণ করিলে সে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে, তাহার চেখে মুখে এমন একটা জ্বালা প্রকটিত হইয়া উঠে, দর্শককে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে হয়।

মনোরমার জীবন দুঃখময়। সেই কবে, কতদিন আগে বাল্যকালে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের রাত্রে শুভদৃষ্টির সময় সে কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিতে পারে নাই, ফুলশয্যার রাত্রেও লজ্জায় বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়াছিল। তাহার পর আর স্বামীর সহিত দেখা হইবার সুযোগ হয় নাই। তিনি ব্যারিস্টারি পড়িতে বিলাতে গিয়াছিলেন, ফিরিবার পথে জাহাজডুবি হইয়া মারা গিয়াছেন। স্বামীর মুখ মনোরমার মনে নাই। যখন বিবাহ হইয়াছিল, কতই-বা তাহার বয়স! দশ বৎসরও নয়। হিন্দু-বিধবাজীবনের নিষ্ঠুর নিষ্ঠার চাপেও কিন্তু মনোরমার যৌবন নিষ্পিষ্ট হইয়া যায় নাই, এবং যায় নাই বলিয়াই সমাজের চক্ষে সে পতিতা। কিন্তু কাগজে যাহা বাহির হইয়াছিল, তাহা ঠিক নয়। গুণ্ডায় তাহাকে হরণ করে নাই। সে স্বেচ্ছায় তারাপদর সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছিল। মনোরমা তারাপদকে সত্যই ভালোবাসিয়াছিল এবং আত্মীয়স্বজনেরা যদি পুলিশের হাঙ্গামা না তুলিতেন, হয়তো তারাপদর সঙ্গেই তাহার জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইত! (যাইত কি?—মাঝে মাঝে এখন তাহার নিজেরই সন্দেহ হয়।) পুলিশের ভয়ে তারাপদ অন্তর্ধান করিল। আত্মীয়স্বজনেরা মনোরমাকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন; কিন্তু ক্ষমা করিলেন না। পদস্খলিতাকে ক্ষমা করা আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ। তবু বাপ মা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন মনোরমা সংসারের মধ্যে কোনো রকমে টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছিল। বাপ-মার মৃত্যুর পর তাহাও অসম্ভব হইয়া উঠিল। ভাইদের সংসারে ভ্রাতৃজায়াদের গঞ্জনা সহ্য করিয়াও হয়তো মনোরমা ভিটা আঁকড়াইয়া কোনোক্রমে পড়িয়া থাকিতে পারিত; কিন্তু যখন সে শুনিল যে, সে থাকাতে তাহার ভাইঝিদের বিবাহ হইতেছে না, তাহার অতীত কলঙ্কটা তাহাকে ঘিরিয়া এখনও সজীব হইয়া আছে এবং তাহাদের বিবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে, তখন সে আবার পথে বাহির হইয়া পড়িল। ঠিক করিল, দুই চক্ষু যেখানে লইয়া যায় সেখানেই সে চলিয়া যাইবে, দাসীবৃত্তি করিয়া জীবনযাপন করিবে, ভাইদের সংসারে আর থাকিবে না। যৌবন তখনও অটুট ছিল, দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মতো রূপও ছিল, কাশীধামে উপনীত হইয়া মনোরমা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, তাহাকে আশ্রয় দিবার জন্য একাধিক ব্যক্তি আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। দুইজন গুণ্ডা গোছের লোক, একটি বিপত্নীক কাশীবাসী প্রৌঢ় এবং গুটিচারেক ছোকরার বলবিক্রম-দরদ-অনুরোধ-ইঙ্গিতের আবর্তে পড়িয়া সে যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সহসা মুকুজ্জেমশাই আসিয়া দেখা দিলেন।

মুকুজ্জেমশাই লোকটি কে, কেন তাহার উদ্ধার সাধন করিতে চাহিতেছেন, কি করিয়া তাহার খবর পাইলেন, মনোরমা কিছুই জানিত না। তিনি আসিয়া বলিলেন, শুনলাম তুমি বিপদে পড়েছ, যদি আমার সঙ্গে আসতে চাও আসতে পার।

মুকুজ্জেমশাইয়ের চোখে মুখে কথায় বার্তায় মনোরমা কি দেখিল তাহা মনোরমাই জানে, সে নির্ভয়ে রাজি হইয়া গেল। কেবল বলিল, আমাকে নিয়ে আপনি কোথায় যাবেন?

তা এখনও ঠিক করিনি। আমি কোথাও বেশি দিন থাকি না। তবে তোমাকে ভালোভাবে রাখার বন্দোবস্ত করব কোথাও না কোথাও।

সেই হইতে মনোরমা মুকুজ্জেমশাইয়ের আশ্রয়ে আছে এবং এ যাবৎ যত পুরুষের সংস্রবে তাহাকে আসিতে হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই মুকুজ্জেমশাই-ই একমাত্র লোক, যিনি তাহার রূপ যৌবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার; তাহার ভরণপোষণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেছেন, ভদ্র পরিবারে তাহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, সর্বপ্রকার অসুবিধা দূর করিবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট—কিন্তু কখনও তাহার দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া মনোরমার মনে পড়ে না। প্রায় বারো-তেরো বৎসর মুকুজ্জেমশাইয়ের আশ্রয়ে; কিন্তু মুকুজ্জেমশাই সেই একরকম—সৌম্যমূর্তি সদাহাস্যমুখ, কর্তব্যপরায়ণ, পরোপকারী, সদাচঞ্চল ব্যক্তি।

ধীরপদে ঘরে প্রবেশ করিয়া মনোরমা দেখিল, মুকুজ্জেমশাই নিজের জিনিসপত্র গুছাইয়া লইতেছেন।

শান্তস্বরে প্রশ্ন করিল, খাবার এনে দিই তা হলে!

এবেলা আর খাব না, খিদে নেই, ওবেলাই যা খাওয়া হয়েছে তা হজম হয়নি এখনও।

মুকুজ্জেমশাইয়ের মুখখানি হাসিতে উদ্ভাসিত হইল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মনোরমা পুনরায় প্রশ্ন করিল, মোকদ্দমার কি বুঝলেন? ভবেশবাবুর স্ত্রী জিজ্ঞেস করতে বললেন।

ভবেশ ছাড়া পাবে।

মুকুজ্জেমশাই পুঁটুলি বাঁধিতে লাগিলেন, মনোরমা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পরে ইতস্তত করিয়া মনোরমা পুনরায় আর একটি প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, ওঘরে কাল যে জাহাজডুবির গল্পটা বলছিলেন, সেটা কি সত্য?

মুকুজ্জেমশাই চকিত দৃষ্টিতে মনোরমার মুখের পানে চাহিয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন, তুমি কি করে শুনলে?

আমি বারান্দায় ছিলাম। ওটা গল্প না, সত্যি।

মুকুজ্জেমশাই ক্ষণকাল নীরবে মনোরমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, সে কথা জেনে তোমার লাভ?

মনোরমা কিছু না বলিয়া আনতচক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল। মুকুজ্জেমশাই হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, কেন জানতে চাইছ, বল না।

এমনই।

উত্তর না দিয়া মুকুজ্জেমশাই আর একটু হাসিলেন, বলিলেন, এবারে যেতে হবে, ট্রেনের বেশি সময় নেই। ভবেশের স্ত্রীকে ডাক।

মনোরমার দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠাধর সামান্য যেন একটু কম্পিত হইল, সে কিন্তু কিছু বলিল না।

মুকুজ্জেমশাইকে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেল। একটু পরে অবগুণ্ঠনবতী একটি বধূ আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া মুকুজ্জেমশাইকে প্রণাম করিল।

কোনো ভয় নেই মা, ভবেশ ঠিক ছাড়া পাবে।

মুকুজ্জেমশাই বাহির হইয়া গেলেন।

।। বারো ।।

গতকল্য শঙ্করের নামে যে মাসিক পত্রিকাটি আসিয়াছিল, তাহাই সে একা বসিয়া পড়িতেছিল। নিজের লেখাটাই বার বার করিয়া পড়িতেছিল। ছাপার অক্ষরে নিজের প্রথম রচনা । অনেকদিন আগের লেখা একটা কবিতা। সোনাদিদির কথা মনে পড়িল। সোনাদিদিই লেখাটা কাগজে পাঠাইয়াছিলেন। কবিতাটি রিনির উদ্দেশ্যে লেখা, কিন্তু লাইনগুলোর ফাঁকে ফাঁকে সোনাদিদির মুখখানা যেন উঁকি দিয়া যাইতেছে। সেদিনের কথাটা শঙ্করের মনে পড়িল, যেদিন সে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া মিষ্টিদিদি এবং সোনাদিদির শরণাপন্ন হইয়াছিল। সলজ্জ স্নিগ্ধ সংযতশ্রী রিনির মুখখানি এখনও মনে আঁকা রহিয়াছে, একটুও মলিন হয় নাই। মনের যে সুনিভৃত মণিকোঠায় বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য ছবিগুলি টাঙানো থাকে, রিনির ছবিও সেইখানে টাঙানো রহিয়াছে। রিনির নিকট হইতে কতটুকু বা সে পাইয়াছে, কিন্তু অজ্ঞাতসারে সেইটুকুই সুন্দর করিয়া কখন যে তাহার মন সাজাইয়া রাখিয়াছে, তাহা সে এতদিন জানিতেই পারে নাই। স্মৃতিপটে অঙ্কিত রিনির আলেখ্যের পানে চাহিয়া শঙ্কর একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। রিনির জন্য মন তার উন্মুখ নহে, উন্মুখ হইবার অধিকার তাহার নাই এবং সেজন্য দুঃখও আর নাই। মাঝে মাঝে তাহার মনে হয়, ভালোই হইয়াছে। নিজের যে পরিচয় সে ক্রমশ পাইতেছে তাহাতে মনে হয়, রিনিকে সে সুখী করিতে পারিত না। তাহার মনের কলুষ একদিন না একদিন আত্মপ্রকাশ করিয়া সমস্ত গ্লানিময় করিয়া তুলিতই। কলুষ তাহারই মনের মধ্যে ছিল, এখনও আছে। মিষ্টিদিদি উপলক্ষ মাত্র। তিনি না থাকিলেও অন্য উপায়ে ইহা ঘটিত। রিনি নষ্ট হইয়া যাইত, রিনির সম্বন্ধে তাহার স্বপ্নটাও ভাঙিয়া যাইত, বাস্তবের রূঢ় আঘাত সে সহ্য করিতে পারিত না।

বাস্তবের রূঢ় আঘাত সহ্য করিয়াও আনন্দের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া থাকিতে পারে মুক্তো। শঙ্করের মাংসলোলুপ অথচ স্বপ্নবিলাসী মনকে আশ্রয় দিতে পারে সে-ই। অপর কাহারও পক্ষে, বিশেষত ভদ্রঘরের সুনীতি-শৃঙ্খলিত সভ্য রমণীর পক্ষে তাহা অসম্ভব। কোনো ভদ্রমনা নারীই পশুটাকে সহ্য করিতে পারে না, অন্তত না পারার ভান করে। মুক্তোর পশু লইয়াই কারবার, সুতরাং সে বিষয়ে কোনোরূপ ভণ্ডামি বা ছদ্মবেশ তাহার নাই। পশুদের হাটে নিজেকে সে নিলামে চড়াইয়া দিয়াছে, যে ক্রেতা সর্বোচ্চ মূল্য দিবে সে বিনা দ্বিধায় তাহারই নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। এই নিছক কেনা-বেচার অন্তরালেও কিন্তু একজন আছে, যাহাকে টাকা দিয়া কেনা যায় না, যাহাকে অনুভব করা যায় কিন্তু ধরা যায় না, তাহাকে ঘিরিয়াই শঙ্করের স্বপ্ন রঙিন হইয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর অন্যমনস্ক হইয়া পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিল, কি করিয়া বেশ কিছু টাকা জোগাড় করা যায়। এক-আধ শো টাকা নয়, বেশ কিছু মোটা টাকা,

যাহার বিনিময়ে সে মুক্তোকে পাইতে পারিবে। নিজের দৈন্যে নিজের উপরই তাহার ঘৃণা হইতে লাগিল। সামান্য টাকার জন্য এই অপমান, এই বঞ্চনা, এই আত্ম-অসম্মান। যেমন করিয়া হউক, উপার্জন করিতে হইবে, বড়লোক হইতে হইবে। অকারণে ফিজিক্স মুখস্থ করিয়া এম. এস-সি পাশ করার কোনো সার্থকতা নাই। ওরিজিনাল মূর্খ কিন্তু ধনী, সেইজন্যই মুক্তোর ওপর তাহার ন্যায্য অধিকার বেশি।

সহসা শঙ্করের মনে হইল, মুক্তো কি পড়িতে পারে? এই মাসিক-পত্রিকাটা তাহাকে দিয়া আসিলে কেমন হয়? এ কবিতা কি মুক্তো বুঝিতে পারিবে?

পিওন আসিয়া প্রবেশ করিল এবং দুইখানি চিঠি দিয়া গেল। দুইখানিই খামের চিঠি। একটি বেশ মোটা, হাতের লেখা দেখিয়াই শঙ্কর বুঝিল সুরমার চিঠি। ইদানীং অনেক দিন সে সুরমার কোনো চিঠি পায় নাই। দ্বিতীয় চিঠিখানি বাবার। বাবার চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল। সংক্ষিপ্ত চিঠি, প্রয়োজনীয় কথার বেশি আর কিছু নাই। লিখিয়াছেন, মা ভালো আছেন আজকাল, শঙ্কর আগামী মাসে যেন একবার বাড়ি আসে, তাহার বিবাহ-সংক্রান্ত কথাবার্তা তিনি শেষ করিয়া ফেলিতে চান। লিখিয়াছেন, তুমি এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিবে বলিয়াছিলে। আশা করি, এতদিন চিন্তা করিয়া একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছ এবং তাহা অসাধারণ কিছু নহে। আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয় শিরীষবাবুর কন্যার সহিত কথাবার্তা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। দেনা-পাওনার কথা এখনও অবশ্য কিছুই ঠিক হয় নাই। সে দিক দিয়া তাঁহাদের তরফে যদি কোনো বাধা না ওঠে, তাহা হইলে অন্য কোনো আপত্তির কারণ দেখিতে পাইতেছি না। যতদূর শুনিয়াছি এবং ফোটোতে যতদূর দেখিয়াছি, মেয়েটি সুশ্রী। তুমি যদি ইচ্ছা কর, পাত্রীটিকে দেখিয়া আসিতে পার। কলিকাতাতেই তাহারা থাকে। তোমার পত্র পাইলে শিরীষবাবুকে লিখিব, তোমার সহিত দেখা করিয়া মেয়ে দেখার বন্দোবস্ত করিতে। তুমি আগামী মাসে নিশ্চয় একবার আসিবে।

শঙ্কর ড্রয়ার খুলিয়া একখানা পোস্টকার্ড বাহির করিল এবং তৎক্ষণাৎ লিখিয়া দিল যে, সে ঠিক করিয়াছে, বিবাহ করিবে না। ইহা লইয়া তাহাকে যেন আর অনুরোধ করা না হয়। বিবাহ করা তাহার পক্ষে এখন অসম্ভব। চিঠিখানা লিখিয়া চাকরটাকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ সেটা রাস্তার ডাকবাক্সে ফেলিয়া আসিতে বলিল। এক কাপ চা-ও ফরমাশ করিল।

সুরমার চিঠিটা খুলিতেই কতকগুলি ফোটো বাহির হইয়া পড়িল। নানা রকম ফোটো। একটা কুকুরের, একটা ফুলের, একটা ক্রন্দনাকুল একটি শিশুর, একটা মেঘের, একটা সমুদ্রের, আরও কয়েকটা নানা রকম প্রাকৃতিক দৃশ্য। সুরমা লিখিতেছি—

শঙ্করবাবু,

অনেকদিন পরে আপনাকে চিঠি লিখছি। অর্থাৎ আপনার চিঠিখানা পাওয়ার পর এতদিন কেটে গেছে যে, চিঠিখানাও আর খুঁজে পাচ্ছি না। খুঁজে পাচ্ছি না বলে যেন মনে করবেন না, যেখানে সেখানে অবহেলাভরে ফেলে রেখেছিলাম এবং অবশেষে তা ওয়েস্ট-পেপার-বাস্কেট বাহিত হয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে। মোটেই তা নয়। বরং পাছে হারিয়ে যায় এই ভয়ে অত্যধিক যত্ন করে সেটা রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু কোন্ অ্যাটাচিকেসের কোন্ পকেটে, কোন্ টেবিলের কোন্ ড্রয়ারে অথবা কোন্ বাক্সের কোন্ খোপে যে সেই সযত্নরক্ষিত চিঠিটি

আত্মগোপন করে রইল, উত্তর দেবার সময় কিছুতেই তা আবিষ্কার করা গেল না! তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। চিঠির উত্তরে আমরা যখন চিঠি লিখি, তখন সব সময়ে আমরা যে চিঠির উত্তরই লিখি তা নয়, উত্তর দেবার উপলক্ষ করে নিজের লিপিকুশলতা প্রকাশ করবার চেষ্টা করি। সব সময়ে তাতে প্রশ্নের উত্তর থাকে না, আবার অনেক সময় অজিজ্ঞাসিত প্রশ্নেরও অযাচিত উত্তর থাকে। কারও চিঠি পেলে মনে যে সাড়া জাগে, তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আমরা যা করি তাই তার উত্তর। অনেক সময় নীরবতাই হয় শ্রেষ্ঠ উত্তর। অনেক সময় আবার আসল উত্তরটাকে আড়াল করবার জন্যই অবান্তর বাগ্‌বিস্তার করতে হয়, অনেক সময় পাতার পর পাতা লিখলেও উত্তরটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না, আবার অনেক সময়—। কিন্তু এ আমি করছি কি! আপনি কবিমানুষ। আপনাকে এ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া যে নিউ-কাস্‌ল শহরে কয়লা বহন করার চেয়েও হাস্যকর। আপনি নিশ্চয়ই এতক্ষণ মুচকি মুচকি হাসছেন। ভাবছেন বোধহয়, এতদিন পরে চিঠির উত্তর এল—তাও আবোল-তাবোল?

সুতরাং আর নয়, ও-প্রসঙ্গ এইখানেই চাপা দিলাম। এতদিন আপনার চিঠির যে উত্তর দিইনি, তার প্রধান এবং একমাত্র কারণ এতক্ষণে বোধহয় বুঝতে পেরেছেন। ফোটোগ্রাফিতে আমাকে পেয়ে বসেছে। দিনরাত ওই নিয়েই আছি। দিনে যে ফোটো তুলি, রাত্রে ডেভেলপ করি। কয়েকটা নমুনা পাঠালাম, কেমন লাগল সত্যি করে জানাবেন তো? খুব কঠোর হয়ে বিচার করবেন না তা বলে। এই আমার প্রথম হাতে-খড়ি, সেটা মনে রাখবেন। ছোট ছেলেটির কান্নার ছবিটি কি খুব মিষ্টি, নয়? একটি পার্সী ভদ্রমহিলার ছেলে এটি। ভদ্রমহিলার সঙ্গে সম্প্রতি ভাব হয়েছে, বেশ মেয়েটি। রবীন্দ্রনাথের একজন গোঁড়া ভক্ত। ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রায় কণ্ঠস্থ। আপনার সেই কবিতাটিও ওঁকে অনুবাদ করে শুনিয়েছি, খুব ভালো লেগেছে ওঁর। ভালো কথা, আপনি কি কবিতা লেখা ছেড়েই দিলেন নাকি? কই কোনো লক্ষণই তো দেখতে পাই না! লিখলে নিশ্চয় কোথাও দেখতে পেতাম।

আপনার বন্ধুর কোনো খবর কি পেয়েছেন ইদানীং? আমি অনেকদিন কোনো খবর পাইনি। পত্রলেখক হিসাবে বোধহয় কোনোকালেই ওঁর প্রসিদ্ধি ছিল না। আপনিই ভালো বলতে পারবেন, কারণ আপনার বাল্যবন্ধু। আমার সঙ্গে পরিচয় যদিও অল্পদিনের (আমি তো আগন্তুক বললেই হয়), কিন্তু এই অল্প পরিচয় সত্ত্বেও এ কথাটা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, পত্রলেখক হিসাবে ওঁকে প্রথম শ্রেণীতে দূরের কথা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান দিতেও ইতস্তত করা উচিত। অত্যন্ত কাজের মানুষ অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যাল লোক যাঁরা, শুনেছি, অপব্যয় করবার মতো সময় নেই তাঁদের এবং যে চিঠি দু কথায় লেখা যায় তার জন্যে দুশো কথা লেখাটা অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে করেন তাঁরা। দুশো কথা একসঙ্গে লেখবার ক্ষমতা আছে কি না, সে প্রশ্ন না তুলেও এটা বোধহয় নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, দুশো কথা লেখবার ধৈর্য ওঁদের নেই। আপনার বন্ধুটির প্রথম প্রথম যা-ও বা একটু ধৈর্য ছিল, আজকাল তার থেকেও চ্যুত হয়েছেন তিনি। হয়তো পড়ার চাপ, নয়তো বা আর কিছু। অনেক সময় প্রহেলিকা বলে মনে হয়।

কবিরা এখনও নারীদেরই প্রহেলিকা বলে থাকেন, আমার মনে হয়, খুব সম্ভব সেটা প্রথার খাতিরে। এককালে হয়তো নারীরা সত্যই প্রহেলিকা ছিল এবং বিস্মিত পুরুষদের মন একদা তার সমাধানেই ব্যস্ত ছিল বলেই কাব্যে তার এত উল্লেখ দেখা যায়। যুগ যুগ ধরে পুরুষদের সম্মিলিত

চেষ্টার ফলে নারী কিন্তু আর প্রহেলিকা নেই, নারী-সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যাই তাঁরা সমাধান করেছেন। নারীদের ছলা-কলা হাব-ভাব লীলা-চাপল্য অর্থাৎ নাড়ি-নক্ষত্র আজকাল পুরুষজাতির নখদর্পণে। তবু কিন্তু পুরুষদের দৃষ্টির সম্মুখে এখনও নারীরা নিজেদের রহস্যময়ীরূপে প্রকট রাখবার চেষ্টা করেন, এবং আমার বিশ্বাস, পুরুষেরা জেনেশুনেও মুগ্ধ হবার ভান করেন। অর্থাৎ আজকাল বিজ্ঞান-মহিমায় প্রহেলিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রহসন। আপনারা তা দেখে যে হেসে লুটিয়ে পড়েন না, সেটা আপনাদেরই ঔদার্য, ভণ্ডামি বা সিভালরি—যাই বলুন। আমার বরং পুরুষদেরই প্রহেলিকা বলে মনে হয়, যদিও বিজ্ঞানের প্রকোপ আপনারাও এড়াতে পারেননি, এবং যদিও আমাদের ধারণা, আপনাদের চরিত্রের অনেকখানিই আমরা বুঝে ফেলেছি। আপনাদের আমরা সমস্ত বুঝে ফেলেছি—এই ধারণাই আরও বিভ্রান্ত করেছে আমাদের। আমাদের সম্পর্কে আপনাদের যতটুকু আমরা পাই, আপনাদেরই ততটুকুই হয়তো কিছু কিছু বুঝি আমরা; কিন্তু আমাদের আয়ত্তের বাইরে আপনাদের যে সত্তা, তার সঙ্গে আমাদের কিছুই পরিচয় নেই এবং সেই অপরিচয়ের অন্ধকারে সবজান্তার মতো চলতে যাই বলে পদে পদে হোঁচট খেতে হয়, এবং সেই হোঁচটের নানা মূর্তি নানা রূপে দেখা দেয়। কখনও মূর্ছা যাই, কখনও আত্মহত্যা করি, কখনও কবিতা লিখি, কখনও বা কোনো আন্দোলনে যোগদান করি। আমি ফটোগ্রাফ নিয়ে মেতেছি। কিন্তু ওই অপরিচয়ের অন্ধকারটাই যে লোভনীয়!

যাক। নিজের কথা নিয়েই অনেকক্ষণ বাগ্‌বিস্তার করলাম, আপনার কথা কিছুই জিজ্ঞেস করা হয়নি। মিষ্টিদিদির খবর অনেকদিন পাইনি। শৈল-ঠাকুরঝিও কোনো চিঠিপত্র দেন না। কেমন আছেন তাঁরা? রিনিদেবী কেমন আছেন? এখনও কি আপনি তাঁর পাঠাভ্যাসে সহায়তা করছেন নাকি? পুরুষদের মধ্যে যে অংশটুকু প্রহেলিকা নয়, কাচের মতো স্বচ্ছ এবং ভঙ্গুর যেটুকু, সেটুকুর সম্বন্ধে সচেতন করা বৃথা বলেই কিছু বললাম না। আশা করি, আপনি এবং রিনি উভয়েই নিরাপদে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন। অনেকক্ষণ ধরে বকছি, বিরক্ত হয়ে উঠেছেন বোধহয় এতক্ষণ। আমারও নতুন প্রিন্টগুলো শুকিয়েছে, তুলতে হবে এইবার। ফোটোগুলো কেমন লাগল জানাবেন। প্রীতি-সম্ভাষণ নিন। ইতি—সুরমা।

ভৃত্য চা দিয়া গেল এবং বলিল যে, নীচে কমন-রুমে এক ভদ্রলোক শঙ্করের সহিত দেখা করিবার জন্য আসিয়াছেন।

শঙ্কর বলিল, এইখানেই নিয়ে আয় ডেকে।

একটু পরেই রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে অপূর্বকৃষ্ণ পালিত আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দর্শন দিলেন। বিনীত নমস্কার করিয়া অপ্রস্তুত মুখে রুমালটা পকেটে পুরিতে পুরিতে একটু হাসিয়া বলিলেন, আশা করি, আপনার কাজের কোনো ব্যাঘাত করে বিরক্ত, মানে—

কিছু না, বসুন। চা খাবেন?

না। অনেক ধন্যবাদ। এইমাত্র চা খেয়ে আসছি আমি।

কোনো দরকার আছে নাকি আমার সঙ্গে?

অপূর্ববাবু পুনরায় রুমাল বাহির করিলেন এবং গলা ঘাড় কানের পিছন প্রভৃতি মুছিয়া যেন কিছু শক্তি সংগ্রহ করিলেন। তাহার পর মরিয়া হইয়া শঙ্করের চোখের পানে চাহিয়া বলিয়া ফেলিলেন, মিস মল্লিকের সঙ্গে কি দেখা হয় আজকাল আপনার?

দেখা না হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে?—বিস্মিত শঙ্কর প্রশ্ন করিল।

অপূর্ববাবু কেমন যেন থতমত খাইয়া গেলেন, সত্যই তো শঙ্করবাবুর সহিত বেলা মল্লিকের দেখা না হওয়ার কোনো সঙ্গত বাধা থাকিবার কথা নয়। এ প্রশ্ন করার কোনো অর্থ হয় না। অকারণে অনর্থক একটা প্রশ্ন করিয়াছেন এবং সেটা ধরা পড়িয়া গিয়াছে, এই ভাবিয়া অপূর্ববাবু মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহার মুখভাবেও সেটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। আবার রুমাল বাহির করিতে হইল। শঙ্কর পুনরায় প্রশ্ন করিল, বেলার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে কতদিন আগে?

আমার? আমার তো দেখা করবার তেমন সুযোগ হয় না, রবিবার ছাড়া আমার ছুটি তো তেমন—মানে—তা ছাড়া আপিস আজকাল বড় স্ট্রিক্ট, রবার্টসন সায়েব—

রবিবার তো মাসে চারটে করে আছে—বলিয়া শঙ্কর মৃদু হাসিতে লাগিল।

মিস্ মল্লিক রবিবারে বাড়ি থাকেন না, আমি গিয়েছিলাম দুদিন। অথচ পিয়ানোর ভালো ভালো গৎ জোগাড় করেছি কয়েকটা, মানে—শুনলাম, উনি আজকাল পিয়ানোও—

শঙ্কর বলিল, পিয়ানো! পিয়ানো পেলে কোথা? শুনিনি তো!

মিস্টার বোসের একটা পিয়ানো আছে, উনি মিসেস বোসকে এস্রাজ শেখাতে যান, সেই সময় পিয়ানোটাও বাজান শুনেছি। মানে—ওঁদের বেয়ারাটা বলছিল—

শঙ্কর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, বেশ তো, আপনি কি করতে চান?

অপূর্ববাবু একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন, কয়েকটা ভালো গৎ পেয়েছিলাম, খুব ভালো বিলিতি গৎ, সেইগুলো ওঁকে আর কি, মানে—অ্যাজ এ ফ্রেন্ড—

উপহার দিতে চান?

অপূর্ববাবু একটু হাসিলেন, চক্ষু দুইটি একটু নত করিলেন এবং সমস্ত মুখভাবে নারীসুলভ কমনীয়তা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, না না, উপহার ঠিক নয়, আমি অর্থাৎ—

নির্বিকারভাবে শঙ্কর বলিল, বেশ তো, ডাকে পাঠিয়ে দিন না, দেখা যখন হচ্ছে না।

ডাকে? তা বেশ বলেছেন, সিওর পাবেন তা হলে, কি বলুন? আমি আপনার কাছে এসেছিলাম এই ভেবে যে, আপনি হয়তো বলতে পারবেন, কখন উনি বাড়ি থাকেন, তা হলে আপনার সঙ্গে আমিও একদিন, মানে—

উনি কখন বাড়িতে থাকেন, তা আমিও ঠিক জানি না। প্রায়ই অবশ্য থাকেন না, অনেকগুলো টিউশনি নিয়েছেন কিনা!

তা শুনেছি আমি। তা হলে—

অপূর্ববাবু আর কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। একটু ইতস্তত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, ডাকেই তা হলে পাঠিয়ে দেব। ওঁর নাম্বারটা কি বলুন তো, টুকে নিই, ঠিক মনে নেই।

পাঞ্জাবির পকেট হইতে পকেট-বুক বাহিরে করিতে গিয়া কতগুলি মেয়েদের মাথার কাঁটা বাহির হইয়া মেঝেতে পড়িয়া গেল। কুণ্ঠিত অপূর্ববাবু চাদর সামলাইতে সামলাইতে সেগুলি কুড়াইতে লাগিলেন।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, ওগুলো আবার কি?

ওগুলো, মানে—আমাদের পাড়ারই একটি মেয়ে কিনতে দিয়েছিল আমাকে—

কাঁটাগুলি কুড়াইয়া মিস বেলা মল্লিকের ঠিকানাটা টুকিয়া লইয়া অপূর্বকৃষ্ণ পালিত চলিয়া গেলেন। শঙ্কর মৃদু হাসিয়া চাটুকু পান করিয়া ফেলিল।

।। তেরো ।।

মানুষের সহিত পশুর প্রকৃতিগত অনেক সাদৃশ্য তো আছেই, অনেক সময় আকৃতিগত সাদৃশ্যও থাকে। এক-একজন লোকের সহিত এক-একটা পশুর অদ্ভুত রকম মিল, দেখিলেই একটা বিশেষ পশুর কথা মনে পড়ে। সেদিন সন্ধ্যায় যে লোকটি হাওড়ায় একটি মুদির দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিলে ঘোড়ার কথা মনে হয়। মুখটা ঠিক ঘোড়ার মুখের মতো—খানিকটা যেন লম্বা হইয়া সামনের দিকে আগাইয়া গিয়াছে। মাথার সামনের দিকে লম্বা লম্বা চুল, দাঁতগুলাও লম্বা লম্বা এবড়ো-খেবড়ো, যেন একটা আর-একটার ঘাড়ে চড়িবার চেষ্টা করিতেছে। সমস্ত দাঁতেই বিশ্রী হলুদ রঙের ছোপ। গায়ে একটা আধময়লা কামিজ, পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতো, পরনের কাপড়টাও ময়লা, কিন্তু বেশ কায়দা করিয়া মালকোচা মারিয়া পরা। দেখিলে ঘৃণা হয়। কিন্তু ভয় হয় ভদ্রলোকের চোখ দুইটি দেখিলে। খুব বড় বড় কিংবা খুব ছোট ছোট নয়, মাঝারি ধরনের সাধারণ চোখ। এককালে হয়তো সাধারণ চোখের মতোই খানিকটা সাদা এবং খানিকটা কালো অংশ ছিল, এখন কিন্তু সাদা অংশটি পীতাভ এবং কালো অংশটি বাদামী গোছের হইয়া গিয়াছে। প্রথম দর্শনে ইহাতে হয়তো ভীতিকর কিছু দেখা যাইবে না, কিন্তু কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিলেই ভয় হইবে। ভদ্রলোক যদিও জ্ঞাতসারে সর্বদাই চোখের দৃষ্টিতে একটা সহৃদয়তার সুন্দর পর্দা টাঙাইয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু একটু অন্যমনস্ক হইলেই পরদা সরিয়া যাইতেছে এবং তাহার অন্তরালে যে দৃষ্টি দেখা যাইতেছে, তাহা মানুষের নয়—পিশাচের। পকেট হইতে চিনাবাদাম বাহির করিয়া ভদ্রলোক খোলা ছাড়াইয়া ছাড়াইয়া মুখে ফেলিতেছেন এবং লক্ষ্য করিতেছেন, মুদির দোকানে খরিদ্দারের ভিড় কখন কমিবে। মুদির দোকান নির্জন না হইলে তাঁহার সওদা খরিদ করা হইবে না।

একটু পরেই মুদির দোকান নির্জন হইল এবং খগেশ্বরবাবু ওরফে যতীনবাবু ওরফে কেষ্টবাবু ওরফে তিন নম্বর আগাইয়া গেলেন এবং মুদিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কর্তা, আমার সওদাটা এবার দাও দিকি।

কি চাই বলুন?

বেশি কিছু নয়, আধ-পোটাক সুপুরি। সবগুলি কিন্তু কানা হওয়া চাই।

মুদি একটু বিস্ময়ের ভান করিল। বলিল, সবগুলো কানা? কি হবে কানা সুপুরি দিয়ে?

হলুদ রঙের দন্তগুলি বিকশিত করিয়া খগেশ্বর বলিলেন, ওষুধ।

কিসের ওষুধ?

চুলকোনির।

মুদি বাছিয়া বাছিয়া আধ পোয়া কানা সুপারি ওজন করিয়া দিল এবং প্রসঙ্গত বলিল, কার্‌ফরমা লেনের মোড়ে একটা বিড়িওয়ালা আছে, চুলকোনির অব্যর্থ ঔষধ সে জানে।

খগেশ্বর ঠিকানাটা টুকিয়া লইলেন। এই ঠিকানাটারই প্রয়োজন। এই ঠিকানা জনৈক কানা-সুপারি-ক্রেতাকে দিবার জন্য মুদিও পয়সা খাইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিল।

কার্‌ফর্‌মা লেন চিৎপুর অঞ্চলে। একটি ট্যাক্সি সহযোগে খগেশ্বর রওনা হইলেন। কার্‌ফর্‌মা লেনের কাছাকাছি আসিয়া ট্যাক্সিটা ছাড়িয়া দিলেন এবং কিছু দূর হাঁটিয়া গিয়া দেখিলেন, কার্‌ফর্‌মা লেনের মোড়ে সত্যই একটা বিড়ির দোকান রহিয়াছে। থাকিবেই, তাহা খগেশ্বরবাবু জানিতেন। জনৈক বৃদ্ধ মিয়া বসিয়া বিড়ি পাকাইতেছিল।

খগেশ্বর আগাইয়া গিয়া বলিলেন, মিয়াসাহেব, ভালো গোলাপী বিড়ি চাই এক বান্ডিল।

মিয়াসাহেব বিড়ি দিল।

খগেশ্বর বলিলেন, আর একটি মেহেরবানি করতে হবে। শুনেছি, তুমি খুজলির ভালো দাবাই জান, বলে দিতে হবে সেটি আমাকে।

মিয়াসাহেব সবিস্ময়ে বলিল, খুজলির দাবাই! আমি জানি, তা কে বললে আপনাকে?

এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে খগেশ্বর বলিলেন, যে মুদির কাছ থেকে কানা সুপুরি কিনলাম আধ পোয়া, সেই তো তোমার নাম বাতলালে মিয়াসাহেব।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে মিয়াসাহেব একবার খগেশ্বরের পানে চাহিল। বলিল, দেখি সুপুরি।

মিয়াসাহেব সুপারিগুলি একটি একটি করিয়া নিরীক্ষণ করিল। হাঁ, সবগুলিই কানা বটে। বলিল, দাবাই আমার কাছে নেই, আছে হাড়কাটা গলির হীরেমন বিবির কাছে। তাকে গিয়ে বলুন, আমার খুজলি হয়েছে, আপনার বাঁ পায়ের ছেঁড়া পয়জারখানার ধুলো আমার একটু চাই। এই বললেই যা চাইছেন, তা পাবেন।

মিয়াসাহেব গম্ভীর মুখে পুনরায় বিড়ি পাকাইতে শুরু করিল।

মিয়াসাহেব আর কোনো কথা বলেন না দেখিয়া খগেশ্বর প্রশ্ন করিলেন, ঠিকানাটা?

ঠিকানাটা নিতে হলে সুপুরিগুলি রেখে যেতে হবে।

বেশ।

সুপারিগুলি হস্তগত করিয়া মিয়াসাহেব হীরেমন বিবির ঠিকানাটা দিল।

হাড়কাটা গলিতে হীরেমন বিবির দ্বারস্থ হইয়া খগেশ্বর দেখিলেন যে, হীরেমন নামটা শুনিয়া অন্তর যেরূপ উন্মুক্ত হইয়া উঠে, বিবি আসলে সেরূপ কিছু নহেন। এককালে হয়তো রূপসী ছিলেন, এখন কিন্তু কুশ্রী, নানা রোগগ্রস্ত জীর্ণ-শীর্ণ বারাঙ্গনা। রুক্ষ কেশ, কোটরগত চক্ষু, কঙ্কালসার দেহ। একটা খাটের ওপর বসিয়া আছে, হাঁপানির টান উঠিয়াছে।

স্বল্পান্ধকার ঘরটাতে প্রবেশ করিতেই হীরেমন অতি কষ্টে প্রশ্ন করিল, কে, কি চাই?

খগেশ্বর তাঁহার বাঁ পায়ের ছেঁড়া পয়জারের ধূলি প্রার্থনা করিলেন।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিবি বলিল, আপনি ক নম্বর।

তিন নম্বর?

কাকে কাকে চেনেন আপনি?

খগেশ্বরবাবুকে, হারানবাবুকে, যতীন্দ্রবাবুকে, কেষ্টবাবুকে আর ম্যানেজারবাবুকে।

তা হলে এই রসিদটায় সই করে দিন।

হীরেমন অতি কষ্টে উঠিল, এবং একটি তোরঙ্গের ভিতর হইতে একটি তালা-লাগানো

ছোট বাক্স এবং একটি কাগজ বাহির করিল। কাগজে লেখা ছিল, হীরেমন বিবির নিকট ঔষধ পাইলাম।

ওইটেতে সই করে দিন।

খগেশ্বর পকেট হইতে একটি ছোট কপিং পেন্সিল বাহির করিয়া বাঁ হাতে বাঁকা বাঁকা অক্ষরে লিখলেন, তিন নম্বর। এই স্বল্প পরিশ্রম করিয়াই হীরেমন বিবি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার হাঁপানিটা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। একটু সামলাইয়া লইয়া থামিয়া থামিয়া সে বলিল, এই বাক্সটা নিয়ে যান। ওর ভেতরে সব লেখা আছে, বাক্সে হরফওলা তালা লাগানো আছে। তালা খোলবার কৌশল আপনি জানেন তো?

না।

আমিও জানি না।

তা হলে খুলব কি করে?

মির্জাপুর স্ট্রিটের মোড়ে যে অন্ধ ভিখিরিটা আঁচল পেতে বসে থাকে মেডিকেল কলেজের সামনে, তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন—ক-পয়সায় দিন চলে তোমার? সে যা উত্তর দেবে, সেই কথাটি অক্ষর সাজিয়ে ঠিক করলেই তালা খুলে যাবে।

আচ্ছা।

খগেশ্বর বাক্সটা লইয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় হীরেমন বিবি বলিল, বলবেন ম্যানেজারবাবুকে, আমি মরছি, তাঁর কি একটুও দয়া হয় না আমার ওপর? মাসে মাত্র দশ টাকায় কি চলে আমার?

হীরেমন বিবি হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল!

খগেশ্বর বলিলেন, বলব আমি।

বলিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিলেন। ম্যানেজারবাবুকে বলিলেই যদি টাকা পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না। খগেশ্বর সিংহকে তাহা হইলে সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে ঝঞ্ঝাট সহ্য করিয়া এখানে আসিতে হইত না।

মির্জাপুর স্ট্রিটের মোড়ে মেডিকেল কলেজের সামনে একটা অন্ধ ভিখারি তারস্বরে চিৎকার করিতেছিল—এক পয়সা দিলা দে রাম।—

খগেশ্বর তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মোড়টা অপেক্ষাকৃত জনবিরল হইতেই নিম্নস্বরে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, ক-পয়সায় দিন চলে তোমার?

ভিক্ষুক খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

খগেশ্বর পুনরায় প্রশ্ন করিলেন।

ভিক্ষুক মৃদু কণ্ঠে যেন আপন মনেই বলিল, বাক্‌সা লায়া হ্যায় তো সেভেন, নেই লায়া হ্যায় তো ঢন্‌ঢন্।

খগেশ্বর সরিয়া গিয়া ল্যাম্প-পোস্টের নিকটে দাঁড়াইয়া এলোমেলো ইংরেজি অক্ষরগুলি ঘুরাইয়া Seven কথাটি সাজাইয়া ফেলিলেন। তালা খুলিয়া গেল।

বাক্সের ভিতর একটি ঠিকানা ও চাবি রহিয়াছে। চাবির গায়ে একটি কাগজে লেখা 'খিড়কি-দরজা'। ম্যানেজারবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যাইতেছে।

ঠিকানায় পৌঁছিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। চাবি দিয়া খিড়কি-দরজা খুলিয়া খগেশ্বর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রকাণ্ড বাড়ি। সূচিভেদ্য অন্ধকার। অন্ধকার প্রাঙ্গণে খগেশ্বর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে হইল, ওপরের ঘর হইতে একটা চাপা গোঙানির শব্দ যেন ভাসিয়া আসিতেছে। মিনিটখানেক নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া খগেশ্বর পকেট হইতে একটা দিয়াশলাই-কাঠি বাহির করিলেন এবং সেটা নাকে দিয়া খুব জোরে একবার হাঁচিলেন। হাঁচির শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতলের একটি কক্ষে আলো জ্বলিয়া উঠিল। ওপরে উঠিবার সিঁড়িটাও আলোকিত হইল। খগেশ্বর দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া ওপরে উঠিয়া গেলেন এবং গিয়াই বৃদ্ধ ম্যানেজারবাবুর সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল। সিঁড়ির ঠিক সামনের ঘরটাতেই তিনি ফরাসে উপবিষ্ট ছিলেন। সর্বাঙ্গে দামি শাল জড়ানো, মুখে প্রসন্ন হাস্য। বাড়িতে জনপ্রাণী আর কেহ নাই।

এই যে শ্রীগরুড়, এসে পড়েছ দেখছি?

বিনীত নমস্কার করিয়া খগেশ্বর বলিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিশেষ বেগ পেতে হয়নি তো? মুদি, বিড়িওয়ালা, হীরেমন আর অন্ধ ভিখিরি এই চারজনকে পার হয়ে এসেছ নিশ্চয়?

সশ্রদ্ধ কণ্ঠে খগেশ্বর বলিলেন, তাই এসেছি।

ম্যানেজার স্মিতমুখে চাহিয়া আছেন দেখিয়া খগেশ্বর বলিলেন, ব্যাপারটা ভালো বুঝতে পারলাম না।

কর্তার কত বিচিত্র খেয়াল, আমিই কি ছাই সব বুঝতে পারি! যা বলেন, হুকুম তামিল করে যাই। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ শুনে কর্তা বললেন, ওকে সোজাসুজি ঠিকানা দিও না। মুদি, বিড়িওয়ালা আর হীরেমনের কাছে মুখটা চিনিয়ে তবে যেন আসে। সেই রকম ব্যবস্থাই করলাম। হল অনর্থক কতকগুলো অর্থব্যয়।

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, তাতে আমারই বা কি, তোমারই বা কি? লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।

খগেশ্বর বলিলেন, উদ্দেশ্যটা কি কিছু বুঝলেন?

ঠিক অবশ্য বুঝিনি। যতদূর আন্দাজ করছি সেটা এই যে, ওই মুদি, ওই বিড়িওয়ালা আর ওই হীরেমন ইদানীং কর্তাকে কিছু মাল সাপ্লাই করেছে। ভবিষ্যতে তুমি যদি দেহাত থেকে কোনো টাটকা মাল আমদানি করে আনতে পার—ওদের কারও হেফাজতে এনে দিলেই মালটা ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে। সেইজন্যেই সম্ভবত তোমার মুখটা চিনিয়ে দিলেন ওদের। কাজের লোক ওরা, মাল জোগান দেয়, পাহারা দেয়, পাচার করে। এসব অবশ্য আমার আন্দাজ। কর্তার কথা খোদ কর্তাই জানেন। যাক ওসব কথা। তোমার কথাই শুনি। আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা করতে চেয়েছ কেন শুনি? সংক্ষেপে বল।

খগেশ্বর সংক্ষেপেই বলিলেন, টাকা—

টাকা? কত টাকা?

যা দেবেন। দিন চলা ভার হয়েছে আমার। চাকরি গেছে, পরিবার গেছে, মেয়ে গেছে, কি-ই বা আছে! সবই তো জানেন আপনি। আপনার কর্তার সেবাতে জীবনটাই উচ্ছৃঙ্খল করেছি বলতে গেলে।

ম্যানেজারবাবু কিয়ৎকাল খগেশ্বরের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, গাঁজা কতটা করে খাও আজকাল?

আজ্ঞে, দৈনিক চার আনার।

সৌদামিনীর কাছে পাও-টাও কিছু?

একটা আধলা না। গেলে দেখাই করে না। নিজের মেয়ে-পরিবার যে এমন দুশমনের মতো ব্যাভার করবে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। না খেতে পেয়ে মরছিল, লাথি-ঝাঁটা খেয়ে দিন কাটত, আপনার কাছে এনে দিলাম, আপনি বললেন, কর্তার দুজনকেই পছন্দ হয়েছে। নিজের চোখে দেখলাম। এখন বেশ সোনাদানা পরে দিব্যি জাঁকিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে মশাই, আর বললে বিশ্বাস যাবেন না ম্যানেজারবাবু, আমাকে বাড়িতে ঢুকতে পর্যন্ত দেয় না!

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব।

খগেশ্বরই পুনরায় কথা কহিলেন, কর্তা কি আজকাল যান-টান ওদের কাছে?

রামোঃ! কর্তার শখ ওই দু-এক দিনই! দু দিনেই পুরনো হয়ে যায়, নতুনের জন্যে ক্ষেপে ওঠেন। নতুন মাল সন্ধানে থাকে তো বল, ভালো দাম দিয়ে কিনবেন। হাজার টাকা পর্যন্ত নগদ পেতে পার।

একটা ভালোর চেষ্টায় আছি—

বৃদ্ধের চক্ষু দুইটি আগ্রহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিলেন, বেশ তো, জোগাড় কর।

বৃদ্ধ পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া কুড়িটা টাকা খগেশ্বরকে দিলেন এবং বলিলেন, এখন এই নিয়ে যাও, দিন পনেরো পরে এসো আবার।

এই বাড়িতেই?

না, এ বাড়িতে নয়, এ বাড়ি বদলাতে হবে। আর বল কেন, সাত দিন অন্তর অন্তর বাড়ি বদলাতে হচ্ছে। ঠিকানা ঠিক পাবে এবার যেমন করে পেলে। এবার অবশ্য মুদি বিড়িওলা আর হীরেমন থাকবে না। অন্য লোকদের মারফত আসবে। কর্তার হুকুম এই। প্রত্যেকবার নতুন রকম সঙ্কেতের তালা দিতে হবে। এবারকার তালাটা ঠিক খুলেছিল তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, সেভেন কথাটা হতেই খুলে গেল তালা।

তালা চাবি আর বাক্স দিয়ে যাও সব। এবার অন্যরকম তালা দিতে হবে।

এই যে।

খগেশ্বব তালা-সমেত কাঠের বাক্স ও খিড়কির চাবিটা ম্যানেজারবাবুর হাতে দিলেন।

সহসা চাপা গোঙানিটা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল।

খগেশ্বর প্রশ্ন করিলেন, ওটা কিসের শব্দ?

একজন আমলার জ্বর হয়েছে, সে-ই ও-রকম করছে ও-ঘরে পড়ে পড়ে—ও কিছু নয়।

দ্বিতলে অপর প্রান্তে অজ্ঞান বন্দিনীর কথা খগেশ্বরকে বলিবেন, এমন কাঁচা লোক বৃদ্ধ নহেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া খগেশ্বরকে বলিলেন আচ্ছা তুমি যাও এখন। বড় ক্লান্ত আছি আজ, ঘুমুব এবার।

খগেশ্বর হাত জোড় করিলেন।

ওই তোমার দোষ শ্রীগরুড়, কিছুতেই তোমার খাঁই মেটানো যায় না।

আরও দশটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

খগেশ্বর ঝুঁকিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

খগেশ্বর চলিয়া গেলে ম্যানেজার ধীরে ধীরে উঠিলেন ও খিড়কির দরজাটা বন্ধ করিয়া আসিলেন। তাহার পর কুব্জ দেহটা ঈষৎ উন্নমিত করিয়া খানিকক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। গোঙানিটা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া ক্রমশ চিৎকারে পরিণত হইল। বৃদ্ধ বুঝিলেন, এইবার জ্ঞান হইয়াছে, আর দেরি করা অনুচিত হইবে।

বারান্দাটা পার হইয়া ওদিকে একটা ঘরের দিকে দ্রুতপদে তিনি অগ্রসর হইয়া গেলেন। সেই ঘরটার ভিতর হইতেই চিৎকার ভাসিয়া আসিতেছিল। ঘরের তালা খুলিয়া বৃদ্ধ প্রবেশ করিলেন।

হতবুদ্ধি মেয়েটির চিৎকার ক্ষণিকের জন্য বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই। পর-মুহূর্তেই আরও তীব্র তীক্ষ্ণ মর্মান্তিকরূপে তাহা অন্ধকারকে আকুল করিয়া তুলিল। বৃদ্ধ নিঃশব্দে কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন।

আর কিছু শোনা গেল না।

।। চোদ্দো ।।

অচিনবাবুর কারখানি নিঃশব্দগতিতে আসিয়া বেলার বাসার সম্মুখে থামিল। জনার্দন সিংহেব মারফত নিজের কার্ডখানি পাঠাইয়া দিয়া অচিনবাবু স্টিয়ারিঙের ওপর ভর দিয়া বসিয়া রহিলেন। একটু পরেই বেশবাস সম্বৃত করিয়া স্মিতমুখে বেলা বাহির হইয়া আসিলেন ও নমস্কার করিয়া বলিলেন, আপনি কার্ড পাঠিয়েছেন?

অচিনবাবু মোটর হইতে নামিয়া আসিলেন এবং সমস্ত মুখচ্ছবিতে নিখুঁত ভদ্রতা বিকিরণ করিয়া অতিশয় সুষ্ঠু ভঙ্গিতে একটি নমস্কার করিলেন। রাস্তায় দাঁড়াইয়া আলাপ করাটা অশোভন হইতেছে দেখিয়া বেলা বলিলেন, আসুন, ভেতরে আসুন।

উভয়ে আসিয়া বাহিরের ঘরটাতে উপবেশন করিলেন। অচিনবাবু হাসিয়া হাত দুইটি জোড় করিয়া বলিলেন, একটি দয়া করতে হবে মিস মল্লিক।

মনে মনে একটু বিব্রত হইলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ করিবার মেয়ে নহেন। ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া তিনি চাহিয়া রহিলেন। অচিনবাবু বলিলেন, আপনার বাজনার খ্যাতি চারিদিকে শুনতে পাই, আপনার নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসত নেই তাও জানি, তবু এসেছি নিজের জন্যে নয়, পরের জন্য।

ব্যাপার কি খুলেই বলুন না?

লিলুয়ার একটা বাগান-বাড়ি ভাড়া নিয়ে চ্যারিটি পার্‌ফর্‌ম্যান্স করছি আমরা। নাচ, গান, বাজনা—থাকবে সব রকমই। এর থেকে যা টাকা বাঁচবে, সেটা ভালো কাজেই খরচ হবে। মেয়েদের একটা ইস্কুল করবার ইচ্ছে আছে আমাদের। আপনাকে একটা কিছু বাজাতে হবে সেখানে—এস্রাজ সেতার যা হোক। আমি নিজে কারে করে নিয়ে যাব, কারে করে পৌঁছে দিয়ে যাব—ঘণ্টা দুয়েকের ব্যাপার।

কখন হবে?

দিন-দশেক পরে, সন্ধে সাতটা থেকে শুরু।

সন্ধেবেলায় আমার ছুটি তো নেই, বাজনা শেখাতে যেতে হয় এক জায়গায়।

বেশ তো, কোথায় বলুন না, একদিনের জন্যে ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নেব আমি। সে ভার আমি নিচ্ছি।

সেটা ঠিক হয় না।

না না, মিস মল্লিক, কাইন্ডলি আপত্তি করবেন না। আপনাকে আমাদের চাই-ই।

আমাকে মাপ করুন, আমার সময় কম।

বেলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অচিনবাবুও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, দেখুন, একটা সৎকার্যের জন্য একটু ত্যাগ স্বীকার যদি না করেন, তা হলে—

বেশ, আপনাদের স্কুলে আমি না হয় কিছু চাঁদা দেব।

সে তো দিতেই হবে, এটা হল উপরি পাওনা। আপনি না থাকলে ফাংশনটা একেবারে মাটি হয়ে যাবে। আপনাকে যেতেই হবে।

বেলা হাসিয়া বলিলেন, আমি কথা দিতে পারলাম না কিন্তু।

বেশ, আর একদিন আসব আমি, কথা আপনাকে দিতেই হবে।

বেলা স্মিত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কোনো জবাব দিলেন না। অপ্রত্যাশিত এই বিপদটার হাত হইতে কি করিয়া উদ্ধার পাওয়া যায়, মনে মনে সেই চিন্তাই তিনি করিতেছিলেন। অচিনবাবু তাঁহাকে নীরব দেখিয়া বলিলেন, আচ্ছা, আপনি একটু ভেবে দেখুন। সৎকার্যের জন্যে কিছু করা একটা মহাপুণ্য তো বটেই, তা ছাড়া আর একটা দিকও আছে। অনেক বড় বড় লোকের কাছে টিকিট বিক্রি করছি আমরা, তাঁদের কাছেও আপনার গুণের পরিচয়টা দেওয়া হবে। যাই বলুন, মিড্‌ল ক্লাস পিপ্‌ল তো আপনার গুণের যথোচিত মূল্য দিতে পারে না।

অচিনবাবু আরও হয়তো কিছু বলিতেন, কিন্তু বেলা সহসা নমস্কার করিয়া বলিলেন, আচ্ছা, ভেবে দেখব। আসুন তা হলে।

বেলা ভিতরে চলিয়া গেলেন।

অচিনবাবু কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাহিরে আসিলেন। রাস্তার ওপর দাঁড়াইয়া চিন্তাকুল-মুখে অত্যন্ত নিপুণভাবে একটি সিগারেট ধরাইলেন, জ্বলন্ত দিয়াশলাই কাঠিটা খানিকক্ষণ ধরিয়া থাকিয়া তাহার পর সেটা নাড়িয়া নিবাইয়া ফেলিয়া দিলেন এবং এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। নিঃশব্দগতিতে গাড়ি গলি হইতে বাহির হইয়া গেল।

অচিনবাবুর গাড়ি চলিয়া যাইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রফেসর গুপ্তের গাড়িখানা আসিয়া দাঁড়াইল। প্রফেসার গুপ্ত গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন এবং জনার্দন সিংহের সেলামের প্রত্যুত্তরে মাথা নাড়িয়া বাহিরের ঘরটাতে আসিয়া প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময় বেলার সহিত তাঁহার মুখামুখি দেখা হইয়া গেল। উভয়ে উভয়ের মুখের পানে চাহিয়া কয়েক মুহূর্ত

দাঁড়াইয়া রহিলেন। বেলার ওষ্ঠাধর নিমেষের জন্য কাঁপিয়া থামিয়া গেল। আত্মসম্বরণ করিয়া বেলা সহজ কণ্ঠেই বলিলেন, আমি বেরুচ্ছিলাম, আপনার কি বিশেষ কোনো কাজ আছে?

তোমাকে কিছু বলতে চাই।

প্রফেসার গুপ্ত কিছুদিন হইতে বেলাকে, অবশ্য বেলার সম্মতিক্রমেই, 'তুমি' বলিতে শুরু করিয়াছেন।

আমাকে? বেশ বলুন।

এখানে সে কথা বলা যাবে না, চল, মাঠে যাই।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বেলা কয়েক মুহূর্ত নীরব রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, বেশ, তাই চলুন। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে।

কি, বল?

আপনার বলবার মতো যত কথা আছে, আজই শেষ করে ফেলতে হবে। এর জন্যে মাঠে যতক্ষণ বসে থাকতে বলেন, আজ বসে থাকব। কাল থেকে কিন্তু আর নয়।

প্রফেসার গুপ্ত অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার মনের ভিতর কিসের যেন একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সহসা তিনি বলিলেন, বেশ তাই হবে।

তা হলে একটু দাঁড়ান, এখুনি আসছি আমি।

বেলাদেবী ভিতরে গেলেন ও মাঠে যাইবার উপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

চলুন।

কিছুক্ষণ পূর্বে সূর্য অস্ত গিয়াছে, মাঠে অন্ধকার নামিতেছে। একটি নির্জন স্থান বাছিয়া বেলা ও প্রফেসার গুপ্ত উপবেশন করিলেন। মোটরে যদিও উভয়ে পাশাপাশি বসিয়াছিলেন, কিন্তু একটিও বাক্য-বিনিময় হয় নাই।

প্রফেসার গুপ্তই প্রথমে কথা কহিলেন, তুমি মানতুকে কি সত্যিই আর বাজনা শেখাবে না?

ও ঘটনার পর আর তো আপনার বাড়িতে যাওয়া সম্ভব নয়। আপনার স্ত্রী আফিং খেয়েছিলেন আমার জন্যে—এ কথা শোনার পর আর কি আপনার বাড়িতে যাওয়া চলে, আপনিই বলুন? ভাগ্যিস বেঁচে গেছেন, না বাঁচলে কি হত বলুন তো?

সেটা কি আমার দোষ?

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বেলা বলিলেন, আপনার দোষ সত্যি আছে কি না, সে অপ্রিয় আলোচনা করবার অধিকার আমার নেই। আমার নিজের কোনো দোষ নেই, এইটুকুই আমি জানি। আর সেটা আপনিও জানেন। অথচ—

আমার দোষ স্খালনের চেষ্টা আমি করছি না, কারণ এটাকে আমি দোষ বলে মনে করি না। তোমাকে আমার ভালো লেগেছে এবং ভাবে ভঙ্গিতে সেটা হয়তো প্রকাশ করেছি, তাতে দোষের তো কিছু নেই।

আপনি যা বলছেন, তা যদি সত্যি হয়, তা হলে নিশ্চয় দোষের আছে। আপনি বিবাহিত, সমাজের নিয়ম মেনেই আপনার চলা উচিত। হঠাৎ আমাকে ভালো লাগবার কারণই বা কি, তা তো আমি বুঝতে পারছি না। আরও বুঝতে পারছি না, সে কথা আপনি প্রকাশ করছেন কেন?

প্রফেসর গুপ্ত ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, ভালোবাসা কোনো দিন কোনো আইন মেনে চলেনি। তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে, এর বেশি আর আমার কিছু বলবার নেই। আমি জীবনে সুখী নই বেলা।

প্রফেসার গুপ্তের একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

সুখী নন কেন? আপনার স্ত্রীকে আপনি ভালোবাসতে পারেননি?

পারলে আমার এ দুর্দশা হত না।

পারেননি কেন? আপনার স্ত্রী তো লোক খারাপ নন?

লোক খারাপ কি ভালো, তা বিচার করে কেউ কাউকে ভালোবাসে না। মন্তর পড়ে বিয়ে করলেই ভালোবাসা জন্মায় না। মনের মিল হওয়াটাই আসল। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার এতটুকু মনের মিল নেই—কোনো দিক থেকেই নেই। আমার মানসিক সুখ-দুঃখ আনন্দ-অবসাদের সঙ্গে আমার স্ত্রীর এতটুকু সম্পর্ক নেই। আমি উপার্জন করব, তিনি খরচ করবেন, আমার চালচলনের প্রতি তীক্ষ্ণ নৈতিক দৃষ্টি রাখবেন, কোনো মেয়ের সঙ্গে সামান্য ঘনিষ্ঠতা দেখলে তা নিয়ে কথায় কথায় শ্লেষ করবেন, কোনো কারণে যদি তাঁর স্বার্থে এতটুকুও আঘাত করি, তা হলে তাই নিয়ে গঞ্জনা দেবেন, কথায় কথায় প্রকাশ করবেন যে, তাঁর মতো মহীয়সী মহিলা আমার মতো লোকের হাতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেলেন—এই তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক। ঝগড়া অথবা তর্ক ছাড়া তাঁর সঙ্গে অন্য কোনো প্রকার আলাপ বহুকাল হয়নি, হওয়া সম্ভবও নয়। রাস্তার একটা অশিক্ষিত কুলি অথবা অমার্জিত গাড়োয়ানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হওয়া বরং সম্ভব, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে সম্ভব নয়। কারণ আমাকে তিনি সর্বদাই তাঁর নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায়স্বরূপ মনে করেন এবং সর্বদাই সন্দেহ করেন যে, হয়তো আমি তাঁকে সে বিষয়ে ফাঁকি দিচ্ছি। আমি অবশ্য সে সন্দেহের ন্যায্য খোরাক যে সরবরাহ না করি তা নয়, করি—কারণ আমার মন সর্বদাই ক্ষুধিত।

একটু থামিয়া প্রফেসার গুপ্ত পুনরায় বলিলেন, অনেক দিন পরে তোমাকে দেখে ভেবেছিলাম যে, তোমার মধ্যে আমার মন হয়তো আশ্রয় পাবে। সব কথা শুনলে হয়তো তুমি আমার দুঃখ বুঝবে, হয়তো একটু প্রশ্রয় পাব। আমার স্ত্রী নাটকীয় ভঙ্গি করে এক ডেলা আফিং খেয়েছেন বলেই তাঁর দুঃখটা তুমি বড় করে দেখো না। আমার দুঃখ আরও গভীর।

প্রফেসার গুপ্ত নীরব হইলেন। অনেকক্ষণ কেহই কোনো কথা বলিলেন না। অনেকক্ষণ পরে প্রফেসার গুপ্তই পুনরায় নীরবতা ভঙ্গ করিলেন।

তুমি কিছু বলছ না যে?

বলবার কিছুই নেই।

কিছুই নেই?

না।

প্রফেসার গুপ্ত চুপ করিয়া রহিলেন।

সহসা নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বেলা বলিলেন, আপনার আর কিছু কি বলবার আছে?

সবই তো বললাম।

তবে চলুন, এবার ওঠা যাক।

বেলা উঠিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ওদিকে কোথা? আমার কার যে এদিকে। রাস্তা ভুলে গেলে নাকি?

রাস্তা ভুলিনি। আমি ট্যাক্সি করে ফিরব। আপনি বাড়ি যান।

বেলা ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডের দিকে চলিয়া গেলেন।

প্রফেসার গুপ্ত চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

।। পনেরো ।।

মৃন্ময়কে আজকাল প্রায়ই বাহিরে যাইতে হইতেছে। কি যে এক ছাই কাজ জুটিয়াছে— বাড়িতে একদণ্ড থাকিবার উপায় নাই। এ রকম চাকরি করার চেয়ে অনাহারে থাকাও বরং ঢের ভালো। আজ এখানে, কাল সেখানে, একদিনও কি সুস্থির হইয়া বসিয়া থাকিবার জো আছে! যেন চরকির মতো বেড়াইতেছে। একটা মানুষ কতই বা ঘুরিতে পারে, সকল জিনিসেরই তো একটা সীমা আছে। হাজার হউক, মানুষ তো, কল তো আর নয়। উপরওয়ালা সাহেবদের জ্ঞান-গম্যি দয়া-মায়া বলিয়া কি কিছুই নাই? উনি না হয় ভালোমানুষ লোক, মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারেন না, মুখ বুজিয়া সমস্ত সহ্য করিয়া যান, তাই বলিয়া তাঁহারই উপর সব কাজের ভার চাপাইতে হইবে? আক্কেলকে বলিহারি যাই। ইত্যাকার নানারূপ চিন্তা ও স্বগতোক্তি করিতে করিতে হাসি হাতের লেখা লিখিতেছিল। যদিও চিনু এখনও পর্যন্ত স্বীকার করিতেছে না, কিন্তু ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে হাসির হাতের লেখা সত্যই উন্নতি লাভ করিয়াছে। খানিকটা লিখিয়া হাসি সোজা হইয়া বসিল, খোঁপাটা এলাইয়া পড়িয়াছিল, দুই হাত দিয়া সেটা ঠিক করিয়া লইল, তাহার পর হাতখানাকে একটু দূরে সরাইয়া নানাভাবে নিজের লেখাটিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এই হাতের লেখায় স্বামীকে চিঠি লিখিলে তাহা কি খুব হাস্যকর হইবে? উনি হাসিবেন? কক্‌খনও না। বরং খুশিই হইবেন। আশ্চর্য হইয়া যাইবেন। কালই একখানা চিঠি লিখিতে হইবে। খুব লুকাইয়া কিন্তু। ঠাকুরপো যেন না জানিতে পারে। ঠাকুরপো তো ফাজিলের চূড়ামণি। চিঠিটা লিখিয়া ঝিয়ের মারফত রাস্তার ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিলেই চলিয়া যাইবে।

নীচে কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। এমন সময় কে আসিল?

বউদি, কপাট খোল।

চিন্ময়ের গলার স্বর। ঠাকুরপো আজ এত সকাল সকাল কলেজ হইতে ফিরিল কেন? হাসি ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, মাত্র আড়াইটা বাজিয়াছে। এত সকাল সকাল আসিবার মানে কি? অকারণ ভয়ে হাসির বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। খারাপ খবর-টবর পায় নাই তো? নীচে পুনরায় কড়া নাড়িয়া চিন্ময় ডাকিল, বউদি!

হাসি তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল।

কপাট খুলিতেই চিন্ময় বলিল, ঘুমুচ্ছিলে তো?

আহা, ঘুমুব কেন, লিখছিলাম। তুমি এখন এলে যে?

ক্লাস হল না, প্রফেসরের অসুখ করেছে।

চিন্ময় ওপরে চলিয়া গেল। কপাট বন্ধ করিয়া হাসিও ওপরে আসিল। হাসির হাতের লেখা দেখিয়া চিন্ময় বলিল, সুন্দর হচ্ছে তো লেখা তোমার বউদি।

যাও, আর ঠাট্টা করতে হবে না।

হাসি হাতের লেখার খাতাটা বন্ধ করিয়া দিল।

ঠাট্টা নয়, সত্যি, বেশ হচ্ছে। আচ্ছা। তুমি ডিক্‌টেশন লিখতে পার?

ডিক্‌টেশন কি আবার?

আমি বলব, তুমি শুনে শুনে লিখবে।

তা আমি পারি বোধহয়।

ঘোড়ার ডিম পার।

নিশ্চয় পারি।

এই নাও কাগজ, লেখ।

ভুল হলে ঠাট্টা করতে পারবে না কিন্তু, বলে দিচ্ছি।

না না, ঠাট্টা করব কেন? লেখই না আগে, দেখি।

হাসি কাগজ কলম লইয়া বসিল।

চিন্ময় বলিতে লাগিল—

সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। তুমি নটার সময় গোলদীঘির পূর্বদিকে একটা গেটে থাকিও ইতি—ক খ গ ঘ।

লেখা হইয়া গেলে চিন্ময় বলিল, কই, দেখি। বাঃ, চমৎকার হয়েছে! থাক আমার কাছে এটা।

কাগজখানা সে পকেটে পুরিয়া ফেলিল।

হাসি প্রশ্ন করিল, ওর মানে কি?

মানে আবার কি, যা মনে এল তাই বললাম।

চিন্ময় একটু হাসিল, তাহার পর বলিল, অমন করে চেয়ে আছ যে? এ কাগজটা এখন থাক আমার কাছে। একমাস পরে আবার তোমাকে দিয়ে লেখাব খানিকটা, তারপর দুটো মিলিয়ে দেখব, উন্নতি হয়েছে কি না!—এই বলিয়া সে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল।

এসেই যাচ্ছ কোথায় আবার?

মাঠে। খুব ভালো ম্যাচ আছে একটা, দেখে আসি।

খিদে পায়নি? খাবে না কিছু?

না।

চিন্ময় বাহির হইয়া গেল।

হাসি পুনরায় লিখিতে বসিল।

।। ষোলো ।।

যেমন করিয়া হউক রোজগার করিতে হইবে। উপার্জন করিতে না পারিলে মানুষের কোনো মূল্যই নাই। টাকা দিয়া প্রেম কিনিতে যাইবার প্রয়াস হাস্যকর। যে নিঃস্ব, তাহার এই

মানসিক বিলাসের অধিকার নাই। তাহার অন্তরের ঐশ্বর্য যতই না কেন প্রচুর থাকুক, বাহিরের ঐশ্বর্য না থাকিলে তাহা খনির তিমিরগর্ভে রত্নরাজির মতো চিরকালই লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিবে।

অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করিবার জন্যই বাহিরের ঐশ্বর্যের প্রয়োজন। খনিকে খনন না করিলে মণির সন্ধান মিলিবে কীরূপে? মণি আবিষ্কার করিবার পর খনিত্র অনাবশ্যক, কিন্তু আবিষ্কারের পূর্বে খনিত্র না হইলে চলে না। খনিত্র একটা চাই-ই। কিন্তু টাকা না থাকিলে কিছুই করা যায় না! টাকাটা যে অতি তুচ্ছ জিনিস, তাহাও টাকা না থাকিলে প্রমাণ করা যায় না। অর্থ থাকিলে তবেই তাহা ত্যাগ করিয়া ত্যাগের মহত্ত্ব প্রকট করা সম্ভব, কপর্দকহীন দরিদ্রের মুখে ত্যাগের মহিমার কথা মানায় না। অর্থের অপেক্ষা প্রেম বড়, এ কথার মর্ম মুক্তোকে বুঝাইতে হইলে প্রথমেই মুক্তোকে পাওয়া দরকার এবং সেজন্য টাকার প্রয়োজন। মুক্তোকে আয়ত্তের মধ্যে পাইলে তাহার মনে নিজেকে শঙ্কর নিশ্চয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে, এ বিশ্বাস নিজের ওপর তাহার আছে। কিন্তু মুক্তোকে আয়ত্তের মধ্যে পাওয়াই যে দুরূহ! অত টাকা কোথায় পাইবে সে? অবিলম্বে উপার্জন করা দরকার, কিন্তু কি করিয়া তাহা সম্ভব? এই কলিকাতা শহরে কে তাহাকে চেনে? চিনিলেও বা কত টাকার চাকরি সে পাইতে পারে? বড় জোর মাসে পঞ্চাশ টাকার। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? অল্প টাকায় মুক্তোকে তো পাওয়া যাইবে না। কেহ কিছু টাকা দেয় না? মাসে মাসে তাহাকে শোধ করিয়া দিলেই চলিবে। কিন্তু কে-ই বা ধার দিবে? সহসা শঙ্করের শৈলর কথা মনে পড়িল। সে বড়লোকের পত্নী। তাহার হাতে কিছু টাকা থাকিতে পারে, তাহার নিকট হইতে কোনো ছুতায় ধার করিয়া আনাও শঙ্করের পক্ষে অসম্ভব হইবে না। তাহার পরে ধীরে ধীরে টাকাটা পরিশোধ করিয়া দিলেই চলিবে। একটা চাকরি সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রফেসার গুপ্ত চেষ্টা করিলে একটা টিউশনি হয়তো তাহাকে জোগাড় করিয়া দিতে পারেন।

রবিবারের দুপুর। শঙ্কর বিছানায় শুইয়া চিন্তা করিতেছিল, উঠিয়া বসিল। শৈলর সহিত আজই দেখা করিতে হইবে। প্রফেসার গুপ্ত চেষ্টা করিলে একটা টিউশনিও হয়তো তাহাকে জোগাড় করিয়া দিতে পারেন—তাঁহার সহিতও দেখা করা দরকার। শঙ্কর তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। শৈল একদিন যাইতেও বলিয়াছিল তাহাকে। এখন হয়তো সে একা আছে।

রাস্তায় বাহির হইতেই অপ্রত্যাশিতভাবে প্রকাশবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। শঙ্কর তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, তিনি কিন্তু শঙ্করকে চিনিয়াছিলেন।

নমস্কার শঙ্করবাবু, চিনতে পারছেন?

চিনিতে না পারিলেও সব সময় সেটা বলা যায় না। শঙ্কর স্মিতমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রকাশবাবুই পুনরায় বলিলেন, চেনবার কথা অবশ্য নয়, একটিবার মাত্র তো দেখা। প্রফেসার মিত্রের বাড়িতে টি-পার্টিতে—হয়েও গেল অনেক দিন।

শঙ্করের মনে পড়িল। সোনাদিদি ইঁহাকে শঙ্করের সহিত আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাও মনে পড়িল, সোনাদিদি ইঁহার নাম দিয়াছিলেন—অগতির গতি। ভদ্রলোক নাকি

পরোপকারী। শঙ্কর আর একবার প্রকাশবাবুর দিকে ভালো করিয়া চাহিল। খদ্দরের মোটা কোট ও মোটা চাদর গায়ে, কয়েক দিনের না-কামানো গোঁফ-দাড়ি মুখে, চক্ষুতে সরল দৃষ্টি। প্রকাশবাবু ঠিক তেমনই আছেন।

প্রকাশবাবু হাসিয়া বলিলেন, আপনার কবিতাটা পড়লাম কাগজে, ভারি সুন্দর লাগল। আমাদের একটা কাগজ বার হচ্ছে, তাতে আপনাকে লিখতে হবে কিন্তু।

আচ্ছা।

সেই হস্টেলেই থাকেন তো এখন?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, যাব একদিন। এখন চলি, নমস্কার!

নমস্কার।

প্রকাশবাবু চলিয়া গেলেন। শঙ্কর পুনরায় পথ চলিতে লাগিল। কিছুদূর অন্যমনস্কভাবে হাঁটিবার পর সহসা তাহার মনে হইল, এ সে কি করিতেছে। শৈলর কাছে হাত পাতিয়া টাকা চাহিবে! শৈলর টাকা লইয়া সে—। না, তাহা অসম্ভব। তাহা সে কিছুতেই পারিবে না।

শঙ্কর ঘুরিয়া অন্যপথ ধরিল। একেবারে বিপরীত দিকে চলিতে শুরু করিল। দ্রুতবেগেই চলিতে লাগিল। কোথায় যাইবে ঠিক নাই। কেবল তাহার মনে হইতেছে, অবিলম্বে একটা কিছু করিয়া ফেলিতে হইবে, অবিলম্বে একটা কিছু করিয়া ফেলিতে না পারিলে সে পাগল হইয়া যাইবে। দ্রুতবেগে পথ অতিবাহন করিতে করিতে সে ভাবিতে লাগিল, কি আশ্চর্য, টাকাটাই শেষে এত বড় হইয়া দাঁড়াইল! মুক্তো তাহাকে চায় না—টাকা চায়! আশ্চর্য!

কপাট ভেজানো ছিল, ঠেলিতেই খুলিয়া গেল।

শঙ্কর ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল, কেহ নাই। কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় হঠাৎ মুক্তো আসিয়া প্রবেশ করিল।

এ কি, হঠাৎ আপনি যে এ সময়ে?

এলাম।

মুক্তো একদৃষ্টে খানিকক্ষণ শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর মুচকি হাসিয়া বলিল, বসুন। আসছি এখনি।

শঙ্করকে কোনো কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া মুক্তো বাহির হইয়া গেল। অবকাশ দিলেও যে শঙ্কর বিশেষ কিছু বলিতে পারিত, তাহা নয়। বলিবার মতো কোনো বক্তব্য তাহার ওষ্ঠাগ্রে ছিল না। শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, ভাবিতে লাগিল, মুক্তো ফিরিয়া আসিলে তাহাকে কি বলিবে! বলিবার তো কিছু নাই। সত্যই কি কিছুই নাই? সত্যই কি মুক্তো টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না? মুক্তোর মুখ দেখিয়া, কথাবার্তা শুনিয়া তাহা তো মনে হয় না!

আপনি এখানে হামেশা কি করতে আসেন মোসায়, বলেন তো?

শঙ্কর চাহিয়া দেখিল, লুঙ্গি-পরা গুণ্ডা-গোছের একটা লোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ঘাড়ে একদম চুল নাই, সামনে ঘোড়ার মত চুল, মাংসল মুখে নিষ্ঠুর এক জোড়া চোখ,—অধরোষ্ঠের নীচে এক গোছা মিশকালো নুর, দাড়ি নাই, গোঁফ আছে—কিন্তু পুরাপুরি নাই, মাঝখানে খানিকটা কামাইয়া ফেলাতে মাত্র ঠোঁটের দুই পাশে খানিকটা ঝুলিতেছে।

শঙ্কর সবিস্ময়ে লোকটার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মোতলবখানা কি মোসায়ের?

শঙ্কর নির্বাক।

জোবাব দিচ্ছেন না যে বড়?

তোমাকে জবাব দেব কেন, তুমি কে?

হামি তোমার বাপ। শালা হারামিকা বাচ্চা, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

খবরদার।

শঙ্কর হঠাৎ ঘুষি পাকাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেই মুক্তো ছুটিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল।

এ কি কাণ্ড! বাঘা, এসব কি হচ্ছে?

বাঘা বলিল, বাঃ, তুমিই তো বিবিজান আসতে বললে হামাকে। আভি বলছো, এসব কি হচ্ছে? গরদনিয়া না দিলে কি এ হারামির বাচ্চা নিকল্‌বে?

আচ্ছা, যা তুই।

বিনা বাক্যব্যয়ে বাঘা বাহির হইয়া গেল। যেন পোষা কুকুর।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, লোকটা কে?

ও বাঘা। আমাদের আপনার লোক।

আপনার লোক মানে?

মুচকি হাসিয়া মুক্তো বলিল, আপনার লোক মানে কি, তা জানেন না? যারা বিপদে আপদে রক্ষে করে, তারাই আপনার লোক। ওরা ছাড়া আমাদের আপনার লোক আর কে আছে বলুন?

শঙ্কর বজ্রাহতের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। বিপদে আপদে রক্ষা করে!

অমন করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন, চা আনতে দিয়েছি।

শঙ্কর কোনো কথা না বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

শঙ্করবাবু, একটি কথা শুনে যান, দুটি পায়ে পড়ি আপনার—শুনুন—শুনে যান—

শঙ্কর আর ফিরিয়া চাহিল না। যতক্ষণ দেখা গেল, মুক্তো শঙ্করের পানে চাহিয়া রহিল; কিন্তু বেশিক্ষণ দেখা গেল না। কতটুকুই বা গলি, শঙ্কর দেখিতে দেখিতে পার হইয়া গেল! মুক্তো তবু সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পুণ্যলেশহীন অন্ধকার পতিতা-জীবনে একটিমাত্র পুণ্য-প্রেরণার শিখা জ্বলিয়াছিল। সেই শিখার ইন্ধন যোগাইতে গিয়াই সে নিঃস্ব হইয়া গেল। শঙ্করের মতো ছেলেকে সে নষ্ট করিতে চাহে নাই। যেদিন তাহাকে প্রথম দেখিয়াছিল, সেই দিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—যেমন করিয়া হউক, পঙ্কিলতা হইতে ইহাকে সে রক্ষা করিবে। অন্তর্দ্বন্দ্বে সে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, কিন্তু হার মানে নাই। শঙ্করকে পঙ্ককুণ্ড হইতে সত্যই রক্ষা করিয়াছে।

কিন্তু এখন তাহার সমস্ত নারী-হৃদয় উন্মথিত করিয়া যে দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল, তাহা স্বস্তির নিশ্বাস নহে। তাহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে কে যেন বলিতেছিল—তুমি এ কি করিলে, এ কি করিলে—ও যে চলিয়া গেল! মুক্তো বুঝিয়াছিল, শঙ্কর আর আসিবে না, শূন্য গলিটার পানে চাহিয়া তবু সে দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ হাঁটিবার পর শঙ্কর অন্যমনস্ক হইয়া এমন একটা গলিতে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, যাহা তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল, ব্লাইন্ড লেন, বাহির হইবার পথ নাই। ফিরিতে হইল। কিছুদূর আসিবার পর দেখিতে পাইল, একটা বাড়ির দরজা খুলিয়া একটি মেয়ে বাহির হইয়া সামনের দরজার কড়া নাড়িতেছে। শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল।

এই গলি থেকে বেরুবার রাস্তাটা কোন্ দিকে বলতে পার? আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি।

মেয়েটি বলিল, আর একটু এগিয়ে ডান দিকে গেলেই রাস্তা পাবেন।

শঙ্কর আগাইয়া গেল, আগাইয়া সত্যই দেখিল, ডান দিকে বাহির হইবার পথ রহিয়াছে। আরও খানিকটা গিয়া বউবাজারে পড়িল। সামনেই একটা ট্রাম পাইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল। একটু পরেই কিন্তু নামিয়া যাইতে হইল। সঙ্গে পয়সা ছিল না এবং সে কথা মনেও ছিল না। শঙ্কর আবার হাঁটিতে লাগিল। গলির সেই মেয়েটির মুখখানি মাঝে মাঝে মনে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। ভারি সুন্দর স্নিগ্ধ মুখখানি! মুক্তোর মুখখানিও মনে পড়িল। পড়ুক, কিন্তু মুক্তোর কাছে সে আর যাইবে না। যাইবার আর উপায়ও নাই। অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে যবনিকাপতন হইয়া গিয়াছে। ভালোই হইয়াছে। একটা অস্বস্তিকর দুঃস্বপ্ন হইতে সে যেন সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে। আরও কিছুদূর গিয়া শঙ্করের চোখে পড়িল, একটা পাগলা ডাস্ট্‌বিন হইতে এঁটো ভাত তুলিয়া খাইতেছে। মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি, গায়ে একটা ছেঁড়া কোট ছাড়া আর কিছু নাই। শঙ্করের মনে পড়িল, এই লোকটাই কিছুদিন আগে সারকুলার রোডে মাথায় কাগজের টুপি পরিয়া সকলকে নির্বিকার চিত্তে সেলাম করিয়া বেড়াইতেছিল। এখনও নির্বিকার চিত্তে ডাস্ট্‌বিন হইতে ভাত তুলিয়া খাইতেছে। ভণ্টু অথবা বক্‌সি মহাশয় দেখিলে মোস্তাককে চিনিতে পারিত।

শঙ্কর হাঁটিতে হাঁটিতে অবশেষে হস্টেলের দিকেই ফিরিতে লাগিল। মুক্তোর কাছে আর যাইবে না, ইহা ঠিক করিবার পর হইতে শঙ্করের মন যেন অনেকটা হালকা হইয়া গিয়াছে। অনেক দিন কারাবাসের পর যেন সহসা মুক্তি পাইয়া বাঁচিয়াছে। হস্টেলে ফিরিয়া দেখিল, তাহার নামে একটা জরুরি টেলিগ্রাম আসিয়াছে—বাবা অবিলম্বে বাড়ি যাইতে বলিতেছেন।

অবিলম্বে কলিকাতা ত্যাগ করিবার একটা অজুহাত পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল।

।। সতেরো ।।

যদিও সে মনে মনে এরূপ কিছু একটা প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু এতটা প্রত্যাশা করে নাই। আসিয়াই যে দুইজন কন্যাপক্ষীয় ভদ্রলোকের সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা সে ভাবিতে পারে নাই। কিছুকাল পূর্বে যখন সে বাবাকে চিঠি লিখিয়াছিল যে তাহার এখন বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই, তখন তাহাই তাহার সত্য মনোভাব ছিল। কিন্তু এখন তাহার আর সে মনোভাব নাই। দুই দিনে সমস্ত বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার সমস্ত দেহে মনে যে ক্ষুধা জাগিয়াছে, তাহাকে নিবৃত্ত করিতে না পারিলে সে পাগল হইয়া যাইবে। মুক্তোকে সে পাইবে না, পাইতে পারে না এবং এখন পাইতেও চাহে না। তাহার পঙ্কিল স্পর্শ হইতে সে যে মানে মানে দূরে চলিয়া আসিতে পারিয়াছে, এজন্য সে আনন্দিত। পঙ্কিল স্পর্শ! এখন মুক্তোর স্পর্শকে পঙ্কিল স্পর্শ মনে হইতেছে।

বাড়িতে আসিয়া দেখিল, বৈঠকখানায় দুইজন অপরিচিত ব্যক্তি বসিয়া রহিয়াছেন। পুরাতন ভৃত্য ব্রজ সর্বাগ্রে চুপিচুপি সংবাদটি দিল—ইহারা তাহার বিবাহের সম্বন্ধে পাকা কথা কহিতে আসিয়াছেন। সাড়া পাইয়া মা বাহির হইয়া আসিলেন। মায়ের চেহারা দেখিয়া শঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া গেল। মা এত রোগা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত শরীরের রস কে যেন শোষণ করিয়া লইয়াছে, মুখের দিকে তাকানো যায় না। শুষ্ক শীর্ণ পাণ্ডুর মুখচ্ছবি। চোখ-মুখের দীপ্তি নাই, কেমন যেন অসহায় অর্থহীন ভাবে শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—যেন দেখিয়াও দেখিতেছেন না। শঙ্কর প্রণাম করিল। যন্ত্রচালিতবৎ তিনি আশীর্বাদ করিলেন। মস্তক চুম্বন করিয়া বলিলেন, আয়, ভেতরে আয়।

শঙ্কর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। শঙ্করকে বিছানায় বসাইয়া হাত দিয়া চিবুক তুলিয়া ধরিয়া মৃদু হাসিয়া মা বলিল, একবারও কি মাকে মনে পড়ে না?

শঙ্কর এতদিন যে জগতে বিচরণ করিতেছিল, সে অন্য জগৎ। অনেকদিন পরে সহসা মায়ের কাছে আসিয়া যেন নিজেকে ঠিক স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না। কেমন যেন খাপ খাইতেছিল না। মায়ের কথা শুনিয়া সে মনে মনে লজ্জিত হইল। মুখে বলিল, কলেজের ছুটি ছিল না—

মা ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, হাত-মুখ ধো, খাবার আনি।

মা বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্করের মনে সহসা সেকালের মায়ের মুখখানা ফুটিয়া উঠিল—যখন মা টকটকে লালপাড় শাড়ি পরিতেন, যখন তাঁহার মুখখানি মহিমায় প্রদীপ্ত ছিল। পরক্ষণেই পাগলিনীর ছবিটাও মনে পড়িল। জানালার গরাদের সঙ্গে হাত বাঁধা, অসংলগ্ন আর্ত চিৎকার! এখন আবার কি চেহারা—সশঙ্কিত, অসমর্থ, ক্লান্ত—সমস্ত জীবনশক্তিকে কে যেন নিঙড়াইয়া বাহির করিয়া লইয়াছে।

অম্বিকাবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন :

তুমি চা-টা খেয়ে বাইরে এস একবার, ওঁরা তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন একটু।

ওঁরা কারা?

শিরীষবাবু আর মুকুজ্জেমশাই—শিরীষবাবুর বন্ধু। শিরীষবাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে।

যদিও শঙ্করের মত বদলাইয়াছিল, তথাপি সে বলিল, আমি তো বলেছিলাম—

জানি, চিঠি পেয়েছি তোমার। কিন্তু তোমার মতের সঙ্গে আমার মতের মিল হল না, আই অ্যাম সরি। চা-টা খেয়ে বাইরে এস।

আমার মতের কি কোনো দাম নেই বলতে চান?

তোমর নিজের দামই যখন এখনও পর্যন্ত অনিশ্চিত, তখন তোমার মতের দাম সুনিশ্চিত হবে কি করে?

তার মানে?

এটা কি সত্যি কথা নয় যে, আমার দামেই তুমি সমাজে এখনও পর্যন্ত বিকোচ্ছ? সুতরাং

তোমার সম্বন্ধে আমার অভিরুচি এবং অভিমতই মানতে হবে তোমাকে। তোমার স্বতন্ত্র মত তখনই সহ্য করব, যখন স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। যতক্ষণ তা না করতে পারছ, ততক্ষণ আমার কথা শুনেই চলতে হবে তোমাকে।

শঙ্করের মাথার ভিতর যেন দপ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, কে যেন সজোরে তাহাকে কশাঘাত করিল। ইচ্ছা হইল, তখনই উঠিয়া বাহিরে চলিয়া যায়, কিন্তু সে পারিল না। কিছুই পারিল না। একটা কথা পর্যন্ত বলিতে পারিল না। বজ্রাহতের মতো চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অম্বিকাবাবু বাহিরে চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, চা-টা খেয়ে এস বাইরে—ডোন্‌ট বি এ ফুল।

শঙ্কর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মানসপটে মুক্তোর মুখচ্ছবি ফুটিয়া উঠিল, যেন শুনিতে পাইল, মুক্তো বলিতেছে—এ ক-টা টাকায় কি হবে, এই নিন আপনার টাকা, গরিবের ছেলের এ সব ঘোড়ারোগ কেন বাপু!

টাকা, টাকা, টাকা! টাকা না থাকিলে পৃথিবীতে কেহ সম্মান করে না, এমন কি পিতাও না। শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, কিন্তু উঠিয়া চলিয়া যাইতে পারিল না, তাহার অন্তরবাসী আত্মসম্মানহীন কাঙালটা বিবাহ করিবার লোভে এতবড় অপমান সহ্য করিয়ও উন্মুখ হইয়া বসিয়া রহিল।

পাশের ঘরে কথাবার্তা চলিতেছে। শঙ্কর উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল।

শিরীষবাবু মিনতি সহকারে বলিতেছিলেন, দেখুন আমি অতি দরিদ্র, অত টাকা আমি দিতে পারব না। একটু বিবেচনা করতে হবে।

অম্বিকাবাবু বলিলেন, বিবেচনা করেই বলছি! আড়াই হাজার টাকা এমন কিছু বেশি নয়।

আমার পক্ষে বেশি। আপনি দয়া করলে—

দেখুন, যারা কথায় কথায় দয়া প্রার্থনা করে, সেই সব আত্মসম্মানহীন লোকের ওপর আমার কেমন যেন শ্রদ্ধা কমে যায়। যখন পড়তাম, তখন করালীচরণ বলে একটি ছেলে আমাদের মেসে থাকত। তার অনেক দোষ ছিল, কিন্তু তার আত্মসম্মানের জন্যেই তাকে আমরা সবাই খাতির করতাম। আমাকে 'দাদা, দাদা' বলত, পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল; কিন্তু তাকে শ্রদ্ধা করতাম তার ওই আত্মসম্মানবোধের জন্যে। সেদিন অনেকদিন পরে তার সঙ্গে দেখা। সে জ্যোতিষচর্চা করছে শুনে তার কাছে আমার আত্মীয়ের কুষ্ঠি নিয়ে গেলাম দেখাতে। সে প্রথমেই বললে, অম্বিকাদা, দশ টাকা দক্ষিণা লাগবে কিন্তু। আমি তার মুখের দিকে চাইতেই সে বললে, দশ টাকা আপনার কাছে না নিলেও আমার চলে যাবে, কিন্তু আপনি শুধু শুধু আত্মসম্মানটা খোয়াবেন কেন? আমাদের দেশের লোক কিছুতে এ সামান্য কথাটা মনে রাখে না! তারা সর্বদাই সকলের কাছে গলবস্ত্র হয়ে কৃপাভিক্ষা করছে। আশা করি, আপনি তাদের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র।

শিরীষবাবু এই তীক্ষ্ণ বক্তৃতাটি শুনিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। বলিলেন, সত্যি বড় দরিদ্র আমি।

মুকুজ্জেমশাই স্মিতমুখে বসিয়াছিলেন; বলিলেন, আচ্ছা, টাকার জোগাড় করা যাবে। উনি যা বলেছেন তা ঠিকই।

শিরীষবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

অম্বিকাবাবু বলিলেন, আড়াই হাজার টাকা এমন কিছু তো বেশি নয়—

শঙ্কর আর সহ্য করিতে পারিল না, দ্বার ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। বলিল, আমি এক পয়সা চাই না। আপনারা যদি আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চান, বিনাপণেই আমি বিয়ে করে আসব। মেয়েও দেখতে চাই না আমি।

সকলেই অবাক হইয়া গেলেন।

অম্বিকাবাবু শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া সিগারের ছাইটা ধীরে ধীরে ঝাড়িলেন। তাহার পর শিরীষবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, তা হলে তো মামলা মিটেই গেল। সংসারসমুদ্রে নৌকোতে পাড়ি দেবার সাহস বাবাজীবনের আছে দেখছি। আপনাদেরও যদি ওর দুঃসাহসের ওপর ভরসা থাকে, দিন ওর সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে—আই হ্যাভ নো অবজেক্‌শন। আমি ওদের সুবিধের জন্যেই নৌকার চেষ্টায় ছিলাম।

চক্ষু বুজিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি সিগারে একটু মৃদু টান দিলেন। মুকুজ্জেমশাই একদৃষ্টে শঙ্করের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

শঙ্কর আর দাঁড়াইল না, বাহির হইয়া গেল।

।। আঠারো ।।

অল্পদিনের মধ্যেই শঙ্করের বিবাহ হইয়া গেল।

বলা বাহুল্য, অম্বিকাবাবু বিবাহে যোগদান করেন নাই। শঙ্কর বন্ধুবান্ধব কাহাকেও এমনকি ভণ্টুকেও খবর দেয় নাই। শিরীষবাবু অমিয়াকে গহনাপত্র ছাড়া নগদ এক হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, শঙ্কর সে টাকা গ্রহণ করে নাই। সত্য সত্যই বিনাপণে সে অমিয়াকে বিবাহ করিল। শুভদৃষ্টির সময় শঙ্কর সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, মেয়েটি তো অচেনা নয়, কোথায় যেন ইহাকে দেখিয়াছে! হঠাৎ মনে পড়িল, কিছুদিন আগে একটা ব্লাইন্ড লেনে ঢুকিয়া সে পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এই মেয়েটিই তাহাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছিল।

অমিয়াও সবিস্ময়ে দেখিল যে, একাগ্র মনে শিবপূজা করা সত্ত্বেও ক্যালেন্ডারের শিবের চেয়ে তাহার স্বামী ঢের বেশি সুন্দর হইয়াছে। শান্তি, বিলু, কমলি, টগর, এমন কি রেণুদির বরের চেয়েও তাহার বর দেখিতে ভালো।

কেমন চমৎকার চোখ দুইটি!

।। উনিশ ।।

শঙ্কর হস্টেলে বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল তাহার জীবনের এই প্রধান ঘটনাটি কত সহজে ঘটিয়া গেল! কিছুদিন পূর্বে সে স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, সে বিবাহ করিবে। সহসা সে আবিষ্কার করিল যে তাহার জীবনের গতিকে যতবার সে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, ততবারই তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিবার পর সে ঠিক করিয়াছিল,

অবিবাহিত থাকিয়া আজীবন দেশসেবা করিবে। কংগ্রেসে ভলান্টিয়ারি করিয়া, বন্যা-প্রপীড়িতদের জন্য চাঁদা আদায় করিয়া, দ্বারে দ্বারে খদ্দর ফেরি করিয়া এবং ঘরে ঘরে চরকা বিতরণ করিয়া অদ্ভুত একটা উন্মাদনার মধ্যে কিছুকাল তাহার কাটিয়াছিল। এ উন্মাদনা কিন্তু বেশিদিন রহিল না। আই. এস-সি এবং বি. এস-সি পড়িতে পড়িতে বিজ্ঞানের নেশায় তাহাকে পাইয়া বসিল। দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, বিজ্ঞানের সেবা করিলেই প্রকৃত দেশসেবা করা হইবে। অবৈজ্ঞানিক রীতিতে দেশসেবা অর্থহীন। এ যুগে চরকা চালাইবার চেষ্টা বাতুলতা। বৈজ্ঞানিক পন্থায় দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান-চেষ্টাই সমীচীন। সুতরাং ঠিক করিয়াছিল, আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া বিজ্ঞানচর্চাই তাহাকে করিতে হইবে। কিন্তু এসব মফঃস্বলীয় কল্পনা কলিকাতায় আসিয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া শঙ্কর নিজেকে যেন পুনরায় আবিষ্কার করিল। দেখিল, তাহার মন অনিবার্য টানে যে দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, তাহা বিজ্ঞান নয়—সাহিত্য। আরও আবিষ্কার করিল যে, নারী-সঙ্গ-বর্জিত জীবন আর যেই যাপন করিতে পারুক, সে পারিবে না। তাহার একজন সঙ্গিনী চাই। তাহার এই অন্তর্নিহিত কামনার টানে মিষ্টিদিদি, রিনি, মুক্তো আকস্মিকভাবে আসিল ও চলিয়া গেল। অমিয়ার মুখখানি তাহার মনে পড়িল। কত ছেলেমানুষ এবং কত লাজুক! ফুলশয্যার রাত্রে লজ্জায় চোখই খুলিল না। কোথায় ছিল এই অমিয়া? কোন্ অজ্ঞাতলোক হইতে সহসা বাহির হইয়া আসিয়া তাহার জীবনে এমন কায়েমি আসন দখল করিয়া বসিল।

পিওন আসিয়া প্রবেশ করিল এবং চিঠি দিয়া গেল। বাবার চিঠি। শঙ্কর এইরূপই কিছু একটা প্রত্যাশা করিতেছিল, তবু সে পত্রখানি পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। পত্রখানি এই—

কল্যাণবরেষু,

বিবাহ-ব্যাপারে তোমার স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়া সুখী হইয়াছি। অপরের টাকা না লইয়া স্বাবলম্বী হইবার সাহস তোমার আছে, ইহার প্রমাণ তুমি দিয়াছ। শক্তিও যে আছে, সে প্রমাণও আশা করি দিতে পারিবে। সুতরাং আগামী মাস হইতে তোমার খরচ দেওয়া আমি বন্ধ করিলাম। যে সমর্থ, তাহার অপরের সাহায্যের প্রয়োজন নাই। পৃথিবীতে অসমর্থ অসহায় লোক অসংখ্য। নিজেদের আত্মীয়—তোমার মামাতো-ভাই নিত্যানন্দ টাকার অভাবে পড়াশোনা বন্ধ করিয়াছে। যে টাকাটা তোমাকে দিতাম, তাহা তাহাকে দিলে সে বেচারা বোধহয় এম. এ-টা পাস করিতে পারিবে। টাকাটা তাহাকেই দিব স্থির করিয়াছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে তোমার স্পর্ধার অনুরূপ শক্তি ও আত্মসম্মান দান করুন। আমার আশীর্বাদ জানিবে।

আশীর্বাদক
শ্রীঅম্বিকাচরণ রায়

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

।। তৃতীয় অধ্যায় ।।

।। এক ।।

একটি সংকীর্ণ গলি-পথে বাইকটি ঠেলিয়া ভণ্টু চলিয়াছিল, বাইকের পিছনের চাকাটায় গোলমাল হইয়াছে, হাওয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। শীঘ্র সারাইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ পকেট শূন্য। একেবারে শূন্য নয়, একটি অর্ধভুক্ত কাঁচা পেয়ারা আছে। সকালে আপিস যাইবার মুখে মৃন্ময়ের বাসায় সে কিছু টাকার চেষ্টায় গিয়াছিল। মৃন্ময় চিন্ময় কেহই বাড়িতে ছিল না, ছিল, হাসি। পেয়ারা কিনিয়া সে গোয়াভা জেলি প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিতেছিল। হাসির নিকট হইতে টাকা চাওয়া যায় না, কিন্তু পেয়ারা চাওয়া যায়। গোটা-দুই ডাঁসা পেয়ারা সে সংগ্রহ করিয়াছিল। ভাগ্যিস করিয়াছিল, তাই অফিসের পর কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিয়াছে। এখন চলিয়াছে নিবারণবাবুর নিকট, ধারের চেষ্টায়। অবিলম্বে কিছু টাকার প্রয়োজন। এক-আধ টাকা নয়, সাড়ে পাঁচশত টাকা। করালীচরণ দ্রাবিড় যাইবে বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে যেমন করিয়া হউক টাকাটা তাহাকে দিতেই হইবে। কি কুক্ষণেই যে সে করালীচরণের টাকায় হাত দিয়াছিল। এ টাকা না পাইলেও তাহার সংসার নিশ্চয়ই চলিয়া যাইত। খুচখুচ করিয়া টাকাগুলি খরচ হইয়া গিয়াছে, এখন মহা মুশকিল। হঠাৎ সাড়ে পাঁচশত টাকা জোগাড় করা কি সহজ? বউদিদির অলঙ্কারগুলিও নাই। দাদা তাহার কিয়দংশ পূর্বেই সাবাড় করিয়াছিলেন, তাহার বি. এস-সি পরীক্ষায় ফি জমা দিবার সময় রুলি-জোড়া গিয়াছিল, ফন্তির অসুখের সময় হারটা গিয়াছে। নিরাভরণা বউদিদি শাঁখা লোহা ও সিঁদুরের সহায়তায় সধবার ঠাট কোনোরকমে বজায় রাখিয়াছে। বিড়ডিকার এ বিষয়ে মুখে অবশ্য কখনও কিছু বলেন না, কিন্তু না বলিলেও ভণ্টু সব বুঝিতে পারে। কিন্তু বুঝিতে পারিয়াই বা কি করিবে, গহনা গড়াইয়া দিবার সামর্থ্য তো তাহার নাই। বরং মনে হইতেছে, বউদিদির গহনাগুলি এ সময়ে থাকিলে কাজে লাগিত। তিন দিন হইতে সে করালীচরণকে এড়াইয়া চলিতেছে, টাকা না লইয়া তাহার সহিত দেখা করা অসম্ভব। শঙ্করের বহুদিন হইতে দেখা নাই। সেদিন হস্টেলে গিয়া সে যাহা শুনিল, তাহা অবিশ্বাস্য। শঙ্কর নাকি লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া বৈরাগী হইয়া গিয়াছে—হস্টেলের দারোয়ানটা বলিল। দারোয়ানের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার পাত্র ভণ্টু নয়। সে আরও খোঁজ করিয়া জানিল, ভীমজালে পড়িয়া ছোকরা গা-ঢাকা দিয়াছে। অত লদ্‌কালদ্‌কি করিলে ভীমজালে পড়িবে না! ইদানীং সে যে বড় একটা ধরা-ছোঁয়া দিত না, তাহার কারণ এতদিনে সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। কয়েকদিন পূর্বে ওরিজিন্যাল অর্থাৎ দশরথের মুখেও সে অতিশয় চমকপ্রদ একটি সংবাদ শুনিয়াছে। আধুনিক ছোকরাদের গালাগালি প্রসঙ্গে তাহাদের হ্যাংলামির উদাহরণস্বরূপ ওরিজিনাল শঙ্কর নামক একটি যুবকের উল্লেখ করিলেন। সে নাকি লুকাইয়া ওরিজিনালের রক্ষিতার নিকট যাতায়াত করে। কলেজের দুই-একজন প্রাক্তন সহপাঠীর নিকটও ভণ্টু শঙ্করের সম্বন্ধে নানা কথা

শুনিয়াছিল এবং সমস্ত শুনিয়া তাহার প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, 'চাম্‌ গ্যানচঅ' ভীমবেগে রসাতলের উদ্দেশ্যেই রানিং আপিস খুলিয়াছে। এখন যদি ছোকরার একবার নাগাল পাওয়া যাইত বড় ভালো হইত। আর যাই হোক, রাস্‌কেলটার মাথা বড় সাফ—কাব্যিরোগেই উহাকে খাইয়াছে।

মেজকাকা অর্থাৎ বাবাজি পুনরায় অন্তর্হিত হইয়াছেন। মায়ের বিষয়টি বাঁধা দিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এবং তাহারই সাহায্যে তিনি নাকি কুমারিকা অন্তরীপের সন্নিহিত কোনো নির্জন স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। ভণ্টুর মনে হইল, বাবাজির বিষয়টা হস্তগত করিয়া লইলে মন্দ হইত না। এ সময়ে অন্তত তাহা কাজে লাগিতে পারিত! বাবাজি তো দিতেই চাহিয়াছিলেন।

অন্ধকার গলি। গলির দুই পাশে ঘেঁষাঘেঁষি খোলার ঘর। কোনো ঘরে কলহের, কোনো ঘরে বেগুনভাজার, কোনো ঘরে হারমোনিয়ামের, কোনো ঘরে শিশুর ক্রন্দন রোল উঠিয়াছে। ভণ্টুর এসব দিকে লক্ষ্য নাই। বাইকটি ঠেলিতে ঠেলিতে নানা এলোমেলো চিন্তার মধ্যে একটি কথাই সে কেবল ভাবিতেছে, হঠাৎ এত টাকার কথা নিবারণবাবুর কাছে পাড়িবে কি করিয়া!

পৃথিবী বৈচিত্র্যময়ী। বিচিত্র লীলায় বিচিত্র ভঙ্গিতে বিচিত্র বিধানে জীবনধারার বিচিত্র বিকাশ। এ বৈচিত্র্যকে আমরা অন্তরের সহিত উপলব্ধি করি না বলিয়াই অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটিলে বিস্মিত হই। বস্তুত প্রকৃতির বিচিত্র লীলানিকেতনে প্রত্যাশিত বলিয়া কিছু নাই। কোনো কিছুকে আমরা প্রত্যাশিত বলিয়া মনে করি আমাদের কল্পনার দৈন্যবশত। আমাদের আরও একটা অভ্যাস—আমরা নিজেদের রুচি, বুদ্ধি, সংস্কার ও সুবিধা অনুযায়ী প্রত্যাশা করি, এবং নিজেদের রুচি, বুদ্ধি, সংস্কার ও সুবিধার প্রতিকূল কিছু ঘটিলেই তাহাকে 'অপ্রত্যাশিত' আখ্যা দিয়া বিস্মিত অথবা মর্মাহত হই। ভুলিয়া যাই যে বৈচিত্র্যই পৃথিবীর প্রাণধর্ম। প্রাণধর্মের প্রেরণায় প্রত্যাশিত, ঈষৎ-প্রত্যাশিত, অপ্রত্যাশিত— সর্বপ্রকার ঘটনাই ঘটে। আমরা ইহা জানি, বিচারের ক্ষেত্রে ইহা স্বীকার করি; কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে এতদনুসারে চলি না। ব্যবহারিক জীবনে আমরা আশা করি যে, আমাদের সংস্কার, সুবিধা এবং নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী সব কিছু ঘটিবে। কিন্তু তাহা ঘটে না,—কাহারও জীবনে ঘটে না, নিবারণবাবুর জীবনেও ঘটিল না। নিজের মেয়েকে কেহ মন্দ ভাবে না, নিজের বন্ধুর চরিত্রে বিশ্বাস করাও মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই সুবিধাজনক স্বাভাবিক ধারণার আরামদায়ক আবেষ্টনীতে মন নিশ্চিন্ত থাকে। রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় নানা বিপদ ঘটিতে পারে জানিয়াও আমরা ঘুমাই। সুতরাং মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত রকমে চমকিত হইতে হয়। সকালে উঠিয়া দেখি, চোরে সিঁধ কাটিয়াছে অথবা ঘরে আগুন লাগিয়া গিয়াছে। নিবারণবাবুর মুখে সমস্ত শুনিয়া ভণ্টু স্তম্ভিত হইয়া গেল। মাস্টার আস্‌মিকে লইয়া সরিয়াছে।

।। দুই ।।

ছোট স্টেশনটি এতক্ষণ নিবিড় অন্ধকারে অবলুপ্ত ছিল। রাত্রি বারোটার সময় কিছুক্ষণের জন্য তাহা সজীব হইয়া উঠিল। একটা গাড়ি আসিবে। স্টেশনের বাহিরে গভীর অন্ধকার ঝিল্লিস্বরে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। চারিদিকে কেবল মাঠ। একটি সরু রাস্তা স্টেশন হইতে মাঠের ভিতর দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া দুই ক্রোশ দূরবর্তী বড় রাস্তায় মিশিয়াছে। স্টেশনের নিকট

রেলের দুই-একটি কোয়ার্টার্র ছাড়া আর কোনো ঘরবাড়ি নাই। আশেপাশে কেবল দিগন্তব্যাপী প্রান্তর। অমাবস্যা, সূচীভেদ্য অন্ধকারে চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন। ট্রেন আসিল, দুই মিনিট থামিল এবং চলিয়া গেল। ট্রেন হইতে জন-দুয়েক যাত্রী নামিলেন, চিন্ময়ও নামিল। নির্দেশমত এই স্টেশনেই তাহার নামিবার কথা। অন্য যাত্রীদের সহিত চিন্ময়ও স্টেশনের বাহিরে সরু রাস্তাটার ওপর আসিয়া হাজির হইল। অন্য যাত্রীরা আপন আপন গন্তব্যপথে চলিয়া গেলেন। চিন্ময়ও একা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটি ছেলের আসিবার কথা, কিন্তু কই, কেহই তো আসে নাই! এই অন্ধকারে পথ চেনাও মুশকিল! চিন্ময় অনিশ্চিতভাবে এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিল।

আপনি কি জাফরানপুর যাবেন? কোমল বালককণ্ঠে অন্ধকারের মধ্যে কে যেন প্রশ্ন করিল।

আপনি কে?

আমি আপনাকে নেবার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি এখানে।

তাই নাকি! আচ্ছা, এদিকে এস।

অন্ধকারে একটি ছায়ামূর্তি নিকটে সরিয়া আসিল।

আলোর কাছে চল, দেখি তুমি কে!

স্টেশনের নিকটবর্তী হইয়া স্টেশনের আলোকে চিন্ময় চিনিতে পারিল। কলিকাতায় তাহাদের দলপতি দূর হইতে একদিন এই বালকটিকেই চিনাইয়া দিয়াছিলেন।

চিন্ময় প্রশ্ন করিল, কতদিন পূর্বে তুমি কলকাতায় গিয়েছিলে?

ও-মাসের পঁচিশে।

তারিখটাও মিলিয়া গেল।

চল, তা হলে যাওয়া যাক।

আবার তাহারা মাঠের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বালক প্রশ্ন করিল, আপনার নাম কি?

বাইশ নম্বর।

চলুন।

তরুণকান্তি পনেরো-ষোল বছরের একটি কিশোর। তাহারই ওপর নির্ভর করিয়া চিন্ময় অন্ধকারে মাঠে নামিয়া পড়িল। সমস্ত সন্ধ্যাটা গুমোট করিয়াছিল, এখন বেশ ঝিরঝির করিয়া বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু চারিদিকে কি ভীষণ অন্ধকার! চিন্ময় সহসা লক্ষ্য করিল, ছেলেটি তাহার পাশে পাশে নয়, আগে আগে চলিয়াছে।

তুমি আগে আগে যাচ্ছ কেন?

আমি আগে আগেই থাকি—আপনি আমার পিছু পিছু আসুন।

কেন বল তো?

বালক কোনো উত্তর দিল না। সে কিন্তু চিন্ময়ের সহিত চলিতে পারিতেছিল না, চিন্ময় তাহাকে বারম্বার ধরিয়া ফেলিতেছিল। তখন সে ছুটিয়া আবার খানিকটা আগাইয়া যাইতেছিল। চিন্ময়কে সে কিছুতেই আগাইয়া যাইতে দিবে না।

চিন্ময় হাসিয়া বলিল, অমন ছুটে ছুটে এগিয়ে যাবার দরকারটা কি? একসঙ্গে পাশাপাশি যাই চল না।

না, আমি এগিয়ে থাকব।

কেন?

এমনই।

চিন্ময় যে কার্যে চলিয়াছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা মানা। এই কিশোর তাহাকে জাফরানপুর অবধি পৌঁছাইয়া দিবে। সেখান হইতে অন্য উপায়ে কর্মস্থলে পৌঁছিতে হইবে। উভয়ে নীরবে মাঠ পার হইতে লাগিল। উভয়েই বেশ দ্রুতপদে চলিয়াছে, তাহার সঙ্গী আগাইয়া থাকিবার জন্য প্রায় ছুটিয়া চলিয়াছে। চিন্ময় প্রশ্ন না করিয়া পারিল না।

অত ছুটে চলবার দরকার কি?

আসুন না আপনি।

তুমি পাশাপাশি না চললে আমি যাব না।

আসুন না।

তুমি কেন এগিয়ে থাকতে চাও, না বললে আমি যাব না।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটু ইতস্তত করিয়া ছেলেটি অবশেষে বলিল, এ মাঠে বড় বড় গোখরো সাপ আছে। আমার টর্চ আনা উচিত ছিল, কিন্তু আমি ভুলে গেছি।

তাতে কি হয়েছে?

আপনাকে যদি সাপে কামড়ে দেয়? আমার ওপর ভার আছে আপনাকে জাফরানপুরে নিরাপদে পৌঁছে দেবার। আপনি আসুন।

তোমাকে যদি সাপে কামড়ায়?

আমার চেয়ে আপনার প্রাণের দাম ঢের বেশি। আসুন।

।। তিন ।।

শঙ্কর বিবাগী হইয়া যায় নাই।

পিতার পত্র পাইবার পরদিন সে হস্টেল ছাড়িয়া দিল, জিনিসপত্র ও বই বিক্রয় করিয়া খুচরা ধারগুলো শোধ করিয়া ফেলিল এবং উদভ্রান্তচিত্তে অনিশ্চিতভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে লাগিল। পকেটে সাড়ে বারো আনা পয়সা মাত্র সম্বল। বিরাট কলিকাতা নগরীতে মাথা গুঁজিবার স্থান নাই। শঙ্কর সহসা অনুভব করিল, কলিকাতায় ধনীর স্থান আছে, দরিদ্রের স্থান আছে, কিন্তু মধ্যবিত্তের স্থানাভাব। ধনীর প্রাসাদ আছে, দরিদ্রের ফুটপাত আছে, কিন্তু মধ্যবিত্তের—চক্ষুলজ্জাসম্পন্ন ভদ্রতাজ্ঞানবিশিষ্ট মধ্যবিত্তেরই মুশকিল। এখানে বিনা পরিচয়ে অথবা বিনা পয়সায় ভদ্রভাবে কোনো আশ্রয় পাইবার উপায় নাই। শঙ্করের যাহারা পরিচিত, তাহারা এত বেশি পরিচিত যে, শঙ্কর অসঙ্কোচে তাহাদের নিকট যাইতে পারে না। কোন্ লজ্জায় সে শৈলর বাড়ি যাইবে! তাহাকে সে চিরকাল অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছে, তাহার নিকট যাইবে অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে। এই একই কারণে ভণ্টুর নিকট যাওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া ভণ্টুদের অবস্থা সে ভালো করিয়াই জানে। তাহাকে আশ্রয় দেওয়ার মতো সঙ্গতি তাহাদের নাই। শিরীষবাবু বদলি হইয়া গিয়াছেন, থাকিলেও শঙ্কর এমন দীনবেশে শ্বশুরবাড়ি যাইতে পারিত না। প্রফেসার গুপ্তের শরণাপন্ন হইয়া অবিলম্বে একটা

টিউশনির বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে পারিলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। প্রফেসার গুপ্ত কি অবিলম্বে একটা টিউশনির ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন? যখন প্রয়োজন ছিল না, তখন একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, তাহাকে একটি টিউশনি জোগাড় করিয়া দিতে পারেন। এখনও কি পারিবেন? শিয়ালদহের সামনে একটা মুসলমানি দোকানে ঢুকিয়া সস্তায় কিছু রুটি-মাংস কিনিয়া শঙ্কর ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। স্টেশনের ঘড়িটাতে দেখিল, আড়াইটা বাজিয়াছে। রবিবার প্রফেসার গুপ্ত হয়তো বাড়িতেই আছেন। তাঁহার বাড়ির দিকেই শঙ্কর অগ্রসর হইল। কোনোক্রমে দশ-পনেরো টাকার মতো একটা টিউশনিও যদি জুটিয়া যায়! পথ চলিতে চলিতে মায়ের কথা তাহার মনে পড়িল। বাবা যে খরচ বন্ধ করিয়াছেন, মা কি তাহা জানেন? খুব সম্ভবত জানেন না। বাবা মায়ের দুর্বল মস্তিষ্ককে পারতপক্ষে বিচলিত করিতে চাহিবেন না। সে যে বিবাহ করিয়াছে, সে কথাও কি মা জানেন না? কিংবা হয়তো সব জানেন, বাবার ভয়ে কিছু করিতে পারিতেছেন না। জানুন আর নাই জানুন, শঙ্কর নিজে তাঁহাকে কখনও জানাইবে না। মাকে নিজের অবস্থার কথা জানানোর সরল অর্থ বক্রপথে পিতার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে যাওয়া। তাহা সে মরিয়া গেলেও করিবে না। সহসা অমিয়ার কথা তাহার মনে হইল। সে শিরীষবাবুর সঙ্গেই তাঁহার নূতন কর্মস্থল দিনাজপুরে গিয়াছে। অমিয়ার শিশুর মতো সরল মুখখানি চোখের ওপর ভাসিয়া উঠিল। নিতান্ত সরল! শঙ্করকে পাইয়া যেন বর্তিয়া গিয়াছে। এমন স্বামী যেন কাহারও নাই, হইতে পারে না। এতটা সরলতা কিন্তু শঙ্করের ভালো লাগে নাই। শঙ্করের পরিণত মনের ক্ষুধা কি ওই শিশুপ্রকৃতির অমিয়া মিটাইতে পারিবে? উহাকে স্নেহ করা চলে, উহার অযৌক্তির সারল্য দেখিয়া কৌতুকান্বিত হওয়া চলে, কিন্তু উহার সহিত রোমান্টিক প্রেম করা চলে না। ওইটুকু মেয়ে, ভালোবাসার কি বোঝে ও! শঙ্কর যেন নূতন রকম একটা দামী পুতুল এবং তাহারই একান্ত নিজস্ব—এই আনন্দেই অমিয়া বিভোর। শঙ্করের মনের নিগূঢ় আকুতির বিচিত্র পিপাসার কোনো খবর রাখা উহার পক্ষে সম্ভবই নয়। ও যদি কুটিল হইত, অপাঙ্গের বিলোল কটাক্ষে মুগ্ধ করিয়া ভ্রূভঙ্গি সহকারে ব্যাহত করিতে পারিত, তাহা হইলে শঙ্করের ভালো লাগিত। এ অতিশয় সরল, অত্যন্ত সহজ। বিনা প্রতিবাদে বাহুবন্ধে ধরা দেয়, বিনা প্রশ্নে সমস্ত কিছু বিশ্বাস করে, বিনা সঙ্কোচে কৃতজ্ঞ হয়। কোনো জটিলতা নাই, মনকে উৎসুক করিয়া তোলে না।

প্রফেসার গুপ্তের বাসায় পৌঁছিয়া শঙ্কর যাহা দেখিল, তাহা অপ্রত্যাশিত। প্রফেসার গুপ্ত ও মিষ্টিদিদি দক্ষিণ দিকের নির্জন বারান্দায় বসিয়া চা পান করিতেছেন। বাড়িতে বালক-ভৃত্যটি ছাড়া আর কেহ আছে বলিয়াও মনে হইল না।

শঙ্করকে দেখিয়া মিষ্টিদিদিই হাস্যমুখে সম্বর্ধনা করিলেন, এ কি, শঙ্করবাবু যে! অনেকদিন পরে দেখা হল আপনার সঙ্গে, বসুন।

নির্বিকারভাবে মিষ্টিদিদি কথাগুলি বলিলেন, শঙ্কর অবাক হইয়া গেল।

মুখখানা বড় শুকনো দেখাচ্ছে যে! বসুন না।

শঙ্কর উপবেশন করিল।

প্রফেসার গুপ্ত বালক-ভৃত্যটিকে ডাকিয়া, আর এক পেয়ালা চা ফরমাস করিলেন। তাহার পর শঙ্করের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, আমাদের কাব্য আলোচনা হচ্ছিল। 'কিং লিয়ারে'র গনেরিল আর রেগনকে কেমন লাগে তোমার?

শঙ্করের 'কিং লিয়ার' পড়া ছিল না, তবু বলিল, ভালোই লাগে।

মিষ্টিদিদি সবিস্ময়ে বলিলেন, ভালো লাগে আপনার? আপনার রুচি বদলেছে তা হলে বলুন। আগে তো ঝাঁজওয়ালা জিনিস বরদাস্ত করতে পারতেন না আপনি।

প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, ওর রুচির খবর রাখেন নাকি আপনি?

সামান্য একটু পরিচয় নিয়েছিলুম একদিন। একদিন একটু ঝাঁজালো সস্‌ চাখিয়েছিলুম, খেতে পারলেন না। কম ঝাঁজালো আরো খাবার ছিল, সেগুলো পর্যন্ত খেতে পারলেন না। উঠে যেতে হল ওঁকে।

তাই নাকি। আমার তো ধারণা ছিল, শঙ্কর খুব ঝালের ভক্ত।

শঙ্কর নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল কিনা তাহা সে নিজেও দেখিতে পাইল না, কিন্তু তাহার কান দুইটা গরম হইয়া উঠিল। মিষ্টিদিদি হাসিমুখে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, তারপর, আছেন কেমন বলুন? অনেক দিন আপনার কোনো খবর পাইনি। পড়াশোনা হচ্ছে কেমন?

পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছি।

ওমা, সে কি! এটা আপনার এগ্‌জামিনের বছর না?

প্রফেসার গুপ্তের চক্ষু দুইটিও প্রশ্নাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছ?

হ্যাঁ।

কেন, হঠাৎ হল কি?

বাবা খরচ দেওয়া বন্ধ করেছেন, তার অমতে বিনাপণে বিয়ে করেছি বলে।

মিষ্টিদিদি মুখে একটা বিস্মিত সহানুভূতির ভাব ফুটাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখ দুইটি হইতে একটা চাপা হাসি উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, হঠাৎ তাঁর অমতে বিয়ে করতে গেলে কেন?

একটি কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোকের ওপর অনুকম্পা হল।

মিষ্টিদিদি একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, তবু ভালো, আমি ভাবছিলুম, বুঝি আর কিছু।

শঙ্কর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া বলিয়া ফেলিল, আপনি ভাববেন বইকি।

এই কথায় মিষ্টিদিদি কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। উচ্ছ্বসিত হাস্যতরঙ্গে শঙ্করের ব্যঙ্গোক্তি কোথায় ভাসিয়া গেল, তাঁহাকে স্পর্শই করিতে পারিল না। চায়ের পেয়ালার বাকি চাটুকু নিঃশেষ করিয়া মিষ্টিদিদি উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, আমি এবার চলি তা হলে। আপনি একটা লোকের চেষ্টায় থাকবেন কিন্তু, আমরা আমাদের সমিতি থেকে আট আনা করে দিতে পারব। এর চেয়ে বেশি দেওয়ার ক্ষমতা নেই সমিতির। অত সস্তায় কোনো ট্রেন্‌ড নার্স পাওয়া যাবে না মানি, ট্রেন্‌ড্ নার্সের দরকারও নেই, পাহারা দেবার মতো একজন লোক পেলেই হল। বেঘোরে খাট থেকে পড়ে-টড়ে না যান ভদ্রলোক। ওষুধ খাওয়ারও হাঙ্গামা নেই। ওষুধ দিচ্ছেন আমাদের প্রকাশবাবু, হোমিওপ্যাথি, পনেরো দিন অন্তর এক ফোঁটা।-- এই বলিয়া তিনি একটু মুচকি হাসিলেন।

প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, আচ্ছা, চেষ্টায় থাকব—অত সস্তায় কোনো বিশ্বাসযোগ্য লোক পাওয়া শক্ত।

ওর চেয়ে বেশি দেবার ক্ষমতা আমাদের সমিতির নেই। অত দেবারও ক্ষমতা নেই, মিসেস স্যানিয়ালের বোন চুনচুনের স্বামী বলেই আমাদের যা ইন্টারেস্ট্। নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে কিছু টাকা জোগাড় করেছি আমরা।

টি. বি বলে সন্দেহ করেছেন, সেইটেই হয়েছে আরও মুশকিল বিনা—

ডাক্তাররা তাই বলছে, আমরা কি করব বলুন?

একটু হাসিয়া মিষ্টিদিদি আবার বলিলেন, কি করে চুনচুন যে ওই রোগা কুচ্ছিত লোকটার লাভে পড়ল, তাই ভেবে অবাক লাগে আমার।

প্রফেসার গুপ্ত মিষ্টিদিদির মুখের পানে ক্ষণিক চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশ তাঁহার মুখে মৃদু একটা হাসিও ফুটিয়া উঠিল। মিষ্টিদিদিও হাসিলেন। তাহার পর বলিলেন, মনে রাখবেন কথাটা। মিসেস স্যানিয়াল আমার ওপর ভার দিয়েছেন, আমাকে অপ্রস্তুত করবেন না যেন। শঙ্করবাবুকেও বলুন না ব্যাপারটা খুলে, উনিও হয়তো কোনো লোকের সন্ধান দিতে পারবেন। অনেক জায়গায় ঘোরেন তো, পুরুষমানুষ হলেও চলবে। তাহার পর হাতঘড়িটা দেখিয়া বলিলেন, উঃ বড্ড দেরি হয়ে গেছে আমার। এবার চলি আমি।

মিষ্টিদিদি চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারটা কি?

মিসেস মিত্রের একজন বান্ধবীর বোন চুনচুন কিছুদিন আগে যতীন হাজরা বলে একটি লোককে লুকিয়ে বিয়ে করে। যতীন হাজরার তিন কুলে কেউ নেই, প্রেসে না কোথায় একটা কাজ করত, কোনো রকমে চলে যাচ্ছিল। এখন সেই যতীন হাজরার হয়েছে টি. বি— নার্স করবার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। চুনচুনের দিদি মিসেস স্যানিয়াল চুনচুনকে কিছুতে সেখানে যেতে দেবে না। ওদের সমিতি থেকেই তাঁর চিকিৎসার খরচ চলছে, তাঁর থাকবার জন্যে একটা ঘরও ভাড়া করে দিয়েছেন ওঁরা, এখন সেবা করবার একজন লোক চাই। রোজ আট আনা করে পাবে সে। আছে এমন লোক তোমার সন্ধানে?

আমি করতে পারি।

তুমি!

আপত্তি কি, আমি আপনার কাছে এসেছিলাম একটা টিউশনির চেষ্টায়, যতদিন সেটা না জুটছে, ততদিন এই করা যাক।

সত্যি সত্যি তুমি পড়াশোনা ছেড়ে দেবে নাকি? ব্যাপারটা কি খুলে বল তো?

ওই তো বললাম, বাবা খরচ দেওয়া বন্ধ করেছেন।

প্রফেসার গুপ্ত কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, বেশ তো, টিউশনি করেই পড়াশোনা কর। পরীক্ষাটা দিয়ে ফেল।

ডিগ্রি লাভ করার কোনো সার্থকতা দেখতে পাচ্ছি না। বর্তমান যুগে টাকাটাই আসল, সময় নষ্ট না করে টাকা রোজগারের চেষ্টাতেই লেগে যাওয়া উচিত।

কিন্তু টাকা রোজগারের পথে বাঙালির ছেলের ডিগ্রিটাই আসল সম্বল। ওটা নিতান্ত তুচ্ছ করবার জিনিস নয়।

ডিগ্রি সম্বল বলেই বাঙালির ছেলেদের এত দুর্দশা।

তা হলে কি তোমার মতে লেখাপড়া করাটা অনর্থক?

যারা লেখাপড়ার জন্যেই লেখাপড়া করতে চায়, তারা তা করুক এবং সম্পূর্ণভাবে তার উপযুক্ত হোক। আমি ভেবে দেখেছি, আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

তার মানে?

বিদ্যার্থী হবার মতো মনের জোর নেই আমার। সকলে ব্রাহ্মণত্ব লাভের উপযুক্ত নয়।

তুমি যে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছ দেখছি।

শঙ্কর কোনো উত্তর দিল না। বালক-ভৃত্যটি এক পেয়ালা চা দিয়া গেল। শঙ্কর নীরবে চা পান করিতে লাগিল।

তুমি টিউশনি করেই টাকা রোজগার করবে ঠিক করেছ? ব্যবসা হিসেবে ওটা তো খুব প্রশস্ত পথ নয়।

যতদিন অন্য কোনো একটা উপার্জনের পথ না পাই, ততদিন টিউশনি করেই চালাব। তা ছাড়া উপায় কি? আপনি আপাতত যা হোক কিছু একটা জোগাড় করে দিন আমাকে।

একটি আই. এস-সি ছেলেকে কোচ করতে পারবে?

পারব।

কত মাইনে চাও?

আপনি যা ঠিক করে দেবেন।

গোটা চল্লিশ হলে চলবে?

চলবে।

দু বেলা পড়াতে হবে কিন্তু।

তাই পড়াব।

আচ্ছা, বলব তাঁদের তা হলে। একটি জুনিয়র প্রফেসারের সঙ্গে তাঁরা কথা বলেছেন, দরে বনছে না, সে ভদ্রলোক ষাট টাকা চান। তুমি চল্লিশ টাকায় রাজি তো?

হ্যাঁ। কবে থেকে পড়াতে হবে?

আসছে মাস থেকে।

ততদিন তা হলে এই টি. বি. রোগীটার সেবা করা যাক।

ওসবের মধ্যে আবার গিয়ে কি করবে? রোগটা ছোঁয়াচে এবং মারাত্মক।

তা হোক, তবু আমি যাব।

আচ্ছা পাগল তো! তোমার জীবনের মূল্য এখন অনেক বেশি। বিয়ে করেছ।

শঙ্কর উত্তরে শুধু একটু হাসিল।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, তোমার সেই বান্ধবীটির খবর শুনেছ?

কোন্ বান্ধবীটির?

বেলা মল্লিক।

না, অনেকদিন কোনো খবর জানি না।

সে এক বুড়ো সায়েবের সঙ্গে জুটেছে।

তার মানে?

একদিন বেলা সিনেমার সেকেন্ড শো থেকে বাড়ি ফিরে এসে দেখে, তাঁর বাড়ির ঠিক সামনে একটা বুড়ো সায়েব অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। চতুর্দিকে জনপ্রাণী কেউ নেই। বেলা জনার্দনকে ডেকে ধরাধরি করে অজ্ঞান সায়েবকে ঘরে নিয়ে এল। শুধু তাই নয়, একজন ডাক্তার ডাকলে এবং সেবা-শুশ্রূষা করে সায়েবকে চাঙ্গা করে তুললে।

সায়েবটা নিশ্চয় মাতাল।

না, তার স্ট্রোক হয়েছিল। অর্ধেক শরীরে পক্ষাঘাত হয়ে গেছে।

তারপর?

সায়েবের জ্ঞান হবার পর জানা গেল, সায়েব খাঁটি বিলিতি সায়েব, এখানে একটা সায়েবি দোকানে বড় চাকরি করে কিছুদিন পর রিটায়ার করে দেশে ফেরার কথা, এমন সময় এই বিপদ।

বেলার বাসার সামনে এল কি করে?

সায়েব নাকি এক ট্যাক্সিতে ছিল, ট্যাক্সিতেই অজ্ঞান হয়ে যায়। যত দূর মনে হচ্ছে, ওই ট্যাক্সিওলাই বেগতিক দেখে ওই নির্জন গলিতে সায়েবকে নামিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে। অজ্ঞান সায়েবকে নিয়ে সে আর ঝামেলায় ঢুকতে চায়নি।

তারপর? এ যে রীতিমতো রোমান্টিক ব্যাপার!

Truth is stranger than fiction.

তারপর কি হল?

তারপর যোগাযোগও দেখ অদ্ভুত, সায়েবের তিন কুলে কেউ নেই, থাকবার মধ্যে আছে একটি পিয়ানো। বেলাও নাকি মিস্টার বোসের বাড়িতে পিয়ানো বাজাতে শিখেছে।

শঙ্কর বলিল, হ্যাঁ, শৈলর পিয়ানোটা ও বাজাত শুনেছি।

ফলে বেলা এখন রোজ সন্ধেবেলায় সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত সায়েবকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনায়। সায়েবের 'কার' এসে ওকে নিয়ে যায়, দিয়ে যায়।

মাইনে নিশ্চয় পান এর জন্যে?

সেটা ঠিক জানি না আমি। তবে সায়েব জাত, কারও কাছে অমনই কিছু নেয় না। নিশ্চয়ই কিছু দিচ্ছে।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

প্রফেসার গুপ্তও বাতায়ন-পথে খানিকক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিলেন।

শঙ্কর অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিল, মান্তুরা কি এখানে নেই নাকি, কারও সাড়াশব্দ পাচ্ছি না?

না, ওরা অপর একটা বাড়িতে আছে। মান্তুর বিয়ে—

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

প্রফেসার গুপ্ত কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মিসেস মিত্রকে আপনি কি একটা চিঠি দেবেন? না, আমিই মুখে গিয়ে বলব?

তুমি ওই যক্ষ্মারোগীর সেবা না করে ছাড়বে না?

না।

তবে আর চিঠি লেখার দরকার কি, নিজেই গিয়ে বল।

তবু একটা লিখে দিন।

স্মিতহাস্য করিয়া প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, তা হলে প্যাডখানা আর কলমটা নিয়ে এস ওই টেবিলটা থেকে।

শঙ্কর আনিয়া দিল।

প্রফেসার গুপ্ত লিখিলেন—

মিসেস মিত্র,

অন্য লোক খোঁজার দরকার নেই। শঙ্করই সেবা করতে রাজি হয়েছে। এত সস্তায় এত ভালো লোক পাওয়া যেত না। কালকে এন্‌গেজ্‌মেন্টের কথা মনে আছে তো?

ইতি— গুপ্ত।

শঙ্কর পত্রখানি লইয়া চলিয়া গেল।

প্রফেসার গুপ্ত আসন্ন এন্‌গেজ্‌মেন্টটার কথা ভাবিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, ইভার চিঠির উত্তর দেওয়া হয় নাই। প্রায় দুই মাস হইল বেচারা চিঠি লিখিয়াছে। প্যাডখানা টানিয়া লইয়া তিনি ইভাকে চিঠি লিখিতে বসিলেন। উচ্ছ্বাসপূর্ণ দীর্ঘ একটা চিঠি লিখিয়া তখনই সেটা পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর অন্যমনস্কভাবে 'কুমারসম্ভব' খানা উল্টাইতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি এই শ্লোকটিতে আটকাইয়া গেল—

শুচৌ চতুর্ণাং জ্বলতাং শুচিস্মিতা
হরির্ভুজাং মধ্যগতা সুমধ্যমা।
বিজিত্য নেত্রপ্রতিঘাতিনীং প্রভা—
মনন্যদৃষ্টিঃ সবিতারমৈক্ষত।।

—শুচিস্মিতা কৃশোদরী তপস্যারতা উমা গ্রীষ্মকালে অনন্যদৃষ্টিতে সূর্যের পানে চাহিয়া আছেন। তুষারশীতল হিমালয়ের কন্যা উমা, যে হিমালয়ে।

ভাগীরথী নির্ঝরশীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃ কম্পিত দেবদারুঃ।
যদ্‌বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈরাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ।।

—সেই হিমালয়ের সুকুমারী কন্যা উমা শ্মশানবিলাসী সন্ন্যাসীর জন্য অগ্নিপরিবেষ্টিতা হইয়া সূর্যের দিকে চাহিয়া আছেন।

প্রফেসার গুপ্তের সহসা মনে হইল, এই দুরূহ তপশ্চারণ আজকাল আর কেহ করে না। শিবই আজকাল নানা উপহার লইয়া উমার পিছু পিছু ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

।। চার ।।

অমিয়ার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, রাজমহলের ভবেশবাবু ছাড়া পাইয়াছেন, মুকুজ্জেমশাইয়ের এবার নিশ্চিন্ত হওয়ার কথা; কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত নহেন। নিশ্চিন্ত থাকা তাঁহার স্বভাব নয়।

কোনো একটা কিছু লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে না পারিলে তিনি কেমন যেন স্বস্তি পান না। একটা কিছু জুটিয়াও যায়। মুকুজ্জেমশাই হরেরামবাবুর নিকটে গিয়াছিলেন। মফস্বলের একটি ক্ষুদ্র গ্রামে হরেরামবাবু পোস্ট-মাস্টারি করেন। নিতান্ত নিরীহ লোক, কাহারও সাতে-পাঁচে থাকেন না। থাকিবার অবসরই নাই। সকাল হইতে শুরু করিয়া রাত্রি আটটা নয়টা পর্যন্ত আপিসের কাজকর্ম শেষ করিতেই কাটিয়া যায়। নিড়বিড়ে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, অতিশয় ভালোমানুষ। মুকুজ্জেমশাই কিন্তু হরেরামবাবুকে বড় ভালোবাসেন এবং বছরে অন্তত একবার আসিয়া হরেরামবাবুর কাছে কয়েকদিন কাটাইয়া যান। এবারে আসিয়া কিন্তু কিছু অধিক দিন থাকিতে হইল। পাকেচক্রে অবস্থা একটু জটিল হইয়া উঠিল।

হরেরামবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র ভোম্বল তাঁহাকে মুশকিলে ফেলিয়া দিয়াছে। ভোম্বলের বয়স দশ-এগারো বছর মাত্র। কিন্তু হইলে কি হল, বাঘ-বকরি খেলায় সে মুকুজ্জেমশাইকে বার বার তিন বার হারাইয়া দিয়াছে। মুকুজ্জেমশাই বাজি রাখিয়া হারিয়া গিয়াছেন। মুকুজ্জেমশাই বাজি রাখিয়াছিলেন যে, ভোম্বল যদি তাঁহাকে তিন বার উপর্যুপরি হারাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে ভোম্বল যাহা খাইতে চাহিবে মুকুজ্জেমশাই তাহাই তাহাকে প্রাণ ভরিয়া খাওয়াইবেন। বিজেতা ভোম্বল মাংস খাইতে চাহিয়াছে। মুরারিপুর যদি শহর হইত অথবা হরেরামবাবু যদি একটু কম নিষ্ঠাবান হইতেন, তাহা হইলে মুকুজ্জেমশাইয়ের পক্ষে এই সামান্য প্রতিশ্রুতিটুকু পালন করা অসম্ভব হইত না। মুরারিপুরে কসাইয়ের দোকান নাই, হরেরামবাবু বৃথা-মাংস পছন্দ করেন না। মুকুজ্জেমশাই অনুরোধ করিলে হরেরামবাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও হয়তো রাজি হইতেন; কিন্তু কাহারও প্রিন্সিপ্‌লে আঘাত করা মুকুজ্জেমশাইয়ের স্বভাববিরুদ্ধ। যে যাহা লইয়া সুখে আছে, থাকুক—ইহাই তাঁহার মত। সুতরাং হরেরামবাবুকে এ অনুরোধ তিনি করিলেন না। কিন্তু ইহার পরিবর্তে তিনি যাহা করিলেন, তাহা প্রিন্সিপ্‌ল্-সঙ্গত হইলেও হরেরামবাবুর পক্ষে আরও সাংঘাতিক হইল। হরেরামবাবুকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, হরেরাম, আসছে অমাবস্যাতে এস, কালীপুজো করা যাক।

মনিঅর্ডার-রেজিস্ট্রি-ভি. পি-ইন্‌সিওর বিক্ষুব্ধ হরেরাম প্রথমে কথাটা হৃদয়ঙ্গমই করিতে পারিলেন না।

কি বলছেন?

আগামী অমাবস্যাতে, এস, কালীপুজো করা যাক।

কালীপুজো?

হরেরাম আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি সমস্ত দিন আপিস লইয়া ব্যস্ত থাকেন, ভোম্বলের সহিত মুকুজ্জেমশাইয়ের বাজির কোনো খবরই তিনি রাখেন না। বস্তুত ভোম্বল এবং মুকুজ্জেমশাই ছাড়া কেহই এ খবর জানে না। বিস্মিতনেত্রে হরেরাম চাহিয়া রহিলেন।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, শক্তিবংশের ছেলে তুমি, কালীপুজো করবে তাতে হয়েছে কি? তোমাকে কিছু করতে হবে না, আমিই সব ব্যবস্থা করব। একটি কালীমূর্তি আর একটি ভালো দেখে কালো পাঁঠা জোগাড় করতে হবে।

মুকুজ্জেমশাইয়ের সহিত হরেরামের অনেক দিনের পরিচয়। তিনি মুকুজ্জেমশাইয়ের মুখভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে আপত্তি করা বৃথা। মুকুজ্জেমশাই যাহা ধরেন, তাহা না

করিয়া ছাড়েন না। তা ছাড়া, দেবীপূজায় আপত্তি তুলিতে তাঁহার ধর্মভীরু মন ভীত হইল। বলিলেন, অমাবস্যার আর কদিন বাকি?

দশ দিন।

এর মধ্যে কি সব হয়ে উঠবে?

এর মধ্যে ছোটোখাটো মূর্তি একটা হবে না? খোঁজ কর, গ্রামে নিশ্চয় গড়তে পারে কেউ।

মাথা চুলকাইয়া হরেরাম বলিলেন, দেখি বংশীকে বলে। আমি কিছুই জানি না।

বংশী পিওন।

বংশীর সহায়তায় সাত-আট দিনের মধ্যে ছোট একটি প্রতিমা এবং নধর একটা পাঁঠা জোগাড় হইয়া গেল। ভোম্বল উল্লসিত হইয়া উঠিল। নিষ্ঠাবান পিতার সন্তান হইলে কি হয়, মাংসের প্রতি তাহার খুব লোভ। মাংস খাইতে পায় না বলিয়া লোভটা আরও বেশি। তাহার ভারি আনন্দ হইল। পিতামাতার জ্ঞাতসারে সে অবশ্য বেশি হর্ষপ্রকাশ করিতে সাহস করিল না। বাঘ-বকরি খেলার তুচ্ছ বাজির জন্য মুকুজ্জেমশাই এত কাণ্ড করিতেছেন, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে হরেরামবাবু অত্যন্ত চটিয়া যাইবেন। নিরীহ হরেরাম চটিয়া গেলে মার-ধোর অথবা হাঁক-ডাক করেন না, নীরবে উপবাস করিতে থাকেন। সুতরাং সহসা কেহ তাঁহাকে চটাইতে চাহে না। মুকুজ্জেমশাই বাঘ-বকরি প্রসঙ্গ তাঁহার নিকট উত্থাপিত করিলেন না। ভোম্বলও ভালোমানুষের মতো চুপ করিয়া রহিল।

বংশীর আনুকূল্যে মুকুজ্জেমশাই কালীপূজার আয়োজন যখন শেষ করিয়া আনিয়াছেন, এমন সময় অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত রকম একটি বাধা আসিয়া উপস্থিত হইল। পোস্টাল সুপারিন্টেন্ডেন্টের এক চিঠি আসিয়া হাজির। তাহার সারমর্ম—মুরারিপুরের কয়েকজন মুসলমান অধিবাসী অভিযোগ করিয়াছেন যে, মুরারিপুর পোস্ট-আপিসে নাকি কালীপূজা করা হইতেছে। অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এতদ্দ্বারা হরেরামবাবুকে পোস্ট আপিসে কালীপূজা করিতে নিষেধ করা হইতেছে। কোনো গভর্নমেন্ট আপিসে এরূপ পূজাদি করা নিয়মবিরুদ্ধ।

ভোম্বল অত্যন্ত দমিয়া গেল। সঙ্কল্পিত এবং আয়োজিত দেবীপূজায় বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে হরেরামবাবুও মনে মনে উদ্বিগ্ন হইলেন। দমিলেন না মুকুজ্জেমশাই। তিনি হাসিয়া বলিলেন, ওর জন্যে আর ভাবনা কি, ওই সামনের মাঠটায় একটা চালা তুলে ফেলে সেইখানেই পূজা করা যাবে। পোস্ট-আপিসে পূজা নাই বা করলাম আমরা, কি বল ভোম্বল?

ভোম্বল ভালোমানুষের মতো একবার আড়চোখে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। নিকটে উপবিষ্ট বংশীকে সম্বোধন করিয়া মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, তুমি দু-চারটে জনমজুর ডাকাও, বুঝলে বংশী—একটা ছোটখাটো চালা তুলতে আর কতক্ষণ যাবে? গ্রীষ্মকালে মাঠের মাঝখানে বরং ভালোই হবে। ও জমিটা তো রামকিষুণের—সে বোধহয় আপত্তি করবে না। তাকেও তুমি একবার জিজ্ঞেস করে এস।

বংশী রামকিষুণের অনুমতি লইবার জন্য চলিয়া গেল এবং একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, রামকিষুণের আপত্তি তো নাই-ই, সে বরং খুশিই হইয়াছে। সাধুবাবা ওখানে কালীমায়ীর পূজা করিবেন, ইহাতে আপত্তি করিবার কি আছে! সে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে।

ইহার জন্য আরও যদি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয়, সে করিতে প্রস্তুত আছে। মুকুজ্জেমশাই বংশীকে চালা তুলিবার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন এবং খড় বাঁশ প্রভৃতি কিনিবার জন্য টাকা বাহির করিয়া দিলেন। পূজার যাবতীয় খরচ মুকুজ্জেমশাই-ই বহন করিতেছেন, হরেরামের নিকট হইতে এক পয়সাও লইতে রাজি হয় নাই।

আয়োজিত কালীপূজায় বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে হরেরাম মনে মনে শঙ্কিত হইয়াছিলেন, এখন কর্তৃপক্ষের অমতে কালীপূজা করিতে আবার তিনি মনে মনে ইতস্তত করিতে লাগিলেন। যদিও পোস্ট-আপিসে করা হইতেছে না, একেবারে পোস্ট-আপিসের সীমানার বাহিরেই হইবে, তথাপি কর্তৃপক্ষের অমতেই তো হইবে! চাকরির যা বাজার, কোথা হইতে কি হইয়া যায়, কে বলিতে পারে? অথচ নিষ্ঠাবান হিন্দু সন্তান হইয়া আয়োজিত পূজা না করাটাও—। এক দিকে মা-কালী, অন্য দিকে পোস্টাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট,—নিরীহ নিষ্ঠাবান হরেরাম মর্মান্তিক দোটানায় পড়িয়া গেলেন। কিন্তু মুখুজ্জেমশাই মা-কালীর পক্ষে, নিরুপায় হরেরামকে চুপ করিয়াই থাকিতে হইল।

মুকুজ্জেমশাই মহা উৎসাহে জনমজুর লইয়া রামকিষুণের মাঠে চালাঘর তুলিতে লাগিয়া গেলেন। ভোম্বল মুকুজ্জেমশাইয়ের নিকট হইতে ফর্দ ও টাকা লইয়া ভালো ঘি গরমমসলা প্রভৃতির সন্ধানে বাজারের নানা দোকানে ঘুরিতে লাগিল। মুকজ্জেমশাই এত রকম মসলার ফিরিস্তি দিলেন যে, মুরারিপুরে সবগুলি মেলাই মুশকিল হইয়া উঠিল। সির্কা এবং জাফরান এ দুইটি দ্রব্য তো কোথাও মিলিল না।

বেলা তিনটা নাগাদ চালা খাড়া হইয়া গেল। চালার ব্যাপার শেষ করিয়া মুকুজ্জেমশাই মাংসের ব্যাপারে মন দিলেন। মুকুজ্জেমশাই ঠিক করিয়াছিলেন, রাত্রে পূজা হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই মাংসটি রাঁধিয়া ফেলিবেন। তিনি নিজেই রাঁধিবেন। ভোম্বল এবং তাহার কয়েকজন সঙ্গী গোল করিয়া নৈনিতাল আলু ছাড়াইতেছে। আলু ছাড়ানো হইয়া গেলে আলুগুলির গায়ে ছোট ছোট ছিদ্র করিয়া ভাজা মশলা পুরিতে হইবে। মুকুজ্জেমশাই নানা রকম মসলা ভাজিয়া গুঁড়া করাইতেছেন। অনেক কষ্টে জিওলপুর গ্রামের দৌলতরাম মাড়োয়ারির নিকট জাফরান পাওয়া গিয়াছে। সির্কা পাওয়া যায় নাই। মুকুজ্জেমশাই টক দই দিয়া তাহার অভাব পূর্ণ করিয়া লইবেন আশ্বাস দিয়াছেন। কালীপূজার আয়োজন পুরাদমে চলিতেছে, এমন সময় একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গোশকটে আরোহণ করিয়া স্বয়ং সুপারিন্টেডেন্ট মহাশয় হাজির হইলেন। তিন ক্রোশ দূরবর্তী স্টেশন হইতে মুরারিপুরে আসিতে হইলে গো-শকট ছাড়া অন্য কোনো যান নাই, সুতরাং মাননীয় সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহাশয়কে গো-শকটেই আসিতে হইয়াছে। প্রকাশ্যে সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহাশয় বলিলেন, তিনি মুরারিপুর পোস্ট-আপিস ভিজিট করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি মুসলমান সেই হেতু সকলে অনুমান করিতে লাগিল যে, তাঁহার কালীপূজা-সম্পর্কিত আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হইয়াছে কি না, তাহাই প্রত্যক্ষ কবিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন। চাকুরিজীবী নিরীহ হরেরাম বেশ একটু ঘাবড়াইয়া গেলেন। মুকুজ্জেমশাই ছিদ্রিত আলুগুলিতে মসলা পুরিতে পুরিতে একটু হাসিলেন এবং হরেরামকে বলিলেন, তুমি তোমার সুপারিন্টেন্ডেন্টকে সামলাও গিয়ে, এখানে আসবার দরকার নেই তোমার। আমরা সব ব্যবস্থা করে নিয়েছি।

হরেরাম সুপারিন্টেন্ডেন্টকে সামলাইতে লাগিলেন। মুকুজ্জেমশাই ভোম্বলদের 'মার্চেন্ট অব ভেনিসে'র গল্প বলিতে বলিতে মাংস রান্নার আয়োজনে ব্যাপৃত রহিলেন। সন্ধ্যা নাগাদ কালীপ্রতিমা আসিয়া চালায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলেন, গ্রামের পুরোহিত মহাশয় পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কালীপূজা হইয়া গিয়াছে। অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি থমথম করিতেছে। চালাঘরের পাশেই একটি তোলা উনুনে মুকুজ্জেমশাই মাংস রান্না করিতেছেন, সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত। নিকটেই ভোম্বল ও তাহার তিন-চারজন সঙ্গী গুটিসুটি হইয়া বসিয়া আছে। পুরোহিত মহাশয়ও মহাপ্রসাদ আস্বাদন করিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। জমির মালিক রামকিষুণ ও তাহার সম্বন্ধী খুবলালও সোৎসাহে জাগিয়া বসিয়া আছে। যদিও রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাহারও চোখে ঘুম নাই। মুকুজ্জেমশাই খুব জমাইয়া একটি ভূতের গল্প শুরু করিয়াছেন।

আগামী কল্য বেলা দশটার আগে ট্রেন নাই। সুতরাং সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহাশয়কে পোস্ট-আপিসেই রাত্রিবাস করিতে হইতেছে। তিনি কালীপূজা সম্পর্কে হরেরামবাবুর কোনো খুঁত ধরিতে না পারিয়া অফিসের কাগজপত্র নাকি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। ভোম্বল মাঝে মাঝে উঠিয়া গিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে যে, রাত্রি দশটা পর্যন্ত তিনি নাকি খাতাপত্র দেখিয়াছেন। পোস্ট-আপিসের বাহিরের ঘরটাতে তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং স্থানীয় মাদ্রাসার মৌলবিসাহেব তাঁহাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিপাটিরূপে আহার করাইয়াছেন। বংশী বলিল, এই উপলক্ষে মৌলবিগৃহে মুরগিও নাকি নিহত হইয়াছে। এখন সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহাশয় পোস্ট-আপিসের বাহিরের ঘরটিতে নিদ্রিত। মাংস প্রায় সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, ভূতের গল্পও বেশ জমিয়া উঠিয়াছে— এমন সময় পোস্ট-আপিসের বাহিরের ঘর হইতে একটা চেঁচামেচি শোনা গেল।

সাপ—সাপ!

সকলেই সচকিত হইয়া উঠিল।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, বংশী, তুমি লণ্ঠনটা নিয়ে একটু এগিয়ে দেখ। শুধু বংশী নয়, খুবলাল, রামকিষুণ, পুরোহিত, ভোম্বল সকলেই আগাইয়া গেল। সত্যই সাপ বাহির হইয়াছে। বিরাট একটা কেউটে পোস্ট-আপিসের কোণে ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুপারিন্টেন্ডেন্টের অবস্থা অবর্ণনীয়। সাপটাকে মারা গেল না, কোথায় যে চকিতের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িল বোঝা গেল না। সুপারিন্টেন্ডেন্ট পোস্ট-আপিসে শুইতে চাহিলেন না। শশব্যস্ত হরেরাম তাঁহাকে কোথায় শুইতে দিবেন চিন্তায় পড়িলেন।। রামকিষুণ বলিল, মৌলবিসাহেবের বাড়িতে খবর পাঠান হোক। তাহাই হইল। সুপারিন্টেন্ডেন্ট মৌলবিসাহেবের ঘরটাতে শুইতে গেলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁহার সুনিদ্রা হইল না। চোখ বুজিলেই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, প্রকাণ্ড কৃষ্ণকায় সর্পটা হিংস্র ফণা উদ্যত করিয়া তর্জন করিতেছে। অতি প্রত্যুষেই তিনি মুরারিপুর ত্যাগ করিলেন। রামকিষুণ প্রথমে ব্যাপারটা ভালোভাবে প্রণিধান করে নাই; কিন্তু পরে সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রভাতে আসিয়া ভক্তিভরে মুকুজ্জেমশাইকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। সাধুবাবাটি তো সহজ লোক নহেন! এতবড় অকাট্য প্রমাণ পাইয়া সে যেন চরিতার্থ হইয়া গিয়াছিল। প্রকাণ্ড কেউটে আসিয়া হাজির হইয়া গেল! ম্লেচ্ছ সুপারিন্টেন্ডেন্ট পলাইতে পথ

পাইল না! রামকিষুণের এতাদৃশ ভক্তিবাহুল্যে মুকুজ্জেমশাই কিন্তু মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন—লোকটি মাদুলি অথবা মন্ত্র চাহিয়া না বসে! এই জাতীয় অনেকগুলি ভক্ত তাঁহার জীবনে অনিবার্যভাবে জুটিয়া গিয়াছে, আর সংখ্যা বাড়াইতে তিনি চান না। রামকিষুণ মাদুলি কিংবা মন্ত্র চাহিল না; কিন্তু অনুরোধ করিল, আরও দুই-চারিদিন তাঁহাকে থাকিয়া যাইতে হইবে। তাহার কন্যার ‘গওনা’ অর্থাৎ দ্বিরাগমন আর কয়েকদিন পরেই অনুষ্ঠিত হইবে। সে সময় পর্যন্ত যদি সাধুবাবা ‘কিরপা’ করিয়া থাকিয়া যান, বড় ভালো হয়। তাঁহার আশীর্বাদ নবদম্পতির জীবনের অমূল্য সম্পদ হইবে।

মুকুজ্জেমশাই মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। ভোম্বল মাংস খাইয়া খুশি হইয়াছে, কালীপূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। সুপারিন্টেন্ডেন্ট স্টেশন অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন। হরেরামবাবুর কাজকর্মে কোনোরূপ গাফিলতি ধরা পড়ে নাই। সুতরাং নিশ্চিন্তচিত্তে মুকুজ্জেমশাই এবার যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন হঠাৎ রামকিষুণের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এই সরল প্রকৃতির লোকটিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া চলিয়া যাইতে তাঁহার বাধিতেছিল, অথচ মুরারিপুরে আর তাঁহার ভালো লাগিতেছিল না। এক স্থানে বেশিদিন থাকা তাঁহার স্বভাব নয়। হয়তো শেষ পর্যন্ত তিনি রামকিষুণের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না, কিন্তু সকালের ডাকে একখানি পত্র পাইয়া তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। সেই দিনই তাঁহাকে কলিকাতা যাত্রা করিতে হইল। জরুরি পত্রের বিষয় অবগত হইয়া রামকিষুণও আর আপত্তি করিল না। পত্রখানি হাসির। হাসিকে তিনি মুরারিপুরের ঠিকানা দিয়া আসিয়াছিলেন। সাধারণত তিনি কাহাকেও ঠিকানা দিয়া আসিতে চান না। কিন্তু হাসি নূতন লিখিতে শিখিয়াছে, মুকুজ্জেমশাইকে চিঠি লিখিবে বলিয়া জোর করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ঠিকানা আদায় করিয়া লইয়াছিল; হাসির চিঠি পাইয়া মুকুজ্জেমশাই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বড় বড় আঁকা-বাঁকা অক্ষরে হাসি লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু,

বড় বিপদে পড়ে আপনাকে চিঠি লিখছি। ঠাকুরপো তার এক বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী যাচ্ছি বলে একদিন সন্ধের সময় চলে যায়। সেই থেকে ঠাকুরপো আর ফেরেনি। এখন শুনছি, সে নাকি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে, তার কাছে বোমা আর রিভলবার পাওয়া গেছে। ঠাকুরপো এখন হাজতে। আজ শুনছি, ওঁরও নাকি চাকরি থাকবে না। উনি যখন মজঃফরপুর গিয়েছিলেন, তখন ওঁকে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম। ওঁদের সঙ্গে মিস্টার ঘোষ বলে কে এক মুখপোড়া নাকি কাজ করে—চিঠিখানা তার হাতে পড়েছে। আমার চিঠির ভেতরে সে কি দেখতে পেয়েছে জানি না, কিন্তু তা নিয়ে নাকি ওঁর চাকরি যাচ্ছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি শিগ্‌গির চলে আসুন। আমি বাবাকেও চিঠি লিখলুম। ইতি—

হাসি

পুনশ্চ—

দেখেছেন, আমার মাথার একেবারে ঠিক নেই। তাড়াতাড়িতে আপনাকে প্রণাম দিতেই ভুলে গেছি। ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিন। ইতি—

হাসি

মুকুজ্জেমশাই সেই দিনই কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

।। পাঁচ ।।

নীরব গভীর রাত্রি।

মরণোন্মুখ যতীন হাজরার শয়নশিয়রে শঙ্কর একা জাগিয়া বসিয়া আছে। ঘরের এক কোণে টেবিলের ওপর একটি বাতি জ্বলিতেছে। আপেল, বেদানা, কমলালেবু প্রভৃতি দুই-চারিটি ফলও টেবিলে সাজানো আছে। মিষ্টিদিদি এগুলি পাঠাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু যতীনবাবু একটিও স্পর্শ করেন নাই। যতীনবাবু লোকটি অদ্ভুত প্রকৃতির। আর কিছু নয়, অদ্ভুত রকম নীরব। শঙ্করের সহিত একটিও কথা হয় নাই। শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ। অতিশয় ক্লান্তি-ব্যঞ্জক কোটরগত চক্ষু দুইটি বুজিয়া সর্বক্ষণই চুপ করিয়া শুইয়া থাকেন। নীরবে বিনা প্রতিবাদে মৃত্যুর কাছে এমন আত্মসমর্পণ শঙ্কর আর কখনও দেখে নাই। শঙ্কর যতীনবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। লক্ষ্য করে, তাঁহার গলার দুই পাশের শিরা দুইটা অহরহ স্পন্দিত হইতেছে। মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে, সন্ধ্যার পর কাশিটা বাড়িয়া ওঠে। প্রয়োজন হইলে নিজেই উঠিয়া বাথ-রুমে যান, একটি বালক-ভৃত্য খাবার আনিয়া দুই বেলা তাঁহাকে খাওয়াইয়া যায়, প্রকাশবাবু প্রত্যহ সন্ধ্যায় একবার করিয়া আসেন। প্রকাশবাবুর প্রশ্নের উত্তরেই অতি সংক্ষেপে দুই-চারিটি কথা যতীনবাবু বলেন; প্রকাশবাবু চলিয়া গেলে আবার চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকেন। শঙ্কর যে দিবারাত্রি তাঁহার নিকটে রহিয়াছে, তাহা তিনি মোটে লক্ষ্যই করিতে চান না। শঙ্কর পাড়ার একটা সস্তা হিন্দু হোটেলে আহারাদি সমাধা করিয়া আসে। (নিজের গরম ওভার-কোটটা বিক্রয় করিয়া সে কিছু অর্থসংগ্রহ করিয়াছে।)—এবং নির্বাক হইয়া এই যক্ষ্মারোগীর মরণশিয়রে জাগিয়া বসিয়া থাকে।

হয়তো থাকিত না, কিন্তু চুনচুনের জন্য থাকিতে হয়। সকলের বারণ সত্ত্বেও গভীর রাত্রে চুনচুন লুকাইয়া স্বামীকে দেখিতে আসে। গভীর রাত্রে শঙ্কর কপাট খুলিয়া দেয়, চুনচুন চোরের মতো আসিয়া প্রবেশ করে। চুনচুন প্রবেশ কবিলে শঙ্কর বাহিরে চলিয়া যায়। চুনচুন বেশিক্ষণ থাকে না। যতক্ষণ থাকে, শঙ্কর ফুটপাথে পায়চারি করিতে করিতে চুনচুনের কথাই ভাবে। চুনচুন খুব রোগা, খুব কালো, কিন্তু চোখ দুটি তাহার সুন্দর। চোখ দুইটি বড় নয়; কিন্তু অপরূপ। চুনচুনের সমস্ত অন্তরের ছবি যেন ওই কালো চোখ দুইটি। গভীর রাত্রে এই গোপন অভিসার শঙ্করের মনকে উতলা করিয়া তোলে। প্রেমাস্পদকে গোপনে বিবাহ করিয়া চুনচুন গোপনেই তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। হিতৈষিণী দিদি এবং দিদির বান্ধবীর দল চুনচুনকে কিছুতেই তাহার স্বামীর সংস্রবে আসিতে দিবে না, এমনকি মৃত্যুকালেও নয়। ছোঁয়াচে রোগের অজুহাতে এ যেন প্রতিশোধ লওয়া। আজ যদি মিসেস স্যানিয়ালের ওই রোগ হয়, চুনচুনকে কি তিনি কাছে যাইতে দিবেন না? কিন্তু এসব লইয়া দিদির সহিত তর্ক করিবার কল্পনা করাও চুনচুনের পক্ষে অসম্ভব। অতিশয় মার্জিতরুচি মৃদুপ্রকৃতির মেয়ে। শঙ্করের মনে হয়, অতিশয় নিগূঢ় প্রকৃতির। তাহা না হইলে গোপনে বিবাহ করিতে পারিত না, গভীর রাত্রে স্বামীর সহিত দেখা করিতে আসিত না। শঙ্করের মনে হয়, চুনচুন সমাজের সহিত ইতরের মতো কলহ করিতে চায় না, কিন্তু নিজের মতে নিজের পথে চলিতে চায়। প্রকাশ্যভাবে চলিবার যদি বাধা থাকে। বাধা অতিক্রম করিবার জন্য সে অকারণে শক্তিক্ষয় করে না, গোপনতার আশ্রয় লয়।

নিদ্রিত যতীনবাবুর পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া শঙ্কর চুনচুনের কথাই ভাবে। চুনচুনকে ঘিরিয়া তাহার মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। উৎসুক হইয়া না উঠিলে শঙ্কর এই নীরব মৃত্যু-পথযাত্রীর মাথার শিয়রে এমনভাবে হয়তো দিনের পর দিন বসিয়া থাকিত পারিত না। পাশের বাড়ির ঘড়িতে বারোটা বাজিয়া গেল। আর একটু পরেই চুনচুন আসিবে। দ্বারে মৃদু করাঘাতটির প্রত্যাশায় শঙ্কর সজাগ হইয়া বসিয়া রহিল।

কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল, শঙ্করের খেয়াল ছিল না। সে টেবিলের এক ধারে বসিয়া 'অ্যানা ক্যারেনিনা' পড়িতেছিল। হঠাৎ লক্ষ করিল, যতীনবাবু একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছেন। শঙ্কর বিস্মিত হইয়া গেল, একটু ভয়ও পাইল।

শুনুন।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি তাঁহার বিছানার কাছে উঠিয়া গেল। যতীনবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, আমার একটি উপকার করবেন দয়া করে?

কি, বলুন?

যতীন হাজরা কয়েক মুহূর্ত শঙ্করের মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি তো?

নিশ্চয়।

যতীনবাবু আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, দেখুন, আমি বুঝতে পেরেছি, আমি আর বাঁচব না। আমার ভেতরটা কেমন যেন খালি খালি হয়ে আসছে।

আবার চুপ করিলেন।

শঙ্কর নীরবে সোৎসুকে চাহিয়া রহিল।

ক্ষণকাল পরে যতীনবাবু বলিলেন, মারা যাব সে জন্যে দুঃখ নেই, আমার সবচেয়ে দুঃখ যে মরেও আমি শান্তি পাচ্ছি না। আমার মনে হচ্ছে যে। আমার মৃত্যুর পরও অশান্তি ভোগ করার জন্যে আমার মনটা বোধহয় বেঁচে থাকবে।

শঙ্কর চুপ করিয়াই রহিল।

যতীনবাবু বলিতে লাগিলেন, কিন্তু আপনি তাকে বলবেন যে, অনুতাপে আমার বুকটা পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। আমি এ ক-দিন খালি তার কথাই ভাবছি, আর কোনো কিছু ভাববার শক্তিও নেই আমার।

আপনি কার কথা বলছেন?

আমার স্ত্রী।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

যতীনবাবু বলিলেন, চুনচুনের নয়, আমার প্রথম স্ত্রীর। সে এখনও বেঁচে আছে। আমি তাকে ফেলে পালিয়ে এসেছিলাম। সে নিরপরাধ জেনেও তার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে ত্যাগ করে এসেছিলাম। সে এখনও বেঁচে আছে। আপনি একবার দয়া করে যাবেন তার কাছে? তাকে বলবেন যে, আমি—

যতীনবাবু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

একটু চুপ করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, বলবেন আমার পাপের পুরো প্রায়শ্চিত্ত করে জ্বলে পুড়ে

অনুতাপ করতে করতে আমি মরেছি। আপনি কাল একবার দয়া করে যাবেন তার কাছে। গিয়ে বলবেন যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারই কথা ভেবেছি, মনে মনে তার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছি—

শঙ্কর বলিল, চুনচুন, মানে—মিসেস হাজরা কি এ কথা কিছুই জানেন না?

না। লুকিয়ে বিয়ে করেছি ওকে, সে অনেক ইতিহাস—বলবার এখন সময় নেই।

একটু চুপ করিয়া পুনরায় বলিলেন, মেয়েমানুষ, দুটো মিষ্টি কথা বললেই ভুলে যায়, অতি সহজেই ভুলে যায়। আপনি ওকে যেন ওসব কথা বলবেন না, বৃথা কষ্ট পাবে। এ কি—এ কি— এখনই সব অন্ধকার হয়ে আসছে যে—আপনি—তার—

সব শেষ হইয়া গেল।

প্রথম স্ত্রীর ঠিকানা আর শঙ্করকে বলা হইল না। নির্বাক শঙ্কর পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিল।

।। ছয় ।।

প্রথম দিন ভণ্টু কথাটা পাড়িতে পারে নাই। ওইরূপ নিদারুণ সংবাদ শোনার পর টাকার কথা পাড়া সম্ভবপর হয় নাই। আজও যে জিনিসটা সহজ হইয়াছে তাহা নয়, কিন্তু আজ না পাড়িয়া উপায় নাই। কাল রাত্রে করালীচরণ স্বয়ং নাকি টাকার তাগাদায় তাহার বাড়িতে আসিয়াছিলেন। ভাগ্যে সে বাড়িতে ছিল না! বউদিদি বলিলেন যে, সে বাড়িতে নাই শুনিয়াও করালী নড়িতে চাহে নাই। ভণ্টুর অপেক্ষায় রাস্তার মোড়ে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছেন, ভণ্টু যেন অতি অবশ্য অবিলম্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে। দ্রাবিড়ী লদ্‌কালদ্‌কির নেশায় চাম গ্যান্ঢঅ যেরূপ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে রিক্ত হস্তে তাঁহার সহিত দেখা করিলে রক্তসিক্ত হইয়া ফিরিতে হইবে। সুতরাং অশোভন হইলেও নিবারণবাবুকে আজ না খজলাইয়া উপায় নাই। কিন্তু কিরূপে? মুখবন্ধটা কি প্রকারে করা যায়—ভণ্টু ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু সমস্যার সমাধান করিতে পারিল না। এরূপ ক্ষেত্রে ঠিক কথাগুলি গুছাইয়া মনে মনে মহড়া দিয়া লইলে সুবিধা হয় বটে, কিন্তু ঠিক কথাগুলি কিছুতেই মনে আসে না। কার্যক্ষেত্রে যথাসময়ে যা হোক করিয়া ব্যাপারটা আপনিই সম্পন্ন হইয়া যায়। হইলও তাহাই। ভণ্টু গিয়া দেখিল, নিবারণবাবু ম্লানমুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। ভণ্টুকে দেখিলে পূর্বে যেরূপ সোচ্ছ্বাসে সম্বর্ধনা করিতেন, এখন তাহার কিছুই করিলেন না। ক্লান্ত কণ্ঠে কেবল বলিলেন, আসুন।

ভণ্টু উপবেশন করিল। ভণ্টু কবি নয়, তবু তাহার মনে একটা উপমার উদয় হইল। লোকটা যেন নিবিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ নীরবতার পর ভণ্টু বলিল, কোনো খবর-টবর পেলেন?

কিছু না। পুলিশে খবর দিয়েছি আমি।

ভণ্টু নীরব রহিল।

সহসা নিবারণবাবু উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলিলেন, এর জন্যে যত টাকা লাগে, খরচ করব আমি। ও-ব্যাটাকে আমি দেখে নেব যেমন করে হোক।

ভণ্টু তথাপি নীরব।

আস্‌মিকে জানতেন তো, অত্যন্ত সরল সাদাসিধে মেয়ে সে; স্কাউন্ড্রেলটা নিশ্চয়ই কোনো রকম ভাঁওতা দিয়ে নিয়ে গেছে তাকে। বুঝছেন না আপনি?

ভণ্টু সুযোগ পাইল, হাসিয়া বলিল, খুব বুঝেছি। আস্‌মির কতই বা বয়েস, দার্জি হলেও বা কথা ছিল।

দার্জিও ওসব কিছু বোঝে না, আমাদের গুষ্টিরই ধারা অন্য রকম। এই রাস্কেলটা জুটেই না এই হাল হল!

ভণ্টু একটু হাসিয়া বলিল, সে কি আর আমি জানি না! এতদিন আপনার বাড়িতে আসছি যাচ্ছি, আপনার মেয়েদের গলার স্বরটি পর্যন্ত শুনতে পাইনি কোনোদিন।

ওই যে বললাম আপনাকে, আমাদের গুষ্টিরই ধারা অন্যরকম।

নিবারণবাবুর গুষ্টির ধারা কি রকম, তাহা লইয়া আলোচনা করিতে ভণ্টু আসে নাই: সুতরাং সে চুপ করিয়া গেল। আসল কথাটা কোন্ ফাঁকে পাড়িবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে নিবারণবাবু বলিলেন, পুলিশের পাল্লায় পড়লে টিট হবেন বাছাধন।

ভণ্টু বলিল, পুলিশের হাঙ্গামা করলে আবার একটা কেলেঙ্কারি না হয়! কাগজে হয়তো এই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবে, আপনাকে আবার দার্জির বিয়ে দিতে হবে তো।

হলেই বা, সত্যি কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না বলতে চান?

ভণ্টু নিবারণবাবুর মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মন্তব্য করিল, আপনার মতো সরল ধর্মভীরু লোক দুনিয়ায় খুব বেশি নেই নিবারণবাবু।

নিবারণবাবু কোনো উত্তর দিলেন না, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পা দোলাইতে লাগিলেন। ভণ্টুও আর কোনো কথা বলিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, লোকটি অতিশয় ভালোমানুষ এবং ভালোমানুষি জিনিসটা নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর।

সহসা নিবারণবাবু ভণ্টুর দুইটি হাত ধরিয়া বলিলেন, দার্জির জন্যে দিন না একটা পাত্র জুটিয়ে ভণ্টুবাবু! মেয়েটা মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ভাবি কষ্ট হয় আমার। টাকা আমি খরচ করব। তিন হাজার নগদ, গয়না, দানপত্র— যথাসাধ্য দেব আমি। ভদ্রবংশের ছেলে দিন একটা জোগাড় করে, গরিব হলেও ক্ষতি নেই, ওদের ভরণপোষণের যা হোক একটা বন্দোবস্ত আমি করে যেতে পারব। আমার ওই মেয়েরা ছাড়া আর কে আছে বলুন? তাও তো আস্‌মিটা—

নিবারণবাবুর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি বক্তব্য শেষ করিতে পারিলেন না। উদগত অশ্রু গোপন করিবার জন্য অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

বিদ্যুৎচমকের মতো ভণ্টুর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। দুই-এক মিনিট সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিল এবং তাহার পর বলিল, আপনি যদি মনে না করেন, তা হলে একটা প্রস্তাব করি।

কি বলুন?

আমার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দেবেন?

নিবারণবাবু সত্যই ইহা প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি বিস্ফারিত চক্ষে ভণ্টুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। বাক্যস্ফূর্তি হইলে বলিলেন, আমার ওই কুচ্ছিত মেয়েটাকে নেবেন আপনি?

ভণ্টু বলিল, দেখুন আমি আপনার কাছে কিছুই গোপন করব না। আপনি আমার অবস্থা

ভালো করেই জানেন। দু-কুড়ি সাতের খেলা কোনোক্রমে খেলে যাচ্ছি, তা-ও চারিদিকে ধার হয়ে গেছে। যা মাইনে পাই, তাতে কুলোয় না। দাদার চেঞ্জের খরচ, সংসারের খরচ, সব আমাকে ওই মাইনে থেকে চালাতে হয়। চারদিকে ধার হয়ে গেছে। আপনি যদি কিছু টাকাকড়ি দেন, ধার-টারগুলো শোধ করে একটু ঝাড়া-হাত-পা হতে পারি। টাকার জন্যেই আমার বিয়ে করা। এক জায়গায় সাড়ে পাঁচশো টাকা ধার আছে, দু-এক দিনের মধ্যে দিতে না পারলে অপমানিত হতে হবে। আমি আপনার কাছেই টাকাটা চাইব ভাবছিলাম। আপনার এই অবস্থা দেখে কেবল চাইতে পারছিলাম না। এখন আপনার কথা শুনে মনে হল—আপনি স্বজাতি, পালটি ঘর, আমার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আপনার মেয়ের বিয়ে হতে পারে। আপনারও কন্যাদায় উদ্ধার হয়, আমিও একটু ঝাড়া হাত-পা হই। বিয়ে তো একদিন করতেই হবে। চিঠিও আসছে নানা জায়গা থেকে—

নিবারণবাবু বলিলেন, আপনি দার্জিকে দেখেছেন ভালো করে?

যা দেখেছি, তাই যথেষ্ট।

আপনার বাবা রাজি হবেন তো?

চেষ্টা করব!

নিবারণবাবু উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং কয়েক মিনিট পরে একটি চেক বই লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

কত টাকা চাই বললেন আপনার?

সাড়ে পাঁচশো।

নিবারণবাবু তৎক্ষণাৎ চেক লিখিয়া দিলেন।

কথা তা হলে পাকা তো?

একদম পাকা। এই বলিয়া ভণ্টু হেঁট হইয়া নিবারণবাবুর পদধূলি লইল।— এবার আর নিবারণবাবু আপত্তি করিলেন না।

।। সাত ।।

প্রথম চিঠি লেখার উৎসাহে কিছুদিন পূর্বে হাসি চিন্ময়কে লুকাইয়া যে চিঠিখানি স্বামীকে লিখিয়াছিল, তাহা যে মৃন্ময়ের সহকর্মী মিস্টার ঘোষের হাতে পড়িয়া এত অনর্থ সৃষ্টি করিবে, তাহা হাসির কল্পনাতীত ছিল। মৃন্ময়ও কল্পনা করে নাই যে, হাসি তাহাকে চিঠি লিখিতে পারে। মৃন্ময় জানিত, হাসি নিরক্ষর। হাসি যে দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া রোজ হাতের লেখা অভ্যাস করিতেছিল, এ খবর মৃন্ময়ের অজ্ঞাত ছিল। মৃন্ময়কে অবাক করিয়া দিবে বলিয়া হাসি ঘুণাক্ষরেও মৃন্ময়কে কিছু জানায় নাই। মজঃফরপুরের কাজ সারিয়া মৃন্ময় যখন কলিকাতায় চলিয়া আসে, তখন সেখানকার পোস্ট-আপিসে বলিয়া আসিয়াছিল যে, তাহার নামে যদি কোনো চিঠিপত্র আসে তাহা যেন কলিকাতায় তাহার আপিসের ঠিকানায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহার ধারণা ছিল, যদি কোনো চিঠি আসে, তাহা আপিসেরই চিঠি হইবে। সুতরাং বাড়ির ঠিকানা দিয়া আসিবার কল্পনাও তাহার মাথায় আসে নাই।

হাসির চিঠি যখন মজঃফরপুর ঘুরিয়া কলিকাতার আপিসে আসিয়া পৌঁছিল, তখন মৃন্ময় আপিসে ছিল না। আপিসে ছিলেন মিস্টার ঘোষ, দৈবক্রমে চিঠিখানা তাঁহারই হাতে পড়িয়া গেল। দাবার ছকে নিবদ্ধদৃষ্টি কোনো দাবা-খেলোয়াড় ভালো একটা চাল হঠাৎ আবিষ্কার করিলে যেমন আনন্দিত হইয়া ওঠেন, মিস্টার ঘোষ ঠিক তেমনিই আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। এই তো বাজিমাত হইয়া গিয়াছে! ঠিক এই হাতের লেখারই তো তিনি অনুসন্ধান করিতেছিলেন। অসঙ্কোচে তিনি চিঠিখানা খুলিয়া পড়িয়া ফেলিলেন। কে এই হাসি? যেই হউক, মৃন্ময়বাবুর সহিত বেশ মাখামাখি আছে দেখা যাইতেছে। উত্তেজনায় আনন্দে মিস্টার ঘোষের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠাধরে অর্ধ-বিকশিত ক্রূর একটা হাসি নীরবে যেন বলিতে লাগিল, এইবার তো লোকটাকে কবলে পাওয়া গিয়াছে! একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়িয়াছে, এতদিন বাছাধন ডুবিয়া জলপান করিতেছিল। মিস্টার ঘোষ অতিশয় আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। শুধু যে বাজিমাত হইয়া গিয়াছে তাহা নয়, এক ঢিলে দুইটি পক্ষীই নিহত হইয়াছে। সেদিন যে অ্যানার্কিস্ট ছোকরা ধরা পড়িয়াছে এবং তাহার নিকট যে চিঠির টুকরাটা পাওয়া গিয়াছে, তাহার লেখা আর মৃন্ময়বাবুর এই হাসির লেখা তো হুবহু এক। লিপি-সমস্যার সমাধান এইবার সহজে হইয়া যাইবে। শুধু তাহাই নয়, চাকরি-জগতে প্রবল-প্রতিদ্বন্দ্বী মৃন্মষ মুখোপাধ্যায়ের নিষ্কলঙ্ক চাকুরি-জীবনে বেশ মোটা একটা কলঙ্কও দাগিয়া দেওয়া যাইবে। চিন্ময় নামে যে ছোকরা ধরা পড়িয়াছে, শোনা যাইতেছে, সে নাকি মৃন্ময়বাবুরই সহোদর ভাই। এই হাসিটা মৃন্ময়ের কে হয়?

পরদিনই খোদ বড়সাহেব মৃন্ময়কে তলব করিলেন! মৃন্ময়ের মুখের দিকে ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, চিন্ময় তোমার কে হয়?

ভাই।

হাসি তোমার কে হয়?

স্ত্রী।

এরা যে ঐ ব্যাপারে লিপ্ত ছিল, তুমি জানতে?

না।

সত্যি কথা বল।

সত্যি কথাই বলছি।

সাহেব ক্ষণকাল মৃন্ময়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, আচ্ছা যাও।

মৃন্ময়ের শ্বশুর মহাশয় পুলিশের বড় চাকুরে। তাঁহারই খাতিরে এবং চেষ্টায় মৃন্ময় ও হাসি রেহাই পাইয়া গেল, অর্থাৎ তাহাদের জেল হইল না। মৃন্ময়ের চাকরিটি কিন্তু গেল। মুকুজ্জেমশাই আসিয়া দেখিলেন, চাকুরিবিহীন মৃন্ময় অত্যন্ত মুষড়াইয়া পড়িয়াছে, এবং হাসি তাহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেছে যে, জীব দিয়াছেন যিনি আহার দিবেন তিনি। এই হতভাগার চাকরি গিয়াছে, ভালোই হইয়াছে। অন্য চাকরি একটা জুটিয়া যাইবেই। এত লোকের জুটিতেছে, মৃন্ময়ের জুটিবে না?

মুকুজ্জেমশাই কলিকাতায় আসিয়া আর একটি সংবাদ পাইলেন। শিরীষবাবু লিখিতেছেন, বেয়াইমশাই নাকি শঙ্করের পড়ার খরচ বন্ধ করিয়াছেন। শুনিতেছি, তিনি তাকে ত্যাজ্যপুত্র

করিবেন। সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা ভয়ানক সংবাদ। আমি কি করিব, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। শঙ্করকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম যে, আমিই কোনোক্রমে তাহার পড়ার খরচ চালাইব, সে যেন পড়া বন্ধ না করে। উত্তরে শঙ্কর লিখিয়াছে যে, সে চাকুরির চেষ্টা করিতেছে, আর পড়াশোনা করিবার তাহার ইচ্ছা নাই। আপনি যদি একবার সুযোগ পান, তাহার সহিত দেখা করিবেন এবং তাহাকে বুঝাইয়া বলিবেন, সে যেন পড়া বন্ধ না করে। আমি যেমন করিয়া হউক তাহার পড়ার খরচ চালাইব।

এই দুইটি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়া মুকুজ্জেমশাই উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। কিছুদিনের মতো খোরাক পাইয়া তাঁহার মস্তিষ্ক সক্রিয় হইয়া উঠিল।

।। আট ।।

সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি বাহির হইতেছিল—

'একটি শিক্ষিত বাঙালি পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্রী যে-কোনো জাতির হইলেই চলিবে, কিন্তু শিক্ষিত পাত্রী অথবা গান-বাজনা-জানা মেয়ে একেবারেই চলিবে না। অক্ষর পরিচয়হীনা, বয়স্থা পাত্রীই প্রয়োজন। পণ লাগিবে না। পাত্র শিক্ষিত উপার্জনক্ষম।... নং পোস্টবক্সে আবেদন করুন।'

এ দেশে অশিক্ষিতা পাত্রীর অভাব নাই, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাও ঘরে ঘরে বিরাজমান, তথাপি এই বিজ্ঞাপনের উত্তর আশানুরূপ সংখ্যায় আবেদন আসিয়া জুটিল না। 'পাত্রী যে-কোনো জাতি হইলেই চলিবে'— এই কথায় পুরাতন-পন্থীরা, এবং 'শিক্ষিতা অথবা গান-বাজনা-জানা মেয়ে একেবারেই চলিবে না'—এই কথায় আধুনিক-পন্থীরা ভড়কাইয়া গেলেন। সকলেই ভাবিলেন, লোকটার মাথায় ছিট অথবা কোনো কুমতলব আছে। নিজে শিক্ষিত, জাত মানে না, অথচ অক্ষর-পরিচয়-হীনা বয়স্থা পাত্রী বিবাহ করিতে চায়— এ আবার কি রকম।

বেলার ওপর চটিয়া প্রিয়নাথ মল্লিক অবশেষে বিবাহই করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ঠিক করিয়াছিলেন যে, শিক্ষিত মেয়ে বিবাহ করিবেন না— কিছুতেই না। উহাদের মুখদর্শন করিলেও পাপ হয়। কিন্তু তাঁহার বিজ্ঞাপনের ধরন দেখিয়া শিক্ষিতা-অশিক্ষিতা কোনো মেয়েই জুটিল না। একেবারেই যে জোটে নাই তাহা নয়, কিন্তু যে দুই-চারিজন আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বেলার গৃহত্যাগের বিবরণ শুনিয়া আর অগ্রসর হওয়া সদ্বিবেচনার কার্য মনে করেন নাই। কেহ যদি সত্য সত্যই অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলেই যে প্রিয়নাথ বিবাহ করিতেন তাহাও সুনিশ্চিত বলা যায় না। তিনি হঠাৎ খেয়ালের বশে বিজ্ঞাপনটি দিয়া ফেলিয়াছিলেন, মনে হইয়াছিল, কিন্তু কি হইবে এমনভাবে বেলার পথ চাহিয়া! সে যদি না-ই আসিতে চায়, চুলায় যাক, আমি বিবাহ করিয়া সুখী হইব। সত্য সত্যই বিবাহের সুযোগ উপস্থিত হইলে হয়তো তিনি পিছাইয়া যাইতেন। কিন্তু বিজ্ঞাপন দিয়া যখন কোনো পাত্রীই পাওয়া গেল না, তখন ব্যাহত প্রিয়নাথ ক্ষোভে আক্রোশে মনে মনে গুমরাইতে লাগিলেন। তাঁহার মনের উত্তাপ ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। তাঁহার একমাত্র চিন্তা হইল, কেমন করিয়া বেলাকে জব্দ করা যায়। যেমন করিয়া হউক তাহার দর্পটা চূর্ণ করিতে হইবে, ছলে বলে কৌশলে—যেমন করিয়া হউক।

।। নয় ।।

বৃষ্টি পড়িতেছে।

ভিজিয়া ভিজিয়াই শঙ্কর হাঁটিয়া চলিয়াছে। তখনও রাগে তাহার মাথার শিরাগুলা দপদপ করিতেছিল। অপদার্থ লোকটার স্পর্ধা তো কম নয়! হাঁদা জরদগব ছেলেটাকে টাকার জোরেই রাতারাতি বুদ্ধিমান করিয়া তুলিবে ভাবিয়াছে! অঙ্ক কিছু তো জানেই না, বুঝাইয়া দিলেও বুঝিতে পারে না, তাহাকে ফিজিক্স পড়াইতে হইবে! তাও না হয় চেষ্টা করা যাইত; কিন্তু উহাদের অর্থোত্তাপ অত্যন্ত বেশি, শঙ্করের পক্ষে অসহ্য। হস্তীমূর্খ ছেলেটার পিছনে শঙ্কর যে এতটা করিয়া সময় নষ্ট করিতেছে, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দূরে থাকুক, ছেলের বাবা এমনভাবে কথাবার্তা বলেন, যেন ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের চেয়ে কোনো অংশে বড় নয়। আজ স্বচ্ছন্দে তাহাকে বলিয়া বসিলেন, ওহে মাস্টার, আজ আমাদের চণ্ডীবাবু বলছিলেন যে, পড়াশোনা তেমন নাকি সুবিধে হচ্ছে না! ফিজিক্সের কি একটা কোশ্চেন করেছিলেন উনি, কিছুই বলতে পারলে না! চণ্ডীবাবু বলছিলেন, আর কটা টাকা বেশি দিয়ে কলেজের একজন প্রফেসার রাখলেই ভালো হয়। কি বলেন আপনি, হবে আপনার দ্বারা পড়ানো? টাকার জন্যে আমি ভাবি না, যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন— প্রফেসারই না হয় রাখি একটা—

শঙ্করের মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তথাপি সে শান্তকণ্ঠেই প্রশ্ন করিল, চণ্ডীবাবু কে?

একজন রিটায়ার্ড ইন্‌জিনিয়ার। আমাদের পাড়াতেই থাকেন। তিনিই কাল জীবুকে ডেকে দু-চারটে কোশ্চেন করলেন, ও তো কিছুই বলতে পারলে না, হাঁ করে রইল।

শঙ্কর বলিয়া বসিল, ও হাঁ করেই থাকবে, ওর দ্বারা কিছু হবে না। ওর মাথায় কিছু ঢুকতে চায় না সহজে—

ঢোকাতে জানলেই ঢোকে। জীবু বলছিল, আপনি নাকি কেবল অঙ্কই কষান, ফিজিক্স কিছুই পড়ান না।

অঙ্ক না জানলে ফিজিক্স পড়া যায় না।

এই কথা শুনিয়া গড়গড়ায় একটা টান দিয়া হাঁটু দোলাইতে দোলাইতে এমন টানিয়া টানিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন, যেন শঙ্কর হাস্যোদ্দীপক অসম্ভব কিছু একটা বলিয়া ফেলিয়াছে।

দেখুন, কারও রুটি আমি সহজে মারতে চাই না, কিন্তু মন দিয়ে একটু পড়াবেন-টড়াবেন।

আমি আর কাল থেকে আসব না, আপনি কলেজের প্রফেসারকেই বাহাল করুন।

শঙ্কর বাহির হইয়া যাইতেছিল, ভদ্রলোক ডাকিয়া বলিলেন, মাইনেটা তা হলে চুকিয়ে দিই, দাঁড়ান। ক-দিন কাজ করেছেন আপনি?

আমার ঠিক মনে নেই।

দাঁড়ান, আমার টোকা আছে।

কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনি আজ নিয়ে একুশ দিন কাজ করেছেন, মাসিক চল্লিশ টাকা হিসাবে আপনার আটাশ টাকা পাওনা— এই নিন। গুপ্তমশায়কে বলবেন যে আমি আপনাকে ছাড়াইনি, আপনি নিজেই ছেড়ে গেলেন। আমার ছেলে ওই

পড়ে, গুপ্তমশায়ের কথায় প্রিন্সিপাল ওঠেন বসেন শুনেছি, তাঁকে আমি চটাতে চাই না। আপনি নিজেই ছেড়ে গেলেন, এই কথাটা দয়া করে জানিয়ে দেবেন তাঁকে।

আচ্ছা।

হনহন করিয়া চলিতে চলিতে শঙ্কর ভাবিতেছিল, এইবার কি করিবে? মাত্র এই কটি টাকা, কলিকাতা শহরে দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যাইবে। যে মেসে সে উঠিয়াছে, তাহার চার্জ মিটাইতেই তো কুড়িটা টাকা লাগিবে। নূতন কাজের সন্ধান করিলেই কি মিলিবে? তাহার উপর কয়দিন হইতে যে বৃষ্টি শুরু হইয়াছে, কোথাও বাহির হওয়াই মুশকিল। সমস্ত আকাশে চাপ চাপ মেঘ, দিবারাত্রি বৃষ্টির বিরাম নাই। সহসা শঙ্করের মনে হইল, আকাশ নির্মেঘ হইলেই বা সে কি করিত, বৃষ্টির দোহাই দিয়া তবু কয়েকটা দিন অকর্মণ্যতাকে সহ্য করা যাইতেছে। আকাশ একদিন না একদিন নির্মেঘ হইবেই, কিন্তু তাহার সমস্যার সমাধান কি তাহা হইলেই হইয়া যাইবে?

শঙ্করবাবু নাকি?

শঙ্কর ফিরিয়া দেখিল, বেলা মল্লিক। অবাক হইয়া গেল। মাথায় ছাতা, পরনে ঘন নীল রঙের শাড়ি, বাঁ হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, পায়ে হাই-হিল জুতা, গ্রীবাভঙ্গিসহকারে অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। সমস্ত অবয়বে এমন একটা আভিজাত্যমণ্ডিত শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, শঙ্কর চোখ ফিরাইতে পারিল না, মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বেলা মল্লিকই পুনরায় কথা বলিলেন, কোথায় চলেছেন?

মেসে।

আজকাল মেসে থাকেন নাকি? আমার ধারণা ছিল, আপনি হস্টেলে থাকেন।

আপনি কিছুই শোনেননি তা হলে?

না। শোনবার মতো কিছু আছে নাকি?

শঙ্কর একটু হাসিল। তাহার পর বলিল, শোনবার কিংবা শোনাবার মতো কিছু অবশ্য নয়—

ভণিতা ছাড়ুন। ব্যাপার কি?

ব্যাপার কিছুই নয়, পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে উদরান্নের জন্যে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

পড়াশোনা ছেড়ে দিলেন কেন হঠাৎ?

খরচ জুটল না।

তার মানে?

শঙ্কর আর একটু হাসিয়া বলিল, তার মানে, ওই।

টাকার অভাবে আপনাকে পড়াশোনা বন্ধ করতে হল— এ কথা বিশ্বাস করতে রাজি নই। আপনি যে গরিবের ছেলে নন, তা আমি জানি।

বাবা বড়লোক তো আমার কি?

বেলা ভ্রূভঙ্গিসহকারে খানিকক্ষণ শঙ্করের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, আপনার এখন সময় আছে কি?

প্রচুর, কেন?

তা হলে আসুন আমার সঙ্গে।

কোথায়?

আমার বাসায়।

শঙ্কর বিস্মিতকণ্ঠে বলিল, কেন বলুন তো?

এমনই একটু গল্প-সল্প করা যাবে। আজ একটু ছুটি পেয়ে গেছি।

চলুন।

।। দশ ।।

ভণ্টুর বউদিদি বসিয়া বসিয়া বড়ি দিতেছিলেন। রবিবারে আপিসের তাড়া নাই। ভণ্টু অদূরে একটি মোড়ার ওপর বসিয়া নাকে, কানে, নাভিবিবরে, পায়ের আঙুলগুলির ফাঁকে ফাঁকে তৈল-নিষেক করিয়া অতিশয় পরিপাটিরূপে সর্বাঙ্গে তৈলমর্দন করিতেছিল। এই একদিনে ভণ্টু সাতদিনের মতো তেল মাখিয়া লয়। সপ্তাহের বাকি ছয় দিন তেল মাখিবার অবসর থাকে না। কোনোক্রমে মাথায় দুই ঘটি জল ঢালিয়া এবং নাকে-মুখে যা হোক কিছু গুঁজিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে আপিসে ছুটিতে হয়। এই রবিবার দিনই বেচারা প্রাণ ভরিয়া স্নানাহার করে। বউদিদিও রবিবারের দিন আহারের একটু বিশেষ রকম আয়োজন করিয়া থাকেন।

ভণ্টু সশব্দে নাসারন্ধ্রে খানিকটা তেল টানিয়া লইয়া বলিল, বাকু কি ইটিং আপিস খুলেছেন?

তোমার আসবার আগেই বাবা খেয়ে নিয়েছেন। আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি করছ কি, একেবারে আচার হয়ে গেল যে!

ভণ্টু কিছু না বলিয়া আবার খানিকটা তৈল নাসারন্ধ্রে সশব্দে টানিয়া লইল।

বউদিদি বলিলেন, ওই জন্যই তো জামা-কাপড় তেল চিটচিটে হয়ে যায়। সাবান দিলেও পরিষ্কার হতে চায় না।

অয়েলিশ অ্যাফেয়ারে বড় সুখ।

ভণ্টু বাম তালুতে খানিকটা তৈল ঢালিয়া লইয়া গর্দানায় ঘষিতে লাগিল।

বউদিদি এক নজর সেদিকে চাহিয়া দেখিলেন, ও বলিলেন, তোমার আর কি, তোমাকে তো সাবান কাচতে হয় না, যাকে কাচতে হয় সে-ই বোঝে।

ভণ্টু গর্দানায় তেল মালিশ করিতে করিতে অর্ধ নিমীলিত নেত্রে বলিল, বড় সুখ।

বউদিদি আর কিছু না বলিয়া বড়ি দিতে লাগিলেন।

দুই-এক মিনিট নীরবতার পর ভণ্টু বলিল, আজ কি কি রান্না করেছ বউদি?

আলুর দম, পটল-ভাজা, মাছের ঝোল, মাছের অম্বল, মুড়ো দিয়ে মুগডাল—

বাকুকে ওই সমস্ত খেতে দিয়েছ নাকি?

তা দিয়েছি বইকি!

ধীরেন ডাক্তার বলছিলেন, ওঁকে এখন ওসব গুরুপাক জিনিস খেতে না দেওয়াই ভালো। চোখের কোল ফুলেছে, কিডনি খারাপ হয়েছে নিশ্চয়ই।

ঘরে ভালোমন্দ রান্না হলে ওঁকে না দিয়ে কি পারবার জো আছে?

একটু থামিয়া বউদিদি বলিলেন, এমনিতেই তো পান থেকে চুন খসলে তুলকালাম কাণ্ড। সেদিন রাত্রে পরোটায় সামান্য একটু ময়ান কম হয়েছিল, বললেন, এ পরোটা না পরেন্‌ঠা!

ভণ্টুর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

আজকাল বাকু আর সে রকম করেন না, না বউদিদি?

কি রকম?

রাগ হলে 'ক্ষিদে নেই' বলে মশারি-টশারি ফেলে তার ভেতর বসে শ্রীমদ্ভাগবত পড়তে শুরু করে দিতেন সেই যে!

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, না, অনেক দিন তো সে রকম করেননি।

ভণ্টু বাকুর ঘরের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, বাকু স্লিপিং আপিস খুলেছেন বোধহয়; কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

হ্যাঁ, বোধহয় ঘুমুচ্ছেন।

ভণ্টু উঠিয়া দাঁড়াইল, পেটে ও পিঠে তেল মাখিতে মাখিতে বলিল, আসল ব্যাপারের কতদূর কি সেট্‌ল্ করলে? বাকুর কাছে পেড়েছিলে কথাটা?

না, নিবারণবাবুর টাকা তুমি ফেরত দাও।

কেন, দার্জি মেয়েটি তো মন্দ নয়। চমৎকার সেলাই-ফোঁড়াই জানে।

রঙ কি রকম?

কালো, কিন্তু কুৎসিত নয়। অনেকটা কচি নিমপাতার মতো, একটু লালচে আভা আছে।

আভা আছে?

বউদিদি হাসিয়া ফেলিলেন। তাহার পর বলিলেন, রঙের জন্যে কিছু এসে যাচ্ছে না, আমার রঙই বা কি এমন ফরসা! কিন্তু যে বাড়িতে অমন কেলেঙ্কারি ঘটেছে, সে বাড়িতে বিয়ে করতে হবে না টাকার জন্যে! টাকাটা ফেরত দিয়ে দাও।

টাকা তো গভীর গাড্ডায়।

গাড্ডায় মানে?

করালীচরণকে দিয়ে এসেছি।

তোমাকে মানা করলুম, তবু তুমি দিয়ে এলে? ওকে দুদিন পরে দিলেই তো চলত। এইবার তো তোমার দাদা এসে কাজে জয়েন করবেন, দুজনে মিলে কিছুদিন পরেই না হয় শোধ করে দিতে টাকাটা।

কেতুরাজ করালীচরণকে তুমি চেনো না, তাই কলাইয়ের ডালের বড়ি দিতে দিতে স্বচ্ছন্দে কথাগুলো বলতে পারলে। চিনলে সটান ঢোঁক গিলে যেতে, ও-কথা আর উচ্চারণ করতে না।

আহা!

দুই বগলে তেল চাপড়াইতে চাপড়াইতে ভণ্টু বলিল, চামলদ করালী দ্রাবিড়ে লদ্‌কালদ্‌কি করতে যাচ্ছে, তাকে আটকায় কার সাধ্য!

তাহলে অন্য কোথা থেকে টাকা জোগাড় করে নিবারণবাবুকে দিয়ে দাও। ও-বাড়ির মেয়ে ঘরে আনা চলবে না।

পাশের ঘর হইতে গদাম করিয়া একটা শব্দ হইল।

বউদিদি ভণ্টুর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, কেউ ঘুমোয়নি, সব মটকা মেরে পড়ে আছে তোমার ভয়ে।

ভণ্টু তেল মাখিতে মাখিতে আগাইয়া গেল ও জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, একটা পাশ-বালিশ মাটিতে পড়িয়াছে। ছেলেরা সকলে চোখ বুজিয়া শুইয়া আছে, সকলেরই চোখ মিটমিট করিতেছে।

এই ফন্‌তি, বালিশ ফেললে কে?

ফন্‌তি ঘাড় ফিরাইয়া নাকি সুরে বলিল, দাদা আমাকে কাতুকুতু দিচ্ছে খালি।

শণ্টু, বেত না খেলে পিঠ সুড়সুড় করছে, নয়?

শণ্টু, আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিল না, চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

পাশ-বালিশটা তুলে চুপ করে শুয়ে থাক সব। ফের যদি কোনো আওয়াজ শুনেছি তো পিঠের চামড়া তুলে ফেলব আমি সকলের।

ফনতি পাশ-বালিশটা তুলিয়া লইল এবং সকলে আর একবার নড়িয়া-চড়িয়া শুইল।

বউদিদি আবার তাগাদা দিলেন, তুমি এবার চান কর, আর কত বেলা করবে, সব যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

তুমি ভাত বাড় না, আমার চান করতে কতক্ষণ যাবে?

তোমাকে যেন চিনি না আমি। দাঁত মাজতেই তো এক যুগ যাবে এখন।

ভণ্টু মুখ বিকৃত করিয়া বউদিদির মুখের পানে চাহিল।

আহারাদির পর ভণ্টু ছোট একটি হাত-আয়না এবং ছোট একটি কাঁচি লইয়া মোড়ার ওপর বসিয়া গুম্ফসংস্কার করিতেছিল। বউদিদিও আহার সমাপন করিয়া ছেলেদের পাশেই একটু গড়াইয়া লইতেছিলেন। তাঁহার তন্দ্রার মধ্যেও তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন— স্বামী আসিয়াছেন, শরীর বেশ সারিয়া গিয়াছে, আর জ্বর হয় না, মুখের সে রুগ্ন ভাব আর নাই, গাল চিবুক বেশ ভারী হইয়াছে।

একটা মোটরের হর্নের শব্দে তাহার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। বাড়ির সামনে একটা মোটর আসিয়া থামিয়াছে। ভণ্টু আয়না ও কাঁচি কুলুঙ্গিতে রাখিয়া সদর-দরজা খুলিয়া দেখিতে গেল, কাহার মোটর তাহার বাসার সামনে আসিয়া থামিল। দরজা খুলিয়া ভণ্টু বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার আপিসের বড়বাবু! কেরানিমহলের যিনি সর্বেসর্বা, স্বয়ং তিনিই আসিয়াছেন। ভণ্টুর আপিসের বড়বাবু বড়লোক। মোটা মাইনা পান, তা ছাড়া ধনীর সন্তান। নিজের মোটর আছে। ভণ্টু সসম্ভ্রমে নমস্কার করিল।

বড়বাবু মোটর হইতে অবতরণ করিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, ভালোই হল, তুমিও এখন বাড়িতে আছ। তোমার বাবার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলাম।

হঠাৎ বাকুর সহিত বড়বাবু কেন আলাপ করিতে আসিলেন, তাহা বিস্মিত ভণ্টু হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও মুখে সোচ্ছ্বাসে আহ্বান করিল।

আসুন আসুন, ভেতরেই আসুন।

তাহার পর একটু সঙ্কোচভরে বলিল, বাবা কানে একটু কম শোনেন, একটু জোরে কথা বলতে হবে।

আচ্ছা।

ভণ্টু বড়বাবুকে লইয়া বাকুর ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘণ্টাখানেক পরে বড়বাবু যখন চলিয়া গেলেন, তখন ভণ্টু আরও বিস্মিত হইয়া গেল। এ যে স্বপ্নাতীত আবুহোসেনি কাণ্ড! বড়বাবু নিজের মেয়ের সহিত ভণ্টুর সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। বউদিদি উল্লসিত হইয়া উঠিলেন।

এখন স পাঁচ আনা পয়সা দাও দিকি।

কেন?

আমি মনে মনে হরির লুট মানসিক করেছিলাম, যাতে ওই নিবারণবাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে না হয়।

পাগল! উইনটার ক্যাপিটাল অফ বেঙ্গল গভর্নরকে অগ্রাহ্য করা সোজা নাকি?

উইনটার ক্যাপিটাল কি?

দার্জিলিং।

বউদিদি সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, ওখানে তোমার বিয়ে হতেই পারে না।

না না, ছি! অমন অসময়ে এক কথায় করকরে সাড়ে পাঁচশোটি টাকা গুনে দিলে, তা ছাড়া বৃশ্চিক রাশি, মকর লগ্ন, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেছে, নিবারণকে এমনভাবে ল্যাডারিং করা কি ঠিক হবে?

ল্যাডারিং কথাটা ভণ্টু সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করিল।

বউদিদি মানে বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, তার মানে?

মানে, নিশ্চিন্ত নিবারণ গাছে উঠে মজাসে গোঁফে তা দিচ্ছে, এখন মইটা সরিয়ে নিলে লোকে বলবে কি?

লোকে যাই বলুক, ওখানে বিয়ে হবে না। আজই তুমি তাঁকে বলে এস— বাড়ির কারও মত হচ্ছে না। কারও হবেও না। ও-কথা শুনলে বাকু, তোমার দাদা, কেউ রাজি হবেন না। সকলের অমতে তুমি বিয়ে করবে নাকি?

কিন্তু ফাইভ অ্যান্ড হাফ সেঞ্চুরির মহড়া সামলাব কি করে? সেটা ভাবছ না কেন?

সে আবার কি?

বেশ খাসা আছ তুমি! সাড়ে পাঁচশো টাকাটা তো স পাঁচ আনার সিন্নি দিলেই উবে যাবে না? আর আমাদের গুষ্টিসুদ্ধুকে ছাতু করে ফেললেও পাঁচ টাকা বেরুবে কি না সন্দেহ। তোমার গয়নাগুলি তো বহু পূর্বেই বিক্রমপুর হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে উপায় কি সেইটে বল, সিন্নি নিয়ে লদ্‌কালেই তো চলবে না!

পণ হিসেবে বড়বাবু নিশ্চয় কিছু দেবেন, তার থেকেই দিয়ে দিও নিবারণবাবুকে।

বড়বাবু কত দেবে তার ঠিক কি? যে রকম গোঁফ আর জুলপি লোকটার, কিছুই বিশ্বাস নেই।

বাঃ, নিশ্চয়ই দিতে হবে। বাকুকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও না।

বাকু তোমাকে এক হাটে কিনে এক হাটে বেচতে পারে। বাকুকে শেখাবে তুমি!

বাকুও এই বিষয়ে আলাপ করিবার জন্য আঁকুপাকু করিতেছিলেন, তিনি বাহির হইয়া আসিলেন।

কই গো বড়বউমা, এস না একবার এদিকে। ভণ্টুর আপিসের বড়বাবুর প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখা যাক। চা-ও চড়াও। চা খেতে খেতে বেশ জাঁকিয়ে বিবেচনা করা যাক, এস।

বউদিদি ভণ্টুর দিকে চাহিয়া বাকুর পিছু পিছু ঘরে গিয়া ঢুকিলেন এবং তাঁহার কানে বাকুর কণ্ঠস্বর পুনরায় শোনা গেল—বলে, লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না।

বউদিদি চা চড়াইতে গেলেন।

ভণ্টু পিছন হইতে তাঁহাকে ভ্যাঙচাইতে লাগিল।

।। এগারো ।।

অন্ধকার রাত্রি।

করালীচরণ বক্‌সির ঘরে মোমবাতির ম্লান আলোকে অন্ধকার ঘনতর হইয়া উঠিয়াছে। বোতলের মুখে গোঁজা যে মোমবাতিটি জ্বলিতেছে, তাহার আয়ু নিঃশেষিতপ্রায়, আর বেশিক্ষণ টিকিবে বলিয়া মনে হইতেছে না। বেশিক্ষণ টিকিবার আর প্রয়োজনও নাই। বক্‌সি মহাশয়ের গোছানো শেষ হইয়া গিয়াছে, এইবার তিনি বাহির হইয়া পড়িবেন। মোমবাতির স্বল্পালোকে বক্‌সি মহাশয় নিবিষ্টচিত্তে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একখানা পত্র পড়িতেছিলেন। সমস্ত মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে, ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ়নিবদ্ধ, চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে। দ্রাবিড়ে যাইবার মুখে এ কি এক ফ্যাসাদ আসিয়া জুটিল! পত্রের সহিত দলিল-গোছের কি একটা কাগজ ছিল। পত্রটি এবং দলিলখানি আদ্যোপান্ত পুনরায় পড়িয়া করালীচরণ সেগুলিকে লম্বা খামের ভিতর পুরিয়া ফেলিলেন। দ্রাবিড় হইতে ফিরিয়া তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাইবে। ভণ্টুবাবু এখন তাড়াতাড়ি ফিরিলে যে বাঁচা যায়! ভণ্টুকে তিনি কিছু মাল এবং টিকিট কিনিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। প্রায় ঘণ্টা-দুই হইয়া গেল, এখনও ফিরিতেছে না কেন? অধীর করালীচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা তাঁহার চোখে পড়িল, দ্বারপ্রান্তে ছায়ামূর্তির মতো কে যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

কে?

আমি।

ছায়ামূর্তি আগাইয়া আসিল, মোড়ের সেই পানওয়ালিটা। একমুখ হাসিয়া মিসি-লাগানো দাঁতগুলি বাহির করিয়া পানওয়ালি বলিল, জিনিসপত্তর সব বাঁধা-ছাঁদা হচ্ছে আজ সকাল থেকে দেখছি, কোথাও যাওয়া হবে নাকি ঠাকুরের?

করালীচরণ কিছু না বলিয়া তাহার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকাইয়া রহিলেন, এই অযাত্রাটা ঠিক যাইবার সময় আসিয়া হাজির হইয়াছে!

আমি যেখানেই যাই না, তোর তাতে কি? দূর হ তুই এখান থেকে।

পানওয়ালি কিন্তু নড়িল না, স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।—আচ্ছা, আমার ওপর তোমার এত রাগ কেন বলতো ঠাকুর? আমি তো তোমার ভালো ছাড়া মন্দ কোনো দিন করিনি।

করালীচরণের চোখটা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি গর্জন করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, তুই নড়বি কি না বল্ এখান থেকে?

পানওয়ালি তথাপি নড়িল না।

আমার ওপর তোমার এত রাগ কেন, তা না বললে আমি যাব না।

হারামজাদী ছোটলোক বেশ্যা, তোর মুখদর্শন করলে যে পাপ হয়, তা তুই জানিস না? আবার কৈফিয়ত তলব করছেন।

পানওয়ালির মুখের হাসিটা সহসা নিষ্প্রভ হইয়া গেল। তথাপি সে সপ্রতিভ ভাবটা বজায় রাখিবার জন্য আর একটু হাসিয়া বলিল, ওমা, এইজন্যেই এত রাগ! আমি ভেবেছিলাম, বুঝি বা আর কিছু! মুখ দেখলে পাপ হয়, আর আমার কাছ থেকে সিগারেট পান নিলে বুঝি কিছু হয় না? ধন্যি শাস্তর তোমাদের!

দূর হ বলছি।

করালীচরণ তাড়া করিয়া গেলেন। পানওয়ালি অন্ধকারে অন্তর্ধান করিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভণ্টু আসিয়া পড়িল।— উঃ, বড্ড দেরি করলেন আপনি ভণ্টুবাবু, সব জিনিসপত্তর পেয়েছেন তো?

হ্যাঁ।

ভণ্টু দুই বোতল মদ, ছোট একটি কাচের গ্লাস, পাঁচ টিন সিগারেট, এক ডজন দেশলাই, দুই প্যাকেট মোমবাতি এবং টুকিটাকি আরও নানা রকম জিনিস টেবিলের ওপর সাজাইয়া রাখিল।

টিকিট করেননি?

নিশ্চয়। এই যে, নিন না।

ভণ্টু ভিতরের পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিল এবং তাহার ভিতর হইতে টিকিট ও বাকি টাকা বাহির করিয়া দিল।

করালীচরণ আলমারির মাথায় দাঁড়কাকের খাঁচাটা দেখাইয়া বলিলেন, আর ওটার?

ওটার সম্বন্ধে নানা বখেড়া। খাঁচার মাপ-জোক চাই, তা ছাড়া অনেক খরচ।

গভীর বিস্ময়ের সহিত করালীচরণ বলিলেন, খরচ বলে কি এতদিনের সঙ্গীটাকে এখানে ফেলে রেখে যাব নাকি? কে খেতে দেবে ওকে?

ভণ্টু বলিল, সে ভার না হয় আমি নিচ্ছি; আপনি বিদেশে যাচ্ছেন, কোথায় ওর ঝামেলা নিয়ে ঘুরবেন? তার চেয়ে ওকে এখানে রেখে যান, আমিই দেখাশোনা করব বরং।

আপনি ঠিক দেখাশোনা করতে পারবেন তো?

ঠিক পারব।

দেখুন।

বলছি, ঠিক পারব।

তা হলে গোটা-বিশেক টাকা রেখে দিন আপনি। ওকে মাছ মাংস ছাতু দেবেন রোজ। আমও বেশ খায়। দেখবেন, যেন কষ্ট না পায়। আপনি ভার নিচ্ছেন বলেই ভরসা করে রেখে যাচ্ছি।

টাকার দরকার নেই, আমি সব ব্যবস্থা করব এখন।

না না, টাকাটা রাখুন, টাকাই হচ্ছে পেয়াদা, ওই তাগাদা দেবে আপনাকে। বাই নারায়ণ! বিনা টাকায় কিছু হবার জো আছে আজকাল!

ভণ্টুকে টাকা লইতে হইল।

এবার চলুন, স্টেশনে যাওয়া যাক তাহলে। ট্রেনের আর দেরি কত? ঘণ্টাখানেক? চলুন, চলুন, আর দেরি নয়, ট্যাক্সি ডাকুন আপনি।

ভণ্টু ট্যাক্সি ডাকিতে বাহির হইয়া গেল।

করালীচরণ পুনরায় লম্বা খামটা হইতে চিঠি ও দলিলটা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন এবং আবার সমস্ত আদ্যোপান্ত পড়িয়া স্বগতোক্তি করিলেন, বাই নারায়ণ! এবং পুনরায় সেগুলি খামে পুরিয়া আলমারির ভিতর রাখিয়া দিলেন।

ট্যাক্সি আসিয়া পড়িল।

ঘণ্টা দুই পরে ভণ্টু ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে পানওয়ালি চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভণ্টু পানওয়ালিকে চিনিত। বাইক হইতে অবতরণ করিয়া বলিল, ভালোই হল, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

কেন বলুন তো?

বক্‌সিমশায়ের ঘর-দোরের কি ব্যবস্থা করা যায়, তাই ভাবতে ভাবতে আসছিলাম। উনি আমার ওপরই সব ভার দিয়ে গেলেন। তুমি পারবে দেখাশোনা করতে?

কি করতে হবে বলুন?

এই ঝাঁট-পাট দেওয়া আর কি, বক্‌সিমশায়ের একটা কাক আছে, সেটাকেও খেতে-টেতে দিতে হবে। পারবে তুমি?

পারব।

তা হলে এই টাকা কটা রাখ, মাছ মাংস ছাতু আম যা দরকার কিনে দিও।

টাকার দরকার নেই।

বক্‌সিমশায় দিয়ে গেছেন যে।

আপনাকে দিয়ে গেছেন, আমাকে তো আর দেননি। আপনি কেবল একটি উবগার করবেন।

বিস্মিত ভণ্টু বলিল, কি?

ওঁকে জানাবেন না যে, ওঁর ঘরের ভার আপনি আমাকে দিয়েছেন।

অধিকতর বিস্মিত হইয়া ভণ্টু বলিল, কেন?

মিসি-মণ্ডিত-দন্তপাঁতি বিকশিত করিয়া পানওয়ালি উত্তর দিল, আমি ওঁর দুচক্ষের বিষ ছিলুম।

ভণ্টু কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

পানওয়ালি পুনরায় হাসিয়া বলিল, দিন, চাবি দিন। ওঁকে জানাবেন না কিন্তু।

জানাব কি করে, ওঁর ঠিকানাই জানি না।

আচ্ছা, উনি কোথায় গেলেন বলুন তো?

দ্রাবিড়ে।

সে আবার কোথায়? সেখানে কেন?

পড়তে।

পড়ে পড়েই সারা হল। দিবারাত্রি আর কোনো কাজ নেই।

পানওয়ালি মুচকি হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, মানুষে এত পড়ে কেন বলুন তো? যত পড়ে, ততই তো মাথা গোলমাল হয়ে যায় দেখছি।

ভণ্টু সহসা অনুভব করিল, 'লাই' পাইয়া মাগি বোধহয় লদ্‌কালদ্‌কিতে ঢুকিবার চেষ্টায় আছে। গম্ভীরভাবে বলিল, লেখাপড়ার মর্ম সবাই বুঝলে আর ভাবনা ছিল কি?

ইনি খুব বিদ্বান, না?

লদ্‌কালদ্‌কি ঘনীভূত হইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া ভণ্টু এ কথার জবার দিল না। বলিল, চাবিটা রাখ তা হলে। কাকটাকে খেতে-টেতে দিও। কাল আবার আসব আমি।

সে বাইকে সওয়ার হইল।

চাবিটা হাতে করিয়া অন্ধকার গলিতে পানওয়ালি করাণীচরণের রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। রাত্রে ঘরটা খুলিতে তাহার সাহস হইল না?

।। বারো ।।

মৃন্ময় গঙ্গার ধারে একা চুপ করিয়া বসিয়াছিল। নিজেকে নিতান্ত একা মনে হইতেছিল। এই সেদিন পর্যন্ত তাহার নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না, এখন অখণ্ড অবসর। নিমেষের মধ্যে সমস্ত যেন ওলট-পালট হইয়া গেল। চিন্ময়টা গোপনে গোপনে এত কাণ্ড করিতেছিল! বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই। সহসা মৃন্ময়ের স্বর্ণলতাকে মনে পড়িল। তাহাকে অন্বেষণ করিবার জন্যই তো সে পুলিশের চাকুরি লইয়াছিল। অন্বেষণ তো করা হয় নাই, চাকরিটাই বড় হইয়া উঠিযাছিল। চোর, জুয়াচোর, খুনে, জালিয়াত— ইহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহার দিনের পর দিন কাটিয়া গিয়াছে, স্বর্ণলতাকে অন্বেষণ করিবার সে অবসর পাইল কই? প্রথম প্রথম প্রত্যহই তাহার মনে হইত, হাতের কাজটা শেষ করিয়া সে স্বর্ণলতার খোঁজ করিবে, কিন্তু হাতের কাজ কোনো দিনই শেষ হয় নাই। শেষে স্বর্ণলতার কথা তাহার মনেও পড়িত না। মানুষ কত সহজে ভোলে! দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক দাবি এত প্রবল, এত অনিবার্য এবং এত সর্বগ্রাসী যে, অতীতকে স্মৃতিপথে জাগরূক রাখা দুঃসাধ্য ব্যাপার। যাহারা নিকটে রহিয়াছে, যাহাদের সর্বদা দেখিতেছি, তাহাদেরই সকলকে সর্বতোভাবে মনে স্থান দেওয়া সম্ভবপর নয়। সচেতন মনের পরিসর বড় ক্ষুদ্র, সমভাবে সকলের স্থান সঙ্কুলান হওয়া সেখানে অসম্ভব। স্বর্ণলতার মুখখানা মনের মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিল, সেই নিটোল গৌর মুখখানি, প্রদীপ্ত কালো চোখ দুইটি, অধরে অর্ধবিকশিত মৃদু হাসি। নিমীলিত নয়নে মৃন্ময় স্বর্ণলতার মানসমূর্তির পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, স্বর্ণলতা যেন মৃদুগুঞ্জনে বলিতেছে, আমাকে খোঁজ নাই বলিয়াই তোমার এত শাস্তি। আমাকে খুঁজিবার জন্যই বিবাহ করিয়া পুলিশে চাকুরি লইয়াছিলে, কিন্তু

হাসি এবং চাকরি— ইহারাই তোমাকে ভাগ করিয়া লইয়াছিল, আমার জন্য কিছুমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। এত প্রবঞ্চনা সহিবে কেন? সহসা একটা গানের সুর হাসির হল্লা গঙ্গাবক্ষ হইতে ভাসিয়া আসিল। মৃন্ময় চাহিয়া দেখিল, একদল লোক নৌকাবিহার করিতেছে. সঙ্গে একজন গায়িকা। হারমোনিয়ম ও ডুগি-তবলা সহযোগে গান বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।

একটু তফাতে একজন ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, ছি ছি, ছোকরা একেবারে বখে গেল! দেখুন দিকি কাণ্ডখানা, ছি ছি ছি!

মৃন্ময় প্রশ্ন করিল, আপনি চেনেন নাকি?

চিনি না! আমাদেরই পাড়ার রাশু দত্তের মেজ ছেলে বিশু দত্ত। সোনাগাছিতে আজকাল কাপ্তেনি করে বেড়াচ্ছে। দেখুন দিকি কাণ্ডখানা ছোকরার!

বিশু দত্ত নামটা মৃন্ময়ের চেনা চেনা ঠেকিল। চাকুরিচ্যুত না হইলে এখনই আর একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া মৃন্ময় বিশু দত্তের অনুসরণ করিত। একটা চুরির তদন্ত করিতে করিতে বিশু দত্তের নামটা মৃন্ময়ের কর্ণগোচর হয়। বিশু দত্ত নাকি নিজের সুন্দরী রক্ষিতাকে টোপস্বরূপ ব্যবহার করিয়া বড় বড় লোককে আকৃষ্ট করে এবং তাহাদিগকে নানাভাবে বেকায়দায় ফেলিয়া তাহাদের আংটি, ঘড়ি, টাকা প্রভৃতি অপহরণ করে। ঠিক নিজ হস্তে করে না, তাহার রক্ষিতাই নাকি তাহার নির্দেশ অনুসারে অপহরণ করে। মৃন্ময়ের মনে পড়িল, কিছুদিন পূর্বে এক শূন্য নাচের আসর হইতে পুলিশ কর্তৃক সংগৃহীত একটি নর্তকীর পদাঙ্ক লইয়া সে বহু মাথা ঘামাইয়াছিল। উক্ত নর্তকীই নাকি বিশু দত্তের চতুরা প্রণয়িনী, মদ-বিহুল এক মাড়োয়ারি সন্তানের বহুমূল্য একটি হীরক-অঙ্গুরীয় অপহরণ করিয়াছিল। মাড়োয়ারির বন্ধুবর্গ পুলিশে খবর দেন, পুলিশ আসিয়া তাহাকে ধরিতে পারে নাই, নর্তকীর পদাঙ্কটি কেবল সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল। মৃন্ময়ের মনে পড়িল, তাহার বন্ধু মিস্টার মজুমদার এখনও হয়তো ব্যাপারটা লইয়া তদন্ত করিতেছেন। আর কিছুদিন পূর্বে হইলে নৌকাবিহারী বিশু দত্তের সন্ধান পাইয়া মৃন্ময় উল্লসিত হইয়া উঠিত, এখন কিন্তু সমস্তই নিরর্থক বলিয়া মনে হইল। সে অসাড় হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। স্বর্ণলতার মুখচ্ছবি মন হইতে ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া গেল। মৃন্ময় একমনে বসিয়া গান শুনিতে লাগিল।

॥ তেরো ॥

বেলা হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনি কেমন যেন স্বস্তি পাচ্ছেন না, না শঙ্করবাবু?

কি করে বুঝলেন আপনি?

কি করে তা বলতে পারব না, কিন্তু ঠিক কি না বলুন? এই নিন, বড় কাপটাই আপনি নিন, এই নিয়ে তিন কাপ হল কিন্তু।

তা হোক। খেতে তো আজ দেরি হবে, কত রাত্তির হবে বলুন দেখি?

এগারোটার কম নয়। একা হাতে সব করতে হবে তো!

আপনার কজন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছেন?

বেশি নয়, একজন।

তারপর একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, আপনিও চেনেন তাকে।

কে?

চুনচুন।

শঙ্কর বিস্মিত হইল।

আমি যে চুনচুনকে জানি, তা আপনাকে কে বললে?

বেলা স্মিতমুখে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, আমি সব জানি।

সব জানেন, মানে? আর কি জানেন?

আপনি ওর স্বামীর মৃত্যুকালে শুশ্রূষা করেছিলেন এবং আপনার দশ টাকা যা পাওনা হয়েছিল তা আপনি নেননি।

শঙ্কর আরও বিস্মিত হইল।

এত খবর আপনি পেলেন কোথা থেকে?

চুনচুনের কাছ থেকেই।

দুই-এক সেকেন্ড নীরব থাকিয়া বেলা বলিলেন, আপনার ন্যায্য পাওনা দশ টাকা আপনি নিলেন না কেন?

এমনিই।

এমনিই? নিছক এমনিই?

বেলাদেবী ফিক করিয়া হাসিয়া অধরোষ্ঠ দংশন করিলেন। তাহার পর বলিলেন, কেন নেননি, তাও আমি জানি।

কি বলুন তো?

বলব না। ইক্‌মিকের আঁচটা ঠিক আছে কি না দেখে আসি। একটু বসুন আপনি।

বেলা পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

বেলার আগ্রহাতিশয্যে শঙ্কর মেসের বাসা উঠাইয়া দিয়া বেলার বাসাতেই আসিয়া বাস করিতেছে। দৃষ্টিকটু হইবে বলিয়া শঙ্কর প্রথমে আসিতে চাহে নাই। কিন্তু বেলা কিছুতেই শোনেন নাই। তাঁহার যুক্তি—লোকে কি বলিবে, না বলিবে, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতে শুরু করিলে মাথাই ঘামিয়া যাইবে, আর কিছুই হইবে না। শঙ্কর একদা বিপন্ন বেলাকে আশ্রয় দিয়াছিল, এখন ঘটনাচক্রে শঙ্কর বিপন্ন হইয়াছে, বেলার কি উচিত নয় এখন তাহাকে দুই-চারি দিনের জন্যও আশ্রয় দেওয়া এবং বেলার যখন সে সুবিধা রহিয়াছে? বেলার একটা কথাও শঙ্করের মনে পড়িল, সমাজের নিষ্কর্মাদের দিকটাও তো দেখতে হবে। পরের আচরণের সমালোচনা করেই বেচারারা সময় কাটায়। এই তাদের মানসিক রোমন্থনের একমাত্র জাবর, তার থেকে তাদের বঞ্চিত করাটা কি উচিত? আমার তো মনে হয়, ওদের মুখ চেয়েই মাঝে মাঝে দৃষ্টিকটু আচরণ করা কর্তব্য।

একরূপ জোর করিয়াই বেলা শঙ্করকে টানিয়া লইয়া আসিয়াছেন। শঙ্কর আসিয়াছে বটে, কিন্তু স্বস্তি পাইতেছে না। বেলার উপার্জনে ভাগ বসাইতে তাহার পৌরুষে আঘাত লাগিতেছে। কিন্তু এ কথাও সে মনে মনে বারংবার স্বীকার না করিয়া পারিতেছে না যে, ভাগ্যে বেলার সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল, না হইলে সে কি মুশকিলেই পড়িত। টিউশনি ছাড়িয়া দেওয়াতে

প্রফেসার গুপ্ত একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। প্রফেসার গুপ্তের কথাগুলি তাহার কানে বাজিতেছে—আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে বনে যাও। কলকাতা শহরে বাবুয়ানি করে থাকবে, অথচ আত্মসম্মানের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগলে সইতে পারবে না, তা হয় না। তা ছাড়া, অমন সজারুর মতো বিবেক নিয়ে কোথাও কিছু করতে পারবে না তুমি, আজীবন কেবল কষ্ট ভোগ করবে। স্থানকালের উপযোগী নতুন বিবেক তৈরি করে নাও।

সুতরাং টিউশনির জন্য প্রফেসার গুপ্তের নিকট পুনরায় আর যাওয়া চলে না। কিন্তু বেলার কাছেই বা আর কতদিন থাকা চলিবে? বেলা অবশ্য বার বার বলিতেছেন যে, যতদিন না একটা কাজ হয় ততদিন আপনি আমার বাসায় থাকুন। কিন্তু তাহা শঙ্কর পারিবে না। অবিলম্বে যেমন করিয়া হউক তাহাকে বেলার বাসা ত্যাগ করিতে হইবে। শুধু যে বেলার উপার্জনে ভাগ বসাইতে তাহার পৌরুষে আঘাত লাগিতেছে তাহা নয়, অন্তর-গুহা-নিবাসী পশুটা বারংবার প্রলুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। শঙ্কর যদিও ইহা সুনিশ্চিত ভাবেই জানে যে, প্রলুব্ধ পশুর কবলে পড়িয়া বিক্ষত হইবার সম্ভাবনা আর যাহারই থাক, বেলার নাই। বিধিদত্ত এক অদ্ভুত বর্মে তিনি আবৃত। আক্রমণ করিলে পশুটাই ব্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসিবে, বেলার কিছু হইবে না। সমস্ত জানিয়াও কিন্তু পশুটা প্রলুব্ধ হয়, বরং বেশি করিয়া হয়। সুতরাং এই অস্বস্তিকর আবহাওয়া হইতে যত শীঘ্র অপসৃত হইয়া পড়িতে পারা যায়, ততই মঙ্গল। কিন্তু অপসৃত হইবার কোনো পথই শঙ্কর দেখিতে পাইতেছে না। কোথায় যাইবে? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইবে? তাহাই বা কয়দিন সম্ভব? তাহার বর্তমান তমসাচ্ছন্ন জীবনে বেলা মল্লিকই এখন একমাত্র আলো, যাহার সাহায্যে সে অন্তত খানিকটা পথ অতিবাহন করিতে পারে। কিন্তু মুশকিল হইয়াছে এই যে, বেলা মল্লিকই শুধু আলো নয়, শিখাও। একটু অসাবধান হইলেই তাহা দহন করে, এবং সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও মন অসাবধান হইবার জন্য প্রলুব্ধ হইয়া ওঠে। মাত্র কয়েকদিন বেলা মল্লিকের সহিত আলাপ করিয়া শঙ্কর ইহা মনেপ্রাণে বুঝিয়াছে, এবং বুঝিয়াছে বলিয়াই পলাইবার পথ খুঁজিতেছে। বেলা আশ্রয় দিয়াছেন, কিন্তু প্রশ্রয় দিবেন না। হাসিতে হাসিতে যে কথাগুলি বেলা আজ সকালে বলিয়াছিলেন, তাহা শঙ্করের মনে পড়িল। শঙ্কর বেলাকে বলিয়াছিল, আর কিন্তু ভালো দেখাচ্ছে না মিস মল্লিক, একটা বিয়ে করুন।

আমি তো এক্ষুনি রাজি, কিন্তু পাত্র কই?

কি রকম পাত্র চাই আপনার?

গোটা এবং সুস্বাদু।

তার মানে?

তার মানে—সুস্বাদু পেয়ারা হলেও আমার আপত্তি নেই, কিন্তু সেটা গোটা হওয়া চাই। তার আধখানা আর একজন কামড়ে খেয়ে গেছে, সে রকম জিনিস আমার চাই না। কারও উচ্ছিষ্ট জিনিস ছুঁতেও আমার ঘেন্না করে। তাই বলে গোটা নিম, গোটা মাকাল বা গোটা কুমড়োর প্রতিও লোভ নেই আমার।

সে রকম পাত্রের অভাব কি?

বেলা নাসা কুঞ্চিত করিয়া ওষ্ঠভঙ্গিসহকারে উত্তর দিয়াছিলেন, সব এঁটো।

কটা লোক দেখেছেন আপনি?

যে কটা দেখেছি, তাই যথেষ্ট। হাঁড়ির ভাত একটা দুটো টিপলেই বোঝা যায়, বাকিগুলোর অবস্থা কি রকম। দেশসুদ্ধ ব্যাটাছেলে হয় হাঁদা, না হয় এঁটো।

হাসিতে হাসিতে প্রসঙ্গটা উঠিয়াছিল এবং হাসিতে হাসিতে তাহা শেষ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু হাসির অন্তরালবর্তী সত্যটা শঙ্কর উপলব্ধি না করিয়া পারে নাই।

ইক্‌মিকের তত্ত্বাবধান শেষ করিয়া বেলাদেবী ফিরিয়া আসিলেন।

বড্ড দেরি হয়ে গেল, নয়? বেগুনগুলো পোড়ালাম, বিরিঞ্চি করব।

এত রকম রান্না আপনি শিখলেন কোথা থেকে?

'পাকপ্রণালী' থেকে।

চুনচুনকে নেমন্তন্ন করেছেন যখন, তখন সব নিরামিষ রান্না করেছেন নিশ্চয়?

হ্যাঁ।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শঙ্কর বলিল, চুনচুনের জন্যে ভারি দুঃখ হয় আমার।

বেলাদেবী মুচকি হাসিয়া বলিলেন, সাবধান, দুঃখ হওয়াটাই কিন্তু প্রথম ধাপ।

তাহার পর গম্ভীরভাবে বলিলেন, আমার কিছুমাত্র দুঃখ হয় না, আমার বরং রাগ হয়। মনে হয়, বেশ হয়েছে, যেমন কর্ম তেমনই ফল।

কেন?

ও-রকম বোকার মতো লুকিয়ে বিয়ে করতে গিয়েছিল বলে।

বাঃ, ভালোবেসেছিল, বিয়ে করবে না?

ভালোবাসলেই তাকে বিয়ে করতে হবে? বেশ তো যুক্তি আপনার! সত্যি সত্যি যাকে ভালোবাসা যায়, তাকে বিয়ে না করাই বরং ভালো, ভালোবাসাটা ঘষা পয়সার মতো হয়ে যায় না!

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, আপনি থামুন তো, এসব ব্যাপারে আপনার নিজের যখন কোনো অভিজ্ঞতাই নেই, তখন এ বিষয়ে আপনার কোনো কথাই শুনতে প্রস্তুত নই আমি। ওসব কেতাবি কথা আমিও জানি।

অভিজ্ঞতা নেই, আপনি জানলেন কি করে?

আমি জানি।

কিছু জানেন না। কিংবা জেনেও না-জানার ভান করেছেন।

উভয়ে উভয়ের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার পর শঙ্কর বলিল, অর্থাৎ আপনি বলতে চান, আপনি কাউকে ভালোবেসেছেন, অথচ তাকে পাবার জন্য আকুল হয়ে ওঠেননি?

আকুল হয়ে উঠলেও দমন করেছি সে আকুলতা। আমার আকুলতা আমার আত্মসম্মানজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি কখনও, পারবেও না।

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বলিল, যে ভালোবাসা আত্মসম্মানজ্ঞানকে বিপর্যস্ত করে দিতে না পারে, সে ভালোবাসা ভালোবাসাই নয়।

আপনি পুরুষের দিক দিয়ে ভাবছেন, আমি বলছি ভদ্র মেয়ের মনোভাব। আলোচনা হয়তো আরও কিছুদূর অগ্রসর হইত, কিন্তু দ্বারের বাহিরে একটা মোটর থামিবার শব্দ হওয়াতে আর হইল না।

বেলাদেবী উঠিয়া পড়িলেন।

সায়েবের ওখান থেকে মোটর এল। আপনি বসুন, আমি চট করে ঘুরে আসছি এক্ষুনি।

আজ না গেলে কি হয়?

আর কিছু না, কিছুই বলবেন না, কিন্তু বড় কষ্ট পাবেন। এত অসহায়, যদি দেখেন তাঁকে—। আমি যাব আর আসব।

সম্পর্কটা খুবই ঘনিষ্ঠ হয়েছে তা হলে বলুন।

হ্যাঁ, ঠিক মা আর ছেলের মতো।

হাসিয়া বেলা পাশের ঘরে বেশ পরিবর্তন করিতে গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনি ততক্ষণ 'ওল্‌ড্‌ কিউরিয়সিটি শপ'খানা পড়ুন। আমি বেশি দেরি করব না। আর ইতিমধ্যে যদি চুনচুন এসে পড়ে তা হলে তো ভালোই হবে।

মুচকি হাসিয়া বেলা চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর বসিয়া 'ওল্‌ড্‌ কিউরিয়সিটি শপ'-খানার পাতা উল্টাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার মানসপটে চুনচুনের মুখখানা ক্রমশ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। চুনচুনের কালো চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি যেন তাহার অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত আলোকিত করিয়া দিল।

॥ চোদ্দো ॥

সাড়ে পাঁচ শত টাকার নোটগুলি সযত্নে ভিতরের পকেটে রাখিয়া ভণ্টু নিবারণবাবুর বাড়ির উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। বাহির হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু কি করিয়া নিবারণবাবুকে কথাটা বলিবে, তাহা সহসা তাহার মাথায় আসিল না। বেচারা তাহার সহিত দার্জির বিবাহ দিবেন বলিয়া কত আশা করিয়া বসিয়া আছেন। সহসা এমন করিয়া তাঁহার আশাভঙ্গ করিতে হইবে। নিবারণবাবুর আশাভঙ্গ করিতে ভণ্টুর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল তাহা নয়, কিন্তু চক্ষুলজ্জা বলিয়া একটা জিনিস আছে তো! তাছাড়া, লোকটা দাগী লোক, একবার একটা গুরুতর ঘা খাইয়াছেন। অকারণে আবার একটা আঘাত করা সত্যই অন্যায় হইবে। কিন্তু আঘাত না করিয়া ভণ্টুর উপায়ও নাই। যাহা স্বপ্নাতীত ছিল, তাহাই সত্য হইতে চলিয়াছে। আরব্য উপন্যাসের খামখেয়ালি বাদশাহ হারুন-অল-রশিদের প্রেতাত্মাই সম্ভবত জুলফি-দার বড়বাবুর স্কন্ধে ভর করিয়াছে। তিনি ভণ্টুকে জামাই না করিয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না। ইহার জন্য যত অর্থ লাগে, তাহা তিনি ব্যয় করিতে প্রস্তুত। এতদিন ধরিয়া তিনি ভণ্টুর গতিবিধি, চরিত্রবল, কর্মতৎপরতা, কর্তব্যবোধ—সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিয়াছেন এবং এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, কোনোরূপ বাধাকেই তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতে চান না। বাধার যতগুলি ঐরাবত ভণ্টু খাড়া করিয়াছিল, জুলফি-দারের উৎসাহস্রোতে সমস্তগুলিই ভাসিয়া গিয়াছে। বিবাহ-সম্পর্কে ভণ্টুর সঙ্গত অসঙ্গত যতগুলি দাবি ছিল, সমস্তই তিনি মিটাইয়া দিতে প্রস্তুত। অসঙ্গত দাবিগুলি শুনিয়া জুলফি-দার বরং অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এগুলির দ্বারা ভণ্টুর চরিত্রের মহত্তর দিকটাই নাকি তাঁর নিকট আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। ভণ্টু বড়বাবুকে বলিয়াছিল যে, তিনি তাঁহার কন্যাকে যত টাকার অলঙ্কার দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সে টাকার দ্বারা যেন ঠিক

এক ধরনের দুই সেট গহনা গড়ানো হয়। কারণ বড়লোকের মেয়ে এক-গা গহনা পরিয়া আসিবে এবং তাহার বউদিদি— গুড ওলড বিডডিকার— নিরাভরণা হইয়া থাকিবেন, ইহা সে সহ্য করিতে পারিবে না। সংসারের জন্যই বউদিদির গহনাগুলি একে একে গিয়াছে. বউদিদির গহনা আগে না হইলে সে কোনো ক্রমেই পূর্ণালঙ্কৃতা বধূ ঘরে আনিতে পারিবে না। বড়বাবু এ প্রস্তাবে সানন্দে সম্মত হইয়াছেন। ভণ্টুর দ্বিতীয় প্রস্তাব— বিবাহরূপ দায়িত্ব লইবার পূর্বে সে অন্তত পাঁচ হাজার টাকা লাইফ ইনসিওরেন্স করিতে চায়, কিন্তু এখন তাহার যাহা বেতন, তাহার দ্বারা সে প্রিমিয়ম চালাইতে পারিবে না। বড়বাবু প্রিমিয়ম চালাইতে রাজি হইয়াছেন। বড়বাবুর ভাষায়—মনি ইজ নো কোশ্চেন— তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যার জন্য একটি সৎপাত্র চান। তিনি ইচ্ছা করিলে মেয়েকে বড়লোকের বাড়িতে স্বচ্ছন্দে দিতে পারেন; মেয়েটি সুশ্রী, তাঁহার টাকাও আছে। কিন্তু তিনি বড়লোকের ঘরের বয়াটে অকর্মণ্য পাত্রের হাতে মেয়েকে দিতে চান না। তিনি চান গরিবের ঘরের সচ্চরিত্র. শিক্ষিত, কর্মঠ একটি যুবক এবং ভণ্টুর মধ্যে তাহা তিনি পাইয়াছেন। টাকার জন্য তিনি পশ্চাৎপদ হইবেন না।

আপিসের বড়বাবু শ্বশুর হইলে অনিবার্যভাবে চাকরিরও উন্নতি হইবে। তাহার প্রমোশনের জন্য বড়বাবু ইতিমধ্যে রেকমেন্ড করিয়াছেন। মেয়েটিও দেখিতে ভালো, কুষ্ঠিতেও নাকি রাজ-যোটক হইয়াছে। এতগুলি প্রলোভন ত্যাগ করিয়া নিবারণবাবুর কালো মেয়েকে বিবাহ করিবে এতবড় আদর্শবাদী ভণ্টু নয়। নিজের সুবিধার জন্যই সে দার্জিকে বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছিল, এখন অধিকতর সুবিধার খাতিরে সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে মোটেই কুণ্ঠিত নয়। বড়বাবুকে নিবারণবাবু-ঘটিত সমস্ত কথা খুলিয়া বলায় বড়বাবু তৎক্ষণাৎ তাহাকে নগদ সাড়ে পাঁচ শত টাকা দিয়া বলিয়া দিয়াছেন টাকাটা অবিলম্বে নিবারণবাবুকে ফেরত দিয়া আসিতে। কথাটা বলা যত সহজ, করা তত সহজ নয়। একটা অজুহাত তো খাড়া করিতে হইবে!

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ভণ্টু শেষে স্থির করিয়া ফেলিল যে. আজই সে নিবারণবাবুকে টাকাটা দিবে না। আজ দার্জির কুষ্ঠিটা চাহিয়া আনিবে এবং পরদিন গিয়া বলিবে যে কুষ্ঠির মিল হইল না। সাপও মরিবে, লাঠিও ভাঙিবে না; তাহার পর টাকাটা ফেরত দিলে দেখিতে শুনিতে সবদিক দিয়াই ভদ্র হইবে। সব ক্ষেত্রে সরল সত্য কথা বলিলে কি চলে?

সমস্যার সমাধান হইয়া গেল কিন্তু অন্য প্রকারে এবং অতিশয় অপ্রত্যাশিতভাবে। ভণ্টু যখন নিবারণবাবুর বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল, তখন নিবারণবাবু বাড়িতে ছিলেন না। দার্জিই সসঙ্কোচে বাহির হইয়া আসিল এবং বাহিরের ঘরটা খুলিয়া ভণ্টুকে বসিতে বলিল। ভণ্টু দার্জিকে সামনাসামনি দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, তাহার নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হইতে লাগিল। দার্জি অবশ্য বেশিক্ষণ দাঁড়াইল না, বাহিরের ঘরটা খুলিয়া দিয়াই চলিয়া গেল। ভণ্টু বসিয়া রহিল। পাশের বাড়ির ছাদে একজন প্রৌঢ় বিধবা বড়ি দিতেছিলেন এবং আপন মনেই কাহার উদ্দেশ্যে কি যেন বলিতেছিলেন, ভণ্টু অন্যমনস্ক হইয়া তাহাই শুনিতেছিল। দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ শুনিয়া ভণ্টু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, দার্জি সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

কি?

যদি কিছু মনে না করেন, আপনাকে একটা কথা বলব।

কি বল?

দার্জি কিছুক্ষণ আনতচক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমার ইচ্ছে নয় যে, আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়।

এই অপ্রত্যাশিত উক্তিতে ভণ্টু কেমন যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল, কয়েক মুহূর্ত তাহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিস্মিত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল, ইচ্ছে নেই কেন?

দুই চক্ষুর দৃষ্টি ভণ্টুর মুখের ওপর স্থাপিত করিয়া দার্জি মৃদু কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, আপনি আমাকে বিয়ে করছেন খালি টাকার জন্যে।

ভণ্টু নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

দার্জিই পুনরায় বলিল, তা ছাড়া আমি ভিন্ন বাবাকে দেখবার এখন কেউ নেই। আপনি দয়া করে ভেঙে দিন বিয়েটা। আমি এখন বিয়ে করতে পারব না।

আর কিছু না বলিয়া দার্জি ভিতরে চলিয়া গেল।

ভণ্টু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এরকম ঘটনা যে বঙ্গদেশে ঘটিতে পারে, তাহা ভণ্টুর কল্পনাতীত ছিল। একটু পরেই নিবারণবাবু আসিয়া পড়িলেন। তিনি আসিতেই ভণ্টু উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অসঙ্কোচে তাঁহার হাতে টাকাগুলি দিয়া বলিল, মাপ করবেন নিবারণবাবু, বাবা বউদি— কেউ মত দিচ্ছেন না।

নিবারণবাবু আকাশ হইতে পড়িলেন।

সে কি? মানে—

কিছুতেই মত হচ্ছে না, কি করি বলুন?

আমি একবার গিয়ে যদি—

না, আপনি আর কষ্ট করবেন না।

নোটের তাড়া হাতে কবিয়া নিবারণবাবু বজ্রাহতের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন।

।। পনেরো ।।

মুকুজ্জেমশাই নিশ্চিন্ত ছিলেন না।

সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে একটি ছোট ঘর ভাড়া লইয়া তিনি মৃন্ময় এবং শঙ্করের জন্য চাকরির চেষ্টা করিতেছিলেন। একরূপ জোর করিয়াই তিনি হাসিকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিয়া মৃন্ময়কে নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন। শঙ্করের কিন্তু কোনো সন্ধানই তিনি পাইতেছিলেন না। শিরীষবাবু তাহাকে যে ঠিকানা দিয়াছিলেন, তাহা একটি মেসের ঠিকানা। মুকুজ্জেমশাই সেখানে গিয়া শঙ্করের দেখা পান নাই; কয়েক দিন পূর্বেই নাকি শঙ্কর সে বাসা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারিল না। হয়তো শঙ্কর শিরীষবাবুকে তাহার নূতন ঠিকানা জানাইয়াছে এই আশায় মুকুজ্জেমশাই শিরীষবাবুকে পুনরায় পত্র দিয়াছেন, এখনও পর্যন্ত জবাব আসে নাই। মৃন্ময়কে লইয়া পরিচিত অপরিচিত নানা ব্যক্তির ও আপিসের দ্বারে মুকুজ্জেমশাই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। অমিয়ার বিবাহ-ব্যাপারে মুকুজ্জেমশাই যেমন একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন, এই চাকুরি অনুসন্ধানেও তিনি ঠিক তাহাই

করিতেছেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ইংরাজি বাংলা কয়েকখানা দৈনিক পত্রিকা কেনা হয়। মৃন্ময় অথবা শঙ্করের উপযুক্ত যেখানে যত কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখেন সর্বত্রই একটি করিয়া দরখাস্ত পেশ করিয়া দেন। কর্তৃপক্ষ কলিকাতায় থাকিলে নিজে গিয়া অথবা মৃন্ময়কে পাঠাইয়া তদ্বির করেন। এ পর্যন্ত তিনি কুড়ি জায়গায় দরখাস্ত করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন, কিন্তু দমেন নাই। মৃন্ময় দমিয়া গেলে হাসিয়া বলিয়াছেন, ছেলেবেলার সেই কবিতাটা ভুলে গেল— 'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ, উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?' দমে গেলে চলবে কেন? চেষ্টা থাকলে ঠিক একটা না একটা কিছু লেগে যাবেই, দেখ না তুমি।— বলেন আর হাসেন। মৃন্ময় লজ্জিত হইয়া পড়ে।

সেদিন নির্জন দ্বিপ্রহরে মৃন্ময় বাসায় একা ছিল। মুকুজ্জেমশাই একবিংশ দরখাস্তটির তদ্বির করিতে স্বয়ং বাহির হইয়াছিলেন। মৃন্ময় একা শুইয়া শুইয়া নিজের ছন্নছাড়া জীবনের কথাই ভাবিতেছিল। বাল্যকালে পিতা-মাতা মারা গিয়াছেন, দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ের যৎসামান্য সাহায্যে এবং প্রাইভেট টিউশনি করিয়া বহুকষ্টে সে এম. এ. পাস করিয়াছে। নিজে পছন্দ করিয়া স্বর্ণলতাকে বিবাহ করিয়াছিল এবং এই বিবাহের জন্যই দূর-সম্পর্কের সেই আত্মীয়টির সহিত তাহার মনোমালিন্য ঘটে। আত্মীয়টির ইচ্ছা ছিল, বিবাহ-বাজারে মৃন্ময়কে বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জন করিবেন। কিন্তু আদর্শবাদী মৃন্ময় তাহা ঘটিতে দেয় নাই। সে নিজে পছন্দ করিয়া দরিদ্রের কন্যা স্বর্ণলতাকে বিনাপণে বিবাহ করিয়াছিল এবং অনেক আশা করিয়া এই কলিকাতা শহরেই তাহার ক্ষুদ্র সংসারটি পাতিয়াছিল। অতিশয় আকস্মিকভাবে তাহার সে সংসার ছারখার হইয়া গেল। মনের আবেগে তখন মূর্খের মতন সে কি অদ্ভুত কাণ্ডটাই করিয়া বসিল! স্বর্ণলতাকে খুঁজিবার জন্য পুনরায় বিবাহ করিয়া পুলিশে চাকরি লইল! একবার ভাবিল না যে, পুনরায় বিবাহ করা মানেই— স্বর্ণলতাকে অপমান করা, তাহার স্মৃতির সম্মুখে একটা যবনিকা টাঙাইয়া দেওয়া। স্বর্ণলতার সদ্যবিরহে সে ভাবিয়াছিল যে, হাসিকে অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু উন্মেষিত-যৌবনা অনুরাগিণী পত্নীর সুনিবিড় সান্নিধ্যকে ঔদাসীন্যভরে পাশ কাটাইয়া যাওয়া কি এতই সহজ! তিলে তিলে ক্ষণে ক্ষণে অনিবার্যভাবে হাসি মৃন্ময়ের মনে আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছে। স্বর্ণলতার কথা এখন জোর করিয়া মনে করিতে হয়। তাহার স্মৃতিকে সজীব রাখিবার জন্য প্রথম প্রথম সে প্রতিদিন তাহাকে পত্র লিখিত। কিন্তু তাহাও ক্রমশ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সহসা মৃন্ময় সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। স্বর্ণলতার পত্রগুলি সে যে চন্দনকাঠের বাক্সটাতে রাখিত, সে বাক্সটা তো হাসির সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। মৃন্ময়ের গরম জামা কাপড় যে ট্রাঙ্কটাতে থাকিত, সেই ট্রাঙ্কটাতেই চন্দনকাঠের বাক্সটা সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সে ট্রাঙ্কটা তো হাসি লইয়া গিয়াছে। এতদিন সে ট্রাঙ্কের চাবি মৃন্ময়ের কাছে থাকিত, যাইবার সময় হাসি চাহিয়া লইয়া গিয়াছে। চন্দনের বাক্সটার কথা মৃন্ময়ের মনেই ছিল না। স্বর্ণলতার কথা হাসি কিছুই জানে না। হাসি এখন বেশ লিখিতে পড়িতেও শিখিয়াছে, সে যদি চিঠিগুলি পড়ে। মৃন্ময় অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

মৃন্ময়বাবু বাড়ি আছেন নাকি?

আছি।

কণ্ঠস্বর শুনিয়া মৃন্ময় বুঝিল, পাশের বাড়ির এম. এ. পরীক্ষার্থী বিকাশবাবু আসিয়াছেন।

ভদ্রলোক এবার ফিলজফিতে এম. এ. পরীক্ষা দিতেছেন। মৃন্ময়ও ফিলজফিতে এম. এ. শুনিয়া বিকাশবাবু মৃন্ময়ের নিকট সাহায্য লইবার জন্য মাঝে মাঝে আসেন। কাল মৃন্ময় বাড়ি ছিল না, বিকাশবাবু আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন— মুকুজ্জেমশাইয়ের নিকট মৃন্ময় তাহা শুনিয়াছিল। মৃন্ময় উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

বিকাশবাবু আসিয়াই বলিলেন, মুকুজ্জেমশাই কোথায়?

তিনি বেরিয়েছেন।

হি ইজ এ ওয়ান্ডারফুল ম্যান। অদ্ভুত লোক মশাই, কাল আপনি বাড়ি ছিলেন না, আমি একটু হতাশ হয়েই ফিরছিলুম; মুকুজ্জেমশাই বললেন, পরীক্ষা নাকি কাল থেকে? আমি বললাম, হ্যাঁ, মৃন্ময়বাবুকে আজ একবার পেলে ভালো হত। মুকুজ্জেমশাই আমাকে তখন কয়েকটা কোশ্চেন সাজেস্ট করে দিলেন, বললেন, এগুলো ভালো করে দেখে যেও, পড়তে পারে। আমি তো প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেলুম, মুকুজ্জেমশাই যে এম. এ.-র ফিলজফির কোশ্চেন সাজেস্ট করতে পারেন, তা আমরা ধারণারই বাইরে ছিল। যাই হোক, বললেন যখন, দেখে গেলুম। আমাদের অবস্থা তো বোঝেন— ড্রাউনিং ম্যান ক্যাচস অ্যাট এ স্ট্র। গিয়ে দেখি, ঠিক পড়েছে মশাই। উনিও নিশ্চয় এম. এ. নয়? কিন্তু কিছু বোঝবার উপায় নেই।

মৃন্ময় বিস্মিত হইয়াছিল। বলিল, আমি ঠিক জানি না, উনি নিজের কোনো পরিচয় কাউকে দেন না।

ফিরবেন কখন?

ঠিক বলতে পারি না। এলে খবর দেব আপনাকে।

দেবেন তো কাইন্ডলি, নেক্সট্ পেপারটার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব।

আচ্ছা।

বিকাশবাবু চলিয়া গেলেন। মুকুজ্জেমশাইয়ের নূতন পরিচয় পাইয়া মৃন্ময় যদিও বিস্মিত হইয়াছিল, কিন্তু সে বিস্ময় তাহার মনকে এখন ততটা অধিকার করিতে পারিল না। তাহার সমস্ত মন একটি মাত্র চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া ছিল, হাসির হাতে যদি স্বর্ণলতার চিঠিগুলি পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে কি হইবে?

।। ষোলো ।।

শৈলর দিন কাটিতেছিল, কারণ সময়ের গতিরোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। অমোঘ নিয়মে সূর্য উঠে এবং অস্ত যায়, মানবের সুখদুঃখে দিশাহারা হইয়া এক মুহূর্তের জন্যও শ্লথগতি হয় না। বড় অফিসার মিস্টার এল. কে. বোসের পত্নী শৈলবালারও জীবনের দিনগুলি একে একে আসিতেছিল এবং যাইতেছিল। শৈল সুখী ছিল না। শৈল সুখী ছিল কি না—এ প্রশ্ন কাহারও মনে উদিত হয় নাই; হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। সুখের উপকরণ হিসাবে যে সব জিনিস আহরণ করিবার জন্য আমরা প্রলুব্ধ হই, যাহার জন্য নিজেকে ক্লিষ্ট করি, অপরকে বঞ্চিত করি, মনুষ্যত্বকে খর্ব করি— সুখের সে উপকরণগুলির অভাব শৈলর ছিল না। শৈল বড়লোকের কন্যা, বড়লোকের পত্নী। বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি, গহনা কিছুরই অভাব নেই। স্বামী

রূপবান, পদস্থ ব্যক্তি। শৈলর সহিত তিনি কোনো দুর্ব্যবহার করেনই না, বরং শৈলর সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে স্বামীর নৈতিক কর্তব্যবোধ মিস্টার এল. কে. বোসের একটু বেশি বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বাড়িতে ঠাকুর চাকর দাই বাবুর্চি বেয়ারা গিজগিজ করিতেছে, শৈলকে গান-বাজনা এবং ইংরাজী শিখাইবার জন্য মিস মল্লিককে বাহাল করিয়াছেন, শৈলর নিজের ব্যবহারের জন্য আলাদা একখানা মোটরও তিনি সেদিন তাহার জন্মদিনে তাহাকে উপহার দিয়াছেন। শৈল তথাপি সুখী নয়। তাহার কারণ, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে উৎস উৎসারিত হইলে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও মানুষ সুখী হয়, শৈলর অন্তরে সে উৎস ছিল না। শৈল স্বামীকে প্রিয়তম করিতে পারে নাই। চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারে নাই। শৈল স্বামীকে ভয় করে, তাঁহার নানাবিধ গুণাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হয়, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু তাঁহাকে ভালোবাসিতে পারে না। মিস্টার বোসের কর্মব্যস্ত জীবন ঘড়ির কাঁটা অনুসারে নিয়মিত। তিনি নিক্তির ওজনে কর্তব্য করেন, চুল চিরিয়া বিচার করেন, ওজন করিয়া কথা বলেন। চাকরির উন্নতিই তাঁহার জীবনের ধ্যানজ্ঞান, উপরওয়ালা সাহেবদের বিষয়ই তাঁহার প্রিয় আলোচ্য বিষয়। সাহিত্য সঙ্গীত শিল্প প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় জিনিসের স্থান তাঁহার জীবনে নাই। যতটুকু আছে, তাহা সৌষ্ঠব বজায় রাখিবার জন্য। ঝকঝকে বাঁধানো কতকগুলি মূল্যবান সংস্করণের নামজাদা পুস্তক দামি আলমারিতে সাজানো আছে, প্রতি ঘরের দেওয়ালে সুন্দর ফ্রেমে প্রসিদ্ধ কয়েকখানি ছবিও ঝুলিতেছে। বাড়িতে গ্রামোফোন আছে; পত্নীকে সঙ্গীত শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষয়িত্রী আছে; রেডিওর চলন তখন ছিল না, থাকিলেও লেটেস্ট মডেল নিশ্চয় মিস্টার বোসের গৃহ অলঙ্কৃত করিত। কিন্তু মিস্টার বোসের অন্তরে ইহাদের কোনো শ্রদ্ধার স্থান নাই, মনে মনে তিনি এসব কবিত্ব-টবিত্বকে অনুকম্পার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। শৈলর সহিত মাঝে মাঝে ইহা লইয়া আলোচনা হয়। মিস্টার বোসের ভাষায়— এ সমস্ত ওয়ার্থলেস অকর্মণ্য লোকদের উপজীব্য। পৃথিবীতে যাহারা কাজের লোক, তাহাদের ওসব লইয়া মাতামাতি করিবার অবসর কই? সুতরাং শৈলর নূতন শেখা সুরটা শুনিয়া মুগ্ধ হইবার, নূতন প্যাটার্নের সেলাইটা দেখিয়া তারিফ করিবার অথবা নূতন শোনা নাটকটার কাহিনী ধৈর্যভরে শুনিবার ইচ্ছা মিস্টার বোসের নাই, ইচ্ছা নাই বলিয়া অবকাশও নাই। তিনি নিখুঁত কর্মতৎপরতার সহিত নিজের নিখুঁত কর্মজীবন যাপন করিয়া চলিয়াছেন। নিম্নতম কর্মচারীরা সকলে জানে, বোস সায়েব ভারি স্ট্রিক্ট লোক, কোনো কিছুতেই বিধিবদ্ধ কর্তব্যকর্ম হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবেন না।

শৈল মাঝে মাঝে ভাবে, তাহার স্বামী যদি একটু কম নিখুঁত হইত, একটু কম বুদ্ধিমান হইত, একটু কম মাহিনার চাকরি করিত, তাহা হইলে হয়তো সে সুখী হইত। এমন প্রবল রকম নিখুঁত লোককে ভয় করা চলে, শ্রদ্ধা করা চলে, ভালোবাসা যায় না।

শৈলর মাঝে মাঝে শঙ্করদার কথা মনে পড়ে। বাল্যকালে শঙ্করদা তাহার সঙ্গী ছিল, তাহার অসঙ্গত মান ভাঙাইবার জন্য কত সাধ্যসাধনা করিত! শঙ্করদা আজকাল আর আসে না। কেনই বা আসিবে? বিবাহ হইয়াছে, নূতন বউ লইয়া সে হয়তো আনন্দেই আছে। মিস মল্লিকের সহিত শঙ্করদার মাঝে মাঝে নাকি দেখা হয়! মিস মল্লিককে দিয়া ডাকিয়া পাঠাইলে শঙ্করদা নিশ্চয়ই আসিবে। কিন্তু ডাকিয়া পাঠাইতে লজ্জা করে, ভয়ও হয়।

।। সতেরো ।।

সকালে টিউশনি সারিয়া বেলাদেবী এগারোটা নাগাদ বাসায় ফিরিলেন। স্নানাহার করিয়া আবার বাহির হইতে হইবে। দুপুরে আরও গোটা-দুই টিউশনি আছে। মেয়েদের গানের শিক্ষয়িত্রী হিসাবে বেলা মল্লিকের পসার বেশ জমিয়া গিয়াছে। প্রথমত মেয়েদের গান শিখাইবার জন্য পুরুষ অপেক্ষা নারী শিক্ষকেরই বেশি চাহিদা, দ্বিতীয়ত বেলার শুধু রূপ নয়— গুণও আছে। গান-বাজনায় বেশ দখল হইয়াছে, হারমোনিয়াম, সেতার, এস্রাজ, পিয়ানো— এই চারিটি যন্ত্র খুব ভালোভাবে বাজাইতে পারেন এবং ছাত্রীদের খুব যত্নসহকারে শিখাইয়া থাকেন। বেতনও যে খুব অসম্ভব রকম বেশি তাহা নয়, সুতরাং গীত-বাদ্য-জিজ্ঞাসু ছাত্রীমহলে বেলাদেবীর চাহিদা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। এমন কি সময়ের অভাবে আজকাল অনেক ছাত্রীকে ফিরাইয়া দিতেও হইতেছে। দাদার সহিত ঝগড়া করিয়া আসিয়া প্রথমে তিনি অকূল পাথারে পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখন সত্য সত্যই নিজের পায়ে সমর্থভাবে দাঁড়াইতে পারিয়াছেন। দাদার প্রতি মনোভাবও অনেকটা কোমল হইয়া আসিয়াছে। হয়তো আর কিছুদিন পরে দাদার নিকট তিনি ফিরিয়াও যাইতেন। মনের ভিতর এই যুক্তিটা ক্রমশ অঙ্কুরিত হইতেছিল— এখন আর ফিরিয়া যাইতে আপত্তি কি, এখন তো আমি সত্য সত্যই নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিয়াছি, দাদার অর্থ অথবা অনুগ্রহের ওপর আর তো নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে না। অন্য সব টিউশনি ছাড়িয়া দিলেও ওই বৃদ্ধ সাহেবটি যাহা দেন, তাহাতেই তাহার একার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সব গোলমাল হইয়া গেল। বেলাদেবী ফিরিয়া আসিয়াই একখানি পত্র পাইলেন— প্রিয়নাথ মল্লিকের পত্র। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পত্রখানি পড়িলেন, সমস্ত চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। প্রিয়নাথ মল্লিক লিখিতেছেন—

বেলা,

এতদিন পরে বুঝিলাম, কেন তুমি আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছিলে এবং এতদিন পরে তোমার সম্বন্ধে আমার একটা ভ্রান্ত ধারণাও অপনোদিত হইয়া গেল। এতদিন তোমাকে আমি পুরুষ-সঙ্গ-লোলুপ সাধারণ মেয়েদের সহিত এক শ্রেণীতে ফেলিয়া ছোট করিয়া দেখিতে পারি নাই। তোমার স্বাধীনভাবে থাকিবার অসামাজিক ইচ্ছাকে তোমার খামখেয়ালী জেদী প্রকৃতিরই স্বরূপ মনে করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, তুমিও পুরুষ-সঙ্গ-লোলুপ সাধারণ মেয়ে, শাসনের গণ্ডি ডিঙাইয়া স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা করিতে চাও। শঙ্করবাবু নামক ব্যক্তিটি যে তোমার প্রণয়ী, তাহা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারি নাই; কিন্তু এখন তোমার আচরণে তাহা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে অবিশ্বাস করিতে পারি না। আমি আশ্চর্য হইয়া কেবল ভাবিতেছি, তোমার সামাজিক জ্ঞান কি একেবারে লোপ পাইয়াছে! লোকটাকে প্রকাশ্যভাবে ঘরে স্থান দিয়াছ! তোমাকে এখনও অনুরোধ করিতেছি, এখনও তুমি যদি ভালোভাবে থাকিতে চাও, আমার কাছে ফিরিয়া এস। ইহাই আমার শেষ অনুরোধ জানিবে।

ইতি—

তোমার দাদা প্রিয়নাথ মল্লিক

বেলা পত্রখানি কুচিকুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। দাদার নিকট ফিরিয়া যাইবার যে

ইচ্ছাটা মনের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছিল, তাহা মুহূর্তে অপসারিত হইয়া গেল। শঙ্করকে প্রকাশ্যভাবে বাড়িতে স্থান দেওয়ায় ক্ষুব্ধ জনার্দন সিংহও চাকরিতে জবাব দিয়া গিয়াছে। এই পত্রখানি বেলাকে দ্বিতীয়বার আঘাত করিল। কিন্তু এই দ্বিতীয় আঘাতে বিচলিত হওয়া দূরে থাক, বেলা আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। শঙ্করবাবুর যতদিন না কোথাও চাকরি হইতেছে, ততদিন বেলা তাঁহাকে কোথাও যাইতে দিবেন না, ইহাতে যে-ই যাহা বলুক না কেন!

বেলাদেবী পাশের ঘরে গেলেন। ইক্‌মিক কুকারটির গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, একটু গরম আছে, একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যায় নাই। তাড়াতাড়ি স্নানটা সারিয়া লইতে হইবে, শঙ্করবাবু হয়তো এখনই আসিয়া পড়িবেন। তেলের শিশিটা এবং সাবানের কৌটা লইয়া বেলা বাথরুমে গেলেন। বাথ-রুমের ভিতর যে তৃতীয় আঘাত উদ্যত হইয়াছিল, তাহা বেলা প্রত্যাশা করেন নাই। বাথ-রুমের জানালা গলাইয়া কে একটা প্রকাণ্ড খাম মেঝের ওপর ফেলিয়া গিয়াছে। জনার্দন সিং নাই, সুতরাং ও পাশের ছোট দেওয়ালটা অতিক্রম করিয়াই কেহ নিশ্চয়ই আসিয়াছিল এবং জানালা গলাইয়া ইহা রাখিয়া গিয়াছে। বিস্মিত বেলাদেবী খামটা তুলিয়া লইলেন। বেশ মোটা লম্বা খাম। খাম খুলিয়া বেলাদেবীর সমস্ত দেহ সঙ্কুচিত হইয়া গেল! খামের ভিতর অতিশয় অশ্লীল ছবি এবং ততোধিক অশ্লীল একটা চিঠি। চিঠিটা দরখাস্তের আকারে লেখা, নীচে আট-দশজনের নাম। প্রণয়ী-হিসাবে ইহারা সকলেই যে শঙ্করের অপেক্ষা বেশি যোগ্য, তাহাই অতি অশ্লীল ভাষায় বিশদ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছে। বেলা কয়েক মুহূর্ত নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর খামখানা লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাহা স্পিরিটে ভিজাইয়া পুড়াইয়া ফেলিলেন। খামখানা যখন নিঃশেষে পুড়িয়া গেল, তখন আবার তিনি বাথরুমে ফিরিয়া গেলেন।

একটু পরেই শঙ্কর আসিয়া পড়িল। সঙ্গে চুনচুন। চুনচুনকে দেখিয়া অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া বেলা বলিলেন, ও তাই দেরি! আমি ভাবছিলাম, শঙ্করবাবু চাকরির সন্ধানে বুঝি বিবাগীই বা হয়ে গেলেন! চুনচুনের সঙ্গে কোথায় দেখা?

শঙ্কর বলিল, আমিই ওঁদের বাড়ি গিয়েছিলাম।

বেলা চুনচুনের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তোরা সার্ভিস সিকিওরিং বিউরো খুলেছিস নাকি?

চুনচুনের মুখ বিষণ্ণ, তবু এই কথাগুলি শুনিয়া তাহার চক্ষু দুইটিতে হাসির আভা ফুটিয়া উঠিল। বলিল, না, শঙ্করবাবু গিয়েছিলেন প্রকাশবাবুর খোঁজে।

প্রকাশবাবুর খোঁজে কেন?

শঙ্কর বলিল, প্রকাশবাবু আমার জন্যে একটা চাকরি জোগাড় করে দেবেন বলেছিলেন। তাঁর জানা-শোনা একটা প্রেসে প্রুফ-রিডারের একটা কাজ নাকি খালি আছে।

কত মাইনে?

প্রকাশবাবুর দেখাই পেলাম না। চুনচুনের দিদির সঙ্গে আলাপ হল, তিনি সব শুনে দয়ার্দ্র হলেন, বললেন, যতদিন আপনার কোনো কাজ না হয়, ততদিন না হয় আমার ছেলে দুটিকে পড়ান আর আমাদের বাড়িতে থাকুন।

বেলাদেবী অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া একটু হাসিলেন।— আপনি রাজি হয়ে এসেছেন তো?

না হয়ে উপায় কি?

একটু থামিয়া শঙ্কর আবার বলিল, এনি পোর্ট ইন দি স্টর্ম। আপনার দাক্ষিণ্যে আর কতদিন বাস করা যায় বলুন?

বেলা ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। এই সংবাদে নিজের পায়ে দাঁড়াইবার জন্যে শঙ্করের এই আকুলতায় তাঁহার মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল না। তবু তিনি হাসিয়া বলিলেন, বেশ করেছেন। এখন চলুন খাওয়া যাক, ভয়ানক খিদে পেয়েছে। চুনচুন, তুই খেয়ে এসেছিস তো?

চুনচুন বলিল, হ্যাঁ।

তিনজনে খাইবার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

।। আঠারো ।।

বাবাজি ওরফে মুক্তানন্দ স্বামী কুমারিকা অন্তরীপে বেশিদিন বাস করিতে পারিলেন না। নির্ঝঞ্ঝাটে ভগবদুপাসনা করিবার পক্ষে স্থানটি উপযোগী হইলেও বাবাজি একটি মহা অসুবিধায় পড়িলেন। মনের মতো তেমন কোনো বাঙালি কাছে-পিঠে নাই। একেবারে বাঙালি-বর্জিত স্থানে কি থাকা যায়? শুধু সমুদ্র দেখিয়া মন ভরে না। কাছাকাছি কথা বলিবার মতো একজনও লোক না থাকিলে প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে যে! সেখানকার ভাষা বাবাজির পক্ষে দুর্বোধ্য, ইংরেজি ও ভাঙা-ভাঙা হিন্দি বলিয়া কতদিন চালানো যায়? তা ছাড়া, আর একটা কথাও বাবাজির বার বার মনে হইতে লাগিল। স্বদেশ হইতে এতদূরে আসিয়া বসবাস করাটা কি ঠিক? হাজার হোক স্বদেশ। আত্মীয়স্বজনও আছে; ভন্টুও আছে, তা ছাড়া ঠাকুরও ওই দেশেই থাকেন— সকলের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এতদূরে থাকিতে মুক্তানন্দ স্বামীর অন্তরাত্মা রাজি হইল না। দেশের কাছাকাছি নির্জন স্থান দুর্লভ নয়। গঙ্গার ধারে অমন ঢের জায়গা পড়িয়া আছে। এই গঙ্গা-হীন বিদেশ-বিভুঁয়ে থাকার কোনো অর্থ হয় না। সংসারের জালে অবশ্য তিনি নিজেকে জড়াইবেন না কিন্তু তাই বলিয়া এখানে পড়িয়া থাকিবারও প্রয়োজন নাই। আর একটা কথা, টাকাও ফুরাইয়া আসিতেছিল। অর্থাভাবে পড়িলে এই অচেনা অজানা জায়গায় কে তাঁহাকে সাহায্য করিবে? নিজের অতবড় বিষয়টা বাঁধা দিয়া বন্ধুর নিকট হইতে তিনি মাত্র পাঁচ শত টাকা আনিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে তিন শত টাকা শেষ হইয়া গিয়াছিল। আরও টাকা পাইবার জন্য বন্ধুকে পত্র দিয়াছিলেন, কোনো উত্তর আসে নাই; এ বিষয়েও উদাসীন থাকা তাঁহার উচিত বলিয়া মনে হইল না। ভন্টুকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে। ভন্টু লিখিয়াছে যে, সে মেজকাকার বিষয়-ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে চাহে না। মেজকাকার বিষয়ের ব্যবস্থা মেজকাকা নিজেই করুন। বাবাজির মনে হইল, চিঠিতে অভিমানের সুর ধ্বনিত হইতেছে। হইবেই না বা কেন! হাজার হোক, ছেলেমানুষ তো। এই বয়সেই সমস্ত সংসারের বোঝাটা তাহার ওপর পড়িয়াছে। বিষ্টুটা এক পাল ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়া তুচ্ছ একটা অসুখের ছুতায় দিব্য সমুদ্রের ধারে গিয়া বায়ু সেবন করিতেছে। ভন্টুর অগ্রজ বিষ্ণুবাবুর প্রতি পুরাতন ক্রোধ বাবাজির অন্তরে নূতন করিয়া মাথাচাড়া দিয়া উঠিল।

অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্বিক চিন্তা করিয়া তিনি ঠিক করিয়া ফেলিলেন, কুমারিকায় আর থাকা চলিবে না। তল্পিতল্পা গুটাইয়া তিনি স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

।। উনিশ ।।

মোটরের দালাল অচিনবাবুর অদম্য অনুসন্ধিৎসার ফলেই একদিন প্রিয়নাথ মল্লিকের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। বেলাকে কিছুতেই নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনিতে না পারিয়া অচিনবাবু অবশেষে প্রিয়নাথের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন এবং হিতৈষীর ছদ্মবেশে তাঁহার চরিত্র পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। প্রিয়নাথের সহিত আলাপ করিয়া অচিনবাবু বুঝিয়াছিলেন, যে, ভগিনীর ওপর বিরূপ হইলেও প্রিয়নাথ ভগিনীকে ফিরিয়া পাইবার জন্য এখনও সমুৎসুক। এই ঔৎসুক্যকে তীব্রতর করিয়া তুলিবার বাসনায় অচিনবাবু প্রিয়নাথের বিরক্তির অনলে ইন্ধন জোগাইতে শুরু করিলেন। প্রতিদিন আসিয়া প্রিয়নাথকে বেলার গতিবিধির অতিরঞ্জিত নানা কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন। বেলার বাসায় শঙ্করের অভ্যাগমে তাঁহার আরও সুবিধা হইয়া গেল, বেলা যে সত্য সত্যই কিভাবে অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে, তাহা উদাহরণ-সম্বলিত করিয়া ব্যাখ্যা করিবার সুযোগ তিনি পাইলেন। এমনকি মোটরে চড়াইয়া একদিন রাত্রে তিনি প্রিয়নাথ মল্লিককে বেলার-বাসায়-প্রবেশোন্মুখ শঙ্করকে দেখাইয়া পর্যন্ত দিলেন। স্বচক্ষে ইহা দেখিয়া প্রিয়নাথের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, তখনই মোটর হইতে নামিয়া তিনি একটা অনর্থ সৃষ্টি করিতেন, অচিনবাবু অনেক কষ্টে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। তাহার পরদিন প্রিয়বাবু বেলাকে যে পত্রাঘাত করিয়াছিলেন, তাহা অচিনবাবু জানিতেন না। শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

আপনি চিঠি লিখে দিয়েছেন?

নিশ্চয়।

কি লিখলেন?

সোজা সত্য কথা, লিখে দিলাম— তোমার স্বাধীনতার মর্ম সব বুঝতে পেরেছি, ভালো চাও তো এখনও ফিরে এস।

অচিনবাবুর চক্ষু দুইটি হাস্যময় হইয়া উঠিল।

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, অত সোজায় আসবেন না তিনি।

প্রিয়নাথ মল্লিক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একদৃষ্টে অচিনবাবুর মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। ইজি-চেয়ারে ঠেস দিয়া শুইয়াছিলেন, সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

আমার কি ইচ্ছে করছে জানেন?

অচিনবাবুর মুখে এতটুকু হাসি নাই, কেবল চোখ দুইটি হাসিতেছে।

কি বলুন?

ইচ্ছে করছে, চুলের ঝুঁটি ধরে টানতে টানতে ওকে এখানে নিয়ে এসে ঘরে তালা বন্ধ করে আটকে রেখে দিই।

অচিনবাবুর চোখের হাসি মুহূর্তে প্রখর হইয়া উঠিল। একটা অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনার ইঙ্গিত

পাইয়া চক্ষুর দৃষ্টি যেন জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টির প্রাখর্য কণ্ঠস্বরে সংক্রামিত হইল না। অতিশয় ধীরভাবে যেন একটা নিঃসংশয় মত তিনি ব্যক্ত করিতেছেন এমনভাবে বলিলেন, মিস মল্লিককে যদি আনতে চান, জোর করেই আনতে হবে। কেবল মুখের কথায় তিনি আসবেন না।

প্রিয়নাথ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আবার খানিকক্ষণ অচিনবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অচিনবাবু বলিলেন, ভাবছেন কি?

ভাবছি, সত্যই কি জোর করে ওকে আনা যায় না কোনোরকমে?

তা যাবে না কেন? তবে একটু রিস্‌কি ব্যাপার।

তাহার পরই অচিনবাবু বানাইয়া একটি গল্প বলিলেন। যশোরে একবার নাকি এক স্বামীগৃহবিমুখা বধূকে তিনি জোর করিয়া মোটরে তুলিয়া স্বামীগৃহে রাখিয়া আসিয়াছিলেন এবং সে ক্রমশ নাকি পোষ মানিয়াছিল।

একে আনতে পারেন আপনি?

অচিনবাবুর চক্ষু দুইটি চকচক করিতে লাগিল। এই প্রশ্নটির জন্যই তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, চেষ্টা করিতে পারি। কিন্তু আপনাকে থাকতে হবে আমার সঙ্গে। কারণ পুলিশ-কেস হলে আমি একা হাঙ্গামায় পড়তে চাই না। আপনি হলেন ওঁর ন্যাচারাল গার্জেন, এ রকম জোরজবরদস্তি করবার খানিকটা অধিকার আছে আপনার।

নিশ্চয়ই আছে। পুলিশকে সব কথা খুলে বললে—দে উইল সি মাই পয়েন্ট। এ তো মগের মুলুক নয়, ব্রিটিশ রাজত্ব।

অচিনবাবুর চক্ষু দুইটি পুনরায় হাস্যময় হইয়া উঠিল। প্রিয়নাথ আর কিছুক্ষণ গুম হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, আপনি যদি বন্দোবস্ত করতে পারেন, করুন। চোখের সামনে বোনটাকে এমনভাবে উচ্ছন্নে যেতে দিতে পারি না। পুলিশ-কেস হয় হোক, কুছ পরোয়া নেই, আই শ্যাল রিস্‌ক্ ইট।

আচ্ছা ভেবে দেখি।

অচিনবাবু গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার ভাবিয়া দেখিবার বেশি কিছু ছিল না। এই সম্ভাবনাটা মনে উদিত হইবামাত্র বিদ্যুৎগতিতে তিনি সমস্তটা ভাবিয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রিয়নাথের অজুহাতে এবং প্রিয়নাথকে শিখণ্ডী খাড়া করিয়া বেলাকে জোর করিয়া কিভাবে অপহরণ করা সম্ভব, তাহা অচিনবাবু অবিলম্বে কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন। গোলমালে প্রিয়নাথকে ফাঁকি দিয়া কি করিয়া বেলাকে অন্যত্র সরাইয়া ফেলা যাইবে, এই অংশটুকু এখনও তাঁহার ভাবা হয় নাই। এই অংশটুকু পরিপাটিরূপে চিন্তা করিতে হইবে। পরিপাটিরূপে চিন্তা না করিয়া অচিনবাবু ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই জাতীয় কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে অচিনবাবু অঙ্কের মতো সমস্ত জিনিসটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কষিয়া লইয়া তবে কার্য আরম্ভ করেন। মনে মনে সমস্ত জটিলতার সমাধান করিয়া এবং পূর্বাহ্নেই তদনুযায়ী বন্দোবস্ত করিয়া তবে অচিনবাবু কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন। এই অংশটুকুর সমাধানও যে তিনি সুচারুরূপে করিতে পারিবেন, সে বিশ্বাস তাঁহার আছে। তাহার পর, অর্থাৎ বেলাদেবীকে একবার

আয়ত্তাধীনে পাইলে সব ঠিক হইয়া যাইবে। অচিনবাবুর ধারণা, মেয়েমানুষ অনেকটা বুনো জানোয়ারের মতো। সহজে ধরা দেয় না, ধরা দিলেও প্রথম প্রথম তীব্র প্রতিবাদ করে, কিন্তু কিছুদিন খাঁচায় বন্ধ করিয়া রাখিলে ক্রমশ পোষ মানে এবং অবশেষে খেলা দেখায়।

অচিনবাবুর মোটরকার নিঃশব্দগতিতে কড়েয়ার দিকে ছুটিতে লাগিল। ম্যানেজারবাবু সম্প্রতি যে নূতন বাসাটায় উঠিয়া আসিয়াছেন, তাহা কড়েয়াতে একটা গলির মধ্যে। ম্যানেজারবাবু যদি মোটা রকম দক্ষিণা দিতে রাজি হন, তাহা হইলেই এই বিপজ্জনক ব্যাপারে অচিনবাবু হাত দিবেন, নতুবা নয়। সম্প্রতি তাঁহার কিছু টাকারও প্রয়োজন ঘটিয়াছে, মেয়েটার জন্য একটা ভালো পাত্রের সন্ধান মিলিয়াছে, কিন্তু তাহারা নগদ দশ হাজার টাকা চায়। অত টাকা অচিনবাবুর হাতে নাই। অচিনবাবুর মোটর একটা গলি পার হইয়া সার্কুলার রোডে পড়িল। রাত্রি অনেক হইয়াছে। সার্কুলার রোড নির্জন। অচিনবাবু মোটরের স্পিড বাড়াইয়া দিলেন।

।। কুড়ি ।।

ম্যানেজারবাবুকে ঘন ঘন বাসা পরিবর্তন করিতে হয় বটে, কিন্তু কখনও কোনো ছোট বাসায় তিনি যান না। প্রকাণ্ড দুই-তিন মহলা বাড়ি না হইলে তাঁহার চলে না। কড়েয়ার বাড়িটাও প্রকাণ্ড। এই প্রকাণ্ড বাড়ির একটি প্রায়ান্ধকার কক্ষে ম্যানেজার একা বসিয়া ছিলেন। ঘরের এক কোণে একটি ছোট ইলেকট্রিক পাখা নিঃশব্দে ঘুরিতেছিল এবং আর এক কোণে একটি ঘন বেগুনি রঙের ছোট বালব্ অন্ধকারকে যৎসামান্য আলোকিত করিয়া পারিপার্শ্বিককে রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছিল। ম্যানেজারবাবু প্রখর আলোক সহ্য করিতে পারেন না। দিবসেও তিনি ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া চতুর্দিকে পর্দা ফেলিয়া সূর্যালোককে যথাসাধ্য প্রতিরোধ করিয়া রাখেন। অন্ধকার-বিলাসী তাঁহার মন অন্ধকারেই নিশাচরের মতো সঞ্চরণ করিতে চায়! বহুকাল ধরিয়া তাঁহার ক্ষুধিত বাসনা অতৃপ্ত আবেগে নিবিড় অন্ধকারে যে জটিল রহস্যময় পথে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, অন্ধকারে যে পথ অফুরন্ত বলিয়া মনে হইতেছে, আলোকপাত করিয়া সে পথের সীমারেখা দেখিয়া কি হইবে? সীমা তো আছেই, কিন্তু তাহা দেখিয়া লাভ কি? অতলস্পর্শী যে গহ্বরটা সুনিশ্চিতভাবেই একদিন তাঁহাকে গ্রাস করিবে, তাহার বিভীষিকাকে যতদূর সম্ভব তিনি আড়াল করিয়া রাখিতে চান অথবা একা অন্ধকারে বসিয়া এইসবই তিনি কল্পনা করেন---তাহা বলা শক্ত। ম্যানেজারবাবুর মনের খবর কেহ জানে না, কিন্তু ইহা তাঁহার অনুচরবর্গেরা সকলেই জানে যে, অন্ধকার, বড় জোর ঈষৎ-আলোকিত অন্ধকার, তাঁহার প্রিয় আবেষ্টনী।... বাহিরের ঘরে ইলেকট্রিক বেল ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। ম্যানেজারবাবু একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। খুব সম্ভবত অচিনবাবু আসিয়াছেন। তাঁহাকে আসিবার জন্য তিনি খবর পাঠাইয়াছিলেন। অচিনবাবুকে দিয়া চিঠিখানা লিখিয়া খগেশ্বরকে পাঠাইতে হইবে। না পাঠাইলে নূতন মালটিকে হস্তগত করা যাইবে না। অচিনবাবু চিঠিখানা লিখিতে রাজি হইবে তো? কথাটা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারবাবুর জরা-শিথিল মুখমণ্ডল নীরব হাস্যে আরও কদাকার হইয়া উঠিল। রাজি হইবে না! কিছু টাকা কবুল করিলেই রাজি হইবে।

বেঁটে গাঁট্টাগোঁট্টা ছোকরাটি নিঃশব্দে আসিয়া ছায়ামূর্তির মতো দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল।

কি?

নিচে মোটরকারের দালালবাবুটি এসেছেন।

বেশ, সিঁড়ির দরজাটা খুলে দাও।

ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইল।

নিচে প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে সিঁড়িটা সহসা আলোকিত হইয়া উঠিল। অচিনবাবু উপরে উঠিয়া গেলেন। দ্বার উন্মুক্তই ছিল, তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে ম্যানেজারবাবুর ঘরের বেগুনি বাল্‌ব নিবিয়া গিয়া সাধারণ একটি আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

অচিনবাবু প্রবেশ করিতেই ম্যানেজারবাবু বলিয়া উঠিলেন, আপনার ভাগ্য ভালো, কিছু টাকা লাভ হয়ে যাবে আপনার আজ। তাই ডেকে পাঠিয়েছিলাম আজ আপনাকে। মাত্র দুটি লাইন একটি চিঠি লিখে দিতে হবে, এর জন্যে কর্তামশাই নগদ একশো টাকা স্যাংশন করেছেন। আসুন, বসুন।

কিসের চিঠি?

আরে, মশাই, বসুনই না আগে।

অচিনবাবু উপবেশন করিলেন।

ম্যানেজারবাবু সত্য মিথ্যা মিশাইয়া একটি গল্পের অবতারণা করিলেন; কিছুদিন আগে, মনে আছে, যমুনা বলে একটি মেয়ের সন্ধান এনেছিলেন আপনি?

গল্পের এ অংশটুকু সত্য।

অচিনবাবু বলিলেন, মনে আছে, তা তাকে তো কোনো রকমেই বাগাতে না পেরে শেষটা হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম।

দিয়েছিলেন তো? কর্তার আর একটি এজেন্ট কিন্তু তার নাগাল পেয়েছে।.

ম্যানেজারবাবু সহাস্য দৃষ্টি মেলিয়া ক্ষণকাল অচিনবাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, কিন্তু মুশকিলেও পড়েছেন তিনি। মেয়েটির এখনও আপনার ওপর অগাধ বিশ্বাস। মেয়েটা বলছে যে, অচিনবাবু যদি আমাকে যেতে লেখেন, তা হলে আমি কলকাতা যেতে পারি।

অচিনবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন, কিন্তু আমি যখন তাকে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে চেয়েছিলুম, তখন তো সে আসতে চায়নি! এই এজেন্টটি কে?

জানেন তো কর্তার কড়া হুকুম, একজন এজেন্টের নাম আর একজনের কাছে করা চলবে না।

যমুনা মেয়েটা আবার আসতে চাইছে? আশ্চর্য!

স্মিতমুখে ম্যানেজার বলিলেন, তবে আর মেয়েমানুষ বলেছে কেন?

তাহার পর বলিলেন, আরে মশাই, আপনি ও নিয়ে অত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? দিন না দু লাইন লিখে, আমারও হুকুম তামিল করা হোক, আপনারও কিছু লাভ হোক। তারপর কর্তা তাঁর এজেন্টের সঙ্গে বোঝাপড়া করুন গিয়ে-- আপনারই বা কি, আমারই বা কি?

ম্যানেজার আর কালবিলম্ব করিলেন না, কুব্জ দেহটাকে সোজা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন,

গৃহকোণে অবস্থিত লোহার সিন্দুকটা খুলিয়া এক শত টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া আনিলেন, তাক হইতে চিঠি লিখিবার প্যাড এবং ফাউন্টেন-পেন পাড়িয়া আনিয়া বলিলেন, নিন, লিখে দিন চিঠিখানা।

কি লিখব?

লিখুন না—কল্যাণীয়াসু, তুমি লোকটার সহিত অবিলম্বে চলিয়া আসিবে। আমি ইহাকে পাঠাইয়াছি। বিশেষ দরকার আছে। ব্যাস্, নামটা সই করে দিন, ঠিকানাও দিয়ে দিন।

অচিনবাবু যথাযথ লিখিয়া দিলেন।

ম্যানেজার পত্রখানি হস্তগত করিয়া একশত টাকার নোটখানি অচিনবাবুর হস্তে দিয়া বলিলেন, এই নিন আপনার পারিশ্রমিক। তারপর আর সব খবর কি বলুন?

অচিনবাবু খবর বলিবার জন্যই আসিয়াছিলেন।

নোটটি পকেটস্থ করিয়া বলিলেন, ভালো খবর আছে একটা।

কি বলুন তো?

খুব ভালো জিনিসের সন্ধান পেয়েছি, কায়দা করে সাপটে নিতে পারলে মালের মতো মাল একখানা।

বলুন, বলুন।

ম্যানেজারবাবু কুব্জ দেহটাকে উন্নমিত করিয়া উৎকর্ণ হইয়া বসিলেন। অচিনবাবু রঙ এবং রস দিয়া বেলা মল্লিকের বর্ণনা শুরু করিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে সমস্ত শুনিয়া ম্যানেজারবাবু বলিলেন, আপনি যেমন বলছেন, তেমন জিনিস যদি হয়, টাকার জন্য কর্তা মশাই পেছপাও হবেন না। মেয়েমানুষের পেছনে অনেক টাকা উড়িয়েছেন তিনি, আরও ওড়াবার তাকতও আছে তাঁর। তবে জিনিসটি সরেস হওয়া চাই।

জিনিস খুব সরেস।

তা হলে টাকার জন্যে ভাবনা নেই।

হাজার দশেক খরচ হতে পারে।

হাজার বিশেক হলেও কর্তা ভ্রূক্ষেপ করবেন না, জিনিস যদি ভালো হয়।

আমি বলছি, জিনিস খুবই ভালো।

তা হলে লেগে পড়ুন, টাকার জন্যে ভাববেন না।

অচিনবাবু উঠিলেন।

ক্ষণকাল পরে তাঁহার মোটরখানি নিঃশব্দগতিতে গলি হইতে বাহির হইয়া গেল।

একটা ঘড়িতে টং টং করিয়া দুইটা বাজিল। অচিনবাবু চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যানেজারবাবুর ঘরে পুনরায় বেগুনি বালব জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। অচিনবাবু-বর্ণিত বেলা মল্লিকের কাল্পনিক মূর্তিটি ঘিরিয়া তাঁহার লেলিহান বাসনা ক্রমশ উগ্র হইতে উগ্রতর হইয়া উঠিতেছিল। স্ফীতনাসারন্ধ্র, মুদিতচক্ষু, তিনি নিস্পন্দ হইয়া এক কোণে বসিয়াছিলেন। দ্বারে আবার শব্দ হইল। চাহিয়া দেখিলেন, বেঁটে গাঁট্টাগোঁট্টা সেই ছায়ামূর্তি পুনরায় দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কি আবার?

সেই জু মেয়েটি মরে গেল।

ও! আচ্ছা, প্যাক করে ফেল তা হলে। বড় প্যাকিং কেস আছে তো?

আছে।

প্যাক করে সেই বুড়ো জু-টার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এস। ডাক্তারবাবু সার্টিফিকেটও একখানা দিয়ে গেছেন, সেটাও নিয়ে যেও। সেই বুড়ো জু-ই মড়ার ব্যবস্থা করবে। তার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে কাল। এখুনি সরিয়ে ফেল তার বাড়িতে, দেরি করো না।

ম্যানেজার এমন অনাকুলিত চিত্তে আদেশ দিলেন, যেন একটা কাচের পাত্র অসাবধানে ভাঙিয়া গিয়াছে, টুকরাগুলা সরাইয়া ফেলিতে বলিতেছেন।

ছায়ামূর্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ঘন বেগুনি রঙের নিবিড় পরিবেষ্টনীতে নিষ্ঠুর নীরবতা ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

।। একুশ ।।

মৃন্ময় ছিল না।

অতিশয় তুচ্ছ একটা অজুহাত দেখাইয়া হাসির নিকট চলিয়া গিয়াছিল। অজুহাতটার তুচ্ছতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াও মুকুজ্জেমশাই আপত্তি করেন নাই, বরং সস্নেহ কৌতুকভরে তাহার যাওয়াটার সমর্থনই করিয়াছিলেন। সত্যই তো, মৃন্ময় কি রকম ধরনের চাকরি লইবে, সে সম্বন্ধে হাসির সহিত একটা পরামর্শ করা কর্তব্য বইকি! মৃন্ময়ের অবিলম্বে চলিয়া যাওয়া উচিত। মৃন্ময় চলিয়া গেলে মুকুজ্জেমশাই অনুকম্পাভরে ভাবিয়াছিলেন, আহা বেচারা, একটা বলিষ্ঠ রকম অজুহাত খাড়া করিতে পারে নাই, চাকরি সম্বন্ধে হাসির মতামতও লইতে গিয়াছে! যেন বহু মনিব আসিয়া চাকরির জন্য তাকে সাধাসাধি করিতেছে, কোন্‌টা গ্রহণ করিবে সে ঠিক করিতে পারিতেছে না।

মুকুজ্জেমশাই আরও একটা কারণে মৃন্ময়কে ছুটি দিয়াছিলেন। তিনি কয়েকদিন হইতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, মৃন্ময় ক্রমশ কেমন যেন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছে। এমনই সে বড় একটা হাসে না, কিন্তু কি আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয়ে সে আরও গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল। হাসি বাপের বাড়ি যাইবার পর সেই গাম্ভীর্যের ওপর একটা বিষাদের কালিমাও যেন দিন দিন স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল। মুকুজ্জেমশাই ভাবিলেন, যাক, দিনকতক হাসির নিকট ঘুরিয়া আসুক, আমি একাই যতটা পারি করি।

মৃন্ময় কিন্তু হাসির নিকট গিয়াছিল সেই চিঠিগুলির সন্ধানে। মুকুজ্জেমশাই এবং হাসির অভিভাবক ভদ্রলোক যদিও মৃন্ময়ের গৃহত্যাগিনী পত্নীর কথা জানিতেন, কিন্তু হাসিকে সে কথা বলেন নাই। সে পত্নীর নামও তাঁহারা জানিতেন না, এবং তাহাকে ঘিরিয়া মৃন্ময়ের অন্তরলোকে যে সব অসাধারণ কাণ্ড ঘটিতেছিল তাহার বিন্দুমাত্র আভাসও তাঁহারা কোনোদিন পান নাই। সুতরাং স্বর্ণলতাকে লিখিত চিঠিগুলির অস্তিত্ব কল্পনা করাও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

মৃন্ময় চলিয়া গিয়াছিল, মুকুজ্জেমশাই বাসায় একা ছিলেন। বেশ ভালোই ছিলেন। সমস্ত সকাল বিজ্ঞাপন দেখিয়া, সমস্ত দুপুর পূর্বলিখিত দরখাস্তগুলির সম্বন্ধে তদ্বির করিয়া এবং সমস্ত সন্ধ্যা নূতন বিজ্ঞাপন অনুযায়ী দরখাস্ত লিখিয়া তাঁহার ভালোই কাটিতেছিল। প্রতিদিন দুপুরে বাহির হইবার মুখে রাত্রের লেখা দরখাস্তগুলি টাইপ করাইবার জন্য দিয়া আসিতেন। শিরীষবাবুর নিকট হইতে শঙ্করের নূতন ঠিকানাও তিনি পাইয়াছেন, শঙ্করের সহিত দেখাও করিয়া আসিয়াছেন। সে একটা ছোটখাটো টিউশনি জোগাড় করিয়াছে এবং কি করিয়া প্রুফ দেখিতে হয় অধ্যবসায় সহকারে তাহাই শিক্ষা করিতেছে। বিকাশবাবু নামক এম. এ. -পরীক্ষার্থী যুবকটি মুকুজ্জেমশাইয়ের মধ্যে অপ্রত্যাশিতরূপে একজন বিদ্বান অধ্যাপক আবিষ্কার করিয়া পুলকোচ্ছ্বাসের আতিশয্যবশতঃ মুকজ্জেমশাইয়ের কার্যে বিঘ্নোৎপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মুকুজ্জেমশাই তাঁহার উৎসাহ-অনলে শীতল বারিসিঞ্চন করিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছেন। অতিশয় নিরীহভাবে তিনি বিকাশবাবুকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি নিজে ফিলজফির 'ফ'ও জানেন না, অন্যত্র তিনি একজন এম. এ. পরীক্ষার্থীকে ওই প্রশ্নগুলি পড়িতে দেখিয়াছেন, এবং সেগুলি তাঁহার মনে ছিল বলিয়াই আকস্মিকভাবে বিকাশবাবুকে সাহায্য করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি নিজে মূর্খ মানুষ, ফিলজফির কিছুই বোঝেন না। এই কথায় মুকুজ্জেমশাইয়ের সৌভাগ্যক্রমে বিকাশবাবু নিরস্ত হইয়াছেন এবং মুকুজ্জেমশাইয়ের নিকট আসা কমাইয়া দিয়া সদ্য-দত্ত পরীক্ষার খবরাখবর করিতে ব্যস্ত হইয়া আছেন। একা একা নিজের আরব্ধ কার্যে মশগুল হইয়া মুকুজ্জেমশাইয়ের দিনগুলি সুন্দর কাটিতেছিল।

এমন সময় একদিন এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। সেদিন রবিবার, মুকুজ্জেমশাই বাসায়। অতিশয় অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো খবর না দিয়া রাজমহল হইতে মনোরমা আসিয়া উপস্থিত হইল, সঙ্গে কেহ নাই— একাই আসিয়াছে।

এ কি, তুমি যে হঠাৎ?

মনোরমার মুখের একটি পেশিও বিচলিত হইল না। শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, এমনই এলুম, ওখানে আর ভালো লাগছিল না।

মুকুজ্জেমশাই ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশ তাঁহার চক্ষু দুইটি কৌতুকদীপ্ত হইয়া উঠিল।

একা চলে এলে, ভয় করল না?

না।

এ বাসার ঠিকানা খুঁজে বের করতে পারলে কি করে?

ঠিকানা খুঁজতে গিয়েই দেরি হল, আমি হাওড়ায় এসে পৌঁছেছি সকালের ট্রেনে।

তারপর?

হাওড়া থেকে হাঁটতে হাঁটতে আর জিজ্ঞেস করতে করতে আসছি।

হাওড়া থেকে হেঁটে আসছ?

পয়সা ছিল না।

মুকুজ্জেমশাই অবাক হইয়া গেলেন।

এমন করে আসবার মানেটা কি?

ওখানে আর ভালো লাগছিল না।— এইটুকু বলিয়া মনোরমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মুকুজ্জেমশাই বুঝিলেন, হাজার প্রশ্ন করিলেও ইহার বেশি আর সে কিছুই বলিবে না।

যাও, কাপড়-চোপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধোও গিয়ে। উঠানের ও-পাশেই কল আছে। কলে বোধহয় জল এসেছে এতক্ষণ।

মনোরমা ক্ষুদ্র পুঁটলিটি লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মুকুজ্জেমশাই মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, মনোরমার এ আচরণের অর্থ কি? অর্থ যাহাই থাকুক আন্দাজ করিয়া লইতে হইবে। স্বল্পভাষিণী মনোরমা যাহা বলিয়াছে, তাহার বেশি আর কিছু বলিবে না। মাত্র চার-পাঁচ দিন পূর্বে মুকুজ্জেমশাই ভবেশকে কুড়ি টাকা এবং মনোরমার হাতখরচ পাঁচ টাকা পাঠাইয়াছেন। এই পাঁচ টাকা সম্বল করিয়াই মনোরমা এখানে চলিয়া আসিয়াছে। আসিয়াছে তো, কিন্তু এখন তাহাকে লইয়া কি করা যায়? ভবেশের কাছে মনোরমাকে রাখিয়া মুকুজ্জেমশাই বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন। হঠাৎ মনোরমার হইল কি? ভবেশকে মুকুজ্জেমশাই ভালো করিয়াই চেনেন, মনোরমার সহিত সে কোনোরূপ দুর্ব্যবহার করিবে, ইহা তাঁহার কল্পনাতীত। সহসা মুকুজ্জেমশাইয়ের মনে হইল, মনোরমার খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে, সে হয়তো অনেকক্ষণ কিছুই খায় নাই। মুকুজ্জেমশাই উঠিলেন।

ঘর হইতে বাহির হইয়া মনোরমাকে দেখিতে পাইলেন না। উঠানে নামিয়া দেখিলেন, কলের কাছেও কেহ নাই, কল হইতে জল পড়িতেছে। মনোরমা গেল কোথায়? মৃন্ময় যে ঘরটায় শুইত, দেখিলেন, তাহার দরজাটা খোলা রহিয়াছে। বারান্দায় উঠিয়া দ্বারপ্রান্তে গিয়া মুকুজ্জেমশাই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। চৌকির ওর মনোরমা উপুড় হইয়া শুইয়া রহিয়াছে, ক্রন্দনাবেগে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। মুকুজ্জেমশাই খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইরূপ যে কিছু একটা ঘটিবে, তাহা তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন; তথাপি তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন অনাথাব প্রতি করুণাবশত। কর্তব্য ক্রমশ কঠোরতর হইয়া উঠিতেছে। আরও কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মুকুজ্জেমশাইকে অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করিতে হইল।

কি হল তোমার?

মনোরমা নীরব।

মুকুজ্জেমশাই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ওঠ ওঠ, কি ব্যাপার সব খুলে বল তো?

মনোরমা উঠিয়া বসিল এবং বেশবাস সম্বৃত করিয়া মুকুজ্জেমশাইয়ের দিকে পিছন ফিরিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

হল কি তোমার? এ রকম করার মানে কি?

মনোরমা খানিকক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিয়া ক্রন্দনকম্পিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, আমি আর সহ্য করতে পারি না।

কি সহ্য করতে পার না?

আপনার দয়া।

তার মানে?

মনোরমা সহসা ঘুরিয়া বসিল। অশ্রুবাষ্পাকুল আরক্ত নয়ন দুইটি মুকুজ্জেমশাইয়ের মুখের ওপর নিবদ্ধ করিয়া বলিল, আপনি কি মনে করেন আমি মানুষ নই, আমার প্রাণ বলে কোনো জিনিস নেই, আপনি চিরকাল দয়া করে যাবেন আর আমি তা চিরকাল সহ্য করব? আপনার দয়া পাবার কি যোগ্যতা আছে আমার? কেন শুধু শুধু আপনি এমন করে চিরকাল আমার ভার বয়ে বেড়াবেন? কাশীর একটা আস্তাকুঁড় থেকে কুড়িয়ে এনে কেন সকলের কাছে আত্মীয় বলে পরিচয় দেবেন, আপনার ওপর যখন সত্যিকার কোনো দাবিই নেই আমার?

কে বললে দাবি নেই?

উৎসুক নয়নে মনোরমা প্রশ্ন করিল, কিসের দাবি?

প্রত্যেক মানুষের ওপরই প্রত্যেক মানুষের দাবি আছে।

কেন?

কারণ মানুষ পশু নয়!

আপনি কি যেখানে যত অসহায় আছে, সকলকেই এমনই করে সাহায্য করেন?

ক্ষমতায় কুলোলে নিশ্চয়ই করতাম, সকলকে সাহায্য করবার ক্ষমতা আমার নেই।

মনোরমা ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আরও কত লোক আছে, যারা আমার চেয়ে আপনার দয়া পাবার ঢের বেশি যোগ্য? আপনি আমাকেই বা বেছে নিলেন কেন?

কে যোগ্য, কে অযোগ্য, তা বিচার করবার অধিকার আমার নেই। যে আমার সামনে পড়ে, যথাসাধ্য তারই উপকার করবার চেষ্টা করি। তখন কাশীতে ছিলুম, হঠাৎ একজনের মুখে তোমার খবর পেলুম, তোমার কাছে গিয়ে তোমার মুখে সমস্ত শুনে কষ্ট হল, সঙ্গে করে নিয়ে আসতে চাইলাম, তুমিও স্বেচ্ছায় চলে এলে— এর বেশি তো আর কিছু নয়। তার পর থেকে আমি যথাসাধ্য তোমার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেছি।

মনোরমা চৌকি হইতে নামিয়া কাপড়-চোপড় আর একবার সামলাইয়া লইয়া ঈষৎ তিক্তকণ্ঠে বলিলেন, কিন্তু আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

কি সহ্য করতে পারছ না?

বললাম তো আপনার দয়া।

সহ্য করতে পারছ না কেন?

কারণ আমি পশু নই—মানুষ।

নিজের উত্তরটাই এমন তির্যকভাবে নিজের কাছে ফিরিয়া আসায় মুকুজ্জেমশাই ঈষৎ কৌতূহল অনুভব করিলেন। কিন্তু বিস্মিত হইলেন যখন দেখিলেন, মনোরমা নিজের ছোট পুঁটলিটা লইয়া বাহির হইয়া যাইতেছে।

ও কি? কোথায় যাচ্ছ?

যেদিকে দু চক্ষু যায়; এমনভাবে কারও দয়ার পাত্রী হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভালো।

মুকুজ্জেমশাই কিছুই বলিলেন না, স্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন। মনোরমা দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

পর-মুহূর্তেই গুরুভার পতনের শব্দে সচকিত হইয়া মুকুজ্জেমশাই বাহিরে গিয়া দেখিলেন, মনোরমা সিঁড়ির ওপর মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে এবং সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। মুকুজ্জেমশাই ক্ষণকাল ইতস্তত করিয়া অবশেষে কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন, অজ্ঞান মনোরমাকে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া গিয়া ধীরে ধীরে বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন!

গভীর রাত্রে মনোরমা চক্ষু মেলিয়া দেখিল, একজন অপিরিচিতা নারী তাহাকে শুশ্রূষা করিতেছে।

আপনি কে?

আমি নার্স।

আপনি কি করে এলেন?

আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে এসেছিলাম, তিনিই আমাকে রেখে গেছেন।

তারপর একটু থামিয়া বলিল, ওই যে সন্ন্যাসীর মতন কে একজন ছিলেন, তিনিই ডেকেছিলেন ডাক্তারবাবুকে।

তিনি কোথায়?

তিনি আপনার সব ব্যবস্থা করে দিয়ে কোথায় যেন গেলেন। কাল সকালে আসবেন বলে গেছেন। আপনি বেশি কথা বলবেন না, ডাক্তারবাবু নিষেধ করে গেছেন।

মুকুজ্জেমশাই বাসা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। মনোরমা নির্বাক হইয়া রহিল। কিন্তু তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, চিৎকার করিয়া বলে— চাই না, চাই না, তোমার এত দয়া চাই না আমি।

কিন্তু সে কিছুই বলিল না, চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

।। বাইশ ।।

চুনচুনের দিদি মিসেস স্যানিয়াল নাতি সাধারণ প্রকৃতির মহিলা। বলিষ্ঠ চওড়া-চওড়া গড়ন, শক্তিব্যঞ্জক মুখমণ্ডল, একটু লক্ষ্য করিলে গোঁফের রেখা পর্যন্ত দেখা যায়। মনোবৃত্তিও পুরুষভাবাপন্ন নির্ভীক বলিষ্ঠ। নারীসুলভ কমনীয়তা হয়তো তাঁহার এককালে ছিল, (না থাকিলে অধুনা-মৃত মিস্টার স্যানিয়াল কি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন?) এখন কিন্তু তাঁহার মধ্যে নারীসুলভ কোনোপ্রকার মাধুর্য নাই। শুধু তাহাই নহে, বর্তমানে তিনি মাধুর্যবিরোধী, রূপসজ্জার কোনো প্রকার আতিশয্য সহ্য করিতে পারেন না। কমনীয়তা এবং মাধুর্য লইয়া বাড়াবাড়ি করিতে গিয়াই যে আজকালকার মেয়েরা অধঃপাতে যাইতেছে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। মিস্টার স্যানিয়াল পাঁচ বৎসর হইল মারা গিয়াছেন এবং মিসেস স্যানিয়াল এই পাঁচ বৎসরকাল সাতিশয় দক্ষতার সহিত নানা ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে নিজের সংসার-তরণীকে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এমনকি নিজের দূরসম্পর্কের ভগিনী চুনচুনকে পর্যন্ত নিজের আশ্রয়ে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছেন। হাব-ভাব-বিলাসিনী প্রসাধন-কুশলা সাধারণ রমণী হইলে ইহা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না—এ কথা প্রায়ই তিনি পরিচিত-মহলে ঘোষণা করিয়া থাকেন। তাঁহার এত সাবধানতা সত্ত্বেও যে চুনচুন লুকাইয়া এমন একটা

কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে, তাহা আধুনিক যুগের সর্বসাবধানতা উল্লম্ফিনী দুষ্টা দক্ষতার প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই নহে। আজকালকার ব্যাপার দেখিয়া মিসেস স্যানিয়ালের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, সাবধানতার প্রাচীর যত উচ্চই হউক, আজকালকার মেয়েরা ঠিক তাহা ডিঙাইয়া যাইবে। মিসেস স্যানিয়াল প্রতিদিন কথায় কথায় ভগবানকে ধন্যবাদ দেন যে, ভগবান তাঁহাকে একটি মেয়েও দেন নাই, তাঁহার দুইটি সন্তানই পুত্র-সন্তান। মেয়েদের ওপর তাঁহার ভয়ানক রাগ, তাঁহার ধারণা, আজকাল মেয়েগুলাই সমাজটাকে উচ্ছন্ন দিতেছে! মেয়েরা আসকারা না দিলে পুরুষের সাধ্য কি অগ্রসর হয়! মেয়েদেরই কর্তব্য, অবাঞ্ছিত পুরুষসংসর্গ সযত্নে পরিহার করিয়া চলা। আজকাল কি ছেলে কি মেয়ে, কর্তব্যজ্ঞান কাহারও নাই। এই যে তিনি চুনচুনকে মানুষ করিয়াছেন, তাহার লুকাইয়া-বিবাহ-করা স্বামীর চিকিৎসার যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়ভার বহন করিযাছেন এবং সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও চুনচুনকে দূর করিয়া দেন নাই— সমস্তই কর্তব্যের খাতিরে। মিসেস স্যানিয়ালের কর্তব্যনিষ্ঠা প্রবল। তিনি যে কর্তব্যপরায়ণা, সৎপথবর্তিনী এবং নিষ্কলুষা— এ কথা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার কর্তব্যপরায়ণতা শুধু যে তাঁহার নিজের সংসারের মধ্যে আবদ্ধ, তাহা নহে; তিনি নারীজাতির উন্নতিকল্পে একটি নারীসমিতি স্থাপন করিয়াছেন, পাড়ার বালিকা-বিদ্যালয়ে প্রত্যহ বিনা-বেতনে এক ঘণ্টা অধ্যাপনা করিয়া থাকেন, উপযুক্ত পাত্রে যথাসাধ্য দান করিতেও তিনি পরাঙ্মুখ নহেন। শঙ্করের পরিচয় পাইয়া, তাহার বিপন্ন অবস্থা শুনিয়া এবং তাহাকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া মিসেস স্যানিয়াল তাহাকে নিজের ছেলেদের গৃহশিক্ষকরূপে বাহাল করিয়াছেন। তাঁহার একটি ছেলে এবার কলেজে ঢুকিয়াছে, আর একটি স্কুলে পড়ে। মিসেস স্যানিয়াল কিন্তু শঙ্করকে আকারে ইঙ্গিতে এই কথাটি বারম্বার বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, যেহেতু শঙ্কর একটা উচ্চ আদর্শের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে এবং যেহেতু তিনি চুনচুনের স্বামীর শুশ্রূষা-সম্পর্কে শঙ্করের উদার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছেন, সেই হেতুই তিনি শঙ্করকে নিজগৃহে স্থান দিতেছেন, অখিল-অনিলের জন্য গৃহশিক্ষকের তেমন কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ সৎ অথচ সমাজ-কর্তৃক-লাঞ্ছিত যুবককে সাহায্য করা যে কোনো কর্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরই অবশ্যকরণীয় কর্তব্য।

শঙ্কর কিন্তু মিসেস স্যানিয়ালের বাসায় আসিয়া ঠিক যেন দুইটি উপবাসী মৎকুনের পাল্লায় পড়িয়া গেল। অখিল-অনিলের জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত তীব্র। তাহারা শঙ্করের বিদ্যাবুদ্ধিকে যেন দোহন করিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ বড় না মিলটন বড়, অ্যালজ্যাব্রা শিখিয়া কি উপকার হয়, মঙ্গলগ্রহে বায়ুমণ্ডলের চাপ কি পরিমাণ, মহিলা কবি তরু দত্তের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা কোন্‌টি, জোনাকি আলো দেয় কি উপায়ে, একই মাটি হইতে রস আহরণ করিয়া বিভিন্ন গাছ বিভিন্ন ফুল ফোটায় ও ফল ফলায় কি করিয়া, দুধ এবং ডিমের মধ্যে কোন্‌টি বেশি পুষ্টিকর এবং কেন, মানস সরোবরে নীলপদ্ম ফোটে কি না, ওয়াটার্‌লু যুদ্ধে কোন্ পক্ষে কত সৈন্য ছিল— ইত্যাকার নানাবিধ জটিল প্রশ্নে তাহারা শঙ্করকে বিব্রত করিয়া তুলিল। এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সব সময় সহজ নয়, ছাত্রদের নিকট উত্তর দিতে অপারগ হইলেও কেমন যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িতে হয়; সুতরাং উত্ত্যক্ত শঙ্কর যথাসাধ্য তাহাদের এড়াইয়া চলিত, পারতপক্ষে বাড়িতে থাকিত না, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। এই সঙ্গতিহীন অসহায় অবস্থায় আশ্রয় পাইয়া শঙ্কর কিছুতেই ইহাদের ওপর কৃতজ্ঞ হইতে পারিল না। মিসেস স্যানিয়ালের

কর্তব্যনিষ্ঠা এবং তাঁহার পুত্রদ্বয়ের জ্ঞানস্পৃহা তাহাকে এমন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল যে, তাহার মনে হইতে লাগিল, কোনো রকমে কোথাও একটা চাকরি জুটিলে এই উচ্চাদর্শ-প্রণোদিত পরিবারের কবল হইতে মুক্তি পাইয়া সে যেন বাঁচে।

প্রুফ-রিডিং সে অনেকটা আয়ত্ত করিয়া আনিয়াছে এবং প্রকাশবাবু তাহাকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, আগামী মাসে তিনি তাঁহার জানা-শোনা একটি প্রেসে তাহাকে ঢুকাইয়া দিতে পারিবেন। মুকুজ্জেমশাই নামক ব্যক্তিটিও একদিন আসিয়া তাহার সহিত দেখা করিয়া গিয়াছেন। তিনি নাকি তাহার চাকরির জন্য নানা স্থানে দরখাস্ত করিয়াছেন এবং যত দিন একটা কিছু না জোটে, ততদিন নাকি করিতে থাকিবেন। সেদিন তিনি শঙ্করকে দিয়া চার-পাঁচটি দরখাস্তে সহি করাইয়া লইয়া গেলেন। মুকুজ্জেমশাই শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কিত লোক। শ্বশুরবাড়ির তরফ হইতে কোনো প্রকার সাহায্য লইতে তাহার আত্মসম্মান যেন ক্ষুণ্ণ হয়। যে আত্মসম্মানের জন্য সে পিতামাতার সহিত সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়াছে, সেই আত্মসম্মানকে খর্ব করিয়া সে শ্বশুরবাড়ির লোকের নিকট হইতে সাহায্য লইতে যাইবে কোন্ লজ্জায়? কাহারও নিকট সে কোনো সাহায্য লইবে না, নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ের ওপরই তাহাকে দাঁড়াইতে হইবে। কিন্তু এই মুকুজ্জেমশাইকে সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই। লোকটি অদ্ভুত-প্রকৃতির, তাহার নাকি সংসারের কোনো বন্ধন নাই, পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেরই উপকার করা নাকি তাঁহার পেশা। তিনি বিশেষ কাহারও নন—তিনি সকলের। শিরীষবাবুর সহিতও তাঁহার পরিচয় নাকি আকস্মিক।

শঙ্কর সেদিন যে দরখাস্তগুলিতে সই করিয়াছিল, তাহার একটির ঠিকানা বোম্বাইয়ের একটি পোস্ট বক্স। একটা বাংলা মাসিক পত্রিকার জন্য একজন সহকারী সম্পাদকের প্রয়োজন। বোম্বাই শহরে কে বাংলা মাসিকপত্র প্রকাশ করিতেছে? সুরমার কথা শঙ্করের মনে পড়িল। সুরমার চিঠি অনেকদিন পায় নাই, উৎপলও বহুদিন পূর্বে চিঠি লেখা বন্ধ করিয়াছে। আর কিছুদিন পূর্বে হইলে শঙ্কর হয়তো সুরমাকে পত্র লিখিত, কিন্তু এখন আর লিখিতে ইচ্ছা হইল না। একদা যে সুরমা তাহার মার্জিত রুচি, সংযত অথচ সাবলীল সৌন্দর্য দিয়া তাহার চিত্তকে স্পর্শ করিয়াছিল, সে সুরমা অহরহ নিকটে থাকিলে হয়তো শঙ্করের মানসলোকে বিপর্যয় ঘটাইতে পারিত; কিন্তু সুরমা দূরে চলিয়া গিয়াছে, অন্তরাল ধীরে ধীরে আপন অনিবার্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, বিস্মৃতির কুহেলিকায় সুরমা যে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, শঙ্কর তাহা বুঝিতেও পারে নাই। দরখাস্ত-প্রসঙ্গে তাহার কথা মনে পড়িল বটে, কিন্তু চিঠি লিখিতে ইচ্ছা হইল না।

এখন শঙ্করের মানসলোক জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে আর একজন—অমিয়া নয়, চুনচুন। মিসেস স্যানিয়ালের বাড়িতে আসিয়া এবং চুনচুনের সান্নিধ্য লাভ করিয়া শঙ্কর চুনচুনের ঘনিষ্ঠতর যে পরিচয় পাইয়াছে, তাহাতে সে আরও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। অদ্ভুত মেয়ে, কিছুতেই বিচলিত হয় না। মিসেস স্যানিয়ালের গৃহের যাবতীয় কর্ম চুনচুন একাই করে, কিন্তু এমন নীরবে এবং এমন হাসিমুখে করে যে, শঙ্কর অবাক হইয়া যায়। কর্তব্যপরায়ণা নিষ্কলুষা মিসেস স্যানিয়াল চুনচুনের দুষ্কৃতির জন্য কথায় কথায় তাহাকে শ্লেষাত্মক উপদেশ দেন, মিসেস স্যানিয়ালের পুত্র দুইটি যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ফাই-ফরমাশ করিয়া করিয়া একদণ্ড চুনচুনকে স্থির থাকিতে দেয় না, মিসেস স্যানিয়ালের দূর সম্পর্কের অপুত্রক বিপত্নীক দেবর পীতাম্বরবাবু

প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা আসিয়া একমুখ কাঁচাপাকা গোঁফ দাড়ি ও ভ্রূ লইয়া একদৃষ্টে চুনচুনের দিকে চাহিয়া থাকেন (এবং মিসেস স্যানিয়ালের সহিত কর্তব্যদ্যোতক সদালাপ করেন); কিন্তু চুনচুন একটু বিরক্ত বা বিচলিত হয় না। ইহাদের সহিত অকারণ বাদানুবাদ করিয়া নিজের আত্মমর্যাদা নষ্ট করে না, মুখে অসহায় ভঙ্গি প্রকাশ করিয়া কাহারও সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে না, নীরবে হাসিমুখে সমস্ত সহ্য করে। শঙ্কর অবাক হইয়া যায়। তাহার মাঝে মাঝে মনে হয়, এই স্মিতমুখী শান্ত মেয়েটির মনের মধ্যে আর একজন চুনচুন বাস করে, তাহার লক্ষ্য স্থির আছে এবং সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার জন্য অনিবার্য সুনিশ্চিত গতিতে সে পথ অতিবাহন করিতেছে। বাহিরে অকারণে আত্মপ্রকাশ করিয়া সে বিব্রত হইতে চাহে না, বাহিরের জগৎকে ফাঁকি দিবার জন্যই সে বাহিরের জগতে অনাড়ম্বরে অতিশয় সাধারণ বেশে থাকে। আসলে সে অসাধারণ, আসলে সে বিদ্রোহিনী, প্রেমের জন্যই প্রেমাস্পদকে বরণ করে—সামাজিক বা আর্থিক কারণে নয়। যতীন হাজরার যক্ষ্মাবিধ্বস্ত মুখচ্ছবি শঙ্করের মাঝে মাঝে মনে পড়ে। চুনচুনের প্রতি সমস্ত মন শ্রদ্ধায় অনুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে। ইচ্ছা করে, ওই রহস্যময়ীর অন্তরের রহস্যালোকে প্রবেশ করিয়া দিশাহারা হইয়া যায়।

শঙ্কর দ্রুতপদে হাঁটিতে হাঁটিতে চুনচুনের কথাই ভাবিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল—

একখানা প্রকাণ্ড নীল রঙের মোটর সহসা শঙ্করের পাশেই থামিয়া গেল। মোটরের জানালা দিয়া মুখ বাড়াইল শৈল।

শঙ্করদা, কোথায় চলেছ?

শৈল!

তবু ভালো, চিনতে পেরেছ!

চিনতে পারব না, বলিস কি?

কোথায় যাচ্ছ তুমি?

কোথাও না, এমনিই হাঁটছি।

আমার সঙ্গে একটু মার্কেটে চল তা হলে। অনেক জিনিস কিনতে হবে, তুমি পছন্দ করে দেবে।

তার মানে?

লক্ষ্মীটি, চল।

শৈল দ্বার খুলিয়া আহ্বান করিল, শঙ্কর 'না' বলিতে পারিল না।

ঘণ্টা-দুই পরে নানা রঙের শাড়ি, জামা, উল, ছিট, বাসন, টি-সেট এবং টুকিটাকি আরও নানাবিধ জিনিস কিনিয়া শঙ্করকে লইয়া শৈল বাড়ি ফিরিল। মিস্টার বোস বাড়িতে ছিলেন না। তিনি সম্প্রতি যে পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, তাহাতে ক্রমাগত ট্যুর করিয়া বেড়াইতে হয়। তিনি ট্যুরে বাহিরে ছিলেন।

শঙ্কর বলিল, এবার আমি যাই।

এখনই যাবে কি! সে হবে না, ওপরে চল, কিছুই তো কথা হল না।

শঙ্করকে উপরে যাইতে হইল।

উপরে গিয়া শৈল বলিল, এখনও তো আসল কথাই জিজ্ঞেস করা হয়নি।

কি কথা?

বউ কেমন হল?

শঙ্কর বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল, কার বউ?

তোমার, তোমার গো, লুকিয়ে বিয়ে করে ভেবেছ, কেউ টের পায়নি বুঝি? সব জানি আমি।

শঙ্কর বুঝিল, আর লুকাইবার উপায় নাই।

কাউকে জানাইনি, তুই খবর পেলি কি করে?

কুস্‌মি চিঠি লিখেছে। কুস্‌মিকে মনে পড়ে?

বিদ্যুৎঝলকের মতো শঙ্করের মনে কুস্‌মির মুখখানা ফুটিয়া উঠিল। কুসুম শৈলর বাল্যসখী। শৈলর সঙ্গে প্রায় তাহাদের বাড়িতে আসিত, শঙ্করকে দেখিলেই মুচকি হাসিয়া ছুটিয়া পলাইত। কুসুমের কচি মুখখানা তাহার চোখের ওপর ভাসিতে লাগিল।

কুস্‌মি খবর পেলে কি করে?

সে কপাল পুড়িয়ে বিধবা হয়ে গ্রামে ফিরে এসেছে যে। তোমাদের বাড়ি থেকেই খবর পেয়েছে। তুমি নাকি জ্যাঠামশাইয়ের অমতে বিয়ে করেছ?

হ্যাঁ।

কেন, অমিয়াকে খুব বেশি মনে ধরেছিল?

বড্ড।

উভয়েই মুচকি হাসিয়া পরস্পরের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তাহার পর শঙ্কর হাসিয়া বলিল, বিয়ের আগে তাকে আমি দেখিইনি।

তবে?

বিয়ে করবারই ইচ্ছে ছিল না আমার, কিন্তু বাবা যখন পণের জন্যে আমার শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে দর-কষাকষি শুরু করে দিলেন তখন আমার ভয়ঙ্কর রাগ হয়ে গেল। রোখের মাথায় ঠিক করে ফেললুম যে, বিনাপণে ওখানেই বিয়ে করব।

শৈল ঔৎসুক্যভবে জিজ্ঞাসা করিল, তারপর?

তাই করলুম।

জ্যাঠামশাই কি করলেন?

কি আর করবেন, রেগে আমার পড়ার খরচ বন্ধ করে দিলেন।

ও মা, তাই নাকি? তারপর?—উৎকণ্ঠায় শৈলর দুইটি চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তুমি এখন কি করছ তা হলে?

শঙ্কর গম্ভীরভাবে মিথ্যা কথা বলিল, চাকরি করছি।

কোথায়?

একটা আপিসে।

কোথা থাক?

একটা মেসে!

কোন্ মেসে, ঠিকানাটা বল না?

কিছুদিন আগে শঙ্কর যে মেসটাতে ছিল, তাহার ঠিকানা বলিয়া দিল। শৈল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

একবার তাহার ইচ্ছা হইল, শঙ্করকে বলে, এখানে আসিয়া থাকিতে; কিন্তু কেমন যেন সঙ্কোচ হইল; একটু ভয়ও হইল, বলিতে পারিল না। বেয়ারা মোটর হইতে জিনিসগুলি নামাইয়া আনিয়াছিল, বাহির হইতে প্রশ্ন করিল, এগুলো কোন্ ঘরে রাখব মা?

এখানেই নিয়ে আয়।

বেয়ারা চলিয়া গেল।

শৈল বলিল, ওমা, একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। দাদা যে বিলেত থেকে ফিরে এসেছে। চিঠিপত্র পাওনি তুমি?

না। কতদিন ফিরেছে?

তা প্রায় মাস-দুই হবে। বম্বেতেই শুনছি থাকবে, কি একটা ব্যবসা কববে নাকি, শ্বশুর টাকা দিচ্ছে, শ্বশুর খুব বড়লোক তো।

ও।

শঙ্কর আর কিছু বলিল না। সুরমার কথা একবার মনে হইল, উৎপলের মুখটাও মনের মধ্যে একবার উঁকি দিয়া গেল, কিন্তু মনে তেমন কোনো সাড়া জাগিল না। কিছুদিন আগে তাহার মন উৎপল এবং সুরমাকে লইয়া মাতিয়াছিল, সে মন আর নাই। নূতন মন নূতন জগতে নূতন প্রেরণায় নতূন স্বপ্ন দেখিতেছে। দুইটি ভৃত্য, বেয়ারা আসিয়া প্রবেশ করিল এবং জিনিসগুলি টেবিলে সাজাইয়া রাখিয়া বাহির হইয়া গেল।

শঙ্কর ইতিপূর্বে একবার বলিয়াছিল, আবার বলিল, অনর্থক এতগুলি টাকা খরচ করলি তুই।

অনর্থক কেন?

শাড়ি, বাসন, টি সেট নিশ্চয়ই তোর যথেষ্ট আছে, তবু কি দরকার ছিল আবার কেনবার?

কি নিয়ে থাকব তা না হলে? ওদের নেড়ে-চেড়েই তো সময় কাটে। আঃ, চুলে দুলটা আটকে গেল, ছাড়িয়ে দাও না শঙ্করদা।

ছাড়াইয়া দিতে দিতে শঙ্কর বলিল, শাড়ি নেড়ে তোর সময় কাটে? কি যে বাজে কথা বলিস!

সত্যি বলছি।

গান-বাজনা শিখছিলি যে?

শিখেছি কিছু কিছু, শোনাব কাকে, ঘরের দেওয়ালকে? সেইজন্যে আর ভালো লাগে না ওসব।

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিল।

শঙ্কর বলিল, এবার আমি যাই, আমার কাজ আছে।

কাজ, কাজ, কাজ—সবারই খালি কাজ।

একটু অস্বাভাবিক ঝাঁজের সহিত কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া ঝাঁজটাকে মোলায়েম করিবার জন্য শৈল হাসিল।

কাজ না করলে চলে কই?

না, তোমাকে এখন আমি যেতে দেব না, অনেকক্ষণ থাকতে হবে এখানে, তোমার সেই কবিতাগুলো তোমার মুখে শুনব আবার।

কোন্ কবিতাগুলো?

সেই যেগুলো ইস্কুলে লিখেছিলে?

সেগুলো কোথায়?

আমার কাছে আছে। খাতাখানা চুরি করেছিলাম, মনে নেই? বার করে আনি, থাম— তুমি বিছানার ওপর ভালো করে বসো।

একরূপ জোর করিয়া শঙ্করকে বিছানার উপর বসাইয়া শৈল বাহির হইয়া গেল এবং কয়েক মিনিট পরে জীর্ণ-মলাট একখানা খাতা আনিয়া শঙ্করের হাতে দিয়া বলিল, পড়।

নিজের লেখা সমঝদার শ্রোতাকে পড়িয়া শোনাইবার দুর্দমনীয় বাসনা শঙ্করের মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; তবু সে বলিল, সত্যি বলছি, আমার কাজ আছে এখন।

লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে পড়ি, এখনই চলে যেও না। চা আনতে বলছি, চা খেয়ে যেও, ততক্ষণ পড় না একটু, শুনি— বড্ড একগুঁয়ে তুমি শঙ্করদা।

শৈল ঠোঁট উল্টাইয়া অভিমান করিল। শঙ্করের সেই বহুদিন আগেকার কিশোরী শৈলকে মনে পড়িল, সে-ও ঠিক এমনি করিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া কথায় কথায় মুখ ভার করিত।

দুই ঘন্টার পর শঙ্কর যখন শৈলর বাড়ি হইতে বাহির হইল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কবিতার খাতাটা সমস্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত শৈল তাহাকে ছাড়ে নাই। শৈলর শেষ কথাগুলি শঙ্করের কানে বাজিতেছিল— মাঝে মাঝে তুমি এসো শঙ্করদা, আমার বড্ড একা একা লাগে। আর বাজিতেছিল শৈলর প্রশ্নটা— বউ কেমন হয়েছে সত্যি বল না, নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী; রঙ কেমন, আমার চেয়েও ফরসা?

আসিবার সময় শৈল একটা কাগজে মুড়িয়া নতুন কেনা একখানা দামি শাড়ি অমিয়ার জন্য দিয়াছে। উপহার। শৈল কিছুতেই ছাড়িল না, শঙ্করকে লইতে হইল। প্যাকেটটা বগলে করিয়া শঙ্কর ধর্মতলার মোড়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। পাশের বারান্দায় সজ্জিত পুরাতন পুস্তকগুলি শঙ্করের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে সরিয়া গিয়া বইগুলি দেখিতে লাগিল। কি চমৎকার চমৎকার সব বই! লুব্ধ আগ্রহে সে বই বাছিয়া সাজাইতে লাগিল। এসব বই সে কোনোদিন পড়িবে কি না, পড়িবার সময় পাইবে কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিল না। একগাদা বই বাছিয়া ফেলিল।

আরও ঘণ্টা-খানেক পরে শঙ্কর যখন বাসায় ফিরিল, তখন বগলে একগাদা বই, কিন্তু শাড়ির প্যাকেটটি নাই। অর্ধমূল্যে শাড়িটি বিক্রয় করিয়া সে বইগুলি কিনিয়া আনিয়াছে।

আরও খানিকক্ষণ পরে স্তূপীকৃত বইগুলি সামনে রাখিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়াছিল। শাড়িখানা বিক্রয় করিয়া তাহার মনটা যেন অপরাধী হইয়া পড়িয়াছিল। শৈল যদি জানিতে পারে, কি মনে করিবে? অমিয়া শুনিলেই বা কি ভাবিবে?

চুনচুন আসিয়া প্রবেশ করিল।

এত বই কোথা থেকে আনলেন?

কিনে আনলাম।

কেন?

পড়ব।

চুনচুনের দৃষ্টিতে বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল।

শঙ্করের মনের গ্লানিটুকু কাটিয়া গেল।

।। তেইশ ।।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

নিজের শূন্য ঘরে বেলা মল্লিক একা চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। ঘরের বাহির হইতে সাহস হইতেছিল না। সকাল হইতে একটা বদখত চেহারার লোক তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে। এখনও লোকটা গলির মোড়ে কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই বসিয়া আছে। বিগত কয়েক দিনে জানালার ভিতর দিয়া আরও অশ্লীল চিঠি ও চিত্র আসিয়াছে। জনার্দন সিং চলিয়া যাইবার পর অন্য কোনো চাকরও জোগাড় করা সম্ভবপর হয় নাই। কয়েকদিন হইতে অবিরত চেষ্টা করিয়াও একটা চাকর জোটে নাই, মনে হইতেছে, ষড়যন্ত্র করিয়াই সকলে যেন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে। শূন্য ঘরে একা বসিয়া বেলার নিজেকে নিতান্ত অসহায় বলিয়া মনে হইতেছিল। দ্বারে মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

বেলাদেবী তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কে?

মিহি গলায় উত্তর আসিল, আমি অপূর্ব।

ও, অপূর্ববাবু! আসুন আসুন।

অপূর্ববাবুর মতো লোক আসাতে বেলা যেন নিশ্চিন্ত হইলেন। দ্বার খুলিয়া দিতেই এসেন্সের গন্ধ ছড়াইয়া, পাউডার-মণ্ডিত মুখে মৃদুহাস্য বিকীর্ণ করিতে করিতে সঙ্কুচিত বিনীত অপূর্ববাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। গায়ে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে সবুজ রঙের জরিদার নাগরা, পরনে মিহি কোঁচানো ধুতি। চক্ষু দুইটি কিন্তু গর্তস্থ। মুখের মধ্যে কেবল গালের হাড় দুইটি এবং দাঁতগুলি প্রবলভাবে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করিতেছে।

স্মিতহাস্যে নমস্কার করিয়া বেলা বলিলেন, আসুন, আপনাকে বড় রোগা দেখাচ্ছে যে, অসুখ-বিসুখ হয়েছে নাকি?

হ্যাঁ, কিছুদিন থেকে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ভুগছি।

অপূর্ববাবুর মুখভাব করুণ হইয়া উঠিল।

আসুন, এতদিন পরে হঠাৎ মনে পড়ল যে!

আমি কতবার এসে ফিরে গেছি, আপনার দেখাই পাই না।

তাই নাকি?

যখনই এসেছি, আপনার ওই গোঁফ-ওলা দারোয়ান এক কথায় আমাকে বিদেয় করে দিয়েছে। আজ তো তাকে দেখতে পেলুম না! মানে—লোকটা একটু যেন—

অপূর্ববাবু থামিয়া গেলেন। পকেট হইতে ফিনফিনে পাতলা রুমাল বাহির করিয়া মুখ

মুছিতে মুছিতে গোঁফ-ওয়ালা দারোয়ানটির সম্বন্ধে সত্য অথচ অরূঢ় কি বলিবেন, নির্ণয় করিতে গিয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

বেলাদেবীই প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন।

হ্যাঁ, লোকটা একটু রাফ-গোছের ছিল, তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি আমি। ছাড়িয়ে দিয়েও কিন্তু মুশকিলে পড়েছি, একটা দারোয়ান না হলে চলছে না। একটা ভালো লোক পেলে এখুনি বাহাল করি।

আকস্মিক পুলকোচ্ছ্বাসে অপূর্ববাবুর মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই বেলাদেবীর এমন একটা উপকারে লাগিতে পারিবেন, ইহা যে অভাবনীয় ব্যাপার!

আজই তাঁহার আপিসের নেপালি দারোয়ানটা তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছিল, দেশ হইতে তাহার ভাই আসিয়াছে, অপূর্ববাবু যদি তাহাকে কোথাও লাগাইয়া দিতে পারেন, বড় উপকৃত হয় সে।

আছে আপনার সন্ধানে কোনো লোক?

আর একবার রুমালে মুখ মুছিয়া অপূর্ববাবু বলিলেন, নেপালি রাখবেন?

কেন রাখব না, যদি বিশ্বাসী হয়।

আমার জানাশোনা একটি নেপালি আছে। ঠিক জানাশোনা নয়, মানে— আমাদের আপিসের যে নেপালি দারোয়ানটা আছে, তারই ভাই— তাকে আমি পার্‌সোনালি অবশ্য— তবে যতদূর মনে হয়— মানে, যদি বলেন, আমি নিজে গিয়ে, অর্থাৎ—

নিজের অসংলগ্ন বাক্যজালে বিজড়িত হইয়া অপূর্ববাবু থামিয়া গেলেন।

বেলা প্রশ্ন করিলেন, কোথা থাকে সে?

বড়বাজারে।

তার বাসাটা চেনেন আপনি?

চিনি।

তা হলে চলুন, এখনই গিয়ে ডেকে আনা যাক তাকে।

এখনই?

হ্যাঁ, এখনই— আজই বাহাল করব। একা এমন অরক্ষিত অবস্থায় থাকতে ভয় করে।

এখান থেকে এখন বড়বাজার যাওয়া মানে—

নিজের হাতঘড়িটা দেখিয়া অপূর্ববাবু পুনরায় বলিলেন, মানে নটা বেজে গেছে কিনা, যেতে আসতে প্রায়—

চলুন না, ট্যাক্সি করে যাই।

বেলার সহিত ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসিয়া যাওয়াটা যদিও লোভনীয় ব্যাপার, কিন্তু ভাড়াও তো কম লাগিবে না। বেলা যদি নিজে হইতে ভাড়াটা না দেন, তাঁহার কাছে ভাড়াটা দাবি করাও তো শোভন হইবে না! তুচ্ছ এই দুর্বলতাটুকুকে প্রশ্রয় দিতে গিয়া অকারণে চার-পাঁচটা টাকা ব্যয় করা— অপূর্বকৃষ্ণ পালিত ফাঁপরে পড়িয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

কি, ভাবছেন কি?

ভাবছি, এখন কেন ট্যাক্সি করে হাঙ্গামা করতে যাবেন, মানে—টুমরো আমি পজিটিভ্‌লি— কথা দিচ্ছি আপনাকে—

সহসা বেলার নজরে পড়িল, ওদিকের জানালাটা হইতে একটা ছায়ামূর্তি যেন সরিয়া গেল এবং ক্ষণপরেই ঝুপ করিয়া একটা শব্দ হইল। গলির মোড়ের সেই লোকটার কথাও বেলার মনে হইল।

বেলা বলিলেন, না, আজ রাত্রেই আমার একজন লোক চাই। ডাকুন একটা ট্যাক্সিই।

ট্যাক্সি, মানে—

অপূর্ববাবু পুনরায় ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

বেলা বলিলেন, আশ্চর্য লোক তো আপনি! আমি ভাড়া দেব, আপনি ইতস্তত করছেন কেন?

না না, ভাড়ার কথা নয়, মানে— দেখি, কটা টাকা আছে আমার কাছে।

অপূর্ববাবু পকেটে হাত দিয়া মনিব্যাগ হাতড়াইতে লাগিলেন।

আপনি ভাড়া দিতে যাবেন কেন? কি মুশকিল! যান, একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসুন।

বেশ, তাই যাই!

বাধ্য বালকের মতো অপূর্বকৃষ্ণ যাইতে উদ্যত হইলেন। বেলার হঠাৎ লোকটার প্রতি অনুকম্পা হইল। ভদ্রলোক আসিতে না আসিতে তাঁহাকে এমন করিয়া ফরমাশ করাটা অনুচিত হইতেছে।

একটু চা খাবেন? চা খেয়ে বরং যান। আসুন, একটু চা-ই করা যাক আগে, আমারও আজ বিকেলে চা খাওয়া হয়নি, চা-টা খেয়ে তারপর বেরুনো যাবে।

চা-পানান্তে কিছুক্ষণ গল্প করিবার পর ট্যাক্সি খুঁজিতে বাহির হইয়া অপূর্বকৃষ্ণ পালিতকে বেশি বেগ পাইতে হইল না। বেলাদেবী যদি চায়ের হাঙ্গামাটা না তুলিতেন, তাহা হইলে হয়তো অচিনবাবু-নিয়োজিত চরটি অচিনবাবু-নিয়োজিত ট্যাক্সিখানি ঠিক গলির মোড়টিতে আনিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিবার সুযোগ পাইত না।

অপূর্ববাবু বাহির হইয়া দেখিলেন, গলির ঠিক মোড়েই একটি ভালো সিডান-বডি ট্যাক্সি রহিয়াছে, ডাকিবামাত্রই হর্ন দিতে দিতে সেটি অবিলম্বে আগাইয়া আসিল। বিগত কয়েক দিবস হইতে বেলাদেবীকে কোনো উপায়ে আরোহীরূপে পাইবার জন্য ট্যাক্সিখানি অচিনবাবু কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আশেপাশে অপেক্ষা করিতেছিল।

বেলাদেবীর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য, তাঁহার ঘরে অশ্লীল চিঠি ছবি ফেলিয়া উত্ত্যক্ত করিবার জন্য এবং তাঁহার ঘরের আনাচে-কানাচে আড়ি পাতিবার জন্য একটি চরও অচিনবাবু নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ট্যাক্সির প্রয়োজন হইতে পারে শুনিবামাত্র চরটি গিয়া ট্যাক্সিখানাকে ডাকিয়া আনিয়া মোড়ে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল।

বেলাদেবী এবং অপূর্বকৃষ্ণ পালিত ট্যাক্সিতে আরোহণ করিয়া বলিলেন, চল, বড়বাজার।

অপূর্ববাবু বেলার সন্নিকটে ঘেঁষিয়া বসিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন, পিয়ানোর সেতারের এস্রাজের অনেক ভালো গৎ জোগাড় করেছি, অনেক দিন থেকে দেব ভাবছি, কিন্তু কিছুতেই আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে উঠছে না, মানে—

আজ আনলেই পারতেন।

আজও যে আপনার দেখা পাব, তা আশা করিনি। তা ছাড়া—

মোটর দ্রুতবেগে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল।

অপূর্ববাবু এবং বেলাদেবী কেহই লক্ষ্য করিলেন না, গাড়ি বড়বাজার অভিমুখে যাইতেছে না। সিডান-বডি গাড়ির অভ্যন্তরে তাঁহারা কথোপকথনে অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ দ্রুতগতিতে চলিবার পর গাড়িখানা সহসা থামিয়া গেল।

ড্রাইভার বলিল, আপনারা নামুন, গাড়ির তেল কমে গেছে। আমি আর একখানা ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি আপনাদের মোড় থেকে।

অপূর্ববাবু বিস্মিতকণ্ঠে বলিলেন, সে কি! তেল ফুরিয়ে গেছে, মানে, আগেই তোমার—

এরূপ একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিয়াছেন বলিয়া অপূর্ববাবু নিজেই নিজের কাছে অপরাধী হইয়া পড়িলেন এবং মুখভাবে তাহা ব্যক্ত করিলেন।

বেলা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ড্রাইভারকে বলিলেন, এক পয়সা ভাড়া দেব না তোমাকে।

এ সংবাদে ড্রাইভার বিচলিত হইল না, অ্যালবার্ট টেরিতে একবার হাত বুলাইল, বুক-খোলা জামার পকেট হইতে সুদৃশ্য একটি সিগারেট-কেস বাহির করিয়া সিগারেট ধরাইল এবং একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া নির্বিকারভাবে উত্তর দিল, বেশ, তাই যদি আপনার ধম্‌মো হয়, দেবেন না। এখন আমার গাড়িটা ছেড়ে দিন দয়া করে।

নামিতেই হইল।

ড্রাইভার ভাড়ার জন্য অধিক জেদ না করিয়া গম্ভীরমুখে গাড়ি হাঁকাইয়া গলিটা হইতে বাহির হইয়া গেল। ভয়ঙ্কর অন্ধকার গলি। কলিকাতা শহরেও যে এমন একটা অন্ধকার গলি থাকিতে পারে, তাহা ধারণা করা শক্ত।

বেলা বলিলেন, চলুন, হেঁটে গিয়ে বড় রাস্তায় পড়া যাক, তারপর সেখান থেকে ট্যাক্সি নিলেই হবে।

বেশ, তাই চলুন। উঃ, ভীষণ অন্ধকার!

অন্ধকার গলিটার দুই পাশের বাড়িগুলা বিরাটকায় জন্তুর মতো মনে হইতেছে। কোনো বাড়িতে যে কোনো লোক আছে মনে হয় না, চারিদিকে নিস্তব্ধ।

অন্ধকারে দুইজনে কিছুদূর অগ্রসর হইলেন, গলিটা আঁকিয়া বাঁকিয়া কতদূরে গিয়া বড়রাস্তায় পড়িয়াছে, কে জানে! খানিক দূরে গিয়া একটা বাঁক ফিরিতেই দেখা গেল, হেলিয়া-পড়া একটা থামের ওপর একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলিতেছে।

অপূর্ববাবু বলিলেন, যাক, বাঁচা গেল, তবু একটা আলো পাওয়া গেল, মানে— অন্ধকার যেন ক্রমশ, ঠিক ভয় নয়, একটু যেন গা-ছমছমের মতো—

অপূর্ববাবু কথা শেষ করিতে পারিলেন না। আচম্বিতে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। 'চোর চোর' বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে পাশের আর একটা ক্ষুদ্রতর গলি হইতে বলিষ্ঠ একটা লোক ছুটিয়া আসিল এবং অপূর্বকৃষ্ণ পালিতকে জাপটাইয়া ধরিয়া ভূশায়ী করিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের কয়েকটা বাড়ির কপাট খুলিয়া গেল, দুই-একটা ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে ভূপতিত অপূর্বকৃষ্ণকে ঘিরিয়া একটা ছোটলোকের জনতা কলরব শুরু করিয়া দিল। ঘটনাটার আকস্মিকতায় বেলাদেবী ক্ষণিকের জন্য দিশাহারা হইয়া পড়িলেন; কিন্তু ক্ষণপরেই আত্মস্থ হইয়া আগাইয়া গেলেন এবং তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আদেশের ভঙ্গিতে বলিলেন, এই, এই, ছেড়ে দাও ওঁকে, উনি চোর নন।

জনতা হইতে কে একজন বলিল, ইস, ভারি দরদ যে দেখছি!

আর একজন ঈষৎ নিম্ন কণ্ঠে সায় দিল, হ্যাঁ, পীরিত একেবারে উথলে পড়ছে!

বেলার চক্ষু দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া গেলেন এবং ভিড়ের মধ্যস্থলে গিয়া দেখিলেন, বলিষ্ঠ গুণ্ডাটা অপূর্ববাবুর ওপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

এই, কি করছ? ওঠ, ওঠ বলছি, ছেড়ে দাও ওঁকে।

গুণ্ডাটা ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, ছেড়ে দেব কি ঠাকুরন! আমার ঘড়ি চুরি করে ভাগছিল শালা, ওকে আমি ছেড়ে দেব?

কই তোমার ঘড়ি?

এই যে দ্যাখেন না— শালার পকেট থেকে টান মেরে বার করলাম।

রূপার চেনসুদ্ধ একটা নিকেলের ঘড়ি সে তুলিয়া দেখাইল।

ও ঘড়ি ওঁর কাছে ছিল না। শিগ্‌গির ওঠ বলছি তুমি।

মজা ঘনীভূত হইতেছে দেখিয়া জনতার ভিতর হইতে রোগা-গোছের এক ছোকরা আনন্দাতিশয্যে মুখের ভিতর আঙুল পুরিয়া সিটি দিল।

আর একজন বলিল, নাঃ, এমন পীরিত মাইরি নাটক-নভেলেও দেখা যায় না।

ফতুয়া-পরা প্রৌঢ়-গোছের একজন ভদ্রলোক বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কি, এই মাগীকে সুদ্ধ নিয়ে ওই ব্যাটাকে টানতে টানতে থানায় যাও। ছি ছি ছি ছি! ভদ্দরলোকের পোশাক পরে যত ব্যাটা ছিঁচকে আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে ঘুরছে আজকাল! কালে কালে কতই যে দেখব বাবা!

এই দ্বিতল বাড়ির জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া একটি যুবকও সবিস্ময়ে সব দেখিতেছিল ও শুনিতেছিল। বেলা দৃপ্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, ওকে ছাড়বে কি না?

জনতার ভিতর হইতে উত্তর আসিল, মাইরি আর কি!

এমন সময় একটা মোটরের হেড লাইট পড়িয়া সমস্ত স্থানটা আলোকিত হইয়া উঠিল। মোটরখানি নিঃশব্দ-গতিতে আসিয়া হর্ন দিয়া জনতার সম্মুখে থামিয়া গেল, অচিনবাবু স্টিয়ারিং ছাড়িয়া মোটর হইতে অবতরণ করিলেন। পূর্ব আয়োজন অনুযায়ী পটভূমিকা ঠিক প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল, এইবার স্বকীয় ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হইলেন।

অতীব বিস্মিতকণ্ঠে ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া বলিলেন, এ কি, মিস মল্লিক নাকি, আপনি হঠাৎ এখানে? বাই জোভ!

বেলা মল্লিক যেন অকূলে কূল দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আপনি অপূর্ববাবুকে উদ্ধার করুন আগে।

নিশ্চয়।

অচিনবাবু রুষ্ট ভঙ্গিতে আগাইয়া গিয়া গুণ্ডাকে প্রচণ্ড একটা ধমক দিলেন এবং তাহাতে ঠিক যেন জাদুমন্ত্রের মতো কাজ হইল। গুণ্ডাটা হঠাৎ অপূর্ববাবুকে ছাড়িয়া দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে গলিটার মোড়ে অদৃশ্য হইয়া গেল। লোকটার অভিনয় দক্ষতায় অচিনবাবু সন্তুষ্ট হইলেন। বেলা দেবী লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইতেন, অচিনবাবুর চক্ষু দুইটি হইতে একটা চাপা কৌতুকের হাসি উপচাইয়া পড়িতেছে। গুণ্ডাটা পলায়ন করিতেই বেলা পুনরায় অপূর্ববাবুর কাছে গেলেন,

দেখিলেন, মূর্ছিত অপূর্ববাবুর নিস্পন্দ দেহটা ধূলায় লুটাইতেছে; আদ্দির পাঞ্জাবি ছিন্ন, নাগরা পদচ্যুত হইয়াছে। অপূর্ববাবুর সংজ্ঞাহীন দেহটার ওপর ঝুঁকিয়া বেলা ডাকিতে লাগিলেন, অপূর্ববাবু, অপূর্ববাবু, ও অপূর্ববাবু!

অপূর্ববাবুর তবু জ্ঞান হয় না। অচিনবাবু তখন অপূর্ববাবুর দুই কাঁধ ধরিয়া সজোরে ঝাঁকানি দিলেন, ঝাঁকানি খাইয়া তাঁহার জ্ঞান হইল, এবং জ্ঞান হইতেই তিনি-কাঁদিয়া ফেলিলেন।

মিস মল্লিক—অ্যা— আমি কোথায়— মিস মল্লিক— আমি— আপনি—

প্রিয়নাথ মল্লিক মোটরের ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া ভগিনীর কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করিতেছিলেন। অচিনবাবু তো তাহা হইলে ঠিক কথাই বলিয়াছেন। অচিনবাবু আজকাল প্রায় প্রতিদিনই বলিতেছেন যে শুধু শঙ্কর নয়, বেলার আজকাল নিত্য নতুন বন্ধু জুটিতেছে। আজ একটু আগেই অচিনবাবু প্রিয়নাথবাবুকে বলিয়াছিলেন; মিস মল্লিকের পুরনো গানের মাস্টারের সঙ্গে আজকাল খুব মাখামাখি। আমার এক চর এসে খবর দিলে, এখনই ওঁরা ট্যাক্সি করে বেলগাছিয়া অঞ্চলে এক এঁদো আড্ডায় যাবেন ঠিক করেছেন। শুনে আমার রাগ হয়ে গেল মশাই; আমি একটা গুণ্ডা ঠিক করেছি, অপূর্ববাবুকে ধরে বেশ করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে দেয় যেন। এই সময় আমরাও চলুন যাই, মিস মল্লিককে পাকড়াও করে আনা যাক যদি পারা যায়। বুঝলেন না, এ একটা মস্ত সুযোগ।

সত্যই তো, অপূর্ববাবুর সঙ্গে বেলা বেলগাছিয়ায় এই অন্ধকার গলিটায় আসিয়াছে! এখানে আসিবার তাহার কি কারণ থাকিতে পাবে? ক্রুদ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রিয়নাথ বেলার আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। বেলা অপূর্ববাবুর মুখের ওপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে সান্ত্বনা দিতেছিলেন।

না না, ভয় কি আপনার! চলুন, উঠুন, এই যে নিন, জুতো পায়ে দিন।

প্রিয়নাথের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়া গেল।

গাড়ি হইতে নামিয়া দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া তিনি বলিয়া বসিলেন, ঢের হয়েছে, আর সোহাগ জানাতে হবে না। বদমায়েস পাজি কোথাকার!

অগ্রজের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে বেলা বিস্মিত হইলেন, কিন্তু বিচলিত হইলেন না। অন্তত বাহিরে তাহার কোনো অভিব্যক্তি দেখা গেল না। তিনি প্রিয়নাথের দিকে একবার মাত্র চকিত দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাহার পর তাঁহার উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া অপূর্ববাবুকে বলিলেন, উঠুন, এই নিন, আমার কাঁধে হাত দিন।

প্রিয়নাথের চক্ষু দুইটি হিংস্র হইয়া উঠিল। স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া শ্বাপদের মতো দন্ত প্রদর্শন করিয়া তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, বিচ, বিচ, এ কমান বিচ! কুকুরেরও অধম।

বেলা ভ্রূক্ষেপ করিলেন না।

অচিনবাবু কিন্তু মনে মনে প্রমাদ গনিলেন। এই লোকটা সব মাটি করিল। এত করিয়া শিখাইয়া পড়াইয়া আনিলেন যে, বেলা মোটরে ওঠার আগে কিছুতেই তিনি যেন আত্মপ্রকাশ না করেন। আত্মপ্রকাশ করিলে বেলা হয়তো মোটরে উঠিতেই চাহিবেন না। বেলাকে মোটরে উঠাইয়া স্টার্ট দিয়া তবে আত্মপ্রকাশ করিলেই চলিত। সমস্ত গোলমাল হইয়া গেল। অচিনবাবুর প্ল্যান ছিল অপূর্ববাবুকে পৌঁছাইয়া দিয়া বেলা এবং বেলার দাদাকে লইয়া তিনি

সোজা বাহির হইয়া যাইবেন। বেলার দাদাকে বলিবেন যে, তাঁহার একটু কাজ আছে, কাজটুকু সারিয়া তিনি তাঁহাকে এবং বেলাকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবেন। কলিকাতার বাহিরে কয়েকজন গুণ্ডা এবং একটা ট্যাক্সি তিনি ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিলেন। বন্দোবস্ত ছিল যে, বেলা এবং বেলার দাদাকে লইয়া একটি জনবিরল মাঠের কাছাকাছি তিনি মোটর থামাইবেন এবং কাজের ছুতায় নামিয়া গিয়া গুণ্ডাগুলিকে খবর দিবেন। তাহার অচিনবাবুর অনুপস্থিতিতে আসিয়া বেলাকে হরণ করিবে এবং বেলার দাদাকে অচিনবাবুর মোটরে হাত পা মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিয়া যাইবে। প্রিয়নাথের চোখের সম্মুখে গুণ্ডা কর্তৃক বেলা অপহৃত হইলে এবং পরে অচিনবাবু আসিয়া প্রিয়নাথকে উদ্ধার করিলে অচিনবাবুর সহিত বেলা-অপহরণের যে কোনো সংস্রব আছে, তাহা সহসা আবিষ্কার করা শক্ত হইবে। কিন্তু প্রিয়নাথ সহসা আত্মপ্রকাশ করাতে সমস্ত গোলমাল হইয়া গেল।

বেলার কাঁধে ভর দিয়া অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অচিনবাবু সহাস্যমুখে সহৃদয় ভঙ্গিতে মোটরের দ্বার খুলিয়া বলিলেন, আসুন আসুন, চলুন, পৌঁছে দিই আপনাদের। আপনি উঠুন প্রিয়নাথবাবু। বেলার দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রিয়নাথবাবু উঠিয়া বসিলেন। অপূর্ব্ববাবুও ধীরে ধীরে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

আপনিও উঠুন।

অনেক ধন্যবাদ, আপনি অপূর্ব্ববাবুকে ওঁর বাসায় পৌঁছে দিন, আমি যাব না।

চলুন না, আপনাকেও আপনার বাসায় নাবিয়ে দিয়ে যাই।

না, আমি এখন বাসায় ফিরব না।

বেশ তো, কোথায় ফিরবেন বলুন, সেইখানেই নাবিয়ে দিয়ে যাই।

না, তার দরকার নেই, আপনারা যান।

মোটরের ভিতর হইতে প্রিয়নাথ গর্জন করিয়া উঠিলেন, চুলের ঝুঁটি ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসুন ওকে, সোজা কথায় ও আসবে না।

অচিনবাবু বলিলেন, আঃ থামুন আপনি, কি যে বলেন। তাহার পর বেলার দিকে ফিরিয়া একটু অনুনয়ভরে বলিলেন, চলুন চলুন, ওঁর কথায় কিছু মনে করবেন না আপনি, চলুন। এবং হাত ধরিয়া ঈষৎ আকর্ষণ করিলেন।

হাত ছেড়ে দিন আমার।

আপনি যাবেন না?

না।

কারণটা কি?

আমার খুশি।

সহসা বেলার নজরে পড়িল, আজ সকাল হইতে যে লোকটা তাহাকে অনুসরণ করিতেছিল জনতার মধ্যে সেও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বেলার সন্দেহ হইল। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কি যেন একটা যোগাযোগ রহিয়াছে। বহুকাল পূর্বে প্রফেসার গুপ্ত অচিনবাবু সম্বন্ধে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, সে কথাটাও মনে পড়িয়া গেল।

চলুন, চলুন, ওঁর কথায় কিছু মনে করবেন না।— অচিনবাবু পুনরায় অনুরোধ করিলেন।

আমি যাব না, কেন বৃথা সময় নষ্ট করছেন, অপূর্ব্ববাবুকে পৌঁছে দিন আপনি।

জোর করে যদি ধরে নিয়ে যাই, কি করতে পারেন আপনি?

মোটরের ভিতর হইতে গলা বাড়াইয়া প্রিয়নাথ পুনরায় গর্জন করিলেন, জোর করেই আনুন না আপনি, কি করে ও দেখি একবার!

আসুন, কি ছেলেমানুষি করছেন।

অচিনবাবু এবার একটু জোরেই বেলার হস্তাকর্ষণ করিলেন। বেলা হাত ছাড়াইয়া সরিয়া সহসা অচিনবাবুর গণ্ডে সজোরে একটা চপেটাঘাত করিয়া বারান্দায় দণ্ডায়মান প্রৌঢ়টিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, একজন মহিলাকে এরা সবাই অপমান করছে আর আপনারা তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন। একটু সাহায্য করবেন না আমাকে?

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি আর পাঁচজনের মতো দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে দেখিতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছিলেন। সহসা এই প্রশ্নে একটু থতমত খাইয়া গেলেন।

সাহায্য। আরে বলে কি? আমাকে সুদ্ধ জড়াতে চায়, কি আপদ!

আর কিছু না পারেন, আমাকে অন্তত সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে থানায় পৌঁছে দিন। পুলিশের আশ্রয়ে তবু খানিকটা ভরসা পাব।

দ্বিতলের বাতায়ন হইতে যুবকের মুখটি সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং ক্ষণপরেই সশরীরে তিনি বাহিরে আসিয়া বেলা মল্লিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনি আসুন, আমার বাইরের ঘরে এসে বসুন, তারপর যা হয় ব্যবস্থা করছি আমি।

সকলেই ফিরিয়া দেখিল, স্বাস্থ্যবান দীর্ঘাকৃতি একটি যুবক।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি মন্তব্য করিলেন, এইবার ঠিক হয়েছে, রতনে রতন চিনেছে। এবং সমস্ত ঘটনাবলীর ওপর যবনিকাপাত করিয়া দিয়া ঘরে ঢুকিয়া খিল আঁটিয়া দিলেন।

বেলা মল্লিক অবিলম্বে গিয়া যুবকের বাহিরের ঘরে বসিলেন। অচিনবাবুর যদিও ক্রোধে আপাদমস্তক জ্বলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু তিনি ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং এখন ইহা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করা অনুচিত হইবে ভাবিয়া গম্ভীরভাবে মোটরে উঠিয়া মোটরে স্টার্ট দিলেন। প্রিয়নাথ এবং অপূর্ব্ববাবু বেলার কাণ্ড দেখিয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন। নিঃশব্দ-গতিতে মোটর গলি হইতে বাহির হইয়া গেল।

জনতাও ক্রমশ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

প্রফেসার গুপ্ত খোলা ছাদে বসিয়া কাব্য-আলোচনা করিতেছিলেন। দক্ষিণা বাতাস বহিতেছিল, পাশের তেপায়ার ওর রক্ষিত সুদৃশ্য কাচপাত্রে স্তূপীকৃত বেলফুলগুলি হইতে মৃদু সৌরভ সমীরিত হইতেছিল, সবুজ রেশমের ঘেরাটোপ-দেওয়া ইলেকট্রিক বাতির আলোকে পরিবেষ্টনী শ্যামস্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, একটি আরাম-কেদারায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া আবেশবিহ্বল নয়নে মিষ্টিদিদি বসিয়াছিলেন এবং প্রফেসার গুপ্ত তন্ময়চিত্তে মহাকবি ভাস-বিরচিত 'স্বপ্নাবাসদত্তা' নাটক পাঠ করিতেছেন—

'যদি তাবদয়ং স্বপ্নো ধন্যমপ্রতিবোধনম্।
অথায়ৎ বিভ্রমো বা স্যাদ বিভ্রমো হ্যস্তু মে চিরম্।।'

কাব্যের ছন্দ-মন্ত্রে উভয়েই স্থান কাল বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ইহা যে বিংশ শতাব্দী এবং

তাঁহারা কলিকাতা শহরে আছেন— প্রত্যক্ষভাবে এ চেতনা প্রফেসার গুপ্তের অন্তত ছিল না। অতি-দূর বিগত রূপলোকের আবেষ্টনীতে উদয়ন-বাসবদত্তা-পদ্মাবতীর আনন্দ-শঙ্কা-শিহরনের মধ্যে নিজেকে তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

সহসা স্বপ্নভঙ্গ হইল।

বাহিরের দুয়ারে কে কড়া নাড়িতেছে!

এখানে আবার কে আসিল! এই সব উপদ্রবের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই প্রফেসার গুপ্ত আলাদা এ ছোট বাসাটি ভাড়া করিয়াছেন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আলাদা বাসায় থাকে, প্রফেসার গুপ্ত সকালে সেখানে থাকেন, রাত্রেও সেখানে ফিরিয়া যান অর্থাৎ তাহাদের সহিত সামাজিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ আছে। কলিকাতার নির্জন অংশে এই ছোট বাসাটি তিনি ভাড়া করিয়াছেন— সংসারের কলরব, স্ত্রীর মুখর ভাষণ এবং কৌতূহলী প্রতিবেশীগণের আপ্যায়ন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া অবসরটুকু বিনোদন করিবার জন্য। নিতান্ত অন্তরঙ্গ দুই-চারিজন বান্ধব-বান্ধবী ভিন্ন এ বাসার ঠিকানাই কেহ জানে না। এত রাত্রে কে আসিল?

প্রফেসার গুপ্ত উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

পাশের বাড়িতে নয় তো?

আবার শব্দ হইল।

মিষ্টিদিদি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, এই বাড়িতেই। যান দেখে আসুন, কে এল! আমাকেও এবার পৌঁছে দিয়ে আসুন, রাত অনেক হল। রিনিটা এতদিন ছিল, কোনো ভাবনাই ছিল না।

প্রফেসার গুপ্ত উঠিতে উঠিতে বলিলেন, রিনি কি চলে গেছে?

হ্যাঁ, পরশুদিন ওর স্বামী এসে নিয়ে গেছে ওকে।

লক্ষ্ণৌ?

হ্যাঁ।

প্রফেসার গুপ্ত নামিয়া গেলেন।

কপাট খুলিয়া যাহাকে তিনি দেখিলেন, তাঁহাকে তিনি মোটেই প্রত্যাশা করেন নাই, মিস বেলা মল্লিক অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া গ্রীবাভঙ্গি-সহকারে স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রফেসার গুপ্তের মনে পড়িল, এই নূতন বাসাটার ঠিকানা দিয়া কিছুদিন পূর্বে তিনি বেলাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু বেলা আসে নাই। রাস্তার ওপরে একটা ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া ছিল এবং ট্যাক্সিতে একজন কে যেন বসিয়াছিলেন।

হঠাৎ তুমি এ সময়ে যে?

যখন নেমন্তন্ন করেছিলেন, আসতে পারিনি, আজ বিপদে পড়ে এসেছি। আমাকে এক রাত্রির জন্যে আজ আশ্রয় দিতে পারবেন?

কেন, ব্যাপার কি?

আমি এখনই বাসায় ফিরে দেখলাম, আমার ঘরে তালা ভেঙে কে ঢুকেছিল। আমার চাকরবাকর এখন কেউ নেই, একা ও-বাসায় থাকতে ভয় করছে।

জনার্দন সিং কোথা গেল?

সে দেশে গেছে। আশ্রয় দিতে পারবেন এক রাত্রের মতো?

হ্যাঁ, নিশ্চয়, ভেতরে এস। মিসেস মিত্রও আছেন এখানে।

মিষ্টিদি?

হ্যাঁ।

দাঁড়ান, ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দিই।

ট্যাক্সির নিকট গিয়া সেই যুবকটিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলিয়া দিলেন, যেন সে তাঁহাকে আবার বেলগাছিয়ায় পৌঁছাইয়া দেয়, এজন্য তিনি অগ্রিম ভাড়াও দিয়া দিলেন। ট্যাক্সি চলিয়া গেল। প্রফেসার গুপ্ত ও বেলা উঠিয়া গেলেন।

মিষ্টিদিদি সবিস্ময়ে বলিলেন, এ কি, বেলা নাকি? তারপর, হঠাৎ কি মনে করে?

এমনই এলাম।—তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, আজ থাকব রাত্রে এখানে।

তার মানে?

প্রফেসার গুপ্ত উত্তর দিলেন, ওর বাড়িতে তালা ভেঙে কে যেন ঢুকেছিল আজ, সেই ভয়ে ও পালিয়ে এসেছে, এখানে থাকতে চাইছে রাত্রে।

মিষ্টিদিদির মুখের হাসিটা একটু যেন নিষ্প্রভ হইয়া গেল। তবু জোর করিয়া একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন, কি ভীতু মেয়ে বাবা!

বেলা হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

প্রফেসার গুপ্ত সহসা সবিস্ময়ে বলিলেন, ও কি, তোমার কোমরে ওটা কি?

ছোরা। এখুনি কিনলাম।

কেন?

কাছে একটা থাকা ভালো।

মিষ্টিদিদিও ক্ষণকাল কুচকুচে কালো খাপটার পানে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন এবং পুনরায় আর একটু হাসিয়া পুনরুক্তি করিলেন, কি ভীতু মেয়ে বাবা!

বলা বাহুল্য, প্রফেসার গুপ্ত একটু বিব্রত বোধ করিতেছিলেন। প্রথমত, বেলার এই আকস্মিক আবির্ভাব সত্যই যে আকস্মিক, প্রফেসার গুপ্ত ইহার বিন্দুবিসর্গও যে পূর্বাহ্নে জানিতেন না, তাহা হয়তো মিসেস মিত্র বিশ্বাস করিবেন না। কারণ তাঁহার হাসির অন্তরালে যাহা বিস্ফুরিত হইতেছিল, তাহা আনন্দজনিত অথবা আনন্দজনক নহে। দ্বিতীয়ত, তিনি ভাবিতেছিলেন, বেলাকে লইয়া কোথায় রাখা যায়? এ বাসায় প্রফেসার গুপ্ত থাকেন না, রাত্রে বাড়িতে ফিরিয়া যান, সেখানে বেলাকে লইয়া যাওয়া অসম্ভব। অথচ এখানেও বেলাকে একা ফেলিয়া যাওয়া অসঙ্গত। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনাইয়া উঠিতেছিল। বেলা এবং মিষ্টিদিদি নীরবে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। প্রফেসার গুপ্ত ভাবিতেছিলেন, কি করা যায়!

সহসা মিষ্টিদিদি সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন।

বেলা এখানে কোথা থাকিবে? তার চেয়ে চলুক আমার সঙ্গে, রিনিটা চলে গিয়ে বাড়িটা একদম ফাঁকা হয়ে গেছে।

প্রফেসার গুপ্ত সোৎসাহে সায় দিলেন।

বেশ তো সেই ভালো।

বেলাও নিশ্চিন্ত হইলেন। নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই তাঁহাকে প্রফেসার গুপ্তের শরণাপন্ন

হইতে হইয়াছিল। মিষ্টিদিদির সাহচর্য মনোরম না হইলেও নিরাপদ। একটা রাত্রি কোনোরকমে তাঁহার সহিত কাটাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। বেশ তো, তাই চলুন।

সকলে নীচে নামিয়া আসিলেন।

।। চব্বিশ ।।

শঙ্করের পক্ষে মিসেস স্যানিয়ালের বাসায় থাকা শ্বাসরোধকর হইয়া উঠিয়াছিল। মিসেস স্যানিয়্যালের পুত্র দুইটির অত্যাচার আর সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তাহারা শঙ্করের অজ্ঞতার কিছু-না-কিছু নিদর্শন প্রায় প্রত্যহই গোপনে মাতৃসমীপে উপস্থিত করিত। কর্তব্যপরায়ণা মিসেস স্যানিয়াল তাহা লইয়া শঙ্করকে সোজাসুজি কিছু বলা যদিও অকর্তব্য মনে করিতেন, কিন্তু বাঁকাপথে শঙ্করকে সচেতন করিয়া দিতে ইতস্তত করিতেন না। যেমন আজ সকালে বলিতেছিলেন, দেখুন শঙ্করবাবু, অনিলটার সব বিষয়ে জানবার এমন আগ্রহ! আমাকে কাল থেকে ও বিরক্ত করে মারছে পেঙ্গুইন পাখিদের বিষয় জানবার জন্যে। আপনাকে হয়তো ভয়ে বলতে পারেনি, আপনি তো ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে যান, পেঙ্গুইন পাখিদের বিষয় দয়া করে দেখে আসবেন তো একটু, আপনারও হয়তো সব জানা নেই ও-সম্বন্ধে। আসল ঘটনা কিন্তু অন্যরূপ। ভয়ে ভয়ে শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই, এইরূপ ভীতু প্রকৃতির বালক অনিলচন্দ্র নয়। সে শঙ্করকে পেঙ্গুইনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছে এবং শঙ্কর অজ্ঞতা প্রকাশ করায় মুখ টিপিয়া হাসিয়াছে। কারণ, নিজের জ্ঞানবুদ্ধি-মানসে তো সে শঙ্করকে প্রশ্ন করে নাই, সে শঙ্করের বিদ্যার দৌড় কত দূর তাহাই নিরূপণ করিবার জন্য প্রশ্নটা করিয়াছিল এবং এজন্য একজন সহপাঠীর বাড়ির একটা মাসিক-পত্রে পেঙ্গুইন বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নিজে পূর্ব হইতেই এ বিষয়ে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল হইয়া বসিয়াছিল। শঙ্করকে বিব্রত করাই তাহার উদ্দেশ্য। শঙ্কর মিসেস স্যানিয়ালকে মৃদু হাসিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে, সে যত শীঘ্র সম্ভব পেঙ্গুইন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া অনিলের জ্ঞান-পিপাসা নিবারিত করিয়া দিবে। অনিল সম্বন্ধে সত্য সত্যই তাহার যাহা মনে হইতেছিল, তাহা সে মিসেস স্যানিয়ালকে বলে নাই। অকস্মাৎ সহায়-সঙ্গতি-বিহীন হইয়া ক্রমশ সে এই সত্যটি উপলব্ধি করিতেছিল যে, জটিল সংসার-পথে স্বচ্ছন্দে চলিতে হইলে সব সময় মুখের কথার এবং মনের সামঞ্জস্য রক্ষা সম্ভবপর নহে। অনুগৃহীত ব্যক্তির মুখের রূঢ় সত্যভাষণ কেহই শুনিতে চাহে না। প্রফেসার গুপ্ত তাহাকে যে টিউশনিটি জুটাইয়া দিয়াছিলেন একটু মানাইয়া চলিলে তাহা থাকিত এবং তাহাকে এমন দুর্দশায় পড়িতে হইত না। স্পষ্টভাষণের তীক্ষ্ণতা কমাইয়া না আনিলে যে উপায় নাই, তাহা সে বুঝিয়াছিল বলিয়াই মিসেস স্যানিয়ালকে বলিতে পারিল না, আপনার পুত্র দুইটি ডেঁপো হইয়া উঠিয়াছে এবং এই ডেঁপোমির প্রশ্রয় দিলে উহারা উচ্ছন্ন যাইবে। মিসেস স্যানিয়ালের পুত্রদ্বয়কে আদর্শ মানবে পরিণত করিবার দায়িত্ব তাহার নহে। তাহার কর্তব্য সর্বাগ্রে আত্ম-প্রতিষ্ঠ হওয়া। যেমন করিয়া হউক নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে। যতদিন তাহা না পারিতেছে ততদিন একটা অন্তঃসারশূন্য আত্মসম্মানকে উগ্রভাবে আস্ফালিত করিয়া লাভ নাই। যতদিন একটা কিছু না জুটিতেছে, ততদিন পেটভাতায় থাকিয়াও

অখিল-অনিলের দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হইবে। শঙ্কর ভাবিয়া পাইত না অখিল-অনিল তাহাকে ক্রমাগত এমন জ্বালাতন করে কেন? শঙ্কর না জানিলেও একটা কারণ ছিল। শঙ্কর আসিবার পূর্বে চুনচুন ইহাদের নিকট বড়াই করিয়া বলিয়াছিল, শঙ্কর খুব বিদ্বান, নানা বিষয়ে তাহার প্রচুর জ্ঞান। শঙ্করের বিদ্যাবত্তাকে পদে পদে বিমলিন করিয়া দিয়া তাহারা চুনচুনের উক্তি যে মিথ্যা, মিসেস স্যানিয়ালের নিকট তাহাই প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইত। মিসেস স্যানিয়ালের কর্তব্যনিষ্ঠা অত্যন্ত প্রবল বলিয়াই সম্ভবত তিনি শঙ্করকে বিদায় করিয়া দেন নাই। শঙ্কর যে প্রতিদিন দুই বেলা অখিল-অনিলের পাঠ্যবিষয়গুলি অতিশয় পরিশ্রমসহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দেয়—সে সম্বন্ধে কোনোরূপ উল্লেখ না করিয়া তিনি প্রায় প্রত্যহই বিপত্নীক দেবর পীতাম্বরবাবুকে বলিয়া থাকেন, যদিও আমার অখিল-অনিলকে পড়াবার মতো বিদ্যা শঙ্করবাবুর নেই, তবু ছেলেটিকে রেখেছি বাড়িতে, ভদ্রলোকের ছেলে, বিপদে পড়েছে, হাজার হোক—। কাঁচাপাকা-গোঁফ-দাড়ি-ভ্রূ-সমন্বিত পীতাম্বরবাবু চোখে মুখে এমন একটা ভাব ফুটাইয়া তোলেন, যাহার অর্থ— এই তো আপনার মতো মহীয়সী মহিলার উপযুক্ত কথা। শঙ্কর-সম্পর্কীয় আলোচনা অবশ্য বেশিক্ষণ চলিত না। কারণ পীতাম্বর আসিলেই মিসেস স্যানিয়াল কোনো না কোনো ছুতায় চুনচুনকে আহ্বান করিতেন এবং তাহাকে পীতাম্বরবাবুর দৃষ্টির সম্মুখবর্তী করিয়া দিতেন। এই ঈষন্নির্বোধ প্রৌঢ় বিপত্নীক দেবরটির স্কন্ধে চুনচুনকে চাপাইয়া দিবার সুবুদ্ধি সম্ভবত কর্তব্যপরায়ণতার জন্যই তাঁহার মস্তিষ্কে কিছুদিন হইতে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। চুনচুন আবার কখন কি করিয়া বসে, সে সম্বন্ধে তাঁহার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। পিতাম্বরবাবু শুধু বিপত্নীক নহেন, অপুত্রক এবং শাঁশালো। চুনচুনের সহিত ইঁহাকে বিবাহ-বন্ধনে বাঁধিতে পারিলে সব দিক দিয়াই সুখের হইবে—ইহাই কর্তব্যপরায়ণা মিসেস স্যানিয়ালের বিশ্বাস, এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তিনি চলিতেছিলেন। বিধবা-বিবাহ তো আজকাল অনেকেই করিতেছে, ইহারাই বা করিবে না কেন? চুনচুন যদিও কিছু বলে নাই, তবু শঙ্কর দুই-চারি দিনের মধ্যেই ব্যাপারটা বুঝিয়াছিল। কিন্তু শুধু বুঝিয়া কি করিবে? চুনচুনকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার কোনো সঙ্গতিই এখন তাহার নাই। নিজের সামর্থ্য থাকিলে চুনচুনকে হয়তো সাহায্য করিতে পারিত, কিন্তু এখন সে নিজেই নিরুপায়। চুনচুনের এই আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা শঙ্করকে আরও যেন উদ্যোগী করিয়া তুলিয়াছে। যত শীঘ্র সম্ভব, একটা চাকুরি তাহাকে জোগাড় করিয়া ফেলিতেই হইবে।

অখিল-অনিলকে পড়াইয়া রাত্রি প্রায় নয়টার পর শঙ্কর বাহির হইয়া পড়িল। প্রকাশবাবুর সহিত দেখা করিয়া আজই সে ঠিক করিয়া ফেলিবে যে, ওই প্রুফ-রীডারের চাকুরিটা তাহার হইবে কি না। প্রুফ সংশোধন করা বিদ্যেটা সে তো ভালোরূপেই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। আজকাল দুপুরবেলাটা সে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে কাটায়। সাহিত্য বিশেষত সাহিত্য-সমালোচনার বইগুলি তাহার বড় ভালো লাগে। আমাদের দেশে সাহিত্য বলিয়া যাহা চলিতেছে, তাহা যে কতদূর অসাহিত্য, ক্রমশ তাহা সে বুঝিতে পারিতেছে। বিদেশি সাহিত্যের নকলে মৌলিকতা জাহির করিতে গিয়া যেসব অসুন্দর রচনা ছদ্মবেশে আসর জমাইতেছে তাহাদের ব্যঙ্গ করিয়া সে কয়েকটা কবিতাও লিখিয়া ফেলিয়াছে।

প্রকাশবাবুর বাড়ির কাছে আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিতে গিয়া শঙ্কর সহসা থামিয়া গেল।

ঠিক বাহিরের ঘরে প্রকাশবাবু এবং আরও কে একজন বসিয়া তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। উৎকর্ণ হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

কই মশাই, প্রুফ-রিডার সেই যে ছেলেটির কথা আপনি বলেছিলেন, তাকে আনলেন না তো?

বক্তা সম্ভবত প্রেসের মালিক।

প্রকাশবাবু একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন, তাকে হাতে রেখেছি, একটু অপেক্ষা করুন না মশাই দুদিন।

কেন?

আরে মশাই, ও হল গিয়ে (ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে) পরের ছেলে। একটি নিজেদের ছোকরা যদি পাই, তা হলে আর ওকে ডাকি কেন, বুঝলেন না? আমাদের মাইতি মশায়ের একটি ভাইপো দেশ থেকে নাকি আসবে শিগ্‌গির শুনেছি, সে যদি আসে, তাহলে আর—। শঙ্কর আর দ্বারে করাঘাত করিল না, দাঁড়াইলও না, বিপরীত মুখে সোজা হনহন করিয়া চলিতে লাগিল।—নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে খানিকক্ষণ অনির্দিষ্টভাবে হাঁটিবার পর শঙ্করের খেয়াল হইল, এইবার বাড়ি ফেরা দরকার, রাত হইয়াছে। পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য একটা গলিতে ঢুকিবামাত্রই একটি দ্রুতগামী সাইকেলের সহিত ধাক্কা খাইয়া সে পড়িয়া যাইবার মতো হইল। সাইকেল-আরোহী নামিয়া পড়িল।

এ কি, চাম গ্যান্‌ঢঅ যে!

ভণ্টু!

কোথাও লাগেনি তো।

না।

এত জোরে বেল দিচ্ছিলাম, তুই শুনতে পাসনি? থিঙ্কিং আপিস খুলতে খুলতে আসছিলি বুঝি? একদিন ডাইং আপিস খুলবি দেখছি। অনেকদিন তোর খবর-টবর পাই না— ব্যাপার কি বল তো, কোথা যাচ্ছিস?

বাসায়।

বাসা আবার কোথায়?

গড়পার।

যদিও ভণ্টু সব জানিত, তবু জিজ্ঞাসা করিল, হস্টেলে থাকিস না আজকাল?

না।

চল্, আমাদের বাড়ি চল্। বিড়ভিকার আজ ফৈশিয় অ্যাফেয়ারে ঢুকেছে, এতদিন পরে তোকে দেখলে খুশি হবে। কাল রবিবার, আমার ছুটি আছে, হোল নাইট প্রোগ্রামে ঢুকি চল্, আজ তোর সমস্ত হদিস ইন ডিটেল আয়ত্ত করব।

শঙ্কর দোটানায় পড়িয়া গেল। দুঃখের দিনে পুরাতন বন্ধু ভণ্টুকে দেখিয়া ভালোও লাগিতেছিল, অথচ তাহার সহিত যাইতেও কেমন যেন ইচ্ছা করিতেছিল না, কেমন যেন সঙ্কোচ হইতেছিল। যে ভণ্টুকে সে এতকাল অনুকম্পার চক্ষে দেখিয়াছে, তাহাকে সে নিজের সব কথা খুলিয়া বলিবে কি করিয়া? কোনো একটা অজুহাতে বিদায় করিয়া দিতে পারিলে বাঁচিত কিন্তু ভণ্টু কিছুতেই ছাড়িল না।

শঙ্কর তখন বলিল, তা হলে বাসায় একটা খবর দিয়ে যেতে হয়, তা না হলে ওরা ভাববে।

বেশ তাই চল।

শঙ্কর যখন ভণ্টুর বাসায় পৌঁছিল, তখন প্রায় রাত এগারোটা। ভণ্টুর বউদিদি রান্নাবাড়া শেষ করিয়া ভণ্টুর অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন। ভণ্টুর সহিত শঙ্করকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন।

ওমা, এতদিন পরে পথ ভুলে না কি?

শঙ্কর একটু হাসিল।

ভণ্টু বলিল, ও একটা চোর, চেন না ওকে।

এস, বস।

বউদিদি তাড়াতাড়ি একটা মাদুর আনিয়া পাতিয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন, খাওয়াদাওয়া সেরে এসেছ নাকি?

ভণ্টু পুনরায় উত্তর দিল, ভুলে যাও সেসব কথা, মুচ্ছি মূলে খাবে ও এখন।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, শুনলাম আপনি মাছ-টাছ অনেক রকম রান্না করেছেন, সেই লোভে এলাম।

বেশ তো।

ভণ্টু বাইকটা উঠানে রাখিবার জন্য সেটাকে ঠেলিয়া বাহিরে লইয়া গেল।

শঙ্কর বউদিদিকে বলিল, আমি খবর-টবর না দিয়ে অসময়ে এলাম, কম পড়ে যাবে না তো?

একমুখ হাসিয়া বউদিদি উত্তর দিলেন, যা আছে তিন জনে ভাগ করে খাব।

ঘরের ভিতর হইতে দরাজ গলায় বাকু হাঁক দিলেন, ও বউমা, ভণ্টু ফিরল? চারিদিকে যা দাঙ্গা হচ্ছে!

বউদিদি ঘরের ভিতর গেলেন।

ভণ্টু ফিরেছে, বাঁচা গেল! ও, তাই নাকি? শঙ্করও এসেছে, ভালো ভালো। কিন্তু চারিদিকে ভীষণ দাঙ্গা, সব লোক ক্ষেপে উঠেছে, শঙ্করকে আজ আর যেতে দিও না এত রাত্রে, এইখানেই খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে থাক্। 'বঙ্গবাসী' যা লিখছে— ভীষণ কাণ্ড।

বউদিদি হাস্য-স্নিগ্ধ মুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

ভণ্টু বাইক রাখিয়া ফিরিয়া আসিল এবং বউদিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, লর্ড বাক্‌ল্যান্ড কি বলছেন?

উনি আজ সন্ধে থেকে নিজের আলোটি জ্বেলে খবরের কাগজ পড়ছেন। কাগজে বেরিয়েছে হিন্দু-মুসলমানে নাকি দাঙ্গা শুরু হয়েছে, তুমি এতক্ষণ ফিরছিলে না, খুব ভাবছিলেন উনি।

শঙ্কর সবিস্ময়ে বলিল, দাঙ্গা তো বড়বাজার অঞ্চলে গত সপ্তাহে হয়েছিল, এখন তো আর কিছু নেই।

ভণ্টু বলিল, লর্ড বাক্‌ল্যান্ডের কাণ্ডকারখানাই আলাদা, তুই তার কি বুঝবি?

বউদিদি মুখ টিপিয়া বলিলেন, বাবা যে সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পড়েন, ওঁর কাছে খবরটা

আজ এসে পৌঁছেছে। উনি কানে তো একদম কিছু শোনেন না, 'বঙ্গবাসী' পড়েই বাইরের খবর যা কিছু পান।

ভণ্টু জিজ্ঞাসা করিল, নতুন আলোটা বাকুর পছন্দ হয়েছে?

খুব। কাউকে হাত দিতে দেন না, আমি সন্তর্পণে খালি তেলটি ভরে দিই। উনি নিজের হাতে চিমনি ডোম পরিষ্কার করেন। এ তুমি এক আপদ জুটিয়েছ বাপু।

কেন?

ছাইয়ের গুঁড়ো, ফরসা ন্যাকড়া, কাঁচি—ওঁর বাতি জ্বালার তরিবৎ করতে করতে সমস্ত বিকেলটা যায় আমার।

ভণ্টু শরীরের উপরার্ধ্ব নাচাইতে নাচাইতে বলিল, বা কুর কুর কুর কুর কুর কুর—

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, বউয়ের কাছে ও-রকম ঢঙ করলে বউ কাছেও ঘেঁষবে না বলে দিচ্ছি। শঙ্কর-ঠাকুরপোকে বলেছ সব কথা?

শঙ্কর বলিল, শুনেছি।

একমুখ হাসিয়া বউদিদি বলিলেন, আপিসের বড়বাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে, অনেক দেবে-থোবে।

ভণ্টু বাকুর ঘরের জানালায় উঁকি দিয়া দেখিতেছিল। শঙ্করকে বলিল, দেখ্ দেখ্, লর্ড ব্যাক্‌ল্যান্ডকে দেখবি আয়।

শঙ্করও উঠিয়া উঁকি দিয়া দেখিল, ধপধপে ফরসা বিছানায় বসিয়া পরিষ্কার-ওয়াড়-দেওয়া এবং দামি তোয়ালে-আবৃত তাকিয়ার ওপর ঠেস দিয়া বাকু 'বঙ্গবাসী' পাঠ করিতেছেন। পাশে টুলের ওপর প্রকাণ্ড গড়গড়া, রূপালী-জরি লাগানো জমকালো নল, মাথার দিকে টেবিলে শুভ্র-ডোম-সমন্বিত সুদৃশ্য টেবিল-ল্যাম্প। চশমার পুরু লেন্স হইতে আলোক বিচ্ছুরিত হইতেছে। শ্মশ্রু গুম্ফ-বিহীন ধপধপে ফরসা মুখমণ্ডলে একটা গম্ভীর ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, ঠিক যেন হাইকোর্টে চিফ জাস্টিস বসিয়া রহিয়াছেন।

বউদিদি দুইখানি আসন পাতিয়া গ্লাসে জল গড়াইতে গড়াইতে বলিলেন, আর রাত করো না, বস তোমরা।

উভয়ে আসিয়া উপবেশন করিল।

ভণ্টু বলিল, দাদা বোধহয় আজ স্টার্ট করবেন বউদি।

বউদিদি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, তাই তো লিখেছিলেন।

শঙ্কর খবরটা শোনে নাই, বলিল, দাদা ফিরে আসছেন নাকি?

বউদিদি নিজের আনন্দ আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, শরীর বেশ সেরে গেছে, জ্বর-টর আর হয় না।

জলের গ্লাস দুইটি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া বউদিদি ভাত বাড়িবার জন্য রান্নাঘর অভিমুখে যাইতেছিলেন।

ভণ্টু বলিল, বউদি, শোন, মাছের মুড়োটা এই ছোকরাকে দিও। অত্যন্ত সৎকার্য করছেন ইনি আজকাল; বিয়ে করে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে চাকরির চেষ্টায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, গ্রেট সোল!

বিবাহের কথায় বউদিদি শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

ভণ্টু শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, অমন গোমড়া-গোছের মুখ করে কেন বসে আছিস রে রাস্কেল! ভরপেট খেয়ে আজ ঘুমো, কাল জাল্‌ফিদারিক ব্যাপারে ঢুকব, দেখি কি করতে পারি!

জাল্‌ফিদারিক মানে?

জুলফিদার শব্দের উত্তর ষ্ণিক প্রত্যয় করলে জালফিদারিক হয় না?

তাতে কি?

আমাদের আপিসের বড়বাবুকে দেখিসনি কখনও?

না।

হি ইজ জুল্‌ফিদার দি গ্রেট—মাই প্রসপেক্‌টিভ ফাদার-ইন-ল। কাল তাকে খজলে দেখব, তোর জন্যে যদি কিছু করতে পারি। আজ ভরপেট খেয়ে বাফেলোয়িং কর।

বাফেলোয়িং শব্দটাও শঙ্কর বুঝিতে পারিল না এবং তাহা লক্ষ্য করিয়া ভণ্টু বলিল, মোষের মতো ঘুমো।

বউদিদি দুই হাতে দুইটি থালা লইয়া প্রবেশ করিলেন এবং উভয়ের সম্মুখে তাহা রাখিয়া বলিলেন, খাও. নেবু কেটে রেখেছি, নিয়ে আসছি।

ভণ্টু বলিল, সেটি হচ্ছে না। তোমার যা কিছু আছে—পাই পয়সা সমস্ত নিয়ে এস, আর একখানা থালাও নিয়ে এস, যা আছে তিনজনে সমান ভাগ করে খাব। আমরা ইডিয়েটের মতো গোগ্রাসে গিলে খাব আর তুমি উপোস করে গ্রেটনেসের লদ্‌কালদ্‌কি করবে, সেটি হচ্ছে না।

বস না তোমরা, বসছি আমিও!

আমাদের সামনে বসতে হবে, তোমাকে চিনি না আমি— থিফ কোথাকার!

বাবা বাবা, বড় জ্বালাতন কর তুমি ঠাকুরপো।

শঙ্কর বলিল, ভাগ করে খাওয়ারই তো কথা হয়েছিল।

অগত্যা বউদিদি আর একটি থালা আনিতে গেলেন।

॥ পঁচিশ ॥

পরদিন সকালে শঙ্কর বাসায় ফিরিয়াই শুনিল যে, মুকুজ্জেমশাই কাল রাত্রে তাহার চলিয়া যাইবার পর আসিয়াছিলেন এবং শঙ্করকে অবিলম্বে তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিয়া গিয়াছেন। ঠিকানাও দিয়া গিয়াছেন। ঠিকানাটা সারপেন্‌টাইন লেনের। মুকুজ্জেমশাই বাসা পরিবর্তন করিয়াছেন, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের বাসায় আর তিনি থাকেন না। সংবাদটা শুনিয়াই শঙ্কর বাহির হইয়া যাইতেছিল, এমন সময় মিসেস স্যানিয়াল বলিলেন, আপনি এখন আবার বেরুচ্ছেন নাকি কোথাও?

হ্যাঁ।

অখিল ডিনামিক্‌সের কি যেন একটা বুঝতে পারছে না। কাল রাত্রে আপনি চলে যাবার পর

থেকেই অস্থির হয়ে উঠেছে ও। ভেবেছিল, আপনি ফিরলে সকালেই বুঝিয়ে দেবেন। কাল তো আপনি সারারাত বাইরে রইলেন, আজ আবার এসেই বেরিয়ে যাচ্ছেন। ওরে অখিল!

অখিল পাশের ঘরে বসিয়া ক্যারাম খেলিতেছিল। শঙ্করের মেজাজটা ভালো ছিল না, তথাপি যথাসম্ভব আত্মসম্বরণ করিয়া উত্তর দিল, এখন আমাকে যেতেই হবে, আমি ফিরে এসে বুঝিয়ে দেব।

মিসেস স্যানিয়ালের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া শঙ্কর বাহির হইয়া গেল। মিসেস স্যানিয়াল শঙ্করের গমন-পথের দিকে চাহিয়া খানিকক্ষণ গুম হইয়া রহিলেন এবং তাহার পর চুনচুনকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলেন, ক্রমশ গুণ বেরুচ্ছে ভদ্রলোকের। শুধু শুধু কি আর ভগবান কাউকে বিপদে ফেলেন! তা ফেলেন না। কি ছেলে, কি মেয়ে—আজকাল কারও কর্তব্যবোধ নেই, সেইজন্যই এত দুঃখ তাদের। চুনচুন ঘরের টেবিলটা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতেছিল, নীরবে তাহাই করিতে লাগিল। মিসেস স্যানিয়াল তাহার দিকে একটা রুষ্ট দৃষ্টি হানিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্কর দ্রুত পথ অতিবাহন করিতেছিল। মনটা ভালো ছিল না। সারা মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি। ভণ্টু, ভণ্টুর বউদিদি কাল তাহাকে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছে, ভণ্টু তাহাকে আশ্বাসও দিয়াছে যে, যেমন করিয়া হউক সে তাহার হবু-শ্বশুরকে ধরিয়া তাহাকে তাহাদেরই আপিসে একটা চাকরি জোগাড় করিয়া দিবে। তাহাদের আপিসে শীঘ্রই একজন নাকি লোক বাহাল করা হইবে, বেতন পঁচাত্তর টাকা হইতে শুরু—দেড়শোর গ্রেড। ভণ্টু বলিয়াছে, এখন এইটাতেই ঢোক্, তারপর জুল্‌ফিদারকে চুমরে লিফ্‌ট করিয়ে দেব তোর। একবার সুড়ঙ্গ কেটে ঢোক তো। এই দেখ্ না, আমার আড়াইশোর গ্রেডে লিফ্‌ট হয়ে গেছে। চাকরির এমন একটা আশু এবং সুনিশ্চিত-প্রায় সম্ভাবনা সত্ত্বেও কিন্তু শঙ্করের চিত্ত আনন্দিত হইয়া উঠে নাই। মনের ভিতরটা কেমন যেন করকর করিতেছিল। যে ভণ্টু বিদ্যায় বুদ্ধিতে সব বিষয়ে তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল, সেই তাহাকে ডিঙাইয়া ওপরে উঠিয়া গেল! ধনীর একমাত্র কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইতেছে, আড়াই শত টাকার বেতনে উন্নীত হইয়াছে, ইতিমধ্যে কিছু লাইফ ইন্‌সিওর করিয়াছে এবং শীঘ্র আরও করিবে। অথচ সে আত্মীয় পরিজন বিচ্যুত হইয়া অত্যন্ত ঝুঁটা একটা আদর্শের পতাকা স্কন্ধে করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এ আদর্শের মূল্য কি? তা ছাড়া সত্যই কি আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সে অমিয়াকে বিবাহ করিয়াছিল? সে অমিয়াকে বিবাহ করিয়াছিল ঝোঁকের মাথায়—ঝোঁকের মাথায় নিজের ক্ষুধিত বাসনা-বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইবার জন্য। সে উদ্দেশ্যও সফল হয় নাই। ওই অতি সরল হাবা-গোবা অমিয়া ইন্ধনের যোগ্যতাও লাভ করিতে পারে নাই। বাসনা-বহ্নিকে উদ্দীপ্ত করিবার মতো ক্ষমতা ওই ঘোমটা-দেওয়া জড়ভরত প্রকৃতির অমিয়ার মধ্যে নাই। শঙ্করের বারম্বার মনে হইতে লাগিল, সে ঠকিয়া গিয়াছে—ভয়ঙ্কর ঠকিয়া গিয়াছে। কিন্তু আর উপায় নাই, এই ভুলটাকে লইয়াই সারা জীবন চলিতে হইবে। ঈর্ষার ক্ষুদ্র কীটটা অন্তরের অন্তস্তলে বসিয়া দংশন করিতেছিল, নিজের দুরবস্থায় এবং ভণ্টুর স্বচ্ছলতায় সমস্ত অন্তঃকরণ কেমন যেন বিষাইয়া উঠিয়াছিল, মনে এতটুকু স্বস্তি নাই।

খানিকক্ষণ হাঁটিবার পর অনেক খুঁজিয়া সে অবশেষে সার্‌পেনটাইন লেনে মুকুজ্জেমশাইয়ের নতুন বাসায় আসিয়া পৌঁছিল। একটি ছোট দ্বিতল বাসা। নীচের বসিবার ঘরটি খোলাই ছিল। শঙ্কর প্রবেশ করিয়া দেখিল, মুকুজ্জেমশাই নাই, আর একজন প্রৌঢ়-গোছের ভদ্রলোক বসিয়া রহিয়াছেন।

মুকুজ্জেমশাই কোথায়?

তিনি একটু বেরিয়েছেন, আপনার নামই কি শঙ্করবাবু?

হ্যাঁ।

বসুন, আপনাকে বসতে বলে গেছেন তিনি, এখনই আসবেন।

শঙ্কর নিকটের বেঞ্চিতে উপবেশন করিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি শঙ্করের মুখের দিকে সস্মিত ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, আপনার মুখটাও চেনা-চেনা ঠেকছে।

ভণ্টু থাকিলে আস্‌মি-দার্জির পিতা নিবারণবাবুকে অবিলম্বে চিনিতে পারিত। শঙ্কর মাত্র একদিন ভণ্টুর সহিত নিবারণবাবুর দোকানে চা পান করিতে গিয়াছিল; সুতরাং নিবারণবাবুকে ঠিক কোথায় দেখিয়াছে মনে করিতে পারিল না। এই ছোট দ্বিতল বাড়িখানি নিবারণবাবুরই, মুকুজ্জেমশাই ভাড়া লইয়াছেন। নিবারণবাবু যে বাড়িতে থাকেন, সে বাড়িটিও পাশেই। শুধু ভাড়াটে হিসেবেই নয়, মুকুজ্জেমশাই লোকটি পরোপকারপ্রবণ এবং নানা স্থানে তাঁহার অনেক জানা-শোনা লোক আছে শুনিয়া নিবারণবাবু তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন। আস্‌মির কোনো সন্ধানই এখনও মেলে নাই। পুলিশে সংবাদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু পুলিশ কিছু করিতে পারিতেছে না। নিবারণবাবু মনে মনে ঠিক করিয়াছেন, মুকুজ্জেমশাইকে সব কথা বলিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিবেন।

আপনি বসুন শঙ্করবাবু, আমি উঠি। আপনাকে আটকাবার জন্যেই মুকুজ্জেমশাই আমাকে বসিয়ে রেখে গেলেন। মৃন্ময়বাবুর সঙ্গে তিনি এই একটু বেরিয়েছেন, এখনই এসে পড়বেন।

মৃন্ময়বাবু এখানে আছেন নাকি?

হ্যাঁ, তাঁর স্ত্রীও এসেছেন, ওপরে আছেন। আচ্ছা, বসুন তা হলে, আমাকে দোকানে বেরুতে হবে।

নিবারণবাবু চলিয়া গেলেন। মৃন্ময়ের স্ত্রীর কথায় বহুদিন আগেকার একটা ছবি শঙ্করের মনে জাগিয়া উঠিল। মৃন্ময় মোটর চাপা পড়িয়া হাসপাতালে ছিল এবং তাহার স্ত্রীকে রাত্রে সেখানে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। রোরুদ্যমানা হাসির মুখখানা মনে পড়িল। সহসা রিনির মুখখানাও মনে পড়িয়া গেল। লক্ষ্ণৌয়ে একজন ডাক্তারের সঙ্গে রিনির বিবাহ হইয়াছে। শঙ্করকে কি তাহার এখনও মনে আছে? শঙ্করকে কি সে ক্ষমা করিতে পারিয়াছে? বহুদিন পরে রিনির স্মৃতিকে ঘিরিয়া তাহার কল্পনা স্বপ্নলোক সৃজন করিতে লাগিল।

শঙ্কর এসে পড়েছ দেখছি!

অন্যমনস্ক শঙ্কর সচকিত হইয়া দেখিল, মুকুজ্জেমশাই আসিয়াছেন, সঙ্গে মৃন্ময়। মুকুজ্জেমশাই কিন্তু বসিলেন না, বলিলেন, তুমি এইখানেই খেয়ে যেও, অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। পালিও না যেন। আমি সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট থেকে আসছি এখনই ঘুরে।

ও বাসায় কে আছে?

ও বাসায় একটি রুগী আছে। আমারই চেনা-শোনা একজন, রাজমহল থেকে এসেছে; যে দাইটা রাত্রে থাকত সেখানে, সে দুদিন থেকে আসছে না। তার একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে আসছি আমি এখনই। তুমি যেও না, বম্বে থেকে চিঠি এসেছে, হয়তো হয়েও যেতে পারে কাজটা। ঠিক বুঝতে পারছি না, কেন তারা তোমার ফোটো চেয়েছে একখানা। আমি একজন ফোটোগ্রাফারকে বলে এলাম, সে বিকেলের দিকে আসবে।—মৃন্ময়, ও মৃন্ময়, তুমি এসে শঙ্করের সঙ্গে গল্প-সল্প কর ততক্ষণ।

শঙ্করও মৃন্ময়ের দিকে পিছন ফিরিয়া মুকুজ্জেমশাইয়ের সহিত কথা কহিতেছিল, কখন সে উপরে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা সে টের পায় নাই।

আপনি যান, আমি বসছি।

মুকুজ্জেমশাই চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর পুনরায় বেঞ্চিটিতে উপবেশন করিল এবং বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, ফোটো চাহিয়াছে কেন? ফোটো লইয়া তাহারা কি করিবে? সম্ভব-অসম্ভব নানা কল্পনা মনে জাগিতে লাগিল। মনে হইল, যিনি মাসিক-পত্রিকার স্বত্বাধিকারী, হয়তো তিনি একটি কন্যারত্নেরও স্বত্বাধিকারী। পছন্দসই একটি সহকারী সম্পাদক পাইলে তাহাকে জামাইপদেও বরণ করিবেন। এবার ফোটো চাহিয়াছেন। ফোটো পছন্দ হইলে বোধ হয় কোষ্ঠী চাহিয়া পাঠাইবেন। মনে মনে শঙ্কর এক ব্যক্তিকে জামাই সহকারী সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত করিয়া কল্পনার রঙ চড়াইতে লাগিল। মেয়েটি হয়তো লাবণ্যময়ী পুষ্পিত যৌবনা তন্বী, তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রতি মাসে হয়তো একটি করিয়া কবিতা লিখিতে হইবে, হয়তো কবিতা তাহার পছন্দ হইবে না, হয়তো সেই বিম্বাধরোষ্ঠীকে বিগলিত করিবার সাধনায় নব নব ছন্দ উপমার অনুসন্ধানে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে হইবে। হয়তো—

সহসা উন্মুক্ত দ্বারপথ দিয়া একটা উচ্চ নারী-কণ্ঠস্বর তাহার কল্পনার জালকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল।

জানি গো জানি, সব জানি—আমার কাছে আর অত ভালোবাসা ফলাতে হবে না; তোমার স্বর্ণলতার কাছে ওসব সোহাগ জানাওগে যাও, তোমাকে বুঝতে আর বাকি নেই আমার।

স্বর্ণলতা! চকিতের মধ্যে শঙ্করের মনে বহুকাল পূর্বের আর একটি রাত্রির কথা মনে পড়িল। স্বর্ণলতার নামাঙ্কিত সেই চিঠিখানি এখনও তাহার কাছে আছে। সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল এবং ক্ষণপরেই মৃন্ময় আসিয়া প্রবেশ করিল। শঙ্কর লক্ষ্য করিল, তাহার চক্ষু দুইটি হইতে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক জ্যোতি স্ফুরিত হইতেছে!

আমার একটু দেরি হয়ে গেল। মৃন্ময় হাসিয়া বলিল।

তা হলই বা। আমি বেশ তো বসেই আছি।

একটু ইতস্তত করিয়া মৃন্ময় বলিল, আমার সব কথা শুনেছেন আপনি?

না, কিছুই শুনিনি।

শোনবার কথা অবশ্য নয়, কারণ কাউকেই আমি জানাইনি, এমন কি ভণ্টুকে পর্যন্ত নয়। মুকুজ্জেমশাই অবশ্য জানেন সব কথা, কিন্তু তাঁকেও হাসি, মানে -- আমার স্ত্রী বলেছে, আমি বলিনি।

তাহার পর জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, নিজের দুর্ভাগ্যের কথা পাঁচজনকে বলে বেড়িয়ে লাভ কি বলুন?

মিনিটখানেক অস্বস্তিকর একটা নীরবতার পর শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারটা কি?

আমার একটা ছোট ভাই ছিল, চিনতেন তাকে আপনি? আপনাদের কলেজেই পড়ত।

কি নাম বলুন তো?

চিন্ময়।

শঙ্কর মনে করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মনে পড়িল না। তথাপি বলিল, মনে হচ্ছে যেন নামটা শোনা।

আমার সেই ভাই বোমার দলে যোগ দিয়ে হাতে-নাতে ধরা পড়ে জেলে আছে এখন। আর সেই জন্যেই আমার চাকরিটি গেছে! আমি পুলিশের আই. বি.-তে চাকরি করতাম। যার নিজের ভাই রেভলিউশারি, তাকে আই. বি.-তে রাখবে কেন? মৃন্ময় সহসা চুপ করিয়া গিয়া আবার বলিল, দুঃখ তাও নয়, আসল দুঃখ—। পুনরায় থামিয়া গেল, আবার তাহার চক্ষু দুইটিতে একটা অস্বাভাবিক জ্বালা ফুটিয়া উঠিল। কয়েক সেকেন্ড পরে হঠাৎ আবার জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, আসল দুঃখ, I am a fallen man—আমার পতন হয়েছে, সমস্ত গোলমাল হয়ে গেছে। I have bungled my whole life— লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেছি!

শঙ্কর অবাক হইয়া শুনিতেছিল, মৃন্ময় সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল।

এক মিনিট বসুন, আমি বলে আসি— আপনি খাবেন আজ দুপুরে। আসল কথাটা বলতে ভুলে গেছি।

শঙ্করকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়া মৃন্ময় ঘর হইতে বাহির হইয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিয়া গেল।

।। ছাব্বিশ ।।

যেদিন মনোরমা অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের বাসায় অজ্ঞান হইয়া গেল, সেদিন হইতে মুকুজ্জেমশাই ও-বাসায় আর রাত্রিবাস করেন নাই। ডাক্তার, নার্স ডাকিয়া তিনি মনোরমার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু রাত্রে সেখানে থাকা উচিত মনে করেন নাই। পরদিন গিয়া একজন রাঁধুনি ও একজন চাকরানি বাহাল করিয়া মনোরমাকে বলিয়া আসিয়াছিলেন, আমি রোজ আসব। বুড়ি রাঁধুনি তার ছেলেকে নিয়ে রাত্রে থাকবে, চাকরানিও রাত নটা পর্যন্ত থাকবে। আমার সঙ্গে আর একটা ছেলে আছে, তাই আমি আর একটি বাসা নিয়েছি। আমি রোজ এসে খবর নিয়ে যাব তোমার, কোনো ভাবনা নেই।

মনোরমা কোনো আপত্তি করে নাই, বস্তুত কোনো উত্তর সে দেয় নাই। অজ্ঞান হইয়া যাইবার পর হইতে সে অসম্ভব রকম হইয়া গিয়াছে, মুকুজ্জেমশাই প্রত্যহ আসেন, খোঁজ-খবর করেন, সে চুপ করিয়া থাকে। তাহার শেষ বক্তব্য যেন সে বলিয়া দিয়াছে, আর যেন তাহার বলিবার কিছু নাই।

আজ মুকুজ্জেমশাই আসিয়া দেখিলেন, মনোরমা নাই। রাঁধুনি বলিল, সেও সকাল হইতে

মনোরমাকে দেখিতে পাইতেছে না। ঘরের ভিতর মুকুজ্জেমশাইয়ের নামে একটা পত্র পাওয়া গেল। অতি ক্ষুদ্র পত্র।

শ্রীচরণেষু,

আমি চলিলাম। আমাকে খুঁজিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না। ইতি—

প্রণতা
মনোরমা

।। সাতাশ ।।

যদিও মিষ্টিদিদির স্বামী অধ্যাপক মিত্রের কিছুদিন হইতে 'হার্ট ট্রাব্‌ল' বাড়িয়াছিল, তথাপি তিনি একটি থিসিস লিখিতেছিলেন এবং তাহাতেই তন্ময় হইয়াছিলেন। অধ্যাপক মিত্রের সহিত মিষ্টিদিদির সম্পর্ক কোনোদিনই বেশি রকম ঘনিষ্ঠ হইতে পারে নাই। থিসিস লিখিতে আরম্ভ করিয়া তিনি আরও যেন দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। ইংরেজি নাট্য-সাহিত্যে গ্রীক নাটকের প্রভাব লইয়া তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে, অন্য কিছুর খবর রাখিবার অবসর তাঁহার ছিল না। মিষ্টিদিদি কখন বাড়িতে থাকেন, কখন থাকেন না, কখন আসেন, কখন যান, কাহার সঙ্গে মেশেন, কাহার সঙ্গে মেশেন না—এ সকল খবর রাখিবার কোনো প্রয়োজনই তিনি অনুভব করেন না, কারণ এ সকল খবরের সহিত তাঁহার থিসিসের কোনো সম্পর্ক নাই। গ্রীক নাটকের কোনো প্রভাব ইংরেজি নাটকে পড়িয়াছে কি না এবং পড়িয়া থাকিলে কতটুকু পড়িয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতেই তিনি ব্যস্ত। ইহা লইয়াই তাঁহার দিবসের অধিকাংশ সময় কলেজে এবং রাত্রির অধিকাংশ সময় নিজের বাড়ির লাইব্রেরি ঘরে অতিবাহিত হয়। পুরাতন ভৃত্য জগদীশ তাঁহার স্নান, আহার, বেশ-পরিবর্তন হইতে শুরু করিয়া কখন তাঁহার কলেজ যাইবার সময় হইল, কবে কোথায় কাহার সহিত এন্‌গেজ্‌মেন্ট আছে, কোন্ কোন্ প্রয়োজনীয় বইগুলি হাতের কাছে রাখিতে হইবে, সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করে। অর্থাৎ জগদীশ যদি স্ত্রীলোক হইত, তাহা হইলে জগদীশকে ব্যাকরণসম্মতভাবে প্রফেসার মিত্রের জীবন-সঙ্গিনী বলা চলিতে পারিত। মিষ্টিদিদি সামাজিক আসরে মিসেস মিত্র, মিস্টার মিত্রের সহিত সামাজিক সম্পর্ক ছাড়া তাঁহার আর কোনো সম্পর্ক নাই। রঙ্গমঞ্চের বাহিরে দুইজন দুই জগতের লোক।

মিষ্টিদিদির প্রতি প্রফেসার মিত্রের মনোভাব কিন্তু অদ্ভুত-ধরনের। প্রফেসার মিত্র মিষ্টিদিদিকে যেন ভয় করেন। অপরাধী বালক যেমন ভয়ে ভয়ে অভিভাবককে এড়াইয়া চলে এবং অভিভাবক কোনো একটা কিছু লইয়া অন্যমনস্ক থাকিলে নিশ্চিন্ত হয়, প্রফেসার মিত্রও ঠিক তেমনই মিষ্টিদিদিকে যথাসাধ্য এড়াইয়া চলেন এবং মিষ্টিদিদি যা-হোক একটা কিছু লইয়া মাতিয়া থাকিলে নিজেকে নিরাপদ মনে করেন। প্রফেসার মিত্র মিষ্টিদিদিকে যে চেনেন না তাহা নয়, কিন্তু না চিনিবার ভান করেন। মিষ্টিদিদি নিকটে আসিলে সমস্ত দন্তপাঁতি বিকশিত করিয়া এমন আন্তরিকতার সহিত আকর্ণবিশ্রান্ত হাসিটি হাসেন যে, মনে হয়, তিনি কিছুই জানেন না, মনে হয়, তিনি মিষ্টিদিদির খোশামোদ করিতেছেন; মনে হয়, তিনি মিষ্টিদিদির প্রীত্যর্থে সবকিছুই করিতে প্রস্তুত। মিষ্টিদিদি সরিয়া গেলেই তাঁহার মুখের হাসি মিলাইয়া যায়,

জগদীশকে ডাকিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিতে বলেন এবং রুদ্ধ দ্বারের দিকে চকিত দৃষ্টিতে দুই একবার তাকাইয়া পুনরায় অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। শুধু যে মিষ্টিদিদিকে দেখিয়াই তিনি সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন তাহা নয়, মিষ্টিদিদির ঝাঁকড়া লোমওয়ালা কুকুরটা তাঁহার পড়ার ঘরে ঢুকিলেও তিনি সমান অস্বস্তিবোধ করেন। এবং অনুরূপ আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া তাহার গায়ে মাথায় আলতো আলতো হাত বুলাইয়া তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন। মিষ্টিদিদি অথবা মিষ্টিদিদির কুকুর উভয়ের সম্বন্ধেই প্রফেসার মিত্রের মনোভাব অনেকটা একরকম, অধ্যয়নের অন্তরায় হিসাবেই যেন উভয়কেই তিনি ভয় করেন এবং উহাদের প্রতি যথোচিত মনোযোগ দিতে পারেন না বলিয়া নিজেকে অপরাধী মনে করেন। তাঁহার নিজের ধারণা অর্থাৎ যে ধারণাটাকে তিনি সচেতন মনের সদরে কিঞ্চিৎ কপটতার সহিত প্রশ্রয় দেন তাহা এই যে, দুর্নিবার অধ্যয়ন-স্পৃহাই একটা নেশার মতো তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে এবং বহুবিধ কর্তব্যকর্ম হইতে বিচ্যুত করিতেছে। এই বিচ্যুতির জন্য তিনি সর্বদাই লজ্জিত। ইহার প্রায়শ্চিত্ত হিসাবেই তিনি যেন মিষ্টিদিদির স্বেচ্ছাচারকে সহ্য করেন; শুধু তাহাই নয়, স্বেচ্ছাচারের আবিলতরঙ্গে গা ভাসাইয়া মিষ্টিদিদি যে দয়া করিয়া তাঁহাকে রেহাই দিয়াছেন, এজন্য তাঁহার প্রতি একটা কৃত্রিম কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন। প্রফেসার মিত্র কোনোদিন আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দেখেন নাই, দেখিতে চাহেন নাই—আসল গলদ কোন্‌খানে! নিজের দুর্বলতা কেহ স্বীকার করিতে চাহে না, এমন কি নিজের কাছেও নহে। সর্বগ্রাসী অধ্যয়ন-স্পৃহার উপর সমস্ত দোষারোপ করিয়া মিত্রমহাশয় সুখে ছিলেন, দোষারোপ করিবার মতো একটা কিছু না পাইলে তিনি পাগল হইয়া যাইতেন।

প্রফেসার মিত্র অ্যারিস্টোফ্যানিস পড়িতেছিলেন। রাত্রি অনেক হইয়াছে। মিষ্টিদিদি বাহিরে গিয়াছেন এখনও ফেরেন নাই। ফিরিলেও তিনি সোজা ওপরে চলিয়া যাইবেন, প্রফেসার মিত্রকে বিরক্ত করিবেন না, ইহাই চিরাচরিত প্রথা। কিন্তু আজ একটা অঘটন ঘটিয়া গেল, সশব্দে দ্বার ঠেলিয়া মিষ্টিদিদি প্রবেশ কবিলেন। সর্বাঙ্গে কমলা রঙের জরিদার শাড়ি ঝলমল করিতেছে, চোখের কোলে সূক্ষ্ম কাজলের রেখা। মনে মনে বিব্রত হইলেও প্রফেসার মিত্র নাক হইতে চশমাটি কপালে তুলিয়া আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসিটি হাসিয়া বলিলেন, ও, তুমি! কোথায় গিয়েছিলে, সিনেমায়?

তাহার পর একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, কি বই ছিল?

সিনেমায় যাইনি, প্রফেসার গুপ্তর বাড়ি থেকে আসছি।

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-মিশ্রিত একটি তীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া এক হাত কোমরে দিয়া ঈষৎ বঙ্কিম ঠামে মিষ্টিদিদি দাঁড়াইলেন, টেবিলে স্তূপীকৃত বইগুলির দিকে একবার চাহিয়া প্রফেসার মিত্রের মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি হইতে ঘৃণা যেন উপচাইয়া পড়িতেছিল। প্রফেসার মিত্র বিচলিত হইলেন না, বলিলেন, ওঃ প্রফেসার গুপ্ত। বেশ বেশ।

মিষ্টিদিদি কাজের কথা পাড়িলেন, আমাকে দুশো টাকার একখানা চেক দাও দিকি।

দুশো টাকার চেক? কেন?

কাল আমি দার্জিলিং যাব, এখানে আর ভালো লাগছে না।

ও! প্রফেসার গুপ্তও যাবেন নাকি?

না, একাই যাব।

প্রফেসার মিত্র আর প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেন না। ড্রয়ার খুলিয়া চেক-বহি বাহির করিলেন এবং দুই শত টাকার চেক লিখিয়া দিলেন। মিষ্টিদিদি চেক লইয়া অবিলম্বে বাহির হইয়া গেলেন। কাল সত্যই তিনি দার্জিলিং চলিয়া যাইবেন। প্রফেসার গুপ্তকে উতলা করিবার জন্যই অল্প কিছুদিন সরিয়া থাকা দরকার। বেলা যদিও পরদিন উঠিয়াই নিজের বাড়িতে চলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্য প্রফেসার গুপ্তের দুর্ভাবনার বহরটা মিষ্টিদিদির নিকট মোটেই উপাদেয় মনে হয় নাই। আজ মিষ্টিদিদি প্রফেসার গুপ্তের সহিত ছদ্ম কলহ করিয়া আসিয়াছেন, কাল ছদ্ম অভিমান করিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইবে। পুরুষ-মানুষকে বশে রাখিতে হইলে নানা কৌশল অবলম্বন করিতে হয়।

।। আটাশ ।।

মৃন্ময়ের সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া, বিশেষত মৃন্ময়ের মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, শঙ্কর একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। লোকটা শুধু যে মুষড়াইয়া গিয়াছে তাহা নহে, কেমন যেন দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছে। শঙ্করের নিজের দুঃখও কম নয়, কিন্তু মৃন্ময়ের দুঃখের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর। শঙ্কর স্বেচ্ছায় খেয়ালের বশবর্তী হইয়া দুঃখকে বরণ করিয়াছে, নিজের আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, দুঃখের ভারে ভগ্নমেরুদণ্ড হইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়ে নাই। তাহার আদর্শ ঝুটা হইতে পারে, সে কিন্তু সে আদর্শ হইতে এতটুকু বিচ্যুত হয় নাই, তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাকেই এখনও আঁকড়াইয়া আছে অর্থাৎ তাহার এই কৃচ্ছ্রসাধন একটা বলিষ্ঠতা দ্বারা মহিমান্বিত। পিতামাতার বিরুদ্ধে অমিয়াকে বিবাহ করিয়া সে হয়তো ভুল করিয়াছে, কিন্তু সেই ভুলটাকে সংশোধন করিবার নিমিত্ত সে নিজের অহঙ্কৃত পৌরুষকে অপমানিত করে নাই। সগৌরবে উন্নত শিরে নিজের স্বেচ্ছাকৃত ভুলের লাঞ্ছনা সহ্য করিতেছে ও করিবে। এমন কিছুই করে নাই বা করিবে না, যাহা আত্মধিক্কারের গ্লানিতে সমস্ত অন্তর অহরহ বিষাক্ত করিয়া তুলিবে। মৃন্ময়েব কিন্তু তাহাই ঘটিয়াছে। হাসিকে বিবাহ কবিয়া অন্তর্হিতা স্বর্ণলতার প্রেমে একনিষ্ঠ থাকিয়া পুলিশে চাকরি করিতে করিতে তাহার অনুসন্ধানে প্রয়োজন হইলে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া দিব—এই অসম্ভব আদর্শকে অনুসরণ করিতে গিয়া মৃন্ময় স্বাভাবিক নিয়মে আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছে। নিজের অজ্ঞাতসারে স্বর্ণলতাকে ভুলিয়া হাসিকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছে। বিনিময়ে হাসির ভালোবাসা সে পাইয়াছিল। কিন্তু স্বর্ণলতার চিঠিগুলি আবিষ্কার করিযা হাসি যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছে। হাসি যদি মৃন্ময়কে আর একটু কম ভালোবাসিত অথবা সে যদি আর একটু চাপা গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে হইত, তাহা হইলে তাহার ঈর্ষাক্ষুব্ধ অন্তর এমন প্রখরভাবে হিংস্র হইয়া উঠিত না। কিন্তু সে মৃন্ময়কে অকপটে ভালোবাসিয়াছিল বলিয়া এবং মনের ভাষার সহিত মুখের ভাষার পার্থক্য রক্ষা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া অকপটে সে মৃন্ময়কে এই প্রতারণার জন্য ধিক্কার দিতেছে। মৃন্ময়ের চাকুরিবিহীন জীবন হাসির বাক্যবাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিয়াছে।

মৃন্ময়ের আর একটা মুশকিল হইয়াছিল, কাহারও কাছে সব কথা খুলিয়া বলিয়া সে মনের

ভার লাঘব করিতে পারিতেছিল না। কাহার নিকট বলিবে? সে মুখ-চোরা-প্রকৃতির লোক, কাহারও সহিত ভালো করিয়া মিশিতে পারে না, কাহারও সহিত তাহার হৃদ্যতা জন্মে না। ভণ্টু তাহার পরিচিত, কিন্তু ভন্টুর অভিধান-বহির্ভূত বাক্যাবলীকে সে ভয় করে। হয়তো তাহার মর্মান্তিক বেদনাকে কেন্দ্র করিয়াই সে কতকগুলি অদ্ভুত শব্দ সৃজন করিয়া বসিবে এবং যেখানে সেখানে আওড়াইতে থাকিবে। তা ছাড়া ভণ্টুর পরিবারের সকলেরই সম্বন্ধে মৃন্ময়ের আর একটা কারণে কিঞ্চিৎ বিরূপ মনোভাব ছিল। স্বর্ণলতার অন্তর্ধানের ব্যাপারটা ইহারা কেহই সহানুভূতির চক্ষে দেখে নাই, ইহাকে একটা কেলেঙ্কারির পর্যায়ে ফেলিয়া তাহা লইয়া হাস্য-পরিহাস করিয়াছে। মৃন্ময়কে তাহারা অবশ্য অনুকম্পার চক্ষে দেখিত কিন্তু মৃন্ময় পুনরায় যখন বিবাহ করিল, তখন তাহা তাহাদের নিকট আর একটা স্থূল রসিকতার খোরাক জোগাইল মাত্র। সেজন্য মৃন্ময় ভণ্টুকে যথাসাধ্য এড়াইয়া চলে।

সেদিন শঙ্করকে নিকটে পাইয়া, শঙ্করের জীবন-কাহিনী শুনিয়া এবং তাহার সহানুভূতিপূর্ণ সহৃদয় আলাপে মুগ্ধ হইয়া মৃন্ময় নিজের সমস্ত কথা শঙ্করকে খুলিয়া বলিয়াছিল। অনুরোধ করিয়াছিল, শঙ্কর যেন আবার আসে। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির ফেরত তাই সে পুনরায় একদিন মৃন্ময়ের বাসায় গিয়া হাজির হইল। দেখিল, মৃন্ময় একাই আছে, মুকুজ্জেমশাই বাহিরে গিয়াছেন। শঙ্কর বলিল, চলুন, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

চলুন।

উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল।

খানিকদূর নীরবে পথ অতিবাহন করিবার পর মৃন্ময় বলিল, জ্বালাতন হয়ে উঠেছি।

কেন?

মৃন্ময় কোনো উত্তর দিল না। শঙ্কর চাহিয়া দেখিল, সে অন্য দিকে চাহিয়া আছে। ক্ষণকাল নীরবতার পর সহসা মৃন্ময় বলিল, চানাচুর খাবেন?

আপত্তি কি?

মোড়ে একটা লোক চানাচুর বিক্রয় করিতেছিল, মৃন্ময় আগাইয়া গিয়া তাহার নিকট হইতে তিন ঠোঙা চানাচুর খরিদ করিয়া ফেলিল। মনিব্যাগের ভিতর হাত ঢুকাইয়া একটি পয়সা বাহির করিয়া কিছুক্ষণ সেটার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিল। ব্যাগটা উপুড় করাতে একটা আনি বাহির হইল। চানাচুরের দাম চুকাইয়া পয়সা দুইটি ব্যাগে পুরিতে পুরিতে বলিল, বাস, দুই পয়সা মাত্র বাকি রইল আর।

তিন ঠোঙা কিনলেন কেন?

একটা আমার স্ত্রীর জন্য নিয়ে যাব, ভারি ভালোবাসেন চানাচুর খেতে।

হাসিয়া মৃন্ময় একটি ঠোঙা পকেটে পুরিল। আসলে চানাচুরওয়ালাকে দেখিয়া হাসির কথাই তাহার মনে হইয়াছিল; হাসির জন্য কিনিতে গিয়াই ভদ্রতার খাতিরে আরও দুই ঠোঙা কিনিতে হইল।

চানাচুর চিবাইতে চিবাইতে নীরবে উভয়ে হাঁটিতে লাগিল। মিনিটখানেক পরে শঙ্কর সহসা দেখিল, মৃন্ময় পাশে নাই, সে যে কখন একটা কাপড়ের দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে, ভিড়ে শঙ্কর তাহা বুঝিতে পারে নাই। শঙ্কর দেখিল, একটা শো-কেসের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া মৃন্ময় দাঁড়াইয়া আছে।

কি দেখছেন?

কি চমৎকার শাড়িখানা দেখুন, কি অদ্ভুত ময়ূরকণ্ঠী রঙ!

মৃন্ময় খানিকক্ষণ শাড়িটার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তাহার পর সহসা যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া বলিল, যাই, চলুন।

আবার উভয়ে চলিতে শুরু করিল।

খানিকক্ষণ নীরবতার পর মৃন্ময় আপন মনেই যেন বলিল, কে জানে! তাহার পর শঙ্করের দিকে হঠাৎ ফিরিয়া মুখে একটু হাসি টানিয়া বলিল, আচ্ছা, আপনার কি ধারণা বলুন তো?

কি বিষয়ে?

আবার নতুন করে শুরু করলে শান্তি ফিরে পাওয়া যাবে?

নিশ্চয়।

মৃন্ময় কোনো উত্তর দিল না। শঙ্কর দেখিল, সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

শঙ্কর পুনরায় বলিল, না পাবার কোনো কারণ নেই।

মৃন্ময় ইহারও কোনো জবাব দিল না, আবার নীরবে দুইজনে পথ চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মৃন্ময় আপন মনেই বিড়বিড় করিয়া বলিল, কিছুতেই জুটছে না, আশ্চর্য!

কি?

চাকরি।

আমারও তো সেই অবস্থা।

আপনার চাকরি তো হয়ে গেছে।

কে বললে?

আপনি আসবার একটু আগে ভণ্টু এসেছিল। সে বললে, তার আপিসে যে চাকরিটা ছিল, সেটা আপনি পেয়ে গেছেন।

একটু থামিয়া পুনরায় বলিল, আমিও ওই চাকরিটার জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম, ভণ্টু বললে, সে তা জানত না। আমিও অবশ্য ভণ্টুকে কিছু বলিনি, মানে—আপনি তো সবই জানেন।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

মৃন্ময় হঠাৎ থামিয়া গেল, বলিল, চলুন ফেরা যাক। আর বেড়াতে ভালো লাগছে না।

বেশ, চলুন।

ফিরিবার পথে মৃন্ময বলিল, একটা উপকার করবেন আমার?

কি?

আমি খবরের কাগজে মুড়ে আমার শালখানা লুকিয়ে আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। বাঁধা দিয়ে হোক, বিক্রি করে হোক, কিছু টাকা কাল এনে দিতে হবে। এমন জিনিস কোথায় বিক্রি করে আমার জানা নেই, আপনার হয়তো জানা থাকতে পাবে।

মৃন্ময়ের মুখের দিকে চাহিতে গিয়া শঙ্কর দেখিল, মৃন্ময় অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে।

।। উনত্রিশ ।।

সমস্ত শুনিয়া মুকুজ্জেমশাই নিবারণবাবুকে বলিলেন, আপনার মেয়ে দোষী কি নির্দোষ; সে কথা এ ক্ষেত্রে অবান্তর।

নিবারণবাবু সকরুণভাবে মুকুজ্জেমশাইয়ের দুইটি হাত ধরিয়া বলিলেন, বিশ্বাস করুন আপনি একেবারে নির্দোষ সে! তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।

আহা, আপনি অমন করছেন কেন? সে দোষী হোক নির্দোষ হোক, তাতে কিচ্ছু এসে যায় না।

খুব এসে যায়। সে নির্দোষ—এ বিশ্বাস না থাকলে কি তাকে ফিরে পাবার জন্যে আমি এমন উতলা হতাম?—নিবারণবাবুর গলার স্বর কাঁপিতে লাগিল। একটু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, আপনি বিশ্বাস করুন, তার নিজের কোনো দোষ নেই।

মুকুজ্জেমশাই হাসিমুখে উত্তর দিলেন, বেশ, বিশ্বাস করলাম।

নিবারণবাবু সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মুকুজ্জেমশাইয়ের দিকে চাহিতেই মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, আমি তো আপনার কথাতে অবিশ্বাস করিনি, আমি বলতে চাইছিলাম যে, সে যদি দোষী হয়, তা হলেও তাকে আমি খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতাম।

নিবারণবাবু অবুঝের মতো পুনরায় বলিলেন, না, সে দোষী নয়। মুকুজ্জেমশাই স্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন, আর উত্তর দিলেন না। একটু পরে নিবারণবাবু বলিলেন, তা হলে আপনি—

এ কাজে আমি কয়েকদিন পরে হাত দেব। শঙ্কর আর মৃন্ময়ের যতক্ষণ না একটা কিছু হচ্ছে, ততক্ষণ আমি অন্য কোনো কাজে হাত দিতে পারছি না। আর একজনেরও খোঁজ করতে হবে আমাকে। আপনাকে এ বিষয়ে আর বার বার এসে বলতে হবে না, আমার যথাসাধ্য আমি ঠিক যথাসময়ে করব। আচ্ছা, এবার আমি উঠি। বেরুতে হবে একবার।

আচ্ছা, আমি এখন যাই তা হলে।

নিবারণবাবু চলিয়া গেলেন।

মুকুজ্জেমশাই কয়েকখানি টাইপ-করা দরখাস্ত গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিবারণবাবু চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া পড়িলেন। মৃন্ময়কে এবং শঙ্করকে তিনি দুই স্থানে পাঠাইয়াছিলেন, তিনি নিজে আরও দুই স্থানে যাইবেন, তা ছাড়া তিনটি আপিসে তিনখানি দরখাস্ত দিয়া আসিতে হইবে, পোস্টে না পাঠাইয়া সেখানকার পৈরবি-চুমরায়িত বাবুদের হাতে দিলে বেশি ফলপ্রদ হইবে। শিরীষের পত্রখানিও অবিলম্বে পোস্ট করা দরকার, তাহা না হইলে সে আবার অকারণে ছুটি লইয়া ব্যস্তসমস্তভাবে আসিয়া পড়িবে। শঙ্করের জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। দ্রুতপদে পথ চলিতে চলিতে মুকুজ্জেমশাইয়ের সহসা মনে হইল, শিরীষকে বোধহয় সুশীলাই উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহা না করিলে শিরীষ মনে মনে হাজার চিন্তিত হইলেও একা এতদূরে আসিবার ঝঞ্ঝাট পোহাইতে চাহিত কি না সন্দেহ! কিছুদূর গিয়া মুকুজ্জেমশাই থামিলেন এবং অবশেষে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মনে হইল, সুশীলাকে এ বিষয়ে কিছু লেখা উচিত। ফিরিয়া আসিয়া শিরীষবাবুর নামে লেখা খামটি জল দিয়া ভিজাইয়া খুলিয়া লিখিলেন—

কল্যাণীয়া সুশীলা,

তুমি সম্ভবত শঙ্করের জন্য বেশি উতলা হইয়াছ এবং শিরীষকে উত্ত্যক্ত করিতেছ। শিরীষ অবশ্য তাহা আমাকে লেখে নাই, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি। শিরীষকে উত্ত্যক্ত করিও না, শঙ্কর ভালো আছে, শীঘ্রই তাহার একটা চাকরি জুটিবেই। অমিয়াকেও চিন্তিত হইতে বারণ করিও। ইতি—

মুকুজ্জেমশাই

খামটি জুড়িয়া মুকুজ্জেমশাই আবার বাহির হইয়া গেলেন।

।। ত্রিশ ।।

দিন-দশেক পরে শঙ্কর সহসা কৃতনিশ্চয় হইয়া উঠিল যে, মিসেস স্যানিয়ালের বাড়িতে সে আর থাকিবে না। নিজের জন্য নয়, চুনচুনের জন্যই তাহাকে মিসেস স্যানিয়ালের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হইবে। তাহার জন্য চুনচুনকে অহরহ বাক্যবাণ সহ্য করিতে হইতেছে। চুনচুন নীরবে সমস্ত সহ্য করিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু শঙ্করের আর সহ্য হইতেছে না। শঙ্কর হাঁটিতে হাঁটিতে বেলার বাসার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। বেলার বাসাতেই বরং সে আপাতত কয়েক দিনের জন্য আশ্রয় লইবে, কিন্তু মিসেস স্যানিয়ালের ওখানে আর নয়। বেলার বাসায় পৌঁছিয়া শঙ্কর কিন্তু অবাক হইয়া গেল। বাড়ির সামনে 'টু লেট' ঝুলিতেছে, দরজায় তালা লাগানো! বেলা বাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছে! শঙ্কর খানিকক্ষণ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ গেল কোথায়? পাশের বাড়ির একটি ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, প্রায় পনেরো-ষোল দিন পূর্বে মিস মল্লিক বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। ইহার বেশি কোনো খবর সে আর বলিতে পারিল না, আশেপাশে কেহই পারিল না। আশ্চর্য এই কলিকাতা শহর! কেহ কাহারও খবর রাখে না, প্রতিবেশীর খবর রাখার প্রয়োজনও কেহ অনুভব করে না। এখানে অতিপরিচিত লোকেরও নাগাল পাইতে হইলে বাড়ির রাস্তা এবং নম্বর জানা থাকা প্রয়োজন। ঠিকানার সূত্রটুকু হারাইয়া গেলে, এই বিরাট জনসমুদ্রে লোকটাই হারাইয়া যাইবে। যদি দৈবানুগ্রহে অকস্মাৎ কোনোদিন দেখা না হইয়া যায়, তাহা হইলে বেলাও হয়তো হারাইয়া গেল। হঠাৎ শঙ্করের মনে হইল, প্রফেসার গুপ্তের নিকট খোঁজ করিলে হয়তো কোনো খবর পাওয়া যাইতে পারে, এ বাড়িটা তো প্রফেসার গুপ্তেরই একজন বন্ধুর বাড়ি। প্রফেসার গুপ্তের বাড়িতে গিয়া শঙ্কর শুনিল, প্রফেসার গুপ্ত বাড়িতে নাই। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে গলিটা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। ঠিক করিল, আর একদিন আসিয়া খোঁজ করিবে। আরও খানিকক্ষণ অনিশ্চিতভাবে রাস্তায় ঘুরিয়া সে ঠিক করিল, ভণ্টুর বাসায় যাওয়া যাক, এতক্ষণে সে হয়তো আপিস হইতে ফিরিয়াছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটিয়া ভণ্টুর বাসায় পৌঁছিয়া শঙ্কর দেখিল যে আর একটু দেরি হইলে ভণ্টুব সহিতও দেখা হইত না। এক-একদিন এরকম হয়, কাহারও সহিত দেখা হয় না, যাত্রাটাই নিষ্ফল হইয়া যায়। ভণ্টু বাইকে চড়িতে যাইতেছিল, শঙ্করকে দেখিবামাত্র তাহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

তোর কাছেই যাব ভাবছিলাম, জুল্‌ফিদারিক অ্যাফেয়ার সাকসেস্‌ফুল, চাকরি হয়ে গেছে,

দিন পাঁচ-ছয়ের মধ্যেই অ্যাপয়েন্ট্‌মেন্ট্‌ লেটার পাবি। জুল্‌ফিদার প্রথমটা একটু বেঁকে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু আমি তো ছাড়বার পাত্র নই, কচলে কচলে ব্যাঙ তেতো করে ফেললাম, শেষটা দিক হয়ে জুল্‌ফিদার রাজি হল।

শঙ্কর বলিল, আমার কিন্তু ভাই একটা অনুরোধ আছে।

কি?

চল্‌, রাস্তায় যেতে যেতে বলছি। কোন্‌ দিকে যাচ্ছিস তুই?

আমি তোর খোঁজেই ম্যাডাম গুম্ফের বাসায় যাব ঠিক করেছিলাম। তুই যখন এসে পড়েছিস, তখন চল্‌, আর এক জায়গায় যাওয়া যাক, সেখানে যাওয়া দরকার।

ভণ্টু ইতিমধ্যেই নিজস্ব ধরনে মিসেস স্যানিয়ালের নূতন নামকরণ করিয়া ফেলিয়াছে দেখিয়া শঙ্কর একটু মুচকি হাসিল।

হাসছিস যে?

নামকরণটা বেশ হয়েছে।

ভণ্টু কিছু না বলিয়া নিঃশ্বাস টানিয়া টানিয়া গলা হইতে 'গোঁক' 'গোঁক' ধরনের একটা শব্দ বাহির করিল।

কোন্‌ দিকে যাচ্ছিস তুই বল্‌তো?

ওরিজিনালের কাছে।

মানে, দশরথবাবুর কাছে?

শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল! নিমেষের মধ্যে মুক্তোর মুখখানা মনের মধ্যে উঁকি দিয়া গেল।

কি রে দাঁড়িয়ে পড়লি যে?

তাহার পর একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, ভাবছিস, আমি কিছু জানি না! ওরিজিনালের কাছ থেকে সব হদিস পেয়েছি তোর। কানা করালীও কিছু আভাস দিয়েছিল তোর কুষ্ঠি দেখে।

কিসের আভাস?

মোল্লা অ্যাফেয়ারের।

কাছা দেয় না বলিয়া ভণ্টু নারী মাত্রকেই মোল্লা বলে, শঙ্কর তাহা জানিত। ওরিজিনালের নিকট হইতে ভণ্টু মুক্তোর ব্যাপারে শুনিয়াছে নাকি? শঙ্করের মুখটা যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু সে পর-মুহূর্তেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, শুনেছিস, বেশ করেছিস এবং অত্যন্ত সপ্রতিভ একটা হাসি হাসিয়া বলিল, চল্‌।

ভণ্টু অলক্ষিতে মুখ বিকৃত করিয়া একটু ভ্যাঙাইল এবং চলিতে শুরু করিল। খানিকক্ষণ নীরবে চলিবার পর বলিল, ম্যাডাম গুম্ফের আস্তানা এবার ত্যাগ কর্‌ তুই। চাকরি তো হয়ে গেল, এবার আলাদা একটা বাসা কর, বউকে নিয়ে আয়, ওসব মোল্লাফায়িং ছাড়।

আমি চাকরি করব না।

ভণ্টু যেন চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া পড়িল।

চাকরি করবি না, মানে?

চাকরি করব না তা বলছি না, কিন্তু তোর এ চাকরিটা করব না। এটাতে তুই মৃন্ময়বাবুকে ঢুকিয়ে দে, ও ভদ্দরলোকের অবস্থা আমার চেয়েও শোচনীয়।

ভণ্টু নির্বাক বিস্ময়ে শঙ্করের পানে চাহিয়া রহিল। ছোকরা হন্যে কুকুরের মতো পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মাথা গুঁজিবার একটা জায়গা নাই, কাল কোথায় কিভাবে অন্ন জুটিবে তাহাও বোধহয় অনিশ্চিত, অথচ ভালো একটা চাকরি হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিতেছে। যেন তেন প্রকারেণ নিজের কোলের দিকে ঝোল টানিয়া রাখাই ভণ্টুর জীবনের মূলমন্ত্র। এ জাতীয় মনোবৃত্তি তাহার ধারণার অতীত।

মৃন্ময়কে না হয় ঢুকিয়ে দিলাম, কিন্তু তোর হাল কি হবে? তোর কি একটা ভয়-ডরও নেই?

শঙ্কর সহাস্যে উত্তর দিল, সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়?

শিশিরে কি ভয়?

মৃন্ময়বাবুর চাকরি পাওয়া আগে দরকার। ভদ্দরলোক কাপড়-জামা বিক্রি করতে শুরু করেছেন। আমাকে নিজের শালখানা বিক্রি করবার জন্যে দিয়েছেন, যদিও এখনও বিক্রি করতে পারিনি।

মোমবাতির এ রকম দুরবস্থা হয়েছে, অথচ আমাকে কিছু বলেনি তো!

শঙ্কর ইহার কোনো উত্তর দিল না। উভয়ে আবার নীরবে চলিতে লাগিল।

তুই তা হলে তোর বাবার কাছে ফিরে যা, হাতে পায়ে ধরে মিটিয়ে ফেলগে যা।

সে অসম্ভব।

উন্মাদ হয়ে গেলি নাকি হঠাৎ। বাবার কাছে ফিরে যাবি না, চাকরি জুটিয়ে দিলে করবি না, একাধিক মোল্লা জুটিয়েছিস—

শঙ্কর হাসিয়া ফেলিল।

কোনো ভয় নেই তোর, সব ঠিক হয়ে যাবে। মৃন্ময়কে এ চাকরিটায় ঢুকিয়ে দে তুই।

তার মানে জুলফিদারকে ফ্রেশ খজলাতে হবে। খজলে খজলে লোকটাকে এমনিই তো ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছি, বেশি খজলালে আবার দক্‌চে না যায়!

শঙ্কর কোনো উত্তর দিল না, নীরবে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। সে বারম্বার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল। মুক্তো মনের মধ্যে বারম্বার আনাগোনা করিতেছিল। খানিকক্ষণ হাঁটিয়া শঙ্কর বলিল, আমি আর দশরথবাবুর কাছে যাব না, তুই যা।

ভণ্টু মুখটা সূচালো করিয়া বলিল, কেন, লজ্জা করছে বুঝি?

অনর্থক একটা অপ্রিয় জিনিসের ভেতর গিয়ে লাভ কি?

ওরিজিনাল কম্‌প্লিটলি চেঞ্জ্‌ড, সে মানুষই আর নেই। গুম হয়ে চুপচাপ বসে থাকে, কথা-টথা একদম বলে না। যে মেয়েমানুষটাকে রেখেছিল, সেটা খুন হয়ে যাবার পর মিস্টার ফাইভ কেমন যেন হয়ে গেছে, তা ছাড়া হাঁপানিতে ধরেছে।

কে খুন হয়ে গেছে? মুক্তো?

খবরের কাগজে পড়িসনি তুই? মহা হৈ-চৈ হল যে কদিন তাই নিয়ে।

খবরের কাগজের সঙ্গে অনেক দিন সম্পর্ক নেই। সত্যি জানিস তুই? কে খুন করলে?

কতকগুলো গুণ্ডা। তাকে খুন করে গয়নাপত্তর টাকাকড়ি যা ছিল সব নিয়ে গেছে। একটা ভাঙা তোরঙ্গ খালি পড়েছিল, ওরিজিনালের কাছে আছে সেটা।

খানিকক্ষণ হাঁটিয়া উভয়ে ওরিজিনালের বাসার সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল। প্রকাণ্ড

দ্বিতল বাড়িখানা যেন স্তূপীকৃত পুঞ্জীভূত খানিকটা অন্ধকার, কোথায় এতটুকু আলো নাই। ভণ্টু সাইকেলের ঘন্টা বাজাইতেই সম্মুখের দ্বার খুলিয়া এক ব্যক্তি সন্তর্পণে বাহির হইয়া আসিলেন এবং মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, কে, ভণ্টুবাবু নাকি? ক'দিন আসেননি, আমি ভাবছিলাম, কি হল আবার আপনার! কেমন আছেন?

জবুথবু।

ভেতরে আসুন, একটু পরামর্শ আছে। সঙ্গে উনি কে?

চাম গ্যান্‌ঢঅ।

দাঁড়ান, আলোটা জ্বালি।

ভদ্রলোক পুনরায় ভিতরে ঢুকিয়া গেলেন।

ভণ্টু শঙ্করের কানে কানে চুপিচুপি বলিল, ইনি হচ্ছেন নেপো, দই মারতে এসেছেন। ওরিজিনালের দূর সম্পর্কের ভাগনে হয়, নিঃসন্তান বড়লোক মামার দুঃখে বিগলিত হয়ে সেবা করতে এসেছে রাস্কেল। হাড় কিপ্‌টে।

ঘরের ভিতর আলো জ্বলিয়া উঠিল।

ভণ্টু বলিল, চল, এবার যাওয়া যাক।

শঙ্কর ভিতরে গিয়া লোকটিকে প্রত্যক্ষ করিল। লোকটি যুবক নয়, প্রৌঢ়। গায়ে হাত কাটা ফতুয়া, গোঁফ-দাড়ি নাই, গলায় কণ্ঠি, চোখে মুখে চতুরতার সহিত বৈষ্ণবভাবের অদ্ভুত একটা সমন্বয়। ভণ্টু বলিল, আপনি কি এতক্ষণ অন্ধকারে বসেছিলেন নাকি?

ভদ্রলোক এতক্ষণ চাহিয়া ছিলেন, ভণ্টুর কথা শুনিবামাত্র প্রশান্তভাবে চোখ দুইটি বুজিয়া ফেলিলেন এবং কথাটা যেন ভালোভাবে প্রণিধান করিয়া পুনরায় চাহিলেন।

কেরোসিনের আলো জ্বেলে কতখানি অন্ধকার আমরা দূর করতে পারি, বলুন?

লদ্‌কালদ্‌কি রেখে আসল কথাটা কি বলুন?

মামা যে একেবারে কথা বন্ধ করে দিয়েছেন, তার উপায় কি করি বলুন আগে আপনি।—এইটুকু বলিয়া চক্ষু বুজিলেন এবং খানিকক্ষণ বুজাইয়া রাখিয়া আবার খুলিলেন। শঙ্কর লক্ষ্য করিল যে, নিজের এবং অপরের কথোপকথনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া তিনি চক্ষু বোজেন এবং খোলেন। ইহার মধ্যে বেশ একটা ছন্দ আছে।

শঙ্করের দিকে চাহিয়া তিনি চক্ষু বুজিলেন এবং ভণ্টুর দিকে ফিরিয়া চক্ষু খুলিয়া বলিলেন, এ ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন।

উনি চাম্ গ্যান্‌ঢঅ—শঙ্কর, আমার একজন পুরানো বন্ধু। এবং শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, ইনি হচ্ছেন নেফিউ-শ্রেষ্ঠ সতীশচন্দ্র কর—দশরথবাবুর ভাগ্নে, মামার জন্যে দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করে ফেলছেন।

সতীশবাবু সবিনয়ে শঙ্করকে নমস্কার করিতে শঙ্করও প্রতি-নমস্কার করিল।

ভণ্টু বলিল, দশরথবাবুর সঙ্গে দেখা হবে এখন?

সতীশবাবু স্মিতহাস্য সহকারে চক্ষু দুইটি বুজিয়া এবং খুলিয়া বলিলেন, কাছে গিয়ে কোনো লাভ নেই, তিনি একটি কথাও বলবেন না, খালি বিরক্ত হবেন। আগে যা-ও দু-একটা কথা বলছিলেন, আজকাল তা-ও বন্ধ করে দিয়েছেন। দূর থেকে অবশ্য দেখে যেতে পারেন।

বেশ তো, এসেছি যখন, দূর থেকেই দেখে যাওয়া যাক।

তা হলে আসুন দোতলায়। আলো-টালো নিয়ে যাব না, জানালা দিয়ে লুকিয়ে দেখে যান। লোকজন কেউ এলে বড্ড অসোয়াস্তি বোধ করেন। অবশ্য এক আপনি ছাড়া আজকাল আর বিশেষ কেউ আসেনও না, সুখের পায়রারা সব উড়ে চলে গেছে। আপনিই যা মাঝে মাঝে খবর-টবর নেন।

সতীশবাবু চক্ষু বুজিলেন এবং খুলিলেন।

ভণ্টু কণ্ঠ হইতে বার-দুই গোঁক গোঁক শব্দ করিল।

শঙ্কর কিছুই বলিল না, মুক্তোর মৃত্যু-সংবাদে তাহার সমস্ত মন অসাড় হইয়া গিয়াছিল।

অন্ধকারে ধীরে ধীরে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া সতীশবাবুর পিছু পিছু শঙ্কর ও ভণ্টু দোতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দোতলাও অন্ধকার। প্রকাণ্ড দালানটার এক প্রান্তে শুধু মৃদু একটা আলোর রেখা দেখা যাইতেছিল।

সতীশবাবু চুপিচুপি বলিলেন, ওই ঘরটাতে আছেন উনি, আপনারা চুপিচুপি এগিয়ে যান, একটু গেলেই জানালা দিয়ে দেখতে পাবেন।

কিছুদূর গিয়াই ওরিজিনালকে দেখা গেল। ঘরে মৃদু আলো জ্বলিতেছে, একটা কালো র‍্যাপারে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া ওরিজিনাল বসিয়া আছেন। মুখটা ভালো দেখা যাইতেছে না, কিন্তু যতটুকু দেখা যাইতেছে ততটুকুই যথেষ্ট ভীতিকর। সমস্ত মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল, রগের এবং কপালের শিরাগুলি স্ফীত, রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটি যেন অক্ষিকোটর ছাড়িয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে। একটা তীব্র ঘৃণা সমস্ত চোখে মুখে যেন মূর্ত হইয়া রহিয়াছে। দুই হাতে দুইটা বালিশ আঁকড়াইয়া ধরিয়া ওরিজিনাল হাঁপাইতেছেন।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া সতীশবাবুর পিছু পিছু শঙ্কর ও ভণ্টু পুনরায় নামিয়া আসিল। ভণ্টু যে জন্য আসিয়াছিল, তাহা এখন উত্থাপন করা যদিও একটু অসমীচীন মনে হইল, তথাপি একবার চেষ্টা করিতে সে ছাড়িল না।

আচ্ছা, সাইকেলের একটা ভালো সিট সস্তায় বিক্রি ছিল, দশরথবাবু সেটা দেবেন বলেছিলেন আমাকে। সেটা কি করে পাওয়া যেতে পারে বলতে পারেন?

চক্ষু দুইটি বুজিয়া সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সতীশবাবু চক্ষু দুইটি পুনরুন্মীলন করিলেন এবং অত্যন্ত নিরীহভাবে মৃদু-হাস্য করিয়া বলিলেন, আমি তো ওসবের কিছুই জানি না, দোকানের খবর নেবার কি আর অবসর আছে? ওই মটরা ব্যাটা যা করছে তাই হচ্ছে। হ্যাঁ, আপনাকে একটা পরামর্শ জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম, আপনার যদি অসুবিধা না হয়—

সতীশবাবু চক্ষু বুজিলেন ও খুলিলেন।

ভণ্টু বলিল, কি বলুন?

চিকিৎসা নিয়ে মহাবিভ্রাটে পড়েছি। এখানকার ডাক্তারদের ভাঁজ-ভোঁজ ঘাঁত-ঘোঁত বিলি-ব্যবস্থা কিছুই বুঝতে পারছি না আমি ভণ্টুবাবু। দু বেলা আসছে যাচ্ছে, দামি দামি ওষুধ ফরমাশ করছে, নানারকম এগজামিন করাচ্ছে, কিন্তু ফল তো কিছুই হচ্ছে না, হু-হু করে অর্থব্যয় হচ্ছে কেবল, দুদিন থেকে কথাও বন্ধ হয়ে গেছে। আমি বলি কি, হোমিওপ্যাথি করাব? পাড়ায় একজন—

ভণ্টু বলিল, যাই করুন, খরচের ত্রুটি করবেন না! হোমিওপ্যাথি করতে চান, ভালোভালো রুই-কাতলাদের নিয়ে আসুন 'যার নেই কোনো গতি, সেই করে হোমিওপ্যাথি'—এ রকম কোনো বাজে চামাটুকে জোটাবেন না, ডাকতে হয় চাম্‌ লদ্‌ কাউকে ডাকুন। মানে লোকে যেন এ অপবাদ দেবার সুযোগ না পায়, যে টাকার জন্যেই আপনি—

সতীশবাবু চক্ষু দুইটি বুজিয়া ফেলিলেন ও নিমীলিত চক্ষেই মৃদু হাস্যসহকারে বলিলেন, কাকে বলছেন আপনি ভণ্টুবাবু! তাহার পর চক্ষু খুলিয়া আর একটু হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, দেখি আরও দুদিন।

শঙ্কর স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া সহসা বলিয়া বসিল, মুক্তোর সেই তোরঙ্গটা একবার দেখতে পারি?

ভণ্টু বলিল, সেটা বোধহয় ও-ঘরে আছে।

সতীশবাবু সোৎসুকে বলিলেন, কি বলুন তো?

ভণ্টু বলিল, সে আপনি জানেন না, আমি জানি, এ ঘটনা আপনি আসার পূর্বেই ঘটেছিল। এই পাশের ঘরের কোণেই তোরঙ্গটা আছে, আয়, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি— চাম্‌ গ্যান্‌ঢঅ তুই, না দেখে তো ছাড়বি না, দেখি আলোটা একবার।

সতীশবাবু বলিলেন, ভাঙা হলদে তোরঙ্গটার কথা বলছেন? সেটা আমি পরশুদিন ভাঙা সব জিনিস-পত্তরের সঙ্গে বিক্রি করে দিলাম যে। ভাবলাম, কি হবে ও ঝরঝরে ট্রাঙ্কটা রেখে? তাতে দুটি জিনিস মাত্র ছিল। একটি নীল রঙের খদ্দরের চাদর, আর একটি ফোটো। রেখে দিয়েছি সে দুটি, দেখতে চান তো দেখতে পারেন।

দেওয়ালের গা-আলমারি হইতে খবরের কাগজে মোড়া ছোট একটি পুলিন্দা বাহির করিয়া সতীশবাবু শঙ্করের হাতে দিলেন। শঙ্কর পুলিন্দাটি খুলিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ কাহার ফোটো! এ যে চুনচুনের স্বামী যতীন হাজরা! ফোটোর মুখখানা নখ দিয়া আঁচড়াইয়া কে যেন ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে! আঁকাবাঁকা অক্ষরে নিচে লেখা, 'স্বামী নয়— শয়তান'। খদ্দরের নীল চাদরখানাও শঙ্কর চিনিতে পারিল, সে-ই একদিন মুক্তোকে ইহা কিনিয়া দিয়াছিল।

রাত্রি দশটা নাগাদ হাঁটিতে হাঁটিতে শঙ্কর অবশেষে মিসেস স্যানিয়ালের বাড়িতেই আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ সে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিল, যেমন করিয়া হউক মিসেস স্যানিয়ালের বাসা ত্যাগ করিবে, কিন্তু সে কথা তাহার মনেই ছিল না। রাস্তায় ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার সমস্ত মনে এই কথাটাই প্রবলভাবে শুধু জাগিতেছিল যে, যে বিচিত্র যোগাযোগের ফলে এবং বিভিন্ন পরিবেষ্টনীতে মুক্তো, যতীন হাজরা এবং চুনচুনের জীবনে তাহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, সেই বিচিত্র যোগাযোগের নামই কি অদৃষ্ট? এই যোগাযোগ কি কোনো শক্তিমান বিধাতার নিগূঢ় অভিসন্ধি? না, এমনই আকস্মিক যোগাযোগ? কোথায় আমার ভাসিয়া চলিয়াছি, এই চলার কোনো উদ্দেশ্য আছে কি না, থাকিলেও তাহা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়া বোঝা সম্ভবপর কি না, কে আমাদের চালক— নানা প্রশ্নের ঘূর্ণাবর্তে তাহার সমস্ত অন্তর আলোড়িত হইতে লাগিল।

কড়া নাড়িতেই দ্বার খুলিয়া গেল। শঙ্কর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল, চুনচুন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শঙ্করের মনে হইল, সে যেন তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

।। একত্রিশ ।।

একটা বিরাট প্রান্তরে বীভৎস তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছে। সুরা-উন্মত্ত ঘূর্ণিত-লোচন ভয়ঙ্কর বলিষ্ঠ একদল পুরুষ অট্টহাস্য করিতে করিতে নৃত্য করিতেছে। তাহাদের গলায় নারীমুণ্ডের মালা, কটি বেষ্টন করিয়া নারী-হস্ত-পদ-রচিত মেখলা। মুক্তোর দেহটা অদূরে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, সেই বিচ্ছিন্ন দেহটা ঘিরিয়াই নৃত্য উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। আরও কিছুদূরে একদল বন্দিনী— মিষ্টিদিদি, সোনাদিদি, শৈল, রিনি, চুনচুন—তাহাদের ঘিরিয়াও একদল উন্মত্ত পুরুষ পাশব চিৎকারে প্রান্তর প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেছে, সকলের হাতে খড়্গ। নিকটে অভ্রভেদী একটি রক্তাক্ত যূপকাষ্ঠ...

সহসা শঙ্করের নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে বিছানায় উঠিয়া বসিল। স্বপ্নের ঘোরটা তখনও ভালো করিয়া কাটে নাই, মাংসলোলুপ নরপশুদের উন্মত্ত চিৎকার তখনও তাহার কানে বাজিতেছিল। খানিকক্ষণ মুহ্যমানের মতো সে বিছানায় বসিয়া রহিল। তাহার পর উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

হাত-মুখ ধুইয়া বাহিরের ঘরে গিয়া বসিতেই মিসেস স্যানিয়াল আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটি চিঠি বাহির করিয়া বলিলেন, দু-একদিন থেকে আপনার এই চিঠিখানা এসে পড়ে আছে, আমার আর দিতেই মনে থাকে না। তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, মনে থাকবে কি করে, আপনার দেখাই পাওয়া যায় না আজকাল। মিসেস স্যানিয়াল ওষ্ঠাধর দৃঢ়নিবদ্ধ করিয়া অগ্নিগর্ভ এবং কর্তব্যদ্যোতক একটা দৃষ্টি শঙ্করের দিকে নিক্ষেপ করিলেন এবং শঙ্করকে চিঠিখানা দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্কর খামটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, দামি নীল রঙের খাম, হাতের লেখা চিনিতে পারিল না। খুলিয়া দেখিল, বেলার চিঠি—

শঙ্করবাবু,

আপনাকে ইতিপূর্বে কখনও চিঠি লিখিনি এবং জীবনে আর হয়তো কখনও লেখবার সুযোগও হবে না। আজও না লিখলে চলত, কিন্তু দেশ ছেড়ে চলে যাবার আগে আপনার সঙ্গে (কেবল আপনার সঙ্গেই) একবার দেখা করে যেতে ইচ্ছে করছে। আমি যে চলে যাচ্ছি, এ খবর কাউকে জানালাম না; জানাতে ইচ্ছে হল না। যে বুড়ো সায়েবটিকে রোজ পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতাম, তাঁর সঙ্গে বিলেত চললাম। তিনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সংসারে আপনজন কেউ নেই, তিনি অনেকদিন থেকেই আমাকে বলছিলেন তাঁর সঙ্গে যেতে। দেশ ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে ছিল না বলে এতদিন রাজি হইনি। কিন্তু এখন দেখছি, এ দেশে আমার মতো মেয়ের পক্ষে ভদ্রভাবে বাস করা অসম্ভব। এ দেশে যে কোনো মেয়ে, তা সে সুরূপা কুরূপা যাই হোক, যদি ভদ্রভাবে থাকতে চায়, তাহলে তাকে বিয়ে করে অর্থাৎ একজন পুরুষের পদানত হয়ে থাকতে হবে—সে পুরুষটি যুবক, বৃদ্ধ, মূর্খ, বিদ্বান, সচ্চরিত্র, দুশ্চরিত্র যাই হোন। অধিকাংশ মেয়ের পক্ষে এইটেই হয়তো বাঞ্ছিত পরম গতি এবং সমাজের কল্যাণের পক্ষে এই হয়তো সুচিন্তিত সুষ্ঠু ব্যবস্থা। আমি কিন্তু পারলাম না, আমার বিদ্‌ঘুটে রুচি নিয়ে কিছুতেই এ ব্যবস্থা মানতে প্রবৃত্তি হল না আমার। এ জন্যে অহরহ

ক্ষণে ক্ষণে অপমানিত হয়েছি, কিন্তু দমিনি; তবে শেষটা হার মানতেই হল। এবার রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছি। কারণ এখন এটা নিঃসংশয়ে বুঝেছি যে, এদেশে থাকা আমার পক্ষে আর নিরাপদ নয়। ও-দেশ নিরাপদ কি না জানি না, কিন্তু যতদূর শুনেছি তাতে মনে হয় ওরা আর যাই করুক, নারীকে অপমান করে না। বহুকালব্যাপী স্ত্রী-স্বাধীনতার ফলে ওদের সে ভয় ঘুচেছে। এসব অবশ্য আমাদের কল্পনা, সত্যি সত্যি ব্যাপারটা যে কি, স্বচক্ষে না দেখলে বোঝা যাবে না। সেখানেও যদি গিয়ে দেখি যে, ও-দেশও এ-দেশেরই মতো, তাহলে অনতিক্রম্য নিয়তিকে মেনে নিয়ে মনকে বোঝাতে চেষ্টা করব যে, আমরা কাগজে কলমে যতই না কেন নিজেদের মহিমার ঢাক পেটাই, আসলে এখনও মেয়েরা পুরুষ-পদানত জীব ছাড়া আর কিছু নয়; এবং মানব-সভ্যতার পরিধি তার আদিম গুহা ছেড়ে বেশি দূর অগ্রসর হয়নি।

আমাদের জাহাজ ৩রা ছাড়বে। আমি বাসা ছেড়ে দিয়েছি, মিঃ স্মিথের ফ্ল্যাটেই আছি, ৭৫০ নং চৌরঙ্গি স্ট্রিট। আপনি যদি সময় করে যান বড়ই সুখী হব। আপনি আমাকে যে বায়রন গ্রন্থাবলী দিয়েছিলেন, সেটা আমি সযত্নে রেখেছি এবং যতদিন বাঁচব সযত্নে রাখব। কিন্তু আপনার একটি অনুরোধ আমি রাখতে পারিনি— I could not accept Byron.

কাল নিশ্চয়ই আসবেন, সকালের দিকে আমি বাসায় থাকব। ইতি—

বেলা মল্লিক

শঙ্কর ক্যালেন্ডারের পানে চাহিয়া দেখিল, আজ পাঁচ তারিখ। পরশুদিন বেলার জাহাজ ছাড়িয়া গিয়াছে। শঙ্কর কল্পনায় দেখিতে লাগিল, জাহাজের রেলিঙে ভর দিয়া ভ্রূভঙ্গি সহকারে অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া বেলা তাহার পথপানে চাহিয়া আছেন।

।। বত্রিশ ।।

দেখিতে দেখিতে সাত দিন কাটিয়া গেল।

এই সাতটা দিন শঙ্কর অন্যমনস্কভাবে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে কাটাইয়া দিল। যেদিন সে বেলার চিঠি পাইল, সেই দিনই সে মিসেস স্যানিয়ালের বাড়ি হইতে বিদায় লইয়া মৃন্ময়ের বাসায় আসিয়া উঠিল। মিসেস স্যানিয়ালের বাসায় থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। ভণ্টুর আপিসে মৃন্ময়ের চাকরিটা হইয়া যাওয়াতে মুকুজ্জেমশাই শঙ্করের চাকরির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন এবং এই উপলক্ষে তাঁহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে হইয়াছিল। পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের একটি ভালো চাকরি খালি ছিল। মুকুজ্জেমশাইয়ের পরিচিত পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে একজন পদস্থ অফিসার সিমলায় ছিলেন, চিঠি লেখার চেয়ে নিজে গেলে বেশি কাজ হইবে ভাবিয়া মুকুজ্জেমশাই নিজেই সেখানে গিয়াছিলেন। মৃন্ময় কাজে যোগদান করিয়াছিল, সুতরাং শঙ্করের দিনগুলি রাস্তায় এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে কাটিতেছিল। দিনে সে মৃন্ময়ের সহিত খাইয়া বাহির হইয়া যাইত এবং ফিরিত সকলে ঘুমাইয়া পড়িবার পর। তাহার খাবার বাহিরের ঘরে ঢাকা দেওয়া থাকিত। সে মৃন্ময়কে এড়াইয়া চলিয়াছিল। তাহার অত্যুচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা সে হজম করিতে পারিতেছিল না: কারণ ইহা সে ভালো করিয়াই জানিত যে, নিজের অহঙ্কারের প্রেরণাতেই সে মৃন্ময়ের উপকারটা করিয়াছে।

ব্যাপারটা কাকতালীয়বৎ। মৃন্ময় যদি না-ও থাকিত, তাহা হইলেও সে ভণ্টুর আপিসে ভণ্টুর অধস্তন কর্মচারী হইয়া কাজ করিতে পারিত না। কিন্তু মৃন্ময় ইহা জানে না, সে শঙ্করকে দেখিলে এমন একটা মুখভাব করে, যেন সে দেব-দর্শন করিতেছে। শঙ্কর মনে মনে লজ্জিত হইয়া পড়ে, অনুপার্জিত এই শ্রদ্ধা গ্রহণ করিতে তাহার সঙ্কোচ হয় এবং এইজন্যই তাহার সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। একজন মানুষ আর একজন মানুষের সান্নিধ্য যে কত কারণেই এড়ায়!

শঙ্কর শুধু যে মৃন্ময়কে এড়াইয়া চলিতেছিল তাহা নয়, সে সকলকেই এড়াইয়া চলিতেছিল। মানুষের সঙ্গই তাহার ভালো লাগিতেছিল না। মিল্‌টন, শেক্সপিয়ার, শেলি, কিটস, রবীন্দ্রনাথের জগতে পরিভ্রমণ করিয়া, অবাস্তব কল্পলোকের নর-নারীর সাহচর্যে সে নিজেকেই ভুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। ধীরে ধীরে আবিষ্কার করিতেছিল যে, এই অবাস্তব লোকের প্রাণীগুলিকেই বাস্তব জীবনের স্থায়ী অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ উহারা নির্ভরযোগ্য, চিরকাল উহাদের এক রূপ। শেলি কিটসের স্কাইলার্ক নাইটিঙ্গেল কখনও বেসুরা গাহিবে না, রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কখনও জরাগ্রস্ত হইবে না, শেক্সপিয়ারের নাটকের চরিত্রগুলি চিরদিন একসুরে একভাবে একভঙ্গিতে কথা বলিবে, ব্রুটাস কখনও দেশদ্রোহী হইবে না, ওফেলিয়া কখনও পাপীয়সী হইবে না, ইয়াগো কখনও মহাত্মা হইবে না। কিন্তু বাস্তব জগতের ক্ষণভঙ্গুর মানুষেরা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হইয়া বুদ্‌বুদের মতো অবশেষে একদিন বিলীন হইয়া যাইবে। তাহাদের ওপর নির্ভর করিলে নিরাশ হইতে হইবে। কল্পজগতের সার্থক সৃষ্টিগুলি অমর এবং অপরিবর্তনীয় বলিয়াই নির্ভরযোগ্য। তাহারা আজ এক কথা— কাল আর এক কথা বলে না। স্বপ্নের পাখায় ভর করিয়া শঙ্করের মন দিব্যলোকে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। সহসা একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাকে রূঢ় মর্ত্যলোকে নামিয়া আসিতে হইল। বাসায় ফিরিয়া টেলিগ্রাম পাইল, সন্ন্যাসরোগে বাবা মারা গিয়াছেন। টেলিগ্রামটার দিকে সে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

ট্রেনে বসিয়া সে ভাবিতেছিল, বাবার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল না কেন? সমস্ত অন্তরটা মাঝে মাঝে মুচড়াইয়া উঠিতেছে, মনের মধ্যে কেমন একটা শূন্যতা, কিন্তু চোখে জল নাই। কিছুতেই সে কাঁদিতে পারিল না, ট্রেনের কামরায় একা শুষ্ক চক্ষে অন্ধকারের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

।। তেত্রিশ ।।

শঙ্কর ফিরিয়া আসিল মাস-দেড়েক পরে। আসিয়া স্টেশন হইতে সে সোজা ভণ্টুর বাসায় গেল।

কবে এলি?

এখনই, সোজা স্টেশন থেকে তোর কাছেই এসেছি।

কেন?

তোর সেই কানা করালীর খবর কি বল্ তো?

তাকে নিয়ে কি করবি?

বাবা এক অদ্ভুত উইল করে গেছেন। আমি জানতাম না, করালীচরণ বক্‌সির সঙ্গে বাবার বন্ধুত্ব ছিল। বাবা মায়ের নামে ব্যাঙ্কে একটা ফিক্সড ডিপোজিট করে গেছেন, তারই সুদ থেকে মায়ের চলে যাবে। দেশের বাড়িটাও মাকে দিয়ে গেছেন। আর সম্পত্তির সমস্ত ভার দিয়ে গেছেন করালীচরণ বক্‌সির উপর। উইলে লেখা আছে— করালীচরণ যদি দেখেন যে, আমি নিজের পায়ে ভালোভাবে দাঁড়াতে পেরেছি, তা হলে, এবং যদি তিনি সমীচীন মনে করেন, তা হলে তাঁর বাকি সম্পত্তি আমি নয়—আমার স্ত্রী পাবে। আমি নিজের পায়ে যদি ভালোভাবে দাঁড়াতে না পারি, তাহলে সমস্ত সম্পত্তি কোনো সৎকার্যে দান করে দিতে হবে, আমার স্ত্রী কিছু পাবে না।

ভণ্টু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, করালীচরণ তো দ্রাবিড়ে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ! তবু চল, তার বাড়ির একটু খোঁজ-খবর নিয়ে আসা যাক। অনেক দিন যাওয়া হয়নি সেখানে।

মহা মুশকিলে পড়ে গেছি ভাই, মা ভয়ানক মুষড়ে গেছে, কিছুতেই ছাড়তে চাইছিল না আমাকে, অনেক কষ্টে পালিয়ে এসেছি আমি। উইলের কথা মা জানে না। আমি করালীচরণকে শুধু বলতে এসেছি, এ কথা মাকে কিছুতেই যেন জানানো না হয়। একটা চাকরি জুটলেই মাকে এনে নিজের কাছে রাখব আমি।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললি তুই রাস্কেল, তোর কপালে অশেষ দুর্গতি আছে। মুকুজ্জেমশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোর? সে চাকরিও তোর হয়নি, উনি যাবার আগেই লোক বাহাল হয়ে গেছে।

উভয়ে করালীচরণের বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

গলিতে ঢুকিয়াই পানওয়ালির সঙ্গে দেখা হইল। ঠিক মোড়ে তাহার দোকান। দোকানে দুইজন খরিদ্দার দাঁড়াইয়া ছিল। ভণ্টুকে দেখিবামাত্র মিশিমণ্ডিত দন্ত বাহির করিয়া একমুখ হাসিয়া পানওয়ালি বলিল, ঘর খোলাই আছে, আপনারা বসুন গিয়ে, আমি এই পান ক-খিলি সেজে দিয়েই যাচ্ছি।

এই বলিয়া নিপুণ ত্বরিতহস্তে চেরা পানগুলিতে সে চুন ও খয়েরগোলা মাখাইতে লাগিল। ভণ্টু ও শঙ্কর বকসিমশাইয়ের বাড়ির দিকে আগাইয়া গেল। দ্বার উন্মুক্তই ছিল। তাহা দেখিয়া ভণ্টু বলিল, দেখেছিস মাগীর আক্কেল, কপাট খুলে রেখে দিয়েছে, কেউ ঢোকে যদি! বক্‌সিমশাইয়ের অনেক জিনিসপত্তর আছে ঘরের মধ্যে, এই মোল্লাদের কোনো কাজ দিয়ে বিশ্বাস করবার উপায় নেই।

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া উভয়েই একটা দুর্গন্ধ অনুভব করিল। পচা ঘায়ের গন্ধ। মোস্তাক চৌকির ওপর শুইয়াছিল, তাহারা প্রবেশ করিতেই উঠিয়া বসিল এবং মুখবিকৃতি করিতে করিতে অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিলিটারি কায়দায় তাহাদের স্যালিউট করিল। মোস্তাকের বাঁ পায়ের পাতায় ময়লা ন্যাকড়া দিয়া বাঁধা প্রকাণ্ড একটা ঘা। পুঁজ রক্তে ন্যাকড়াটা ভিজিয়া রহিয়াছে এবং তাহা ঘিরিয়া বহু মাছি ভনভন করিতেছে। মোস্তাকের মুখময় গোঁফ-দাড়ি,

মাথায় অবিন্যস্ত চুলের বোঝা ধূলায় অযত্নে পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিয়াছে। ভাসা ভাসা চক্ষু দুইটি আরক্ত-বেদনাতুর। স্যালিউট করিয়া মোস্তাক আবার চোখ বুঝিয়া চৌকির ওপর শুইয়া পড়িল, কোনো কথা বলিল না, যেন তাহার যাহা করিবার ছিল করিয়া ফেলিল, আর কিছু বলিবার নাই। ভণ্টু ও শঙ্কর সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, এ কে?

ও মোস্তাক, বক্‌সিমশায়ের বন্ধু।

পানওয়ালি আসিয়া প্রবেশ করিল।

ওকে নিয়েই বিপদে পড়েছি বাবু। বলছে, পায়ের ওপর দিয়ে গাড়ি চলে গেছে। পরশু থেকে এখানে এসেছে, কিন্তু ওষুধ-বিষুধ কিছু লাগাতে দেবে না, পাড়ার ডাক্তারবাবুটিকে খোশামুদি করে ডেকে এনে দেখালুম, তাঁর ব্যবস্থামত তুলো আইডিন ব্যান্ডেজ কিনে আনলুম; কিন্তু আনলে কি হবে, ও পায়ে হাত দিতে দেবে কি? একে নিয়ে আমি কি করি বলুন তো?

ভণ্টু বলিল, হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও।

পানওয়ালি ইহাতে আপত্তি করিল। মাথা নাড়িয়া বলিল, না, তা আমি পারব না, হাসপাতালে শুনেছি বড় কষ্ট দেয় গরিবদের। ওরে পাগলা, ভাত খেয়েছিস?

মোস্তাক কোনো জবাব দিল না, চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। পানওয়ালি ঘরের কোণের দিকে আগাইয়া গিয়া ঝুঁকিয়া দেখিল।

খেয়েছে দেখছি। কত ভাত ছড়িয়েছে। কাল তো সমস্ত রাত খেলে না, সকালে এসে দেখি, ভাতের থালা যেমনকার তেমনই পড়ে আছে, সে ভাত আবার কুকুরকে ধরে দিই। আ আমার কপাল, একেই বলে পাগল। শাকচচ্চড়ি সব খেয়েছে, মাছটা খায়নি। মাছের পেটিটা দিলাম বেছে কাঁটা নেই বলে—ভাগ্যিস বেড়ালে নিয়ে যায়নি! নে, খা।

পানওয়ালি মাছের পেটিটা তুলিয়া মোস্তাকের মুখে ধরিল, মোস্তাক কুপ করিয়া খাইয়া ফেলিল। ভণ্টু জিজ্ঞাসা করিল, কাকটা কই?

ওধারে উঠোনে আছে। কি দস্যি কাক! পরশু হলুদজল করে নাওয়াতে গেছি, এমন ঠুকরে দিয়েছে হাতে যে, জ্বলে মরি!

পানওয়ালি হাতের ক্ষত দেখাইয়া হাসিল। আচ্ছা, এই বইগুলোর কি করি বলুন তো? উই ধরেছে, ঝেড়ে ঝেড়ে রোদে দিয়েছিলুম। কবে আসবে? কোনো খবর পেয়েছেন?

কিছু না।

খবর পেলে আগে থাকতে জানাবেন আমাকে একটু। তা না হলে আমাকে এখানে দেখলে তেলে-বেগুনে জ্বলে যাবে।

মিশি-মাখানো দাঁত বাহির করিয়া পানওয়ালি হাসিল।

বইগুলো চল তো দেখি! অনেক দামি বই আছে।

দেখুন না।

শঙ্কর চুপ করিয়া ছিল। পানওয়ালি, মোস্তাক এবং খাঁচায় পোরা দাঁড়কাকের সহিত একচক্ষু করালীচরণকে সংযুক্ত করিয়া তাহার মন এক বিচিত্র রসে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। এই লোকটিরই হাতে বাবা বিষয়-সম্পত্তির ভার দিয়া গিয়াছেন। সহসা একটা কথা মনে করিয়া

লোকটার ওপর শঙ্করের শ্রদ্ধা হইল। তাহার বিবাহ সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করালীচরণ করিয়াছিলেন, তাহা তো অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে।

ভণ্টু আলমারি খুলিয়া দেখিতেছিল।

ওরে, এখানে একটা লম্বা খামে কি একটা দলিলের মতো রয়েছে, দেখ তো, এটাই তোর ব্যাপার কি না!

হ্যাঁ, এ তো বাবার হাতের লেখা।

খুলিয়া দেখিল, বাবার উইলের একটা কপি এবং করালীর নামে একখানি চিঠি। চিঠিতে অম্বিকাবাবু করালীচরণকে এই ভার গ্রহণ করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন। সমস্ত পড়িয়া শঙ্কর বলিল, এগুলো এখানেই থাক, করালীবাবু এলে তখন যা হয় করা যাবে।

ভণ্টু পানওয়ালিকে বলিল, আমি চললাম এখন।

পানওয়ালি চোখের ইশারায় ভণ্টুকে একটু আড়ালে ডাকিয়া বলিল, পাগলাটাকে আপনি একটু ভয় দেখিয়ে শাসন করে দিয়ে যান, যাতে ও ওষুধ লাগাতে দেয় আমাকে।

ভণ্টু মোস্তাকের কাছে আগাইয়া গিয়া বলিল, তুমি যদি ওষুধ লাগাতে না দাও, কালই তোমাকে হাসপাতালে দিয়ে আসব, সেখানে পা কেটে বাদ দেবে তোমার।

মোস্তাক চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

পানওয়ালি মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

ভণ্টু ও শঙ্কর বাহির হইয়া আসিল।

শঙ্কর বলিল, চল, মৃন্ময়ের বাসায় যাই।

তুই যা, আমাকে জুলফিদারের কাছে যেতে হবে।— বলিয়া সে বাইকে সওয়ার হইল।

।। চৌত্রিশ ।।

মৃন্ময় বাড়িতে ছিল না। গিয়াই মুকুজ্জেমশাইয়ের সঙ্গে দেখা হইল।

সব নির্বিঘ্নে হয়ে গেল তো?

হ্যাঁ।

শিরীষের সঙ্গে দেখা হল? অমিয়া এসেছিল?

সকলেই এসেছিল। শ্বশুরমশায় চলে গেলেন, অমিয়া মায়ের কাছেই রইল।

তোমার বাবা কোনো উইল করে গেছেন নাকি?

শঙ্কর উইলের কথা খুলিয়া বলিল, মুকুজ্জেমশাইয়ের নিকট ইহা গোপন করার কোনো প্রয়োজন সে দেখিল না। সব শুনিয়া মুকুজ্জেমশাইয়ের চোখ দুইটি হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

নিজের পায়ে তো তুমি দাঁড়িয়ে গেছই, চাকরি তোমার হয়ে গেছে।

মুকুজ্জেমশাই উঠিয়া ইংরেজিতে লেখা একখানি চিঠি আনিয়া দিলেন। জনৈক পি. দত্ত তাহাকে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে 'আদর্শ' নামক বাংলা মাসিক-পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত করিতেছেন। তিনি শঙ্করকেই কলিকাতায় আপিস খুলিবার ভার দিয়াছেন। মাসিক এক শত

টাকা বেতনের মধ্যে একজন সহকারী সম্পাদক ও একটি ক্লার্ক নিয়োগ করিতে এবং একটি ভালো প্রেসে কাগজ ছাপাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। কাগজের ছাপা এবং গেট-আপ যেন ভালো হয়, প্রেসের বিল তিনি আলাদা দিবেন। লেখকদেরও যথোচিত পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে। শঙ্করের পত্র পাইলেই তিনি কলিকাতার ব্যাঙ্কে টাকাকড়ির সব বন্দোবস্ত করিবেন।

উত্তেজনায় শঙ্করের কানের দুই পাশ গরম হইয়া উঠিল। কে এই পি. দত্ত তাহার স্বপ্ন সফল করিবার জন্য বোম্বেতে বসিয়া আছেন?

মৃন্ময় ওপরে ছিল, নামিয়া আসিল।

আপনার আর একখানা চিঠি এসেছে, আমার কাছে আছে।

টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া একটি মোটা খামের চিঠি মৃন্ময় শঙ্করকে দিল। শঙ্কর দেখিল, সুরমার চিঠি।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, আমার কাজ তো শেষ হয়ে গেল। আজ রাত্রেই আমি খুলনায় যাচ্ছি

খুলনা? কেন?

দরকার আছে।

মুকুজ্জেমশাই মনোরমা এবং আস্‌মির খোঁজে বাহির হইতেছেন সে কথা আর বলিলেন না, অপ্রয়োজনীয় কথা বলা তাঁহার স্বভাব নয়। তিনি নিজের জিনিসপত্র গুছাইতে লাগিলেন।

লোকের সঙ্গ আর ভালো লাগিতেছিল না; সুরমার পত্রটা পকেটে পুরিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

গড়ের মাঠে একটি নির্জন অংশে বসিয়া শঙ্কর সুরমার পত্রখানি পড়িতেছিল। খামের ভিতর দুইখানি চিঠি ছিল— একটি সুরমার, আর একটি উৎপলের। সুরমা লিখিয়াছে—

শঙ্করবাবু,

এই আপনার কাছে আমার প্রথম চিঠি। অর্থাৎ এ চিঠির ভাব, ভাষা, হাতের লেখা সবই আমার। এতদিন আপনাকে যে সব চিঠি আমি লিখেছি, সেগুলোর হাতের লেখা আমার ছিল বটে, কিন্তু ভাব ভাষা আমার ছিল না। আপনার বন্ধু চিঠিগুলো বিলাত থেকে লিখে পাঠাতেন, আমি সেগুলো টুকে দিতুম। আপনার বন্ধুকে চেনেন তো? একটা অদ্ভুত রকম কিছু করে মজা দেখতে পেলে আর কিছু চান না উনি। এমনকি সেবারে যে ফোটোগুলো পাঠিয়েছিলুম, সেগুলোও উনি বিলেত থেকে তুলে পাঠিয়েছিলেন। ওঁর পাল্লায় পড়ে আপনার সঙ্গে এই যে সামান্য চাতুরিটুকু করেছি, এর জন্যে আমি লজ্জিত এবং এর জন্যে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি— যদিও পনেরো আনা দোষ আপনার বন্ধুটিরই। উনিই এই সঙ্গে আপনাকে চিঠি দিচ্ছেন, তাতে সব কথা জানতে পারবেন। আমার নমস্কার নিন। আশা করি ভালো আছেন। ইতি—

শ্রীসুরমা ঘোষ

উৎপল লিখিয়াছে—

ভাই শঙ্কর,

এতদিন সুরমার বেনামীতে তোমাকে যে চিঠিগুলি লিখেছি, তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তোমার নাড়ী পরীক্ষা করা। কলকাতায় লক্ষ্য করেছিলাম যে, সুরমার সান্নিধ্যে তোমার নাড়ী

কিঞ্চিৎ রসস্থ হয়েছিল। সে ধারণা আরও দৃঢ় হল, যখন দেখলাম, তুমি আমার আসবার দিন হন্তদন্ত হয়ে হাওড়া স্টেশনে একরাশ লাল লাল গোলাপ নিয়ে হাজির হলে। ট্রেনে যেতে যেতে মাথায় একটু দুষ্টবুদ্ধি জাগল, সুরমার সঙ্গে পরামর্শ করে ফেলা গেল যে, তোমার ঈষৎ-সচেতন রস-পিপাসাকে উতলা করে তুলতে পারে এমন একটা কিছু করে দূর থেকে বসে মজা দেখতে হবে। চিঠি লেখাই সাব্যস্ত হল, কিন্তু সুরমা নিজে কিছুতেই চিঠি লিখতে রাজি হল না। একটি জিনিস লক্ষ্য করেছ? আমাদের দেশের মেয়েরা সব বিষয়েই সর্বক্ষণ সিরিয়াস. রসিকতাকে নিছক রসিকতা হিসাবে গ্রহণ করা ওদের সাধ্যাতীত। যাই হোক. সুরমাকে অনেক কষ্টে রাজি করালুম যে, আমি চিঠিগুলো লিখে দেব ও টুকে পাঠিয়ে দেবে এবং তোমার উত্তর এলে উত্তরগুলো আমার কাছে পাঠাবে। এটা অবশ্য আশা করিনি যে, তুমি 'যাও পাখি বলো তারে'-মার্কা গোলাপী চিঠির কাগজে সবুজ কালি দিয়ে রাত্রি-জাগরণক্লিষ্ট বাষ্পাচ্ছন্ন নয়নে উচ্ছ্বসিত প্রেম-পত্র লিখতে থাকবে। তবে এটা নিশ্চয়ই আশা করেছিলুম যে, তোমার সভ্যভব্য চিঠির মধ্যেও এমন এক-আধটা খোঁচ থাকবে, যা উপভোগ করে আমরা আনন্দ পাব। তুমি কিন্তু আমাদের নিরাশ করেছ। অমন নিরামিষ চিঠি বোধহয় ভাইও বোনকে লেখে না। নিরাশ হয়ে অবশ্য আনন্দিতই হয়েছি, কলকাতায় সুরমার সান্নিধ্যে তোমার মনে যে রস-সঞ্চার হয়েছিল, সে রকম রস-সঞ্চার যে কোনো সুন্দরী যুবতীর সান্নিধ্যে যে কোনো সুস্থ যুবকের মনে হওয়া জৈবিক ধর্ম অনুসারেই স্বাভাবিক। বিলেতে থাকবার সময় নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই এ সত্য দু-চারবার হৃদয়ঙ্গম করেছি। রস-সঞ্চার হওয়াটা স্বাভাবিক. কিন্তু রস-দমন করাটাই মনুষ্যত্ব। সে মনুষ্যত্বের পরিচয় তোমার মধ্যে পেয়ে আনন্দিত হয়েছি।

যাক ওসব কথা, এইবার কাজের কথা বলি শোন। বিলেতে গিয়েছিলাম ব্যারিস্টারি পড়তে, পড়ে এসেছি জার্নালিজম। অক্সফোর্ডের একটা ডিগ্রি অর্জন করেছি। সেই ডিগ্রি নিয়ে বহু তৃতীয় শ্রেণীর লোকের দ্বারস্থ হয়ে তাঁহার দৈহিক নানা স্থানে প্রচুর তৈলনিষেক করতে পারলে হয়তো দুশো আড়াইশো টাকা বেতনের একটা চাকরি জোগাড় করতে পারা যেত. কিন্তু তা করতে প্রবৃত্তি হল না। তুমি তো ভাই জানই চাকরি করা জিনিসটাকে আমি বরাবর ঘৃণা করি। সেইজন্যই বোধ হয় কৃপাপরবশ হয়ে ভগবান আমাকে একটি শাঁসালো শ্বশুর জুটিয়ে দিয়েছেন। আমার শ্বশুর ব্যবসা করে ব্যাঙ্কে যে টাকা সঞ্চয় করেছেন, তার পরিমাণ ঠিক কত আমি জানি না। তবে তিনি মেয়েকে (অর্থাৎ সুরমাকে) পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। এই টাকাটা অযাচিতভাবে হাতে এসে পড়াতে ঠিক করেছি যে, একখানা বাংলা এবং একখানা ইংরেজি মাসিক-পত্র বেশ ভালো ভাবে বার করব। খুব ভালো মাসিক-পত্র আমাদের দেশে নেই. উঁচু আদর্শ রক্ষা করে যদি চালাতে পারা যায়, নিশ্চয়ই ভালোভাবে চলবে। বাংলা কাগজটার নাম দিয়েছি 'আদর্শ', ইংরেজিটার 'The Ideal' । ইংরেজি কাগজটা আমি এখান থেকে চালাব, বাংলা কাগজটার ভার তোমাকে নিতে হবে। আমি প্রথমে বাংলা কাগজটার একজন সহকারী সম্পাদকের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। আবেদনকারীদের মধ্যে একজন শঙ্করসেবক রায় দেখে সন্দেহ হল যে, হয়তো এ আমাদেরই শঙ্কর। ফোটো চেয়ে পাঠালাম। ফোটো আসতে সন্দেহ দূর হল। তোমার বাড়ির ঠিকানায় একটি চিঠি লিখে কোনো উত্তর পাইনি, তাই ফোটো চাইতে হয়েছিল। তোমাকে সহকারী নয়, পুরোপুরি সম্পাদকই হতে হবে। পি. দত্তের সই-করা

চিঠি নিশ্চয়ই পেয়েছ। পি. দত্ত অপর কেউ নয়, আমার বড় সম্বন্ধী—প্রবীর দত্ত। আমি ইংরেজি কাগজটার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত আছি; প্রবীর আমার হয়ে কাগজটার সম্পর্কে চিঠিপত্র লেখালেখি করছে।

এই সম্পর্কে আমার অনেক হিতৈষী বাঙালি-চরিত্রের অতীত নজির উদ্ধার করে আমাকে সাবধান করেছেন যে, টাকাটা মারা যাবে অর্থাৎ তোমার অপটুতা অথবা অসাধুতা অথবা দুইই এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আত্মপ্রকাশ করবে যে, আমি চমকে যাব। বন্ধু-প্রীতি বিষয়ে নাতিক্ষুদ্র একটি নিবন্ধ রচনা করে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠবার এমন একটা সুযোগ পেয়েও আমি সেটা ছেড়ে দিলাম, তার কারণ, জিনিসটা অত্যন্ত 'ভালগার' শোনাবে। দ্বিতীয়ত, টাকাগুলি অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়েছি, অপ্রত্যাশিতভাবে যদি যায়ও, বেশি লাগবে না আমার। তবে এ বিষয়ে আমার সত্যিকার মত কি, তা তোমাকে বলছি। বেশি জলে না নামলে সাঁতার শেখা যায় না। সাঁতার শিখতে গিয়ে দু'চারজন ডুবে মরে তা সত্যি, কিন্তু এই দু'চারজনের উদাহরণ আস্ফালন করে সব সাঁতার-শিক্ষার্থীদের ভড়কে দেওয়ার কোনো সার্থকতা দেখতে পাই না। বন্ধু হিসেবে তোমাকে এইটুকু শুধু অনুরোধ করছি যে, যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করে সাঁতারটা শিখে ফেল। অগাধ জলে স্বচ্ছন্দে সাঁতরাবার কৌশলটা আয়ত্ত করা সহজ নয়, কিন্তু তোমাকে যতদূর জানি অসাধ্য-সাধন করবার শক্তি তোমার কাছে। আর একটা কথা, যদি ডোব, আর কারও কিছু হবে না, তুমিই ডুববে। যত শীঘ্র সম্ভব কাজ শুরু করে দাও। আশা করি, অন্যান্য সব খবর ভালো। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু-সংবাদে ব্যথিত হলাম। শৈলর চিঠিতে তোমার সব খবর জেনেছি। অবিলম্বে উত্তর দিও—

উৎপল

কে, শঙ্করবাবু নাকি, এখানে একা বসে কি হচ্ছে?

শঙ্কর চমকাইয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিল, ঠিক পিছনে অচিনবাবু দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। ভদ্রলোক যে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন শঙ্কর মোটেই টের পায় নাই।

এখানে কি করছেন?

এমনি বেড়াতে এসেছি।

আচ্ছা, একটা খবর আমাকে বলতে পারেন? এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, খবরটা জানবার জন্যে নেমে পড়লাম।

কি খবর?

মিস্ বেলা মল্লিক আজকাল কোন্ ঠিকানায় আছেন?

তিনি এদেশে নেই, বিলেত গেছেন।

বলেন কি, বিলেত! কার সঙ্গে?

একটি বুড়ো সায়েবকে তিনি পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতেন, তাঁরই সঙ্গে।

অচিনবাবু গম্ভীর বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

যাক, তা হলে তো মিটেই গেল। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিই।

না, আমি এখন যাব না।

কবিতা ভাবছেন বুঝি?— মৃদু হাসিয়া অচিনবাবু কারে গিয়া আরোহণ করিলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে শঙ্কর বাসায় ফিরিল। ঢুকিতে যাইবে, এমন সময় সাইকেলের ঘণ্টা দিতে দিতে ভণ্টু আসিয়া হাজির হইল এবং হাসিয়া বলিল, তুই কোথাও বেরুচ্ছিস নাকি?

না, আমি এই ফিরছি।

তা হলে তো ভালোই হল। আমি জুলফিদারের কাছে গিয়েছিলাম; সব বলছি, চ, জুলফিদার দি গ্রেট আবার এক হাত দেখিয়েছে। কড়া নাড়।

কড়া নাড়িতেই মৃন্ময় দ্বার খুলিয়া দিল।

মৃন্ময়কে দেখিয়া ভণ্টু বলিল, মিস্টার ক্যান্ডল, তুই আর মিসেস স্মাইল পরশুদিন সকালে আমাদের বাসায় যাস। শঙ্কর, তুইও যাস। পরশু রবিবার আছে, জুলফিদার আমাকে ব্লেসিং আপিস খুলবে ঠিক করেছে।

সে আবার কি?

আশীর্বাদ করবে রে রাস্কেল, এটা বুঝতে পারছিস না? জুলফিদার কিন্তু এগেন এক হাত দেখিয়েছে।

কি রকম?

তোর কথা আজ আবার জুলফিদারকে বলেছিলাম। জুলফিদার বললে যে, আমাদের আপিসে তো আর চাকরি খালি নেই, তবে হল অ্যান্ডারসনে একটা পোস্ট শিগ্‌গিরই খালি হবে, সেটা আমি জোগাড় করে দিতে পারি।

মৃন্ময় হাসিয়া বলিল, ওঁর খুব ভালো চাকরি হয়ে গেছে।

কোথায়?

মৃন্ময় সব কথা খুলিয়া বলিতে ভণ্টু খানিকক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে শঙ্করের দিকে তাকাইয়া রহিল; তাহার পর সহসা তাহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া গেল।

চোর কোথাকার, আমাকে তো কিছু বলিসনি এতক্ষণ! তা হলে চা খাওয়া ছাড়া তো উপায় নেই। স্মাইলকে খুব কড়া করে চা করতে বল। চা খেয়ে এখুনি বেরুতে হবে।

মৃন্ময় চায়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য উঠিয়া গেল।

আবার কোথায় বেরুবি এখন?

ওহো, তোকে বলতেই ভুলে গেছি, ওরিজিনাল গন। তাকে পোড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে।

মারা গেলেন?

বেঁচে গেলেন বল।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে ভণ্টু বলিল, বাবাজির কাণ্ড শুনেছিস?

না।

বাবাজিকে বিয়ের খবর দিয়ে একটা চিঠি লিখেছিলাম, বাবাজি কি উত্তর দিয়েছে দেখ।

ভণ্টু পকেট হইতে একটি পোস্টকার্ড বাহির করিয়া দিল।

কল্যাণবরেষু,

তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্য রকম ছিল। তুমিও যে শেষ পর্যন্ত বিষ্ণুচরণের মতো বিবাহ করিয়া এক দঙ্গল অপোগণ্ড সৃষ্টি করিতে থাকিবে, ইহা আমি ভাবি নাই। আমি প্রায়

পনেরো দিন হইল প্রয়াগে আসিয়াছি, ইচ্ছা ছিল, তোমাদের গিয়া একবার দেখিয়া আসিব। কিন্তু তোমার পত্র পাইয়া আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছে। সংসারের কীট তোমরা, সংসারের পাঁকে সমস্ত জীবন কাটাও। আমাকে আর উহার মধ্যে টানিও না। দূর হইতে আশীর্বাদ করিতেছি, ভগবান তোমাদের রক্ষা করুন। ওই অবস্থায় যতটা সুখ সম্ভব, ততটা সুখ যেন তোমাদের ভাগ্যে ঘটে। ইতি—

আশীর্বাদক
তোমার মেজকাকা

পড়িয়া শঙ্কর পোস্টকার্ডখানি ফেরত দিল।

ভণ্টু হাসিয়া বলিল, চাম চামাটু বাবাজি।

কিন্তু বাবাজির চিঠিতে ভণ্টু যে মর্মাহত হইয়াছে, তা সে হাসি দিয়া ঢাকিতে পারিল না।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

পাশের বাড়ির ঘড়িতে দশটা বাজিল।

চা খাইয়া ভণ্টু চলিয়া গেল, খানিকক্ষণ পরে মৃন্ময় ওপরের ঘরে উঠিয়া গেল, তাহার ঘুম পাইয়াছিল। নিচের ঘরে শঙ্কর একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অপরিচিত পি. দত্তের চিঠি পাইয়া সে পুলকিত হইয়া উঠিলেও সুরমা ও উৎপলের চিঠি পাইয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল যে, এ চাকরি সে গ্রহণ করিতে পারিবে না। শৈলর দাদা ও সুরমার স্বামী বাল্যবন্ধু উৎপলের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া সে জীবনযাপন করিতে পারিবে না। যাহাদের চক্ষে সে নিজেকে এতদিন মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের কাছে নিজের গৌরব খর্ব করিতে পারিবে না। ভণ্টু এবং উৎপল শ্বশুরের প্রসাদে প্রসন্নমনে থাকুক এবং নিজেদের লইয়া থাকুক. শঙ্করের উপর তাহাদের কৃপাবর্ষণ করিতে হইবে না। ঈর্ষায়, ক্ষোভে, তিক্ততায় তাহার সমস্ত অন্তরটা জ্বালা করিতে লাগিল। সে তখনই কাগজ কলম লইয়া আসিল এবং উৎপলের চিঠির জবাব লিখিয়া ফেলিল।—

ভাই উৎপল,

তোমার চিঠি এবং তোমার আর্থিক সচ্ছলতার কথা শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিলাস-ব্যসনে মন না দিয়ে সাহিত্য সেবায় মন দিয়েছ, এটাও আনন্দের কথা। আমি যদিও তোমার বিজ্ঞাপনের উত্তরে স-ফোটো দরখাস্ত করেছিলাম, কিন্তু এখন ভেবে দেখছি, যে ভার আমাকে তুমি দিতে চেয়েছ সে ভার আমি নিতে অক্ষম। প্রথমত, তোমার সাহিত্যিক আদর্শের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক আদর্শ না মিলতে পারে। দ্বিতীয়ত, কোনো বন্ধুর অধীনে কাজ করবার প্রবৃত্তি আমার নেই। বন্ধু প্রভু হলে উভয় পক্ষকেই অশান্তি ভোগ করতে হয়। সাহিত্য-সেবা আমিও করব, কিন্তু এভাবে করতে পারব না। কারণ মনে প্রসন্নতা এবং স্বাধীনতা না থাকলে সাহিত্যচর্চা করা যায় না। তুমি অন্য লোক দেখ।

তোমরা দুজনে ষড়যন্ত্র করে আমাকে যে পরীক্ষায় ফেলেছিলে, তা থেকে যে আমি মানে মানে উত্তীর্ণ হয়েছি, এটা উভয়েরই সুখের বিষয়। সেদিন আমার সর্বস্ব ব্যয় করে লাল লাল গোলাপ ফুল নিয়ে গিয়েছিলাম. তার একমাত্র কারণ— তখন আমি বোকা ছিলাম। নি-খরচায় ঠোঁটের কোলে একটু হাসি আর চোখের কোণে একটু ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা বিকিরণ করে কাজ

হাসিল করবার আর্টটা তখনও ভালো করে আয়ত্ত করতে পারিনি। বোকার মতো অর্থব্যয় করে বসেছিলাম। এখন এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করবার চেষ্টা করছি যে, আমার বোকামিটাকে কেন্দ্র করে তোমরা দুজনে আনন্দলাভ করেছিলে তো! পরোক্ষভাবেও বন্ধু-দম্পতিকে খুশি করতে পেরেছি—তাই বা কম কি!

তোমাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, কারণ সুরমার মতো মহিলা তোমার সহধর্মিণী এবং সুরমার বাবার মতো সহৃদয় ব্যক্তি তোমার শ্বশুর। আশা করি, ভালো আছ সব। মাঝে মাঝে গরিব বন্ধুর খবর নিও। ইতি—

শঙ্কর

চিঠিটা খামে পুরিয়া সে ঠিকানা লিখিয়া ফেলিল। তাহার মনে হইল, চিঠিটা এখনই পোস্ট করিয়া দিলে ভালো হয়, কারণ কি জানি আবার যদি মত বদলাইয়া যায়! পারিপার্শ্বিক ঘটনার চাপে বিবেকের যুক্তি হয়তো নাও টিকিতে পারে। টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া দেখিল, একটা টিকিটও আছে। খামে টিকিট আঁটিয়া কপাট খুলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। নিকটে কোনো ডাকবাক্স ছিল না, হাঁটিতে হাঁটিতে শঙ্কর বড় রাস্তায় গিয়া পড়িল। বড় রাস্তাতেও খানিকক্ষণ হাঁটিয়া তবে সে ডাকবাক্স পাইল। চিঠিখানা পোস্ট করিয়া দিয়া সে বাঁচিল।

প্রায় আধঘন্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বাড়ির সামনে একটা মোটর দাঁড়াইয়া আছে। ঘরের কপাট খোলা। মনে পড়িল, সে নিজেই কপাট খুলিয়া চলিয়া গিয়াছিল। ভিতরে ঢুকিয়া তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সম্পূর্ণ অপরিচিত সাহেবি-পোশাক-পরা এক ব্যক্তি তাহার বিছানায় শুইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। সর্বাঙ্গে মদের গন্ধ। শঙ্কর খানিকক্ষণ বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ আবার কে?

গায়ে হাত দিয়া একটু ঠেলিতেই সাহেব উঠিয়া বসিলেন এবং মদিরাবিহ্বল চক্ষু মেলিয়া শঙ্করের মুখের দিকে এক সেকেন্ড চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনি কে?

আমি এইখানে থাকি।

আপনি এইখানে থাকেন? You mean this is your house?

আমার নিজের বাড়ি নয়, আমরা ভাড়াটে। আপনি কে?

মাই গড! এটা কি বিডন স্ট্রিট নয়?

আজ্ঞে না, সারপেনটাইন লেন।

আই সি।

সাহেব খানিকক্ষণ খোলা দ্বারটার পানে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, সাধারণত গেরস্ত-বাড়িতে এত রাত্রে কপাট খোলা থাকে না, তাই ভাবলাম, বুঝি আমারই বাড়ি। আই অ্যাম সো সরি, এটা সারপেনটাইন লেন! আই অ্যাম সো সরি।

ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না।

শঙ্কর বলিল, বসুন, যাচ্ছেন কেন?

ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িয়া সায়েব বলিলেন, আই সি you are a gentleman. না, আমি আর বসব না, উঠি এবার।

ভদ্রলোকের টলটলায়মান অবস্থা দেখিয়া শঙ্কর আবার বলিল, না না, বসুন।

O, you are damned good fellow.

তাহার পর শঙ্করের মুখের দিকে খানিকক্ষণ স্মিতমুখে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, আপনি কি স্টুডেন্ট?

না।

No? But you look it, কি করেন আপনি?

কিছুই করি না আপাতত।

No? কিছু করার ইচ্ছা রাখেন?

তাহার পর ঘাড়টা একটু কাত করিয়া সায়েব বলিলেন, What is your propensity? To swindle or to dwindle? These are the two things one must choose between.

কথাবার্তা শুনিয়া লোকটিকে নেহাত খেলো বলিয়া শঙ্করের মনে হইল না। শঙ্কর কোনো উত্তর না দিয়া হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। এই অদ্ভুত অতিথিটিকে তাহার বেশ ভালো লাগিতেছিল।

সায়েব বলিলেন, নিজে যদিও আমি একজন রটন, কিন্তু বাপের দৌলতে অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ আছে আমার। I can shut you on to any one of those two lines, I mean, swindling and dwindling. There are marvelous possibilities in both of them. আপনার মনের ঝোঁক কোন দিকে?

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, আমি সাহিত্যচর্চা করতে চাই।

O God Almighty, you are a poet! That's funny and that's great!

সায়েব পকেট হইতে একটা কার্ড-কেস বাহির করিলেন; তাহার পর শঙ্করের দিকে চাহিয়া বলিলেন, Will you lend me your poet's plume please?

শঙ্কর হাসিয়া দোয়াত কলম আগাইয়া দিল।

সাহেব কার্ডের পিছনে লিখিলেন, 'Hiron, he is a gentleman. Please take him in your gang.' তাহার নিচে নিজের নাম সই কবিয়া কার্ডখানি শঙ্করের হাতে দিলেন এবং বলিলেন, হিরণ is a bright boy.—সেও সাহিত্যচর্চা করছে, at least that's his present pose— চলে যান তার কাছে। আমি উঠি— I am so sorry. I disturbed you.

সায়েব উঠিলেন।

আমি কি আপনার সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব?

No, thanks, মোটরে উঠে বসে স্টিয়ারিং ধরতে পারলে I am as steady as a rock.

সায়েব টলিতে টলিতে গিয়া মোটরে উঠিলেন এবং মোটর স্টার্ট করিয়া গলি হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া কার্ডখানি উল্টাইয়া দেখিল, নাম লেখা রহিয়াছে— যোগেন রায়।

কে এই যোগেন রায়?

শঙ্কর কপাট বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু অনেকক্ষণ তাহার ঘুম আসিল না, সমস্ত দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা মনকে নানাভাবে নাড়া দিতে লাগিল। ঘুমাইয়া পড়িবার পর স্বপ্ন দেখিল, সমস্ত দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নয়— অমিয়াকে।

।। পঁয়ত্রিশ ।।

পরদিন সকালে উঠিয়াই শঙ্কর ঠিক করিল, হিরণবাবু বলিয়া কেহ আছে কি না, খুঁজিয়া দেখিতে হইবে। উঠিয়া টেবিলের ড্রয়ার হইতে কার্ডখানি বাহির করিল এবং কার্ডখানির দিকে চাহিয়া নির্বাক হইয়া গেল। সুরামত্ত যোগেন রায় সবই লিখিয়াছেন, কিন্তু ঠিকানা দেন নাই। নিজের না হিরণবাবুরও না। শঙ্কর তবু বাহির হইয়া পড়িল। বিডন স্ট্রিটটা খুঁজিয়া দেখিতে হইবে।

প্রায় প্রতি বাড়িতে জিজ্ঞাসা করিয়া বেলা বারোটা নাগাদ শঙ্কর যোগেন রায়ের বাড়িটা বাহির করিল বটে, কিন্তু যোগেন রায়ের দেখা পাইল না। শুনিল, যোগেনবাবু সকালের ট্রেনে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন। হতাশ হইয়া শঙ্কর ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে একটা বুকস্টলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। স্টলে নানারকম বই ও মাসিক পত্রিকা। শঙ্কর তাহার প্রিয় ও পরিচিত মাসিক পত্রিকা 'সংস্কারক' খানা উল্টাইতে লাগিল। একটু পরেই তাহার নজরে পড়িল 'ক্ষত্রিয়' নামে একটা নূতন পত্রিকা বাহির হইয়াছে। টানিয়া লইয়া দেখিতে লাগিল। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কাগজ, সম্পাদক—জ্যোতির্ময় বসু। হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল—পিছনের দিকে একটা বিজ্ঞাপন রহিয়াছে। একজন সুদক্ষ প্রুফ রিডার চাই। শ্রী হিরণকুমার রায়ের নিকট আবেদন করুন। ঠিকানা—ঠিকানা দেওয়া আছে। ইনি যোগেনবাবুর হিরণ নয় তো! শঙ্কর অবিলম্বে হিরণবাবুর ঠিকানার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

আধঘণ্টা পরে শঙ্কর হিরণবাবুর বাহিরের ঘরে বসিয়া অধীর-চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল।

দ্বার ঠেলিয়া একটি নাতিস্থূল সুদর্শন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। পরিধানে ঢিলা পায়জামার ওপর ড্রেসিং গাউন, ঈষৎ কটা চুলগুলি ব্যাক ব্রাস করা, বাঁ হাতের অনামিকায় দামি-পাথর-বসান একটি আঙটি। ডান হাতে মোটা বর্মা চুরুট।

আপনিই আমাকে খুঁজছেন?

আমি হিরণবাবুকে খুঁজছি।

আমারই নাম হিরণ, কি চান আপনি?

আপনি কি যোগেন রায় বলে কাউকে চেনেন?

চিনি।

শঙ্কর কার্ডখানা তাঁহার হাতে দিল।

হিরণবাবু কার্ডে লেখা কথাগুলি পড়িলেন, কার্ডখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, যোগীনদার সঙ্গে আপনার আলাপ আছে নাকি?

শঙ্কর আদ্যোপান্ত সব খুলিয়া বলিল।

যোগীনদা দু'দিনের জন্যে কলকাতায় এসেই একটা ইতিহাস করে গেছেন দেখছি!

একটু থামিয়া হিরণবাবু বলিলেন, আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি বলুন?

শুনলাম, আপনারা একটা কাগজ বার করছেন, তাতে যদি আমাকে কোনো কাজে—

আপনি লেখক?

একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, কিছু কিছু লিখি।

কি লেখেন?

বেশির ভাগই কবিতা।

বেশ, আপনার লেখা নিয়ে আসবেন।

কখন আসব?

আজ বিকেলেই আসতে পারেন।

শঙ্কর কয়েক সেকেন্ড নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমি এখন একেবারে বেকার। গ্রাসাচ্ছাদনের মতো একটা কোনো কিছু যদি জুটিয়ে দিতে পারেন ভালো হয়, আমি যে কোনো কাজ করতে রাজি আছি।

কবিতা লেখা ছাড়া আপনার আর কি কোয়ালিফিকেশন আছে? কতদূর লেখাপড়া করেছেন আপনি? বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

শঙ্কর একটি চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিল, হিরণবাবুও বসিলেন।

আমি এম. এস-সি পর্যন্ত পড়েছি, পরীক্ষা দিইনি।

বেশ করেছেন, পরীক্ষাটা দিলেন না কেন?

আর্থিক নানা কারণে, ফি জমা দেবার টাকা পাইনি।

যাক, তবু ভালো, আমি ভাবছিলাম, পারমার্থিক কোনো হেতু আছে বুঝি। রবীন্দ্রনাথের যেহেতু ডিগ্রি নেই, সেই হেতু আজকাল অনেকে ডিগ্রি না থাকাটাকেই কবি হওয়ার সপক্ষে একটা প্রবল যুক্তি বলে মনে করেন। আপনার সে কমপ্লেক্স নেই দেখে সুখী হলাম। আপনি প্রুফ দেখতে পারেন?

পারি। 'ক্ষত্রিয়' কাগজের বিজ্ঞাপনে দেখলাম—

দেখেছেন? আমি দিয়েছি ওটা। আপনাকে কাজটা দিতে পারি। 'ডাম্বেল, মুগুর ও বারবেল' বলে আমি একটা বই লিখিয়েছি কয়েকজন ব্যায়ামবীরকে দিয়ে, সেটা ছাপা হচ্ছে। আপনি যদি তার প্রুফ ভালো করে দেখে দিতে পারেন দৈনিক এক টাকা হিসেবে আপনাকে এখনই আমি বাহাল করতে পারি।

আমি পারব।

আপনি কোথায় আছেন?

আমার এক বন্ধুর বাসায় আছি। সেখানেই পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকব আপাতত ভাবছি।

সেখানে যদি অসুবিধা হয়, আমার একটা আনইউজড নতুন বাথরুম আছে, ইচ্ছে করলে সেখানেও আপনি থাকতে পারেন ফ্রী অফ কস্ট।

একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, দেখি।

বেশ, তা হলে বিকেলে আসবেন, 'ক্ষত্রিয়' কয়েকখানা মাত্র বেরিয়েছে, আমাদের মতামত মিলিটারি, আমরা যা সত্য বলে মনে করি তা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে মিথ্যা আবর্জনাগুলোকে

ঝেড়িয়ে সাফ করতে হবে বলেও মনে করি। বিকেলে আসবেন, সেই সময় সব দেখাব আপনাকে।

আচ্ছা।

শঙ্কর নমস্কার করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

চলিতে চলিতে সে ভাবিতে লাগিল, কোথাকার অপরিচিত যোগেন রায় মদের ঝোঁকে তাহার খোলা দরজায় নিতান্ত আকস্মিকভাবে প্রবেশ করিয়া তাহাকে হিরণবাবুর ঠিকানা দিয়া গেলেন। জীবনের অধিকাংশ প্রধান ঘটনার অন্তরালেই এক আকস্মিক যোগাযোগের রহস্য। জন্ম জীবন মৃত্যু— জীবনের এই অতি-প্রত্যাশিত ঘটনাগুলিও ভাবিয়া দেখিলে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতের দলেই। আনন্দের আতিশয্যে শঙ্কর দ্রুতবেগে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। হিরণবাবু লোকটিকে তাহার ভালো লাগিয়াছে। বেশ সুন্দর সুস্থ বলিষ্ঠ ব্যক্তিটি।

সেই দিন বৈকালেই শঙ্কর দুইটি কবিতা লইয়া হিরণবাবুর কাছে হাজির হইল। তাহার যেন তর সইতেছিল না। গিয়া দেখিল, আড্ডা গুলজার হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত চেয়ার কয়টা অধিকৃত, তক্তপোশেরও অনেকখানি ভরিয়া গিয়াছে। ঘোরতর তর্ক চলিতেছে। সিগার-সিগারেটও এত বেগে পুড়িতেছে যে, ঘরের খানিকটা অংশ কুজ্ঝটিকাবৃত বলিয়া মনে হইতেছে, তক্তপোশের এক ধারে ট্রে-র ওপর কতকগুলি চায়ের পেয়ালা ধূমায়িত হইতেছে এবং বালক ভৃত্যটি একে একে সেগুলি তার্কিকদের হাতে ধরাইয়া দিতেছে।

শঙ্কর প্রবেশ করিতেই সকলে তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন।

হিরণবাবু বলিলেন, লেখা এনেছেন?

এনেছি।

কই, দিন।

শঙ্কর সসঙ্কোচে পকেট হইতে কবিতা দুইটি বাহির করিয়া দিল। আশা করিয়াছিল, হিরণবাবু তখনই সেগুলি পড়িবেন এবং পড়িয়া চমৎকৃত হইয়া যাইবেন। কিন্তু হিরণবাবু সেসব কিছুই করিলেন না। লেখাগুলি একবার খুলিয়া পর্যন্ত দেখিলেন না, ড্রয়ার টানিয়া অতিশয় নির্বিকারভাবে সেগুলি ড্রয়ারের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। আর একটি ড্রয়ার খুলিয়া 'ডাম্বেল, মুগুর ও বারবেল'র একতাড়া প্রুফ শঙ্করকে দিয়া বলিলেন, কাল বিকেলবেলাই চাই।

একটা পেন্সিল কি কলম পেলে এখুনি শুরু করতে পারি।

এত গোলমালে পারবেন?

পারব।

বেশ, পেন্সিল দিচ্ছি আমি, বসুন। ওরে নব্‌নে, ও-ঘর থেকে টুল একটা নিয়ে আয়, এক কাপ চা দে বাবুকে।

টুল আসিল, চা আসিল। চা পান করিয়া শঙ্কর প্রুফ দেখিতে শুরু করিয়া দিল। আড্ডায় যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই যুবক। শঙ্করের আগমনে তাঁহারা মিনিটখানেকের জন্য চুপ করিয়াছিলেন, আবার শুরু করিয়া দিলেন। আলোচনা চলিতেছিল চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু এবং আধুনিক একজন বিদ্রোহী কবিকে লইয়া। তর্ক-মুখর চটুল বিদ্রূপাত্মক আলোচনা।

শঙ্করের খুব ভালো লাগিতেছিল, কিন্তু অনাহূতভাবে আলোচনায় সে যোগদান করিল না। নীরবে বসিয়া প্রুফগুলি দেখিতে লাগিল।

অতিশয় অনাড়ম্বরভাবে তাহার সাহিত্যিক জীবন শুরু হইয়া গেল।

।। ছত্রিশ ।।

মৃন্ময় আপিস হইতে যখন ফিরিল, তখনও শঙ্কর ফেরে নাই। শঙ্কর আজকাল সকালে উঠিয়া হিরণবাবুর কাছে চলিয়া যায়, ফেরে রাত্রি দশটা-এগারোটায়। দ্বিপ্রহরের ভোজনটা সে নিকটবর্তী একটা হোটেলে আনা তিনেকের মধ্যে সারিয়া লয়; আরও তিন আনা দিয়া দুই প্যাকেট সস্তা সিগারেট কেনে, রাত্রে মৃন্ময়ের বাসায় খায় এবং শোয়। ইহার জন্য মৃন্ময়কে সে মাসে দশ টাকা করিয়া দিবে ঠিক করিয়াছে। মৃন্ময় প্রথমে কিছুতেই টাকা লইতে রাজি হয় নাই; কিন্তু যখন সে দেখিল, টাকা না লইলে শঙ্কর থাকিবে না তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে সম্মতি দিতে হইয়াছিল। এই শঙ্করবাবু লোকটির ব্যবহার, চালচলন এবং আদর্শনিষ্ঠা মৃন্ময়কে সত্যই মুগ্ধ করিয়াছিল। নিজের আদর্শভ্রষ্ট জীবনে শঙ্করকে পাইয়া তাহার মন অনেকটা যেন স্বস্তিলাভ করিয়াছিল। ভগ্নহাল ছিন্নপাল তরণীর আরোহীদের মধ্যে একজন বলিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ মাঝি থাকিলে নৌকা-পরিচালক মাঝি যেমন ভরসা পায়, শঙ্করকে পাইয়া মৃন্ময়ের মনের অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ হইয়াছিল। শঙ্কর অধিকাংশ সময় বাড়িতে থাকে না, শঙ্করের জীবনযাত্রার সহিত এবং জীবনের আদর্শের সহিত মৃন্ময়ের জীবনযাত্রা অথবা আদর্শের কিছুমাত্র মিল নাই; শঙ্কর বম্বের এই চাকরিটাও যে মনোবৃত্তির প্রভাবে লইল না, সে মনোবৃত্তির সমর্থন যদিও মৃন্ময় করে না, তবুও মৃন্ময় মনে মনে শঙ্করের ওপর নির্ভর করিতে শুরু করিয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ—যখনই যতটুকু দেখা হয়, শঙ্কর সহানুভূতি সহকারে মৃন্ময়ের সমস্ত কাহিনী শোনে এবং আশ্বাস দেয় যে, সব ঠিক হইয়া যাইবে। সব ঠিক হইয়া যাইবে—এতবড় আশ্বাস কয়জন এমন করিয়া দিতে পারে।

বাড়িতে ঢুকিতেই নীচের তলায় ডানহাতি ঘরটায় শঙ্কর থাকে। শঙ্কর যাইবার সময় তালা লাগাইয়া দিয়া যায়—হাসির কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে, রাত্রির খাবার রাখিয়া যাইবার জন্য। মৃন্ময় ঢুকিয়া বদ্ধ তালাটার পানে চাহিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। শঙ্করবাবু ফেরেন নাই তাহা হইলে। তাহার বগলে একটা প্যাকেট ছিল। শঙ্করবাবুকে আগে দেখাইতে পারিলে ভালো হইত, কিন্তু—। খানিকক্ষণ ইতস্তত করিয়া মৃন্ময় অবশেষে উপরে উঠিয়া গেল।

আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গিতে হাসি চুল বাঁধিতেছিল। হাসির সমস্ত মুখখানাতে কেমন একটা বিষাদের ছাপ পড়িয়াছে। মৃন্ময় যে স্বর্ণলতাকে ভালোবাসে—এ কথা জানিয়া অবধি হাসির জীবনে অন্ধকার নামিয়াছে। স্বর্ণলতা যে মৃন্ময়ের পূর্বপক্ষের স্ত্রী, অপর কেহ নহে, ভালোবাসাটা যে তাহার ন্যায্য পাওনা—এ বার্তায় সে অন্ধকার কিছুমাত্র কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। বরং স্বর্ণলতার প্রতি এই প্রেমটা যদি অবৈধ প্রণয় হইত, তাহা হইলে ইহার বিরুদ্ধে একটা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়া এবং মৃন্ময়কে এজন্য ন্যায়ত লাঞ্ছিত করিবার একটা সঙ্গত কারণ পাইয়া হাসির আক্রোশ হয়তো কিছু কমিত। কিন্তু বিবাহিত বিগত স্ত্রীর প্রতি যদি

কোনো স্বামী প্রেম পোষণ করে, তাহার বিরুদ্ধে কি বলিবার আছে! মৃন্ময় প্রবেশ করিতেই সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল এবং কাগজের বাক্সটা দেখিয়া প্রশ্ন করিল, ওটা কি?

কাপড়।

কার কাপড়?

ভণ্টুর যে পরশু বিয়ে, ভুলেই গেছ?

ও।

চুলের বিনুনিটা ঠিক করিতে করিতে হাসি আগাইয়া আসিল।

কি কাপড় কিনলে?

মৃন্ময় হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতেছিল (হয়তো সেইজন্যই তাহার মুখটা লাল হইয়া উঠিয়াছিল), কোনো উত্তর না দিয়া জুতার ফিতাই খুলিতে লাগিল। হাসি আগাইয়া আসিয়া কাগজের বাক্সের ডালটা খুলিয়া ফেলিল।

দুখানা কাপড় কেন?

জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতেই মৃন্ময় উত্তর দিল, একখানা তোমার জন্যে। ওই ময়ূরকণ্ঠী রঙের শাড়িটা—

আমার শাড়ি চাই না।

বাক্সটা তাচ্ছিল্যভাবে ঠেলিয়া দিয়া হাসি পুনরায় আয়নার কাছে গেল এবং দাঁত দিয়া ফিতেটি কামড়াইয়া পুনরায় প্রসাধনে মন দিল। মৃন্ময় এই আশঙ্কাই করিতেছিল, তাহার লাল মুখখানা সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল।

একটু ইতস্তত করিয়া সে বলিল, পছন্দ করে এনেছি—

আমার চাই না।

তাহার পর সহসা ফিরিয়া বলিল, তুমি মাইনে তো এখনও পাওনি, দাদামশাই যে টাকা দিয়ে গেছেন তার থেকেই তো সংসার চলছে, বাড়িভাড়া এখনও দেওয়া হয়নি, তুমি কাপড় কেনবার টাকা পেলে কোথা?

মৃন্ময় যে শঙ্করের সাহায্যে শালখানা বাঁধা রাখিয়াছিল, হাসি তাহা টের পায় নাই। মৃন্ময় হাসিকে এখনও সে কথা বলিল না, মিথ্যা কথা বলিল।

একটা চেনা দোকান থেকে ধার এনেছি। মাইনে পেলে পরে দিয়ে দিলেই হবে।

ধার করে বাবুয়ানি করবার দরকার কি?

মৃন্ময় কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু পারিল না, তাহার ঠোঁট দুইটা ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল মাত্র।

আগে হাসি এমন করিত না, স্বর্ণলতাকে আবিষ্কার করিয়া অবধি তাহার মন কেমন যেন নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছে, স্বর্ণলতা নাগালের বাহিরে, তাহার কিছুই সে করিতে পারে না, মৃন্ময়কে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া তাই সে মনের জ্বালা মিটাইতে চায়। অথচ হাসিই একদিন মৃন্ময়ের সামান্যতম কষ্ট দূর করিবার জন্য কি না করিতে পারিত।

।। সাঁইত্রিশ ।।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শঙ্কর 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার লেখক, প্রুফ রিডার, ম্যানেজার এবং প্রকাশক হইয়া পড়িল। যদিও হিরণবাবু তাহাতে সংশ্লিষ্ট রহিলেন এবং প্রকাশ্যত হিরণবাবুর বন্ধু জ্যোতির্ময়বাবুর সম্পাদক বলিয়া নাম ছাপা হইতে লাগিল কিন্তু আসলে শঙ্করই সর্বেসর্বা হইয়া উঠিল। হিরণবাবু এবং জ্যোতির্ময়বাবুর নিকট সাহিত্যচর্চা খেয়াল মাত্র ছিল, কিন্তু শঙ্করের ইহা অন্তরের বস্তু। সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া সে ইহার উন্নতিকল্পে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিল এবং তাহার একাগ্রতা দেখিয়া হিরণবাবু তাহার হাতে সমস্ত ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। একদা যে শঙ্কর দুইটি কবিতা লইয়া সসংকোচে হিরণবাবুর নিকট আসিয়াছিল (একটি হিরণবাবু মনোনীত করিয়া ছাপিয়াছিলেন, অপরটি তাঁহার পছন্দ হয় নাই), আজ সেই শঙ্করের নিকটই হিরণবাবু নিজের লেখা আনিয়া বলিতেছেন, দেখ তো এটা তোমার কাগজে চলবে কি না?

বস্তুত কাগজখানা যেন শঙ্করের নিজেরই হইয়া গিয়াছে। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত উহা লইয়াই তাহার কাটিতেছে। 'ডাম্বেল, মুগুর ও বারবেল' নামক পুস্তকের প্রুফ দেখিতে এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না, বাকি সময়টা সে 'ক্ষত্রিয়' লইয়া থাকে। তাহার নিজের মনের মধ্যে যে নিরস্ত্র ক্ষত্রিয় এতদিন রুদ্ধ আক্রোশে ফুলিতেছিল, হঠাৎ অস্ত্রশস্ত্র ও সুযোগ লাভ করিয়া সে যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। এই অতি-আধুনিক-মার্কা ডেঁপো ছোকরাদের চাবকাইয়া পিঠের ছাল ছাড়াইয়া দিবে সে। ইহারা অতীতের মহত্ত্ব স্বীকার করে না, দেশের লোকেদের চেনে না, বিদেশি আলট্রামর্ডানিজমের নকলে 'নতুন কিছু' করিয়া বাহাদুরি দেখাইতে চায় এবং সেই উপলক্ষে নিজেদের নপুংসক কামনা-কণ্ডুয়নকে কখনও সুবোধ্য, কখনও দুর্বোধ্য ভাষায় প্রচার করে। ইহাদের ভণ্ডামিটাকে চূর্ণ করিতে হইবে। অতিশয় উত্তেজনার মধ্যে তাহার দিন কাটিতেছে। অনেকগুলি ভালো লোকের সঙ্গেও আলাপ হইয়াছে। ভালো লোক মানে, লোকগুলিকে শঙ্করের ভালো লাগিয়াছে। জ্যোতির্ময়বাবু—যিনি নামে কাগজের সম্পাদক—তিনি বেশ একটু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। নিজে যদিও তিনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী, কিন্তু ব্রাহ্মদের গালাগালি দিয়া তিনি যত আনন্দ পান, অন্য আর কিছু করিয়া ততটা পান না। রাজনীতি সম্বন্ধেও তাঁহার মতামত অদ্ভুত। তিনি আমাদের পরাধীনতাটাকে টাইফয়েড-জাতীয় একটা ব্যাধি হিসাবে গণ্য করেন। বলেন, তাড়াহুড়ো করিয়া লাভ নাই, নিজের প্রাণশক্তি-প্রভাবে ব্যাধি যদি সারিবার হয়, আপনিই সারিবে। আমাদের দেখা উচিত, চিকিৎসার ছুতো করিয়া রাজনৈতিক নেতাগুলি যেন আমাদের সর্বস্বান্ত না করেন। আর একটি বিচিত্র লোক সুরেন্দ্রনাথ সোম। বেঁটেখাটো মানুষটি, অত্যন্ত রোগা, মাইনাস ফাইভ চশমা, নিরামিষাশী, স্কুলে মাস্টারি করেন। যদিও মাত্র বি. এ. পাস, কিন্তু অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। হেন বিষয় নাই যাহার সম্বন্ধে দুই-চারি কথা না জানেন। মদ এবং শিকার বিষয়ে তিনি তো বিশেষজ্ঞ। নিজে যদিও কখনও জীবনে মদ স্পর্শ করেন নাই, সিগারেট পর্যন্ত খান না, কিন্তু কোন্ মদে কত অ্যালকহল আছে, কি রকম গ্রেপ হইতে ভালো মদ প্রস্তুত হয়, সস্তা মদ এবং দামি মদের তফাত কি, কি রকম সেলারে মদ রাখা উচিত, মদের বোতলের কাঁচ অ্যালকালি-ফ্রী হইলে বা না হইলে কিভাবে মদের গুণে তারতম্য ঘটিবার সম্ভাবনা, মদের

ব্যবসা কোন্ দেশে কিভাবে চলে, সাহিত্যসৃষ্টির ওপর মদের প্রভাব কি এবং তাহা কতদূর বিজ্ঞানসম্মত—এ সমস্তই তাঁহার নখদর্পণে। শিকার বিষয়েও তাই। ইংরেজি সাহিত্যে তো বটেই, ফরাসি সাহিত্যেও লোকটির অগাধ অধিকার। মাঝে মাঝে আড্ডায় আসেন এবং ক্বচিৎ কখনও ভারী ওজনের প্রবন্ধ লেখেন। সুরেনবাবু 'ক্ষত্রিয়' কাগজটির প্রতি স্নেহশীল—সাহিত্য-প্রীতিবশত ততটা নহে, যতটা হিরণদার সহিত ঘনিষ্ঠতাবশত। যে জন্যই হোক, তিনি 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। প্রবন্ধ-লেখক হিসাবে ততটা নয়, যতটা সংশোধক হিসাবে। মাস্টার মানুষ, ভুল কিছুতেই তাঁহার চক্ষু এড়াইয়া যাইতে পারে না। তিনি 'ক্ষত্রিয়ে'র ভুল তো সংশোধন করেনই, অন্য কোন্ কোন্ পত্রিকায় কি কি ভুল বাহির হইয়াছে তাহা শঙ্করকে আনিয়া দেন, এবং সেগুলিকে কেন্দ্র করিয়া শঙ্করের লেখনী হিংস্র হইয়া ওঠে। শঙ্করের লেখনীতে যেমন একটা হিংস্রতা ছিল, তাহা শঙ্কর নিজেও এতদিন জানিত না; নিজের এই তীক্ষ্ণ-নখদন্ত-সমন্বিত নবরূপ সে নিজেই সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। ছবি রায় এই আড্ডার আর এক অসাধারণ ব্যক্তি। কখনও কবিতা লেখে না, কিন্তু মনে-প্রাণে কবি। মাথায় রুক্ষ তৈলহীন অবিন্যস্ত চুল, চোখে আকুল উতলা দৃষ্টি, মুখে শেলি কিটস ওয়ার্ডসওয়ার্থ রবীন্দ্রনাথ, পরনে আধময়লা ঢিলা-হাতা পাঞ্জাবি, পায়ে স্যান্ডাল। প্রত্যহ সকালে বাজার করিতে যাইবার মুখে থলিটা হাতে করিয়া আড্ডায় প্রবেশ করে, খানিকক্ষণ আড্ডা দেয়, কবিতা আওড়ায়, এক-একদিন ভাবের আবেগে কাঁদিয়া পর্যন্ত ফেলে। মদ খাওয়া অভ্যাস আছে, অথচ উপার্জন কম, সেইজন্য দুর্দশাটা আরও বেশি। বয়স খুব বেশি নয়, কিন্তু একপাল ছেলেমেয়ে। দশটা পাঁচটা একটা আপিসে কেরানিগিরি করে, বৈকালে মণিহারি দোকানে গিয়া তাহাদের বিজ্ঞাপনী-সাহিত্য লেখে, সন্ধেবেলায় এক জায়গায় টুইশনি করে, তবু কুলায় না। 'ক্ষত্রিয়' কাগজের সহিত তাহার মতের মিল নাই, কিন্তু হিরণদাকে সে দেবতার মতো ভক্তি করে। হিরণবাবুও তাহাকে স্নেহ করেন, এত স্নেহ করেন যে মাঝে মাঝে নিজের পকেট হইতে পয়সা খরচ করিয়া তাহাকে মদ খাওয়ান। শঙ্করেরও ছবিকে বড় ভালো লাগে! আরও অনেকে আড্ডায় আসে। দীপেন, জ্যোতিষদা, চঞ্চল, বরেন, নিপু, শ্যামল এবং আরও অনেকে; সকলেই যুবক, সকলেই সাহিত্য-রসিক। কেহ ধনীর সন্তান, কেহ চাকুরে, কেহ বেকার, কেহ বিজনেস করিতেছে। হিরণবাবু সকলেরই হিরণদা। শঙ্করও আজকাল হিরণবাবুকে হিরণদা বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছে। হিরণদা যদিও এই আড্ডার প্রাণস্বরূপ, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তিনি নিজেকে কখনও হাজির করেন না। তিনি কেন্দ্রেই বাস করেন বটে, কিন্তু অস্পষ্ট ভাবে। তাঁহার পছন্দ-অপছন্দ মতামত আড্ডায় কাহারও অগোচর নাই, সকলেই তদনুসারে চলেনও; কিন্তু হিরণদা উগ্রভাবে নিজের দলপতিত্ব কখনও প্রকাশ করেন না। হিরণদার সম্বন্ধে একটা কথা ভাবিয়া শঙ্কর অবাক হয়, লোকটার প্রতিভা যে কিরূপ, তাহা বোঝা যায় না। সাহিত্যচর্চা যে খেয়ালমাত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার নানা বিষয়ে কৌতূহল, এবং 'ক্ষত্রিয়' নামক পত্রিকা প্রকাশ তাঁহার বহুমুখী কৌতূহলের একটা মুখ মাত্র। শাণিত ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ এই কাগজটা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন ঠিক সেই মনোভাব লইয়া, যে মনোভাব লইয়া দুষ্ট ছেলে দুষ্টামি করে। বঙ্গদেশরূপে মহারণ্যের নানা বৃক্ষে নানাজাতীয় পতঙ্গ নানারকম চক্র নির্মাণ করিয়া গুঞ্জন করিতেছে, প্রত্যেক চক্রে এক-একটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া দেখাই যাক না, কি

রকম মজাটা হয়! এতদিন তিনি নিজেই লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিতেছিলেন, এখন শঙ্করের মধ্যে একজন সক্ষম লোষ্ট্রনিক্ষেপ আবিষ্কার করিয়া তিনি তাহার হাতে এ কার্য ছাড়িয়া দিয়া অপর দিকে মন দিয়াছেন। একটা কুস্তির আখড়ার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সেখানে অনেকগুলি যুবক এবং কুস্তিগীর পালোয়ান জুটাইয়া বক্সিং, জুজুৎসু এবং শরীরচর্চার নানারূপ আয়োজন তিনি করিয়াছেন। তাঁহার মতে, অশক্ত অসুস্থ বলিয়াই আমরা ভীরু দার্শনিক হইয়া পড়িতেছি। জীবনযুদ্ধের নির্মম সত্যগুলিকে সুস্থভাবে গ্রহণ করিতে হইলে সর্বাগ্রে সুস্থ বলিষ্ঠ শরীর থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এই কুস্তির আখডাতেই তাঁহার সমস্ত চিত্ত নিবদ্ধ নহে, আরও নানাদিকে তাঁহার মন বিক্ষিপ্ত। জন্তু-জানোয়ারের বিষয়ে ঝোঁক আছে। বাড়িতে শুধু কাবুলি বিড়াল এবং অ্যালসেসিয়ান কুকুর নয়, বাঘের বাচ্চাও পুষিয়াছেন। ইহা ছাড়া ডাকটিকিট সংগ্রহ, দিয়াশলাইয়ের বাক্স সংগ্রহ, পুরাতন শাল সংগ্রহ. সেকেলে বাসন সংগ্রহ প্রভৃতিতেও তাঁহার আগ্রহ কম নয়। হিরণবাবু বড়লোকের ছেলে, সর্বঘটবিহারী অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন বেকার। শঙ্করের মাঝে মাঝে মনে হয়, সত্যিই নিজের কিছু করিবার নাই বলিয়া বোধহয় তিনি নিজের শিক্ষা-দীক্ষা-রুচি অনুযায়ী সব কিছুতেই সমান উৎসাহ প্রকাশ করেন। পিতামাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এখনও পর্যন্ত বিবাহ করেন নাই, সুতরাং বাধা দিবার কেহ নাই। যোগীনদাও নাকি এককালে এই ধরনের ছিলেন, একটা চাকরি জোটাতে আজকাল সব থামিয়া গিয়াছে। যোগেন রায়ের পরিচয় শঙ্কর পাইয়াছে। তিনি বিলাতি ডিগ্রি ও সুপারিশের জোরে একটি নামজাদা বিলাতি লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানির ম্যানেজার হইয়াছেন। ভারতবর্ষের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসেন এবং বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে কয়েকদিন কাটাইয়া যান। যখন কলিকাতায় থাকেন না, বিডন স্ট্রিটের বাড়িটা খালি পড়িয়া থাকে, বাড়ি ভাড়া দেওয়া তিনি পছন্দ করেন না। যোগীনদাও অবিবাহিত, রসিক, কিন্তু নিদারুণ মাতাল। আর একটি নূতন ধরনের লোকের সহিত শঙ্করের পরিচয় হইয়াছে, ডাক্তার মুখার্জি। ইনি একজন রিটায়ার্ড আই. এম. এস অফিসার, বিলাতের এম. ডি রিটায়ার্ড লেফটানান্ট-কর্নেল। এককালে হিরণবাবুর পিতৃবন্ধু ছিলেন, এখন হিরণের বন্ধু। এমনকি সিগার আদান-প্রদান চলে। লোকটিকে দেখিলে শ্রদ্ধা হয়। বিদ্বান বহুদর্শী লোক, কিন্তু এতটুকু অহঙ্কার নাই। গোঁফদাড়ি কামান, ফর্সা রঙ, ভারী মুখ, মাথায় প্রকাণ্ড টাক, গায়ে ঢিলা গলাবন্ধ সাদা চায়না কোট, পরনে সাদা থান, মুখে প্রকাণ্ড সিগার, এবং প্রশান্ত হাসি। মাঝে মাঝে যখন আড্ডায় আসেন, সমস্ত আড্ডাটা যেন ভরাট হইয়া ওঠে। সাহিত্যরসিক, স্পষ্টবাদী, শক্তিশালী ব্যক্তি।

এই নূতন সমাজে নূতন প্রেরণা লইয়া শঙ্কর নূতন জীবন আরম্ভ করিয়াছে। অল্পদিনের মধ্যে নিজের একটা বিশিষ্ট স্থানও করিয়া লইয়াছে। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র চিন্তা তাহাকে মধ্যে মধ্যে আকুল করিয়া তুলিতেছে, হিরণদার 'ডাম্বেল, মুগুর এবং বারবেল' পুস্তকের প্রুফ দেখা হইয়া গেলে সে কি করিবে, অর্থোপার্জনের স্থায়ী রকম কোনো ব্যবস্থাই তো এখনও পর্যন্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রুফ সংশোধন করিতে করিতে শঙ্কর ভাবিতেছিল, ডাক্তার মুখার্জি তাহাকে একটা চাকরির আশ্বাস দিয়াছিলেন কয়েকদিন পূর্বে, কিন্তু তাহার পর হইতে আর তিনি আসেন নাই। তিনি কোন্ ঠিকানায় থাকেন, তাহাও শঙ্করের জানা নাই... সহসা অমিয়ার মুখখানা মনের ওপব ফুটিয়া উঠিল, ভীরু সলজ্জ চোখ দুইটি। শঙ্কর অবাক হইয়া গেল, অমিয়ার কথা সে তো

মোটেই ভাবিতেছিল না! এমন হয় কেন? ইহার নাম টেলিপ্যাথি? অমিয়ার মুখখানাই অসংলগ্নভাবে মনের ভিতর যাওয়া-আসা করিতে লাগিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শঙ্কর পুনরায় প্রুফে মনঃসংযোগ করিল। প্রুফগুলিতে কি অদ্ভুত ভুলই থাকে! সমস্ত দন্ত 'ন' গুলা উল্টা এবং সমস্ত 'খ' 'থ' হইয়া গিয়াছে।

যে ঘরে হিরণদার আড্ডা বসে ঠিক তাহার পাশের ছোট ঘরটাতে (অর্থাৎ আন্‌ইউজড বাথরুমটিতে) শঙ্কর নিজের জন্য একটি ছোট আপিসের মতো করিয়া লইয়াছিল। হিরণদা একটি ছোট টেবিল, শেলফ এবং চেয়ার দিয়াছিলেন। এই ছোট ঘরটিতেই শঙ্কর পড়ে, লেখে, প্রুফ সংশোধন করে। ইহাই 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার আপিস। কিছু উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে, কারণ এতদিন 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার আপিস হিরণদার টেবিলের ড্রয়ারেই সীমাবদ্ধ ছিল। মাঝে মাঝে শঙ্কর আড্ডায় গিয়া যোগ দেয়। আড্ডা সাধারণত শুরু হয় বৈকাল হইতে এবং চলে রাত্রি দশটা-এগারোটা পর্যন্ত। সেদিন রবিবার, একটু সকাল সকালই আড্ডা শুরু হইয়াছে এবং পাঁচটা নাগাদ বেশ গুলজার হইয়া উঠিয়াছে। জ্যোতিষদার গলা-খাঁকারি, চঞ্চলের উচ্চহাস্য হইতেই তাহা বেশ বোঝা যাইতেছে। হিরণদা শঙ্করকে শুনাইয়া সকলকে সতর্ক করিতেছেন, অত চেঁচিয়ে নয়, শঙ্কর চটে যাবে, প্রুফ নিয়ে তন্ময় হয়ে আছে ও।

শঙ্কর জানে হিরণদার এই সতর্কবাণীর অর্থ কি। অর্থ— উঠিয়া এস। শঙ্কর উঠিয়া বাহির হইয়া আসিল।

হিরণদা বলিলেন, আমার দোষ নেই কিন্তু, আমি সেই থেকে সবাইকে মানা করছি।

শঙ্কর হাসিয়া টুল টানিয়া উপবেশন করিল। হিরণদা হাঁকিলেন, নবীন, এক কাপ চা।

ডাক্তার মুখার্জি আসিয়া প্রবেশ করিলেন, সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বস, বস, দাঁড়িয়ে উঠলে কেন সব? শঙ্কর, তোমার চাকরি ঠিক করে এলুম, 'সংস্কারক' আপিসে প্রুফ রিডার, মাসে চল্লিশ টাকা করে পাবে। আপাতত ওইতেই ঢুকে পড়— তারপর দেখা যাবে।

'সংস্কারক' কাগজে তাহার চাকরি হইয়াছে! শঙ্কর নিজের কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। হীরালাল মজুমদার সম্পাদিত 'সংস্কারক' কাগজে! ইহা যে সে কল্পনাও করে নাই।

।। আটত্রিশ ।।

কয়েকদিন পরে শঙ্কর, ভন্টু ও মৃন্ময় গড়ের মাঠে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। খানিকক্ষণ নীরবতার পরে ভন্টু বলিল, ঝুলে তো পড়লাম ভাই খুজবুজকে নিয়ে, এখন অদৃষ্টে কি আছে কে জানে?

ভন্টুর বিবাহ হইয়া গিয়াছিল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, ইন্দুমতীকে লাগছে কেমন?

উচ্ছ্বসিত ভন্টু বলিল, চমৎকার ভাই, ঠিক মাখন-লদ্‌কানো টোস্টের মতো, বেশ নরম নরম অথচ মুচমুচে। বিড়্‌ডিকার তো একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তুই অমিয়াকে আনছিস কবে?

শিগ্‌গিরই আনব।

এনে ফেল।

মৃন্ময় একটি কথাও বলে নাই, চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

ভণ্টু ভাবিতেছিল ইন্দুমতীর কথা, তাহাদের অবস্থা-পরিবর্তনের কথা, নূতন গহনা পাইয়া বউদিদির আনন্দের কথা। এতদিন দুঃখে কাটাইয়া বউদিদি এইবার বোধহয় সুখের মুখ দেখিতে পাইলেন।

শঙ্কর ভাবিতেছিল সাহিত্যের কথা। 'সংস্কারক' পত্রিকার সংস্পর্শে সে যখন আসিতে পারিয়াছে, তখন আর ভাবনা কি! শেক্‌সপিয়ার, দান্তে, টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি... মহিমান্বিত মূর্তিগুলি চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিতেছিল...বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ... এই দেশের মাটিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার কল্পনা-বিহঙ্গম মৃত্তিকা ছাড়িয়া বহু উর্ধ্বলোকে পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছিল।

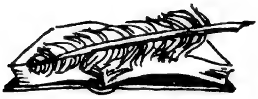

তুমি

।। এক ।।

যেদিন তুমি এসেছিলে সেদিন আকাশে হোলি খেলা হচ্ছিল। আবীরের স্তূপ জমা হয়েছিল দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশের দিগন্ত জুড়ে। সোনালী লাল রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল সমস্ত দক্ষিণ আকাশটা। মাথার উপরে মেঘগুলোও ঝলমল করছিল সেই রঙের ছোঁয়া লেগে। উত্তর দিক থেকে প্রকাণ্ড একটা স্তূপ মেঘ ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল এই উৎসবের আকর্ষণে। একটা অদ্ভুত রক্তিম আনন্দ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল চতুর্দিকে, লালের মোহ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল সমস্ত প্রকৃতিকে। লালও যেন তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সর্বজনীন হয়ে উঠেছিল সেদিন। আকাশের নীলের প্রশান্তির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল বেমালুম, মিশে গিয়েছিল বনানীর সবুজ রঙের মরকত দ্যুতির সপ্রতিভতার সঙ্গে।

আমি সবিস্ময়ে বসেছিলাম বজরায়, চেয়েছিলাম নদীর রক্তিম ঊর্মিমালার দিকে। নদী লালে লাল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মনে হচ্ছিল না সেটা রক্তধারা, মনে হচ্ছিল আমি যেন অদৃষ্টপূর্ব এক সুরার স্রোতস্বিনীতে ভাসছি, যে সুরার রং লাল, যা শুধু সুরা নয়, যা অশ্রুতপূর্ব সুরও, যে সুর রক্তে দোলা দেয়, জন্মান্তরের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে, যা হাতছানি দেয় ইন্দ্রিয়লোকের ওপার থেকে, যা অতীন্দ্রিয় জগতের দিশারী।

বিহ্বল হয়ে বসেছিলাম বজরার ছোট ঘরটায়। ছোট ঘরটা আর ছোট ছিল না, মনে হচ্ছিল যেন অসীমের মধ্যে বসে আছি। আমার চেয়ারটা হয়ে গিয়েছিল দোলনা, প্রতি মুহূর্তে আশা করেছিলাম কেউ এসে দোলা দেবে, কারও কলহাস্যের উচ্ছলতায় এমন একটা অপরূপ লাল রং আভাসিত হবে যা বর্ণালীতে নেই, যা বিজ্ঞানী চাক্ষুষ করেনি, কিন্তু কবি কল্পনা করেছে।

আমার সেই ছোট ঘরে মোনালিসার একটা ছবি ছিল। তার সেই রহস্যময় হাসির উপরও পড়েছিল সেদিনের সেই লাল আলো। তার মধ্যেই যেন দেখতে পেয়েছিলাম তোমাকে। মোনালিসার রহস্যময় দৃষ্টির মুকুরে রক্তিম আলোর স্বপ্ন-আবর্তে ভেসে উঠেছিল তোমার যন্ত্রণাকাতর মুখ। কে যেন আমাকে কানে কানে বলে গেল তোমার জন্যই ওর ওই যন্ত্রণা। অবাক হয়ে গেলাম। তারপর সহসা আমিও যন্ত্রণা অনুভব করলাম। তোমার ওই নির্বাক যন্ত্রণা আমাকেও বিঁধতে লাগল, কাটতে লাগল, পোড়াতে লাগল। যন্ত্রণার ঘূর্ণাবর্তে আমি আবর্তিত হতে লাগলাম। তুমি কে তা তখনও জানতাম না এখনও জানি না...।

যন্ত্রণার মধ্যে কৌতূহল এল, প্রশ্ন জাগল তুমি কে।

ভাবতে লাগলাম। ভাবনার অথৈ জলে তলিয়ে গেলাম। মনে হল যুগযুগান্তর কেটে গেছে।

।। দুই ।।

একটা চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলাম। চায়ের দোকানে চা খাব বলে ঢুকিনি, ঢুকেছিলাম রোদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য। বাইরে প্রখর রোদ দাউদাউ করে জ্বলছিল যেন।

হুড়মুড় করে ঢুকে দেখলাম দোকানে কেউ নেই। দোকানী জিজ্ঞেস করল—'কি চান?'

'চা এক কাপ।'

'এখন তো চা হবে না। সাড়ে তিনটার আগে চা হয় না এখানে।'

'দাও না ভাই। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। আমি তেষ্টার সময় চা খাই।'

'দুধ নেই এখন।'

'বিনা দুধেই দাও। চিনিও চাই না। তেতো কড়া চা-ই ভালো লাগে আমার।'

তেতো কড়া চা খাচ্ছিলাম চুমুকে চুমুকে।

হঠাৎ নজরে পড়ল তুমি বসে আছ দোকানের এক কোণে। বাইরের জ্বলন্ত রৌদ্র যেন মানুষ্যমূর্তি পরিগ্রহ করেছে। মনে হল নাকের ডগাটা কাঁপছে তোমার। মাথার লাল চুল এলোমেলো হয়ে পড়েছে পিঠের উপর। হলদে শাড়ির লাল পাড় যেন দীপক রাগিণী ধরেছে। আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছ তুমি। নিথর নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছ। যেন ধ্যান করছ।

হঠাৎ আমি এগিয়ে গেলাম তোমার দিকে।

'তুমি এখানে?'

কোনো উত্তর দিলে না তুমি।

দোকানী বলল—'কার সঙ্গে কথা বলছেন। এখানে তো কেউ নেই।'

'ওই যে'

'ওটা যে ক্যালেন্ডারের ছবি'

দেখলাম সত্যিই তাই।

কিন্তু এও সত্যি সেদিন তোমাকেও দেখেছিলাম।

।। তিন ।।

না, তোমরা যা ভাবছ তা নয়।

আমি পাগল নই। আমি খাই, ঘুমুই, লোকের সঙ্গে আলাপ করি, আপিস চালাই। কিন্তু আমার যে ব্যক্তিত্বটা সূচ্যগ্র-চেতনার মুখে সুরের মতো কাঁপছে তার স্বরূপ কাউকে দেখাতে পারি না। সেই ব্যক্তিত্বটাকেই প্রকাশ করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না, তাই এলোমেলো শোনাচ্ছে। আমার সেই চেষ্টা যে রূপ নিচ্ছে তা তোমাদের পরিচিত রূপ নয়, তাই তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, তাই তোমরা আমাকে পাগলের দলে ঠেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইছ হয়তো। তুমিও আমাকে পাগল ভাবছ? কিন্তু আমি জানি তুমি আছ বলেই, তুমি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছ বলেই, এই ধাঁধা। তোমার 'তুমিত্ব' কোনো বিশেষ ছাঁচের মধ্যে নেই। তা কোনো পীবর-স্তনী হাস্যমুখী শোভন-জঘন্য সুবেশিনী যুবতীর লাস্য-লীলায় সীমাবদ্ধ নয়। তবু সে সর্বত্র আছে, সর্বত্র তাকে দেখতে পাই আকস্মিক মহিমার অপ্রত্যাশিত পরিবেশে। সেদিন দেখেছিলাম রূপকথালোকে। অজস্র অপরাজিতা ফুটেছিল নীল-স্বপ্ন বিস্তার করে; তাদের উপর কয়েকটা চুনী খদ্যোত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার মধ্যে ছিলে তুমি। অথচ আমি তখন আপিসে কাজ করছিলাম। 'ফাইল' ক্লিয়ার করছিলাম। স্থিরমস্তিষ্কে মন্তব্য লিখছিলাম। কিন্তু তার ফাঁকে ফাঁকে দেখছিলাম চুনীব জোনাকিরা উড়ে বেড়াচ্ছে অপরাজিতার নীল

পাপড়ির উপর। ...ঠিক এই সময় এলেন মিস মিত্র টাইপ-করা কয়েকটা চিঠি নিয়ে। তিনি আমার আপিসের টাইপিস্ট। খুব মার্জিতরুচি ভদ্রমহিলা। রূপসী, স্বল্পভাষিণী। ধবধবে ফরসা রং নয়। শ্যামলী, কিন্তু শ্রীমণ্ডিতা। তিনি কাছে এলেই মনে হয় তুমিও যেন এসেছ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। আমার মনের বীণায় তখন যে সুরটা বেজে ওঠে তা ভৈরবী কি সাহানা তা বলতে পারব না, এইটুকু শুধু জানি তা কান্না।...মিস মিত্র যে চিঠিগুলি দিলেন সেগুলির দিকে চেয়ে রইলাম বটে কিন্তু সেগুলির মর্ম মাথায় ঢুকল না।

'কি করতে হবে'—প্রশ্ন করলাম বোকার মতো।

'দেখে সই করে দিন'

না দেখেই সই করে দিলাম সবগুলোতে।

মিস মিত্র চলে গেলেন। বীণার সুর থেমে গেল। কিন্তু সবিস্ময়ে দেখলাম তুমি দাঁড়িয়ে আছ। যে তুমি অরূপা, অধরা, যে তুমি অমেয়া অসীমা, অশেষা সেই তুমি যেন দাঁড়িয়ে রইলে আমার সামনে। মনে হতে লাগল অসীমা যেন সীমার মধ্যে আসবার চেষ্টা করছে, অধরা যেন ধরা দেবে, অসম্ভব যেন সম্ভব হবে। আর সেই দুরূহ দুঃসাধ্য চড়াই-উতরাই ভাঙছ বলে কষ্ট পাচ্ছ তুমি। অসহ্য, অকথ্য কষ্ট। অপরাজিতার নীলকে অতিক্রম করে চুনীর জোনাকিদের লাল আলো মাঝে মাঝে তাই বুঝি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে সেই যন্ত্রণায়?

তবু আমি আপনমনে আপিসের কাজ করছি। তুমি কিন্তু আছ।

।। চার ।।

সেদিন মিস মিত্র একটু যেন বেশী সাজগোজ করে এসেছিলেন। পরনের শাড়িটি সোনালী রঙের, পাড়টিও অভিনব। কানেব দুল দুটিও নূতন মনে হল। মনে হল মুক্তোর ধারা প্রপাতের মতো এসে কাঁধের উপর পড়তে চাইছে। হাতের কাঁকন দুটিও যেন নূতন। অদ্ভুত একটা দীপ্তি চকমক করছে তাদের ঘিরে। মনে হচ্ছে কারও মিনতি যেন কাঁকনের রূপ ধরে তাঁর হাত দুটি বেষ্টন করে আছে। তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়েও একটা মৌন আমন্ত্রণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে চারিদিকে। হঠাৎ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। কপালের চারিদিকে চূর্ণকুন্তলের সমারোহ, যেন উন্মুখ জনতার অধীর আগ্রহ মৌনতার মন্ত্রে নীরব হয়ে রয়েছে, মাঝে মাঝে দুলছে কেবল ধীরে ধীরে। বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তে চাইছে কিন্তু পারছে না। ফ্যানের হাওয়ায় উতলা হচ্ছে কেবল, ফুরফুর করে কাঁপছে কয়েকটি চুল।

হঠাৎ মিস মিত্র প্রণাম করলেন আমাকে।

'কি ব্যাপার?'

'আমার আজ জন্মদিন। একটু সকাল সকাল বাড়ি যেতে চাই। যে ক'খানা চিঠি টাইপ করবার ছিল তা করে দিয়েছি, আপনি দেখে সই করে দেবেন।'

কয়েকটি চিঠি আমার টেবিলের উপর রাখলেন। তারপর সসঙ্কোচে একটি নিমন্ত্রণপত্র বার করে দিলেন আমার হাতে।

'আজ সন্ধেবেলা যদি যান খুব খুশি হব আমরা'

কোনো উত্তর দিলাম না, চুপ করে রইলাম।

মিস মিত্র কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর চলে গেলেন। তারপরই সেই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটল। সেই ঘটনাটা যা ঘটেনি কিন্তু যা আমার সমস্ত সত্তাকে নিমজ্জিত করে কোথায় যে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তা আমি জানি না। মনে হল সমস্ত পৃথিবী যেন স্থল-হীন হয়ে গেছে। চারিদিকে কেবল জল আর জল। নীল জল। আমি তার মধ্যে আছি, কিন্তু আমার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোথাও নেই। 'আমি আছি' এই ধারণাটুকুর মধ্যেই যেন বেঁচে আছি আমি সেই উত্তাল প্রলয়পয়োধির নীলাম্বুরাশির আবর্তে। দেখলাম সেই নীল জল থেকে উঠেছে প্রকাণ্ড একটি পদ্ম আকাশের দিকে। সমস্ত পৃথিবীর ব্যক্ত ও অব্যক্ত প্রার্থনা যেন মূর্ত হয়েছে সেই অপরূপ কমলের পাপড়িতে পাপড়িতে। তার সৌরভ ছেয়ে ফেলেছে চতুর্দিকে। বাতাস মন্থর হয়ে গেছে। স্বপ্ন দেখছে আকাশ। আর দেখতে পেলাম সেই কমলের শীর্ষদেশে জ্যোতির্ময় আবেষ্টনীতে তুমি বসে আছ। সেই তুমি যে আমার মানস-কমলে মাঝে মাঝে এসে আবির্ভূত হও, আবার বিলীন হয়ে যাও। এ সবের অর্থ কি, মন বলতে লাগল বার বার।...

...মিস মিত্র যে চিঠিগুলি রেখে গিয়েছিলেন আমি সেগুলি পড়ে পড়ে সই করে দিলাম। ঘণ্টা বাজালাম। চাপরাসী এল। চিঠি নিয়ে চলে গেল।

...তারপর চোখে পড়ল নিমন্ত্রণপত্রটি টেবিলের একপাশে পড়ে রয়েছে। মিস মিত্র দিয়ে গেছেন।

খুলে দেখলাম একটা কবিতা লেখা রয়েছে।

আমার জন্মদিনে
আমার আমাকে যে চিনিয়ে দেবে
সে কোথায়।
আমি আমার যে 'আমি'কে চিনি।
সে আমি সামাজিক
সে আমি মুখোশ-পরা।
আমার সত্য সত্তাকে আবিষ্কার করবে যে
তার আশাতেই বসে আছি।
মনে হয় আমার জন্মদিনেই সে আসবে।
জন্মদিনেই তো পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন
সত্য-পরিচয়ের দিনও জন্মদিন হওয়া উচিত।
কিন্তু বাইশটা জন্মদিন তো কেটে গেল।
সে এল না আজও।
এবার আসবে কি?

শ্রীলতা

মিস মিত্রের নাম কি শ্রীলতা? ওর পুরো নাম তো কোনোদিন জানবার দরকার হয়নি। আপিসের খাতা খুলে দেখলাম লেখা আছে মিস এস. মিত্র। কবিতাটা কি ওর লেখা?

হঠাৎ অনুভব করলাম তুমি আমার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে আছ।

।। পাঁচ ।।

তপতী এসেছিল হঠাৎ সেদিন।

তপতী যেন ঝড়, হাসির ঝড়। প্রতি কথায় হাসে, হাসির কথায় হেসে লুটিয়ে পড়ে। ওর প্রসাধনের বালাই নেই। চুল এলোমেলো। মুখে স্নো পাউডারের চিহ্ন নেই। পরনে অতি সাধারণ সুতীর কাপড়। পরবার ধরনও অতি সাধারণ। মনে হয় কাপড়টা জড়িয়ে রেখেছে গায়ে যেন কোনোরকমে। বুকের কাপড় বার বার সরে যায়, বার বার ঠিক করে নেয়। দাঁতগুলো বড় বড় আর ধপধপে সাদা। রং আড়ময়লা। মুখটা পানের মতো। গলাটা একটু যেন বেশি লম্বা। দোহারা চেহারা। তপতীর আসল সৌন্দর্য তার চোখদুটিতে। বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ আর সে চোখের আয়নায় তার যে চরিত্র প্রতিফলিত তা অনুপম কিন্তু রহস্যময়। তা যেন সদা চঞ্চলতার মুহুর্মুহুঃ আঘাতে সম্পূর্ণ রূপায়িত হতে পারে না কখনও। আভাস ইঙ্গিতে দেখা দেয়। কখনও মনে হয় সে খুব গভীর, আবার কখনও মনে হয় লঘু। হালকা উড়ন্ত মেঘের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে দেখা যায় আকাশচুম্বী পর্বতশৃঙ্গকে। দৃঢ় গম্ভীর পর্বতশ্রেণী হঠাৎ দেখা দিয়ে আবার হঠাৎ ঢাকা পড়ে যায়। বোঝা যায় না তপতী চরিত্রের মূল সুরটা মেঘ, না পাহাড়। রামধনুও যেমন দেখা যায় মাঝে মাঝে, বজ্রের ভ্রূকুটিও তেমনি বিরল নয়। সবই আছে, কিন্তু সবই একটা স্বতোৎসাহিত আনন্দের দোলায় দুলছে।

হাস্যমুখী তপতীর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল আসানসোল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। দুঃসহ গরম সেদিন। উত্তপ্ত প্ল্যাটফর্মে নিষ্ঠুর নিদাঘের নিষ্করুণ প্রতাপ সহ্য করতে না পেরে আশ্রয় নিয়েছিলাম ওয়েটিং রুমে। তেষ্টা পেয়েছিল খুব। চেষ্টা করেও ঠাণ্ডা পানীয় কোথাও পাইনি। স্টেশনের ভেন্ডারটা বললে, বরফ ফুরিয়ে গেছে, এখন পাওয়ার আশাও নেই। শুষ্কতালু হয়ে ওয়েটিং রুমের ইজিচেয়ারটায় চোখ বুজে শুয়েছিলাম। মাথার উপর ঘুরছিল ফ্যানটা তপ্ত হাওয়ার ঝড় তুলে। এমন সময় হাস্যমুখী তপতী এসে ঢুকল।

'ওমা, আপনি এখানে—'

এগিয়ে এসে প্রণাম করল আমাকে। তাকে আগে কখনও দেখিনি। একটু বিস্মিত হলাম।

বললাম, 'আপনাকে চিনি বলে তো মনে হচ্ছে না'

'আমি আপনাকে চিনি। কে না চেনে আপনাকে। কবি দিগন্ত সেনকে সবাই চেনে। তা ছাড়া আপনার বোন মল্লিকা পড়ত আমার সঙ্গে। আপনি আমাদের স্কুলেও একবার গিয়েছিলেন অনেকদিন আগে। সেই আপনাকে প্রথম দেখি—'

ফিকফিক করে হাসতে লাগল। বুকের থেকে কাপড়টা উড়ে গেল হাওয়ার তোড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে নিয়ে বলল, 'ভেন্ডারের কাছে বরফ নেই। আপনি ঠাণ্ডা জল পেয়েছেন?'

'কোথা পাব'

'আমার কাছে আছে থার্মোফ্লাস্কে। দাঁড়ান নিয়ে আসি'

আসানসোলের তপ্ত প্ল্যাটফর্মে বরফশীতল জল খাইয়েছিল আমাকে তপতী। একটা অরেঞ্জ স্কোয়াশও খাইয়েছিল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনার কবিতার একটা লাইন বুঝতে পারিনি। বুঝিয়ে দেবেন? ''হাসির দোলায় দুলতে দুলতে আসবে যে, কান্না সে কি

জানবে না?'' কান্না তো সবাইকেই জানতে হবে। অনেক সময় হাসিই কান্নাকে ঢেকে রাখে। তাই না?'

বললাম, 'ইঙ্গিতে সেই কথাই তো বলেছি'

তপতী বলল, 'জানেন আমি খুব হাসি। আমার সবেতেই হাসি পায়। মা বলে তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে'

বলেই খুব হাসতে লাগল।

তারপর কতদিন কেটে গেছে মনে নেই। তপতীর দেখা পেয়েছি কিন্তু মাঝে মাঝে. কখনও চলন্ত ট্রাম থেকে হাসিমুখে চেয়েছে আমার দিকে, কখনও দেখা হয়েছে সিনেমার ভিড়ে। রবীন্দ্রসদনে একবার গান শুনছি হঠাৎ দেখলুম সে আমার সামনের সিটে বসে আছে। আমাকে দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করল। একটা সাহিত্য-সভাতেও দেখা হয়েছিল একদিন। তারপর অনেকদিন তার দেখা পাইনি।

সেদিন এসে সে যা বলল তাতে হকচকিয়ে গেলাম। বলল—হাসতে হাসতেই বলল—'বড় বিপদে পড়ে এসেছি আপনার কাছে, উদ্ধার করতে হবে'

বিপন্না নারীকে উদ্ধার করা পুরুষমাত্রেরই কর্তব্য। সে কর্তব্য পালন করতে নির্ভয়ে এগিয়ে যাওয়াই উচিত। আমি কিন্তু ভয় পেয়ে গেলাম। আমার অন্তরাত্মা যেন বলে দিল ওকে আশ্রয় বা প্রশ্রয় দিলে তোমার বিপদ হবে।

'আমায় সাহায্য করবেন?'

'কি হয়েছে আগে সেটা বল'

'আমাকে ব্যাধেরা ঘিরে ফেলেছে। বিয়ের সম্বন্ধ আসছে চারিদিক থেকে। আমি বিয়ে করব না'

'বিয়ে করবে না কেন'

'আমার বিয়ে হয়ে গেছে'

'তোমার বাড়ির লোকে সে কথা জানে না?'

'কেউ জানে না'

'কেউ জানে না?'

'না। এমন কি যাকে বিয়ে করেছি, সে-ও জানে না'

হেসে লুটিয়ে পড়ল তপতী।

'তা হলে কি রকম বিয়ে সেটা?'

'সেকালে অনেক মেয়ে গাছকে বিয়ে করত। গাছ কি জানতে পারত সে বিয়ের কথা?'

'একালে সে রকম গাছ পেলে কোথা?'

'পেয়েছি। তার বাইরের চেহারাটা মানুষের মতো কিন্তু আসলে সে গাছ। বৃহৎ বনস্পতি। তার ফুল আছে পাতা আছে, তার ডালে পালায় নানা পাখির আনাগোনা, অনেক ঐশ্বর্যও তার। সে কিন্তু উদাসীন নির্বিকার। তাকেই বরণ করেছি আমি'

'হেঁয়ালি বুঝতে পারছি না। আমাকে এখন কি করতে হবে বল'

'আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে চাই। আপনাকে তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আমার কাছে পয়সাকড়িও কিছু নেই। জানি না আপনার উপর কতটা নির্ভর করতে পারি'

হাসিমাখা দৃষ্টি তুলে চেয়ে রইল আমার দিকে। আমার মনে হল অগাধ জলে পড়ে গেছি। সাঁতার জানি না। নাকানিচোবানি খাচ্ছি। তারপর হঠাৎ একটা খড় ভেসে এল আমার দিকে। দিন কয়েক আগে দার্জিলিং যাব বলে একটা টিকিট কিনেছিলাম। সেখানকার একটা হোটেলে রুমও ভাড়া করেছিলাম পনের দিনের জন্য। কিছু টাকাও অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তাদের।

বললাম, 'তুমি যদি দার্জিলিং যেতে চাও, তোমাকে একটা টিকিট দিতে পারি। সেখানে একটা হোটেলে একটা ঘরও ভাড়া করা আছে পনের দিনের জন্য।'

'আপনি যাবেন না?'

'না। একটা টিকিটই তো কিনেছিলাম। সেটা নিয়ে তুমিই চলে যাও। আমি কাজে আটকে গেছি, আমার যাওয়া হবে না এখন'

খিলখিল করে হেসে উঠল তপতী।

'কেন যাবেন না, তা বুঝেছি। সুনামে কলঙ্ক লাগবে বুঝি—' একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। কিন্তু কিছু বললাম না।

তপতী বলল, 'বেশ, আমি একাই যাব। দিন টিকিটখানা। কিন্তু আর একটা মুশকিল আছে—'

ঘাড় বেঁকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

'আবার কি—'

'আমার হাতে পয়সাকড়ি নেই। নিঃস্ব অবস্থায় বিদেশে যেতে সাহসও হচ্ছে না'

এরপর আমি যা করলাম তা করা উচিত ছিল কি না জানি না। পকেট থেকে মনিব্যাগ বার করে দেখলাম তাতে পঞ্চাশটি টাকা রয়েছে, পঞ্চাশ টাকাই দিয়ে দিলাম তাকে।

তপতী চলে গেল।

আমার টেবিলের এক কোণে একটা লম্বা ফুলদানিতে রজনীগন্ধা ফুল ছিল একগোছা। ফুলদানির পিছনে ছিল একটা কাচের জানলা। আর সে জানলায় ছিল সবুজ একটা পরদা। পরদার ভিতর দিয়ে সূর্যালোক এসে একটা সবুজাভ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল রজনীগন্ধার গুচ্ছটিকে ঘিরে। কাচের লম্বা ফুলদানিতে লেগেছিল সেই পরিবেশের প্রভাব।...পাশের বাড়ির খুকু গীটারে আশাবরী বাজাচ্ছিল। আমি যে অবস্থায় ছিলাম তাকে কি বলে বর্ণনা করব জানি না। সব দেখছি অথচ দেখছি না, সব শুনছি অথচ শুনছি না। এই রকম একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে আমার চৈতন্য যখন মগ্ন হয়ে তন্দ্রালু হয়ে পড়েছিল তখন তুমি আবির্ভূত হলে।...পরদার ভিতর দিয়ে যে সূর্যালোক আসছিল তা যেন রূপায়িত হল সবুজ সুরে। শ্রাব্য নয়, দৃশ্য। অদ্ভুত স্বচ্ছ, অদ্ভুত সবুজ, অদ্ভুত সুন্দর একটা কুঞ্জবন যেন মূর্ত হয়ে উঠল আমার জানলার সামনে। দৃষ্টির মাধ্যমে আমি যেখানে গিয়ে হাজির হলাম তা সুরলোক। কাচের ফুলদানি সমেত রজনীগন্ধার গুচ্ছটা হয়ে গেল যেন ছোট্ট একটি তন্বী রূপসী। আমার তন্দ্রাচ্ছন্ন অনুভূতি দিয়ে আমি অনুভব করলাম তুমি এসেছ। যে তুমি বার বার নানারূপে আসছে সেই তুমি এসেছ আবার। আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললে, তুমি কি চাও তা কি তুমি জান? বললাম, জানি কিন্তু প্রকাশ করতে পারি না। তুমি বললে, কবিতায় পারবে। আমি বলছি তুমি লেখ। তুমি বলতে লাগলে আমি লিখতে লাগলাম।

কোনও মূর্তিকে আঁকড়ে ধরলেই
অসম্পূর্ণকে পাওয়া হল।
কারণ যারা মূর্তি ধরেনি
সেই সব অমূর্ত অপরূপের দল
রয়ে গেল তোমার নাগালের বাইরে।
তোমার আলিঙ্গিত মূর্তির
তোমার আলিঙ্গনের ওপারে
হয়তো তাদের আভাস পাবে
আলেয়ার মতো
মরীচিকার মতো
হয়তো তাদের সৃষ্টি করবে কল্পনা দিয়ে
কিন্তু তাদের পাবে না কখনও।
অমূর্ত রূপকে উপভোগ করার ইন্দ্রিয়
তোমার নেই।
আকাঙক্ষা আছে কি?
যদি থাকে
তাহলে তোমার সেই দূরাশাকে
সত্যে রূপায়িত করবে যে শিল্পী
মূর্তি দেবে যে কবি
তাদের সন্ধান করো।

হঠাৎ দুয়ার ঠেলে ঢুকল পাশের বাড়ির খুকু। হাতে গীটার।

'দিগদা আপনার সময় আছে?'

'আছে। কেন?'

'আমি আশাবরীটা অনেক কষ্টে তুলেছি গীটারে। শুনবেন?'

'শুনেছিলাম তো। বেশ হয়েছে'

'বেশ হয়েছে? আপনি বলছেন বেশ হয়েছে? মন দিয়ে শুনেছিলেন? আর একবার শুনুন'

অনুনয়ের সুর বেজে উঠল তার কণ্ঠে। আমার অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই বসে পড়ল সে সামনের সোফাটায়। শুরু করল গীটার বাজাতে। খুকুর ভালো নাম চন্দ্রাননী গাঙ্গুলী। যদিও সে আমাকে দাদা বলে কিন্তু রক্তের সম্পর্ক নেই। পাশের বাড়িতে থাকে, আমিও গানবাজনার চর্চা করি, তাই নিজেই এসে আলাপ করেছিল একদিন আমার সঙ্গে। এসে বলল, 'আপনিই কি কাল পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন?' বললাম, 'হ্যাঁ।' খুকু বললে, 'এমন বাজনা শুনিনি আগে। মনে হচ্ছিল সুরের ঝড় বইছে। আপনি গীটার বাজাতে জানেন? বললাম, 'জানি একটু একটু।' অনুনয় ধ্বনিত হয়ে উঠলে খুকুর কণ্ঠে—'আমাকে তাহলে মাঝে মাঝে শিখিয়ে দিতে হবে। আমি গীটার শিখছি। দেবেন তো?' 'না' বলতে পারিনি। সেই থেকে খুকু আসে আমার কাছে। গীটার শেখার ফাঁকে ফাঁকে আবিষ্কার করেছি ওকে ঘিরে সেই মহোৎসব চলছে যে মহোৎসব সব নারীর জীবনেই অতর্কিতে আসে এবং অতর্কিতে শেষ হয়ে যায়। যে উৎসবে

প্রত্যেক নারীকেই মনে হয় সম্রাজ্ঞী, অপ্সরী বা স্বপ্ন, যে উৎসবের দিকে পুরুষমাত্রেই আত্মহারা হয়ে চেয়ে থাকে, যাকে ঘিরে মূর্ত হয় কবি-কণ্ঠে গান, চিত্রকরের তুলিতে ছবি। খুকুর ঠিক কত বয়স জানি না, কিন্তু এম.এ. ক্লাসের ওই ছাত্রীটির সর্বাঙ্গ ঘিরে যৌবনের বসন্ত-উৎসব যে রঙে রসে মহিমায় স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছিল তা আবিষ্কার করতে আমার দেরি হয়নি। আমার মধ্যে যে পৌরুষ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তার খানিকটা প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছিল পাশবিক আগ্রহে, খানিকটা চাইছিল পূজারীর মতো পূজা করতে, আরও একটা অংশ কি যে চাইছিল তা অস্পষ্টতার কুয়াশায় আচ্ছন্ন। তা পাশবিক নয়, তামসিক বা রাজসিক নয়, তা যেন ওর প্রস্ফুটিত যৌবনের মধ্যে নিজেকে নিষ্কাম আনন্দে বিলিয়ে দেওয়ার আগ্রহ। এর নামই কি আধ্যাত্মিক আকুলতা? ঠিক জানি না, কারণ তা মাপবার মাপকাঠি আমার কাছে নেই। তা অস্পষ্ট, তবু সত্য।

'কি রকম হয়েছে'

হঠাৎ বলে উঠল খুকু। আশাবরীতে লাগল যেন আর একটা নতুন সুর। খুকুর গলা সত্যিই খুব মিষ্টি। আমি মন দিয়ে শুনিনি। তন্ময়তার কুয়াশায় অন্যমনস্ক হয়ে ছিলাম।

তবু বললাম, 'চমৎকার হয়েছে'

খুকু হঠাৎ এসে আমাকে প্রণাম করে বলে, 'আপনিই তো আমার গুরু। সত্যিই যদি ভালো হয়ে থাকে তাহলে সে কৃতিত্ব তো আপনারই।'

তারপর চলে গেল সে। তার পিঠ-কাটা ব্লাউজের কল্যাণে দেখতে পেলাম তার পুষ্ট পিঠের আর সমুন্নত নিতম্বের খানিকটা। রূঢ় বস্তুলোকের বাস্তবতায় হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম যেন। মুগ্ধ হলাম, ক্ষুব্ধও হলাম।

তারপর মনে হল অসমাপ্ত কবিতাটা শেষ করি। খাতার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলাম কিন্তু। এক লাইনও তো লিখিনি! যে কবিতাটা আমার মনে বেজে উঠেছিল সেটাও কি অরূপা তাহলে? অনেকক্ষণ বসে রইলাম। একটা সুমিষ্ট আবেশ যেন ধীরে ধীরে জড়িয়ে ধরল আমাকে। তা যে সুমিষ্ট তা আমার সর্বচেতনা দিয়ে অনুভব করছিলাম, কিন্তু এ-ও অনুভব করছিলাম যে তার হাত থেকে আমার মুক্তি নেই। অনুভব করছিলাম সে সুমধুর কিন্তু অনতিক্রম্য আবেশ তোমারই নিবিড় আশ্লেষ, তা যদিও অবর্ণনীয়, তা যদিও সীমার বন্ধনে বন্দী হয়নি, কিন্তু তা তুমি, তুমি, তুমি। অনেকক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলাম। মনে হল যেন তলিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কোথায় তা জানি না। হঠাৎ এক জায়গায় এসে শক্ত মাটিতে পা ঠেকল। দেখলাম বিশাল এক প্রাসাদের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে আছি। অঙ্গনও মণিমাণিক্য খচিত। প্রাসাদ রত্নময়। সব কিন্তু ছায়ায় ঢাকা। সহসা একটি রূপসী কন্যাকে দেখতে পেলাম, ত্রস্ত হয়ে ছুটে পালাচ্ছে। আমাকে দেখে ছুটে পালাচ্ছে কি? কেন? তারপরই মনে পড়ল গল্পটা। বুঝতে পারলাম আমি প্লুটো (Pluto) আর ওই মেয়েটি পার্সিফোন (Persephone)... প্লুটো পার্সিফোনকে হরণ করে এনেছিল পৃথিবী থেকে। কিন্তু তার মন পেতে অনেক দেরি হয়েছিল তার। কিন্তু আমি প্লুটো হতে যাব কেন? আমি তো কাউকে হরণ করিনি। করিনি? সত্যি করিনি? মনে মনেও করিনি? সামনের জানলার কপাট দুটো সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। ঝড় আসবে একটা।

।। ছয় ।।

আপিসে বসে ফাইল ক্লিয়ার করছিলাম। অনেক ফাইল জমে গিয়েছিল। অনেক জটিল বিষয় ছিল সে সব ফাইলে। সে সব জটিল সমস্যার সমাধান করে পাশে পাশে আমি মন্তব্যও লিখছিলাম। কিন্তু এরই ফাঁকে ফাঁকে যাওয়া আসা করছিল মিস মিত্রের অনুপস্থিত সত্তা। প্রতি মুহূর্তে আশা করছিলাম সে এসে পড়বে, কিন্তু সে আসছিল না। আমি টাইপিস্ট মিস মিত্রের সান্নিধ্য কামনা করছিলাম না, আমি সান্নিধ্য কামনা করছিলাম কবি শ্রীলতা মিত্রের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে এল না। হয়তো সই-করাবার মতো কোনো চিঠি আজ নেই। ওই বাজে চিঠিগুলোর মাধ্যমেই তো সে আসে। আজ বোধহয় চিঠি নেই।

তারপর আমি যা করলাম তা আমার কাছে অশোভন ঠেকেনি সেই মুহূর্তে। কিন্তু পরে মনে হয়েছিল এটা না করলেই হত। আমি একটা কোম্পানীকে অদরকারী একটা চিঠি লিখে ঘণ্টা টিপলুম। চাপরাসী আসতে তাকে বললাম, 'টাইপিস্ট মিস মিত্রকে খবর দাও, একটা চিঠি টাইপ করতে হবে।'

চাপরাসী উত্তর দিল, 'মেমসাহেব আজ আসেননি'

তখন ফোন করলাম আমার বড়বাবুকে।

'মিস মিত্র আজ আসেননি?'

'না। তাঁর অসুখ করেছে, একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন'

'কি অসুখ'

'তা তো জানি না। সে কথা লেখেননি কিছু'

'টাইপিস্টের কাজ করছে কে'

'জগমোহন'

গুঁফো তোবড়া-গাল জগমোহনের মুখটা মনে ভেসে উঠল।

যে চিঠিটা লিখেছিলাম সেটা আর টাইপ করতে দিলাম না।

মিস মিত্র উপর্যুপরি চার দিন এলেন না। বড়বাবু বললেন, 'তিনি এক মাসের ছুটি চেয়ে দরখাস্ত করেছেন। ডাক্তার সন্দেহ করেছেন তাঁর নাকি টাইফয়েড হয়েছে'

এর পরই দ্রুত পরিবর্তন হল আমার মানসলোকে। বিজ্ঞানীরা বলেন এই নিখিল বিশ্ব একদিন নাকি নিহিত ছিল উত্তপ্ত একটা গ্যাসের পিণ্ডে। তারই ক্রমবিবর্তন আমাদের পৃথিবী এবং মানুষ। সে ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস তাঁরা লিপিবদ্ধ করেছেন নানারকম কল্পনা এবং প্রমাণের উপর নির্ভর করে। মিস মিত্রের কঠিন অসুখ করেছে এই সংবাদটাও জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ডের মতো আমার মনের আকাশে আবর্তিত হয়েছিল (কেন হয়েছিল তা জানি না)। কিন্তু সেটা কি করে যে রূপান্তরিত হল, কি করে আমি যে আমার প্রেস্টিজবোধ হারিয়ে কিছু আঙুর-বেদানা-কমলালেবু নিয়ে সারপেনটাইন লেনে আমার টাইপিস্টের বাসাবাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম, ওই জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ডটা কি করে যে বহুবর্ণসমন্বিত সৃষ্টিশোভায় বিকশিত হল, কোন্ মন্ত্রবলে যে আপিসের দোর্দণ্ডপ্রতাপ মনিব টাইপিস্টের সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রেরণায় তার খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন এ রহস্যের ইতিহাসও আমার জানা নেই।

সারপেনটাইন লেনের কোন্ নম্বর বাড়িতে থাকেন মিস মিত্র সে খবরটা আপিসের খাতা

থেকে জেনে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম সেটা একটা ফ্ল্যাট। কড়া নাড়তেই একতলা থেকে যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বেরিয়ে এলেন তিনিই খবরটি দিলেন আমায়।

বললেন, 'দোতলায় ফ্ল্যাটের আধখানাতে থাকেন মিস মিত্র। বাঁ দিকটায়। আপনি এই সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় চলে যান। বাঁ দিকের ফ্ল্যাটটায় মিস মিত্র থাকেন। তাঁর অসুখ করেছে।'

বললাম, 'সেই জন্যেই তো এসেছি'

'আপনার আত্মীয় নাকি'

'তা বলতে পারেন'

আমার গাড়িটার দিকে চেয়ে তাঁর সম্ভবত সম্ভ্রম জাগল মনে।

বললেন, 'এসেছেন ভালোই হয়েছে। আমার মনে হয় ওঁর ঠিক চিকিৎসা হচ্ছে না।'

'তার মানে?'

'হোমিওপ্যাথিই যদি করাতে চায় তা হলে ভালো একজন হোমিওপ্যাথকেই ডাকুক। ওষুধ দিচ্ছেন পাড়ার ননী চৌধুরী, যাঁর আসল কাজ কয়লার ব্যবসা। আমি একথা বলেছিলাম সুরেশবাবুকে কিন্তু আমার কথা তিনি শোনেননি—'

'সুরেশবাবু কে?'

'ওর দাদা। আপনি চেনেন না?'

ভদ্রলোক বোধ হয় একটু অবাক হলেন। আত্মীয় অথচ চিনি না—

কিন্তু সেকথা প্রকাশ করলেন না।

বললেন, 'আপনি চিকিৎসার একটা সুব্যবস্থা করে যান'

আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। মনে হল তুমিও উঠছ আমার সঙ্গে। দোতলায় উঠে দেখি বাঁ হাতের কপাটটায় ছোট একটি নেম-প্লেট—মিস এস. মিত্র। একটু বিস্মিত হলাম। বাড়িতে দাদা রয়েছে অথচ নেম-প্লেট তার নামে নয় কেন?

কড়া নাড়তেই কপাট খুলে গেল।

আড়ময়লা-লুঙ্গি-পরা যে লোকটি বেরিয়ে এলেন তিনিই সম্ভবত মিস মিত্রের দাদা। গাবদাগোবদা মোটাসোটা চেহারা। মুখে বুদ্ধিমত্তার দীপ্তি নেই। কিছু মাত্র মিল নেই মিস মিত্রের চেহারার সঙ্গে।

'কে আপনি—'

'আমি দিগন্ত সেন'

'আসুন, আসুন আপনি! দাদা, উনি আমার আপিসের বস।'

শ্রীলতার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

সুরেশবাবুর মুখেও তখন সম্ভ্রম ফুটল।

'ও, আসুন আসুন'

ঢুকে দেখলাম শ্রীলতাও তার রোগশয্যায় উঠে বসেছে। একটা শস্তা বেডকভার গায়ে দিয়ে শুয়ে ছিল, সেটা খসে পড়েছে গা থেকে। জ্বরে থমথম করছে মুখখানা। আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

'উঠবেন না, শুয়ে পড়ুন'

ঘরে বসবার চেয়ার ছিল না। এক কোণে ছোট টুল ছিল একটা তার উপরই বসলাম।

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল শ্রীলতার মুখ।

'আপনি যে আসবেন এ আমার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'জ্বর ছাড়ছে না?'

দাদাই উত্তর দিলেন, 'না। একটু আগে দেখলাম ১০৩'

'কি চিকিৎসা হচ্ছে'

'হোমিওপ্যাথিক'

'অ্যালোপ্যাথিতে টাইফয়েডের ভালো ওষুধ বেরিয়েছে। অ্যালোপ্যাথি করান'

চুপ করে রইলেন দাদা। শ্রীলতা পাশ ফিরে শুল দেওয়ালের দিকে মুখ করে।

একটু ইতস্তত করে দাদা শেষে বললেন, 'সত্যি কথা বলব? অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করবার পয়সা নেই আমাদের। আমি বেকার হয়ে আছি গত তিন মাস থেকে। শ্রীলতা যা রোজগার করে তাতে আমাদের কুলোয় না। এই দুখানি ঘরের ভাড়াই একশ' টাকা দিতে হয়।'

তখন আমাকে বলতে হল—'বেশ চিকিৎসার ভার আমি নিচ্ছি। আমার ডাক্তারকে বলে দিচ্ছি সে এসে সব ব্যবস্থা করে দেবে।'

'অ্যালোপ্যাথি ওষুধের দাম শুনেছি বড্ড বেশি'

'ওষুধের ব্যবস্থাও আমি করব। আচ্ছা, আমি তাহলে এখন উঠি। ভয় নেই ঠিক হয়ে যাবে সব'

কাগজের মোড়কে বেঁধে ফলগুলি এনেছিলাম সেগুলি মেঝের উপরই রাখতে হয়েছিল।

দাদা বললেন—'এগুলো আপনি ফেলে যাচ্ছেন'

'ওতে ফল আছে। মিস মিত্রের জন্যই এনেছি ওগুলো'

'তাই নাকি!'

বিস্মিত হলেন সুরেশবাবু। মিস মিত্র দেওয়ালের দিকে মুখ করেই শুয়ে রইলেন।

আমি সিঁড়ি দিয়ে নাবছিলাম।

তুমিও নাবছিলে আমার সঙ্গে সঙ্গে।

যে কথা তুমি উচ্চারণ করনি সেই কথা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল আমার অন্তরে।

'মিস মিত্রের কাছে এভাবে নিজেকে খেলো করে আনন্দ পেলে?'

এর প্রত্যুত্তর দিলাম আমি মনে মনে।

'আনন্দ হল বই কি। একজন গরিবের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম। এতে খারাপ কি আছে'

'তোমার আপিসের ব্রজবাবু ছ'মাস ধরে অসুস্থ। বিনা মাইনেতে ছুটি নিয়ে আছেন। তিনি মিস মিত্রের চেয়ে অনেক বেশি গরিব। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে তাঁর। তাঁর কি খোঁজ করেছিলে একদিনও?'

'ব্রজবাবু সামান্য কেরানি। তিনি কবি নন। শ্রীলতা কবি'

এক কথায় মনে হল অট্টহাস্য করে উঠল কে যেন। নীচে নেমে দেখলাম আকাশভরতি কালো মেঘ। চোখ ধাঁধিয়ে একটা বিদ্যুৎ চমকে উঠল। তারপর আবার অট্টহাস্য।

।। সাত ।।

তোমার অনবদ্য প্রকাশের বর্ণনা করি এমন সাধ্য আমার নেই। জলে-স্থলে, অনলে-অনিলে পুষ্পে পত্রে নির্ঝরে-নদীতে সাগরে-মরুভূমিতে কত রূপেই না ক্ষণে ক্ষণে আভাসিত হচ্ছে

তোমার লীলা। তুমি অনির্বচনীয়, তবু তোমাকে ভাষা দিয়েই প্রকাশ করতে চাই। অসম্ভব এ আকাঙক্ষা কেন? এ আমার আকাঙক্ষা নয়, এ প্রয়াস আমি না করে পারি না। তুমি আমার উপর ভর করেছ। তুমি আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছ সেই সব কথা যার অর্থ আমি জানি সীমাবদ্ধ কিন্তু যা আমি প্রয়োগ করছি তোমাকে, অসীমাকে, বর্ণনা করবার জন্য। কিন্তু তোমাকে শুধু অসীমা বললেই তৃপ্তি হয় না, আরও অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করে। সেদিন তোমার আভাস একটু পেয়েছিলাম। কুন্দফুল ফুটেছিল বাগানে অনেক। দিনের আলোয় তাদের দেখেছিলাম, তখন তোমাকে দেখতে পাইনি। কিন্তু জ্যোৎস্নার আলোয় যখন দেখতে গেলাম তখন দেখা পেলাম তোমার। অবশ্য তা-ও একটা আভাস মাত্র, একটা ইঙ্গিত, একটা ইশারা। জ্যোৎস্নাস্নাত কুন্দফুলগুলোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু সেই না-দেখতে পাওয়ার মধ্যেই ছিল একটা অসীমতা। জ্যোৎস্নামাখানো ফুলগুলি আমাকে স্বপ্নলোকে নিয়ে গেল যেখানে সবই সম্ভব। দেখলাম এক উৎসুক রাজপুত্রকে গল্প শোনাচ্ছে এক চটুলা রাজকন্যা। আরব্য উপন্যাসের আমেজ চতুর্দিকে ভরপুর। চামেলী আতরের গন্ধ যেন ঘন হয়ে রয়েছে বাতাসের পরতে পরতে, তার ভিতর থেকে আভাসিত হচ্ছে মেহেদি রঙের স্বপ্ন। রাজপুত্র হঠাৎ বললেন, আচ্ছা শাহজাদী, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। তোমাকে আমি মেরে ফেলব এ জেনেও তুমি কি করে আমাকে এমন সুন্দর সুন্দর গল্প শোনাচ্ছ। শাহজাদী হেসে উত্তর দিলেন—আপনাকে দেখেই তো আমি মারা গেছি। মরবার ভয় আর আমার নেই। আমার ভয় পাছে আবার বেঁচে উঠে আপনাকে হারিয়ে ফেলি। মৃত্যুর মাঝখানে আপনাকে পেয়েছি, ভয় হয় জীবনের মাঝখানে আপনাকে হারিয়ে ফেলব। সাবাস, সাবাস, সাবাস বলে উঠলেন রাজপুত্র। শাহজাদীর থুতনি নেড়ে আদর করলেন। একটা করুণ গম্ভীর সুর ধ্বনিত হতে লাগল অন্তরীক্ষে। হেনা রজনীগন্ধা আর চাঁপার গন্ধ—অভিনন্দনে ভরে উঠল চারিদিক। কুন্দফুলগুলো চোখের সামনেই ছিল, কিন্তু তারা যেন হারিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল। মনে হল ওরা কি শুধু কুন্দ? আর কিছু নয়? আর মনে হল এ সমস্তকে ঘিরে তুমি বিরাজ করছ।

হ্যাঁ, তুমি।

কিন্তু তোমাকে বর্ণনা করব কি করে?

।। আট ।।

সেদিন রবিবার।

খোলা বারান্দায় প্রসন্ন প্রভাতের রোদ এসে পড়েছিল। বারান্দার একধারে পড়েছিল খবরের কাগজটাও। কিন্তু সেটা খুলে দেখতে ইচ্ছে করছিল না। কোথাও ডাকাতি বা রাহাজানি হয়েছে, রাজনৈতিক নেতারা কি নিয়ে পরস্পর কলহ করছেন, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির বহর কোন্ সভায় কতটা হয়েছে, অরাজকতা কেমন ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিচ্ছে এসব বেদনাদায়ক খবর পড়তে ইচ্ছে করছিল না।

ওমর খৈয়াম পড়ছিলাম। ভাবতে চেষ্টা করছিলাম আমার এই ত্রিতল বাড়িটা একটা সরাইখানা আর আমার পাশে কোনো অদৃশ্য তন্বী রূপসী বসে আছে সুরাপাত্র হাতে নিয়ে। ভাবতে চেষ্টা করছিলাম কিন্তু ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল সে চেষ্টা। অবাস্তব কল্পনাটা আরও অবাস্তব

হয়ে যাচ্ছিল রাস্তার ভিখারিনিটাকে দেখে। পরনে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ার ফালি, সারা মুখে হতাশার ছাপ, হাতে ভিক্ষাপাত্র। করুণ প্রত্যাশাভরা দৃষ্টিতে চেয়েছিল আমার দিকে। তার করুণ নির্বাক দৃষ্টি ভাসিয়ে নিয়ে গেল ওমর খৈয়াম আর তার সাকীকে। মনটা বাস্তবমুখী হয়ে উঠল। চারিদিকে এত দুঃখ কেন? যখন এম. এ. ক্লাসে পড়তাম তখন মনে হয়েছিল স্বাধীনতা পেলে সুস্থ রাজনীতিই এর সমাধান করবে। এখন সে ভুল ভেঙেছে। এখন দেখছি এদেশে সুস্থ রাজনীতি নেই, আছে পার্টি-নীতি আর স্বার্থনীতি। তবু মনে হয় আমার এই তিনতলা বাড়িতে একা থাকবার অধিকার আমার আছে কি যখন আমার বাড়ির পাশেই শ্যামবাবু বিরাট পরিবার নিয়ে ছোট ছোট তিনখানা ঘরে গুঁতোগুঁতি করে মরছেন? আমি যদি এই বাড়িটা গরিবদের দান করে দিই তাহলেই কি সব দরিদ্রদের সমস্যার সমাধান হবে? হবে না। হবে না, হবে না, হবে না, কিছুতেই হবে না। আমার বাড়িটা নিয়ে তখন নতুন সমস্যা জাগবে, কমিটি বসবে, তাঁরা ঠিক করবেন কার পাওয়া উচিত, শেষপর্যন্ত দেখা যাবে যোগ্য লোকেরা পায়নি তদ্বির-পটুয়া পেয়েছে। মানুষের অশান্তি, অসন্তুষ্টি থাকবেই। ধনী দরিদ্র কারও শান্তি নেই, কেউ সন্তুষ্ট নয়। যে কোনো রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেই চালাকরা নিজেদের কোলে ঝোল টেনে নেবে আর দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে থাকবে বোকারা। বুদ্ধিমানরাই শক্তিমান, তারাই পৃথিবী ভোগ করবে। তাদের হটিয়ে দেবার মতো কোনো সাধু পন্থা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তবু আমি একটু বিরূপ দৃষ্টিতেই চেয়ে রইলাম আমার সেগুন কাঠের কপাটগুলোর দিকে। মোজেইক-করা মেঝেটা যেন বিদ্রূপ করতে লাগল আমাকে। মনে হল—না, এ বাড়িকে কিছুতেই ওমর খৈয়ামের সরাইখানা ভাবা যাবে না। ওমর খৈয়ামের সুর আর মোহমুদগরের সুর মূলত এক—বৈরাগ্যের সুর, পৃথিবীর নশ্বরতার সুর ধ্বনিত হয়েছে ওই দুটো কবিতাতেই। আমার মতো ভোগীর বিলাস-মঞ্চে ও সুর মানাবে না। কিন্তু পরক্ষণেই যা ঘটল তাতে বদলে গেল সব।

খুকু এল গীটার নিয়ে।

'আমি একটা নতুন গান তুলেছি। শোনাই?'

'শোনাও'

খুকু বাজাতে লাগল—'আমায় একটু শুধু বসতে দিও কাছে।'

...একটু পরে অনুভব করলাম আমি বাজনাটা শুনছি না, খুকুর পল্লবিত মুঞ্জরিত দেহশ্রীর দিকেই চেয়ে আছি। মনে হল খুকু যেন গীটার বাজাচ্ছে না, আমাকে সুরা পান করাচ্ছে। আমি ওমর খৈয়াম, সে সাকী। সে স্বপ্নলোকে চিরন্তন ওমর খৈয়াম চিরন্তনী সাকীর জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে সেই স্বপ্নলোক বাস্তবে রূপান্তরিত হল কোন্ মন্ত্রবলে তা প্রথমে বুঝতে পারিনি। হঠাৎ আমার জানলার ফাটা কাঁচটার দিকে চেয়ে বুঝতে পারলাম। দেখলাম একটা বিদ্যুৎ যেন স্থির হয়ে গেছে, একটা বাঁকা তলোয়ার যেন মূর্ত হয়েছে ওখানে। বুঝলাম তুমি এসেছ অন্তরালে। তোমার আবির্ভাবেই সব বদলে গেছে। কিন্তু এই স্তব্ধ বিদ্যুৎ কি বলতে চাইছে? ওই বাঁকা তলোয়ার কিসের প্রতীক? 'আমায় একটু শুধু বসতে দিও কাছে' করুণ স্বরে বার বার মিনতি করছে খুকুর গীটার। রঙ্গনা গাছটার সর্বাঙ্গে মহোৎসব চলেছে, আকাশের উড়ন্ত মেঘটা যেন ঠিকানা পেয়েছে তার দয়িতার, পদ্মের পাপড়িতে প্রতিফলিত সূর্যালোক পদ্মকে পেয়েও যেন পাচ্ছে না, কিন্তু তোমার ওই উজ্জ্বল তলোয়ারের বক্রভঙ্গিতে কি বলতে চাইছ

তুমি তা বুঝলাম না। রাগ হয়েছে? ঈর্ষা হয়েছে? কিন্তু তুমি যে অসীমা, কোনো অনুভূতির সীমায় তুমি তো বাঁধা পড়বে না। তবে? না, বুঝতে পারলাম না। শুধু বুঝলাম তুমি এসেছ।

'কেমন লাগল'

গীটার বাজনা শেষ করে জিজ্ঞেস করল খুকু।

'চমৎকার'

'আপনি তো কোনোদিন খারাপ বলেন না'

ঠোঁট ফুলিয়ে জবাব দিলে খুকু ঘাড় বাঁকিয়ে।

আমি শুধু হাসলাম একটু।

তারপর খুকু প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হল হঠাৎ।

'আজ খুব ভালো ইংরেজী সিনেমা হচ্ছে একটা। একজন সঙ্গী পেলে গিয়ে দেখে আসতাম। কিন্তু কাউকে পাচ্ছি না। একা যেতে ভয় করে'

'তোমার বন্ধু-বান্ধবী কেউ নেই?'

'না, তেমন কেউ নেই। আমি নিতান্তই একা। এই বিরাট কলকাতা শহরে আমার মতো নিঃসঙ্গ বোধহয় আর কেউ নেই।'

তারপর হেসে বললে, 'কারও সঙ্গে মিশতে পারি না যে। কেবল গীটার শেখবার লোভেই আপনার সঙ্গে এসে আলাপ করেছি, তা-ও খুব ভয়ে-ভয়ে। আমার বাড়িতেও এমন কেউ নেই যার সঙ্গে গিযে সিনেমাটা দেখে আসি। বইটা খুব ভালো শুনেছি'

খুকু বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। পুরোনো চাকর রামধনই তাদের ভরসা। সেই সব বাইরের কাজ সামলে দেয়। এমন কি ব্যাঙ্ক থেকে টাকাও আনে। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার সুদ থেকে নাকি সংসার চলে ওদের।

খুকু যে প্রত্যাশাভরে দাঁড়িয়ে আছে তা আমি মনে মনে অনুভব করছিলাম, কিন্তু সহসা কিছু বলতে কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছিল।

খুকু বলল, 'আপনি সিনেমা দেখেন না বুঝি'

মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম, 'না, খুব একটা দেখি না। তবে চল আজ দেখে আসি তোমার সঙ্গে।

'যাবেন?'

একটি কথায় খুকুর আনন্দিত অন্তর যেন মূর্তি ধরে দেখা দিল।

সিনেমা দেখে যখন বেরুলাম তখন আমি মাতোয়ারা হয়ে গেছি। গল্পের নায়িকা নায়ককে খুব ভালোবাসত, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ভালোবাসত তার স্বদেশকে। সে যে মুহূর্তে বুঝতে পারল তার প্রণয়ী স্বদেশদ্রোহী, গোপনে গোপনে চেষ্টা করছে স্বদেশকে শত্রুপক্ষের হাতে বিকিয়ে দিতে, এর অকাট্য প্রমাণ যেদিন তার হাতে এল সেইদিনই সে গুলি করে মেরে ফেললে তাকে। তারপর দেশের জন্য লড়তে লড়তে প্রাণ দিল নিজেও।

...আমিও একদা 'স্বদেশী' ছিলাম, যদিও ইদানীং বদলে গিয়েছি। এখন মনে হয়েছে রাজনীতি করে আত্ম-আস্ফালন বা আত্ম-সেবা করা যায় কিন্তু স্বদেশসেবা করা যায় না। রাজনীতি করতে হলে দল গড়তে হবে। যে দলই গড়া যাক না কেন সে দলে দলাদলিই শেষে

মুখ্য হয়ে উঠবে, স্বদেশ হবে একটা উপলক্ষ মাত্র। এখন মনে হচ্ছে এই অজুহাতটা নিতান্তই একটা পঙ্গু অজুহাত। আমি আসলে পলাতক। এখন মনে হচ্ছে দেশকে যদি সত্যিই ভালোবাসতাম তাহলে অত অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করতাম না, ঝাঁপিয়ে পড়তাম। আসলে আমিও নিজেকেই ভালোবাসি তাই গা-বাঁচিয়ে আত্মসেবা করছি। নিজের ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ল। যে সূর্য চিরকালের মতো অস্ত গেছে সেই সূর্যই যেন দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করে উদিত হল আবার। মনে পড়ল কোয়াকে। সে কোথায় আজ? তার জেল হয়েছিল, তারপর তার আর কোনো খবর পাইনি। তার উজ্জ্বল নির্ভীক চোখ দুটো ভেসে উঠল মনের উপর। শচীনের মুখটাও মনে পড়ল। পুলিশের গুলিতে মারা পড়েছিল সে। তার মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে গিয়েছিলাম। মনে পড়ল শচীনের মুখের হাসিটা। বিজয়ীর হাসি, আত্মোৎস্বর্গের অপরিসীম তৃপ্তি সে হাসিতে উদ্ভাসিত। সে হাসি যেন বলছিল, দেশের জন্য মরতে পেরেছি, আমি ধন্য। দেশকে ভালোবাসি তার প্রমাণ দিতে পেরেছি এইতেই আমি কৃতার্থ। এই হাসিটা অনেকদিন আমার জীবনকে উজ্জ্বল করে রেখেছিল। কোথায় গেল আমার সে জীবন? কোথায় গেল সেই দিগন্ত? এই কথাটাই যেন বার বার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল আমার মনের সেই অন্ধকার গহন-প্রদেশে যা একদিন আলোকিত ছিল। আলো নিবে গেল কেন? সেই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি বিরাট একটা অর্কেস্ট্রার মতো বাজতে লাগল, আচ্ছন্ন করে ফেলল আমার সমস্ত সত্তাকে। আমি খুকুর পাশে নির্বাক হয়ে বসেছিলাম। মনে হল সেই উদ্দাম অর্কেস্ট্রার ভিতর সহসা একটা নূতন সুরও বাজল যেন। সে সুর বলতে লাগল দিগন্ত কোথাও যায়নি, যাবে না, যেতে পারবে না। তার পুরাতন জীবন প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, সূর্য যেমন প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে রাত্রির অন্ধকারে। অন্ধকারের যবনিকা সরে যাবে, আত্মপ্রকাশ করবে সে আবার। আমার মনে হল...কি যে মনে হল তা ব্যক্ত করা যাবে না। বার বার মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগলাম, দেশকে ভালোবাসি বই কি। যদিও নেতা হতে পারব না কখনও কিন্তু দেশকে ভালোবাসি...

মোটরটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটা প্রসেশন আসছে। অপরূপ একটি সরস্বতী প্রতিমা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে একদল ছেলে। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম। মনে পড়ল কাল সরস্বতী পুজো। তারপর চমকে উঠলাম হঠাৎ। মনে হল প্রতিমাটি যেন আমার দিকে চাইলে। তার মুখের স্মিতহাস্য যেন আমারই জন্য বিশেষ একটা অর্থ বহন করে আনল। তার মধ্যে আমি তোমাকে চিনতে পারলাম। নানারূপে তুমি দেখা দিয়েছ, আজ সরস্বতীরূপে দিলে, তোমাকে...

এর পর সব গোলমাল হয়ে গেল।

খুকু কথা কইল।

'সিনেমাটা ভালো লাগেনি বুঝি'

'খুব ভালো লেগেছে। এমন ভালো ছবি অনেকদিন দেখিনি'

'তাহলে চুপ করে আছেন যে'

এর উত্তরে আবার চুপ করে যেতে হল কয়েক মুহূর্ত। তারপরে বললাম, 'ভালো লেগেছে বলেই চুপ করে আছি। কত ভালো লেগেছে তা তো কথা দিয়ে বলা যাবে না'

'তা ঠিক।'

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনার লোককে কেউ ধন্যবাদ দেয় নাকি'

বললাম, 'তোমাকেই আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। তোমার জন্যেই এমন ভালো ছবি দেখা হল আমার'

'এটা রাখুন—'

একটা দশ টাকার নোট আমার হাতে গুঁজে দিল খুকু।

'একি!'

'না না, টিকিটের দামটা আপনি কেন দেবেন। সঙ্গ দিয়েছেন এই যথেষ্ট'

আমি হেসে বললাম, 'এটা কি আপনার লোকের মতো ব্যবহার হচ্ছে। তাছাড়া দশ টাকা তো লাগেনি'

'বাকিটা পরে ফেরত দেবেন।'

খুকুর বাড়ির সামনে গাড়িটা থামতেই খুকু নেবে গেল তাড়াতাড়ি। আমার মনে হল সত্যিই তো, গাঁটের পয়সা খরচ করে ওকে সিনেমা দেখাবার কোনো অধিকার তো আমার নেই। থাকলে এ প্রস্তাবই ও করত না। এ নিয়ে আর বেশি মাথা ঘামালাম না টাকাটা পকেটে পুরে নেমে পড়লাম। আমার মনে তখন অন্য সুর বাজছিল। ওপরে উঠেই ফোন করলাম কুমোরটুলিতে। সেখানকার একজন শিল্পীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা আছে।

'ভাই, আমার একটা উপকার করতে পারবে?'

'কি বলুন'

'আমি কাল সরস্বতী পুজো করব। একটি ভালো প্রতিমা দিতে হবে'

'আগে অর্ডার দেননি?'

'না। কিন্তু দিতে হবে ভাই একটা প্রতিমা। সেই জন্যেই তোমাকে ফোন করছি। একটা ব্যবস্থা করতেই হবে'

'ছোট প্রতিমা কিন্তু নেই একটাও। একটা বড় প্রতিমা দিতে পারি'

'বড় হলে ক্ষতি নেই? দেখতে সুন্দর তো?'

'হ্যাঁ, দেখতে চমৎকার'

'তাহলে ওইটেই পাঠিয়ে দিও'

পরদিন সকালে খুকুকে খবর পাঠালাম।

'তুমি তোমার গীটার নিয়ে এস। সরস্বতী পুজো করছি। প্রতিমা আনতে গেছে। তোমার গীটারের সুর দিয়ে অভ্যর্থনা করতে হবে বীণাবাদিনীকে। অবিলম্বে চলে এস'

আমার নিচের বড় 'হল' ঘরটায় আলপনা দিয়েছিল পাড়ার মেয়েরা। কয়েকটা বড় বড় ফুলদানিতে সাজিয়ে রেখেছিলাম গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা গোলাপ আর শ্বেতপদ্ম। একধারে বসে খুকু গীটার বাজাচ্ছিল। চমৎকার দরবারী কানাড়া শুরু করেছিল সে। প্রতিমা যখন এল তখনও তন্ময় হয়ে বাজাচ্ছে সে। প্রতিমাকে যথাস্থানে স্থাপিত করে চাইলাম প্রতিমার দিকে। চমৎকার প্রতিমা। কিন্তু সেদিন রাস্তায় প্রতিমার চোখে যে দৃষ্টি দেখেছিলাম, মুখের যে মৃদু হাসি আমার মনে আনন্দ-হিল্লোল জাগিয়ে তুলেছিল সে দৃষ্টি সে হাসি এ প্রতিমার নেই। সুন্দর মুখ, কিন্তু ভারী গম্ভীর। চোখের দৃষ্টি সম্মুখের দিকে প্রসারিত, আমার দিকে নয়।

...খুকু বাজিয়ে চলেছে, মীড়ে মীড়ে সুরে সুরে দরবারী কানাড়া মূর্ত হয়ে উঠেছে। উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে গোলাপ আর পদ্মের পাপড়িগুলো।

প্রতিমার মুখে কিন্তু হাসি নেই, কোনো ইঙ্গিত নেই, কোনো বার্তা নেই।

তুমি কি রাগ করেছ?

।। নয় ।।

আপিসের কাজ করছি। চাপরাসী একটা কার্ড নিয়ে ঢুকল। কার্ডে দেখলাম লেখা রয়েছে এস. গুপ্ত। ঠিক চিনতে পারলাম না। তবু বললাম, সেলাম দেও। সাহেবী পোশাক পরে যিনি এলেন প্রথমে তাঁকে চিনতে পারিনি। তারপর কথা কইতেই চিনতে পারলাম। ওরকম মিহি নিখাদে-বাঁধা কণ্ঠস্বর আর তো কারো শুনিনি।

'আরে সৌরভ যে। এস, এস, বস। অনেক দিন তোমাকে দেখিনি। কি খবর, কি করছ আজকাল'

'পুলিশের চাকরি করছি'

'আমাকে ভোলনি দেখছি এখনও'

'তোমাকে ভোলা কি সহজ নাকি। তোমার স্মৃতিচিহ্ন এই দেখ আমার হাতে এখনও রয়েছে'

অনেক দিন আগে—যখন দু'জনে কলেজে একসঙ্গে পড়তাম—তখন তার জন্মদিনে একটা হাত-ঘড়ি উপহার দিয়েছিলাম তাকে। দেখলাম ঘড়িটা এখনও তার হাতে বাঁধা আছে।

'ঘড়িটা এতদিন চলছে! আশ্চর্য—'

'মাঝে মাঝে অয়েল করিয়েছি শুধু। চমৎকার ঘড়ি, এক মিনিট স্লো-ফাস্ট হয় না'

'আপিসে কেন এলে ভাই। এখানে কি দিয়ে তোমাকে অভ্যর্থনা করি। চা বা কফি খাবে?'

'না। তোমার বাড়িতে পরে একদিন যাব। আগে যে জরুরি কথাটা তোমাকে বলতে এসেছি সেটা বলেনি। তপতী বলে কোনো মেয়ে কি তোমার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে দার্জিলিঙের একটা হোটেলে উঠেছিল?'

'হ্যাঁ। কেন'

'সে মেয়েকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। সে একজন টেরারিস্ট। হোটেলের ম্যানেজার বললেন ঘরটা তোমার জন্যেই রাখা ছিল। মেয়েটি তোমার কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে গিয়ে সেই ঘরটা দখল করেছিল। হোটেলের ম্যানেজার তোমার চিঠিটা আমাকে দেখালেন। চিঠিতে তুমি লিখেছ পত্রবাহিকা তোমার আত্মীয়া, তাকে যেন তোমার ঘরটায় থাকতে দেওয়া হয়। ভাগ্যে তুমি মহিলার নামটা লেখনি'

'তপতী টেরারিস্ট। তাই নাকি'

'তার তোরঙ্গ থেকে আমরা রিভলভার পেয়েছি একটা। আরও চিঠিপত্রও পেয়েছি। ও যে টেরারিস্ট তাতে আমাদের সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু এখনও কি টেরারিস্ট দল আছে?'

'আছে। যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তাতে ওরা সন্তুষ্ট নয়। যাক সে সব কথা। আসল

কথাটা হচ্ছে আমি চাই না যে তোমার নামটা ওর সঙ্গে জড়িত হয়। আমি যখন আছি এর মধ্যে তোমাকে বেমালুম বার করে দেব। তবে তোমাকে একটা আত্মীয়া খাড়া করতে হবে যে দরকার হলে বলবে যে তুমি তাকেই চিঠিটা দিয়েছিলে। চিঠিটা হারিয়ে ফেলেছিল বলে সে যেতে পারেনি। তপতী সেই হারিয়ে-যাওয়া চিঠিটা নিয়ে দার্জিলিঙের হোটেলে লুকিয়েছিল তোমার আত্মীয়া সেজে—এইটে আমরা প্রমাণ করব'

বললাম, 'আমার তো তেমন কোনো আত্মীয়া নেই ভাই। তাছাড়া—'

সৌরভ বলল, 'বেশ আমিই তাহলে তোমার আত্মীয়া আবিষ্কার করি একজন। গোটা কয়েক টাকা পেলেই অনেক মেয়ে রাজি হয়ে যাবে'

'আমি ভাই কিন্তু মিথ্যে কথা বলতে পারব না। পুলিশ আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে আমি বলব আমি তপতীকেই চিঠি দিয়েছিলাম'

'তার পরই পুলিশ কি জানতে চাইবে জান? ওর সঙ্গে কি আলাপ ছিল আগে, কোথায় কিভাবে আলাপ হয়েছিল'

'তখনও সত্যি কথা বলব। ওর সঙ্গে আগে আমার আলাপ ছিল না, এখনও তেমন নেই। কিছুদিন আগে ঘোর গ্রীষ্মের দুপুরে আসানসোল স্টেশনে ও আমাকে বরফ-জল খাইয়েছিল থার্মোফ্লাস্ক থেকে। এই সূত্রেই আলাপ—'

'পুলিশ জানতে চাইবে অযাচিতভবে অচেনা লোককে বরফ-জল খাওয়াতে গেল কেন সে'

'তখন বলব যদিও মুখোমুখি কোনো দিন দেখা হয়নি তবু ও চিনত আমাকে আমার লেখার ভিতর দিয়ে। আমি কবি, আমার অনেক কবিতাই ছাপা হয়েছে কাগজে, সেই সূত্রেই আমাকে চিনত তপতী, যদিও মুখোমুখি দেখা সেই প্রথম'

'কিন্তু পুলিশ এই 'কক অ্যান্ড বুল' (cock and bull) গল্প বিশ্বাস করবে না'

'তাহলে আমি নাচার। মিথ্যে কথা আমি বলতে পারব না। তপতী এখন কোথায়'

'জেলে আছে। তুমি তাহলে তোমার মত বদলাবে না?'

'না। তপতী যে টেরারিস্ট একথা আমি জানতাম না। তার সঙ্গে আমার দেখাও বেশিবার হয়নি, ঘনিষ্ঠতাও হয়নি। সে হঠাৎ একদিন এসে বললে বাড়ির সবাই জোর করে তার বিয়ে দিয়ে চাইছে। তাই সে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। আমার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করছিল। তাই আমি তাকে দার্জিলিঙের হোটেলে চালান করে দিয়েছিলাম। ওর সম্বন্ধে এর বেশি আর কিছু জানতাম না আমি। তোমার কাছে ওর নতুন পরিচয় পেয়ে কিন্তু আমার যা মনে হচ্ছে তা কি তুমি বরদাস্ত করতে পারবে?'

'বলে ফেল, দেখি পারি কিনা'

'ওর প্রতি আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে। মনে হচ্ছে মেয়েটি অসাধারণ'

'সত্যি টেরারিজ্‌মকে ভালো মনে কর?'

'করি। যেখানে সর্বত্র অবিচার, সেখানে সবাই মতলববাজ, সেখানে কালোবাজারীদের দাপটে সবাই সন্ত্রস্ত, যেখানে শাসনের নামে কুশাসন, যেখানে দেশের নামে সবাই চুরি ডাকাতি করছে সেখানে টেরারিজ্‌মই একমাত্র প্রতিবাদ। আর প্রাণ তুচ্ছ করে সে প্রতিবাদ যারা করে তারা নমস্য। অবশ্য অনেক মেকী টেরারিস্টও আছে যারা আসলে মতলববাজ গুণ্ডা, আশা করি তপতী তাদের দলে নয়। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘা যতীন, দীনেশ বাদল বিনয় যে পথে

চলেছিল, স্বয়ং অরবিন্দ একদিন যে পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, নিবেদিতা যে পথের আলোকপাত করেছেন আশা করি তপতীও সেই পথের যাত্রী। তুমি এটাকে খারাপ বল?'

'এটাকে খারাপ বলবার জন্যেই মাইনে পাই, যে মাইনে দিয়ে পালন করি আমার বুড়ো মা-বাবাকে আর বউ ছেলেমেয়েদের। অন্য পথে চলবার উপায় নেই আমার। যার নিমক খাই তার বিরুদ্ধাচরণও করতে পারব না। তবে তোমাকে আমি বাঁচাবার চেষ্টা করব। কারণ তুমি আমার বন্ধু আর এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে তুমি নির্দোষ। আচ্ছা, উঠি তাহলে এখন। পরে আবার আসব একদিন'

হেসে বললাম, 'আমি যদি সত্যি কথা বলি তাহলে আমাকে বাঁচাবে কি করে'

'এই 'পিকচার' থেকে বেমালুম লোপাট কবে দেব তোমাকে'

'কি করে সম্ভব হবে তা'

'দার্জিলিঙের ওই হোটেলওলার কাছ থেকে তোমার চিঠিখানা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেব। তিনিও ভয় পেয়েছেন খুব। আশা করি আমার কাছ থেকে অভয় পেলে চিঠিখানা আমাকে তিনি দেবেন'

সৌরভ চলে যাওয়ার পরই চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। জানলা দিয়ে দেখলাম আকাশে ঘন-ঘোর মেঘ। আলো জ্বালতে হল। বেয়ারা এসে ডাকটা দিয়ে গেল। অধিকাংশই আপিসের চিঠি। একটা বড় চৌকোনা খাম প্রথমে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। খামটা খুলে চমকে গেলাম। তপতীর ফটো। আমার দিকে চেয়ে হাসছে। সেই হাসিটা যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠল সহসা। আমি ভুলে গেলাম যে আমি আপিসে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে বসে আছি। অবলুপ্ত হয়ে গেল আমার পরিবেশ। আমার সমস্ত সত্তা যেন উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল।

'আমার হাসি তোমরা কিছুতে নিবিয়ে দিতে পারবে না। আমি অসত্যের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি। আমার হাসবার অধিকার আছে। কালোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি আমি আলো, ভণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি আমি সরলতা। আমি হাসব না? নিশ্চয়ই হাসব। আমার এ হাসিকে নেবাতে পারবে না তোমরা কেউ। এ হাসি সূর্যালোকের দীপ্তি। ফাঁসিকাঠে যখন ঝুলব তখনও এ হাসি অমলিন থাকবে।'

ফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল।

সৌরভ ফোন করছে।

'কে দিগন্ত? শোন, তপতী জেল থেকে পালিয়েছে। তোমার ওখানে যদি যায় আমাকে একটু খবর দেবে? আমার ফোন নাম্বার'...

'মাপ কর ভাই। যদি আসে—সম্ভবত আসবে না—কিন্তু যদি আসে তাহলে তোমাকে খবর দিতে পারব না, মানে পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার সৌরভকে খবর দিতে পারব না, বন্ধু সৌরভকে খবর দিতে পারি যদি সে বন্ধুর মতো ব্যবহার করে। আমাকে এর মধ্যে জড়িয়ো না ভাই। নিজেরাই যা পার কর'

সৌরভ ফোন কেটে দিলে।

ফটোটার দিকে আবার চাইলাম। তপতীর হাসি আবার বাঙ্ময় হয়ে উঠল। বলল, 'আমি যাব আপনার কাছে। তখন যদি ধরিয়েও দেন মনে করব না কিছু। কারণ জানি ধরা একদিন পড়বই। এ পথে যারা চলেছে তাদের সকলের যে পরিণতি হয়েছে আমারও তাই হবে এ

জেনেও এ পথে নেমেছি। যদি না-ও নামতাম তাহলেও মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পেতাম না। কিন্তু সে মৃত্যু হত অন্ধকারের মধ্যে পদদলিত লাঞ্ছিত পশুর মৃত্যু। এখন আমার সান্ত্বনা আমি আলোর নৌকোয় পাড়ি দিচ্ছি অন্ধকার সমুদ্রে। নৌকোও ডুববে কিন্তু যা ডুববে তা আলোর নৌকো। অন্ধকার তাকে গ্রাস করলেও হজম করতে পারবে না। কোনো-না-কোনো রূপে তা আবার দেখা দেবে নূতন দিগন্তে...।'

এর পরই বৃষ্টি এল। ঝমঝম শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল চারিদিক। মনে হল অসংখ্য নর্তকী যেন নাচছে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে। নাচের শব্দ থেমে গেল তারপর। হঠাৎ থেমে গেল। মনে হল নূতন কিছু আবির্ভাবে সসম্ভ্রমে থেমে গেল যেন সব। তারপর শোনা গেল গম্ভীর একটা সুর। তানপুরার সুর। তানপুরা বাজাচ্ছে কে? তারপর দেখতেও পেলাম তানপুরাটা। অন্ধকারে আবছাভাবে দেখা গেল। যে বাজাচ্ছে তার মুখ দেখা গেল না, আলো-আঁধারিতে দেখা গেল শুধু তার অলকগুচ্ছ, আর তার শুভ্র হাত দুটি। মনে হল তানপুরাটা শুধু বাদ্যযন্ত্র নয়, ওটা যেন জীবন্ত একটা হৃদয়। সে হৃদয় থেকে যা উৎসারিত হচ্ছে তা শুধু সুর নয়, তা কান্নাও নয়, তা যেন নির্দেশ, তা যেন আদেশ।

যে বাজাচ্ছে তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু জানি আমি সে কে।

সে তুমি।

।। দশ ।।

অনেকদিন পরে মিস মিত্র আপিসে এসেছেন। রোগা হয়ে গেছেন খুব। রোগা হয়ে তাঁর সৌন্দর্য যেন আরও বেড়ে গেছে। একটা অদ্ভুত সূক্ষ্মতা, একটা অনির্বচনীয় লঘুতা তাঁকে ঘিরে যে শোভা সৃষ্টি করেছে তা যেন ধরবার ছোঁবার জিনিস নয়, তা যেন ভঙ্গুর, রূঢ়তার সামান্য আঘাতে ভেঙে পড়বে তা। প্রজাপতির ডানায় হাত দিলে যেমন তার রং ঝরে যায়—অনেকটা তেমনি। বহুকাল আগে সাঁওতাল পরগনায় এক পাহাড়ের ধারে শীর্ণকায়া স্বচ্ছতোয়া একটি তরঙ্গিণীকে দেখেছিলাম। তাকে মনে পড়ছে। জনতাকে এড়িয়ে নদীটি সসঙ্কোচে বনের ভিতর দিয়ে বয়ে চলে গেছে। তার আশে-পাশে রয়েছে কিছু নুড়ি আর নাম-না-জানা পাহাড়ী ফুলগাছ কয়েকটা আমি যেদিন দেখেছিলাম সেদিন তার তীরে বসে একটা দোয়েল পাখি জল খাচ্ছিল ঘাড় উঁচু করে করে। আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল। নদীটাও সশঙ্কিত হয়ে উঠল যেন।

অনেকগুলি চিঠি টাইপ করে মিস মিত্র যখন দাঁড়ালেন আমার পাশে তখন আমি তাঁর দিকে না চেয়েই প্রশ্ন করলাম—'এখন বেশ ভালো আছেন তো'

'হ্যাঁ—'

প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে এই অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন তিনি। আমি চিঠিগুলি দেখে দেখে সই করতে লাগলাম। কয়েকটা সই করে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম মিস মিত্র নেই। তাঁর জায়গায় বেয়ারাটা দাঁড়িয়ে আছে। শেষ চিঠিটা সই করবার পর দেখলাম সবশেষ চিঠিখানা খামের চিঠি, আমার নামে। টাইপ-করা চিঠিগুলো বেয়ারার হাতে দিয়ে আমার চিঠিটা খুললাম। শ্রীলতার চিঠি।

মান্যবরেষু,

আপনি আমার অসুখের সময় যা করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই আমার। প্রখর গ্রীষ্মের পর বর্ষার ধারা-জলে স্নান করে একবার ভারি তৃপ্তি পেয়েছিলাম। কিন্তু তার জন্য বর্ষাকে ধন্যবাদ জানাইনি। জানাবার কথা মনেও হয়নি। আপনাকেও জানাব না। প্রকৃতির অফুরন্ত ঐশ্বর্য অকৃপণ অজস্রতায় চারিদিকে বিকীর্ণ হয়, আপনাদের মতো লোকের উদার দাক্ষিণ্যও অনেকটা তেমনি। ধন্যবাদ দিয়ে তাকে ছোট করব না। তবু কিন্তু একটা কথা সসঙ্কোচে বলছি। আমার অসুখের জন্য যে টাকাটা আপনি খরচ করেছেন সেটা আমি দিয়ে দেব। না দিলে আমার তৃপ্তি হবে না। আমার মাইনে থেকে প্রতিমাসে কিছু কিছু যদি কেটে নেন আমি অত্যন্ত খুশি হব। আধ্যাত্মিক ঋণ শোধ কবা যায় না. কিন্তু আধিভৌতিক ঋণ যায়। যা শোধ করা যায় তা করাই উচিত। আপনি আশা করি আমার এ অনুরোধটি রক্ষা করবেন। আমার দাদা সম্প্রতি একটা চাকরি পেয়েছেন। মাসে মাসে কুড়ি টাকা করে যদি আমার মাইনে থেকে কেটে নেন তাতে আমার অসুবিধা হবে না। আর যদি হতই তাহলেই বা কি। যা কর্তব্য তা তো করতে হবেই।

আপনি আমার অসুখের সময় একবার মাত্র গিয়েছিলেন। আর যাননি। আপনার এই না-যাওয়াটা অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। ওর মধ্যেই আপনার মহত্ত্বকে, কবি দিগন্তের সুষ্ঠু মাত্রাবোধকে বার বার অনুভব করেছি এবং কৃতার্থ হয়েছি।

আমার অসংখ্য প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি—

শ্রীলতা

চিঠিটার দিকে চেয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর টং করে ঘণ্টা টিপলাম। বেয়ারা আসতেই বললাম, 'মিস মিত্রকে ডেকে দাও একবার।'

শ্রীলতা সসঙ্কোচে এসে দাঁড়াল।

'আপনি যা চেয়েছেন তাই হবে। কিন্তু আপনার চিকিৎসার জন্য ঠিক কত খরচ হয়েছে তা এখনও আমি জানি না। বিল এখনও আসেনি। ডাক্তার আমার বন্ধুলোক, সে বলেছে ফি নেবে না। ওষুধের জন্যে যা খরচ হয়েছে তা জানতে পারলে আপনার মাইনে থেকে কেটে নেওয়ার কথা বলে দেব। কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছে এর অন্য দিকটা আপনি দেখলেন না'

'অন্য দিকটা মানে বুঝতে পারলাম না ঠিক'

'মানে আমার দিকটা। টাকাটাকেই বড় করে দেখলেন আপনি। যদি দেখেন তাতে আপত্তি করবার অধিকার আমার নেই—যা বলবেন তাই করব। এতে আপনার চরিত্রের একটা বিশেষ রূপও ফুটে উঠেছে। কিন্তু আপনার সঙ্গে মানবিক একটা সম্পর্ক আবিষ্কারের যে পথ হঠাৎ পেয়েছিলাম সেটাকে আপনি দুর্গম করে দিলেন। আমার আপিসের দুঃস্থ কর্মচারীদের সামান্য সাহায্য করে আমি আনন্দ পাই, সে আনন্দ থেকে আপনি আমাকে বঞ্চিত করছেন'

'আমাদের আপিসে ব্রজবাবু আমার চেয়েও দুঃস্থ। ছ'মাস ধরে ভুগছেন। তাঁর জন্যে—'

অবাক হয়ে গেলাম। তুমিও এই কথা বলেছিলে আমাকে যদিও সেকথা ভাষায় উচ্চারিত হয়নি সেদিন। কিন্তু গোপনে সেটা সঞ্চারিত হয়েছিল মর্মে। ব্রজবাবুর ব্যবস্থা করেছি আমি।

শ্রীলতাকে বললাম, 'হ্যাঁ, তাঁর জন্যেও ব্যবস্থা করেছি বই কি। তিনি বিনা মাইনেতে ছুটি নিয়েছিলেন কারণ তাঁর ছুটি আর পাওনা ছিল না, আমি বলে দিয়েছি তিনি যতদিন অসুস্থ

থাকবেন ততদিনের পুরো মাইনে পাবেন। তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছি। এর জন্যেও তাঁর কোনো খরচ করতে হবে না। আপনি আপত্তি করেছেন টাকা নিতে উনি করেননি। উনি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ লম্বা চিঠি লিখেছেন একটা। সেটাও অবশ্য খুব ভালো লাগেনি আমার। আপনি টাকাটার উপর জোর দিয়েছেন। হয়তো এইটেই আপনার বৈশিষ্ট্য, তাকে আমি অসম্মান করতে চাই না। কিন্তু বিশ্বাস করুন অন্যরকম হলে আমার ভালো লাগত।'

মিস মিত্র দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর চলে গেলেন। পরদিন একটা কবিতা এল ডাকে।

হিমালয়কে যখন প্রণাম করি
তখন আশা করতে পারি না
বাঙ্ময় হয়ে তিনি আশীর্বাদ করবেন।
পাথরের দেবতারাও
নির্বাক্ নিষ্পলক হয়ে থাকেন
যখন আমরা তাদের প্রণাম করি।
তাই প্রণামের পরিবর্তে কিছু পাব
এ প্রত্যাশা আমি করি না।
অসংখ্য প্রণামের ভিড়ে
আমার প্রণাম হারিয়ে যাবে জানি
তবু প্রণাম করি
প্রণাম করে যে তৃপ্তি হয়
সেইটেই আমার লাভ
এর বেশি কিছু চাই না
চাইলেও পাব না
যিনি প্রণম্য
তিনি অতিদূরবর্তী আকাশ-লগ্ন বিস্ময়।
নিজের মহিমার বিশালতাই
উত্তুঙ্গ করেছে তাঁকে।
নিয়ে গেছে তাঁকে নাগালের বাইরে।
মনে হয় তিনি যেন
মূক, বধির, অন্ধ নির্বিকার
তবু
তাঁর উদ্দেশেই
রেখে গেলাম আমার প্রণামটিকে
কোনো প্রত্যাশার বন্ধনে নিজেকে বন্দী না করে

চিঠির নীচে কোনো নাম নেই।

কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হল না কবিতাটি কে লিখেছে।

ফোনটা বেজে উঠল।

'শরাল হাঁস এসেছে চকদীঘিতে। শিকারে বেরুবে নাকি? যদি রাজি থাক এখুনি এস। আমি যাচ্ছি।'

আমার শিকারী বন্ধু দাসু ফোন করেছে।

বললাম, 'ফোনটা ধরে থাক। দেখি এখন আমার বেরুনো চলবে কি না'

বড়বাবুকে ডাকলাম।

তিনি বললেন, 'না তেমন কোনো জরুরি কাজ নেই। কেউ যদি দেখা করতে আসে তাঁকে কাল আসতে বলব'

বাড়ি থেকে সোজা বেরিয়ে গেলাম কাপড়চোপড় না বদলেই। বন্দুকটা নেবার জন্যেই বাড়ি যেতে হয়েছিল। মোটরগাড়ি বেশিদূর গেল না। সামনে একটা মাঠ ছিল। দাসু বলল, 'ও মাঠ দিয়ে গাড়ি চালানো নিরাপদ নয়। মনে হচ্ছে সব সবুজ, কিন্তু মাঝে মাঝে জল আছে, গর্তও আছে জলের তলায়। চল হেঁটেই যাই আমরা এখান থেকে। মাঠের ওপারেই চকদীঘি সেইখানেই হাঁস ও এসেছে'

মাঠের ধার দিয়ে দিয়েই চলতে লাগলাম দু'জনে একটা সরু আলপথ বেয়ে।...

আমি মিস মিত্রের কবিতাটাই বিশ্লেষণ করছিলাম মনে মনে। মিস মিত্রের প্রণম্য লোকটি কে? আমি কি? সে কথা স্পষ্ট করে বলা নেই কোথাও, কিন্তু ইঙ্গিত আছে। কিন্তু এর স্থূল অর্থটা কি? মাইনে থেকে ও চিকিৎসার খরচটা কাটিয়ে দিতে চায় কি না তা তো বোঝা যাচ্ছে না। কবিতাতে অবশ্য এসব কথা লেখা শক্ত। কিন্তু...আমার প্রতি মিস মিত্রের প্রকৃত মনোভাবটা কি তা জানবার জন্য সহসা আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। মনে হল দুর্গম পাহাড়ের শিখরে যে বদ্ধদ্বার দুর্গটা রয়েছে, সে দুর্গে বন্দিনী হয়ে আছে আমার অদেখা প্রিয়তমা। আমি যেন তারই উদ্দেশ্যে চলেছি। মিস মিত্র...

হঠাৎ সুরটা কেটে গেল।

দাসু বলে উঠল, 'ডান দিকে—'

ডান দিকের রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম অন্যমনস্ক হয়ে।

দাসু আবার বললে, 'ঝোপগুলো বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলো। ঝোপের মধ্যে অনেক সময় সাপ থাকে। আমাকে একবার একটা কেউটে তাড়া করেছিল এখানে—'

রাস্তাটার চারদিকেই ঝোপঝাড়। একটা গাছও চিনি না। এক ধরনের গাছ দেখলাম অনেকগুলি রয়েছে। চমৎকার পাতাগুলি। বেশ বড় বড় পাতা, লাউয়ের পাতার মতো। পীতাভ সবুজ রং। বেশ ঢলঢলে চেহারা। এই ঝোপঝাড়ের মধ্যে মিস মিত্র হারিয়ে গেলেন। তবু কেন জানি না মনে হতে লাগল এই ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালেই তিনি চলেছেন আমার সঙ্গে। আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। মনে হল মিস মিত্রের কথা এত ভাবছি কেন? এ প্রশ্নটাও হারিয়ে গেল পরক্ষণে। তারপর মনে হল আমি আমাকেই যেন খুঁজে পাচ্ছি না। মিস মিত্রের কবিসত্তা আমার কবিসত্তার সঙ্গে মিলে যে মেঘলোকে উধাও হয়েছে, সেই মেঘলোকে আমি হারিয়ে গেছি। তারপরই টিট্টিভ ডেকে উঠল একটা। ডিড-হি-ডু-ইট—ডিড্-হি-ডু-ইট—ডিড-হি-ডু-ইট। আবার ফিরে পেলাম নিজেকে। দাসু আমার সামনে হনহন করে চলেছে আমি পিছিয়ে গেছি। হঠাৎ দেখলাম সেই চওড়া চওড়া সবুজ ঢলঢলে পাতাওলা গাছগুলো ভিড় করেছে এক জায়গায়। মনে হল মিস মিত্রের সঙ্গে এদের মিল আছে। এদের

সর্বাঙ্গ দিয়ে সে সহজ শোভা উথলে পড়ছে সেই সহজ শোভা যেন অন্য রূপে উথলে উঠেছে মিস মিত্রকে ঘিরে। সে শোভা যৌবনের নয়, সে শোভা বাহুল্যহীনতার। অকারণে মনে হল এই মেঠো রাস্তায় মিস মিত্রই যেন ঝোপঝাড়ের ছদ্মবেশে দাঁড়িয়ে আছে আমাকে দেখবে বলে—এরা সবাই ছদ্মবেশী মিস মিত্র। তারপর দেখতে পেলাম একটা গাছে ফুল ফুটেছে। অপরূপ ফুল। এরকম ফুল আগে দেখিনি। মনে হল গাছটা যেন আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছে। আঙুলের ডগায় ঘন বেগুনী রং আর তার পেছনে একটু হলুদের ছোঁয়া। হলুদের ভিতরও কয়েকটি বিন্দু। বাকি ফুলটা সাদা। দাঁড়িয়ে পড়লাম। মনে হল মিস মিত্রই বুঝি একটা নতুন রকম কবিতা এনেছে আমার জন্য। হাত বাড়িয়ে ফুলটা তুলছি এমন সময় ঝোপের আড়াল থেকে শব্দ—ফোঁস। পরক্ষণেই দেখলাম উদ্যত-ফণা একটি গোক্ষুরে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে ফণা নাবিয়ে চলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে আমার কানের কাছে কে যেন বলে উঠল—দেখলে তো। দাসু বলেনি। সে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। তুমি বলেছিলে। হ্যাঁ, তুমি। যে তুমি অপ্রত্যাশিত, যে তুমি দুর্বোধ্য, যে তুমি রহস্যময়ী। রহস্যময়ী না রহস্যময়? তুমি নারী, না পুরুষ তা তো জানি না। তোমার সান্নিধ্য অনুভব করেছি বার বার, কিন্তু এ কথাটা জানি না। জানবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কি বলতে চাইছ তুমি? কোনো উত্তর পেলাম না।

...এক ফালি সাদা মেঘ ভেসে চলেছে। কিছু দূরে স্তর মেঘেরা স্তূপীকৃত হয়ে আছে যেন কার অপেক্ষায়। সাদা মেঘটা ভেসে চলেছে কোথায়। স্তর মেঘের স্তূপ কার অপেক্ষায় স্তূপীকৃত হয়ে আছে? এই অকারণ প্রশ্নটা দুরূহ সমস্যার মতো কেন জানি না আমাকে আকুল করে তুলল। মনে হল এ সমস্যার সমাধান আছে, কিন্তু তা আমার নাগালের বাইরে। এক ঝলক হাওয়া এসে তোলপাড় করে দিয়ে গেল ঝোপঝাড়গুলোকে। মনে হল মিস মিত্র বিচলিত হয়েছে এতে...।

দাসু দেখলাম অনেক দূর থেকে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। পাছে মানুষের গলার স্বর শুনে হাঁসগুলো উড়ে যায় তাই বোধহয় হাতছানি দিচ্ছে।

অনেকগুলো হাঁস পেয়েছিলাম। দাসু চারটে নিয়ে গেল। আমি নিতে চাইছিলাম না তবু দাসু জোর করে দিয়ে দিল দুটো। বাড়ি ফিরে দেখি আমার 'কম্বাইন্ড হ্যান্ড' চাকরটি জ্বরে শয্যাগত। হাঁস ছাড়িয়ে মাংস রান্না করা অসম্ভব তার পক্ষে। আর আমার অন্য যে বালক ভৃত্যটি আছে সে বড়জোর রুটি-মাখন-জ্যাম-জেলি ডিমসিদ্ধ 'চীজ' দিয়ে আমার রাত্রের খাওয়ার একটা ব্যবস্থা করতে পারে কিন্তু হংস-সমস্যা সমাধান করা তার সাধ্যাতীত। আমার ড্রাইভারটি মুসলমান। ছিমছাম ভদ্র চেহারা। খুব চালাক চতুর। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম সে কোনো ব্যবস্থা করতে পারে কি না। সে বললে, 'এক্ষুনি করে দিচ্ছি।' বলেই বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই পাশের বাড়ি থেকে খুকু এসে হাজির।

'আপনি নাকি দুটো হাঁস শিকার করে এনেছেন আপনার ড্রাইভার বললে। কই দেখি—'

'হাঁস গাড়িতেই আছে। কিন্তু ও দুটোকে নিয়ে মুশকিলে পড়েছি। সরোজের জ্বর হয়েছে। রাঁধবে কে? তুমি না হয় নিয়ে যাও ও দুটো'

'আমার বাড়িতে? মা আছেন যে! তিনি ওসব দেখলে আঁতকে উঠবেন। আমাদেব বাড়িতে ওসব ঢোকেই না। আমি এখানেই রান্না করে দিচ্ছি আপনাকে'

'ছাড়ানো কোটা নানা হাঙ্গামা। মসলাও পেষা নেই হয়তো—'

'হাঙ্গামা আবার কি। আপনার তো প্রেসার-কুকার আছে?'

'আছে'

'তাহলে তো ভাবনাই নেই। আমি গোটা মসলা দিয়ে স্ট্যু রান্না করে দেব'

খুকু বেরিয়ে গেল।

আমার ঘরের সামনে যে ছোট বারান্দাটা আছে সেইখানেই সে এসে বসল মরা হাঁস দুটো নিয়ে। বালক ভৃত্যটি তার ফরমাশ খাটতে লাগল। বঁটি আনল, থালা আনল, জল আনল একটা গামলায় করে। তারপর হাঁসের পালক ছাড়াতে লাগল। খুকুও সাহায্য করতে লাগল তাকে। আমি খুকুর দিকে চেয়েছিলাম—তার পুষ্পিত দেহটার দিকে। যৌবনের মহিমায় মুগ্ধ হয়ে গেলাম ক্রমশ। মনে হল অপূর্ব। এর পর খানিকক্ষণ কি ঘটেছে তা আমি জানি না। আমি যখন নিবিড়ভাবে মুগ্ধ হই তখন স্থান কাল লুপ্ত হয়ে যায় আমার চেতনা থেকে। আমি কোথায় যেন হারিয়ে যাই।

...হঠাৎ একটা শব্দ হলো। ফিরে পেলাম নিজেকে। দেখলাম খুকু একটা পালক-ছাড়ানো হাঁসকে কাটছে বঁটি দিয়ে। তার দু'হাতে রক্ত। যে হাত দিয়ে সে গীটার বাজায় সে হাত দুটো রক্তে মাখামাখি। কেন জানি না আমার মনে ভেসে এল ইতিহাসের এট্টিলা, চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর লং, নাদির শাহ, ভেসে এল ইতিহাসের নরঘাতক দস্যুরা, ভেসে এল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তারপর সব ডুবে গেল রক্তের সমুদ্রে। দেখলাম সে সমুদ্রে খুকু যেন ডুবরীর মতো ডুবছে আর উঠছে। তারপরই দেখতে পেলাম আকাশ। নির্মল নীল আকাশ, নির্মেঘ জ্যোতির্ময়। কিন্তু সূর্য নেই। তবু একটা অদ্ভুত আলো ঝলমল করছে সে আকাশে। অদ্ভুত অপূর্ব বিস্ময়কর সে আলো। কিন্তু আমার মনে বিস্ময় জাগল না। আমি বুঝতে পারলাম তুমি হাসছ। ওটা তোমার হাসির আলো। ওই আকাশও তুমি। কিন্তু তোমাকে বুঝতে পারলাম না। আমার সমস্ত ভালো-লাগার পটভূমিকায় বারংবার তোমার এ আবির্ভাবের অর্থ কি? তুমি কি চাও না আমি কাউকে ভালোবাসি? কিন্তু তুমি কি জান না আমি চেষ্টা করে দু'হাত বাড়িয়ে কাউকে চাইনি? কিন্তু ওরা যে রোদের মতো, হাওয়ার মতো, বৃষ্টির মতো, শারদ প্রভাতের মাধুরীর মতো, ফুলের সুগন্ধের মতো এসে যায়, আপনিই এসে যায়. তখন ওদের অস্বীকার করব কি করে? করবই বা কেন। তা করা যে অসম্ভব আমার পক্ষে। অসম্ভব তোমাকে অস্বীকার করাও। তুমি আছ তা আমি জানি। কিন্তু তুমি যে দুর্বোধ্য, তুমি যে ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে, তুমি যে ভাষায় কথা কও তা ইঙ্গিতের ভাষা, ইশারার ভাষা। আমি তা বুঝতে পারি, কিন্তু আমার বক্তব্য তোমাকে বোঝাতে পারি না। তোমাকে নিয়ে আমি কি করি, কি করি—'

শেষের কথাগুলো বোধহয় আমি উচ্চারণ করে ফেলেছিলাম।

খুকু জবাব দিল—'পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন না। শিকার করে খুব ক্লান্ত হয়েছেন নিশ্চয়। শুয়ে পড়ুন কাপড় জামা ছেড়ে। রান্না হয়ে গেলে আমি ওঠাব আপনাকে। প্রেসার-কুকারে স্ট্যু রাঁধতে বেশি দেরি লাগবে না। লুচি খাবেন না ভাত?'

'লুচিই কর—'

'বেশ। ঘি ময়দা কোথায় আছে?'

বালক ভৃত্যটি বলল, 'আমি সব বার করে দিচ্ছি।'

উঠে পাশের ঘরেই চলে গেলাম। কাপড় জামা ছেড়ে লুঙ্গি পরে শুয়ে রইলাম।... ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কি পড়িনি সে কথা অবান্তর। আসল কথা আমি রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্য। বিরাট একটা সোনার তরী হয়ে গিয়েছিলাম আমি। ভাসছিলাম আলোর সমুদ্রে, যে আলো তোমার হাসির আলো। সে সমুদ্রের ওপারে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছিল বন্দরও একটা। আবছাভাবে দেখা যাচ্ছিল আরও অনেক সোনার তরী ভিড় করেছে সেখানে। তাদের প্রত্যেক মাস্তুলে রঙিন পতাকা উড়ছে। আমার মাস্তুলে কিন্তু পতাকা নেই। নেই কেন? ওই বন্দরে পৌঁছলে কি পতাকা পাওয়া যাবে?...

একটা শব্দ শুনে উঠে বসলাম। প্রেসার-কুকার থেকে স্টীম বেরুচ্ছে। রান্নার মনোরম গন্ধে চতুর্দিক ভরপুর।

।। এগারো ।।

পতাকা আমাকেও পেতে হবে এই জিদটা যেন পেয়ে বসল আমাকে। সেদিন তোমার হাসির আলোর সমুদ্রে সোনার তরী হয়ে ভেসেছিলাম, কিন্তু পতাকা পাইনি। দূরে আবছাভাবে যে বন্দরটা দেখা যাচ্ছিল সেখানেও সারি সারি দাঁড়িয়ে ছিল অনেকগুলি সোনার তরী। প্রত্যেকের মাস্তুলে বহুবর্ণ বিচিত্র পতাকা উড়ছিল। বুঝতে পারলাম তোমার পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তারাই ভিড়েছে ওই আবছা-বন্দরে আর তাদেরই তুমি পতাকা শিরোপা দিয়েছ। আমাকে দেবে না? কি সে এমন শক্ত পরীক্ষা যাতে আমি উত্তীর্ণ হতে পারব না? জীবনে কোনো পরীক্ষায় তো কখনও হারিনি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলো স্বর্ণপদক আছে আমার বাক্সে। তোমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারব না? সঙ্গে সঙ্গে মনে হল এ পরীক্ষার প্রশ্ন কি তা-ই তো জানা নেই। প্রশ্ন কি তা-ও আমাকে আবিষ্কার করতে হবে। তুমি তো স্পষ্ট করে কিছু বলবে না। তোমার দুর্বোধ্য ইঙ্গিতগুলোর জট ছাড়িয়ে প্রশ্নটা আমাকেই বার করতে হবে। তারপর উত্তর দিতে হবে।

আজ ছুটির দিন। নিজের বাড়ির খোলা বারান্দায় বসে আছি আকাশে কয়েকটা কালো মেঘ প্রক্ষিপ্ত হয়ে আছে। তাদের বিশেষ কোনো সৌন্দর্য নেই, তবু তারা বেমানান নয়। মনে হল এইটেই বড় কথা। দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো সাজসজ্জা নেই ওদের। কোনো রঙিন আলোয় উদ্ভাসিত নয় ওরা। ওরা আকাশবিহারী মেঘ এইটুকুমাত্র ওদের পরিচয়, আর মনে হচ্ছে তাতেই যেন ওরা গর্বিত।

...নজরে পড়ল দূরের বাড়ির জানলাটা। রোজই পড়ে। রোজ তাতে সাদা পরদা টাঙানো থাকে। আজ দেখলাম পর্দাটা নীল হয়ে গেছে। উগ্র ধরনের নীল। অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। মনে হল সবাই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। জীবনলীলার এইটেই যেন বড় টেকনিক। সবাই যেন বলছে—দেখ, দেখ, আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ। এই আত্ম-বিজ্ঞাপন বাজছে নানা সুরে, নানা ছন্দে, নানা গ্রামে। মনে হল যে আত্মগোপন করতে চায় তার স্থান কোথায়? ব্যর্থতার মরুভূমিতে? না, সার্থকতার সেই অতিউচ্চলোক যেখানে জনতার দৃষ্টি পৌঁছায় না? কালো কালো মেঘের টুকরোগুলির দিকে চাইলাম আবার। ওরা সন্ধ্যার মেঘ

নয়। উষার মেঘ নয়, জ্যোৎস্নামণ্ডিত মেঘ নয়, ওরা নিতান্ত সাধারণ তুচ্ছ মেঘ। ওরা অনলঙ্কৃত, নিরহঙ্কার, কিন্তু অসার্থক নয়। ওরাই হয়তো সন্ধ্যা-উষার স্পর্শ পাবে একদিন, মণ্ডিত হবে জ্যোৎস্নালোকে। মনে হল ওরা কি সোনার তরী হয়ে ভাসতে পারবে কোনোদিন তোমার হাসির আলোর সমুদ্রে, পৌঁছবে সেই আবছা-বন্দরে, পাবে কি পতাকার শিরোপা? এই অদ্ভুত কথাটা কেন মনে হল জানি না। আমার জিদটা কি নানা বাঁকা-চোরা পথে গিয়ে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছে যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আমি তোমার কাছ থেকে শিরোপা পাব সে পরীক্ষার প্রশ্নটা কি? প্রশ্নটা জানতে পারলে আমি তার উত্তর দেবই এবং ঠিক উত্তর দেব।

আমার বালক ভৃত্যটি প্রবেশ করল একখানি কার্ড হাতে করে। কার্ডে নাম রয়েছে ওয়াই. জেড. গুপ্ত (Y. Z. Gupta) —এ আবার কে? এ নাম কখনও শুনেছি বলে তো মনে পড়ল না।

'কি চান ইনি?'

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। বৈঠকখানায় বসিয়েছি'

একবার মনে হল বলি দেখা করব না। বেশ বসে আছি আপনমনে, কোথা থেকে এ উৎপাত এসে জুটল। কিন্তু সে কথা বলতে ভদ্রতায় বাধল। ওই অদ্ভুত নামটাও আকর্ষণ করতে লাগল আমাকে। উঠে পড়লাম শেষে।

বৈঠকখানায় বসে ছিলেন প্রচুর গোঁফ-দাড়িওলা লোকটি। মাথায় বাবরি চুল। ভুরুর চুলও বেশ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া।

নমস্কারান্তে বললাম, 'আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না তো'

বললাম বটে, কিন্তু মনে হতে লাগল ভদ্রলোকের মধ্যে কি যেন একটা আছে যা আমার সম্পূর্ণ অচেনা নয়। কিন্তু কি সেটা বুঝতে পারলাম না।

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন মেয়েলী গলায়।

'আপনি আমাকে চেনেন। পরিচয় পরে দিচ্ছি। কেন এলাম সেটা আগে বলছি। আসাম থেকে যেদিন কলকাতা রওনা হব সেদিন আপনার বান্ধবী তপতীর সঙ্গে দেখা হল সেখানে। কথায় কথায় আপনার কথা উঠে পড়ল। দেখলাম তিনি আপনার লেখার খুব ভক্ত। আমি বললাম, আমারও ওঁর লেখা খুব ভালো লাগে। কিন্তু ওঁর সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ কখনও হয়নি। তপতী দেবী বললেন, আপনি কলকাতায় যাচ্ছেন তো? আমি আলাপ করবার সুযোগ দিচ্ছি। উনি আনারস খেতে খুব ভালোবাসেন। আমি আপনার সঙ্গে কয়েকটা আনারস দিচ্ছি। ওঁর ঠিকানা লিখে দিচ্ছি, আপনি আমার নাম করে আনারসগুলো দিয়ে আসবেন ওঁর বাড়িতে। আর আলাপও করে আসবেন। এই বাক্সে আনারস আছে।'

ছোট একটা কাঠের বাক্স নীচে রাখা ছিল। সেইটে দেখালেন। দেখলাম বাক্সটি খুবই ছোট, ক'টা আনারস পাঠিয়েছে তপতী। একটি নাকি।

সে কথা না বলে প্রশ্ন করলাম, 'আপনার সঙ্গে কোথাও আমার আলাপ হয়ে ছিল নাকি?'

'হয়েছিল। কিন্তু সে কথা বললে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। তাই তা আর বলব না। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার আসল আলাপ হয়েছে আপনার কবিতার ভিতর দিয়ে। আপনার লেখা এই লাইনগুলো প্রায়ই আবৃত্তি করি আমি।

সত্য-শিব-সুন্দরই আমার উপাস্য দেবতা।
এই আদর্শেই
সৃজন করেছি আমার দেশমাতৃকাকে।
তিনি সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতীক।
এই প্রতীককে
এই সত্য-শিব-সুন্দরকে
যারা কলঙ্কিত করবে
তারা আমার শত্রু।
তারা দুর্যোধনের দল
তাদের অনিবার্য বিনাশ যে পাণ্ডবদের হাতে
তারা আছে এবং থাকবে চিরকাল।
আমি তাদের দলে।'

অবেগভরে আবৃত্তি করে গেলেন।

মনে পড়ল অনেকদিন আগে এ কবিতা লিখেছিলাম। আমার যে বইটাতে এ কবিতাটা ছাপা হয়েছিল সে বই বাজারে চলেনি, পোকায় কেটেছে। আমি যে এ কবিতা লিখেছিলাম তা-ও আমার মনে ছিল না। এতদিন পরে এ কবিতা একজন অচেনা লোকের কণ্ঠে শুনে রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেলাম। অভিভূতও হলাম একটু।

বললাম, 'আমার 'কয়েকটি মুহূর্ত' বইটা কি বাজারে আছে এখনও?'

'তা জানি না। আপনার ঐ কবিতাটি 'নদী' মাসিক পত্রিকায় প্রথমে পড়ি। তখনই আমি মুখস্থ করে ফেলেছিলাম।'

অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল 'নদী' নামক অধুনা-লুপ্ত একটি পত্রিকায় কবিতাটা লিখেছিলাম বটে। ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার 'কয়েকটি মুহূর্ত' বইটি আছে আমার। আপনার সব বইই আছে। অনেক কবিতা মুখস্থও আছে'

তারপর হঠাৎ খোলা জানালাটার দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

'আপনার বাথরুমটা কোন দিকে?'

'এই যে পাশেই'

দেখিয়ে দিলাম দরজাটা। বাথরুমে ঢুকে গেলেন ভদ্রলোক। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকলেন পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার সৌরভ গুপ্ত।

'এই যে দিগন্ত বাইরেই আছ দেখছি। তোমাকে একটা খবর দিয়ে যাই। আমরা খবর পেয়েছি তপতী কলকাতায় এসেছে। হয়তো তোমার কাছে আসবে। তুমি তো বলেছ তাকে ধরিয়ে দেবে না। তাই তোমার বাড়ির সামনে একজন কনস্টেবল রেখে যাচ্ছি। সন্দেহজনক কাউকে দেখলে সে অ্যারেস্ট করবে তাকে। আমি চাই না যে সে তোমার বাড়িতে ধরা পড়ুক। পড়লে তুমি-সুদ্ধ জড়িয়ে পড়বে। তাই যদি ও আসে পত্রপাঠ বিদেয় করে দিও।'

খবরটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

সৌরভ হেসে বললে, 'তোমাকে আমি বাঁচাবার চেষ্টা করছি। তুমিও নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করো। অনর্থক রাজ-রোষে পড়বার মানে হয় না কোনো। অন্য কোনো অফিসারের

দৃষ্টিতে যদি পড়ে যাও তাহলে তোমাকে চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারব না। কারণ চাকরিটাই আমাকে সর্বাগ্রে বাঁচাতে হবে'

'বস। কি খাবে—'

'এখন আর বসব না ভাই। আই. জি. ডেকে পাঠিয়েছেন সেখানেই যাচ্ছি। যাবার মুখে তোমাকে খবরটা দিয়ে গেলাম। চলি—'

সৌরভ চলে গেল। আমি আশা করতে লাগলাম সেই ভদ্রলোক বাথরুম থেকে বেরুবেন। হয়তো আমার আরও দু'একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবেন আমাকে। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেল, তিনি বাথরুম থেকে বেরুলেন না। কি হল? বাথরুমের দরজাটার দিকে চেয়ে দেখলুম। তারপর হঠাৎ সেটা হাওয়ায় খুলে গেল। উঠে পড়লাম। দেখলাম বাথরুমের ভিতর কেউ নেই। বাথরুমটা বেশ বড় বাথরুম। ভিতরের দিকেও এর একটা দরজা আছে। সে দরজাটাও খোলা দেখলাম। কোথা গেলেন ভদ্রলোক? চাকরটাকে ডাকলাম। সে বলল, 'বাবু তো উপরে বসে আছেন'

'উপরে?'

'আপনি যেতে বলেননি?'

'না'

'আমি ভাবলাম আপনি বলেছেন'

আশ্চর্য কাণ্ড। তাড়াতাড়ি উপরে উঠে দেখলাম আমার শোবার ঘরে বিছানার উপর বসে আছেন তিনি। আমি উপরে যেতেই তিনি হেসে বললেন, 'কপাটটা বন্ধ করে দিন।'

'কপাটটা? কেন!'

'দিয়েই দেখুন না কি হয়'

দিলাম কপাট বন্ধ করে।

সঙ্গে সঙ্গে যা হল তা অপ্রত্যাশিত। চুল দাড়ি গোঁফ ঝাঁকড়া ভুরু খুলে বেরিয়ে এল তপতী। সেই চোখে-মুখে হাসি। হেসে লুটিয়ে পড়ল একেবারে।

'কেমন ঠকিয়েছি। কিন্তু আর বেশিক্ষণ বসব না। পুলিশ এসেছিল, না? এইবার পালাতে হবে। আপনার বাড়িতে খিড়কি দুয়ার আছে নিশ্চয়—'

'হ্যাঁ। সেটা দিয়ে কিন্তু পাশের গলিতে যাওয়া যায়। গলিটা অবশ্য সদর রাস্তায় পড়েছে'

'ওই দিক দিয়েই পালাব। সদর রাস্তায় আমার ট্যাক্সিটা 'ওয়েট' করছে। আর শুনুন, ওই বাক্সটায় আনারস নেই, আছে একটা রিভলভার। আপনি ওটা রাখুন। দরকার হলে ব্যবহার করবেন। আপনি আপনার কবিতায় বলেছিলেন আপনিও পাণ্ডবদের দলে। কিন্তু নিরস্ত্র পাণ্ডব তো কিছু করতে পারবে না, তাই আপনাকে একটা অস্ত্র দিয়ে গেলাম। ওই বাক্সে আর একটা জিনিস আছে। একটা খাতা। শ্রীলতার বাবার ডায়েরি। তিনি মরবার সময় ওটা আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন আমি যেন ওটা ওকে দিয়ে আসি। কিন্তু এখন নিজে গিয়ে দিয়ে আসা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তাই আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। শ্রীলতাকে চেনেন নিশ্চয়। আপনার আপিসেই কাজ করে। সে-ও কবিতা লেখে। আমরা একসঙ্গে পড়তাম।'

'শ্রীলতার বাবা মারা গেছেন নাকি।'

'হ্যাঁ, তাঁর যক্ষ্মা হয়েছিল। স্নেহময়ী দিদির কাছে থাকতেন তিনি। সেখানেই মারা গেছেন—'

'স্নেহময়ী দিদি কে? কোনো আত্মীয়?'

'না। রক্তের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাঁকে ভালোবাসতেন উনি, বিশ্বাস করতেন। স্নেহময়ী দিদি সে ভালোবাসার সে বিশ্বাসের মর্যাদা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছিলেন। আপনি ডায়েরিটা যদি পড়েন সব জানতে পারবেন। আমি কিন্তু এবার যাব। এগুলো আবার পরে ফেলি'

তপতী জামার পকেট থেকে দাড়ি গোঁফ লাগাবার আঠা বার করে আমার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ছদ্মবেশ সম্পূর্ণ করল। আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আমার দিকে চেয়ে আবার হাসল সে। মনে হল তার চোখে দুটো দেখেই তাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছিল।

'আপনার খিড়কি দরজা কোন্ দিকে?'

খিড়কি দরজা দিয়ে বার করে দিলাম তাকে। তারপর সেই বাক্সটা নিয়ে এলাম বাইরের ঘর থেকে। তার ভিতর লোডেড রিভলভার আর একটা খাতা ছিল। আমার বন্দুক আছে, কিন্তু রিভলভার নেই। রিভলভার কেনবার প্রয়োজন অনুভব করিনি কোনোদিন। সত্যি সত্যি টেরারিস্ট হওয়ার কল্পনা করিনি কখনও। স্বপ্নলোকে কবিত্বের ইন্দ্রধনু তৈরি করেছি কেবল দিনের পর দিন। কথার পর কথা গেঁথে গেছি শুধু। কথাকে কার্যে পরিণত করবার কথা একবারও মনে হয়নি। ছাত্রজীবনে পরিচয় হয়েছিল কোয়ার সঙ্গে, শচীনের সঙ্গে। তাদের দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, তাদের নিয়ে কবিতা লিখেছিলাম, কিন্তু তাদের দলে যোগ দিতে পারিনি। বাপের একমাত্র ছেলে আমি, বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, দুর্গম পথে যাওয়ার সত্যিকার প্রেরণা ছিল না আমার। বিলেতে গিয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি এনেছি, আমাদের ব্যবসার উন্নতির জন্য নামজাদা বিলিতী ফার্মে ট্রেনিং নিয়েছি। আমি শুধু শুধু বোমা পিস্তল নিয়ে লোক খুন করে বেড়াব কেন? সত্যি কথা, কোয়া আর শচীনকে নিয়ে যে দিগন্ত কবিতা লিখেছিল সে শৌখীন কবিমাত্র, বিলাসের স্রোতে সে ভেসে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে ওদের কথা ভেবে লজ্জা হত, চক্ষুলজ্জা, কিন্তু সেটাও নিতান্ত শৌখীন লজ্জা, মানসিক বিলাস মাত্র।

...আজ তপতী লোডেড রিভলভার (loaded revolver) দিয়ে গেল। এর মর্যাদা রাখবার উৎসাহ কি আছে আমার? টেরারিজ্‌মের উপর আর বিশ্বাস আছে কি? দু'চারজন লোককে পিছনে থেকে লুকিয়ে হত্যা করলেই কি দেশের দুর্দশা ঘুচবে? সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে? বার বার তো এ প্রহসন হয়ে গেছে নানা দেশে...

আবার ছাতে গিয়ে খোলা বারান্দাটায় বসলাম। তুমি আবার বাঙ্ময় হয়ে উঠলে। মনে মনে স্পষ্ট যেন শুনতে পেলাম—'গীতায় বলছে মা ফলেষু কদাচন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই তোমার কর্তব্য। তার ফল কি হবে এ নিয়ে ভাবছ কেন। ওরকম ভাবাটা তো ভীরুতারই নামান্তর।'

চুপ করে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর চাইলাম আকাশের দিকে। দেখলাম কালো মেঘগুলি টুকরো টুকরো হয়ে অসংখ্য পালকের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সারা আকাশে। তাদের যা দেখেছিলাম তা আর তারা নেই। অন্যরকম হয়ে গেছে।

আবার শুনতে পেলাম তোমার কণ্ঠস্বর। ওই পালক মেঘগুলোতেই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল তোমার কথা।

'রূপ থেকে রূপান্তরই নিয়ম। তুমি বদলাবে। প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছ। তুমিও ভাবছ ভুল পথে যাবে? কোনো পথই ভুল পথ নয়। পরিবর্তন যেমন অনিবার্য বিপথে যাওয়াও তেমনি অসম্ভব। তোমার লালসা, কামনা, লোভ, হিংসা, তোমার উদারতা, তোমার কবিত্ব ওরা কেউ তোমার নয়। ওরা বাইরের ঢেউ, ওরাই অবশেষে তোমাকে নিয়ে যাবে সেই দেশে যে দেশে পরিচ্ছন্ন মানবতা অমর হয়ে আছে সভ্যতার অমরাবতীতে। যখন সে দেশে উত্তীর্ণ হবে তখন মিথ্যা হয়ে যাবে ওসব। অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে, যেমন অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায় রেলের টিকিট আর রেলগাড়ি যখন যাত্রা শেষ হয়ে যায়। তখন যা জানবে তা চিরন্তন সত্য, কিন্তু সেটা এখন তোমাকে বোঝানো যাবে না, কারণ তা অবর্ণনীয়...'

হঠাৎ বাড়ির সামনে একটা গোলমাল উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে গেট খুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম, দেখলাম রাস্তায় হই-হই চীৎকার করছে অনেক লোক।

'কি হয়েছে?'

'খুন হয়ে গেছে একজন'

'কে খুন করলে—'

'ট্যাক্সিতে চড়ে একজন গোঁফ-দাড়িওলা লোক যাচ্ছিল, এক ভদ্রলোক হাত তুলে ট্যাক্সিটা থামাতে গেলেন। ট্যাক্সি থামল না, তখন খুব জোর হুইস্‌ল বাজালেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে গোঁফ-দাড়িওলা লোকটা গুলি করলে তাঁকে, তারপর জোরে ট্যাক্সি হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল। আশ্চর্য কাণ্ড!'

আমি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে লোকটা। রক্তে ভিজে গেছে তার বুকের জামাটা। তখনই নিজের গাড়ি বার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম তাকে। কিন্তু বাঁচাতে পারলাম না।

বাড়ি ফিরে এসে একটু পরে সৌরভের ফোন পেলাম!

'তোমার বাড়ির সামনে যে প্লেন-ড্রেস-পরা কনস্টেবলটিকে রেখে এসেছিলাম তাকে একজন গোঁফ-দাড়িওলা লোক গুলি করে মেরেছে। লোকটা নাকি ট্যাক্সিতে ছিল। তুমি কিছু জান?'

'আমি তখন ছাতের উপর ছিলাম। স্বচক্ষে কিছু দেখিনি। তবে লোকটিকে আমিই মোটরে করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। বুকে গুলি লেগেছিল—'

'মিস্টার রায় কিন্তু তোমার পাড়া থেকে দু'জন সাক্ষী যোগাড় করেছেন। একজন বলছে লম্বা কোটপরা গোঁফ-দাড়িওলা একজন লোককে সে তোমার বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে। আর একজন বলছে তোমার বাড়ির ঠিক পাশেই যে গলিটা আছে সেই গলি থেকে সে ঠিক ওইরকম একটা লোককে বেরুতে দেখেছে। ওরকম গোঁফ-দাড়িওলা লোক কি তোমার বাড়িতে এসেছিল কেউ?'

চুপ করে রইলাম।

'হ্যালো—'

তাগাদা দিতে লাগল সৌরভ।

বললাম, 'আসাম থেকে একজন গোঁফ-দাড়িওলা লোক এসেছিলেন আমার কাছে আনারস নিয়ে। তাঁকেই হয়তো দেখে থাকবেন তোমাদের সাক্ষী।'

'এঁর সঙ্গে তোমার আলাপ ছিল?'

'না! আসামের একজন বন্ধু এঁর হাত দিয়ে আনারস পাঠিয়েছিলেন আমাকে'

'আসামের সে বন্ধুর ঠিকানা কি'

'তা-ও তো জানি না। চিনি না তাঁকে আমি। তিনি আমার লেখার একজন ভক্ত। সব ভক্তদের নাম ঠিকানা মনে রাখা কি সম্ভব'

'দেখ দিগন্ত এই কেসটার এনকোয়ারির ভার পড়েছে মিস্টার রায়ের উপর। তিনি চৌকশ জাঁদরেল অফিসার। কারও খাতির করেন না। তোমাকেও করবেন না। তুমি আমার কাছে যে সব জবাব দিলে তা তাঁর কাছে গ্রাহ্য হবে কিনা সন্দেহ আছে। তাই তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি যা বলবে তা যেন ধোপে টেঁকে।'

ফোন কেটে দিলে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তারপরই খুকু এল হঠাৎ। হাতে একটা বাটি।

'আপনার বাড়ির সামনে খুন হয়ে গেছে নাকি!'

'হ্যাঁ। আমি লোকটিকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। বাঁচল না। তোমার হাতে বাটি কেন?'

'মা আপনার জন্যে সুক্তো পাঠিয়েছেন। সুক্তো ভালোবাসেন তো'

'বাসি বই কি'

'সেদিনকার স্ট্যুটা সত্যি ভালো লেগেছিল? না, আমার মন রাখার জন্যে বললেন'

'না, না, সত্যি খুব ভালো হয়েছিল। সেইদিনই বুঝেছি শুধু বাজনায় নয়, রান্নাতেও তুমি একজন বড় আর্টিস্ট। ইচ্ছে আছে একদিন ভালো 'মাটন্' এনে তোমাকে দিয়ে কোর্মা রান্না করাব। অবশ্য তুমি যদি রাজি থাক'

'বলছেন কি, আমি কৃতার্থ হয়ে যাব। আমার নিজেরই খুব ইচ্ছে করে আপনাকে মাছ মাংস রেঁধে খাওয়াই, কিন্তু মা বিধবা, আমাদের বাড়িতে আমিষ ঢোকে না। আমিও অধিকাংশ দিনই নিরামিষ খাই। মাঝে মাঝে যখন মাছ মাংস খেতে ইচ্ছে হয় হোটেল থেকে আনিয়ে খাই, আলাদা একটা প্লেট আছে তাতেই খাই। 'হরিজন' প্লেটটা আলাদা একটা তাকে রাখা থাকে—'

খুকুর মুখে এমন একটি মিষ্টি হাসি ফুটল যার তুলনা দিই এমন উপমা আমার ভাণ্ডারে নেই।

'এটা আপনার চাকরকে দিয়ে আসি—'

বাটিটা নিয়ে চলে গেল খুকু। একটু পরেই ফিরে এল। বলল, 'একটা গজল তুলেছি গীটারে, শুনবেন?'

দেখলাম তার চোখে একটা সলজ্জ মিনতি ফুটে উঠেছে। গীটারে গজল বাজতে লাগল একটু পরে। খুকুর দিকেই চেয়েছিলাম মুগ্ধ হয়ে। হঠাৎ দেখি খুকুকে আড়াল করে তপতী এসে দাঁড়িয়েছে। হাসছে আমার দিকে চেয়ে। তারপর তপতীকে আড়াল করে এসে দাঁড়াল

শ্রীলতা মিত্র, সসঙ্কোচে আনতনেত্রে। তারপর তিনজনই মিলে মিশে রূপান্তরিত হল আর একটি অনবদ্য আবির্ভাবে। বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে। একে তো কখনও দেখিনি। আলোর পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছে কে ওই জ্যোতির্ময়ী? তুমি কি? কিন্তু তুমি যে অরূপা, অসীমা। সীমার সঙ্কীর্ণতায় তুমি কি ধরা দিতে পার?

কি জানি!

।। বারো ।।

তুমি যখন বার বার সীমার মধ্যে ধরা দিচ্ছ তখন তোমার একটা নামকরণ করা উচিত। ঠিক করেছি নাম রাখব রঙ্গিণী। যদিও তুমি ধরা ছোঁয়ার বাইরে, একটা বিশেষ রূপের সীমায় তোমায় বাঁধা যাবে না, কিন্তু রঙ্গিণীকে যাবে, আমার কল্পনার নাগালের মধ্যে তাহলে তোমায় পাব খানিকটা। রঙ্গিণীই তো তুমি। আমার মাথার উপর মিস্টার রায়-রূপী বজ্র যখন উদ্যত হয়ে আছে তখনও তোমার রঙ্গ কমছে না। মনে হচ্ছে তুমি যেন একটা বিরাট দাবানলের মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে যাচ্ছো। তোমার মুখে হাসি, চোখে আলো, সারা দেহে অপরূপ ছন্দ, যতির মধ্যে ব্যস্ততার চিহ্নমাত্র নেই, ভয়ের আভাস পর্যন্ত ফুটছে না মুখভাবে। মাঝে মাঝে এ-ও মনে হচ্ছে তুমিই ওই দাবানল, তোমারই অন্তর-বহ্নি যেন শতশিখায় মূর্ত হয়েছে বাইরে। আমাকে তুমি কি কিছু বলতে চাইছ ইঙ্গিতে? তুমিও কি আমাকে অমনি হাসিমুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলছ আগুনে? কিন্তু মুশকিল হয়েছে আগুন যে একাধিক। কোন্‌টাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব আমি?..

...একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটেছে কিন্তু এই মুহূর্তে। আমার ঘরের মেজের দিকে চেয়ে দেখছি একদল ছোট ছোট পিঁপড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে প্রকাণ্ড একটা মরা ভিমরুলকে। সৎকার করবে বলে নয়, খাবে বলে। ওটাও অবশ্য একটা সৎকার্য। আমার মনের নেপথ্যলোকে তুমি অগ্নিতে অবগাহন করছ আর আমার মনের প্রত্যক্ষলোকে রয়েছে ওই পিঁপড়েগুলো। ওরা আমাকেও যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে অতীত ইতিহাসের দিকে। আমরাও তো এককালে ওইরকম ছিলাম, জানোয়ারদের শব সংগ্রহ করে বেড়াতাম আহারের জন্য। মনে হচ্ছে, এখন সভ্য হয়েছি এখন আর শব সংগ্রহ করি না, জীবন্ত জীব কেটে খাই। পেটের তাগিদে মানুষের গলায় ছুরি বসাতেও আপত্তি করি না। যাঁরা আবার সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন তাঁরা প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়াও অন্য রকম তাগিদের তাড়ায় সর্বদাই উত্তেজিত। মানের তাগিদ, প্রেমের তাগিদ, লোভের তাগিদ, মোহের তাগিদ, রাজনীতির তাগিদ, জাতীয়তার তাগিদ— আরও কতরকম তাগিদ। এইসব তাগিদের সংঘাতেই নাকি সভ্যতার বর্ণবৈচিত্র্য। এরই তাগিদে যুদ্ধ হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করবার বৈজ্ঞানিক প্রণালী আয়ত্ত করছে। অ্যাটম-বোমা আবিষ্কৃত হয়েছে, মানুষ চাঁদে পা দিয়েছে, অন্যান্য গ্রহেও হয়তো যাবে, এইসব নিয়ে আবার হয়তা যুদ্ধ বাধবে, অন্তরীক্ষেও আমাদের রক্তধারা হয়তো রঞ্জিত করবে আমাদের সভ্যতাকে।

...সামান্য কয়েকটা পিঁপড়ের কাণ্ড দেখে মানব-সভ্যতার ভবিষ্যতে এসে হাজির হলাম। তারপর মনে পড়ল তপতীর কথা। সে নাকি একটা ধূর্ত খয়েরখাঁ পাষণ্ড কালোবাজারীকে

হত্যা করেছে। কিন্তু না তপতী যা করছে তা আমি সমর্থন করি না। হানাহানির পথে মানুষের মুক্তি নেই। কিন্তু তা বলে কি তপতীকে ধরিয়ে দিতে পারি? তা-ও পারি না। হাস্যমুখী তপতীর মুখটা বার বার ভেসে ওঠে মনে। যেন আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলে— আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবেন আপনি? দিন না। আপনি যদি দিতে পারেন আমিও ফাঁসিকাঠে ঝুলতে পারি। দেখবেন, হাসতে হাসতে মরব।

...না, তপতীর কথা পুলিশকে বলব না। বলতে পারব না। ওর সম্বন্ধে আমার দুর্বলতা আছে। কেন এ দুর্বলতা এ প্রশ্ন যদি কেউ করেন তাহলে হয়তো তাঁকে বলব এর জন্যে জবাবদিহি করতে আমি বাধ্য নই। কিন্তু নিজের কাছে এর একটা জবাবদিহি আছে। ফ্রয়েড বা ওঁর সগোত্র বিজ্ঞানীরা যাই বলুন, আমি এ কথা মানব না যে ওর প্রতি আমার এই আকর্ষণ নির্জ্ঞান বা সজ্ঞান যৌন-লালসা। একটা আদর্শের জন্য ও প্রাণ তুচ্ছ করে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এজন্য আমি ওকে শ্রদ্ধা করি। এই শ্রদ্ধা যৌন-লালসারই একটা রূপ এ কথা আমি মানি না। একজন পাগল কেমিস্ট ছিল। সে বলত ভেবে দেখলে সব জিনিসই রসগোল্লা। রসগোল্লাতে কার্বো-হাইড্রেট, প্রোটিন আর ফ্যাট আছে, অন্য সব খাবারেও তাই আছে। সুতরাং সব খাবারই রসগোল্লার সমগোত্র। ভাতে গরম ঘি মেখে আলুভাতে দিয়ে খাওয়া রসগোল্লা খাওয়ারই রকমফের। পোলাও খাওয়াও তাই, লুচি মাংস খাওয়াও তাই—সব রসগোল্লা। বিজ্ঞানীরা সেক্সের মাপকাঠি দিয়ে অনেক জিনিস মাপতে গেছেন। তাঁদের বৈদগ্ধ্যকে আমি সম্মান করি, কিন্তু তবুও এ কথা আমি মানতে পারছি না তপতীর প্রতি আমার শ্রদ্ধার মূলে আছে নির্জ্ঞান যৌন-প্রবৃত্তি। ...তপতীকে বাঁচাব যেমন করেই হোক। কিন্তু. .ওকি, এ কি কাণ্ড করলে তুমি রঙ্গিণী। কোথায় গেল দাবানল। বিরাট সমুদ্রে ময়ূরপঙ্খী ভাসছে, ছাদের উপর তুমি দাঁড়িয়ে আছ দিগন্তের দিকে চেয়ে। আকাশ ঢেকে উড়ছে তোমার ইন্দ্রধনু রঙের ওড়নাখানা।

'আসতে পারি'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম খুকু দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল তার চোখের দৃষ্টিতে একটা রহস্যময় কিছু আভাসিত হচ্ছে যেন।

'এস। কি হল—'

গলা খাটো করে বললে, 'আপনার বাড়ির সামনে সেদিন যে পুলিশের লোকটি খুন হয়ে গেল তার সম্বন্ধে এনকোয়্যারি করতে এসেছিলেন একজন পুলিশের অফিসার আমাদের বাড়িতে—'

'তোমাদের বাড়িতে? কি এনকোয়্যারি করলেন?'

'বললেন একজন গোঁফ-দাড়িওলা লোক নাকি খুন করেছিল ওই কনস্টেবলকে। অনেকেই নাকি তাকে দেখেছে। জানতে চাইছিলেন আমরা কোনো গোঁফ-দাড়িওলা লোককে এ পাড়ায় দেখেছি কি না সে সময়'

'ও। তুমি কি বললে—'

'বললাম দেখি নি'

তারপর মুচকি হেসে বললে, 'মিথ্যে কথা বললাম। লোকটা আপনার বাড়িতে যখন এসেছিল তখন তাকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম। আপনার বৈঠকখানার ঘরটা তো আমার

ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায়। আমি দেখেছিলাম তাকে। কিন্তু আপনি পাছে বিপদে পড়ে যান তাই কথাটা চেপে গেলাম। আপনার কথাও জিজ্ঞেস করছিলেন অনেক'

'আমার কথা? কি জিজ্ঞেস করছিলেন?'

'আপনি কেমন লোক, আমাদের সঙ্গে আলাপ আছে কি না, কি ধরনের লোক আপনার বাড়িতে আসে এই সব আর কি। আমি বললাম উনি আমার গুরু, ওঁর কাছে গীটার শিখি। অবাক হয়ে গেলেন! উনি আমার ব্যবসার কথা, কবিতার কথা, আপনার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানেন, কিন্তু আপনি যে গানবাজনার একজন বড় শিল্পী এ কথা জানেন না। মিস্টার রায়েরও গানবাজনার দিকে খুব ঝোঁক। সেতার বাজান। বললেন আপনার বাজনা শুনতে আসবেন একদিন'

'ভদ্রলোকের নাম বুঝি মিস্টার রায়?'

'হ্যাঁ। তারাসেবক রায়। আমরা অবশ্য ওঁকে মিনুদা বলি।'

'আত্মীয়তা আছে নাকি'

'না, আত্মীয়তা নেই। তবে—'

খুকু একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল। তারপর সামলে নিয়ে বলল, 'আমার বাবা আর ওঁর বাবা এক আপিসে কাজ করতেন। যখন রংপুরে আমরা ছিলাম খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল'

আমি চুপ করে রইলাম। মনে হতে লাগল সৌরভ যে জাঁদরেল অফিসারটির খবর দিয়েছিল ইনি কি সেই ব্যক্তি?

খুকু হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'পুলিশে যারা চাকরি করে তাদের আমরা খারাপ মনে করি কেন'

'ওটা একটা কুসংস্কার'

'তার মানে ওরা খারাপ নয়?'

'সবাই খারাপ নয়। অনেক ভালো পুলিশ অফিসারকে আমি চিনি। তাঁরা প্রকৃত ভদ্রলোক। আবার ভস্মমাখা গেরুয়াধারী সাধুদের মধ্যেও অনেক অসাধু লোক দেখেছি। এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'না এমনি'

আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। কল্পনায় আঁকতে চেষ্টা করলাম মিস্টার রায়ের ছবি। ভালোই মনে হল। ফরসা রং, ছিপছিপে পাতলা, ভদ্র মার্জিত চেহারা। একটু যেন লাজুক প্রকৃতির। এসে যেন বললেন, 'নমস্কার। আমার কথা খুকু নিশ্চয় বলেছে আপনাকে। আপনি কবিতা লেখেন, ব্যবসা করেন এ সব কথা জানতুম, কিন্তু আপনি যে গানবাজনাতেও একজন বড় শিল্পী, এ কথা তো জানা ছিল না আমার'

কল্পনাতেই লোকটির উপর শ্রদ্ধা হল আমার। কল্পনাতেই কথাবার্তা কইতে লাগলাম তাঁর সঙ্গে। খুব ভালো লাগতে লাগল ভদ্রলোককে। আমার প্রশংসা করলেন বলেই কি?

বললাম, 'বড় শিল্পী আমি নই। অ্যামেচার মাত্র। শখ আছে, চর্চা করি মাঝে মাঝে'

'খুকুর তো আপনার সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা। সে বললে আপনি যদি নিজেকে বাজারে সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করতেন তাহলে আপনাকে সুর-সম্রাট বলত সবাই'

হেসে বললাম, 'সম্রাটরা তো আজকাল বাতিল হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর খাতির আজকাল সম্রাটের চেয়ে অনেক বেশি। সুর-প্রধানমন্ত্রী বা সুর-রাষ্ট্রপতি হয়তো চলবে দিন কতক পরে'

হেসে উঠলেন মিস্টার রায়।

বললেন, 'ওগুলো কিন্তু ভালো শোনাচ্ছে না—'

'সুর-সম্রাট বা সাহিত্য-সম্রাটই কি ভালো শোনায়? সম্রাটরা যে জগতের লোক শিল্পীরা সে জগতের নয়। ফুলের সঙ্গে আচার বা মোরব্বা জুড়ে দিলে কি শোভন হয় তা? সুরের জগতে, বস্তুত, সব শিল্পের জগতেই থাকেন স্রষ্টা আর রসিক। তাঁরা পরস্পরকে যা দিয়ে থাকেন রাজনীতির ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। শিল্পের জগতে adult franchise নেই, সেখানে রসিকের রায়কেই মানতে হবে। কিন্তু রসিকেরা স্বল্পসংখ্যক, সুতরাং শিল্পের জগতে স্রষ্টারা যাদের ভোট পান তারা 'মাইনরিটি'। কিন্তু তাদের ভোটই চরম এবং অকাট্য। অর্থাৎ রাজনীতির জগতে যা ঘটে ঠিক তার উলটো'

'ঠিকই বলেছেন আপনি!'

মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার কি গানবাজনার শখ আছে নাকি? ওইটেই আসল জিনিস। অবনী ঠাকুর বলেছেন, শখ থাকা চাই, শখের প্রেরণাতেই মানুষ আর্টিস্ট হয়ে ওঠে'

মিস্টার রায় বললেন, 'সেতার বাজাই। খুকু বলছিল আপনি নাকি খুব ভালো বাজান। সেতারে সে একদিন আপনার ভৈরবীর আলাপ শুনেছিল'

'কই মনে পড়ছে না তো'

যদিও কল্পনাতেই আলাপ চলছিল তবু ওই শেষের কথাগুলো জোরে উচ্চারণ করে ফেললাম।

খুকু দাঁড়িয়েই ছিল।

সে বললে, 'কি মনে পড়ছে না'

'মনে পড়ছে না কবে তোমাকে সেতারে ভৈরবীর আলাপ শুনিয়েছি'

'শোনাননি তো একদিনও। হঠাৎ এ কথা মনে হল যে এখন'

অপ্রস্তুত ভাবটা সামলে নিয়ে বললাম—'শোনাব মনে করেছিলাম সেইটেই আমার মতিভ্রমে ওই চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল'

মুচকি হেসে খুকু চলে গেল। বলে গেল, 'মিনুদা শিগ্‌গিরই একদিন আসবেন আপনার কাছে।'

রঙ্গিণী তুমি হাসছ? দেখতে পাচ্ছি তোমার হাসি ফুটে রয়েছে ওই দোপাটি ফুলগুলোতে। কিন্তু আমি ওর মধ্যে একটা বিদ্রুপও দেখতে পাচ্ছি যেন। হাসির ভাষায় যেন বলছ, 'তুমি নিজেকে বড্ড জড়িয়ে ফেলছ। হয়তো বন্দরে শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।'

কিন্তু আমি জানি আমি পৌঁছবই। তোমার পতাকাও উড়বে আমার নৌকোর মাস্তুলে।

।। তেরো ।।

শামুক ভয় পেয়ে নিজেকে খোলের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছে এ উপমা দিতে ইচ্ছে করছে না। আরব্য উপন্যাসে পড়েছি এক দৈত্য নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পেরেছিল একটা কলসীর

মধ্যে, এ উপমাও নয়। শ্রীলতাকে শামুক বা দৈত্য ভাবতে ইচ্ছে করছে না। বরং বলতে ইচ্ছে করছে একটা প্রস্ফুটিত ফুল আত্মগোপন করেছে কুঁড়ির মধ্যে, কিংবা আকাশব্যাপী জ্যোৎস্না নিজেকে সংহরণ করেছে যেন মেঘের স্তূপের আড়ালে, কিংবা একটা উড়ন্ত প্রজাপতি হঠাৎ যেন ফিরে গেছে তার রেশমের গুটির অন্তরালে।

হ্যাঁ, কেন জানি না শ্রীলতা সরিয়ে নিয়েছে নিজেকে আমার কাছ থেকে। চিঠি সই করাতেও আর আসে না, চাপরাশির হাতে পাঠিয়ে দেয় চিঠিগুলো। সে টাইপিস্ট, টাইপ করাই তার কাজ, টাইপ-করা চিঠিগুলো যে তাকেই আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে এমন কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। আমি যদি কিছু সংশোধন করি তাহলে সংশোধিত চিঠি আবার সে পাঠিয়ে দেয় চাপরাশির হাত দিয়েই। নিজে আসে না। আসবার দরকার তো নেই। আমিও ডেকে পাঠাতে পারি না তাকে। লজ্জা করে, আত্মসম্মান বাধা দেয়। কিন্তু একটা জিনিস বুঝি। ধনুকের দুই প্রান্তকে যে রজ্জু বেঁধে রেখেছে তা যদিও অদৃশ্য হয়েছে, কিন্তু বিলুপ্ত হয়নি। বরং মনে হয় টানটা বেড়েছে। আত্মবিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করি। কেন এই টান? আমি টানছি, না ও টানছে? না, দুজনেই নিজেদের অজ্ঞাতসারে পরস্পরকে টানছি? এই কি প্রেম? এরই পরিণাম কি বিবাহ? কিন্তু না, না, শ্রীলতাকে, আমার অফিসের টাইপিস্টকে আমি সহধর্মিণী করব এ কল্পনাও তো করিনি কোনো দিন, তাহলে এ কি কৌতূহল কেবল? শ্রীলতা আমার কাছাকাছি এসে আবার দূরে সরে যাচ্ছে কেন এই রহস্যটা কি, তাই জানবার জন্যে কি আমার মন উন্মুখ হয়ে উঠেছে? আমার প্রতি এই বিরূপতা কেন এইটুকু জানলেই কি আমি নিশ্চিন্ত হব? একটা কথা মনে হল। হয়তো টাকাকড়ির ছোঁয়াচ লেগেই এই নেপথ্যলীন মাধুর্যটুকু বিলীন হয়ে গেল। আমি যে ওর চিকিৎসার টাকাটা ওর কাছে নিচ্ছি না—বড়বাবুকে বলে দিয়েছি ওর মাইনে থেকে কিছু কাটতে হবে না—সেটা কি ও শুনেছে? ওকে কিন্তু বলেছিলাম ওর মাইনে থেকে টাকা কেটে নেব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিনি। ওষুধের দাম আড়াই শ' টাকা লেগেছে। মনে হল এই সামান্য টাকাটা—।

আত্মবিশ্লেষণ বন্ধ করতে হল। মনের মধ্যে যে মুখটা জেগে উঠল তা শ্রীলতার।

শান্ত দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে বলল, 'আমাকে ভিখারিনীর দলে ফেলে দিলেন কেন? আমি গরিব, কিন্তু ভিখারী নই। আপনার দান করবার মতো বাড়তি টাকা আছে, কিন্তু কারো দান নেবার মতো প্রবৃত্তি নেই যে আমার'

তখনই বড়বাবুকে ডেকে বললাম, 'মিস মিত্রের ইচ্ছে যে তাঁর মাইনে থেকে তাঁর চিকিৎসার খরচটা কেটে নেওয়া হোক। আড়াই শ' টাকা খরচ হয়েছিল। উনি যে মাসে যতটা কাটতে বলেন কেটে নেবেন'

বড়বাবু বললেন, 'এ মাসে উনি কুড়ি টাকা কম মাইনে নিয়েছেন। আমি যখন বললাম সাহেব মাইনে কাটতে বারণ করেছেন তখন উনি চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, আপনি কুড়ি টাকা কমই দিন আমাকে। আমি সাহেবকে বলব। কিছু বলেননি আপনাকে?'

'না, আসেননি তো। বেশ কেটেই নেবেন'

বড়বাবু চলে গেলেন। মনে মনে ভারী লজ্জিত হয়ে পড়লাম আমি। তখনই মনে হল শ্রীলতা গরিব হতে পারে কিন্তু আসলে সে সম্রাজ্ঞী। দান গ্রহণ করে না অর্ঘ্য গ্রহণ করে। কিন্তু

সে অর্ঘ্য দিতে আমি কি প্রস্তুত? সে দাবিও কি আছে আমার?... হঠাৎ আত্মস্থ হলাম। মনে হল আমার আপিসের টাইপিস্টকে সম্রাজ্ঞী মনে করে তাকে অর্ঘ্য নিবেদন করবার কথা আমার মনে জাগছেই বা কেন।

তারপর তুমি এলে।

উত্তর পেয়ে গেলাম মেজের দিকে চেয়ে। দেখলাম একটা কাঁচপোকা প্রকাণ্ড একটা আরশোলাকে অনায়াসে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মনে হল, তোমারই ষড়যন্ত্র কি? তুমিই কি অলীক একটা মায়াছবি সৃজন করে আমাকে বলে দিচ্ছ, সাবধান আরশোলার পর্যায়ে নেমে যেও না। তুমি মানুষ।

ইচ্ছে হল প্রশ্ন করি—মানুষের সংজ্ঞা কি? তার কি কোনো দুর্বলতা থাকবে না, কোথাও কারও কাছে অবনত হবে না সে? আত্মসম্মানের প্রস্তরবেদীর উপর প্রস্তরমূর্তির মতো চিরকাল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকলেই তার মনুষ্যজন্ম সার্থক হবে, হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলোকে দলে পিষে মেরে ফেলাই কি হবে তার কৃতিত্ব? ..... নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর ঘণ্টাটা টিপলাম। চাপরাশি এল। ভেবেছিলাম তাকে বলব মিস মিত্রকে ডেকে দিতে। কিন্তু তা না বলে বললাম, 'আজকাল তোমরা কি ঘরদোর পরিষ্কার কর না? ঘরে আরশোলা এসেছে কেন?'

'কই আরশোলা?'

'মেজেতে'

ঝুঁকে দেখতে লাগল চাপরাশি।

'কই দেখতে পাচ্ছি না তো'

আমিও ঝুঁকে দেখলাম। কিন্তু আর দেখতে পেলাম না আরশোলা। কোথায় অন্তর্ধান করল সেটা! আবার মনে হল তোমার ষড়যন্ত্র নয় তো। কে তুমি। কেন তুমি এমনভাবে আসছ আমার কাছে রঙ্গিণী? কি চাও, কেন চাও...।

চাপরাশি চলে যাওয়ার পরই মিস মিত্র নিজেই এসে হাজির হলেন। হাতে খানকয়েক টাইপ-করা চিঠি। চিঠিগুলো দেখে সই করে দিলাম। টাকাকড়ির কথা উল্লেখ না করেই চলে গেলেন তিনি। মনে হল হেরে গেলাম।

ডাক এল। উপরেই দেখলাম খুব বড়-বড়-অক্ষরে-ঠিকানা-লেখা একটা খামের চিঠি রয়েছে। ঠিকানা বাংলায় লেখা। চিঠি খুলে আরও অবাক হয়ে গেলাম। ছেলেমানুষের মতো বড় বড় অক্ষরে কে যেন লিখেছে—'শতকোটি প্রণাম জানাই। আপনি জয়ী হয়েছেন। গর্বে আমার মন ভরে উঠেছে। কি আনন্দই যে হয়েছে তা বলবার নয়। ইতি—' নীচে কোনো নাম নেই। মনে হল লেখাটা হয়তো বাঁ হাতের লেখা। তপতী কি?

এর পর আর এক আশ্চর্য কাণ্ড হল। চিঠির অক্ষরগুলোর উপর ভর করে তুমি এলে আবার। বললে, 'হ্যাঁ, জয়ী তোমাকে হতে হবেই। তোমার জীবনে তিনটি ছায়া পড়েছে। ওরা যে ছায়াই, তার বেশি আর কিছু নয় এইটে প্রমাণ করতে হবে তোমাকে তোমার পৌরুষ দিয়ে। সে পৌরুষ নিষ্ঠুরতা নয়, অভদ্রতা নয়, অকোমল নয়, তা সৌজন্যপূর্ণ, তা শালীনতা-স্নিগ্ধ, কিন্তু তা নিজের গাম্ভীর্যে গৌরবময়, তা মহত্ত্বের মহিমায় উত্তুঙ্গ, তা শক্তির সামর্থ্যে অটুট। তা ক্ষণিক নয়, তা শাশ্বত...।'

এর পর যা ঘটল তা আমার কল্পনার কাণ্ড, না তোমার কাণ্ড বুঝতে পারলাম না।

তিনটে বড় বড় থামের মতো কি এসে মূর্ত হল আমার চোখের সামনে। ধোঁয়াটে রঙের তিনটে ডাকিনী যেন। প্রত্যেকেরই মাথায় এলোমেলো চুল, মুখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু খিলখিল হাসি শোনা যাচ্ছে।

তুমি বললে, 'ওদের অস্বীকার করতে হবে। ওরা নানাভাবে বার বার আসবে। কিন্তু মনে রেখো আসলে ওরা ডাকিনী মোহিনী। তোমার দুর্বলতাকে বীণা করে ওরা সুর বাজাবে। ওরা সাইরেন, শেষ পর্যন্ত তোমাকে শুয়োর বানিয়ে দেবে। তবে তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় আমি বাধা দিতে চাই না, শুয়োর হতে চাও যদি—হও। আমি শুধু তোমাকে বলে দেব—পশুত্ব অনেক সময় কবিত্বর মুখোশ পরে আসে...'

আমি মানস-কর্ণে তোমার এ কথা শুনে ভাবলাম ছেলেবেলায় যে পশুপতি মাস্টারের কাছে পড়েছিলাম, যিনি সামান্য ভুল হলেও কান মলে দিতেন, যিনি অনেকদিন পূর্বে মারা গেছেন তাঁরই প্রেতাত্মা এসে আমার উপর ভর করল নাকি।

হঠাৎ একটা গিটকিরি-ভরা অপরূপ সুর যেন বলে উঠল—না—না—না—নারে—।

জানলা খুলে দেখি সামনের বাড়ির রেডিও কন্ডাক্টার বাঁশের উপর বসে একটা দোয়েল। আকাশের পানে চেয়ে গান গাইছে।

।। চোদ্দ ।।

আমি কি রকম যেন আচ্ছন্নের মতো বসে ছিলাম। মনে হচ্ছিল দূর আকাশে কতকগুলো পর্বতশৃঙ্গ যেন খাড়া হয়ে আছে। আকাশকে বিঁধতে চাইছে।

...মিস্টার রায় এসেছিলেন। আগে যেমন তাঁকে কল্পনায় দেখেছিলাম, মোটেই সেইরকম নন। ভারিক্কী মুখের উপর একজোড়া প্রচণ্ড গুম্ফ, মোমের সাহায্যে প্রান্ত দুটি ঊর্ধ্বমুখী। মাথার সামনে দিকটায় ঈষৎ টাক। বেশ মজবুত বলিষ্ঠ চেহারা। খাকী পোশাক, হাবভাব জঙ্গী! হাতে একটি সরু বেত। সেটি বার বার নাড়াচ্ছেন। পায়ে মিলিটারি বুট। খুকু বলেছিল এঁর নাকি গানবাজনার দিকে খুব ঝোঁক। এই চেহারার আড়ালে কি কোনো সংগীত-রসিক প্রচ্ছন্ন থাকতে পারেন? কে জানে।

নমস্কার করে বললেন, 'আপনার সম্বন্ধে অনেক খবর জেনেছি। কিন্তু আপনি যে গানবাজনার একজন বড় ওস্তাদ এ খবরটা জানতাম না। মিস চন্দ্রাননীর কাছে প্রথম শুনলাম। ও নাকি আপনার শিষ্যা। আমারও সামান্য ঝোঁক আছে ওদিকে। কিন্তু সে সব কথা পরে হবে। আগে কাজের কথাগুলো সেরেনি'

নির্নিমেষে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইলেন আমার দিকে। লক্ষ্য করলাম চোখের তারা দুটো কালো নয়, নীলচে। একটা অ্যাংলোইন্ডিয়ান গুন্ডাকে দেখেছিলাম একবার। তার চোখের তারার রংও এইরকম ছিল।

যদিও একটু ভয় ভয় করছিল তবু সপ্রতিভভাবে বললাম, 'কি কাজেব কথা—'

'আমি পুলিশের লোক। অফিসিয়াল ডিউটিতেই এসেছি আপনার কাছে। সেদিন আপনার বাড়ির সামনে একটা প্লেন-ড্রেস-পরা কনস্টেবল খুন হয়ে গেছে। আপনিই তো তাকে

হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। সো গুড অব ইউ (So good of you)—এখন আমরা তার হত্যাকারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনি এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করতে পারেন কি?'

'আমি তো কাউকে খুন করতে দেখিনি।'

'একটা গোঁফ-দাড়িওলা লোকে তাকে খুন করেছে। এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। তবে গোঁফ-দাড়িটা আসল না নকল জানি না আমরা। খুব সম্ভবত নকল। ওটা ছদ্মবেশ। যাই হোক, দু'একজন সাক্ষী বলছে একটা গোঁফ-দাড়িওলা লোক সেদিন নাকি আপনার বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল। আপনার বাড়ির পাশের গলিটা থেকে বেরুতে দেখেছে একজন। আপনি কি দেখেছিলেন ওরকম কোনো লোককে?'

বললাম, 'সেদিন একটি গোঁফ-দাড়িওলা লোক আমারই কাছে এসেছিল দুটি আনারস নিয়ে। আনারস পাঠিয়েছিল আমার একজন ভক্ত আসাম থেকে। আমি মাঝে মাঝে কবিতা লিখি—'

'হ্যাঁ, সে খবর তো জানি আমি। আমিও পড়েছি আপনার কবিতা। সিম্‌প্লি ওয়ান্‌ডারফুল—। কিন্তু আপনার সে ভক্তটির ঠিকানা কি'

'তাকে আমি চিনি না। তার ঠিকানাও জানি না। সেই গোঁফদাড়িওলা লোকটি বললেন, আমি কলকাতা আসছি শুনে তিনি আমার হাতে আনারস দুটি দিয়ে বললেন কবি দিগন্ত সেনকে দিয়ে দেবেন। আমি সে ভক্তকেও চিনি না, ওই গোঁফ-দাড়িওলা লোকটিকেও আগে কখনও দেখিনি। তিনি আনারস দিয়েই চলে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য খুনটা হল। আমি ছাতে ছিলাম। গোলমাল শুনে নীচে নেবে এলাম। একজন লোক বললে খুনীটা নাকি ট্যাক্সি করে এসেছিল। ট্যাক্সি থেকেই তাকে গুলি করতে দেখেছে সে।'

'হ্যাঁ, ট্যাক্সিটাকে 'ট্রেস' (trace) করবার চেষ্টা করছি আমরা। এখনও পারিনি। আচ্ছা, সেদিন যে লোকটি আনারস নিয়ে আপনার কাছে এসেছিল তার গোঁফ-দাড়ি ছাড়া আরও কোনো বৈশিষ্ট্য কি আপনার চোখে পড়েছিল'

তপতীর চোখ দুটোর কথা মনে হল আমার। কিন্তু নিষ্কম্প কণ্ঠে বললাম, 'না আর তো কিছু মনে পড়ছে না—'

'লোকটির হাইট (height) কি রকম মনে হয় আপনার'

খুব লম্বাও নয়, বেঁটেও নও, মাঝারি গোছের'

এই সময় একটা কাণ্ড হল।

আমার ঠিক সামনে টাঙানো ছিল আমার মায়ের ছবি। নামজাদা শিল্পীর আঁকা তৈলচিত্র একখানা, অনেকদিন ছবিটার দিকে চেয়ে দেখিনি। আজ চোখ পড়ল ছবিটাতে। দেখে চমকে গেলাম। জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। চোখের দৃষ্টি যেন জীবন্ত। সে দৃষ্টি যেন বলতে লাগল, 'তুমি মিথ্যে কথা বলছ! ভুলে গেছ তোমার বাবার সত্যনিষ্ঠার কথা। ভুলে গেছ সত্যকে আঁকড়ে ছিলেন বলে কত নির্যাতন তিনি সহ্য করেছেন? এই তো কয়েকদিন আগে তুমি সৌরভকে বলেছিলে আমি মিথ্যা কথা বলতে পারব না। শুনে খুব খুশি হয়েছিলাম। এখন হঠাৎ তপতী মেয়েটার মধ্যে কি এমন দেখলে যে মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছ অনর্গল? বুঝতে পারছ না তোমার এ দুর্বলতা তোমার পৌরুষকে তোমার মনুষ্যত্বকে নষ্ট করে দিচ্ছে? তুমি আমার একমাত্র ছেলে, তোমার এ অধঃপতন আমি সইতে পারছি না...'

বুঝতে পারলাম মায়ের ভিতর তুমি এসেছ। আমাব মা ভালোমানুষ লোক ছিলেন। আমাকে কখনও বকতেন না। তাঁর চোখের এরকম জ্বলন্ত দৃষ্টি কখনও দেখিনি। বুঝলাম তুমি এসেছ মায়ের চোখে।

তোমার কথার জবাব দিলাম আমি মনে মনে। 'তুমি যাকে দুর্বলতা বলছ অন্যদিক থেকে দেখলে বুঝতে পারবে সেটা দুর্বলতা নয়, শক্তি। তপতীকে বাঁচাবার জন্যে আমি যে চেষ্টা করছি সে চেষ্টারই মহৎ রূপ কি তুমি দেখনি মা যখন আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের সন্তানকে বাঁচাবার জন্যে?'

মায়ের চোখের দৃষ্টি আরও জ্বলজ্বল করে উঠল। সেই দৃষ্টিতেই শুনলাম তোমার উত্তর।

'সত্যি সত্যি যদি আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে, সত্যি যদি প্রাণ তুচ্ছ করে তপতীর দলে যোগ দিতে তাহলে বাহবা দিতাম তোমাকে। বলতাম—সাবাস। কিন্তু তুমি নিজে গা বাঁচিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আছ, যে নীতিকে তুমি সমর্থন কর না এখন সেই নীতিরই সপক্ষে দাঁড়িয়েছ ওই তপতী মেয়েটার সম্বন্ধে তোমার মোহসঞ্চার হয়েছে বলে, অনর্গল মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছ কাপুরুষের মতো—এটা শক্তি নয়। এর মধ্যে বিন্দুমাত্র বীরত্ব বা মহত্ত্ব নেই'

মিস্টার রায়ের কণ্ঠস্বরে পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলাম আবার।

'তাহলে মোদ্দা কথা এই দাঁড়াচ্ছে আপনি কোনো ক্লু (clue) দিতে পারছেন না। আর একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি'

'বলুন'

'টেরারিজ্‌ম সম্বন্ধে আপনার সত্যিকার মত কি। আপনি ওটাকে ভালো মনে করেন, না, মন্দ মনে করেন। আপনি লেখক মানুষ আপনার মতামতটা মূল্যবান মনে করি'

এই বলে তিনি পকেট থেকে একটা খাতা বার করে কি যেন লিখতে লাগলেন। আমি চুপ করে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে মিস্টার রায় বললেন—'আপনার স্টেটমেন্টটা লিখে নিচ্ছি। লেখা হয়ে গেলে আপনি ওর নীচে সই করে দেবেন। তাহলেই আমার কাজ 'ফিনিশ'। তারপর আপনার বাজনা শোনবার ইচ্ছে আছে একটু। যদি দয়া করে শোনান খুবই বাধিত হব। বাগেশ্রী শুনব আপনার কাছে। ওটার প্রতি আমার একটু দুর্বলতা আছে। টেরারিজ্‌ম সম্বন্ধে আপনার মতটা লিখে—'

মায়ের ছবিটার দিকে চাইলাম।

দেখলাম বিপুল প্রত্যাশায় তাঁর চোখ দুটো ভাষাময় হয়ে উঠেছে। কিসের প্রত্যাশা?

বললাম, 'আগে বাগেশ্রীটা আপনাকে শুনিয়ে দিই। তারপর আমার স্টেটমেন্ট দেব।'

'তার মানে?'

'মানেও পরে বলব। পাশের ঘরে চলুন। ওইখানেই আমার সংগীতচর্চা হয়। আপনি কিসে বাগেশ্রী শুনবেন? সেতারে, এস্রাজে, বেহালায় না গীটারে—'

'সবই বাজাতে পারেন আপনি?'

'একটু একটু পারি—'

'সেতারেই শোনান তাহলে। আমি সেতারই বাজাই'

'আসুন'

পাশের ঘরে গেলাম দুজনে।

আমি সাধারণত চোখ বুজে বাজাই। চোখ বুজেই বাজাচ্ছিলাম। কতক্ষণ বাজিয়েছিলাম জানি না। বাজনা যখন শেষ করলাম তখন মনে হল সুরের অলকনন্দায় অবগাহন করে উঠেছি। আমার দেহে বা মনে আর কোনো মলিনতা নেই। চোখ খুলে দেখলাম মিস্টার রায়ও চোখ বুজে বসে আছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর দু'চোখ বেয়ে জল পড়ছে, মনে হল তন্ময় হয়ে বসে আছেন। বাজনা শেষ হবার পরও কয়েক সেকেন্ড বসে রইলেন। তারপর অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, 'চমৎকার'। তারপর হঠাৎ এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন আমাকে।

'এ কি, এ কি করছেন—'

'মহান শিল্পীকে প্রণাম করলুম। তাছাড়া আপনি চন্দ্রাননীর গুরু। আমার প্রণম্য—'

'আমি কারো গুরু নই। কারো হতে চাই না, পারবও না। আপনিও বা লঘু কিসে? আপনি তো শিল্পী। আমরা সবাই একই পথের যাত্রী, দরকার হলে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে পারি। এর জন্যে গুরু হবার দরকার কি—'

'আমি আসব কিন্তু মাঝে মাঝে। হয়তো দু'জনে একসঙ্গেই আসব'

'দু'জনে, মানে?'

'চন্দ্রাননীকে বিয়ে করব ঠিক করেছি। চমৎকার মেয়েটি—'

'কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। তারপর যন্ত্রচালিতবৎ বললাম, 'বাঃ শুনে খুব সুখী হলাম'

কয়েক মুহূর্ত আবার চুপচাপ।...আমার মনে হতে লাগল ঝড় উঠেছে। ঝড়ের মাঝখানে বসে আছি। চারিদিকে ধুলো উড়ছে, গাছপালা ভেঙে যাচ্ছে, গাছের ভাঙা ডাল উড়ছে, ঘরের চাল উড়ছে, মনে হল একটা বিরাট স্তম্ভও যেন উড়ে যাচ্ছে। যে তিনটে ছায়াস্তম্ভ দেখেছিলাম তারই একটা কি? বিরাট একটা গাছের ধাক্কায় ভেঙে গেল সেটা। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন মিস্টার রায়।

'আপনি কি একটা স্টেটমেন্ট দেবেন বলছিলেন। টেরারিজ্‌ম বিষয়ে—'

'আগেকার স্টেটমেন্টটা কেটে দিন, ওতে অশুচি মনের মলিনতা লেগে আছে। সুরের স্রোতে অবগাহন করে এখন নির্মল হয়েছি আমি। এখন যা বলব তা স্পষ্ট, তা সত্য'

'বলুন। তাই তো আমি চাই'

'আমার ঘরে সেদিন গোঁফ-দাড়িপরা যে লোকটা এসেছিল সে পুরুষ নয়, মেয়ে একটি। সে ছদ্মবেশে আমার কাছে এসেছিল আনারস দিতে না, একটি রিভলভার দিতে। সে-ই আপনাদের কনস্টেবলকে খুন করেছে কিনা জানি না। কিন্তু মেয়েটির নাম আমি জানি।'

'কি নাম'

'তা আমি বলব না। সে আমাকে বিশ্বাস করেছে, আমি বিশ্বাসঘাতক হতে পারব না। সে যে রিভলভারটা দিয়েছিল সেটাও আপনি নিয়ে যেতে পারেন ইচ্ছে করলে।'

'নাম বলবেন না?'

'না। এর জন্যে যদি আমাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যান—'

'না না অ্যারেস্ট করব কেন। আমি শুধু একটি কথা জানতে চাই। একটি মেয়ের চিঠি আপনাকে দেখাচ্ছি—আপনি যদি বলেন এ মেয়ে সে মেয়ে নয় তাহলেই নিশ্চিন্ত হব আমি'

একটি চিঠি বার করে দিলেন মিস্টার রায়। চিঠিতে আছে—

শ্রীচরণেষু,

দাদা, এই তৃতীয়বার তোমাকে অনুরোধ করছি। ও চাকরি ছেড়ে দাও তুমি। তোমাকে ভালোবাসি তাই তোমাকে শত্রুপক্ষের শিবিরে দেখতে চাই না। আমার হাতে তোমার মৃত্যু হোক এটা আমার মোটেই কাম্য নয়। তুমি অন্য কোনো কাজ কর। আমি আর ফিরব না, ফিরতে চাই না, ফিরবার উপায়ও নেই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে করতে আমি শেষ হয়ে যাব। এইটিই আমার সাধনা, কামনা সব। আমি কারো দলে নেই। আমি একক। যা করি একাই করি। যে লোকটাকে মেরেছি, যার জন্যে তোমরা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ সে লোকটা যে কত পাষণ্ড ছিল তা তোমাদের অবিদিত নেই, কিন্তু তোমরা তাকে শাস্তি দাওনি, সম্মানের আসনে বসিয়ে সেলাম করেছ। আমি তাকে শাস্তি দিয়েছি। জানি এর জন্যে আমাকেও শাস্তি দেবে তোমরা একদিন, ব্যাধেদের হাত থেকে হরিণী বেশিদিন আত্মরক্ষা করতে পারে না। কিন্তু ব্যাধেদের দলে তুমিও থাকবে? আমাকে মারবার জন্যে যে সব ব্যাধরা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদেরও দু'একজনকে মেরেছি আত্মরক্ষা করবার জন্যে। আর একটা দুর্ধর্ষ কালোবাজারী আছে তাকে মেরে তবে আমি নিশ্চিন্ত হব। তারপর হয়তো ফাঁসিকাঠে ঝুলব! আবার জন্মাব আমি, যুগে জন্মাব, যতক্ষণ না পৃথিবী কলুষমুক্ত হয়। তোমাকে শুধু অনুরোধ, তুমি ও চাকরি ছেড়ে দাও। আমার প্রণাম নিও।

ইতি—তপতী।

'তপতী আপনার কে হয়'

'আমার নিজের ছোট বোন। বড্ড ভালোবাসি ওকে। ও আপনার কাছে আসেনি শুনলে নিশ্চিন্ত হব'

'ও আমার কাছে আসতে পারে এ ধারণা কি করে হল আপনার।'

'আপনাকে ভক্তি করে খুব। আপনার লেখা ওর কণ্ঠস্থ। লক্ষ্য করেছি আপনার লেখাতেও বিদ্রোহের সুর আছে। আপনি যে এককালে টেরারিস্টদের সঙ্গে ছিলেন সে খবর আমি আমাদের পুরোনো ফাইল থেকে উদ্ধার করেছি। কোয়া, শচীন আপনার বন্ধু ছিল। তাই মনে হচ্ছে তপতীও আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। এটা যদি মিথ্যে হয় তাহলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচব আমি—'

'কেন বুঝতে পারছি না'

'এখনও পর্যন্ত তাকে বাঁচিয়ে চলেছি। কেউ তার নাম করেনি কিন্তু আপনি যদি বলেন সে ছদ্মবেশে আপনার কাছে এসেছিল, এসে একটা রিভলভার দিয়ে গেছে তাহলে তাকে বাঁচাতে পারব না আর। কারণ সেটা আমাকে রেকর্ড করতে হবে'

'অন্য নাম রেকর্ড করতে পারেন না?'

'পারি। কিন্তু আমি জানি মিথ্যেকে শেষ পর্যন্ত চাপা দেওয়া যায় না। তাই আমি মিথ্যা কথা কখনও বলি না, মিথ্যা কথা রেকর্ড করতে চাই না। তাছাড়া আপনি একজন অনেস্ট লোক আপনি কি ওই মিথ্যা স্টেটমেন্টে সই করবেন? বিশ্বাস করুন আমিও অনেস্ট

অফিসার। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কিন্তু আপনি কি টেরারিজ্‌ম্‌ ভালো মনে করেন'

বললাম, 'দেখুন, মহৎ উদ্দেশ্যে যারা প্রাণ বিসর্জন দেয় তারা সবাই শ্রদ্ধেয়। ঝান্সীর রানি, কানাইলালকে শ্রদ্ধা করি, নফর কুণ্ডুকেও করি। দেশের মঙ্গলের জন্য যাঁরা নির্যাতন সহ্য করেছেন, ফাঁসিকাঠে উঠেছেন তাঁরা সবাই আমার কাছে নমস্য। কিন্তু সব জিনিসের যেমন আসল নকল আছে টেরারিস্টদের মধ্যেও তেমনি আছে। নকল টেরারিস্টরা—যারা বন্দুক চালিয়ে বোমা ফাটিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে— তারা ঘৃণ্য। আপনি যদি খাঁটি মানুষ হন তাহলে আপনারও এই মত হবে এটা আমি বিশ্বাস করি'

'আমার মত যাই হোক, আপাতত কিন্তু ভারি কষ্ট পাচ্ছি'

'কেন?'

'বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছি বলে। আমি বুঝতে পারছি আমার বোন তপতী টেরারিস্ট। তাকে আমার ধরবার চেষ্টা করাই উচিত, কিন্তু তাকে আমি বাঁচাবার চেষ্টা করছি। করছি, কারণ তাকে ভালোবাসি। ভালোবাসা বড়, না কর্তব্য বড়, তা আপনারা কবিরাই ভালো বলতে পারবেন। আমি সামান্য মানুষ, আমি ভালোবাসাকেই বড় স্থান দিয়েছি, এর জন্যে বিবেক দংশন করছে, কিন্তু তবু সুখ পাচ্ছি। আপনি দয়া করে সাহায্য করুন আমাকে। আপনি বলুন তপতী আপনার কাছে আসেনি'

'আমি তো আগেই বলেছি এ বিষয়ে আমি কিছু বলব না'

'একথা রেকর্ড করলে আপনাকেও ধরে নিয়ে যেতে হবে এবং আপনি যাতে নামটা বলেন তার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। সেটা সুখকর হবে না মোটেই। আমি তা করতেও চাই না'

'আপনি যা খুশি করতে পারেন। কোনো নাম আমি বলব না'

'দোহাই আপনার, একটু সাহায্য করুন আমাকে'

'আর একটা কথাও আমি বুঝতে পারছি না। আপনি বলছেন আপনি 'অনেস্ট' অফিসার। কিন্তু যা করেছেন তা কি 'অনেস্টি'র নমুনা? দোষীকে বাঁচাবার চেষ্টা কি অসাধুতারই নামান্তর নয়?'

'আমি তো আগেই বলেছি ভালোবাসার চাপে আমি কর্তব্যচ্যুত হয়েছি। আপনার স্টেটমেন্টটা একটু বদলে দিন। 'বলুন, তপতী আপনার কাছে আসেনি—'

'মাপ করবেন। যা বলেছি তার বেশি আর কিছু বলব না।'

হঠাৎ রূঢ়কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার রায়। 'বলুন, তপতী আপনার কাছে এসেছিল কি না'

পকেট থেকে বার করলেন একটা রিভলভার এবং সেটা উঁচিয়ে ধরলেন আমার দিকে।

বললাম, 'ভয় দেখাচ্ছেন? ভয় পাবার ছেলে আমি নই'

দড়াম করে আওয়াজ হলো।

আমার কিছু হল না, মিস্টার রায়ই লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম তপতী দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে রিভলভার মুখে হাসি। হাসতে হাসতেই বললে, 'শেষ করে দিলাম শয়তানটাকে। ও নিশ্চয় বলেছিল তপতী আমার আপনার লোক'

'বলেছিল তুমি ওর ছোট বোন।'

'আর একজনের কাছে বলেছে আমি ওর স্ত্রী। আমি ওর কেউ নই'

'তোমার এই চিঠিটা দেখিয়েছিল আমাকে'

চিঠিটা সামনেই পড়েছিল, দিলাম তাকে।

পড়ে বললে, 'এ বানানো চিঠি'

'আমাকে বলেছিল আপনি বলুন তপতী আসেনি তাহলেই আপনাকে ছেড়ে দেব'

'তার মানে আপনাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে চাইছিল আপনি তপতীকে চেনেন'

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম রক্তে চতুর্দিক ভেসে যাচ্ছে। মেজেতে, বিছানার চাদরে, চতুর্দিকে রক্ত। তার মাঝখানে মিস্টার রায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন।

'এটা নিয়ে কি করবেন এখন'

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম।

তপতী আমার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। আমি হঠাৎ উঠে কপাটটা বন্ধ করে দিলাম।

'ও কি করলেন'

রাগ হল হঠাৎ। এ কি বিপদে ফেললে আমাকে মেয়েটা।

বললাম, 'আমি এখনি পুলিশে ফোন করব! তোমাকে ধরিয়ে দেব'

হোহো করে হাসতে লাগল তপতী।

তারপর এগিয়ে এসে প্রণাম করল আমাকে।

'আপনার কাছে এইটেই প্রত্যাশা করেছিলাম। আপনি কবি, আপনি বিদ্রোহের গান গেয়েছেন। কিন্তু বিদ্রোহকে মূর্ত করতে হলে যে নোংরা কাজ করতে হয় তা আপনি সহ্য করতে পারবেন না। আপনারা ইঞ্জিনিয়ার, প্ল্যান করে দিতে পারেন, কিন্তু যে জনমজুররা আপনাদের প্ল্যানকে রূপ দেয় তাদের দলে আপনারা যেতে পারবেন না। রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' পড়েই বুঝেছিলাম যে কবিরা যে কল্পলোকে বাস করেন তা নিখুঁত, সেখানে সত্য-শিব-সুন্দর ছাড়া আর কিছু নেই। আমি কবি নই, কিন্তু আমি জানি সত্য-শিব-সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অসত্য, অশিব এবং অসুন্দরকে ধ্বংস করতে হয়। আপনাদের মতে সেটা নোংরামি, সেটা জঘন্য নিষ্ঠুরতা। এর জন্যে যে নির্মম নির্দয় ক্ষাত্রবীর্য থাকা দরকার তা আপনাদের নেই। কারণ আপনারা স্বভাবতই ব্রাহ্মণ। শুদ্ধ, শুচি, পবিত্র ব্রাহ্মণ পরশুরাম ক্ষত্রিয়ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন বলে ব্রাহ্মণ-সমাজে অপাঙক্তেয় হয়ে আছেন। আপনি পুলিশে খবর দিন আমি আপত্তি করব না। আমার রিভলভারে আরও গুলি আছে'

'আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? ভেবেছ যেহেতু আমি ব্রাহ্মণ সেই হেতু আমি ভীতু?'

তপতী এগিয়ে এসে রিভলভারটা আমার পায়ের কাছে রেখে দিলে।

'আপনাকে গুলি করব এ কথা আমি ভাবতেও পারি না। আমার অনুরোধ আপনি আমায় শাস্তি দিন। পুলিশের অত্যাচার সহ্য করে ফাঁসিকাঠে ঝুলে সামান্য খুনির মতো মরতে চাই না। আপনি আমার বিচার করেছেন আপনি আমাকে শাস্তি দিন। সে আমার সুখমৃত্যু হবে। আমি বুক পেতে দাঁড়াচ্ছি—'

'আমি বিচারক নই, জল্লাদও নই। তুমি আইন ভঙ্গ করেছ, আইনই তোমাকে শাস্তি দেবে। আমার কোনো অধিকার নেই, তোমাকে শাস্তি দেবার'

টিক টিক টিক টিক করে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল কি? আমার মনে হল তুমিই যেন বলে উঠলে ঠিক ঠিক ঠিক ঠিক।

এরপর তপতী যা করল তা নাটকীয়। বললে, 'একটা কথা কেবল বলুন। আপনি আমাকে

সামান্য খুনি মনে করেন কি? সত্যি কথা বলুন। সত্যি কথাটা আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই। সাধারণ খুনিকে যেমন ঘৃণা করেন আমাকেও কি তেমনি ঘৃণা করেন?'

'না তপতী, তোমাকে আমি ঘৃণা করি না শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তবু আমাকে পুলিশে খবর দিতে হবে, তা না হলে আমার বিবেক আমাকে রেহাই দেবে না।'

'আপনি আমাকে শ্রদ্ধা করেন এ শুনে আমি চরিতার্থ হয়ে গেছি। আমার হৃদয় কানায় কানায় ভরে উঠেছে। কিন্তু আমি পুলিশকে ধরা দেব না। চললাম—'

সঙ্গে সঙ্গে সে রিভলভারটা তুলে নিলে আমার পায়ের কাছ থেকে। নলটা নিজের মুখে পুরে টিপে দিল ট্রিগারটা। দড়াম করে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল আমার সামনে। দড়াম দড়াম করে চারদিক থেকে গুলিবর্ষণ হতে লাগল। পুলিশ ফোর্স এসেছে। মিস্টার রায় তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'আমি মরি নি'—বলেই আমার দিকে তাক করে রিভলভার তুললেন।

'করুন গুলি আমি ভয় পাই না'

ঠিক ঠিক ঠিক ঠিক বলে উঠল টিকটিকিটা।

দড়াম করে শব্দ হল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার দিবা-স্বপ্ন ভেঙে গেল।

এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম। নিবিষ্টচিত্তে মিস্টার রায়ের কথা ভাবতে ভাবতে যে স্বপ্নলোক সৃজন করেছিলাম তাতেই উপরোক্ত ঘটনাগুলো ঘটে গেল পর পর। আশ্চর্য! স্বপ্নকে এমনভাবে প্রত্যক্ষ করা কি সম্ভব? কিন্তু করলাম তো!

চারদিকে চেয়ে দেখলাম। মায়ের ছবিটাকে দেখতে পেলাম শুধু। আর কিছু নেই। তারপর দেখলাম টিকটিকিটা মায়ের ছবির পিছন থেকে সন্তর্পণে মুখ বাড়াচ্ছে।

টিক টিক টিক—আবার ডেকে উঠল সে। আবার লুকিয়ে পড়ল ছবির পিছনে। তারপর তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

'যা দেখলে তা স্বপ্ন নয়, সত্য। ওগুলো তোমার অবচেতনলোকের নোংরামি, ভয় আর আশা-আকাঙ্ক্ষা। ওর মধ্যে তোমার মহত্ত্বের নমুনাও আছে একটু। কিন্তু সবটা মিলিয়ে একটা জগা-খিচুড়ি। কিন্তু মিথ্যা নয়, স্বপ্ন নয়, সত্য। তুমি আত্মদর্শন করেছ'

উঠে জানলাটা খুলে দিলাম। দেখলাম চাঁপাগাছে একটি ফুল ফুটেছে।

হাসছে আমার দিকে চেয়ে।

।। পনেরো ।।

হাজারিবাগে চেঞ্জে এসেছি। কলকাতা আর ভালো লাগছিল না। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে চমৎকার ভালো বাড়িটি পেয়েছি। বাড়ির সামনেই ফুলের বাগান। মালীটি আমার খুব অনুগত হয়ে উঠেছে। বলেছে ভালো ভালো কয়েকটা গোলাপের কলম আমাকে করে দেবে। তাছাড়া পুরোনো চাকর ভোজুকে পেয়েছি।

তপতী যে খাতাখানা আমাকে দিয়ে গিয়েছিল সেইটে বার করে পড়ছি। টেবিলের উপর মাথার কাছে একটা ল্যাম্প জ্বলছে। অন্ধকার হয়ে এসেছে চারিদিকে। খাতাটা নিয়ে যখন বসেছিলাম তুমি তখন আপত্তি করেছিলে একটু। বলেছিলে, শ্রীলতার বাবার ডায়েরি খুলে

বসলে কেন! পরের ডায়েরি কি পড়া উচিত? তোমার কথা শুনেও শুনিনি। তোমার চোখের প্রখর দৃষ্টি যে আমার উপর নিবদ্ধ হয়ে আছে তা অবশ্য অনুভব করছিলাম। পড়ছিলাম তবুও। তোমার কথা যে শুনিনি এতে মনে মনে ভারি আনন্দ অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিল বুঝি মুক্তি পেলাম। মুক্তি কিন্তু পাইনি, পরে সেটা বোঝা গেল। মুক্তি বোধহয় চাইও না।

শ্রীলতার বাবার হাতের লেখা ভালো নয়। খাতাটিও জরাজীর্ণ। এটা ঠিক ডায়েরিও নয়। এলোমেলোভাবে জীবনের নানা ঘটনা লিখেছেন। পড়তে মন্দ লাগছে না।

রাস্তার ধারে লোমওলা কুকুর ধুঁকছে একটা। আমি কিছু ছাতু কিনেছিলাম। ছাতু আর গুড়। তাই খাচ্ছিলাম রাস্তার ফুটপাথে বসে বসে। ছাতুর চেয়ে ভালো কিছু জোটেনি সেদিন। জোটাতে পারিনি। কাল অনাহারেই কেটেছে। আজ মোট বয়ে আনা চারেক রোজগার করেছি। কুকুরটার দিকে চেয়ে মনে হল ও বেচারাও বোধহয় অনাহারে আছে, ওকেও একটু দিই। একটা ডেলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিলাম তার দিকে। আশ্চর্য কাণ্ড। কুকুরটা ঘেউঘেউ করে তেড়ে এল আমার দিকে। ভাবটা, আমাকে খাবার ভিক্ষে দিচ্ছ, তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়। ছাতুর ডেলাটার দিকে ফিরে চাইলও না। চলে গেল গটগট করে। এরকম আভিজাত্য মানুষের মধ্যেও দেখিনি। মানুষমাত্রেই তো দু'হাত পেতে দেহি দেহি করছে। বাবার কথা মনে পড়ল। বাবা বেশ মানী লোক ছিলেন। দোর্দণ্ড প্রতাপও ছিল তাঁর। দুলাল মিত্তিরকে সবাই চিনত, সবাই ভয় করত। তেজারতি কারবার ছিল, জমিদারিও ছিল। সাহেবসুবোরাও খাতির করতেন তাঁকে। রায়বাহাদুর খেতাব পাব পাব করেও পাননি। এহেন লোককে ভিক্ষা করতে দেখেছি আমি। আমাদের বাড়িতে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব হত। সেই দুর্গোৎসব উপলক্ষে যাত্রা হত, বাঈনাচ হত, ভাগবত পাঠ হত, সে সময় বড় বড় অফিসারদের নিমন্ত্রণ করতেন বাবা। সেবার বাবা লক্ষ্য করলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁর নিমন্ত্রণে আসেননি। বাবা নিজের জুড়িগাড়ি করে গেলেন তাঁর বাড়িতে। আমিও ছিলাম বাবার সঙ্গে। ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর সামনে গাড়ি দাঁড়াল, বাবা নেমে গেলেন। আমি গাড়িতে বসে রইলাম। গাড়িতে বসেই সব দেখতে পাচ্ছিলাম। সাহেব বেরিয়ে আসতেই বাবা খুব ঝুঁকে সেলাম করে কি যেন বলতে লাগলেন আমি শুনতে পাইনি। মনে হল বাবা ওঁর কাছে কৃপা ভিক্ষা করছেন। সাহেব পাঁচ মিনিটের জন্য এসেছিলেন।

বাবার কাছে আমি থাকতে পারিনি। প্রথমেই একটা কথা লেখা উচিত, আমি স্বাধীনচেতা লোক। বাবার হুকুম বর্ণে বর্ণে না মানলে তাঁর বাড়িতে থাকা অসম্ভব দেখে খুব ছেলেবেলায় বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে ছিলাম আমি। আর ফিরিনি। মা ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিলেন। বাবা রক্ষিতা রেখেছিলেন একটি। আমাকে ফিরবার জন্য অনুরোধ করে কয়েক সপ্তাহ কাগজে তিনি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। দু'একটা বিজ্ঞাপন আমার চোখেও পড়েছিল। কিন্তু ফিরে যাওয়ার প্রবৃত্তি হয়নি। তারপর থেকে নানা জায়গায় ঘুরেছি। নানা জায়গায়। যখন পালিয়েছিলাম তখন আমার বয়স বারো। চেহারাটা যতদিন ভদ্র ছিল ততদিন অসুবিধা হয়েছিল। কাজ জুটত না। প্রথম প্রথম ভিক্ষেও করতে পারতাম না। লজ্জা করত। একটা ধর্মশালায় ছিলাম কয়েকদিন। সেখানে দেখা হল নরেশবাবুর সঙ্গে। তিনি বললেন—আমার একজন চাকরের দরকার। তিনি পশ্চিমের একটা শহরে থাকতেন। শহরের নামটা আর লিখব না। তাঁর সঙ্গে গেলাম সেই শহরে। সেখানে

থাকলাম কিছুদিন তাঁর কাছে। কিন্তু বেশি দিন থাকতে পারলাম না। লোকটি ব্যবসাদার। ধনী লোক। কিন্তু ভারী অহঙ্কারী আর রাগী। বউ বাঁজা। মোটা থসথসে কালো চেহারা। নাকে একটা নথ। বউটার সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহার করতেন নরেশবাবু। যা মুখে আসত তাই বলে গাল দিতেন। হারামজাদী, খচরি, লক্ষ্মীছাড়ী, আবাগী—এই সব। একদিন দেখলাম চাবুক দিয়ে মারছেন। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, রুখে দাঁড়ালাম। চাবুকটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ফেলে দিলাম। বললাম, আপনি পাষণ্ড, আপনার বাড়িতে আমি চাকরি করব না। নরেশবাবু জুতো ছুঁড়ে মারলেন আমাকে। জুতোটা কিন্তু আমার লাগল না। আমি বেরিয়ে গেলাম বাড়ি থেকে। তিনিও একটু পরে দোকানে বেরিয়ে গেলেন। আমি বাড়ির আশেপাশেই ঘুরঘুর করছিলাম। গিন্নীমা আমাকে ডেকে খেতে দিলেন। তারপর বললেন, তুমি বাবা আমার একটা উপকার করবে? বললাম, বলুন কি করতে হবে। তিনি তখন বললেন, 'আমি আর এখানে থাকতে পাচ্ছি না। তুমি আমাকে আমার বাপের বাড়ি পৌঁছে দাও। মোকামায় আমার দাদা রেলে কাজ করেন, সেইখানে পৌঁছে দাও আমাকে।' বললাম, বেশ চলুন। গিন্নীমা এক কাপড়েই বেরিয়ে পড়লেন আমার সঙ্গে। তাঁকে তাঁর দাদার কাছে মোকামাতে পৌঁছে দিলাম। তিনি আমাকে দশটি টাকা দিলেন। তারপর বললেন, তুমি বাঁশজোড়া যাবে? সেখানে আমার দিদি থাকেন, আমার ভগ্নীপতি সেখানে ডাক্তার। তিনি খুব ভালো লোক, জামাইবাবুও। তিনি এখানে চিঠি লিখেছেন একটা ভালো চাকর যোগাড় করে পাঠাতে। তুমি তাঁদের কাছে থাক না গিয়ে। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি একটা। তিনি একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছেন।

'আমাকে কি খুব বিশ্বাসী মনে করেন'—এ কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি মুচকি হাসলেন একটু। তারপর বললেন, 'করি'।

বিজয়াদি ধমকে উঠলেন—'সবটা খেয়ে ফেললি, স্নেহের জন্যে রাখলি না একটুও! কি রাক্কোস রে তুই। বঁটি দিয়ে আধখানা কেটে নিলেই হত'।

মুখ গোঁজ করে রইলাম। ইচ্ছে করে রাখিনি। রোজই আমার খাবার থেকে খানিকটা রেখে দিতাম স্নেহময়ীর জন্য। কিন্তু কাল শুনলাম বাবু আড়ালে বিজয়াদিকে বলছেন, 'ছোকরাটা খলিফা মনে হচ্ছে। স্নেহের সঙ্গে জমাবার চেষ্টায় আছে। একটু নজর রেখ'

বিজয়াদি হেসে জবাব দিলেন, 'জমাক না। স্নেহকে আমরা তো কেউ ভালোবাসি না। দায় বলে মনে করি। ও যদি একটু ভালোবাসে বাসুক—'

'বেশ বাসুক। কিন্তু ঝামেলা আমি পোয়াতে পারব না শেষে যদি কিছু হয়—'

কর্তা বেরিয়ে গেলেন।

স্নেহময়ী এদের গলগ্রহ। বিজয়াদি ওকে খেতে পরতে দিতেন, গালমন্দও দিতেন যথেষ্ট। প্রায়ই বলতেন, 'বানে সবাই ভেসে গেল, তুই কেন বেঁচে রইলি মুখপুড়ি'

মুখপুড়ি কিছুই বলত না, পাঁশগাদায় বসে একমনে বাসন মাজত মাথা হেঁট করে। স্নেহময়ী বিজয়াদির বাপের বাড়ির আত্মীয়। আত্মীয়তাটাও বিশুদ্ধ নয়। ওর বিধবা কাকীর জারজ মেয়ে স্নেহময়ী। বিজয়াদির বাবা বিপত্নীক ছিলেন। তিনি ভ্রষ্টা কাকীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেননি। কাকীই কর্ত্রী ছিলেন বিজয়াদির বাপের বাড়িতে। স্নেহময়ীকে নিজের মেয়ের মতোই মানুষ করেছিলেন বিজয়াদির বাবা। লেখাপড়াও শিখিয়েছিলেন কিছু। বাংলা, ইংরেজী, অঙ্ক মোটামুটি

জানত। বিজয়াদির বাবা বেঁচে থাকলে স্নেহময়ীর চেহারা হয়তো অন্যরকম হত। কিন্তু দামোদরের প্রবল বানে তিনি ভেসে গেলেন। বাড়িসুদ্ধ সবাই ভেসে গেল, রইল শুধু স্নেহ। বিজয়াদি খবর পেয়ে নিয়ে এলেন তাকে। পেটভাতায় ভালো ঝি পেয়ে গেলেন একটা। স্নেহময়ীর বয়স তখন দশ বছর। কিন্তু দেখলাম সমস্ত সংসারের ভারটা ওই সামলায়। বিজয়াদির ছেলে খোকনকে পর্যন্ত। খোকনটা এমন বিরক্ত করত তাকে। চুল ধরে টানত, খামচে দিত, কামড়ে দিত, আদুরে জেদী ছেলে। সব হাসিমুখে সহ্য করত স্নেহময়ী...।

যখন খবরের কাগজ ফেরি করতাম তখন আলাপ হয়েছিল ওক্‌লুর সঙ্গে। সে-ও ফেরিওলা ছিল। আপেল ফেরি করত। দমদমে একটা ছোট ঘর ভাড়া করে থাকত সে। আমাকেও আশ্রয় দিয়েছিল সেখানে। বলেছিল তোমাকে ভাড়া দিতে হবে না, তুমি আমার ছেলেটাকে দেখো। আমি তো সমস্ত দিন বাড়িতে থাকি না। ছেলেটা সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। কোন্ দিন হয়তো মোটর চাপা পড়ে যাবে, কিংবা হারিয়ে যাবে। তোমার কাজ তো দশটা এগারোটার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। তুমি তারপর যদি ওর একটু দেখাশোনা কর, নিশ্চিন্ত হই। রাজি হয়েছিলাম প্রথমে। কিন্তু পরে দেখলাম ওক্‌লুর ছেলে শুকুলকে দেখাশোনা করা আমার সাধ্যাতীত। সাত আট বছরের ছেলে। দুষ্টু নয় মোটেই। কিন্তু মহা খামখেয়ালী আর ভবঘুরে। যেন আমারই দ্বিতীয় সংস্করণ! রোজই বাড়ি ফিরে দেখতুম শুকুল বাড়ি নেই। তখন তাকে খুঁজতে বেরুতে হত। একদিন দেখি একটা টিনের টুকরোয় দড়ি বেঁধে সেটা নিয়ে ছুটছে আর হেঁচকা টান দিচ্ছে। বললাম, 'কি করছিস তুই?' হেসে বললে, 'ওটাকে ঘুড়ি করেছি। কিন্তু কিছুতেই উড়ছে না—'

'টিনের ঘুড়ি কখনও ওড়ে?'

'ওড়ে না? কেন!'

'কেন জানি না। চল বাড়ি চল। খিদে পায়নি?'

'পেয়েছিল। ও বাড়ির মা আমাকে একখানা রুটি দিয়েছিল তাই খেয়েছি, এখন খিদে নেই'

'চল বাড়ি চল। রাঁধতে হবে—'

আমিই রাঁধতাম। শুকুল আমায় সাহায্য করত। কাঠ এনে দিত। মসলা (গুঁড়ো) এগিয়ে দিত। উনুনে হাওয়া করত। জল নিয়ে আসত ঘটি করে। খেয়েই বেরিয়ে যেত আবার।

আমি খেয়ে ঘুমুতাম একটু। উঠে আবার শুকুলকে খুঁজতে বেরুতাম। একদিন অনেক খোঁজবার পরও শুকুলের দেখা পেলাম না। প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরির পর পাড়ার একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম, শুকুলকে দেখেছিস? সে বললে, ওই পুকুড়পাড়ে যাও সেইখানেই শুকুল আছে। গিয়ে দেখি একটা পুকুরের ধারে বসে আছে। আমাদের বাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে একটা পুকুর ছিল। পুকুরের পাড়ে ছিল একটা ভাঙা বাড়ি। অনেকগুলো উঁচু উঁচু ভাঙা থাম ছিল সেখানে। দেখলাম শুকুল একটা থামের উপরে চড়ে বসে আছে।

'কি রে এখানে বসে কি করছিস'

'বেশ সুন্দর জায়গাটা, তুমিও এস না'

এই ছিল শুকুল।

আর একদিন আর এক কাণ্ড করেছিল। একটা কুকুরছানার গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এসে হাজির। বলে, 'পুষব'।

বললাম, 'আরে আমাদেরই থাকবার জায়গা নেই ওকে রাখবি কোথায়।'

'দিনের বেলায় রাস্তায় থাকবে। রাত্রে আমার পাশে শোবে। আমার খাবারের অর্ধেক ওকে খাওয়াব। কি চমৎকার কালোয় শাদায় রংটা দেখেছ। এই কানের পাশটা দেখ—'

আমি আর কিছু বললাম না তখন।

দিনের বেলা কুকুরটাকে বাড়ির সামনে রাস্তায় টেলিগ্রাফ পোস্টে বেঁধে রাখত। পরিত্রাহি চেঁচাত কুকুরটা। আমার দিনের ঘুম মাথায় উঠল। শুকুল কিন্তু কুকুরটার কাছে বসে থাকত না। সকালে উঠেই বেরিয়ে যেত। টোটো করে ঘুরে বেড়ানোই তার স্বভাব ছিল। তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কুকুরটাকে একদিন আমি পাচার করে ফেললাম। একটা থলির ভিতর পুরে ফেলে দিয়ে এলাম রেলের ওপারে। শুকুল বাড়ি ফিরে এসে মহা কান্নাকাটি জুড়ে দিলে। মিথ্যে কথা বলতে হল তাকে। বললাম, 'দড়ি কেটে পালিয়ে গেছে।'

'তুমি দেখতে পেলে না।'

'আমি তখন ঘুমুচ্ছিলাম।'

'পালিয়ে গেল? এত ভালোবাসতুম, তবু পালিয়ে গেল। আচ্ছা নেমকহারাম তো—'

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর বললে, 'আবার সে আসবে'

কিন্তু আসেনি।

আমার শুকুলের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা করত। মনে হত ওর কাছে অপরাধী হয়ে আছি। এই জন্যেই একদিন সরে পড়লাম ওখান থেকে।

আমি লেবুর টুকরিটা মাথায় করে নিয়ে এলাম। দার্জিলিং থেকে বাবুর বেয়াই পাঠিয়েছিলেন এক ঝুড়ি লেবু। ওঁরা সবাই মিলে খেলেন। পাড়ায় বিতরণ করলেন কিছু হোমরাচোমরাদের বাড়িতে, মানে, সেই সব বাড়িতে যাদের সঙ্গে দহরম-মহরম করলে লাভ আছে কিছু, যাদের 'বাহবা' পাওয়া খুবই আনন্দজনক। পচেও গেল অনেকগুলো লেবু। কিন্তু আমাকে একটাও দিলেন না। আমি যে চাকর। আমি যে মানুষ, আমি যে দেড় মাইল দূর স্টেশন থেকে অতবড় ঝুড়িটা বয়ে আনলাম এসব কথা মুনসেফবাবুর বা তাঁর স্ত্রীর মনে হল না। অথচ দেখেছিলাম ওঁদের বাড়িতে বিবেকানন্দের এবং রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী চকচকে শেলফে সাজানো আছে। আমি যদিও চাকর হয়েই বাহাল হয়েছিলাম, ওই লেবুতে যদিও আমার কিছুমাত্র দাবি বা লোভ ছিল না তবু ওঁদের ব্যবহারে খিঁচড়ে গেল মনটা।

একদিন মুনসেফবাবু 'বেটাচ্ছেলে' বলে আমার উল্লেখ করলেন শুনতে পেলাম আড়াল থেকে। সেইদিন সরে পড়লাম সেখান থেকে।

জীবনে অনেক জায়গায় চাকরি করেছি। কত নাম আর করব। হাওড়ায় হাজারিবাবুর কাছে, শেওড়াফুলিতে পালেদের দোকানে, নশিপুরে এক জমিদারের বাড়িতে, ফটোগ্রাফার নগেন সিংঘির ওখানে, আরও কত জায়গায়। মগরায় এক চাষার বাড়িতেও কাজ করেছিলাম কিছুদিন। ময়রার দোকানেও কাজ করেছি, ফুনশিয়ার কেদার ময়রার কাছে। চমৎকার প্যাঁড়া আর পানতুয়া তৈরি করত, আমিও শিখেছিলাম। কিন্তু বেশি দিন সেখানে থাকতে পারিনি। ফুনশিয়া বেহারে। সেখানে দেখলাম 'বাঙালীয়া'কে মনে মনে ঘেন্না করে সবাই। তাই সেখানে থাকতে পারিনি। এর পর দিনাজপুরের হানিফ মিঞার ওখানে ছিলাম কিছুদিন। কিন্তু যেদিন

দেখলাম ঈদের পরবে ওরা গরু কাটল সেইদিনই চলে এলাম ওখান থেকে। তারপর ছিলাম হলধরবাবু ডাক্তারের কাছে। তিনি 'হেল্‌থ অফিসার' ছিলেন, 'টুর' করতেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হত আমাকে। এ ভদ্রলোকও বিহারী ছিলেন। খুব ভদ্রলোক। কিন্তু তিনি যা খেতেন আমার তা ভালোও লাগত না, পেটেও সইত না। দিনের বেলাটা তিনি ছাতু খেয়েই কাটিয়ে দিতেন। রাত্রে খেতেন 'রোটি' আর 'শাক' মানে নিরামিষ একটা যা হোক কিছু। তার সঙ্গে আচার। এরপর দুধ খেতেন আধ সের। তিনি যা খেতেন আমাকেও তাই খেতে হত। আমার জন্যেও দুধ কিনতেন তিনি। কিন্তু মাছ ভাতের জন্য আমার বাঙালী প্রাণ কাঁদত। রাত্রে তাঁর গা-হাত-পা টিপে দিতে হত। এটাও আমার ভালো লাগত না। তেলও মাখাতে হত তাঁকে ডলাই মলাই করে। এটাও অপছন্দ ছিল আমার। তাই শেষ পর্যন্ত সেখানকার চাকরি ছেড়ে এক বাঙালী বাবুর বাড়িতে এসে বাহাল হলাম। নাম চিন্ময়বাবু। মাছ-ভাতের প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু এখানেও হতাশ হতে হল। দেখলাম তিনি এক পো'র বেশি মাছ কেনেন না। বাড়িতে খাওয়ার লোক পাঁচজন। আমার ভাগে কিছু পড়ত না। শুনলাম চিন্ময়বাবু বাজেট অনুসারে চলেন। এক পোয়ার বেশি মাছ কোনো দিনই কিনবেন না। বড় মনোকষ্টে দিন কাটাচ্ছিলাম, এমন সময় ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। সৈরভির আবির্ভাব ঘটল আমার জীবনে। আধুনিক ভাষায় তাকে 'তরুণী' বলা যেতে পারে, গ্রাম্য ভাষায় বললে বলতে হয় 'ডবকা ছুঁড়ী'। চিন্ময়বাবুর বাড়ির ঠিকে ঝি সে। এসে বাসন মেজে দিয়ে চলে যায়। আমার বয়স তখন কুড়ি পার হয়ে গেছে, গোঁফ গজিয়েছে। দেখতে দেখতে ভাবসাব হয়ে গেল সৈরভির সঙ্গে। আমার দুঃখের কথা শুনে সৈরভি বললে, হায়, হায়, এরা তোমাকে মাছ-ভাত খাওয়াবে? নিজেরাই তো খেতে পায় না। পিঁপড়ে টিপে গুড় বার করে। তুমি এখানে শুকো একটা মাইনে ঠিক করে নাও। আমি তোমার মাছ-ভাত খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেব। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি করে করবে? সৈরভি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—সে ভাববার তোমার দরকার কি! সে ব্যবস্থা আমি করব। সে ভার আমার। চিন্ময়বাবুকে বললাম একদিন। তিনি শুকো ব্যবস্থায় আমাকে রাখতে রাজি হলেন না। সৈরভি বললে, তুমি ছেড়ে দাও এ চাকরি। ফ্যাক্টারির বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ আছে, সেখানে ঢুকিয়ে দিতে পারব তোমাকে। ফ্যাক্টারির বড়বাবু প্রবীণ মৃত্যুঞ্জয় বোসের বাড়িতেও কাজ করত সৈরভি। বাবা বলে ডাকত তাঁকে। সৈরভি নাছোড় হয়ে ধরে বসল তাঁকে আমার চাকরির জন্য। বললে, আমার গাঁয়ের লোক, মা-বাবা মরে গেছে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, শেষকালে আমার ঘাড়ে পড়েছে এসে... অনর্গল মিথ্যে কথা বলতে লাগল। কিন্তু ফল হল। ফ্যাক্টারিতে চাকরি হয়ে গেল একটা। আমি সৈরভির কাছেই থাকতে লাগলাম। নিজের কথা রেখেছিল সে। দু'বেলা পেট ভরে মাছ-ভাত খাওয়াত আমাকে। নিজেই রাঁধত। চমৎকার রাঁধত। দু'বছর ছিলাম তার কাছে। একটি ছেলে হয়েছিল। সৈরভিই তার নাম রেখেছিল সুরেশ। সুরেশ বলে একটি ছেলের সঙ্গে তার ছেলেবেলায় নাকি ভাব ছিল। তারই স্মৃতিকে সে নিজের ছেলের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল। সে নিজেই কিন্তু হঠাৎ মরে গেল একদিন কলেরায়। অনেক চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারিনি তাকে। তার পর থেকে আমি মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু বিপদে পড়ে গেলাম এক বছরের ছেলে সুরেশকে নিয়ে। সুরেশ যে আমারই ছেলে তা আমি হলফ করে বলতে পারব না। সৈরভি অনেক লোকের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করত। অনেকের সাথে ভাবও ছিল

তার। আমার সে বিয়ে করা বউ ছিল না, সুতরাং তার ওপর আইনত কোনো জোর ছিল না আমার। থাকলেও যে তাকে বেঁধে রাখতে পারতুম তা মনে হয় না। সে ছিল ঝরনার মতো, চারিদিকে নিজেকে ছিটিয়ে ছড়িয়ে থাকতে ভালোবাসত। তবু রেগে মেগে মারধোর করতাম মাঝে মাঝে। কিন্তু তাকে ছাড়িনি, ছাড়তে পারিনি। ওর মধ্যে কি এমন একটা ছিল যে ওকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারতাম না। এর নামই কি ভালোবাসা? জানি না ঠিক। সৈরভিও আমাকে ছেড়ে কোথাও চলে যায়নি, আমার কাছেই বরাবর থেকেছে। আর কি সেবাযত্নই করত আমার! ... এই সময় আমার ভাগ্যোদয় হল। ফ্যাকটারির মালিক মরিসন সাহেবের মেম হঠাৎ একদিন একটা কুয়োয় পড়ে গেলেন পাখি দেখতে গিয়ে। মাঠের মাঝখানে ঘাসে ঢাকা কুয়োটা ছিল, তিনি দেখতে পাননি। মেমসাহেব রোজ 'বাইনোকুলার' নিয়ে পাখি দেখে বেড়াতেন মাঠে মাঠে। সঙ্গে থাকত তাঁদের বেয়ারা মিঠুয়া, দশ বারো বছরের ছেলে একটা। সে ছুটে এসে খবর দিলে, আমরা সবাই গেলাম সেখানে। মরিসন সাহেবও গেলেন। কিন্তু কি করে ওই এঁদো কুয়ো থেকে মেমসাহেবকে উদ্ধার করা যায় তা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। দেখলাম কুয়োর ভিতর কেউ নামতে রাজি নয়। সবাই হাঁকডাক আর সরফরাজি করতেই ব্যস্ত। মরিসন সাহেব বললেন, তিনিই নাববেন। তখন আমি বললাম, আমাকে আগে নাবিয়ে দিন সাহেব। দেখি আমি কিছু করতে পারি কি না। আমার কোমরে একটা শক্ত দড়ি বেঁধে আমাকে নামিয়ে দিল সকলে। মেমসাহেবের তেমন কিছু হয়নি। চেঁচিয়ে বললাম, একটা লম্বা বাঁশের সিঁড়ি নামিয়ে দাও। মেমসাহেব উঠে যেতে পারবেন। তাই হল। মেমসাহেবের কপালে একটু চোট লেগেছিল। দু'দিনেই সেরে উঠলেন। সাহেব জাত অকৃতজ্ঞ নয়। মরিসন সাহেব আমাকে বললেন, তোমার উপর আমি খুব খুশি হয়েছি। তোমাকে উঁচু পোস্টে প্রমোশন দিতে চাই। আসামে আমার একটা ফ্যাক্টারি আছে। তুমি যদি সেখানে যেতে চাও সেখানেই পাঠাব তোমাকে। সেখানে একজন ভালো ম্যানেজার চাই। ভালো ম্যানেজারের অভাবে ফ্যাক্টারিটা চলছে না ভালো। তুমি যদি যাও তোমাকেই ম্যানেজার করে দেব। মাইনে পাবে আড়াই শ' টাকা, তাছাড়া ফ্রি কোয়ার্টারস্। রাজি আছ তো? বাজি হয়ে গেলাম। সুরেশও আমার সঙ্গে রইল। তাকে রেখে যাব কোথায়?

গৌহাটিতে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল স্নেহময়ীর সঙ্গে। সেই স্নেহময়ীকে, যে বাসন-মাজা ঝি ছিল। সে এখন একটা প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করছে। পরনে মোটা থান কাপড়। মাথায় সিঁদুর নেই। শুনলাম সে বিজয়াদির ওখানে বেশিদিন থাকতে পারেনি। শেষকালে নাকি মারধোর করত। বিজয়াদির স্বামীর চালচলনও ভালো লাগছিল না তার। একদিন সে পালিয়ে গেল। পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল চুঁচুড়ার ভাদুবাবুর বাড়িতে। ভাদুবাবু মাস্টার, খুব ভালো লোকও। ভাদুবাবুর বাড়িতে সামান্য কাজ করত, ফাইফরমাশের কাজ। তার পর ক্রমে ক্রমে ভাদুবাবুর আপন লোক হয়ে গেল সে। তাকে লেখাপড়া শেখালেন ভাদুবাবু। স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করল সেখান থেকে। তারপর তার জীবনের ধারা বদলে গেল। ভাদুবাবুর এক বন্ধুর পত্নীবিয়োগ হল। ছেলেপিলে হয়নি তাঁর। কিন্তু ক্রমশ নিঃসঙ্গ জীবন বিস্বাদ হয়ে উঠল তাঁর। ভাদুবাবুকে লিখলেন একটি বয়স্থা গরিবের মেয়ে যদি পাই বিয়ে করি। ভদ্রলোক মাসে দেড় শ' টাকা মাহিনা পান। টিউশনি করে আরও শ'খানেক টাকা রোজগার করেন। বয়স পঞ্চাশ। ভাদুবাবু স্নেহময়ীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার যদি আপত্তি

না থাকে তাহলে ওইখানেই তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলি। ভাদুবাবুর স্ত্রী বললেন, এখ্খনি কর। বিয়ে হলে ওর একটা হিল্লে হয়ে যাবে। স্নেহময়ী বললে, আপনারা যা বলবেন আমি তাই করব। কিন্তু জাতে আমি সদগোপ। উনি তো শুনছি ব্রাহ্মণ, উনি আমাকে বিয়ে করবেন কি করে। ভাদুবাবু হেসে বললেন, ব্রাহ্মণের মূর্ধন্য ন'টা তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি ব্রাহ্ম। জাতটাত মানেন না। তুমি যদি রাজি থাক আমি তাঁকে চিঠি লিখতে পারি। লোক খুব ভালো। গৌহাটিতে তাঁর বাড়ি আছে, কিছু জমিজমাও আছে। স্নেহময়ী বললে, আপনি আমার বাবার মতো। আপনি যা ঠিক করবেন তাই হবে। বিয়ে হয়ে গেল। স্নেহময়ী দাসী রূপান্তরিতা হল স্নেহময়ী গাঙ্গুলীতে। কিন্তু মেয়েটার অদৃষ্টে দাম্পত্যসুখ ছিল না। বিয়ের মাস ছয়েক পরেই গাঙ্গুলীমশাই হৃদ্‌রোগে মারা গেলেন। তাঁর তিন কুলে কেউ ছিল না। সুতরাং স্নেহময়ীই তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হয়ে গেল। কিছুদিন পরে ওখানের একটা মেয়ে স্কুলে চাকরিও পেয়ে গেল সে। একটা কোন্ অনাথ-আশ্রমের সঙ্গেও যোগাযোগ হল ওর। সেখানে অনাথ ছেলে-মেয়েদের খুব সেবাযত্ন করত। কিছু অর্থ সাহায্যও করত।

রূপান্তরিতা স্নেহময়ীকে দেখে আমার খুব ভালো লাগল। স্নেহময়ীও আমাকে দেখে খুব খুশি। বললে, তোমার কথা প্রায়ই মনে পড়ত। তুমি যে এমনভাবে হঠাৎ এসে হাজির হবে তা ভাবতেই পারিনি। ফ্যাকটারিতে কাজ পেয়েছ? কোথায় থাকবে?' বললাম, 'সেখানে আমার কোয়ার্টাস আছে। মুশকিলে পড়েছি আমার ছেলেটাকে নিয়ে। আমি তো সমস্ত দিন ফ্যাকটারিতে থাকব। ওর দেখাশুনা করবে কে, ভাবছি একটা চাকর রেখে দেব—'

'তোমার বউ কোথা'

'আমার বউ ছিল না কেউ।'

'তাহ'লে ছেলে হল কি করে'

'কপাল ভালো, তাই বিয়ের ঝক্কি না পুইয়েই ছেলে পেয়ে গেছি একটা। যার গর্ভে জন্মেছিল সে তো মরে গেছে। আমাকে একটা চাকর যোগাড় করে দাও না'

তোমার ছেলে আমার কাছেই থাক। আমার একটা ভালো ঝি আছে, সেই দেখাশুনা করবে। আমিও করব'

'তুমি পারবে?'

'পারব না কেন। আমার নিজের ছেলেপিলে হয় নি কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের আমি খুব সামলাতে পারি। মনে নেই বিজয়াদির ছেলেকে তো আমিই সামলাতুম। একটা অনাথাশ্রমের ভার আমার উপর। সেখানকার ছেলেমেয়েরা খুব ভালোবাসে আমায়। তোমার ছেলেও থাক আমার কাছে।'

সুরেশ স্নেহময়ীর কাছে রইল। আমি প্রায় রোজই আসতে লাগলাম তার বাড়িতে। রোজ স্নেহময়ীর বাড়িতে আসার ফলে যা ঘটবার তাই ঘটল। স্নেহময়ীর নামে কুৎসা রটাতে লাগলেন আমাদের সমাজের অনারারি অভিভাবকগণ। আমি জানি স্নেহময়ীর মনে পাপ ছিল না। কিন্তু আমার মন যে নিষ্পাপ ছিল তা আমি হলফ করে বলতে পারব না। আমি যে তার সম্বন্ধে নির্বিকার নই একথা সে বুঝত, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনোরকম প্রশ্রয় দেয়নি সে আমাকে। একদিন হঠাৎ সে বলল, 'হারুদা, তুমি বিয়ে কর। পুরুষমানুষের বউ দরকার। একটি লক্ষ্মী বউ

ঘরে আন, সে সুরেশের দেখাশোনাও করবে, তোমারও করবে। ভালো চাকরি হয়েছে, থিতু হয়ে বস এইবার'

আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

'লক্ষ্মী বউ পাব কোথায়। লক্ষ্মী লাখে একটা হয়, সে আমার গলায় মালা দেবে কেন। এখন বিয়ে করলে অলক্ষ্মীই জুটবে একটা, শান্তির চেয়ে অশান্তিই বেশি হবে। বেশ আছি। সুরেশকে তুমি মানুষ কর, যা খরচ লাগে আমি দেব'

'আহা খরচের জন্যেই যেন আটকে যাচ্ছে সব। তোমার নিজের জন্যেই যে একটি বউ দরকার। সুরেশের ভার না হয় আমি নিলাম, কিন্তু তোমার ভার কে নেবে'

'কেন তুমি'

'আমি পারব না। একটি ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে কর'

'ভালো মেয়ে পাবো কোথায়'

'আমার সন্ধানে আছে একটি ভালো মেয়ে'

'কোথায়'

'অনাথ আশ্রমে। খুব লক্ষ্মী মেয়ে। আমি তাকে ছেলেবেলা থেকে জানি। আশ্রমের লোকেরা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিল তাকে। আমি যখন আশ্রমের সম্পর্কে এলাম তখন ওর বয়স পাঁচ বছর। তখন থেকেই দেখছি আমি মেয়েটিকে। খুব ভালো মেয়ে। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। এখন বয়স ষোল বছর। আমরা ভাবছি ওর বিয়ে যদি না দিতে পারি তাহলে ওকে নার্সিং শেখাবার জন্যে কোথাও পাঠাব। তুমি বিয়ে কর ওকে—'

'অনাথাশ্রমের মেয়ে যখন তখন বাপ মার ঠিক নেই?'

'না তা নেই। রাস্তায় কুড়োনো মেয়ে। কিন্তু ও যে ভালো বংশের মেয়ে তা বোঝা যায়।'

'কি করে?'

'চালচলন চেহারা থেকে। অ্যালসেসিয়ান কুকুরবাচ্চাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেলেও তাকে চিনতে ভুল হয় না সে যখন বড় হয়। তুমি জাত মান নাকি'

'আমি নিজেকে ছাড়া কাউকে মানি না। আচ্ছা ভেবে দেখব।'

স্নেহময়ীর পীড়াপীড়িতে বিয়ে করতে হল শেষ পর্যন্ত। ভালোই লাগল। অনেক দিন থেকেই একটা মেয়েমানুষের অভাব বোধ করছিলাম। কুড়োনী দেখলাম চৌখশ মেয়ে। রূপ তো চোখধাঁধানো। স্নেহময়ী ওর নাম দিয়েছিল যমুনা। আমি সেটাকে সংক্ষেপ করে মুনা বলেই ডাকতাম তাকে।

এবার মেয়ে হল একটা। তার মা তার নাম রাখল শিলু। আমি যে বাড়িতে থাকতাম তার ছাতের উপর শিলের মতো একটা চওড়া পাথর পাতা ছিল। শিলুর বয়স যখন দু'মাস, তখন শীতকাল। যমুনা ওকে সেই শিলের উপর রোদে শুইয়ে দিত। আর পাশে বসে সে হয় বড়ি দিত, না হয় সেলাই করত, না হয় বই পড়ত। শিলের উপর শুয়ে থাকত বলে ওর নাম হল শিলু। শুনেছি সেই নাম বদলে শিলু এখন শ্রীলতা হয়েছে। শ্রীলতা। হা হা হা হা। যমুনার মেয়ে শ্রীলতা। লতা বলেই কাছে যে গাছটা পেয়েছিল তাকেই আঁকড়ে ধরেছে। যমুনাকে আমি বুঝতে পারিনি কোনো দিন। মনে হত স্নেহময়ীর হুকুমে সে যেন আমাকে বিয়ে করেছে। নিখুঁত কাজকর্ম, ব্যবহারও অনিন্দনীয়, কোথাও কোনো ভুলচুক নেই, কিন্তু তার এই কেতা-

দুরস্ত লেফাপা ছাড়া আমি আর কিছুই পাইনি। আমি মানুষটাকে চিনতেই পারিনি। বুঝতে পারতাম আমাকে সে ভালোবাসে না, আমার প্রতি তার মমতা নেই। শিলুর প্রতিও ছিল না। নিখুঁতভাবে আমাদের দুজনেরই সেবা সে করত। তারপর খাঁচার দুয়ার একদিন খুলে গেল। তথাকথিত একটি বিদ্বান ছোকরার সঙ্গে পালিয়ে গেল একদিন। ওখানকার তেলের পাম্পের একজন লোক। আমার কাছে নানা দরকারে প্রায়ই আসত ছোকরা। বেশ একটু কবি-কবি ভাব। প্রায়ই কোনো-না-কোনো ছুতোয় বাড়ির ভিতরে চলে গিয়ে বলত—একটু চা খাওয়াবেন? যমুনা তাকে চা খাওয়াত। এইভাবে শুরু হয়েছিল শেষ হল পলায়নে। ঘন ঘন আসত ছোকরা। যমুনা রূপসী ছিল সত্যিই। সাহিত্য, রাজনীতি নিয়ে আলোচনাও করত ওরা। এমন সব আলোচনা যা আমার নাগালের বাইরে। কিন্তু হঠাৎ পালিয়ে যাবে তা আন্দাজ করতে পারিনি। কিন্তু গেল। খুব যে একটা মুষড়ে পড়েছিলাম তা নয়, বরং মনে মনে বলেছিলাম, যাকগে। মানুষের সমাজে শুধু প্রজাপতিরা নয়, ফুলেরাও ওড়ে। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করিনি। স্নেহময়ীকে গিয়ে বললাম, 'তোমার লক্ষ্মী মেয়ের কাণ্ড দেখ। আমি এখন ওই কচি মেয়েটাকে নিয়ে কি করি বল তো। কি ঝামেলায় আমায় ফেললে বল দেখি।'

স্নেহময়ী শান্ত কণ্ঠে বললে, 'ওদের আমার কাছে রেখে যাও। আমিই ওদের মানুষ করব।'

'বেশ'

সুরেশ আর শিলুকে দিয়ে এলাম তার কাছে। তারপর গৌহাটি ত্যাগ করলাম। গৌহাটির আলো বাতাস আর ভালো লাগছিল না। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে গেলাম একদিন হঠাৎ। স্নেহময়ীকে না জানিয়েই।

তোমার চোখের প্রখর দৃষ্টিটা যে আমার উপর নিবদ্ধ হয়ে আছে তা অনুভব করছিলাম, কিন্তু একটু পরে সেটা মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে, আর সহ্য করতে পারছি না। রগের উপর যেন ছুঁচ বিঁধছে। মুখ তুলে চাইলাম। দেখলাম টেবল্ ল্যাম্পের আলোটা ঠিক রগের উপর পড়েছে। সরিয়ে দিলাম ল্যাম্পটা। চোখে পড়ল কয়েকটা গোলাপ ফুল। আড়ালে ফুলদানি ছিল ল্যাম্পটা সরাতেই সেটা আত্মপ্রকাশ করল। মালী কাল বিকেলে কয়েকটা আধফুটন্ত গোলাপ-কুঁড়ি রেখে গিয়েছিল। দেখলাম সেগুলি সব ফুটেছে। তাদের প্রসন্ন হাসিতে হঠাৎ তোমার কথা শুনতে পেলাম।

'তুমি যদি আমার কথা শুনে শ্রীলতার বাবার ডায়েরিটা না পড়তে তাহলে তোমার হয়তো স্বাধীন সত্তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হত, যে স্বাতন্ত্র্যের জন্য তুমি সৃষ্টির একটি বিশিষ্ট স্বতন্ত্র জীব হয়তো সে স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে তুমি অসংখ্য সাধারণ ধূলিকণার মতো স্বাতন্ত্র্যহীন ধূলিকণা হয়ে যেতে। কিন্তু আমার প্রশ্ন ডায়েরিটা পড়ে যে অপ্রত্যাশিত খবরটা পেলে তার জন্যে কষ্ট হচ্ছে তোমার। সত্য জানতে হলে তার দাম দিতে হয়, ওই কষ্ট-পাওয়াটাই তার দাম। কিন্তু তোমার কষ্টই বা হচ্ছে কেন! শ্রীলতা কার মেয়ে, তার মায়ের চরিত্রই বা কি ছিল এ নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন! ও তোমার আপিসের টাইপিস্ট, টাইপিস্ট হিসেবে সে ভালো, তার ব্যবহারও অনিন্দনীয় এর চেয়ে তার বেশি পরিচয় জানবার কি প্রয়োজন আছে? ভালোবেসেছ নাকি ওকে? যদি ভালোই বেসে থাক তাহলে তো কোনো পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। তোমার ভালোবাসার জাদুমন্ত্রে ও তো মহিয়সী হয়ে উঠবে তোমার চোখে, ওর তুচ্ছতাও মহনীয় হয়ে

উঠবে তোমার কাছে, ওর ক্ষুদ্রতাকেও মহত্ত্ব মনে হবে প্রেমের মানদণ্ডে মাপলে। প্রেম নয়? কাম? ইংরেজীতে যাকে বলে লাস্ট (lust), তাই না কি। তাহলেই বা ওর কুলজী জানবার প্রয়োজন কি। যারা বারবনিতার কাছে কামের ক্ষুধা মেটাবার জন্যে যায় তারা কি তাদের কোষ্ঠী বিচার করে যায়? রেস্তোরাঁয় বসে তুমি যখন কাটলেটে কামড় দাও তখন কি নিঃসন্দেহ হতে চাও মাংসটা পাঁঠার, ভেড়ার, কুকুরের না গরুর? দোকানী যা বলে তাই বিশ্বাস কর। তাছাড়া অপবিত্রকে পবিত্র করে দেবার ক্ষমতা আছে কি তোমার? পরাশর মুনির যেমন ছিল। তিনি মৎস্যগন্ধাকে পদ্মগন্ধা করতে পেরেছিলেন, কুজ্ঝটিকা আর দ্বীপ সৃষ্টি করে জন্ম দিয়েছিলেন দ্বৈপায়নের। সে ক্ষমতা আছে তোমার? লোভটুকুই তো তোমার সম্বল। দূরে দাঁড়িয়ে হ্যাংলার মতো ওষ্ঠলেহন করছ খালি। তার বেশি কিছু করবার ক্ষমতা আছে কী তোমার? হা—হা—হা—হা—হা।

দূরে হায়নাগুলো ডাকছে।

মনে হল তুমি হাসছ।

আবার ডায়েরিতে মন দিয়েছি।

ট্রেনেই মুকুন্দ ঘোষের সঙ্গে ঘুষোঘুষি হল। থার্ড ক্লাসে খুব ভিড় ছিল। দুজনেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলাম পাশাপাশি। বাথরুমে যাবার সময় তার পা-টা মাড়িয়ে ফেলেছিলাম। সে বলে বসল—শালা, দেখে চলতে পার না। বাথরুম সেরে এসে আমি তার কথার জবাব দিলাম। বললাম, তুমি শালার বেটা শালা। সঙ্গে সঙ্গে এক ঘুষি ঝেড়ে দিলাম তার নাকের উপর। সে-ও এলোপাতাড়ি ঘুষি চালাতে লাগল। আমার সামনের দাঁত ভেঙে গেল একটা। দুজনেই রক্তারক্তি। মিনিট দুইয়ের মধ্যেই দু'জনের জামার সামনেটা রক্তে ভিজে গেল। হইহই করে উঠল প্যাসেঞ্জাররা সব। পরের স্টেশনে পুলিশ এল। ধরে নিয়ে গেল আমাদের দুজনকেই। সেই সময়ই বুঝতে পারলাম মুকুন্দ ঘোষ টাকার কুমির। অনায়াসে কোমরের গেঁজে থেকে অনেক টাকা বের করে ফেললে। পুলিশদের পান খাওয়ার খরচ বাবদ যা দিলে তাতে একটা ছোটখাটো সংসার এক মাস চলে যায়। দু'শ টাকা নেহাত কম নয়। পুলিশ ছেড়ে দিলে আমাদের দুজনকেই। আমি চলে যাচ্ছিলাম, মুকুন্দ ঘোষ ডাকলে—এই শোন। ফিরে দাঁড়ালাম। মুকুন্দ ঘোষ ফিক করে হেসে বললে, 'আয়, মারামারি তো অনেক হল এবার কিছু খাওয়া যাক।' রক্তাক্ত নাকটা স্টেশনের কলের জলেই ধুয়ে নিলে সে। আমিও কুলকুচো করে ফেললাম কয়েকটা। দাঁতের রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। তারপর স্টেশনের ভেন্ডারের কাছ থেকে গোটা বিশেক রসগোল্লা কিনে ফেললে মুকুন্দ। দশটা আমাকে দিলে, দশটা নিজে খেলে। খেতে খেতে বললে, 'তোর কবজির জোর দেখে খুশি হয়েছি, কি করিস?'

বললাম, 'আগে চাকরি করতাম, এখন কিছুই করি না।'

'চাকরি গেল কেন। সেখানেও মারপিট করেছিলি নাকি।'

'সে খবরে তোমার দরকার কি?'

'দরকার আসলে একটি শক্তসমর্থ ভালো লোকের। তোর কবজির জোর দেখে খুশি হয়েছি। ভাবছি'

তারপর শেষ রসগোল্লাটি মুখে ফেলে দিয়ে সেটি গলাধঃকরণ করে হাসিমুখে আমার দিকে চেয়ে বললে, 'আমার ফার্মে চাকরি করবি?'

'না, চাকরি আর করব না কোথাও'

'কি করবি তাহলে। খালি মারপিট করে বেড়াবি? ঘরে রেস্ত আছে বুঝি'

'কিচ্ছু নেই'

'তবে? পেট চলবে কি করে?'

'কুলিগিরি করব'

'ও কাজটা মন্দ নয়। আমিও করেছিলাম কিছুদিন। তারপর যখন অসুখে পড়ে গেলাম, দেখলাম হাতে একটি পয়সা নেই। পাড়ার ডাক্তারবাবুর কৃপায় বেঁচে উঠলাম। মনে হল একটা বাঁধা চাকরি করাই ভালো। একটা মোটর পার্টসের দোকানে চাকরি নিলাম। এখন ব্যবসা করি—'

'কিসের ব্যবসা'

'ওই মোটর পার্টসেরই। মল্লিক বাজারে বড় দোকান আছে আমার। একলা পেরে উঠি না। যারা কাজ করে তারা সব কটাই তালপাতার সেপাই আর সব কটাই ফাঁকিবাজ। কেবলই বলে মাইনে বাড়িয়ে দাও। দোকানে একদিন কয়েকটা গুন্ডা এসে হামলা করলে—সব ব্যাটা সটকে পড়ল। আমি একাই যতটা পারি সামলাই। কড়ে আঙুলটা জখম হয়ে গেল।'

কড়ে আঙুলটা দেখালে আমাকে। দেখলাম বেঁকে গেছে।

বলতে লাগল, 'সেই থেকে শক্তসমর্থ আর সৎ লোক খুঁজছি আমি। আমাদের দেশে ওইটির বড় অভাব। তোর ঘুষির জোর দেখে মুগ্ধ হয়েছি, এখন তোর মনের জোর আছে কি না, তুই সাঁচ্চা কি না, সেইটে ভাবছি। আসবি তো আয়, আমার সঙ্গে ভিড়ে যা—'

'না, চাকরি করব না'

'পার্টনার হবি? তাতেও আমি রাজি আছি। কিন্তু সাঁচ্চা হওয়া চাই'

বললাম, 'পার্টনার হতে পারি। কিন্তু আপাতত আমার খরচখরচাটা দিতে হবে কিছুদিন'

'তা দেব, তা দেব। তুই তো দোকান চালাবি। যেমন দরকার নিয়ে নিস'

আমি যে সাঁচ্চা লোক সেইটে প্রমাণ করবার জন্যেই আমি বোধ হয় ওর সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। মুকুন্দ দোকান থেকে অনেক পয়সা রোজগার করত। চোরকারবারীদের সঙ্গে প্রচুর দহরম-মহরম ছিল। অনেক ছিঁচকে চোরও পার্টস চুরি করে বিক্রি করে যেত তার কাছে। দাঁও মাফিক সাধারণ জিনিসের তিন চার গুণ দাম নিয়ে নিত। কেন সে একজন সাঁচ্চা পার্টনার খুঁজছিল তা বুঝতে দেরি হল না আমার। বিয়ে করেনি, আত্মীয়স্বজন ছিল না তেমন, বলত আমি খানকীর ছেলে। মদ মেয়েমানুষ নিয়েই থাকত বেশির ভাগ সময়। প্রায়ই দোকানে আসতে পারত না। নির্ভরযোগ্য লোক খুঁজছিল তাই একজন। আমাকে পেয়ে বর্তে গেল সে। রোজ যা বিক্রি হত আর তার থেকে যে লাভ হত তা রোজই সে দিয়ে দিত আমাকে। আমাকে অর্ধেক দিয়েও বাকি যা থাকত তাতে তার মদ আর মেয়েমানুষের খরচ উঠে যেত। যখন কম পড়ত তখন আমার কাছে ধার নিত। আবার শোধ করে দিত। এ বিষয়ে সে-ও খুব সাঁচ্চা লোক ছিল। আমি আসাতে দোকানের সম্পূর্ণ ভার আমার উপর দিয়ে নিজের বেলেল্লাগিরিতে মেতে থাকত মুকুন্দ। দোকানে আর আসত না। একটি অনুগত গুন্ডার দল ছিল তার, তাদের সঙ্গেই থাকত বেশির ভাগ। হঠাৎ হঠাৎ দোকান থেকে উধাও হয়ে যেত

তারপর মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে বা হাতে প্ল্যাস্টার জড়িয়ে এসে হাজির হত আবার। হাসত মুচকি মুচকি। বলত—যুদ্ধে গিয়েছিলাম। পুলিশ মামলাতে মাঝে মাঝে মবলগ টাকাও বেরিয়ে যেত দোকানের ক্যাশ থেকে। মুকুন্দ বলত, ও টাকা আমার নামে খরচ লেখ। সেদিন বুঝলে—বউবাজারের মোড়ে কোথায় গুন্ডামি করেছে তারই গল্প জুড়ে দিত। আমাকে কিন্তু ভালোবাসত খুব। বলত, তুই মরদকা বাচ্চা, অক্ষয় বট, ঠিক খাড়া আছিস। কথা রেখেছিস তোর। কোনোরকম ছিঁচকেমি ধরতে পারিনি। জানিস তোর পিছনে স্পাই রেখেছিলাম?

মুকুন্দ মরে গেল হঠাৎ একদিন। খুন হয়ে গেল একদিন একটা বেশ্যাবাড়িতে। একটা উইল বেরুল তার উকিলের কাছ থেকে। দেখলাম আমাকে তার সর্বস্ব দিয়ে গেছে। অমন চালু দোকানটা পেয়ে গেলাম, তাছাড়া ব্যাঙ্কেও নগদ বিশ হাজার টাকা। আমারও কিছু টাকা জমেছিল। মুকুন্দর যে টাকাটা ব্যাঙ্কে ছিল সেটা সম্ভবত তার মায়ের টাকা। কারণ দেখলাম ব্যাঙ্কে ফুলজানি দাসীর নামে যে অ্যাকাউন্ট ছিল সেইটেই ট্র্যান্সফার্ড হয়েছে তার নামে।

আমি বউবাজারে একখানা ঘর ভাড়া করে থাকতাম। খেতাম হোটেলে। হাতে টাকা হওয়ায় বাড়ি ভাড়া করে ফেললাম একটা। সুরেশ আর শিলুকে নিয়ে এসে স্কুলে ভরতি করে দিলাম। রাঁধুনী বামুন রাখলাম একটা। তারপর...

... হঠাৎ মনে হল দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার। এ কি! আমার চারদিকে কংক্রিটের গাঁথুনি। আমার অজ্ঞাতসারেই কে যেন গেঁথে ফেলেছে আমাকে গলা পর্যন্ত। স্তরে স্তরে গেঁথেছে। নানা স্তরে নানারকম রং। অদ্ভুত বিচিত্র রং সব। তুমি। তোমারই বহুবর্ণ বিচিত্র সত্তা খেয়ে ফেলেছে আমাকে, বেঁধে ফেলেছে, বন্দী করেছে। আমাকে ঘিরে গড়েছে নতুন রকম পিরামিড, রঙিন পিরামিড। ওই পিরামিডের ভিতর কি আমি আছি? পিরামিডের ভিতর তো মড়া থাকে। এই পিরামিডের ভিতর কে আছে...আমি চিৎকার করে উঠলাম। খাতাখানা পড়ে গেল হাত থেকে। পিরামিড কথা কয়ে উঠল।

পিরামিড। তুমি চঞ্চল হয়ে উঠলে কেন। খাতাটা শেষ কর। দেখ শেষ পর্যন্ত শ্রীলতার কি হল। হয়তো তপতীর খবরও ওর মধ্যে পাবে।

আমি। তুমি আমাকে মুক্তি দাও।

পিরামিড। আমি তো তোমাকে বন্দী করিনি

আমি। তবে আমার চারদিকে কংক্রিটের এসব কি

পিরামিড। যা দেখছ তা তুমিই। আমি ওর মধ্যে কোথাও নেই। তুমিই জমে ওইরকম হয়ে গেছ।

তারপর কুহু কুহু করে ডেকে উঠল একটা কোকিল। হাজারিবাগে কোকিল আছে নাকি। ঝিরঝির করে বাতাস ঢুকল জানলা দিয়ে। দেখলাম পিরামিড অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ভোজু এল।

ভোজু আমাদের পুরোনো চাকর। আমাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। জাতে সাঁওতাল। এখন ওকে পেনশন দিয়েছি। এই হাজারিবাগেই থাকে। আমি যখন হাজারিবাগে আসি তখন আমার কাছে এসে থাকে। শিকার ব্যাপারে খুব উৎসাহী। অভিজ্ঞতাও আছে। ভোজু এসে বললে, 'মাচান বাঁধা হয়েছে।'

'হয়েছে? চল তবে যাওয়া যাক আজ'

ভোজু ঘাড় চুলকে বললে, 'আগে থাকতে একটা পাঁঠা ওখানে বেঁধে রাখলে ভালো হত। বাঘটা আসত ঠিক। অমনিই হয়তো আসবে। ওইটেই ওর যাওয়া-আসার রাস্তা। ওখান দিয়েই জল খেতে যায়। কিন্তু পাঁঠা থাকলে—'

বললাম, 'না পাঁঠা বাঁধতে হবে না। শুধু শুধু একটা নিরীহ জীবকে মেরে লাভ কি—'

ভোজু একটা অদ্ভুত হাসি মুখে ফুটিয়ে চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপর বললে, 'বাঘটাই বা তোর কি দোষ করেছে। ওকে মারতে চাইছিস কেন?'

'ও যে বাঘ। ও যে আমাদের শত্রু। মানুষের কি কম অনিষ্ট করে?'

'তবে চল। পাঁঠাও আমাদের শত্রু। আমার শাকের ক্ষেতটা মুড়িয়ে খেয়েছে। যে গাছে একবার মুখ দেয় সে গাছ আর হয় না। দুনিয়ায় কে শত্রু নয়? জানিস আমার ব্যাটার সঙ্গে আমার মুখ দেখাদেখি নেই'

গাছের উপর মাচানে বসে আছি।

চারিদিকে বড় বড় গাছ। একটু দূরে চিকমিক করছে একটা নদী। ওই নদীতেই বাঘটা আসে নাকি জল খেতে। সন্ধ্যার পরই আসবে।

'ত্যাকর ত্যাকর ত্যাকর'—ডেকে চলেছে একটা অজানা পাখি। আসন্ন সন্ধ্যার পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে আরক্তিম সূর্যালোকে। একদল কাক ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। একটু পরে ময়ূর ডেকে উঠল। মনে হল তার কেকারব তরবারির মতো আস্ফালিত হল যেন শূন্যে। তারপরই দেখতে পেলাম। বাঘ নয়, নদীর ধারে একটি হরিণ দাঁড়িয়ে আছে। একটি ছবি আঁকা রয়েছে যেন আকাশপটে। শাখাময় শিংগুলি কালো। গায়ের রং স্বর্ণাভ। মনে হল তার উপর সাদার ছিটও রয়েছে। স্বপ্নালু দৃষ্টি তুলে চেয়ে রয়েছে আমার দিকেই। ও তো জানে না অদূরেই মাচানের উপর বন্দুক-হাতে মানুষ বসে আছে, যে মানুষ এক মুহূর্তে তাকে হত্যা করতে পারে। কিন্তু না, যদিও আমি মানুষ, (হঠাৎ মনে হল মানুষের সংজ্ঞা কি, বিধাতার সৃষ্টিধ্বংসকারী ঘোর স্বার্থপর সম্প্রদায়?),

কিন্তু না তবু আমি ওই হরিণকে মারব না, কিছুতেই মারব না।

পাশের গাছে আর একটা মাচানে ভোজু বসে ছিল। সে ইঙ্গিত করল—মারো! কিন্তু না, আমি কিছুতেই মারব না ওকে। একথা মনে হতে না হতেই বাঘটা হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল হরিণটার উপর। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলাম আমি। বাঘ পালিয়ে গেল। ভোজু তাড়াতাড়ি নেমে ছুটে গেল। দেখলাম আমার গুলি হরিণেরই বুকে লেগেছে। বাঘটার কিছুই হয়নি। ভোজু হরিণটাকে টানতে টানতে নিয়ে এল। তার মুখে আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি। বললে, এ হরিণের মাংস চমৎকার হবে।

সবাই মিলে মাংসটা ভাগ করে নিয়ে গেল। খাবার সময় দেখি ভোজু আমার জন্যেও এক বাটি মাংস রেঁধে এনেছে।

...খেয়ে ফেললাম। বেশ ভালো লাগল। কিন্তু খেতে খেতে হরিণের জীবন্ত মূর্তিটা চোখের উপর ভেসে উঠল—সেই স্বর্ণাভ তন্বী মূর্তি, চোখের সেই স্বপ্নময় দৃষ্টি।

নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম, তুমি কে? কবি, না পিশাচ?

হা-হা-হা-হা করে দূরে ডেকে উঠল হায়নার দল।

মনে হল তুমি হাসছ।

।। ষোল ।।

হাজারিবাগ থেকে ফিরে মিস মিত্রের বাবার ডায়েরিটা আবার পড়তে শুরু করেছিলাম। খাতাটা খুলেই কিন্তু হতাশ হতে হল। দেখলাম অনেকগুলো পাতা নেই। যেটুকু আছে তা এই।

...শিলু কলেজে পড়ছে। আছে স্নেহময়ীর কাছে। স্নেহময়ীর কাছেই শেষে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ওদের। আমি টাকা পাঠাতাম। আর সুযোগ পেলেই ওদের দেখে আসতাম। ওদের কেন বরাবর নিজের কাছে রাখিনি তার একটা কারণ অবশ্য ছিল। কারণটা অকপটে স্বীকার করাই ভালো। ডায়েরিতে মিথ্যা কথা লিখতে নেই। পাঠিয়ে দিয়েছিলাম কারণ আমার মনে হয়েছিল আমার সংস্পর্শে থাকলে ওরা খারাপ হয়ে যাবে। আমার চরিত্রদোষ ঘটেছিল। হাতে বেশি টাকা থাকলে যা হয় তাই হয়েছিল। মদ খেতাম। মেয়েমানুষও রেখেছিলাম একটি। সে আবার মাঝে মাঝে আমার বাসাতেও এসে হাজির হত। তাই শিলু আর সুরেশকে স্নেহময়ীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়াই সুযুক্তি মনে হল। স্নেহময়ীকে অকপটে লিখলাম সব কথা। চিঠি পেয়ে স্নেহময়ী আর্জেন্ট একটি টেলিগ্রাম করল—ওদের অবিলম্বে পাঠিয়ে দাও। পাঠিয়ে দিলাম একজন লোক সঙ্গে দিয়ে। চক্ষুলজ্জাবশত প্রথমে নিজে যেতে পারিনি। কিছুদিন পরে যখন গেলাম তখনও স্নেহময়ী আমার পদস্খলন নিয়ে একটা প্রশ্ন করল না। স্নেহময়ীর ওইরকম স্বভাব ছিল। মাঝে মাঝে যেতুম ওদের কাছে। সুরেশ লেখাপড়ায় মোটেই মেধাবী ছিল না। সে ম্যাট্রিক পাস করতে পারল না। এদিকে কিন্তু বেশ তাগড়া হয়ে উঠেছিল। শিলু কিন্তু খুব ভালো ছিল পড়াশোনায়। সে দেখতে দেখতে আই. এ. পাস করে বি. এ. ক্লাসে ভরতি হয়ে গেল। আমি একবার ওর জন্যে কিছু বই কলকাতা থেকে কিনে নিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি সুরেশ নেই। স্নেহময়ী বললে, 'ওকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি। তুমি ওকে নিয়ে কোথাও কাজে লাগিয়ে দাও।' বললাম, 'তাড়িয়ে দিলে কেন?' স্নেহময়ী একটু থেমে জবাব দিলে, শিলুর সঙ্গে ওকে মিশতে দেওয়া আর নিরাপদ নয়।'

'কোথা আছে সে?'

'ওর আড্ডা বখা নলেন ভৌমিকের বাড়িতে'

গেলাম সেখানে। গিয়ে দেখি মস্ত এক তাসের আড্ডা জমেছে। সম্ভবত জুয়ো খেলা হচ্ছে। সুরেশকে ডাকলাম। বাইরে নিয়ে গেলাম তাকে।

চোখ পাকিয়ে বললাম, 'তুমি শিলুর গায়ে হাত দিয়েছিলে এটা সত্যি কথা।'

চুপ করে রইল।

তারপর বললে, 'হ্যাঁ দিয়েছিলাম। ওকে আমি ভালোবাসি, ওকে আমি বিয়ে করব।'

'বোনকে বিয়ে করবে!'

'ও আমার বোন নয়। আমি সব খবর পেয়েছি। সৈরভি আমার মা ছিল, আর আপনি আমার বাবা কি না তারও ঠিক নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা আমি শিলুকে ভালোবাসি, শিলুও আমাকে ভালোবাসে।'

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম তার মুখের দিকে চেয়ে।

'এ বিয়ে হবে না। হতে পারে না'

'কেন হবে না। আপনিই তো আমার আদর্শ। প্রেমই যে জীবনের সবচেয়ে সেরা জিনিস এটা বুঝেছিলেন বলেই তো আপনি সৈরভির সঙ্গে ছিলেন। শিলুর মাকে আপনি ভালোবাসতে পারেননি বলেই সে পালিয়ে গেল। স্নেহমাসীর সঙ্গেও আপনার কি সম্পর্ক তা-ও আমরা জানি। আমার বেলাতেই বাধা দিচ্ছেন কেন—'

এর পরই তার নাকে ঘুষি মেরেছিলাম একটা। সুরেশের বন্ধুরা আমাকে ধরে পিটিয়েছিল খুব।

খবর পেয়েছি শিলু আর সুরেশ স্নেহময়ীর কাছ থেকে চলে এঁসেছে। আসবার আগে তাকেও খুব অপমান করেছে নাকি। স্নেহময়ী কিছু বলেনি। আমি ওখানকার একজন লোকের মুখে শুনলাম। এ-ও শুনেছি ওরা কলকাতাতেই আছে। শিলু শ্রীলতা হয়েছে। টাইপরাইটিং শিখে কোনো এক প্রাইভেট আপিসে নাকি কাজ করছে। আর ওদের খোঁজখবর করিনি। করবার ইচ্ছেও নেই। নোঙর-ছেঁড়া নৌকোর মতন ঘুরে বেড়াচ্ছি। মদের মাত্রা বাড়িয়েছি এবং—হ্যাঁ আর আর যা আনুষঙ্গিক তা-ও বেড়েছে। স্নেহময়ীকে আর চিঠি লিখি না। শরীরটা খুব খারাপ হয়েছে। পেটের ডান দিকে ব্যথা। কাশি হয়েছে খুব। নানারকম ওষুধ খাচ্ছি, কিছু হচ্ছে না।

একদিন দোকান থেকে ফিরে এসে কাশতে কাশতে শুয়ে পড়লাম। কাশি বরাবরই ছিল, সেদিন একটু বেশি হল। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম কাশির সঙ্গে রক্তও বেরুচ্ছে। প্রথমে একটু বেরুচ্ছিল তারপর প্রচুর বেরুল। একটা গামলা ভরে গেল রক্তে। ডাক্তার এলেন। বললেন যক্ষ্মা হয়েছে। স্যানাটোরিয়ামে যাওয়ার উপদেশ দিলেন।

... স্নেহময়ীর কাছে চলে এসেছি।

শেষ কটা দিন এখানেই থাকব। কটা দিনই বা আছে আর। স্নেহময়ী খুব সেবা করছে। ও আমার কেউ নয়। রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু মনে হচ্ছে ওই আমার সব।

।। সতেরো ।।

আপিসে এসে মিস মিত্রকে ডেকে পাঠালাম। তাঁর বাবার ডায়েরিখানা ভালো করে প্যাক করে নিয়ে এসেছিলাম। আসতেই তাঁর হাতে দিলাম সেটা।

'তপতী এটা আপনাকে দিতে বলেছিল।'

'কি এটা'

'তপতী বলেছিল এটা আপনার বাবার ডায়েরি'

'সে পেল কি করে'

'স্নেহময়ীর সঙ্গে তার আলাপ ছিল। স্নেহময়ীই তাকে দিয়েছিল আপনাকে দেবার জন্য। তপতী কিন্তু আপনার দেখা পায়নি। তারপর যখন শুনল আপনি আমার আপিসে কাজ করেন তখন আমাকেই দিয়ে গেল আপনাকে দেবার জন্য। আপনার বাবার নাকি শেষ ইচ্ছা ছিল ডায়েরিটা যেন আপনার হাতে পৌঁছয়'

'কবে পেয়েছেন এটা'

'বেশ কয়েকদিন আগে'

প্যাকেটটি হাতে করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন মিস মিত্র।

‘তপতীর সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল?’

‘হয়েছিল একবার আসানসোল স্টেশনে’

‘তার সব কথা জানেন আপনি?’

‘না। আপনার সঙ্গে কতদিনের আলাপ’

‘অনেকদিনের। একসঙ্গে পড়তাম আমরা। জানেন ওকে আজকাল পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে? হিম চন্দ্ বলে যে কালোবাজারী লোকটা খুন হয়েছে পুলিশের সন্দেহ সেটা তপতীরই কাজ’

‘তাই নাকি। তা কি সম্ভব?’

‘অসম্ভব হবে কেন। সবই সম্ভব। তপতী সাধারণ মেয়ে নয়। তপতী কবে আপনার কাছে এসেছিল?’

‘বেশ কিছুদিন আগে। যেদিন আমার বাড়ির সামনে একটা খুন হয় সেই দিনই। তারিখটা মনে নেই ঠিক। পুলিশ তো অনেক খোঁজাখুঁজি করলে কিন্তু কাউকে ধরতে পারেনি’

‘পুলিশের সন্দেহ এ খুন তপতী করেছে’

বিস্ময়ে ভান করে বললাম, ‘তাই নাকি!’

মিস মিত্র কিছু না বলে মুখ টিপে হাসলেন একটু।

আমি বললাম, ‘তপতীর ঠিকানাটা জানলে তাকে জানিয়ে দিতাম যে খাতাটা আপনাকে দিয়ে দিয়েছি।’

মিস মিত্র বললেন, ‘আমি জানিয়ে দেব—’

‘তার ঠিকানা আপনি জানেন?’

‘জানি’

হঠাৎ তার মুখভাবটা কেমন যেন কঠোর হয়ে উঠল। তবু তার উপর হাসির ঝলক খেলে গেল একটু। মুখ টিপে তিনি হাসলেন তারপর চলে গেলেন।

আশ্চর্য, মিস মিত্রের ওই কঠোর মুখের হাসিটাই নানা বিচিত্র রূপে ঘুরে বেড়াতে লাগল আমার চোখের সামনে। কখনও মনে হল ঘন কালো মেঘের মাঝখানে ছোট্ট একটু বিদ্যুৎ স্থির হয়ে আছে। কখনও মনে হল দীপক রাগের ছোট্ট একটা মীড় যেন মূর্ত হয়েছে মানসপটে, কখনও মনে হয় আগ্নেয়গিরির ছোট্ট একটি অঙ্কুর ফুটি ফুটি করছে ওর চাপা ওষ্ঠপ্রান্তে।

।। আঠারো ।।

খুব বৃষ্টি পড়ছিল।

বাজ পড়ছিল ঘন ঘন।

গভীর রাত্রে বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিলাম বিনিদ্রনয়নে। নামজাদা এক লেখকের উপন্যাস নিয়ে পড়বার চেষ্টা করেছিলাম একটু আগে। ভালো লাগল না। খালি কথার কচকচি, খালি বিদ্যে জাহির করবার চেষ্টা। সুর জমেনি।

......ঘুমিয়ে পড়লাম হঠাৎ।

ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম।

ঘাগরা-পরা জিপ্‌সি মেয়ে এসেছে যেন।

উদ্দাম যৌবন তার। গায়ের জামাটা টাইট আর বেখাপ্পারকম সবুজ। পিঠে বেণী দুলছে। কপালের উপর এসে পড়েছে গোছা গোছা কোঁকড়ানো চুল। চোখে মুখে কৌতুকের মোহিনী হাসি। হাতে কাচের চুড়ি। কুচকুচে কালো রঙের। গৌরবর্ণ হাত দুটিতে সুন্দর মানিয়েছে।

আমার সামনে এসে মাথা ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'খেলনা লিবি?'

'খেলনা? কোথায় আছে।'

'আমার বুকে'

'দাও—'

হাত বাড়ালাম।

হঠাৎ মেয়েটা পিছিয়ে সরে গিয়ে খিলখিল করে হেসে নাচ শুরু করে দিল ঘাগরা ঘুরিয়ে।

দিব নাই, দিব নাই, দিব নাই
তুই শুধু চেয়ে যা, চেয়ে যা, চেয়ে যা,
বল শুধু চাই চাই চাই চাই
আমি দিব নাই, দিব নাই, দিব নাই।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে তুমি?'

আবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

'আমাকে চেনো না? আমাকেই তো দেখছ বারে বারে'

ঘুম ভেঙে গেল।

আলোটা জ্বাললাম ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে। চতুর্দিকে নিস্তব্ধ। একটা অসম্ভব প্রত্যাশা মনে জেগে উঠল। আশা করতে লাগলাম সেই জিপ্‌সি মেয়েটা আবার হয়তো হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসবে ঘরের কোণ থেকে। হয়তো নাচ শুরু করবে। স্বপ্নতে একবার তো প্রত্যক্ষ করেছিলাম। কিন্তু এবার কিছুই হল না। কেউ এল না। চুপ করে বসে রইলাম সামনের দেওয়ালটার দিকে চেয়ে। মনে হল দেওয়ালে কার যেন একটা মুখ আঁকা রয়েছে। চেয়ে আছে উপরের দিকে, মাথার দীর্ঘ চুল যেন উড়ছে। প্রার্থনা করছে মনে হল। কে কার জন্যে প্রার্থনা করছে? কিসের প্রার্থনা? মনে হয়েছিল ওটা মেয়ের মুখ কিন্তু একটু পরে কেন জানি না মনে হল পুরুষের মুখ ওটা। শ্রীলতার বাবা কি? শ্রীলতার জন্য প্রার্থনা করছেন? প্রার্থনায় কি বিশ্বাস ছিল তাঁর? বিশ্বাস না থাকলেও অন্তর থেকে অজ্ঞাতসারেই প্রার্থনা উত্থিত হয় অনেক সময়। তারই ছবি কি ওটা? সবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর ভুলটা ভেঙে গেল। ওটা চুনকামের পোঁচড়ার দাগ। নিতান্তই আকস্মিক। ওর অর্থ কিছু নেই। বাজে! মনটা কিন্তু ওকে কেন্দ্র করেই ঘুরতে লাগল। একবার মনে হল ওটা যীশুখ্রিস্টই বা নয় কেন? হয়তো আমার দুঃখেই কাতর হয়ে মূর্ত হয়েছেন আমার ঘরের দেওয়ালে। তারপর তীক্ষ্ণ তীব্র চিৎকার শুনতে পেলাম একটা। সাইরেনের শব্দ নয়, পাখির ডাক মনে হল। কি পাখি? পেঁচা? শহুরের মাঝখানে পেঁচা আসবে কি করে? উঠে জানলাটা খুললাম। আকাশের পশ্চিম দিগন্তে প্রচুর কালো মেঘ জমে রয়েছে। কিন্তু মেঘের নীচে রক্তাভ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ ওটা কি? প্রথমে বুঝতে পারিনি। তারপর পারলাম। চাঁদ অস্ত যাচ্ছে। গোল নয়। প্রকাণ্ড প্রতপ্ত একটা টাঙির মতো।

মনে হল তপ্ত ক্ষুরধার একটা প্রতিবাদ যেন মূর্ত হয়েছে। শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ। কিন্তু অমন রুদ্র মূর্তি কেন? সন্ধ্যায় ওকেই তো অপরূপ লেগেছিল ধবল মেঘপুঞ্জের আড়ালে।

হঠাৎ—না, কি মনে হল বলব না।

।। উনিশ ।।

ক'দিন কেটে গেছে মনে নেই।

কলকাতা শহরেই ছিলাম। আপিসে গেছি, বাড়িতে এসেছি। নিশ্চয়ই দিনও হয়েছে রাতও এসেছে। ফাইল সই করেছি, খাবার খেয়েছি, পোশাক পরেছি। কথাবার্তাও হয়তো বলেছি করো কারো সঙ্গে। কিন্তু আমার কিছু মনে নেই। কিচ্ছু মনে নেই। একটা বিরাট অন্যমনস্কতার কুয়াশায় আবৃত ছিল আমার সত্তা। সেই কুয়াশার মধ্যে যে সব ছায়ামূর্তি দেখেছি সেইগুলোর কথাই মনে আছে। সেগুলি অদ্ভুত। কারো হাঁটুর উপর চোখ মুখ নাক, ধড় আছে, মুণ্ডু নেই। কারো আবার কপালের উপর চোখ, কারো একটা, কারো দুটো, কারো তিনটে। কারও কপালে চোখ নেই, ঠোঁট আছে। সেই ঠোঁটে আবার হাসি। নানা মূর্তি। আবার মিছিলও দেখেছিলাম একটা। প্রেতের মিছিল। সবার মুখে মুখোশ। কারো মুখোশ ভয়ংকর, কারো মুখোশ মনোরম। সে মিছিলে তুমিও ছিলে। হঠাৎ মুখোশ সরিয়ে আমার দিকে চেয়ে হেসেছিলে। মুখোশটা সরিয়ে দিলে, কিন্তু তোমার মুখ দেখতে পাইনি। অদ্ভুত অদৃশ্য একটা আবরণের তলায় আত্মগোপন করেছিলে। চিনেছিলাম তোমার হাসিটা দেখে। সেই চেনা হাসিটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল মুখোশের তলা থেকে। সে হাসিটা বলেছিল, 'এদের মধ্যেও আছি। দেখছি এদের দৌড় কোন্ মসজিদ পর্যন্ত।' কুয়াশায় অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল তারপর সব। সে অন্ধকারের মধ্যেও কিন্তু আবছাভাবে দেখতে পেয়েছিলাম তপতীকে। অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথার উপর জ্বলছিল একটা বর্তিকা। বর্তিকার শিখা কাঁপছিল না। ঊর্ধ্বমুখী শিখা যেন আরতি করছিল কোন অদৃশ্য দেবতাকে। আমি মিস মিত্রকেও খুঁজছিলাম সেই অন্ধকারে। খুকুকেও। কিন্তু তাদের দেখা পাইনি। এই না-পাওয়াটা অন্ধকারকে গাঢ়তর করেছিল যেন। কেন তা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করিনি। বস্তুত কোনো চিন্তার ঢেউ ওঠেনি আমার মনে। অন্ধকারের সমুদ্রে ভেসে চলছিল আমার মন কোন্ অজানার উদ্দেশ্যে তা ভাববার চেষ্টাও করিনি। ছেড়ে দিয়েছিলাম নিজেকে। সমুদ্রে ঢেউ ছিল কি? জানি না। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল ডুবে যাচ্ছি, তলিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কে যেন আমাকে ভাসিয়ে উপরে তুলে আনছিল। মনে হচ্ছিল একটা অদৃশ্য 'বয়া' (buoy) যেন ঠেলে আনছে আমাকে। বার বার ডুবে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বার বার সে আমায় ভাসিয়ে তুলছিল। আকাশ দেখতে পাচ্ছিলাম। অন্ধকার আকাশ। কিন্তু আকাশ। হঠাৎ আবিষ্কার করে মুগ্ধ হয়ে গেলাম যে ওটা 'বয়া' নয় বাহু। তোমার বাহু।

হঠাৎ কুয়াশা মিলিয়ে গেল।

কেটে গেল অন্ধকার।

স্বচ্ছ দিবালোকে দেখলাম আমার সামনে আপিসে বড়বাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

বলছেন, 'মিস মিত্র আর এখানে চাকরি করবেন না। একটা রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়েছেন।'

যথোচিত গাম্ভীর্য রক্ষা করে বললাম, 'চাকরি করবেন না তো এক মাসের নোটিশ দেওয়া উচিত ছিল আগে। তাঁকে সেটা জানিয়ে দিন। চাকরি করবেন না কেন। না করেন তো আমরা এক মাসের মধ্যে অন্য লোক খুঁজে নেব'

'মিস মিত্র সে কথাও লিখেছেন। লিখেছেন আমি কাল থেকে আপিস যেতে পারছি না। আমার এক মাসের নোটিশ দেওয়া উচিত তা-ও পারলাম না। এর ক্ষতিপূরণস্বরূপ আমার প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে যা কেটে নেবার নেবেন। আমি নিয়ে আসছি দরখাস্তটা'

বড়বাবু একটু পরেই দরখাস্তটা নিয়ে এলেন। দরখাস্ত পড়ে বুঝলাম মিস মিত্র আর আসবেন না। লিখেছেন শরীর খারাপ তাই আর কাজ করতে পারছেন না। লিখেছেন, 'আমার অসুখের জন্য আপিস থেকে যে টাকা অগ্রিম নিয়েছিলাম তার কিছুটা শোধ করেছি, কিছু বাকি আছে। সেটাও প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে কেটে নেবেন'

দরখাস্তটার দিকে চেয়ে রইলাম খানিকক্ষণ।

'একজন টাইপিস্টের খোঁজ করুন তাহলে'

'আমার ভাইপো গজুকে নিয়ে এসেছি। সে আপাতত কাজ চালিয়ে দেবে। সে একজন পাসকরা টাইপিস্ট। স্পীড ভালোই। যদি আপনার পছন্দ হয় তাকেও রাখতে পারেন'

'তাকে ডাকুন—

একটু পরেই গজু এল। দু'গালে চওড়া জুলফি, ঠোঁটের উপর পাতলা লতানে গোঁফ। ঠোঁটে ধবল। আমার ব্যাগ থেকে সেদিনকার পত্রিকাটা বার করে বললাম, 'এটা টাইপ করে নিয়ে আসুন।'

একটু পরেই নিয়ে এল।

দেখলাম একটিও ভুল নেই।

'বেশ, ওই এখন কাজ করুক তাহলে—'

বড়বাবু ভাইপোকে নিয়ে চলে গেলেন।

ছেলেবেলার একটা গল্প মনে পড়ছে।

এক মাসিকপত্রে গগন ঠাকুরের আঁকা একটি ছবি বেরিয়েছিল! খুব ভালো লেগেছিল আমার। সেটি বাঁধিয়ে রেখেছিলাম আমার পড়ার ঘরে। কিছুদিন পরে আমার এক দূর সম্পর্কের দাদা রইলেন আমাদের বাড়িতে কয়েকদিন। তিনি চলে যাওয়ার পর দেখলাম ছবিটি নেই। তিনিই ছবিটি নিয়ে গেছেন একথা বলবার সাহস আমার হয়নি। স্বচক্ষে তাঁকে নিতে দেখিনি। মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমার ছবিটা কোথা গেল। তিনি ধমকে উঠলেন, বললেন, আর একটা ছবি টাঙা না ওখানে। কে নিয়ে গেছে তা কি করে বলব। যে পেরেকে ছবিটা টাঙানো ছিল সেই পেরেকটার উদ্দেশ্যে ছোট একটি কবিতা লিখেছিলাম মনে পড়ছে—

ওগো ছবিহীন পেরেক
তোমার সঙ্গে কিসের উপমা দেব
স্বামীহীনা বিধবার
না, পুত্রহীনা জননীর?
উপমা যাই হোক

তোমাকে নিঃসঙ্গ রাখব না
টাঙিয়ে দেব আর একটা ছবি।

টাঙিয়ে দিয়েছিলাম। একটা ক্যালেন্ডারের ছবি। সিনেমা অভিনেত্রীর। টাঙিয়েই সঙ্গে সঙ্গে মনে হল—এ কি করলাম। ছবিটাকে নামিয়ে দিলাম। উপড়ে ফেললাম পেরেকটাও। তখন বাবা বেঁচে ছিলেন। হাতে যেটুকু হাতখরচ দিতেন তা দিয়ে ভালো ছবি কেনা সম্ভব ছিল না। এখন হাতে আমার অনেক অনেক টাকা। এখন বুঝেছি টাকা দিয়ে ছবি কেনা যায় না। আজকাল তাই দূরে থেকে ছবি দেখি শুধু।

'কেন যাচ্ছ ওখানে'

বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলে তুমি।

উত্তর দিইনি। কিন্তু তুমি থামলে না। রাস্তার রিক্‌শাওলার ঝুনঝুন, নানারকম মোটরের হর্ন, বাস স্টপে বাসের জন্য অপেক্ষামানা তরুণীর সপ্রশ্ন দৃষ্টি, আমার পিছনের চাকাটার কচকচ শব্দ সবেতেই যেন মূর্ত হয়ে উঠল তোমার ওই প্রশ্নটা। রাস্তার একটা ছুটন্ত ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে যখন জোরে ব্রেক দিলাম তখন ব্রেকের আওয়াজেও তুমি যেন ধমকে উঠলে—কেন যাচ্ছ ওখানে।

তবু গেলাম।

মনে হল যদিও তুমি জিজ্ঞেস করছ কেন ওখানে যাচ্ছি কিন্তু তুমি জান, তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না, কেন ওখানে যাচ্ছি। পরে এও মনে হল তুমিই যেন ঠেলে আমাকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলে সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি করে দেবার জন্যে। বার বারই তো তুমি এই দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করেছ। কেন করেছ জানি না যে। বিস্মিত হই বার বার। প্রশ্ন করি, উত্তর পাই না।

গলিতে যখন ঢুকলাম তখন দেখলাম একটা মরা কুকুর রাস্তার ধারে পড়ে রয়েছে। কোনো মোটরের তলায় চাপা পড়েছে সম্ভবত। সমস্ত মুখটা রক্তাক্ত। দুটো কাক চোখ দুটো ঠুকরে খাচ্ছে। পাশেই একটা ভাঙা ডাস্টবিন। ময়লা উপচে পড়ছে। তার পাশেই উড়ছে ফরসা একটা ন্যাকড়ার ফালি। তাতে শৌখিন পাড় লেগে আছে একটু। জরির পাড়। কে ওই শাড়ি পরত, কোথায় সে এখন, তার শাড়ির টুকরো রাস্তায় অমনভাবে উড়ছে কেন, এই সব ভাবনার টুকরোগুলোও মনের মধ্যে এল আর উড়ে গেল। ন্যাকড়ার ফালিটাও নাচতে নাচতে চলে গেল আমার দৃষ্টিসীমা পেরিয়ে। সে নাচের মধ্যে একটু ব্যঙ্গের খোঁচাও অনুভব করলাম যেন।

তীব্র উত্তরে হাওয়া বইছে।

... সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলাম।

উঠেই দাঁড়িয়ে পড়তে হল। মিস মিত্রের ঘরে একটা তালা ঝুলছে। নেম-প্লেট নেই। কয়েক মুহূর্ত আমার নির্বাক দৃষ্টি নীরবে যা বলেছিল তা লিখলে একটা কাব্য হয়। কিন্তু আমি কাব্য করবার চেষ্টা করিনি। সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসেছিলাম। নেমে এসে একতলার সেই ভদ্রলোকটিকে ডেকেছিলাম কড়া নেড়ে। তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এলেন। ওত পেতে ছিলেন যেন।

'মিস মিত্র কোথা গেছেন বলতে পারেন'

তাঁর মুখে একটা রহস্যময় হাসি ফুটল।

বললেন, 'তাঁরা এখান থেকে চলে গেছেন'

'কোথায়'

'জানি না।'

।। কুড়ি ।।

একটা কথা আমার বার বার মনে জাগছে। শ্রীলতার বাবার ডায়েরিটা না পড়লে ও হয়তো আমার কাছ থেকে এমনভাবে সরে যেত না। যদিও আমি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করিনি, তবু নিগূঢ়ভাবে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল যে আমি ওর জীবনচরিত সব জেনে ফেলেছি। অনুমান করেছিল। ওর মনে হয়েছিল মুখোশটা তো ছিঁড়ে গেল। এরপর আমার কাছে আর মুখ দেখাতে পারেনি সে। যদি পারত তাহলে কি হত ? আমি কি ওকে ঘৃণা করতাম? না ওর প্রতি বেশি আকৃষ্ট হতাম? ওকে সদুপদেশ দেবার দুর্বুদ্ধি আমার মাথায় জাগত? কি হত তা জানি না। হ্যাঁ, আসল কথা জানি না। মাথায় অকস্মাৎ লাঠি পড়লে বাবা রে বলব, না মাগো বলব, না, কেরে শালা বলব তা যেমন বলা শক্ত, এ-ও তেমনি। এইটুকু বলতে পারি একটি রহস্যময় শূন্যতার মাঝখানে বসে আছি, আর ভারী আরাম বোধ করছি। হ্যাঁ, আরাম, ফোড়াটা ফেটে গেলে যে ধরনের আরাম হয় সেই ধরনের আরাম।

... তুমি হাসছ, তা দেখতে পাচ্ছি। তোমার হাসিটা দেখতে পাচ্ছি সামনের গাছটায় প্রচ্ছন্ন হলদে পাখির পালকের ঝলকে। অথচ তুমি রয়েছ আমার মনের নেপথ্যে। এই ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানির খেলা আর কতদিন চালাবে তুমি। এই নিরবচ্ছিন্ন বহু রাগ-রাগিণী-সমন্বিত সংগীত কি সমে এসে কোনোদিন থামবে না? দেখা দেবে না সংগীত সরস্বতী? নির্জন ঘরে একা বসে আছি। এ সময়ে যদি আসতে...মূর্তিমতী হয়ে বলতে যদি কিছু...

দ্বার ঠেলে খুকু প্রবেশ করল।

সঙ্গে একটি অচেনা ভদ্রলোক। খুকু এসে প্রণাম করে বলল, 'ইনি মিস্টার রায়। এর কথা আপনাকে একদিন বলেছিলাম পুলিশে বড় চাকরি করেন ইনি।'

মিস্টার রায় নমস্কার করলেন।

'আজ আপনার ছুটি তো?'

'হ্যাঁ—'

'আমারও ছুটি. আপনার কাছে এসেছি বিশেষ একটি আশা নিয়ে'

'কি বলুন—'

'ফরমাশ করতে সঙ্কোচ হচ্ছে। কিন্তু চন্দ্রাননী বলেছিল আপনি অনেকগুলো যন্ত্র বাজাতে পারেন। আমারও সংগীতে সামান্য অনুরাগ আছে। আর আমার ভাবী পত্নী চন্দ্রাননী তো আপনার শিষ্যা। সে হিসেবে হয়তো একটু দাবিও আছে আপনার উপর। যদি কিছু বাজিয়ে শোনান তো কৃতার্থ হব।'

খুকুর দিকে চেয়ে দেখলাম।

মাথা হেঁট করে মুচকি মুচকি হাসছে।

সেদিনের সেই অদ্ভুত দিবাস্বপ্নটাও মনে পড়ল। সেই দিবাস্বপ্নে মিস্টার রায়ের যে চেহারা দেখেছিলাম তা একেবারে অন্যরকম। মনে হল সে দেখাটা কি মিথ্যে? যা দেখছি তাই কি সত্যি? যা দেখছি তাও হয়তো আর একটা স্বপ্ন। দার্শনিক চিন্তার স্রোতে কিন্তু বেশিক্ষণ গা ভাসিয়ে থাকতে পারলাম না। শঙ্করাচার্যের বেদান্তদর্শনকে সরে দাঁড়াতে হল। আবদার-তরল কণ্ঠে খুকু অনুরোধ করল, 'বেহালায় ভৈরবীর আলাপটা ওঁকে শুনিয়ে দিন। নিয়ে আসি বেহালাটা?'

'চল ওই ঘরেই চল'

পাশেই আমার বাজনার একটা আলাদা বড় ঘর আছে। সেইখানেই আমার সব রকম বাজনা থাকে। মেজেতে ফরাশ আর তাকিয়া। পিয়ানো বাজাবার জন্য ছোট একটা টুল আছে পিয়ানোর সামনে। সেই ঘরে গেলাম সবাই। ফরাশেই বসলাম।

... একটু পরেই বেহালায় শুরু হয়ে গেল ভৈরবী। উদাসিনীর আশা-আকাঙক্ষা কান্নার সুর বাজতে লাগল। আমার মনের ভিতর আর একটা সুর কিন্তু পল্লবিত হচ্ছিল নানাভাবে। তপতীর কথা কি উনি তুলবেন? সে সম্বন্ধে কিছুই বললেন না তো। পরে বলবেন কি?

......বেহালা বাজতে লাগল। কতক্ষণ বাজিয়েছিলাম মনে নেই। বোধহয় অনেকক্ষণ। কোথায় যেন তলিয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনের মিনতিই যেন ভৈরবীর সুরে সুরে বলছিল—তুলো না, তুলো না তপতীর কথা। স্পর্শ করো না ওকে।

থামতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন মিস্টার রায়। 'চমৎকার। চমৎকার—'

তখন আমি বললাম, 'এইবার আপনি একটা শোনান'

'ও রে বাব্বা. আপনার সামনে।'

'তাতে কি হয়েছে। বাজান বাজান একটা। কি যন্ত্র বাজান আপনি'

'সেতার নিয়ে টুংটাং করি একটু'

আমার সেতারটা এগিয়ে দিলাম তাঁকে। অনেক পীড়াপীড়ির পর বাজালেন শেষকালে। ভৈরবীই বাজালেন। দেখলাম অপূর্ব বাজান। আমিও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম।

তারপর খাবার এল, কফি এল, পান এল, সিগারেট এল।

আমার অনুরোধে খুকুও শেষে গীটারে গজল বাজাল একটা। চমৎকার বাজাল। বেশ শিখেছে। তারপব মিস্টার রায় সসঙ্কোচে বললেন, 'আগামী পনেরই অগ্রহায়ণ আমাদের বিয়ে। যাবেন নিশ্চয়ই। আর একটি অনুরোধ আছে—'

'কি—'

'আপনি যদি আশীর্বাদ করে একটা কবিতা লিখে দেন তাহলে—'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললাম, 'দেব'

তারপর তারা চলে গেল।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম।

সমস্ত শবীরের গ্রন্থিগুলো যেন শিথিল হয়ে গেছে। মহাশূন্যে ঝুলছি, কিন্তু একেবারে নিরালম্ব নয়। অবলম্বন আছে একটা এখনও। তপতী।

মনের দিকে চেয়ে দেখলাম তুমি হাসিমুখে আমার দিকে চেয়ে আছ। নির্নিমেষ চেয়ে আছ। তোমার হাসি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। একটা নিরাকার নির্নিমেষ হাসি, কিন্তু তাকে অস্বীকার করতে পারছি না। হাসির মধ্যে একটু ব্যঙ্গেরও আমেজ রয়েছে যেন।

তারপরই খড়্গাটা পড়ল ।

যে সুতোটা ধরে ঝুলছিলাম সেটা ছিঁড়ে গেল হঠাৎ।

ফোন বাজল।

উঠে গেলাম পাশের ঘরে।

'হ্যালো, কে—ও সৌরভ, অনেক দিন তোমার খবর পাইনি। বদলী হয়েছে? ও শুনিনি তো। কীট্‌সের কবিতার অনুবাদগুলো চাও? ও ভালো হয়নি ভাই। কবিতার অনুবাদ হয় না। আচ্ছা এসো একদিন। দেব তোমাকে, তবে ছাপিও না। তোমার সহকর্মী মিঃ রায় এসেছিলেন। এই একটু আগেই গেলেন। অনেকক্ষণ গানবাজনা হল। আমার পাশের বাড়িতে তার বিয়ে হচ্ছে। শুনেছ? মেয়েটি আমার ছাত্রী। বরযাত্রী আসবে? মিঃ রায় আসতে আমার ভাই একটু ভয় হয়েছিল। ভাবছিলাম যদি তপতীর কথা তোলেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। খবর? না, কিছু জানি না তো। খবরের কাগজ আমি পড়ি না—'

সৌরভ বললে, 'ও তুমি তা হলে শোননি। তপতীর বান্ধবী শ্রীলতা মিত্রের কাছ থেকে ঠিকানা পেয়ে পুলিশ তপতীকে ধরতে গিয়েছিল। কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় ধরতে পারেনি। রিভলভার মুখে পুরে সে আত্মহত্যা করেছিল'

এর পরও সৌরভ আরও কি সব যেন বলেছিল। আমি শুনিনি। সে যখন থেমে গেল তখনও আমি রিসিভারটা কানে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। চোখের উপর ফুটে উঠেছিল কাঁচা-হাতের বড় বড় অক্ষরে লেখা সেই চিঠিটা—আপনি জয়ী হয়েছেন। এতে খুব খুশি হয়েছি। মুগ্ধ হয়ে গেছি। শতকোটি প্রণাম জানাই...।

জয়ী হয়েছি? আমি?

পাগলের মতো পিয়ানো বাজাচ্ছিলাম। কি বাজাচ্ছিলাম জানি না। সুরের ঝড় বইছিল শব্দের সুমুদ্রে তুফান তুলে। কাঁপছিল চারদিক। ঘরের দেওয়াল, জানলার শার্সি, এমন কি পাখাটাও যেন যোগ দিয়েছিল সুরের সেই তাণ্ডবনৃত্যে। মনে হচ্ছিল অসংখ্য পাখি ডাকছে। বুক-ফাটা কান্নাব প্লুত অতিপ্লুত সুর তীক্ষ্ণ হতে তীক্ষ্ণতর হয়ে ধাপে ধাপে উপরে উঠে আকাশকে যেন টুকরো টুকরো করতে চাইছে। বিলাপ যেন গর্জন করছে ভর্ৎসনার রূপ ধরে। চতুর্দিক মথিত হচ্ছে যেন।

...বাজিয়ে চলেছি... পাগলের মতো বাজিয়ে চলেছি। হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেল সব। বাজিয়ে চলেছি, কিন্তু কোনো শব্দ নেই।

মৃত্যু হল নাকি আমার?

চারিদিকে অন্ধকার।

নীরন্ধ্র অন্ধকার।

অন্ধকারেও বসে পিয়ানো বাজিয়ে যাচ্ছি। শব্দ হচ্ছে না। সুর হারিয়ে গেছে অন্ধকারে।

মনের মধ্যে একটা সুরই কেবল নিঃশব্দে বাজছে। নিঃশব্দে সে শুধু একটি কথাই বলছে—মোহ নেই, মোহ নেই, মোহ নেই। নিঃশব্দ নির্মোহ সেই সুরের প্রশান্ত প্রবাহে অবগাহন করছে আমার সমস্ত সত্তা। মোহ নেই, মোহ নেই, মোহ নেই...না, না, না।

ক্রমশ অন্ধকার আলোকিত হলো।

দেখলাম একটি জ্যোতির্ময়ী আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না।

তবু চিনতে পারলাম।

তুমি এসেছ।

তারপর আবিষ্কার করলাম, তুমি দাঁড়িয়ে নেই, তুমি চলছ। আমি অনুসরণ করলাম তোমায়। কিন্তু তোমার কাছাকাছি যেতে পারলাম না। তুমি অতি দ্রুত বেগে চলেছ, ক্রমশ আরও দূরে চলে যাচ্ছ। দূরে, দূরে, আরও দূরে। ক্রমশ তোমাকে একটা ক্ষীণ আলোকরেখার মতো মনে হতে লাগল। ক্ষীণ, কিন্তু উজ্জ্বল। ভয় হতে লাগল তোমাকে বুঝি হারিয়ে ফেলব। ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ থেমে যেতে হল। সামনে এক নদী। তরঙ্গসংকুল বিরাট নদী। হেঁটে পার হওয়ার উপায় নেই। সাঁতার তো জানি না। তুমি দেখলাম পেরিয়ে গেছ। ওপারে দূরে অনেক দূরে আলোক-রেখাটা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে আসছে। ব্যাকুলভাবে ছোটাছুটি করতে লাগলাম নদীর ধারে।

সহসা আবির্ভূত হলো একটা লোক।

'কে আপনি'

'আমি হারু'

'চিনতে পাচ্ছি না'

'এর মধ্যেই ভুলে গেলেন! অত মন দিয়ে পড়লেন আমার ডায়েরিটা, ভুলে গেলেন সব। আমি মশাই শ্রীলতার বাবা, যার আসল নাম ছিল শিলু—মনে পড়ছে?'

'পড়েছে। নমস্কার। আপনি এখানে—'

'হ্যাঁ, আপাতত এখানেই আছি। পথভোলা লোককে পথ দেখিয়ে দিই। পোড় খাওয়া লোক তো, এ কাজটা পারি। কোথা যাবেন আপনি'

'আমি ওপারে যাব। ওই যে আলোর রেখাটা দেখা যাচ্ছে—'

'ওখানে তো সবাই যেতে পারে না। আমি রাস্তাটা দেখিয়ে দিতে পারি, আমি কিন্তু ওখানে যেতে পারি না। বাগানে আটকে পড়ি—'

'বাগানে মানে?'

'এই নদী একটা বাগানে গিয়ে শেষ হয়েছে। বাগানটাকে জল যোগান দেওয়াই এই নদীর কাজ'

'কার বাগান।'

'তা জানি না। আসুন'

বাগানে পৌঁছলাম গিয়ে।

'অপূর্ব বাগান। ফুলের বাগান। নানা রঙের নানা আকৃতির সহস্র সহস্র ফুল ফুটে আছে

চারিদিকে। গন্ধে পরিপূর্ণ আকাশ বাতাস। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। হারু নিঃশব্দে কখন অন্তর্ধান করেছে বুঝতে পারিনি।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

তপতীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম যেন।

'দাঁড়াবেন না এখানে। বাগান পেরিয়ে যান। দাঁড়িয়ে পড়লে আর এগুতে পারবেন না। উনি আপনার জন্য সমুদ্রের তীরে অপেক্ষা করছেন'

চারিদিকে চেয়ে দেখলাম।

তপতীকে দেখতে পেলাম না কোথাও।

তপতীর কণ্ঠস্বরই আবার অনুনয়ের সুরে বললে, 'দাঁড়াবেন না, দাঁড়াবেন না, এগিয়ে যান'

এগিয়ে গেলাম।

দ্রুতপদেই এগোতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে মনে হল অদৃশ্য কি একটা যেন টানছে আমাকে। আমার সর্বাঙ্গ যেন বিরাট একটা অভিকর্ষের আকর্ষণে ছুটে চলেছে অজানার দিকে। আমি থামতে পাচ্ছি না। আলোকের রেখাটা ক্রমশ বড় হতে লাগল। সমুদ্রের কল্লোলধ্বনি শুনতে পেলাম তারপর। দেখলাম রেখা আর রেখা নেই। তুমি দাঁড়িয়ে আছ, পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছ। তোমার সর্বাঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অপূর্ব জ্যোতি, অদ্ভুত এক মহিমার পরিমণ্ডলে দাঁড়িয়ে আছ তুমি। সেই পরিমণ্ডলকে ঘিরে যা বিকিরিত হচ্ছে তা কেবল জ্যোতি নয়, শোভা নয়, আলো নয়, ছটা নয়, তা পরিপূর্ণ প্রকাশ। তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম লালের পটভূমিকায় তারপর একটা ছবিতে। তারপর নানা অভিব্যক্তিতে দেখেছি তোমায়, অনুভব করেছি তোমার অনন্যতা, কখনও গানের মীড়ে, কখনও পাখির গানে, কখনও ফুলের হাসিতে, আরও কত অজস্র প্রকাশলীলায়—আজ সে সমস্ত মিলে তুমি সম্পূর্ণ প্রকাশের যে পরিমণ্ডলে মূর্ত হয়েছো তাকে বর্ণনা করি এমন সাধ্য আমার নেই।

তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না।

তবু তোমাকে চিনেছি।

তোমার পিছনে এসে যখন দাঁড়ালাম তখন তুমি হাত তুলে বললে, ওই দেখ বন্দরে সোনার তরীরা দাঁড়িয়ে আছে। সব শেষেরটা তোমার তরী।

দেখলাম আমার তরীতেও রামধনু রঙের পতাকা উড়ছে।

অসংলগ্না

।। প্রথম পর্ব ।।

।। এক ।।

সকালবেলা শীত ছিল বেশ। মেঘ ছিল আকাশে, চাপ চাপ তুলোর মতো। বারান্দায় রোদ আসেনি। তবু বারান্দায় পাতা লেখার টেবিলে এসে বসলেন সুভদ্রবাবু। এসে লেখার খাতাটা খুললেন। কিন্তু লিখলেন না কিছু। আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। চোখে পড়ল হলদে রঙের তিনতলা বাড়িটা—পূর্ণেন্দুবাবুর বাড়িটা। পূর্ণেন্দুবাবুর স্মৃতির মতন বাড়িটার জৌলুসও কমে গেছে। হলদে রঙের উপর কালো কালো 'কাজলি' লেগেছে। পূর্ণেন্দু রায় সেকালের 'আধুনিক' ছিলেন। মদ খেতেন, গো-মাংস খেতেন, মেম বিয়ে করে এনেছিলেন বিলেত থেকে। প্রচুর টাকা ছিল, ইংরেজ সরকারে বড় চাকরি করতেন, সুতরাং সমাজের বুকে বসেই সমাজের দাড়ি ওপড়াতে পেরেছিলেন তিনি। কেউ কিছু বলতে সাহস করেননি। খোশামোদই করত বরং সূর্যকান্ত শিরোমণি—গোঁড়া হিন্দুদের কট্টর নেতা। পূর্ণেন্দু কিন্তু চোট খেয়েছিলেন তাঁর মেমসাহেবের কাছেই। মেমসাহেব এ-দেশে এসে বাংলা সংস্কৃত শিখে এ-দেশের ধর্মশাস্ত্র পাঠ করে হয়ে গেলেন গোঁড়া হিন্দু! পাটের কাপড় পরে গঙ্গাস্নান শুরু করে দিলেন তিনি। তেতলার চিলেকোঠার ঘরে স্বপাক নিরামিষ আহারের আয়োজন করে অবাক করে দিলেন সকলকে। সুভদ্রবাবুর কল্পনা-তুরঙ্গম হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কাঠঠোকরা পাখিটা দেখে। ছাতে যে এরিয়েলের বাঁশটা আছে তারই উপর এসে বসেছিল পাখিটা। তার লাল ঝুঁটি আর সোনালী পিঠ আর তার ট-র-র-র-র-র শব্দ যেন সতর্ক করে দিলে সুভদ্রবাবুকে, বললে—মশাই, বাড়াবাড়ি হচ্ছে। উইশফুল থিংকিং-এরও (Wishful thinking) একটা সীমা থাকা উচিত। সুভদ্রবাবুর তখন সত্য ঘটনা মনে পড়ল। মিসেস পূর্ণেন্দু হিন্দু হননি। হয়েছিলেন মিসেস চ্যাটার্জির নকলে পূর্ণেন্দুবাবুর তাগড়া বাবুর্চি ইসমাইলের প্রণয়িনী, পূর্ণেন্দুবাবুর আকস্মিক মৃত্যুটাও সন্দেহজনক ঠেকেছিল অনেকের কাছে। মিসেস পূর্ণেন্দু মেমসাহেব ছিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের এবং এস. পি-র বান্ধবী ছিলেন, তাই পূর্ণেন্দুবাবুর পোস্টমর্টেম হয়নি। পূর্ণেন্দুবাবুর ডাক্তার অবিনাশবাবু সন্দেহ করেছিলেন স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি তাঁর। কিন্তু বাঙালী ডাক্তারের সন্দেহ বিলাতী মেমসাহেবকে কাবু করতে পারেনি একটুও। তিনি যতদিন সবলা এবং স্বাস্থ্যবতী ছিলেন...কাঠঠোকরা পাখিটা উড়ে গেল। মেঘও সরে গেল। রোদ উঠল। এক ঝলক এসে পড়ল সুভদ্রবাবুর টেবিলে। সুভদ্রবাবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন তাঁর বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষে যে রক্তকরবীর গাছটা আছে (যেটাকে সম্প্রতি ছেঁটেও একবারে শাখা-পত্রহীন করতে পারা যায়নি) তারই ছায়ায় দেওয়ালের উপর দুটি শালিক খুব ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি বসে আছে। ওরা সুভদ্রবাবুর হাতাতেই থাকে। ওরা এ-বাড়ির পরিজন হয়ে গেছে। বাড়ির সর্বত্র নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। এমনকি খাবার টেবিলেও আসে। মনে পড়ল এই প্রসঙ্গে

চড়ুইপাখি আর কাকদেরও। তারাও বাড়ির পরিজন। সুভদ্রবাবুর হাতায় অবশ্য আরও নানারকম পাখি আছে। দোয়েল, বুলবুল, ঘুঘু, হলদে পাখি, দরজী পাখি, টুনটুনি, মোহনচূড়া ফিঙে, নীলকণ্ঠ, কাজল পাখি (Shrike), তালচোঁচ এবং আরও কয়েকরকম নাম না জানা পাখি। কিন্তু এরা কেউ পরিজন হয়ে উঠতে পারেনি। ওরা সুভদ্রবাবুর শোয়ার ঘরে, খাওয়ার ঘরে যায় না কখনও। ওরা সুভদ্রবাবুর এঁটো ভাত বা চায়ের টেবিলের বিস্কুট-পাঁউরুটির টুকরো খাওয়ার জন্য গোপনে বা প্রকাশ্যে লোভ প্রকাশ করেনি কখনও। এইজন্যেই ওরা আপন হতে পারেনি। চড়ুই, কাক, শালিকদের হ্যাংলামি, চোরামি আর লোভই ওদের আপন করেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এইজন্যই আমাদের প্রিয়। শালিক দুটি সুভদ্রবাবুর দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসেছিল, সুভদ্রবাবু তাদের দিকে চাইতেই তারা একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। তারপর উড়ে গেল। সুভদ্রবাবুর এ অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে। তিনি অনুভব করেছেন দৃষ্টির একটা আঘাত আছে, পাখিরা এ বিষয়ে বড় বেশি সচেতন। পিছন ফিরে থাকলেও তারা অনুভব করতে পারে কেউ তাদের দিকে চেয়ে দেখছে। মানুষরাও পারে অনেকে। পিছন ফিরে আছে মেয়েটি, তুমি তার দিকে চেয়ে থাক, সে ঠিক ঘুরে দেখবে তোমাকে। সুভদ্রবাবুর মনে হল, মিসেস পূর্ণেন্দুও বোধ হয় এই রকম দৃষ্টিস্পর্শসচেতন ছিলেন।

সুভদ্রবাবুর যখন জন্ম হয়নি, তখনই মিসেস পূর্ণেন্দুর লীলাখেলা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু মিসেস পূর্ণেন্দুর এত রকম কাহিনী শুনেছেন তিনি যে, তাঁর কল্পনাও তাঁকে ঘিবে নানারকম ছবি এঁকেছে, অনেক সময় আজগুবি অসম্ভব ছবি, কিন্তু সে-সব ছবি এঁকে ভারি আনন্দ পেয়েছেন তিনি। মিসেস পূর্ণেন্দু গোঁড়া হিন্দু মহিলাতে রূপান্তরিত হয়ে মাতাল গোখাদক পূর্ণেন্দুকে শায়েস্তা করবার চেষ্টা করছেন এ কল্পনাটা এত পেয়ে বসেছিল তাঁকে যে, ওটা যে তাঁর কল্পনা এটা ভুলে গিয়েছিলেন দিন কতক। এখনও মাঝে মাঝে ভুলে যান। আজই তো ভুলে গিয়েছিলেন। কাঠঠোকরা পাখিটা তাঁর ভুল শুধরে দিয়ে উড়ে গেল। পাখিটা যেদিকে উড়ে গিয়েছিল, সেই দিকে চাইলেন তিনি। তারপর ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

সুভদ্রবাবু ঠিক প্রকৃতিস্থ লোক নন। অনেক ডাক্তার তাঁকে পাগল বলেছেন। তাঁর পাগলামির প্রধান লক্ষণ তিনি স্বাভাবিকভাবে খান না, স্নান করেন না, ঘুমোন না। তাঁকে নাওয়াতে খাওয়াতে আর ঘুম পাড়াতে পারলে তাঁর নাতনী মহুয়া নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু তাকে তিনি কখনও নিশ্চিন্ত হতে দেন না। মহুয়া সুভদ্রবাবুর আপন নাতনী নয়, পাতানো নাতনী। সাঁওতাল পরগনার এক মহুয়া গাছের তলায় ওকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন প্রায় কুড়ি বছর আগে। তখন তাঁর মেয়ে শ্যামলী সদ্য বিধবা হয়ে এসেছিল তাঁর কাছে। শ্যামলীই মানুষ করেছিল মহুয়াকে। মহুয়া নাম তারই দেওয়া। মহুয়ার বাবা-মার খোঁজ অনেক চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। সম্ভবত কোন ভর্তৃহীনা সাঁওতালনী জবালার ক্রোড়ে ওর জন্ম। মহুয়ার চেহারা দেখেও মনে হয়, ও সেই আদিবাসীদের একজন যাদের জীবনবীণা প্রকৃতির সুরে বাঁধা। যদিও কৃত্রিম পরিবেশে মানুষ হয়েছে, স্কুল-কলেজে পড়েছে, সাঁওতালী ভাষা জানে না, কিন্তু তবু পূর্ণিমা রাত্রে যখন জ্যোৎস্নার পাথার আকাশে থই থই করতে থাকে, যখন প্রখর সূর্যালোকে রুক্ষ প্রান্তরে চিলের ডাকে মূর্ত হয় সুরের মরীচিকা, অন্ধকারে নিশাচর পেচকের ডাকে সহসা ঘনীভূত হয়ে ওঠে যখন অজানার রহস্য, তখন মহুয়া কেমন যেন হয়ে যায়। মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। হনহন করে হেঁটে আসে খানিকক্ষণ। কিছু দূর গিয়ে কিন্তু ফিরে

আসে আবার। মনে পড়ে যায়, সুভদ্রর এখনও খাওয়া হয়নি, কিংবা নাওয়া হয়নি। সুভদ্রর পাগলামিই বাড়িতে বেঁধে রেখেছে তাকে। তা না হলে সে যেদিকে দু'চক্ষু যায় চলে যেত, ক্রমাগত চলতে থাকত, আর ফিরত না। দিনে রাত্রে জ্যোৎস্নায় অন্ধকারে পথ প্রান্তর অরণ্য পেরিয়ে চলতেই থাকত সে, ফিরত না। কিন্তু সুভদ্র তাঁকে বেঁধে রেখেছে। বার বার তাকে ফিরে আসতে হয়। বাড়িতে আছে তিনজন চাকর, একটি বুড়ী ঝি, আর তাদের ছেলেপিলেরা। সুভদ্রবাবুর আপন লোক কেউ নেই। আগে তিনি অধ্যাপক ছিলেন। রিটায়ার করেছেন অনেক দিন। শ্যামলীর মৃত্যুর পর পাগলামি দেখা দিয়েছে নানারকম। রোজ সকালে উঠে লেখেন। ওই লেখাটাই এখন তাঁর মনের একমাত্র অবলম্বন। তাঁর আর সব বিষয়ে ভুল হয়। কিন্তু লেখার টেবিলে এসে বসতে ভুল হয় না কখনও। সকালে এসেই বসেন ওখানে। তারপর আর উঠতে চান না। মহুয়াকে অনেক সাধ্য-সাধনা করে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাঁকে। তিনি যে খাতাটায় লেখেন, সে খাতার নামকরণ করেছেন 'মেঘ'। নানারকম লেখা লেখেন তাতে। এই লেখা থেকেই সুভদ্রবাবুর মনের খবর পাওয়া যায়। কিন্তু সবটা স্পষ্ট হয় না। মিসেস পূর্ণেন্দু কেন জানি না তাঁর মনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছেন। কিভাবে করেছেন, তা ও'র খাতাটা পড়লেই বুঝতে পারা যাবে। পূর্ণেন্দুবাবুর প্রকাণ্ড হলদে বাড়িটা ওঁর চোখের সামনে অহরহ দাঁড়িয়ে আছে, তার বিরাট ভগ্ন অস্তিত্ব নিয়ে। ও বাড়িতে এখন কেউ থাকে না—শেষ ভাড়াটেরা দু'বছর আগে উঠে গেছে। ভয় পেয়ে উঠে গেছে নাকি। পূর্ণেন্দুবাবু অপুত্রক ছিলেন, তাঁর এক ভাগ্নে তাঁর উত্তরাধিকারী। তিনি থাকেন মাদ্রাজে। বাড়িটা বিক্রি করতে চাইছেন অনেকদিন থেকে। দাম চাইছেন এক লাখ টাকা। খদ্দের জোটেনি। বাড়িটা সুভদ্রবাবুর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রোজ সকালে এসে ওরই দিকে চেয়ে থাকেন তিনি। ওই বাড়ি থেকেই মিসেস পূর্ণেন্দু নানারূপে আবির্ভূতা হন তাঁর মনে, নিত্যনতুন রূপ লাভ করেন তাঁর কল্পনায়, লিপির কারাগারে বন্দিনী হয়ে থাকেন কখনও সুস্পষ্ট মাধুর্যে, কখনও অস্পষ্ট হেঁয়ালীতে।

'মেঘ' থেকে উদ্ধৃত করছি কিছু কিছু।

''সমাজে বাস করতে হলে মানুষের সঙ্গে বাস করতে হয়। নিরাপদে বাস করবার জন্যেই মানুষ সমাজ সৃষ্টি করেছিল একদিন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকটি মানুষই প্রচ্ছন্ন শ্বাপদ হয়ে উঠেছে। ভদ্রতার ছদ্মবেশ পরে থাকে, সুবিধে পেলেই পেছন থেকে কামড়ে দেয়। বেদ-উপনিষদ কোরান-বাইবেল শুনিয়েও ওদের সংশোধন করা যাচ্ছে না। সাহিত্যকেও ওরা পশুত্বের রঙ্গমঞ্চ করে ফেলেছে। বকুল-ফুলের গন্ধ মেখে ফুরফুরে হাওয়াটি কাল যখন এল, তখন তাকে তাই বললাম—-দেখ মিসেস পূর্ণেন্দু, তোমার ছদ্মবেশটি মন্দ হয়নি। তুমি লোকের ঘরে ঘরে ঢুকে সুবাস বিতরণ করছ। ভালোই তো। ভদ্রতা করছ—খুব ভালো কথা। কিন্তু একটা বিষয়ে সতর্ক করে দিই তোমাকে। মানুষের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার কর, কিন্তু খুব গভীরভাবে কারো সঙ্গে মিশবার চেষ্টা করো না। তুমি তো জানই সমুদ্রের তলাতেও ডুবো-পাহাড় থাকে। তুমি পূর্ণেন্দুকে সমুদ্র ভেবেছিলে, কিন্তু তার ভিতরে যে পাহাড়টা ছিল, তার ধাক্কায় তোমার জাহাজের তলা ফেঁসে গেল। কিন্তু তুমি...এর পরই আশ্চর্য কাণ্ড হল একটা। হাওয়াটা থেমে গেল। মনে হল সে চলে গেল হঠাৎ, কোথা গেল, আবার আসবে কি—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বোঁ করে বোলতা ঢুকল একটা, আর তার পেছনে একটা ভীমরুল। কোনটা মিসেস পূর্ণেন্দু? কোনটা ইসমাইল? স্বর্ণকান্তি বোলতাটাকেই মিসেস পূর্ণেন্দু বলে মনে হচ্ছিল,

কিন্তু ভীমরুলটাই আমার ভুল ভেঙে দিল। হেসে উঠল। বলল—চেয়ে দেখ ভালো করে, আমিই মিসেস পূর্ণেন্দু। মিসেস পূর্ণেন্দুর বিলিতী নাম কি ছিল? মেরী? রুবি? জেন? রিটা? আনন্দে উচ্ছ্বসিত একটা নীলকণ্ঠ পাখি কর্কশ অট্টহাস্যে ভরিয়ে দিল আকাশটাকে। সে যেন হাসতে হাসতে আমাকে বলে গেল, আসল কথাটা তুমি খুলে বলছ না কেন? তোমার ধারণা, মহুয়াই পূর্বজন্মে মিসেস পূর্ণেন্দু ছিল। মিসেস পূর্ণেন্দুকে তুমি দেখনি, কিন্তু তাকে ভালোবেসেছ তার গল্প শুনে। তাই মহুয়ার বেশে সে এসেছে তোমার কাছে। এ কথাটা বলছ না কেন স্পষ্ট করে? ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম নীলকণ্ঠ পাখিটা উড়ে উড়ে ওই কথাটাই বলছে কেবল, আর তার সঙ্গে দুলছে কচি বাঁশের ডগাগুলো। মিত্তিরদের বাগানে ছোট একটা বাঁশঝাড় আছে। তার কয়েকটা ডগা দেখা যায় আমাব বারান্দা থেকে। নীল আকাশের পটভূমিকায় তাদের দোলন প্রায় দেখতে পাই। আজ মনে হল, তারা শুধু দুলছে না, হাসছেও।”

আর একটা লেখা।

“গন্ধরাজ গাছটার কাছে লতিয়েছে একটা কুমড়ো গাছ। কুমড়ো গাছ গাছ নয় তবু আমরা ওকে লতা না বলে গাছ বলি, কারণ লতা হওয়া সত্ত্বেও ওর মধ্যে একটা পুরুষালী ভাব আছে, আইভিলতা বা তরুলতার মধ্যে যা নেই। গন্ধরাজ গাছটার চারিদিকে নিজেকে ছড়িয়েছে কুমড়ো গাছটা। তারস্বরে যেন বিজ্ঞাপিত করছে নিজেকে। অনেক ফুল ফোটাচ্ছে, জালিও হয়েছে অনেক। কিন্তু জালিগুলো পচে যাচ্ছে। কেন? পাতাগুলো প্রাণরসে টলমল, ডাঁটাগুলো বেশ মোটা মোটা, ফুলও বেশ চমৎকার—ফলগুলো পচে যাচ্ছে কেন তাহলে। একটা থিয়োরি খাড়া করেছি। আমার মনে হচ্ছে কুমড়োগাছটা ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্সে (Inferiority Complex) ভুগছে। ও যদিও গন্ধরাজ গাছটাকে নানাভাবে বেষ্টন করে বিব্রত করেছে, কিন্তু ও মনে মনে জানে গন্ধরাজ ওর চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। এই হিংসার বিষ সঞ্চারিত হচ্ছে ওর সাবা দেহে। তাই ওর ফলগুলো মরে যাচ্ছে। কি বলো? প্রশ্নটা করে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। ভেবেছিলাম পাশেই বুঝি মিসেস পূর্ণেন্দু দাঁড়িয়ে আছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম ছোট্ট একটা ধুতরো গাছে সাদা ধুতরো ফুটেছে একটা। তার পাশের ডালেই ছোট্ট সবুজ কচি একটি ধুতরো ফল। সেই ধুতরো ফলটির উপর ভর করে স্বচ্ছ সরু রেশমের সিঁড়ি উঠে গেছে আকাশের দিকে। সেটা যে মাকড়সার জাল তা প্রথমে বুঝতে পারিনি। সেটা বেয়ে মহুয়ার মন যে নেমে এসে আমার সঙ্গে তর্ক জুড়বে তা-ও আমার কল্পনাতীত ছিল। মহুয়ার মন অনেকটা জোনাকির মতো। টিপটিপ করে জ্বলে আর নেবে, দিনের বেলাতেও তার আলো দেখা যায়, একটু করে অন্ধকার সর্বদাই ঘিরে আছে তার মনকে, তারই পটভূমিকায় তার মনের আলো জ্বলে। সেই মহুয়ার মন আলো টিপটিপ করতে করতে নেমে এল মাকড়শার জাল বেয়ে। বলল—মানুষদেরই হিংসে থাকে। গাছেদের থাকে না। যে-সব মানুষ জীবন-যুদ্ধে হেরে গেছে তারাই মক্ষিকা হয়, মধুপ হতে পারে না। কুমড়ো গাছকে তুমি অতটা হীন ভেবো না। কুমড়ো গাছ যোদ্ধা, সে ওই গন্ধরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, শুধু গন্ধরাজের সঙ্গে না, আশপাশের সকলের সঙ্গে। ওই যে সব গোছা গোছা গাছ রয়েছে, ওই যে মাথায় ছোট্ট বেগুনী ফুল নিয়ে চওড়া-পাতা লম্বা লম্বা ডাঁটাগুলো, ওই যে ও-পাশে পুটুসফুলের ঝাড়টা, এই ধুতবো গাছটা, সকলের সঙ্গে নীরবে যুদ্ধ করছে এই কুমড়োগাছ। একে তুমি তোমার বন্ধু

হরেন লাহিড়ীর সঙ্গে তুলনা করছ কেন। তোমার বন্ধুর সান্নিধ্যে এলে মনে হয় কোনও সিনেমা ল্যাভেটরিতে বা কারও অপরিষ্কৃত খাটা-পায়খানায় ঢুকে পড়েছি। কুমড়োগাছের কাছে এসে কি তা মনে হয়? ওর ফল পচে যাচ্ছে, তার কারণ এমন কোনও রোগের শত্রু এসে হানা দিয়েছে, যার সঙ্গে ও পেরে উঠছে না। কিন্তু তা নিয়ে ওর হাহাকার নেই। ও নিজের পচা ফল নিয়ে কোনও প্রদর্শনীও খোলেনি, কারও সহানুভূতি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেনি। ওর ফল যে পচে যাচ্ছে, এ খবর তোমরাই বার করেছ খুঁজে খুঁজে, নিজেদের স্বার্থের জন্য।''

মহুয়ার মনের আলোটা হঠাৎ যেন দপ দপ করে জ্বলতে লাগল। মনে হল চটেছে।

হেসে উত্তর দিলাম—'গভীর রাতে উশ্রী নদীর ঢেউয়ে দোল খেতে খেতে জ্যোৎস্না যে গান গায়, সেই গানের আভাস তোমার গলায় পাব আশা করে বসে আছি। তুমি এ কি ওকালতি-সুরে কথা কইলে। তোমাকে যে মূর্তিমতী কবিতারূপে মনে করে বসে আছি আমি!'

কবিতা-বেলুনে আলপিনের খোঁচা লাগল। মহুয়া সশরীরে এসে হাজির।

''এবার ওঠ না দাদু—আড়াইটে যে বেজে গেল। কখন নাইবে?''

''আজ না-ই বা নাইলুম—''

''তিন দিন নাওনি। আজ তোমাকে নাইতেই হবে। তোমার জন্যে ভালো ফুলেল তেল আনিয়েছি আজকে...''

''তাই নাকি? তা হলে উঠছি; কিন্তু একটি শর্ত আছে—''

''কি--''

''ফুলেল তেল আমি মাথায় মাখব না, পিঠে মাখব—''

কলকণ্ঠে হেসে উঠল মহুয়া। একটা ঝাড়লণ্ঠন যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

''বেশ, বেশ, পিঠেই মাখিয়ে দেব। তুমি ওঠ এখন—''

উঠতে হল।

''টিউ।''

হলদে পাখির ডাক। ডাকটাতে একটু ব্যঙ্গের সুর ধ্বনিত হল যেন। দুষ্টু পাখি। যদি ওকে কখনও ধরতে পারি, ওর সর্বাঙ্গে ফুলেল তেল মাখিয়ে দেব।

''ফুলেল তেল কতখানি কিনেছিস?''

''বড় এক বোতল। কেন?''

''মনে করছি হলদে পাখিটাকেও মাখিয়ে দেব—''

''ও পাখিকে ধরবে কি করে?''

''ধরেছি অনেক দিন আগে। নাম রেখেছি মহুয়া—''

আবার একটা ঝাড়লণ্ঠন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

এই ধরনের লেখা থাকে তাঁর খাতায়, যার নাম দিয়েছেন তিনি 'মেঘ'।

সেদিন তিনি অনেকক্ষণ খাতা খুলে বসে রইলেন, কিন্তু কোনও লেখা মাথায় এল না। আকাশে তুলোর মতো মেঘেরা ভেসে ভেসে চলে গেল নিরুদ্দেশ যাত্রায়। নতুন একদল পালক মেঘ এল কোন এক অজানা সুপর্ণের খবর নিয়ে। সুভদ্রবাবুর মাথায় কিংবা খাতায় কেউ এল না অনেকক্ষণ। তারপর এল। হঠাৎ এল। সুভদ্রবাবু লিখলেন।

"সকালে যে মেঘের দল আকাশে ছিল তাদের চেহারা ছিল চাপ চাপ তুলোর মতো। তাদের দেখে মনে পড়েছিল রহমান ধুনকরকে। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, তখন রহমান ধুনকর এসে আমাদের বাড়িতে তুলো ধুনে লেপতোশক তৈরি করত শীতের একটু আগে। ধন্ ধপৎ, ধন্ ধপৎ, ধন্ ধপৎ—তুলো ধোনার শব্দটা এখনও কানে বাজছে। আমি আকাশে কান পেতে ছিলাম, আশা করছিলাম, ওই তুলোর মতো মেঘগুলোকেও রহমান ধুনকর এসে ধুনে দেবে বুঝি, ধন্ ধপৎ, ধন্ ধপৎ, ধন্ ধপৎ শব্দটা আবার শোনা যাবে। কিন্তু গেল না। তার পরেই ওই হলদে বাড়িটার দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। স্পষ্ট যেন দেখতে পেলাম মিসেস পুর্ণেন্দু কাঁদছে। তার এ কি চেহারা। মেমসাহেব নয়, শ্যামলী কিশোরী। মনে হল, তার কান্না যেন কথা কইছে। আমি দৃষ্টির ভিতর দিয়ে গিয়ে নিজেকে মূর্ত করবার চেষ্টা করলাম তার পাশে, কিন্তু পারলাম না, আমার ভাষা-জ্ঞান দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম তার কান্নার ভাষাকে, তাও পারলাম না। শেষকালে আমার এই না-পারাটাকেই ভেলা করে তার দিকে ভেসে যেতে চেষ্টা করলাম সেই সমুদ্রের উপর দিয়ে, যে সমুদ্রের নাম নেই, কোনো বিশেষণ দিয়ে যার নিদারুণ ভয়াবহতা বর্ণনা করা যায় না, যে সমুদ্রে অসহায় দুরাকাঙ্ক্ষীরা ডুবে মরে চিরকাল, যে সমুদ্রের পার আছে, কিন্তু তবুও যা অপার। এই সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে যখন ভাসছি তখন হঠাৎ দেখতে পেলাম শ্যামলীর মা রহস্যকে। দেখতে পেলাম তার কনে চন্দন-আঁকা মুখটা—যা বিয়ের রাত্রে শুভদৃষ্টির সময় দেখেছিলাম চল্লিশ বছর আগে। এই চল্লিশ বছরে কত রঙের আলো পড়েছে ওই মুখের উপরে, কত রঙের পরদা দুলেছে ওই মুখের সামনে, কিন্তু আশ্চর্য, একটুও বদলায়নি সে মুখশ্রী। সেই সন্নত দৃষ্টি, অধরের সেই ভাষাময়ী ব্যঞ্জনা, সলজ্জ নীরবতার সেই আশ্চর্য মহিমা অবিকল তেমনি আছে। আমি সবিস্ময়ে দেখছি, এমন সময়ে আমাকে আরও বিস্মিত করে সে চোখ তুলে চাইল আমার দিকে। আশ্চর্য, যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন একবারও সে এমনভাবে তাকায়নি। এ দৃষ্টিকে বর্ণনা করবার ভাষা নেই আমার। একসঙ্গে অনেক কথা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, হলদে পাখির 'টিউ' ডাকের সঙ্গে যেন সাদৃশ্য আছে এর। এক ঝাঁক টিয়ে এসে বসল আর উড়ে গেল ইউক্যালিপ্টাস গাছটার মগডাল থেকে। এ দেখে মগডালের সাদা ফুলের গোছাটায় যে অবাক ভঙ্গি জাগল তার সঙ্গে ও সাদৃশ্য আছে। আর সবচেয়ে সাদৃশ্য আছে আমাদের সেই অনিশ্চিত মনোভাবের সঙ্গে, যখন আমরা কিছু না বুঝেও সায় দিয়ে বলি—হ্যাঁ, তা তো বটেই। এর প্রত্যেকটির সঙ্গে ওই দৃষ্টির সাদৃশ্য আছে, তবু এই তিনটি উপমার সাহায্যে ওর স্বরূপ বোঝানো যাবে না। এইসব ভাবছি এমন সময় এক কাণ্ড হল। আদালতে যেমন কাঠগড়া থাকে তেমনি একটা কাঠগড়ার ছবি ফুটে উঠল আকাশে আর সেই কাঠগড়ার উপর সেই দৃষ্টি মূর্ত হল স্ফুরিতাধরা যুবতীরূপে। তার হাতে একটা লাল রুমাল। মনের 'সুইচ'টা হঠাৎ অকেজো হয়ে গেল যেন। আলো নিবে গেল। আমার অন্তরতম সত্তার প্রত্যক্ষ প্রদেশ থেকে কে যেন সভয়ে বলে উঠল—লাল রুমালটা ছিল তা জানি, ও যে ওর রহস্য নামের মর্যাদা রেখেছে তা-ও আমার অজানা নয়—কিন্তু ওসব আর দেখতে চাই না, শুনতে চাই না, পরদা ফেলে দাও, পরদা ফেলে দাও। মনে হল কোনো এক অজানা প্রেক্ষাগৃহ থেকে হাততালি দিচ্ছে অসংখ্য দর্শক। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কে যেন বলে উঠল—আংকোর, আংকোর। তারপর সব নিস্তব্ধ।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মহুয়া এল—“দাদু খাবে চল, আড়াইটে বেজে গেছে—ওঠ, আর দেরি নয়—”

“তুই কোথায় ছিলি এতক্ষণ?”

“কলেজ থেকে আসছি—আমি আজ না খেয়েই কলেজ গিয়েছিলাম। চল, এক সঙ্গেই খাব আজ।”

“চল।”

কোনও আপত্তি না করেই উঠে পড়লেন সুভদ্র। তারপর হঠাৎ যেন আবিষ্কার করলেন ব্যাপারটা। “এ কি, তুই এই ভেলভেটের কোট গায়ে দিয়ে কলেজ করিস নাকি?”

মহুয়া যে ব্রাউন রঙের বেঁটে কোটটা গায়ে দিয়েছিল সেটা ভেলভেটিনের। আর সত্যিই চমৎকার সেটা। তাতে হাত বুলিয়ে সুভদ্র বললেন—“এত শৌখিন জামা গায়ে দিয়ে আমাদের কালে কলেজে যাওয়া যেত না। তোর ছাত্ররা কিছু বলে না?”

“আজকাল ছাত্র বলে কিছু নেই। যাদের আমি পড়াই তাদের মধ্যে কেউ বন্ধু, কেউ শত্রু, কেউ স্তাবক।”

“এমন চমৎকার কোটটা তুই কবে কিনলি?”

“তুমিই তো কিনে দিয়েছিলে গতবার আমার জন্মদিনে। এত ভুলো তুমি—”

“কাল, না পরশু, না তার আগের দিন—ঠিক মনে পড়ছে না, তোকে একটা রামধনু রঙের শাড়িও দিয়েছিলাম, তাতে বিদ্যুতের পাড় বসানো। তোকে রোজ এত জিনিস দিই যে, সত্যিই মনে থাকে না কিছু। বিধাতা উজাড় করে গ্রহনক্ষত্র ঢেলে দিয়েছেন আকাশের বুকে, কোনটা কবে দিয়েছেন, তা তাঁর মনে আছে কি?”

“ইস্—”

ঘাড় ফিরিয়ে চাইল মহুয়া হাসিমুখে।

তার হাসিমুখ দেখে যেন ভরসা পেলেন সুভদ্র।

সাহস করে জিজ্ঞেস করলেন—“কাল রাত্রে কোথায় যাওয়া হয়েছিল?”

একটু অবাক হবার চেষ্টা করল মহুয়া।

“কাল তুমি ব্রোমাইড খাওনি?”

“খেয়েছিলাম। কাজ হলো না। চোখ বুজে শুয়ে ছিলাম। তুমি যাওয়ার আগে আমার বোজা চোখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলে খানিকক্ষণ। তা-ও টের পেয়েছিলাম। তারপর খুট করে ছিটকিনি খোলার শব্দ হল, একটু ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকল, হাস্নুহানার গন্ধও ঢুকল এক ঝলক, সাঁওতালী বাঁশির সুরও শোনা গেল দূরে, বুঝলাম তুমি চলে গেলে। কোথায় গিয়েছিলে বলো তো?”

“যদি বলি তেপান্তরের মাঠে। বিশ্বাস করবে?”

“করব। তুমি যাওয়ার পরমুহূর্তেই পক্ষিরাজটা এসেছিল যে। তাতে আমি সওয়ার হয়েছিলাম। দেখলাম মহুয়া আলেয়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তেপান্তরের মাঠে।”

“ইস্।”

আবার ঘাড় ফিরিয়ে চাইল মহুয়া হাসিমুখে।

॥ দুই ॥

তিরিশ বছর আগে ফিরে যাওয়া যাক।

কলেজ স্কোয়ারের দক্ষিণ দিকে তিনতলা একটি বাড়ির মির্জাপুর স্ট্রীটের দিকের ঘরটিতে বসে একটি যুবক তন্ময় চিত্তে সবুজ মরক্কো দিয়ে বাঁধানো টেনিসনের গ্রন্থাবলী পড়ছিলেন। পিছন থেকে এক ফালি সূর্যালোক ঢুকেছিল ঘরে। চশমার সোনার ফ্রেমে প্রতিফলিত হয়ে সে আলো বইয়ের পাতায় অদ্ভুতরকম ছবি আঁকছিল একটা। মনে হচ্ছিল, ছোট্ট একটা সোনার হরিণ যেন নেচে বেড়াচ্ছে। মাথাটা একটু নাড়ালেই ছুটোছুটি করছে সেটা পাতার উপর থেকে নীচে পর্যন্ত। 'লেডি অব দি শ্যালট' পড়ছিলেন যুবকটি। লিলি ফুল, উইলো আর অ্যাসপেন গাছ, চারিদিকে সোনার ফসল, প্রকাণ্ড নদীর স্বচ্ছ জলধারা আর সেই বিরাট দুর্গ. যে দুর্গে একাকিনী থাকেন সুন্দরী লেডি অব শ্যালট—মুগ্ধ হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন যুবকটি। চলে গিয়েছিলেন কলকাতা ছেড়ে Camelot-এ, বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে কল্পনা-নেত্রে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করছিলেন সেই সুপ্রাচীন ব্রিটিশ বীরকে, যিনি Saxonদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। সেদিনকার খবরের কাগজটা টেবিলে পড়ে ছিল, তাতেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক খবর ছিল, কিন্তু সেদিকে কৌতূহল ছিল না তাঁর। Idylls of the king নিয়ে তন্ময় হয়েছিলেন তিনি। হঠাৎ ওই সোনার হরিণটা এসে অন্যমনস্ক করে দিল তাঁকে। তিনি একটা খেলা পেয়ে গেলেন যেন। মাথাটা একটু নাড়ালেই ছুটে পালাচ্ছে হরিণটা। লেডি অব শ্যালট থেকে সহসা তিনি চলে গেলেন লেডি অব রামায়ণের কাছে। মনে পড়ে গেল সীতার কথা। এই সোনার হরিণের জন্যেই বিপদে পড়েছিলেন তিনি। যুবকটিও পড়লেন। তিনি ভুলে গেলেন যে, আর আধ ঘণ্টা পরেই 'নি' আসবে। এসেই টেনিসনের সম্বন্ধে লেখাটা চাইবে—কিন্তু কিছু লেখবার আগে যে পড়াটা দরকার তাই তো হয়নি এখনও—সোনার হরিণটা এসে সব গোলমাল করে দিল। সুভদ্র সেন ঠিক করলেন—যুবকই সেই সুভদ্র সেন, যে সুভদ্র সেন চিরতরে হারিয়ে গেছে, যার সঙ্গে এখনকার সুভদ্র সেনের কিছুমাত্র মিল নেই (ফুলের সঙ্গে ফলের মিল থাকে কখনও ?)— সুভদ্র সেন হঠাৎ ঠিক করলেন কবিতা লিখে ফেলবেন একটা। ফাউনটেন পেন বার করলেন পকেট থেকে। তারপর টেবিল থেকে একটা ছোট খাতা তুলে ভাবতে লাগলেন চোখ বুজে। অনেকক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। একটা ভাব মনে এল। ভাবলেন, লেখবার আগে আর একবার দেখে নেওয়া যাক হরিণটাকে। চোখ খুলে দেখলেন হরিণ নেই, পালিয়ে গেছে। সূর্য সরে গেছে আকাশ থেকে। চশমার ফ্রেমে আর আলোর রেখা পড়ছে না। এই আবির্ভাব ও তিরোভাবকে সৃষ্টির একটা মহাসত্য বলে মনে হল সুভদ্র সেনের। মহাশূন্যে প্রতি মুহূর্তে হয়তো কত জ্যোতিষ্কের জন্ম ও বিলয় হচ্ছে এইরকম। হয়তো... হঠাৎ মনে হল 'নি'-ও কি হারিয়ে যাবে? ভ্রূ কুঞ্চিত করে রইলেন। তারপর লিখে ফেললেন কবিতাটা।

টেনিসনের কাব্যকুঞ্জে
হঠাৎ এসেছিল সোনার হরিণ
আকাশ থেকে।
ছুটোছুটি করে বেড়াল খানিকক্ষণ;
মনে হল তেষ্টায় ছটফট করছে।

মনে হল খুঁজছে সীতাকে।
উঁচু-পর্দায়-বাঁধা
ওগো সুর-সপ্তকের নিখাদ,
ওগো 'নি'
তুমিই কি তার তেষ্টার জল
তুমিই কি তার সীতা
তা ভালো করে বোঝবার আগেই
সে চলে গেল।
আকাশেই চলে গেল সম্ভবত।
কোন আকাশে?
আকাশ তো একটা নয়
তুমিও একটা আকাশ তো
সে আকাশে সূর্যচন্দ্রনক্ষত্র নেই
আছে ফানুস
নানা রঙের ফানুস
কে জানে
ওই সোনার হরিণটা
ফানুস হয়েই উড়ছে সেখানে হয়তো।

এর পরেই 'নি' এল সশরীরে। ছিপছিপে গড়নের মেয়েটি। দেহের কোনো অঙ্গেই রূপ নেই। বাদামী রং, কাঠি-কাঠি হাত পা, ছোট চোখ, বড় দাঁত, নাকটা খাঁদা—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—সমস্তটা মিলিয়ে এমন একটা তীক্ষ্ণ অপরূপ শ্রী—যা অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই, মুগ্ধ হতেই হবে। একাধিক লোক হয়েছে। ওর প্রথম প্রণয়ী ওর নাম রেখেছিল 'ফড়িং'। 'ফড়িং-এর মতোই অপ্রত্যাশিতভাবে লাফ দিয়ে ও পালিয়ে এসেছে তার কাছ থেকে। ওর আসল নাম নাকি কৈবল্যদায়িনী। ওর দ্বিতীয় প্রণয়ী সেটাকে নাকি ছোট করে নিয়েছিল—'কই'। 'কই'-এর কাঁটার ঘায়ে অতিষ্ঠ হতে হয়েছিল নাকি ভদ্রলোককে। বহু কিংবদন্তী, নানা ইতিহাস আছে ওর সম্বন্ধে। সুভদ্র সেনের সঙ্গে তার পরিচয় কিভাবে হয়েছিল তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর বন্ধু সৌরেন মিত্তির। সুভদ্র সেন যে জবাব দিয়েছিলেন তা অবিশ্বাস্য। বলেছিলেন—"ও হঠাৎ একদিন আবির্ভূত হয়েছিল আমার সামনে—"

"কিরকম? কোথা থেকে আবির্ভূত হলো?"

"আকাশ থেকে। সবুজ একটা প্যারাস্যুট থেকে নামল আমার সামনে। হাতে লাল রুমাল ছিল একটা। টকটকে লাল। আর ওর সমস্ত সত্তা কাঁপছিল চড়া নিখাদের মীড়ে মীড়ে।"

সৌরেন মিত্তির হেসে বলেছিলেন—"আমি কিন্তু ও মেয়েকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি একটা পার্কে। পাশে একটা মদের বোতলও ছিল—"

সুভদ্র সেন হাসিমুখে চেয়ে ছিলেন বন্ধুর দিকে। অনেকক্ষণ চেয়ে ছিলেন। তারপর বলেছিলেন—"তুমি হয়তো ওর দেহটাকে দেখেছ, ওকে দেখনি। নি-কে দেখা যায় না, নি-কে অনুভব করতে হয়—"

সেই নি সশরীরে উপস্থিত হল এসে।

"লেখাটা এখনও হয়নি কিন্তু। আশ্চর্য একটা সোনার হরিণ—"

"লেখার আর দরকার নেই। পড়াশোনা খতম হয়ে গেল। এক্স্পেলড (expelled) ফ্রম দি কলেজ।"

ধাপে ধাপে গলা চড়িয়ে হেসে উঠল নি। হাসতে হাসতে বেঁকে গেলে। তারপর হঠাৎ থেমে সুভদ্রর কাছে এসে তার থুঁতনিটা নেড়ে দিয়ে বলল—"ফেলে দাও টেনিসন। তোমার গীটারটা নিয়ে চল বেরিয়ে পড়ি।"

"কোথা যাবে? বটানিকাল গার্ডেন?"

"বড্ড পুরোনো হয়ে গেছে ও জায়গা, চল না নতুন জায়গা খুঁজে বার করি একটা। ঘন বনের ধারে ছোট্ট একটু ফাঁকা মতন। পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে নদী বইছে। দূরে নীল পাহাড় দেখা যাচ্ছে। সেইখানে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে তুমি গীটার বাজাবে, আর আমি নাচব আমার এই লাল রুমালটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। আমার নাচ দেখে বন থেকে বেরিয়ে আসবে হরিণ, আর তোমার গীটার শুনে বেরিয়ে আসবে বিরাট শঙ্খচূড় কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে ফণা তুলে শুনবে তোমার ভৈরবী, যে ভৈরবীতে কোমল 'নি' লাগে..."

আবার হাসি ধাপে ধাপে গলা চড়িয়ে।

"তারপর?"

"তারপর নদী বেয়ে ভেসে আসবে ময়ূরপঙ্খী। আর ময়ূরপঙ্খী থেকে নেমে আসবে অদ্ভুত পোশাক পরা ইটালিয়ান নাবিক একটি। তার পোশাক আর টুপি, তার ছুঁচলো দাড়ি, আর চোখের দৃষ্টি থেকে তুমি বুঝতে পারবে লোকটা জলদস্যু। কিন্তু আমার মনে হবে, কী মিষ্টি ওর মুখের হাসি। আমাকে দেখে একমুখ হেসে, টুপিটি খুলে ঘুরিয়ে এমনভাবে অভিবাদন করবে সে যে, আমি মুগ্ধ হয়ে যাব। সে বলবে—হ্যাঁ, তার কথা বেশ বুঝতে পারব আমি, যদিও আমি ইটালিয়ান ভাষা জানি না—তবু বুঝতে পারব। সে বলবে— "সিনিয়রিন্যা (Signorina), আমার অকপট অভিনন্দন গ্রহণ করুন। মহামান্য সীজার ক্যালিগুলার বংশধর সিনিয়োর্যা (Signora), আলফাবীটা আপনার নাচের খ্যাতি শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন এই ময়ূরপঙ্খী! আসুন—এই বলে সে একটু ঝুঁকে দু' হাত প্রসারিত করে অভ্যর্থনা করবে আমাকে। তার ওই হাসি দেখে আমি পা বাড়াতে যাব—এমন সময়—"

থেমে গেল 'নি'—তার চোখে চিকমিক করতে লাগল দুষ্টু হাসির ঝিলিমিলি আলো।

"তারপর?"

আবার সেই ধাপে ধাপে গলা চড়িয়ে হাসি।

"তারপর যা হল তা আশ্চর্য কাণ্ড—miracle—রূপকথা—নানা কাব্যের কোয়ালিশন। তুমি বলে উঠবে—না, তুমি যাবে না। হঠাৎ তোমার গীটার হয়ে যাবে তলোয়ার আর হাতের টুপি হয়ে যাবে কাট্লাস (Cutlass), মানে নাবিকদের হাতে যে তলোয়ার থাকে তাই। যুদ্ধ বেধে যাবে তোমাদের। ওই শঙ্খচূড় সাপটা নাগবংশীয় বীর রূপ ধারণ করে তোমার পিছনে পাঁয়তারা কষতে থাকবে। আর সেই হরিণটা আমাকে কানে কানে বলবে—এই সুযোগ, আমার পিঠে চড় এবার। আমি বিস্মিত হব। জিজ্ঞেস করব, কে তুমি? সে বলবে—আমি

গ্রীক বন্য-দেবতা প্যান। ওরা যুদ্ধ করুক, চল আমি তোমাকে নিয়ে যাই। কোথায় নিয়ে যাবে, জিজ্ঞেস করব আমি। সে বলবে, প্রথমে নিয়ে যাব লঙ্কায়, তারপরে ট্রয়ে। মুচকি হেসে উঠে বসব তার পিঠে আমি। আর সে ছুটতে থাকবে...তারপর হঠাৎ দেখব, প্রকাণ্ড একটা মেঘের উপর চড়ে ভেসে যাচ্ছি, প্যান আর হরিণ নেই, মানুষ হয়ে গেছে, কন্দর্পকান্তি যুবক, বাঁ হাত দিয়ে আমার কোমরটা জড়িয়ে ধরেছে। তারপর সে আমার কানে কানে বলবে—ওই দেখ, তোমার জন্যে কি কাণ্ড হচ্ছে। দেখতে পাব—বিরাট যুদ্ধ হচ্ছে। রাম, রাবণ, অ্যাগামেমনন, ভীম, অর্জুন, অ্যাজাক্স্ একিলিস, কর্ণ, দ্রোণ, প্যারিস, ভীষ্ম সবাই যুদ্ধ করছে আমার জন্য। প্যান আমার কানে কানে বলছে—তুমি কখনও সীতা, কখনও দ্রৌপদী, কখনও হেলেন—"

আবার সে হাসতে লাগল ধাপে ধাপে গলা চড়িয়ে। ক্রমাগত হাসতে লাগল। ক্রমশ সে হাসি রোদনে পরিণত হল। সে বলতে লাগল—"হবে না, হবে না, হবে না, আমি জানি এসব কিছুই হবে না—সেই বোসের কেবিনে গিয়ে নড়বড়ে ময়লা রেক্সিন-মোড়া টেবিলে বসে ধারে জোলো চা খেতে হবে ফাটা পেয়ালায়—"

নি কাঁদতে লাগল হু হু করে।

কতক্ষণ কেঁদেছিল তা সুভদ্র সেনের মনে নেই। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন নি নেই, চলে গেছে। পড়ে আছে সেই লাল রুমালটা, মনে হচ্ছিল এক ঝলক রক্ত যেন।

সুভদ্র সেন কুড়িয়ে রেখে দিয়েছিলেন সেটা! বাক্সের ভিতর লুকিয়ে রেখেছিলেন, ভেবেছিলেন 'নি' ফিরে এসে চাইবে। 'নি' আর ফিরে আসেনি। অনেকদিন পর এই চিঠিখানা এসেছিল।

সুভদ্র,

আমি এখন মহাসমুদ্রের ঢেউয়ের উপর ভাসছি। ঝড় উঠেছে। জাহাজটা দুলছে। সামনে টেবিলের উপর দুলছে শ্যামপেনের বোতলটা। ওপাশে চেয়ারে বসে দুলছে তোমার বন্ধু সৌরেন মিত্তির। তাকেই বিয়ে করেছি। সেই আমাকে নিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা। সমুদ্রের নাম অ্যাটলান্টিক—যার বাংলা তোমরা করেছ অতলান্তিক—আর জাহাজের নাম পেগেসাস (Pegasus)—গ্রীক পুরাণের পাখাওলা সেই ঘোড়া—যা নক্ষত্ররূপে এখনও আকাশে উজ্জ্বল—যার বাংলা নাম করতে পার পক্ষিরাজ বা উচ্চৈঃশ্রবা। হঠাৎ তোমাকে চিঠি লিখছি কেন, এ প্রশ্নের সদুত্তর নেই। তুমি উত্তর দেবে না জানি, উত্তরটা আমার অজানা তা-ও নয়, তবু প্রশ্ন করছি, তুমি কি তোমার 'নি'কে—আসলে সে স্বৈরিণী—তোমার জীবন-সঙ্গিনী করতে পারতে? আমি জানি পারতে না। আমি যে তোমার সঙ্গে মিশতাম এটা যখন জানাজানি হয়ে গেল, তখন তুমি বেশ বিব্রত বোধ করতে আমি লক্ষ্য করেছিলাম। তোমার শখ ছিল, লোভ ছিল, কিন্তু সাহস ছিল না। সৌরেন কিন্তু দুর্দান্ত। সে সমস্ত ত্যাগ করে আমাকে নিয়ে সমুদ্রে ভাসতে পেরেছে। কিন্তু তবু—। এইখানেই শেষ করি...।

এই 'তবু'র উপর সুভদ্র সেন অনেক তাজমহল, অনেক পিরামিড, অনেক ইফেল টাওয়ার বানিয়েছেন। একে একে সেগুলো মূর্ত হয়েছে, কিছুক্ষণ থেকেছে, আবার বিলীন হয়ে গেছে। সেদিন ওই 'তবু'টা অজন্তার গুহার রূপ ধারণ করেছিল, আর সেই গুহার ভিতর সুভদ্র সেন দেখছিলেন সেই বিখ্যাত ভিখারিনিকে—'নি'ই যেন সেই ভিখারিনি—নি-ই যেন আকুল উৎসুক নয়নে তাঁর দিকে চেয়ে আছে।

কিন্তু নি আর ফেরেনি সশরীরে। অশরীরিণীরূপে কিন্তু এখনও সে ঘোরাফেরা করে সুভদ্র সেনের মানসলোকে।

অতীতের যবনিকা একটু সরিয়ে দেখে নেওয়া গেল বটে সেকালের সুভদ্র সেনকে, একজন প্রেমিক লোকের দেখা পাওয়া গেল, কিন্তু আসল লোকটিকে দেখা গেল না। অর্থাৎ সে লোকটির দেখা পাওয়া গেল না, যে লোকটি রূপকথালোকে বাস করে। বাস করে বলছি বটে, কিন্তু সে বাস করে না কোথাও, সে সঞ্চরণ করে বেড়ায়। অনেক 'নি'র সঙ্গে দেখা হয় তার, কোথাও কিন্তু বাঁধা পড়ে না। অনেক স্থাবরকে জঙ্গম করেছে সে, অনেক জঙ্গমকে স্থাবর, কিন্তু বাঁধা পড়ে না কোথাও। সুভদ্র সেনের দেহটা জরার কারায় মাঝে মাঝে বন্দী-যন্ত্রণা ভোগ করে, মন কিন্তু সদা-উড়ন্ত। কত দেশের অরণ্য পর্বত সাগর আকাশ যে পার হয় তার ঠিক নাই। সত্যিই একটা পাখির মতন, সে পাখি কখনও হাঁস, কখনও ঈগল, কখনও আবার নাম-না-জানা ঝড়ের পাখি। বহু দিন আগে কাহিনীর যে টুকরোটি তিনি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন—সেই কাহিনী, সেই মিসেস পূর্ণেন্দুর কাহিনী—আর কাহিনীমাত্র নেই তাঁর কাছে, তা তাঁর কাছে সৃষ্টির প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিসেস পূর্ণেন্দুকে তিনি নানা ভাবে সৃষ্টি করছেন প্রত্যহ। ডাক্তাররা বলেন, ওইটেই পাগলামির লক্ষণ। কিন্তু মহুয়ার ধারণা অন্যরকম। তার ধারণা, দাদু প্রেমে পড়েছে। কার প্রেমে তা সে ঠিক জানে না। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়—তখন মুচকি হাসি ফুটে ওঠে তাঁর পুরু সাঁওতালী ঠোঁটে।

।। তিন ।।

সুভদ্র সেন লিখছিলেন ঃ

"সময়টা কাল হতে পারে, হাজার বছর আগেও হতে পারে, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। কারণ, এ ঘটনা কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা হবার দাবি রাখে না, এর গায়ে তারিখের কোনও লেবেল লাগানো প্রয়োজন মনে করি না। কিন্তু ঘটনাটা যে ঘটেছিল তা আমার স্পষ্ট মনে আছে। জায়গাটা পাহাড়ে। কাছে দূরে ছোট-বড় অনেক পাহাড়। কেন জানি না মনে হচ্ছিল সুইজারল্যান্ড। আমার ঠিক সামনে দিয়ে পাহাড়ী রাস্তাটা এঁকেবেঁকে উপরে উঠে গিয়েছিল। তার দু'পাশের ঝোপে থোকো থোকো বেগুনী ফুলের শোভা দেখে আমার উঠোনের শিম্বি-নগরকে মনে পড়ল। সত্যি, আশ্চর্য কাণ্ড হল একটা। অনেকদিন আগে আমার উঠোনে একটা শিম গাছ লাগিয়েছিলাম। সেই শিমগাছ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দু'দিন পর যা হয়ে দাঁড়াল তা বিস্ময়কর। ছোটখাটো মাচার সীমাকে অগ্রাহ্য করে সে উদ্দাম হয়ে উঠল। নতুন বাঁশ, পুরোনো ডালপালা, এমন কি লোহার জাল দিয়েও রোখা গেল না তাকে। সে দেওয়ালের মাথায় উঠে আকাশের সঙ্গে কথা কইতে লাগল। ঢলঢলে ঘন-সবুজ পাতা দিয়ে একটা সবুজ নগরই পত্তন করে ফেলল দেখতে দেখতে। বাধ্য হয়ে নাম দিতে হল সে নগরের শিম্বি-নগর। সে নগরে টুনটুনি, চড়াই, বুলবুলি ছাড়াও দরজী পাখিদের অবাধ যাতায়াত, বাসও করছে কেউ কেউ। ফড়িং, প্রজাপতি কাঠবিড়ালীরা ক্রমাগত ঢুকছে বেরুচ্ছে। আর ফুটেছে অজস্র বেগুনী রঙের ফুল। অজস্র! শিমও ফলেছে অনেক, হনুমানরা মাঝে মাঝে এসে

লুটপাট করে খেয়ে যায়— তবু অনেক থাকে। হঠাৎ দেখলাম সেই শিম্বি-নগরটা যেন হন হন করে উঠছে ওই পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে। স্ফুরিতাধরা বলিষ্ঠা মানবী-মূর্তি তার। সবুজ শাড়ি, গাছকোমর-বাঁধা, মাথার খোঁপায় বেগুনী ফুলের থোপনা গোঁজা। সে ওই ঝোপগুলোর কাছে গিয়ে বলছে শুনলাম—আমার ফুল তোমরা চুরি করেছ কেন। ঝোপের গাছরা অপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মৃদু হাওয়ায় দুলছে শুধু, কোনও উত্তর দিচ্ছে না। আমি ভাবলাম ওর পিছু পিছু উঠে গিয়ে ওকে থামাই। আমার উঠোনের শিম্বি-নগর বিদেশে এসে দুটো ফুলের জন্য এমন ঝগড়া করছে, এতে আমারই যেন লজ্জা করতে লাগল—কিন্তু আমাকে যেতে হল না। মানে, আমার ভুল বুঝতে পারলাম। দেখলাম, ও মানবীতে রূপান্তরিত শিম্বি-নগর নয়; ও সত্যিই একজন মানবী, এই পাহাড়টারই মালকাইন সম্ভবত। যে তার ফুল চুরি করছিল, সে দেখলাম ছুটে পালাচ্ছে বন-বাদাড় ভেঙে। মানুষ নয়, প্রকাণ্ড একটা পাখি। বার্ড অব প্যারাডাইস—ছবি দেখেছিলাম বলে চিনতে পারলাম। পিঠের দিক থেকে বেগুনী পালকের প্রপাত নেমেছে যেন, মুখে বেগুনী ফুলের পাপড়ি। খাচ্ছে আর মুচকি হাসছেও যেন।

"দুষ্টু কোথাকার—"

তাড়া করে গেল মেয়েটি। তারপর আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। দু'জনেই অবাক হয়ে গেলাম। মিসেস পূর্ণেন্দুকে এমনভাবে এখানে দেখব আশা করিনি।

"একি মিসেস পূর্ণেন্দু, আপনি এখানে—"

"ওমা, আপনি। আজকাল এখানেই তো থাকি। এই পাহাড়গুলো ইজারা নিয়েছি—"

"কেন?"

"স্বপ্নের চাষ করি এখানে। ওই দেখুন না, একটা স্বপ্ন পাখি হয়ে গেছে। আমার স্বপ্নের ফুলগুলো খেয়ে ফেলছে—একটা স্বপ্ন আর একটা স্বপ্নকে খেয়ে ফেলছে—আশ্চর্য, নয়? স্বপ্নরাও হিংস্র হতে পারে এ কখনও ভাবিনি।"

মিসেস পূর্ণেন্দুর অজ্ঞতা দেখে হঠাৎ আমার একটু মজা লাগল। আমিও এতক্ষণ মিসেস পূর্ণেন্দুর মতোই অজ্ঞ ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একটা আলোর রেখা এসে উড়িয়ে দিল আমার অজ্ঞতার কুয়াশাটাকে। আমি জ্ঞানলাভ করে মিসেস পূর্ণেন্দুকে অনুকম্পা করতে লাগলাম।

"আপনি ও পাখিটাকে চিনতে পারেননি দেখছি।"

"ওটা তো বার্ড অব প্যারাডাইস—ওর ছবি কে না দেখেছে?"

"কিন্তু ওর মধ্যে লুকিয়ে আছে শকুনি, তাকে আপনি দেখতে পাননি।"

"শকুনি?"

"হ্যাঁ, মিস্টার পূর্ণেন্দু।"

"ছি, ছি, পূর্ণেন্দুকে আপনি শকুনি বলছেন। তাকে তো আপনি চিনতেন না—"

"না, সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে যা শুনেছি—"

"কি শুনেছেন?"

"অনেক কিছু। সেসব শুনে আর কি করবেন। আমি কেবল একটা ব্যাপারে তাঁর শকুনি-পরিচয় পেয়েছিলাম। আপনি যে জীবন্ত একথা তিনি মানতে চাননি। তিনি আপনাকে মড়া ভেবেছিলেন এবং নিজে মড়াটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবেন ঠিক করেছিলেন—"

বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মিসেস পূর্ণেন্দু। আমি বললাম—"তারপর আপনি হঠাৎ

দেখিয়ে দিলেন যে, আপনিও জীবন্ত। আপনি কিংবা ইসমাইল কেউ ঠিক আইনস্টাইন নন, তবু আপনারা প্রমাণ করেছিলেন যে, প্রেমেরও একটা ফোর্থ ডাইমেনসন আছে—যা সদা-জীবন্ত, সদ্য-পরিবর্তনশীল। সেই সদা-পরিবর্তনশীল ফোর্থ ডাইমেনসন অদৃশ্য স্রোতে কবে আপনাকে এখানে ভাসিয়ে এনেছিল, কবে থেকে আপনি এই পাহাড়ী দেশে স্বপ্নের চাষ করছেন, কবে মনুষ্যরূপী শকুনি মিস্টার পূর্ণেন্দু বার্ড অব প্যারাডাইসের ছদ্মবেশে আপনার স্বপ্নের দেশে প্রবেশ করেছে এসব খবর কোথাও বিজ্ঞাপিত হয়নি। তবুও বলব হয়েছে, তা না হলে আমি জানলাম কি করে। আমি কি করে এলাম এখানে।"

মিসেস পূর্ণেন্দু কিশোরীর মতো ঘাড় নেড়ে দুষ্টুমি মাখানো হাসি হেসে বললেন — "জানি না। জানতে চাইও না—আব একটা কথা জানি কিন্তু— "

আর একটা আশ্চর্য কাণ্ড হল।

যিনি বলিষ্ঠা মানবীরূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন, তিনি সত্যিই কিশোরী হয়ে গেলেন দেখতে দেখতে। ঘাড় বেঁকিয়ে অপাঙ্গে আমার দিকে চেয়ে বললেন—"আপনি যে আসবেন তা আর একজন জানতে পেরেছে, কাল থেকে কাঁচকলা আর উচ্ছে খুঁজছে সে, পেয়েছে কিনা জানি না—"

মনে পড়ি পড়ি করেও মনে পড়ল না। মনে হতে লাগল অন্ধকারে কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, নূপুরও বাজছে, কিন্তু তার সঙ্গে কলকল-ধ্বনি, একটা নদী বইছে কি? দেখতে পাচ্ছি না, কেবল মনে হচ্ছে অনেক দূরে, অনে—ক দূরে। নদীর ওপার থেকে ডাকছে যেন কে—এসো, এসো। তবু মনে পড়ল না।

"রহস্য, রহস্য গো, আপনার বউ। সেও এখানে আছে যে—আপনি সেকালে সুক্তো ভালোবাসতেন—তাই রান্না করছে সে আপনার জন্যে—"

হেসে লুটিয়ে পড়ল কিশোরীটি, তার সবুজ শাড়ির আঁচল উড়তে লাগল হাসির হাওয়ায়।

"রহস্য আছে এখানে?—কোথা আছে?"

"ওই যে—ওই যে—ওই যে——ওই বাড়িটায়—কাঁচকলা, উচ্ছে, বাড়ি, রান্নাঘর সব পেয়েছে সে—"

হাসি, হাসি, হাসি, ক্রমাগত হাসি, হাসির তুফান উঠল একটা। পাহাড়গুলো সব উড়ে গেল, রইল শুধু সেই হাস্যপরা কিশোরীটির ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হাতটা।

"ওই যে—ওই বাড়িটায়—"

তারপর হাতটাও মিলিয়ে গেল। মনে পড়ল 'নি' এইরকম ফোয়ারা-হাসি হাসত। হঠাৎ বাড়িটা দেখতে পেলাম। আশ্চর্য হয়ে গেলাম দেখে। ওটা তো পূর্ণেন্দুবাবুর সেই হলদে বাড়িটা, আমার পাশের বাড়ি, হলদে রঙের উপর কালো কালো কাজলির দাগ, সবই সেই, তবু সেটা দেখে আশ্চর্য হলাম। বাড়িটা আমার কাছে সরে এসেছে, বেশ খানিকটা সরে এসেছে। একটা জানলা দিয়ে ভিতরের ঘরের একটা দেওয়াল দেখা যাচ্ছে। দেওয়ালের গায়ে একটা কপাট। কপাটটা ফাঁকা করে সে মুখ বাড়িয়ে চাইল আমার দিকে—হাসি-ভরা চোখ—হ্যাঁ, রহস্যই—তবু যেন রহস্য নয়। নানারকম গন্ধ যেন এক ঝাঁক ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করছে ওর মুখের চারদিকে—মুখের ওপর ছায়া ফেলেনি—গন্ধের ছায়া পড়ে না—কিন্তু তবু মুখটাকে একটু যেন বদলে দিয়েছে—আমার স্থূল বুদ্ধির গজকাঠি দিয়ে পরিবর্তনটা মাপবার চেষ্টা করছি, পারছি

না, কেবলই পারছি না, এই রকম যখন অবস্থা, তখন হঠাৎ আমি হারিয়ে গেলাম। চারিদিকে সমুদ্র—উত্তাল তরঙ্গ উঠছে আর পড়ছে—হঠাৎ এক মৎস্যনারী এসে সাঁতার কাটতে লাগল আমার পাশে। বললে—আমাকে চিনতে পার? পারলাম না। সে তখন বললে—আমি এককালে ছিলাম রোহিতানী। আমার 'তা' স্বপ্নের ডিমের উপর বসে আছে—কবে থেকে, এখন আমি তাহীনা রোহিণী। তোমার নি কিন্তু আছে আমাকে জড়িয়ে। আকাশের চন্দ্রের আমি প্রেয়সী আর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আমি নায়িকা। তোমরা—এ যুগের লেখকরা—আমার নাগাল পাওনি—নাগাল পেয়েছ যোনির, যে যোনি তোমাদের বাবা-মায়ের ছিল, ছেলেমেয়েদের আছে, ছাগল-কুকুর, পোকা-মাকড়, কার নেই. তাই নিয়ে ঘাঁটছ তোমরা—নায়িকার দেখা পাওনি, প্রেয়সীর তো নয়ই। সরে যাও, আমাকে ছুঁয়ো না। ইন্দ্রধনুসন্নিভ তার পুচ্ছ আন্দোলন করে অন্তর্ধান করল সে সেই নীলসাগরের জলে, যার উপর পূর্ণিমার চাঁদ আলো ফেলে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছে মনে হল।

আমি আরও হারিয়ে গেলাম।

তারপর আবার দেখলাম—হলদে বাড়িটা সত্যিই অনেক কাছে সরে এসেছে। আমার বাড়ির দেওয়ালে ঠেকেছে তার দেওয়াল। সবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। তারপর কানে কানে কে যেন বললে—কথাটা কাউকে বলো না যেন। কে বললে। অতীত নিশ্চয়ই নয়, অতীতকে কবি কত সেধেছেন—কথা কও, কথা কও। সে তো কোনো কথা বলেনি। কত ঐতিহাসিক অনুমানের জাল ফেলেছেন হারিয়ে-যাওয়া কথা-মুক্তাদের বিস্মৃতির সমুদ্র থেকে তোলবার জন্য। পারেননি, কত ভূতত্ত্ববিদ্ তার প্রস্তরকঠিন ঔদাসীন্যকে ফাটাবার চেষ্টা করেছে গাঁইতি-শাবল-ডিনামাইট দিয়ে—কিছু জানা গেছে কি? যায়নি। যায়নি, যায়নি, যায়নি—কিছু জানা যায়নি—কিছু জানা যায়নি। 'নি'—'নি'—'নি'।"

সুভদ্রবাবু চোখ তুলে চাইলেন। দেখলেন, এরিয়েলের বাঁশের ডগায় বসে দোয়েল সুরের জাল বুনে চলেছে। নি সুরটা নানাভাবে লীলায়িত হচ্ছে। হলদে বাড়ির দেওয়ালটা আরও অনেক এগিয়ে এসেছে। এরিয়েলের বাঁশটাও। দোয়েলের সাদায়-কালোয় পালকগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, সাদা আর কালো, আলো আর অন্ধকাব, দিন আর রাত্রি, কাক আর বক মিতালি করেছে যেন ওর সর্বাঙ্গে। 'কথাটা কাউকে বলো না যেন'—আবার কে যেন বললে কানে কানে। সুভদ্র সেন দেখলেন—ঠিক দেখলেন নয়, নিজের চোখকে আর বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি—মনে হল অনুভব করলেন—সামনে ছায়াময়ী কে একজন দাঁড়িয়ে আছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না। অথচ যেন দেখা যাচ্ছে একটা আবছা হাসি। সেই হাসি থেকেই যেন নিঃশব্দ ভাষায় আবার বিচ্ছুরিত হল—আমিই বলেছে ও কথা। আমি বর্তমান নই, অতীত নই, আমি ভবিষ্যৎ। অমৃতের প্রতি আমার লোভ, কিন্তু অমৃত আমি পাইনি, অমৃতের কাছাকাছি আসতেই কেটে দিয়েছে আমাকে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, বলেছে আমি নাকি দৈত্য। বার বার আমি হয়ে গেছি রাহু। ক্রমাগত গ্রাস করেছি চন্দ্রসূর্যকে কিন্তু হজম করতে পারিনি। ওরা যদি সর্বদাই আমাকে কেটে ফেলবার জন্যে উদ্যত না হতো তা হলে হয়তো আমি অন্যরকম হতাম। তা হলে হয়তো আমার ফুরফুরে হাওয়া বেদনার ঝড়ে পরিণত হত না, তা হলে হয়তো আমার ছায়ার ভীতি প্রেমের বাহুবন্ধনে পরিণত হত, তা হলে আমি রাহু হতাম না। আমার অর্ধেকটা অমর, অর্ধেকটা সাপ। আমি ওই সাপকেও অমর করব এই আমার পণ। কিন্তু একথা জানতে পারলেই ওরা বাধা

দেবে, ছুটে আসবে বিষ্ণু তার সুদর্শন চক্র নিয়ে। তাই বলছি, কথাটা বলো না কাউকে। কোন কথাটা গোপন রাখতে হবে? ভাবতে লাগলেন সুভদ্র সেন। তারপর দেখতে পেলেন সামনের বাড়ির দেওয়ালটা হাসছে। হাসির রং থাকে নাকি! এ হাসির কিন্তু রং আছে। হলদে রং, তার উপর কালোর ডোরা। হাসি, না বাঘ? অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন সুভদ্র সেন।

।। চার ।।

অন্ধকারের ভিতর সুরের ঝড় উঠেছে। বীণা, বেণু, সেতার, এস্রাজ, পিয়ানো বাজছে, আর বাজছে চেলো, ম্যাণ্ডোলিন, তার সঙ্গে ঢোল-মৃদঙ্গ, মাঝে মাঝে সানাইয়ের সরু সরু আর খঞ্জনীর খন্‌খন্‌ আওয়াজ, অনেক দূরে গর্জন করছে ভেঁপু আর রামশিঙে। ঢাকের গমগমে শব্দে অন্ধকার গম্ভীর হবার চেষ্টা করছে মাঝে মাঝে আবার ডুগি-তবলার চটুল বোলে চঞ্চল হয়ে উঠছে। সবগুলো যেন কিসের দোলায় দুলছে, হাসির না কান্নার, তা ঠিক করতে পারছে না মহুয়া। সে কেবল ছুটছে ওই অন্ধকারের মধ্যে। সব সময় ছুটছে না। মাঝে মাঝে থামছে। থেমে পিছু ফিরে দেখছে সে আসছে কি না। কে সে? মিস্টার চ্যাটার্জি? মোহিত সোম? মঙ্গলময়? তার দাদু? নিতান্ত ছেলেমানুষ বাবুল বোস? না, কেউ নয়! কাউকে চিনতে পারছে না সে। দেখছে কেবল কতকগুলো চাহনি...সব চাহনির একই ভাষা...। বাজনা থেমে গেল হঠাৎ। সানাইটা কেবল বাজতে লাগল। তারপর তুমুল উলুধ্বনি। খানিকটা অন্ধকার আলো হয়ে গেল। ওগুলো কি পড়ছে? খই? না ফুল? পুষ্পবৃষ্টি নাকি। অজস্র ফুলে ছেয়ে গেল চারিদিক। তারপর এল একটা মোটরকার। পদ্মফুলে মোড়া। মোটর থেকে যে নামল তার মাথায় বরের টোপর। মুখটা কিন্তু দেখা গেল না। ঝনঝন করে বেজে উঠল অ্যালার্ম ঘড়িটা। মহুয়া ঘুমোয়নি। জেগে শুয়েছিল। উঠে বসল। অ্যালার্ম ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখল। কাঁটায় কাঁটায় দুটো। রাত দুটো। উঠে পড়ল বিছানা থেকে। নিঃশব্দে আলমারি খুলে রঙীন শাড়ি বার করল। আর তার সঙ্গে বার করল ছন্দ মিলিয়ে জামা ওড়না আর দুল, নিঃশব্দে পরল সেগুলি। তারপর রবার-সোল জুতো পরে সন্তর্পণে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ছিটকিনির শব্দ হল খুট করে। সুভদ্র সেনের ঘরের দিকে চেয়ে দেখল একবার। ঘর অন্ধকার। সুভদ্র সেন চোখ বুজে শুয়ে ছিলেন। ঘুমুচ্ছিলেন না। ব্রোমাইডে সেদিনও কাজ হয়নি। ছিটকিনির শব্দে তাঁর বোজা চোখ খুলে গেল। তিনি এতক্ষণ চোখ বুজে হলদে বাড়িটা দেখছিলেন, ভাবছিলেন, ওটা অত কাছে সরে এসেছে কেন। খোলা চোখে দেখলেন, মিসেস পূর্ণেন্দু—তন্বী শ্যামা রূপসী মিসেস পূর্ণেন্দু—অন্ধকারের অজানায় পাড়ি দিচ্ছে। অভিসারে? হঠাৎ মহুয়ার মুখটা ভেসে উঠল। সে মুচকি হেসে চুপি চুপি বলল—না, অনুসন্ধান। অনুসন্ধানের তেপান্তর পার হচ্ছে নাকি মহুয়া? যাবে তুমি ওর সঙ্গে? প্রশ্নটা জিজ্ঞাসাচিহ্নের মতো দুলতে লাগল সুভদ্র সেনের চোখের সামনে। দ্বিধার দোলায় দুলতে লাগলেন সুভদ্র সেন। ওই প্রশ্নটার পিঠে চড়ে যদি বেরিয়ে পড়েন (স্বপ্নের ছোঁয়া লেগে প্রশ্ন যে কোনও মুহূর্তে পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়ে যেতে পারে তা তিনি জানেন), তাতে লাভ হবে কি? মহুয়া আলেয়া হয়ে গেছে এ তো তিনি আগেই দেখেছেন। এক রঙের আলেয়া নয়, লাল, নীল, সবুজ, হলুদ চার রঙের চারটি পরী একে একে হাসিমুখে উঁকি দিয়ে গেল তাঁর মনের বাতায়নে। লাল পরী বললে, আমি মহুয়া। নীল

বললে, আমি নয় কেন? সবুজ কিছু বললে না, হাসিমুখে চেয়ে রইল খালি। হেসে কুটিকুটি হলো হলুদ পরীটা—সে বললে, কি আশ্চর্য, আমাকে চিনতে পারছ না, দাদু? বেড সুইচ টিপে ঘরে আলো জ্বাললেন সুভদ্র সেন। সামনেই দেখতে পেলেন সদ্য বিধবা শ্যামলীর ফোটোটা। দেখতে পেলেন তার চোখের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি। শুনতে পেলেন শ্যামলীর সেই কথাগুলো, 'ওকে একটু দেখো বাবা, ও বড় দুরন্ত, বড় খেয়ালী।' দেখো? তিনি তো আগেও দেখেছেন এখনও দেখছেন—কিন্তু শ্যামলীর চোখে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি কেন? তার দৃষ্টি সহসা যেন সুভদ্র সেনের চোখে ফুটে উঠল। তিনি দেখলেন একটা বাঘ যেন হরিণকে দেখছে। এ কোন হরিণ? অনেক দিন আগে একটা সোনার হরিণকে দেখেছিলেন। টেনিসনের কাব্যকুঞ্জে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল। আলোর হরিণ আলোর দেশে চলে গেছে; নি চলে গেছে সুরের সুরলোকে। একটা জটিল প্রশ্ন জাগল মনে হঠাৎ। আলোর অভাবই তো অন্ধকার, তাহলে অন্ধকারের মধ্যেও আলো আছে, অন্ধকার মানে-নি-আলো। ওর মধ্যে নি-ও আছে তাহলে। তাহলে...সবটা গোলমাল হয়ে গেল, জলটা ঘুলিয়ে উঠল, স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তব, সংশয়ের সঙ্গে প্রত্যয়, দেখার সঙ্গে না দেখা ঘুরপাক খেতে লাগল। সুভদ্র সেন অনুভব করলেন, ইলেকট্রিক আলোতে সত্যকে দেখা যাবে না। সুইচ টিপে আলোটা নিবিয়ে দিলেন। দেখলেন হলদে বাড়ির সামনের দেওয়ালটা তাঁর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে জানলাসুদ্ধ; জানলায় পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে কে যেন। পিঠের উপর বেণী দুলছে। চিনতে পারলেন তাকে। তবু জিজ্ঞেস করলেন, "কে?"

"আমাকে তো চেনো। তবে আবার জিজ্ঞাসা করছ কেন?"

"তোমার মুখ তো দেখতে পাচ্ছি না।"

"আগে তো আমার বেণীটাকেই বেশি চিনতে।"

পা পিছলে গেলে বা জুয়াচুরি ধরা পড়ে গেলে লোকে যেমন অপ্রস্তুত হয়, তেমনি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন সুভদ্র সেন মনে মনে। একটু আশ্চর্যও হলেন। ওর চুলও তো—।

"তুমি একটু ফিরে দাঁড়াও না। তোমার মুখটাও দেখি—"

"মুখ তো দেখানো যাবে না। মুখ যে পোড়া।"

সুভদ্র সেন জানতেন, এই উত্তর পাবেন।

"কিন্তু চুলটাও তো পুড়েছিল। বেণীটা তাহলে—"

"বেণী নেই, ওটা তুমি দেখছ, কারণ ওটা তোমার কল্পনায় অমর হয়ে আছে—"

"মুখটাও কি নেই?"

"না। সতী মেয়েদের মুখ কারও কল্পনায় আজকাল অমর হয়ে থাকে না। অমর হয়ে থাকে এইসব—"

বাঁ হাতটা তুলে সে লাল রুমালটা দেখাল। সুভদ্র সেন দেখতে পেলেন, বাঁ হাতের অনামিকায় পান্নার আংটিটাও জ্বলজ্বল করছে। হঠাৎ মনে পড়ল রহস্য প্রথম যেদিন আংটিটা পরেছিল কি অপরূপ হাসিই না ফুটেছিল তার মুখে। সে মুখ আর দেখা যাবে না। কল্পনাতেও না? হঠাৎ মিসেস পূর্ণেন্দু বেরিয়ে এলেন হলদে বাড়ির দেওয়াল ভেদ করে। বললেন— "আপনার কল্পনার দৃষ্টি-শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে। আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।"

লাল বনেট আর সবুজ-গাউন পরা মিসেস পূর্ণেন্দু মুচকি হেসে বেরিয়ে গেলেন।

সুইচ টিপে আবার আলো জ্বাললেন সুভদ্র সেন। গত বছরের ক্যালেন্ডারটা চোখে পড়ল।

লক্ষ্মীর ছবি। লক্ষ্মীর বাহন পেঁচাটা মনে হল মুচকি মুচকি হাসছে। আগে গম্ভীর হয়ে থাকত। পেঁচাটাও আজ মহুয়াকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে নাকি? তারপর হঠাৎ মনে হল, মিসেস পূর্ণেন্দুও বোধ হয় ওরই খোঁজে বেরিয়ে গেল। তাই কি? ভ্রূ কুঞ্চিত করে বসে রইলেন সুভদ্র। তারপরই সবুজ গঙ্গাফড়িংটা লাফিয়ে ঢুকল জানলা দিয়ে। বাতির শেডের উপর বসে এক পা তুলে চেয়ে রইল সুভদ্রর দিকে। সুভদ্র ভাবলেন, এও নিশ্চয় মহুয়ার খবরই এনেছে। তারপরই লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল ফড়িংটা। সুভদ্র সেনের মনটাও বেরিয়ে গেল তার সঙ্গে গঙ্গাফড়িং-এর পিঠে সওয়ার হয়ে। দেহটা বসে রইল।

মহুয়া যখন রাস্তায় নেমেছিল, তখন নীরব নিথর ছিল সব। মিসেস পূর্ণেন্দুর বাড়ির পূর্ব দিকে যে রাস্তাটা সাপের মতো এঁকেবেঁকে গঙ্গার ধারে গেছে, সে রাস্তায় গেল না মহুয়া। গঙ্গায় যদি নৌকো থাকত আর সে নৌকোয় থাকত যদি মাঝি, যে মাঝি সাগরের খবর রাখে, তাহলে হয়তো যেত। সাগরেই যেতে চায় সে। কিন্তু সুযোগ পায় না। মহুয়া জানে সুযোগ সে পাবেও না। সে জানে তাকে হেঁটেই যেতে হবে, হেঁটেই অতিক্রম করতে হবে প্রান্তর, অরণ্য, পর্বত, মরুভূমি। সে বেরিয়ে দেখল চারদিক নীরব নিথর। ঝিঁঝি পোকাও ডাকছে না। দূরে একটা ছোট্ট ঝোপের ধারে সামান্য একটু আলো দেখা গেল। মাঠের মাঝে ঝোপটা। সেই দিকেই চলল মহুয়া। রোজ যায়। কিন্তু কখনও পৌঁছতে পারে না। ঝোপটা সরে সরে যায় ক্রমাগত। সে জানে পৌঁছতে পারলে দেখা যাবে—হয় মিস্টার চ্যাটার্জি, না হয় মোহিত সোম, না হয় মঙ্গলময়, না হয় দাদু (সেই দাদু, যার তেড়ি-কাটা ফোটোটা টাঙানো আছে তার শোবার ঘরে), কেউ না কেউ নিশ্চয় বসে আছে সেখানে। কিন্তু মহুয়া পৌঁছতে পারে না। চলতে চলতে তাকে ঘিরে কখনও বাজনা বাজে, কখনও বাজে না। ঝোপের ধারের আলো কখনও উজ্জ্বল হয়, কখনও হয় না। টিপ টিপ করে আলো জ্বেলে জোনাকিরা ওড়ে আশেপাশে। সুভদ্র সেন দেখতে পেলে বলতেন—ওর মনই জোনাকি হয়ে উঠেছে। চুলও উড়ছে। উড়ছে বাদুড়ের দল। উড়ছে স্বপ্ন আর কল্পনা। এর পর যা ঘটল, তাও কি কল্পনা? কার নিঃশ্বাস যেন গায়ে লাগল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মহুয়া। আজ তার চলার ছন্দে পিয়ানো বাজছিল; হঠাৎ থেমে গেল সেটাও।

দেখল, তার পাশে দীর্ঘকান্তি কে যেন দাঁড়িয়েছে এসে। চোখ মুখ কিছু দেখা যাচ্ছে না। পাওয়া যাচ্ছে শুধু অদ্ভুত একটা ফুলের গন্ধ। বকুল? রজনীগন্ধা? হাস্নুহানা? না, এ গন্ধ সে চেনে না! মনে হল—পিয়াল? পিয়াল ফুলের গন্ধ থাকলে এইরকম হত হয়তো। একথা কেন মনে হল, তা জানে না মহুয়া। পিয়াল ফুলের গন্ধ আছে কিনা তাও জানে না।

"কে আপনি?"

"তুমি তো মহুয়া।"

"হ্যাঁ।"

"মহুয়া গাছের তলায় তোমার জন্ম হয়েছিল বলে তোমার নাম মহুয়া—তাই না?"

"হ্যাঁ—"

"আমার নাম শালিম। শাল গাছের তলায় জন্ম হয়েছিল আমার। লিবাং বনে এখনও আছে সেই শাল গাছ। আর আছে সেই তিরি নদী, যার জলে শাল গাছটার ছায়া পড়ে, যে ছায়ার সঙ্গে খেলা করে মেঘের ছায়া আর রামধনুর রং, যে নদীর জলে সকালে আসে ঊষা

বিকেলে সন্ধ্যা, জ্যোৎস্নার সঙ্গে যার মিতালি, অন্ধকারের বিস্মৃতিতে হারিয়ে যায় না যে, রূপান্তরিত হয় স্বপ্নে। এর সঙ্গে তুমিও আছ মহুয়া—”

“আমি?”

“হ্যাঁ তুমি। তুমি তো শহরের নও। তুমি বনের। বন এখনও তোমায় ডাকে। শুনতে পাও না?”

“না—”

“কান পেতে শোন—”

একটা আকুল মর্মর ধ্বনিতে পূর্ণ হয়ে উঠল অন্ধকার। অভিভূত হয়ে পড়ল মহুয়া। এ মর্মর ধ্বনি তো সে শুনেছে আগে। কেবল অন্ধকার মাঠে নয়, তার রক্তের মাঝখানে।

“শুনলে?”

“শুনলাম। কিন্তু ওর মানে বুঝতে পারি না।”

“তোমার ভাষায় অনুবাদ করে দিলে হয়তো বুঝবে। বলো তো করে দিই। কবিতায় করব কিন্তু—সুরে বলব—”

“বলো—”

শালিম গুনগুন করে গান গাইতে লাগল।

তোমারি পথের পানে
চেয়ে থাকি সাঁঝ বিহানে
তবু তো পাই না দেখা
গহিনা আঁধার রাতে
জেগে থাকি তাহার সাথে
একা একা
তবু তো পাই না দেখা।
ওগো মনে পড়ছে না কি
পিয়াল বনে দোয়েল পাখি
সুরের রাখি।
বেঁধেছিল তোমার প্রাণে
সে রাখি ছিঁড়ল কবে
কে-ই বা জানে।
ছিঁড়ল কেন ছিঁড়ল কবে
কিসের টানে
পাই না দিশা ও মহুয়া।
বুঝি না কোনই মানে।

গান থেমে গেল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তারা। দু’জনের মাঝখান দিয়ে যা প্রবাহিত হতে লাগল তা নিঃশব্দ সময়ের স্রোত নয়, তা গুঞ্জন-বহুল ছন্দ-ধারা, তা অস্ফুটের ফোটার বাসনা, তা অপ্রকাশের প্রকাশ হবার আকৃতি। অস্পষ্ট কি একটা যেন স্পষ্ট হতে চাইছে মনে হল। মহুয়া বলল—“আমি কিছু বুঝতে পারছি না—”

“না পারাটাই স্বাভাবিক। তোমার ইহজন্ম আর পূর্বজন্মের মাঝখানে যে পরদাটা দুলছে তা

দৃষ্টি দিয়ে ভেদ করা যায় না। কেবল অনুভূতি দিয়ে আর কল্পনা দিয়ে যায়। আমি অনেক কষ্টে তা ভেদ করেছি, অনেক যুগ যুগান্তরে লীন হয়ে গেছে, আমার ভাষাকে তোমার ভাষা করতে আরও কত দিন কত রাত্রি লেগেছে—তবু নিজেকে স্পষ্ট করতে পারছি না, অন্ধকার এখনও জড়িয়ে আছে আমাকে—শালিমকে, তোমার সেই পূর্বজন্মের শালিমকে দেখতে পাচ্ছ না তুমি—আমার ব্যক্তি-সত্তাটাকে স্পষ্ট করতে পারিনি এখনও, কিন্তু তুমি যদি সময় দাও পারব—আমার আশার টানেই তুমি রোজ রাত্রে বেরিয়ে আসো তা আমি জানি—"

মহুয়া বলল—"না, আমি বেরিয়ে আসি ব্রাহ্ম মুহূর্তের মোহে অভিভূত হয়ে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত আমাকে রোজ ডাক দেয়। বলে—বাইরে এস, বাইরে এস, বাইরে এস। তারই ডাকে চলে আসি আমি।"

"ব্রাহ্ম মুহূর্তের খবর কে দিয়েছিল তোমায়?"

"মঙ্গলময়—"

"কে সে?"

"আমার সহকর্মী অধ্যাপক একজন। সে বলেছিল ব্রাহ্ম মুহূর্তেই জীবনদেবতার দেখা পাওয়া যাবে। তাই আমি রোজ—"

হঠাৎ শালিমের দেহটা একটু বেঁকে গেল। মনে হল একটা ধনুকও মূর্ত হল তার সামনে। তারপর—বং—। একটা কালো তীর ছুটে চলে গেল।

"আমি আবার আসব, আবার আসব, বার বার আসব—" শালিম অন্তর্ধান করল।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মহুয়া। সহসা তার স্তব্ধতাকে চিরে ডাক দিয়ে চলে গেল একটা রাত-জাগা পাখি—মিচচে—মিচচে—মিচচে। মহুয়ার মনে হল মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে। শালিম? আবার আসবে? বার বার আসবে? তারপর সে আবিষ্কার করল বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে বেশি দূর যায়নি। পূর্ণেন্দুবাবুর বাড়ির পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা সাপের মতো এঁকেবেঁকে গঙ্গার ঘাটের দিকে চলে গেছে, তারই একটু দূরে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ঝোপটা নেই, আলোটাও নেই। তারপর রোজ যা হয়, সে দিনও হল, মনে পড়ল দাদু এখনও হয়তো ঘুমোননি। নিশ্চয়ই জেগে এ-পাশ ও-পাশ করছেন। কে যেন তাকে ঘুরিয়ে দিল বাড়ির দিকে। সুভদ্র সেন চুম্বকের মতো টানতে লাগলেন তাকে। তারপর একটা হিমের আবর্ত উদ্বেলিত হয়ে উঠল তাকে ঘিরে, হতাশার আবর্ত। ব্রাহ্ম মুহূর্তে সে রোজ যাত্রা করে, কিন্তু কোথাও পৌঁছতে পারে না কেন। কেন এ ব্যর্থতা। যে ঐশ্বর্য অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে আছে, যে ঐশ্বর্যের সন্ধান কত লোক পেয়েছে, সে পাবে না কেন।

"সে ঐশ্বর্য নেই—" কে বলেছিল? মনে নেই, কিন্তু কোথায় পড়েছিল? তারই স্মৃতি যেন কথা কয়ে উঠল।

"নেই?"

"না—"

"কে আপনি—"

"আমি হারুন অল রশিদের পুত্র অল মামুন। আমি ঐশ্বর্য পাব বলে বিদীর্ণ করেছিলাম পিরামিডকে। কিচ্ছু পাইনি—"

যে বইয়ে ঘটনাটা পড়েছিল সেই বইয়ের নাম মনে পড়ল না, মলাটটা কেবল মূর্ত হয়ে উঠল মানসপটে। তারপর সেইটেই যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল তাকে।

বাড়ি ফিরে দেখল, সুভদ্র সেন আলো জ্বেলে ঘরের মাঝখানে একটা হাত একটু তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হল যেন কার সঙ্গে কথা কইছিলেন। মহুয়াকে দেখে যেন একটু থতোমতো খেয়ে গেলেন।

"তুমি কি মঙ্গলময়ের কাছে গিয়েছিলে?"

"না। কেন?"

"এখুনি খবর পেলাম যে, মঙ্গলময় অসুস্থ—"

"বাজে খবর শুনেছ। কে বললে?"

"মিসেস পূর্ণেন্দু। তিনিও একটু আগে বেরিয়েছিলেন—"

"মিসেস পূর্ণেন্দু!"

হেসে উঠল মহুয়া, আবার ভেঙে পড়ল একটা ঝাড়লণ্ঠন। কেঁপে উঠল রাতের অন্ধকার।

"ব্রোমাইড খেয়েছ?"

"খেয়েছি। কাজ হয়নি—"

"তাহলে শোও—। আমি তোমায় মাথায় অডিকোলন দিয়ে একটু হাওয়া করি—"

"করবি? সত্যি করবি?"

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ। মনে হল যেন কৃতার্থ হয়ে গেলেন।

"মিসেস পূর্ণেন্দু কিন্তু মিথ্যে নয়। তুই আসার একটু আগে এসে খবরটা দিলেন আমাকে। তুই আসার সঙ্গে সঙ্গে তোর মধ্যে মিলিয়ে গেলেন যেন মাঝে মাঝে আমার কি সন্দেহ হয় জানিস?"

"বাজে না বকে তুমি শুয়ে পড় তো—"

শুয়ে পড়ল সুভদ্র সেন।

তারপর হঠাৎ চীৎকার করে উঠল মহুয়া—"ওটা কি। ওটা কি! শালগাছ এখানে এল কি করে?"

সুভদ্র সেন বললেন—"ওটা তো পূর্ণেন্দুবাবুর বাড়ির দেওয়াল। দেওয়ালের গায়ের কালো দাগ ওটা, গাছের মতো দেখাচ্ছে—"

"দেওয়াল? দেওয়াল এখানে আসবে কি করে।"

ফিসফিস করে সুভদ্র সেন বললেন—"রোজই এগিয়ে আসছে আস্তে আস্তে—"

মহুয়া চেয়ে রইল দীর্ঘ শাল গাছটার দিকে। এরই তলায় কি শালিম জন্মেছিল?

।। পাঁচ ।।

সুভদ্র সেন লেখার টেবিলে এসে বসেছিলেন। যথারীতি চেয়েছিলেন হলদে বাড়িটার দিকে। টেবিলের উপর খোলা ছিল সেই খাতাটা যার নাম 'মেঘ'। 'মেঘ'-এর প্রথম কয়েকটি পাতায় নানা ছাঁদের অক্ষরে 'মেঘ' 'মেঘ' 'মেঘ' লেখা ছিল খালি, কয়েকটা পাতা সাদাও ছিল। যখন মাথায় কিছু আসত না, তখন মাঝে মাঝে নানা অক্ষরে 'মেঘ' শব্দটাকেই লিখতেন

তিনি। সেদিন কিন্তু তাও লিখছিলেন না। চেয়েছিলেন—হলদে বাড়িটার দিকে। হ্যাঁ, বাড়িটা সরে গেছে। কাছে এসেছিল, সরে গেছে। শুধু তাই নয়, অভিমানও করেছে, লিখতে আরম্ভ করলেন—

‘‘হলদে বাড়িটা অভিমানই করেছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি। কাল রাত্রে মহুয়া আমার মাথায় অডিকোলন দিয়ে ঝুঁকে যখন বাতাস করছিল, যখন আমি চোখ খোলবার চেষ্টা করছিলাম তখন আঙুল দিয়ে আমার চোখ বুজিয়ে দিয়ে যখন বলছিল—আবার তুমি দুষ্টুমি করছ দাদু—তখন তার চোখের ভিতর দিয়ে আমি আর একজনের ঈর্ষাতুর দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছিলাম—মিসেস পূর্ণেন্দুর। সে যেন বাঘিনীর মতো চেয়েছিল। মহুয়ার চোখের ভিতর দিয়েই সে দেখছিল আমাকে। আজ দেখছি বাড়িটা সরে গেছে। অভিমান—হ্যাঁ, অভিমানই করেছে বাড়িটা। আর একটা অভিমানের ছবি মনে পড়ছে। অনেক দিন আগে আমি সিংঘিবাগানে একটা ভাড়া বাড়িতে থাকতাম। চারতলা বাড়ি। সে বাড়ির ছাদের উপর সারি সারি জলের ট্যাংক বসানো থাকত। একটা ট্যাংকের তলাটা ছ্যাঁদা ছিল, জল পড়ত ঝর ঝর করে। মনে হত ছোট্ট একটা ঝরনা যেন। তার তলায় ছোট ছোট পাখিরা এসে স্নান করত রোজ মহানন্দে। ট্যাংকটা ভাবত এটা বুঝি তারই কৃতিত্ব। একটা খুশির আভা ফুটে উঠত তার সর্বাঙ্গে। তারপর একদিন মিস্ত্রি এল—সারিয়ে দিলে ট্যাংকটা। ঝরনা লোপ পেয়ে গেল (নায়াগ্রাও এমনি করে হয়তো একদিন লোপ পাবে।) চড়াইরা শালিকরা আর স্নান করতে আসে না। কিছুদিন পরে আর একটা ট্যাংকের তলায় ছ্যাঁদা হল সেখানে আবার ঝরনা ঝরতে লাগল। সেখানেও আবার এল স্নানার্থী চড়াই-শালিকের দল। তখন ওই প্রথম ট্যাংকটার সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন ঈর্ষা বিচ্ছুরিত হত। অভিমান ভরে সে চাইত ওই পাখিগুলোর দিকে। পাখিরা বুঝত না, কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম। আমি স্পষ্ট দেখতে পেতাম। হলদে বাড়িটার দিকে চেয়ে আজ সেই ট্যাংকটার কথা মনে পড়ছে। মিসেস পূর্ণেন্দুর ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত সেই হাতটার কথাও মনে পড়ছে। বলেছিল, রহস্যও নাকি ওখানে আছে। রহস্যকে ঘিরে যে রহস্য সেটাও আছে কি? শিম্বি-নগর থেকে একটা কাঠবেড়ালী বেরিয়ে অমন করে আমার দিকে চেয়ে আছে কেন। রহস্যটার কথা ও জানে না কি! ওর চোখে একটা উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছে, যেন রহস্যটা ওর কাছ থেকে আমি ছিনিয়ে কেড়ে নেব। টপ করে লুকিয়ে পড়ল আবার। কা কা করে দুটো কাক উড়ে গেল ঈশান কোণ লক্ষ্য করে। এ সবের অর্থ কি? এর অর্থ, রহস্য আছে—চিরকাল থাকবে। রহস্যটাকে ঘিরে যে রহস্য তা-ও থাকবে চিরকাল। তার রং বদলাবে খালি, চেহারাও বদলাবে। তার ফোটো তুলে কোনও নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা যাবে না তাকে কোনোদিন। চুল পুড়ে গিয়েছিল সেটাও সত্য। কাল তার যে বেণীরূপ দেখলাম তা-ও তো মিথ্যে নয়। রহস্য কাল তার মুখ দেখাতে চায়নি, যে ওজুহাত দেখাল আমি জানি সেটা ঠিক নয়। তাঁর মুখ পুড়েছিল কিন্তু তার পোড়ামুখ আর নেই, আবার নূতন মুখ হয়েছে তার। কিন্তু সে মুখ দেখাতে চায় না। লাল রুমালটা দেখাল খালি। অভিমান। দুর্জয় অভিমান। মনে পড়ল বাল্যসঙ্গিনী টিপুকে। প্রায়ই তার সঙ্গে ঝগড়া হত। প্রায়ই সে থুতনির উপর বুড়ো আঙুল তিনবার ঘষে মাথা নেড়ে নেড়ে বলত— তোর সঙ্গে আড়ি, আড়ি, আড়ি। তারপর ঝাঁকড়া-চুল-ভরা মাথা নেড়ে ছুটে চলে যেত। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারত না দূরে। একটু পরেই আবার এসে আমার কাছে-পিঠে ঘুরঘুর করত। আমি ছুটে গিয়ে তখন ধরে ফেলতুম তাকে। তার মুখের কাছে মুখ এনে বলতাম—বলো তো ভাই—ডাব। সে মুখ ঘুরিয়ে মুচকি হেসে বলত—ডাব। সঙ্গে সঙ্গে আমি

বলতুম—তোর সঙ্গে ভাব। আর ভাব হয়ে যেত। আজকাল অত সহজে হয় না। আজকাল সব যেন কেমন—”

লেখা থামিয়ে চুপ করে বসে রইলেন সুভদ্র সেন। এর পর কি লিখবেন, কি লিখলে তাঁর মনের ভাবটা ঠিক ফুটবে তা তিনি ভেবে পেলেন না। মনে হল বাস্তব-কল্পনা-ভাব-অভাব-প্রেম-অপ্রেম সমস্ত জট পাকিয়ে গেছে যেন। অনড় করে দিয়েছে তাঁর মনকে। পরস্পরবিরোধী দুটো উপমা মনে জাগল। একবার মনে হল লোহার জ্যাকেট পরে একটা লোহার ঘরে বন্দী হয়ে আছেন তিনি। তারপর মনে হল, না, বিরাট একটা তাসের প্রাসাদের মাঝখানে কে যেন বসিয়ে দিয়েছে তাঁকে। একটু নড়লেই সব হুড়মুড় করে পড়ে যাবে। খানিকক্ষণ বসে রইলেন অন্যমনস্ক হয়ে। তারপর সাদা পাতায় ‘মেঘ’ কথাটাকে লিখতে লাগলেন। ‘মে’-টাকে লিখলেন খুব বড় অক্ষরে। তার পেটের পুঁটুলিটার উপর দুটো চোখ আঁকলেন। অদ্ভুত দেখাতে লাগল। তারপর ‘ঘ’টা লিখলেন খুব ছোট করে। মনে হতে লাগল ‘ঘ’ যেন ‘ম’-য়ের কাঁধের উপর উঠে বসেছে। ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন লেখাটার দিকে। মুচকি হাসির আভা ফুটল ঠোঁটে, কবিতাও জাগল মনে।

‘ঘ’-এর ভারে ক্ষুব্ধ ‘ম’ আর্তনাদ ছাড়ে।
দ্বীপের সেই বৃদ্ধ যেন সিন্দাবাদ-ঘাড়ে।...

ভাবছিলেন আরও খানিকটা লিখবেন, মনে হচ্ছিল কল্পনার আবীরে মেঘ যেন রাঙা হয়ে উঠছে। কিন্তু হল না। শব্দের আবীর ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে, সুরের আবীর। মহুয়া ডাক দিল।

“দাদু, আঙুরের পায়েস হয়ে গেছে। তুমি এসো—”

আবীরে আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইলেন সুভদ্র সেন। অতীত থেকে হঠাৎ ভেসে এল একটা রঙের দিন। বহু পিচকিরির মুখ থেকে ছুটে এল রঙের ফোয়ারা, একটা শাড়ির চওড়া লাল পাড় আর একটা এলোমেলো আবীর-রাঙা বেণীও চকিতে এল আর মিলিয়ে গেল। তারপর উচ্চকণ্ঠের এক বলিষ্ঠ হাসি—‘ধরেছি, ধরেছি—এইবার?’ ইন্দ্রের হাসি। ‘ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে’—চিৎকার করছে অহল্যা। ইন্দ্র-অহল্যা? না, শেখর-রহস্য? না—না—না—না—মানব না একথা। মানব না, মানব না, মানব না। সুভদ্র সেনের অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠল। শেষ হয়ে গেল রঙের খেলা। সন্দেহের কালো জগদ্দল পাথরটা এর পর মূর্ত হল সামনে। দু’হাত দিয়ে ঠেলতে লাগলেন সেটাকে সুভদ্র সেন। না, না, মানব না, কিছুতেই মানব না তোমাকে। সরে যাও—সরে যাও। অজানা প্রেক্ষাগৃহে আবার হাততালি দিয়ে উঠল অসংখ্য লোক। কে যেন আবার তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করছে, আংকোর—আংকোর—আংকোর।

“আচ্ছা দাদু—কি কাণ্ড তোমার—মঙ্গলময় তোমার জন্যে বসে আছে যে—চল—চল—”

“ও, মঙ্গলময় এসেছে বুঝি। তাই আঙুরের পায়েস। বুঝেছি—”

“মঙ্গলময় মোটেই পায়েস ভালোবাসে না—”

“মঙ্গলময় কি ভালোবাসে, কাকে ভালোবাসে সব জানি। কতটুকু বাসে তা-ও অজানা নয়। কিন্তু আমি একটা কথা ভাবছি—”

“কি ভাবছ—”

"গ্যাঁদা ফুলের মালা হয়তো বাঁশের ডগায় মানাতো। কিন্তু ভায়োলেট ফুলের গোছা কি মানাবে, লোকটা বড্ড বেশি লম্বা। ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিসনি—"

"আমি কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিনি। ওঠ তুমি।"

মহুয়ার কণ্ঠে ধমকের সুর ফুটে উঠল। সুভদ্র সেনের মনে হল ধমক নয়, গমক।

"সত্যি বলছিস?"

কাঙালের মতো চাইলেন তার দিকে।

"কি করছ দাদু, ওঠ না—"

হাত ধরে টেনে তুলল তাঁকে মহুয়া।

সুভদ্র সেন ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন হলদে বাড়িটার দিকে। দেখতে পেলেন দোতলার জানলা ফাঁক করে কে যেন চেয়ে আছে তাঁর দিকে। তিনি সে দিকে চাইতেই জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল। আবার কে যেন তাঁর কানে কানে বলে গেল, "কথাটা কাউকে যেন বলো না—"। দেওয়াল ঘেঁষে যে করবী গাছটা দাঁড়িয়েছিল, তাতে একটা সাড়া জাগল কি? করবী ফুলগুলো পরস্পরের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসছে কেন। হঠাৎ আর একটা কথা মনে হল। একেবারে অন্য কথা।

"পায়েসে কোকোর ফ্লেভার দিয়েছিস তো।"

"দিয়েছি। মঙ্গলময় খেজুর গুড়ের ফ্লেভার পছন্দ করে। কিন্তু তোমাকে তো চিনি, কোকোই দিয়েছি—"

"আমাকে ভালোবাসিস তাহলে?"

মহুয়া নাক-মুখ কুঁচকে চাইলে তাঁর দিকে। তার নীচের পুরু কালো ঠোঁটটা দেখে একটা নূতন উপমা মনে হল সুভদ্র সেনের। টুসটুসে পাকা কালো জাম যেন। ঠিক এই সময় একটা খঞ্জন পাখি এসে বসল সামনের দেওয়ালে। তার পুচ্ছ আন্দোলনের ছন্দে সুভদ্র সেনের ভবিষ্যৎ যেন কাঁপতে লাগল।

খেতে বসে কিন্তু ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে গেল তাঁর। পায়েসে তো কোকোর ফ্লেভার নেই; এ তো খেজুরে গুড়ের পায়েস। মঙ্গলময় কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল—বাঃ কোকোর ফ্লেভার তো চমৎকার হয়েছে। আগে কখনও খাইনি। মহুয়া মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

।। ছয় ।।

আমরা সর্বদা কত কথা বলছি কত লোকে। কথার হরির লুঠ দিতে দিতে চলেছি যেন আমরা সারাজীবন। কোন কথা কাকে বললাম, কখন বললাম, কেন বললাম, তা আমাদের মনে থাকে না। গাছ অজস্র বীজ ছড়িয়ে দেয়, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে। কোন বীজ কোথায় অঙ্কুরিত হল তার সে খবর রাখে না। মঙ্গলময়ই একদিন মহুয়াকে ব্রাহ্মমুহূর্তের কথা বলেছিল। বলেছিল, "পরম সত্য ভিড়ের মধ্যেও আছে, নির্জনতার মধ্যেও আছে। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে তাকে চেনা যায় না, অনেক ছদ্মবেশী সত্য তাকে আড়াল করে থাকে। কিন্তু নির্জনতার মধ্যে ভিড়ের গোলমাল নেই। তুমি যদি নিজের ছদ্মবেশটা খুলতে পার তাহলেই পরম সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি হতে পারবে।"

"পরম সত্য কি"—প্রশ্ন করেছিল মহুয়া।

"সেটা তো তুমিই জান, দেখলেই চিনতে পারবে।"

"তাই না কি—"

স্বপ্ন নেমে এসেছিল মহুয়ার চোখে।

"কিন্তু নির্জনতা কোথায় পাব?"

"তার জন্যে শ্মশানে, অরণ্যে বা পাহাড়ে যেতে হবে না। তা তোমার শোবার ঘরেই পাবে ব্রাহ্মমুহূর্তে। রাত দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত নির্জনতা রোজ তোমার অপেক্ষায় বসে থাকে। সে সময়ে উঠতে পারলেই পাবে"—কথাটা মঙ্গলময় শেষ করতে পারেনি। কারণ ঠিক সেই সময়ই ক্লাসের ঘণ্টা বেজে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল সে ক্লাসে। তারপর ভুলে গিয়েছিল সব। মহুয়ার তখন ক্লাস ছিল না, সে একা বসেছিল কমন-রুমে। সাগর-পারে অজানা দেশের খবর পেয়ে কলম্বাসের মনে যে রঙিন উত্তেজনা জেগেছিল, ভাস্কো ডা-গামা যে উত্তেজনা নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন অজানা মহাসমুদ্রে, সেই ধরনের উত্তেজনার 'ডায়নামো' হয়ে সেদিন বসেছিল মহুয়া। ঠিক সেই সময় মোহিত সোম এসেছিল। ফুটফুটে সুন্দর ছেলেটি। মহুয়ার ছাত্র। এসে কুণ্ঠিত মুখে বলেছিল—"মহুয়াদি, আজও একটা কবিতা লিখে এনেছি। একটু দেখে দেবেন? সময় হবে কি?"

"দাও—"

হাত বাড়িয়ে কবিতাটা নিয়েছিল মহুয়া। পড়বার আগেই সে জানত কি লেখা আছে ওতে। জানত ওর কবিতায় অনন্যতা নেই, ছন্দ নেই, কিন্তু যা আছে তা-ও তুচ্ছ করবার মতো নয়। আছে পূজা, আছে অর্ঘ্য। মোহিত সোম তার পূজারী। তার পূজায় কোনও ফাঁকি নেই। সেদিন কিন্তু সে যে কবিতাটি লিখে এনেছিল তার গোড়াটা পড়েই চমকে উঠেছিল মহুয়া।

নির্জন নিঃশব্দতা মোর মনে কহে কথা
অবাঙ্‌ময়ী হলো বাগ্‌দেবী,
নির্দল হলো শতদল।
অন্ধকার সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে দেখি
আলো-হংস করে ঝলমল...

রোমাঞ্চিত হয়ে বসেছিল সে খানিকক্ষণ। হয়তো তার বাহ্যজ্ঞান—যে জ্ঞানের জোরে আমরা লৌকিকতা করি—লোপ পেয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। কারণ সে যখন বলল, 'চমৎকার হয়েছে' তখন মোহিত সেখানে ছিল না। অনেকক্ষণ আগেই চলে গিয়েছিল সে। চলে গিয়েছিল, কিন্তু নির্জনতার খবরটা রেখে গিয়েছিল। নির্জনতার মোহ দুনির্বার আকর্ষণে সেই দিন থেকেই টেনেছিল তাকে। সেইদিন রাত্রেই ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে শুয়েছিল সে। সেই দিনই তার মনে পড়েছিল যে, পাশের বাড়ির শরীর-সর্বস্ব মিস্টার চ্যাটার্জি—যাঁর মনোযোগের গুলতি থেকে প্রায়ই দু'একটা গুলি আঘাত করে মহুয়াকে এসে—কিন্তু তা সত্ত্বেও যাঁর উপর মহুয়া রাগ করতে পারেনি—(অমন একটা বলিষ্ঠ সুপুরুষের সপ্রশংস দৃষ্টির নীরব অথচ মুখর, প্রচ্ছন্ন অথচ স্পষ্ট, পাশব অথচ লোভনীয় নিবেদন অগ্রাহ্য করতে পারেনি মহুয়া, সত্যিই পারেনি, এজন্য নিজেকে সে ধিক্কার দিয়েছে, তবু পারেনি)—এই মিস্টার চ্যাটার্জিও তাকে নির্জনতার কথা বলেছিলেন একদিন। বলেছিলেন—"চলুন না মহুয়া দেবী, একটু বেড়িয়ে আসা

যাক। কি যে রোজ কলেজ থেকে ফিরে ঘুচ করে ঘরে ঢুকে পড়েন—।" অবাক মহুয়া প্রশ্ন করেছিল—"কোথা যাবেন?" "মাঠে যাই চলুন। নির্জনে আপনাকে দুটো কথা বলব।" মহুয়া যায়নি। না, মহুয়া বাইরে কোনোরকম প্রশ্রয় দেয়নি তাঁকে। কিন্তু মন থেকেও মুছে ফেলতে পারেনি। অনিন্দ্যকান্তি পশুটা মাঝে মাঝে সত্যিই প্রলুব্ধ করে তাকে। হ্যাঁ, মনে পড়ল, মিস্টার চ্যাটার্জিও নির্জনতার কথা বলেছিলেন একদিন।

প্রথম যেদিন অ্যালার্ম ঘড়িটা বেজে উঠেছিল, প্রথম যেদিন ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসেছিল মহুয়া, সেদিন তাড়াতাড়ি উঠে আগে অ্যালার্মটি বন্ধ করে দিয়েছিল সে, মনে হয়েছিল ঘড়িটা খুনি, নির্জনতাকে খুন করছে সে। ঘড়ির শব্দ যখন থেমে গেল তখন নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে খানিকক্ষণ। তারপর শুনতে পেল নির্জনতার ডাক। "আমি বাইরে আছি, বাইরে এসো। এসো অন্ধকারের সুনিশ্চয়তার মধ্যে, এসো তারা-ভরা আকাশের তলায়।" প্রথম দিনই বেরিয়ে সে দেখতে পেয়েছিল ওই আঁকাবাঁকা পথটা—যেটা সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে নদীর ঘাটের দিকে। সেই দিনই দেখতে পেয়েছিল দূরের মাঠে সেই ঝোপটা, আর তার পাশে একটু আলো। কিন্তু সেখানে সে আজও পৌঁছতে পারেনি। মনে হয় যেন জন্ম-জন্মান্তর হাঁটছে কিন্তু পৌঁছতে পারছে না। কিন্তু শালিম? শালিমের জন্যে সে তো প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু ও যে একবারে পাশে এসে দাঁড়াল সে দিন।

নিজের চারদিকে কংক্রীটের দেওয়াল তুলেছে মহুয়া। কারাগারে বন্দী করেছে নিজেকে। মঙ্গলময়ের সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। আমল দেয়নি মোহিত সোমকে। সেদিন মিস্টার চ্যাটার্জি ছোট্ট একটু শিস দিয়েছিলেন, সেদিকে ফিরে তাকায়নি। অ্যালার্ম দেয়নি ঘড়িতে। সুভদ্র সেন রসিকতা করেছিলেন—"তোর নাম মহুয়া না হয়ে মোয়া হলে বেশি মানাত। তুই মিষ্টি কিন্তু মোয়ার মতো শক্ত; দাঁত বসাতে পারছি না। মহুয়ার কোমলতা তোর নেই।" কোনো জবাব দেয়নি সে। কংক্রীটের দেওয়ালের আড়ালে আত্মগোপন করেছিল। একনায়কত্বের কঠিন আইন জারি করেছিল নিজের উপর। সেকালের যে বিবেক মরেও মরে না, সেই বিবেক হঠাৎ ডিকটেটার হয়ে উঠেছিল তার জীবনে। ঠিক করেছিল স্বপ্নকে আর সে প্রশ্রয় দেবে না। সেকালের আদর্শকে মেনে নিয়ে ভালোভাবে চলবে সে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসল মহুয়া। ঘড়িতে অ্যালার্ম দেয়নি, তবু ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দুটো। বাইরে থম থম করছে নীরব নির্জনতা। কি একটা নিশ্চল যেন সচল হবার চেষ্টা করছে।

"এসো, এসো, বাইরে এসো। তোমার জন্য কতদিন থেকে অপেক্ষা করছি। আমাকে এসে আবিষ্কার কর তুমি। তোমার আলো এসে আমার অন্ধকারে ঢাকা পদ্মকে প্রস্ফুটিত করুক। এসো, এসো, এসো—"

মহুয়া আর থাকতে পারল না। বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়ে দেখল শালিম দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার আকাশের নীচে গাঢ়তর অন্ধকারের স্তম্ভ যেন একটা।

মহুয়া যখন তার পাশে এসে দাঁড়াল তখনও স্তম্ভ স্তম্ভিত হয়েই রইল। কোনো কথা বলল না। কিন্তু তারপর যা হল তা যেন সত্যি নয়। গল্প।

তিরি নদী বইছে। বিরাট নদী। কালো জলে অসংখ্য ঢেউ। ছোট ছোট ঢেউ। রোমাঞ্চিত হয়ে

আছে তিরি, কেন কে জানে। মনে হল অকারণেই রোমাঞ্চিত হওয়াই যেন ওর স্বভাব। দুই তীরে শাল গাছের গভীর জঙ্গল। লেবাং বন। বনে একটা মর্মর ধ্বনি কাঁপছে। হঠাৎ বোঝা গেল তিরি নদী রোমাঞ্চিত কেন। প্রকাণ্ড একটা বাঘ সাঁতার দিয়ে নদী পার হচ্ছে। তার পিছনে ভেসে উঠেছে একটা কুমির। বাঘ প্রাণপণে সাঁতরাচ্ছে, কিন্তু তিরি নদী প্রকাণ্ড, তাড়াতাড়ি পার হওয়া যাবে না। কুমির নিঃশব্দ সুনিশ্চিত গতিতে অনুসরণ করছে তাব শিকারকে। সে জানে ধরবেই ওকে, যদি না—। কিন্তু সেই 'যদি না'-টাই হয়ে গেল। শাল গাছের ফাঁকে দেখা গেল ঝাঁকড়া-চুলো মেয়েটাকে, সে বাঘ আর কুমিরের দিকে চেয়েই তরতর করে উঠে গেল একটা শাল গাছ। একটু পরেই একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার বিদীর্ণ করে দিল নৈশ অন্ধকারকে। কুমির আর বাঘ দুটোই যেন তাদের গতিবেগ বাড়িয়ে দিল এই চিৎকার শুনে। একটু পরেই শালবনের ভিতর থেকে বেরুল শিরস্ত্রাণধারী অসংখ্য বলিষ্ঠ পুরুষ। প্রত্যেকেরই হাতে তীর-ধনুক। ধারা-বর্ষণের মতো অসংখ্য তীর বর্ষিত হতে লাগল বাঘ আর কুমিরের উপর। গর্জন করে উঠল বাঘটা। জলের তলায় আত্মগোপন করল কুমির। তীরের ধারা-বর্ষণ সমানে চলতে লাগল তবু। আবার সেই গগন-ভেদী চিৎকার শোনা গেল, তারপর ঝপাং করে একটা শব্দ। তীরের ধারা-বর্ষণ থেমে গেল, জ্বলে উঠল অসংখ্য মশাল। মশালের আলোয় দেখা গেল, মরা বাঘটা ভাসছে, আর সেটাকে ধরে ভাসছে সেই মেয়েটা। তার একটা হাত জলে ডোবানো। একটু পরেই সে তীরে উঠল। কয়েকটি পুরুষ এগিয়ে এসে টেনে তুলল বাঘটাকে। দেখা গেল মেয়েটির যে হাতটা জলে ডোবানো ছিল সেই হাতে সে ধরে আছে কুমিরের ল্যাজটা কুমিবটাকে ডাঙায় টেনে তুলল সে। তখনও মরেনি সেটা। বিবাট হাঁ করে তেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত মশাল তার মুখে পুরে দিল একজন। আরও অনেক লোক বেরুল শালবনের ভিতর থেকে। তারা দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল কুমিরটাকে আর বাঘটাকে৷ তখন মেয়েটা হাসিমুখে হাত তুলে দেখাল। যে হাত দিয়ে সে কুমিরের ল্যাজটা ধরেছিল, দেখা গেল, সেটা রক্তাক্ত। অনেকগুলো মাথা ঝুঁকে এগিয়ে এল, প্রত্যেকের কপালে রক্ত মাখিয়ে দিতে লাগল মেয়েটা। তারপর উঠল একটা তুমুল জয়ধ্বনি। মিলিয়ে গেল তিরি নদী, মিলিয়ে গেল লেবাং বন। কেবল লেবাং বনের মর্মর ধ্বনিতে কাঁপতে লাগল নিবিড় অন্ধকার। ক্রমশ তাও থেমে গেল।

মহুয়ার মনে হল, 'স্বপ্ন দেখলাম না কি।' সামনের আকাশে জ্বল জ্বল করছিল শুকতারা। সেই অজানা ফুলের গন্ধটা—যা তার পিয়াল ফুলের গন্ধ বলে মনে হয়েছিল সেদিন—আবার ভেসে এল কোথা থেকে। বলে গেল, 'তুমি অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলে, তাই শালিম চলে গেছে। বলে গেছে, আবার আসবে, বার বার আসবে।'

মহুয়া ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, ঘন অন্ধকারের যে স্তম্ভটা তার পাশে মূর্ত হয়েছিল, সেটা আর নেই। স্তব্ধ হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। হঠাৎ সে দূরের মাঠটা দেখতে পেল আবার। দেখল সেখানে সেই ঝোপটাও রয়েছে। তার আড়ালে আলোও জ্বলছে একটা। কিসের ঝোপ? কিসের আলো? এ প্রশ্ন বার বার জেগেছে তার মনে। উত্তরও পেয়েছে—সেইটেই তো দেখতে হবে। আবার চলতে লাগল মহুয়া। চলতেই লাগল। ক্রমাগত চলতে লাগল। আশপাশে উড়তে লাগল জোনাকির দল। আকাশের দিকে চেয়ে দেখল। শুকতারা নেই। একটা কালো মেঘে ঢাকা পড়েছিল সেটা। কিন্তু এ কথাটা মানতে চাইল না তার মন। তার মনে হল ওই জোনাকিগুলোই শুকতারা। শুকতারাই নেমে এসেছে তার কাছে। অসংখ্য জোনাকি হয়ে তাকে পথ দেখাচ্ছে।

পথ—হ্যাঁ পথ—তারই স্বপ্ন-সত্তা যেন—বিস্তৃত হয়ে আছে পথরূপে—তার প্রান্তে একটা ঝোপ, ঝোপের পাশে একটু আলো—সেটাকে ঘিরে আছে অন্ধকার আর কুয়াশার অনিশ্চয়তা। ওখানে কি সে পৌঁছতে পারবে। কিন্তু পৌঁছতে হবেই যে।

মহুয়া দ্রুতবেগে হাঁটতে লাগল।

"মহুয়াদি, আমার হাতটা একটু ধর। বড্ড ভয় করছে—"

সেই বাচ্চা ছেলে বাবুলটা তার সঙ্গ নিয়েছে নাকি। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মহুয়া—কেউ নেই। কিন্তু চলা বন্ধ হয়ে গেল তার। মনে হল রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড যে খাদটা আছে, সেখানে পড়ে গেল না তো ছেলেটা। ফিরে এল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে খাদটার পাশে। অনেকদিন আগে ওই খাদটার ভিতর একটা ভাঙা লাল কাচের টুকরো দেখেছিল সে দিনের বেলায়। তাতে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে অদ্ভুত একটা লাল রঙের ফোয়ারা উঠেছিল আকাশের দিকে। এই অন্ধকারে সেই ফোয়ারাটা আবার দেখতে পেল মহুয়া। আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল সেদিকে। কোনো আগ্নেয়গিরির আগুন ওটা? কোনো রক্তের ফোয়ারা? বাবুলের সঙ্গে কি ওর...তীক্ষ্ণ শব্দে চিৎকার করে উড়ে গেল একটা পেঁচা। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল তন্দ্রা, সুর কেটে গেল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল অন্ধকারের মোহ। ভয় ভাবনা দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভিড় করে এল নির্জনতাকে ছিন্নভিন্ন করে। সে হঠাৎ আবিষ্কার করল, সে এক পা-ও চলেনি। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক ঝাঁক জোনাকি কেবল তাকে ঘিরে উৎসবে মেতেছে। অন্ধকার তাকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরছে। যে স্বপ্নের লীলা-উল্লাসে সে এতক্ষণ দুলছিল, যাকে গতি বলে ভুল করছিল. তা বাইরে নেই। হঠাৎ তার শীত করতে লাগল। গরমের কাপড় পরে আসেনি। ফিরতে হল বাড়ির দিকে। সেই আঁকাবাঁকা পথটি আবার দেখতে পেল, গঙ্গার ঘাটের দিকে চলে গেছে। সাপের মতো। কিন্তু সাপ নয়। পথ। স্বপ্ন-সরণি নয়, সত্যিকার বাস্তব পথ, ওই পথ গঙ্গার ঘাটের দিকে গেছে। প্রত্যহ কত লোক ওই পথ দিয়ে আনাগোনা করে। কেউ যায় স্নান করতে, কেউ যায় পার হতে। খেয়া পারাপারের নৌকোও আছে ওখানে একটা। কিন্তু সাগরের সন্ধানে কেউ যায় কি ওখানে? মহুয়ার মনে হল, গঙ্গাই তো সাগরে মিশেছে—এ সম্বন্ধে কেউ কি সচেতন? হঠাৎ মনে হল, তিরি নদীর খবর কি গঙ্গা জানে? লেবাং বনের? সেই গন্ধটা—যাকে তার পিয়াল ফুলের গন্ধ বলে মনে হয়েছিল—সেই গন্ধটা ভেসে এল আবার। বলল—জানে জানে। গঙ্গা সব জানে।

একসঙ্গে ডেকে উঠল অনেকগুলো পাখি। রাত্রির শেষ যামে ঘুম ভেঙেছে তাদের।

।। সাত ।।

হলদে বাড়িটা কাছে সরে এসে আবার দূরে চলে গেল কেন, এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে সুভদ্র সেন সেদিন ছাতের আলসের উপর দু'টি মোহনচূড়া পাখির দিকে প্রত্যাশা ভরে চেয়েছিলেন, যেন তারাই সমাধান করে দেবে এই শক্ত সমস্যাটার। মোহনচূড়া পাখির ইংরেজী নাম হুপো, তাদের মাথার চূড়াটি জাপানী পাখার মতো খুলে যায়, উপ্-উপ্-উপ্ করে তারা কথা কয় মাথা নেড়ে নেড়ে। হরিণ আর জেব্রার রং তাদের গায়ে. লম্বা কালো ঠোঁট গাঁইতির মতো, চোখ দু'টি যেন ছোট ছোট কালো মুক্তো। আলসের উপর কত ভঙ্গিতেই তারা প্রেম

নিবেদন করছে পরস্পরকে। খুব কাছে আসছে, আবার দূরে সরে যাচ্ছে, লাফিয়ে উঠছে, ডিগবাজি খাচ্ছে, মাথার চূড়াটি বার বার খুলছে আর বন্ধ করছে। নিজেদের নিয়েই মত্ত ওরা। সুভদ্র সেনের সমস্যা ওরা কি করে সমাধান করবে এ যাঁরা ভাবছেন তাঁরা সুভদ্র সেনের কল্পনার দৌড়ের খবর রাখেন না। মোহনচূড়ার ঠোঁট দেখে তাঁর মনে পড়ল রমেন সিংঘিকে। ওই ঠোঁটের মতন নাক ছিল তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ছেয়ে পঙ্গপাল এসে ছেয়ে ফেলল তাঁর চেতনার দিগন্ত। মনে পড়ল অসহযোগ আন্দোলনের কথা। তিনিও অসহযোগ আন্দোলনের উন্মাদনায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন একদিন ওই রমেন সিংঘির পাল্লায় পড়ে। মহাত্মা গান্ধীর খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন একদিন। এখন মহাত্মা গান্ধী কত দূর সরে গেছেন। যারা খুব কাছে আসে, তারাই দূরে সরে যায়—এই বোধ হয় নিয়ম। সুভদ্র সেন দেখলেন, মোহনচূড়া পাখি দুটো দূরে সরে গেছে কিন্তু পরস্পরের দিকে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলে চলেছে—উপ্-উপ্-উপ্, উপ্-উপ্-উপ্। সুভদ্র সেন চাইলেন হলদে বাড়িটার দিকে, ওটাও কিছু বলছে নাকি তাঁকে। বলছে নিশ্চয়, কিন্তু তিনি শুনতে পাচ্ছেন না। উৎকর্ণ হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল শেখর চাটুজ্যেকে। রহস্যের সমবয়সী ছিল সে। সে-ও কলেজ ছেড়ে এসে যোগ দিয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনে। রমেন সিংঘির আমন্ত্রণে তিনি এসেছিলেন বটে, কিন্তু নিজেই নেতা হয়ে উঠেছিলেন পরে। তখন একটা স্কুলে মাস্টারি করতেন। চাকরি ছেড়ে এসে যোগ দিয়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলনে। কাজ ছিল মদের দোকানে পিকেটিং করা, আর বিলিতী কাপড় পোড়ানো। সহকারী ছিল শেখর চাটুজ্যে...পঙ্গপাল...পঙ্গপাল...পঙ্গপাল...ধোঁয়া...ইনকিলাব জিন্দাবাদ...মহাত্মা গান্ধীর জয়...অম্বর গুপ্ত...উকিল অম্বর গুপ্ত—বন্ধু ছিল তাঁর—বন্ধু? হ্যাঁ, পরিচিত লোককেই তো বন্ধু বলে মনে করি আমরা।—বন্ধু? হা-হা-হা, মনের ভিতর অট্টহাস্য করে উঠল মিসেস পূর্ণেন্দু। সুভদ্র সেন হলদে বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলেন—উপ্ উপ্ উপ্—ডেকে চলেছে মোহনচূড়া দুটো—তার সঙ্গে দুলছে হলদে বাড়ির খোলা জানলার কপাট একটা। হাওয়া নেই তবু দুলছে। সুভদ্র সেন বুঝলেন, হলদে বাড়িটা তাঁর সঙ্গে কথা কইছে—তার কথা উপ্ উপ্ উপ্ নয়, তার কথা ওই কপাটের দোলন। অনেকক্ষণ প্রত্যাশা ভরে দেখতে লাগলেন—দুলছে, কেবলই দুলছে কপাটটা। তারপর বুঝতে পারলেন। রহস্যও তো একদিন দুলেছিল সন্দেহ-দোলায়, যখন অম্বর গুপ্ত বলেছিল—তোমার বউকেও নামাও এই আন্দোলনে। জওহরলাল নেহরুর মা, বউ এই আন্দোলনে নেমেছেন। বাসন্তী দেবী নেমেছেন— তুমিই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? আমার বউ নেই, থাকলে তাকেও নামাতাম আমি। আবার তাঁর মনের মধ্যে শোনা গেল মিসেস পূর্ণেন্দুর অট্টহাসি। তারপর একটি মেয়ের পিছন দিকটা দেখতে পেলেন তিনি। খদ্দরের শাড়ি পরে হাতে একটা খদ্দরের থলি দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে গেল। মিসেস পূর্ণেন্দু? না রহস্য? দু'জনেই তো খদ্দরের শাড়ি পরেছিল। মিস্টার পূর্ণেন্দুই ছিল মিসেস পূর্ণেন্দুর খদ্দরের শাড়ি, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল তাকে। আর রহস্য তো সত্যিকার খদ্দর পরেছিল, তার পরতে খুব কষ্ট হতো, তবু তাঁর অনুরোধে (অনুরোধ না হুকুমে?) পরেছিল সে খুব মোটা একটা খদ্দরের শাড়ি, বাদামী রঙের শাড়িটা, লালপাড়। একটুও মানায়নি। তবু পরেছিল আর তবু ওই পোশাকই মুগ্ধ করেছিল অনেককে... তিনি যেন দেখতে পেলেন ওই শাড়িটা পরে রহস্য মদের দোকানে পিকেটিং

করছে, শেখর চাটুজ্যে তার পেছনে রয়েছে। তাঁর বন্ধু অম্বর গুপ্ত জেলে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন রোজ...হ্যাঁ, তিনি যখন জেলে ছিলেন তখন অম্বরই রোজ আসত তাঁর কাছে—শহরের সব খবর কুড়িয়ে আনত। তার একটা কথা মনে পড়ল হঠাৎ—'তোমার বউই দেশের অন্ধকার দূর করবে। দশ দিক আলো করে বেড়াচ্ছে...।' উপ্ উপ্ উপ্—উপ্ উপ্ উপ্—শব্দের এক বিচিত্র জাল বুনে চলেছে মোহনচূড়া দুটো। দূরে একটা বাবলাগাছকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে স্বর্ণলতা, তাতে পড়েছে মেঘ চাপা সূর্যের কিরণ, মনে হচ্ছে বিরাট একটা সোনালী ব্যাঙের ছাতা যেন ছত্রপতি হতে চাইছে। তারপর? তারপর? তারপর? কোনও উত্তর খুঁজে পেলেন না সুভদ্র সেন। ঢেউ, ঢেউ, ঢেউ, ঢেউ-এর পর আবার ঢেউ, তারপর আবার। সব একরকম।

হঠাৎ খাতাটা বার করে লিখলেন ঃ কোনো কিছুর সমাধান কখনও হয়নি, কখনও হবে না। বিধাতা তাঁর বিরাট রহস্যলোকে অসংখ্য রহস্যই সৃষ্টি করেছেন কেবল। সে রহস্য যখন রূপান্তরিত হয় তখন তাকে সমাধান বলব না, আর একটা রহস্য বলব। সমাধান হলেই তো খেলা শেষ হয়ে গেল। বিধাতা খেলা শেষ করতে চান না। তাই কোনও প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন না। তাঁর পর্বত, তাঁর আকাশ, সমুদ্র নির্বাক। ভাবটা যেন, আমি উত্তর দেব কেন, উত্তরটা তুমিই আন্দাজ কর। আন্দাজ? কোটি কোটি বছরের আন্দাজ পাষাণে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, উদ্ভাসিত হয়ে আছে আকাশের লক্ষ লক্ষ সূর্য-নক্ষত্রে, লক্ষ লক্ষ লাইব্রেরিতে লক্ষ লক্ষ অক্ষরের কারাগারে, কিন্তু—। সহসা সেই বেণীটা—যে বেণীটা পুড়েও পোড়েনি...। সেইটে দেখতে পেলেন যেন সহসা। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেটা হারিয়ে গেল। কিন্তু ফিরে এল আবার নূতন রূপে।

"দাদু, কফি খাবে? আমি খাচ্ছি—"

"খাবো—খাবো—"

অস্বাভাবিক উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠলেন সুভদ্র সেন। হাত থেকে কলমটা পড়ে গেল। হেঁট হয়ে তুলতে গিয়ে দেখলেন তাঁর টেবিলের পায়াতে অদ্ভুত সুন্দর সবুজ ছোট্ট একটি প্রজাপতি চুপ করে বসে আছে। এত গোলমালেও বিচলিত হয়নি। তপস্যা করছে নাকি! কি প্রগাঢ় তপস্যা। মহুয়ার ডাকেও বিচলিত হয় না। 'দশ দিক আলো করে বেড়াচ্ছে'—অম্বর গুপ্তর কথাটা আবার শুনতে পেলেন, আবার দেখতে পেলেন তার মুখের ব্যঙ্গ-কুঞ্চিত মুচকি হাসিটা। হঠাৎ মনে হল পুরাকালের শূলে-দেওয়া শাস্তিটা যদি এখনও প্রচলিত থাকত আর আমি যদি বিচারক হতাম, অম্বর গুপ্তকে আমি শূলে দিতাম। তারপর মনে পড়ল তা অসম্ভব হত, কারণ অম্বর গুপ্ত মারা গেছেন কয়েক বছর আগে।

"দাদু এসো-না, কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

ছোট্ট প্রজাপতিটার এইবার তপোভঙ্গ হল। হঠাৎ উড়ল সেটা। সুভদ্র সেন দেখতে পেলেন তার ডানার নীচের দিকটা আশ্চর্য লাল। এই আশ্চর্য লাল রংটাকে এতক্ষণ সবুজের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল ও। 'তোমার রহস্যও কি রাখেনি?' মিসেস পূর্ণেন্দু বলে গেলেন কানে কানে ফিসফিস করে। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন সুভদ্র সেন। অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে। মহুয়া নিজেই চলে আসছে। হাতে একটা ট্রে আর তার উপর কফির সরঞ্জাম।

"নাও—"

"কফি তো আনলি, কি ফি নিবি—"

"বত্রিশ টাকা।"

"তার মানে। তুই টাকায় ফি নিবি! তুই যে এত বড় বস্তুতান্ত্রিক জড়বাদী তা তো জানতাম না।"

"আমি নেব না। নেবে ডাক্তার বোস। তাঁকে আমি 'কল' দিয়েছি। মৃগাঙ্ক ডাক্তারের ব্রোমাইড মিকশ্চার খেয়ে তোমার কিছু হচ্ছে না। পাগলামি আরও দিন দিন বাড়ছে যেন। আমারও কি যেন হয়েছে, ঠিক রাত দুটোর সময় ঘুম ভেঙে যায় রোজ। তারপর আর বিছানায় থাকতে পারি না, বাইরে চলে যেতে হয়। তাই ডাক্তার বোসকে ডেকেছি। উনি একজন মেন্টাল ডিজিজ স্পেশ্যালিস্ট।"

"সর্বনাশ। কিন্তু এই সর্বনাশের মধ্যেও একটু আনন্দের সুর বাজিয়েছিস তুই।"

"সেটা আবার কি?"

"আমার নৌকোয় নিজেকেও তুলেছিস—"

তারপর দু'হাত তুলে মোটা বেসুরো গলায় গেয়ে উঠলেন—

"ডাক্তার বোস করবে কি আর এসে
ভেসে ভেসে
এক নৌকোয় আমরা দু'জন যাব
জনম-জনমান্তরের দেশে।"

কলকণ্ঠে হেসে উঠল মহুয়া। ভেঙে পড়ল একটা ঝাড়লণ্ঠন।

"তোমার কবিতা দেখছি আরও জড়বাদী। বত্রিশ টাকার উল্লেখ শুনেই পট করে বেরিয়ে এল।"

"একটা কথা জানিস? অধিকাংশ কবিরা আর লেখকরা পয়সার জন্যে লেখেন—"

"জানি বই কি।"

"সত্যি ডাক্তার ডেকেছিস?"

"আমার মাথা হয়তো একটু খারাপ হয়েছে। কিন্তু অতটা খারাপ হয়নি। তবে ষোল টাকা খরচ করেছি। তাঁর চেম্বারে গিয়েছিলাম। তোমার কথা, আমার কথা, সব বললাম। তিনি একটা বিদ্‌ঘুটে নাম বললেন—স্কিজোফ্রেনিয়া। বললেন, এই মানসিক ব্যাধির সূত্রপাত হয়েছে বলে তাঁর মনে হচ্ছে।"

"তুই কি বললি?"

"আমি একটু মুচকি হেসে চলে এলাম। তবে তোমার কবিতার 'ওই জনম-জনমান্তরের দেশে' লাইনটা শুনে মনে হচ্ছে, আমার জনম-জনমান্তরের খবর নিয়ে মাঝে মাঝে কে একজন যেন আসতে আরম্ভ করেছে আমার কাছে —জানি না এটা আমার মাথা-খারাপের লক্ষণ কিনা।"

"কে লোক?"

"শালিম।"

"সে আবার কে!"

"লিবাং বনে শালগাছের তলায় জন্ম হয়েছিল তার। আমার যেমন হয়েছিল মহুয়াগাছের তলায়! এই সূত্রে সে আমার সঙ্গে আত্মীয়তা দাবি করেছে।"

"কখন আসে সে?"

"আমি যখন রাত দুটোয় উঠে বেরিয়ে পড়ি, তখন মাঠে তার সঙ্গে দেখা হয়—"

"ডাক্তার না ডেকে ওঝা ডাক। তুই কোনো ভূত-টুতের পাল্লায় পড়েছিস।"

"কিন্তু আমার ভয় করেনি এক দিনও।"

"ওইটে তো আরও ভয়ের কথা।"

"আমি যখন রোজ রাত দুটোর সময় বেরিয়ে যাই, তখন তুমি বুঝতে পার?"

"রোজ। তুই তো আমার বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যাস—"

"তোমার বুকের উপর দিয়ে!"

"হ্যাঁ। বাইরের অন্ধকারে আমার সমস্ত বুকটা যে পাতা থাকে।"

"তার মানে।"

"মনে হয় পৃথিবীতে যত অমানিশীথিনী এসেছিল তারা কেউ মরেনি, আমার বুকের ভিতর তারা বাসা বেঁধেছে। দিনের বেলা তারা ছোট্ট হয়ে গুটি পাকিয়ে থাকে, কিন্তু রাত্রে অন্ধকারে নামলে তারাও সব বেরিয়ে আসে, আর বাইরের অন্ধকারে মিশে যায়। তখন আমার ভিতরের অন্ধকার আর বাইরের অন্ধকার হয়ে যায় একাকার। অন্ধকারের বিরাট একটা অতলান্তিক সমুদ্র আর সেই সমুদ্রের উপর অন্ধকার জাহাজে দুলতে থাকে 'নি'।"

"নি?"

"হ্যাঁ, সুরসপ্তকের নিখাদ।"

"কফিটা খাও। মনে হচ্ছে শিজোফ্রেনিয়াই হয়েছে তোমার। কেমন হয়েছে কফি?"

"বলব না।"

"কেন?"

"অনির্বচনীয়কে 'চমৎকার' বা 'খাসা' বলে খেলো করতে পারব না। এইটুকু শুধু বলতে পারি, কফির কাপটা বড় ছোট।"

"আর এক কাপ নাও না। পটে আরও কফি আছে।"

মহুয়া আরও খানিকটা কফি ঢেলে দিলে তাঁকে।

"বেশি খেও না। এমনিতেই তো তোমার ঘুম হয় না।"

"অমনিতেও হবে না। ঘুম বোধ হয় ডিউটি ফাঁকি দিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে নিজেই ঘুমুচ্ছে। জানিস? ঘুম নামে একটা জায়গা আছে। পৃথিবীর যত ঘুম বোধ হয় সেইখানেই ঘুমুচ্ছে। তোরও তো রাত্রে ঘুম হয় না। রোজ দুটোর সময় বেরিয়ে পড়িস।"

"তুমি তো আমাকে বারণ করনি এক দিনও—"

"না। আমার মতে মর্নিং ওয়াক করা ভালো।"

"মর্নিং ওয়াক ওকে বলো তুমি?"

"ইংরেজী মতে রাত বারোটার পরই মর্নিং হয়। আমাদের মতে ব্রাহ্মমুহূর্তে। সেই সময়

অন্ধকার-নিমজ্জিত সমস্ত পৃথিবী দম বন্ধ করে একাগ্র চিত্তে আলোকে ডাকে। সে ডাক শোনা যায় না, তা অনুভব করতে হয়। করেছিস কোন দিন?''

''করেছি। রোজই করি। কিন্তু সেটা কি রকম তা যেন জানতে চেও না।''

''একটুও বলবি না। আভাসে একটু?''

''শুধু বলতে পারি, দূরে একটা মাঠে ছোট্ট একটা ঝোপ দেখা যায় আর তার পাশে একটু আলো। মাঝে মাঝে শালিম দেখা দেয়। আর মনে হয় হাঁটছি হাঁটছি হাঁটছি, ক্রমাগতই হেঁটে চলেছি, কিন্তু ওই ঝোপটার কাছে কিছুতেই পৌঁছতে পারছি না।''

''কোথায় সে ঝোপ?''

''দিনের বেলায় দেখেছি সে মাঠও নেই, ঝোপও নেই।''

''বুঝেছি—''

''কি বুঝেছ?''

''শিচজোফ্রেনিয়া।''

পিওন একটা চিঠি দিয়ে গেল। দেখা গেল চিঠির ভিতর একটা ফোটো রয়েছে। সুভদ্র সেন ভ্রূ কুঞ্চিত করে পড়তে লাগলেন চিঠিখানা। তারপর খামে চিঠিখানা পুরে যখন চাইলেন মহুয়ার দিকে, তখন তাঁর দৃষ্টি উদ্ভাসিত।

''কার চিঠি দাদু?''

''নাম দিয়ে তাকে সীমাবদ্ধ করতে চাই না। নামটা মনেও নেই। চিঠিতেও ও তো নিজের নামের উল্লেখ করেনি। সুতরাং আপাতত ওকে অনামিকা বললে ক্ষতি নেই। চিঠিতে ও এমন একটা ঘটনার উল্লেখ করেছে, যা আমি ভুলিনি, তাই তাকে চিনতে পারছি, যদিও নামের দ্বারা চিহ্নিত করতে পারছি না। নামটা আত্মগোপন করে আছে। যাক, নামেতে কি এসে যায়। ঘটনাটা কিন্তু ভারি ভালো। এরকম ভালো ভালো ঘটনার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়। ছেলেবেলায় একটা চানাচুরওলা স্কুলে এসে চানাচুর ফেরি করত। চানাচুর নয়, যেন অমৃত। ওরকম চানাচুর আর খাইনি কখনও। তারও নামটা ভুলে গেছি। চেহারাটা মনে আছে। রাজপুত্রের মতো। গায়ে পা পর্যন্ত লম্বা ঝুল-ওলা একটা পাঞ্জাবি, মাথায় গোলাপী রঙের পাগড়ি, চোখে নীল চশমা, আর পায়ে নূপুর, রূপকথালোকের জীব। আমাদের স্কুলে আসত মাঝে মাঝে। এ মেয়েটিও রূপকথালোকের, অনেক দিন আগে এসেছিল। রোজ সকালে আমার পায়ে এসে এক আঁজলা ফুল দিত। কোনও দিন যুঁই, কোনও দিন বকুল, কোনও দিন চাঁপা, কোনও দিন বেলি। সেই কথাটাই লিখেছে চিঠিতে। আর লিখেছে। ও কিছু দিন পরে তেহরান চলে যাচ্ছে। ওর এখানকার বাড়িটা খালি পড়ে থাকবে। লিখেছে, আমি গিয়ে ওর বাড়িতে কিছু দিন যদি থাকি তা হলে ও কৃতার্থ হবে। কলকাতার একটা ঠিকানা দিয়েছে, সেখানে খবর দিলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। যাবি? চল না, সামনেই তো তোর পুজোর ছুটি।''

''মেয়েটি নিজের ফোটো পাঠিয়েছে নাকি।''

''না। অত বেরসিক সে নয়—''

''তবে কিসের ফোটো ওটা?''

''ওর বাড়ির।''

"দেখি।"

ফোটোখানা দেখেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল মহুয়া। এ যে তিরি নদীর ধারে লেবাং বন। এঁকেবেঁকে চলে গেছে নদীটা, আর নদীর ওপারে ঘন বন। নদীর এপারে একটি পাহাড়, পাহাড়ের উপর তাজমহলের মতো বাড়ি। পাহাড়ের তলা থেকে সিঁড়ির সারি উঠে গেছে বাড়ি পর্যন্ত।

"জায়গাটা কোথা দাদু?"

"জানি না। যদি যেতে চাও কলকাতার এই ঠিকানায় খবর দিতে পারি—"

"মেয়েটি কি তোমার ছাত্রী ছিল?"

"দেখ্, ওসব খবর জানতে চাসনে। সে কুমারী ছিল, না সধবা ছিল, না বিধবা ছিল, ছাত্রী ছিল, না ছাত্রীর মাসীমা ছিল—এসব খবর অবান্তর। যেটা আসল খবর সেটা গোড়াতেই বলেছি—"

"চিঠিটা পড়তে পারি?"

"আপত্তি নেই। কিন্তু পারবি কি?"

চিঠিটা খুলে মহুয়া দেখল, যে ভাষায় সেটা লেখা সে ভাষা তার জানা নেই।

"উর্দুতে লেখা নাকি?"

"না, ফার্সিতে।"

।। আট ।।

মহুয়া যেন নিজের ডায়রিতে লিখছে—

এর পর ফাঁক। অনেকখানি ফাঁক। দৃষ্টি কোথাও আটকাচ্ছে না। মনে হচ্ছে দিগন্তও নেই যেন। আকাশ কোথাও নামেনি। সোজা চলে গেছে। হাওয়া বইছে। এলোমেলো হাওয়া। হাওয়ায় কিসের যেন ইঙ্গিত। আর একটা মিষ্টি গন্ধ। দূর্বাদলশ্যাম বিরাট একটা প্রান্তরের মাঝে একা বসে আছি। উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছি। কার? তা জানি না। অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটবে হয়তো, তারই অপেক্ষায় বসে আছি। অপেক্ষা করাটাই জীবনের একমাত্র কাজ, অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না সেটা। হাওয়াটা হঠাৎ আমাকে ঘিরে ঘিরে নাচতে লাগল। মনে হল ইঙ্গিতটা অর্থময় হয়ে উঠছে। গন্ধটা তীব্রতর হল। উন্মুখ হয়ে উঠল আমার মন। প্রশ্ন করলাম—কে তুমি, কিছু বলবে আমাকে? নাচের বেগ বেড়ে গেল, গন্ধটা আরও তীব্র হয়ে উঠল। তারপর হঠাৎ কল্পনাকে চিনতে পারলাম। বুঝলাম, সে আজ কথা কইবে না। তার ইঙ্গিতময় গন্ধভরা নৃত্য দিয়ে সে কেবল আকুল করে তুলবে। আজ এই তার খেয়াল।

তারপর দেখতে পেলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম। রূপকথালোকের সেই পথটাকে। পথ নয়, যেন জ্যোৎস্নার ফালি, চিকচিক করছে বিরাট একটা কালো নদীর উপর। তার উপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন সুভদ্র সেন আর মহুয়া। চলেছেন সেই তাজমহলের মতো বাড়িটার দিকে, যা সু-উচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত, অনেক সিঁড়ি পার হয়ে পৌঁছতে হয় সেখানে, যে পাহাড়ের ধার দিয়ে বয়ে গেছে একটা নদী, যে নদীর ওপারে একটা বিরাট বন। আর তাদের পিছু পিছু চলেছে পূর্ণেন্দুবাবুর সেই প্রকাণ্ড পুরোনো হলদে বাড়িটা, হলদে বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে আছে নীল-

নয়না একটি মেয়ে। তার মুখে মৃদু হাসি, চোখে দুষ্টুমি ভরা চাহনি, সোনালী চুল হাওয়ায় উড়ছে। মিসেস পূর্ণেন্দু। আর একটা জানলায় দাঁড়িয়ে আছে আর একটি ফরসা সুন্দরী মেয়ে, তার মাথায় লম্বা বেণী, তার চোখ কুচকুচে কালো, তার হাতে টকটকে লাল রুমাল। শুধু সুন্দরী নয়, অপূর্ব সুন্দরী। অম্বর গুপ্তের ভাষায় 'দশ দিক আলো-করা' সুন্দরী। রহস্য কিন্তু হাসছে না। বড় বেশি গম্ভীর। আর এই সমস্তটাকে আচ্ছন্ন করে বাজছে একটি মাত্র চড়া সুর—নি। সে সুর দেখা যাচ্ছে না, শোনাও যাচ্ছে না, তবু বাজছে। পিছনে ভেসে ভেসে চলছে এক দল রঙীন মেঘ। তার কোনোটাতে আছে মঙ্গলময়, কোনোটাতে মোহিত সোম, কোনোটাতে মিস্টার চ্যাটার্জি। আর সবার শেষে ছায়ার মতো আসছে শালিম।

দিলদরিয়ায় বান ডেকেছে হঠাৎ।

সুভদ্র সেন ভাবছেন—

কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্না।

চারিদিকে মনে হচ্ছে নীল আর কালো মখমল মোড়া। দূরে একটা টিট্টিভ পাখি কোথায় যেন ডাকছে, কাকে যেন প্রশ্ন করে চলেছে ইংরেজীতে—ডিড্ হি ডু ইট্? ডিড্ হি ডু ইট্? ডিড্ হি ডু ইট্? এই তীক্ষ্ণ প্রশ্নের পটভূমিকায় ঝঙ্কৃত হচ্ছে ঝিল্লিধ্বনি। রাত্রির নীরবতা তবু নষ্ট হয়নি। সে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেন?

সুভদ্র সেন বসে আছেন সিঁড়ির উপর। কয়েক ধাপ নীচে মহুয়াও বসে আছে। কারও মুখে কোনও কথা নেই। তাজমহলের মতো বাড়িটা আকাশের গায়ে দেখা যাচ্ছে তিলকের মতো। তার চার পাশে ঝলমল করছে কালপুরুষের নক্ষত্রগুলো। আর্দ্রা আর বাণরাজ কিছু বলছে কি আলোর ইশারায়?

সুভদ্র সেন বললেন—"এত সিঁড়ি ভাঙতে হবে তা আন্দাজ করতে পারিনি। এ যে অনেক সিঁড়ি—"

"আমার কেমন মনে হচ্ছে ওখানে আমরা পৌঁছতে পারব না।"

"পৌঁছতেই হবে।..."

"যে ঝোপটার উদ্দেশ্যে প্রতি রাত্রে হাঁটি, যার কাছে কোনও দিন পৌঁছতে পারিনি, সেটা দেখছি ওই বাড়িটার পাশে রয়েছে। তাই মনে হচ্ছে ওখানে পৌঁছতে পারব না।"

"পৌঁছতে হবেই। তোমার জীবনের জট তোমাকেই ছাড়াতে হবে।"

"জট মানে?"

"কৌতূহল। অবশ্য ভাগ্য ভালো হলে বীরেন্দ্র বা রমজু এসে তোমাকে আড়োয়ারি মাছ খাইয়ে দিতে পারে। কিন্তু সব সময়ে তারা আসে না, তাদের উপর নির্ভর করে বসেও থাকা যায় না—"

"বীরেন্দ্রই বা কে, রমজুই বা কে?"

"তোকে আমি বলিনি গল্পটা? আশ্চর্য তো! আমার ধারণা আমার সব গল্পই তোকে একাধিকবার বলেছি। যৌবনে আমার স্বভাব ছিল গঙ্গার ধারে গিয়ে বসা। তখন আমি একটা গুজব শুনেছিলাম যে, মিসেস পূর্ণেন্দু নাকি গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ছোট ছেলেমেয়ে যেমন অনেক সময় বায়না ধরে, অকারণে ঘ্যানঘ্যান করে, আমার কল্পনা তেমনি

আমার মনে ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল—চলো তুমি গঙ্গার ধারে। ওখানে যখন সন্ধ্যার আলো গঙ্গার জলে পড়বে তখন সেই আলো সাঁতরে মিসেস পূর্ণেন্দু দেখা দেবে তোমাকে—সদ্যস্নানসিক্তবসনা চিকুর সিন্ধুশীকরলিপ্ত। তখন গঙ্গার চেহারাও ছিল সিন্ধুর মতোই। তাই বসতাম গিয়ে রোজ গঙ্গার ধারে। একদিন দেখলাম গঙ্গার জলে শিহরন তুলে কি যেন ভেসে আসছে আমার দিকে। কাছে আসতেও বুঝতে পারলাম না কি ওটা। পরে জানতে পারলাম এক ঝাঁক আড়োয়ারি মাছ । একটা ছোঁড়া সেখানে ছিল, সে-ই আমাকে জ্ঞানদান করল। সে এও বললে, সাধারণ জালে ওই মাছ ধরা পড়ে না। রমজু জেলের কাছে একরকম জাল আছে, সেই জালে ওই মাছ ধরা পড়ে। রমজু জেলে খেয়ালী লোক, কখনও থাকে মুঙ্গেরে, কখনও ভাগলপুরে, আবার কখনও চলে যায় তার শ্বশুরবাড়ি তালঝারি। সে ব্যবসায়ী জেলে নয়, শৌখিন মৎস্যশিকারী। রোজই দেখতে পাই গঙ্গার জলের উপর সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে আড়োয়ারি মাছের ঝাঁক। তাদের দেহটা দেখা যায় না, দেখা যায় চোখগুলো। মাঝে মাঝে সন্দেহ হত, মিসেস পূর্ণেন্দুই বুঝি সহস্র-চক্ষু মেলে খুঁজছে আমাকে। তারপর বন্ধু বীরেন এল হঠাৎ একদিন। দেখি সে-ও গঙ্গার ধারে ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাতে বন্দুক। কে যেন তাকে খবর দিয়েছে, গঙ্গায় আজকাল চখা এসেছে। চখার দেখা না পেয়ে আমার দেখা পেয়ে গেল সে। আমি তাকে দেখিয়ে দিলাম আড়োয়ারি মাছের ঝাঁককে। বললাম—ওরাই হয়তো ছদ্মবেশী চখা। আজকাল সবাই তো ছদ্মবেশী। মাছের ঝাঁকের উদ্দেশে দড়াম দড়াম করে বন্দুক চালিয়ে বসল বীরেন্দ্র। অনেক ছররা যেন ছিনিমিনি খেলে গেল গঙ্গার জলের উপর। একটু পরেই দেখা গেল অনেকগুলো মাছ ভেসে উঠছে। সেই ছোঁড়াটা—যে আমার কাছে ঘুবঘুর করত, যার কাছে আড়োয়ারি মাছের খবর পেয়েছিলাম—সে লাফিয়ে পড়ল জলে এবং উলঙ্গ হয়ে নিজের কাপড় দিয়ে ছেঁকে অনেকগুলো মাছ তুলে ফেলল। ওরকম সুস্বাদু মাছ অনেকদিন খাইনি। রমজুও একদিন খাইয়েছিল, কিন্তু রমজু বা বীরেন সব সময় আসে না। দৈব অনুগ্রহ করলে আসে। আর একটা কথা না বললেও গল্পটা সব বলা হবে না। আড়োয়ারি মাছের ঝাল খেতে খেতে মনে হয়েছিল, মিসেস পূর্ণেন্দু যদি সত্যি নদী সাঁতরে আসত তা হলে এর চেয়ে বেশি আনন্দ দিতে পারত না—"

"তুমি প্রায়ই মিসেস পূর্ণেন্দুর কথা বলো, তাঁর যেসব গল্প তোমার কাছে শুনেছি তাব কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল নেই কিন্তু—"

"কালীর সঙ্গে দুর্গার বা সরস্বতীব কোনো মিল আছে কি? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রত্যেকেরই আলাদা চেহারা, তেত্রিশ কোটি দেবতার তেত্রিশ কোটি রূপ—অথচ প্রত্যেকেই নাকি পরম ব্রহ্ম, উপনিষদে যাকে নিরাকার, নির্গুণ, নিরুপাধি, নির্বিকার বলেছে। মিসেস পূর্ণেন্দুও সেইরকম—একটা আইডিয়া মাত্র—বিদ্রোহের একটা প্রতীক। আমার কল্পনা তাকে নানা রঙে নানা ঢঙে সাজিয়ে আনন্দ পাচ্ছে। কিন্তু একটা কথা কি জানিস, নিজেকে তবু আমি ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না, অর্থাৎ সত্যি কথাটা বলতে বাধছে। সত্যি কথাটা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি অথচ বলতে পারছি না।"

এই বলে খানিকক্ষণ চুপ করে গেলেন সুভদ্র সেন। তারপর বললেন—"এইটেই বোধ হয় সত্যের লক্ষণ। সত্যকে অনুভব করা যায়, প্রকাশ করা যায় না। প্রকাশ করতে গেলেই তার চেহারা যায় বদলে।"

মহুয়া কোনো উত্তর দিল না। সে সবিস্ময়ে নীচের সিঁড়িগুলোর দিকে চেয়ে ছিল। মঙ্গলময় আসছে, তার পিছু পিছু মিস্টার চ্যাটার্জি, স্কুলের ছেলে বাবুলটাও লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছে, ও যা মনে মনে বলছে তাও যেন মহুয়া শুনতে পেল—'মহুয়াদি. তুমি অত উপরে নাগালের বাইরে চলে গেলে কেন, আমি যে আর সিঁড়ি ভাঙতে পারছি না।' তারপর হঠাৎ নজর পড়ল আকাশের দিকে। চাঁদের ঠিক নীচেই একটা সোনালী মেঘ ভাসছে। তার উপর রয়েছে মোহিত সোম। কবিতা আবৃত্তি করছে, কবিতাটাও যেন শুনতে পেল মহুয়া—সিঁড়ি ভেঙে তোমার কাছে যাব না। গেলে পরেও জানি তোমায় পাব না। যেটাকে এতক্ষণ ঝিল্লিধ্বনি মনে হচ্ছিল সেটা যে মোহিত সোমের কণ্ঠস্বর তা এতক্ষণ বুঝতে পারেনি বলে আরও বিস্মিত হল মহুয়া। মনে হল মোহিত সোমকে কতটুকু চিনি আমি। মাঠের মাঝখানে ছায়া-স্তম্ভের মতো শালিমও দাঁড়িয়ে আছে। সে যেন প্রতীক্ষা করছে। সে যেন জানে, মহুয়া তারই কাছে আসবে। নীরবতা দিয়ে সে রূপকথার জাল বুনে চলেছে, সে জালটা যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

"মনে নেই কি মহুয়া, যেদিন দস্যু শার্দূল সর্দার তোমাকে লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিল, তোমাকে উলঙ্গ করে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করেছিল তারপর তোমাকে নাচতে বাধ্য করেছিল আর একদল উলঙ্গিনী ধর্ষিতার সঙ্গে, সেদিন তোমার আর্ত ক্রন্দনে এবং উদ্দাম নৃত্যে ঝড় উঠেছিল লেবাং বনে, যেদিন তিরি নদীর উত্তাল তরঙ্গমালায় জেগেছিল ক্ষুব্ধ গর্জন, আকাশে বিসর্পিত হয়েছিল বিদ্যুতের অগ্নিরেখা, যাদের আহ্বানে উত্তেজিত হয়ে আমি এসেছিলাম আমার হস্তিযূথ নিয়ে, আমার দলের সেরা হাতি পর্বত শুঁড়ে করে তুলে তোমাকে বসিয়ে দিয়েছিল আমার পাশে—এসব কি মনে পড়ছে না তোমার মহুয়া?..."

মহুয়া মনে মনেই উত্তর দিল—"পড়ছে, কিন্তু আমি অসহায়। বর্তমানের দুর্গে নূতন কারাগারে বন্দিনী হয়ে আছি, অতীতে ফিরে যাব কি করে?"

তারপরই চমকে উঠল মহুয়া। লেবাং বনে হাতির ডাক শোনা গেল আর সঙ্গে সঙ্গে সুভদ্র সেনও যেন তার কথারই উত্তর দিলেন—"যাওয়া যায়। কিন্তু আস্তে আস্তে যেতে হবে—"

"অতীতে ফিরে যাওয়া সম্ভব?"

"আমি কি কিছু বললাম নাকি?" —বিস্মিত সুভদ্র সেন প্রশ্ন করলেন।

"বললে তো—"

"তোমাকে বলিনি। রহস্যকে বলেছি। তোমার দিদিমা ওই হলদে বাড়িটার জানলায় দাঁড়িয়ে আমাকে বলছে, আমার কাছে কি ফিরে আসা যায় না? আমি তারই কথার উত্তর দিচ্ছিলাম মনে মনে। সেটা যে কথায় বলে ফেলেছি তা খেয়াল ছিল না। তা এক হিসেবে ভালোই হয়েছে, আমার অনেক দিন থেকেই ধারণা, রহস্য তোমার ভিতরই আত্মগোপন করে আছে।"

"ইস—"

তারপরই সুরের তুবড়ি ছুটিয়ে ডেকে উঠল পাপিয়াটা— চোখ গেল, চোখ গেল।

ভেঙে গেল দিবাস্বপ্ন। লুপ্ত হয়ে গেল সব। প্রখর দিবালোকে, আবার ফিরে এল তারা। খালি কফির কাপের সামনে বসে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল দু'জনেই।

মহুয়া হেসে বললে—“আমি মনে মনে সত্যিই চলে গিয়েছিলাম তোমার ওই আরব্য-উপন্যাসের বাড়িতে—”

“আমিও। মনে মনে অনেক সিঁড়ি ভেঙেছি—”

“আমিও।”

কলকণ্ঠে হেসে উঠল মহুয়া।

“চল না দাদু, সত্যি সত্যি যাই। কলকাতায় খবর দাও।”

“কোথাও যেতে হলে মনে মনে যাওয়াই ভালো। কোনও ঝঞ্ঝাট নেই, কোনও মেহনত নেই, কোনও খরচ নেই। তা ছাড়া মনে মনে দেখলে তার বাস্তব রূপ ছাড়া আর একটা অবাস্তব অতীন্দ্রিয় রূপ দেখা যায়। বাস্তবে গিয়ে দেখবি হয়তো সিঁড়িগুলো ভাঙা, ইট বেরিয়ে রয়েছে, কিংবা দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। মনে মনে দেখলে ওগুলো দেখা যায় না—এইটে একটা মস্ত সুবিধে। তাছাড়া আর একটা কথা কি জানিস—সেইটেই বোধহয় আসল কথা—”

চুপ করে গেলেন সুভদ্র সেন এক মুহূর্তের জন্য। তারপরে বললেন, “নাঃ, আসল কথাটা আর না-ই বললুম—”

“বলো না—”

আবদারের সঙ্গে ধমক মেশানো অদ্ভুত একটা সুর ফুটল মহুয়ার কণ্ঠে। চোখের দৃষ্টিতেও ফুটল একটা আদুরে ভঙ্গি।

“বললে বিশ্বাস করবি না।”

“তবু বলো।”

“হাসতে পাবি না কিন্তু।”

“বেশ, হাসব না।”

“ওই প'ড়ো ভাঙা হলদে বাড়িটার প্রেমে পড়েছি আমি। ওইটেকে ঘিরে আমার অনেক স্বপ্ন আর খেয়াল নানা রঙের ছবি আঁকে দিন-রাত। ওকে ফেলে আমি কোথাও যেতে পারব না। ওই যে ভাঙা জানলাটার পাশ দিয়ে লম্বা ঘাসের গোছা গজিয়েছে, মনে হয় ওটা মিসেস পূর্ণেন্দুর চুলের গোছা। যে যাদুমন্ত্রবলে ওটা কালো না হয়ে সবুজ হয়েছে সেই যাদুমন্ত্রটারই সন্ধান করি আমি অহরহ।”

মহুয়া হেসে লুটিয়ে পড়ল।

তারপর বলল—শিজোফ্রেনিয়া—নির্ভেজাল শিজোফ্রেনিয়া—”

।। নয় ।।

ফার্সীতে লেখা চিঠিটা আবার পড়ছিলেন সুভদ্র সেন। মহুয়াকে তিনি বলেননি সবটা খুলে। ফার্সী দেখে মহুয়া ভেবেছিলেন মেয়েটি মুসলমান। কিন্তু সবিতা হিন্দু, ব্রাহ্মণের মেয়ে। তাঁর ছাত্রী ছিল। তাঁর কাছেই সংস্কৃত শিখে সংস্কৃতে এম. এ. পাশ করে। তারপর তার ইচ্ছা হল ফার্সী পড়বার। সুভদ্র সেনই একজন মৌলবীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন তার। সবিতা ফার্সী শিখছে দেখে তাঁরও ফার্সী শেখবার জেদ হয়েছিল। তাঁর ছাত্রী তাঁকে হারিয়ে দেবে—

কভি নেহি। এই মনোভাব নিয়ে ফার্সী শিখেছিলেন তিনি। এই কথাই তিনি নিজের বিবেকের কাছে এবং সকলের কাছে বলেছিলেন, কিন্তু আসল সত্যটা এতদিন যেন একটা গুটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে কোথায় ছিল তাঁর মনের মধ্যে। সহসা গুটি কেটে রঙিন প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেল সেটা তাঁর চোখের সামনে। না, তিনি কখনও প্রেমনিবেদন করেননি সবিতাকে। বরাবর ছাত্রীর মতোই ব্যবহার করেছেন তার সঙ্গে, সংযত শুদ্ধ ভদ্র আচরণের শক্ত খামে মুড়ে রেখেছিলেন নিজেকে। মনের ভিতর রঙিন বাসনাটা কিন্তু গুটি বেঁধে ছিল এতদিন, হঠাৎ রঙিন প্রজাপতি হয়ে আজ উড়ে গেল সেটা। কত গুটিই যে রঙিন প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেছে তাঁর জীবনে। সামনে একটা সবুজ মাঠ দেখতে পেলেন। তার উপর দিয়ে অসংখ্য প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে...। আবার চিঠিখানি পড়লেন।

লিখেছে, "তেহরানের বাজারে এই ছবিটি দেখলাম। এ ছবি যেন আপনারই প্রতীক। নদী বয়ে চলেছে, তার এক তীরে গভীর অরণ্য, অন্য তীরে প্রকাণ্ড পাহাড়। সেই উঁচু পাহাড়ের উপর সুন্দর একটি 'মনজিল'। তাজমহলের মতো দেখতে। মনে হলো এ যেন আপনার প্রতীক। আপনি সকলের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, সকলের নাগালের ওপারে, নিজের স্বপ্নালোকে মশগুল হয়ে আছেন, আপনার সঙ্গী সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রও নয়, তারাও আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না, আপনি নিজেকে নিয়েই মহাশূন্যে স্বপ্ন সৃষ্টি করছেন। ছবিতে দেখছি পাহাড়ের গায়ে অনেক সিঁড়ি আছে, ওই সিঁড়ি বেয়ে হয়তো পর্বতচূড়াবলম্বী ওই স্বপ্নমহলে পৌঁছানো যায়, আপনার কাছে যাওয়ারও অনেক পথ আছে। তার কোনও একটা ধরে আপনার কাছে যাওয়া অসম্ভব নয়—কিন্তু আমি জানি তা হবার নয়। ওই স্বপ্নমহল চিরকাল সবার নাগালের বাইরে থাকবে। কেউ ওখানে পৌঁছতে পারবে না। আমার কথা কিছু লিখলাম না। আমি নিজেকে 'ফেরি' করছি এই বিদেশের বাজারে। আমি আর মানুষ নেই, পণ্য হয়ে গেছি। পণ্য-জীবনের একঘেয়ে কাহিনী আপনাকে শোনাব না। আমার প্রণাম নেবেন।"

হঠাৎ একটা মুক্তোর মালা ছিঁড়ে মুক্তোগুলো যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। প্রথম যখন চিঠিখানা পড়েছিলেন তখন মনে হয়েছিল একটা সুন্দর ফুলকে কে যেন নর্দমায় ফেলে দিল। এখন আবার অন্যরকম উপমা একটা মনে এল। মনে হলো এই উপমাটা আরও ভালো। নর্দমার ফুল মরে যায়, পচে যায়। মুক্তো পচে না। হয়তো কোনও জহুরী ওগুলো সংগ্রহ করে নূতন মালা গাঁথবে...।

কর্কশ কণ্ঠে ডেকে উঠল একটা নীলকণ্ঠ।

সুভদ্র সেন চোখ তুলে চেয়ে দেখলেন একটা থিয়েটার হচ্ছে। হলদে আলখাল্লা পরা একটা বুড়ো লোক হাত-পা নেড়ে কি যেন বলছে। হলদে বাড়িটা নেই। সামনে দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। একজনের হাতে লাল রুমাল। আর একজনের নীল চোখ। হলদে আলখাল্লা-পরা লোকটা কে? হঠাৎ বুঝতে পারলেন। হলদে বাড়িটাই ওই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

আলখাল্লা-পরা লোকটা বলে উঠল—তোমরা বেরিয়ে যাও। আমি যতক্ষণ বাড়ি ছিলাম,

ততক্ষণ আমাকে তোমরা যথেচ্ছ ব্যবহার করেছ, আমি আর বাড়ি নই, আমি মানুষ হয়েছি, আর আমার মধ্যে ঢুকতে চেষ্টা করো না তোমরা।

মিসেস পূর্ণেন্দু। আমরা মানুষ হলে তাড়াতে পারতে কিন্তু আমরা মানুষ নই, আমরা কল্পনা, তুমিও কল্পনা, বাড়ি কখনও মানুষ হতে পারে না। সুভদ্র সেনের উদ্ভট কল্পনা আমরা। ঝগড়া না করে এসো আমরা নাচি, ভদ্রলোক তা হলে হয়তো আনন্দ পাবেন একটু। সবিতাকে ভুলতে পারবেন খানিকক্ষণের জন্য।

রহস্য। আমি কখনও নাচ শিখিনি, তবু নাচব। কিন্তু তার আগে বিচার চাই। জজ সাহেবকে ডাকো। অম্বর গুপ্তকে ডাকো, আর ডাকো শেখরকে।

আলখাল্লা-পরা লোকটা। আমি যদি জজ হই তোমার আপত্তি আছে?

রহস্য। কিছুমাত্র না। কিন্তু সুবিচার চাই। আগে অম্বর গুপ্তকে ডাকুন। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলো অম্বর গুপ্ত।

রহস্য। এইবার ওঁকে জিজ্ঞেস করুন আমার স্বামীর সঙ্গে উনি যখন জেলে দেখা করতে যেতেন, কি বলতেন আমার সম্বন্ধে—

আলাখাল্লা-পরা লোকটা। (অম্বর গুপ্তর দিকে চেয়ে) প্রশ্ন তো শুনলেন। এবার উত্তর দিন। সত্য কথা বলবেন।

অম্বর গুপ্ত। রহস্য দেবী আর শেখর সেন একসঙ্গে বাজারে পিকেটিং করতেন—এ নিয়ে সুভদ্র সেনের বন্ধুরা নানারকম টিটকারি দিতেন, অনেক অশ্রাব্য ইঙ্গিতও করতেন। তাই আমি সুভদ্র সেনকে গিয়ে বলেছিলাম. তোমার বউকে নিয়ে নানারকম গুজব উঠছে, তুমি তোমার বউকে মানা করে দাও আর যেন ও পিকেটিং করতে না বেরোয়।

রহস্য। ওঁকে জিজ্ঞেস করুন উনিই আমার স্বামীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন কিনা তোমার বউকেও আন্দোলনে নামাও। তা হলে সবাই তোমাকে বাহবা বাহবা করবে।

অম্বর গুপ্ত। দিয়েছিলাম। কিন্তু তখন ভাবিনি যে, উনি শেখর সেনের সঙ্গে অমন বিশ্রীরকম মাখামাখি করবেন।

রহস্য। ওঁকে জিজ্ঞেস করুন উনি নিজেই মাখামাখি করবার জন্যে আমার পিছনে রোজ ছুটোছুটি করতেন কি না।

অম্বর গুপ্ত চুপ করে রইলেন।

আলখাল্লা-পরা লোকটা। (ধমকের সুরে) জবাব দিন।

অম্বর গুপ্ত। রহস্য দেবী অপরূপ সুন্দরী ছিলেন। ওঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে সবাই ব্যগ্র হতেন, আমিও হতাম, কিন্তু ওঁর সঙ্গে মাখামাখি করবার চেষ্টা করেছিলাম একথা আমি অস্বীকার করছি।

রহস্য। উনি যে আমাকে তিনখানা লম্বা চিঠি লিখেছিলেন, সে কথাও কি উনি অস্বীকার করছেন? সে চিঠিগুলো যদিও কাউকে দেখাইনি. কিন্তু সেগুলো আমার বাক্সে আছে এখনও।

অম্বর গুপ্ত। দেখাননি কেন?

রহস্য। আমার স্বামীকেই দেখাব ভেবেছিলাম, কিন্তু সময় পেলাম না। আপনার কথায় বিশ্বাস করে আমার স্বামী যখন কুৎসিতভাবে শেখর চাটুজ্যের সঙ্গে আমার সম্মান জড়াতে ইতস্তত করলেন না, যখন উনি ভুলে গেলেন যে, ওঁরই কথায় আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও

আন্দোলনে নেমেছিলাম ওঁর মান রক্ষা করবার জন্যে, তখন ওই কাদা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে প্রবৃত্তি হল না।

অম্বর গুপ্ত। (আলখাল্লা-পরা লোকটাকে) ওঁকে জিজ্ঞেস করুন শেখর চাটুজ্যের সম্বন্ধে ওঁর কি কোনো দুর্বলতা ছিল না?

রহস্য। ছিল। কিন্তু সে দুর্বলতা কি রকম তা শেখর চাটুজ্যে নিজেই এসে বলুক—ডাকুন তাকে।

ডাকতে হল না, নিজেই এল শেখর চাটুজ্যে। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, উসকো-খুসকো চুল সুশ্রী যুবক একটি।

শেখর চাটুজ্যে। (কোনো প্রশ্ন করবার আগেই) ওঁকে আমি মা বলতাম। উনি আমাকে ছেলের মতো স্নেহ করতেন। কিন্তু যেদিন শুনলাম—ওফ—

দু'হাতে মুখ ঢেকে বেরিয়ে গেল শেখর চাটুজ্যে। তারপর দেখা গেল একটা আড়কাঠা থেকে ঝুলছে তার দেহটা। গলায় দড়ি দিয়েছে শেখর সেন।

রহস্য। মরবার আগে শেখর আমাকে ওই চিঠিটা লিখেছিল—

আঙুল তুলে সে আকাশের দিকে দেখাল। আগুনের অক্ষরে জ্বলজ্বল করে উঠল এই কথাগুলো—'মা, এ পাপ-পৃথিবী ছেড়ে চললাম। প্রণাম।'

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল মিসেস পূর্ণেন্দু। "পাপ, পাপ, পাপ, পাপ বা-প রে বাপ।"

আলখাল্লা-পরা লোকটা। অম্বর গুপ্তর চিঠিগুলো দেখাতে পার?

রহস্য। সেগুলো মর্ত্যের এলাকায়, আমার তোরঙ্গের মধ্যে আছে। সেগুলো আমার নাগালের বাইরে এখন। দেখাতে পারব না।

আলখাল্লা-পরা লোকটা। তোমার হাতের ওই লাল রুমালটা কার?

রহস্য। এটা আমার স্বামীর বাক্সে ছিল, একটা সুগন্ধি খামের ভিতর। খামের উপর লেখা ছিল 'নি'। শেখরের চিঠিটা আর এই রুমালটা আমি সঙ্গে এনেছিলাম।

আলখাল্লা পরা লোকটা। আমার বিচারে তুমি দোষী।

রহস্য। দোষী?

আলখাল্লা-পরা লোকটা। হ্যাঁ, খুনের দায়ে।

রহস্য। কাকে খুন করেছি আমি?

আলখাল্লা-পরা লোকটা। নিজেকে।

আবার হো হো করে হেসে উঠল মিসেস পূর্ণেন্দু।

মিসেস পূর্ণেন্দু। ওরে বাউল, নিজেকে কি খুন করা যায়? থাকবার বাসাটা বদলানো যায়, পুরোনো কাপড়টা ছাড়া যায়, নিজেকে খুন করা যায় না। আমরা কেউ মরিনি, কেবল বদলেছি। তুই ছিলি ভাঙা একটা বাড়ি, হয়েছিস বাউল। আয় আমরা নাচি, সুভদ্র সেন দেখুক। যে সবিতা-ঘাস ওর নাগালের বাইরে তাই খাওয়ার জন্য ওর মন-গরু জিব বাড়াচ্ছে, সে গরুকে অন্যমনস্ক করতে হবে। আমরা থাকতে ও অন্যের কথা ভাববে কেন, আমরা ভাবতে দেবই বা কেন?

রহস্য। (অভিমান ভরে) কিন্তু আমার সুবিচার না হলে আমি নাচব না।

আলখাল্লা-পরা বাউলটা এর পর অদ্ভুত কাণ্ড করল। হঠাৎ দু'হাত তুলে কবিতা আবৃত্তি করল একটা।

ওগো নারী, করিও না রোষ
সদাই নিষ্পাপ তুমি সদাই নির্দোষ
আনন্দ-দায়িনী, মনোলোভা
যা করিবে পাবে তাই শোভা

অম্বর গুপ্ত। (মুচকি হেসে) আমি তবে চললাম। (প্রস্থান)

বাউল নাচ শুরু করে দিল।

মিসেস পূর্ণেন্দু। দাঁড়াও দাঁড়াও, বাজনা আসুক। নি ম্যান্ডেলিন বাজাবে। নি—নি—নি, শিগগির এসো—।

নি বেরিয়ে এল। আগুনের শিখা যেন সাপের মতো ফণা তুলে দাঁড়াল। মুখ দেখা যায় না। টকটকে লাল ওড়নায় সব ঢাকা। বেজে উঠল ম্যান্ডোলিন। শুরু হয়ে গেল নাচ। আগুনের শিখাটা সাপের মতো এঁকেবেঁকে নাচতে লাগল ম্যান্ডোলিনের তালে তালে। তারপর ছড়িয়ে পড়ল আগুন। ঘিরে ধরল রহস্যাকে। তারপর দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল সেটা, নাচের ভঙ্গিতেই জ্বলতে লাগল।

সুভদ্র সেনের একটা ছবির কথা মনে পড়ল, সীতার অগ্নিপরীক্ষা। চারিদিকে অগ্নিশিখা, তার মাঝখানে ধ্যানমগ্না সীতা হাত জোড় করে রয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ আর একটা কথা মনে হল সুভদ্র সেনের। সীতাকে পোড়াবার সময় কি তার শাড়িতে কেরোসিন তেল ঢালা হয়েছিল? ধোঁয়ায় ভরে গেল চারিদিক। আকাশ কালো হয়ে গেল। কিছু দেখা যায় না। তবু উদ্দাম নাচের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারপর ঝড় উঠল। বিরাট ঝড়। ধোঁয়াকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। এক টুকরো ধোঁয়া কিন্তু উড়ল না। লম্বা কালো একটা টুকরো দুলতে লাগল আকাশ-পটে।

"ওই তো রহস্যের বেণী. বেণীটা পোড়েনি, বেণীটা পোড়েনি—"

চিৎকার করে উঠলেন সুভদ্র সেন। সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল নীলকণ্ঠ। সুভদ্র সেন দেখলেন, একটা নয়, হলদে বাড়ির আলসেতে চারটে নীলকণ্ঠ। একটা চিৎকার করতে কবতে আকাশে উড়ে গেল, তারপর সোঁ করে নেমে এল। নীল রঙের বহ্ন্যুৎসব হয়ে গেল যেন। সুভদ্র সেন দেখলেন বেণীটা এখনও আকাশে ঝুলছে। সেইটেকে ঘিরেই নীলকণ্ঠটা যেন মাতামাতি করছে।

হঠাৎ সুভদ্র সেন উঠে দাঁড়িয়ে অনুনয়ভরা কণ্ঠে বললেন—"রহস্য, একবার ফিরে দাঁড়াও, তোমাকে দেখি, আমি জানি তুমি বেঁচে আছ—"

বেণী অন্তর্হিত হল।

হলদে বাড়ির জানলায় দেখা গেল মিসেস পূর্ণেন্দু দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন। তার পিছনে মনে হল রহস্য দাঁড়িয়ে আছে, তার পিছনে 'নি'।

।। দশ ।।

সেদিনও মহুয়া অন্ধকারে হাঁটছিল, রাত দুটোর পর। ঘড়িতে অ্যালার্ম দিতে হয়নি, আপনিই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। হাঁটছিল, কিন্তু এগোচ্ছিল না। গঙ্গার ঘাটের দিকে যে পথটা এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছিল সেইখানে দাঁড়িয়ে ভাবছিল সে। কল্পনা করছিল, কল্পনাতেই হাঁটছিল সে।

হঠাৎ মুখ তুলে সে অবাক হয়ে গেল। ঝোপটা নেই। আড়াল ঘুচে গেছে। মুক্ত প্রান্তরে জ্যোৎস্নালোকে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। সুভদ্র সেন, মঙ্গলময়, মোহিত সোম, মিস্টার চ্যাটার্জি, বাবুল—সবাইকে তার ভালো লাগে। কিন্তু পুরোপুরি লাগে না। তার ভালো-লাগার জ্যোৎস্না কাউকে সম্পূর্ণ আলোকিত করেনি। সবারই গায়ে খানিকটা আলো, খানিকটা অন্ধকার। দূরে দাঁড়িয়ে আছে শালিম। কোন সুদূর পূর্বজন্মের, কোন বিস্মৃতি আদিম সমাজের প্রণয়ী ও? কোন মৃত ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এল সজীব হয়ে? তার সঙ্গে সত্যি কি কোনো যোগ ছিল মহুয়ার? এখন কি যোগ হওয়া সম্ভব? সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ বেজে উঠল যেন অনেক। দূরে অনেকগুলো মিল থেকে যেন বাঁশি বেজে উঠল। চিৎকার করে উঠল মহুয়া। সুভদ্র সেন, মঙ্গলময়, মোহিত সোম, মিস্টার চ্যাটার্জি, বাবুল, শালিম—সবাই যেন কাছাকাছি সরে এসে মিলে যাচ্ছে, তাদের গা থেকে অন্ধকারের টুকরোগুলো খসে পড়ছে, থাকছে শুধু আলোকিত অংশগুলো, সেগুলো সব এক হয়ে গেল। যোগফল যা হল তা অপূর্ব, আশ্চর্য, জ্যোতির্ময় এক পুরুষ। অতীত ও বর্তমান মিলে নিখুঁত ভবিষ্যৎ আবির্ভূত হল। হাসিমুখে এগিয়ে আসতে লাগল মহুয়ার দিকে। শাঁখ বাজছে, মিলের বাঁশিগুলো বাজছে, চাঁদের আলো উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। মহুয়ার হঠাৎ ভয় হল—সে দু'হাত বাড়িয়ে বলে উঠল—না, না, তুমি এস না। তুমি নিখুঁত, তুমি ভয়ঙ্কর, তুমি স্বপ্নের মহাকাশচারী, আলিঙ্গনে তোমাকে বাঁধা যাবে না। তুমি এস না, এস না, এস না।

তবু কিন্তু সে আসতে লাগল।

মহুয়া বাড়ির দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। কিছুদূর গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সে আসছে, একবারও থামেনি। অনিবার্য গতিতে এগিয়ে আসছে সে। তার ভয় করছে কেন, বার বার সে নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগল কিন্তু ভয় ঘুচল না। তার মনে হল, আমি তো নিখুঁত নই, আমার মধ্যেই যে অনেক পঙ্ক, অনেক গ্লানি, আমি ওর সহচরী হবার যোগ্য কি? ও যে নির্মল, ও যে সুন্দর, ও যে পবিত্র. .ছুটতে লাগল মহুয়া। বাড়ির থেকে বেশি দূরে সে যায়নি, কিন্তু তবু মনে হল বাড়ি পৌঁছতে পারছে না সে। বাড়িটাও যেন নাগালের বাইরে অনেক দূরে চলে গেছে।

অনেকক্ষণ পরে যখন পৌঁছল তখন শুনতে পেল সুভদ্র সেন চিৎকার করছেন—"রহস্য, রহস্য, তুমি ফিরে দাঁড়াও; আমার চোখের দিকে চেয়ে দেখ, সেইখানেই তুমি আমাকে, আমার স্বরূপকে, দেখতে পাবে! ফিরে দাঁড়াও, ফিরে দাঁড়াও, ফিরে দাঁড়াও—দোহাই তোমার, একবার ফিরে দাঁড়াও, শোন, আমার কথা শোন—"

ঠিক এই সময়েই প্রচণ্ড গর্জন করে বিরাট এরোপ্লেনটা নেমে এলো। বিরাট একটা ফড়িংয়ের মতো থামল এসে তাদের বাড়ির সামনে। তার সর্বাঙ্গে স্বর্ণদ্যুতি মানব-মনীষার শেষ কীর্তি যেন। মানুষের মতো কথা কইল সে।

"তোমার ডাক শুনে আমি নেমে এসেছি মহাকাশ থেকে। তুমি যা চাইছ তা এখানে নেই। তোমাদের কবি বহুকাল আগে বলে গেছেন—'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।' সেইখানে চল যাই—উঠে এস—"

সুভদ্র সেন বেরিয়ে এলেন।

"কে তুমি? মিসেস পূর্ণেন্দু? রহস্য? নি? না, মহুয়া?"

"আমি মহাকাশের মহাভৃঙ্গ। যেখানে শাশ্বত আলোর কমল ফুটে আছে সেইখানেই আমি বিহার করি। তুমি যাদের কথা বললে তারা সবাই সেখানে আছে—অথচ নেই। সেই আছে-অথচ-নেই-লোকের দ্বিধার কম্পনকে আলোকিত করছে আলোর কমল। হয়তো সে দ্বিধা একদিন বিশ্বাসে পরিণত হবে। কিন্তু এখনও হয়নি। মানুষের সব জ্ঞান এখনও অজ্ঞান-ভ্রূণে নিহিত। জানার সব নদী বার বার অজানা সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। সে সমুদ্রের কূলকিনারা এখনও পাওয়া যায়নি। আলোর কমল উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে খালি। এস, নিজের চোখেই দেখবে সব।"

সুভদ্র সেন এরোপ্লেনে উঠে বসলেন। বিরাট গর্জন করে প্লেন উড়ে গেল। ভনভন ভনভন ভনভন—কোটি কোটি ভ্রমর যেন চিৎকার করতে করতে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেল।

মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল মহুয়া।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন সুভদ্র সেন। তিনি ভিতরে যেন ওত পেতে অপেক্ষা করছিলেন। দু'হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন মহুয়াকে, যেন সে ছোট একটা শিশু। সুভদ্র সেন নিজেও জানতেন না যে, তাঁর গায়ে এখনও এত শক্তি আছে। শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে অদ্ভুত একটা আনন্দ হল তাঁর। নিজেকে হঠাৎ যেন ফিরে পেলেন। এতদিন কোন মিথ্যা স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে নিজেকে তিনি দুর্বল রোগী ভাবছিলেন? এই তো মহুয়াকে একটা পালকের মতো কুড়িয়ে নিলেন। তাকে দু'বাহুর উপর তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। মহুয়ার মাথায় এলো-খোঁপা করা ছিল। সেটা আরও এলিয়ে পড়ল। অজস্র কালো চুলের প্রপাত নামল তাঁর বাহু বেয়ে। এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল মহুয়ার বুকের কাপড়ও। কিন্তু এসব সুভদ্র সেনের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করল না। যে শিশু-মহুয়াকে একদা তিনি মহুয়া গাছের তলায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, মনে পড়ল তাকে। যে মহুয়াকে শ্যামলী মানুষ করেছিল নিজের মেয়ের মতো, মনে পড়ল তাকে। যে মহুয়াকে দোলায় দোল দিতেন তিনি, মনে পড়ল তাকে। সেই ছোট্ট শিশুটা যেন এই অসংবৃত-বাসা বিস্রস্ত-কেশা পীবর-স্তনী যুবতীকে আড়াল করে ফেলল নিমেষে, ফিক করে হাসল তাঁর দিকে চেয়ে, ফোকলা দাঁতের মিষ্টি হাসি, যা তাঁকে বহুকাল আগে অভিভূত করত, সেই হাসিটাই তিনি যেন দেখতে পেলেন আবার, নীচের মাড়িতে ছোট ছোট আলোচালের মতো দুটি দাঁতও। হঠাৎ লক্ষ করলেন মহুয়ার নিঃশ্বাস জোরে জোরে পড়ছে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেন তাকে। মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলেন। একটু পরে চোখ খুলল মহুয়া। সবিস্ময়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। তারপর বলল, "দাদু, ফিরে এলে কখন?"

"আমি কোথাও তো যাইনি।"

"হ্যাঁ, গেছলে তো। আকাশ থেকে যে সোনার এরোপ্লেনটা নেমে এসেছিল তাতে করে—"

"সোনার এরোপ্লেন?"

"হ্যাঁ, সে বললে, আমি মহাকাশের মহাভৃঙ্গ, আলোর কমল যেখানে ফুটেছে, সেইখানেই আমি বিহার করি, আরও সব কি বললে ঠিক বুঝতে পারিনি। তুমি তার সঙ্গে চলে গেলে..."

আবার চোখ বুজল মহুয়া। অনেকক্ষণ বুজেই রইল। ভ্রূকুঞ্চিত করে হাওয়া করতে লাগলেন সুভদ্র সেন। মহুয়া কথা কইল আবার।

"সে-ও এসেছিল—"

"কে?"

"যোগফল। তোমাদের সকলের যোগফল। কিন্তু সে এত সুন্দর, এত চমৎকার, এত নিখুঁত যে, আমি ভয়ে পালিয়ে এলাম। সে এখনও বোধ হয় আসছে আমার দিকে, চিরকাল বোধহয় আসবে।"

"Stop that nonsense."

হঠাৎ পুরুষ কণ্ঠে ধমকে উঠলেন সুভদ্র সেন। নিজের স্বর শুনে নিজেই চমকে উঠলেন তিনি। অতীতের বাস্তববাদী বলিষ্ঠ সুভদ্র সেন সহসা আবির্ভূত হলেন যেন স্বপ্নের খোলস ছিঁড়ে। যে সুভদ্র সেন একদা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেল খেটেছিলেন। জেলে অনশন করেছিলেন অন্যায়ের প্রতিবাদে, যে সুভদ্র সেন ছাত্রজীবনে গুণ্ডার সঙ্গে লড়েছিলেন একটি অপহৃতা বালিকাকে উদ্ধার করবার জন্যে, যে সুভদ্র সেন রূঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন রহস্যকে, 'তুমি আর শেখরের সঙ্গে মিশবে না'—সেই সুভদ্র সেন অতীতের ভগ্নস্তূপ থেকে যেন বেবিয়ে এলেন সতেজ সবুজ চারার মতো।

"আমাকে তুমি বকছ দাদু?"

মহুয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে প্রশ্ন করল।

সুভদ্র সেন লক্ষ করলেন তার নীচের ঠোঁটটা কাঁপছে।

"বেশি বকবক করো না। ঘুমোও—"

মহুয়া চুপ করে রইল।

তারপর আবার শুরু করল—"আমি—"

"একটি কথা বলো না। চুপ কর। আমরা আর এখানে থাকব না।"

"কোথা যাবে—"

"কোথা তা জানি না। কিন্তু এই ভূতুড়ে পরিবেশ ছেড়ে চলে যাব। তুমিও যাবে আমার সঙ্গে—"

মহুয়া সবিস্ময়ে চেয়ে রইল তাঁর দিকে।

"কোথায়?"

"ওপারে। এপারে আর ভালো লাগছে না।"

এরোপ্লেন বলছিল—"হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।"

"চুপ কর।"

বজ্রকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন সুভদ্র সেন।

।। দ্বিতীয় পর্ব ।।

সসীম বাস্তবলোক ও অসীম স্বপ্নলোকের সঙ্গমস্থলে এবার আমাদের কাহিনী চলে গেল। বাস্তবলোকের সীমানা সিমেন্ট-কংক্রিটের একটা চওড়া বারান্দা। বাস্তবলোক থেকে কয়েকটি সিঁড়ি উঠে এসে বারান্দার দক্ষিণ দিকে শেষ হয়েছে। এই সিঁড়িগুলি দিয়ে নিম্নস্থ মর্ত্যলোক থেকে বাস্তবলোকের সীমান্ত-বারান্দায় পৌঁছানো যায়। বারান্দাটির মাঝখানে একটি বড় দরজা। সেই দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে স্বপ্নলোকের আভাস। প্রথমেই মনে হবে একটা নিস্তরঙ্গ নীল সমুদ্র বুঝি অসীমে গিয়ে দিশাহারা হয়েছে। কিন্তু খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলেই ভুল ভাঙবে। বোঝা যাবে ওটা নীল সমুদ্র নয়, ওটা পটভূমিকা মাত্র। ওই পটভূমিকায় মাঝে মাঝে সমুদ্র যে মূর্ত না হতে পারে তা নয়, সব রকম স্বপ্নই রূপ পরিগ্রহ করতে পারে ওই অসীমের পটভূমিকায়। এখন শুধু পটভূমিকাটা দেখা যাচ্ছে। মর্ত্যে যে সব স্বপ্ন বন্দী হয়ে থাকে মুক্তি পেলে তারাও এইখানে আসে ওই সিঁড়িগুলো বেয়ে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। একটু পরেই দেখা গেল প্রতিহারীর পোশাক পরা একটি লোক বারান্দার উপর উঠে এসেছেন। তাঁর বগলে দুটি খাতা রয়েছে। ইনি বাস্তবলোকের ও স্বপ্নলোকের মধ্যে সেতুর কাজ করেন। এঁর নামও সেতু। ইনি এসেই পকেট থেকে একটি কাগজ বার করে পড়তে লাগলেন।

"মর্ত্যলোকে শ্রীযুক্ত সুভদ্র সেন এবং শ্রীমতী মহুয়া দেবী মারা গেছেন। তাঁদের মৃত্যু রহস্যময়। তাঁদের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ডাক্তাররা ঠিক করতে পারেননি। সকালে দেখা গেল শ্রীমতী মহুয়া বিছানায় এবং শ্রীযুক্ত সুভদ্র সেন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। এঁদের দু'জনের মস্তিষ্ককোটরে অনেকগুলি স্বপ্ন বন্দী অবস্থায় ছিল। তারা এবার ছাড়া পেয়েছে। মর্ত্যের শাসনকর্তাদের মতে এ স্বপ্নগুলি বিপজ্জনক। তাই তাদের স্বপ্নলোকে চালান করে দিয়েছেন তাঁরা। স্বপ্নরা নীচে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনাদের অনুমতি পেলেই তাঁরা উপরে উঠে আসবেন।"

দেখা গেল নীল পটভূমিকায় একটি রূপালী স্রোতস্বিনী মূর্ত হয়েছে। তার উপর সোনালী পানসি বাইতে বাইতে আসছেন একটি তরুণ যুবক। তার গায়ে রামধনু রঙের পোশাক। মাথায় সবুজ শিরস্ত্রাণ। দেখতে দেখতে পানসি এসে ভিড়ল দরজার সামনে। তরুণ যুবক কংক্রিটের বারান্দার উপর উঠে এসে অভিবাদন করলেন মর্ত্যের সেতুকে। বললেন—"আমাদের দেশে কোনও স্বপ্নই বিপজ্জনক নয়। স্বপ্ন হলেই আমরা তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নেব আমাদের দেশে। কিন্তু সেটা মেকী হলে চলবে না।"

সেতু। কোনটা আসল কোনটা মেকী তা যাচাই করবার ক্ষমতা আমাদের নেই।

তরুণ যুবক। আমাদেরও ছিল না। সম্প্রতি মহাকাল আমাদের সহায় হয়েছেন। বলেছেন তিনি নিজে এসে নির্বাচন করে দেবেন। তাঁর কিন্তু একটি কঠোর শর্ত আছে।

সেতু। কি সেটা?

তরুণ যুবক। মেকী স্বপ্নদের তিনি ধ্বংস করে ফেলবেন। এই শর্তে কি ওঁরা রাজি আছেন?

সেতু। ওঁদের রাজি থাকা না থাকার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ওঁদের আমরা ফিরিয়েও নিতে চাই না। ওঁদের নিয়ে আপনারা যা খুশি করতে পারেন।

তরুণ যুবক। ওঁদের কোনো পরিচয় আপনি দেবেন না?

সেতু। ওঁদের পরিচয় তো আমি জানি না। সুভদ্রবাবুর ঘরে এই খাতাটা পাওয়া গেছে। খাতাটার উপরে লেখা আছে 'মেঘ'। শ্রীমতী মহুয়ারও একটা ডায়েরি পেয়েছি আমরা। সেই দুটো এনেছি। এ দুটোতে ওই স্বপ্নদের কিছু খবর পাবেন। এই নিন। আমি চললাম।

(তরুণ যুবকের হাতে খাতা দুটি দিয়ে তিনি চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তরুণ যুবক বাধা দিলেন।)

তরুণ যুবক। শুনুন। আমার মনে হয় মহাকালের শর্তের কথাটা ওঁদের আগে থাকতে জানিয়ে দেওয়া উচিত।

সেতু। তাতে লাভ কি হবে? ওদের মধ্যে ভয় পেয়ে কেউ যদি আসতে না চায় তাদের তো আমরা ফিরিয়ে নেব না। বাস্তবলোক থেকে ওদের দূর করে দেওয়া হয়েছে, গেট বন্ধ হয়ে গেছে। একথা শুনলে ওরা কেবল হইচই করবে।

তরুণ যুবক। তবু বলুন, সব জেনেশুনে মহাকালের সম্মুখীন হওয়াই ভালো।

সেতু। কিন্তু ওরা যদি না আসতে চায়, সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে যদি হল্লা করে—

তরুণ যুবক। তা করুক। ওরা স্বেচ্ছায় না এলে ওদের অভ্যর্থনা করব কি করে? স্বপ্নলোকে স্বেচ্ছায় আসতে হবে।

সেতু। বেশ।

(সেতু চলে গেলেন। একটু পরেই সিঁড়ির নীচে গোলমাল শোনা গেল। দু'একজন আর্তনাদ করে উঠলেন মনে হল। তরুণ যুবক অপেক্ষা করে রইলেন। তাঁর মুখে মৃদু হাসি। তারপর দরজার কাছে গিয়ে দরজার দিকে চেয়ে কাকে যেন বললেন—'ওদের বসবার জায়গা করে দাও। অলঙ্কৃত আসন নিয়ে এস কয়েকটা। আর স্ফটিকের সেই বৃহৎ পাত্রটিও আন।' সঙ্গে সঙ্গে দরজা দিয়ে অপরূপ বেশে সজ্জিত কয়েকজন কিঙ্কর-কিঙ্করী প্রবেশ করল। আসন পাতা হল। স্ফটিকের সুদৃশ্য একটি পান-পাত্রও এক ধারে রেখে চলে গেল তারা। পান-পাত্রটি বেশ বড়। একটি মানুষ অনায়াসে তার ভিতর ঢুকে যেতে পারে। কিঙ্কর-কিঙ্করীরা চলে যাওয়ার পর তরুণ যুবকটি পান-পাত্রের দিকে এগিয়ে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল।)

তরুণ যুবক। (পান-পাত্রকে) আপনার স্বরূপ প্রকাশ করুন। আপনি সুস্থ আছেন তো? মহাকালের বিচার-সভা এখনি বসবে।

(শ্বেত স্ফটিকের পান-পাত্রটি দেখতে দেখতে রক্তবর্ণ ধারণ করল। মনে হল তার ভিতরে আগুন জ্বলে উঠল। তরুণ যুবক করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে আগুনের দীপ্তি নিবে এল ক্রমশ। স্ফটিক পাত্র, শুভ্র রূপ ফিরে এল আবার। তরুণ যুবক তখন দরজার দিকে চেয়ে

ডাকলেন— 'নন্দী ভৃঙ্গী! এবার তোমরা এসো।' নীল পটভূমিকার উপর দুটি বিরাট দৈত্য আবির্ভূত হয়ে এগিয়ে এল দরজার কাছে।)

তরুণ যুবক। তোমরা দু'জনে বাস্তবলোকের ওই সিঁড়ির দু'পাশে স্তম্ভের আকারে দাঁড়িয়ে থাক। আর তোমাদের দু'জনের মধ্যে মায়াজাল প্রসারিত কর।

(সিঁড়ির দু'পাশে নন্দী-ভৃঙ্গী কষ্টিপাথরের স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের দু'জনের মাঝখানে প্রসারিত হল সবুজ আলোর জাফরি দিয়ে তৈরী একটি সুদৃশ্য গেট।)

তরুণ যুবক। (গেটের দিকে চেয়ে) আসতে দাও।

(গেট খুলে গেল)

আসতে দিও না—

(গেট বন্ধ হয়ে গেল)

ঠিক আছে।

(এরপর প্রবেশ করলেন স্বপ্নলোকের কোটাল। সুকান্তি, সুবেশ, রুচিবান লোক। তাঁর হাতে একটি সুন্দর সাঁড়াশি রয়েছে।)

তরুণ যুবক। আসুন, আপনার কথাই ভাবছিলাম।

কোটাল। তাই তো আসতে হল। আপনার ভাবা মানেই আহ্বান। সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়েছি। মহাকালও পেয়েছেন। তিনি কিন্তু সশরীরে সব সময়ে এখানে উপস্থিত থাকবেন না। নেপথ্যে থাকবেন। আড়াল থেকেই সব শুনবেন বললেন। শুনে তারপর নির্দেশ দেবেন আমাকে। আমিও মশাই আড়ালে থাকতে চাই। কারও সঙ্গে দৈহিক সংঘর্ষে আসবার প্রবৃত্তি নেই। আমার হয়ে এই সাঁড়াশিটি কাজ করবে। এটিকে এই দরজার পাশে লাগিয়ে দিচ্ছি। মহাকাল যাকে ধ্বংস করতে বলবেন, এই সাঁড়াশি তাকে ধরে ওই স্ফটিকের পান-পাত্রের ভিতর ফেলে দেবে। ওর মধ্যে যে অগ্নি আর জারক রস আছে, বাকি কাজটা তারাই করবে।

তরুণ যুবক। ওটি তো বড় ছোট মনে হচ্ছে।

কোটাল। প্রয়োজন মতো ও নিজের শরীরকে বড় কবতে পারবে। বাঁকাতেও পারবে। এ অদ্ভুত সাঁড়াশি।

তরুণ যুবক। (সবিস্ময়ে) আশ্চর্য তো! কোথায় পেলেন এটি?

কোটাল। এটিও একটি স্বপ্ন। ভবিষ্যতে রাজনীতি যা হবে তারই স্বপ্ন। এ আমার সৃষ্টি। অনুমতি করেন তো লাগিয়ে দিই ওই দরজার পাশে।

তরুণ যুবক। দিন।

(কোটাল সাঁড়াশিটিকে দরজার উপর লাগিয়ে দিলেন।)

কোটাল। এইবার এই সুতোটি বেঁধে দিতে হবে এর গায়ে।

তরুণ যুবক। সুতো?

কোটাল। হ্যাঁ—এটিকে ধরে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব। আমার ইচ্ছা সঞ্চারিত হবে এই সুতোর ভিতর দিয়ে, চালিত করবে সাঁড়াশিকে। আচ্ছা, দেখাচ্ছি।

(কোটাল একটি রঙীন সুতো বেঁধে দিলেন সাঁড়াশির গায়ে। সুতোটি বেশ লম্বা। সেটি ঝুলতে লাগল সাঁড়াশি থেকে। তারপর তিনি সুতোটি ডান হাতে ধরে বললেন—'লম্বা হও।'

সঙ্গে সঙ্গে সাঁড়াশি লম্বা হয়ে গেল, যখন বললেন—'ডান দিকে বেঁক—ডান দিকে বেঁকল, যখন বললেন—বাঁ দিকে বেঁক—বাঁ দিকে বেঁকল। সুতোটি ছেড়ে দিতেই সাঁড়াশি আবার পূর্ববৎ ছোট হয়ে দরজার উপর লেগে রইল।)

তরুণ যুবক। বাঃ, বেশ চমৎকার তো। আপনি তা হলে বাইরে থাকছেন?

কোটাল। হ্যাঁ। এই সুতোটি ধরে থাকব কেবল। মহাকালের আদেশ আপনারা শুনতে পাবেন। তাঁর আদেশ অনুসারে আমার সাঁড়াশি কাজ করবে।

(রঙীন সুতোটি ধরে তিনি বাইরে চলে গেলেন। তরুণ যুবক একটি আসনে বসে খাতা দুটি উলটে উলটে দেখতে লাগলেন। একটু পরে গেটের কাছে মঙ্গলময়কে দেখা গেল। তিনি গেট ঠেলতে লাগলেন, গেট খুলল না।)

তরুণ যুবক। আপনি স্বেচ্ছায় আসছেন তো?

মঙ্গলময়। হ্যাঁ।

তরুণ যুবক। সব শুনেছেন?

মঙ্গলময়। শুনেছি।

তরুণ যুবক। (গেটের দিকে চেয়ে) নন্দী-ভৃঙ্গী, ওঁকে আসতে দাও।

(গেট খুলে গেল। মঙ্গলময় এসে প্রবেশ করলেন।)

তরুণ যুবক। আসুন, বসুন। (একটি আসন দেখিয়ে দিলেন।)

মঙ্গলময়। (উপবেশনান্তে) আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?

তরুণ যুবক। আমার বিশেষ কোনো পরিচয় নাই। আমি স্বপ্নলোকের অধিবাসী। আপনাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে স্বপ্নমহেশ্বর আজ আমাকে নিযুক্ত করেছেন। আপনি কে?

মঙ্গলময়। আমিও স্বপ্ন। মহুয়া দেবীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি অধ্যাপক মঙ্গলময়ের সম্বন্ধে যে স্বপ্ন দেখতেন আমি সেই স্বপ্ন।

তরুণ যুবক। আপনার মধ্যে অভিনবত্ব কিছু আছে কি?

মঙ্গলময়। অভিনবত্ব? আমার মধ্যে? মনে হয় না আছে। আমি মহুয়া দেবীর মনের কামনা মাত্র। পুরুষকে ঘিরে নারীর যে কামনা চিরকাল পুষ্পিত হয়েছে আমি তার চেয়ে বেশি কিছু নই। অভিনবত্বের দাবি আমি করব কি করে?

তরুণ যুবক। স্বপ্নলোকে এসেছেন কেন?

মঙ্গলময়। আমি তো আসতে চাইনি। দেখলাম বাস্তবলোকে আমার স্থান নেই। তারা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখানে স্থান পেলে—

(দ্বারপথে মহাকালের বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল—ধ্বংস কর। সঙ্গে সঙ্গে সাঁড়াশিটি লম্বা হয়ে মঙ্গলময়ের গলা চেপে ধরে তাকে শূন্যে তুলে ফেলল, তারপর নিক্ষেপ করল স্ফটিকের পান-পাত্রের ভিতর। স্ফটিক পাত্রটি রক্তবর্ণ ধারণ করল কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর তার শুভ্রতা আবার ফিরে এল। তরুণ যুবক আবার খাতা দুটিতে মন দিলেন। একটু পরে গেটে মিস্টার চ্যাটার্জিকে দেখা গেল। বলিষ্ঠ কমনীয়-কান্তি চ্যাটার্জি এসে হাঁক দিলেন—কপাট খুলুন। পা দিয়ে লাথি মারলেন গেটে।)

স্তম্ভরূপী নন্দী। (স-হুঙ্কারে) ভদ্র হোন।

স্তম্ভরূপী ভৃঙ্গী। (ধমক দিয়ে) কি চান আপনি?

মিস্টার চ্যাটার্জি। ভিতরে ঢুকতে চাই।

ভৃঙ্গী। লাথি মারবার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে?

নন্দী। যা করেছেন তার জন্যে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা-করুন।

(মিস্টার চ্যাটার্জি কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন, তারপর হাতের আস্তিন গুটিয়ে চোখ পাকিয়ে একটু তেরিয়া ভঙ্গিতে চাইলেন নন্দীর দিকে।)

মিস্টার চ্যাটার্জি। যদি না করি কি করবেন?

নন্দী। ছাতু করে ফেলব।

(তরুণ যুবক এতক্ষণে সচেতন হলেন, আর একজন এসেছে। সুভদ্র সেনের 'মেঘ' তাঁকে অন্যমনস্ক করে দিয়েছিল। তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন।)

তরুণ যুবক। কি হয়েছে?

ভৃঙ্গী। লোকটি অভদ্র। মায়াজালে লাথি মেরেছে।

তরুণ যুবক। (মিস্টার চ্যাটার্জিকে) আপনারা এক হিসাবে উদ্বাস্তু। তাই আপনাদের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করব না। আপনি কি স্বেচ্ছায় এখানে আসতে চান? সব শুনেছেন তো?

মিস্টার চ্যাটার্জি। সব শুনেছি, ওসব ভয় আমার নেই। আমি মুষ্টিযোদ্ধা।

তরুণ যুবক। আসুন, ভিতরে আসুন। ওঁকে আসতে দাও।

(গেট খুলে গেল। মিস্টার চ্যাটার্জি প্রবেশ করলেন।)

ওই আসনে বসুন। বসে আপনার পরিচয়টা দিন।

(মিস্টার চ্যাটার্জি উপবেশন করলেন। গোঁফে তা দিলেন একবার।)

মিস্টার চ্যাটার্জি। আমার পরিচয়? আমার নানারকম পরিচয় আছে। কিন্তু আমার শ্রেষ্ঠ পরিচয় আমি কুমারী মহুয়া দেবীর ফ্যান্সি বয়। তিনি অনেক দিন আগেই মনে মনে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, আমাকে ঘিরে অনেক আরতি করেছে তাঁর মন।

তরুণ যুবক। সংক্ষেপে আপনি তাঁর স্বপ্ন?

মিস্টার চ্যাটার্জি। স্বপ্ন কিনা তা জানি না। কারণ আমার মধ্যে ধোঁয়া-ধোঁয়া আবছা-আবছা কিছু নেই। আমি স্ট্রেট, আমি সলিড, আমি মাসকিউলার, অর্থাৎ আমি ক্লীব নই, সবল সুস্থ। হয়তো আমার এই পৌরুষই শ্রীমতী মহুয়ার মনে স্বপ্ন জাগিয়েছে—হ্যাঁ, স্বপ্নই বলতে পারেন তাকে—কিন্তু আসলে তা—

(মিস্টার চ্যাটার্জি থেমে গেলেন)

তরুণ যুবক। শেষ করুন কথাটা।

মিস্টার চ্যাটার্জি। (মরিয়া হয়ে) কোদালকে কোদাল বলাই ভালো। আসলে তা কাম। ডিজায়ার, লিবিডো।

(দ্বারপথে মহাকালের বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল—ধ্বংস কর। সাঁড়াশি লম্বা হয়ে এগিয়ে এল, চ্যাটার্জির গলা ধরে তাকে শূন্যে তুলে স্ফটিক-পাত্রে নিক্ষেপ করল। প্রদীপ্ত হয়ে উঠল স্ফটিকের পাত্র। মিস্টার চ্যাটার্জি নিঃশেষ হয়ে গেলেন। তরুণ যুবক আবার খাতা দুটিতে মন দিলেন। একটু পরেই সিঁড়ির ওপার থেকে কান্না ভেসে এল।)

তরুণ যুবক। কে কাঁদছে?

নন্দী। একটি বালক আর একটি যুবক। ওরা এখানে আসতে ভয় পাচ্ছে।

তরুণ যুবক। কে ওরা, কি নাম ওদের?

(শালিমকে গেটের কাছে দেখা গেল। সে গেটের ওপার থেকেই কথা কইল।)

শালিম। আমাকে ভুলে যাওনি আশা করি। আমি তো স্বপ্নলোকেব পুরাতন অধিবাসী।

তরুণ যুবক। হ্যাঁ, তোমাকে তো চিনি; তুমি পূর্বজন্মের স্বপ্ন। তুমি বাস্তবলোকে কোথায় গিয়েছিলে?

শালিম। মহুয়ার অবচেতনলোকে।

তরুণ যুবক। ফিরে আসবে এখানে?

শালিম। কোথায় আর যাবো।

তরুণ যুবক। এসো। (নন্দী-ভৃঙ্গীকে) ওকে আসতে দাও।

(শালিম প্রবেশ করল।)

তরুণ যুবক। নীচে কাঁদছে কে?

শালিম। বাবুল, মোহিত সোম।

তরুণ যুবক। কে ওরা?

শালিম। মহুয়ার দুর্বলতা।

তরুণ যুবক। ওরা যদি এমনভাবে কাঁদে তা হলে তো—

শামিম। কুয়াশার স্বপ্নকে ডাকো। সে ওদের অবলুপ্ত করে দিক।

তরুণ যুবক। তুমি গিয়ে পাঠিয়ে দাও তা হলে—দাঁড়াও।

(নেপথ্যের দিকে চেয়ে) মহাকাল, ইনি স্বপ্নলোকের পুরাতন অধিবাসী একজন। এঁকে প্রবেশ করবার অনুমতি দিচ্ছি।

(দ্বারপথে মহাকালের আদেশ ভেসে এল—'দাও।' শালিম ভিতরে চলে গেল। একটু পরে কুয়াশার স্বপ্ন প্রবেশ করল। তুহিনশুভ্র বোরখায় ঢাকা নারী-মূর্তি। মেঘের মতো ভাসতে ভাসতে চলে গেল গেট পার হয়ে। বাবুল আর মোহিত সোমের কান্না ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে অবশেষে থেমে গেল। তরুণ যুবক আবার খাতায় মনোনিবেশ করলেন। একটু পরেই মিসেস পূর্ণেন্দু এসে দাঁড়ালেন গেটের কাছে। খাঁটি মেমসাহেব। নীল চোখ, কটা চুল 'বব' করে ছাঁটা, গায়ের রং লাল, ঘাগরা-পরা। পায়ে হাই-হিল জুতো।)

মিসেস পূর্ণেন্দু। ভিতরে আসতে পারি?

(তরুণ যুবক উঠে গেলেন)

তরুণ যুবক। কে আপনি?

মিসেস পূর্ণেন্দু। আমি মিসেস পূর্ণেন্দু রায়।

তরুণ যুবক। আপনি স্বপ্ন?

মিসেস পূর্ণেন্দু। সুভদ্র সেন বলে এক পাগল অধ্যাপক আমাকে নিয়ে প্রায়ই স্বপ্ন দেখতেন। আমাকে তিনি দেখেননি কখনও, আমার গল্প শুনেছিলেন নানারকম। লোকটি কবি, নানারকম রং চড়িয়ে আমার নানা ছবি এঁকেছিলেন তিনি মনে মনে। প্রথম যে ছবিটি তিনি

এঁকেছিলেন তারই প্রতিচ্ছবি আমি। আসল মিসেস রায় মরণের অন্ধকারে কবে হারিয়ে গেছে। আমি সুভদ্র সেনের স্বপ্ন, প্রথম স্বপ্ন।

তরুণ যুবক। আপনি স্বপ্নলোকে আসতে চান?

মিসেস পূর্ণেন্দু। তা ছাড়া আর কোথায় যাব।

তরুণ যুবক। সব শুনেছেন তো?

মিসেস পূর্ণেন্দু। শুনেছি আমাকে যদি আপনাদের পছন্দ না হয় তা হলে আমাকে নিঃশেষ করে দেবেন—এই তো? আমার যিনি স্রষ্টা সেই সুভদ্র সেনও যখন নিঃশেষ হয়ে গেছেন, তখন আমারও নিঃশেষ হতে আপত্তি নেই।

তরুণ যুবক। আসুন তা হলে। ওই আসনে বসুন—

(মিসেস পূর্ণেন্দু একটি আসনে এসে বসলেন।)

আপনাকে দু'-একটি প্রশ্ন করতে পারি?

মিসেস পূর্ণেন্দু। করুন।

তরুণ যুবক। আপনি যখন স্বপ্ন ছিলেন না, তখন কি ছিলেন আপনি?

মিসেস পূর্ণেন্দু। প্রথমে আমি ছিলাম লন্ডন শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। নাম ছিল মার্থা গ্রীন। একটা চায়ের দোকানে চাকরি করতাম। সেইখানেই মিস্টার রায়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি বড়লোকের ছেলে ছিলেন, প্রবল যৌবন ছিল তাঁর। আমি ছিলাম হ্যাংলা গরিবের মেয়ে, তাঁর সহচরী হয়ে গেলাম মাসখানেকের মধ্যে। তারপর যা যা ঘটল তা অশ্রাব্য। বলতে চাই না। ভালোর মধ্যে শুধু এই, শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিয়ে করতে পেরেছিলাম। বিয়ে করে যখন ভারতবর্ষে এলাম তখন তাঁর স্বরূপ স্পষ্টতর হয়ে উঠল আমার কাছে। দেখলাম তিনি একটা বর্বর কামুক। একদিন একটা মেথরানীর সঙ্গে হাতে-নাতে ধরা পড়লেন। আমিও ছাড়লাম না, প্রতিশোধ নিলাম। আমাদের একটা বাবুর্চি ছিল তার সঙ্গে জুটে গেলাম আমি—

(দ্বারপথে মহাকালের বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল—ধ্বংস কর। সাঁড়াশি এগিয়ে এসে ধরল মিসেস পূর্ণেন্দুকে—তারপর নিক্ষেপ করল তাকে স্ফটিক পান-পাত্রে। আগুন জ্বলে উঠল তার ভিতর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গেটের প্রান্তে দেখা গেল 'নি' এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে টকটকে লাল শাড়ি। মাথার খোঁপায় বেলফুলের মালা। চোখে মুখে অপরূপ হাসি।)

নি। (সহাস্যে) আমাকেও শেষ করে দিন, কতক্ষণ আর অপেক্ষা করিয়ে রাখবেন?

তরুণ যুবক। কে আপনি?

নি। আমি সুভদ্র সেনের নি।

তরুণ যুবক। আসুন ভিতরে। ওঁকে আসতে দাও।

(গেট খুলে গেল। নি এসে ঢুকল। ঢুকে বিস্মিত দৃষ্টিতে পান-পাত্রটার দিকে চেয়ে রইল।)

নি। ওটা কি?

তরুণ যুবক। স্ফটির পান-পাত্র।

নি। পানীয় আছে নাকি কিছু?

(এগিয়ে গিয়ে উঁকি মেরে দেখল)

ওরে বাবা! নীলমতন কি রয়েছে খানিকটা। খুব গরম। কড়া মদ নাকি? কি মদ বলুন না! নীল রঙের মদ তো কখনও দেখিনি।

তরুণ যুবক। আমি ঠিক জানি না। আপনার পরিচয় কি বলুন?

নি। আমার পরিচয়? দেখতেই তো পাচ্ছেন আমি নি। আমি নারী, আমি মোহিনী। আমি জীবনকে উপভোগ করেছি—এই আমার পরিচয়। আইনের দেওয়াল বার বার ডিঙিয়ে গেছি কল্পনার প্রেরণায়। অফুরন্ত আনন্দ পেয়েছি, এই আমার পরিচয়।

তরুণ যুবক। আপনি কি স্বপ্নলোকে আসতে চান?

নি। না, বাস্তব নিয়ে আমার কারবার। বাস্তবলোকে আর ফিরে যাওয়া যায় না?

তরুণ যুবক। স্বপ্নলোক আর বাস্তবলোকের মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য দেওয়াল আছে একটা। সেটা লঙ্ঘন করবেন কি করে?

নি। (মুচকি হেসে) অনেক দেওয়াল তো লঙ্ঘন করেছি। আপনি কি স্বপ্ন?

তরুণ যুবক। হ্যাঁ।

নি। আপনার স্পর্শ পেলে আমি হয়তো অসাধ্যসাধন করতে পারব। আপনি তো সুন্দরও দেখছি। একটু সাহায্য করুন।

তরুণ যুবক। (সবিস্ময়ে) আমি সাহায্য করব? কিরকম সাহায্য—

(নি হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে তরুণ যুবকের সামনে দাঁড়াল মুখ তুলে।)

নি। আমাকে আদর করুন একটু।

(বিস্মিত তরুণ যুবক কেমন যেন সম্মোহিত হয়ে এগিয়ে এলেন। তারপর তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত রাখলেন।)

না—ওরকম নয়—এই রকম—

(সহসা তাকে জাপটে ধরে চুম্বন করল আবেগভরে। এর পর আশ্চর্য কাণ্ড হল একটা। নি রূপান্তরিত হয়ে গেল একটা রঙীন আলেয়ায়। ভাসতে ভাসতে চলে গেল গেটের দিকে—তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।)

বাস্তবলোকেই ফিরে চললাম। দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর এবার পার হতে পারব।

(গেট পার হয়ে উড়ে গেল সে। তরুণ যুবক অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। কি করবেন ভাবছেন, এমন সময় দ্বারপথে স্বয়ং মহাকাল প্রবেশ করলেন। তাঁর পিছু পিছু পবনদেব। পবনদেবের হাতে ছোট্ট একটি থলি। মহাকাল এসে স্মিতমুখে লজ্জিত তরুণ যুবকের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। মহাকালের চেহারা ধপধপে সাদা। মনে হয় দেহ বুঝি মর্মর-গঠিত।)

মহাকাল। (অপ্রস্তুত তরুণ যুবকের দিকে চেয়ে) খুব বেশি লজ্জিত হয়ো না। আমিও মদনবাণে জর্জরিত হয়েছিলাম একবার। মদনকে কিন্তু রেহাই দিইনি। তোমার রঙীন আলেয়াকেও দিইনি। পবন, কোথায় ছাইগুলো?

পবন। (সসম্ভ্রমে) এই যে। সব এই থলিতে সংগ্রহ করে এনেছি—

মহাকাল। ফেলে দাও ওটা ওই পান-পাত্রের মধ্যে। ফেলে দিয়ে তুমি চলে যাও নিজের কাজে।

(পবন থলিটি স্ফটিকের পান-পাত্রের ভিতর ফেলে দিতেই সেটি আগের মতো অগ্নিদীপ্ত হয়ে উঠল, তারপর আবার ধারণ করল পূর্বমূর্তি। পবনদেব চলে গেলেন।)

তরুণ যুবক। আমি যে এ কাজের অযোগ্য তা তো প্রমাণিত হয়ে গেল। আমি আর এর মধ্যে থাকতে চাই না। আপনি যদি অনুমতি দেন তা হলে আমিও যাই।

মহাকাল। (নির্বিকারভাবে) যাও।

(তরুণ যুবক চলে গেলেন)

মহাকাল। (নন্দী-ভৃঙ্গীর দিকে চেয়ে) আর কেউ আছে নাকি নীচে? থাকে তো পাঠিয়ে দাও।

নন্দী। একটি মেয়ে আছে কেবল।

মহাকাল। পাঠিয়ে দাও তাকে।

(রহস্য প্রবেশ করল। তার সর্বাঙ্গ পোড়া। হাতে সেই লাল রুমালটি রয়েছে। পিঠের দিকে লম্বা বেণীটা দুলছে। সেটা পোড়েনি। সে এসে ভক্তিভরে মহাকালকে প্রণাম করল।)

মহাকাল। কে তুমি?

রহস্য। আমি সুভদ্র সেনের ধর্মপত্নী রহস্য সেন।

মহাকাল। তোমার সর্বাঙ্গ পোড়া কেন?

রহস্য। আমি সর্বাঙ্গে কেরোসিন তেল দিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিলাম।

মহাকাল। কেন?

রহস্য। স্বামীর উপর অভিমান করে। তিনি আমাকে ভুল বুঝেছিলেন। কিন্তু কাজটা ভালো করিনি। অনুতাপ হচ্ছে এখন।

মহাকাল। অনুতাপ হচ্ছে কেন? স্বামী ভালো লোক ছিলেন?

(রহস্য চুপ করে রইল)

উত্তর দিচ্ছ না কেন?

রহস্য। আমি পতি-নিন্দা করব না।

মহাকাল। পতিকে তুমি ভালোবাসতে? ভক্তি করতে?

(রহস্য আবার চুপ করে গেল।)

উত্তর দাও।

রহস্য। আমি তাঁকে ভালোবাসতে পারিনি। ভক্তি করতেও পারিনি। এটা আমার অক্ষমতা। আমি নিজের রুচি ও পছন্দের ছাঁচে তাঁকে দুমড়ে মুচড়ে ঢোকাতে গিয়ে ব্যর্থকাম হয়েছি। তাই আমার এত কষ্ট। তাই আমাকে পুড়ে মরতে হল। আমি এতদিনে বুঝেছি কাউকে বিচার করবার অধিকার কারো নেই। প্রত্যেকেই নিজের মতো নিজের স্বভাব অনুযায়ী বিকশিত হয়। আমার ফরমাশে কেউ আমার মতো হবে এটা প্রত্যাশা করা অন্যায়।

মহাকাল। স্বামীর যথেচ্ছাচারকে তাহলে সহ্য করা উচিত—এই তোমার মত?

রহস্য। এখন তো তাই মনে হচ্ছে! দেবতাদের যথেচ্ছাচার, অদৃষ্টের অত্যাচার, সবই তো মুখ বুজে সহ্য করি। স্বামীর বেলায় প্রতিবাদ করে লাভ কি। কোনো লাভ হয় না। স্বামীকে ত্যাগ করে এসে দুঃখ বাড়ে বই কমে না। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

মহাকাল। তুমি তোমার স্বামীর কাছে আবার ফিরে যেতে চাও?

রহস্য। যেতে চাইলেও তো পারব না। তিনি তো নেই।

মহাকাল। কি করবে তা হলে?

রহস্য। আমি স্বামীরই স্বপ্ন দেখতে চাই।

মহাকাল। কি রকম স্বপ্ন দেখবে? তোমার কথাবার্তা থেকে যতদূর মনে হচ্ছে তিনি খুব ভালো লোক ছিলেন না। তাঁকে নিয়ে কি রকম স্বপ্ন দেখবে তুমি?

রহস্য। দেবতাদেরও নানা দোষ, নানা দুর্বলতার কথা পুরাণে পড়েছি, নানা ছবিতে নানা মূর্তিতে তাঁদের নানা রকম চেহারা দেখেছি। একটার সঙ্গে আর-একটার মিল নেই। কিন্তু তবু তাঁদের সম্বন্ধে স্বপ্ন বদলায়নি।

মহাকাল। কোন দেবতার স্বপ্ন দেখ তুমি?

রহস্য। শিবের। ছেলেবেলা থেকে শিবপুজো করেছি। এখনও রোজ শিবের স্তোত্র পাঠ করি, শিব হয়তো শুনতে পান না। কিন্তু আমি—স্বপ্ন দেখি।

মহাকাল। শিবের সম্বন্ধে তোমার স্বপ্নটা কি ধরনের?

রহস্য। তা তো বলতে পারব না। ছেলেবেলায় এক বুড়ো শিবের মন্দিরে পুজো দিতাম। সেখানে শিব শুধু একখানা পাথর, সেই পাথরকেই দয়াময় মনে করতাম। তারপর শিবের নানারকম ছবি দেখেছি। আমার স্বপ্নও বার বার বদলে গেছে। শেষে একবার হিমালয়ে বেড়াতে গেলাম, তখন মনে হল হিমালয়ই শিব। হিমালয়ের যে-সব চূড়া আকাশে উঠে গেছে, যা সাদা বরফ দিয়ে ঢাকা, আমার স্বপ্ন এখন সেইসব চূড়াকে ঘিরে মেঘের মতো ভেসে বেড়ায়। জানি না আমার এ সব স্বপ্ন হয়তো মিথ্যে, আসল শিব হয়তো অন্যরকম। কিন্তু ওই স্বপ্ন দেখেই আমি সুখ পাই। স্বামীর সম্বন্ধেও ওইরকম স্বপ্ন দেখতে চাই আমি, স্বামীকে বিচার করতে চাই না; তাঁর স্বপ্ন দেখতে চাই। (সহসা সানুনয়ে) আপনি তার সুবিধে করে দেবেন একটু?

মহাকাল। এর জন্যে নরকে যেতে রাজি আছ?

রহস্য। আছি। আমি পাপী, আমার তো নরকে যাওয়াই উচিত।

মহাকাল। নরকে কিন্তু নিদারুণ কষ্ট। সেই কষ্টের মধ্যে কি তুমি তোমার স্বামীর স্বপ্ন দেখতে পারবে?

রহস্য। চেষ্টা করব। চেষ্টা ছাড়া আর কি করতে পারি বলুন।

মহাকাল। তুমি হাতে ওই লাল রুমালটা নিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? কার রুমাল ওটা। তোমার স্বামীর?

রহস্য। বোধ হয় আমার স্বামীর কোনো প্রণয়িনীর। স্বামীর বাক্সে রুমালটা পেয়েছিলাম। ছোঁয়া মাত্রই কিন্তু রুমালটা আমার হাতে সেঁটে গেছে। পরশুরামের হাতে যেমন কুড়ুল আটকে গিয়েছিল অনেকটা তেমনি। আমার ঈর্ষার আঠাই সম্ভবত রুমালটাকে আটকে রেখেছে। (সানুনয়ে) এটা খুলে নিতে পারেন?

মহাকাল। এদিক একটু সরে এস।

(রহস্য সরে আসতেই মহাকাল অনায়াসে তার হাত থেকে রুমালটি খুলে নিলেন। মহাকালের স্পর্শে কিন্তু রহস্য রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। একটা বিপ্লব ঘটে গেল যেন তার সর্বাঙ্গে।)

রহস্য। কে—কে—কে—আপনি?

(মূর্ছিত হয়ে পড়ল। মহাকাল তাকে তুলে একটি আসনে শুইয়ে দিলেন। তারপর যা করলেন তা অদ্ভুত। প্রণাম করলেন তাকে। অনেকক্ষণ শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তার

দিকে। তারপর ইঙ্গিতে নন্দীকে ডাকলেন। নন্দী কাছে এলে বললেন—এঁকে সসম্মানে পার্বতীর কাছে নিয়ে যাও। নন্দী তাকে কাঁধে করে তুলে নিয়ে গেল। মহাকাল লাল রুমালটি স্ফটিকের পান-পাত্রের ভিতর ফেলে ধ্বংস করে ফেললেন সেটিকে। তারপরই আর্ত হাহাকার আর অট্টহাসির অদ্ভুত অশরীরী। একটা রূপ ভেসে এল গেটের ওপার থেকে।)

মহাকাল। ভৃঙ্গী, আর কেউ আছে নাকি নীচে?

ভৃঙ্গী। কেউ নেই। বাস্তবলোক থেকে ভেসে আসছে ওই চিৎকার।

অশরীরী চিৎকার। আমি সবিতা, আমি এখনও মরিনি। আমি এখনও তেহেরানের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, পণ্য করেছি দেহকে, সঞ্চয় করেছি অনেক অর্থ, হয়েছে অনেক যশ, পেয়েছি অনেক অর্ঘ্য—কিন্তু তবু তৃপ্তি নেই। সুভদ্র সেন, কোথা তুমি, কোথা তুমি—কোথা তুমি, আমার কথা তোমাকে বলতে পারিনি কখনও—

(মহাকাল ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলেন—হঠাৎ চিৎকারটা থেমে গেল।)

ভৃঙ্গী। চিৎকার থেমে গেল।

মহাকাল। বজ্রাঘাতে এখনই মারা গেল মেয়েটি। ওর কষ্টের অবসান করে দিলাম।

(দরজার দিকে চেয়ে হাঁক দিলেন—'কোটাল, কোটাল'। কোটাল প্রবেশ করলেন এসে।)

তেহেরানের রাস্তায় নীল শাড়ি পরা সবিতা এখনি বজ্রাঘাতে মারা গেছে, তাকে তোমার ওই সাঁড়াশি কি আনতে পারবে এখানে?

কোটাল। নিশ্চয় পারবে।

মহাকাল। নিয়ে এস তাহলে। এনে ওই স্ফটিক পাত্রে নিক্ষেপ কর—সবাই একসঙ্গেই থাক।

(কোটাল অন্তর্ধান করলেন। সাঁড়াশি প্রলম্বিত হয়ে গেট পার হয়ে চলে গেল বাস্তবলোকের দিকে। পরক্ষণেই ফিরে এল সবিতাকে নিয়ে। সবিতার মৃত দেহটা শূন্যে ঝুলছে। মানুষ নয়, নীল শাড়িপরা একটা ঘুমন্ত পুতুল যেন। স্ফটিক পান-পাত্র তাকে গ্রাস করে ফেলল নিমেষে। আগুন জ্বলল, তারপর ঠাণ্ডা হয়ে গেল সব। দাঁড়িয়ে রইল স্ফটিকের পান-পাত্র স্ফটিক-শুভ্র শোভায়। এর পর প্রবেশ করলেন তরুণ যুবক। তাঁর হাতে সেই দু-খানা খাতা।)

তরুণ যুবক। এই খাতা দুটোর মধ্যেও কিছু কিছু স্বপ্নের আভাস আছে। পড়ে শোনাব আপনাকে?

মহাকাল। শোনাও।

তরুণ যুবক। প্রথমে মহুয়ার ডায়েরি থেকে পড়ছি কিছু—

মহাকাল। পড়।

তরুণ যুবক। (পড়তে লাগলেন) চারিদিকে এত ভিড়, তবু যেন মনে হয় একা আছি। আমার অন্তরতম সত্তা কাঁদছে। প্রগতির যুগে অনেক রকম অসুখের প্রতিকার আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু এ কান্না থামাবার উপায় আবিষ্কার করেছে কি? ধর্ম? সে তো কুসংস্কার, মিথ্যে স্তোকবাক্যে নিজেকে সম্মোহিত কর। সাহিত্য? সাহিত্য কল্পনার কুসুম-কানন। কত রকম ফুল ফুটেছে, তাদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকতে ভালো লাগে, কিন্তু বরাবর নয়, খানিকক্ষণ পরেই

অন্তরের চিরন্তন হাহাকার উদ্বেল হয়ে ওঠে আবার, মনে হয় আমি নিঃসঙ্গ, আমি একা। দাদু, মঙ্গলময়, মিস্টার চ্যাটার্জি, বাবুল, মোহিত সোম, শালিম সবাই ভালো, অথচ সবাই খারাপ। দু-মুখো মূর্তির মতো। মুখের আধখানা সুন্দর, আধখানা কুৎসিত, খানিকটা প্রদীপ্ত, খানিকটা অন্ধকার—

মহাকাল। থাক—আর পড়তে হবে না। আর একটাতে কি আছে, পড়—

তরুণ যুবক। নানারকম লিখেছেন ভদ্রলোক। খাতাটার নাম 'মেঘ'। প্রথম পাতাতেই একটা ধাঁধা এবং তার উত্তর। কে চটে গেলে আর আসে না? উত্তর—ঘুম।

এরপর একটা কবিতা—

শালিক ছাতারে ঘুঘু ফিঙে বক মুর্গি
চড়াই শকুনি আর কাকেরা
বিহঙ্গ সমাজের এই নবশাখেরা
এবার তুলিবে নাকি বিদ্রোহ-ঝাণ্ডা
অভিজাত পাখিদের করে দেবে ঠাণ্ডা!
ময়ূর, ফটিক জল, দোয়েল, হলদে পাখি,
মার্কিনে যাবে বলে খুঁজিতেছে ভিসা নাকি—
তিতির বটের দল
সবার নয়নে জল
খঞ্জন টিট্টিভ
ভয়ে বুক টিপ টিপ
থিরথিরা ছোট পাখি
কাঁপে শুধু থাকি থাকি
কোকিলের কুহু কুহু
মনে হয় উহু উহু
বেদনা আকাশে ফেরে কাঁপিয়া
চোখ গেল চোখ গেল ডেকে ওঠে পাপিয়া।
টুনটুনি বুলবুল
ঘামিতেছে কুল কুল
শুধু কাঠঠোকরার শোনা যায় ঝঙ্কার
বলে যেন—চোপ চোপ চোপ রও।
মাঝে মাঝে চুপে চুপে ডাকে—বউ কথা কও।
দরজী বাবুই আর মুনিয়া
মুচকি মুচকি হাসি শুনিয়া।

এর পর ছোট একটু গদ্য—

আমরা কিছু জানি না এইটেই সবচেয়ে বড় সত্যি কথা। এক হিসেবে সবচেয়ে বড় সান্ত্বনাও। জ্ঞানই মানুষকে অসুখী করে, অশান্ত করে। আমাদের কল্পনা নানারকম স্বপ্ন সৃষ্টি করে আমাদের মুগ্ধ করে রাখে খানিকক্ষণ। ভঙ্গুর সে স্বপ্ন ভেঙে যায়, আর একটা স্বপ্ন জেগে ওঠে। এই

ক্ষণভঙ্গুর স্বপ্নের নিত্য পরিবর্তনশীল স্রোতে আমরা ভেসে চলেছি। শেষে গিয়ে যে মহাকাল-সাগরে আমরা মিশব তার স্বরূপ আমরা জানি না। না জেনে ভালোই আছি। জানলে হয়তো ভয় পেতাম;

তারপর আর একটা কবিতা—

কেন জানি না মনে হচ্ছে
অনন্ত আকাশ-পথে চলেছে
পালকির সফর।
সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র
পাখি, ঘুড়ি, ধূলি, ধোঁয়া, গন্ধ—
সব পালকি।
প্রত্যেকেরই মাঝে
আছে বর, আছে বধূ
আর আছে সেই মধু
যার নাম প্রত্যাশা।
সবাই প্রত্যাশা করে আছে।
তাদের বয়ে নিয়ে যাচ্ছে
যে বেয়ারারা
তারাও পালকি চড়ছে মনে মনে
বাইরে তা দেখা যাচ্ছে না কিন্তু,
মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে
তাদের আর্তনাদ শুধু—
হুম ব্রো, হুম ব্রো, হুম ব্রো।
তারা ছুটছে—কেবল ছুটছে—
উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে—
গা দিয়ে ঝরছে ঘাম
ঘাম—ঘাম—কালঘাম।
চলেছে পালকির সারি
অগুনতি, অসংখ্য।

এর পর আছে—

মহাকাল। আর পড়তে হবে না। খাতা দুটো ফেলে দাও ওই পান-পাত্রের ভিতর। ওদের মধ্যে যে স্বপ্ন অমর তা মরবে না—

(তরুণ যুবক খাতা দুটি পান-পাত্রের ভিতর ফেলে দিলেন। আগের মতোই প্রদীপ্ত হয়ে উঠল সেটি খানিকক্ষণের জন্য। তারপর আবার পূর্ববৎ হয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুটো রঙিন প্রজাপতি বেরিয়ে এল পান-পাত্রের ভিতর থেকে, স্বপ্নলোকের দরজা দিয়ে উড়ে চলে গেল।)

মহাকাল। ওরা মরবে না! আর কেউ নেই তো?

ভৃঙ্গী। না।

মহাকাল। এবার তাহলে পান-পাত্রটাকে সরিয়ে নিয়ে এস। আর খবর দাও অসম্ভব-সম্ভব-কারিণী কোন মহাবিদ্যাকে—

(তরুণ যুবক চলে গেলেন। ভৃঙ্গী বিরাট পান-পাত্রটিকে মহাকালের সামনে স্থাপিত করে গেটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। একটি রূপসী যুবতী প্রবেশ করলেন।)

মহাকাল। ও, ষোড়শী এসেছ? এই পান-পাত্রটিকে ছোট করে দাও, এতে যা আছে তা পান করব।

ষোড়শী। কি আছে এতে?

মহাকাল। বিষ।

(ষোড়শী পান-পাত্রটিকে স্পর্শ করতেই সেটি ছোট স্বচ্ছ একটি পান-পাত্রে রূপান্তরিত হল। দেখা গেল তাতে নীল বিষ টলটল করছে।)

ষোড়শী। আবার বিষ পান করবেন?

মহাকাল। করতে হবে। এই আমার নিয়তি—

(পানপাত্রটি তুলে সমস্ত বিষ পান করে ফেললেন। তাঁর ঈষৎ নীল দুগ্ধ-ধবল কণ্ঠ আবার ঘোর নীল হয়ে গেল। ষোড়শী ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর চলে গেলেন ধীরে ধীরে। ভৃঙ্গী নীরবে সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন মহাকালের দিকে।)

।। তৃতীয় পর্ব ।।

তারপর অনেক অনেক দিন কেটে গেছে।

পূর্ণেন্দুবাবুর হলদে বাড়িটা ইঁটের স্তূপে পরিণত হয়েছে। ইঁটও আর দেখা যায় না। তার উপর গজিয়েছে জঙ্গল। জঙ্গলের গাছ অধিকাংশই অচেনা, চেনা শুধু তাদের সবুজ সতেজ প্রকাশটুকু। চেনা গাছ যে একেবারে নেই, তা-ও নয়। আকন্দ, ধুতুরা, বাঘ-নখ, নিম-অশ্বত্থের চারা, শিশু বট, ডুমুর গাছ, আসশ্যাওড়া। আর দু'পাশে দুটো দেবদারু গাছ—একটা খুব বড়, আর একটা তার চেয়ে ছোট, ভগ্নস্তূপের দু'ধারে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে এরা। সকলেরই সবুজ সতেজ প্রাণবন্ত ঊর্ধ্বমুখী প্রকাশ। পোকামাকড় পতঙ্গ প্রজাপতি টিকটিকি-গিরগিটিও আছে অনেক। সাপও আছে। আর আছে পাখিরা। সেই পাখিরাই, যারা সুভদ্র সেনকে ভোলাত একদিন। চড়াই শালিক টুনটুনি বুলবুলি নীলকণ্ঠ ফিঙে ল্যাজঝোলা হলদে পাখি দরজী ঘুঘু মোহনচূড়া বসন্ত-বউরি স্যাকরা পাখি চোর পাখি—সবাই আছে। মাঝে মাঝে ধনেশ পাখিও এসে বসে দেবদারু গাছে। লতাও আছে নানারকম। বিছুটি, তেলাকুচা পুনর্নবা গুলঞ্চ নাম-না-জানা আরও কতরকম লতা। তাদের কতরকম ফুল, কতরকম ফল, কতরকম গন্ধ, কত অভিব্যক্তি চতুর্দিকে। নেই কেবল পূর্ণেন্দুবাবুর হলদে বাড়িটা। সুভদ্র সেন আর মহুয়াকেও কেউ মনে করে রাখেনি। সুভদ্র সেনের পুরাতন চাকর মারা গেছে অনেক দিন। তার একমাত্র পৌত্র কলকাতায় রিকশা টানে। সে সুভদ্রবাবুর নাম পর্যন্ত শোনেনি। মানুষের ইতিহাসে সমাজের ইতিহাসে সুভদ্র সেন আর মহুয়া কোথাও নেই। মানুষের স্মৃতি সহজেই অবলুপ্ত হয় বিস্মৃতির অন্ধকারে। তবু কিন্তু মনে হয় ওই বাড়িটার ভগ্নস্তূপ এখনও ভোলেনি ওদের।

গভীর রাত্রে যখন জোনাকিরা আলোকোৎসব করে দেবদারু গাছ দুটিকে ঘিরে, তখন ছোট দেবদারু গাছ থেকে শঙ্কিত কণ্ঠে কে যেন ডাক দেয়—'দাদু'। বড় গাছটা চুপ করে থাকে খানিকক্ষণ। তারপর দ্বিধাভরে সেও সাড়া দেয়—'কি'। সব চুপচাপ হয়ে যায় আবার। অসংখ্য জোনাকি জ্বলতে থাকে নীরবে। অনেকক্ষণ পরে আবার শোনা যায় ভীরু সশঙ্কিত ডাক—দাদু। অনেকক্ষণ পরে বড় দেবদারু আবার দ্বিধাভরে উত্তর দেয়—কি!

অনেকে হয়তো বলবেন রাত-জাগা পাখি ওরা। কিন্তু—।

নবদিগন্ত

।। প্রথম পরিচ্ছেদ ।।

আগার সঙ্গে গোড়ার, সবুজের সঙ্গে ধূসরের, গদ্যের সঙ্গে কবিতার অমিলটাই চোখে পড়ে যাদের তাদের সংখ্যাই বেশি পৃথিবীতে। গোড়া যে কেবলই মিলতে চাইছে আগার সঙ্গে, ধূসর যে অহরহ সবুজের চিন্তাতেই আকুল এ খবর খুব বেশি লোক জানে না। তার চেয়েও কম লোকে জানে উলটো খবরটা। অগ্রগামী আগাও যে গোপনে গোপনে স্থাণু গোড়ার সমর্থন কামনা করে, সবুজও যে কখনও ধূসরের মায়া কাটাতে পারে না, আধুনিক গদ্য-প্রগতি যে সনাতন কবিতা-বন্ধনে বাঁধা পড়তে চাইছে নানা ছলে এর রহস্য তাদের চোখে কখনও ধরা পড়ে না যারা নিষ্প্রাণ সূত্রের সাহায্যে প্রাণবন্ত জীবনের মীমাংসা করবার ব্যর্থ প্রয়াস করে মরছে। নিকষে ঘষে কমলের মূল্য নিরূপণ করার মতো তা যে যুগপৎ করুণ এবং হাস্যকর হয়ে উঠছে তা বুঝতেও পারছে না তারা। ছন্দে না মিললেও নূতন এবং পুরাতন অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। আসলে তারা পরস্পরকে চায় কিন্তু পায় না। রূপান্তরিত হয়েও একজন আর একজনকে চিনতে চায়, কিন্তু পারে না, নাগাল পায় না। এইখানেই জমে উঠেছে নাটক।

উকিল সূর্যকান্ত চৌধুরী যখন তাঁর এম-এস-সি পাশ কৃতী পুত্র দিবসকে ল' কলেজে ভরতি করে দিয়েছিলেন তখন তাঁর মানস-লোক যে বর্ণসম্ভারে রঞ্জিত হয়েছিল তা যে দিবসের চিত্তকে রঞ্জিত করছিল না এ খবর তিনি অনেকদিন পাননি। এর কোনও লক্ষণও দেখতে পাননি। প্রথমে দিবস দু' একবার বলেছিল যদিও যে রিসার্চ নিয়েই সে থাকতে চায় কিন্তু তা তিনি কবিত্ব বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। নগদ পয়সা নেই যাতে তা কবিত্ব ছাড়া আর কি! বিজ্ঞান পড়লেও দিবসের প্রকৃতিটা যে আসলে কবি-প্রকৃতি (যে প্রকৃতি সমুদ্রের মতো পুরাতন দ্বীপ নিমজ্জিত করে সৃষ্টি করে নূতন দ্বীপ) তা সূর্য চৌধুরীর অবিদিত ছিল না। এর প্রত্যক্ষ একটা প্রমাণ তিনি পেয়েছিলেন অন্তত। দিবসের সঙ্গীতানুরাগ। একটা সরোদ নিয়ে যখন তখন মেতে ওঠে ও। সরোদটা যদিও নিজেই কিনে দিয়েছিলেন তিনি (মাতৃহীন একমাত্র পুত্রের কোনও আবদারে বাধা দেওয়ার শক্তি তাঁর ছিল না, তা ছাড়া ছিল ব্রজ) কিন্তু ও সরোদটাকে সু-চক্ষে দেখবার মতো উদারতা কিংবা নিরপেক্ষতা ছিল না তাঁর। কেবলই মনে হত তাঁর এবং তাঁর পুত্রের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে ওই যন্ত্রটা। কিন্তু এর বিরুদ্ধে বেশি কিছু বলবার সাহস তাঁর ছিল না যে কারণে তা আপাতদৃষ্টিতে গোবিন্দ সাণ্ডেলের কাছে অদ্ভুত ঠেকলেও তার আসল উৎস মনুষ্যত্বের সেই সত্তা যে সত্তায় জন্মগ্রহণ করে বিবেক, সত্যকে সত্য বলে চিনতে দ্বিধা করে না যে একমুহূর্ত। সরোদ বাজিয়ে দিবস যে কোনও অন্যায় করছে না এ তিনি বুঝতেন, দিবস যে রিসার্চ করতে চেয়ে অন্যায় কিছু করেনি এ-ও তিনি মানতেন। তবু তিনি ব্রজর কাছে সরোদ বাজানোর অলীক অপকারিতার কথা ইঙ্গিতে প্রকাশ করতেন, তবু তিনি দিবসকে প্রায়-জোর-করে ল' কলেজে ভরতি করে দিয়েছিলেন। চিন্তা-বৈষম্যের বিভিন্ন

আলোকেই তো বিচিত্র হয়েছে মানব জীবন। মানুষ আকাশের স্বপ্ন দেখে বটে কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না যে সে স্বপ্নটা আসলে ঘুড়ি, তার একটা খুঁট বাঁধা থাকে মর্ত্যের মাটিতে। ঘুড়ি যখন সুতো কেটে উড়ে যেতে চায় অসীম শূন্যে তখন ঘুড়ির মালিক হাহাকার করে ওঠেন যে সুরে সেই সুরে হাহাকার করে উঠল সূর্য চৌধুরীর মন অনিবার্য ঘটনাটা যেদিন ঘটে গেল। যে ছেলে চিরকাল শান্ত সুবোধ বাধ্য, বৃত্তি পেয়ে এসেছে যে বরাবর, সে যে ল' ক্লাসে এমন করে বেঁকে দাঁড়াবে তা তাঁর কল্পনাতীত ছিল।

.....দিবস নিজেও আত্ম-আবিষ্কার করল অকস্মাৎ। বই-মুখস্থ-করার কুস্তিগিরিতে অনর্থক সে সময় নষ্ট করছে একথা আবছাভাবে বারবার তার মনে হচ্ছিল যদিও অনেকদিন থেকে, কিন্তু স্পষ্টভাবে সে তখনই সচেতন হয়ে উঠল যখনই বুঝল মনে নানা রঙের স্বপ্নজাল বয়ন করা ছাড়া কার্যত আর কিছুই সে করেনি। পিতা-বনস্পতির স্কন্ধরূঢ় হয়ে পরগাছার মতো সে নানারকম থিয়োরির ফুল ফুটিয়েছে কেবল।

সচেতন হওয়া মাত্রই তার সজাগ শক্তি বেরিয়ে পড়ল পথের সন্ধানে। সব আবিষ্কারের মতো তার আত্ম-আবিষ্কারটাও হঠাৎই হল সেদিন। ডিম ফুটে বার হবার আগে পক্ষী-শিশু যেমন বাড়তে থাকে নেপথ্যলোকে, তার দুর্গম-পথানুরাগী ব্যক্তিত্বও তেমনি বাড়ছিল নামহীন কোনও যবনিকার অন্তরালে। বড় বড় আবিষ্কারের মতোই তার আবির্ভাবটাও হল আকস্মিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যে উপলক্ষকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করল সেটা, সেই উপলক্ষটাই বড় হয়ে রইল সকলের চোখে কিছুদিন। এত সস্তা চেহারা নিয়ে বড় হয়ে রইল যে সুবিধা হল গোবিন্দ সাণ্ডেলদের। তাঁরা চোখ বড় বড় করে বলবার সুযোগ পেলেন—"দেখলে? বলেছিলাম তো!"

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে উপলক্ষটা তুচ্ছ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে হল না তার কারণ আত্মা জিনিসটা (যা আবিষ্কার করলে দিবস) স্যাকারিন বা এক্স্-রে বা ওই জাতীয় সহসা-আবিষ্কৃত বস্তুর চেয়ে সূক্ষ্মতর। চোখ এড়িয়ে গেল সেটা সকলের, এমন কি দিবসের নিজেরও। সে-ও ব্যাপারটা নিজে বুঝতে পারেনি কিছুদিন, সদ্যোজাত শিশু প্রথমটা যেমন বুঝতে পারে না ব্যাপারটা কি হল। পিতার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়ে যাবার ফলে যে বেগে সে ছিটকে পড়ল তার পরিচিত আবেষ্টনীর গণ্ডী থেকে সেই বেগই খানিকক্ষণ অভিভূত করে রাখলে তাকে। তা ছাড়া তার ওই যন্ত্রটা (মানে, সরোদ) ষড়যন্ত্র করে তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করবার চেষ্টা করল যেন। রঙ্গনাও—থাক্ সে কথা পরে হবে।.... হ্যাঁ সংঘর্ষই হয়েছিল। সংঘর্ষ বলতে আমরা সাধারণত যে ধরনের রক্তারক্তি কাণ্ড বুঝি তার চেয়ে ঢের বেশি নিদারুণ সংঘর্ষ হয়েছিল, রক্ত যদিও এক ফোঁটাও পড়েনি। কিন্তু সংঘর্ষ হয়েছিল বলেই যে উকীল সূর্যকান্ত চৌধুরী—ধূসর সূর্যকান্ত চৌধুরী—সবুজ দিবসের প্রতি নির্মম হয়ে পড়লেন এজন্য এ কথাও যেমন সত্য নয়, সবুজ দিবসও আত্ম-আবিষ্কার করে তার ধূসর পিতার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ল এ কথাও তেমনি মিথ্যে। প্রকাণ্ড একটা ব্যবধানের অন্তরালে লুকোচুরি চলল যেন কিছুদিন প্রাচীন কবিতা এবং আধুনিক গদ্যের।

সঙ্গীতাচার্য গহনচাঁদও তার একমাত্র কন্যা রঙ্গনা সম্পর্কে যে ধরনের পরস্পর বিরোধী আচরণ পরম্পরা প্রকট করলেন তারও মূল সুর স্নেহ এবং রঙ্গনা সেটা জানত। জানত বলেই যা-খুশি করবার সাহস হল তার। এ যুগের কলেজে-পড়া মেয়ে সে ('লেডিজ্' লেবেল মারা

ট্রামের সীটগুলোর দিকে চেয়ে লজ্জায় মাথা কাটা যায় যার) তার অবশ্য সাহসের অভাব হওয়ার কথা নয়, কিন্তু সেই অস্ফুট সাহস প্রস্ফুটই হত না হয়তো যদি অদৃশ্য পথে গহনচাঁদের স্নেহ-লোকের খবর সে না পেত।

পত্নী বিয়োগের পর (এ ভদ্রলোকও বিপত্নীক, আশ্চর্য যোগাযোগ!) তাঁর একমাত্র কন্যাটির ভার আত্মীয় চুনীলালের উপর ন্যস্ত করে সঙ্গীতাচার্য গহনচাঁদ যখন নিশ্চিন্ত মনে কাশীতে রমজান-সীতারামের শ্রদ্ধা-সিংহাসনারূঢ় হয়ে সঙ্গীতচর্চায় মেতে ছিলেন তখন তিনি ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি যে কাশীর বাসা উঠিয়ে কোলকাতায় এসে তাঁকে 'সঙ্গীত ভবন' খুলতে হবে। সনাতনী পন্থায় তাঁর আধুনিক কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করতে গিয়ে তাঁকে এত নাকাল হতে হবে এও তাঁর কল্পনাতীত ছিল। ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠল সুতরাং।

চিরকালই হচ্ছে। বামপন্থী ছেলেমেয়েদের হিতাকাঙ্ক্ষায় উদ্বাহু পিতামাতার দল চিরকালই ছুটে চলেছেন দক্ষিণ পথে। নাগাল পাচ্ছে না কেউ কারও। কিন্তু আকর্ষণ আছে, দুর্নিবার আকর্ষণ.....

ব্যাপারটাকে জটিলতর করে তুলেছে বন্ধুবান্ধবের দল। দিবসের ট্রাম ড্রাইভার বন্ধু কিরণ, সূর্যকান্তের প্রধান মন্ত্রী গোবিন্দ, গহনচাঁদের আত্মীয় চুনীলাল না থাকলে এই দুই পরস্পর আকৃষ্ট অথচ বিভিন্নমুখী দল হয়তো একটু কম দিশাহারা হতেন। কিন্তু এঁরা চিরকাল আছেন এবং থাকবেন। এবং থাকবেন সেই সব অনাত্মীয়-অথচ-পরম-আত্মীয় ব্যক্তিগণ। (সৌদামিনী এবং দিবসের সেই সাহেব প্রফেসারের মতো) যাঁরা অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে হাজির হবেন ঊনপঞ্চশবায়ু-বাহিত হয়ে এবং আরও দিশাহারা করে দেবেন ধূসরের দলকে।

আরও থাকবেন তাঁরা যাঁরা জ্ঞাতসারে, অথবা অজ্ঞাতসারে, স্বার্থের স্নেহের অথবা, খেয়ালের প্রেরণায় সেতু-নির্মাণের প্রয়াস পান দুই দলের মধ্যে। এ হিসেবে মেসের বাসিন্দা অঘোর-গোবর্ধন-হরিদাস-ধূর্জটির দলের সঙ্গে সারেঙ্গী রমজান বা তবলচি সীতারাম অথবা মকোর্দমা-প্রিয় হরলালের বিশেষ তফাৎ নেই। কিন্তু একটা মজার কথা এই যে এরা সেতু বাঁধতে গিয়ে পরিখা খনন করে বসেন প্রায়ই। আঘাত করতে গিয়ে জাগিয়ে তোলেন সুর, সুর বাজাতে গিয়ে করে ফেলেন আঘাত।

রঙ্গনা যেটাকে আঘাত বলে ভেবেছিল সেটা সুর হয়ে বেজে উঠল তার জীবনে। উর্মি যেটাকে সুর বলে ভেবে ছিল সেটা হয়ে গেল আঘাত।

সুরই আঘাত হয়ে বাজল এই কাহিনীরও প্রাথমিক পর্বে। সেই সরোদটা। তীরের মতো এসে বিঁধল যেন, সূক্ষ্ম ফাটল দিয়ে প্রবেশ করল অব্যর্থ-সন্ধী আলোকরেখার মতো বন্ধ অন্ধকার ঘরে। শিউরে উঠল ঘরটা, চমকে উঠল, চটে গেল শেষে। 'তুমি বদ্ধ তুমি অন্ধকার'—আলোকরেখার এই নিঃসন্দিগ্ধ নীরব বাণী অসহ্য হয়ে উঠল যেন তার পক্ষে। সে বদ্ধ? সে অন্ধকার? মিছে কথা। মনে হল ওরা বাহাদুরি করছে, মনে হল ওরা হেরে যাবে, ভুল পথে চলছে, বাধা দেওয়াটা কর্তব্য তার। মনে হল...।

সুরটা শুনেও উকিল সূর্যকান্তবাবুকে তাঁর বিদেশাগত মক্কেল হরলালকে মকোর্দমা সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়ে যেতে লাগলেন, যেন কিছুই হয়নি। যেন-কিছুই-হয়নি ভাবটা মুখভাবে প্রস্ফুট রাখবার কৌশল (বা দক্ষতা) সূর্য চৌধুরীর এমন আয়ত্ত ছিল যে তাঁর নিতান্ত পরিচিত গোবিন্দ সাণ্ডেল এবং পুরাতন ভৃত্য ব্রজও সে ভাব-ব্যূহ ভেদ করে তাঁর মানস-লোকে প্রবেশ করতে পারত না সব সময়।

"দেখুন এ মকোর্দমা জিততে হলে গোটা কয়েক মিথ্যে সাক্ষী জোগাড় করতে হবে।"

ফাইলে নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে যন্ত্রচালিতবৎ বলে গেলেন তিনি কথাগুলো। হরলালের চোখে মুখে শৃগাল-সুলভ যে ভাবটা ফুটে উঠল তা লক্ষ্য করলেন না তিনি। বরং পরমুহূর্তেই চোখ তুলে উন্মুক্ত বাতায়ন পথে তাঁর দৃষ্টি যা দেখতে পেল (ওটা অনেকদিন থেকেই আছে, এতদিন দেখতে পাননি তিনি) এবং তাঁর মনে যে চিন্তাধারার পত্তন করল তার সঙ্গে হরলাল বা তার মকোর্দমার কোনও সম্পর্ক নেই। আবার তাঁর দৃষ্টি ফাইলে নিবদ্ধ হল কিন্তু তিনি যা দেখতে লাগলেন এবার তা ফাইলের লেখা নয়। যে সবুজ কচি অশ্বত্থ চারাটা চোখে পড়েছিল তাঁর ক্ষণকাল পূর্বে সেইটের সঙ্গে ভিত্তি-বিদারী একটা ফাটলের ছবিও ফুটে উঠেছিল তাঁর মানসপটে। তিনি শংকিত দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন সেই ফাটলটার দিকে। যে ভিত্তির উপর তাঁর এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের কীর্তিসৌধ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় এক শতাব্দী ধরে, পাশ্চাত্য সভ্যতার পাকা ইঁট আর বাঙালী প্রতিভার সিমেন্টে দুর্ভেদ্য মনে হয়েছিল যে বস্তুটাকে, যার উপর উঠেছে কত রকম ইমারত, চাকরির, পেশার, বিদ্যার, বুদ্ধির—হঠাৎ সেই ভিত্তিটার একধারে ফাটল দেখা দিয়েছে..... সুরটা বাজতেই লাগল পাশের ঘরে.....মনে হতে লাগল সুর নয়, অশ্বত্থ চারা, ছোট, কচি, কিন্তু শক্তিমান......

"উপড়ে ফেলতে হবে"—কথাগুলো উচ্চারণ করেই লজ্জিত হয়ে পড়লেন সূর্য চৌধুরী।

"আজ্ঞে?"—বিস্মিত হরলাল প্রশ্ন করলেন আবার।

"মিথ্যে সাক্ষী চাই কয়েকটা।"

"মিথ্যে সাক্ষী?"

"হ্যাঁ, মশাই। অনেক সময় মিথ্যে সাক্ষী না দিলে সত্যি কথাও প্রমাণ করা যায় না আদালতে।"

অনাবশ্যক জোর দিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করেই আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন সূর্য চৌধুরী। জানলা দিয়ে আবার চাইলেন বাইরের দিকে। অশ্বত্থ চারাটা হাসছে যেন হাওয়ায় দুলে দুলে।

হঠাৎ মনে হল দিবসকে চেনেন না তিনি। রোজ দেখছেন তবু চেনেন না। চেনবার কোনও চেষ্টাই করেননি, এতদিন, প্রয়োজন হয়নি। মাটির উপর রোজ নিশ্চিন্ত-চিত্তে চলা-ফেরা করে সবাই। মাটিকে চেনবার তাগিদ থাকে না, প্রয়োজন থাকে না তার নীচে কি আছে জানবার। ভূমিকম্প হয়ে যাবার পর সে আগ্রহটা জাগে। আবিষ্কৃত হয় ধৈর্যের প্রতিমূর্তি আপাত-শীতল মাটির বুকের ভিতরও আগুন আছে, আকাশচুম্বী পর্বতশিখরের দুর্ভেদ্য শিলাকে চৌচির করে মূর্ত হয়ে উঠতে পারে যা আগ্নেয়গিরিতে যে কোনও মুহূর্তে....

....পথ চলতে চলতে অপ্রত্যাশিতভাবে বৃষ্টি এসে পড়লে গম্ভীর পথিকও যেমন বিব্রত

হয়ে ছুটতে থাকে (বিশেষত ছাতা না থাকে যদি) সূর্য চৌধুরী তেমনি মনে মনে ছুটছিলেন, হোঁচট খেলেন হঠাৎ এক-জায়গায়।.... কিরণ, দিবসের বন্ধু কিরণ, কোথায় থাকে ছোকরা তাও তো জানি না, ছোকরা কবি শুনেছি, দিবসের সঙ্গে পড়ত, কিরণই দিবসকে সরোদের হুজুকে মাতিয়েছে—এইধরনের নানা এলোমেলো চিন্তা প্রস্তরীভূত হয়ে উঠল যেন হঠাৎ, হোঁচট খেলেন তাতে।.... তারপর সন্তর্পণে অন্ধকার একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন যেন নামহীন, অবাস্তব একটা ঘরের দিকে যেখানে দিবস ষড়যন্ত্র করছে প্রচলিত ভিত্তির বিরুদ্ধে—সঙ্গে কিরণ আছে কি?— তৈরি করছে সুরের হাতুড়ি!

....হঠাৎ মনে পড়ল গোবিন্দ সাণ্ডেলকে, তাঁর আবাল্য বন্ধু গোবিন্দ সাণ্ডেলকে যাঁর চতুর্ভুজাকৃতি চিবুকের নিম্নতম বাহুটি উভয় দিকে প্রসারিত হয়ে কর্ণস্পর্শী হয়ে উঠেছে প্রায়। আপদে বিপদে যে গোবিন্দ সাণ্ডেল নির্ভরযোগ্য পরামর্শ দিয়ে এসেছেন এতকাল, তাঁর বলিষ্ঠ মুখটা মনে পড়ল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সুইচ টিপে দিলেন হরলাল আবার।

"কটা মিথ্যে সাক্ষী চাই?"

"গোটা তিনেক অন্তত।"

"আচ্ছা, তাই চেষ্টা করি গিয়ে তাহলে। কোর্টে কি বলতে হবে তাদের?"

"সে আমি শিখিয়ে দেব। আপনি তাঁদের এইখানেই নিয়ে আসবেন।"

"আচ্ছা তাই আনব। আমি উঠি এবার?"

"আপনি উঠেছেন কোথায়?"

"যে মেসটায় আমি বরাবর উঠি তাতেই উঠেছি।"

"অসুবিধা হলে এখানেও থাকতে পারেন।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সে জোর তো আছেই।"

....সরোদটা বাজছিল পাশের ঘরে, সূর্য চৌধুরী আবার ছুটছিলেন মনে মনে, হঠাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন তিনি। সুরের শিলাবৃষ্টি হয়ে গেল যেন। দুনে উদ্দাম হয়ে উঠল গৎটা।

মুচকি হেসে সমঝদারের মতো মাথা নেড়ে হরলাল খোশামোদ করবার প্রয়াস পেলেন একটু।

"দিবুবাবু বাজাচ্ছেন বুঝি, বাঃ, খাশা হাত হয়েছে তো!"

আশানুরূপ ফল কিন্তু ফলল না। সূর্য চৌধুরীর কুঞ্চিত ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হয়ে গেল এবং নাসারন্ধ্রপথে যে 'হুঁ'টি ছট্‌কে বেরিয়ে এল সেটি তপ্তগুলির মতো মনে হল হরলালের। নমস্কারান্তে ছাতাটি বগলে নিয়ে সুট করে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

সূর্য চৌধুরী গুম্ হয়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হচ্ছিল যে তিনি ফী'য়ের টাকাগুলোর দিকেই সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন কিন্তু আসলে ঢুকে পড়েছিলেন তিনি 'গ্রীনরুমে' অর্থাৎ সাজঘরে, নিজের অজ্ঞাতসারেই। অপমানিত অভিভাবকের ভূমিকায় অভিনয় করতে হলে যে ধরনের সাজসজ্জা প্রয়োজন তাই নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আমরা সকলেই যে স্বপ্ন-রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা মাত্র সেই বৈদান্তিক বোধ সব সময়ে আমাদের মনে জাগরূক থাকে না সম্পূর্ণরূপে, সূর্য চৌধুরীরও তা ছিল না। তাছাড়া এক্ষেত্রে আর একটা

গোল হল। যে সরোদ নিয়ে দিবসকে মাতামাতি করতে মানা করেছেন তিনি—সেই সরোদে এই দুপুরবেলা পাশের ঘরে বসে অমন একটা তুফান-তোলা গৎ বাজানোর অর্থ তাঁকে অপমান করা এই অলীক ধারণার ঢিলটা অহংকার-সর্পের গায়ে লাগবামাত্রই ফোঁস করে উঠল সেটা এবং তর্জনের নেশায় নিমেষে এমন অভিভূত হয়ে পড়লেন তিনি যে স্বকীয় অন্তর্নিহিত আসল সত্তাটার (যে সত্তা বহির্জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপকে স্বপ্ন বলেই জানে) দিকে মনোযোগ দেবার আর অবসর পেলেন না। অর্থাৎ অজ্ঞাতসারেই রঙ্গমঞ্চে নূতন ভূমিকায় নেবে পড়লেন, এবং রুষ্টকণ্ঠে হাঁক দিলেন—"ব্রজ—"

তাঁর অন্তর্নিহিত আসল সত্তাটার সম্বন্ধে তিনি যে বরাবর উদাসীন থাকতে পারেননি এর বহু প্রমাণ পরে পাওয়া যাবে, কিন্তু তাঁর এই রুষ্ট কণ্ঠস্বরের মধ্যেই ব্রজ কি করে যে সে সত্তার আমেজ পেলে তা ব্রজই জানে। পুরাতন ভৃত্যদের একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে বোধ হয় যা দিয়ে তারা মনিবের স্বরূপটা ঠিক ধরতে পারে যে কোনও অবস্থায়।

রুষ্ট আহ্বানের উত্তরে ব্রজ তাই হন্তদন্ত হয়ে এল না। খুব ধীরে-সুস্থেই এল।

"কিছু বলছ?"

ব্রজ সূর্য চৌধুরীর বাপের আমলের চাকর। সূর্যকে বালক অবস্থায় দেখেছে, মাতৃহীন দিবসকে মানুষ করেছে। সুতরাং সূর্য চৌধুরীকে অসংকোচে সে 'তুমি' বলে।

"দিবুই বাজনা বাজাচ্ছে নাকি ও-ঘরে?"

"হ্যাঁ।"

"কলেজ যায় নি?"

"কই না তো। খায়ও নি সকাল থেকে কিছু। কি যে এক বাজনা কিনে দিয়েছ ওকে, দিন রাত ওই নিয়ে আছে।"

"কলেজ যায়নি কেন?"

"ও তো বলছে কলেজে আর যাবে না, উকীল হওয়ার ওর ইচ্ছে নেই।"

"ইচ্ছেটা কি তাহলে?"

"তা তো জানি না!"

যেমন নির্বিকারভাবে এসেছিল তেমনি নির্বিকারভাবে চলে গেল ব্রজ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করলেন গোবিন্দ সাণ্ডেল, রিটায়ার্ড গভর্নমেন্ট অফিসার গোবিন্দ সাণ্ডেল। তাঁর ধারণা তিনি সূর্যকান্তের বন্ধু ও বিবেক-রক্ষক। বর্ণচোরা আম বলে যারা এ জাতীয় লোকেদের বর্ণনা করেন তাঁরা ঠিক সুবিচার করেন না। আমের প্রতিও না এঁদের প্রতিও না। কড়া পাকের সন্দেশ বললেও ঠিক হয় না। এদের পাকটা যে কড়া সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু এরা ঠিক সন্দেশ নন। এঁরা মাধুর্যের অধিকারী (না হলে সূর্যকান্তের মতো লোক আকৃষ্ট হয়েছেন কেন) কিন্তু তা সরল মিষ্টতা নয়। কড়া সিগার বা বিলিতি চীজের সঙ্গে উপমিত করলে এঁর চরিত্রের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়, তাও ঠিক পাওয়া যায় না, কারণ এঁদের উপমা এঁরা নিজেরাই। মেকি চার্চিল-মার্কা উদ্ধত মনোভাবের মুখে বহু সাহেবের পাদুকা প্রহারের চিহ্ন ঢাকবার জন্যে যাঁরা মুখোস পরেছেন নানারকম সারা জীবন ধরে, যাঁদের শাস্ত্রে বাঙালীত্ব বজায় রাখবার একমাত্র মন্ত্র অবাঙালীদের তাচ্ছিল্য করা, নিজের মহত্ত্ব বজায় রাখবার উপায় অপরকে হীন

চক্ষে দেখা এবং কথায় কথায় প্রতিবেশীদের উপর টেক্কা দিয়ে ঈর্ষার বীজ বপন করা, মূর্খ হয়েও যারা সবজান্তা সেজে কাটিয়েছেন, নির্ধন হয়েও ধনীর চাল বজায় রেখেছিলেন যাঁরা চাকরি-জীবনে এবং চাকরি শেষে সে চাল বজায় না রাখতে পেরে নির্মম বাজেটের দাঁড়িপাল্লার উপর সন্তর্পণে চড়ে বসে আছেন যাঁরা, এক কথায় তাঁদের বর্ণনা করা শক্ত। ইংরেজি 'চীজ' বললে যা বোঝায় তা এরা নন ঠিক, হিন্দি চীজ ''শব্দটি' বরং বেশি লাগসই এঁদের সম্বন্ধে। খুব বেশি লোকের সঙ্গে সত্যিকার বন্ধুত্ব এঁদের হয় না। কারণ এঁদের চরিত্রের নিগূঢ় মাধুর্য অধিকাংশ লোকেরই মর্মগোচর হয় না, তাছাড়া এদের চারিদিকে এমন একটা বর্ম থাকে যা অধিকাংশ লোকের পক্ষে দুর্ভেদ্য। কিন্তু যদি কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব জমে যায় এঁদের দৈবাৎ, তাহলে বিলিতি পাকা রঙের মতোই নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে তা। সূর্য চৌধুরীর সঙ্গে গোবিন্দ সাণ্ডেলের বন্ধুত্ব জমেছিল।

দিবস উকিল হতে চায় না ব্রজর মুখে এই কথা শুনেই সব গুলিয়ে গিয়েছিল সূর্য চৌধুরীর। যে সম্ভাবনাটা মনের ভিতর লুকিয়ে ছিল সেটা হঠাৎ মূর্ত হয়ে উঠল যেন— 'হায় হায় কেটে গেল বুঝি ঘুড়িটা অমন মানজা দেওয়া সত্ত্বেও' গোছের একটা শঙ্কিত ক্ষোভের দাপটে তাঁর সমস্ত চিন্তাধারা নিরবয়ব হয়ে পড়ল যেন মুহূর্তের মধ্যে। গোবিন্দ সাণ্ডেলকে পেয়ে বেঁচে গেলেন তিনি যেন, মনে মনে ছুটে এলেন তাঁর দিকে, অকুল সমুদ্রে ভেলা দেখতে পেলেন যেন একটা। ছুটে আসবার আর একটা কারণও ছিল, নিমেষের মধ্যে আর এক কাণ্ডও করেছিলেন তিনি, অতীতে ফিরে গিয়েছিলেন, নিজের সেই অর্ধবিস্মৃত যৌবনলোকে— রাজপুত্র প্রবীরের দিকে চেয়েছিলেন সবিস্ময়ে, মাথায় উষ্ণীষ, গায়ে জরিদার মখমলের পোশাক, বাম স্কন্ধে বিলম্বিত ধনু, ললাটে তিলক...। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য কথা, তিনিই প্রবীর সেজেছিলেন একদিন পিতার নিষেধ তুচ্ছ করে। অবলুপ্ত ছবিটার দিকে অবিশ্বাস ভরে চেয়েছিলেন তিনি, স্নিগ্ধরস ধারায় কোমল হয়ে আসছিল মনটা, এই সময় গোবিন্দ সাণ্ডেল না এসে স্বয়ং দিবস যদি আসত তাহলে এ কাহিনীর চেহারা অন্য রকম হয়ে যেত হয়তো। কিন্তু গোবিন্দ সাণ্ডেল এলেন এবং তাঁকে দেখেই সূর্য চৌধুরী পালিয়ে এলেন স্বপ্নলোক থেকে।

....পাশের ঘরে সরোদটা তখনও বাজছিল, যে সরোদের ভগ্ন-মূর্তি পরে ব্যথিত করেছিল ব্রজকে, লুকোচুরিতে প্রবৃত্ত করেছিল গম্ভীর সূর্যকান্তকেও, সেই সরোদটা বেজে চলেছিল তখনও....

গোবিন্দ সাণ্ডেলের মুখে নয় চোখে ফুটে উঠল একটা ভাষা। 'ও বাবা একি আবার'-গোছ। ভাবের সঙ্গে সকৌতুক বিদ্রূপই শুধু ছিল না তাতে 'বেফাঁস কিছু না বলে চুপটি করে মজা দেখা যাক দূর থেকে দাঁড়িয়ে'—এই ধরনের একটা আভাসও ফুটে উঠেছিল ভাষাভরা সে অপরূপ চাহনিতে। দিবসের আধুনিক চাল-চলন সম্বন্ধে যতটুকু সংবাদ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন (এবং বেশ কিছু করেছিলেন; কারণ পরের সম্বন্ধে নানাবিধ রোচক সংবাদ সংগ্রহ করার যে পারদর্শিতা তাঁর ছিল তা আধুনিক যুগের টিকিট সংগ্রহ করার পারদর্শিতার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়) তাতে দূর থেকে দাঁড়িয়ে মজা উপভোগ করবার মতো যথেষ্ট উপকরণ যে নিশ্চয়ই আছে এ বিশ্বাস তার ছিল।

বাপের কানের পাশে সরোদের গৎ বাজানোটা যে দিবসের আধুনিকতার একটা লক্ষণমাত্র

এটা বুঝাতে দেরি হয়নি গোবিন্দ সাণ্ডেলের। সূর্য চৌধুরীরও হয়নি যদিও তিনি এই অবিশ্বাস্য জ্ঞানটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করছিলেন প্রাণপণে। "পেশা হিসাবে ওকালতি ব্যাপারটার সার্থকতা আমি আর দেখতে পাচ্ছি না ভবিষ্যৎ সমাজে। ভবিষ্যৎ ভারতের প্রচেষ্টা হবে সব রকম ঝগড়া নিবারণ করা, ঝগড়াকে অবলম্বন করে পয়সা রোজগার করা নয়"—অনেকদিন পূর্বে উচ্চারিত দিবসের এই কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু শুনতে চাইছিলেন না। সরোদের গৎ ভেদ করে তবু ভেসে আসছিল কথাগুলো, রুষ্টতর করে তুলছিল তাঁকে। তিনি যে দিবসের অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে রুষ্ট হচ্ছিলেন তা নয়, রোষের আসল কারণ তিনি অপমানিত বোধ করছিলেন এতে। যে ঠুনকো সম্মানের পোশাক পরে তিনি সগৌরবে সামাজিক মর্যাদা কুড়িয়ে এসেছেন এতদিন সেই পোশাকটার গায়ে কাদা লাগিয়ে দিয়েছে দিবস যেন তাঁর মনে হচ্ছিল। তিনি কল্পনানেত্রে দেখছিলেন যে দিবস—তাঁর একমাত্র ছেলে দিবস—মুখে না বললেও মনে মনে তাঁকে অশ্রদ্ধা করছে এই ওকালতি পেশার জন্য, যে পেশার ভিত্তি, দিবসের মতে, মনুষ্যত্ব নয়, পশুত্ব। কি মূর্খতা! এই মূর্খতার কথাটা কিন্তু মুখ ফুটে তিনি বলতে পারেননি দিবসকে, বলবার সাহস সংগ্রহ করতে পারেননি। শুধু তাই নয়, (সব চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার এইটেই এবং এইটেই সূর্য চৌধুরীর বিশেষত্বও), দিবসকে তিনি জোর করে ল' ক্লাসে ভরতি করে দিয়ে মনে মনে অপরাধী হয়েছিলেন যেন। তাঁর বারবার মনে হচ্ছিল নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, বৃদ্ধবয়সে দিবসকে নিজের নির্ভরযোগ্য অবলম্বন করবার জন্য, তিনি যেন তাঁকে তার বিবেকের বিরুদ্ধে আটকে রাখতে চাইছেন জোর করে। "না না দিবসকে তিনি উকিল করতে চাইছেন তার নিজের ভালোর জন্যেই। নিতান্ত ছেলে মানুষ, দুনিয়ার ও বোঝে কি, রিসার্চ করে কটা পয়সা পাবে ও এ বাজারে—তাছাড়া যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে নানাবিধ সংকীর্ণতার বিষ জর্জরিত করে রেখেছে আবহাওয়াকে সে দেশে বিজ্ঞানের গবেষণা হওয়া সম্ভব না কি! এখানে সব জায়গাতেই তো ক্লিক্—" এই সব কথা আর একবার মনে মনে আউড়েও সাহস সংগ্রহ করতে পাচ্ছিলেন না তিনি। তাঁর হঠাৎ-ক্রুদ্ধ দৃষ্টির শিখা ম্লান হয়ে আসছিল, এমন সময় প্রিয় বন্ধু গোবিন্দ সাণ্ডেলের দর্শন পেয়ে অকূল সমুদ্রে কূল পেলেন তিনি যেন সহসা।

"কি খবর?"

গোবিন্দ সাণ্ডেলের এই তুচ্ছ কথা দু'টিই যেন প্রচুর সাহস সঞ্চার করলে তাঁর মনে। প্রদীপ্ততর হয়ে উঠল চোখের দৃষ্টি।

"খবর? খবর ওই শোন না"—বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে দিলেন পাশের ঘরটা।

টং টং টং টং টং মনের আনন্দে সরোদ বেজে চলেছিল। ভাযাভরা চক্ষু নিয়ে পাশের কৌচটায় বসলেন গোবিন্দ সাণ্ডেল। পা দোলাতে লাগলেন সূর্য চৌধুরী। গোবিন্দ সাণ্ডেলের স্থূল উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে মনে মনে কিন্তু তিনি দিবসের সঙ্গেই কথা বলতে লাগলেন কল্পনায়।

"এটা প্রত্যাশা করিনি তোমার কাছে। আশা করিনি যে লেখাপড়া শিখেও অবাধ্য হবে তুমি।"

"অবাধ্য? কই না! সরোদ বাজাতে আপনি মানা করেন নি তো?"

"ব্রজর কাছে তুমি নাকি বলেছ যে উকিল হওয়ার তোমার ইচ্ছে নেই?"

"তা নেই।"

কাল্পনিক কথাবার্তা এর বেশি আর এগোল না। এই কাল্পনিক 'তা নেই'-এর বিরুদ্ধে কল্পনাতে তিনি কিছু বলতে পারলেন না। সরোদটা সমানে বেজে যেতে লাগল।

—"বাবাজি আজকাল বাজনা নিয়ে খুব মেতেছেন বুঝি? ভালো!"

টোপটি ফেলে উৎসুক হয়ে বসে রইলেন গোবিন্দ সাণ্ডেল। দিবসের সম্বন্ধে সূর্যকান্তর দুর্বলতার কথা অবিদিত ছিল না তাঁর। সুতরাং বেশি কিছু বলা সমীচীন মনে করলেন না। সরোদ কিনে দিতে আগেই মানা করেছিলেন তিনি। এখন....।

সূর্য চৌধুরী কিন্তু কোনও উত্তর দিলেন না, তিনি কাল্পনিক 'তা নেই'-এর উত্তরটা ভাবছিলেন পা দোলাতে দোলাতে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গোবিন্দ সাণ্ডেল নিজের কেশবিরল মস্তকে হাত বুলোলেন একবার। আড়চোখে সূর্য চৌধুরীর দিকে চাইলেনও একবার।

"আমিই অবশ্য বাজনাটা ওকে কিনে দিয়েছি"—সূর্য চৌধুরী বললেন সে চাউনির উত্তরে।

"তা তো জানি।"

"কিন্তু ও যে ও নিয়ে এতটা মেতে উঠবে তা ভাবিনি"—প্রিয় বন্ধু গোবিন্দ সাণ্ডেলের মুখভাবে বিদ্রূপের আভাস দেখে থেমে গেলেন একটু তিনি, তারপর আর একটু থেমে শেষ করলেন কথাটা—"কলেজ না গিয়ে সরোদ বাজাচ্ছে দেখ দিকি কাণ্ড!"

গোবিন্দ সাণ্ডেলের মুখভাবে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল সহসা বিদ্রূপের আভাসটা। বস্তুত, আভাস রইল না তা আর প্রকাশ হয়ে পড়ল, আর তা লক্ষ্য করবামাত্র সশস্ত্র হয়ে উঠলেন সূর্য চৌধুরী মনে মনে।

"বাজনা জিনিসটা খারাপ নয়, বুঝলে, কিন্তু মা সরস্বতীর দক্ষিণ হস্তের ওই ব্যাপারটি মা সরস্বতীকেই মানায়। আমাদের মতো সাধারণ লোকেরা ও নিয়ে বেশি মাতামাতি করতে গেলেই আমাদের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটি বন্ধ হয়ে যায, বিশেষত আমাদের দেশে।"

ঠিক এই মুহূর্তে সূর্য চৌধুরীর মনে যা হচ্ছিল তা জানতে পারলে চমকে যেতেন রিটায়ার্ড গভর্নমেণ্ট অফিসার গোবিন্দ সাণ্ডেল। হঠাৎ তাঁর, মানে সূর্য চৌধুরীর, অন্তরাত্মা (যা কখনও মরে না, যাতে কখনও মরচে ধরে না, যা সমস্ত পাঁক পলি ঠেলে কমলের মতো বেরিয়ে পড়ে মাঝে মাঝে) আত্মপ্রকাশ করল তাঁর দৃষ্টির ভিতর দিয়ে। প্রিয় বন্ধু গোবিন্দ সাণ্ডেলকে তিনি শঠ, জুয়াচোর, ঘুষখোর, মূর্খ, খোশামুদে, অহঙ্কারী, পাজি, ঝুনোনারকেল-রূপে প্রত্যক্ষ করলেন সহসা। ক্ষণকালের জন্য কিন্তু। তারপর মুহূর্তেই আবার চলে গেলেন তিনি দিবসের কাছে। ভাবতে লাগলেন দিবস কি—কিন্তু ভাববার দরকার হল না—তিনি নিঃসংশয় হলেন যে দিবসকে নোয়ানো যাবে না, কিছুতেই নিজের মত পরিবর্তন করবে না ও। পুত্রের মুখখানা মানসনেত্রে দেখতে লাগলেন। অসাধারণ নয়, কিন্তু বিশিষ্ট, চরিত্রের ছাপ আছে। নোয়ানো যাবে না। অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে লাগলেন। প্রিয় বন্ধু গোবিন্দ সাণ্ডেলের দিকে চাইলেন আবার। মনে হল, হোক ঝুনো নারকেল, তবু এই লোকটাই নির্ভরযোগ্য।

"কলেজ না গিয়ে সরোদ বাজাচ্ছে, মানে? ওকালতি আর পড়বে না?"

"না।"

"তার মানে?"

মানেটা কিন্তু স্পষ্ট করে খুলে বলতে পারলেন না সূর্য চৌধুরী। আসল কথাটা চেপে গেলেন। সবুজ প্রাণের দুঃসাহসকে তিনি যে আমল দেননি, তাকে যে রিসার্চ করতে বাধা দিয়েছিলেন, এ কথাটা ঝুনো নারকেল গোবিন্দ সাণ্ডেলের কাছেও স্বীকার করতে বাধল তাঁর। গোড়াগুড়িই বেধেছিল। গোবিন্দ সাণ্ডেলকে এ কথা তিনি একবারও বলেননি। প্রিয় বন্ধুর কাছ থেকেও অনেক সময় অনেক কথা গোপন করতে হয়। কিন্তু এই বিশেষ কথাটি গোপন করে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন তা যদি দিবস জানতে পারত তাহলে সে হয়তো অমন হঠকারিতা করত না।

"বুঝলাম না ঠিক, গান বাজনাকেই ও পেশা করতে চায় নাকি তাহলে?"

"হয়তো।"

ঠিক এইখান থেকেই উপলক্ষটা বড় হয়ে উঠতে লাগল, প্রায় ডালপালা বিস্তার করে ক্রমশ আবৃত করে ফেলল লক্ষ্যকে। ধূসর-পক্ষ সরোদটাকেই বড় করে দেখলেন এবং সবুজ-পক্ষের জীবনেও তা ঘটনাচক্রে বড় হয়ে উঠল কিছুদিনের জন্য। রঙ্গনা প্রভৃতির অভ্যাগমে জটিলও হয়ে গেল একটু। দিবসের আন্তরিক আকুতি ঈপ্সিত পথে বাধা পেয়ে ভিন্ন খাতে বইল কিছু দিন।

"দিবুকে তো অত বোকা মনে হয় না"—মন্তব্য করলেন গোবিন্দ সাণ্ডেল, "উকিল হয়ে বসলে তোমার তৈরী প্র্যাকটিসটা পেত এটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি ওর আছে বলেই তো বিশ্বাস করি।"

"কি জানি ভাই আজকালকার ছেলেদের মতিগতি বুঝতে পারি না"—মামুলি ফরম্যুলাটা আওড়ালেন সূর্য চৌধুরী।

গোবিন্দ সাণ্ডেল মাথায় হাত বুলোলেন। তারপর একটু থেমে বললেন, "ভিতরে অন্য ব্যাপার আছে—নিশ্চয় কিছু। খোঁজ কর।"

"অন্য ব্যাপার মানে?"

"তাতো জানি না, খোঁজ কর সেটা।"

অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়লেন গোবিন্দ সাণ্ডেল। যে দিবসকে তিনি চেনেন তার সঙ্গে ঘটনাটা কিছুতেই মেলাতে পারছেন না যেন।

"কি ধরনের ব্যাপার সন্দেহ করছ তুমি?"—সূর্য চৌধুরীর কণ্ঠস্বরে একটু ব্যাকুলতাই প্রকাশ পেল।

"সন্দেহ?"

উৎসুক দৃষ্টিতে চাইলেন তিনি একবার বাইরের দিকে যেন জানলার বাইরেই প্রশ্নটার উত্তর মূর্ত হয়ে আছে। জানলার বাইরে কেউ নেই দেখে কিন্তু হতাশ হলেন তিনি, আশ্বস্ত হলেন। নিম্নকণ্ঠে বললেন, "দেখ গান-বাজনার সঙ্গে প্রায়ই যে জিনিসটা জড়িয়ে থাকতে দেখা যায় তা, প্রায়ই, মানে হ্যাপি হয় না। বিশেষত আমাদের মতো মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের পক্ষে। পাখিরা গান গায় কখন জান? ব্রিডিং সিজনে!"

হঠাৎ ধস্ ভেঙে সূর্যকান্ত পড়ে গেলেন যেন খরস্রোতা নদীর আবর্তে। উত্তাল তরঙ্গমালার

সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তলিয়ে গেলেন যেন ক্ষণকালের জন্য, আবার উঠলেন, আবার সাঁতরাতে লাগলেন প্রাণপণে,—হঠাৎ দূরে দ্বীপ দেখতে পেলেন একটা, চেনা দ্বীপ, সাঁতরে গিয়ে উঠলেন সেখানে। কিরণ।

"মানুষের বেলায় ও কথা সত্যি কি সব সময়ে?"—চেনা দ্বীপে উঠে আশ্বস্ত সূর্যকান্ত বললেন মুখে হাসি টেনে—"তাছাড়া দিবু গান শিখছে তার বন্ধু কিরণের কাছে। তুমি যা ভাবছ তা নয়।"

"কিরণ? কোন কিরণ? সেই ট্রাম ড্রাইভারটা না কি? তার সঙ্গে দিবসের বন্ধুত্ব আছে?"

"কলেজে একসঙ্গে পড়েছিল যে। খুব বন্ধুত্ব দুজনে। ওই তো সরোদের হুজুকে মাতিয়েছে ওকে।"

ভাষা-ভরা হয়ে উঠল গোবিন্দ সাণ্ডেলের দৃষ্টি। 'এই সেরেছে'র সঙ্গে তাহলে তো-যা-ভাবছিলাম-তাই'-এর একটা হৃষ্ট সম্মিলন জ্বলজ্বল করতে লাগল তাঁর চোখে।

"কিরণ ছেলে কিন্তু খুব ভালো। খুব আত্মসম্মান বোধ আছে, বেশ ভদ্র, তাছাড়া—"

যদিও কিরণের সম্বন্ধে তেমন বিশেষ কিছু জানতেন না তিনি, সে কোথায় থাকে সে ঠিকানাটা পর্যন্ত জানতেন না, তবু যতটুকু জানতেন তাতেই রং চড়িয়ে বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু গোবিন্দ সাণ্ডেলের চোখের দিকে চেয়ে দমে গেলেন তিনি। থেমে গেলেন। আমতা আমতা করে কেবল বললেন, "না, না তুমি যা ভাবছ তা নয়।"

"আমি স্বচক্ষে কিন্তু সেটা দেখেছি"—মৃদু হেসে বললেন গোবিন্দ সাণ্ডেল এবং বলেই থেমে গেলেন। অভিজ্ঞ লোকেরা চট করে পুরো কথাটা বলেন না, অভিজ্ঞতার জটে কথাগুলো আটকে যায় বোধ হয়, এবং যতটুকু বলেন তা অনন্ত সম্ভাবনার ইঙ্গিতে শ্রোতাকে যখন দিশাহারা করে তোলে তখন জট খুলতে খুলতে সেটা উপভোগও করেন তাঁরা। অর্থাৎ কথা কইতে কইতেও তাঁরা দাবা খেলেন।

গোবিন্দ সাণ্ডেল ওইটুকু বলেই মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। উৎকণ্ঠিত সূর্য চৌধুরী প্রশ্ন করলেন, "কি দেখেছ স্বচক্ষে?"

জানলার দিকে আর একবার চকিতে দৃষ্টিপাত করে এবার পুরো উত্তরটাই দিলেন গোবিন্দবাবু। অবশ্য নিম্নকণ্ঠে।

"আমাদের পাড়ায় ঊর্মি বলে একটা বখা মেয়ে আছে নেচে নেচে বেড়ায় চারদিকে। তোমার ওই কিরণের সঙ্গে প্রায়ই দেখতে পাই তাকে পথে ঘাটে। সেদিন দেখি একটা রিকশা চড়ে আসছে দু'জনে!"

বখা মেয়ে! সর্বনাশ! দিবসের বন্ধু কিরণের সঙ্গে রিকশা চড়ে বেড়ায়? ভীতিবিহুল বিস্ফারিত নেত্রে চেয়েছিলেন যদিও তিনি গোবিন্দ সাণ্ডেলের মুখের দিকে, কিন্তু তাঁর পরবর্তী কথাগুলো আর কানে ঢুকছিল না সূর্য চৌধুরীর। তিনি কল্পনায় দিবসের কাছে চলে গিয়ে তার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

"কিরণ না কি ঊর্মি বলে একটা মেয়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়?"

"বেড়ায় শুনেছি। তাতে হয়েছে কি!"

"ও রকম ভাবে একটা মেয়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়ানোটা কি ভালো?"

"ক্ষতি কি?"

কল্পনায় দিবসের মুখে এই সম্ভাব্য উত্তরটা শুনে সূর্য চৌধুরীর চক্ষু আরও বিস্ফারিত হয়ে গেল। কল্পনাতেও এর প্রতিবাদ করবার মতো জোর খুঁজে পেলেন না তিনি। তাঁরও মনে হল, সত্যিই তো, একটা মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে ক্ষতি কি। তারপর হঠাৎ তিনি শ্রবণশক্তি ফিরে পেলেন আবার শুনলেন গোবিন্দ সাণ্ডেল বলে চলেছেন, "ধরে নিলুম না হয় কিরণ ভালো ছেলে এবং দিবস তার কাছেই গান-বাজনা শিখছে, কিন্তু আমি গোড়ায় যে কথাটা বলেছিলুম তুমি উড়িয়ে দিতে চাইলেও উড়িয়ে দেবার মতো নয়। দিবস যার কাছেই গান-বাজনা শিখুক তাতে এসে যায় না কিছু, আমি যে কথাটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে গান-বাজনা জিনিসটাই একটু 'সেক্‌সি'। অত কথায় কাজ কি, খোদ সরস্বতীর পৌরাণিক কাহিনীটাই মনে করে দেখ না। আমরা গরিব গুরবো মানুষ, আমাদের কি ওসব সরোদ ফরোদ পোষায় ভায়া। শাক ভাতের ব্যবস্থা করতেই নাজেহাল হতে হবে আমাদের। আমার পরামর্শ যদি শোন, প্রশ্রয় দিও না ও সব।"

কথাটা খুবই সমীচীন মনে হল সূর্য চৌধুরীর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দিবসের মুখটা মনে পড়ে গেল.... নাঃ, কিছুতেই নোয়ানো যাবে না ওকে।

"সিট্ অন্ হিম্" হঠাৎ ইংরেজি ভাষায় উপদেশ দিলেন সাণ্ডেল মশাই।

"তার মানে?"

"রাশ টেনে ধর হে। এই সোজা কথাটা বুঝতে পারছ না?"

হঠাৎ একটা অদ্ভুত উপমা মনে এল সূর্য চৌধুরীর।

"পারছি না। পাহাড় ফেটে যখন ঝরনা বেরোয় তখন তার রাশ টেনে রাখতে পার তুমি?"

"পারি বই কি"—একটু ঝাঁজের সঙ্গেই উত্তর দিলেন গোবিন্দ সাণ্ডেল—"মানুষ চিরকালই পারছে। বাঁধ দেওয়া ব্যাপারটা খুব নতুন নয় তো।"

বাঁধ! দিবসের চারিদিকে বাঁধ দিতে হবে! বিরাট একটা কংক্রিটের দেওয়াল মূর্ত হয়ে উঠল চোখের সামনে।

"দিবুকে একটা কংক্রিটের বেড়ার মধ্যে বেঁধে রেখে দেব বলছ?"

"মানুষকে যে বেড়ার মধ্যে বেঁধে রাখতে হয় তা যে কংক্রিটের নয় তা তুমিও জান, আমি জানি। যাক্ ও আলোচনা এখন থাক, একটা মকোর্দমার নথি এনেছি সেইটে দেখ দিকি। চুনীলাল বলে আমার একটি বন্ধু আছে, ঠিক বন্ধু নয়, বন্ধুর বন্ধু, সে এক ব্যবসা করতে গিয়ে ফেঁসে গেছে। বাঙালীর যা হয়। ম্যানেজিং ডিরেকটার ছিল সে। ক্রিমিনাল কেসে পড়ে গেছে বেচারা। দেখ তো এর কোনও উপায় করতে পার কি না।"

সূর্য চৌধুরী সাগ্রহে হাত বাড়ালেন নথিটার দিকে। এই অপ্রিয় আলোচনার ধোঁয়ায় তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল যেন। ধূমায়মান ভিজে ঘুঁটেটা সরিয়ে নেওয়াতে তিনি বাঁচলেন যেন।

নথির দু'এক পাতা উলটেই তিনি বললেন, "ও, এ কেস তো জানি আমি। হরলাল সিংহির সঙ্গে মকোর্দমা তো? আমিই তো হরলালের পক্ষে উকিল, এখুনি তো হরলাল এসেছিল। তোমার চুনীবাবু যদি নির্দিষ্ট দিনে টাকা দাখিল করতে না পারেন জেল হয়ে যাবে।"

"বল কি! জেল হয়ে যাবে?"

"নির্ঘাত!"

ঠিক এই সময়ে ব্রজ এল আবার। এবং ঈষৎ ধমকের সুরেই বললে, "তুমি আর বেলা করছ কেন। এগারোটা বাজে যে—কাছারি যাবে না নাকি আজ?"

"হ্যাঁ যাব বই কি।"

"আমিও উঠি তাহলে এবার"—গোবিন্দ সাণ্ডেল উঠে পড়লেন। সরোদটা তখনও বাজছিল। পাশের ঘরটার দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসে চোখ মট্‌কে গোবিন্দ সাণ্ডেল বললেন, "খুব জমিয়েছে দেখছি। আমি বুড়ো মানুষ, আমার বুকের ভেতরটাই খলবল করে উঠছে"—বলেই চলে গেলেন।

সূর্য চৌধুরী হঠাৎ অপমানিত বোধ করলেন এতে। তাঁর উনবিংশ-শতাব্দী-লালিত আত্মসম্মানের কান লাল হয়ে উঠল লজ্জায়। ব্রজর দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "কি কাণ্ড!"

"তুমি তো কিনে দিয়েছ ওকে সরোদ"—নির্বিকার কণ্ঠে বললে ব্রজ। তার মুখের চেহারাও এমন ভাব-লেশ-হীন হয়ে উঠল (অনেকটা ঢালের মতো) যেন সে পরবর্তী চিৎকারটা প্রত্যাশাই করছিল।

"না ওসব বেলেল্লাগিরি আমার বাড়িতে চলবে না। ডেকে দাও ওকে"—গর্জন করে উঠলেন সূর্য চৌধুরী।

ব্রজ চলে গেল। ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে পা দোলাতে লাগলেন তিনি। দিবস এল না, মানে ঠিক পরমুহূর্তেই এল না। সূর্য চৌধুবী এতে অযৌক্তিকভাবে আরাম পেলেন একটু। আবার তাঁর মনে হল দিবসকে চেনেন না তিনি। দিবস দিনের আলোর মতোই অতিশয় স্পষ্ট, তবু তার সবটা তিনি দেখতে পাননি। তার অত্যুজ্জ্বলতাই যে আড়াল করেছে তার সমগ্রতাকে, দিনের আলো যেমন আড়াল করে রাখে আকাশভরা নক্ষত্রের রূপকে, এ তথ্য স্পষ্টরূপে না জানলেও এটা তিনি আবার আবছাভাবে উপলব্ধি করলেন যে দিবসকে চেনেন না তিনি। প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতা ওলটাতে যে দিবসের ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে ওঠে, সুসজ্জিত বাক্যাবলী-অলংকৃত নানাবিধ মুখোশের অন্তরালে নানাবিধ রাজনৈতিক দলাদলির নানাবিধ নীচতা বারংবার বিমর্ষ করে তোলে যে দিবসকে, তথা-কথিত ভদ্র পেশার পোশাকী ছাঁদের অন্তরালে বার-বনিতা-বৃত্তির কদর্য রূপ দেখে শিউরে উঠে যে দিবস, স্বাধীনতার উত্তাল-তরঙ্গ-সমাকুল সংজ্ঞা-সমুদ্রে ডুবে ডুবে একটি মাত্র সত্য মুক্তা আহরণ করেছে যে ধৈর্য সহকারে, যার মন অভাবনীয়ের ভাবনায় মশগুল থাকতে চায়, ধরতে চায় অধরাকে, অজানাকে জানবার আশায় যার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হতে চায় নিউক্লিয়ার এনার্জির নব নব সম্ভাবনার মধ্যে, পাখা মেলতে চায় সুরের আকাশে, তাকে শুধু সূর্য চৌধুরী নয়, কেউ চেনে না। সে নিজেও ভালো করে চেনে না নিজেকে।

"আমাকে ডাকছেন?"

চমকে উঠলেন সূর্য চৌধুরী। দিবস কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল তা তিনি টের পাননি। দিবসের মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ তিনি ভদ্র হয়ে গেলেন। একটু অপ্রস্তুতও হলেন যেন।

"তুমি আজ কলেজ যাওনি?"—বেশ ভদ্রভাবেই প্রশ্ন করলেন। অঙ্কশাস্ত্রের সমস্যায় নিমগ্ন আহত গ্রীক বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস্ আঘাতকারী বিজয়ী রোমান সৈন্যদের দিকে যেমন

সবিস্ময়ে চেয়ে ছিলেন ঠিক ততটা বিস্ময় দিবসের চোখে না ফুটলেও সেই জাতীয় বিস্ময় ফুটে উঠল। যে কথা একাধিকবার স্পষ্ট করে সে বলেছে তা আবার জিজ্ঞাসা করবার মানে কি? দিবসের চোখের এ দৃষ্টিতে ভড়কে গেলেন সূর্য চৌধুরী এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু চটেও গেলেন আবার।

"তুমি আজ কলেজ যাওনি?" দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলেন।

"না, আমি আর কলেজ যাব না। আগেই বলেছি উকিল হওয়ার ইচ্ছে নেই।"

"কি করবে তাহলে?"

"যাহোক কিছু করব একটা।"

"কি সেটা, তাই তো জানতে চাইছি।"

"তা ঠিক করিনি এখনও।"

"রিসার্চ করার নামে কলেজে গিয়ে আড্ডা দেবে আর বাড়িতে বসে দিনরাত সরোদ বাজাবে এই যদি তোমার মতলব হয়—"

"এ বছর এখানে রিসার্চ করবার কোনও সুযোগ তো আর পাবো না। অন্য লোক নেওয়া হয়ে গেছে।"

"কি করবে তাহলে এখন? দিনরাত সরোদ বাজাবে? রোজগার করবার কোনও চেষ্টা করবে না? কোনও কাজ করবে না?"

"কাজ করব বই কি, এমন কাজ যাতে গ্লানি নেই।"

বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কাজ সম্বন্ধে, বাঙালী ছেলে মেয়েদের বেকার জীবনের কারণ সম্বন্ধে, তার যে ধারণাটা মনের তলায় থিতিয়ে ছিল এই আলোড়নে সেটা স্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করল সহসা। নিমেষের মধ্যে তার মনে হল এতদিন যা ভেবেছি তা হাতে-কলমে দেখিয়ে দেবার সুযোগ এসেছে এবার। যে বক্তৃতা সে পরে ছাত্রসভায় দিয়েছিল (এবং যা 'সেন্টিমেন্টাল' বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন সূর্য চৌধুরী) সেই বক্তৃতার প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করে তুলল তার সদ্যজাগ্রত চেতনাকে। তার মনে হল সৃষ্টির যে কোনও প্রকাশের মতোই আত্মপ্রকাশ করতে হবে তাকে, আর কিছু নয়। নিজের বিশিষ্ট প্রেরণার মহিমায় আত্মপ্রকাশ করতে হবে শুধু। নিমেষের মধ্যে তার দুঃসাহসী চিত্ত দুরূহ দুর্গম পথে যাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠল। তার যে কল্পনা উন্মুখ হয়েছিল রিসার্চের ছায়াপথে অভিযান করে নব নব সৌরলোক আবিষ্কার করবার জন্যে, সক্রিয় হয়েছিল সরোদের সুরলোকে আনন্দের সন্ধানে আত্মহারা হবার ছন্দোময় প্রয়াসে, তার সেই কল্পনাই এখন অতি রূঢ় বাস্তবক্ষেত্রেই ফোটাতে লাগল আকাশ-কুসুম। এর জন্য কারও কাছে কোনও জবাবদিহি করবার প্রয়োজনও অনুভব করল না সে। তার মনে হল আত্মপ্রকাশ করতে হবে শুধু, এর বেশি তার আর দায়িত্ব নেই। জবাবদিহির নোংরামির মধ্যে তাকেই যেতে হয়, যার প্রকাশটা মুখোশ, আত্মপ্রকাশ নয়। অঙ্কুর যখন বীজ বিদীর্ণ করে বার হয়, প্রতিদিন আকাশপটে বর্ণকাব্য লেখা হয় যখন মেঘে মেঘে, পাখির কণ্ঠে ঝংকৃত হয়ে ওঠে যখন কলকাকলি, তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করবার কোনও প্রয়োজন অনুভব করে না তারা। কে কি ভাববে এ নিয়ে চিন্তা নেই তাদের। আত্মপ্রকাশের আনন্দেই তারা মশগুল। সেই বা হবে না কেন? সুরসপ্তকের ঘাটে ঘাটে

তার আঙুলগুলো যেমন বিদ্যুৎ গতিতে খেলে যায় এই কথাগুলোও রাগিণীর গতের মতো তেমনি বেজে উঠল তার মনে নিমেষের মধ্যে। সে নিজের ঘরে এসে ভাবতে লাগল কি করা উচিত এবার।

"গ্লানি নেই মানে? ওকালতিটা তুমি গ্লানিকর বলতে চাও?" সূর্য চৌধুরী পুত্রের অনুসরণ করেছিলেন।

"গ্লানিকর তো বটেই। আইনের ফাঁদে ফেলে—" এইটুকু বলেই দিবস থেমে গেল, জানলা দিয়ে চাইল বাইরের দিকে। এ নিয়ে তর্ক করতে ইচ্ছে হল না তার। সূর্য চৌধুরী কিন্তু থামলেন না। পুত্রের ভ্রান্ত ধারণাটা অপনোদিত করাটা ঠিক সেই মুহূর্তেই কর্তব্য মনে হল তাঁর, কারণ তিনি চটেছিলেন, তাঁর আত্মসম্মান আহত হয়েছিল।

"মানুষ মাত্রকেই সমাজে বাস করতে হবে, আর সমাজরক্ষা করতে গেলেই আইন চাই। সেটাকে ফাঁদ মনে করবার মানে?"

যেন একটু শ্লেষ টংকৃত হয়ে উঠল সূর্য চৌধুরীর কণ্ঠস্বরে। দিবস কিন্তু উত্তর দিলে শান্ত কণ্ঠে।

"কারণ ওতে বোকারা ধরা পড়ে আর গরিবরা সাজা পায়। বুদ্ধিমান কিংবা ধনীদের কিছু করতে পারে না ও আইন। ও পেশা সমাজ রক্ষা করে না, শয়তান ধনীদের রক্ষা করে। ও আমি পারব না।"

কৌশলপূর্ণ যুযুৎসুর প্যাঁচ দেখিয়ে, টপাটপ দেওয়াল ডিঙিয়ে, ফস করে অপ্রত্যাশিতভাবে কপাট খুলে বা টপ্ করে সিঁড়ি নাবিয়ে মুখোশপরা একটা শয়তান গুণ্ডা তার সহকারী বন্ধুবান্ধবের সর্ববিধ সংকট থেকে ত্রাণ করছে এই ধরনের একটা রোমাঞ্চকর চলচ্চিত্র কিছুদিন আগে সূর্য চৌধুরী দেখেছিলেন। দিবসের কথা শুনে হঠাৎ সেই চিত্রটা ভেসে উঠল তাঁর মানস-পটে, এবং নিজেকে তিনি সেই মুখোশপরা গুন্ডারূপে কল্পনা করে আরও চটে উঠলেন। কণ্ঠস্বরে রীতিমত উষ্মা প্রকাশ পেল এবার।

"আমি তাহলে সারাজীবন যা করে এসেছি তা শয়তানী বলতে চাও তুমি, এত বড় আস্পর্ধা তোমার!"

দিবস চুপ করে রইল।

"কোন্ বিশুদ্ধ পেশা তুমি করবে ঠিক করেছ শুনি?"

"ঠিক করিনি কিছু এখনও।"

বলেই তার লজ্জা হল, মনে হল কেন সে ঠিক করেনি; যে কোনও মুহূর্তেই তা ঠিক হয়ে যাবে যদিও কিন্তু সেই মুহূর্তটাকে এতদিন ধরে পেছিয়ে দেওয়ার মধ্যে তার মানসিক জড়তার একটা প্রমাণ সে দেখতে পেল যেন সহসা। দমকা হাওয়ায় বাথরুমের কপাটটা হঠাৎ খুলে গেলে লোকে যেমন অপ্রস্তুত হয়ে যাহোক একটা কিছু দিয়ে নিজেকে ঢাকতে চেষ্টা করে, দিবসও তেমনি ঢাকতে চেষ্টা করল নিজেকে।

"ঠিক করিনি যদিও, কিন্তু ঠিক করতে দেরি লাগবে না।"

"তবু সেটা কি ধরনের হবে জানতে পারি কি? সরোদ বাজাবে তা বুঝতে পারছি, কিন্তু ও ছাড়া আর কোন্ বিশুদ্ধ পেশা করবে তুমি?"

স্বল্পভাষী দিবস একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে ফেললে এর উত্তরে। তার মুখ সহসা অনর্গলি হয়ে গেল যেন।

"আমি এই বাঁধা ধরা গণ্ডী থেকে বেরিয়ে যেতে চাই। ভদ্রলোকের ছেলে হলেই যে উকিল ডাক্তার মাস্টার ইঞ্জিনিয়ার কিংবা কেরানি হতেই হবে এবং তার জন্যে মিথ্যে মুখোশ পরে পরে বেড়াতে হবে এ কারাগার থেকে আমি মুক্তি চাই। এই কাবাগারের বাইরে যে জগত আছে সেইটের সন্ধানে বেরুতে চাই আমি।"

"মানে?"—সূর্য চৌধুরীর ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হয়ে গেল, কারণ সত্যই তিনি বুঝতে পারছিলেন না কিছু।

"মানে সরল পরিশ্রম করে রোজগার করতে চাই।"

"সরল পরিশ্রম? তার মানে মুটেগিরি করবে?"

"আপত্তি নেই, কিন্তু ঠিক কি করব তা জানি না এখনও।"

সূর্য চৌধুরীর বিস্ময় সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। রজ্জুকে যে তাঁর সর্পভ্রম হল তা নয়, ফস্ করে সেটা যেন পাখি হয়ে উড়ে গেল। মুটেগিরি করতে করতে সরোদ বাজাবে? দিবসের চোখের দৃষ্টিতে কিন্তু যে দীপ্তি তিনি দেখলেন তা উন্মাদের চোখে দেখা যায় না, তা অস্বস্তিকর, কিন্তু অর্থহীন নয়। তার "ঠিক-কি-করব-তা-জানি-না-এখনও'র আসল অর্থ যে ঠিক কি করব তা জানি ভালো করে তা সূর্য চৌধুরী যেন পরিষ্কার দেখতে পেলেন এই প্রদীপ্ত দৃষ্টির আলোকে। ঘাবড়ে গেলেন। হতবাক হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। খাঁচার পাখি দরজা খোলা পেয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে যেন। পরমুহূর্তেই নিরুপায় ক্ষোভ অহংকারের ছোঁয়াচ লেগে রূপান্তরিত হল ক্রোধে এবং সেই মুহূর্তে উকীল সূর্য চৌধুরী ধরবার ছোঁবার মতো যে জিনিসটা দেখতে পেলেন সেইটেকেই আঁকড়ে ধরতে গেলেন, যদিও ধরতে গিয়ে যা করে বসলেন তা করবার কল্পনাও ছিল না তাঁর।

"কবে সেটা জানবে? ক্রমাগত সরোদের গৎ বাজিয়ে গেলেই কি ঠিক হবে সেটা?"

দিবসের জড়তার পাথরটা সহসা ফেটে গেল। নির্ঝর ছুটে বেরুল গিরি বিদারণ করে। নিঃশঙ্ক আবেগে যাত্রা শুরু হল তার অনির্দিষ্ট পথে অমিত শক্তির সম্ভাবনা নিয়ে। মৌন ভাবাকুলতা ভাষা পেল যেন হঠাৎ।

"আমি চললুম।"

"কোথায়?"

"নিজের পথ নিজেই ঠিক করব এখন থেকে।"

বাইরের দুয়ারটা খুলে দিবস বেরিয়ে যেতে উদ্যত হল। এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় সূর্য চৌধুরীও অদ্ভুত অচিন্ত্যপূর্ব কাণ্ড করে বসলেন একটা।

"এটাও নিয়ে যাও না, এ নিয়ে আমি আর কি করব"—পাসের টেবিলে সরোদটা ছিল সেটা তুলে ছুঁড়ে দিলেন তিনি দিবসের দিকে।

ঝনঝন করে মেজেতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল সেটা।

দিবস ফিরে দেখলে এবং সেই মুহূর্তেই ঠিক করে ফেললে যে সরোদ কিনতে হবে আর একটা। সেই মুহূর্তে সরোদটা ভেঙে না গেলে হয়তো সরোদটা এত প্রবল হয়ে উঠত না অব্যবহিত ঘটনা পরম্পরায়। রঙ্গনাও আসত না হয়তো।

দিবস চলে গেল। পর মুহূর্তেই দ্রুতপদে প্রবেশ করল ব্রজ। সরোদ ভাঙার শব্দটা শুনতে পেয়েছিল সে।

"কি হল, দিবু কোথা?"

"চলে গেল।"

"কোথা?"

"জানি না।"

"সরোদটাকে অমন করে আছড়ে ভাঙবার কি দরকার ছিল? কি যে কর কাণ্ড!"

হঠাৎ সূর্য চৌধুরীর মনে হল দিবস যদি স্বেচ্ছায় ফিরে না আসে তাহলে তার নাগাল হয়তো আর পাবেন না তিনি। কোলকাতার বিরাট জন সমুদ্রের ছবিটা ভেসে উঠল মানস পটে।

"তেল দাও আমাকে, কোর্টের বেলা হয়ে যাচ্ছে"—অতি ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি ঘর থেকে।

নির্বাক ব্রজ ভাঙা সরোদটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

দিবস যখন পথে বেরিয়ে পড়ল ঠিক সেই সময়ে আরও কয়েকটা ঘটনাও ঘটল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। পরস্পর বিচ্ছিন্ন মনে হলেও এগুলো যে পরস্পর যুক্ত তা পরে বোঝা যাবে অদৃশ্য যোগসূত্রটা দৃশ্য হয়ে উঠবে যখন। যে কৌশলী রূপকার অদৃশ্য লোকে বসে সৃষ্টি করেন নিত্য নূতন নট ও নাটক তাঁরই প্ররোচনাতেই হয়তো সেই সময় বাদ্যযন্ত্রের দোকানদার নিতাই নন্দী তাঁর দোকানে সিগারেটমুখী বিদেশিনী তরুণীর আলেখ্য-অলংকৃত ক্যালেন্ডারটি টাঙাচ্ছিলেন সানন্দে, স্বপ্নেও তিনি ভাবছিলেন না যে এই ক্যালেন্ডারকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা ঘটবে তার ধাক্কা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে। মহেন্দ্র কুণ্ডুও ঠিক সেই সময়ে মুখ ছুঁচলো করে সৌদামিনীর কাছে শুনছিলেন যে তাঁর বাড়ির কোনও ভাড়াটে পাওয়া যায়নি এবং ভাবছিলেন তাঁর বন্ধু রাখহরি যে ভাড়াটের খোঁজটা দিয়েছিল সে আর এসেছে কি না কে জানে। রাখহরির চায়ের দোকানে একবাব খোঁজটা নেবেন ঠিক করলেন তিনি তখনই অন্নদা বিশ্বাসও (ঝোলা গোঁফ, সদা-শুষ্ক মুখ) ঠিক এই সময়ে যে খবরটি পেলেন তাতে তাঁর মাথায় বজ্র ভেঙে পড়ল যেন এবং তিনি ছুটলেন চুনীলালকে সে খবরটি দিতে। যে বৈদ্যুতিক কারবারের বেড়াজালে ম্যানেজিং ডিরেক্টার চুনীলাল বিদ্যুদ্বেগে হরলাল প্রভৃতিকে ডুবিয়েছিলেন সেই বেড়াজালেই ধরা পড়েছিলেন ক্ষুদ্রপ্রাণ অন্নদা বিশ্বাসও। অন্নদা বিশ্বাস স্ত্রীকে লুকিয়ে পোস্টাফিস থেকে যথাসর্বস্ব বার করে 'ইলেক্‌ট্রিক গুডস'-এর ব্যবসায়ে বেশি লাভবান হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ব্যবসা যখন ডুবে গেল তখন তিনি স্বপ্ন-বিবর্জিত সাদা চোখে স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে হরলাল সিংহির মতো মকোর্দমা করবার সামর্থ্য তাঁর নেই। তার চেয়ে বরং যে বৈদ্যুতিক দ্রব্য-সম্ভার দোকানে এখনও মজুত আছে সেগুলিকে যদি দাঁও-মাফিক বিক্রি করে ফেলা যায় তাহলে তাঁর টাকাটা অন্তত উঠে আসবে। সেই চেষ্টাই তিনি করছিলেন এবং বিকাশবাবুর

সন্ধানও পেয়েছিলেন। ধনী বিকাশবাবু একটা নূতন বাড়ি করাবেন, সেখানে অনেক ইলেকট্রিক গুড্‌স্ নাকি দরকার, তাছাড়া ইলেকট্রিক গুড্‌স্-এর একটা দোকান করবারও ইচ্ছা আছে না কি তাঁর। উল্লসিত অন্নদা বিশ্বাস তাঁর কাছে গিয়ে কথাবার্তাও ঠিক করে ফেলেছিলেন প্রায়, কিন্তু এখন তাঁর বন্ধু সমরেশের কাছে যে খবরটি পেয়ে তাঁর মাথায় প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক আঘাত লাগল (চলতি বাংলায় যাকে বজ্রাঘাত বলে) তার ফলে ছুটলেন তিনি আবার চুনীলালের কাছে। প্রেম নামক স্বর্গীয় বস্তুটি যে এমনভাবে তাঁর সর্বনাশের কারণ হয়ে উঠতে পারে ছা-পোষা অন্নদা বিশ্বাস তা কল্পনাও করেননি। এবং ঠিক এই সময়েই গহনচাঁদও রঙ্গনাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে যদি সে আধুনিক গান শুনিয়ে তাঁকে খুশি করতে পারে তাহলে তাকে একটা সেতার উপহার দেবেন। ফ্রেন্ডস্ মেসের বাসিন্দাচতুষ্টয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রসিক এবং স্বল্পভাষী যিনি সেই হরিদাস বাবুরও 'এন্‌ডাউমেন্ড পলিসি'টি মেচিওর হল সেদিন। তিনি টাকাটা বার করে পোস্টাফিসে রেখে দেবেন ঠিক করলেন। হরিদাসবাবু ব্যাচিলার মানুষ, গভর্নমেন্ট আপিসে চাকরি করেন, চাকরি-শেষে পেন্সন পাবেন। তাঁর লাইফ ইন্‌সিওরেন্স করবার সার্থকতা কোথায় এ প্রশ্ন যাঁরা করবেন তাঁরা লাইফ ইন্‌সিওরেন্স এজেন্টদের চেনেন না। বিশেষত এই বিশেষ এজেন্টটি হরিদাসবাবুর বন্ধু হওয়াতে হরিদাসবাবুকে টোপ গিলতে হয়েছিল। হরিদাসবাবু ঠিক করেছিলেন টাকাটা কোন সৎকার্যে দান করে যাবেন। কিন্তু ঠিক কোন্ কার্যকে সৎকার্য বলে তা ঠিক করতে না পেরে টাকাটা আপাতত পোস্টাফিসে রেখে দেবেন ভাবলেন বন্ধু অঘোরের পরামর্শ তুচ্ছ করে। অঘোরের ইচ্ছে টাকাটা কোনো ব্যবসাতে খাটুক।

এই ঘটনাপুঞ্জ অদূর ভবিষ্যতে যে পরিবেশ সৃষ্টি করবে তারই অভিমুখে দিবস হেঁটে চলেছিল কিছু না জেনেই। পথের দিকে ভালো করে না চেয়েই চলেছিল সে। নিজের মনের খবরটাই সে নিচ্ছিল আগে, বিবেকের কষ্টিপাথরে নিজের মতবাদকে বারবার যাচিয়ে আত্মসম্মানের প্রকৃত রূপটা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছিল সে। নিত্য-নূতন-এক্‌স্‌পেরিমেন্ট করতে উৎসুক তার যে বিজ্ঞানী মন পরিচিত আবেষ্টনী ত্যাগ করে অজানা পরিবেশে জীবন নিয়েই এক্‌স্‌পেরিমেন্ট করতে উদ্যত হয়েছিল সেই মনটারই স্বরূপ দেখবার চেষ্টা করছিল সে নানাভাবে এবং তা করতে গিয়ে তার সমস্ত মন এমন একটা আনন্দ পরিপূর্ণ হয়ে উঠছিল যে অনিশ্চয়তার আশঙ্কাটাও ভীত করছিল না আর তাকে। যে মুহূর্তে সে আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়ভূমিতে এসে দাঁড়াল সেই মুহূর্তেই নিঃশঙ্ক হল সে। তারপর পথের দিকে চাইবার অবসর পেল।

...বিরাট শহরের কর্মব্যস্ত জনতাকে আজ সে নূতন দৃষ্টিতে দেখল যেন সহসা, দেখে মুগ্ধ হল। প্রথমেই যে দৃশ্যটা তার চোখে পড়ল সে দৃশ্য ইতিপূর্বেই সে অনেকবার দেখেছে কিন্তু তা দেখে দেবদর্শনের আনন্দ সে এই প্রথম পেল। বোঝার ভারে একটা ঝাঁকা-মুটের ঘাড় বেঁকে গেছে, দর দর করে ঘাম পড়ছে বলিষ্ঠ পিঠ বেয়ে, তবু সে থামেনি, চলেছে ভিড় ঠেলে। তার পিছু পিছু চলেছে একটা রিক্‌শওলা। তারপরই প্রকাণ্ড একটা মোষের গাড়ি থেমে গেল হঠাৎ মোড়ের পুলিশের ইঙ্গিতে। দুহাতে রাশ টেনে দাঁড়িয়ে উঠেছে গাড়োয়ানটা। তার পেশী সমৃদ্ধ বলিষ্ঠ দেহটার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল দিবস। লোভীর মতো চেয়ে রইল, হিংসা হল তার। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে একটা ফেরিওলা চানাচুর ফেরি করছে। কাচের প্রকাণ্ড একটা

গাড়ি ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে আর একজন, কাচের গাড়িতে নানা রকম মনোহারি জিনিস। সবাই অবাঙালী,—হঠাৎ মনে হল দিবসের। ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল একটা, ড্রাইভার পাঞ্জাবী। ঢং ঢং করে ট্রাম আসছে, ড্রাইভারটার দিকে চেয়ে দেখলে দিবস, উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে,—না কিরণ নয়, ট্রামে ঝুলছে অসংখ্য বাঙালী, আপিস-মুখো কেরানির দল, যারা ওই ঝাঁকা, মুটে, রিক্‌শওলা, গাড়োয়ান, ট্যাক্সি ড্রাইভার, দোকানদারদের ছোটলোক বলে অবজ্ঞা করে...।

....হাঁটতে হাঁটতে সে কলেজ স্কোয়ার ওয়েলিংটন স্কোয়ার পার হয়ে ধর্মতলার মোড়ে এসে দাঁড়াল। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, আস্তানা ঠিক করতে হবে একটা সর্বাগ্রে, টাকা দরকার কিছু, তখনই মনে পড়ল তার স্বোপার্জিত কিছু টাকা ব্যাঙ্কে আছে, তার স্কলারশিপের টাকা, কিন্তু তখনই আবার মনে পড়ল—এই দ্বিতীয় কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবার, সূর্য চৌধুরীর, মুখটা মনে পড়ল। ব্রজকে মনে পড়ল। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে অনেকক্ষণ। একটা ফায়ার ব্রিগেড বেরিয়ে গেল চতুর্দিক সচকিত করে, পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে আবার সচেতন হল সে। চতুর্দিকে মানুষের ভিড়, নানারকম মানুষ। রিক্‌শায়-ট্যাকসিতে, বাসে-ট্রামে, নানা ধান্দায় চলেছে। অনেকদিন আগে এক ডাক্তার বন্ধুর ল্যাবরেটরিতে মাইক্রোস্কোপে এক ফোঁটা ব্যাকটিরিয়ার ইমালশান্ দেখেছিল সে। সেই ছবিটা মনে পড়ল হঠাৎ। কোনও এক বিরাট মাইক্রোস্কোপের তলায় রেখে আমাদেরও দেখছে না কি কোনও অদৃশ্য চক্ষু? মোড়ের একধারে একটা ভিখারী বসেছিল। তার পাশে যে শিশুটা বসেছিল সেটা কেঁদে উঠল হঠাৎ। সমস্ত কলরব ছাপিয়ে তার কান্নাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। বিরাট জনতার দুর্নিবার স্রোত ক্ষণিকের জন্য মন্থর হয়ে গেল যেন। পয়সা দেবার জন্য পকেটে হাতে ঢুকিয়ে দিবস অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, মনিব্যাগ ফেলে এসেছে। কাছেই একজন ভদ্রলোক বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন; তিনি পকেট থেকে মনিব্যাগ বার করে হাত ঢোকালেন তাতে, বার করলেন আবার, ব্যাগটা ফাঁক করে ঝুঁকে দেখলেন একটু, আবার হাত ঢোকালেন ভ্রূকুঞ্চিত করে, তারপর একটা পয়সা বার করে দিলেন ভিখারীটাকে। সঙ্গে সঙ্গেই 'বাস' এসে গেল তাঁর। বাসে স্থান নেই, লোক ঝুলছে। তবু নিজের হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে প্রায় ছুটে এগিয়ে গেলেন তিনি এবং বহু যাত্রীর আপত্তি সত্ত্বেও উঠে পড়লেন 'বাস'টায়, গুঁজে দিলেন যেন নিজেকে ওই ভিড়ের মধ্যে। দিবসের মনে হল আপিসের কেরানি বোধ হয়, 'লেট' হয়ে গেছে। 'বাস' চলে গেল। আবার একটা 'বাস' এল, ঠিক তেমনি ভিড়। নানারকম মুখ চোখে পড়ল আবার। কারও মুখে বিড়ি, কারও সিগারেট, কারও পান, কারও হাসি, কারও বিরক্তি। কেউ ভিড় থেকে আত্মরক্ষা করছে কেবল। সেই ভাব ফুটে উঠেছে তার চোখে মুখে। যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ কত রকম লোক। নিজের অতীত জীবন থেকে চ্যুত হয়ে দিবস সহসা যেন আগন্তুক হয়ে পড়েছে। আগন্তুকের দৃষ্টি নিয়ে দেখছে যেন অপরিচিত জনতাকে। সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখছে। সবাই কেরানি? অস্বীকার করতে পারলে সে বেঁচে যেত। কিন্তু অস্বীকার করতে পারল না। হাঁ, অধিকাংশই কেরানি, অধিকাংশই দরিদ্র, অধিকাংশই অসুখী। বন্দীর দল। এক জেল থেকে চলেছে আর এক জেলে। সত্যিকার পরিশ্রম করতে হয় অপারগ, না হয় অনিচ্ছুক। শৌখিনতা বজায় রেখে যতটা হয় তার বেশি কিছুতে কিছু করবে না কেউ। পাখার তলায় চেয়ারে বসে অধস্তন কর্মচারিদের উপর চোখ রাঙিয়ে উর্ধ্বতন কর্মচারিদের খোশামোদ করে দশটা পাঁচটা কলম পিষে যা হয়

তাতেই খুশি সবাই। ওই কলম পিষে কেউ পাচ্ছে পঞ্চাশ, কেউ পাঁচশ, কেউ আরও বেশি। আরও বেশির দলে মুষ্টিমেয় লোক। কিন্তু ওই আলেয়াই মুগ্ধ করে রেখেছে অধিকাংশকে। সবাই কেরানি হবার উপযুক্ত নয়, কিন্তু সবাই ছুটেছে, যারা উপযুক্ত তারাই হয়তো হারিয়ে যাচ্ছে ভিড়ে। ঘুষ-খোশামোদ-তদ্বির-সুপারিশের খানা-খন্দ-জলা-নালায় নাকানি-চোবানি খেতে খেতে হিংসা-কলহে জর্জরিত হয়ে দুর্লভ লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে সবাই ছুটে চলেছে। ওরা স্বাধীন শ্রমসাধ্য কাজে লিপ্ত থাকত যদি তাহলে শুধু যে বেশি রোজগার করতে পারত তা নয় দেশের চেহারাও বদলে দিতে পারত। কিন্তু তা করবে না কেউ। অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ অনুভব করল—খিদে পেয়েছে, খুব খিদে পেয়েছে এবং পরমুহূর্তেই মনে পড়ল যে সঙ্গে একটি পয়সা নেই। এই সমস্তর অন্তরালে কিন্তু আর একটি প্রশ্ন সর্বদা জাগছিল তার মনে—কি করবে, কি করবে এখন, এখনই কিছু আরম্ভ করা দরকার, কিন্তু কি সেটা,—।

"আরে দিবু যে, এখানে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে?"

অপ্রত্যাশিতভাবে অকূলে কূল পেল এ জাতীয় মনোভাব হল না দিবসের। অত্যন্ত প্রত্যাশিত যেটা সে খুঁজছিল এতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে সেইটেই পেয়ে গেল যেন। একটা ট্রাম থেকে কিরণ কথা বলল, ট্রাম চালাচ্ছিল সে। কিরণের সঙ্গে দিবসের বন্ধুত্ব ছিল এবং বন্ধুত্ব ছিল বলেই খুঁটিনাটি অসংখ্য বিষয়ে মতের অমিল ছিল। অর্থাৎ বন্ধুত্ব ছিল বলেই অমিলগুলো প্রকট হবার সুযোগ পেয়েছিল। যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকে না তাদের সঙ্গে আমরা মৌখিক ভদ্রতা কবি, তাদের কথায় সায় দিয়ে স্বল্প পরিচয়ের আবরণের আত্মরক্ষা করি, কারণ সকলের সঙ্গে মতের অমিল নিয়ে তর্ক করবার সময় বা সামর্থ্য সকলের নেই। কিরণের সঙ্গে দিবসের বন্ধুত্ব ছিল বলেই ভয়ও ছিল কিরণ তার এ আচরণ সমর্থন করবে না হয়তো। তা ছাড়া আর একটা ব্যাপারও ছিল। বৈজ্ঞানিক দিবসের কথায় বার্তায় আচরণে যেমন মনে হত সে কবি তেমনি ভাবভঙ্গী দেখে মনে হত সে যেন বৈজ্ঞানিক, প্রত্যেক জিনিসের চুল-চেরা বিচার করে মূল্য-নিধারণ করাই যেন তার স্বভাব। আসলে উভয়েই ছিল যুগপৎ কবি এবং বৈজ্ঞানিক, (কবি আর বৈজ্ঞানিক যে একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ তা কে না জানে)। কিন্তু দিবসের বাইরেটা ছিল কবি, কিরণের ঠিক ছিল তার উলটো। তাই দিবসের ভয় করছিল সে কিরণ হয়তো......।

...দিবস তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল ট্রামটাতে।

"আমাকে কিছু পয়সা দে তো। পয়সা আছে সঙ্গে তোর?"

কিরণ ব্যাগটা বার করলে।

"ব্যাগটাই আমাকে দে।"

"কি হয়েছে বল্ তো?"

কিরণ কিন্তু কথা শেষ করতে পারলে না। কন্ডাক্‌টার ঘণ্টা দিলে, দিবস লাফিয়ে পড়ল ট্রাম থেকে, ফুটপাথে এসে চেঁচিয়ে বলল, "পরে বলব সব, ডিউটির পর তোর বাড়ি যাব।"

মিনিট খানেকের মধ্যে এত কাণ্ড ঘটে গেল। ট্রাম চলে গেল। এবং তারপর দিবস যন্ত্র চালিতবৎ ঢুকল গিয়ে সামনের চায়ের দোকানটায়।

"দেখ একটা কিছু নিয়ে নাটক করে তুলতে না পারলে বাঙালী তৃপ্তি পায় না। আমার মনে হচ্ছে তোমাকেও সেই নাটকের নেশায় পেয়েছে। বাবার সঙ্গে এমনভাবে ঝগড়া করে চলে আসার আর কোনও অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না আমি।"

"ঝগড়া করে চলে এসেছি অবশ্য, কিন্তু ঝগড়াটাই বড় নয়, আদর্শটাই বড়। আদর্শবাদীকে অনেক নিগ্রহ সহ্য করতে হয়। আমার আচরণকে নাটকীয় বলে তুমি যদি ঠাট্টাই কর তা-ও সহ্য করতে হবে আমাকে।"

"তোমার আদর্শটা কি, তাইতো ভালো বুঝতে পারছি না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থোপার্জন করাই যদি তোমার অভিপ্রেত হয় তাহলে ওকালতি কি দোষ করলে? তোমার বাবাকে কি কম মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে? তুমিও ইচ্ছে করলে ফেলতে পার।"

"আমার মতে সরল পরিশ্রম করে সকলেরই রোজগার করা উচিত। যে ব্রাহ্মণত্ব সমাজের প্রাণ তাকে পেশায় পরিণত করলে তা প্যাঁচ হয়ে দাঁড়ায়। বিদ্যে বুদ্ধির প্যাঁচে ফেলে কাউকে পীড়ন করবার ইচ্ছে নেই আমার।"

"কিন্তু সরল পরিশ্রম বলতে যা বোঝায় তা কি পারবে তুমি? অ্যাটমিক কেমেস্ট্রির অনন্ত সম্ভাবনার আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে তোমার মন—"

"কি চাই বাবু আপনার?"

চায়ের দোকানদার রাখহরির কথায় আত্মস্থ হল দিবস। এতক্ষণ সে কল্পনায় কিরণের সঙ্গে তর্ক করছিল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে দোকানের মালিক রাখহরি মল্লিক ঘরের একধারে নিজের ক্যাস বাক্সটি আগলে বসে আছেন। তাঁর চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি। লম্বা টেবিলটার একপ্রান্তে নিবিষ্ট চিত্তে আহার করছেন আর একটি ভদ্রলোক! আরও জন দুই চা খাচ্ছে।

"আমাকে এক কাপ চা আর দুটো টোস্ট দিন।"

রাখহরি পরদাবৃত দরজাটার দিকে চেয়ে হাঁকলেন—"একটা চা, দুটো টোস্ট"—তারপর দিবসের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, "আমলেট?"

"বেশ আমলেটও দিতে বলুন।"

"সিংগিল না ডবল?"

"ডবল।"

রাখহরি আবার সেই পরদাবৃত দ্বারটার উদ্দেশ্যে ফরমাস প্রেরণ করলেন—"ডবল ডিমের আমলেট একটা—"

দিবসের মন অ্যাটমিক কেমিস্ট্রির অনন্ত সম্ভাবনার আকাশেই উড়ে বেড়াচ্ছিল। তখনই সে ঠিক করে ফেললে সেই সায়েব প্রফেসারটিকে চিঠি লিখবে। অন্য কিছু নয়, তার সমস্ত স্বপ্ন যে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে এই কথাটি তাঁকে জানিয়ে দেবে শুধু। ওই বিদেশি অধ্যাপককে হঠাৎ তার অত্যন্ত আপন জন বলে মনে হল। মনে হল ওই ব্যক্তিটাই আসল দিবস চৌধুরীকে চিনেছিল। হঠাৎ উঠে পড়ল সে। রাখহরির দিকে চেয়ে বললে—"আমি আসছি এখনই"—এবং বেরিয়েই সামনের একটা দোকান থেকে কিছু খাম আর চিঠি লেখার একটা প্যাড কিনে নিয়ে ঢুকল।

—চা টোস্ট আমলেট শেষ করে দোকানদারকে দাম চুকিয়ে দিয়ে বললে—"আপনার এখানে বসে একটা চিঠি লিখতে পারি কি?'

"নিশ্চয়"—একমুখ হেসে সম্মতি দিলেন রাখহরি।

দিবসের পকেটে ফাউন্টেন পেন ছিল। চিঠি লিখতে লাগল সে। মনের আবেগে লিখে যেতে লাগল পাতার পর পাতা। রিসার্চের সে সব কথা নীহারিকার মতো মনের গহনলোকে ভেসে বেড়াচ্ছিল শত সৌরলোকের সম্ভাবনা নিয়ে, যে সব স্বপ্ন কখনও সফল হবে না আর তারই কাহিনী লিখতে লাগল সে তন্ময় হয়ে।.... চিঠিটা শেষ করে যখন খামে পুরছে তখন মহেন্দ্র কুণ্ডু এসে ঢুকলেন এবং এসেই রাখহরিকে প্রশ্ন করলেন, "কি হে লোকটা টাকা দিয়ে গেছে?"

কুণ্ডু মশায়ের এই নিতান্ত গদ্যময় প্রশ্নেও হাসি ফুটল রাখহরির মুখে। দোকানদারি করে হাসিটা পোষা হয়ে গেছে তাঁর।

"কই না সে আসেনি তো।"

মহেন্দ্র কুণ্ডু একটা চেয়ার টেনে বসলেন, এবং মুখটাকে ছুঁচলো করলেন। ছুঁচলো করেই বসে রইলেন অনেকক্ষণ। মস্তিষ্কে চিন্তার তরঙ্গ প্রবাহিত হলেই মুখটা ছুঁচলো হয়ে যায় তাঁর।

"বাড়িতে তালা মেরেই চলে যাই তাহলে, কি বল? আজ আমাকে দেওঘর যেতেই হবে, কাল জয়েনিং ডেট।"

রাখহরি, আর একটু হেসে সমর্থন করলেন প্রস্তাবটি।

"তাই যাও, চাবিটা আমার কাছে রেখে যাও। যদি পারি ভাড়াটে জোগাড় করব। খোলার হলেও ভাড়াটে জুটে যেত, কিন্তু তোমার ঘরখানা একেবারে বেমেরামত যে। তার উপর চারদিকে ড্রেন। পাড়াটাও সুবিধার নয় তো—"

"না হে, সেদিন আর নেই। সদি আছে অবশ্য, কিন্তু সদিরও আর সেদিন নেই।"

আর একটি অসুবিধার কথা উল্লেখ করে রাখহরি প্রথমোক্ত অসুবিধাগুলির উপর আর এক পোঁচ রং চড়াবার প্রয়াস পেলেন, অবশ্য আর একটু হেসে।

"তোমার আর একটা ফ্যাচাং আছে যে—হাঁসটা। ওটাকে বেচে দাও, বুঝলে? আমাকেই দাও, নগদ পাঁচ টাকা দিয়ে দিচ্ছি।"

"কি করবে তুমি?"

"রোস্ট্।"

"না ভাই তা পারব না। ও হাঁসটি আমার স্ত্রীর স্মৃতি। দেওঘরে এখন কোয়ার্টার পাব না, তাই ওটাকে নিয়ে যেতে পারছি না। কোয়ার্টার পেলেই নিয়ে যাব।"

দিবস ভ্রূকুঞ্চিত করে শুনছিল এদের কথাবার্তা। সে হঠাৎ কথা রুয়ে উঠল।

"আমার একটা ঘরের দরকার ছিল।"

তড়িদ্বেগে ফিরে বসলেন মহেন্দ্র কুণ্ডু।

"বেশ তো নিন না আমার ঘরখানা।"

রাখহরি মল্লিক ঘরটাকে কেন্দ্র করে গোপন মতলব ফেঁদেছিলেন একটা। তাতে বাধা পড়ায় মনে মনে তিনি বিব্রত হলেন একটু এবং একটু হেসে দিবসের দিকে চেয়ে বললেন, "খোলার ঘর কিন্তু।"

"তাতে আপত্তি নেই। ঘরটা কোথায়?"

"চিৎপুরে, একটি গলিতে।"

"ভাড়া কত?"

"ভাড়া মাসিক পনর টাকা"—মহেন্দ্র কুণ্ডু মুখ ছুঁচলো করলেন একবার—তারপর বললেন, "তবে যদি আপনি আমার হাঁসটাকে রাখেন কিছু কম হবে। তিনমাসের ভাড়া অগ্রিম চাই কিন্তু—"

"বেশ"—দিবস একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল এবং পরমুহূর্তেই যে প্রশ্নটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল তাতে মহেন্দ্র কুণ্ডুর মুখ ছুঁচলো হয়ে গেল আবার।

"কাছাকাছি শালের ভালো দোকান আছে কোনও আপনার জানাশোনা?"

"শালের দোকান? শালের দোকানের অভাব কি?"

"চলুন তাহলে বেরোন যাক। আমাকে ব্যাংক্‌টা হয়ে যেতে হবে একবার।"

"বেশ চলুন।"

বেরিয়েই সে আগে পোস্টাফিসে গিয়ে পোস্ট করে দিলে চিঠিখানা লন্ডনের উদ্দেশ্যে। প্রফেসারের ঠিকানা তার জানা ছিল। বেশি টিকিট দিয়ে দিলে, যাতে 'এয়ার মেলে' যায়। চিঠিটা পোস্ট করে অদ্ভুত আরাম পেলে সে একটা যেন, ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করে আশুফললাভের কোনো সম্ভাবনা না থাকলেও কেবল অর্ঘ্য নিবেদন করে যে তৃপ্তি পায় লোকে সেই ধরনের তৃপ্তি সে পেলে যেন।

ঠিক এই ধরনের তৃপ্তি কিরণও পেলে যখন এস্‌প্ল্যানেড ট্রাম ডিপোতে তার মনের ভাবটা প্রথম ভাষা পেল তার কবিতার প্রথম চরণ দুটোতে। গুনগুন করে এল যেন কথাগুলো এক ঝাঁক ভ্রমরের মতো কোনও অজানা আকাশ থেকে, রেখে গেল ছন্দ-মিলের পশরা।

অন্ধকারে পথ হারাল যারা
তারাই কি গো আকাশ ভরা-তারা!

এস্‌প্ল্যানেডে ট্রামে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিচিত্র জনতার কলরবের মধ্যে কিরণ প্রতীক্ষা করতে লাগল মনে মনে, আবার কখন আর একদল ভ্রমর আসবে। কবিতাটা লিখে ঊর্মিকেই দিতে হবে। গহনচাঁদ বাবুর মেয়ে রঙ্গনা তার গানে সুর দিয়ে দেবে, সেই গান রেকর্ড হবে—ঊর্মির আশা কত! গহনচাঁদবাবু এখানে এসে 'সঙ্গীত ভবন' খুলেছেন এটা সুসংবাদ নিশ্চয়ই। তার বাঁশি শেখার ইচ্ছে খুবই, কিন্তু মাসিক দশ টাকা খরচ করে, (এই বেতনই চুনীবাবু ধার্য করেছেন না কি) বাঁশি শেখবার সামর্থ্য তার নেই। তবে যদি টিউশনি জোগাড় করতে পারে একটা—এই প্রসঙ্গে ঊর্মির সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছিল তা মনে পড়ল কিরণের। ঊর্মি দুষ্টুমিভরা হাসি হেসে বলেছিল, "আমি যদি টিউশনি জোগাড় করে দিতে পারি আমাকে কি দেবেন বলুন?"

"সিনেমা দেখাব একদিন।"

"একদিন মোটে?"

"বেশ দু'দিন।"

"ফার্স্টক্লাসে যাব কিন্তু!"

"বেশ!"

"সেতার শেখাতে পারবেন একটি মেয়েকে?

“অনায়াসে।”

“মাসে পনর টাকার বেশি দেবে না কিন্তু।”

“বেশ!”

“কাল খবর পাবেন তাহলে।”

ঊর্মি শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোয় দেখা করতে এসেছিল তার সঙ্গে। ভিড়ে দাঁড়িয়েছিল তার অপেক্ষায়। ঊর্মির চেহারাটা মনে পড়ল। দেখতে সুশ্রী নয়, রোগা, কালো চেহারা। কপালের দু'পাশে অতি সূক্ষ্ম কোঁকড়ানো কয়েক গোছা অলক কিন্তু অপরূপ শ্রী ফুটিয়ে তুলেছে তার মুখে। তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, তার অন্তর্নিহিত রূপও যেন ফুটে উঠেছে ওই অবিরাম নর্তনশীল অলকগুচ্ছে। তার চোখ দুটো ছোট, কিন্তু সেই চোখের কালো তারায় যখন আলো চিকমিক করে ওঠে হাসির আভায় রঙীন হয়ে, অলকগুচ্ছের নর্তনের সঙ্গে তাল রেখে তখন চোখের দৈর্ঘ্য প্রস্থের কথা মনে থাকে না। বাপ-মা-মরা মেয়ে, অযত্নে লালিত হচ্ছিল না কি মাসির বাড়িতে, হঠাৎ তার মনে সুরের নেশা জাগল কি করে সে খবর কিরণ জানে না। এইটুকু শুধু জানে ও বে-পরোয়া। যে সমাজ তার জন্যে এতটুকু মাথা ঘামায়নি সে সমাজের কিছু তোয়াক্কা করে না ও। সব রকম সমালোচনাকে তুচ্ছ করে যা খুশি করবার সাহস আছে ওর। নিজেই এসেছিল একদিন তার কাছে ধূমকেতুর মতো। এসে বলেছিল—“আপনি শুনেছি ভালো সেতার বাজাতে পারেন। আমাকে শেখাবেন একটু? আমি কিন্তু কিছু দিতে পারব না।” সেই থেকেই ওর সঙ্গে পরিচয়। সুরের মাধ্যমে যে পরিচয়টা নিবিড়তর হয়েছে ভৈরবীতে আশাবরীতে সারংয়ে ইমন কল্যাণে বেহাগে বাগেশ্রীতে সে পরিচয়টা কিন্তু সামাজিক পরিচয় নয়। সামাজিক পরিচয় ঊর্মি দিতে চায় না। অনেক পীড়াপীড়ি করবার পর বলেছিল কেবল ওইটুকু। বাপ-মা-মরা, মাসির বাড়িতে ছেলেবেলাটা কেটেছে মাসতুত ভাই-বোনেদের সেবা করে আর বাসন মেজে। এর বেশি আর কিছু বলেনি, কিরণও আর আগ্রহ প্রকাশ করেনি।

....সামনে যে ট্রাম গাড়িটা লাইনচ্যুত হওয়াতে তার গাড়িটা আটকে পড়েছিল সেটাকে ঘিরে বেশ ভিড় হয়েছে একটা। তার পিছনে বয়ে চলেছে জনস্রোত। জীবনযুদ্ধ? সকলেরই কি যোদ্ধৃবেশ? হঠাৎ তার মনে হল পথ হারিয়ে ফেলেছে এরা। পথ হারিয়ে অন্ধকার অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অন্ধ জোনাকির দল যেন। প্রত্যেকেরই দীপ্তি আছে, কিন্তু কেউ দেখতে পাচ্ছে না কাউকে। পরস্পর ধাক্কাধাক্কি করছে কেবল, এদের ব্যর্থতার ইতিহাস কি ছন্দে গাঁথবে না কোনো কবি? ঝংকৃত হয়ে উঠবে না কি তা অন্ধকারে শিহরন তুলে? হয়তো অন্ধকারেই তাদের ইতিহাস লেখা হচ্ছে অলক্ষ্যে।—আবার এল সেই বাণী ভ্রমরের দল অজানা আকাশ থেকে, গুনগুনিয়ে শুনিয়ে গেল—

আলোয় যারা কোনও খানেই নাইরে
তাদের কি গো আঁধার মাঝে পাইরে
সব নাগালের বাইরে
পথ পেল কি সকল পথ-হারা।

এই লাইনগুলো মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘড়ি দেখলে। অর্থাৎ অধীর হয়ে উঠল। বাড়ি না পৌঁছনো পর্যন্ত তো কবিতাটা লেখা যাবে না। কথাগুলোকে কাগজে বন্দী না করা

পর্যন্ত বিশ্বাস নেই। কবিতাটা লিখে.... এর পরই দিবসের কথা মনে পড়ল তার, কারণ উর্মি ও দিবস ছাড়া আর কোনো পাঠক নেই তার কবিতার। দিবস হঠাৎ অমনভাবে এসে ব্যাগটা চেয়ে নিয়ে গেল কেন? সিনেমা দেখতে গেল না কি কোনও দুপুরের শোয়ে? হঠাৎ রাস্তায় বিজ্ঞাপন দেখেছে হয়তো সঙ্গে পয়সা ছিল না। ভ্রূকুঞ্চিত করে চাইল সে দেওয়ালগুলোর দিকে। কোনও ভালো সিনেমার বিজ্ঞাপন দিয়েছে না কি?—

গলির গলি তস্য গলির মধ্যে নিজের শতজীর্ণ খোলার ঘরে দিবসের মতো ছেলেকে নিয়ে গিয়ে কুণ্ডু মশায় নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন একটু। দিবস ছেলেটি যে সাধারণ ছেলে নয়, অন্তত তাঁর খোলার ঘরে ঠিক যে ওকে মানাবে না তা মহেন্দ্র কুণ্ডু বুঝেছিলেন। সঙ্গে চেক বই ছিল না, অথচ ব্যাংকের কেরানির সঙ্গে একটু হেসে কথা কয়েই ও স্বচ্ছন্দে টাকাগুলি বার করে নিলে। মহেন্দ্র কুণ্ডু পারতেন না। তাঁর বেলায় নানা বখেড়া তুলত ওই কেরানিটাই। এ রকম ছেলে তাঁর খোলার ঘর ভাড়া নিচ্ছে কেন এ ঔৎসুক্য তাঁর যে হচ্ছিল না তা নয় কিন্তু সেটাকে আমোল দিতে চাইছিলেন না তিনি ভাড়াটা হস্তগত করবার পূর্বে। দিবস ঘরটা দেখছিল। তার চোখের দিকে চেয়ে আরও কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন মহেন্দ্র কুণ্ডু।

"ঘরখানা অবশ্য একটু বে-মেরামত আছে, তবে আমার দেওঘরের চাকরিটা যদি পাকা হয়ে যায় আর আপনি যদি বরাবর থাকেন, তাহলে সব ঠিক করে দেব আমি। এখন কোনো অসুবিধা হবে না আপনার, বর্ষাকাল হলে অবশ্য—"

"ওই চৌকিটা কি আপনার?"

"হ্যাঁ, ইচ্ছে করলে আপনিও ব্যবহার করতে পারেন ওটা।"

"আপনার হাঁস কোথা?"

"ওই যে"—খোলা দ্বারপথের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে দেখালেন। হাঁসটা উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। রাজহাঁস একটা।

"ওটাকে দেখবেন একটু"—মিনতিভরা কণ্ঠে বলতে লাগলেন কুণ্ডু মশায়। কণ্ঠস্বরে যেন আন্তরিকতা ফুটল তাতে দিবস বিস্মিত হল বেশ,—"কিছুই করতে হবে না আপনাকে, সকাল বিকেল চারটি চারটি ধান দেবেন আর সদিকে দু'চারটে পয়সা দেবেন মাঝে মাঝে গুগ্‌লি এনে দেবে।"

"সদি কে?"

"আপনার পাশেই থাকে। সদি, ও সদি—" উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করেই নিরস্ত হলেন. না মহেন্দ্র কুণ্ডু, ঘর থেকে বেরিয়ে তাকে ডেকে আনতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পা বাড়াবামাত্র সদির কাংস্যকণ্ঠ শোনা গেল।

"কি গো কি বলছ?"

কুণ্ডু মহাশয়ের মুখভাব এবং কণ্ঠস্বর মোলায়েম হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

"একবার এদিকে এস না—"

কুণ্ডু মশায়ের মুখভাব এবং কণ্ঠস্বর মোলায়েম হলেও সদির বিষয়ে বর্তমানে তাঁর মনোভাব খুব মোলায়েম ছিল না। "তুমি ভাড়াটে জোগাড় না করে ঘরটি নিজেই ভোগ দখল করবে ভাবছিলে কিন্তু আমি দেখ ভাড়াটে জোগাড় করে এনেছি—এই ধরনের একটা টেক্কা-দেওয়া ভাব মনে জাগছিল তাঁর।

"কি বলছ গো?"

প্রবেশ করল সৌদামিনী। এ সৌদামিনীর সঙ্গে আকাশের সৌদামিনীর সাদৃশ্য কোনো কালে ছিল কি না জানি না, এখন কিন্তু নেই। ঈষৎ স্থূলাঙ্গিনী প্রৌঢ়া বস্তিবাসিনী সে। বস্তিজীবনের সমস্ত রকম লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করে অপমানিত নারীত্বের 'আহা কি দুর্দশা হয়েছে' কথায় কথায় এরকম খেদোক্তি করা যাঁদের স্বভাব, সৌদামিনীর মধ্যে তাঁরা কবিত্ব করবার বেশি মালমশলা পাবেন না। সৌদামিনীর হাবভাবে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার চিহ্নমাত্র নেই, তার নারীত্বও যে মোটেই অপমানিত হয়নি এ চিহ্নও তার সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট। ড্রয়িং-রুম-মার্কা বা গৃহলক্ষ্মী-ছাপ-দেওয়া কতকগুলি অর্ধমৃত নারীর অস্বাভাবিকতাকেই নারীত্ব আখ্যা দিয়ে যাঁরা তৃপ্তি পান অথবা যাঁরা স্বেচ্ছাচারের অসংযমের মধ্যেই কেবল নারীত্বের বিকাশ দেখে পুলকিত হন তাঁরা সৌদামিনীর আসল রূপটি দেখতে পাবেন কিনা সন্দেহ। তাঁরা রূপরসিক নন, লেবেল-রসিক। ব্র্যান্ডির-বোতলে-পোরা রঙিন জল খেয়েই নেশায় মত্ত হয়ে যাবার ক্ষমতা আছে তাঁদের। এঁরা মানুষটাকে দেখেন না, জাত কুল কোষ্ঠি দেখেন। এঁদের বিচারে বস্তিটাই বড় হয়ে ওঠে, বাদ পড়ে যায় সৌদামিনী।

মনিবকে দেখলে দুষ্কর্মরত ভৃত্যের মুখভাব যেমন হয় মহেন্দ্র কুণ্ডুরও মুখভাব তেমনি হয়ে উঠল সৌদামিনীকে দেখে। সৌদামিনী সেটা লক্ষ্য করলে না, লক্ষ্য করবার প্রয়োজন নাই তার। তার ট্রেন মহেন্দ্র কুণ্ডু নামক স্টেশন দাঁড়িয়েছিল বটে কিছুক্ষণ কিছুকাল আগে, কিন্তু সে স্টেশন বহুদিন সে ছেড়ে এসেছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রবৃত্তি আর তার নেই। এই খোলার ঘরটা মহেন্দ্র কুণ্ডু তাকে দেবে বলেই কিনেছিল, কিন্তু দেয়নি। এ নিয়েও কোনও দিনই মাতামাতি করেনি সে। বরং মহেন্দ্র কুণ্ডু পরে যখন বিয়ে করে, এইখানেই তার চিররুগ্ন স্ত্রীকে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে এল তখন সৌদামিনী সেবাই করেছিল তার স্ত্রীর। এখনও তার হাঁসটার দেখাশোনা সৌদামিনীই করে। পুরুষদের সে চেনে, ভালো করেই চেনে, সেই জন্যে রাগ নেই তার কারও উপর। মহেন্দ্র কুণ্ডু কিন্তু সৌদামিনীকে দেখলেই তটস্থ হয়ে পড়েন।

"এই বাবুটি আমার এই ঘরখানা ভাড়া নিচ্ছেন"— হাত কচলে কাচুমাচু ভঙ্গীতে বললেন কুণ্ডু মশায়—"হাঁসটাও এইখানেই রইল। একটু দেখাশোনা কোরো, বুঝলে. আমি দেওঘর চলে যাচ্ছি আজই।"

"বেশ।"

সৌদামিনী মাথার কাপড়টা একটু টেনে, আঁচলটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে ভব্য হবার চেষ্টা করলে একটু।

"বাবু তোমাকে পয়সা দেবেন, গুগ্‌লি-টুগ্‌লি এনে দিও, বুঝলে?"

"বেশ তা দেব" তারপর দিবসের দিকে চেয়ে বেশ ভদ্রভাবেই বললে, "যা যখন দরকার হবে বলবেন আমাকে আমি পাশেই আছি"—বলে ঈষৎ হেসে চলে গেল।

দিবসের শরীরটা সেখানে দাঁড়িয়েছিল বটে কিন্তু মনে মনে সে ফিরে গিয়েছিল বাড়িতে; তার বাবার কাছে, ব্রজর কাছে। বিঘ্ন-লেশহীন আবেষ্টনীতে নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রীর তথ্য আহরণ করে অথবা সরোদ আলাপ করে এমন কি উকিল হয়েও যে নির্ঝঞ্ঝাট মধ্যবিত্ত জীবন সে যাপন করতে পারত তার থেকে স্বেচ্ছায় চ্যুত হয়ে হঠাৎ এই খোলার ঘরে এসে মহেন্দ্র কুণ্ডুর

হাঁসের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হতে তার আপত্তি ছিল না (এক নজর দেখে সৌদামিনীকেও তার ভালো লেগেছিল)—কিন্তু এই ছবির মধ্যে বাবা আর ব্রজ যদি থাকত, অযৌক্তিকভাবে মনে হল তার এবং হঠাৎ রাগ হল তারপর। কেন বাবা তাকে এমন ভাবে বাধা দিলেন। ডিম ভেঙে যে পক্ষী-শিশু বেরিয়েছে, যার পালক গজিয়েছে, যে উড়তে শিখেছে সে কোন্ ডালে কতক্ষণ বসবে এ রকম উদ্ভট ফরমাস কোনও পক্ষী পিতা করে না তো, কিন্তু—সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে হল, পক্ষী-শিশু যখন সম্পূর্ণ স্বাধীন হয় তখন বাপ-মার সঙ্গে সম্পর্ক থাকে কি তার? তার কি মন কেমন করে—এই মন কেমন করার মাধুর্যরসে তলিয়ে গেল তার সমস্ত চিত্ত পরমুহূর্তে। যাদের কাছে আর সে ফিরে যাবে না, যেতে পারবে না, তাদের জন্যই আকুল হয়ে উঠল তার অন্তর; আর আকুল হয়ে উঠল বলেই মনুষ্যত্বের একটা সূক্ষ্ম আনন্দ রসায়িত করে তুলতে লাগল তার বেদনাকে, তার অজ্ঞাতসারেই।

ভাড়াটা দিয়ে দিন তাহলে, ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা যাক। টিকিট, রসিদ বই সব সঙ্গে আছে আমার।"

কোটের বোতাম খুলে ভিতরের ফতুয়ার পকেট থেকে ছোট একটি রসিদ বই বার করলেন মহেন্দ্র কুণ্ডু।

"উনচল্লিশ টাকা তো?"

"ওটা পুরোপুরি চল্লিশই করে দিন, চৌকিটা তো ব্যবহার করবেন?

"বেশ।"

চৌকিটার উপর দিবস অনেকক্ষণ বসেছিল একা চুপ করে। সৌদামিনীর কথায় তার চিন্তাধারা মোড় ফিরল হঠাৎ।

"আপনার জিনিসপত্তর কই?"

"আনব, কিনে আনতে হবে সব।"

"ভালো দেখে ফুল-ঝাড়ু আনবেন তাহলে একটা। ভালো করে পরিষ্কার করে দেব ঘরটা। আপাতত আমার যেটা আছে সেইটে দিয়েই দিচ্ছি।"

"ও আচ্ছা।"

আর কিছু না বলে দিবস উঠে বেরিয়ে চলে গেল।

রাস্তায় বেরিয়ে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতেই লাগল সে। যে সব জিনিস কেনবার জন্যে সে বেরিয়েছিল, এখানে থাকতে গেলে যে সব জিনিস তাকে কিনতেই হবে অবিলম্বে, সে সবের দোকান একের পর এক অনেকগুলো পেরিয়ে গেল। যে নিঃসঙ্গতা কেবল ভিড়ের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব তার মধ্যেই মুক্তি পেয়েছিল সে খানিকক্ষণের জন্যে এবং খানিকক্ষণের জন্য বোধ হয় নিঃসঙ্গচারী গ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতুর ধর্মও লাভ করেছিল, যে ধর্মের মূল প্রেরণা গতি, উদ্দেশ্য নয়। কবি রবীন্দ্রনাথের কল্পনা যে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিল এবং যার অসম্পূর্ণ ইতিহাস তিনি ছন্দে গেঁথে রাখবার চেষ্টা করে গেছেন। (কারণ নিরুদ্দেশ যাত্রার সম্পূর্ণ ইতিহাস লেখা যায় না) সে রকম নিরুদ্দেশ যাত্রা আমরা সবাই করি মাঝে মাঝে কিন্তু জানতে পারি না। ঠিক এই সময় দিবস যে বস্তুনিচয়কে অতিক্রম করে যে পথে দ্রুতবেগে চলেছিল, তার বর্ণনা নানা প্যাটার্নের বাড়ি, মানুষ, ডাস্টবিন, চিঠি ফেলবার বাক্স, টেলিগ্রামের খাম,

দোকান, রিক্‌সা, ট্রাম, 'বাস' নয়,—তার বর্ণনা, (যদি তা বর্ণনা করা আদৌ সম্ভব হয়), মহাশূন্যের অসীম ব্যাপ্তি, দূরে দূরে খদ্যোতপুঞ্জের মতো জ্বলমান শত সহস্র সৌরলোক, মন ছুটে চলেছে সেই দেশের উদ্দেশ্যে যেখানে সবই অপার্থিব যেখানে আলোক ভেঙে পড়েছে সপ্ত বর্ণে নয়, সহস্র বর্ণে, ছায়াপথের অজ্ঞাত জ্যোতিষ্কপুঞ্জ যার নাগাল পাওয়ার জন্যে স্পন্দিত হচ্ছে আগ্রহতরঙ্গের অবর্ণনীয় ছন্দে——।

"দিবুদা যে—"

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দিবস পরেশের ডাকে। স্কুলে কলেজে যে অসংখ্য ছেলেদের সঙ্গে মুখচেনা হয়ে কিন্তু অন্তরঙ্গতা থাকে না পরেশ সেই পরিচিত-অথচ-অপরিচিত গোষ্ঠীর একজন। দিবসের চেয়ে নিচের ক্লাসে পড়ত পরেশ।

"কি খবর, অনেক দিন পরে দেখা", পরেশই হেসে বললে আবার।

বলবার মতো অনেক খবর ছিল, কিন্তু সে সব খবর পরেশকে বলা যায় না। মনের নেপথ্যলোকে যে সমস্যাটা বিব্রত করছিল তাকে সেইটেই বাঙ্ময় হয়ে উঠল হঠাৎ প্রশ্নাকারে।

"কোনও একটা কাজের খোঁজ দিতে পার ভাই?"

"ও! কি কাজ, পড়া ছেড়ে দিয়েছেন না কি?"

"হ্যাঁ, যে কোনও কাজ তারপর একটু হেসে—" কেরানিগিরি ছাড়া।

দিবসের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখে পরেশ মনে মনে হাসলে।

"আমি কিন্তু একটা কেরানিগিরি পেলেই বেঁচে যাই। দরখাস্ত করেছি কয়েক জায়গায় ও হ্যাঁ তো"—হঠাৎ পকেটে হাত ঢুকিয়ে পরেশ একটা কাগজ বার করলে।

"প্রাইভেট ট্যুশনির খবর দিতে পারি কয়েকটা। আমি চেষ্টা করেছিলাম, হয় না। আপনার হয়ে যেতে পারে। ওটা রেখে দিন আপনার কাছে। চেষ্টা করুন একে একে, যেটা লেগে যায়।"

প্রাইভেট ট্যুশনি যে কেরানিগিরির চেয়ে মহত্তর পেশা এ মোহ দিবসের থাকবার কথা নয় কিন্তু তবু সে হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে পকেটে পুরল তার কারণ শুধু যে অন্যমনস্ক ছিল তা নয়, অল্প-পরিচয় পরেশের কাছে নিজের মতবাদটা (যা খুব মৌলিকও নয়) আস্ফালন করতে সঙ্কোচ হচ্ছিল তার। বাবার কাছে আস্ফালন করেই যথেষ্ট অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল সে।

"আচ্ছা চলি"——পরেশের 'বাস' এসে পড়ল পরমুহূর্তেই। দিবস কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ক্ষণকাল। ফাঁক পড়ল তার চিন্তাধারায়। আর সেই ফাঁক দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল—কাপড়, জামা, গামছা, গেঞ্জি, বিছানা, আলো, টেবিল, চেয়ার, ফুলঝাড়ু, ... আসন্ন জীবনের অতি রূঢ় দাবির ফর্দটা।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

উপর্যুপরি দু'দুটো নিদারুণ সংবাদ পেয়ে চুনীলালের মুষড়ে যাবার কথা। মুষড়ে হয়তো গিয়েছিলও। কিন্তু অন্নদা বিশ্বাসের কাছে তা প্রকাশ করে ফেললে যে অদূর ভবিষ্যতে আরও মুষড়ে পড়বার কারণ ঘটবে, এটুকু অনুমান করতে তার পোড়-খাওয়া বুদ্ধির দেরি লাগেনি। তাই কথাটা শুনে সে ভ্রূ কুঁচকে দুই কুঞ্চিত ভ্রূর মাঝখানে টোকা মারতে লাগল এবং তারপর

মসৃণ-ভ্রূ হয়ে উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে অন্নদা বিশ্বাসকে হবু রাষ্ট্রভাষাতেই আশ্বাস দিলে—"কুছ পরোয়া নেই।"

একটু আগে গোবিন্দ সাণ্ডেল তাকে জানিয়ে গেছেন যে হরলাল সিংহি নালিশ ঠুকে দিয়েছে, নির্দিষ্ট দিনে টাকা দাখিল না করলে জেল অনিবার্য। নির্দিষ্ট দিনের পূর্বেই চুনীলাল হরলালকে টাকা দিয়ে দিত। কিন্তু দেবার মতো টাকা তার নেই। কোনও কালেই ছিল না। টাকা রোজগার করবার উদ্দেশ্যেই সে ব্যবসা ফেঁদেছিল, কিন্তু গোবিন্দ সাণ্ডেলের ভাষায়—বাঙালীর যা হয়!

চুনীলালকে যাঁরা জুয়াচোর বা ঠক আখ্যা দেবেন তাঁদের সঙ্গে তর্ক করবার প্রবৃত্তি আমার নেই। তর্ক করে কারও মত বদলানো যায় না, আমার মতটা সত্য কি না তাও আমার জানা নেই, চুনীলালের চরিত্রও সবটা আমি জানি না। কিন্তু যতটুকু জানি তাতে চুনীলাল প্রসঙ্গ উঠে পড়লেই একটা ছবি আমার মনে পড়ে যায়। স্বচক্ষে দেখেছিলাম ঘটনাটা। মাঝগঙ্গায় ডুবছিল একজন লোক। ডুবছিল বললে সবটা বলা হয় না ফেনিল ঘূর্ণাবর্তের নিষ্ঠুর টানে তলিয়ে যাচ্ছিল অতলের দিকে অসহায়ভাবে। আমরা সবাই তীরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলাম। দর্শকদের মধ্যে একজন ধনী ছিলেন। তিনি আর এ দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না। বলে উঠলেন—ওকে যদি কেউ বাঁচাতে পারে, নগদ একশ টাকা দেব তাকে। তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল একটা ছোকরা এবং সাঁতরে এগিয়ে যেতে লাগল তার দিকে। মজ্জমান লোকটির বিপন্ন হাতটা দেখা যাচ্ছিল শুধু মাঝে মাঝে। যে ছোকরা তাকে বাঁচাতে গেল সে কাছাকাছি হতেই কিন্তু ঘটল আর এক কাণ্ড। ডুবন্ত লোকটি এমনভাবে জাপটে ধরলে তাকে যে দুজনেই ডুবে গেল। কেউ বাঁচল না। উপচিকীর্ষু ব্যক্তিটি যদি মজ্জমান প্রথম ব্যক্তিকে অকৃতজ্ঞ বলে পরলোকে গিয়ে তার নামে নালিশ করে সে ঠিক কাজ করবে কি না তাও জানি না। চুনীলালের কথা মনে হলেই কিন্তু ছবিটা ভেসে ওঠে মনে। আর একটা কথাও মনে হয় যে আমাদের সমাজে অধিকাংশই চুনীলাল—যে চুনীলালদের ভীষণ সমাজব্যবস্থা এবং ভীষণতর রাষ্ট্রব্যবস্থা নামক দুটি সিংহের সঙ্গে অহরহ লড়তে হচ্ছে একটা বদ্ধ অঙ্গনের মধ্যে। প্রাচীন রোমে এই ধরনের একটা খেলা ছিল শুনেছি। সেই স্থূল ব্যাপারটা একটু সূক্ষ্মতর হয়েছে আধুনিক যুগে। নরখাদক সিংহগুলোর আকার বদলেছে। আর একটু তফাতও হয়েছে। পরিবার ঘাড়ে করে লড়তে হত হচ্ছে এদের। তারা একাই লড়ত—

"কুছ পরোয়া নেই, মানে? বিকাশবাবু যদি এখন গা না করেন তাহলে তো গেলাম আমি। পরিবার যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারে যে আমি পোস্টাফিস থেকে টাকা বার করে—"

অন্নদা বিশ্বাসের কণ্ঠস্বর কাঁদো কাঁদো হয়ে এল। চুনীলালের দুটি হাত ধরে নিরর্থক জেনেও তিনি আবার বললেন, "দেখো ভাই আমার টাকাগুলো যেন মারা না যায়। ওই আমার যথাসর্বস্ব। আমাকে যা করতে বল আমি করতে রাজি আছি।"

চুনীলালের কণ্ঠস্বরও কাঁদো কাঁদো হয়ে আসা উচিত ছিল, কিন্তু প্রত্যেক খেলোয়াড়, লেখক বা অভিনেতার যেমন স্বকীয়তা থাকে, চুনীলালেরও তেমনি ছিল। অন্নদা বিশ্বাসের নকল না করে দক্ষ সেনাপতির মতো তিনি বললেন, "ডিটেল্‌স্ সংগ্রহ কর।"

"কিসের ডিটেল্‌স্?"

'কোথায় প্রেমে পড়েছে, কার প্রেমে পড়েছে, কিভাবে প্রেমে পড়েছে—' এসব খবর পেলে চুনীলাল যে অবিলম্বে কিস্তি মাৎ করে ফেলতে পারবেন তা নয় কিন্তু এসব খবর জোগাড় করতে অন্নদা বিশ্বাসকে বেশ কিছু সময় ব্যয় করতে হবে এবং সময়ের মধ্যে চুনীলাল হয়তো কিছু—এই 'হয়তো কিছু'টা যে কি রূপ নেবে তা চুনীলাল এখনও জানে না—হয়তো জামাইবাবু (মানে, গহনচাঁদ) 'সঙ্গীত ভবন' ব্যাপারটাকে টাকাকড়ি দিয়ে সার্থক করে তোলবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতে পারেন (এ কল্পনাটা কিন্তু আকাশকুসুমই মনে হচ্ছিল, চুনীলালের) কারণ প্রথমত জামাইবাবুর টাকা নেই দ্বিতীয়ত দারিদ্র্য সত্ত্বেও তাঁর ভাবভঙ্গিটা সেকেলে মার্কা, দোকান করা দূরে থাক, মাইনে নিয়ে ছাত্রছাত্রীকে গানবাজনা শেখাতেও তিনি রাজি নন, বিদ্যা বিক্রয় করা না কি মহাপাপ। তবে একটা ভরসা আছে। রঙ্গনার বিয়ের জন্য টাকা ঋণ করতে হবে তাঁকে এবং সেই ঋণ শোধ করবার জন্য উপার্জনের রাস্তা খুঁজতে হবে একটা, সেই দিক থেকে 'সঙ্গীত ভবন'-এর আর্থিক সম্ভাবনাটা হয়তো উপেক্ষা না-ও করতে পারেন তিনি, যদিও 'সঙ্গীত ভবন'টাকে অর্থকরী করতে হলে আরও টাকা ঢালতে হবে ওতে, মানে আরও ঋণ করতে হবে, কিংবা হয়তো মানিকলাল (চুনীলালের শালা) কিছু সাহায্য করতে পারে তাকে এই দুঃসময়ে, লটারিতে বেশ কিছু পেয়েছে সে সম্প্রতি, পদ্মমুখীকে (চুনীলালের স্ত্রী) পাঠাতে হবে তার কাছে একবার, সাহায্য না করে ধার দিক, কিংবা (মানিকলাল যদি 'ফেল' করে তাহলে) অগত্যা কাবুলীওলার শরণ নিতে হবে—কেবল অন্নদাকে কোনও ওজুহাতে দিন-কয়েকের জন্য সরিয়ে দিয়ে হাঁফ ছাড়তে চাইল চুনীলাল। মকোর্দমারও তারিখ পড়ে, সময় পাওয়া যায়, এ লোকটা দম ফেলতে দিচ্ছে না, ছিনে জোঁকের মতো আঁকড়ে আছে....।

'ডিটেল্‌স' পেলে চুনীলাল যে নিশ্চয় কিছু করতে পারবে অন্নদার কিন্তু এ বিশ্বাস ছিল। চুনীলাল যদিও তাকে ডুবিয়েছে কিন্তু চুনীলালের উপর আস্থা হারায়নি সে। বস্তুত অবস্থাটাই অন্নদা-বিশ্বাস-জাতীয় লোকেদের একমাত্র অবলম্বন জীবনে। অনেকবার অনেক রকমে হতাশ হয়েও এরা বিশ্বাস হারায় না। ভগবানের কাছে অনেক প্রার্থনা করেছে একটাও সফল হয়নি, তবু ভগবানের প্রতি অচল বিশ্বাস এদের। শুধু ভগবান নয়, মাদুলি, বড় সাহেব, টাকা, অদৃষ্ট প্রভৃতি বহু বিচিত্র জিনিসের উপর বিশ্বাস করে করেই বিচিত্র জীবনদর্শন গড়ে তুলেছে এরা।

সোৎসাহে অন্নদা বিশ্বাস তাই বললে, "সমরেশের কাছ থেকে কিছু কিছু খবর পেয়েছি।"

তার মনে হল এই খবরগুলোর প্রভাবেই হয়তো তার ডুবে-যাওয়া টাকাগুলো উদ্ধার হয়ে যাবে কোনও অভাবিত উপায়ে। চুনীলালের বুদ্ধিমত্তার উপর সত্যিই প্রগাঢ় আস্থা ছিল তার।

"সমরেশ কে?"— অন্যমনস্ক চুনীলাল প্রশ্ন করলে আত্মস্থ হয়ে —"ভদ্রলোকের নাম তো বিকাশ বলেছিল?"

চুনীলাল বিকাশবাবুর সম্বন্ধে কিছুই জানত না। বিকাশবাবু অন্নদা বিশ্বাসেরই আবিষ্কার। অন্নদার সময়ক্ষেপের ওজুহাত হওয়া ছাড়া বিকাশবাবু যে সত্যি কোনও কাজে লাগতে পারেন সে বিশ্বাস চুনীলালের মোটেই ছিল না। ওই নিয়ে অন্নদা যতক্ষণ ভুলে থাকে থাক এই ছিল চুনীলালের মনোভাব। অন্নদা কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে এমন একটা খবর এনেছিল যা শুধু চুনীলালের কেন অনেকেরই চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দিলে কিছু কালের জন্য।

"সমরেশ? বাঃ কাল তোমায় বললুম না, সমরেশ হল আমাদের আপিসের দাস মশায়ের

আপন পিসতুতো শালা! ওঁর থ্রু দিয়েই তো ধরেছি বিকাশবাবুকে। বিকাশবাবুর সঙ্গে সমরেশবাবুর খুব বন্ধুত্ব কি না। দাস মশাই হেল্‌প্ না করলে অতবড় লোকের নাগাল পাওয়া কি আমাদের মতো হেঁজিপেঁজি লোকের কর্ম ভাই। আমরা হলুম—"

অন্নদা যে সুরে কথাটা আরম্ভ করেছিল অর্থাৎ সে অতি দীন দরিদ্র নগণ্য ব্যক্তি, নিতান্ত সৌভাগ্যবশতই কারও থ্রু দিয়ে সে প্রকাণ্ড একটা লোকের সন্ধান পেয়ে যেন বর্তে গিয়েছে—এটা তার অতি প্রিয় সুর। এই সুরটাই আলাপ করছিল সে এবং চুনীলাল বাধা না দিলে আরও খানিকক্ষণ হয়তো করত।

"সমরেশের কাছ থেকে কি খবর পেয়েছ সেইটেই বল না আগে।"

"ও হ্যাঁ। বিকাশবাবুর এক মাসতুতো বোনের নাকি বিয়ে হয়েছে দিন সাতেক আগে, দাঁড়াও—" হঠাৎ থেমে গেল অন্নদা।

"কি হল?"

"মাসতুতো না পিসতুতো ঠিক মনে করতে পারছি না। মাসতুতোই সম্ভবত—"

"ধরে নিলাম মাসতুতো, তারপর কি বল।"

"মেয়েটি কলেজে পড়ে। তার বিয়েতে তার কলেজ-ফ্রেন্ড এসেছিল জনকয়েক। তাদের একজনকে দূর থেকে দেখে—"

আবার থেমে গেল অন্নদা। যে কথাটা বললে ঠিক লাগসই হত সেই কথাটাই আটকে গেল তার মুখে। সে নিজেই যেন এজন্য অপরাধী এই রকম একটা মুখভাব করে আড়চোখে চাইতে লাগল চুনীলালের দিকে। প্রেমেপড়া ব্যাপারটা খুবই সড়গড় হয়ে গেছে আজকাল, ও নিয়ে আলোচনা করা মোটেই লজ্জার কথা নয়, তাছাড়া বিকাশবাবু ধনী লোকও, এসব ছোটখাটো কলঙ্ক মানায় তাঁকে। কিন্তু এটা যে কলঙ্ক এই সেকেলে বোধটা থাকতে অন্নদা থেমে গেল।

"দূর থেকে দেখে ভালো লেগেছে, এই তো?"

"আর একটু বেশি" সলজ্জ হাসি হেসে বললে অন্নদা।

অন্নদার মুখের দিকে স্মিতমুখে চেয়ে রইল চুনীলাল। 'প্রেম' কথাটার সঙ্গে অন্নদার ভাসুর-ভাদ্দর-বৌ-শোভন এই আচরণে চুনীলাল বেশ কৌতুক অনুভব করছিল মনে মনে। এই জন্যেই—মানে এই সব সেকেলে সংকোচ এবং কুসংস্কারের জন্যই—অন্নদাকে চুনীলাল ভালোবাসে। পরিহাস-তরল কণ্ঠে স্নেহের সুর লাগল তাই। একটু পরেই অন্নদা যে কথাটা বলবে, যা শুনে বিস্মিত চুনীলালকেও খানিকক্ষণের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়তে হবে এবং যা অবশেষে নিমজ্জমান চুনীলালের চক্ষে ভেলা-রূপে প্রতীয়মান হবে, তার আভাস পেলে চুনীলালের কণ্ঠস্বর পরিহাস তরল হত কি না সন্দেহ। কারণ চুনীলালের চরিত্রে আর যে দোষই থাকুক প্রয়োজনীয় কাজের কথা নিয়ে ছ্যাবলামি করা তার স্বভাব নয়।

"বেশিটা কি রকম? চটচটে, গদগদে, না গাঢ়?"

"অতশত জানি না ভাই"—আর একটু বিব্রত হয়ে পড়ল অন্নদা—"তবে এই নিয়ে তার জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে ঝগড়া হবার উপক্রম হয়েছে নাকি শুনলাম। বিকাশবাবুর বাবা নেই, জ্যাঠামশাই বেঁচে আছেন, তিনি না কি কোথায় এক জায়গায় পঁচিশ হাজার টাকা পণ নিয়ে

বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন, কিন্তু এই মেয়েটিকে দেখবার পর বিকাশবাবু নাকি ওখানে আর বিয়ে করতে চাইছেন না। এই নিয়ে বাড়িতে হুজ্জৎ হচ্ছে, আমাদের ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেছে তাই—"

"কে বললে তোমাকে?"

"সমরেশবাবু, আমাদের আপিসের দাস মশায়ের থ্রু দিয়ে যাঁকে ধরেছিলাম তিনি।"

"মেয়েটির নাম কি, বাড়ি কোথায়, এসব ডিটেল্স্ জান কিছু?"

"বাড়ি কোথায় তা জানি না, তবে মেয়েটির নাম শুনলাম রঙ্গনা।"

"রঙ্গনা! বল কি!"

নিমেষের মধ্যে চুনীলালের মনে পড়ে গেল, রঙ্গনা— তার ভাগ্নী, রঙ্গনা—এক কলেজ-ফ্রেন্ডের বিয়েতে গিয়েছিল। হ্যাঁ. দিন সাতেক আগেই। মনে পড়া মাত্র চুপ করে গেল চুনীলাল। গুলি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে না মরলে বাঘ যেমন এক লাফে অদৃশ্য হয়ে যায় ঘন জঙ্গলে চুনীলালও অনেকটা তেমনি করলে যেন। তফাৎ অবশ্য ছিল। গুলি খেয়ে বাঘ দারুণ চিৎকার করে একটা, চুনীলাল টুঁ শব্দটিও করলে না। গুম হয়ে গেল।

অন্নদা চুনীলালের এ ভাবান্তর হয় লক্ষ্য করলে না বা এর তাৎপর্য বুঝতে পারলে না। রঙ্গনা যে চুনীলালের ভাগ্নী হতে পারে এ তার কল্পনাতীত ছিল। চুনীলালের হাতে সে যথাসর্বস্ব সমর্পণ করেছিল, তার সঙ্গে হৃদ্যতাও ছিল, তার আরও নানা খবর জানত সে (যথা, সে রেসে বেশ ভালো 'টিপ' দিতে পারে, ভালো মাছ ধরতে পারে, শেয়ার মার্কেটের ব্যাপার খুব ভালো বোঝে) কিন্তু তার যে রঙ্গনা নামে এক ভাগ্নী আছে এ খবর সে রাখত না। সে বরং কার কাছে যেন শুনেছিল এবং ঠিকই শুনেছিল যে চুনীলালের বউ নাকি বাঁজা। রঙ্গনার খবর সে জানত না। তাই চুনীলাল যখন চুপ করে গেল তখন অন্নদার মনে হল চুনীলাল বোধ হয় নূতন পরিস্থিতির জটিলতাটা সরল করবার উদ্দেশ্যে নূতন চাল ভাবছে কোনও। ওস্তাদ দাদা-খেলোয়াড় চুনীলালের চালের উপর সত্যিই আস্থা ছিল অন্নদার। সে উৎসুক নেত্রে চেয়ে রইল।

চুনীলাল চালই ভাবছিল। আহত বাঘের মতোই তার মন অতি দ্রুতবেগে ভেবে চলেছিল অতর্কিত এই ব্যাপারটাকে সামলানো যায় কি করে।

"নাম কি ভদ্রলোকের?"—হঠাৎ প্রশ্ন করলে সে।

"কার? সমরেশের? সমরেশ পাল।"

"আরে না, না, বিকাশবাবুর। কোন্ জাত, উপাধি কি?"

"ব্রাহ্মণ। বিকাশ চাটুজ্জে।"

শুনেই চুনীলাল বাঁ হাতে তুড়ি দিয়ে ফেললে সহসা কয়েকটা। অন্নদাকে যদিও সে খুলে বললে না কিছু, কিন্তু চকিতের মধ্যে সে একটা পথ দেখতে পেলে, মতিস্থির করে ফেললে এবং আশা করতে লাগল যে বিভিন্ন ধরনের বাধা সত্ত্বেও সুরাহা হয়ে যাবে বোধ হয় এই বার। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লৌহখণ্ডগুলোর মাঝখানে কোন এক অদৃশ্য হস্ত যেন চুম্বক রেখে গেল একটা। হঠাৎ খুশি হয়ে উঠলে ভ্রূ-কুঞ্চিত হয়ে যায় চুনীলালের, কুঞ্চিত ভ্রূর তলায় চকচক করে চোখ দুটো খালি।

"অমন করে দেখছ কি?"

“বিকাশবাবুর ঠিকানাটা রেখে যাও আমার কাছে।’

ঠিকানাটা দিয়েই অন্নদা বিশ্বাস বুঝলে এইবার তাকে যেতে হবে, অর্থাৎ চুনীলালের কাছে এখন আর দাঁড়িয়ে থাকার কোনও সার্থকতা নেই। কিন্তু যে অকুল পাথারে যে পড়েছে তাতে চুনীলালই একমাত্র ভরসা, চুনীলালকে কাছছাড়া করতে ইচ্ছে করে না।

“আচ্ছা তোমাকে খবর পাঠাব আমি পরে। দেখি কতদূর কি করতে পারি”—চুনীলাল বললে।

“যাই কর, আমার টাকা কটা যেন ফিরে পাই। তুমি তো সবই জান, তোমার কাছে লুকোচাপা তো নেই কিছু।”

“কিছু ভেব না, ঠিক হয়ে যাবে সব।”

“দেখো ভাই—”

“বিকাশবাবু আর তার জ্যাঠামশাই কি এক বাড়িতে থাকেন?”—হঠাৎ প্রশ্ন করলে আবার চুনীলাল।

“আরে না না—দু’জনে আলাদা বাড়িতে থাকে। বিষয় সম্পত্তিও সব নাকি আলাদা”—চুনীলালের কাছে আর একটু থাকবার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেল অন্নদা বিশ্বাস—“বিকাশবাবু নিজে আর একটা আলাদা বাড়িও কবাচ্ছেন সেই জন্যেই তো ইলেকট্রিক গুড্‌স্ দরকার তাঁর—তাছাড়া দোকান করবারও ইচ্ছে—অগাধ বড়লোক তো—”

“তাহলে ওব বিয়েতে জ্যাঠামশাই ঝগড়া লাগাচ্ছেন কি করে?”

“বাঃ তা লাগাবে না? হিন্দু ফ্যামিলি তো হাজার হোক!”

“ও”—সম্পূর্ণ অন্য কথা ভাবতে ভাবতে ‘ও’টি বললে চুনীলাল।

“মণ্ডাটা কিছু নয়, তবু নৈবেদ্যর ওপরেই ওটাকে স্থান দিতে হবে। এই যে ধর না আমার বিয়ের সময়েই, কোথাও কিছু নেই, আমার মামা ফট্ করে বেঁকে দাঁড়িয়ে মাতুল-বিদায় ফিদায়ের ফরকট তুলে এমন হাঙ্গামা বাধিয়ে তুললে যে বিয়েই পণ্ড হয়ে যাবার যোগাড়—”

অন্নদা বিশ্বাসের বিবাহের ইতিহাস শোনবার আগ্রহ চুনীলালের ছিল না। সে ভাবছিল অন্য কথা। ভাবছিল রঙ্গনার যে ফটোটা কিছুদিন আগে তোলান হয়েছিল সেটা আছে পদ্মমুখীর বাক্সে এবং সে বাক্সের চাবি আছে পদ্মমুখীর আঁচলে। বাড়ির কারও কৌতূহল উদ্রিক্ত না করে ফটোটা কি করে সংগ্রহ করা যায় এই কথাই চিন্তা করছিল চুনীলাল। পদ্মমুখীকে কিছু বললেই সে ঝংকার দিয়ে ওঠে। ব্যবসাটা ফেল করার পর থেকে ঝংকারটা আরও বেড়েছে। কিন্তু ফটোটা চাই....।

অন্নদা বিশ্বাস কিন্তু বলে চলেছিল—“শেষ পর্যন্ত মামা আরও একশ টাকা আদায় করে তবে ছাড়লে। ওই যে বললুম না হিন্দু ফ্যামিলিতে বিয়ের ব্যাপারে গুরুজনদের অমর্যাদা করা চলে না, তা তিনি যত বড়ই হোন না কেন—”

“আচ্ছা। তুমি যাও এখন।”

হঠাৎ বাধা পেয়ে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল অন্নদা। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল তারা। চুনীলাল নিজের হাতঘড়িটার দিকে এক-নজর চেয়ে আবার বললে—“যা হয় তোমাকে খবর পাঠাব আমি।”

"বিকাশবাবুর সঙ্গে দেখা করবে ভাবছ?"

"দেখি।"

বিশেষ কিছু ভাঙতে চাইলে না চুনীলাল। হঠাৎ সে বাড়িমুখো হল দেখে অন্নদা বিশ্বাসকেও বাড়িমুখো হতে হল।

"আচ্ছা ফাইভ-বি নম্বরটা কোন্‌খানে হবে বলতে পারেন?" অন্যমনস্ক চুনীলালকে যে যুবকটি প্রশ্ন করলে সে যে অদূর ভবিষ্যতে যে জালটা চুনীলাল মনে মনে বুনতে বুনতে চলেছিল সেই জালটাই ছিন্নভিন্ন করে দেবে তা আন্দাজ করা চুনীলালের পক্ষে অসম্ভব ছিল। সুতরাং দিবসের দিকে ভালো করে না চেয়েই সে উত্তর দিলে—"গলিটার ভিতর দেখুন" এবং আপন মনে ভাবতে ভাবতে চলতে লাগল ফটোটা এখনই যদি হস্তগত করা সম্ভব হয় তাহলে কি ভাবে সে টোপটা ফেলবে।

প্রত্যেক মানুষ নিজেকে জ্ঞাতসারে যে সব দোষগুণের সমষ্টি বলে বিশ্বাস করে অজ্ঞাতসারে সে সেই সব দোষগুণগুলি অপরের উপরও আরোপ করে। অর্থাৎ সে নিজেকেই দেখে অপরের মধ্যে। অন্য প্রকার কোনও দর্শন যে সম্ভবই নয় এ জ্ঞান যখন তার হয় তখন তার মানসিক রূপান্তর ঘটে গেছে। ডিম হয়ে গেছে পাখি। চুনীলালের সে অবস্থান্তর ঘটেনি। সংসার সমরাঙ্গনে যে সব অস্ত্র চালনা করে সে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে তার ধারণা সকলেই সে অস্ত্র লাভ করবার জন্যে সমুৎসক। স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে বিশেষ করে তার ধারণাটা এত বেশি বস্তুতান্ত্রিক যে তার সবটা লিপিবদ্ধ করা যাবে না।

বাড়িতে ঢুকেই সুতরাং পদ্মমুখীকে আড়ালে ডেকে সে প্রথমেই দুখানা দশ টাকার নোট বার করে দিলে।

"কোথা পেলে টাকা? আবার ধার করলে নাকি?"—সবিস্ময়ে জানতে চাইলে পদ্মমুখী।

টাকাটা সত্যিই যে ধার করতে হয়নি এতে বাস্তবিক চুনীলালও খুবই আনন্দিত হয়েছিল মনে মনে। বালুকাস্তূপের উপর বসে বহুবার হতাশ হওয়া সত্ত্বেও যে বালক বালুর প্রাসাদ নির্মাণের স্বপ্ন ত্যাগ করেনি সে যদি সহসা একটা বালুকা প্রাচীরকে খানিকক্ষণ অভগ্ন অবস্থায় দেখে তাহলে তার মনে যে আনন্দের শিহরন জাগে প্রৌঢ় চুনীলালের মনেও সেই ধরনের শিহরনই জাগছিল একটা। ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল তার এবং কুঞ্চিত ভ্রূর তলায় চকচক করছিল চোখ দুটো।

"রঙ্গনা কোথায়?"—নিম্নকণ্ঠে প্রথমে জিগ্যেস করলে সে।

"ছাতে। কার কাছ থেকে ধার করলে টাকাটা? জামাইবাবু টাকা দিয়েছেন তো কিছু আপাতত।"

"ধার করিনি। তবে ধার কথাটার সঙ্গে ওর সম্পর্ক আছে বলতে পার। বুদ্ধির ধারও তো ধার"— বলেই হেসে ফেললে চুনীলাল।

"ঊর্মি আর সরলা বলে দুটি ছাত্রী আজ ভর্তি হল গানের স্কুলে।"

"গানের স্কুল সত্যি খোলা হবে নাকি?"

স্মিতমুখে চেয়ে রইল চুনীলাল। অপেক্ষা করতে লাগল। পদ্মমুখী ঝংকার একটা দেবেই সে জানত।

"সব কর্মে হয়েছ যশী বাকি আছে এখন ভীম একাদশী। ইন্‌সিওরের দালালী হল, ইলেকট্রিকের দোকান খোলা হল, শেয়ার মার্কেটে ফাটকা খেলা হল এবং বাকি আছে গানের ইস্কুল।"

"একের পর এক চেষ্টা তো করেই যাচ্ছি, লাগছে না কি করব বল। ইলেকট্রিকের দোকানটা যে এমনভাবে ডুবে যাবে কে জানত!"

"আমি জানতাম। দোকান না খুললে দোকান চলবে কেন? দোকান কি খুলতে কখনও? আজ মাছ-ধরা, কাল রেস খেলা—"

"গানের স্কুল কিন্তু হু হু করে চলবে দেখো। জামাইবাবুর যে রকম নাম।"

"কিন্তু উনি কি মাইনে নিয়ে তোমার গানের স্কুলের মাস্টারি করবেন?"

"তা কি করতে পারেন কখনও? উনি সঙ্গীতবিদ্যা বিতরণ করবেন। মাইনেটা নেব আমি, অবশ্য একটু গোপনে। দেখো জামাইবাবু বা রঙ্গনা যেন এ টাকার কথা ঘুণাক্ষরে জানতে না পারে।"

"এটা কি উচিত হবে!"

পদ্মমুখীব কণ্ঠস্বর মোলায়েম হয়ে এল একটু। মুখে সে যতই ঝংকার দিক ভিতরে ভিতরে সেও কম ভীত হয়নি। এই বাজারে উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেলে ভবিষ্যতে চলবে কি করে এ ভয় তারও হয়েছিল। ভাগ্যে জামাইবাবু এসে পড়ছেন তাই দৈনিক সংসার খরচটার জন্যে অপরের কাছে হাত পাততে হচ্ছে না। শেষে তার বাপের দেওয়া গয়নাগুলোও যাবে না কি? এই ভয়াবহ চিন্তার আগুনে চুনীলালের নবোদ্ভাবিত উপার্জন-কৌশল—তা সে যতই অযৌক্তিক হোক না কেন—কিঞ্চিৎ বারি-সিঞ্চন করল যেন। চুনীলালের পরবর্তী কথাগুলোতে কিছু যুক্তির আভাসও পেলে পদ্মমুখী।

"খুব হবে, খুব হবে। এ বাবা ব্ল্যাক মার্কেটের যুগ, সোজা রাস্তায় কিছু হবার জো নেই। তুমিও ওঁকে একটু অনুরোধ কর থাকতে। আজ উনি যখন খেতে বসবেন তখন পাখাটা হাতে নিয়ে কাছে বোসো, বুঝলে, শালাজের অনুরোধ ঠেলতে পারবেন না—"

"কত রঙ্গই যে জান!"

হেসে ফেললে পদ্মমুখী। হাতে নগদ কুড়িটা টাকা পেয়ে সত্যিই চিত্ত কিন্তু বিগলিত হয়ে গিয়েছিল তার। তার ওই হাসি যে মর্মন্তুদ অশ্রুরই রূপান্তর একথা ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করেনি বলেই হাসিটা ভারী সুন্দর দেখাল। ক্ষণিকের জন্য চুনীলালও নূতন করে মুগ্ধ হল আবার, ফিরে গেল অতীতের সেই পরম মুহূর্তটিতে যখন সে পদ্মমুখীকে প্রথম দেখেছিল। শুভদৃষ্টির সময় দেখা চেলিগুণ্ঠিত চন্দনচর্চিত মুখখানি ভেসে উঠল চোখের উপর। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় সাদা পাল-তোলা যে নৌকোটা তারা ভাসিয়েছিল ময়ূরাক্ষীর স্বচ্ছ জলে অনেক দিন আগে, কোথায় গেল সেটা? কোন্ নামহীন ঘাটে ভিড়েছে তা?—

অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল চুনীলাল ক্ষণকালের জন্য। এবং এই চিন্তার সূত্র ধরেই ফিরে এল সে আবার বাস্তবলোকে।

"রঙ্গনার সেই ফটোটা যে তোলান হয়েছিল, কোথায় সেটা দাওতো" বলে চুনীলাল একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল যেন মনে মনে। তার আবছা ভাবে যেন মনে হল যে রঙ্গনার সম্বন্ধে

এখনই যে কথাটা সে শুনলে তাতে মামা হিসেবে এবং প্রচলিত সমাজবিধি অনুসারে তার চটে যাওয়া উচিত। কিন্তু তা না করে যে.....

"ফটোটা বাক্সে আছে।"

"দাও তো!"

"কি করবে এখন?"

"একটি পাত্রের সন্ধান পেয়েছি।"

অপ্রস্তুত ভাবটা কেটে গেল চুনীলালের। প্রয়োজনের সঙ্গে বিবেকের যখন সংঘর্ষ হয় তখন পুরাতন বিবেকের সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়। নূতন বিবেক এসে তখন দখল করে সেটা।

জানালাটা হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় খুলে গেল। খোলা বাতায়ন-পথে সুর ভেসে এল একটা। ও ধারের ঘরে বসে গহনচাঁদ উদাত্তকণ্ঠে গান করছিলেন শিব-মানস স্তোত্রটি—

আত্মা ত্বং গিরিজামতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং।
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ।
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণ-বিধিঃ স্তোত্রাণি সর্ব। গিরো।
যদযৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্।।

প্রচলিত সমস্ত শিবস্তোত্রগুলিতে সুর বসিয়ে দেবেন ঠিক করেছেন গহনচাঁদ। কোন্ কোন্ সুর স্তোত্রে ঠিক লাগবে এই তাঁর প্রধান চিন্তা এখন।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

দৃশ্যমান অন্ধকার যে আসলে চোখের স্নায়ুমণ্ডলের উপর বহির্জগতের কতকগুলি অদৃশ্য তরঙ্গের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মাত্র, ওতে সত্যি সত্যি যে ভয় পাবার কিছু নেই, বস্তুত অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পাওয়ার শক্তি যে মানুষের চোখেরও আছে, যাকে আমরা আলো বলি তার উৎস যে জাতীয় জ্যোতিষ্ক অন্ধকারেই যে তারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বেশি, তাছাড়া ওই সূর্যালোকের মহিমা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করার জন্যেই যে অন্ধকারের প্রয়োজন এই ধরনের চিন্তার স্তোক সত্ত্বেও দিবসের মন হয়তো ভেঙে পড়ত যদি সদ্য-লব্ধ স্বাধীনতার আনন্দে সে ভরপুর হয়ে না থাকত। ভরপুরই হয়েছিল সে। মশগুল হয়েছিল। পুরাতন বন্ধনের ছিন্নমুখগুলো রক্তাক্ত হয়েছিল তখন, জ্বালা করছিল, অসংখ্য উপলখণ্ড তার আনন্দ-নির্ঝরের পথকে দুর্গম করে তুলছিল, অনিশ্চয়তার গাঢ় কুয়াশায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার নবদিগন্তকে, কিন্তু তবু তার সমস্ত সত্তা গান গাইছিল যেন। উপলখণ্ডের বাধাগুলোই যেন সৃষ্টি করছিল নব নব ছন্দ।

উপর্যুপরি তিন জায়গায় প্রাইভেট ট্যুশনির চেষ্টা করে ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে সে। মধ্যবিত্ত যে ভদ্রলোকটি তাঁর তিনবার ফেল করা ছেলেকে চতুর্থ বার পাশ করিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি চাইলে মাসিক পনর টাকা বেতনের বিনিময়ে (তা আপনি এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা যতক্ষণ পড়িয়ে পারেন আমার আপত্তি নেই, ভদ্রলোকের কথাগুলো তখনও কানে বাজছিল দিবসের) তাঁকে দেখে রাগ হয় না, করুণা হয়। নিজের ছেলেকে দেখবার তাঁর নিজের সময় নেই। কারণ সকালবেলায় আপিসের তাড়া, আপিস থেকে ফিরে নিজেই ট্যুশনি করেন

দু'জায়গায়, ফেরেন রাত্রি দশটায়। তাঁর স্ত্রীর সামর্থ্য বা সময় কোনোটাই নেই। তিনি ব্যস্ত সংসার নিয়ে সম্ভবত। দশটি ছেলেমেয়ে ভদ্রলোকের। যে পনর টাকা তিনি দিবসকে দিতে রাজি হয়েছিলেন সে টাকাটা নিশ্চয়ই ওদের খাদ্য কমিয়েই সংগ্রহ করতে হত ভদ্রলোককে (ঘরের দ্বার দিয়ে যে শীর্ণকান্তি কয়েকটি শিশু উঁকি মারছিল, তাদের মুখগুলো মনে পড়ল আবার) কারণ খাদ্য ছাড়া আর কিছু কমাবার উপায় নেই। বাড়িভাড়া দিতেই হবে, ভদ্রসমাজে চলাফেরা করবার মতো কাপড়ও কিনতেই হবে, লোক-লৌকিকতা বজায় রাখতেই হবে, দরকার হলে প্রাইভেট টিউটার রাখতেই হবে—কমানো যা কেবল খাদ্যটা। কিন্তু খাদ্য কমিয়ে প্রাইভেট টিউটারের মাইনে সংগ্রহ করতে হচ্ছে যাঁকে তাঁর চোখে মুখে একটা লাটসাহেব-সুলভ ভাব ফুটে রয়েছে কেন, দ্বিতীয় যে ব্যক্তিটি (সেই আমহার্স্ট স্ট্রীটের ভদ্রলোক) তার কেমিস্ট্রি-বিদ্যা কতটা জানবার জন্যে তাকে অ্যালকহল, অ্যাসিটোন আর অ্যালহিডাইডের পার্থক্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন (পড়াতে হবে তাঁর ম্যাট্রিক ক্লাসের ভাগ্নেকে, মাইনে মাসে কুড়ি টাকা) কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটু কথা কয়েই যাঁর নিজের বিদ্যা প্রকট হয়ে পড়ল শোচনীয়রূপে তাঁর চোখে মুখেই বা অমন সবজান্তাভাব উগ্র হয়ে আছে কেন এবং তিনি প্রাইভেট টিউটার পদপ্রার্থী যুবকমাত্রকেই মূর্খ মনে করেন কেন—এই সব কথাই দিবস ভাবছিল নানাভাবে। তাদের মুখচ্ছবিগুলো যতবারই মনে পড়ছিল তার ততবারই মনে হচ্ছিল ওগুলো মুখ নয় মুখোশ। কোনও বিশেষ প্রয়োজনে হয়তো বহুদিন আগে মুখোশটা পরেছিল ওরা কিন্তু খুলতে ভুলে গেছে। মুখের সঙ্গে মুখোশটা এমন বেমালুম এক হয়ে গেছে যে নিজেরাই ভুলে গেছে যে ওটা মুখোশ। কিন্তু কোন্ প্রয়োজনে পরেছিল ওরা মুখোশটা? চাকরির? দাসত্বের? কতকালের চাকরি, কতকালের দাসত্ব—? সহসা অদ্ভুত একটা ছবি প্রত্যক্ষ করে চমকে গেল সে। ওই মুখ দুটোকে মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলেছে যেন লক্ষ লক্ষ পা—আর্য—শক হুন দল পাঠান মোগল—ইংরেজ—। সুন্দর মুখ দুটোকে মাড়িয়ে মাড়িয়ে দুমড়ে দিয়েছে, এখন মনে হচ্ছে মুখোশ। কিন্তু ওই মুখোশ ভেদ করে তাদের আসল জৈবিক সত্তাটাও আত্মপ্রকাশ করছিল (সে সত্তাটাকে বাঁচাবার জন্যে মুখকে মুখোশ করছে তারা) সেটাকে কিছুতেই লুকোতে পারছিল না কেউ—"ছেলেটি দেখতে ভালো, লেখাপড়াও জানে, উপাধি কিন্তু বলছে চৌধুরী, চৌধুরী উপাধি অনেক জাতেরই হয়" পাশেব ঘরের নিম্নকণ্ঠের যে আলাপটা শুনে ফেলেছিল দিবস সেইটেই আবার বেজে উঠল কানে। "কমলির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব? কিন্তু তার আগে ওর জাতটা কি জেনে নেওয়া উচিত"—তৃতীয় যে স্থান থেকে চলে আসতে হয়েছিল দিবসকে—যারা দিবসের জাত জানতে চায় (কোষ্ঠি এবং ব্যাংকের খবরও জানতে চাইত যারা নিশ্চয় কিছুদিন পরে)—যারা তাদের যুবতী কন্যাকে রবীন্দ্র-সাহিত্যে পারদর্শিনী করবার জন্যে দিবসকে প্রাইভেট টিউটার রাখতে চেয়েছিল মাসিক কুড়ি টাকা মাইনে দিয়ে—তাদের জৈবিক সত্তাটা যে মুখোশের তলায় আত্মগোপন করেও ব্যর্থকাম হচ্ছিল বারংবার সেই মুখোশটার বিচিত্র চেহারাটার কথাই ভাবতে ভাবতে পথ চলতে লাগল দিবস। তারা সমাজের (যা, দিবসের মতে, জুতোর মতো বারংবার বদলানো দরকার) সব রকম নিয়ম বাঁচিয়ে সমাজবিধি লঙ্ঘন করতে চায়, কন্যাকে অসূর্যম্পশ্যা রেখেও টোপ স্বরূপ ব্যবহার করতে চায় এবং ধৃত মৎস্যটির কুল কোষ্ঠিবংশ সঙ্গতি বিচার করতে চায়। কোন 'কন্‌কেভ্' দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে

সমস্ত জাতটাকে এমন বীভৎস দেখাচ্ছে, কোথায় সে আয়নাটা সেইটেকেই চুরমার করে ফেলা উচিত আগে। যে বীভৎস ছবিগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো ছবি নয় প্রতিচ্ছবি, বিকৃত প্রতিচ্ছবি, যে ছবিগুলো আড়ালে আছে সেগুলো সুন্দর, অতি সুন্দর—মহৎ, শিল্পী, স্নেহশীল, স্বাতন্ত্র্যকামী, স্পষ্টবাদী, সাহসী, প্রতিভাধর বাঙালী নর-নারীর একটা মিছিল ফুটে উঠল তার মানসপটে—হ্যাঁ, ওই বাঁকাচোরা আয়নাটাকে, ওই ঝুটো-আত্মসম্মানের দর্পণটাকে সরিয়ে দিতে হবে, যে আত্মসম্মানের ভিত্তি আত্মপ্রত্যয় নয় আত্মবঞ্চনা, অবলুপ্ত করতে হবে সেটাকে, যুবতী মেয়েকে কাছে ভিড়িয়ে দিয়ে—হঠাৎ দিবসের মনে হল এই ভালোলাগাটা, মানে যুবতী মেয়েকে ভালো লাগাটা, কিছু অন্যায় নয় তো, জীবনে সব কিছু ভালো লাগুক, সব কিছু মধুময় হয়ে উঠুক, এইতো আমরা চাই, ভালো-লাগাই তো আনন্দ (যে রঙ্গনাকে দেখে হঠাৎ ভালো লেগে যাবে তার সে যদিও তখন কল্পনার বাইরে ছিল তবু সে মনে মনে কল্পনা করে চলেছিল যেন একটি তরুণীকে তার ভালো লেগেছে, তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না; কিন্তু তবু তাকে ভালো লাগছে), ওই রবীন্দ্র সাহিত্যানুরাগিণী মেয়েটিকে যদি তার ভালো লাগত কি ক্ষতি হত তাতে, সমস্ত মনটা বিষিয়ে উঠল কেন তার, পালিয়ে এল কেন, তখনই মনে হল তৃতীয় পক্ষের ভণ্ডামির জন্যেই খারাপ লাগল, ওই তৃতীয় পক্ষ মনে মনে চায় মেয়েটিকে তার ভালো লাগুক কিন্তু সত্যি সত্যি ভালো লেগে গেলে ওরাই ছদ্ম আতঙ্কে চিৎকার করবে সবচেয়ে বেশি এবং তারপর ভান করবে যেন সর্বনাশ হয়ে গেছে এবং সর্বশেষে দাবি করবে বিবাহ-মন্ত্রপূত করে এই অশুদ্ধ ব্যাপারটাকে শুদ্ধ করে না দিলে এমন একটা কাণ্ড করবে তারা—ওটা ফাঁদ, ওটা ষড়যন্ত্র তাই পালিয়ে আসতে হয়েছে, এবং পালিয়ে আসতে হয়েছে বলে দুঃখ হচ্ছে, কমলির সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে বলে ততটা নয় (কমলির সান্নিধ্যলাভের লোভ তার একেবারে ছিল না যে তা নয়) যতটা কমলির বাপের মতলবের পরিচয় পেয়ে— দোমড়ানো, তোবড়ানো, পাক-খাওয়া কি অদ্ভুত মন! কিন্তু আসলে ওটা ওরকম নয় মোটেই, নানারকম চাপে ওই রকম হয়ে গেছে— যে চাপে সাপ গর্তে ঢুকে পড়ে কিংবা ফণা ধরে, খরগোশ ঝোপে আত্মগোপন করে কিংবা পালায়.... বহুবিধ জীবজন্তু পক্ষী-পতঙ্গ গাছপালার বিচিত্র ছদ্মবেশের কথা মনে পড়ে গেল তার, আত্মরক্ষার কত বিবিধ আয়োজন জীব-জগতে। সকলের হাত থেকে দুর্বল আত্মরক্ষা করছে যে উপায়ে, (সে উপায়গুলো কখনও মনোহর কখনও ভীষণ), সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকেও কি সেই উপায়ে আত্মরক্ষা করতে হবে? যে মানুষ এত বিভিন্ন রকমে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করেছে (দিনকে রাত রাতকে দিন করেছে, ঘুচিয়েছে দূরত্বের বাধা, সময়ের শাসন, বাড়িয়েছে দৃষ্টির সীমা শ্রবণ-শক্তির পরিধি, সংযত করেছে নিজেকে নানা অস্বাভাবিক উপায়ে) সেই মানুষদের মধ্যেও সবল দুর্বলের বিভেদ ঘুচবে না এখনও? এখনও চলবে সেই নিষ্ঠুর আদিম দ্বন্দ্ব? শ্রেষ্ঠ মানব মনীষা এখনও দুর্বল-দলনেই ব্যস্ত থাকবে? নিউক্লিয়ার এনার্জির সার্থকতা হবে অ্যাটম বমে? আগুন দিয়ে মানুষ ঘর পোড়াবে এখনও? হঠাৎ বাবার মুখটা মনে পড়ল। বাবাও ওই দলে। তিনিও তাঁর সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি ব্যবহার করছেন সবলদের বলবৃদ্ধি করবার জন্যে। দুর্বলের তিনি কেউ নন—হঠাৎ দিবস আশ্চর্য হয়ে গেল। আশ্চর্য হয়ে গেল নিজের মনের দিকে চেয়ে। তাঁর উপর রাগ হচ্ছে না তো! বরং ....। কিছুদিন পরে যে তর্কটা সে বাবার সঙ্গে করবে তারই মহলা দিতে দিতে পথ

চলতে লাগল সে। বাবার সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করাবর একটা দুর্দম আকাঙ্ক্ষা টানতে লাগল তাকে বাড়ির দিকে। কিন্তু না, এখন নয়, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, স্বকীয় উপার্জনের পন্থা একটা ঠিক করে তবে সে দেখা করবে বাবার সঙ্গে। এখন নয়.....।

ভজন গানটা শুনেই যে সে দাঁড়িয়ে পড়ল তা নয়। যে লোকটা পিছু ফিরে বসেছিল পিছন থেকে সে দেখতে ঠিক ব্রজর মতো। ভালো করে চেয়ে দেখলে জুতোর কারখানা একটা। যারা কাজ করছে তারা সবাই অবাঙালী। সেই বা জুতো তৈরি করতে পারবে না কেন? টলস্টয়ের মতো লোক তো জুতো তৈরি করতেন।

"এখানে কোনও কাজ খালি আছে কি?"

"কৌন কাজ?"

"তোমরা যে কাজ করছ।"

"বাবু ভেইয়া ইসব কাজ শেকবে কি?"

"দিয়েই দেখ না, ঠিক পারব।"

যে লোকটা পিছন থেকে ব্রজর মতো দেখতে সে কাঁচি দিয়ে চামড়া কাটছিল, তার মুখে একটা ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ হাসি ফুটে উঠল। কিছু বললে না সে, চামড়াই কাটতে লাগল। ভদ্রভাবে উত্তর দিলে আর একটি লোক।

"কাম নেহি খালি হ্যায় বাবু।"

দোকান থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেবে আসতে হল দিবসকে ফুটপাথের উপর। টলস্টয়ের আদর্শ অনুসরণ করবার কোনও সুযোগ পাওয়া গেল না আপাতত। যে লোকটা পিছন থেকে ব্রজর মতো দেখতে সে যে অর্ধস্বগোতোক্তিটা করলে তা শুধু যে দিবসের কান এড়াল না তা নয় মনে হল উক্তি তার কান মলে দিলে যেন।

"শৌখিন ধোতি পাঞ্জাবি পহিনকে ইসব কাম নেহি হোতা হ্যায়".... সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দিলে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সে হাঁটতে লাগল। মনে হল কেউ যেন ঠেলছে তাকে, গলাধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে যাচ্ছে, দূর করে দিচ্ছে যেন কর্মজগত থেকে, বলছে যেন ওরে ফোতো বাবু, কলম পিষতে পিষতে মুখে রাজা উজির মার গিয়ে, এসব তুই পারবি না—!

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ সে দেখতে পেলে একটা কুলি আর একটা কুলির মাথায় মোট চড়িয়ে দিচ্ছে একটা। মোটটা কিন্তু এত ভারী যে একলা চড়িয়ে দিতে পারছে না সে, দিবস ছুটে গেল তাকে সাহায্য করতে, আগ্রহ ভরে ছুটে গেল (না ছুটে গেলে যেন তার আত্মসম্মান আহত হচ্ছিল) কুলিটা কিন্তু তার সাহায্য নিতে চাইলে না। সে সাহায্য করতে চেয়েছে বলে কুলিটার চোখে মুখে একটা কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটে উঠল যদিও, কিন্তু দিবসের মনে হল একটু অবজ্ঞাও যেন প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তার মধ্যে। 'আপ ছোড় দিজিয়ে বাবু'—এই কথাগুলোর মধ্যেই একটু খোঁচা ছিল যেন।

—ল্যাম্প-পোস্টে-সাঁটা কাগজের টুকরোটা দেখতে পেয়ে ধরবার ছোঁবার মতো কিছু পেলে যেন একটা সে অনেকক্ষণ পরে। এতক্ষণ সে হাঁটছিল কেবল।—

"ফেরিওয়ালা চাই। খাবার ফেরি করিতে হইবে। বিশ্বাসযোগ্য লোক নিম্নলিখিত ঠিকানায় খোঁজ করিতে পারেন।"

ঠিকানাটা টুকে নিয়ে আবার সে হাঁটতে লাগল। একটা উৎসাহ পেল যেন সে আবার। অতি তুচ্ছ জিনিসের জন্যও ছেলেবেলায় তার যে উৎসাহ যে আগ্রহ জাগত (একটা ছোট হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশি পাওয়ার জন্য সে চেতলা পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিল একবার, একটা কুকুর বাচ্চা আনবার জন্য হাওড়ার পুল পার হয়ে চলে গিয়েছিল ছেলেবেলার যখন সে স্কুলে পড়ে) সেই ধরনের একটা উদ্দীপনা জাগল তার ওই বিজ্ঞাপনটা দেখে। মনে হল ওই বিশেষ কাজটা পেলে সে যেন চরিতার্থ হয়ে যাবে। পেতেই হবে ওটা।.....

...খাবারের দোকান। বেশ বড় দোকান। সামনেই যে ছোকরাটি বসে আছে সেও যেন মনুষ্যাকৃতি পানতোয়া একটি। কালো গোছের রং, গোলগাল, হৃষ্টপুষ্ট। বাঁহাতে একটি সোনার তাবিজ, গলায় একটি সোনার সরু হার। মুখটি কচি, গোঁফ দাড়ি ওঠেনি। ভিতরের দিকে চৌকিতে বসে আছে একটি ক্ষীণকান্তি বৃদ্ধ। বৃদ্ধ হলেও শৌখিন। আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে, পাকাচুলে তেড়িকাটা।

"এইটেই কি পঁচিশ নম্বর"—দিবস জিগ্যেস করলে। একটু ভয়ে ভয়েই জিগ্যেস করলে। পরীক্ষার 'হলে' ঢুকে যে ধরনের ভয় করত সেই ধরনের একটা অনির্দিষ্ট ভয় করতে লাগল তার।

"কি চাই আপনার"—ছোকরাটাই উত্তর দিলে।

"রাস্তায় আসতে আসতে দেখলাম আপনারা একটা ফেরিওলার বিজ্ঞাপন দিয়েছেন—"

"হ্যাঁ, আছে কেউ জানাশোনা আপনার?"

"আমাকেই রাখুন।"

ছোকরার বর্তুলাকৃতি মুখ আরও বর্তুলাকৃতি হয়ে গেল। কোনও ছাগল এসে নিজমুখে যব মাড়বার প্রস্তাব করলেও এত বিস্মিত হত না সে।

"আপনাকে!"

"হ্যাঁ, আমাকে। দিয়েই দেখুন না।"

দিবসের কণ্ঠস্বরে যে আন্তরিকতার সুর ধ্বনিত হল, যে সুর ধ্বনিত হয়েছিল ক্ষুদিরাম কানাইলালের কণ্ঠে, যে সুর বেজেছিল নেতাজির উদাত্ত বাণীতে, বস্তুত প্রেরণা-প্রবুদ্ধ বাঙালীর কণ্ঠস্বরে যে সুর বেজেছে যুগে যুগে, সে সুরের মর্ম কিন্তু খাবারের দোকানদার বুঝলেন না। আদ্দির পাঞ্জাবি-পরা ক্ষীণক্ষান্তি বৃদ্ধ খেঁকিয়ে উঠলেন।

"না মশাই, মাপ করবেন ভদ্রলোকের ছেলেকে ও কাজ আমরা দিতে পারব না।"

"একবার দিয়েই দেখুন না।"

দিবসের কণ্ঠস্বরের আকুলতাটা ন্যাকামি বলে ঠেকল বৃদ্ধের কানে। যে কারণে ঠেকল সেইটেই উল্লেখ করলেন তিনি এর পর।

"না মশাই, একবার দিয়ে শিক্ষা হয়ে গেছে। গরিব বাঙালী বলে ভদ্রচেহারার এক ছোকরাকে রেখেছিলাম একবার। নগদ পঁচিশটি টাকা মেরে সরে পড়েছে। পরাতটা পর্যন্ত ফেরত দেয়নি, সেই থেকে নাক কান মলেছি, আর নয়।"

সত্যি সত্যি তিনি নিজের নাক কান মলে কার উদ্দেশে নমস্কার করলেন যেন। এবং তারপর বক্তব্য শেষ করলেন এই কথাগুলি দিয়ে—"আমাদের ওই ছোট লোকই ভালো।"

বিজ্ঞানের ছাত্র দিবস নিঃসংশয়ে অনুভব করলে যে কথাটা সত্য। অনবধানতাবশত কপাটের চৌকাটে মাথাটা সজোরে ঠুকে গেলে মনের যে রকম অবস্থা হয় দিবসের ঠিক তাই হল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে ক্ষণকাল, তারপর মনে হল, এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা অশোভন হচ্ছে, মনে হতেই সরে দাঁড়াল একটু। সরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল কি করবে এখন। হঠাৎ, কানে গেল সেই বৃদ্ধ বলছেন।—"পাঞ্জাবি উড়িয়ে তেড়ি কেটে ফেরিওয়ালাগিরি করতে এসেছেন। মতবলববাজ চোর সব!"—শোনা মাত্রই মনে হল এটা সত্য নয়, এর প্রতিবাদ করা উচিত। দোকানের সামনে ফিরে এল সে আবার। চৌকাটে সজোর মাথা ঠুকে গিয়েছিল বলেই সম্ভবত প্রতিবাদটা একটু ঝাঁঝালো গোছের হয়ে গেল।

"একজন হয়তো আপনাকে ঠকিয়েছে, কিন্তু সবাইকে ওই দলে ফেলবেন না। আপনিও তো পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে তেড়ি কেটে বসে আছেন, আপনি কি চোর?"

মোটা ছোকরা ক্ষেপে উঠল।

"মুখ সামলে কথা বলবেন মশাই।"

"আরে যেতে দাও যেতে দাও"—চেঁচিয়ে উঠলেন সেই ক্ষীণকান্তি বৃদ্ধই আবার (তাঁর গলার স্বর মোটেই ক্ষীণ নয়, অপ্রত্যাশিত রকম তীক্ষ্ণ বরং) দিবসের দিকে ফিরে বললেন— "আর কিছু কি বলবার আছে আপনার, না থাকে তো পথ দেখুন"—তর্জনি দিয়ে পথটা দেখিয়ে দিলেন।

তীক্ষ্ণ তীব্র তিক্ত সত্যটাকে নানাভাবে অনুধাবন করতে করতে পথ চলতে লাগল দিবস আবার। যে প্রচণ্ড হাতুড়িগুলো তার অহঙ্কারের জগদ্দল পাথরটার গায়ে ফাটল সৃষ্টি করেছিল সেই হাতুড়িগুলো যে সত্য, তার অহঙ্কারের পাথরটা যে চুরমার হয়ে যাওয়াই উচিত (নিজেই একটু আগে সে এই কথাই ভাবছিল) এ কথা মেনে নিয়েও তার মনে হচ্ছিল, না তবু প্রতিবাদ করা উচিত, কিন্তু ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না।

...রঙ্গনা কিন্তু ভাষা খুঁজে পেয়েছিল। সে তার কোণের ঘরটিতে বসে বসে চিঠি লিখছিল একজন আধুনিক লেখককে। যে কোণের ঘরটি চুনীলাল তাকে পড়াশোনা করবার জন্য দিয়েছিল, সেই কোণের ঘরে বসেই সে পরিচয় লাভ করেছিল বৃহৎ বিশ্বের, স্বদেশ বিদেশের বহু লেখক ভিড় করে আসত যেত ওই কোণের ঘরটাতেই। বর্তমান অগ্রগতির যুগে তার স্থান যে কত পিছনে, কত রকম শৃঙ্খল যে তার হাতে পায়ে মনে জড়ানো, উপার্জনের জন্য ব্যতিব্যস্ত তার মামার সদাশংকিত মুখভাবে সপ্রতিভতা ফুটিয়ে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা, নিরতিশয় ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তাঁর মামীমার প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্বের শোচনীয় মৃত্যু এ সবই সে অনুভব করত তার ওই কোণের ঘরটিতে বসে। ওইখানে বসেই সে বুঝত যে তার চারিদিকেও জাল-ফেলা হচ্ছে, তার বাবা কাশী থেকে এসেছেন ওই জন্যই, সেদিন হঠাৎ একজন ফটোগ্রাফার এসে ফোটো তুললেন তারও কারণ ওই, বাবা ঋণ করেছেন, সবই শুনেছে সে এই কোণের ঘরে বসে বসে এবং এই কোণের ঘরে বসে বসেই সে অনবরত মনে মনে রচনা করেছে প্রতিবাদ। এই কোণের ঘরেই সে অনেক স্বপ্ন দেখেছে, অনেক কান্না কেঁদেছে।

সেদিন হঠাৎ সে ভাষা খুঁজে পেয়েছিল।

লিখছিল—"আপনার আঁকা কুসুমের ছবি অতি বাস্তব। এত বাস্তব যে অপমানিত বোধ

করেছি। কুসুমকে দেখে মনে হয়েছিল ও বোধ হয় আমিই। আমাকেই বোধ হয় আপনি এঁকেছেন, আমাকে দেখেছেন আপনার কল্পনার দূরবীন লাগিয়ে। তাই আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে। মনে হয়েছে আমাদের জন্যে যাদের বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই, কণামাত্র সহানুভূতি নেই, যাঁরা আত্মতৃপ্তি সাধনের জন্য ছবি এঁকে চলেছেন কেবল, কি অধিকার আছে তাঁদের আমাদের এই নগ্ন মূর্তিকে লোকের কাছে বার করবার! আমাদের হ্যাংলামি, আমাদের ছলনা, আমাদের নীচতা, আমাদের দুর্বলতা আমাদেরই থাক, তা নিয়ে আপনাদের মাথা ঘামাতে হবে না! সত্যি কথা বলতে কি মাথা আপনারা ঘামানও না। লিখতে পারেন লিখে যাচ্ছেন। সত্যি সত্যি আমাদের জন্য ব্যথা অনুভব করে যদি সমাজ সংস্কারের আন্দোলন চালাতেন প্রণাম জানাতাম আপনাকে। সেদিন শুনলাম একজন লেখক (যাঁর লেখায় স্ত্রীজাতির প্রতি দরদ জবজব করে) তাঁর স্ত্রীকে ধরে মারেন না কি। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর তিনি না কি বিরোধী। আমাদের সমাজে কুসুমরা আছে, খুব ভালো করেই জানি। আমি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, নিজেকে চিনি, নিজের চারিদিকে দেখিও, আমি জানি কি অবস্থা আমাদের। জীবনে কোনও আনন্দ নেই, সৌন্দর্য নেই, আশা নেই, নিজেদের যে কি অবস্থা তা বোঝাবার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই। শুধু গ্রাসাচ্ছাদনটুকুর জন্য কি আপনার লাঞ্ছনা গঞ্জনা যে আমরা সহ্য করি। ওইটুকু পাবার জন্যই হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছি সারি সারি ঘরে ঘরে। নিজেদের অবস্থাটা যে কি তাতো কাউকে বোঝাবার ক্ষমতা নেই, বোঝাতে গেলেও কেউ বুঝতে চায় না। চুপ করে থাকে, অনেক সময় হাসে টিটকারিও দেয়। নিজেদের দুরবস্থার কথা শুনতে চায় না, তাদের এ দুরবস্থা যে কখনও ঘুচবে এ বিশ্বাসও তাদের নেই। মানুষকে বিশ্বাস করতে তারা ভুলে গেছে। তারা বিশ্বাস করে কেবল তাদের হ্লাদিনী শক্তির উপর, যা ভাঙিয়ে তাদের এতকাল চলেছে। আপনার লেখায় একটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের সুর ফুটে উঠেছে। আমার কিন্তু ও নিয়ে ব্যঙ্গ করতে ভালো লাগে না, ওদের উপর রাগও করতে পারি না। আমি জানি আমরা একদিন জাগব। আমাদের মনুষ্যত্ব মরেনি, সেটা চাপা পড়ে গেছে শুধু। সমাজের কুৎসিত নিয়ম, নানা রকম কুসংস্কার, মেয়েদের প্রতি সম্মান দেখানোর ছলে প্রতিপদে তাদের অপমান এ সব অতিক্রম করে আমরা একদিন জাগব। যেদিন জাগব সেদিন হয়তো সুস্থ মনে আপনাদের—যাঁরা আমাদের ক্ষতের উপর লাথি মেরে মেরে আমাদের সচেতন করেছেন ক্ষমা করতে পারব। লর্ড কার্জনকে পরাধীন ভারত যেমন ক্ষমা করতে পারেনি আমরাও তেমনি আজ আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করতে পারলাম না।" ভ্রূকুঞ্চিত করে লিখে চলেছিল রঙ্গনা, তার অধর স্ফুরিত হচ্ছিল।

—দিবস হাঁটছিল। ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল খুব। পাশের গলি থেকে একটা রিক্‌শ বেরুল।

"এই রিক্‌শ—"

রিক্‌শওয়ালা এগিয়ে এল তার দিকে।

"কাঁহা যানে হোগা হুজুর?"

"সোজা চিৎপুরের দিকে।"

দিবস রিক্‌শয় উঠে বসল। রিক্‌শ চলতে লাগল। এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে একটা কাজ জোগাড় করতে পারেনি সে। কাজ কিন্তু জোগাড় করতে হবে। যে কটা টাকা আছে তাতে কদিন চলবে? রিক্‌শ টানলে কেমন হয়।

"আচ্ছা, রোজ কত করে বাঁচে তোমার?" রিক্‌শওয়ালাটাকে জিগ্যেস করলে সে হঠাৎ।

"উসকা কই ঠিকানা নেহি হুজুর তিন রুপিয়া, চার রুপিয়া।"

"আমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারিস?"

"কোন কাজ?"

"রিক্‌শ টানার।"

রিক্‌শওয়ালা ঘাড় ফিরিয়ে হাস্যোদ্ভাসিত মুখে দিবসের দিকে চেয়ে দেখলে একবার। মনে করলে বাবু রসিকতা করছেন বোধ হয়।

"ই সব কাম বাবু ভেইয়াকো বাস্তে নেহি হুজুর। আপ নেহি সেকিয়ে গা—"

দিবস নেবে পড়ল রিক্‌শ থেকে। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বিদায় করে দিলে তাকে। আবার হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে অদ্ভুত সব কথা মনে হতে লাগল তার। মনে হতে লাগল সত্যিই যখন টাকাগুলো ফুরিয়ে যাবে, যখন খাবার কেনবার পয়সা থাকবে না একটিও, তখনও যদি কাজ না পাওয়া যায় একটা, নিশ্চয়ই সে বাড়ি ফিরে যাবে না, কি করবে তাহলে? পণ নিয়ে বিয়ে করবে? হাসি পেল হঠাৎ। তার মতো নিঃস্বকে কন্যা সম্প্রদান করবে কে! কিন্তু যদি করত বেশ হত! স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে রোজগার করা যেত। বিয়ে করা বিষয়ে তার মত খুব বৈজ্ঞানিক। অল্প বয়সে বিবাহ করার পক্ষপাতি সে। তার ধারণা আজকাল ছেলে মেয়েরা বিবাহের দায়িত্বট' এড়িয়ে চলতে চাইছে বলেই আরও বেশি দায়িত্বহীন হয়ে পড়েছে। গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে চায় সবাই রঙিন বেলুনের মতো। তার মতে পৃথিবীর সব জিনিসই যেমন স্ব স্ব স্থান থেকে সুস্থ আছে মাধ্যাকর্ষণের টানে এবং হাওয়ার চাপে—সমাজের প্রত্যেক লোকও তেমনি ঠিক থাকে পারিবারিক আকর্ষণে এবং সামাজিক নিয়মের চাপে। আমাদের যুগটা যে বেঠিক পথে চলেছে তার কারণ পরিবার পালনের দায়িত্ব নিতে চায় না কেউ, সামাজিক নিয়ম অমান্য করবার দিকেই সকলের ঝোঁক বেশি। সামাজিক অনেক নিয়ম বদলানো প্রয়োজন, কিন্তু সেই পরিবর্তিত নিয়মও মানতে হবে। "আমি যা খুশি করব" অর্থাৎ তেমন কিছুই করব না, স্রোতে গা ভাসিয়ে থাকব কেবল, এই মনোভাব পছন্দ নয় দিবসের। পছন্দমতো পাত্রী পেলে সে বিয়ে করতে প্রস্তুত এখনই, এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও—প্রধান মন্ত্রীকে চিঠি লিখবে একটা? বেশি কিছু নয়, কেবল—আমি এম-এস-সি পাশ করেছি; পরিশ্রম করতে প্রস্তুত আছি, মানুষের মতো বাঁচতে চাই, আমাকে একটা কাজ দিন, যে কোনো কাজ—তখনই মনে হল চিঠিটা তাঁর হাতে পৌঁছবেও না বোধ হয়, তাঁর সেক্রেটারী ভুরু কুঁচকে বা মৃদু হেসে ছিঁড়ে ফেলে দেবে সেটা ওয়েস্ট পেপার বাসকেটে— চিঠি লেখার কথায় আর একটা কথা মনে পড়ে গেল তার—পরেশ তাকে যে ঠিকানাগুলো দিয়ে গিয়েছিল তার সব জায়গায় যাওয়া হয়নি, যাবার ইচ্ছেও নেই, সে ভেবেছে প্রত্যেক জায়গায় নিজের পরিচয় এবং ঠিকানা দিয়ে এক একটা চিঠি ফেলে দেবে, যদি কোথাও লেগে যায়—সামনে একটা পোস্টাফিসও পেয়ে গেল, এক গোছা পোস্টকার্ড কিনে একের পর এক চিঠি লিখে যেতে লাগল সে পোস্টাফিসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই..... চিঠি লেখা শেষ করে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে চা খেলে.... চা খেতে খেতে মনে হল কয়েকটা জিনিস কেনা হয়নি এখনও—হাঁসের জন্য ধান কিনতে হবে লণ্ঠন কিনতে হবে, একটা, লণ্ঠন কিনলে আবার কেরোসিন চাই কিন্তু (চমৎকার শেড-দেওয়া তার

ইলেকট্রিক টেবিল ল্যাম্পটার কথা মনে পড়াতে মন-কেমন করে উঠল একটু), কেরোসিন কিনতে হলে বোতল চাই, পারমিট চাই, না, দরকার নেই লণ্ঠনে, মোমবাতি কিনলেই হবে, কিন্তু মোমবাতিতে খরচ যে অসম্ভব, কারণ তাকে পড়তেই হবে, না পড়লে ঘুম হবে না রাত্রে, হয়তো গোটা দুই মোমবাতি লাগবে রোজ, তা লাগুক মোমবাতিই কিনতে হবে (এই মোমবাতির জন্যে যে সৌদামিনীর কাছে তাকে বকুনি খেতে হবে পরে এবং সেই বকুনি যে তার স্নেহবন্ধনে আর একটা গ্রন্থি যোজনা করবে এ তার স্বপ্নাতীত ছিল তখন। সামনেই একটা মনোহরি দোকানে দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল সেদিকে সে—যেতে যেতে হঠাৎ মনে হল বই কিনতে হবে একটা, সরোদও—এ দুটো জিনিস অবিলম্বে কিনে ফেলা দরকার আগে—মনে পড়ল, কিরণের কথা, বই এবং সরোদের সঙ্গে কিরণ যে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—কিন্তু না, আগে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে তাকে, তার আগে সে কারও সঙ্গে দেখা করবে না, উলঙ্গ অবস্থায় ঘরের বাইরে যাবার প্রস্তাবে স্বাভাবিক মানুষের মন যেরূপ সংকুচিত হয় তারও অনেকটা তেমনি হল যেন। বিবিধ তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত তরণীর মতো ভেসে চলেছিল তার মন চিন্তার তরঙ্গে, কিন্তু পালে লেগেছিল আনন্দের হাওয়া অজানা সাগরের উদ্দেশে উড়ে চলেছিল মন চাঁদসদাগরের ময়ূরপঙ্খীর মতো—কিছুদূর গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল সে মুগ্ধ হয়ে কতগুলো পাখি দেখে, একটা পাখিওয়ালা খাঁচায় করে পাখি বিক্রি করছে, কি সুন্দর পাখিগুলো, কি চমৎকার গায়ের রং! তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। খানিকক্ষণের জন্যে ভুলে গেল সব। সমস্ত ভুলে তন্ময় হয়ে যাবার অসাধারণ শক্তিই যে তার আসল শক্তি। এই শক্তিই যে তাকে ঘরছাড়া করেছে, এ খবর নিজেও জানত না সে বোধ হয়। সুন্দর কিছু দেখলেই তার মনের ভিতরের কৌতূহলী শিশু আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে সেটার দিকে, আগ্রহ না মেটা পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারে না সেটাকে, দরকার হলে তার পিছু পিছুও যায় স্থান কাল পাত্র সব বিস্মিত হয়ে। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল এই জন্যই, একটা সুন্দর আদর্শকে অনুসরণ করে।—পাখিগুলোকে সে ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে, বিলিতি পাখি, 'গোল্‌ড্ ফিনচ', কি সুন্দর ডানাগুলো, মনে হচ্ছে এক একটা প্রজাপতি যেন পিঠে চড়ে বসে আছে প্রত্যেক পাখিটার, বিলিতি পাখি যদিও কিন্তু ধান খাচ্ছে.... হঠাৎ উঠে পড়ল সে, মনে পড়ল তাকেও ধান কিনতে হবে হাঁসের জন্য.....

....চুনীলালকে বেগ পেতে হল না বেশি। বিকাশবাবু যে বেহালা বাজান এ খবর সে অন্নদার মুখে শুনেছিল। এসেই বেহালার আওয়াজ কানে ঢোকা মাত্রই তার অঙ্কটা মিলে গেল। সুতরাং নিমেষের মধ্যে সে ঠিক করে ফেললে কি করবে, কি বলবে। এক ঢিলে এতগুলো পাখি মরবে এ আশাই সে করেনি। পাখিগুলো কিন্তু ঢিলের মুখে এক লাইনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াচ্ছে দেখে ভারী আনন্দ হল তার। খবরটা পাঠিয়ে দিয়ে দেওয়ালে বিলম্বিত ম্যাডোনার বিখ্যাত ছবিটির দিকে ভ্রুকুঞ্চিত করে চেয়ে রইল। চুনীলাল ছবিটাকে দেখছিল না (ছবির কিছু বোঝে না সে, র‍্যাফেলের নামও শোনেনি) সে নিজের মনের আনন্দটাকে উপভোগ করছিল। কি করে কথাটা পাড়া যায় এই সমস্যাটা সত্যিই ব্যাকুল করছিল তাকে। অন্নদা যে ভাবে বিকাশবাবুর নাগাল পেয়েছিল সে ভাবে নাগাল পাওয়ার ইচ্ছে মোটেই ছিল না চুনীলালের। কারও থ্রু দিয়ে কোনো কিছু করা পছন্দ করে না সে। জীবনযুদ্ধে নানাভাবে

বিক্ষত হয়ে সে এটুকু বুঝেছে যে লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে লক্ষ্যটাকে উদ্দেশ্য করে সোজা সবেগে দৌড়নই বুদ্ধিমানের কাজে। মাঝখানে থ্রু জাতীয় কিছু থাকলে সেটা 'হার্ডল্ রেস' হয়ে দাঁড়ায়। ওই মধ্যবর্তী ভদ্রলোকগুলি অনেক সময়ই সহায় না হয়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সে সোজাসুজি বিকাশবাবুর সঙ্গেই কথা কইবে ঠিক করে এসেছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কি প্রসঙ্গ নিয়ে যে আলাপ শুরু করবে তা সে ভেবেই পাচ্ছিল না। শুধু আলাপ শুরু করলেই হবে না, আলাপটাকে বাঞ্ছিত পথে চালিয়ে নিয়ে যেতেও হবে। বেহালার সুর শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছিল সে, কিন্তু বেশ ঘাবড়ে গেল বিকাশবাবু যখন এলেন। বিকাশবাবু লোকটিকে সে কল্পনায় যা ভেবেছিল (আমরা সবাই এই কাণ্ড করি, যাকে কখনও দেখিনি, নাম শুনেই কল্পনায় তার একটা চেহারা ঠিক করে ফেলি এবং পরে হতাশ হই) তিনি মোটেই সে রকম নন। চুনীলাল ভেবেছিল রোগা-পাতলা ছিমছাম তরুণ-তরুণ অর্থাৎ নাটকে নভেলে সিনেমায় প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে যে ধরনের চেহারা-ওলা ছোকরারা বিকাশবাবুকেও সেই ধরনের ভেবেছিল সে। কিন্তু যা দেখল তা একেবারে উলটো। লোকটি বেশ বলিষ্ঠ। লম্বা চওড়া গড়ন। পরিধানে প্যান্টালুনের উপর ড্রেসিং গাউন। মুখে পাইপ। চোখ মুখের ব্যঞ্জনায় কোমলতার আভাস মাত্র নেই। ভাব-লেশ হীন মুখ। এই লোকটাই বেহালা বাজাচ্ছিল? এরই ভালো লেগেছে রঙ্গনাকে? আশ্চর্য!

''আপনিই কি চুনীলালবাবু, আমার সঙ্গে দেখা করতে চান?''

''হ্যাঁ, আমিই। বিকাশবাবু আপনারই নাম?''—স্মিতমুখে উঠে দাঁড়াল চুনীলাল।

''হ্যাঁ, কি দরকার বলুন তো?''

''বলছি—বসুন''—চুনীলাল কণ্ঠস্বরে এমন একটা সুর ফুটিয়ে তুললে যেন সে-ই বাড়ির মালিক আর বিকাশবাবু যেন অতিথি। বসবার পর চুনীলালের চোখ মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল হঠাৎ, সে কি একটা যেন চেপে যেতে চাইছিল, কিন্তু পারলে না।

''মাপ করবেন, আগে একটা কথা জিগ্যেস করে নি। এখনই বেহালার যে আওয়াজ শুনছিলাম তা কে বাজাচ্ছিল বলুন তো, অদ্ভুত বাজাচ্ছিল, এই বাড়িরই কেউ কি?''

বিকাশবাবুর ভাবলেশহীন মুখ ভাবলেশহীন রইল না আর। এক ঝলক কুণ্ঠিত হাসির কিরণে তার চেহারা বদলে গেল, ওই এক ঝলক হাসিই যেন তাঁর নিষ্প্রাণ পোশাকী আবরণটাকে সরিয়ে প্রকাশ করে দিলে আসল মানুষটাকে। চুনীলাল আশ্বস্ত হল, তার মনে হল লোকটি ভদ্র, ভালোমানুষ।

''আমিই বাজাচ্ছিলাম।''

এই দুটি কথা বলে আরও যেন কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন বিকাশবাবু। তাঁর কানের পাশটা লাল হয়ে উঠল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল চুনীলাল, তার মনে হল, বাঃ এক টোকাতেই পাহাড় থেকে ঝরনা বেরিয়ে পড়ল যে!

''আপনি? আপনি অমন চমৎকার বেহালা বাজাতে পারেন? একথা শুনলে তো জামাইবাবু আকাশের চাঁদ হাতে পাবেন।''

বিকাশবাবুর মুখভাব আবার একটু কঠিন হয়ে গেল। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন তিনি চুনীলালের দিকে।

বিকাশবাবুকে শুনিয়ে চুনীলাল যেন অর্ধ-স্বগতোক্তি করলে—"হয়ে যদি যায়, মণিকাঞ্চন যোগ হবে।"

"আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা" সবিস্ময়ে এবং ঈষৎ সসংকোচে বিকাশবাবু বললেন।

"খুলেই বলি তাহলে। আমার ভগ্নীপতি হচ্ছে গহনচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়। মস্ত বড় ওস্তাদ একজন। গান বাজনা নিয়েই সারা জীবনটা কাটিয়েছেন। একদম আত্মভোলা লোক। দিদি মারা যাবার পর থেকে আরও আত্মভোলা হয়ে গেছেন। কাশীতেই থাকেন বরাবর, সম্প্রতি এখানে এসেছেন। এসেছেন মানে জোর জবরদস্তি করে আমি আনিয়েছি তাঁকে। তাঁর মেয়েটি—ওই একমাত্র সন্তান তাঁর—আমার কাছে থাকে। এখানে পড়াশোনা করছে। এবার আই-এ দেবে। এইবার কিন্তু বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে তো তার। জামাইবাবুকে চিঠি লিখে তাই আনিয়েছি এবং ভাগনীর ফটো পকেটে নিয়ে পাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছি চারদিকে। আজ সকালেই আপনার খবর পেলাম একজনের কাছে—"

এই পর্যন্ত বলে চুনীলাল পকেট থেকে কাগজে মোড়া ফটোটি বার করে আড়চোখে চাইলে একবার বিকাশের দিকে। বিকাশের মুখভাব আবার কঠিন হয়ে এসেছে দেখে মনে মনে হাসলও একটু। 'গোমড়া মুখ করা বার করছি তোমার থাম না'—এই কথাগুলো মনে মনে আওড়ালও একবার। তারপর নিম্নকণ্ঠে বলল—"আপনার দাদার কাছে না গিয়ে আপনার কাছেই প্রথমে এসেছি তার কারণ আপনি যদি মত দেন তাহলেই নিশ্চিন্ত মনে এগুতে পারি। ফটো দেখে যদি পছন্দ হয় আপনার—কারণ ওইটেই হল প্রধান জিনিস—"

ফটোর মোড়কটি খুলে ফটোটি তুলে ধরলে সে বিকাশবাবুর চোখের সামনে। তার জীবন্মৃত আত্মসম্মান ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করল যদিও দু'একবার কিন্তু তার কোনও আভাস চোখেমুখে ফুটল না। বরং চোখেমুখে যা ফুটল তা প্রত্যাশা।

—ব্যাপারটা প্রত্যাশার অতীত ছিল কিন্তু বিকাশবাবুর কাছে। সত্যিই রঙ্গনাকে ভালো লেগেছিল তাঁর। যদিও আলাপ হয়নি, কিন্তু ভালো লেগেছিল। বিয়েবাড়ির সমস্ত আলো গিয়ে পড়েছিল যে মেয়েটির মুখে, সমস্ত উৎসব ছন্দিত হচ্ছিল যার কলহাস্যে, স্পন্দিত হচ্ছিল যার ভ্রূভঙ্গিতে, যে মেয়েটি তারপর হারিয়ে গিয়েছিল হঠাৎ, যার খোঁজ সে একাধিকবার নেবার চেষ্টা করেছে তার বোনের কাছে এবং নিতে গিয়ে হাস্যাস্পদ হয়েছে—তার ফটো এমন ভাবে দেখবেন বিকাশবাবু সত্যিই আশা করেননি।

কিন্তু চুনীলাল যা আশা করেছিল তা হল না। বিকাশবাবু কোনরকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন না। নির্বাক হয়ে রইলেন শুধু।

....ফুটপাথ দিয়ে হনহন করে হেঁটে আসছিল ঊর্মি গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে। বহুলোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগছিল ভিড়ে, কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করছিল না সে। কাঁধের উপর থেকে মাঝে মাঝে খসে পড়ছিল রঙীন ছাপা শাড়ির আঁচলটা, স্ট্যাপ-ছেঁড়া স্যান্ডালটা বারবার খুলে আসতে চাইছিল পা থেকে, দু'একটা অসভ্য লোকের অশ্লীল দৃষ্টি খোঁচার মতো বিঁধছিল মনে, তবু কিন্তু তার মুখের হাসি নেবেনি, ম্লান হয়নি চোখের দৃষ্টি, কানের পাশের অলকগুচ্ছ নাচছিল ঠিক তেমনি করে। হরিণীর মতো ছুটে চলেছিল সে। চলেছিল কিরণের বাড়ির

উদ্দেশে। দেবার মতো সুসংবাদ ছিল কয়েকটা। প্রথম—একজন সিনেমা ডিরেকটার তাকে ইন্টারভিউ করতে চেয়েছেন। নাচ আর চেহারা যদি পছন্দ হয়—ওঃ তাহলে কি মজাই হবে! দ্বিতীয় সুসংবাদ গহনচাঁদবাবুর মেয়ে রঙ্গনা রাজি হয়েছে কিরণের গানে সুর দিতে। তৃতীয় সুসংবাদ গহনচাঁদবাবুর কথকি নাচ শেখাবেন তাকে, বিশেষ করে ময়ূর নাচটা। তিন তিনটে পালে হাওয়া লেগেছিল। মোড়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি চুষতে চুষতে যে মোটা কালো লোকটা পিঁচুটি-ভরা চোখে মিটমিট করে চাইছিল তার দিকে, সে লোকটাকে দেখতেই পেল না উর্মি। দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল সে।

.... সূর্যকান্তবাবুও কাছারি থেকে ফিরে বেশ দ্রুতবেগেই বাড়ির ভিতর ঢুকলেন। তিনি যদি বুঝতে পারতেন যে বেগটা অশোভন রকম দ্রুত হয়েছে, তাহলে হয়তো নিজের কাছেই অপ্রস্তুত হতেন একটু। কারণ শুধু ব্রজর কাছে নয়, নিজের কাছেও তিনি ধরা পড়তে চাইছিলেন না। মনকে চোখ ঠারছিলেন বললে ঠিক তাঁর মনোভাবটি ব্যক্ত হয় না। কারণ 'ঠারা' কথাটির মধ্যে যে ভণ্ডামির আমেজ আছে তা তাঁর মধ্যে স্পষ্টভাবে ছিল না। যে চেতনা তাঁর গতিবেগকে দ্রুত করে দিচ্ছিল তিনি সে চেতনার সম্বন্ধে সচেতনই ছিলেন না। 'আমি যা করেছি তা ঠিকই করেছি' অহং-স্ফীত এই সত্তাটা আড়াল করে রেখেছিল সেটাকে। তিনি সেটাকে ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন না। দেখতে চাইছিলেনও না। কিন্তু সেটা ছিল এবং তাঁর অজ্ঞাতে তাঁর গতিবেগকে দ্রুততর করে দিচ্ছিল। তিনি ড্রাইভারকে মানা করে দিয়েছিলেন যে তাঁকে কাছারি থেকে আনবার জন্য মোটর নিয়ে যাবার দরকার নেই। আপাতদৃষ্টিতে মানা করবার একটা সঙ্গত কারণও খাড়া করেছিলেন অবশ্য। কাছারি থেকে কখন তিনি ছুটি পাবেন তার স্থিরতা ছিল না কিছু, ড্রাইভারটা অনর্থক অপেক্ষা করবে কেন, তিনি কাজ শেষ হলে 'বাসে' কিংবা 'ট্রামে' ফিরতে পারবেন অনায়াসে। কিন্তু এ রকম পরিস্থিতি তো ইতিপূর্বে আরও অনেকবার ঘটেছে, ড্রাইভারের প্রতি সদয় হয়ে তাকে ছুটি দেবার কথা ইতিপূর্বে কেন মনে পড়েনি একথাটা সূর্যকান্ত চৌধুরী যে ভাবেননি তা নয় (আড়ালে অবস্থিত তাঁর দ্বিতীয় সত্তাটা ইশারায় ইঙ্গিতে সচেতন করেছিল তাঁকে এ সম্বন্ধে, তাছাড়া তিনি বুদ্ধিমান লোকও)—কিন্তু তিনি ভাবতে চাইছিলেন না। কাছারি থেকে ফিরবার পথে ট্রামডিপোতে তিনি যে কিরণের নাগাল পেতে চান এবং সেটা ড্রাইভারের কাছ থেকে গোপন রাখতে চান এই তথ্যটার স্বরূপ উদঘাটন করতে লজ্জা করছিল তার এবং লজ্জা করছিল বলে চটে যাচ্ছিলেন তিনি। নিজের উপরই চটে যাচ্ছিলেন, নিজের দুর্বলতা নিজের কাছেই স্বীকার করতে চাইছিলেন না। অপরে তা জেনে ফেলুক সেটা আরও বেশি করে চাইছিলেন না, সুতরাং তার জন্যে এই যে লুকোচুরি করতে হচ্ছে সেটা সোজাসুজি মানতে বাধছিল তাই তাঁর। তিনি নিজের কাছে, ব্রজের কাছে, ড্রাইভারের কাছে, গোবিন্দ সাণ্ডেলের কাছে, বস্তুত সকলের কাছেই এই কথাটা জাহির করে রাখতে চাইছিলেন যে তিনি যা করেছেন তা দিবসের ভালোর জন্যেই করেছেন, দিবস যদি তাঁর অবাধ্য হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, যাক, তার জন্যে বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই তাঁর, কর্তব্যের খাতিরে যতটুকু খোঁজখবর করা দরকার ততটুকুই কেবল তিনি করবেন, রাস্তায় রাস্তায় হাহাকার করে বেড়াবেন না। তিনি যদিও উপরোক্ত মর্মে কারও কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হননি, তবু তাঁর মনে হচ্ছিল যে ওই ধরনের

একটা বেপরোয়া কর্তব্যপরায়ণতা আস্ফালন করতে না পারলে পাঁচজনের কাছে (বিশেষত প্রিয়বন্ধু গোবিন্দ সাণ্ডেলের কাছে যিনি ইংরেজি ভাষায় উপদেশ দিয়েছিলেন 'সিট অন্ হিম') তিনি খেলো হয়ে যাবেন। কিন্তু তাঁর গোপন সত্তাটা দমকা হাওয়ার মতো এসে বেসামাল করে দিচ্ছিল তাঁকে যেন—তার কেতাদুরস্ত বাইরের পোশাকটাকে বিস্রস্ত করে ফেলছিল, উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল যেন মাথার টুপিটা টাকটাকে অনাবৃত করে—চটে যাচ্ছিলেন তিনি। ট্রাম ডিপোতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কিরণের যখন নাগাল পেলেন না, কিরণ কখন 'ডিউটি'তে আসবে সে খবরও যখন পেলেন না কারও কাছ থেকে (আজকাল সবাই এমন আত্মকেন্দ্রিক যে তাঁর কথা ভালো করে শুনলেই না অনেকে, যাঁরা শুনলে তারা দায়সারা গোছ উত্তর দিয়ে দিলে) তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন তিনি খানিকক্ষণের জন্য। কিরণের বাসার ঠিকানা তো জানা নেই তাঁর। সে মাঝে মাঝে বাড়িতে আসত যেত, সে দিবসের বন্ধু, দিবস তারই উৎসাহে তার কাছ থেকে সরোদ বাজানো শিখেছে, এই সবই তিনি জানতেন। এর বেশি যে আর কিছু জানা দরকার একথা একবারও মনে হয়নি তাঁর। কত লোকের সঙ্গেই তো রোজ দেখা হয়, কত লোকের সঙ্গে হৃদ্যতাও আছে কিন্তু তাদের বাসার ঠিকানা তো জানেন না তিনি। হঠাৎ তাঁর মনে হল দিবস হয়তো ফিরেছে এতক্ষণ। তিনি বৃথাই হয়তো সময় নষ্ট করছেন এখানে। মনে হওয়ামাত্রই তিনি ট্রাম ডিপো থেকে বেরিয়ে এলেন এবং একটি ট্যাক্সি ডেকে বাড়ি ফিরলেন। ট্যাক্সিটাকে বাড়ির সামনে পর্যন্ত নিয়ে গেলেন না, কারণ এ ধরনের অপব্যয় করতে দেখলে ব্রজ বাড়ি মাথায় করবে, ট্যাক্সিটাকে মোড়ের সামনে দাঁড় করিয়ে বাকি রাস্তাটুকু হেঁটে গেলেন। বেশ দ্রুতবেগেই গেলেন। তাঁর মনের সেই গোপন ব্যক্তিত্বটা (যার কাছে পরাভব তাঁকে স্বীকার করতেই হবে একদিন, যার প্ররোচনায় পড়ে অসুখের ভান পর্যন্ত কবতে হবে) তাঁর গতিবেগকে অশোভন রকম বাড়িয়ে দিলে।

বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই গেলেন তিনি দিবসের ঘরে! গিয়েই চোখে পড়ল ভাঙা সরোদটা টেবিলের উপর রাখা হয়েছে; ব্রজই তুলে রেখেছে নিশ্চয়। নিস্তব্ধ হয়ে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন সেটার দিকে ক্ষণকাল। তারপর একটু এগিয়ে গেলেন টেবিলটার দিকে, স্পর্শ করতে ইচ্ছে হল সরোদটাকে। কিন্তু ভয় হল। মনে হল ছুঁলেই বোধ হয় প্রতিবাদ করে উঠবে সরোদটা। অযৌক্তিক ভয়টা কাটিয়ে উঠতে অবশ্য বেশি দেরি হল না। তাঁর, যে যুক্তিসঙ্গত দ্বিধাটা তারপর তাঁর মনে এল আবছাভাবে সেটা আরও হাস্যকর। ক্রিমিনাল কেসে প্র্যাকটিস করেন বলে যে কারণে তিনি 'সিভিল' কেস ছুঁতে চান না, সঙ্গীত বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলে সরোদটা স্পর্শ করতে তেমনি ধরনের একটা সংকোচ হল তাঁর ক্ষণিকের জন্য। তবু তিনি ইতস্ততঃ করে এগিয়ে গেলেন এবং সন্তর্পণে সরোদটা তুলে নেড়েচেড়ে দেখলেন একবার। কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। ব্রজ ঘরে ঢুকলে সেই মুহূর্তে।

"দিবস ফেরেনি?"

সরোদটা টেবিলে তাড়াতাড়ি নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"না। সমস্ত দিন তো হাপিত্যেশ করে বসে আছি"—এইটুকু বলেই ব্রজ থামল না, সমস্ত দিন ধরে তার মনে যে কথাটা নানাভাবে পল্লবিত হচ্ছিল তার নির্যাসটুকুও ব্যক্ত করলে—"ছেলে এখন বড় হয়েছে তাকে কি অমন করে বকে?"

সূর্যকান্ত অকারণে গোঁফটাকে বাঁ হাত দিয়ে মুছে চোখমুখে এমন একটা ভাব ফোটাতে চেষ্টা করলেন যার অর্থ—'তুমি ওকে মানুষ করেছ তা মানছি, কিন্তু ছেলেকে কখন কি ভাবে বকতে হবে তা তোমার চেয়ে আমি ভালো বুঝি। এ তুমি যা করছ তা অনধিকার চর্চা'—চেষ্টা করলেন বটে কিন্তু ফুটল না এবং কেবলমাত্র চোখমুখের ভঙ্গিতে এত লম্বা ভাব প্রকাশ করা যে তাঁর সাধ্যাতীত একথাও তিনি যে না বুঝলেন তা নয়, কিন্তু কথা দিয়ে তা ফোটাবারও চেষ্টা করলেন না। ব্রজর দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

.....পথশ্রান্ত পদক্লান্ত দিবস সন্ধ্যার সময় যখন খোলার ঘরে ফিরে এল তখন তার উৎসাহ অনেকটা কমে গেছে। কিন্তু সেই অনুপাতে জেদটা যে বেড়ে গেছে তা নিজে সে স্পষ্টভাবে টের পায়নি তখনও। সূর্য অস্ত গেলে অন্ধকারটাকে যেমন আমরা বড় করে দেখি, প্রথম প্রথম চাঁদটা যেমন চোখেই পড়ে না, দিবস হতাশার অন্ধকারেই তেমনি বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল, অন্তরের নিভৃতে ক্রমবর্ধমান আত্মশক্তিটাকে উপলব্ধি করতে পারছিল না ভালো করে। সে বুঝতেই পারছিল না কি করে কি হবে। অথচ—এই 'অথচ'টার আড়ালে উজ্জ্বলতর হচ্ছিল তার আত্মশক্তি।

অন্ধকার ঘরটায় ঢুকে একটা দেশলাই কাঠি জ্বাললে সে প্রথম। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আগেই সব কিনে এনেছিল যে। টেবিল, চেয়ার, শেলফ, বিছানা, আয়না, চিরুনি—দু'খানা বই, ধানের পুঁটুলি (ধান কিনতে গিয়ে একটা গামছাও কিনতে হল পুঁটুলি বাঁধবার জন্য) এবং মোমবাতির প্যাকেটটা টেবিলে রেখে দিয়ে জ্বলন্ত দেশলাই কাঠিটা ফেলে দিলে সে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ চুপ করে। তারপর হাতড়ে হাতড়ে গিয়ে চৌকিটার উপর বসল। তার মাকে মনে পড়ল হঠাৎ, অর্থাৎ সেই ছবিটাকে যেটা বাবার শোওয়ার ঘরে টাঙান আছে। খুব ছেলেবেলায় মাকে হারিয়েছে সে, জীবন্ত মায়ের মুখটা ভালো মনে নেই তার। ঘোমটা দেওয়া একখানি সুন্দর মুখের খানিকটা ঘেরে টকটকে একটা পাড়—এর বেশি আর কিছু মনে পড়ে না। অয়েল পেন্টিং ছবিখানা আর স্মৃতির এই অস্পষ্ট টুকরোটা দুটোই ফুটে উঠল পাশাপাশি মনের ভিতরে। তার মনে হল মা যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে সে কি এমন ভাবে চলে আসতে পারত? কিন্তু তখনি আবার মনে হল মা কি তাকে এমন ভাবে বাধা দিতেন? বাবাকে বুঝিয়ে তিনি তাকে রিসার্চই করতে দিতেন ঠিক। স্মৃতির অস্পষ্ট টুকরোটা, টকটকে লাল-পাড়-ঘেরা সেই সুন্দর মুখখানা একটু নড়ে উঠল যেন, মনে হল তার দিকে যেন ফিরে দেখতে চাইছে কিন্তু পারছে না। মায়ের একটা ছবি পাওয়ার জন্যে আকুল হয়ে উঠল সে সহসা। কিন্তু তা পাওয়া যাবে না। মায়ের ওই একটা ছবিই অনেক কষ্ট করে করেছিলেন বাবা, অস্পষ্ট একটা ফটো থেকে, সেই সাহেব চিত্রকরও চলে গেছেন দেশে বহুদিন আগে, হয়তো বেঁচেও নেই। অয়েল পেন্টিংয়ের কচি মুখখানা আবার ভেসে উঠল মনে। উনিশ কুড়ি বছরের একটি তরুণী। মুখে ফুটে উঠেছে লজ্জার আভার সঙ্গে মৃদু হাসি, চক্ষু দুটি আনত। অনেক দিন সে নির্নিমেষে চেয়ে থেকেছে ছবিটার দিকে, কিন্তু আনতদৃষ্টি আনতই থেকে গেছে, একবারও তার মুখের দিকে চেয়ে দেখেনি! পাশেই বাবার ফটোখানাও টাঙানো আছে। কত তফাৎ! বাবা প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছেন সামনের দিকে, মনে হয় চোখে চোখ রেখে কথা বলবেন বুঝি এখনই। ফটোখানা সেই তুলিয়েছিল কিছুদিন আগে, তার এক বন্ধু ফটোগ্রাফার

তুলেছিল ফটোটা। পরমুহূর্তেই যে কথাটা মনে হল তার, যে প্রবল বাসনাটা জাগল, তাতে নিজেই অবাক হয়ে গেল সে। যে বাবার জেদের জন্য সে নিজের কাম্য পথে যেতে পায়নি, যাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে পথে ঘুরতে হচ্ছে, তাঁরই একখানা ছবি যোগাড় করে টাঙিয়ে রাখবার ইচ্ছে হল তার। ধূসরের জন্য আকুল হয়ে উঠল সবুজ। অসম্ভব হবে না এটা, তার সেই বন্ধুর কাছে গেলে একখানা কপি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ফটোতে বাবার চোখে যে প্রসন্ন দৃষ্টি ফুটে উঠেছে—হঠাৎ তার মনে হল—সে দৃষ্টির অন্তরালে কোনো রকম নীচতা হীনতা সংকীর্ণতা লুকিয়ে থাকতে পারে না। প্রচলিত কুসংস্কার, অর্থহীন চক্ষুলজ্জা, অতীতকে আঁকড়ে থাকবার প্রয়াস প্রভৃতি কতকগুলো জিনিস হয়তো তাঁকে আধুনিক হতে দেয়নি (আধুনিকতা নিয়ে গোবিন্দ সাণ্ডেলের সঙ্গে যে তর্ক সূর্য চৌধুরী পরে করবেন তা যদি শুনতে পেত দিবস!) কিন্তু —দিবসের মনে হল—ওই চোখের দৃষ্টিটা তো মিথ্যে নয়; তার বাবার স্বরূপ যেন ধরা পড়ে গেছে ঐ চোখের দৃষ্টিতে............

"এ কি কপাট খোলা, ঘর অন্ধকার, কি গো বাবু ফিরেছেন না কি?" সৌদামিনীর সাড়া পেয়ে দিবস চমকে উঠে দাঁড়াল।

"এখনই ফিরলাম।"

"আলো জ্বালেন নি?"

"জ্বালছি, এস।"

দিবস তাড়াতাড়ি একটা মোমবাতি জ্বেলে ফেললে। সৌদামিনী এসে ঢুকল ঘরের ভিতর। দিবস যে এ পাড়ায় বেমানান তা সৌদামিনীর বুঝতে দেরি লাগেনি। যে ধরনের বাবুরা এ পাড়ায় সাধারণত থাকেন বা আসেন তাদের সৌদামিনী চেনে। তাদের মধ্যেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আছে, কিন্তু তাদের চালচলনে বস্তির এমন একটা ছাপ থাকে যা পেঁয়াজ বা হিংয়ের গন্ধের মতো কিছুতেই ঢাকা পড়ে না! দিবস 'হংসো মধ্যে বকো যথা' নয়। 'বকো মধ্যে হংসো যথা' বললেও ঠিক সেই ভাবটি বর্ণনা করা যাবে না যা সৌদামিনীর মনে জাগছিল। 'গোবরে পদ্মফুল' সৌদামিনী নিজেই বলত হয়তো জিগ্যেস করলে, কিন্তু তা-ও তার মনোভাব ঠিক প্রকাশ করত না। গোবর গাদাতেও, পদ্মফুল না হোক, ফুল ফোটে বই কি, আর পদ্মফুল যেখানে ফোটে তা গোবর গাদা না হলেও পাঁকের গাদা। সৌদামিনীর যা মনে হচ্ছিল, যা সে ভাষায় প্রকাশ করতে পাচ্ছিল না তা 'আস্তাকুঁড়েতে জরির টোপর কে বসিয়ে দিয়ে গেল' গোছের কিছু একটা। দিবসের স্বল্পভাষণে তার চোখের প্রদীপ্ত গম্ভীর দৃষ্টিতে, পার্থিব বিষয়ে তার ঔদাসীন্যে (ঘরের কপাটটাই খুলে রেখে চলে গিয়েছিল!), তার মুখভাবের শুচিতায় এমন একটা ব্যক্তিত্ব প্রতিভাত হচ্ছিল যার আভিজাত্য আয়ত্তাতীত বলে চিরকাল শ্রদ্ধাবিষ্ট করে রেখেছে সৌদামিনীদের। যা তারা জানে, খেলো হয়ে পড়বে না কিছুতেই, অর্থাৎ, যা, (এটা অবশ্য সৌদামিনী ভাবছিল না) দেবদাস-চন্দ্রনাথ-সতীশেও পর্যবসিত হবে না শেষ পর্যন্ত, যার শুভ্রতা পঙ্ক স্পর্শ করেও নির্মল থাকবে আলোকের মতো চিরকাল।

"বাইরে থেকে খেয়ে এসেছেন, না এখানেই রান্নাবাড়া করবেন? পিছনের বারান্দার উনুনটা ঠিক করে রেখেছি আমি।"

ঘরের ভিতর ঢুকে মৃদু হেসে বললে সৌদামিনী।

"পিছনের বারান্দায় উনুন আছে নাকি একটা!"

এই কথা শুনে সৌদামিনীর শ্রদ্ধা—যা অনতিবিলম্বে স্নেহে পরিণত হবে—আরও বেড়ে গেল যেন। মনে হল বাড়িভাড়া নিয়েছে অথচ বাড়ির কোথায় কি আছে তা ভালো করে দেখেনি—আশ্চর্য লোক!

"উনুন আছে বই কি। ঢাকা বারান্দা, দিব্যি রান্না করা যাবে।"

"না, রান্নাবাড়া আমার পোষাবে না! কিনেই খেতে হবে। কাছে পিঠে হোটেল আছে কোনও?"

"আছে। মোহন ঠাকুরের হোটেল। কিন্তু আগে থাকতে বলে না দিলে—"

"সেইখানেই ব্যবস্থা করব কাল থেকে।"

"সে তা না হয় কাল থেকে হবে। আজ? আজ কি উপোস করে থাকবেন না কি?"

"বাজার থেকে কিছু কিনে টিনে খাব এখন।"

"আমি তো বাজারের দিকেই যাচ্ছি, কি খাবেন বলুন, কিনে নিয়ে আসব এখন।"

"তাহলে তো ভালোই হয়। কিছু লুচি আর তরকারি এনো তাহলে। এই নাও।"

দশ টাকার নোট দিলে একখানা। সৌদামিনী ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে সদ্যকেনা বই দুটোকে। আবার তার মনে হল; আশ্চর্য লোক, বই কিনে এনেছে, খাবার কিনে আনেনি। খিদেও পায় না নাকি এদের।"

"কত লুচি আনব?"

এই প্রশ্নে মুশকিলে পড়ে গেল দিবস। ভেগা নক্ষত্রের দিকে আমাদের সৌর মণ্ডল কত বেগে এগিয়ে যাচ্ছে অথবা পজিট্রনের চতুর্দিকে যে ইলেক্ট্রনরা নৃত্য করে বেড়াচ্ছে তাদের চরিত্র কি রকম এ সব প্রশ্ন করলে দিবস সঙ্গে সঙ্গে নিখুঁত উত্তর দিতে পারত, কিন্তু কত লুচিতে তার পেট ভরে এ তো সে ঠিক জানে না। অথচ বেঠিক উত্তর দিতেও তার বৈজ্ঞানিক মন ইতস্তত করতে লাগল। একটু অপ্রস্তুত হাসি হেসে তাই সে বললে, "আট দশ খানা এনো। তরকারি বেশি এনো একটু।"

সৌদামিনী চলে গেল। সৌদামিনী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দিবস ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইল জ্বলন্ত শিখাটার দিকে। মাঝে মাঝে কেঁপে যাচ্ছে বটে কিন্তু সোজা ঊর্ধ্বমুখে জ্বলবার চেষ্টা করছে। এর থেকে একটা বিশেষ নীতি আহরণ করে তার অবসন্ন মন যে চাঙ্গা হয়ে উঠল তা নয়, কত ওজনের লুচিতে তার পেট ভরে এই সংবাদ না জানার লজ্জাও তার অন্তর স্পর্শ করেনি মোটেই (ধান কোথায় পাওয়া যায় এই অতি সাধারণ খবরটাও সে জানত না, এবং এই অজ্ঞতার জন্যেও মুষড়ে পড়েনি সে), বস্তুত কোনোরকম চিন্তাই জাগছিল না তার মনে, সে নির্নিমেষে জ্বলন্ত শিখাটার দিকে চেয়েছিল কেবল। অনবরত নিদারুণ চিন্তাভাবে প্রপীড়িত হবার পর আমাদের মন মাঝে মাঝে ছুটি নেয়, কিছুই ভাবতে চায় না আর, ভাবতে পারে না, সমস্ত ভয় ভাবনা থেকে সরে গিয়ে আত্মগোপন করে নিশ্চিত-লোকে কিছুক্ষণের জন্য। এ রকম নির্বিকার হবার ক্ষমতা মনের আছে, তাই মুমূর্ষু সন্তানের মাথার শিয়রে জননী ঘুমিয়ে পড়তে পারে, নেপোলিয়নরা বিশ্রাম নিতে পারে যুদ্ধক্ষেত্রে। জ্বলন্ত শিখাটার দিকে চেয়ে দিবসের মন বিশ্রাম নিচ্ছিল তেমনি। তারপর আবার ধীরে ধীরে সক্রিয় হয়ে উঠল তা। বাড়ি থেকে চলে আসবার পর সমস্ত দিন কি কি কাজ করেছে তারই হিসাব করতে লাগল সে।

তবলচি সীতারাম (বড় বড় চোখ, চমৎকার পাকানো গোঁফ) এবং সারেঙ্গি রমজান (গোলগাল মুখ, গালভরা ননমহেশ দাড়ি) দুজনেরই কোলকাতা শহর খুব ভালো লেগেছিল। তাদের দুজনেরই বাড়ির অবস্থা সচ্ছল, কোলকাতা শহরে কিছুদিন শফর করে গেলে কারও সংসারই অচল হয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। তাই কোলকাতা শহরে কিছুদিন কাটিয়ে যেতে আপত্তি ছিল না তাদের। ভয় ছিল গুরুজি (মানে গহনচাঁদ) যদি থাকতে রাজি না হন, কিন্তু তিনি রাজি হওয়াতে তারা খুশি হয়েছে। চুনীলাল কাছাকাছি একটি ছোট বাসা ঠিক করে দেওয়াতে থাকবারও বিশেষ কোনো অসুবিধা নেই। একটি ছোট ঘরে দুজনেই থাকে। একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ, আর একজন মুসলমান। কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো অসুবিধা হয়নি। মনের মিল থাকলে কোনো কিছুতেই আটকায় না। তাছাড়া যে আর্টের ক্ষেত্রে তারা মিলেছিল সেখানে সুরই প্রধান কথা বে-সুরের স্থান নেই। তাই ওই ছোট ঘরেও সীতারামের আহ্নিক পূজা রমজানের নমাজে একটুও ব্যাহত হচ্ছিল না। আনন্দেই দিন কাটছিল তাদের। তাছাড়া সবচেয়ে আনন্দিত হয়েছিল তারা রঙ্গনাকে দেখে। গুরুজির বেটি যে এমন হবে তা তাদের কল্পনাতীত ছিল। যেমন রূপ তেমনি গুণ, আর তেমনি গানের গলা। ওর বিয়ে তো দেখে যেতেই হবে। জরুর। সীতারামের মতে এ মেয়ের স্বয়ম্বরা হওয়া উচিত। মতটা অবশ্য সে প্রকাশ্যে বলতে পারেনি গহনচাঁদকে। রমজানের ধারণা ঠিক উলটো। তার মতে বেগমের মতো পরদানশীন করে রাখলেই রঙ্গনাকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়। অমন একটা 'নেহায়েৎ নাজুক' সৌন্দর্যকে পথে ঘাটে ছেড়ে দেওয়াটা কি ভালো? কিন্তু সে-ও মতটা প্রকাশ করতে পারেনি গহনচাঁদের কাছে। দুজনেই কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল রঙ্গনাকে দেখে। সেদিন সন্ধ্যার সময় দিবস যখন তার খোলার ঘরে মোমবাতির শিখাটার দিকে চেয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভাবছিল তখন চুনীলালের বাড়িতে জমে উঠেছিল গানের সভা। রঙ্গনা গাইছিল, সঙ্গত করছিল রমজান আর সীতারাম। গহনচাঁদ মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন বসে। গান শেষ হয়ে যাবার পর গহনচাঁদ চোখ খুললেন।

"কেমন লাগল তোমাদের?"—হাসিমুখে চাইলেন তিনি প্রথমে রমজান তারপর সীতারামের দিকে।

"ফার্স্ট ক্লাস"—সীতারাম ইংরেজিতেই বলে উঠল। এই ধরনের দু'চারটে 'আংরেজি লবজ্' সে জানে এবং আওড়ায় মাঝে মাঝে।

"বহুত আচ্ছা"—রমজান মৃদু হেসে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললে এবং অনেকক্ষণ ধরে ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগল, যেন সে যা বলতে চায় তা ভাষার অতীত।

"ওর গান শুনে ভালো লাগলে ওকে ভালো একটা সেতার কিনে দেব বলেছি। দেওয়া যাক তাহলে, কি বল?"

"জরুর"—"বেশক"—সীতারাম, রমজান সমস্বরে বলে উঠল। হেসে ফেললে রঙ্গনা।

"কি যে করছ তুমি বাবা সামান্য একটা সেতার কেনা নিয়ে।"

"কাল নিয়ে আসিস।"

কন্যার দিকে স্নেহভরে চেয়ে বললেন গহনচাঁদ। গহনচাঁদের মুখের দিকে চেয়ে সাহস বেড়ে গেল রঙ্গনার। কলেজ থেকে ফিরে অবধি যে কথাটা সে বলব বলব করে বলতে পারেনি তার

মনে হল তা বলবার এই সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। মামাকে বললে তিনি রাজি হয়ে যাবেন—সেবার বোলপুর যাবার সময় কিছুতো বলেননি—কিন্তু বাবা হয়তো আপত্তি করতে পারেন। বোলপুরের কথা বাবাকে সে জানায়ওনি।

“বাবা আর একটা জিনিস দেবে আমাকে?”

“আবার কি?”

“দু' তিন দিনের ছুটি। এক জায়গায় বেড়াতে যাব।”

“কোথায়?”

“গিরিডি। আমাদের কলেজের মেয়েরা ‘আউটিং’ করতে যাচ্ছে। আমাকেও যে বলছে।”

“গিরিডি! ও বাবা সে যে অনেকদূর। তোদের সঙ্গে থাকবে কে?”

এই কথায় আত্মসম্মান আহত হল রঙ্গনার। তার ধারণা পুরুষরা তাদের আগলে রেখে রেখে আর পাহারা দিয়ে দিয়ে আরও পঙ্গু করে ফেলছে দিন দিন তারা কি এতই ঠুনকো যে রক্ষণাবেক্ষণের ‘ক্রেট্’ দিয়ে মুড়ে না পাঠালে ভেঙে যাবে! কি আশ্চর্য!”

“সঙ্গে? মানে, পাহারা দেবার জন্যে?”

“পাগলির কথা শোন। একা যাবি তোরা অতদূর! যেতে পারবি?”

“খুব পারব! না পারবার কি আছে?”

রমজানের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল একটু। সীতারাম তারিফের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে মুচকি হেসে বললে—“জরুর। কাহে নেহি শেকেগী।”

“কজন যাবি তোবা?”

“আট দশজন।”

“এর আগে গেছিস কখনও?”

“গেল্লবার বোলপুর গিয়েছিলাম।”

“সঙ্গে কেউ ছিল না?”

“মাসিমা ছিলেন সেবার।”

“মাসিমা? কার মাসিমা?”

“হস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট।”

“ও”—অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত হলেন গহনচাঁদ—“এবারও যাবেন তিনি?”

“যেতে পারেন। না-ও যদি যান কি ক্ষতি তাতে”—তারপর ঈষৎ হাসি, ঈষৎ ব্যঙ্গ, ঈষৎ অনুযোগ মিশিয়ে (অপরূপ হয়ে উঠল তার মুখশ্রী এই তিনের সংমিশ্রণে) বললে—“কি যে মনে কর তোমরা আমাদের, আমরা কচি খুকি নাকি?”

“তা নয়তো কি। কোথা থেকে কখন কি বিপদ হয়—”

এর পর বঙ্গনা কিন্তু যা করে বসল তা কচি খুকিকেই মানায়। দুহাত দিয়ে গহনচাঁদের গলা জড়িয়ে ধরে আবদারভরা কণ্ঠে বললে—“না বাবা আমি যাব। তুমি মানা কোরো না। কিছু হবে না।”

“এই দেখ, এই দেখ”—বিব্রত হয়ে উঠলেন গহনচাঁদ—“আচ্ছা বেশ তো, চুনী আসুক তাকে জিগ্যেস করি।”

"মামা তো বোলপুর যেতে মানা করেনি।"

ঠিক এই সময় চুনীলালও এসে ঢুকল। বিকাশবাবুকে গাঁথতে পেরে বেশ পুলকিত হয়ে ফিরেছিল সে।

"মামা, আমরা সেবার বোলপুরে আউটিং করতে যাইনি?"

"হ্যাঁ, গিয়েছিলে তো, কেন, কি হয়েছে?"

"এবার গিরিডি যেতে চাইছে"—ভ্রূকুঞ্চিত করে এবং ঈষৎ অসহায় ভাবে বললেন গহনচাঁদ।

"তা যাক না। কলেজের মেয়েরা ও রকম আউটিং করে মাঝে মাঝে।"

"তাহলে যাস। কবে যেতে হবে?"

"সে এখনও দেরি আছে কয়েকদিন।"

"এই যদি রেওয়াজ হয়ে থাকে আজকাল, যাস।"

রঙ্গনার চোখে মুখে হাসি ফুটে উঠল। এবং তা দেখে সীতারাম এবং রমজানের চোখে মুখেও হাসি ফুটে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। তারা দুজনেই রুদ্ধশ্বাসে যেন অপেক্ষা করছিল ব্যাপারটার কি 'ফয়সালা' হয় শোনবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত রঙ্গনার জয় হওয়াতে তারাও খুশি হল। রমজান যদিও মনে মনে পর্দার পক্ষপাতী কিন্তু রঙ্গনা খুশি হওয়াতে তার চোখে মুখে ফুটে উঠল আনন্দ....।

তার ছোট টেবিলের শালপাতার উপর লুচি তরকারি সাজিয়ে দিতেই দিবস গিয়ে খেতে আরম্ভ করে দিল। খুব খিদে পেয়েছিল তার। সৌদামিনী সেদিকে আড়চোখে একবার চেয়ে আঁচলের গেরো খুলতে লাগল। একগাদা খুচরো ভাঙানি এনেছিল সে। সেগুলি টেবিলের একধারে স্তূপীকৃত করে রাখতে রাখতে সে বললে—"আগেই যে খেতে আরম্ভ করে দিলেন, এগুলো গুনে নিন।"

দিবস হাসিভরা চোখে তার দিকে এক-নজর চেয়ে লুচি মুখে পুরলে আর একখানা। কোনও কথা বললে না, গুনে নেবার কোনও দরকারও প্রকাশ করল না। হঠাৎ এক ঝলক আনন্দ আবার আপ্লুত করে ফেলেছিল তার সমস্ত মন। সমস্ত দিনের ব্যর্থতা, সমস্ত দিনের পরিশ্রম হঠাৎ যেন সার্থক হয়ে উঠেছে তার মনে হচ্ছিল। সে যে এই খোলার ঘরে বসে খোলা টেবিলের উপর শালপাতা পেতে বাজারের অখাদ্য লুচি তরকারি খেতে পারছে, তার মনে যে কোনও গ্লানি, কোনও অনুতাপ হচ্ছে না এই ঘটনাটাই তার চমৎকার মনে হচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল এই তো পেরেছি, এই তো পেরেছি....।

"আগে এগুলো গুনে গেঁথে রেখে দিলে পারতেন, আমি দাঁড়িয়ে থাকব কতক্ষণ?"

"দাঁড়িয়ে থাকবার দরকার নেই।"

"এগুলো গুনে নেবেন না?"

"পরে নেব এখন।"

সৌদামিনী মুচকি হেসে চেয়ে রইল একটু।

"কম হলে?"

"কি আর করব।"

“যাই তাহলে। আর কিছু দরকার নেই তো?”

“জল—”

“ও, হ্যাঁ—”

“তাড়াতাড়ি কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে আনলে সে।”

“আর কিছু দরকার নেই তো?”

“ছিল আর একটা দরকার। কিন্তু থাক, সে কাল সকালে হলেও চলবে।’

“এখনই শুনি না।”

“একটা ময়লা কাপড় আর ময়লা জামা চাই। গেঞ্জি হলেও চলবে।”

“ওমা! ময়লা জামা কাপড় নিয়ে কি হবে?”

“ময়লা কাপড় জামা না হলে চাকরি জুটছে না।”

“কি চাকরি করবেন আপনি?”

“যা জোটে।”

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সৌদামিনী। দিবসের সম্বন্ধে পাকা-পোক্ত যে ধারণাটা সে করে নিয়েছিল (যা যাচাই করে নেবার প্রয়োজনও সে অনুভব করছিল না) সেই ধারণার সঙ্গে যে সংবাদটি সে দিতে যাচ্ছিল তা মোটেই খাপ খায় না। দিবসের মতো ছেলের পক্ষে ওটা সুসংবাদ না হবারই কথা। শোনবামাত্রই হয়তো হো হো করে হেসে উঠবে। কিন্তু ময়লা কাপড় জামার কথা যখন বলছে, তখন হয়তো..... হঠাৎ শশীবাবুর কথা মনে পড়ল সৌদামিনীর, বড়লোকের ছেলে ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে পথের ভিখারী হয়ে পড়েছিল একেবারে....

“আচ্ছা, আপনার দেশ কোথা?”

সন্তর্পণে কথাটা পাড়লে সৌদামিনী। তার ভয় হচ্ছিল হয়তো অসাবধানে নিদারুণ ব্যথার স্থানটিতেই বুঝি খোঁচা দিয়ে ফেলবে।

“দেশ হুগলি জেলায়। কিন্তু কোলকাতাতেই আছি বরাবর।”

“এখানে বাড়ি আছে আপনার?”

সৌদামিনীর চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল যখন দিবস ঘাড় নেড়ে জানালে কোলকাতাতেই বাড়ি আছে তার।

“এখানে বাড়ি আছে? খোলার ঘরে আসা কেন তাহলে?”

দিবসের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

“বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছি। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই।”

সৌদামিনীর বিস্ময় সীমা অতিক্রম করে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ল তার। ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের, পিতার সঙ্গে পুত্রের, বস্তুত যে কোনো পুরুষের সঙ্গে যে কোনো পুরুষের বিরোধ ঘটাবার যে সনাতন কারণটা সকলের মনে গাঁথা হয়ে আছে সেইটে সৌদামিনীরও মনে হল।

“সৎ মা আছে বুঝি?”

“না।”

“তবে?”

"আমার মা আমার ছোটবেলায় মারা গেছেন। বাবা আর বিয়ে করেন নি।"

"বাবার সঙ্গে ঝগড়া হল কেন তাহলে?"

"বাবা চান আমাকে উকিল করতে। কিন্তু আমার তা ইচ্ছে নয়।"

"যত সব ছেলেমানুষি। কালই বাড়ি ফিরে যান আপনি!"

সৌদামিনীর স্নেহতরল কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ভর্ৎসনার আমেজ এখন মধুরভাবে বাজল যে মুগ্ধ হয়ে গেল দিবস। এতক্ষণ ভালো করে সে চেয়েই দেখেনি সৌদামিনীর দিকে, এইবার ভালো করে চেয়ে দেখলে। দেখলে গোলগাল মুখটিতে জ্বলজ্বল করছে চোখদুটো, স্নেহ আর বিস্ময়ের সঙ্গে ছদ্মকোপের দ্যুতি অপরূপ করে তুলেছে, চোখের দৃষ্টিকে।

"উকিল হতে দোষটা কি! ভদ্দর লোকের ছেলেরাই তো উকিল হাকিম জজ ম্যাজিস্ট্রেট হয়—"

"উকিলরা গরিবদের কেউ নয়। ওদের কাজ হচ্ছে বড়লোক বদমাইশদের আইনের হাত থেকে বাঁচানো, ও আমি পারব না।"

ভারী কৌতুক লাগল সৌদামিনীর। বিশেষত এই শেষের কথা কটাতে।

"ও আমি পারব না"—ভারী মিষ্টি একটি আবদারের ঝংকার তুললে যেন। কিন্তু কার কাছে আবদার করছে ও?

"আমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দাও, যদি পার, যে-কোনও কাজ।"—দিবস বলে চলেছিল—"আমি দেখিয়ে দিতে চাই যে উকিল, ডাক্তার, মাস্টার, কেরানি না হয়েও আমরা মানুষের মতো বাঁচতে পারি—"

"কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে হলে—" সকৌতুকে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল সৌদামিনী কিন্তু দিবসের কথার তোড়ে (যার জন্যে নিজেও সে পরে লজ্জিত হয়ে পড়েছিল একটু, কিন্তু যা তখন রোধ করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল) ভেসে গেল তার প্রতিবাদ।

"ভদ্রলোকের ছেলে হলেই কি একটা ছোট গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা থাকতে হবে চিরকাল? তাছাড়া ভদ্রলোক মানে কি! তোমরা কি আমাদের চেয়ে কম ভদ্র? আমরা একটি মুখোশ পরে আছি তোমাদের সেটা নেই। আমি সেই মুখোশটি খুলে তোমাদের কাছে এসেছি বলে তোমরাও আমাকে তাড়িয়ে দেবে।"

দিবসের গলার স্বরটা কেঁপে উঠল একটু। এবং তা শুনে সেই মুহূর্তে সৌদামিনীর জন্ম হল নব-জগতে। ওই কম্পনের ধাক্কাটা তার অন্তরলোকের এমন একটা দ্বার খুলে দিলে হঠাৎ যা কখনও কেউ খোলেনি আজ পর্যন্ত। একটা নিঃস্বার্থ অকৃত্রিম বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল তার চিত্ত। সে বুঝল এই বলিষ্ঠকায় যুবকটি আসলে একটি শিশু, দুরন্ত দামাল শিশু। ওই এই গোঁয়ার্তুমির ঝক্কি তাকেই এখন পোয়াতে হবে। বাধা দিলে উলটো ফল ফলবে। বাধা দিতে গিয়েই ওর বাপ এই কাণ্ডটি করছে! মা নেই কিনা—মা থাকলে এমন হত না। দিবসের খাওয়া শেষ হয়েছিল। কথাগুলো বলেই সে হাত ধুতে গেল। সৌদামিনী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল কি করা যায়। যে ছলনাময়ী নারী বহু সংকটময় মুহূর্তের জটিলতাকে যাদুমন্ত্র বলে সরল করবার কৌশল আয়ত্ত করে জীবনের এতটা পথ অতিক্রম করেছে সেই ছলনাময়ী নারী আত্মপ্রকাশ করল যেন তার মধ্যে! দিবস হাত ধুয়ে ফিরে আসতেই সৌদামিনী মিষ্টি হেসে বললে—"ওমা ওকি অলুক্ষুণে কথা। তাড়িয়ে দেব কেন?

থাকতে যদি পারেন মাথায় করে রাখব। কাজও একটা জোগাড় করে দিতে পারি। আপনি তা পারবেন কি? গিরি যে মেসে কাজ করে সে মেসে ফাই-ফরমাস খাটবার জন্যে একটা চাকর দরকার। সকাল ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত আর বিকেলে ৪টে থেকে ৮টা পর্যন্ত কাজ, মাইনে শুকো কুড়ি টাকা। আপনি যদি করতে পারেন হয়ে যেতে পারে কাজটা। কিন্তু আপনি কি পারবেন এ কাজ করতে?"

মুখে যদিও হাসির আভাস ছিল না মনে মনে কিন্তু হাসছিল সৌদামিনী। তার মনে হচ্ছিল কাজের বর্ণনা শুনেই পিলে চমকে যাবে বাবুর।

"খুব পারব। করে দাও আমাকে কাজটা।"

"বেশ বলি তাহলে গিরিকে। গতর খাটালে আবার কাজের ভাবনা। কিন্তু আপনাদের হলো সুখী শরীর, আপনারা কি আমাদের মতো পারবেন"—

"কি জিদি ছেলে বাবা," মনে মনে বললে সৌদামিনী।

"খুব পারব। তুমি দিয়েই দেখ না। হ্যাঁ, আর একটা কথা—"

"কি?"

"তুমি আমাকে আর আপনি বলতে পাবে না। আর আমি তোমাকে দিদি বলে ডাকব এখন থেকে।"

সৌদামিনী এটা প্রত্যাশা করেনি। সহসা অভিভূত হয়ে পড়ল সে। তারপর সামলে নিয়ে ডান হাতে তর্জনীটি চিবুকের একধারে ঠেকিয়ে বলে উঠল—"কি কাণ্ড!"

চোখের দৃষ্টিতে উথলে উঠল স্নেহ।

।। পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।।

গোবিন্দ সাণ্ডেল সূর্য চৌধুরীর প্রকৃত বন্ধু এবং পাকা লোক, হাতে সময়ের অভাবও নেই, তাই তিনি থানা আর হাসপাতালগুলো তন্নতন্ন করে খুঁজে ফেললেন। সমস্ত দিন সমস্ত রাত এবং তারপর দিন সকাল দশটা পর্যন্ত যখন দিবসের কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না তখন এই নীতি-উপেক্ষণীয় ব্যাপারগুলো মিটিয়ে ফেলাই সঙ্গত মনে হল তাঁর। অনুসন্ধানগুলো করলেন অবশ্য সূর্য চৌধুরীকে না জানিয়ে। তাঁর মনে যে এই সব নিদারুণ সন্দেহ জেগেছে এ কথা জানতে পারলে সূর্যকান্ত আরও ঘাবড়ে যাবেন তাঁর মনে হল। দিবস যে মোটর চাপা পড়তে পারে কিংবা পুলিশের হাতে পড়তে পারে এ বিশ্বাস গোবিন্দবাবুর ছিল না। কিন্তু তিনি পাকা লোক, সব দিক সামলে কাজ করাই তাঁর অভ্যাস, 'অধিকন্তু ন দোষায়' নীতির অনুসরণ করে তাই এ কষ্টটুকু বন্ধুর জন্যে তিনি করলেন। ট্রামে বাসে যাতায়াত করতে কিছু অর্থব্যয়ও হল, তা হোক্, তবু তিনি তৃপ্তি পেলেন এতে। একটা কথা তিনি জানতেন না, জানলে এত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হত না তাঁকে। সূর্য চৌধুরীও গোপনে ঠিক ওই কাজই করেছিলেন। থানায় যাননি অবশ্য তিনি—কারণ দিবসকে যতটা তিনি চিনতেন তাতে তার থানায় যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা তাঁর মনে আসেনি—কিন্তু হাসপাতালগুলোতে তিনি গিয়েছিলেন। মোটর চাপা পড়া বিচিত্র নয়, এ কথা তাঁর মনে হয়েছিল।

দুই বন্ধুর সন্ধ্যাবেলায় যখন দেখা হল তখন দুজনেরই মনে দিবসের সম্বন্ধে নিজ নিজ ধারণা গাঢ়তর রঙে আঁকা হয়ে গেছে। আজকালকার ছেলেদের সম্বন্ধে গোবিন্দ সাণ্ডেলের ধারণা খুব উচ্চ নয় কোনো কালেই। সূর্য চৌধুরী যদিও বেসুরো হওয়ার ভয়ে প্রিয় বন্ধু সাণ্ডেলের কথার প্রতিবাদ করতে চাইতেন না কখনও, (গল্পের আসরকে তর্কসভায় পরিণত করবার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না, বরং গল্পকে জমাটি করবার জন্যে আজকালকার ছেলেমেয়েদের বিরুদ্ধে দু'চারটে ফোড়নই তিনি ছেড়ে এসেছেন বরাবর) আসলে কিন্তু তিনি আজকালকার আদর্শবাদী ছেলেমেয়েদের শ্রদ্ধা করতেন মনে মনে। যত ভুলই করুক—তাঁর মনে হত—ওদের মনের মধ্যে কোনও রকম ভেজাল নেই, ভুল করেও ওরা তাই শেষ পর্যন্ত ঠিক রাস্তায় পৌঁছবে। দিবস চলে যাওয়াতে তিনি নিজেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন। এর জন্যে যে কষ্টটা ভোগ করছিলেন সেটাকে লঘু করবার জন্যেই সম্ভবত দিবসের আদর্শটাকে উজ্জ্বলতর বর্ণে চিত্রিত করেছিলেন তিনি মনে মনে, পুত্র গর্বে গর্বিত হয়ে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছিলেন তির্যক পথে।

গোবিন্দ সাণ্ডেল এই শোচনীয় ঘটনাটাকেই বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবেন বলে এসেছিলেন। তাই মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে আরম্ভ করলেন।

"হুঁঃ, আজকালকার ছেলে, আমি তখনই গোড়ায় যা সন্দেহ করেছিলাম—"

কথা অসমাপ্ত রেখে আড়চোখে তিনি চাইলেন একবার সূর্য চৌধুরীর দিকে এবং আশা করতে লাগলেন সূর্য চৌধুরী এক-আধটা ফোড়ন অন্তত ছাড়বেন। কিন্তু সূর্য চৌধুরী যা করলেন তাতে চমকে গেলেন সাণ্ডেল। এটা তিনি প্রত্যাশা করেননি।

"আজকালকার ছেলেদের কতটুকু জান তুমি?"—হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন সূর্য চৌধুরী।

সাণ্ডেল মশায়ের চোখে এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেলেও হেসেই উত্তর দিলেন তিনি।

"যতটুকু জানি ততটুকুতেই মুগ্ধ হয়ে আছি। আর জানবার বাসনা নেই।"

উত্তরটা দিয়ে মুখে মৃদু হাসিটি ফুটিয়ে রেখে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন তিনি? তাঁর হাসি থেকে নিষ্ঠুর একটা ব্যঙ্গ ইঁটের মতো গিয়ে সূর্য চৌধুরীর কপালে আঘাত করলে যেন। সূর্য চৌধুরী গম্ভীরভাবে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিলেন প্রথমে—"কিচ্ছু জান না তুমি," কিন্তু পরমুহূর্তেই আর একটা ইট এসে লাগল এবং তার ফলে শুধু যে তাঁর কণ্ঠস্বর উচ্চতর গ্রামে উঠে গেল তা নয় তিনি যে উপমাটা ব্যবহার করলেন তা দুর্বোধ্য ঠেকল সাণ্ডেল মশায়ের কাছে।

"আমরা কেউ কিচ্ছু জানি না। আমরা আমাদের সেকেলে জুতোগুলো ওদের পায়ে জোর করে পবাতে যাচ্ছি, ওরা তো বিদ্রোহ করবেই।"

চোখ বড় বড় করে চেয়ে বইলেন খানিকক্ষণ গোবিন্দবাবু।

"জুতো! মানে?"

"আমাদের সেকেলে মতামত একালে চলবে কেন? নূতন যুগের মানুষ ওরা, ওদের পথ তো আলাদা হবেই।"

নিজের অভিমতটা প্রাঞ্জল করেও কিন্তু সুবিধা হল না। চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত এবং ভ্রূযুগল ঈষৎ উৎক্ষিপ্ত করে সাণ্ডেল মশাই বললেন, "পথ! ও বাবা! দেখ ভাই সূর্যকান্ত,

কয়েকটি কথা আমি বরদাস্ত করতে পারি না। 'নবযুগ' 'পথ' 'তরুণ' 'সবুজ' এসব শুনলেই পট করে মাথায় খুন চড়ে যায় আমার। দোহাই তোমার ও কথাগুলি শুনিয়ো না আমাকে।"

সূর্য চৌধুরী আত্মস্থ হয়ে পা দোলাচ্ছিলেন ধীরে ধীরে। মৃদু হেসে বললেন "বেঁচে থাকলেই শুনতে হবে। তোমার মাথায় খুন চড়ে যায় বলে সত্য মিথ্যা হয়ে যাবে না। সে তার পথে ঠিক চলবে।"

এইবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল সাণ্ডেলের। একটু ঝুঁকে বেশ একটু তিক্তকণ্ঠেই বলে ফেললেন তিনি—"পথ পথ করছ, পথটা কি বুঝিয়ে বলতে পার?"

"খুব পারি"—মৃদু হেসে উত্তর দিলেন সূর্য চৌধুরী—"যে পথে আমাদের পূর্বপুরুষরা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, যে পথে আমরা পাড়াগাঁর চণ্ডীমণ্ডপ থেকে শহরের ক্লাবে এসেছি, পঞ্চায়েত ছেড়ে আশ্রয় করেছি আদালতকে।"

"ও বাবা!"—মৃদু হাসি ফুটে উঠল সাণ্ডেল মশায়ের অধরে। হাসিমুখে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন তিনি বন্ধুর মুখের দিকে। তারপর বললেন, "এতই যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়েছে তাহলে ছটফট করে মরছ কেন?"

"ছটফট করে মরছি কে বললে তোমাকে?"

"তোমার চোখ মুখ। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি চোখের কোলে কালি পড়ছে। রাত্রে ঘুমোওনি বোধ হয়।"

"ছটফট যদি করেই থাকি তাহলে সেটা আমার দুর্বলতা।"

"এতক্ষণ পরে খাঁটি কথা বলেছ একটি। দুর্বলতা একটু-আধটু নয় ষোল আনা। গোড়াগুড়ি দুর্বলতা প্রকাশ করেছ, আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটি খেয়েছ ওর"

সূর্যকান্ত চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "কথাটা একটু অশোভন হবে আমার মুখে, তবু তুমি বন্ধু বলেই বলছি তোমাকে, দিবুর মতো হীরের টুকরো ছেলেকে যতটা আদর করা উচিত তার সিকির সিকিও করিনি আমি। কড়া শাসনের উপরই রেখেছি বরাবর। মা-হারা ছেলে—"

হঠাৎ থেমে গেলেন সূর্যকান্ত। গোবিন্দ সাণ্ডেলও অনুভব করলেন অন্য সুরে কথা কওয়া উচিত এবার। বড্ড দমে গেছে লোকটা। দু' একবার মাথায় হাত বুলোবার পর তাঁর হঠাৎ একটা কথা মনে হল। ব্যক্ত করলেন সেটা।

"রেস্ত ফুরুলেই বাছাধন ফিরে আসবেন। ক'টা টাকা নিয়ে গেছেন?"

"ওর স্কলারশিপের পাঁচ শ টাকা ওর নিজের অ্যাকাউন্টে ছিল। সেই টাকাগুলো ও বার করে নিয়েছে খবর পেয়েছি।"

"ও বাবা, তাই নাকি! ওর অ্যাকাউন্টে টাকা রাখতে গেছ কেন? কি আপদ!"

"ওর টাকা ওর অ্যাকাউন্টে থাকবে না তো কার অ্যাকাউন্টে থাকবে?"

গোবিন্দ সাণ্ডেল চুপ করে রইলেন ক্ষণকাল, তারপর বললেন, "টাকাগুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফিরবে না। দুচার দিন দেরি হবে আর কি। টাকাগুলি শেষ হলে সুড়সুড় করে ফিরে আসবে দেখো। কোলকাতা শহরে পাঁচ শ টাকা খরচ করতে অবশ্য বেশি সময় লাগে না।"

এই পর্যন্ত বলে সামলে গেলেন তিনি। এর পর তার মনে হচ্ছিল 'আর আমি যেটা সন্দেহ

করছি তা যদি হয়ে থাকে তাহলে ও কটা টাকা তো ফুটকড়াই হয়ে যাবে দেখতে দেখতে'—কিন্তু একথাগুলো আর বললেন না তিনি। বন্ধুর মনে দুঃখ দেওয়ার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। ভাগ্যে বলেননি কারণ পরমুহূর্তেই যা ঘটল তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। ব্রজ এসে ঢুকল একটা পার্শেল বগলে করে।

"তোমাকে বলতে ভুলে গেছি এই পার্শেলটা আজ এসেছে দুপুরের ডাকে।"

"কিসের পার্শেল?"

"খুলে তো দেখিনি। তোমার মুহুরি এসেছিল সেই সই করে নিয়ে রেখে গেল।"

"খোল দেখি। পার্শেল কোথা থেকে এল বুঝতে পারছি না।"

পার্শেল খুলে দেখা গেল একটা শাল, একটা মোটা লুঁই আর একখানা চিঠি রয়েছে। দিবসের চিঠি। দিবস লিখছে—

শ্রীচরণেষু,

বাবা, আমার স্কলারশিপের টাকাগুলো আজ বার করে নিলাম। আমার অনেক দিন থেকে ইচ্ছে ছিল আমার স্কলারশিপের টাকা দিয়ে আপনাকে একখানা শাল আর ব্রজদাকে একটা ভালো গায়ের কাপড় কিনে দেব। তাই কিনে আজ পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার হাতে যে কয়টা টাকা রইল তা দিয়ে অনায়াসে আমার কয়েকদিন চলে যাবে। এর মধ্যে আমি নিশ্চয়ই একটা কাজ জোগাড় করে নিতে পারব। আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই নিজের সামর্থ্যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি কি না। আমার জন্য আপনারা অনর্থক মন খারাপ করে থাকবেন না। আমি ভালো আছি। আমাকে অনর্থক খোঁজাখুঁজি করেও সময় নষ্ট করবেন না, আমি নিজেই সময়মতো একদিন গিয়ে দেখা করে আসব আপনার সঙ্গে। একটা রিসার্চের পথে আপনি আমাকে যেতে দেননি—হয়তো ভালো ভেবেই দেননি—তাই আর একটা রিসার্চের পথে আমি অগ্রসর হয়েছি। আমার শিক্ষা এবং শক্তি কতখানি তা আমি যাচিয়ে নিতে চাই। আমি জানি আপনি এপথেও আমাকে যেতে দেবেন না, তাই কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকব। আপনি আমার প্রণাম নিন। ইতি—

প্রণত দিবস

সূর্য চৌধুরী নীরবেই চিঠিখানা পড়লেন প্রথমে। এবং পড়বার পরও নির্বাক হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

"কার চিঠি?"—ব্রজ প্রশ্ন করল।

"দিবুর।"

"দিবুর? কি লিখেছে?"

সূর্য চৌধুরী জোরে চিঠিখানা পড়লেন আবার। ব্রজ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। গোবিন্দ সাণ্ডেলের বিস্ময় সীমা অতিক্রম করছিল, তাই ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেল একটু।

কিরণ নিশ্চয়ই দিবসের কাণ্ড শুনে চটে উঠত কিন্তু দিবস ব্যাপারটাকে এমন একটা বিশিষ্ট উপমা দিয়ে এমন একটা বিচিত্র আলোকে ফুটিয়ে তুললে যে কিরণের কবি-মন রূপকথা-লোকের রঙীন আলোছায়ায় আবিষ্ট হয়ে পড়ল। রাগ করবার কথা মনেই হল না তার। এ উপমাটার কথা

দিবসেরও হয়তো মনে হত না যদি না সে শস্তায় সেদিন সেকেন্ড-হ্যান্ড বইয়ের দোকান থেকে আরব্য উপন্যাসখানা কিনে ফেলত। আরব্য উপন্যাস ইতিপূর্বে অনেকবার পড়েছে সে, দ্বিতীয়বার কিনে পড়ার দরকার ছিল না, কিন্তু মলাটের উপর যে ছবিখানা আঁকা ছিল তা এমন মুগ্ধ করে ফেলল তাকে যে বইটা সে না কিনে পারল না। নিষ্ঠুর সুলতান শাহারজাদি দিনারজাদির কাছে বসে গল্প শুনছেন। অন্ধকার আকাশের গায়ে আলোর আভাস ফুটে উঠেছে। আলোর ছোঁয়া লেগে অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে আসছে, সুলতানের নিষ্ঠুরতাও যেন প্রেমে রূপান্তরিত হচ্ছে রূপকথার ছোঁয়া লেগে। অদ্ভুত ছবিটা। রমাঁ রল্যাঁর "I will not rest" বইখানাও কিনেছিল সে, কিন্তু প্রথমেই পড়ে ফেলেছিল আরব্য উপন্যাসখানা। যদিও সমস্ত দিন অনেক হেঁটেছিল তবু রাত্রে অচেনা জায়গায় ভালো ঘুম হচ্ছিল না। অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগেই ছিল সে। আর একটা কারণও ছিল—মশা। মশারি কেনা হয়নি। আরব্য উপন্যাস কিন্তু তাকে এমন একটা রাজ্যে নিয়ে গিয়েছিল যেখানে মশার কামড়ের জ্বালা অসহ্য নয়।

কিরণের বাড়ির সামনাসামনি আসতেই আবার এমন একটা দৃশ্যের মধ্যে সে পড়ে গেল যে দ্বিতীয়বার মনে পড়ল আরব্য উপন্যাসের কথা। গলির সামনে ভিড় জমেছে একটা। লোক জুটেছে নানা জাতের, নানা বয়সের। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে একটি নৃত্যপরা বেদে মেয়েকে দেখছে সবাই। কাছেই ঢোলক বাজাচ্ছে একটি বুড়ো। লম্বকর্ণ রামছাগলও রয়েছে একটি। মেয়েটি যেন রামছাগলকেই নাচ দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে এসে তার থুতুনিটা নেড়ে আদর করছে। মেয়েটির হাতে আছে ট্যামবুরিন। পরনে ঘাগরা, ওড়না। বুকে কাঁচুলি বাঁধা! কোলকাতা শহরের মাঝখানে দিন দুপুরে একটা ইরানী ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে যেন। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দিবসও নাচ দেখতে লাগল। বেশি বয়স নয় মেয়েটির। ওই ঢোলক-বাজিয়ে বৃদ্ধ ওর বাপ বোধ হয়। দিবসের মনে হল আমাদের তথাকথিত ভদ্রসমাজে ছেলে-মেয়েরা বাপ মায়ের বোঝা স্বরূপ। ছেলেকে পড়াতে আর মেয়ের বিয়ে দিতে অনেকেই সর্বস্বান্ত। যাদের আমরা ছোটলোক বলি তাদের ছেলেমেয়েরা কিন্তু অল্পবয়স থেকেই যে যতটুকু পারে উপার্জন করে। শিক্ষার আসল লক্ষ্য মনুষ্যত্ব লাভ। বিপুল অর্থ ব্যয় ও প্রাণপাত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফত আমরা সে মনুষ্যত্ব যতটা লাভ করতে পেরেছি, স্কুল কলেজে না গিয়েও ওরা যে তার চেয়ে কম লাভ করেছে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। আমাদের স্কুল কলেজে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল অর্থোপার্জন-ক্ষমতা লাভ করা। কিন্তু আজকাল কলেজের ডিগ্রির আর সে মূল্য নেই। কিন্তু ওই তথাকথিত ছোটলোকেরা যে সব কাজ করে অর্থোপার্জন করে আসছে চিরকাল তার মূল্য কোনোদিন কমবে না, বরং বাড়বে। হঠাৎ দেখতে পেলে দূরে কিরণ আসছে। কিরণ ফুটপাতের দিকে চেয়ে কবিতার লাইন ভাবতে ভাবতে আসছিল সম্ভবত! দিবসকে সে দেখতে পেল না। ভিড়ের দিকে স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে একবার চেয়ে গলির ভিতর ঢুকে পড়ল। নাচটাও শেষ হল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। মেয়েটি ট্যামবুরিন পেতে পয়সা চেয়ে বেড়াতে লাগল সকলের কাছে। পয়সা, আনি, দোয়ানি পড়তে লাগল। দিবসের কাছে আসতেই দিবস একটা টাকা দিয়ে ফেললে হঠাৎ। মেয়েটি দিবসের মুখের দিকে চেয়ে সেলাম করলে তাকে। দিবস তারপর ভিড় থেকে বেরিয়ে ঢুকল কিরণের গলিতে। কিরণও খোলার ঘরে থাকে। কড়া নাড়তে হল না, কপাট খোলাই ছিল।

"আরে দিবু যে!"

"আমি এখন দিবু নই, আমি হারুণ-অল-রশিদ, ছদ্মবেশে রাজ্য পর্যবেক্ষণ করতে বেরিয়েছি।"

কিরণ তখনও স্বপ্ন-তরণী থেকে অবতরণ করেনি। তখনও তার মনে জাগছিল

সব লগনের শেষে তাদের লগ্ন কি
নীহারিকায় মূর্তি ধরে স্বপ্ন কি
ঠাঁই পেল না যারা দিনের আলোকে
তাদের পথে এমন আলো জ্বালল কে
আকাশ ভরা কালোকে
রূপ দিয়েছ তোমরা বল কারা
অন্ধকারে আকাশ-ভরা তারা।

দিবসের কথায় তার তরণীর পালে আবার হাওয়া লাগল যেন। অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে দিবসের মুখের দিকে।

"মানে? বুঝতে পারছি না কিছু!"

"ল কলেজ ছেড়ে দিয়েছি বলে বাবা তাড়িয়ে দিয়েছেন বাড়ি থেকে। সরোদটাও ভেঙে দিয়েছেন। দিনের হারুণ-অল-রশিদ রাতের হারুণ-অল-রশিদ হয়ে গেছে হঠাৎ। অন্ধকারে সে দেখতে চাইছে নিজেকে যাচিয়ে, আবিষ্কার করতে চাইছে উত্তরাধিকারসূত্রে যে রাজত্বটা সে দিনের আলোয় ভোগ করতে তার চেয়েও মহত্তর কোনও রাজত্ব অন্ধকারে লুকিয়ে আছে কিনা!"

কিরণের চোখের দৃষ্টি আরও স্বপ্নময় হয়ে উঠল। উৎসাহিত হয়ে উঠল সে পরমুহূর্তে।

"সব খুলে বল দেখি। বস, ভালো করে বস।"

গহনচাঁদ বন্দোপাধ্যায় ব্যক্তিটি যে কেউ-কেটা নন এ কথা বিকাশের চক্ষে প্রতিপন্ন করার সুযোগ পেয়ে চুনীলাল পুলকিত হয়ে উঠেছিল। যে মিউজিক কনফারেন্সে ভারতের বিখ্যাত গুণীরা আমন্ত্রিত হয়ে সমবেত হবেন সেখানে সরোদ বাজাবার জন্যে, গহনচাঁদও যে অনুরুদ্ধ হয়েছেন এই গর্বে চুনীলাল যেন ফেটে পড়ছিল, কিন্তু তার গর্বের সঙ্গে স্বার্থ তো ছিলই, কিঞ্চিত আত্মপ্রসাদও মিশল যখন সে খবর পেল বিকাশও সেই কনফারেন্সের টিকিট কিনেছে। বিকাশবাবুর সম্মতি পেয়ে সে বিকাশবাবুর জ্যাঠা প্রকাশবাবুর সঙ্গেও দেখা করেছিল ইতিমধ্যে। অন্নদা বিশ্বাস প্রকাশবাবুকে যতটা বীভৎসরূপে চিত্রিত করেছিল চুনীলাল দেখল মোটেই তিনি সে রকম নন। চুনীলালের মনে হল অন্নদা নিশ্চয় কারও 'থু' দিয়ে পরের মুখে ঝাল খেয়েছে। প্রকাশবাবু লোকটি যদিও খুব গম্ভীর কিন্তু বেশ অমায়িক। বিবাহের প্রস্তাব বেশ মন দিয়ে শুনলেন, ফটোটি দেখে পছন্দ করলেন, বিকাশবাবু যে রঙ্গনাকে দূর থেকে দেখে পছন্দ করেছেন এক সংবাদটাও প্রণিধান করলেন ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে, তারপর অমায়িকভাবে যে কথাগুলি বলবেন তা আধুনিক-আধুনিকাদের কর্ণে মধু বর্ষণ করবে না হয়তো কিন্তু চুনীলালের কাছে সঙ্গত বলেই মনে হল। তিনি বললেন (অমায়িকভাবেই)—"দেখুন আমাদের

পারিবারিক প্রথা অনুসারে বিকাশের বিয়েতে আমাকেই কর্তৃত্ব করতে হবে। আর আমাকে কর্তৃত্ব করতে হলে আমাদের পারিবারিক নিয়মগুলি, যা এতকাল সবাই মেনে এসেছে তা না মেনে আমি পারব না। সে নিয়মগুলি হচ্ছে এই ঃ কন্যার কুষ্ঠি চাই। কুষ্ঠির যদি মিল হয় তাহলে আমরা মেয়েটিকে দেখতে যাব। বিকাশ যাবে না, আমরা, মানে কর্তৃপক্ষরা যাব। মেয়ে যদি পছন্দ হয় তখন দেনা পাওনার কথা হবে। দেনা পাওনা মানে এ নয় যে আমরা মেয়ের বাপকে পীড়ন করব। তবে খুব কম করে ধরলেও আজকালকার দিনে হাজার পাঁচেক টাকা লাগবে তার। বিকাশের মেয়েটিকে পছন্দ হয়েছে বলেই এত কম করে বলছি।"

প্রকাশবাবুর এই ধরনের কথাবার্তা অসঙ্গত মনে হয়নি চুনীলালের। এই দুর্মূল্যের বাজারে পাঁচ হাজার টাকায় যদি অমন একটা জামাই পাওয়া যায় তাহলে সেটা 'চীপ'ই বলতে হবে। 'ড্যাম চীপ্' বলতেও আপত্তি নেই চুনীলালের।

আর একটা কথাও ভাবছিল চুনীলাল। ঘড়িতে দম না দিলে ঘড়ি যেমন চলে না জামাইবাবুকেও তেমনি একটা প্যাঁচে না ফেললে উনি রোজগারের চেষ্টা করবেন না। বিয়ের খরচ অবশ্য ধার করে জোগাড় করতে হবে, কাশীর বাড়িটা বাঁধা দিলে সে টাকা সংগ্রহ করাও অসম্ভব হবে না, কিন্তু সেই ধারটা শোধ করবার তাগিদে জামাইবাবু হয় তো এখানে 'সঙ্গীত-ভবন'-টাতে ভালো করে মন দেবেন এবং উনি যদি ভালো করে মন দেন তাহলে হু হু করে 'সঙ্গীত-ভবন' চলবে, (গান বাজনা শেখার যা ঝোঁক হয়েছে আজকাল।) চুনীলালের সঙ্গে জামাইবাবু যদি হাপাহাপি ('হাফ এণ্ড হাফ'-এর বাংলা সংস্করণ) করেন তাহলে চুনীলালেরও সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে যদি একটা বাজনার দোকান খোলা যায়, কিংবা যদি কোনও দোকানদারের সঙ্গে কমিশনের বন্দোবস্ত করা যায়, তাহলে তো—।

সুতরাং মিউজিক কনফারেন্সে গহনচাঁদ নিমন্ত্রিত হওয়াতে চুনীলালের আকাশ-কুসুমের পাপাড়িতে পাপড়িতে রঙের ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। বিকাশবাবুরা দেখুক যে গহনচাঁদ যে-সে লোক নয়। আর পাঁচজনও দেখুক! কত বড় পাবলিসিটি হবে একটা।

চুনীলাল ইতিমধ্যে নিজেই হ্যান্ডবিল ছাপাতে দিয়েছিল।

গহনচাঁদ যদিও মিউজিক কনফারেন্সে যেতে রাজি হয়েছিলেন কিন্তু তারিখটা মনে ছিল না তাঁর।

চুনীলালের মুখে খবরটা শুনে আকাশ থেকে পড়লেন তিনি।

"আজই নাকি? বল কি! সীতারাম আর রমজানকে খবর পাঠাও তাহলে—"

"পাঠিয়েছি"—স্মিতমুখে উত্তর দিলে চুনীলাল।

"রঙ্গনাও যাবে কি?"

"যাবে বইকি, রঙ্গনাকে গান গাইতে অনুরোধ করছে যে ওরা।"

"রঙ্গনাকে? কেন?"

"আপনার মেয়ে বলে।"

"ও তাই নাকি!"

কিরণের স্বপ্নাচ্ছন্নভাব কিন্তু রইল না বেশিক্ষণ। দিবসও বেশিক্ষণ স্বপ্ন কুহেলী সৃজন

করতে পারল না। যদিও সে বলল যে হারুণ-অল-রশিদের ভূমিকা শেষ হলে হয়তো তাকে রবিনসন ক্রুশো বা ক্যাপ্টেন কুকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে, কিন্তু কিরণের সহজ বুদ্ধির আলোকে ব্যাপারটার স্থূলরূপ প্রকট হয়ে পড়ল একটু পরেই। দিবস যা ভয় করছিল তাই ঘটল শেষে। কিরণ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—"উকিল হওয়ার দোষটা কি?"

দিবস এ সবের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। মনের নেপথ্যালোকে আর এক দিবস আস্তিন গুটিয়ে মালকোঁচা মেরে অপেক্ষা করছিল। কবি দিবস অন্তর্ধান করার সঙ্গে সঙ্গে সে এগিয়ে এল।

"প্রথম [illegible] এযুগে ও পেশা অচল। আমরা যে যুগের স্বপ্ন দেখছি সে যুগে ঝগড়া মারামারি নীচতা মিথ্যাকথার স্থান নেই। দ্বিতীয়ত এটা কি লজ্জার কথা নয় যে চিরকালই আমি নাবালক [illegible] থাকব? নিজের পৌরুষে প্রতিষ্ঠিত হবাব সুযোগ পাব না?"

"তাতে তোমাকে বাধা দিচ্ছে কে"—গম্ভীরভাবে কিরণ প্রশ্ন করল।

"বাবার গদিতে বসে পিতৃসম্পত্তি ভোগ করা মানেই তাই।"

"ইচ্ছে করলে সে সম্পত্তির সদ্ব্যবহার তুমি করতে পার। উকিল হয়েও ঝগড়া মারামারি নীচতা মিথ্যাকথার বিরোধিতা করা অসম্ভব নয়।"

যুক্তিটা অকাট্য বলে মনে হল দিবসের, ক্ষণকালের জন্য থমকে গেল সে, কিন্তু পরমুহূর্তেই আর একটা কথা মনে পড়ে গেল তার। চমৎকার কথা সেটা। তার পরবর্তী উক্তিতে তাই শুধু উৎসাহ নয় একটু ঝাঁঝের আমেজও লাগল। কথাটা মনে পড়াতে শুধু যে সে উৎসাহিত হল তা নয়, ক্ষুব্ধও হল।

"আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাণী কি আমরা তোতাপাখির মতো আউড়েই যাব কেবল? হাতে কলমে সেটা করবার সামর্থ্য কি এ যুগের ছেলেমেয়েদেরও হবে না?"

"কি করতে চাস তুই?"

"আমি অবিলম্বে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে উপার্জন করতে চাই। অর্থাৎ সত্যিকারের শ্রমিক হতে চাই।"

"কিন্তু বাবার সঙ্গে এরকম ভাবে ঝগড়া না করেও সত্যিকারের শ্রমিক হওয়া যেত।"

"তুইও একথা বলছিস্? তুই তাহলে কলেজ ছেড়ে ট্রাম ড্রাইভার হতে গেলি কেন! তোর আদর্শই তো উদ্বুদ্ধ করেছে আমাকে।"

"আমার কথা আলাদা। আমার মা বাবা কেউ ছিল না। মামার গলগ্রহ হয়ে আর থাকতে পারলাম না। আত্মসম্মানে বাধল বলেই চলে আসতে হল।"

"আত্মসম্মান জিনিসটা কি তোরই একচেটে? না, মামার জায়গায় বাবা বসালেই তার মানে বদলে যায়? বাবার উপার্জিত অর্থ ভোগ করতে করতে তাঁর নির্দিষ্ট পথে নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে চলাটাও কি আত্মসম্মানজনক? তুই-ই বল।"

কিরণ চুপ করে রইল। সে বুঝল দিবসের সঙ্গে এখন তর্ক করে লাভ নেই। বরং সে এখন ঠিক কি করবে সেইটে জেনে নেওয়াই উচিত।

"তুই বাড়ি ফিরবি না তাহলে?"

"আপাতত নয়।"

"আমার এখানেই থাকবি?"

"না, আমি আস্তানা ঠিক করেছি একটা কারফরমা লেনে। চাকরিও জোগাড় হয়েছে একটা।"

"কি চাকরি?"

"একটা মেসের চাকর হয়েছি।"

"মেসের চাকরি।"

"হ্যাঁ, কি হয়েছে তাতে?'

দিবসের চোখে মুখে যে গর্বটা ফুটে উঠল তা নিতান্তই শিশুসুলভ মনে হল কিরণের। সে হেসে ফেললে।

"কিছু হয়নি। কিন্তু ওর চেয়ে ভালো চাকরি তুই পেতে পারিস নিশ্চয়।"

"তা হয়তো পারি। কিন্তু তাহলে হারুণ-অল-রশিদ হওয়া যায় না। আমি দেখাতে চাই যে হারুণ-অল-রশিদ সিংহাসনেও বসতে পারে, ছেঁড়া মাদুরেও বসতে পারে।"

দিবসের মুখের দিকে চেয়ে ভারি কৌতুক বোধ হল কিরণের। ছেঁড়া মাদুরে বসবার শখ হয়েছে—ছেঁড়া মাদুরে বসে সারাজীবন কাটাতে হচ্ছে যাদের তাদের অবস্থাটা তো জানে না। চকিতে ঊর্মির কথা মনে পড়ল একবার। হেসে বলল, "হঠাৎ হারুণ-অল-রশিদ সাজবার শখ যে হল তোমার!"

"আমি চাই নিজের মতে নিজের পথে চলতে। হারুণ-অল-রশিদের মতো আমিও চাই একঘেয়েমির কারাগার থেকে বেরিয়ে পড়তে। আবিষ্কার করতে চাই কোথায় আমার শক্তি কোথায় আমার দুর্বলতা। সাধারণ প্রজার বেশ ধরে হারুণ-জল-রশিদ যেমন রাত্রির অন্ধকারে অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কার করতেন নিজের স্বরূপ, আমিও তাই করতে চাই।"

কিরণের চোখ আবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, আবার স্বপ্নের ছোঁয়াচ লাগল তার মনে।

"একটু চা কর দিকি"—দিবস বলল হঠাৎ।

কিরণের স্পপ্নের ঘোর কেটে গেল। কবিকে সরিয়ে দিয়ে নানাভাবে-বিব্রত শ্রমিক কিরণ বেরিয়ে পড়ল রঙ্গমঞ্চে।

"স্টোভে তেল নেই। পারমিট পাইনি এখনও"—এবার কিরণের মুখে যে হাসি ফুটে উঠল তার অর্থ আগুন নিয়ে খেলা করতে যেও না। দারিদ্র্য ভয়ানক জিনিস।

"চল দোকানে তোকে চা খাওয়াচ্ছি" বলে জুতোয় পা গলাতে গলাতে সে হেসে চাইলে একবার দিবসের দিকে। দিবস উঠে গিয়ে তার সরোদটা টুং টাং করছিল।

"আমাকেও সরোদ একটা কিনতে হবে। শুরু করেছি যখন ভালো করে শিখতে হবে বাজনাটা।"

"ভালো করে শেখবার একটা সুযোগও উপস্থিত হয়েছে। ঊর্মি বলছিল কাশী থেকে গহনচাঁদবাবু এসে এখানে একটা গানের স্কুল খুলেছেন নাকি। সরোদের বিখ্যাত ওস্তাদ তিনি একজন। আমি ভাবছি ভরতি হব তাঁর স্কুলে যদি অবশ্য আর একটা টিউশনি পাই।"

আবার তার মুখে হাসি ফুটে উঠল একটা। কিন্তু ম্লান হাসি।

"মাইনে কত করে?"

"মাসে দশ টাকা শুনেছি।"

"চল না দুজনেই একসঙ্গে ভরতি হওয়া যাক, আমার কাছে কিছু টাকা আছে এখনও। মেসে যে চাকরিটা নিয়েছি তাতে আমার খাওয়াটা চলে যাবে। তারপর আরও কিছু জুটে যাবেই একটা নিশ্চয়। সন্ধের পর ভালো গোছের একটা টিউশনি পেলেই চলবে আপাতত। কালই সরোদ একটা কিনে ফেলি আগে, কি বল?"

ছেলেমানুষের মতো উৎসাহিত হয়ে উঠল দিবস। কিরণ হেঁট হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধছিল (পাম্পশু পরে না সে কখনও, মজবুত ডার্বিশুই তার পছন্দ) নিপুণভাবে ফিতে বাঁধা শেষ করে সে যখন মুখ তুলে চাইল তখন তার মনের গ্লানি কেটে গেছে, মুখে যে হাসি ফুটে উঠেছে তা আর ম্লান নয়, অন্তর্দ্বন্দ্বে জয়ী হয়েছে সে।

"তোর প্ল্যানটা কি বল দেখি, ঠিক বুঝতে পারছি না, এই সব ছোটখাট উঞ্ছবৃত্তি করেই জীবন কাটাবি না কি?"

দিবসের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল হঠাৎ।

"উঞ্ছবৃত্তি? উঞ্ছবৃত্তি কাকে বলিস তুই! মাইনে কম পেলেই সেটা উঞ্ছবৃত্তি হয়ে যায় নাকি! তুই কি উঞ্ছবৃত্তি করছিস?"

কিরণ আর একটু হাসলে। তার মনে হল দিবসের মন এখন যে তুরীয় অবস্থায় আছে সেখান থেকে তাকে মর্ত্যে নাবিয়ে আনা যাবে না। সে চেষ্টা না করে সে বলল, "চল বেরোন যাক। আমার ব্যাগটা এনেছিস্ তো?'

"এনেছি।"

দুজনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল এবং নীরবেই পাশাপাশি হাঁটল খানিকক্ষণ। দিবসের মন কিন্তু নিষ্ক্রিয় যে ছিল না তা তার পরবর্তী কথাগুলো থেকেই বোঝা গেল। কিরণের যে কথাটা তাকে আঘাত দিয়েছিল সে কথাটা থেকে সে অনেক দূর সরে গিয়েছিল। মাঝির হাতের ধাক্কা খেয়ে নৌকা যেমন তীর ছেড়ে ভেসে যায় তেমনি তার মন ভেসে চলেছিল কল্পনার স্রোতে. পালে লেগেছিল আনন্দের হাওয়া। বাড়ি থেকে বেবিয়ে আসবার পর থেকে যে অদ্ভুত একটা আনন্দ তার সমস্ত সত্তাকে ওতপ্রোত করে রেখেছিল—যা বাইরের ঘটনা-সংঘাতের ধূলোয় মাঝে মাঝে আবৃত হলেও অবলুপ্ত হচ্ছিল না একবারও—সেইটে হঠাৎ যেন জোর হাওয়ার মতো লাগল হঠাৎ এসে তার নৌকার পালে। তর্‌তর্ করে ভেসে চলেছিল সে।

"তুই বুঝিস্ না কিছু"—ঈষৎ হেসে প্রসন্ন কণ্ঠে বললে সে—"আমি এক জায়গায় বাঁধা থাকব একথা তুই ভাবছিস্ কেন? ছাতে ওঠাই আমার লক্ষ্য, সিঁড়ি নিয়ে আমি মাথা ঘামাব কেন? সব সিঁড়িই সমান, সব সিঁড়িই ভালো। আপাতত একটা চাকর হয়েছি কিন্তু সম্ভাবনা অনেক আছে। হেনরি ফোর্ড, ডেল কার্নেগী, সার আর এন, আচার্য জগদীশচন্দ্র,—সম্ভাবনা কি একটা? অনন্ত। এই গণ্ডীর বিরুদ্ধেই তো আমার বিদ্রোহ।"

কিরণ যদিও মনে মনে ভাবছিল কি করে দিবসকে আবার ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু দিবসের এই কথা শুনে আবার তার মনের সুর বদলে গেল। সাদা কাপড়ে খানিকটা রং ঢেলে দিলে যেন কেউ। কাল ট্রাম চালাতে চালাতে যে কথাটা তার মনে হচ্ছিল (যার ফলে সে কবিতাটা লিখেছে) যা আজও মনে হচ্ছিল একটু আগে সেই কথাটাই মনে পড়ল আবার।

"গণ্ডীর বিরুদ্ধে আমরা সবাই বিদ্রোহ করতে চাই" —মৃদু হেসে বলল সে—"কিন্তু মুশকিল হয়েছে গণ্ডীটা কোথায় তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। পথই দেখতে পাচ্ছি না আমরা। কাল আমার মনে হচ্ছিল আমরা সবাই যেন অন্ধ জোনাকীর দল, আমাদের প্রত্যেকেরই দীপ্তি আছে, কিন্তু সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না কেউ, অন্ধকারে পরস্পর ঠেলাঠেলি করছি, মারামারি করছি, অন্ধ আবেগে হাত পা ছুঁড়ছি, পরস্পরের চাপে মারা যাচ্ছি শেষে, শুয়ে পড়ছি পথের উপরই এবং শুয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত জানতে পারছি না যে এতক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম পথের উপর নয় শব-স্তূপের উপর।"

এই পর্যন্ত বলে থেমে গেল কিরণ, তার বাকরোধ হয়ে গেল আবেগের আতিশয্যে। দিবসের সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চাইতেই কিন্তু সামলে নিলে সে আবার। মৃদু হেসে বললে, "শেষকালে কি মনে হল জানিস্? মনে হল অন্ধকারে যারা পথ হারিয়ে ফেলেছে তারাই বোধ হয় আকাশ-ভরা-তারা।"

দিবস কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল কিন্তু থেমে গেল। চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল তারা। দোকানের ভিতর থেকে রেডিওতে সরোদের গৎ বেজে উঠল একটা।

"বা, চমৎকার তো, চল শোনা যাক, এই তো চায়ের দোকান" চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ল দুজনে। দু' পেয়ালা চায়ের কথা বলে তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল সরোদের বাজনাটা।

"বাঃ কে বাজাচ্ছে'

"কোনো বড় ওস্তাদ নিশ্চয়?"

পাশে আর একজন বসে চা খাচ্ছিলেন, তিনি বললেন, "মিউজিক কনফারেন্স থেকে রিলে করছে—"

চা খাওয়া শেষ করে দুজনে আবার যখন ফুটপাথে নাবল তখনও সরোদ বেজে চলেছে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল দুজনে। একটু পরেই বাজনা থামল, রেডিও ঘোষণা করল—'কাশীর বিখ্যাত ওস্তাদ সঙ্গীতাচার্য গহনচাঁদ এতক্ষণ সরোদ বাজিয়ে শোনালেন।'

"ও তাই।" কিরণ বললে।

"ইনি স্কুল খুলেছেন?"

"উর্মি বলছিল।"

কিরণ অন্যমনস্ক হয়ে গেল একটু। এর পরই ঠিক তার যে কথাটা মনে পড়ল—যদিও অবশ্য উর্মিকে কথা দেয়নি সে—তাতে তার চিন্তাধারা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল একটু।

'একটা সরোদ কিনে ফেলা যাক এখনই, চল।"

"আমাকে টিউশনি করতে যেতে হবে এখন।"

"কাল তোর সময় আছে?"

"কাল সকালে বাড়িতে থাকব।"

"কিন্তু সে সময় আমার যে চাকরি!"

রেডিও আবার ঘোষণা করল—"এর পর গান গাইছেন শ্রীমতী রঙ্গনা দেবী।"

সরোদ কেনার কথাটা চাপা পড়ে গেল। রঙ্গনার গান শুনতে শুনতে আবার পথ চলতে

লাগল তারা। এই গানের সুরে নেপথ্যলোকে যে যোগাযোগের সূচনা হল তার ভবিষ্যৎ রূপের আভাসমাত্রও যদিও দিবসের মনে জাগবার সম্ভাবনা ছিল না তবু তার মনে হতে লাগল কি যেন একটা আসন্ন। আসন্ন বসন্তের আশায় গাছের শাখায় শাখায় যেমন কিশলয়ের ঘুম ভাঙে রঙ্গনার গানের সুরে দিবসের মনে তেমনি কি যেন একটা জাগল, কি সেটা তা বিশ্লেষণ করবার জন্যে তার আগ্রহ হল না, একটা অস্পষ্ট আবেশ তবু ধীরে ধীরে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল ঊষালোকের মতো। কিরণ ভাবছিল ঊর্মির কথা। ঊর্মি নিশ্চয়ই গেছে কনফারেন্সে গান শুনতে। তাকেও যেতে বলেছিল! অনেক করে বলেছিল। বলেছিল তার জন্যে সে একটা টিকিট কিনে রাখবে। পাগল নাকি!

"একদিন টিউশনি করতে না গেলে কি আর হয়?" —ঊর্মির আবদার-মাথা মুখখানা মনে পড়েছিল কিরণের। কিরণ মানা করেছিল তাকে টিকিট কিনতে। কেনেনি বোধ হয়। কেনা উচিত নয় অন্তত।

....একই গানের সুর দুজনকে নিয়ে গেল দুই জগতে। নীরবে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল তারা।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

তার পরদিন দিবস পথ চলছিল একা। ঘাড় হেঁট করে আপন মনে হাঁটছিল সে, কোলকাতা শহরে নয়, নিজের জগতে। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সে সচেতন ছিল না। সরোদ কিনবে বলে বেরিয়েছিল সে বাড়ি থেকে। যে দোকান থেকে প্রথম সরোদটা কিনেছিল সে দোকানের উদ্দেশেই বেরিয়েছিল। ঠিক করেছিল পায়ে হেঁটেই সেখানে যাবে, ঠিক ভাবে গেলে পায়ে হেঁটেই সেখানে গিয়ে পৌছতেও পারত যথাসময়ে। কিন্তু তা হল না, কারণ বাসা থেকে বেরিয়েই সে, কোলকাতা শহরে নয়, নিজের জগতে হাঁটতে লাগল। বাবা এবং ব্রজর জন্যে মন-কেমন-করার পাতলা কুয়াশায় সে জগতের সমস্তটাই প্রায় ঢাকা। তার একগুঁয়েমিটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে অটল হয়ে। চারিধারে জঙ্গল, জঙ্গলের অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়তা অদৃশ্য আলেয়ার মতো প্রলুব্ধ করছে, অচেনা পাখির কাকলী ভেসে আসছে মাঝে মাঝে, মোড় ফিরতেই চোখে পড়ল একটা গাছ, প্রৌঢ় গাছ, অজস্র ফুলে ভরা, হেলে আছে, মনে হচ্ছে সস্নেহে অভ্যর্থনা করছে যেন তাকে! গাছের আড়াল থেকে সহসা ভেসে এল সৌদামিনীর সস্নেহে ভর্ৎসনা—'মাইনে তো পাবে মোটে কুড়িটি টাকা, মোমবাতি কিনে পয়সা নষ্ট করা কেন? কি কাণ্ড!' তারপর কুয়াশা, কুয়াশা, কুয়াশা। একটু পরে কুয়াশা ভেদ করে দেখা দিল আর একটা গাছ। ঋজু, দীর্ঘ আকাশচুম্বী। আকাশ থেকে গাছটা যেন কথা কইলে তার সাহেব প্রফেসারের কণ্ঠে—'সুযোগ পেলে রিসার্চ করতে পারবে তুমি, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পেলে খুব খুশি হব।' মিলিয়ে গেল গাছটা। পরমুহূর্তেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলেন গোবর্ধন, হরিদাস, অঘোর আর ধূর্জটি। যে মেসে সে চাকরি নিয়েছে সেই মেসের বাসিন্দা চারজন। তার মালিক চতুষ্টয়। রাজনীতিমত্ত গোবর্ধন, বিশেষত্বহীন অঘোর এবং সঙ্গীত-পাগল ধূর্জটি কলরব করতে করতে এলেন এবং চলে

গেলেন। রসিক স্বল্পভাষী হরিদাস কেবল দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল তার দিকে চেয়ে। যে জাতির লোক সাধারণত মেসে চাকর হয়ে আসে দিবস যে ঠিক সেই জাতীয় নয় এ সন্দেহ হরিদাসেরই হয়েছিল। কিন্তু একটি কথাও বলেননি তিনি। না বললেও তাঁর চোখের দৃষ্টিতে এ খবরটুকু টের পেয়েছিল দিবস। পরমুহূর্তেই সহসা ছবির ফ্রেমের কথা মনে পড়ল তার। হরিদাসবাবুর বিছানার ঠিক উপরে যে ফটোখানা টাঙানো আছে তার ফ্রেমটা চমৎকার। ওই রকম ফ্রেম দিয়েই সে বাবার ছবিটাও বাঁধাবে। ভোরে উঠেই সে চলে গিয়েছিল তার ফটোগ্রাফার বন্ধুর কাছে। বাবার ফটোখানা নিয়ে এসেছে। ....সব মিলিয়ে গেল আবার। কুয়াশা নেই, জঙ্গল পার হয়ে এসেছে সে অনেকক্ষণ, প্রকাণ্ড মাঠের মাঝখান দিয়ে একটা পায়ে-হাঁটা-পথ বিসর্পিত রেখায় চলে গেছে চক্রবালের দিকে। সূর্য উঠছে, লাল হয়ে উঠেছে পূর্বাশা, চতুর্দিক আনন্দে পরিপূর্ণ....

....হঠাৎ দিবসের খেয়াল হল যে গলিটায় ঢুকলে সে বাজনার দোকানে সহজে গিয়ে পৌঁছতে পারত সে গলিটাকে সে পিছনে ফেলে এসেছে অনেকক্ষণ আগে। হেঁটে যেতে গেলে আরও মাইল খানেক হাঁটতে হয় আবার উল্টো দিকে। সামনে ট্রাম আসছিল একটা, যদিও ভিড় খুব, তবু তাতেই উঠে পড়ল দিবস। ট্রামে পুরুষের সীটগুলো সব ভরতি। লেডিজ সীটগুলোও। একটি লেডিজ সীটে রঙ্গনা বসেছিল কেবল। তার পাশে জায়গা খালি ছিল খানিকটা। অনেকদিন আগে রবীন্দ্রনাথের দু'লাইন একটা কবিতা পড়ে তার যে রকম মনে হয়েছিল রঙ্গনাকে দেখে সেই রকম মনে হল তার প্রথমটা। দু'লাইন কবিতাটি এক নজরে পড়ে তার সমস্ত রস সারা চিত্তে নিমেষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, রঙ্গনাকে দেখেও ঠিক তেমনি হল। নিমেষের মধ্যে ওর সমস্ত রূপটা মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গেল যেন ফটোগ্রাফের মতো ত্বরিত অথচ নিখুঁত পদ্ধতিতে। তার পাশে জায়গা খালি ছিল বলেই তার দিকে চেয়েছিল সে, ক্ষণকালের জন্য চেয়েছিল, কিন্তু ওইটুকুর মধ্যেই কাণ্ডটা ঘটে গেল। রঙ্গনা দিবসকে দেখতে পায়নি, কারণ সে বাইরের দিকে চেয়েছিল। 'ট্রামে' 'বাসে' উঠলে সে বাইরের দিকেই চেয়ে থাকে একাগ্র দৃষ্টিতে, তার ভয় হয় অন্যমনস্ক হলেই বুঝি নাববার জায়গাটা পেরিয়ে যাবে। যে সব ট্রাম-আরোহীরা সমস্তক্ষণ কোণে চোখ বুজে বসে থেকে ঠিক সময়ে উঠে নেবে যেতে পারেন তাদের মতো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় রঙ্গনার ছিল না। বাইরের দিকেই চেয়ে বসেছিল সে। দিবসের চকিত দৃষ্টি যে একবার তার সর্বাঙ্গে সঞ্চরণ করে অন্যদিকে সরে গেল তাও সে টের পেল না। দিবসকে দেখতে পেল না। দিবসকে দেখতে পেল সে একটা দুর্ঘটনার ফলে। ট্রামটা ঘচাং করে থেমে গেল হঠাৎ এবং দিবস হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল নিজেকে। রঙ্গনার সঙ্গে চোখো-চোখি হয়ে গেল তার। সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গনা একটু সরে গিয়ে ভদ্রভাবে বললে, "বসবেন? বসুন না এইখানে।"

"না থাক—"দিবসের কণ্ঠস্বরে শুধু যে সমীহ ফুটে উঠল তা নয়, একটু আতঙ্কের সুরও বেজে উঠল। কিছুদিন পরে এ যুগের স্ত্রীপুরুষের সান্নিধ্য বিষয়ে যে বক্তৃতা দিবস করবে রঙ্গনার কাছে তার সঙ্গে তার এখনকার আচরণের কোনও মিল দেখা গেল না। ট্রামের ডাণ্ডাটা ধরে সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অপ্রস্তুত মুখে। কানের পাশটা গরম এবং লাল হয়ে উঠল একটু। রঙ্গনাও আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলে না তাকে। দিবসও আর দ্বিতীয়

বার ফিরে চাইলে না তার দিকে। দিবসের মনে যে সব ভাব জাগছিল তা অবর্ণনীয় নয় এবং রঙ্গনা-বিষয়কও নয়। ট্রাম গাড়ির আরও কি কি উন্নতি হওয়া উচিত তাই ভাবছিল সে। ট্রাম গাড়ি দোতলা হলে ক্ষতি কি? আর একটু চওড়া করা সম্ভব নয় বোধ হয়, সম্ভব হলে করত নিশ্চয় ওরা। আর একটা কথা মনে পড়াতে আরও অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে। তার মনে পড়ল এইচ. জি, ওয়েল্‌স্ না কে একজন লিখেছেন ভবিষ্যৎ যুগে ফুটপাথই চলবে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবে....নিউক্লিয়ার এনার্জির যুগে হবে হয়তো....হঠাৎ ট্রামটা থেমে গেল। দিবস দেখল অনেকেই নাবছে। তাকেও নাবতে হবে এখানে। তাড়াতাড়ি নেবে পড়ল। নেবেই দেখল সেই মেয়েটিও নেবেছে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয় পরমুহূর্তেই রঙ্গনা মৃদু হেসে তাকে যে প্রশ্নটা করল তার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না সে। অবাক হয়ে গেল।

"আচ্ছা, আপনার বসতে সংকোচ হল কেন বলুন তো?"

সংকোচ কথাটা যেন চাবুকের মতো আঘাত করল তাকে। কথাটা সত্য বলেই আঘাতটা বেশি লাগল। সংকোচের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যে কারণগুলো জড়িয়ে থাকে সেগুলো সে অজ্ঞাতসারে এই মেয়েটির উপর আরোপ করেছে বলে লজ্জাও হল বেশ। জবাবদিহির সুরে তাই বলল—

"সংকোচ ঠিক নয়, ওটা আপনাদের প্রাপ্য সম্মান।"

"শুধু শুধু আমাকে সম্মানই বা করতে যাবেন কেন আপনি? কিন্তু আপনার ধরন-ধারণ দেখে সে কথাও তো মনে হল না। মনে হল আমি যেন অস্পৃশ্যা আর আপনি যেন আমার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে চাইছেন।"

"না, না, ওকথা ভাবছেন কেন?"

"না ভেবে কি করি বলুন? আমাদের নিশ্চয়ই আপনারা অশুচি মনে করেন তাই ট্রামে বাসে 'ফর লেডিজ ওনলি' লেবেল সেঁটে আমাদের তফাতে রাখবার চেষ্টা করছেন, আর ভাবছেন আমাদের খুব সম্মান করা হচ্ছে। আপনাদের ওই নকল শিভ্‌লরি যে অপমানেরই উলটোপিঠ তা বুঝতে বাকি নেই আমাদের।"

রঙ্গনার চোখে একটা বিদ্যুদ্দীপ্তি খেলে গেল। সে আর কিছু না বলে গটগট করে চলে গেল পিছন ফিরে। বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দিবস। আজকালকার মেয়েদের মধ্যেও এমন মুখরা তার চোখে পড়েনি তো। গায়ে পড়ে ঝগড়া করে গেল। রঙ্গনা যে দিকে গেল দিবসেরও পথ সেই দিকে। দিবস হয়তো অনুসরণ করত তার, কিন্তু বাধা পড়ে গেল।

"এই যে দিবুদা—"

"আরে বিনোদ যে, কি খবর?"

"আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ভালোই হল। আমাদের স্টুডেন্টস্ গ্যাদারিংয়ে আপনাকে কিছু বলতে হবে এবার। আপনারই বাড়ি যাচ্ছিলাম।"

"বলতে হবে? এত লোক থাকতে আমাকে কেন?"

"বাঃ আপনাকে বলব না তো কাকে বলব? গেল বছর আপনি যা চমৎকার বলেছিলেন। আপনাকে এবার সভাপতি করেছি আমরা।"

"আমাকে না জিগ্যেস করেই?

"হ্যাঁ ছাপিয়েও ফেলেছি"—একমুখ হেসে বিনোদ ছাপানো নিমন্ত্রণ পত্র বার করলে পকেট থেকে—"আমার উপরই ভার ছিল আপনার মত নিয়ে কার্ড ছাপতে দেবার কিন্তু আপনার বাড়ি গিয়ে দেখা পেলাম না, তাই কপাল ঠুকে ছাপতে দিয়েছিলাম। আপনাকে রাজি হতেই হবে দিবুদা, তা নাহলে ওই দীনেনবাবু খেয়ে ফেলবে আমাকে।"

"কি মুশকিল!"

"না, কোনও আপত্তি শুনব না দিবুদা।"

"কবে?"

দিবস কার্ডটা পড়ে দেখল।

"ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে?"

"হ্যাঁ। আপনি রাজি তো?"

"না হয়ে আর কি করি বল! তোমাকে বাঁচাবার জন্যেই রাজি হতে হবে।"

বিনোদের হাসি আকর্ণ-বিস্তৃত হয়ে উঠল।

"আমি জানতাম আপনি আমার কথা ঠেলতে পারবেন না, তাই ভরসা করে ছাপিয়ে ফেললাম। আচ্ছা চলি এখন, অনেক কাজ বাকি এখনও।"

বিনোদ চলে গেল। দিবস যেদিকে যাবে ঠিক তার উলটো দিকে চলে গেল সে। দিবস দাঁড়িয়ে রইল ক্ষণকাল। অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মনে হল তার অতীত জীবনটা, যে জীবনের সঙ্গে তার বাবা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছেন, তাকে যেন ডাক দিয়ে গেল। পরমুহূর্তে সে ঘাড় তুলে চাইল রঙ্গনা যেদিকে গেছে সেই দিকে। অযৌক্তিকভাবে তার মনে হল ঐ মেয়েটি সভায় আসবে? কলেজের ছাত্রী হলে আসতে পারে। ধরন দেখে কলেজের ছাত্রী বলেই মনে হয়....

নিতাই নন্দীর বাদ্যযন্ত্রের দোকানে ঢুকে রঙ্গনা বেশ ভদ্রভাবেই বললে, "আমাকে ভালো দেখে একটা সেতার দিন তো।"

"সেতাব? ও আচ্ছা।"

নিতাই ভিতরে ঢুকে গেলেন এবং যে সেতারটি বার করে আনলেন তা পছন্দ হল না রঙ্গনার। এবাবও বেশ ভদ্রভাবে বললে যে, "আর একটু বড় হলে ভালো হত। বড় নেই?"

"আছে।"

আবার ঢুকে গেলেন তিনি ভিতরে। রঙ্গনা এদিক ওদিক চাইতে লাগল। হঠাৎ সামনের ক্যালেন্ডারের একটি ছবির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হল তার। একটি অর্ধনগ্ন যুবতী ঈষৎ অশ্লীল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। পরমুহূর্তেই নিতাই নন্দী একটি বড় সেতার নিয়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। এইবার রঙ্গনার কণ্ঠে যে সুর ফুটল তা ভদ্র নয় মোটেই। বেশ রুক্ষকণ্ঠেই সে বললেন. "আপনারা কি চান না যে কোনও ভদ্রমহিলা আপনাদের দোকানে আসুক?"

"নিশ্চয়ই চাই, এ কি কথা বলছেন!"

"ওই ছবি টাঙিয়ে রেখেছেন কেন তাহলে?"

এর উত্তরে আমতা আমতা করা ছাড়া নিতাই নন্দীর অন্য উপায় ছিল না। কাচুমাচু ভঙ্গিতে হাত কচলে তিনি শুরু করলেন—"ওটা মানে, হয়েছে কি?"—কিন্তু শেষ করতে পারলেন না।

রঙ্গনা থামিয়ে দিলে তাকে।

"খুলে নামিয়ে রেখে দিন। বাড়িতে গিয়ে টাঙাবেন যদি প্রবৃত্তি হয়।"

রঙ্গনার স্ফুরিতাধর ভেদ করে কথাগুলি এমন একটা তেজের সঙ্গে বেরুল যে প্রৌঢ় নিতাই নন্দী তা অমান্য করতে সাহস করলেন না।

"বেশ, বেশ তাতে আর কি!"

তাড়াতাড়ি ক্যালেন্ডারখানা নামিয়ে গুটিয়ে টেবিলের একধারে রেখে দিলেন। রঙ্গনা হঠাৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে দেখতে লাগল দ্বিতীয় সেতারটা। তারপর মৃদু হেসে বলল, "এটাও পছন্দ হচ্ছে না।"

ঠিক এই সময় দিবসও ঢুকল এবং বলল, "আমাকে একটা সরোদ দেখান তো।"

"আসুন।"

তারপর রঙ্গনার দিকে ফিরে নিতাই নন্দী বললেন, "এটাও পছন্দ হচ্ছে না? আর একটা আনি তাহলে?"

আবার ভিতরের দিকে চলে গেলেন তিনি। রঙ্গনাকে এখানে দেখে দিবস শুধু যে বিস্মিত এবং পুলকিত হল তা নয় তার সমস্ত পৌরুষ যেন আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল নিজের মহিমা প্রমাণ করবার জন্য। যে মেয়েটি একটু আগে তাকে নিতান্ত হেয় প্রতিপন্ন করে চলে এসেছিল, তার কাছে নিজেকে প্রকাশিত করবার দুর্দম বাসনা উতলা করে তুলল তার সমস্ত সত্তাকে সহসা। চোখো-চোখি হতেই কিন্তু ছোট্ট একটা নমস্কার করা ছাড়া আর কিছু করতে পারলে না সে। রঙ্গনাও প্রতি নমস্কার করল মৃদু হেসে। নিতাই নন্দী আবার ঢুকলেন আর একটা সেতার নিয়ে। রঙ্গনা নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল সেটা।

"এর ঘাটগুলো পছন্দ হচ্ছে না, আর একটা দেখাবেন?"

"দেখাব বৈ কি!"

আবার ঢুকে গেলেন নিতাই নন্দী ঘরের ভিতর এবং আর একটা সেতার বার করে নিয়ে এলেন।

....দিবস চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মনে মনে সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তার এমন কি ঐশ্বর্য আছে যার প্রভাবে সে মুগ্ধ করে দিতে পারে এই মেয়েটিকে? সন্ধান করতে গিয়ে হতাশ হয়ে পড়ছিল। যেখানে তার অনন্ত সম্পদ বিচিত্র অজস্রতায় ছড়িয়ে আছে সেই কল্পলোকে একে নিয়ে যাওয়া যাবে না এখন। কোনও কালেই যাবে না বোধ হয়। একটু পরেই তো এ চলে যাবে, হারিয়ে যাবে ভিড়ের মধ্যে। জানতেও পারবে না ক্ষুদ্র পরমাণুর কি অসীম সম্ভাবনার স্বপ্ন তন্ময় করেছিল তাকে, সুযোগ পেলে পৃথিবীর ইতিহাসই বদলে দিতে পারতো হয়তো সে —হঠাৎ সেই প্রফেসারের মুখটা মনে পড়ল আবার—তিনি চিঠিটা পেয়েছেন কি—আজ কত তারিখ—বহুকাল আগে সে যেন বাড়ি থেকে বেরিয়েছে মনে হচ্ছিল..... তারিখ মনে নেই....

এ সেতারটাও পছন্দ হল না রঙ্গনার।

"এর তুম্বাটা বড় ছোট। তুম্বাটা আর একটু বড় হলে—"

"আপনি দয়া করে একটা কাজ করুন না তাহলে। ভিতরে অনেকগুলো সেতার টাঙানো আছে, নিজেই বেছে নিন যেটা পছন্দ হয়। আসুন, ওই ভিতরের দিকে টাঙানো আছে।"

"সেই ভালো।"

রঙ্গনা ভিতরের দিকে চলে গেল। নিতাই নন্দী তখন দিবসের দিকে চেয়ে বললেন, "আপনাকে সরোদ দেব একটা?"

দিবস তখন চারদিকে চেয়ে দেখছিল এবং এই প্রশ্নের উত্তরে সে যা বললে তা সরোদ বিষয়ক নয়।

"আপনার এখানে ক্যালেন্ডার দেখছি না? আজ কত তারিখ বলতে পারেন?"

"আজ তিরিশে। ক্যালেন্ডার থাকবে না কেন, ছিল, ওই ভদ্রমহিলার ধমকে নামিয়ে রাখতে হল।"

এর পরেই ক্ষুণ্ণ অথচ অনুযোগপূর্ণ কণ্ঠে নিতাই নন্দী বললেন, "আচ্ছা, এই ছবিখানা কি দোষ করেছে বলুন তো, ভালো বিলিতি ছবি—"

ক্যালেন্ডারের ছবিখানা খুলে দেখালেন তিনি দিবসকে কিন্তু পরমুহূর্তেই রঙ্গনার পায়ের সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি আবার গুটিয়ে রাখতে হল সেটা। খুব ভালো একটি সেতার হাতে করে রঙ্গনা এসে ঢুকল।

"এইটে পছন্দ আমার, এইটে দিন। দাম কত এর?"

"পঞ্চান্ন টাকা।"

"পঞ্চান্ন টাকা?"

রঙ্গনার মুখ শুকিয়ে গেল, একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল সে। এত কাণ্ড করবার পর কোন মুখে দোকানীকে সে বলবে যে তার কাছে মাত্র চল্লিশটি টাকা আছে! গহনচাঁদ তাকে চল্লিশ টাকার বেশি দেননি, সে-ও ভাবেনি যে চল্লিশ টাকার বেশি লাগতে পারে। কিন্তু সত্যি কথাটা বলতেই হবে, উপায় নেই।

"অত টাকা তো সঙ্গে নেই। গোটা পনের টাকা কম পড়ছে, আচ্ছা, আপনি ওটা আলাদা করে রেখে দিন, আমি পরে এসে নিয়ে যাব।"

এইবার বাগ পেলেন নিতাই নন্দী। ঝালটা ঝাড়লেন। কিন্তু মধুর হেসে। পাকা দোকানদার তিনি।

"বেশ, আলাদা করেই রেখে দিচ্ছি, আপনি যা বলেন তাতেই রাজি আমি। তবে ওরকম সেতার মাত্র একটিই আছে, নগদ টাকা নিয়ে যদি কোনও খদ্দের আসে তাহলে, মানে, একটু—বুঝতেই পারছেন—"

নিজের দলের গোল হয়-হয় দেখে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ফুটবল খেলোয়াড় যেমন ছুটে আসে দিবসও অনেকটা তেমনি করে ছুটে এল মনে মনে। শোভন-অশোভন জ্ঞান রইল না তার আর।

"যদি কিছু মনে না করেন টাকাটা আমি দিয়ে দিতে পারি। আমার কাছে টাকা রয়েছে। আপনি না হয় পরে দিয়ে দেবেন আমাকে।"

"আপনি দেবেন? না থাক, আমিই পরে এসে নিয়ে যাব।"

"বিক্রি হয়ে যায় যদি। নিয়ে যান না, আমাকেই টাকাটা পরে দিয়ে দিবেন, ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি।"

"বেশ, দিন তবে।"

মুচকি হেসে রঙ্গনা কথাটা এমন ভাবে বললে যেন সে দিবসকে অনুগ্রহ করছে।

....দিবসের বাসার ঠিকানা এবং সেতারটা নিয়ে রঙ্গনা চলে গেল। দিবস নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার নূতন জীবনে যে নূতনতর পর্ব আকস্মিকভাবে আরম্ভ হয়ে গেল তারই অভিনবত্বটা আচ্ছন্ন করে রাখল তার মনকে খানিকক্ষণ। এর পরিণতি কি হবে তা তখন যদিও সে ভাবতে পারেনি (কে-ই বা পারে) কিন্তু এই পরিচয়টা যে ক্ষণস্থায়ী সামান্য পরিচয় মাত্র নয়, এ যে অসামান্য কিছু একটা, এ যেন তার অন্তরাত্মা সভয়ে অনুভব করছিল। যে যোগাযোগ পরে উৎফুল্ল করবে গোবিন্দ সাণ্ডেলদের, বিভ্রান্ত করবে চুনীলালকে, হতভম্ব করবে গহনচাঁদকে তার প্রথম সূত্রপাত ভীত করে তুলেছিল দিবসকে। দুর্গপ্রাকারে শত্রু হানা দিয়েছে খবর পেলে সেনাপতির যেমন ভয় হয়, সংঘদ্বারে প্রথম নারীর আবির্ভাবে বুদ্ধ যেমন ভীত হয়েছিলেন সেই ধরনের একটা ভয় যেন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও জটিলতর ব্যাপারও ঘটছিল। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে মনে মনে যেমন সশাস্ত্র হয়ে উঠছিল তেমনি জ্ঞাতসারে আবার উৎসুক হয়েও উঠেছিল। অধীর চিত্তে ভাবছিল কখন আবার দেখা হবে তার সঙ্গে। আজই সে দামটা দিতে আসবে কি? কখন?

"আপনাকে সরোদ দেখাই?"

দিবসের ঘোরটা কেটে গেল।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ভালো জিনিস দেবেন।"

কিরণ নিজের ঘরে একা বসে কবিতা লিখছিল।

আমার হৃদয়ে মনে আস যাও ক্ষণে ক্ষণে
মুগ্ধ নয়ন-পথ দিয়া,
এই দেখা এই এই চাওয়া এই ক্ষণিকের পাওয়া
এই তব পরিচয় প্রিয়া,
এর বেশি আছে যাহা নাগাল পাব না তাহা
থাক দূরে থাক তা নিভৃতে,
পেয়েছি যতটা আমি তাই মোরে দিবাযামী
ভরে তোলে রঙে রসে গীতে।

এই পর্যন্ত লিখে থেমে গেল সে। কলমটা নামিয়ে রেখে বসে রইল চুপ করে। উর্মির কথাই ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণ আগে এসেছিল সে। সত্যিই সে তার জন্যে প্রাইভেট টিউশন জোগাড় করেছে একটা। মিউজিক কনফারেন্সে তার জন্যে টিকিটও কিনেছিল। ভর্তি হয়েছে গহনচাঁদবাবুর স্কুলে। রঙ্গনাকে তার গানগুলো দিয়ে এসেছে। নূতন বাসার একটা সন্ধান পেয়েছে না কি! সেই বাসার সুবিধা-অসুবিধার নিখুঁত বর্ণনা করছিল এতক্ষণ ধরে। এক মিনিট চুপ করে ছিল না। ঝরনার মতো কলকল করছিল সর্বক্ষণ। কেন আসে, কি চায় ও? চুপ করে বসে রইল কিরণ। যা তার মনে হতে লাগল তাকে ভাষায় লিপিবদ্ধ করবার প্রবৃত্তি আর হল না। একটা অপূর্ব রস ধীরে ধীরে আবিষ্ট করে ফেলতে লাগল তার সমস্ত চিত্তকে। চুপ করে বসে রইল সে।

মেস। আপিস থেকে ফিরেছেন সবাই। ধূর্জটিবাবু আপিসে যায় না, তিনি দিবানিদ্রা শেষ করে উঠেছেন একটু আগে। গোবর্ধনবাবুর সকালবেলায় কাগজ পড়বার অবসর হয় না। কাগজটা কেনেন হরিদাসবাবু, তিনিই পড়েন সকালে। তাঁর পড়া শেষ হতে না হতেই অঘোরবাবুর ছোঁ মেরে নিয়ে নেন সেটা। ন'টার সময়ই আপিসে বেরুতে হয় গোবর্ধনবাবুকে। তাছাড়া অঘোরবাবুর মতো অমন করে ছোঁ মেরে নিয়ে দায়-সারা-গোছ কাগজ পড়ায় তৃপ্তি হয় না গোবর্ধনবাবুর। তিনি প্রত্যেক খবরটি খুঁটিয়ে রসিয়ে রসিয়ে পড়তে চান। আপিস থেকে এসে হাত মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে কাগজটি নিয়ে বসেন তিনি।

.... হরিদাসবাবু দাড়ি কামাচ্ছিলেন। হরিদাসবাবু লোকটিও সাধারণ-পন্থী নন। সকালবেলা দাড়ি কামান না। কারণ ঘুমোন অনেক রাত্রে, ওঠেন দেরিতে। উঠে চা খেয়ে খবরের কাগজ পড়ে চিঠিপত্র লিখতে লিখতেই দশটা বেজে যায় তাঁর। এগারটার সময় আপিস। তাই বিকেলে দাড়ি কামান।

গোবর্ধন নিবিষ্টচিত্তে বসে কাগজ পড়ছিলেন। ভুরু এবং কপাল বেশ কুঁচকে ছিল।

ভৃত্য-বেশি দিবস দুজনের পাশে দু পেয়ালা চা রেখে গেল।

গোবর্ধন হঠাৎ হরিদাসের দিকে চেয়ে বললেন, "উফ, এই লোকটাই ডোবাবে।"

হরিদাসবাবুর দাড়ি কামানো শেষ হয়েছিল। তিনি আয়নার সামনে নানারকম মুখভঙ্গি করে নানাভাবে নিজের মুখশ্রী দেখছিলেন। অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন, "কে?"

"কে আবার! আমাদের জহরলাল। যারা বেশি বাক্যবাগীশ তারা কাজের লোক হয় না প্রায়ই। একেই তো দেশ ডুবে আছে তার উপর বক্তৃতার বান ডাকাচ্ছে ও।"

হরিদাস কোনও জবাব দিলেন না। তাঁর চোখ দুটি হাস্যদীপ্ত হয়ে উঠল শুধু। মুখটি মুছে চায়ের পেয়ালা তুলে চুমুক দিলেন একটা। দিবস আবার ঘরে ঢুকল এবং ঘর ঝাড়ু দিতে লাগল। দিবস যতক্ষণ এখানে থাকে একটি কথা বলে না। নীরবে কাজগুলি শেষ করে চলে যায়।

"দেশে অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, সে সব চুলোয় গেল, ইন্ডোনেশিয়ার জন্যে মাথা ঘামিয়ে মরছেন উনি।"

হরিদাস তবু কোনো কথা বললেন না, নীরবে চা খেয়ে যেতে লাগলেন। গোবর্ধন কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। তিনি হরিদাসবাবুর চোখের দৃষ্টি থেকেই তাঁর সম্ভাব্য জবাবটা অনুমান করে নিয়ে বললেন—

"তুমি বলছ কি করবে তাহলে? ওই ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারগুলোকে টপাটপ ধরুক আর লটকে দিক। এইটেই তো হল প্রথম কাজ।'

হরিদাস তবু কিছু বললেন না। হাসলেন একটু।

"আমার মতে ঘরটি সামলানো দরকার আছে। ঘরটি সামলে সুমলে তারপর যত খুশি ফপরদালালি কর না তুমি, কে বারণ করছে। কি বল?"

এর উত্তরে হরিদাস যে প্রশ্নটি করলেন তা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক মনে হল গোবর্ধনবাবুর।

"কিছু যদি মনে না করেন গোবর্ধনবাবু, একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। আপনি কোন্ বছর ম্যাট্রিক পাশ করেছেন বলুন তো?"

"ম্যাট্রিক? ম্যাট্রিক তো পাশ করিনি। কেন?"

"না এমনি। আচ্ছা রাজনীতি চর্চা করছেন কতদিন থেকে?"

"রাজনীতি? সে আর করবার সময় পেলুম কোথায় ভাই? গোঁফ উঠতে না উঠতেই তো বাবা আপিসে ঢুকিয়ে দিলেন।"

"হুঁ।"

হরিদাসবাবু গম্ভীরভাবে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগলেন। দিবস নীরবে ঝাড়ু দিয়ে যেতে লাগল। তার মুখের পেশী বিচলিত হল না একটু। সে এদের সব কথা মন দিয়ে শুনছিলও না। সে দোকান থেকে সরোদটা কিনে সেটা সৌদামিনীর হাতে দিয়ে চলে এসেছে। কিরণকে সরোদটা দেখানো হয়নি এখনও। এই সব কথাই মনে হচ্ছিল তার। রঙ্গনার কথাও। দামটা দিতে আজই সে আসবে না কি? তার ইচ্ছে হচ্ছিল সৌদামিনীকে বলে আসতে যে একটি মেয়ে হয়তো আসতে পারে.... কিন্তু লজ্জা করল....লজ্জাই বা করল কেন, ভাবছিল সে....।

"হঠাৎ এসব কথা জিজ্ঞেস করবার মানে?"—গোবর্ধন প্রশ্ন করলেন ভুরু কুঁচকে।

হাসি চিকমিক করে উঠল হরিদাসবাবুর চোখে।

"আপনি যে একটা জিনিয়াস এ সন্দেহ আমার গোড়াগুড়িই ছিল এখন অকাট্য প্রমাণ পেলাম। জহরলাল, বেভিন, স্ট্যালিন, মলটভ, ট্রুম্যান, টিটো, ম্যাকার্থার প্রতিদিন সক্কলকে এমনভাবে তুলো-ধোনা করা সহজ কথা নয়।"

গোবর্ধন বুঝলেন ছোকরা ইয়ার্কি করছে।

"খুব ইয়ার হয়েছ, নয়"—এই বলে তিনি গিরিবালা মার্ডার কেসে মনঃসংযোগ করতে যাচ্ছিলেন এমন সময় অঘোর এসে ঘরে ঢুকলেন।

"দিবু আমার সিগারেট এনেছ?"

ফতুয়ার পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বার করে দিলে সে অঘোরকে।

"আজও ছ' আনা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ!"

"উঃ, আর বাঁচতে দেবে না!"

তারপর হরিদাসের দিকে চেয়ে বললেন, "যদিও রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন 'বোলো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে।"

"ভুল কোটেশন কর কেন!"—কাগজের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে গোবর্ধন বললেন অপ্রত্যাশিত ভাবে—"রবীন্দ্রনাথ নয়, নবীন সেন"—তারপর হরিদাসের দিকে তিনিও চাইলেন, "নবীন সেন নয়?"

"আমার তো মনে হচ্ছে শেক্‌সপীয়র"—হাস্যদীপ্ত চক্ষে গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন হরিদাস।

"দেখ ইয়ার্কির একটা সীমা আছে। খুব বেশি ফাজিল হওয়াটা ভালো নয়।" উপদেশ দিয়ে আবার কাগজে মন দিলেন গোবর্ধন।

অঘোরবাবু কিন্তু কবিতা নিয়ে মাথা ঘামালেন না আর। হরিদাসবাবু লেখাপড়া করেন, তাঁর

মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যেই দু'লাইন কবিতা আউড়েছিলেন তিনি। মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে দেখে একেবারে কাজের কথা পাড়লেন।

"তোমার সেই ইনসিওরেন্সের টাকাটার কি করলে হে?"

"ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছি।"

"এই সময়ে টাকাটা যদি গ্রেনসে ইন্‌ভেস্‌ট্ করতে পারতে বেশ কিছু হত! রোজ কেন রোজ বেচে দাও—বেশি কিছু করতে হবে না—ক্লিয়ার টেন পারসেন্ট।"

"আমি তো গোড়াতেই বলেছি—আমি বড়লোক হতে চাই না।"

"অতগুলো টাকা ফেলে রাখবে?"

হরিদাস এ কথার উত্তর দিলেন না। অঘোর একটা সিগারেট ধরিয়ে তর্ক করবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। দিবস ঘর ঝাড়ু দেওয়া শেষ করে চলে গেল পাশের ঘরে। অন্য কথা পাড়লেন গোবর্ধন। হরিদাসের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "তুমি টুরে বেরুচ্ছ কবে?"

"দেরি আছে এখনও।"

"কোন্ দিকে যাবে?"

"কাটোয়া।"

"ডাঁটা পাও তো এনো।"

সহসা পাশের ঘরে যুগপৎ হারমোনিয়ম ও বেহালা বেজে উঠল। ভাঙা গলায় ধূর্জটি গান ধরলেন—"এইসো এইসো প্রিয়তমো হে-এ"

"এই লোকটাই তাড়াবে আমাকে এখান থেকে, বুঝলে অঘোর?"

অত্যন্ত বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন গোবর্ধন।

"যাই বলুন, ভদ্রলোক সিনসিয়ার কিন্তু"—হরিদাস ফোড়ন দিলেন হাস্যদীপ্ত দৃষ্টি তুলে—"সঙ্গীতের প্রতি যাকে বলে অনুরাগ, তা আছে ভদ্রলোকের।"

অঘোর বললেন, "তা আছে বই কি। সেতার এস্রাজ ম্যান্ডোলিন গীটার দমাদ্দম কিনেই চলেছে—সিনসিয়ার বটে।"

"সিনসিয়ার-ফিনসিযার নয়, উন্মাদ। হরিদাস, বুঝিয়ে সুজিয়ে ওকে কোনও ওস্তাদের আখড়ায় ভরতি করে দাও না তুমি। সেইখানে গিয়ে যত খুশি চিৎকার করুক। এখানে কানের পাশে এভাবে চেঁচালে তো টেকা যাবে না—আর ও চেঁচাবেই—যে রকম দেখছি—"

অঘোর বলে উঠলেন, "কাল যে রাস্তায় একটা হ্যান্ডবিল পেলুম কোন এক গহনচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় কাশী থেকে এসে এখানে এক সঙ্গীত ভবন খুলেছেন, আনাড়িকেও সঙ্গীতজ্ঞ করে তুলছেন, সেইখানে ভিড়িয়ে দিলে কেমন হয়? কোথায় রাখলাম হ্যান্ডবিলটা—"

জামার পকেট থেকে হ্যান্ডবিলটা খুঁজে বার করলেন তিনি।

"এই যে—"

হরিদাসকে দিলেন কাগজখানা।

"যা হোক একটা ব্যবস্থা কর ভাই"—মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে গোবর্ধন হরিদাসকে বললেন, "এখান থেকে যাবই বা কোথা? চট্ করে বাড়ি তো পাওয়া যাবে না। কিন্তু এ যে সাপের ছুঁচো-গেলা হয়েছে আমাদের।"

বাড়িটি ধূর্জটিবাবুরই। মফঃস্বলের জমিদার তিনি। সম্প্রতি পত্নীবিয়োগ হওয়াতে কোলকাতায় এসে সঙ্গীত নিয়ে নিজেকে ভুলে থাকবার চেষ্টা করছেন। সমস্ত বাড়িতে তিনি একাই ছিলেন এতদিন। হরিদাসবাবুর সঙ্গে ধূর্জটির বন্ধুত্ব ছিল। তাঁরই অনুরোধে তিনি পাশের ঘর দুখানা এঁদের মেস করবার জন্যে দিয়েছেন। নিজেও এঁদের মেসেই খাওয়া-দাওয়া করছেন আজকাল। সুতরাং ধূর্জটিকে এ বাড়ি থেকে তাড়ানো অসম্ভব।

চুনীলালের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপনটা পড়ে হরিদাসবাবু বললেন, "তা চেষ্টা করা যেতে পারে।"

"দোহাই তোমার, কিছু একটা কর ভাই"—গোবর্ধন বললেন।

"এত বাড়াবাড়ি করত না, কিন্তু ওকে ওসকাচ্ছে ওই উমেশ" একটা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললেন অঘোর।

"উমেশ ওসকাবে না কেন, তার দোকানের জিনিস বিক্রি হচ্ছে যে।"

পাশের ঘরে বেহালা হাতে করে ধূর্জটি বসেছিলেন। তাঁর সমস্ত চেষ্টা যে ব্যর্থ হচ্ছে, গান বাজনা, কিছুই যে জমছে না তা নিজেই অনুভব করছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি জমিদার মানুষ। তাঁর শুধু যে অজস্র টাকা আছে তা নয় বদ্ধমূল ধারণাও আছে যে টাকার জোরে সব হয়। তাঁর বন্ধু উমেশ দত্ত (বাদ্যযন্ত্রের দোকান খুলেছেন যিনি সম্প্রতি ধূর্জটির কাছ থেকে ক্যাপিটাল নিয়ে) তাঁর মনে আর একটা ধারণাও পাকা করে দিয়েছেন। তাঁর গলায় নাকি দানা আছে! দিনকতক সাধনা করলেই তাঁর গলা আরও নাকি দানাদার হয়ে উঠবে এবং তখন রসিক সমাজ তার রসাস্বাদন করে মুগ্ধ হয়ে যাবেন।

দিবস ঘরে ঢুকতেই ঝাপসা কণ্ঠে ধূর্জটি বললেন, "দিবু দেখ তো ঠাকুরকে গরম জল করতে বলেছি সেটা হল কি না। গলাটায় একটু সেক দেওয়ার দরকার।

"দেখি"—দিবস চলে যেতে উদ্যত হল।

"আর শোন, উমেশবাবু বলছেন ঘিয়ের সঙ্গে গোলমরিচ ফুটিয়ে খেতে। ঘি আনতে পারবে একটু চট্ করে?"

"পারব।"

চট্ করে নিয়ে এস তো বাবা। পয়সা নিয়ে যাও। গোলমরিচও এনে দিও। ঠাকুরকে বল ঘি গোলমরিচটা আগেই ফুটিয়ে দেয় যেন।"

"আচ্ছা।"

দিবস চলে যাচ্ছিল এমন সময় উমেশ বললেন, "একটু আদা দিলে আরও ভালো হয়।"

"দিবু, একটু আদাও এন তাহলে। একটাকায় কুলুবে কি? এই পাঁচ টাকার নোটটাই নিয়ে যাও না হয়। ভালো ঘি এন, দালদা মেশানো যেন না হয়, দেখে নিও একটু।"

দিবস পাঁচ টাকার নোট নিয়ে চলে গেল। যন্ত্রবৎ কাজ করে যাচ্ছিল সে। তার মনিবদের কথাবার্তা, আচরণ প্রথমটা ঈষৎ অদ্ভুত মনে হচ্ছিল তার, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছিল এরাই স্বাভাবিক আমিই অদ্ভুত। তারপর থেকে কাজের দিকেই সমস্ত মন লাগিয়ে রেখেছে সে। এদের দিকে মনোযোগ দেওয়া শুধু যে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে তা নয়, বিপজ্জনকও মনে হয়েছে। হঠাৎ যদি এদের কোনও কথার বা আচরণের প্রতিবাদ করে ফেলে সে, তাহলে

হয়তো চাকরিটা যাবে। চাকরি জোগাড় করা যে কি কঠিন ব্যাপার একদিনের অভিজ্ঞতা থেকে তা সে বুঝেছে। তাই তার কেবলই মনে হচ্ছে এই অকূল সমুদ্রে যে ভেলাটি সে পেয়েছে সেটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকাই উচিত। চোখ বুজে তাই সে সেটাকে আঁকড়ে ভেসে চলেছিল। দিবসের আচরণ হরিদাসবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল কিন্তু। যদিও মুখে তিনি কিছু বলেননি কিন্তু মনে মনে তিনি এই নব নিযুক্ত মৌন কর্তব্যনিষ্ঠ চাকরটির আচরণে বিস্ময়বোধ করেছিলেন।

.....দিবস চলে যাবার পর ধূর্জটি নীরবে বসে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ একটা প্রয়োজনীয় কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। উমেশের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "বেহালাটার সুর ঠিক বেরুচ্ছে না তো!"

"কাঠটা ভালো নয় বোধ হয়। আজ দোকানে নিয়ে যাবেন বদলে দেব।"

ধূর্জটি জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলেন। দূরে তেতলা বাড়ির চিলে কোঠাটা পার হয়ে তাঁর দৃষ্টি ঠেকল আকাশে। সমস্ত গুলিয়ে গেল যেন, কি রকম যেন মনে হতে লাগল।

যে দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাটা আশা-আশংকায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে বাসার দিকে পথে চলতে চলতে দিবস হঠাৎ ঠিক করে ফেললে কিছুতেই তাকে আমোল দেবে না। দেওয়া উচিত নয়। সেই মেয়েটি টাকা ফেরত দিতে এসেছে কিনা এই খবরটাকে এখন প্রাধান্য দেওয়া মানেই নিজেকে নিজের কাছে অবনত করা, হঠাৎ মনে হল তার। সে ঘুরে কিরণের বাসার দিকে অগ্রসর হল। কিছুদূর গিয়ে নজরে পড়ল একটা সিনেমার সামনে প্রচুর ভিড়। সেকেন্ড শো শুরু হচ্ছে বোধ হয়। একবার লোভ হল টিকিট কিনে ঢুকে পড়লে হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে হল কোনও চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। হয়তো বাবার সঙ্গেই। অবসর পেলেই সূর্য চৌধুরী সেকেন্ড শোয়ে সিনেমা দেখতে আসেন। ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইল দিবস খানিকক্ষণ। না, তাদের মোটরটা দেখা যাচ্ছে না তো। একটু এগিয়ে আবার ভালো করে দেখল। না, নেই। তবু সে পাশের গলিতে ঢুকে পড়ল। না, সিনেমায় যাবে না সে। এখন যার মাসিক আয় মাত্র কুড়ি টাকা আপাতত সিনেমা দেখার লোভ সম্বরণ করতে হবে তাকে।

....কিরণের বাড়ির সামনে গিয়ে দেখতে পেল কপাট যদিও বন্ধ কিন্তু কিরণ বাড়িতে আছে। খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। নিবিষ্টচিত্তে কি যেন লিখছে। কবিতা নিশ্চয়, দিবস ভাবলে। কবিতাই লিখছিল কিরণ। সকালে যে কবিতাটা আরম্ভ করেছিল সেইটেই নূতন ছন্দে লিখছিল আবার।

দিবস ডাকতেই কপাট খুলে দিল সে।

"কবিতা লিখছিস নাকি?"

"হ্যাঁ।"

খাতাটা মুড়ে একপাশে সরিয়ে রেখে দিল।

"কি লিখলি, পড় না শুনি।"

"শুনবি?"

দিবস পাশের বিছানায় বসল। কিরণ পড়তে লাগল—

দূর হতে শুনি তব বাঁশী, দূর হতে দেখি তব শোভা,
অয়ি মনোলোভা,
সুদূর আকাশে তুমি মেঘে মেঘে বিচিত্র-বরণী
আমি নিম্নে স্বপ্নাতুর দরিদ্র ধরণী
দিবা যামী শুধু চেয়ে থাকি
তোমার মদিরবর্ণে পূর্ণ করি আঁখি।
তারপর ধীরে ধীরে
বর্ণ-জলধির তীরে
নামে অন্ধকার,
নামে শঙ্কা, জাগে ক্ষোভ মূঢ় ব্যর্থতার,
আকাশের লক্ষ তারা করে যেন লক্ষ উপহাস
রুদ্ধ হয়ে আসে যেন শ্বাস
আঁধার প্রান্তরে তুমি সহসা আবার শিখা জ্বালো
হে আলেয়া আলো।

কবিতাটা শুনতে শুনতে দিবসের মনে রঙ্গনার ছবিটা মূর্ত হয়ে উঠল। এই ছবিটাই যেন ভাব জোগাল তার মন্তব্যের।

"কবিতাটা চমৎকার হয়েছে, কিন্তু অন্ধকারের কাছে আমি হার মানতে রাজি নই। শঙ্কা, ক্ষোভ, ব্যর্থতার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে আমাদের। দূর থেকে বাঁশি শুনে কেবল মুগ্ধ হয়ে থাকলেই চলবে না, বাঁশিটা দখল করে সেটা বাজাতে হবে নিজে।"

"বাজাবার চেষ্টা করতে হবে বল, সত্যি সত্যি বাজান যাবে কিনা কে জানে!"

"কিন্তু তোর কবিতার সুর শুনে মনে হচ্ছে তুই যেন ধরে নিয়েছিস তোর আকাঙ্ক্ষা কখনই পূর্ণ হবে না।"

"হয় কি কখনও?"

কিরণের ঠোঁটে ছোট্ট একটু হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল।

"হয় বই কি"—দিবসের খেয়ালই রইল না যে যে-কথাগুলো সে বলতে যাচ্ছে সে গুলোর সঙ্গে তার কিছুদিন আগেকার একটা উক্তির মিল নেই এবং আগেকার সেই উক্তিটা কিরণের মনে থাকা সম্ভব—"খুব হয়, হরদম হচ্ছে। আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবেই এ বিশ্বাস নিয়ে যদি আমরা না অগ্রসর হই তাহলে কাজে উৎসাহ পাব কেন?"

কিরণের চোখে এক ঝলক আলো চকমক করে উঠল।

"কিছুদিন আগে তুই যে 'মা ফলেষু'র বক্তৃতাটা করছিলি আজকের বক্তৃতাটার সঙ্গে সেটাকে খাপ খাওয়াচ্ছিস কি করে তাহলে?"

রাস্তার মোড় ঘুরেই অপ্রত্যাশিতভাবে রাস্তা বন্ধ দেখলে 'রোড ক্লোজড্' লেখাগুলোর দিকে মোটর ড্রাইভার যেমনভাবে চেয়ে 'গিয়ার' বদলে গাড়ি ব্যাক্ করতে থাকে দিবসও অনেকটা তেমনি করলে।

"খাপ খাওয়াবার চেষ্টা আমি করছি না। 'মা ফলেষু'র মানে এ নয় যে ফল সম্বন্ধে তুমি উদাসীন থাকবে। ওর মানে ফল যা হবে তা তোমার আয়ত্তের বাইরে, কাজ করাটাই তোমার আয়ত্তাধীন, তাই কর্তব্যেই তোমার অধিকার। কিন্তু প্রত্যেক কাজেরই একটা উদ্দেশ্য থাকবে নিশ্চয় এবং সে উদ্দেশ্য সফল করতেই হবে, তা সফল হবেই, এরকম একটা বিশ্বাস থাকলেই যে গীতাকে অমান্য করা হবে তা আমি মনে করি না। তবে একটা কথা, চেষ্টা সত্ত্বেও উদ্দেশ্য যদি বিফল হয় তাহলে মুষড়ে পড়া উচিত নয়, তাতে লজ্জারও কিছু নেই—"

কিরণ হাসিমুখে দিবসের দিকে চেয়ে রইল, কিছু বললে না। তার মুখভাব দেখে মনে হল দিবসের আবোলতাবোলের প্রতিবাদ করে সময় নষ্ট করতে সে রাজি নয়। বাঁশী বাজাবার লোভ তারও যথেষ্ট আছে, মনে মনে বাঁশীটার দিকে হাতও বাড়াচ্ছে সে বারবার, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে সেটাকে ধরতে পারলে সে বাজাবেও, কিন্তু সেটা পারা যাবে কি না সেইটেই সমস্যা এবং সেই সমস্যার সংশয়ই তো কবিতার উৎস। কবিতার উৎস? তাই বা কে বলতে পারে? কবিতা দেখে কি তার উৎসের খবর জানা সম্ভব? ফুল দেখে কি বোঝা যায় যে তার উৎস মাটির অন্ধকারে? আকাশে নয়, তাই বা কে বললে..... যে মন আমাদের মুখভাব পরিবর্তন করে কিরণের সেই মন নানা জটিল চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে পড়াতে তার মুখের হাসিটা মুখোশের হাসির মতো দেখাতে লাগল।

"কি ভাবছিস তুই?"

"কিছু না, তোর চাকরি কেমন লাগছে?"

"খারাপ নয়। কেরানিগিরির চেয়ে ভালো, মাইনে কম যদিও—"

"রেস্‌পেক্‌টেব্‌লও নয়" কিরণ বললে মুচকি হেসে।

"ওই ঝুটো রেস্‌পেক্‌টেবিলিটিই তো দফা নিকেশ করেছে আমাদের। ওরই মোহে পড়ে সমর্থ ছেলেরা রোজগার করছে না, মেয়েরা খুঁজে বেড়াচ্ছে রাজপুত্র, ফলে কারও বিয়ে হচ্ছে না, সমাজ উচ্ছন্নে যাচ্ছে।"

"মোহই বল আর যা-ই বল উচ্চাকাঙ্ক্ষাটা মানুষের মজ্জাগত প্রবৃত্তি এবং সম্ভবত উন্নতিরও সোপান—"

"আহা উচ্চাকাঙ্ক্ষা খারাপ কে বলছে! কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা করলেই তো শুধু হবে না, তার যোগ্য হতে হবে। সেই যোগ্যতার প্রথম ধাপ আত্মসম্মান। আত্মসম্মানহীন রেস্‌পেক্‌টেবেলিটির নামই ঝুটো রেস্‌পেক্‌টেবিলিটি, যা রক্ষা করবার জন্যে ধোপা, নাপিত, দর্জির সাহায্য নিতে হয়, ধার করে গাড়ি বাড়ি করতে হয়, মুখস্থ করে বুলি আওড়াতে হয়—"

কিরণ হেসে ফেললে দিবসের উত্তেজনা দেখে। নিতান্ত ছেলেমানুষ—মনে হল তার।

"চল তোর বাসাটা দেখে আসি। তর্ক থাক এখন।"

"জানিস আমি সরোদ কিনেছি"—আবার উৎসাহিত হয়ে উঠল দিবস—"এইবার চল একদিন গহনচাঁদবাবুর কাছে যাওয়া যাক।"

"তুই না এলে এখন সেখানেই আমি যেতাম। ঊর্মি ঠিকানাটা দিয়ে গেছে আমাকে।"

"ও, বেশ তো, সেখানেই চল না তাহলে। ভরতি হয়ে আসা যাক।"

"বেশ। চা খাবি? স্টোভে তেল আছে, পারমিট পেয়েছি।"

"বেশ তো!"

কিরণ স্টোভ জ্বালতে বসল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটছিল আর একটি ঘটনা দিবসের কার্‌ফর্‌মা লেনের বাসায়। বাসার বারান্দায় একটা ভিজে কাপড় শুখোচ্ছিল। সৌদামিনী এবং গিরিবালা এসে ঢুকল।

"এখনও তো আসেনি দেখছি"—লণ্ঠন তুলে সৌদামিনী বললেন।

"মেস থেকে ঠিক আটটার সময়ে বেরিয়েছে কিন্তু। এলে মনে করে বোলো কথাটা। উকিলের ছেলে, কোনও একটা হদিস বাতলাতে পারে হয়তো। মুখ-পোড়ার চোখ রাঙানি আর সহ্য হয় না।"

"বলব। কাপড় কাচার ছিরি দেখ।"

দিবস নিজের কাপড়টা নিজেই কেচে শুখোতে দিয়ে গিয়েছিল। কাপড়ের এক জায়গায় দাগ লেগেছিল খানিকটা। সেইটে দেখিয়ে সৌদামিনী মন্তব্য করলে।

"পরশু দিন চা নিয়ে যেতে যেতে চলকে পড়েছিল যে খানিকটা।" মুচকি হেসে গিরিবালা বললে।

"বড়লোকের ছেলে ওসব কাজ পারবে কেন?"

"কাজ খুব চমৎকার করছে। মুখ বুজে করে যায়, বাবুরা খুব খুশি।"

"তোর কাছে সাবান আছে?"

"আছে।"

"দে দিকিন। থুবে কেচে দি ভালো করে।"

কাপড়টা নিয়ে সৌদামিনী কলতলায় গেল। সাবানও দিয়ে গেল গিরিবালা। রাস্তার আলো এসে পড়েছে কলতলায়। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে হাঁসের জাল-দেওয়া খাঁচাটা। জালের ভিতর দিয়ে হাঁসটাকেও দেখা যাচ্ছে। কাপড় কাচতে কাচতে হাঁসটার দিকে নজর পড়ল সৌদামিনীর, পড়তেই একটা কথা মনে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

"ওই যাঃ ধানের কথাটা বলতে আবার ভুলে গেলাম আজ। নিজেই গিয়ে আনতে হবে কাল দেখছি।"

অন্ধকার গলিটার মুখে একটা টর্চের আলো জ্বলে উঠল দপ করে। "সেই মুখপোড়া আসছে না কি আবার! জ্বালাতন করে তুললে তো—সৌদামিনীর স্বগোতাক্তি বাধা পেল কিন্তু পরমুহূর্তেই। টর্চ জ্বালতে জ্বালতে এগিয়ে এল রঙ্গনা।

"আচ্ছা দিবসবাবু বলে কেউ কি থাকেন এখানে?"

সৌদামিনী এগিয়ে এসে নিরীক্ষণ করতে লাগল রঙ্গনাকে। বিস্মিত হল তার বেশবাস দেখে।

"দিবসবাবুর কি এইটেই বাসা?"

"হ্যাঁ। তিনি এখনও ফেরেননি।"

"ও আচ্ছা, তিনি এলে বলে দেবেন তাঁর সেই টাকাটা আমি দিতে এসেছিলাম। একটু কাগজ দিতে পারেন, একটা চিঠি লিখে রেখে যেতাম তাহলে।"

দিবসের ব্যবহারে রঙ্গনা কম বিস্মিত হয়নি। তার বাসা দেখে সে আরও বিস্মিত হয়ে গেল। এখানে লেখবার মতো কাগজ পাওয়া যাবে কিনা এ সন্দেহও তার হল।

"ওর ঘরে যান—ওই যে ওইটে ওর ঘর, কপাট খোলাই আছে, ওইখানে টেবিলের উপর সব আছে। লণ্ঠনটাও আছে দোরগোড়ায়।"

এইবার রঙ্গনা হঠাৎ হাঁসটা দেখতে পেলে।

"বাঃ, বেশ চমৎকার হাঁসটি তো! দিবসবাবুর?"

সৌদামিনী মাথা নাড়লে হাসিমুখে। তারপর কাপড়টা কাচতে লাগল আবার। রঙ্গনা একটু ঝুঁকে টর্চ ফেলে ফেলে দেখতে লাগল হাঁসটাকে। সৌদামিনী ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে আবার, একটা কৌতুকোজ্জ্বল হাসি জ্বলজ্বল করে উঠল তার চোখের দৃষ্টিতে। অনুপস্থিত দিবসকে কেন্দ্র করে দুটি অপরিচিত নারী-হৃদয় নিজেদের অজ্ঞাতসারেই যে কাব্য রচনা করছিল সে কাব্যের রূপও মূর্ত হয়ে উঠেছিল তখনকার ওই আলো-আঁধারিতে, খাঁচায় বন্দী একক হংসের তন্দ্রাতুর দৃষ্টির সহসা-চকিত বিস্ময়ে। প্রদীপ্ত টর্চটার দিকে হাঁসটা যে-ভাবে চেয়েছিল অনুপস্থিত দিবসের দিকে রঙ্গনাও মনে মনে চেয়েছিল অনেকটা সেইভাবে। দুজনেই দেখছিল অপ্রত্যাশিত কিছু একটা। রঙ্গনা সোজা হয়ে দাঁড়াল অবশেষে।

"ওই ঘরটা?"

সৌদামিনী পুনরায় মাথা নাড়তেই এগিয়ে গেল সেই দিকে কমানো লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে ঢুকল ঘরের ভিতর। লণ্ঠন তুলে ঘুরে ঘুরে দেখলে ঘরখানা। টেবিল, চেয়ার, বিছানা, বইয়ের শেল্‌ফ্—ভদ্রলোক স্টুডেন্ট বোধ হয়, মনে হল রঙ্গনার। অবস্থা খারাপ তাই এখানে এসে আছে। হঠাৎ খুব আনন্দ হল তার, একটা দমকা হাওয়া যেন অজস্র ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে গেল তার মনের ভিতর। দিবস চৌধুরী গরিব এই ধারণাটাকে ঘিরে তার মন স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে গেল সহসা। এগিয়ে গেল সে টেবিলের দিকে। টেবিলে এটা কি? কার ফটো? সূর্য চৌধুরীর ফটোর দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর চিঠি লেখার প্যাডখানা দেখতে পেলে। প্যাডটা টেনে নিয়ে লিখতে লাগল। ফাউন্টেন পেন তার সঙ্গেই ছিল।

দিবসবাবু,

আপনার টাকাটা দিতে এসেছিলাম। কিন্তু আপনার দেখা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছি। আবার আসব কাল, বিকেল পাঁচটার পর, ছটার মধ্যেই। আশা করি বাড়িতে থাকবেন। তখন টাকা দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়িতে আপনাকে বোধ হয় ধন্যবাদ দিতেই ভুলে গিয়েছিলাম। খেয়ালই হয়নি। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। নমস্কার। ইতি—

রঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়

সৌদামিনী এসে ঢুকল।

"কিছু বলবার থাকে তো আমাকে বলে যেতে পারেন, এলে আমি বলে দেব।"

"আমি লিখে রেখে গেলাম। কাল আবার আসব।"

"ও, আচ্ছা। আপনার নামটি?"

"রঙ্গনা। রঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"আচ্ছা।"

"আমি চললাম চাহলে।"

রঙ্গনা চলে গেল। রঙ্গনার প্রস্থানপথের দিকে চেয়ে সৌদামিনী দাঁড়িয়ে রইল। তারপর গালে হাত দিয়ে ঘাড়টি কাৎ করলে। দিবসের পরিচয় সে শুনেছিল। তার সঙ্গে রঙ্গনার আবির্ভাব জড়িয়ে তার মনে যে সব ভাব জাগল তা অবর্ণনীয়। ফলে দিবসের প্রতি তার স্নেহ হঠাৎ যেন গাঢ়তর হয়ে গেল। স্বগতোক্তি করলে—কি দুষ্টু ছেলে বাবা, বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে কি কাণ্ডই করছে! লণ্ঠনটা তুলে দিবসের বিছানাটা দেখলে, তারপর ঝেড়ে পরিষ্কার করে দিলে আর একবার। আর একবার তার মনে হল—মশারির কথা তো পইপই করে বলে দিয়েছি, কিন্তু আনে তবে তো—।

"সদু ও সদু, কোথা গেলি তুই—"

গিরিবালার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"আমি এখানে আছি।"

গিরিবালা এসেই বললে, "তুই ক্ষেপে যাবি না কি তোর দিবুকে নিয়ে। ওদিকে ভাত ঠাণ্ডা হচ্ছে যে।"

"চল।"

চুনীলালের বাড়িতে গানের আসর জমে উঠেছে। ছাত্রছাত্রী অনেকগুলি জুটে গেছে ইতিমধ্যে। সারি সারি বসে আছে তারা। গহনচাঁদ সরোদে দরবারি কানাড়া বাজাচ্ছেন। সঙ্গৎ করছে সীতারাম আর রমজান। উর্মিও একপাশে বসে আছে। দরবারি কানাড়া খুব জমে উঠেছে। ছোট ঘরটার পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়ে গেছে। ঘরটা সত্যিই কখন যেন রূপান্তরিত হয়ে গেছে বিরাট এক রাজ-দরবারে। অদৃশ্য সিংহাসনে অদৃশ্য সম্রাট বসে আছেন যেন রাজকীয় মহিমায়, আর তাঁকে ঘিরে সুরের আরতি চলছে তালে, লয়ে, মানে, মীড়ের টানে টানে, সুরসপ্তকের উদাত্ত ঝংকারে ঝংকারে। অবর্ণনীয় পরিবেশ হয়েছে একটা। তন্ময় হয়ে চোখ বুজে বাজিয়ে চলেছেন গহনচাঁদ। দুটি ছাত্রী দরবারি কানাড়া শিখতে চেয়েছে তাঁর কাছে। দরবারি কানাড়ার রূপটা তাদের দেখাচ্ছেন তিনি। স্বপ্নলোক থেকে নেমে এসেছে যেন সুরময়ী অপ্সরীরা, তাদের নৃত্যনিক্কণে মূর্ত হয়ে উঠেছে দরবারি কানাড়া। সকলেরই মনে হচ্ছে, চলুক, এ যেন না থামে। কিন্তু একটু পরে সমে এসে থেমে গেলেন গহনচাঁদ। নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন সবাই। কারও মুখ দিয়ে একটা কথা সরল না। রমজানের ঠোঁট দুটো নড়ল শুধু, মনে হল অস্ফুটকণ্ঠে সে যেন বললে—"ওয়া, ওয়া'। সীতারাম স্তব্ধ বিভোর হয়ে বসে রইল, তার মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরুল না।

গহনচাঁদই প্রথমে কথা কইলেন।

"এই হল দরবারি কানাড়ার রূপ। সবটা অবশ্য একেবারে তোমরা পারবে না, সাধতে হবে ক্রমশ। আজ একটা সোজা গতের স্বরলিপি লিখে দেব তোমাদের। রঙ্গনা আসুক, রঙ্গনার কাছে লেখা আছে গৎটা।"

"রঙ্গনা কোথা গেছে?"—উর্মি জিগ্যেস করলে।

"সে বেরিয়েছে একটু, আসবে এখুনি।"

"আমাকে কবে থেকে নাচ শেখাবেন?"

"ও তুমি বুঝি কথকি নাচ শিখতে চাও? ময়ূর নাচটা শেখ তবে। সকালে আসতে হবে তাহলে।"

"বেশ তো, কখন আসব বলুন?"

চুনীলাল বারান্দায় ওৎ পেতে বসেছিল। সে ঘরের ভিতর মুখ বাড়িয়ে বললে, "ন'টার পর। তার আগে তো জামাইবাবুর পুজোই শেষ হবে না"—বলেই বারান্দা থেকে নেমে গেল বিড়ি ধরাবার জন্যে।

"হ্যাঁ, নটার পরই এস। কিছু আবীরও কিনে এন।"

"আবীর? আবীর কি হবে?"

"মেজের উপর আবীর ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর পাতলা চাদর পেতে দিতে হবে একটা সেই চাদরের উপর নাচতে হবে। নাচটা যখন তোমার শেষ হয়ে যাবে তখন নাচের পর চাদরটা তুললে দেখতে পাবে আবীরের উপর একটা ময়ূর আঁকা হয়ে গেছে। ময়ূরটা যেন পেখম তুলে নাচছে।"

"তাই না কি! বাঃ চমৎকার তো!"

ঊর্মির মনও সঙ্গে সঙ্গে ময়ূরের মতো পেখম মেলে নেচে উঠল যেন। গহনচাঁদ সস্নেহে চেয়ে রইলেন তার দিকে। রমজান এবং সীতারামের দৃষ্টিও স্নেহসিক্ত হয়ে উঠল। তারাও স্মিতমুখে চেয়ে রইল ঊর্মির দিকে।

"কতটা আবীর আনব?"

"কালই আবীর আনবার দরকার নেই। কাল বরং একটা খড়ি এন। ময়ূরটা মেজেতে এঁকে দাগে দাগে পা ফেলে ফেলে নাচটা অভ্যাস করে নাও আগে। তারপর আবীর বিছিয়ে দেখলেই হবে একদিন, ঠিক হচ্ছে কি না।"

"বেশ খড়িই আনব তাহলে। এই যে রঙ্গনাদি এসে গেছে।"

রঙ্গনা এসে ঢুকল।

"কি হল? দিয়ে এলি টাকাটা?"

"দেখা পেলাম না ভদ্রলোকের।"

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন গহনচাঁদ।

"ছি ছি, টাকাটা আজই দিয়ে আসা উচিত ছিল ভদ্রলোককে। দেখা পেলি না? ছি ছি!"

"বড়ী আপশোস কি বাত"—সীতারামও ক্ষোভ প্রকাশ করলে।

"কি করা যায় বল দেখি সীতারাম? উনি অতটা ভদ্রতা করলেন, আমাদেরও যেমন করে হোক আজই টাকাটা দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। তুমি আর রমজান না হয় টাকাটা নিয়ে যাও, বাড়ি যাবার সময় আর একবার চেষ্টা করে দেখ যদি ধরতে পার ভদ্রলোককে।"

"আমি চিঠি লিখে রেখে এসেছি। কাল গিয়ে দিয়ে আসব এখন।"

"আবার তুই যাবি কাল?"

এমন সময় ঊর্মি রঙ্গনার কানে কানে কি একটা বলাতে কথাটা চাপা পড়ে গেল। রঙ্গনা

মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে বললে। "হ্যাঁ, সুর দেওয়া হয়ে গেছে আমার। তবে বাবাকে এখনও শোনাইনি।"

"কি?"—উৎসুক হয়ে উঠলেন গহনচাঁদ।

"ঊর্মি আমাকে গান দিয়ে গিয়েছিল একটা, সুর বসিয়ে দেবার জন্যে।"

"তুই গানে সুর দিতে পারিস না কি? তাতো জানতাম না।"

বিস্ময়ে প্রশ্ন ফুটে উঠল রমজান এবং সীতারামের দৃষ্টিতেও।

"শুনবে?"—রঙ্গনা ফিরে চাইলে গহনচাঁদের দিকে।

"জরুর জরুর"—উত্তর দিলে সীতারাম। গহনচাঁদও রাজি হলেন।

রঙ্গনা হার্মোনিয়ামটা টেনে নিয়ে বাজাতে লাগল।

"গানটা মনে আছে আপনার? আমার খাতায় টোকা আছে, দেব?" একটা ছোট খাতা দেখিয়ে ফিস করে জিগ্যেস করল ঊর্মি।

"আমার মুখস্থ হয়ে গেছে।"

মুচকি হেসে হার্মোনিয়াম বাজাতে লাগল রঙ্গনা। খানিকক্ষণ বাজিয়ে কিরণের লেখা গানটা ধরলে সে।

আসিবে সে আসিবে সে আসিবে সে
জানি আমি, জানি আমি, জানি গো।
আঁধার রজনী শেষে
আলোক উজল বেশে
আসিবে সে আসিবে সে
আসিবে সে
জানি আমি জানি আমি জানি গো।

বলেছে রাতের পাখি
আসিবে সে আসিবে সে
পরাবে রঙীন রাখী
অরুণ আলোতে এসে।
বলেছে জ্যোছনা ধারা
বলেছে ভোরের তারা
আসিবে সে আসিবে সে
আসিবে সে
জানি আমি জানি আমি জানি গো।

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দিবস এবং কিরণ এসে ঢুকল। গানে যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছিল তা মূর্ত হয়ে গেল যেন সহসা।

"এ কি! আপনি আমার ঠিকানা জানলেন কি করে!" বলে উঠল রঙ্গনা।

দিবস বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। দুজনেই এক দোকান থেকে বাজনা কিনেছে এবং

দুজনেই আবার একই গুরুর কাছ থেকে পাঠ নিতেও এসেছে এই বিস্ময়ের সঙ্গে তার অবচেতন লোকের স্বপ্ন মিলে অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটল তার মনে। অপ্রত্যাশিত এবং প্রত্যাশিত পাশাপাশি দাঁড়াল যেন সামনে এসে। এক হয়ে মিশে গেল যেন দেখতে দেখতে।

"আপনিও এখানে গান শিখতে এসেছেন? আশ্চর্য!"

"এইটেই তো আমার বাড়ি"—তারপর গহনচাঁদের দিকে ফিরে রঙ্গনা বললে—"বাবা, ইনিই দিবসবাবু, কাল আমাকে সেতার কেনবার জন্যে টাকা দিয়েছিলেন।"

ভদ্রতার আতিশয্যে গহনচাঁদ উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং সাগ্রহে দুই বাহু প্রসারিত করে অভ্যর্থনা করলেন।

"আসুন, আসুন, আসুন। আপনার ভদ্রতার কথা শুনে—"

একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল দিবস। এ ধরনের অভ্যর্থনা সে প্রত্যাশা করেনি।

"আমাকে 'আপনি' বলবেন না। আমি আপনার শিষ্য হতে এসেছি।"

"শিষ্য ও, নিশ্চয়ই! তার আর কথা কি! বেশ, বেশ, বেশ। বস বস বস।"

শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন গহনচাঁদ। সীতারাম এবং রমজান নীরবে উপভোগ করতে লাগলেন মিলনটা। গহনচাঁদের উদার চরিত্র তাদের অবিদিত নেই, এই নবাগত উদার যুবকটিকে তারা সকৌতূহলে প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

কিরণকে দেখে উর্মির মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল।

"কিরণদা, একটা কথা শুনুন!"

উর্মির পিছু পিছু কিরণ বাইরে চলে গেল।

দিবস বসল।

রঙ্গনা বললে, "আমি এক্ষুণি আপনার বাড়ি থেকে ফিরে এলাম।"

"তাই না কি!"

"এইমাত্র আসছি। বড় নোংরা বস্তিতে আপনার বাড়িটা। আপনার হাঁসটি কিন্তু সুন্দর!"

"হাঁসটিও দেখে এসেছেন?"

"হ্যাঁ চমৎকার হাঁসটি। এই নিন আপনার টাকাটা।"

একখানা দশ টাকার এবং আর একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে তুলে ধরলে সে দিবসের দিকে।

"টাকার জন্যে ব্যস্ত কি? থাক না,—তাছাড়া আমি—"

শশব্যস্ত গহনচাঁদ কিন্তু দিবসের কথা শেষ হতে দিলেন না।

"না, না, সে কি কথা, ওটা নিতে হবে বই কি—"

"আমি তো সরোদ শিখব বলে আপনার স্কুলে ভরতি হতেই এসেছি। আমার বন্ধু কিরণও ভরতি হবে। আমাদের দুজনের মাইনেই তো কুড়ি টাকা লাগবে—"

"মাইনে? অ্যাঁ, বল কি—"

গহনচাঁদ আকাশ থেকে পড়লেন। বারান্দায় উপবিষ্ট চুনীলালের মাথাতেও যেন বম্ পড়ল। ছোকরা দুটি কখন ফট্ করে ঢুকে পড়েছে টের পায়নি তো সে মোটেই। নূতন ছাত্র ছাত্রীদের ধরবার জন্যেই সে সর্বদা বসে থাকে বারান্দায় ওৎ পেতে। রাস্তায় যেই বিড়িটি

ধরাতে গেছে, অমনি সর্বনাশটি হয়ে গেছে। সাধে মুনি ঋষিরা বলেছেন যে নেশা করা মহাপাপ! যাক, পরে সামলে নিলেই হবে, এখন যা হবার তা হয়ে যাক। এই ধরনের স্বগতোক্তি করে শিস্ দিতে দিতে বেরিয়ে গেল চুনীলাল।

ঘরের ভিতর গহনচাঁদ তাঁর শাগরেদদের দিকে ফিরে বললেন, "রমজান, সীতারাম, শুনছ? মাইনে, ছি ছি ছি!"

রমজান 'তোবা, তোবা' করে উঠল।

সীতারাম ঘাড় নেড়ে বলল, "বিচিত্র।"

দিবস একটু হেসে বললে, "না, না এটা আপনারা সে ভাবে নেবেন না, সামান্য প্রণামী—"

"না না, আগে থাকতে প্রণামীই বা নেব কেন আমি? তোমাকে যদি উপযুক্ত পাত্র বলে মনে করি তাহলেই আমি প্রসন্ন মনে শেখাবো, তোমাকে যতটুকু জানি, টাকার বদলে নয়। এর মধ্যে টাকাকড়ি প্রণামী দক্ষিণা এ সবের কোনো কথাই আসতে পারে না। তোমার প্রদীপটি জ্বালিয়ে দেব আমার প্রদীপের শিখা থেকে। প্রদীপটাই দরকার, টাকাকড়ি নিয়ে কি হবে? এইতেই তো গেছি আমরা!"

রমজান আনন্দে গর্বে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল। সে ধীরে ধীরে গা দুলিয়ে দুলিয়ে মুগ্ধ গদগদ কণ্ঠে বলে উঠল, "ওয়া ওয়া ওয়া।"

সীতারাম শুধু বিস্ফারিত নয়নে চেয়েছিল। চোখ দুটো জ্বলছিল তার। যে ছাত্র-ছাত্রীগুলি বসেছিল তাদের সঙ্গে চুনীলালের একটা প্রাথমিক আলাপ হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং তারা কেউ বিস্ময় প্রকাশ করছিল না। তাদের মধ্যে দু'একজন ঘাড় হেঁট করে বা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল বরং। ঊর্মিও কিরণকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল এই জন্যেই। বারান্দার একধারে দাঁড়িয়ে ঊর্মি কিরণকে বলছিল—"মাইনের কথা গহনচাঁদবাবুর কাছে পাড়বেন না যেন, চুনীলালবাবু মানা করে দিয়েছেন। উনি সেকেলে ধরনের লোক, বিদ্যা বিক্রয় করতে চান না।"

ঘরের ভিতর থেকে গহনচাঁদের উচ্চ কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল—"না না, তা কিছুতেই হতে পারে না, একটি কপর্দকও চাই না আমি। রঙ্গনার কাছে তোমার যে পরিচয় পেলাম কাল তাতে মুগ্ধ হয়ে গেছি। এই তো চাই—বাঃ!"—তারপর আরও উত্তেজিত কণ্ঠে—"তাছাড়া, ভদ্রলোক হবার অধিকার তোমারই একেচেটে থাকবে, এই বা কেমন কথা—বাঃ!"

ঊর্মির চোখের হাসি চিকমিক করে উঠল।

"শুনেছেন? চমৎকার লোক সত্যি! এরকম লোক যে এযুগে থাকতে পারে চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা শক্ত। হ্যাঁ, আর একটা কথা, রঙ্গনাদি আপনার গানে চমৎকার সুর দিয়েছেন। ওঁকে দিয়েই যদি রেকর্ড করানো হয় খুব ভালো হবে। তাই বলি, কি বলেন? আপনার বন্ধু দিবসবাবুর সঙ্গে রঙ্গনাদির আলাপ আছে মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ আমারও তো মনে হচ্ছে। দিবস আমাকে কিন্তু বলেনি কিছু।"

ঊর্মির চোখে আবার একটা হাসি চিকমিক করে উঠল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দিবস বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

"না, ভদ্রলোক কিছুতেই নেবেন না টাকা। চল যাওয়া যাক" রঙ্গনাও বেরিয়ে এল।

"বাবা বলেছেন কাল থেকে আপনারা আসবেন নিশ্চয়।"

"আচ্ছা"—দিবস হাসি মুখে বললে—"আসতেই হবে. উপায় কি? আমরা এখন চলি তাহলে, নমস্কার।"

"নমস্কার।"

ঊর্মি এগিয়ে এসে বললে, "রঙ্গনাদি এখনি আপনি যে গানটা গাইলেন সেটা এঁরই রচনা।"

কিরণের দিকে সগর্বে চেয়ে রইল সে হাসিমুখে। কিরণ যেন তারই কীর্তি। রঙ্গনা নমস্কার করল। কিরণও প্রতিনমস্কার করলে নীরবে। কিরণের দিকে চেয়ে আর এক ঝলক হেসে ফেললে ঊর্মি (তার এই হাসির টুকরাগুলিও যে রূপান্তরিত কান্না তা সে নিজেও বুঝতে পারছিল না)। তারপর রঙ্গনাকে বললে, "লোকটি ভারী লাজুক। ওঁর হয়ে কথাটা আমিই বলি তাহলে। ওঁর গানটা যদি আপনি রেকর্ডে দেন কেমন হয়? শুনেছি গ্রামোফোন কোম্পানিরা আপনার বাবাকে খুব খাতির করেন।"

"জানি না তো!"

"আচ্ছা আমিই জিগ্যেস করছি ওঁকে।"

তারপর কিরণের দিকে ফিরে বললে, "আপনারা যান, আমি একটু পরে আসছি।"

পুনরায় আর একদফা নমস্কার বিনিময় করে দিবস ও কিরণ রাস্তায় নেবে পড়ল। নেবেই দেখা হয়ে গেল চুনীলালের সঙ্গে। এদেরই অপেক্ষায় চুনীলাল দাঁড়িয়েছিল।

"নমস্কার। একটুর জন্যে আজ 'মিস্' করেছি আপনাদের। আমার নাম চুনীলাল। গহনচাঁদবাবু আমার ভগ্নীপতি। ওঁর লেকচারটা শুনলেন তো? এইবার আমার কথাটা শুনুন। উনি যা বলেন তা সত্যযুগের কথা, কিন্তু সত্যযুগ তো এখন নেই, তাই আমার কলিযুগের কথাটাও শুনতে হবে আপনাদের। আমার জামাইবাবুটি মস্তবড় গুণী একজন, কিন্তু একদম আত্মভোলা লোক। সংসার করতে গেলে যে টাকার দরকার এবং সে টাকাটা রোজগার না করলে পাওয়া যাবে না এই কথাগুলো রাগ-রাগিণী নয় বলেই বোধ হয় উনি ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না। দিদি মারা যাওয়ার পর থেকে মেয়েটিকে আমার কাছে রেখে কাশীবাস করছিলেন এতদিন। সেখানে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ পেয়ে, শাগরেদদের কাছ থেকে কলাটা মুলোটা নিয়ে চলে যাচ্ছিল ওঁর। কিন্তু মেয়েটি যে ক্রমশ বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে সেদিকে ওঁর খেয়ালই নেই। মেয়ের বিয়ে দিতে হলেই টাকা চাই। সেইজন্যে ওঁকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এনে এই সঙ্গীত-ভবনটি খুলেছি মশাই, আসল উদ্দেশ্য কিছু টাকা রোজগার করা। সেইজন্যে ওঁকে গোপন করে মাইনের টাকাটা আমিই নিচ্ছি। উনি জানতে পারলে খুনোখুনি করবেন, সেইজন্যে যাতে না জানতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বুঝতে পারছেন কথাটা?"

দিবস বললে, "তার মানে টাকাটা আপনাকেই দিয়ে দেব?"

"হ্যাঁ এবং কথাটা ওর কাছে গোপন রাখবেন।"

"বেশ! তাই হবে। টাকাটা কি এখনই নেবেন?"

"না। আমার বাড়ির বাইরের দিকে যে ঘরটা আছে সেখানে সকালে রোজ ছাত্রছাত্রী ভর্তি করি আমি। সেইখানেই আসবেন। টাকা নিয়ে রসিদ দিয়ে দেব। আমাকে চেনেন না শোনেন না, রাস্তায় আমার হাতে টাকা দেবেন কি! আমি জোচ্চোরও তো হতে পারি?"

দন্ত বিকশিত করে দুজনের মুখের দিকে চাইলে চুনীলাল।

"আচ্ছা, তাই হবে তাহলে, নমস্কার।"

"নমস্কার।"

নীরবে অগ্রসর হল তারা কিছুদূর।

কিরণ সহসা বললে, "গহনচাঁদবাবু যদি সোজাসুজি মাইনে না নেন তাহলে ওখানে ভরতি হব না আমি।"

"কেন?"

"চুনীলালবাবু যা বললেন তা সত্যি কি মিথ্যে কি করে জানব বল? এ-ও হতে পারে চুনীলালবাবু নিজেই টাকাটা গাপ করছেন।"

"তাতো একটু খোঁজ করলেই বোঝা যাবে।"

"তা বোঝা গেলেও আমি স্বস্তি পাব না। গহনচাঁদবাবু জানতে পারছেন না, অথচ তার মতের বিরুদ্ধে তাঁকে লুকিয়ে মাসে মাসে টাকা দিয়ে যাচ্ছি, এ রকম গোঁজামিলের মধ্যে আমি নেই। গুরু বলে যাঁকে শ্রদ্ধা করব তাঁর সঙ্গে লুকোচুরি চলে না।"

"বেশ তো, তুমি ইচ্ছে করলে তাকে মাইনে না দিতে পার। তিনি তো আসতেই বলেছেন আমাদের।"

"না, তাতেও আমার আত্মসম্মানে বাধবে। আমি বিনা বেতনে কাউকে খাটিয়ে নিতে চাই না।"

"ব্রাহ্মণত্বের আদর্শে বিশ্বাস নেই তাহলে তোর বল?

"যে বর্ণাশ্রমধর্মের পটভূমিকায় ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ উজ্জ্বল ছিল সেই বর্ণাশ্রম ধর্মের যখন লোপ পেয়েছে তখন কেবলমাত্র ব্রাহ্মণত্বের আদর্শটাকে আঁকড়ে থাকার কোনো অর্থ হয় না। আজ হঠাৎ যদি কেউ রোমান টোগা পরে রাস্তায় বেরোয় তাহলে তা যেমন হাস্যকর এও তেমনি হাস্যকর।"

"যদিও তুই কবি তবু আমার মনে হয় রোমান টোগার সঙ্গে ব্রাহ্মণত্বের আদর্শের উপমাটা খুব লাগসই হল না। রোমান টোগা একটা সাময়িক ব্যাপার। ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ কিন্তু সভ্য সমাজের চিরন্তন আদর্শ। যে দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম নেই সে দেশেও ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ আছে—"

হঠাৎ সাহেব প্রফেসারের মুখ তার মনে পড়ে গেল।

"ওদেশের যাঁরা বড় বড় অধ্যাপক তাঁরা সত্যিই ব্রাহ্মণ। এদেশেও ব্রাহ্মণ ছিল এবং আবার হবে। না হলে আমাদের মুক্তি নেই।"

"যখন হবে তখন ব্রাহ্মণত্বের আদর্শকে মানব। আজ আমি ব্রাহ্মণ ট্রাম ড্রাইভারি করছি আর তুমি ব্রাহ্মণ একটা মেসে চাকর হয়ে আছ। আমাদের কোনও অধিকার নেই ব্রাহ্মণত্বের আদর্শের ছুতোয় কাউকে বিনাপয়সায় খাটিয়ে নেবার।"

"বেশ বেশ নিও না। সব বিষয়ে তর্ক করা তোর কেমন একটা স্বভাব হয়ে গেছে দেখছি!"

আবার নীরবে পথ চলতে লাগল দুজনে। কিরণের কেমন যেন লজ্জা করছিল। তার যে আত্মসম্মান বোধটা নিষ্ঠুর অত্যাচারীর মতো তার দুর্বলতার টুঁটি টিপে আছে সর্বদা অথচ যার স্বপক্ষে সে যুক্তিও আহরণ করে চলেছে অহরহ সেটাকে এমনভাবে আস্ফালন করেনি সে

কোনোদিন। হঠাৎ উর্মিকে দেখেই বোধ হয় মানসিক সমতাটা নষ্ট হয়ে গেল। উর্মির সান্নিধ্যে এলেই তার আত্মসম্মান বোধটা কেমন যেন উগ্র হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ সে জিগ্যেস করলে, "গহনচাঁদবাবুর মেয়ে রঙ্গনার সঙ্গে তোর আলাপ আছে নাকি?"

"আজই হয়েছে। আমি যে দোকান থেকে সরোদ কিনছিলাম উনিও সেখানে সেতার কিনেছিলেন। ওর কয়েকটা টাকা কম পড়ে গিয়েছিল, আমি সেটা দিয়ে দিলাম।"

দিবস হাসিমুখে চাইলে কিরণের দিকে। কিরণেরও মুখে হাসি ফুটে উঠল।

সে বললে, "এবং, বলে যা, থামলি কেন?"

"এবং-এর পরে ড্যাশ, আধুনিক রীতিতে ফুটকি ফুটকিও বলতে পার।"

আবার সেকেন্ড কয়েক নীরবে চলবার পর দিবস হঠাৎ বললে, "দেখ গহনচাঁদবাবুর ওখানে তুই যদি যাস তাহলে আমার আসল পরিচয়টা যেন ফাঁস করে দিস না ওদের কাছে। আমি ওদের কাছে নিজেকে মেসের চাকর বলেই পরিচয় দেব যদি দরকার হয়।"

"কেন?"

"পরে বলব।"

কিরণ ভ্রূকুঞ্চিত করে চাইলে দিবসের দিকে। দিবসের মুখে ফুটে উঠল মুচকি হাসি।

*　　*　　*　　*

খানিকক্ষণ ঢুলে ঢুলে সৌদামিনী শেষে দিবসের ঘরের মেজেতেই আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়েছিল। দিবসের ঘরের চাবি তার কাছেই আছে, ঘরটা খোলা রেখে নিজের ঘরে যেতে পারেনি সে তাই।

দিবস এবং কিরণ যখন এল তখন দশটা বেজে গেছে। মোহন ঠাকুরের হোটেল থেকে খেয়ে এসেছিল সে। দিবসের সাড়া পেয়ে সৌদামিনী উঠে বসল।

"এত রাত অবধি ছিলে কোথায়? সেই থেকে ঠায় বসে বসে শেষে এই খানেই আঁচল পেতে শুয়ে পড়লুম। ছিলে কোথা এতক্ষণ? বাড়ি গিয়েছিলে না কি?"

"না।"

"তাহলে?"

"এমনি একটু দরকার ছিল।"

"খাওয়া হয়েছে?"

"হয়েছে।"

"কোথা খেলে?"

"মোহন ঠাকুরের হোটেলে।"

কমানো লণ্ঠনটা উস্কে টেবিলের উপর রাখতেই রঙ্গনার চিঠিটা চোখে পড়ল সৌদামিনীর।

"সন্ধেবেলা একটি মেয়ে এসেছিল, এই চিঠি লিখে রেখে গেছে। টাকা না কি দিতে এসেছিল বললে।"

চিঠিটা পড়তে পড়তে দিবস বললে, "দেখা হয়েছে এর সঙ্গে। এদের বাড়িতেই দেরি হয়ে গেল।"

"তোমার কেউ হয় না কি?"

"না।"

এইবার আসল কথাটা মনে পড়ল সৌদামিনীর।

"মশারি এনেছ?"

"ওই যাঃ, আজও ভুলে গেছি।"

"রোজ রোজ মশার কামড়ে শুলে অসুক করবে যে!'

"কিছু হবে না।"

দিবস নিজের মোমবাতিটা জ্বেলে ফেললে। তারপর কিরণের দিকে চেয়ে বললে, "রম্যাঁ রলাঁর 'I will not rest' বইটা কিনেছি। এই দেখ—"

সৌদামিনী কিরণের দিকে একবার চেয়ে বেরিয়ে গেল। কিরণ বইটার সম্বন্ধে কোনও আলোচনা না করে ঘরের চার দিকটা চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

"তুই কি এ ঘরে থাকতে পারবি?"

"কেন পারব না?"

"তার চেয়ে আমার বাসায় চল না!"

"আপত্তি ছিল না, কিন্তু তোর বাসায় থাকবার মতো অবস্থা নয় এখন আমার। তোর বাসায় থাকতে গেলে তোর বাসার অর্ধেক ভাড়া আমার দেওয়া উচিত, কিন্তু অত টাকা পাব কোথা, তাছাড়া এই বাসার তিন মাসের অগ্রিম ভাড়া দিয়ে দিয়েছি।"

কিরণ চুপ করে রইল। আত্মসম্মান বিষয়ে একটু আগেই বক্তৃতা দিয়েছে সে। সৌদামিনী এসে ঢুকল আবার। তার হাতে একটা মশারি।

"আমার একটা ছেঁড়া-খোঁড়া ছিল এইটে টাঙিয়েই শোও আজ। সর, টাঙিয়ে দিই।"

কিরণ উঠে পড়ল।

"আমি এখন উঠি ভাই। কাল ভোরেই আমার আবার ডিউটি। যেতেও হবে অনেকটা দূর।"

"চল তোকে একটু এগিয়ে দি তাহলে।"

দিবসও উঠে দাঁড়াল।

সৌদামিনী দিবসকে বললে, "গল্প করতে করতে আবার বেশি দূরে চলে যেও না যেন। তোমারও কাল সকালে ডিউটি।"

"আমি এখনই আসছি।"

দুজনে বেরিয়ে গেল।

মশারি টাঙাতে গিয়ে সৌদামিনী দেখলে যে শুধু মশারি হলেই হবে না, পেরেক চাই, দড়ি চাই। অর্থাৎ গিরির সাহায্য নিতে হবে।

.... সৌদামিনীর কথা শুনে রাস্তায় যেতে যেতে কিরণ বলছিল—

"একে বেশ পেয়েছিস তো!"

"চমৎকার!" উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে দিবস উত্তর দিলে এবং কাল থেকে যে কথাটা তার মনে হচ্ছিল সেটা বলে ফেললে "যাদের আমরা ছোটলোক বলে ঘৃণা করে এসেছি এতকাল, এখন দেখছি তারা মোটেই ছোট নয়, তাদের মধ্যেই সনাতন ভারতবর্ষ বেঁচে আছে এখনও।"

....গিরি এবং সৌদামিনী দুজনে মিলেই টাঙাচ্ছিল মশারিটা। দিবস আবার বেরিয়ে যাওয়াতে বিরক্ত হয়েছিল সৌদামিনী।

"অত্যন্ত বারফটকা স্বভাব দেখছি। আবার বেরিয়ে গেল।"

"পটলির কথাটা বলেছিলি?"

"সময় পেলাম কই? সঙ্গে কে একজন ছিল, যার তার সামনে কি ওকথা পাড়া যায়? বলব এখন সময়মতো।"

দিবস এসে ঢুকল এবং শেষ কথাগুলো শুনতে পেয়ে গেল।

"কি বলবে? বাঃ, মশারি তো চমৎকার হয়েছে। আরে, গিরিবালাও যে, তুমিও ঘুমোওনি এখনও?"

"এইবার যাই।"

মাথায় আধঘোমটা টেনে বেরিয়ে গেল গিরিবালা। সৌদামিনীর একবার ইচ্ছে হল পটলির কথাটা এখনই বলে কিন্তু তখনই আবার মনে হল—না আজ রাত হয়ে গেছে, কাল সকালে বললেই হবে।

"এইবার আলোটি নিবিয়ে তুমিও ঘুমোও।"

"শুচ্ছি, কিন্তু এখন ঘুম আসবে না। পড়ব।"

"কতক্ষণ পড়বে?"

"যতক্ষণ না ঘুম আসে।"

"কি কাণ্ড!"

আবার ঘাড়টি কাৎ করে গালে হাত দিলে সৌদামিনী। তারপর বেরিয়ে গেল।

টেবিলে মোমবাতিটা ঠিক করে রাখতে গিয়ে রঙ্গনার চিঠিটা আবার চোখে পড়ল দিবসের। ভ্রূকুঞ্চিত করে আবার পড়লে চিঠিটা। তারপর মুচকি হাসি ফুটে উঠল মুখে। আবার ভ্রূকুঞ্চিত হল।

কিরণ বাসায় ফিরে দেখল ঊর্মি একটা চিঠি নিয়ে বসে আছে তার আশায়।

"গহনচাঁদবাবু বললেন গ্রামোফোন কোম্পানিদের কারও সঙ্গে তাঁর নিজের কোনও আলাপ নেই। মলঙ্গা লেনে এক ভদ্রলোক থাকেন, তাঁর না কি হাত আছে। গহনচাঁদবাবু চেনেন তাঁকে। তাঁর নামে একটা চিঠিও দিয়েছেন। আপনি এই চিঠিটা নিয়ে যাবেন তাঁর কাছে?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কিরণ বললে, "না।"

"কেন, গেলে ক্ষতি কি?"

"তা তোমাকে বোঝাতে পারব না, কিন্তু আমি যাব না।"

"বেশ, আমিই যাব তাহলে।"

চিঠিখানা নিয়ে ঊর্মি চলে গেল।

"সময়মতো আমি নিজেই এসে দেখা করে যাব" দিবসের এই আশ্বাসটুকুর উপর নির্ভর করে সূর্য চৌধুরী দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল দিবস ঠিক আসবে, এবং সব ঠিকও হয়ে যাবে। তবু অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল একটা, বিশেষত ব্রজর এক একটা তীক্ষ্ণ কথা মাঝে মাঝে আকুল

করে তুলছিল তাঁকে। কিন্তু এ ছাড়া আর একটা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিলেন তিনি এবং এই দ্বন্দ্বটা তাঁর উকিল মনকে এত ব্যাপৃত করে রেখেছিল যে দিবসের চলে যাওয়ার দুঃখটাও তত তীব্রভাবে অনুভব করছিলেন না তিনি। দ্বৈরথটা চলছিল প্রিয়বন্ধু গোবিন্দ সাণ্ডেলের সঙ্গে। সাণ্ডেল নানারকম উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করতে চান যে আজকালকার ছেলেমেয়েরা অতি পাজি, অতি বখা, তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। দিবসের এই চলে যাওয়াটাকেই একটা উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করছেন তিনি। সূর্য চৌধুরী—উকিল সূর্য চৌধুরী—হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে দাঁড়িয়েছেন আজকালকার ছেলেমেয়েদেরই পক্ষে এবং বদ্ধপরিকর হয়েছেন যে মামলাটা তিনি জিতবেন। মনে মনে তিনি আশা করে আছেন দিবসের আচরণই তাঁকে জিতিয়ে দেবে। প্রমাণের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন তিনি।

.....মক্কেলদের কাজ শেষ করে আহারান্তে তিনি ছাতে বসেছিলেন এবং কোনোদিন যা করেন না আজ তাই করছিলেন। আকাশের দিকে চেয়েছিলেন। কয়েকটা তারার আকম্পিত আলোর দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন তিনি। ব্রজ আসতে মর্ত্যে নেবে এলেন আবার। ব্রজ গড়গড়াটা নামিয়ে তার মাথায় কলকেটা বসিয়ে দিয়ে বললে, "কই দিবু আজও তো এল না।"

"আসবে, ব্যস্ত কি।"

"উঃ, বাপ যে এমন পাষাণ হতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না। আজ ওর মা থাকলে কি এমন নিশ্চিন্ত থাকতে পারতে তুমি, না সে নিশ্চিন্ত থাকতে দিত তোমাকে।"

সূর্যকান্ত কোনো জবাব দিলেন না। ব্রজ দাঁড়াল না। তাঁর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি হেনে নীচে নেবে গেল! সূর্যকান্ত পা দোলাতে দোলাতে গড়গড়ায় টান দিতে লাগলেন।

"সূর্যকান্ত, ঘুমিয়েছ না কি হে?"

সাণ্ডেলের গলা। সূর্যকান্ত উঠে আলসে থেকে ঝুঁকে বললেন—"না। উপরে এস।"

"ও বাবা ছাতে চড়ে বসে আছ!"

একটু পরে সাণ্ডেল এসে হাজির হলেন এবং চেয়ারে বসেই প্রশ্ন করলেন, "বাবাজীর কোনও খবর পেলে?"

"না, আর তো কিছুই পায়নি।"

"গতিক ভালো নয়। উঠে পড়ে লেগে খুঁজে বার কর।"

"ব্যস্ত হবার দরকার কি? শিক্ষিত ছেলে, নিতান্ত ছেলেমানুষও নয়, তাকে অবিশ্বাস করবার কোনও কারণ দেখি না।"

"তুমি দেখ না তার কারণ তুমি অন্ধ, স্নেহান্ধ।"

গোঁফের ফাঁকে একটু মৃদু হেসে সূর্যকান্ত বললেন, "যদি বলি আমি আধুনিক—"

"দেখ শিং ভেঙে বাছুরের দলে মেশা যায় না। ওই এক ঝুড়ি কাঁচা পাকা গোঁফ নিয়ে আধুনিক হতে পারবে না, সে চেষ্টা করো না। ছেলেটিকে খুঁজে বের করে গলায় গামছা দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এস, নিয়ে এসে অবিলম্বে একটি বিয়ে দিয়ে দাও। আমাদের যোগীনের ছেলেটাও গা-ঢাকা দিয়েছিল। কি করেছে জান সে?"

"কী?"

"এঁটো আঁটি চুষতে চুষতে বাড়ি ফিরেছে।"

"তার মানে!"

"গুণ্ডা-বিদ্ধস্ত এক মেয়েকে বিয়ে করে এনেছে! কালে কালে কতই যে দেখব!"

"এতে অন্যায়টা হয়েছে কি? দুঃশাসন-বিদ্ধস্ত দ্রৌপদীকে পাণ্ডবরা যখন ত্যাগ করেনি তখন—"

সূর্য চৌধুরীকে কথা শেষ করতে দিলেন না সাণ্ডেল মশাই।

"নাঃ, তোমার মতিভ্রম হয়েছে দেখছি। দুঃশাসন-দ্রৌপদী করছ কর, কিন্তু এই বলে দিলুম, গরিবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগবে।"

গোবিন্দ সাণ্ডেল উঠে দাঁড়ালেন।

"এর মধ্যেই উঠছ যে?"

"আজ আর বসব না। সমস্ত দিন একাদশীর উপোস গেছে, ঘুম পাচ্ছে। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম ভাবলাম দিবুর খবরটা একবার নিয়ে যাই। আধুনিকতার বারফট্টাই করতে চাও কর, কিন্তু ছেলেটিকে খুঁজে পেতে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এস, তা না হলে পস্তাতে হবে এই বলে দিলুম।"

গোবিন্দ সাণ্ডেল চলে গেলেন। সূর্য চৌধুরী পা দোলাতে দোলাতে তামাক খেতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ উঠে পড়লেন! নীচে নেমে গিয়ে দেরাজটা খুলে শালটা বার করলেন। দিবস যে শালটা পাঠিয়েছিল সেই শালটা! অনেকবার দেখেছেন তবু আর একবার দেখতে লাগলেন। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে লাগলেন। দেখে রেখে দিলেন সেটা। তারপর আর একটা টেবিলে গিয়ে কাগজপত্তর হাঁটকে কার্ডটা বার করলে। ইউনিভার্সিটি ইনস্‌টিট্যুট থেকে তাঁকেও নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে গিয়েছিল। কার্ডটার দিকে চেয়ে রইলেন নির্নিমেষে।

রঙ্গনা নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে কাঁদছিল। চুনীলালের সঙ্গে তার কথা হয়েছে গোপনে। তার বাবার অন্তঃসারহীন মহত্ত্বের পরিণাম যে কি তা চুনীলাল বুঝিয়ে দিয়েছে তাকে। চুনীলালের কথার প্রতিবাদ করতে পারেনি সে। কিন্তু অন্তরের ভিতরটা হায় হায় করছে। কেবলই তার মনে হচ্ছে মামা কেন দিবসবাবুকে এসব কথা বলতে গেলেন! না হয় দু একজন মাইনে না-ই দিল। বাইরের লোকের সামনে বাবাকে— তার অমন সরল বাবাকে—খেলো না করলেই চলছিল না?

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

দিবস হরিদাসবাবুর জুতো বুরুশ করছিল এবং দ্বন্দ্ব করছিল নিজের সঙ্গে। সে যে পেরেছে এই আনন্দে মনটা ভরপুর হয়ে উঠেছিল তার। জুতো বুরুশ শেষ করে একটু পরেই সে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে গিয়ে বক্তৃতা দেবে। এই দুই আপাত-বিরোধী ব্যাপারের সে যে

সমন্বয় করতে পেরেছে এরই আনন্দটা যাতে তার চোখে মুখে উপচে পড়ে আত্মশ্লাঘার ছোঁয়াচ লেগে কুৎসিত বাহাদুরিতে পরিণত না হয় সেই দ্বন্দ্বই করছিল সে মনে মনে। সে যে খুব একটা বাহাদুরি করেছে এটা সে মনে মনেও মানতে চাইছিল না। ভাবছিল মনে মনে মানলেই তার অজ্ঞাতসারে চোখে মুখেও ফুটে উঠবে সেটা। ঘরের কোণে ছোট্ট একটি প্রদীপ জ্বালা থাকলেও তার অস্তিত্ব যেমন বদ্ধদ্বারের সূক্ষ্ম ফাটল দিয়েও বোঝা যায় তেমনি বোঝা যাবে। না, ও প্রদীপ সে জ্বালবেই না। কিছুতেই না। এতে বাহাদুরি কি আছে? এইই তো করা উচিত। আদর্শকে অনুসরণ করার মধ্যে কোনও বাহাদুরি নেই। কিন্তু তার মনের বালক-প্রকৃতি মাঝে মাঝে প্রদীপটা জ্বেলেও ফেলছিল দু' একবার। তখনই আবার নিবিয়ে দিচ্ছিল তাড়াতাড়ি। সেদিন সৌদামিনীর মুখে গিরিবালার আত্মীয়া পটলির কথা শুনে সে যখন নিজের রিস্ট-ওয়াচটা বিক্রি করে পঁচাত্তরটা টাকা এনে দিয়েছিল তখনও তার মনে এই ধরনের বাহাদুরির ভাব জেগেছিল একটা। সৌদামিনীকে যদিও সে জানায়নি যে রিস্ট-ওয়াচ বিক্রি করে সে টাকা এনে দিয়েছে (বলবার লোভ হচ্ছিল যদিও প্রচুর, সিনেমার নায়কের মতো সে যে তার শেষ সম্বলটুকুর বিনিময়ে জনৈক বস্তিবাসিনী যুবতীকে পাপের পথ থেকে নিবৃত্ত করতে পেরেছে এর নাটকটা আস্ফালন করতে খুবই প্রলুব্ধ হয়েছিল সে) কিন্তু মনে মনে আত্মগৌরবের অহংকৃত মদিরাটা সে পান করেছিল বই কি। অন্যায় জেনেও পান করেছিল। ছেলেবেলায় ব্রজকে লুকিয়ে দুপুরবেলা আচার চুরি করে খেত যেভাবে সেইভাবে সে এই আত্মশ্লাঘাটাকে উপভোগ করেছিল। হঠাৎ পটলির যৌবন-লিপ্সু ঝাঁকড়া-চুল-ওলা আরক্তচক্ষু লোকটার মুখচ্ছবি এবং কাহিনী তার মনে জেগে উঠল। পটলির স্বামী কাজ করত লোকটার বাড়িতে। তারপর পটলির স্বামী অসুখে পড়ে। সে অসুখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এখনও ভুগছে। অসুখের জন্য পটলি লোকটার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা ধার করে এনেছিল। সেই ধার সুদে আসলে এখন পঁচাত্তর টাকায় দাঁড়িয়েছে। ঝাঁকড়া-চুল-ওলা লোকটা বলছে নগদ টাকা সে চায় না, পটলি গতর খাটিয়ে সে টাকা শোধ করে দিক। পটলিকে গতর খাটাতে হবে অবশ্য তার বাড়িতে গিয়েই। পটলির পরিবর্তে সৌদামিনী গিয়ে গতর খাটাতে সম্মত হয়েছিল কিন্তু ঝাঁকড়া-চুল-ওলা তাতে রাজি নয়। সে পটলিকেই চায়। অর্থ সুস্পষ্ট। গিরিবালা (পটলির দূর সম্পর্কের কাকী) সৌদামিনীর মারফত উকিল-পুত্র দিবসের উপদেশ প্রার্থনা করেছিল যে আইনত এর কোনো প্রতিকার হতে পারে কিনা। দিবস বলেছিল—"অত ঘোর প্যাঁচের মধ্যে না গিয়ে টাকাটা দিয়ে লোকটাকে বিদায় করে দাও। তোমাদের যদি টাকা না থাকে আমি টাকা দিচ্ছি।" বাড়ি থেকে চলে আসবার আগে সে তার আড়াইশ টাকা দামের রিস্ট-ওয়াচটা অয়েল করতে দিয়েছিল একটা দোকানে। সেই দোকানেই ঘড়িটা সে একশ' টাকায় বিক্রি করে তার থেকে পঁচাত্তর টাকা সৌদামিনীকে দিয়েছে। একটা মস্ত সুবিধে হয়েছে কিরণ কিছুই জানতে পারেনি। জানতে পারলে ঠিক বাধা দিত। বলাবাহুল্য সেই ঝাঁকড়া-চুল-ওলা লোকটা অপ্রত্যাশিত ভাবে সুদসুদ্ধ টাকা নগদ পেয়ে মোটেই খুশি হয়নি, বরং অসংস্কৃত ভাষায় যা সব বলে গেল তা একটুও শ্রুতিরোচক নয়। একটা জিনিস অবশ্য সংস্কৃত ছিল তার—দন্ত্য'স'-এর উচ্চারণটা। এই চিন্তার সূত্র ধরেই রঙ্গনার কথাটাও মনে পড়ল তার। সূত্রটা অবশ্য ঈষৎ জটিল। সেই ঝাঁকড়া-চুল-ওলা লোকটা যা ইঙ্গিত করেছিল তার অর্থ—ও, টাকাটা দিয়ে

পটলিকে তুমিই গ্রাস করতে চাও? বটে! তাঁর এই ইঙ্গিতের উত্তরে মনে মনে হাসতে গিয়েই রঙ্গনার কথাটা মনে পড়ে গেল তার। রঙ্গনাও কি আজকের সভায় যাবে? কে জানে!

জুতো বুরুশ করতে লাগল সে ত্বরিত-হস্তে। আর মিনিট দশেক পরেই বেরুতে হবে তাকে। হরিদাসবাবুও একটা কোনো মিটিংয়ে যাবেন এখনই, জুতোটা তাঁর এখনই চাই। গোবর্ধনবাবুর 'টাইমপীস'টার দিকে এক নজর চেয়ে তাড়াতাড়ি জুতোবুরুশ শেষ করে সে নেবে গেল নীচে। মনিবদের কাছে সে আগেই ছুটি চেয়ে নিয়েছিল।

অসময়ে বৃষ্টি হয়ে গেল এক পশলা। চেৎলা অঞ্চলের একটা সরু গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে (এবং কিঞ্চিৎ ছুটে) আপাদমস্তক ভিজে গেলেন গোবিন্দ সাণ্ডেল। একটা গাড়িবারান্দার নীচে আশ্রয় পাবার পর প্রথমেই তিনি জুতো জোড়াটার দিকে তাকালেন। কাদায় জলে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। মাত্র দিন দুই আগে কিনেছেন। মর্মান্তিক রাগ হল বদ্যিনাথ মৈত্রর উপর। সাধে লোকে বলে সতেরোটা গাধা মরে একটা মাস্টার হয়। তুই যখন ঠিক জানিস না তখন একটা উড়ো খবর দিতে গেলি কোন আক্কেলে! একবারে ঠিকানা পর্যন্ত দিয়ে বলে দিলি যে দিবু বলে এক ছোকরা পান বিড়ির দোকান খুলে বসেছে! সাণ্ডেল মশাই গিয়ে দেখেন দিবু বলে এক ছোকরা পান বিড়ির দোকান খুলেছে বটে কিন্তু এ দিবু দিবস নয় দিব্যেন্দু। দিবাকর হতেও বাধা ছিল না। সাণ্ডেল মশাই এটা যে ভাবেননি তা নয়। বদ্যিনাথকে জেরাও তিনি করেছিলেন, কিন্তু সে ওই কালো সুঁটকো ছোকরার এমন বর্ণনা দিলে যে মনে হল দিবসই হবে বোধ হয়। ওই রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ? না, ওই চেহারাকে দোহারা বলা চলে? এর পর আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলেন সাণ্ডেল মশাই। তিনিই বা মরতে এলেন কেন এতদূর, কি দরকার ছিল তাঁর! উত্তরটাও তখনই মনে এল—না এসে উপায় কি! বন্ধুর দুর্দশাটা চোখের ওপর দেখা যায় কি? তিনি তো একেলে 'ফ্রেন্ড' নন যে মৌখিক সহানুভূতির ফুলঝুরি কেটে কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা হয়ে যাবেন। সামর্থ্যে যতটা কুলোয় ততটা তাঁকে করতে হবে। ছেলেকে ফিরে না পেলে ওর মুখের হাসি যে ফিরবে না তা তাঁর চেয়ে বেশি আর কে জানে। তাঁকেই চেষ্টা চরিত্র করে ফিরিয়ে আনতে হবে ছেলেটাকে। সূর্যি নিজে আর খুঁজবে না। ভাঙবে তবু মচকাবে না—চেনেন তো! ছেলের উপর অগাধ বিশ্বাস করে আধুনিক সেজে বসে আছে। এদিকে মনে মনে সে গুমরে মরছে তা আর কেউ না বুঝতে পারুক তিনি বোঝেন।....হঠাৎ আবিষ্কার করলেন মনি-ব্যাগটা পকেটে নেই। পকেট থেকে তুলে নিলে না কি কেউ? না, ছুটতে গিয়ে পড়ে গেল? বৃষ্টি থেকে মাথাটা বাঁচাবার জন্যে রুমালখানা বার করেছিলেন একবার। সেই সময়ে পড়ে গেল না কি! মহা মুশকিল হল তো। ট্রাম বাসের পয়সা পর্যন্ত নেই যে। শ্যামবাজার পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া তো অসম্ভব। ট্যাক্সি করতে হবে না কি? পরিমিত পেন্সন থেকে অকারণ এতগুলো টাকা বেরিয়ে যাবে। কিন্তু উপায়ই বা কি! ঘোড়ার গাড়িও কম নেবে না। কাছে পিঠে ট্যাক্সিও তো দেখা যাচ্ছে না একটাও। কোঁচাটি বাঁ হাতে ধরে আধুনিক ছেলেদের এবং মাস্টারদের মুণ্ডপাত করতে করতে মোড়ের দিকে অগ্রসর হলেন তিনি।

দিবস নিজেও ভাবেনি যে তার বক্তৃতাটা এমন জমে উঠবে। শেষের দিকটা আরও বেশি জমে উঠল যেন। বিস্মিত রঙ্গনা সামনেই বসেছিল। চিত্রার্পিতবৎ বসেছিল সে। মানে, তার দেহটাই বসেছিল। মনে মনে সে চলে গিয়েছিল অনেক দূরে। দিবসের সব কথা শুনছিলও না। দু'একটা কথা মাঝে মাঝে যা কানে আসছিল তা না এলেও কিছু ক্ষতি হত না। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ যে আলোটা সে দেখতে পেয়েছিল সেই দিকেই চেয়েছিল সে প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে।

আবেগভরে বলে চলেছিল দিবস—"বন্ধুগণ, বাঙালীরা অলস, বাঙালীরা অপদার্থ, বাঙালীরা পরশ্রীকাতর, বাঙালীরা স্বপ্নবিলাসী বাবু এ অপবাদ ঘোচাতে হবে আমাদের। সার্থক প্রতিবাদ করতে হবে এর। হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিতে হবে যে দরকার হলে আমরা সব করতে পারি, কোনও সৎকাজই ঘৃণ্য নয় আমাদের কাছে। কেবল গুটিকতক শৌখিন বৃত্তি ছাড়া অন্য কোনো কাজ করতে আমরা অক্ষম এ নিন্দা আমাদের যেন আর শুনতে না হয়। আমাদের মাথার উপর বজ্রগর্ভ কৃষ্ণমেঘ ঘনিয়ে এসেছে বন্ধুগণ, আত্মরক্ষা করতে হবে আমাদের। ইমার্সনের সেই অমর বাণীকে সার্থক করতে হবে জীবনে—The best Lightening rod for your protection is your own spine. একথা ভুললে চলবে না যে পৌরুষই মানুষের একমাত্র সম্পদ, একমাত্র নির্ভর। কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ এই জাতকে কোমর সোজা করে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে আবার। বাঁচতে হবে, মানুষের মতো কাজ করতে হবে, আলস্য পরিহার করে যে কোনও কাজ করবার সাহস ও শক্তি সংগ্রহ করতে হবে, প্রমাণ করে দিতে হবে যে 'ডিগ্‌নিটি অব লেবার' কথাটা কেবলমাত্র আমাদের মুখের কথাই নয়। ছোট বড় যাই হোক না কেন সমাজ-হিতকর যে কোনও কাজই যে সৎকাজ এই সত্যকে আঁকড়ে থাকবার মতো সাহস যেন আমরা সংগ্রহ করতে পারি, এই সত্যকে সার্থকভাবে ঘোষণা করবার যোগ্যতা যেন আমরা অর্জন করতে পারি। আলস্য নয়, লম্বা লম্বা বুলি নয়, কাজকেই করতে হবে আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র। যে কুৎসিত মূঢ়তা, যে জঘন্য অহংকার শিক্ষিত সমাজকেও পঙ্গু সীমাবদ্ধ করে ফেলছে দিন দিন তার করাল কবর থেকে মুক্ত হতে হবে আমাদের। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে বন্ধুগণ. ভারতবর্ষের অমর গ্রন্থ গীতার কর্মযোগ স্বাধীন মন নিয়ে নূতন করে পড়তে হবে আবার। উপলব্ধি করতে হবে শ্রীকৃষ্ণের এই পৌরুষপূর্ণ উক্তির মর্ম কি—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য কর্ম সমাচর
অসক্তো হ্যাচরণ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।

অনাসক্ত হয়ে কর্মের জন্যই কর্ম করতে হবে। অর্থলোভে নয়, বিলাস-লালসায় নয়, যশাকাঙ্ক্ষায় নয়, কর্তব্যের জন্য, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য, আত্মশুদ্ধির জন্য, আনন্দের জন্য।

ভদ্রমহিলাগণ, আপনাদেরও প্রতি একটা বিশেষ অনুরোধ আছে আমার। আপনারাই আমাদের ঘরে ঘরে জননী ভগ্নী ও বধূরূপে বিরাজ করছেন। আপনারা উদ্বুদ্ধ করুন এই হতভাগ্য জাতির পৌরুষকে। আপনারা শ্রদ্ধা করতে শিখুন ধনীকে নয় চরিত্রবানকে, ভীরুকে নয় বীরকে, অক্ষম পরগাছাকে নয় সক্ষম বৃক্ষকে, অলসকে নয় কর্মীকে, অভদ্রকে নয় ভদ্রকে।

আপনারা জাগিয়ে তুলুন আমাদের মহত্ত্ব, বাঁচিয়ে তুলুন আমাদের মনুষ্যত্ব, উদ্বুদ্ধ করুন আমাদের আদর্শ। আপনাদের স্নেহ ভালোবাসা শ্রদ্ধাই তো আমাদের প্রেরণা। আমাদের অতীতের দিকে চাইলে বুক ভরে ওঠে, আমাদের ভবিষ্যতও কি তেমনি মহিমোজ্জ্বল হবে না? নিশ্চয়ই হবে। আমার বিশ্বাস আছে নিশ্চয় হবে। জাগতেই হবে আমাদের, সাড়া দিতেই হবে আদর্শের আহ্বানে। মুমূর্ষু দেশ প্রতীক্ষা করে আছে—

বাক্যেই নহে কার্যে প্রমাণ করিবে শক্তি তার
কই সে সতেজ সুস্থ সে যৌবন
মন্ত্র সাধনে সিদ্ধ হইবে যাহার পুরুষকার
তাহারই লাগিয়া করিবে জীবন পণ
বাধার পাহাড় যার পদতলে গুঁড়াইয়া হবে ধূলি
আগাইয়া যাবে বজ্র মুঠিতে বিজয়-পতাকা তুলি
স্কন্ধে বহিবে দায়িত্ব ভার—নহে ভিক্ষার ঝুলি
কই সে যুবক, কই সে জাতিস্মর
তারই আশাপথ চাহিয়া রয়েছি সকল দুঃখ ভুলি
হৃদয় মথিয়া উঠিছে কাতর স্বর।

যে দেশ কপিল, গোপাল, ধর্মপাল, চৈতন্য, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির মহিমায় সমুজ্জ্বল, আমার আশা আছে আবার সে দেশে দেখা দেবে নূতন যুগের নূতন কর্মবীর। নূতন সূর্যোদয় হবে আবার নবদিগন্তে।"

তুমুল করতালির মধ্যে দিবস অবতরণ করল মঞ্চ থেকে। দিবসের সহপাঠী এবং অনুরাগীবৃন্দ দিবসের বক্তৃতায় আনন্দিত হয়েছিল খুব কিন্তু বিস্মিত হয়নি। তারা এইরকমই প্রত্যাশা করেছিল কিছু একটা। বিস্মিত হয়েছিলেন সূর্যকান্ত। দিবস যে এমন বক্তৃতা করতে পারে তা তাঁর ধারণার অতীত ছিল। কিন্তু যাঁর বিস্ময় সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল, সত্যিসত্যিই চমৎকৃত হয়েছিলেন যিনি তিনি হচ্ছে হরিদাসবাবু দিবসের মনিব। প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে তিনিও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন এই মজলিসে। প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে বরাবরই তিনি নিমন্ত্রিত হন, কিন্তু চাকরির জন্য বাইরে থাকতে হয়েছে এতদিন, নবযুগের ছাত্র-ছাত্রীদের সভায় যোগদান করবার সুযোগ হয়নি। ঈষৎ অবজ্ঞা মিশ্রিত কৌতূহল ভরেই আজ এসেছিলেন তিনি এই সভায়। এই সভাতে আসবেন বলেই তিনি নব-নিযুক্ত চাকর দিবুকে জুতোটা পরিষ্কার করতে দিয়েছিলেন একটু আগে। সেই দিবুই দিবস চৌধুরী, আজকের সভার সভাপতি!.... সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। দিবুকে দেখে কেমন একটু সন্দেহ হয়েছিল তাঁর গোড়াতেই। সাধারণ লোক হলে তিনি হুড়মুড় করে এগিয়ে গিয়ে দিবসকে আবেগভরে আলিঙ্গন করে নাটকীয় কাণ্ড করে বসতেন একটা। কিন্তু তিনি তা করলেন না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কেবল। তাঁর মনে হল তিনি যে দিবসের সত্য পরিচয়টা জানতে পেরেছেন এটা এখন সাড়ম্বরে ঘোষণা করা ঠিক হবে না। তার তপস্যায় বাধা সৃষ্টি করা হবে তা করলে। ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

..... দিবসও তার বর্তমান জীবনের কথা কাউকে বলল না। সে কেন কলেজে আসছে না দু একজন বন্ধু এ প্রশ্ন তাকে যে না করেছিল তা নয় (নিজেকে জাহির করবার যথেষ্ট সুযোগ সে পেয়েছিল) কিন্তু মুচকি হেসে প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেল সে। নবার্জিত কৃতিত্বের গৌরবটা মনে মনে যতই সে উপভোগ করছিল ততই তার ভয় হচ্ছিল খবরটা যেন তার ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ না হয়ে পড়ে। নব গর্ভিণী তার নবজাত ভ্রূণের বার্তাটা যে সংকোচ সহকারে গোপন রাখতে চায় সেই ধরনেরই একটা সংকোচ হচ্ছিল তার। তবু সে একবার উৎসুক নেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখলে চারদিকে রঙ্গনা কোথা গেল। ভিড়ের মধ্যে কোথায় আত্মগোপন করল সে সহসা? কেমন যেন একটা সশঙ্ক প্রত্যাশা তার মনে জাগতে লাগল যে রঙ্গনা যদি এ নিয়ে আলোচনা করতে চায় তাহলে হয়তো সে আত্মসম্বরণ করতে পারবে না, সব বলে ফেলবে।

...ফুটপাথে নেবে রঙ্গনার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল তার। রঙ্গনা কিন্তু কিছু বললে না। মুচকি হেসে আর একটি সঙ্গিনীর সঙ্গে গল্প করতে করতে চলে গেল।

তারপরই চোখে পড়ল মোটরটা, তাদের মোটরটা। ঘাড় ফিরিয়েই দেখতে পেল তার বাবা, সূর্য চৌধুরী, এগিয়ে আসছেন তার দিকে। সে-ও এগিয়ে গেল তাড়াতাড়ি এবং হেঁট হয়ে প্রণাম করল, যেন কিছুই হয়নি। সূর্য চৌধুরীও এমনভাবে চেয়ে রইলে তার দিকে যেন কিছুই হয়নি। তারপরে মৃদু হেসে বললেন, "তোমার বক্তৃতাটা শুনলাম। বলেছ ভালোই, তবে এ সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু বলবার আছে! তোমার যদি আপত্তি না থাকে আলোচনা করতে পারি।"

শেষের কথাগুলো শুনে দিবস চকিতে চাইল একবার তাঁর মুখের দিকে। তাঁর মুখের যেন 'কিছুই-হয়-নি' ভাবটা যে মেকি তা বুঝতে দেরি হল না তার।

"না, আপত্তি কি?" —সংক্ষেপে উত্তর দিলে সে।

"তাহলে এস।"

মোটরে গিয়ে উঠলেন এবং একটু ইতস্তত করবার পর দিবসকেও গিয়ে উঠে বসতে হল। মোটর ছেড়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে।

সূর্য চৌধুরী বললে, "তোমার বক্তৃতাটা শুনতে বেশ লাগল। কিন্তু তোমার বক্তৃতায় যুক্তির চেয়ে সেন্টিমেন্টই বেশি আছে।"

দিবস সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পিতার দিকে চাইল!

সূর্যকান্ত বললেন, "স্ট্রাগল্ ফর এগজিস্‌টেন্সে আশা করি বিশ্বাস কর। বাঁচবার জন্যে প্রত্যেককে অহরহ যুদ্ধ করতে হচ্ছে আশা করি এ কথাটা মান তুমি?"

"হ্যাঁ, তা মানি বই কি?"

"তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এটাও তোমাকে মানতে হবে যে প্রত্যেক যোদ্ধার উচিত তার সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করা, যে করে না সে বোকা।"

দিবস যদিও বুঝতে পারছিল যে তার বাবা কোন্ দিকে তাকে নিয়ে যাচ্ছেন তবু তাকে বলতে হল—"তা-ও মানি।"

"অপদার্থ বোকা লোকের পক্ষে বেশী সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র হতে পারে কিন্তু বুদ্ধিমান লোকের সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র পেশী নয়, বুদ্ধি। সুতরাং ওই বুদ্ধি চালনা করেই বাঁচবার চেষ্টা করা তার পক্ষে

সঙ্গত হবে, পেশী চালনা করে নয়। তুমি দু একদিন শখ করে রিক্‌শা টেনে বা মোট বয়ে দেখতে পার কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে যে ও পথ তোমার নয়।''

এ যুক্তির সঙ্গে দিবসের বিরোধ থাকবার কথা নয়, বিরোধ ছিলও না। কিন্তু তর্কে পরাজিত হয়ে অপ্রতিভ হয়ে যাবার ছেলে সে নয়, তাই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—''কিন্তু যুগ বদলেছে, একজন লোক বুদ্ধির প্যাঁচে ফেলে অসংখ্য লোককে এক্‌স্‌প্লয়েট্‌ করবে তা এ যুগের নীতি নয়। সনাতন ভারতবর্ষের আদর্শও নয়।''

একটু হেসে সূর্য চৌধুরী বললেন, ''দেখ এক্‌স্‌প্লয়েট কথাটা তোমরা আজকাল এমনভাবে ব্যবহার করছ যেন ওটা একটা কোনো লোক-বিশেষের বা শ্রেণি-বিশেষরই একচেটে অস্ত্র। আসল কথা হচ্ছে প্রত্যেকেই এক্‌স্‌প্লয়টার, প্রত্যেকেই এক্‌স্‌প্লয়টেড। অপরকে শোষণ না করে বাঁচা যায় না। কেউ বাঁচতে পারে না। বাঘ এক্‌স্‌প্লয়েট্‌ করে থাবার জোরে, মানুষ করে বুদ্ধির জোরে, আর ব্যাক্‌টিরিয়ারা করে তাদের সূক্ষ্মতার জোরে, তাদের সংখ্যার জোরে। আমাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ওই কুলিরা কি আমাদের এক্‌স্‌প্লয়েট করছে না? তাদের শক্তি পেশীতে। সেইটেরই পুরো সুযোগ নিচ্ছে তারা। সার্জনের ছুরি আর মজুরের কাটারি একই জিনিসের দুই রূপ। কিন্তু প্রতিভাবান ডাক্তার কি কাটারি হাতে করে কাট কেটে বেড়াবে, না, সেটা মানাবে তাকে? প্রতিভার কি কোনও কদরই থাকবে না এ যুগে বলতে চাও?''

''নিশ্চয়ই থাকবে। সত্যিকার কদর তো প্রতিভারই থাকবে। কিন্তু এ যুগের প্রতিভাবানেরা প্রতিভাকে বিক্রি করবে না সামান্য পণ্যের মতো। সমাজের হিতার্থে তা দান করবে এবং সেইজন্যে সত্যিকার মর্যাদা হবে তার।''

''কিন্তু সেই প্রতিভাবানটি বাঁচবেন কি করে?''

''আর পাঁচজনের মতো সহজ সরল পরিশ্রম করে। তাছাড়া সত্যিকার প্রতিভাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সমাজ উন্মুখ হয়ে থাকবে।''

''সে সমাজ আর নেই, অদূর ভবিষ্যতে গড়ে উঠবার সম্ভাবনাও নেই। ওসব শুনতে বেশ ভালো কিন্তু কার্যকালে কাজে লাগে না। বহুযুগ আগে আমাদের মুনি-ঋষিরাও আদর্শ ব্রাহ্মণত্বের স্বপ্ন দেখেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত টেকেনি। প্রাচীন গ্রীসে প্লেটোও দেখেছিলেন অনেক স্বপ্ন, 'ইউটোপিয়া' পড়েছ আশা করি, কিন্তু ওসব স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে। থেকে যাবেও চিরকাল।''

''হয়তো যাবে, কিন্তু চেষ্টা করতে হবে যাতে না যায়। স্বপ্নকে সফল করবার চেষ্টাই তো মনুষ্যত্ব। এ যুগে আবার আমরা এক্‌স্‌পেরিমেন্ট করে দেখতে চাই যে স্বপ্নকে সফল করা যায় কি না। মানুষের অনেক স্বপ্ন সফল হয়েছে বই কি। মানুষ একদিন আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখেছিল আজ সে সত্যি সত্যি উড়ছে।''

মোটরটা যে বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছে তা দিবসের খেয়াল ছিল না, বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়তে খেয়াল হল। সূর্য চৌধুরী আর কোনও কথা না বলে নেমে পড়লেন। বস্তুত কথা বলবার মতো মানসিক অবস্থা তাঁর ছিল না। মোটরটা বাড়ির সামনে এসে থামতেই আশা-আশঙ্কার যে ধাক্কাটা যুগপৎ মনে লাগল তার আভাস মুখভাবে যাতে প্রকাশ না পায় সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন তিনি প্রাণপণে। দিবসের দিকে চাইতে সাহস হচ্ছিল না। মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

দিবসও গাড়ি থেকে নেবেছিল। সে এগিয়ে এসে প্রণাম করে বলল, ''আমি এবার যাই তাহলে!''

নিদারুণ চেষ্টায় মুখে একটু হাসি টেনে এনে সূর্যকান্ত বললেন, ''তুমি ভেতরে আসবে না? তোমার একস্‌পেরিমেন্ট তো এখানে থেকেও করতে পার?''

''না তা করা যায় না। আমি যা করতে চাইছি তা প্রাসাদে বাস করে করা সম্ভব নয়।''

দিবস চলে গেল। তার প্রস্থান পথের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন সূর্য চৌধুরী। তাঁর একবার মনে হল ব্রজর কথাটা পাড়লে হত কিন্তু মনে হওয়ার সঙ্গে আর একটা কথা মনে হল তাঁর এবং ব্রজর কথা না পাড়ার আপশোসটা আর রইল না। ব্রজর কথা শুনে সে যদি আসত তাহলে অপমানিত বোধ করতেন তিনি। তাঁর চেয়ে ব্রজ দিবসের কাছে বড় হবে এ তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু হয়তো ব্রজই দিবসের কাছে বড়— কথাটা মনে হওয়া মাত্র ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে গেল তার। তিনি ফুটপাথ থেকে ঘুরে কড়া নাড়তে গিয়ে দেখেন কপাট খোলাই রয়েছে। একটু বিস্মিত হয়ে ভিতরে ঢুকলেন তিনি। ঢুকেই দেখা হয়ে গেল ব্রজর সঙ্গে।

''কপাটটা খুলে রেখেছ যে? যা চুরি হচ্ছে—''

''তোমরা আসবে বলেই খুলেছি এক্ষুনি। চায়ের জলটা বসাতে গিয়েছিলুম। দিবু কই?''

কিছু না বলে সূর্যকান্ত বৈঠকখানায় ঢুকলেন।

''কলেজে ওদের সভায় যাওনি তুমি?

''গিয়েছিলাম।''

''দিবু ছিল না।''

''ছিল। আমার সঙ্গে গাড়ি করে এসেও ছিল। কিন্তু ভিতরে ঢুকতে চাইল না, চলে গেল।''

''আর তুমি অমনি যেতে দিলে! আমাকে ডাকলে না কেন?''

সূর্যকান্তের ভ্রূ আর একটু কুঞ্চিত হয়ে গেল। কিছু না বলে উপরে উঠে গেলেন তিনি। দিবস বক্তৃতায় গীতার যে শ্লোকটা উদ্ধৃত করেছিল সেইটে মনে পড়ল একবার। ভাবলেন—নাঃ, আসক্তিটাই যত অনর্থের মূল। ওটা ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই আরামকেদারায় যে ভাবে তিনি শুয়ে পড়লেন তাতে মনে হল না যে গীতার শ্লোক থেকে তিনি শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছেন, বরং মনে হল তাঁর মেরুদণ্ডটাই বুঝি ভেঙ্গে গেছে এবং সেই যন্ত্রণাটা তিনি চাপতে চেষ্টা করছেন।

দিবসও আত্মবিশ্লেষণ করতে করতে পথ হাঁটছিল। আসক্তির কথা সে-ও ভাবছিল। বাবার ডাকে গেল না কেন সে? প্রাসাদে বাস করে এক্‌স্‌পেরিমেন্ট করা যাবে না এটা কি সত্য কথা? প্রাসাদটা বড় কথা নয়, প্রাসাদের আসক্তিটাই বড় কথা। গীতাতেই তো আছে সুখেষু বিগতস্পৃহ হতে পারলেই,—কিন্তু না, তখনই তার আবার মনে হল, 'দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা' হওয়াটাই আগে দরকার; বিশেষত আজকাল; তাছাড়া যে আদর্শ দেখাতে চায় সে, তা প্রাসাদে বসে হবে না। স্বয়ং জনকও যদি এ যুগে জন্মাতেন তাহলে তাঁর পক্ষেও খোলার ঘরে যাওয়া উচিত হত। কিন্তু যে কথাটা সে ভাবছিল না, যা তার অজ্ঞাতসারেই তার মনে কৃচ্ছ্রসাধনের প্রেরণা জোগাচ্ছিল সে গীতা নয়, রঙ্গনা।

রঙ্গনা মিটিং থেকে গিয়েছিল তার এক বান্ধবীর বাড়ি, গিরিডি যাওয়ার দিনটা কবে ঠিক হল জানবার জন্যে। সেখান থেকে আবার গিয়েছিল হস্টেলে, হস্টেল থেকে ফিরছিল সে আর একটি বান্ধবীর সঙ্গে। এই বান্ধবীটিও দিবসের বক্তৃতা শুনেছিল এবং সেই আলোচনাই হচ্ছিল। আলোচনা প্রসঙ্গে হঠাৎ বান্ধবীটি বলে উঠল "অনেকদিন আগে রম্যাঁ রলাঁর 'I will not rest' বইটা পড়ে যে রকম আনন্দ পেয়েছিলাম আজ দিবসবাবুর বক্তৃতাটা শুনে সেই রকম আনন্দ পাওয়া গেল।"

চকিতে রঙ্গনার মনে পড়ে গেল দিবসের খেলার ঘরের ছবিটা। শেলফে যে কখানা বই ছিল তার মধ্যে 'I will not rest' বইটাও সে দেখেছিল। বইটার সম্বন্ধে তখন তার কোনো কৌতূহল হয়নি, এখন হল।

" 'I will not rest' বইটা তুই পড়েছিস না কি?"

"হ্যাঁ, অপূর্ব বই! না পড়ে থাকিস তো পড়িস।"

হঠাৎ রঙ্গনা যেন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে পড়ল দিবসের ঘরে যাওয়ার আর একটা ওজুহাত পেয়ে। পরমুহূর্তেই কিন্তু আনন্দের সূর্যকে ঢেকে দিলে বিষাদের মেঘে। মনে পড়ল মামা তার বিয়ের সম্বন্ধে করছেন, তাদের কাশীর বাড়িটা না কি বাঁধা দেওয়া হচ্ছে এ জন্য। ব্যাধভীতা হরিণীর মতো দিগ্বিদিক-জ্ঞান-শূন্য হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল তার মন। ছুটোছুটি করতে লাগল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গও করতে লাগল নিজের এই 'ব্যাধভীতা হরিণী' ভাবটাকে। শিক্ষার মাধ্যমে স্বাধীনতার যে রূপ সে প্রত্যক্ষ করেছে, যার স্বাদ সে কল্পনাতে উপভোগ করেছে তারই প্রচ্ছন্ন শক্তি হঠাৎ প্রকট হয়ে উঠল তার মনে, সে ব্যঙ্গ করতে লাগল নিজেকেই। কোনও কথা না বলে নীরবে হাঁটতে লাগল সে।

উর্মিকে ময়ূর-নৃত্য শেখাচ্ছিলেন গহনচাঁদ। সীতারাম তবলা বাজাচ্ছিলেন, রমজান সারেঙ্গী। গহনচাঁদ চেয়েছিলেন উর্মির পায়ের দিকে। তন্ময় হয়ে চেয়েছিলেন। তবলার তালে তালে নূপুর নিক্কণের ছন্দে ছন্দে মূর্ত হয়ে উঠেছে নৃত্যপরা ময়ূরটি। একটা বিস্মিত কৌতূহল মূর্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর চোখের দৃষ্টিতে। অরূপকে রূপ পরিগ্রহ করতে বহুবার দেখেছেন তিনি, কিন্তু প্রতিবারই নূতন বিস্ময় জেগেছে তাঁর মনে। এই ব্যক্তিই যে মেয়ের বিয়ের জন্য বাড়ি বাঁধা দিয়ে টাকা সংগ্রহ করছেন তা তাঁর মুখ দেখে মনে হওয়া অসম্ভব। প্রশান্ত মুখচ্ছবি। দৈন্য বা ক্লেশের ছায়ামাত্র নেই তাতে।

"না, না না ঠিক হল না, খড়ির দাগে দাগে পা পড়ল না তো, ময়ূরের চোখ নষ্ট হয়ে গেল যে। মনে থাকে যেন আবীরের উপর নাচতে হবে, একটু এদিকে ওদিকে পা ফেললে ধেবড়ে যাবে সব। খুব হালকা ভাবে ঠিক জায়গাটিতে পা ফেলতে হবে। হ্যাঁ—এইবার ঠিক হচ্ছে। করতে করতেই হবে। আবার গোড়া থেকে কর। সীতারাম ঠায়ে বাজাও একটু— "

আবার নাচ শুরু হল। উর্মি খুব সাবধানে নাচতে লাগল এবার।

"এইবার ঠিক হচ্ছে—বাঃ—বাঃ—"

উল্লসিত হয়ে উঠলেন গহনচাঁদ। নাচ শেষ হয়ে গেল একটু পরেই। গহনচাঁদ এত পুলকিত হলেন যে তাঁর মনে দার্শনিক ভাবের সঞ্চার হল। উর্মিকে আর একবার উৎসাহিত করলেন।

"হবে, ঠিক পারবে তুমি"—তারপর সীতারামের দিকে ফিরে বললেন—"জীবনে এই তো আনন্দ, কি বল সীতারাম?"

"জী হাঁ।"

"দুদিন পরে আমরা কে কোথায় চলে যাব কিন্তু আবীরের উপর ওই ময়ূর চিরকাল পেখম তুলে নাচতে থাকবে। ও অমর। আমাদের জীবন আর ক'দিনের?"

রমজান মাথা নেড়ে বয়েদ আওড়ালে একটা।

"কংকল্ চুন্ চুন্ মহল বানায়া
লোগ কহে ঘর মেরা জি
ন ঘর তেরা না ঘর মেবা
চিঁড়িয়া রহে বশেরা জি।"

"বাঃ, উর্দু বয়েদ বুঝি? চমৎকার!"—বলে উঠলেন গহনচাঁদ—"সুর বসাও ওতে। সুর দিলে অন্য মানেই হয়ে যায়। বুঝলে সীতারাম, আমি ভেবেছি শিবের সব স্তোত্রগুলোতেই সুর বসিয়ে দেব।"

"আপ কি মর্জি হোনে সে তো সব কুছ হো সক্‌তা হ্যায়।"

গদ্‌গদ কণ্ঠে উত্তর দিলে সীতারাম।

"বেশক"—রমজানও স্মিতমুখে মাথা নেড়ে সমর্থন করলে।

একটা আনন্দিত ভাবঘন পরিবেশে নীরব হয়ে রইলেন সবাই খানিকক্ষণ। সহসা রঙ্গনার জন্য মন কেমন করে উঠল গহনচাঁদের। তাঁর মনে হল এখন রঙ্গনা থাকলে বেশ হত।

"রঙ্গনা এখনও কলেজ থেকে ফিরল না কেন বুঝতে পারছি না। অন্য দিন তো বিকেলেই চলে আসে।"

মিটিংয়ের কথা গগনচাঁদ জানতেন না!

"আয়েগী অভি।"

"এখন তো তোমরা বাসায় যাবে?'

"জী হাঁ।"

"আচ্ছা, এস তাহলে। আমি এবার পুজোয় বসি। তুমি অপেক্ষা করবে না কি রঙ্গনার জন্যে?" ঊর্মির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি।

"না, আমিও যাই।"

সে যে নাচটা ঠিক মতো পেরেছে কিরণকে এই খবরটা দেবাব জন্যে মনে মনে ছটফট করছিল সে।

সীতারাম, রমজান, ঊর্মি চলে গেল। চুপ করে বসে রইলেন গহনচাঁদ খানিকক্ষণ। তারপর গুনগুন করে গান ধরলেন—

"কস্তুরিকা চন্দন লেপনায়ে, শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়
সৎ কুন্তলায়ে ফণি কুণ্ডলায়, নমঃ শিবায়ে চ নমঃ শিবায়!"

গান কিন্তু শেষ হল না, চুনীলাল এসে ঢুকল।

"এখন টাকাটা জোগাড় করতে পারলেই শুভ কার্যটি হয়ে যায়। কাশীতে লিখেছেন আপনি?"

"বিশ্বনাথ কথককে লিখেছি।"

"উত্তর আসবার সময় হয়নি এখনও বোধ হয়?"

"না। এই সেদিনই তো লিখেছি।"

রঙ্গনা ঢুকল এসে। ঢুকে ভিতরে যাচ্ছিল এমন সময়ে চুনীলালের কথাগুলো তার কানে গেল।

"কাল যদি উত্তর না আসে তো আর একবার তাড়া দিতে হবে। বিয়ে যখন দিতেই হবে তখন এরকম পাত্র হাতছাড়া করা অনুচিত।"

"কার বিয়ে?"—ঘাড় বেঁকিয়ে জিগ্যেস করলে রঙ্গনা।

"আবার কার, তোর"—হেসে গহনচাঁদ বললেন। রঙ্গনা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার সমস্ত চোখমুখ কেমন যেন জ্বালা করতে লাগল। তারপর বলে ফেলল—

"যারা ওরকম পণ দাবি করে তাদের বাড়িতে বিয়ে করব না।"

বলেই গটগট করে চলে গেল সে বাড়ির ভিতরে।

"দেখ দেখ, পাগলির কাণ্ড দেখ একবার।"

চুনীলালের দিকে হাস্যপ্রদীপ্ত দৃষ্টিতে এক নজর চেয়ে গহনচাঁদ তার অনুসরণ করলেন। চুনীলাল ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবল একটু। রঙ্গনার এই উক্তি সে প্রত্যাশা করেনি। তার ব্যবসায়ের মগ্ন তরীকে যে সব রশিরশা বেঁধে সে টেনে তোলবার চেষ্টা করছিল তার ভাগ্নীর আচরণে যে সে সব ছিঁড়ে যাবে এও তার কল্পনাতীত ছিল। তবু সে ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবলে একটু। ঈশপের এক চক্ষু হরিণের গল্পটা তার মনে পড়ল একবার। সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত আর একটা কথাও মনে পড়ল, 'বিয়ের কথা হলেই আজকালকার মেয়েরা ও রকম বলেই থাকে, ওটা একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে— এ কথা মনে হওয়া মাত্র তার কুঞ্চিত ভ্রূ মসৃণ হয়ে গেল।

কর্মক্লান্ত কিরণ বাড়ি ফিরে আহারাদি শেষ করে চুপ করে বসে ছিল। আর একটা কবিতা গুঞ্জন তুলেছিল তার মনে—

কার সুরে ওগো কার
তিমির রজনী শেষে
খুলিছে উষার দ্বার।

তার সত্যিই যেন মনে হচ্ছিল—কেন মনে হচ্ছিল তা সে বলতে পারত না যদিও—কিন্তু মনে হচ্ছিল যে তার তিমির রজনী এবার বোধ হয় শেষ হবে। দৈনন্দিন এই গ্লানির অবসান হয়ে দেখা দেবে আনন্দ। কল্পনা করতে ভালো লাগছিল—বাধ্য হয়ে এই যে কঠিন কর্মশৃঙ্খল তাকে পরতে হয়েছে, যার মধ্যে কোনও আনন্দ নেই, বৈচিত্র্য নেই, যা উদ্বুদ্ধ করে না, পরিপূর্ণ করে না, যা কেবল প্রাণহীন যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি মাত্র—সে শৃঙ্খল একদিন খসে যাবে। স্বাধীন চিত্তে এমন একটা লোকে সে উত্তীর্ণ হবে যেখানে কর্ম ক্লেশদায়ক নয়, আনন্দদায়ক। কুসুমের বিকাশের মতো, আলোকের উন্মেষের মতো যা স্বাভাবিক এবং সুন্দর। কল্পনানেত্রে এই অপরূপ সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করে সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। একটু দূরে পথের বাঁকে সেই সম্ভাবনাটা যেন দাঁড়িয়ে আছ মনে হল, আর একটু এগিয়ে গেলেই দেখা হবে, চিনতে পারবে।

এটা যে অলীক কল্পনা মাত্র একথাও সে যে অনুভব করছিল না তা নয় কিন্তু তাকে নিরুৎসাহিত করছিল না। বরং তার মনে হচ্ছিল এই কল্পনাকে আশ্রয় করেই তো ভারতবর্ষের সভ্যতা দৈনন্দিন বাস্তবের ঘূর্ণাবর্তে ডুবে যায়নি, ওই কল্পনার ভেলা অবলম্বন করেই বহু শতাব্দী ধরে ভেসে আছি আমরা। আত্মা, পরলোক, কর্মফল, সবই বহুবর্ণের বিচিত্র কল্পনা। সে কল্পনা সত্যেও রূপান্তরিত হয়েছে অনেকের উপলব্ধিতে। তারই বা হবে না কেন? নিবিষ্ট চিত্তে বসে কবিতা লিখতে লাগল সে।

"কিরণদা, ঘুমিয়েছেন না কি?"

দড়াম করে কপাট খুলে ঢুকল ঊর্মি।

"ঘুমোননি? জানেন, আমার ময়ূর নাচটা প্রায় হয়ে এসেছে। সিনেমা ডিরেকটারকেও দেখাব এই নাচটা একদিন, এটা যদি কোথাও ঢুকিয়ে দিতে পারেন তিনি—লিখছিলেন না কি—আর একটা গান না কি? হ্যাঁ, আমি সেই গ্রামোফোন কোম্পানির ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেছি, তিনি গানটা নিয়েছেন, তবে রঙ্গনাকে দিয়ে গাওয়াবেন না বোধ হয়, তাঁর আবার কে একজন পেটোয়া গাইয়ে আছে, তাকে দেবেন। এ গানটাও দিন, রঙ্গনাকে দেব—নিই?"

এক ঝলক হাওয়ার মতো এসে ঊর্মি যেন সব এলোমেলো করে দিলে নিমেষের মধ্যে। নির্জনে কিরণের মনের মেঘে যে ইন্দ্রধনু ফুটে উঠেছিল মেঘসুদ্ধ তা উড়ে গেল কোথায়। একটু হেসে কিরণ বললে—"নেবে? নাও।"

"আপনি বাঁশি শিখতে গেলেন না গহনচাঁদবাবুর কাছে?"

"সময় কই?"

দিবসের কাছে কিরণ যে কারণটা দেখিয়েছিল তা ঊর্মিকে বলতে পারলে না। তার মনে হতে লাগল ঊর্মির কাছে তা বলা যাবে না। আর একটা কারণও দেখালে সে—"ওখানে যা ভিড় হচ্ছে তাতে ওখানে আমার ভালোও লাগবে না! তুমি ওই ভিড়ের মধ্যেই নাচছ কি করে?"

আমাকে উনি আলাদা শেখান, তাই তো এত রাত্রে ফিরছি। লোক খুব চমৎকার। আপনাকেও আলাদা শেখাবেন, গিয়েই দেখুন না।"

কিরণ চুপ করে রইল।

।। অষ্টম পরিচ্ছেদ ।।

দক্ষিণী-বাহিনী নদী ক্রমে ক্রমে গতিপথ পরিবর্তন করতে করতে একদা যেমন উত্তর-বাহিনী হয়ে পড়ে দিবসেরও তাই হল। পাহাড় থেকে নদী যখন নামে তখন সে ঢালু পথই অনুসরণ করে। পথে কোনো বাধা থাকলে সে বাধাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কিংবা অতিক্রম করে। দুরতিক্রম্য হলে সে পথ পরিবর্তন করে, ঘুরে অন্য পথে যায়। এইটেই সাধারণত ঘটে। কিন্তু নদীর সম্মুখ গতিতে আর এক ধরনের বাধাও ঘটে মাঝে মাঝে সম্মুখে যদি গহ্বর থাকে। সমুদ্র-মুখিনী নদী হঠাৎ গর্তে পড়ে যায় কিছুকালের জন্য এবং তার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে কিছুকাল। এই দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটা দিবসের জীবনে ঘটছিল তার অজ্ঞাতসারেই। স্বকীয় পৌরুষ

বলে প্রাচীন প্রথার পাষাণ প্রাচীর ভেদ করে সে বেরিয়েছিল নিজের আদর্শ অনুসরণ করে। আদর্শ অনুসারেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিতও করেছিল সে কর্মজগতে। একটা প্রাইভেট ট্যুশনি জুটে যাওয়াতে অবস্থাও একটু সচ্ছল হবার আশা হয়েছিল (সেদিন বক্তৃতা দিয়ে ফিরেই সে চিঠি পেয়েছিল একটি ছেলেকে অঙ্ক পড়াবার জন্যে, মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা করে দিতে রাজি আছে একজন); যে উত্তেজনার আবেগ নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তা মন্দীভূত হয়ে যেত হয়তো কাল-ক্রমে, স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে অর্থোপার্জন করার কৃতিত্বটা একঘেয়ে কর্মবন্ধনে পরিণত হয়ে গ্লানিকর হয়েও উঠত হয়তো, অবশেষে হয়তো সে অপেক্ষমাণ সূর্য চৌধুরীর ঔৎসুক্যকে ধূলিসাৎ এবং পিতৃস্নেহকে পরিতৃপ্ত করে বাড়িতেই ফিরে যেত শেষ পর্যন্ত, যদি তার কল্পনা নূতন একটা উদ্দীপনা না পেত। রঙ্গনাকে ঘিরে তার মন স্বপ্নজাল রচনা করতে লাগল। এইটুকু বললেই তার মনের অবস্থাটা অবশ্য ঠিক বলা হবে না। 'স্বপ্নজাল' প্রভৃতি কথা ব্যবহার করলেই যা মনে হওয়া স্বাভাবিক তা এক্ষেত্রেও ছিল, কিন্তু তাছাড়া আরও কিছু ছিল। সাধারণ যুবক যে জাতীয় ঐশ্বর্য আস্ফালন করে প্রণয়িনীর হৃদয় হরণ করতে চায় সে জাতীয় ঐশ্বর্য দিবসের যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সেটাকে সে আস্ফালন করতে চাইছিল না। সে তার নবার্জিত ঐশ্বর্যে মুগ্ধ করতে চাইছিল রঙ্গনাকে। সে চাইছিল মেসের চাকর দিবস চৌধুরীর গলাতেই মাল্য দান করবার জন্যে রঙ্গনা উৎসুক হোক। তাই সে সেদিন কিরণকে অনুরোধ করেছিল তার আসল পরিচয়টা সে যেন গহনচাঁদবাবুর কাছে বা রঙ্গনার কাছে বলে না দেয়। রঙ্গনাকে পাবার জন্যে ততটা নয়, রঙ্গনা তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছে কি না দেখবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল সে। যে আদর্শের জন্য সে নিজে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে সেই আদর্শে বিশ্বাসী একজন সঙ্গিনীকে সে আবিষ্কার করতে চায় রঙ্গনার মধ্যে। তার বিজ্ঞানী রিসার্চ-পটু মন এই উত্তেজনায় যে বিচিত্র স্বপ্নজাল বয়নে প্রবৃত্ত হল তা বিচিত্রতর হয়ে উঠতে লাগল পরবর্তী ঘটনা পরম্পরায়। সে ভুলে গেল কিছুদিনের জন্য কি উদ্দেশ্য নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল প্রথম দিন এবং তার এই আত্মবিস্মৃতির খবরটা কিছুদিন পরে পল্লবিত হয়ে যে গোবিন্দ সাণ্ডেলের পক্ষকে শক্তি জোগাতে পারে এ কথাও তার মনে হল না একবারও। মনে হওয়ার কথা নয়, কারণ সূর্য চৌধুরী যে তাঁর বন্ধুর সঙ্গে দ্বৈরথে নেমেছেন এ খবর অজ্ঞাত ছিল তার কাছে। গোবিন্দ সাণ্ডেল অবশ্য খবরটা পেয়েছিলেন কয়েকদিন পরে জগু সেনের মারফত। জগু সেন দিবস আর রঙ্গনাকে না কি রাত বারোটার সময়ে সিনেমা থেকে রোমিও জুলিয়েট দেখে ফিরতে দেখেছিলেন এবং—যাক্, যথাসময়েই ঘটনাটা বলা যাবে।

দিবস কিন্তু যা করবার মনে মনেই করছিল। সরোদ শেখবার ওজুহাতে সে অনায়াসেই গহনচাঁদবাবুর বাড়ি যেতে পারত, কিন্তু যায়নি। তার কেমন যেন ভয় করছিল, মনে হচ্ছিল তার তাসের সাজানো ঘরটা একটু ছুঁলেই বোধ হয় পড়ে যাবে। দূরে থেকেই সে উপভোগ করছিল সেটা এবং সেটা আরও কিছুদিন হয়তো করত রঙ্গনা নিজেই যদি না এসে পড়ত তার বাসায়। আর একটা যোগাযোগও গেল। রঙ্গনা যখন এল তখন দিবস বাড়িতে ছিল না, কিন্তু সৌদামিনী ছিল। সৌদামিনীর মুখে দিবসের সব কথা শুনে (এমন কি দিবস যে সেই ঝাঁকড়া-চুল-ওলা লোকটাকে টাকা দিয়ে পটলিকে উদ্ধার করেছে একথাও সাড়ম্বরে বলেছিল সৌদামিনী) রঙ্গনার মনে যা হয়েছিল তা অবর্ণনীয় নয়, অনেক কবিই তা বর্ণনা করেছেন

সালংকরে। রঙ্গনার সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তার তৃষ্ণার্ত মন অপ্রত্যাশিতভাবে পরিষ্কার পাত্রে নির্মল জল দেখে অবাক হয়ে গেল, এ যুগে যে এরকম সম্ভব তা বিশ্বাস করতেই পারছিল না সে প্রথমে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত করতে হল।

....রঙ্গনা যখন এসেছিল তখন কাউকেই দেখতে পায়নি সে। শুধু দেখলে দিবসের ঘরে তালাটা ঝুলছে। সোজা চলে গেল উঠোনের দিকে এবং গিয়েই দেখতে পেলে হাঁসটাকে। হাঁসটাকে দেখবার জন্যেই সে উঠোনের দিকে গিয়েছিল, ওই রাজহংসটার সঙ্গে দিবসকে সে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িয়ে ফেলেছিল অদ্ভুতভাবে। হাঁসটা উঠোনেই চরছিল, রঙ্গনাকে দেখে সে কলরব করে উঠল। রঙ্গনা তার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে একটু আদর করতে পারলে আনন্দিত হত, কিন্তু হাঁসটা কেবল সরে সরে যেতে লাগল, দু'একবার গলা বাড়িয়ে কামড়াতেও এল তাকে। রঙ্গনাও ছাড়বার পাত্রী নন, নানাভাবে কাছে যাবার চেষ্টা করতে লাগল সে। হাঁসের চিৎকার শুনেই সৌদামিনী পটলির ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পটলির রুগ্ন স্বামীর অসুখটা বেড়েছিল, তার কাছেই ছিল সে।

"ও, আপনি—"

"দিবসবাবুর কাছে একটা বই নিতে এসেছিলাম। তাঁর ঘরে দেখলাম তালা বন্ধ।"

"সে এখনই আসবে, তাকে ডাকতে পাঠিয়েছি, পটলির স্বামীর অসুখটা বেড়েছে আজ দুপুর থেকে— ।"

"পটলি কে?"

"চলুন সব বলছি। ঘরেই চলুন, চাবি আছে আমার কাছে—।"

হরিদাসবাবু চুপ করে ছিলেন। তিনি যে দিবসের আসল পরিচয়টা জানতে পেরেছেন তা দিবসকে তো বলেনই নি, মেসের আর কাউকেও বলেননি। কোনও গুপ্তস্থানে এক হাঁড়ি মোহর আবিষ্কার করে সাধারণ লোকের যে মনোভাব হয় তাঁরও তাই হচ্ছিল। গুপ্ত স্থানটার উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে আশেপাশে তিনি ঘোরাফেরা করছিলেন মনে মনে। হাঁড়িটা ছুঁতেও সাহস হচ্ছিল না তাঁর। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে ছোঁবার সুযোগও তিনি পাচ্ছিলেন না। দিবসকে একা পাওয়া যায় না। সে ঠিক নিয়মিত সময়ে আসে, নীরবে কাজকর্ম করে আবার নিয়মিত সময়ে কর্তব্য শেষ করে চলে যায়। যতই দেখছিলেন ততই মুগ্ধ হচ্ছিলেন। মুখবন্ধকরা হাঁড়ির ভিতর পোলাও যেমন ভিতরে ভিতরে গুমে সিদ্ধ হতে থাকে তাঁরও অবস্থা তাই হয়েছিল অনেকটা। দিবসের সঙ্গে আলাপ করতে ঔৎসুক্য খুবই হচ্ছিল কিন্তু সাহস পাচ্ছিলেন না, সুযোগও ঘটছিল না। তা ছাড়া তাঁর মনে হচ্ছিল আলাপ করলেই বোধ হয় সব নষ্ট হয়ে যাবে, গোপনতার অন্তরালে যে মহজ্জীবন গড়ে উঠছে ধীরে ধীরে, প্রকাশ্যে তাকে নিয়ে টানাটানি করতে গেলেই তা খেলো হয়ে যাবে। আর একটা মুশকিলেও পড়েছিলেন হরিদাসবাবু। দিবসকে দিয়ে জুতো বুরুশ করানো প্রভৃতি নোংরা কাজগুলো করাতে পারছিলেন না তিনি। এমন কি নিজের কাপড়টাও নিজের হাতে কেচে নিতে হচ্ছিল তাঁকে।

....সেদিন বিকেলে হরিদাস বসে দাড়ি কামাচ্ছিলেন, কাগজ পড়ছিলেন গোবর্ধনবাবু, অঘোরবাবু ফাটকা মার্কেট থেকে ফেরেননি তখনও, ধূর্জটিবাবু বাড়ি ছিলেন না। তাঁকে কে

যেন বলেছিল যে রাধাবাজারের একটা গলিতে ইটালিয়ান রজন পাওয়া যায়, সেই রজন ছড়ে লাগালে বেহালা থেকে চমৎকার আওয়াজ বের হয় নাকি। তারই সন্ধানে বেরিয়েছিলেন ভদ্রলোক। দিবস ঘরে ঢুকে দুজনের পাশে দুপেয়ালা চা রেখে গেল। হরিদাসবাবু আড়চোখে দিবসের দিকে চেয়ে দেখলেন একবার শুধু। দিবসের দিকে সোজা চাইতেও আজকাল একটু ইতস্তত করেন তিনি। দিবস চলে গেলে মুখটি মুছে তিনি চা খেতে লাগলেন। হঠাৎ নজরে পড়ল গোবর্ধন চা খাচ্ছেন না, নীচের ঠোঁট দিয়ে উপরের ঠোঁটটাকে চেপে ভুরু কুঁচকে খবরের কাগজে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছেন।

"গোবর্ধনবাবু, চাটুকু খেয়ে নিয়ে চিন্তা করুন। বল পাবেন। কি ভাবছেন কি?"

"ভাবছি চিয়াংকাইশেক কম্যুনিস্টদের সঙ্গে সন্ধি করতে চাইছেন কেন। পেছনে অত বড়ো খুঁটো ট্রুম্যান রয়েছে।"

দিবস আবার ঢুকল ছোট একখানা নূতন গামছা হাতে করে।

"এই গামছাটা কিনেছি আপনার জন্যে।"

গামছাটা গোবর্ধনের হাতে দিলে সে।

"এঃ এটা যে বড্ড ছোট হল হে!"

"এরই দাম এক টাকা বলছে।"

গোবর্ধন স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ দিবসের মুখের দিকে, তারপর হরিদাসের দিকে চেয়ে বোমার মতো ফেটে পড়লেন—গোল্লায় যাবে সব। আজকের কাগজে আমাদের নেতাদের গরম গরম বক্তৃতাগুলো পড়ে দেখো। একটা গামছার দাম কমাবার মুরোদ নেই, দামোদর বাঁধতে যাচ্ছে ওঁরা!"

এমন সময় নীচে থেকে ঠাকুরের গলা শোনা গেল—"ও দিবু তোমাকে বাইরে থেকে কে ডাকছে, নেবে এস একবার—"

দিবস নেবে গেল। একটু পরে যখন ফিরে এল তখন শুনলে হরিদাসবাবু গোবর্ধনবাবুকে বলছেন—"আপনার স্কীমগুলো লিখে পাঠিয়ে দিন না সকলকে। চাটুকু খেয়ে নিন আগে।"

দিবস বলল, "আমি যে বাসায় থাকি সেখানে একটি অসুস্থ লোক আছে। তার অসুখটা বাড়াবাড়ি হওয়াতে ডাকতে এসেছে আমাকে। আমার ছুটি চাই একটু।"

"বেশ যাও, আমাকে এক প্যাকেট বিড়ি এনে দিয়ে যাও তাহলে।"—গোবর্ধন বললেন এবং বিড়ির পয়সা দিলেন।

দিবস চট করে নীচে নেবে গেল আবার এবং বিড়ি নিয়ে এল এক প্যাকেট।

প্যাকেটটা হাতে করে গোবর্ধন হরিদাসবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "প্রাণ খুলে দুটো যে বিড়ি খাব তার পর্যন্ত উপায় নেই। ধরাবার আগেই বিড়িতে আগুন জ্বলছে। গোলাপ মার্কা এনেছ তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি তাহলে যাই এবার?"

"যাও।"

দিবস চলে গেল। রাস্তায় নেমেই সে আগে গেল তার এক ডাক্তার বন্ধুর বাড়িতে। একসঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। মেডিকেল স্কুল থেকে পাশ করে সে বছর দুই হল ডাক্তার

হয়ে বেরিয়েছে। তাকে গিয়ে সে বলল যে বিনা পয়সায় একটি রুগী দেখতে হবে এবং হয়তো বিনা পয়সায় ঔষুধও দিতে হবে। সৌরেন ডাক্তার লোক ভালো—তাছাড়া দিবস চৌধুরীর অনুরোধ—সে রাজি হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। তার গাড়ি চড়েই দিবস হাজির হল নিজের বাসায়।

রঙ্গনাকে দেখবে সে প্রত্যাশা করেনি।

"আপনার 'I will not rest' বইখানা চাইতে এসেছি যদি দু'চার দিনের জন্য পড়তে দেন তাহলে"—রঙ্গনা হেসে বললে।

"হ্যাঁ নিশ্চয় দেব। একটু অপেক্ষা করুন। ডাক্তারবাবু এসেছেন, এ ব্যাপারটা আগে সেরে ফেলি—"

সৌরেন ডাক্তার একটু বিস্মিত হয়েছিল। দিবসের সঙ্গে এ ধরনের বস্তির যোগাযোগ কি করে যে সম্ভবপর হতে পারে তা সে বুঝতে পারছিল না। কিন্তু রঙ্গনা এবং সৌদামিনীর সামনে এ প্রশ্ন করাও সে সংগত মনে করল না।

রঙ্গনাও সকলের সঙ্গে পটলির ঘরে গিয়ে হাজির হল। অন্ধকার ঘর, একটিমাত্র জানলা। পটলির স্বামী জরাজীর্ণ, বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে যেন। নিষ্প্রভ কোটরগত চক্ষু। একটা ক্ষীণ 'উঃ' 'উঃ' শব্দ করে চলেছে ক্রমাগত। সৌরেন ডাক্তার পরীক্ষা করে বললে যক্ষ্মা হয়েছে।

"এঁর বিছানাটা জানলার কাছে নিয়ে গেলে ভালো হয়। আলো আর হাওয়া দরকার। আমার সঙ্গে কেউ একজন চলুক, আমি ঔষুধ যা লাগে দিয়ে দিচ্ছি।"

এই বলে সৌরেন ডাক্তার বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তারপর দিবসের সঙ্গে কথা কইতে কইতে বড় রাস্তায় এসে পড়ল।

"তুমি এখানে কি করে এলে বুঝতে পারছি না তো!"

"এক্স্‌পেরিমেন্ট করছি একটা।"

"টী-বি নিয়ে?"

"বলব সে সব একদিন। আজ একটু ব্যস্ত আছি।"

"আচ্ছা।"

সৌরেন ডাক্তার পটলির ভাই বসন্তকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। দিবস ফিরে আসতেই সৌদামিনী এবং গিরিবালা উৎসুক হয়ে উঠল ডাক্তার কি বলে গেল শোনবার জন্য।

"যক্ষ্মা হয়েছে বললে।"

"তাহলে সঙীন ব্যাপার বল!"—সৌদামিনীর হাত গালে উঠল!

"তা তো বটেই। তবে ডাক্তারবাবু যথাসাধ্য করবেন বললেন।"

"ফি দিলে না?"

"ফি ওষুধের দাম কিছুই নেবে না। আমার বন্ধু একজন। বিছানাটা জানলার দিকে সরিয়ে দি চল!"

"বসন্ত আসুক। খাট সরাতে অন্তত চারজন লাগবে তো। আমি আর গিরিবালা না হয় একদিকে ধরব, তুমি আর বসন্ত আর এক দিকে ধোরো।"

দিবস রঙ্গনার দিকে ফিরে বললে, "এই তো আর একজন রয়েছে।"

"নিশ্চয়, চলুন আমি ধরছি।"

চারজন ধরাধরি করে খাটটা সরিয়ে দিলে জানালার কাছে। ব্যাপারটা কিছু নয়, কিন্তু এরই ফল হল সুদূর-প্রসারী। দিবস আর রঙ্গনাকে পাশাপাশি দেখে সৌদামিনীর অন্তরে যে কথাটি উদিত হল এবং যা সে একটু পরে নিম্নকণ্ঠে গিরিবালাকে বলল তা দৈবাৎ রঙ্গনারও কর্ণগোচর হওয়াতে সামান্য ঘটনাই অসামান্য হয়ে উঠল তার কাছে। যে মেঘটা বর্ণের অভাবে কালোই ছিল বরাবর হঠাৎ এক ঝলক রোদ লেগে তার গায়ে সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু ফুটে উঠল যেন 'I will not rest' বইখানা নিয়ে রঙ্গনা দিবসকে বলল, "কই আপনি বাবার কাছে সরোদ শিখতে গেলেন না তো? আপনার বন্ধুটিও তো আসেননি?"

"কাল যাব। কাল নয় পরশু।"

"কেন, কাল কি করবেন?"

"কাল সেকেন্ড শোয়ে 'রোমিও জুলিয়েট' দেখব মেট্রোতে।"

"ওমা, আমিও যে তাই ঠিক করেছি।"

"বেশ একসঙ্গে দেখা যাবে—থার্ডক্লাশে বসতে পারেন যদি।"

"তা পারব না। আপনার বক্তৃতাটা কিন্তু খুব ভালো লেগেছিল সেদিন। ও সম্বন্ধে দু'একটা কথা আলোচনা করবার আছে। এখন বোধ হয় আপনার সময় নেই?"

"না। এখন চাকরি করতে যেতে হবে।"

রঙ্গনার মুখে মুচকি হাসি ফুটে উঠল। সৌদামিনীর কাছে দিবসের সমস্ত বিবরণ সে শুনেছিল।

"শখ করে এ কৃচ্ছ্রসাধন কেন?"

"শখ করে কে বললে আপনাকে?"

"সব শুনেছি আমি।"

বলেই সে হেসে বেরিয়ে গেল।

বেরিয়েই তাব কানে গেল সৌদামিনী গিরিবালাকে নিম্নকণ্ঠে বলছে "দুটিতে বেশ মানায় কিন্তু পাশাপাশি দাঁড়ালে।"

রঙ্গনা আর দাঁড়াল না, পিছু ফিরে চেয়েও দেখল না, সোজা বেরিয়ে চলে গেল। রজ্জুমুক্ত বেলুনের মতো তার মনটা অসীম আকাশে পাড়ি দিয়েছিল, তারই পিছু পিছু সে ছুটতে লাগল যেন। দিবসের সব কথা সে শুনেছিল সৌদামিনীর মুখে। বড়লোকের ছেলে হয়ে সে যে শখ করে মেসে চাকরি করছে, পটলিকে রক্ষা করবার জন্যে সে যে পঁচাত্তর টাকা এনে দিয়েছে, সে যে অত্যন্ত অন্যমনস্ক, নিজের সম্বন্ধে তার যে কিছুমাত্র হুঁশ নেই এ সবই সে শুনেছিল এবং এই সবের সঙ্গে তার কাল্পনিক-আকাঙ্ক্ষা-বাস্তব-হতাশা-সমন্বিত জীবনের ছবিটাও মিলিয়ে সে দেখেছিল মনে মনে। কিন্তু এর বেশি আর কিছু করবার সাহস হয়নি তার, এর পর তার মনে যে অস্পষ্ট কুজ্ঝটিকাটুকু ছিল সৌদামিনীর নিম্ন কণ্ঠোচ্চারিত উক্ত কথাগুলির প্রভাবে সেটুকু সরে গেল এবং সে যেন সেতু দেখতে পেল একটা। ক্ষণপরেই তার রাগ হল, ধিক্কার এল নিজের উপরই। মনে হল সে যেন উপযাচিকার মতো দিবসের দ্বারস্থ হয়েছে। মনে হওয়ামাত্র আত্মসম্মানের বর্মে নিজেকে আবৃত করে 'I will not rest' বইখানাকে আরও জোরে চেপে ধরে আরও দ্রুত-গতিতে হাঁটতে লাগল সে। বাবাকে কিংবা মামাকে না

জানিয়ে এভাবে দিবসের বাসায় আসাটা যে অন্যায় হয়েছে একথাও মনে হল তার। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার মনে হল—দিবস চৌধুরী? কলেজের স্টুডেন্টস্ গ্যাদারিংয়ে যখন বক্তৃতা করছিলেন তখন নিশ্চয়ই ভালো ছেলে। সৌদামিনী বলছিল আইন পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়েছে না কি, খোঁজ করতে হবে তো। দিবসের কথাই ভাবতে ভাবতে (এবং মাঝে মাঝে সেজন্য লজ্জিত হয়ে) পথ চলতে লাগল সে। একটা রাস্তায় মোড় ফিরতেই একজন সহপাঠিনীর সঙ্গে দেখা হল তার।

"কোথা চলেছিস রঙ্গনা?"

"বাড়ি। তুই কোথা গিয়েছিলি?"

"রোমিও জুলিয়েট দেখে ফিরছি। দেখেছিস? চমৎকার হয়েছে।"

"না, আমি পরে যাব।"

"কি বই ওটা?"

"রমাঁ রল্যাঁর 'I will not rest'—" বেশ একটু সগর্বেই উত্তর দিলে রঙ্গনা।

"দেখি।"

"আমার ভাই বাস এসে গেছে।"

রঙ্গনা বাসে উঠে পড়ল। আর হাঁটতে পারছিল না সে। মনে করেছিল হেঁটে যাবে হেঁটে আসবে, কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বাসটা বেশ ফাঁকা ছিল। একটি খালি সীটের একধারে বসে বইটা খুললে সে। খুলতেই কাগজ বেরিয়ে পড়ল একটা। তারই চিঠিখানা। প্রথম দিন দিবসের বাসায় গিয়ে যে চিঠিখানা সে লিখে রেখে এসেছিল সেইটেই পেজমার্ক করা ছিল। চিঠিখানার দিকে চেয়ে রঙ্গনার শরীরের রক্তস্রোত মুহূর্তের জন্যে থেমে দ্বিগুণবেগে বইতে লাগল পরমুহূর্তে। করেছেন কি ভদ্রলোক! রঙ্গনা, রঙ্গনা, রঙ্গনা—চিঠিখানার আষ্টেপৃষ্টে ছোট বড় বাংলা ইংরেজি নানারকম অক্ষরে তার নামটা লিখেছেন। চিঠিটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে। তারপর উঠে পড়ল হঠাৎ। অকস্মাৎ তার মনে হল বিলাসিতা করা উচিত নয়, হেঁটেই যাবে সে। পরের স্টপেজেই বাস থেকে নেমে পড়ল সে। নেবে আবাব হাঁটতে শুরু করে দিলে, কিন্তু আবার একটু পরেই থামতে হল তাকে। একটা ছবির দোকানের সামনে হংস ও দময়ন্তীর ছবিটা তাকে থামিয়ে দিলে যেন। কেমন যেন আবছা ভাবে তার মনে হল...দিবসের হাঁসের ছবিটা মনে পড়ল।

"কত দাম ছবিটার?"

"আড়াই টাকা।"

"দিন আমাকে।"

ছবিটা কিনে ফেলেই কিন্তু অনুতাপ হল তার। এমনভাবে টাকা খরচ করাটা কি উচিত হচ্ছে? তারা যে গরিব এই কথা আবার প্রবলভাবে মনে পড়ল। মনে পড়ল তার বাবা তার বিয়ের পণ-সংগ্রহের জন্য কাশীর বাড়িটা বাঁধা দেবার আয়োজন করেছেন। বিমর্ষ হয়ে গেল বেচারী। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার তার সমস্ত সত্তা বিদ্রোহ করে উঠল। কেন এত দারিদ্র্য কেন সে যেমন ভাবে থাকতে চায় তেমন ভাবে থাকতে পাবে না? দিবসবাবু সেদিন যে বক্তৃতায় বললেন—কিন্তু তার চিন্তাধারা ব্যাহত হল ঊর্মির ডাকে।

"রঙ্গনাদি, আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম কিরণদা'র এই গানটা নিয়ে। সুর দিয়ে দেবেন এটাতে?"

"বেশ তো, চেষ্টা করব।"

গানটা নিয়ে দেখতে লাগল।

"আমি এখন তাহলে সিনেমা ডিরেকটারের কাছে যাই। আমার ময়ূর নাচটা দেখাই তাঁকে। এটা যদি তিনি ঢুকিয়ে দিতে পারেন—ওফ্ তাহলে হিট্ পিকচার হয়ে যাবে একখানা। ওই আমার বাস এল, আমি চলি তাহলে। কাল যাব আপনার কাছে।"

ঊর্মি চলে গেল। রঙ্গনা হাঁটতে লাগল আবার।

ব্রজ কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিল না।

সে রোজই একবার দিবসকে খুঁজতে বেরুত দুপুরের দিকে। দিবসের যতগুলি বন্ধুর ঠিকানা তার জানা ছিল প্রত্যেকের বাড়ি সে গিয়েছিল। ল'কলেজের গেটেও গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে দু'একদিন, যদি দৈবাৎ দেখা পেয়ে যায়। সূর্যকান্তর উপর আর তার আস্থা ছিল না, তাছাড়া সূর্যকান্তও যে কত গোঁয়ার তা তার চেয়ে বেশি কে জানে। ও ভাঙবে তবু মচকাবে না। গোবিন্দ সাণ্ডেলের উপরও হাড়ে চটা ছিল ব্রজ। তার ধারণা পিতাপুত্রের এই যে মনোমালিন্য ঘটেছে তার মূলে আছে ওই লোকটি। সকাল বিকেল এসে আজকালকার ছেলেদের নামে কুটুস্ কুটুস্ করে চিমটি কেটে কেটে কথা বলাই ওর কাজ। ব্রজর ধারণা সেকালকার ছেলেদের তুলনায় আজকালকার ছেলেরা রত্ন। ব্রজরও বয়স কম হয়নি, সেকাল একাল দু'কালই দেখেছে সে। না, গোবিন্দ সাণ্ডেলের উপরও ভরসা ছিল না তার। সে নিজেই খুঁজে বার করবে। তাকে একবার নাগালের মধ্যে পেলে ঠিক ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারবে এ ভরসা তার আছে।.....এই জাতীয় চিন্তা দ্বারা চালিত হয়ে সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল দিবসকে। একটি মাত্র সহকারী (সহকারিণী বললে আরও ব্যাকরণসম্মত হয়) সে পেয়েছিল। সে হচ্ছে বাড়ির ঝি নিস্তারিণী। নিস্তারিণীকে ব্রজ বলেছিল—"তুই তো রোজ রাস্তা দিয়ে আসিস যাস, চোখ কান খোলা রাখিস একটু। রাস্তায় দেখা যদি হয়ে যায় আধ ঘোমটা টেনে সমীহ করে সরে দাঁড়াসনি যেন। ভুলিয়ে ভালিয়ে ডেকে নিয়ে আসিস। বুঝলি? বলিস ব্রজদা একবার শুধু তোর সঙ্গে দেখা করতে চায়, যদি না আসতে চায় ঠিকানাটা জেনে নিবি, বুঝলি?"

"বুঝেছি, বুঝেছি, আমাকে আর অত বোঝাতে হবে না"—নিস্তারিণী ঝংকার দিয়ে উঠেছিল যদিও কিন্তু সত্যিই সে তার সাধ্যমতো খোঁজ-খবর করছিল এবং সে-ই একদিন দিবসের খবরটা এনেও দিলে ব্রজকে।

"গিরিবালার সঙ্গে আজকে দেখা হল পথে। কথায় কথায় সে বললে আমাদের অন্ন বোধ হয় উঠল এবার্ দিদি। লেখাপড়া জানা কলেজের ছেলেরা সব চাকর হয়ে বাসন মাজছে আজকাল। সে যে মেসে ঝি-গিরি করে সেই মেসে দিবু বলে একটি ল'কলেজের ছেলে নাকি চাকর হয়ে বাহাল হয়েছে।"

"তাই না কি! ঠিকানাটা কি সে মেসের?"

"ঐ যাঃ ঠিকানাটা তো জিগ্যেস করতে ভুলে গেছি।"

"গিরি কোথায় থাকে?"

"তাও তো ঠিক জানি না। আগে থাকত কলুটোলায়, না, না কলাবাগানের কাছে, কি যে ছাই নামটা—"

"আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানিস?"

"কি?"

"তোর গালে ঠাস করে একটা চড় মারি।"

"মুখ সামলে কথা কও বলছি"—তর্জন করে উঠল নিস্তারিণী—"চড় মারবেন, ইশ ভারী মরদ হয়েছেন, যত বুড়ো হচ্ছেন তত ভীমরতি ধরছে—"

"ছি, ছি ছি ছি! দিবুর ঠিকানাটা তুই হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়ে এলি!"

কলহ কিন্তু আর বেশি দূর অগ্রসর হবার সুযোগ পেল না, কারণ গোবিন্দ সাণ্ডেল এসে ঢুকলেন। নিস্তারিণী আধঘোমটা টেনে সরে গেল, ব্রজও থেমে গেল। ব্রজ শুধু থেমে গেল না, এমন ভাবে চাইলে যেন কোনো শত্রু নিকটবর্তী হয়েছে।

"সূয্যি কোথা?"

"ওপরে আছে।"

গোবিন্দ সাণ্ডেল ওপরে চলে গেলেন। ব্রজর কথা তিনি খানিকটা শুনতে পেয়েছিলেন। দিবসের ঠিকানা নিয়েই যে ওরা আলোচনা করছে এটাও বুঝতে পেরেছিলেন। অন্য কেউ হলে থেমে ব্যাপারটা পুরোপুরি জেনে নিতেন, কিন্তু গোবিন্দ সাণ্ডেল সে জাতের লোক নন। চাকরদের সঙ্গে—তা সে যত পুরাতন ভৃত্যই হোক—একটা দূরত্ব রক্ষা করে চলাটাই তিনি আভিজাত্য মনে করেন। সোজা উপরে চলে গেলেন তিনি।

দিবস যে বাড়ির সামনে এসে চলে গেল, তাঁর আহ্বান সত্ত্বেও বাড়ির ভিতরে এল না এর ধাক্কাটা সূর্য চৌধুরী সামলেছিলেন। গোবিন্দ সাণ্ডেলকে দেখে তিনি বুঝলেন যে আর একটা ধাক্কা আসন্ন। এটাকে সামলাবার জন্যও মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিলেন তিনি।

গোবিন্দ সাণ্ডেল এসেই পরিহাসের সুরে বললেন, "আমাকে কুড়িটি টাকা দাও দিকি।"

"কেন?"

"দিবসকে খোঁজবার জন্য চেৎলা দৌড়েছিলুম, মানিব্যাগটি হারিয়েছি, নতুন জুতো জোড়া কাদায় জলে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে, ট্যাক্সি খরচা লেগেছে তার উপর—"

"হঠাৎ চেৎলা দৌড়তে গেলে যে?"

"বদ্যিনাথের কথায়। ও যে অত বড় একটা উজবুক তা ধারণাই ছিল না আমার। কোথা থেকে উড়ো খবরটি দিয়ে চলে গেল।"

সবিস্তারে ঘটনাটির বর্ণনা করলেন।

"মিছে ছুটোছুটি করছ তুমি। দিবস তো এসেছিল।"

"এসেছিল? তার মানে? কোথা সে?"

তখন সূর্য চৌধুরী সবিস্তারে সব বললেন।

"তুমি ডাকলে, তবু এল না?"

"না। বললে সে যা করতে চায় তা এই প্রাসাদে বসে করা সম্ভব নয়।"

"কি করতে চায় সে?"

"আদর্শ শ্রমিক হতে চায়।"

"ও বাবা!"

গোবিন্দ সাঙেলের চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবার মতো হল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি প্রশ্ন করলেন, "কোথা আছে সে?"

"তা তো জানি না। ঠিকানাটা জিগ্যেস করতে ভুলে গেছি।"

"ঠিকানা বোধ হয় ব্রজ জানে তোমার।"

"ব্রজ?"

"হ্যাঁ, এখনি ওপরে আসতে আসতে শুনলাম ও আর তোমার ঝি মাগি দিবসের ঠিকানা নিয়ে কথা কাটাকাটি করছিল। আমাকে দেখেই থেমে গেল।"

"তাই না কি! আমাকে তো কিছু বলেনি?"

"ভিজে গামছা উটি একটি, নেংড়াও জল বেরিয়ে পড়বে।"

সূর্য চৌধুরী চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন, "ঠিকানা জেনেই বা কি হবে বল? যে যদি না আসতে চায়, সে যদি তার নিজের পথে চলতে চায়, আমি তো তাকে জোর করতে পারি না। করা উচিতও নয়।"

"উচিত নয় মানে? ছেলে যা খুশি করবে আর তুমি বসে বসে দেখবে?"

"যা খুশি বলে তুমি যা বোঝাতে চাইছ সে ঠিক তা তো করছে না। ভুল হোক ঠিক হোক সে নিজের একটা আদর্শ খাড়া করছে এবং সেই অনুসারে চলতে চাইছে—"

"আদর্শ না কচু!"

কথাগুলো অভ্যাস অনুযায়ী বেরিয়ে পড়ল গোবিন্দ সাঙেলের মুখ থেকে যদিও, কিন্তু তিনিও মনে মনে চিন্তিত হয়ে পড়লেন একটু। এরকম করবার মানেটা কি! আদর্শ শ্রমিক? তাঁর অবশ্য ছেলে হয়নি, সবগুলোই মেয়ে, ছেলের মর্ম তিনি ঠিক বোঝেন না হয়তো কিন্তু তার বদ্ধ ধারণা ছেলেটিকে নাই দিয়ে দিয়ে সূর্যকান্ত এই কাণ্ডটি করেছেন। শাসন না করলে স্ত্রী পুত্র পরিবার কেউ বশে থাকে না। এমন কি জামাইকে পর্যন্ত শাসন করতে হয়—তাঁর সেজ জামাইটি চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করবেন বলে মেতেছিলেন—ব্যবসা করবার মতো সংগতি আছে তা ঠিক, বাপের অঢেল পয়সা, কিন্তু চাকরির কাছে ব্যবসা! কড়া করে একখানা চিঠি লেখাতে তবে ঠাণ্ডা হয়েছেন বাবাজি! বাপের পয়সা থাকলেই ছেলেগুলোর মাথা কেমন যেন বিগড়ে যায়। জামাইয়ের কথা ভাবতে গিয়েই এই শ্রমিক রহস্যটার সমাধান সহসা চোখে পড়ল তাঁব। সূর্য চৌধুরীর দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "ও সব হুজুক। আর হুজুকে মেতেছে কেন জান? ওর মনটি ঠাণ্ডা আছে।"

"বুঝলাম না।"

"এখন আদর্শ শ্রমিক সেজে বেড়াচ্ছে, বক্তৃতা করছে, কারণ ও জানে যে তুমি চক্ষু বুজলেই বিষয়টি ও পাবে।"

সূর্য চৌধুরী স্মিত মুখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, "অতটা খেলো ওকে

মনে করতে পারি না আমি। এ যুগের ভালো ছেলেদের তুমি চেন না তাই ও কথা ভাবতে পারছ।"

এ ধরনের কথা সূর্য চৌধুরীর মুখে ইদানিং অনেকবার শুনেছেন গোবিন্দ সাণ্ডেল। প্রত্যুত্তর দেবার আর প্রবৃত্তি হল না। শুধু বললেন...."অত কথায় কাজ কি, ফলেন পরিচীয়তে। বিষয়টি থেকে ওকে বঞ্চিত করে সেই খবরটি পাঠাও দিকি ওর কাছে, উঠি-পড়ি করতে করতে ছুটে আসবে।"

"কখনও আসবে না।"

"ঠিক আসবে। করেই দেখ।"

পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন।

রঙ্গনা চলে যাবার পর দিবসও বেরিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে ঘুরল রাস্তায় রাস্তায়। তারপর কিরণের বাসায় হাজির হল এসে।

"একেই বলে টেলিপ্যাথি"—কিরণ হেসে বলল—"আমি এক্ষুনি তোর কথা ভাবছিলাম। তারপর খবর কি?"

কোনও উত্তর না দিয়ে দিবস চেয়ারটা টেনে বসল স্মিতমুখে।

"কিছু বলছিস না যে?"

"বলতে বাধছে।"

"কি রকম?"

দিবস হাসিমুখে চেয়ে রইল তবু। তারপর বললে—"আচ্ছা, তুই তো কবি মানুষ, একটা কথার জবাব দে দিকি। একটা বিশেষ লোককে হঠাৎ ভালো লেগে যায় কেন?"

"কেন, কাউকে হঠাৎ ভালো লেগেছে নাকি?"

"লেগেছে।"

"কাকে?"

"রঙ্গনাকে।"

কিরণের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল সহসা। তাঁর যে ব্যথাটাকে সে গোপন করতে চাইছে প্রাণপণে এই সংবাদটা যেন লোষ্ট্রাঘাতের মতো লাগল এসে তাতে। ক্ষতবিক্ষত হয়েও যে অন্তর্দ্বন্দ্বকে ভুলে থাকবার চেষ্টা করছিল সে, দিবসের কথায় মনে পড়ে গেল সেটা। শুধু মনে পড়ে গেল নয় এর শোচনীয় পরিণামটাও যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চোখের সামনে। কিন্তু তার তৎক্ষণাৎ আবার মনে হল যে দুর্বিষহ দারিদ্র্যের চাপ, যে ব্যর্থতার গ্লানি তার স্বপ্নকে সফল হতে দিচ্ছে না, যা তাকে ভদ্রসমাজ থেকে দূরে টেনে এনেছে, খাঁকি প্যান্ট পরিয়ে এক অদ্ভুত জীব বানিয়েছে, তা তো দিবসের পক্ষে সত্য নয়। দিবসের স্বপ্ন হয়তো সফল হবে। দিবস তো দরিদ্র নয়।

"কিরে অমন করে চেয়ে রইলি কেন? কিছু বল"—সামলে নিলে কিরণ পরমুহূর্তে। হেসে বললে—"কিন্তু রঙ্গনা কি মেসের চাকর দিবস চৌধুরীকে আমোল দেবে?"

"দেবে না? দিলে কিন্তু বেশ হয়. নয়?"—দিবসের কণ্ঠস্বরে এমন একটা আগ্রহ ফুটে

উঠল যা অভূতপূর্ব বলে ঠেকল কিরণের কাছে। দিবস কিরণের মুখের দিকে চকিত চেয়ে আবার সুর করল—"দেবে না কেন? সে কেবল মেসের চাকরিটাই দেখবে, আমাকে দেখবে না? লেখাপড়া শিখছে, মানুষের বাইরেটা যে সব নয় একথা সে বুঝবে না?"

"বোঝা শক্ত।"

এইটুকু বলে কিরণ চুপ করে গেল। তারপর হঠাৎ একটু অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বলে উঠল "উচিতও নয়। সত্যিই যে মোহিনী সে কেন বরণ করতে যাবে অসমর্থ দরিদ্রকে?"

"অর্থ-টাই বড় তাহলে তোর মতে?"

"বড় কি ছোট সে প্রশ্ন অবান্তর। ওর আধ্যাত্মিক যত ব্যাখ্যাই আমরা করি না কেন, অর্থটা প্রয়োজন। দরিদ্রের কোনও অধিকারই নেই প্রেমে পড়বার। সে বিয়ে করুক, কিন্তু প্রেমে পড়লেই তার দুর্গতি অনিবার্য। যাকে ভালোবাসি তাকে— "

হঠাৎ থেমে গেল কিরণ। তারপর কথাটা ঘুরিয়ে একটু হেসে বললে, "তার চেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও না। সোজা হবে জিনিসটা। মানাবেও। শখ 'করে' এ কৃচ্ছ্রসাধনের মানেটা কি তাও তো আমার মাথায় আসছে না।"

"তোর মাথায় এসেছে ঠিকই কিন্তু তুই সেটা মানতে চাইছিস না। তুইও মানতে চাইছিস না, আশ্চর্য লাগছে সত্যি। তুইও বুঝতে পারছিস না যে কর্মবিমুখতাই আমাদের আসল গলদ!"

রঙ্গনার কথা চাপা পড়ে গেল।

দিবস বলতে লাগল, "আজ আমাদের কি দুর্দশা হয়েছে দেখতে পাচ্ছিস না? কোথাও আমাদের স্থান নেই, সম্মান নেই। সবাই বলছে বাঙালীরা কেবল লম্বা লম্বা বুলিই আওড়াতে পারে, কাজ করতে পারে না কিছু। হতে পারে কেবল আপিসের কেরানি। আমাদের এ অপবাদ ঘোচাতে চাই আমি"—দিবসের গলাটা কেঁপে গেল একটু—"আমি হাতে কলমে দেখিয়ে দিতে চাই বাঙালীর ছেলেরা ইচ্ছে করলে সব করতে পারে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় উচ্চতম স্থান দখল করতে পারে আবার দরকার হলে বাসনও মাজতে পারে, জুতাও বুরুশ্ করতে পারে।"

কিরণ বললে, "তোমার কিন্তু দরকার হয়নি।"

"হয়নি বলেই আমি সহজে পারব, এবং সেইজন্যেই এ আদর্শ সৃষ্টি করবার দায়িত্ব আমারই বেশি। দরকারের চাপে বাধ্য হয়ে মেসের চাকর হতে হবে যাদের তারা আমাকে দেখে প্রেরণা পাবে, তাদের আর লজ্জা করবে না। এই দেখ না পাঞ্জাবি বা কামিজের উপর ওয়েস্টকোট এদেশে আগে খানসামারাই পরত, কিন্তু যেদিন থেকে পণ্ডিত জহরলাল একটু বদলে ওটাকে পরলেন সেদিন থেকে ওটা জাতে উঠে গেল। ও পোশাক আজ হেয় নয়, গৌরবের। বড় বড় নেতারা যখন জেলে গেল, তখন জেলই তীর্থস্থান হয়ে উঠেছিল, মনে নেই তোর?"

কিরণ চুপ করে রইল ক্ষণকাল।

তারপর বললে, "বেশ ধরেই নিলাম না হয় যে আদর্শের প্রেরণায় কৃচ্ছ্রসাধন করাটা তোমার কর্তব্য কিন্তু রঙ্গনাকে তার মধ্যে টেনে আনতে চাইছ কেন? প্রেমকে যদি মহিমান্বিত না কয়তে পার তাহলে দরকার কি সে রকম প্রেমের!"

"তুই তাহলে বলছিস যে অর্থ ছাড়া আর কোনও মহিমা নেই?"

"অর্থাতীত যে মহিমা তা অসাধারণ লোকের থাকে। সাধারণ লোকের কাছে অর্থই মহিমালাভের উপায়। শুধু মহিমালাভের উপায় নয়, অতি সাধারণ দৈনন্দিন স্বাচ্ছন্দ্য লাভেরও উপায়।"

"স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে যদি রোজগার করে তাহলে দৈনন্দিন স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হবে না?"

"কিন্তু সেই স্ত্রী যদি তোমার প্রিয়া হয় তাহলে তাকে দিয়ে চাকরানির কাজ করানোটা কি তোমার ভালো লাগবে? সে যখন একটা কাপড় বা গয়না চাইবে, কিংবা তোমার নিজেরই যখন ইচ্ছে হবে তাকে একখানা ভালো শাড়ি বা গয়না দিতে তখন মুদির দোকানের বিল আর বাড়ি ভাড়ার অঙ্ক যোগ করে যদি দেখ তোমার সামর্থ্যে কুলুচ্ছে না তখন কি রকম লাগবে সেটা?"

"তোর মতে তাহলে বিয়ে করাই উচিত নয়?"

"বিয়ে করাটা প্রয়োজন, শখ নয়। বিয়ে তুমি একটা চাকরানিকেও করতে পার, তার সঙ্গেই চাকরের গৃহস্থালী জমবে ভালো। কিন্তু রঙ্গনাকে যদি চাও, রঙ্গনার মতো মর্যাদা দিতে হবে তাকে, আই মীন, আর্থিক মর্যাদা। তোমার নোংরা উঠোনের কোণে পুঁই মাচা মানাবে, কিন্তু পারিজাত কুঞ্জ মানাবে না। তার জন্যে নন্দন-কানন চাই।"

"বিশ্বাস করলাম না। বিশ্বাস করলাম না যে অপরের তৈরি নন্দন-কাননে আমার পারিজাত মর্যাদা পাবে। আমি নিজের শক্তিবলে আমার নিজের উঠোনকেই নন্দন-কাননে পরিণত করতে যদি পারি তবেই আমার পৌরুষ সার্থক হবে আর সেই পৌরুষই মর্যাদা দেবে আমার প্রিয়াকে।"

"মেসের চাকর হয়ে কতদিনে তুমি তোমার উঠোনকে নন্দন-কাননে পরিণত করতে পারবে মনে কর?"

"আমি যে বরাবর মেসের চাকর হয়ে থাকব এ প্রতিজ্ঞা তো করিনি। আমি বলছি, যে কোনও কাজ করবার সামর্থ্য আমাদের অর্জন করতে হবে। কেবল কেরানিগিরি বা শৌখিন পেশাগুলি ছাড়া আমরা আর কিছু করতে অপারগ এই কলঙ্ক ঘোচাতে হবে। আমি তো ইতিমধ্যে একটা প্রাইভেট ট্যুশনি পেয়ে গেছি। আরও ভালো যদি কোনও রোজগারের পন্থা আবিষ্কার করতে পারি, মেসের চাকর থাকব কেন? কিন্তু আমি বাসন মাজতে বা কাপড় কাচতে পারব না, রিকশা টানতে পারব না, কুলী হতে পারব না—অক্ষমতার এই অপবাদ সহ্য করব কেন আমরা?"

"আমাদের শক্তিতেই কুলোবে না! আমার পক্ষে তো রিকশা টানা অসম্ভব।"

"শক্তিটা মনে, পেশীতে নয়। তাছাড়া পেশীরও তো অভাব দেখি না। স্কুলে, কলেজে, ক্লাবে, জিম্‌ন্যাসিয়ামে বাঙালী ছেলেদের স্বাস্থ্যচর্চার তো খুব ধুম দেখি। মাসিকপত্র খুললেই বুক ফোলানো বাইসেপ্‌স্-ফোলানো ছবি তো প্রায়ই চোখে পড়ে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে রিকশা টানে যে লোকটা তার অমন সুদৃশ্য পেশী নেই। আমরা স্বাস্থ্য-চর্চাটাও একটা 'ফ্লারিশ' করবার বস্তু করে তুলেছি। ভালো পেশীওলা ছেলে-মেয়েদের ছবি ছাপা হোক তাতে আমি আপত্তি করছি না। কিন্তু সে পেশী যদি শেষ পর্যন্ত কলম-পেষাতেই পরিণতি লাভ করে তাহলে দুঃখ হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথাগুলো কি কেবল কেতাবেই নিবদ্ধ থাকবে?"

কিরণ একটু চুপ করে থেকে উত্তর দিলে, "প্রত্যেক জাতেরই একটা বিশিষ্টতা থাকে,

বাঙালীরও সেটা আছে। আমরা শিল্পীর জাত, শিল্পীর সমস্ত রকম দোষগুণ তাই আমাদের মধ্যে বর্তমান। রিকশা টেনে বেড়ালে শিল্প সৃষ্টি করা যায় না। শিল্প সৃষ্টি করবার জন্যে ছুটি চাই, অবসর চাই। তাই আমরা চাকরি-প্রিয়। দশটা পাঁচটা আপিস করি বাকি সময়টা অবসর পাই, সে সময় যা খুশি করি। এই যা-খুশি করবার স্বাধীনতাই শিল্পের জন্মদাতা। যারা সকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত গদিতে বসে পয়সার চিন্তা করছে, কিংবা ভাত-কাপড়ের জন্য অহরহ খেটে মরছে, তারা বড় শিল্পী হয়নি। হতে পারবেও না।"

"কিন্তু সমস্ত জাতটা যদি অলস হয়ে কেবল শিল্পেরই ধ্যান করে তাহলে তার মৃত্যুও অনিবার্য।"

চুপ করে রইল দুজনে খানিকক্ষণ।

তারপর কিরণ হেসে বলল, "আমার কিন্তু মনে হচ্ছে রঙ্গনা তোমার ওই খোলার ঘরে এসে থাকতে চাইবে না।"

"চাইবে না?"

"মনে তো হয় না!"

"কিন্তু ভাবতে ইচ্ছে করে যে চাইবে।"

"চাওয়াটা উচিত নয়।"

"তুই কিন্তু ওদের কাছে যেন আমার আসল পরিচয়টা বলিস না।"

"আমি যাই-ই নি সেখানে। সময় পাচ্ছি না।"

"আমারও যাওয়া হয়নি এখনও।"

"এইবার যাও।"

কিরণ মুচকি হাসলে। হাসিটা তার ম্লান দেখাল। ঊর্মির মুখটা তার মনে ভেসে বেড়াচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে। ঊর্মির চোখের ভাষাহীন নিবেদনকে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত করে দিচ্ছিল কালো একখানা মেঘ। দারিদ্র্যের মেঘ। এই অস্বস্তিকর অসংগতির স্পর্শে ম্লান হয়ে যাচ্ছিল তার হাসি। নিজেকে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না সে।

দময়ন্তীর ছবি বগলে করে রঙ্গনা যখন বাড়ি পৌঁছল তখনও গহনচাঁদ এবং চুনীলাল ফেরেননি। মামীমা বাপের বাড়ি চলে গেছেন, বাড়িটা একেবারে ফাঁকা। বুড়ি ঝিটা বসে আছে শুধু, তারই মুখে রঙ্গনা খবর পেলে যে মামা বাবাকে নিয়ে দাদার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গেছেন তারই বিয়ের সম্বন্ধে। মুচকি হেসে ঝি বার্তাটি নিবেদন করলে। তারপর বললে,— "তোমার খাবার ঢেকে রেখে দিয়েছি টেবিলের ওপর। ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে থাকে তো ঠাকুরকে একটু গরম করে দিতে বোলো। আমি চললুম এবার।"

"আচ্ছা।"

ঝি চলে গেল। রঙ্গনা কাপড় ছাড়তে লাগল। একটু পরেই ফিরে এল আবার ঝি।

"বাইরে ডাক বাক্সে চিঠি ছিল দু'খানা।"

চিঠি দিয়ে ঝি চলে গেল। দুখানাই পোস্টকার্ডের চিঠি। একটা গহনচাঁদের। বিশ্বনাথ কথক কাশী থেকে লিখেছেন। বাড়ি বাঁধা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। দলিল-পত্র নিয়ে তিনি নিজেই

আসছেন। লেখাপড়া হয়ে গেলেই টাকা পেতে দেরি হবে না। দ্বিতীয় চিঠিখানা চুনীলালের। সেটিও ভ্রূকুঞ্চিত করে পড়লে রঙ্গনা। কোন এক হরলালবাবু লিখেছেন—"লোক-পরম্পরায় শুনিলাম যে আপনি আমার টাকাটা পরিশোধ করিয়া দিবেন মনঃস্থ করিয়াছেন। সত্যই তাহা যদি করেন তাহা হইলে আমাকে আর অনর্থক মকোর্দমার হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না। উকিলের পরামর্শ লইয়া বুঝিয়াছি মকোর্দমায় আমি জিতিবই। কিন্তু অকারণ টাকা ব্যয় করিতে চাহি না, কারণ এই টাকাটাও তো শেষ পর্যন্ত আপনার ঘাড়েই চাপিবে। আমি আপনার জন্য আর কতদিন অপেক্ষা করিব জানাইবেন।"

চিঠি দু'খানা টেবিলে রেখে দিয়ে রঙ্গনা ঢাকা দেওয়া খাবারটা খেয়ে নিলে। তার সমস্ত মনটা কেমন যেন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল। চতুর্দিকেই কেবল অভাব আর অভাব। আনন্দের কোনও সুরই যেন জমছে না কোথাও। বার বার তাল কেটে যাচ্ছে। মুখের হাসি মিলিয়ে যাচ্ছে ফুটতে না ফুটতেই। আজকালকার ওই রঙীন রবারের বেলুনগুলোর মতো। স্ফীত হয়ে উঠেছে বটে আবেগভরে কিন্তু চুপসে যাচ্ছে পরমুহূর্তে। কেন এমন হয়.... মেঘের পর মেঘ এসে জমতে লাগল রঙ্গনার মনে।

অপ্রত্যাশিতভাবে মেঘ কেটেও গেল আবার। টুলের উপর চড়ে দময়ন্তীর ছবিটা টাঙিয়ে যেই নাবতে যাবে অমনি হাত লেগে পাশে টাঙানো আয়নাটা মেঝেতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ছবিটা কিনেই সে নিজের বিবেকের কাছে অপরাধী হয়ে পড়েছিল, সেই ছবি টাঙাতে গিয়ে আবার আয়নাটা ভেঙে গেল! অনুশোচনা করবার কিন্তু সে সময় পেল না। ঠিক সেই মুহূর্তে দিবস এসে হাজির হল। কিরণের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রঙ্গনার কথাই ভাবতে ভাবতে পথ হাঁটছিল দিবস। রঙ্গনা কেবল আমার মেসের চাকরিটাই দেখবে, আমাকে দেখবে না।—এই কথাটাই বারবার মনে হচ্ছিল তার। তারপর মনে হল তার স্বরূপ জানবার সুযোগ তো রঙ্গনাকে সে দেয়নি এখনও। রঙ্গনা নিজে দু'বার তার বাড়িতে এসে যতটুকু পরিচয় পেয়েছে। তার মূল্য কতটুকু। পথ চলতে চলতে হঠাৎ তার মনে হল রঙ্গনার বাড়ি গেলে হয়, ভালো করে আলাপই তো করা হয়নি তার সঙ্গে। তাছাড়া সরোদ যদি শিখতেই হয় নিজের এবং গহনচাঁদবাবুর সুবিধা অনুযায়ী একটা সময়ও ঠিক করতে হবে। এই ওজুহাতটাকে অবলম্বন করেই সে এসে হাজির হয়েছিল এত রাত্রে। কিন্তু এসে যে সে এই পরিস্থিতিতে পড়ে যাবে তা কল্পনাও করেনি। বাইরের ঘরে কাউকে দেখতে না পেয়ে সে চলে যাবে কি না ভাবছিল। পরমুহূর্তেই ঝন্‌ঝন্ শব্দটা কানে আসতেই পাশের দরজা দিয়ে উঁকি দিয়েই দেখতে পেলে রঙ্গনাকে।

"কি হল!"

"আপনি!" পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে রঙ্গনা বললে—"আসুন, বাবা, মামা কেউ বাড়ি নেই। বাইরের ঘরে বসি চলুন।"

বাইরের ঘরে গিয়ে দিবস বললে, "অত বড় আয়নাখানা কি করে ভাঙল?"

"ছবি টাঙাচ্ছিলাম একটা, হঠাৎ টুলটা কেমন যেন নড়ে উঠল, টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। পাশেই ছিল আয়নাটা, যেই ধরতে গেছি আর অমনি দড়ি ছিঁড়ে পড়ে গেল। অমন শখের আয়নাটা, ছি ছি, এমন কষ্ট হচ্ছে।"

দিবস চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর তার মনে হল তার এই অসময়ে আসার হেতুটা বলা উচিত।

"আমি জানতে এসেছিলাম, কখন এলে সরোদ শেখবার সুবিধে হতে পারে। আমার ছুটি দুপুরে ঘণ্টা দুই—বারোটা থেকে দুটো। আর রাত্রিতে আটটার পর। ও, টিউশনিটা যদি নি তাহলে আটটার পরও তো ছুটি থাকবে না—কখন আসব তাহলে—"

রঙ্গনা আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না।

"আচ্ছা আপনি মেসে চাকরের কাজ করেন শুনলাম? সত্যি?"

"কে বললে আপনাকে!"

"সৌদামিনী। আপনার সব খবর পেয়েছি"—মুচকি হেসে বললে রঙ্গনা।

"তাতো জানতাম না"—দিবস কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

"সত্যি আপনি মেসের চাকর হয়ে আছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"আমার বক্তৃতা তো শুনেছেন!"

ওদের আলাপ কিন্তু আর বেশিদূর অগ্রসর হবার সুযোগ পেল না। গহনচাঁদ এবং চুনীলাল ঢুকলেন এসে। দিবসকে দেখে মহা খুশি হয়ে উঠলেন গহনচাঁদ।

"ও তুমি এসেছ, বস বস বস। ভাবছিলাম তোমার কথা।"

চুনীলাল তির্যক দৃষ্টিতে দিবসের দিকে চেয়ে ভিতরের দিকে যাচ্ছিল, রঙ্গনা বললে, "তোমার চিঠি এসেছে একটা। বাবা তোমারও চিঠি আছে। কথক মশাই আসছেন।"

"তাই না কি, চমৎকার সুখবর তো! কই চিঠি?"

"এই যে আনি।"

রঙ্গনা চলে গেল পাশের ঘরে।

"আমি কখন সরোদ শিখতে আসব জানতে এসেছিলাম। আমার দুপুরে ঘণ্টা দুই ছুটি আছে। আপনি কি দুপুরে ঘুমোন?"

"না। তোমার যখন খুশি এস।"

রঙ্গনা চিঠিটা এনে আবদারের সুরে বললে, "একটা খুব অন্যায় কাজ করে ফেলেছি বাবা। বল তুমি রাগ করবে না?"

"কি করলি আবার!"

"রাগ করবে না বল?"

গহনচাঁদ হেসে ফেললেন।

"আরে শুনিই আগে ব্যাপারটা কি।"

"আমার আয়নাটা পড়ে ভেঙে গেছে। দময়ন্তীর একটা ছবি কিনে এনে টাঙাচ্ছিলাম, হঠাৎ টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম, আয়নাটা পাশেই ছিল, হাত লেগে পড়ে গেল।"

"ভাগ্যে তুই পড়ে যাসনি! দময়ন্তীর ছবি কিনেছিস না কি, কই কোথায়?"

শিশুর মতো কৌতূহলী হয়ে উঠলেন গহনচাঁদ।

"ওঘরে টাঙিয়েছি, দেখবে চল না।"

"আমি এখন চলি তাহলে। পরে আসব আবার"—দিবস উঠে পড়ল এবং গহনচাঁদকে নমস্কার করে বেরিয়ে গেল।

গহনচাঁদ দময়ন্তীর ছবি দেখে খুব খুশি হলেন। বললেন, "যে ঘরে তোর সম্বন্ধ করছি, বাবা বিশ্বেশ্বর যদি মুখ তুলে যান, দেখবি সেখানে কি বড় বড় সব অয়েলপেন্টিং। বৈঠকখানাতে রবি বর্মার 'গঙ্গাবতরণ' খানা টাঙানো রয়েছে দেখলাম, কি ছবি সে, সমস্ত ঘরখানাকে যেন আলো করে রেখেছে।"

"যারা অত পণ দাবি করে সেখানে আমি বিয়ে করব না বাবা। কথক মশাইকে তুমি লিখে দাও বাড়ি বাঁধা দিতে হবে না।"

"আরে, ক্ষ্যাপা না পাগল, টাকা খরচ না করলে কি মেয়ের বিয়ে হয় না কি? সব জায়গাতেই টাকা লাগবে, ওই রেওয়াজ যে।"

"আমি তাহলে বিয়ে করব না"—গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল রঙ্গনা।

"ও চুনী শুনছ, তুমি তো এদিকে মেয়ে দেখবার ব্যবস্থা করে এলে, রঙ্গনা কি বলছে শোন—"

মেয়ের পিছু পিছু তিনিও বেরিয়ে এলেন।

চুনীলাল ছাতে গিয়ে নির্জনে হরলালের চিঠিটা পড়ছিল মনোনিবেশ সহকারে। আজ বিকেলে অন্নদাও এসেছিল টাকার তাগাদা দিতে। সেই জন্যেই বিশেষ করে জামাইবাবুকে (গহনচাঁদকে) নিয়ে চুনীলাল বিকাশের জ্যাঠার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল আজ। বিয়েটা হয়ে গেলে তবেই সে বিকাশের কাছে দোকান কেনার কথাটা উত্থাপন করবে। তার আগে ও কথা পাড়াটা ভালো দেখায় না। অন্নদাকে সে স্তোক দিয়ে বিদায় করেছে আপাতত কিন্তু হরলালকে কি বলবে? হরলাল লোকটা নালিশ ঠুকে দিয়েছে তা গোবিন্দবাবুর মারফত শুনেছে সে, এবং টাকা দিতে না পারলে যে বিপদে পড়তে হবে এ আভাসও গোবিন্দবাবু দিয়ে গেছেন। টাকা সে দিয়ে দেবেও, কিন্তু দোকানটা বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত তো দেবার উপায় নেই আর বিয়ে হওয়ার আগে দোকানের কথা পাড়াও যায় না বিকাশবাবুর কাছে....।

অনেক ভেবে চিন্তে চুনীলাল শেষকালে চিঠির উত্তর না দেওয়াটই স্থির করলে। বেশি ধরপাকড় করলে বলা যাবে চিঠি পাইনি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য হরলাল রেজিস্টার্ড চিঠি লিখবে উইথ এক্‌নলেজ্‌মেন্ট ডিউ, কিন্তু ততদিন তো সময় পাওয়া যাবে।

দিবস চলে আসার পর কিরণ বসেই রইল চুপ করে অনেকক্ষণ। মনস্তত্ত্বের যে বেড়াজালে নিজেকে স্বেচ্ছায় বন্দী করেছিল সে, তার থেকে সে কিছুতেই বেরোতে পারছিল না। পৌরুষের অভিমান, দারিদ্র্যের বাধা, কল্পনার স্বপ্নলোক, ঊর্মির আকর্ষণ, কর্তব্যের তাগিদ এর কোনোটাকেই সে উপেক্ষা করতে পারছিল না। অকস্মাৎ রামের বনবাসের সংবাদে লক্ষ্মণের মনে নানারকম বীরভাবের উদয় হয়েছিল—লক্ষ্মণ রামকে পিতৃ-আজ্ঞা অমান্য করতে প্ররোচিত করেছিল, প্রজাদের রাজদ্রোহী করে তোলবার সংকল্প ব্যক্ত করেছিল, দশরথকে বধ করবার জন্যেও প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে রামের সঙ্গে বনেই গেল। কিরণের

জীবনেও ঊর্মির আবির্ভাবে নানাবিধ ভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল তেমনি। কিন্তু সে ঠিক করে উঠতে পারছিল না কি করবে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে সে শেষকালে আর একটা কবিতা লিখে ফেললে—

তুমি ধরার ধূলিতে এসে ফোট না
ওগো, নন্দন কাননের ফুল,
ওগো নন্দন কাননের ফুল
ওগো অনিন্দ্য গন্ধ-আকুল
ছাড়িয়া মন্দাকিনী কূল
তুমি ধরার ধূলিতে এসে ফোট না।
শোন মর্ত্যের বনে শাখে শাখে
ডাকিছে বকুল যূথী চম্পা
মুগ্ধ কবির হিয়া ডাকে।
ওগো, কর কর কর অনুকম্পা
ওগো নন্দন কাননের ফুল
ওগো আকাশ-কুসুম-সমতুল
ডাকিছে তোমারে অলিকুল
তুমি ধরার ধূলিতে এসে ফোট না।

কবিতাটা লিখে সে খানিকটা তৃপ্তি পেলে যেন। একটু আগে সে নিজেই দিবসের সঙ্গে তর্ক করছিল যে নোংরা বাড়ির উঠোনে পারিজাত কুঞ্জ মানাবে না কিন্তু কবিতার মাধ্যমে সে নন্দন-কাননের ফুলকে ধরার ধূলিতে এসে ফোটবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে অবর্ণনীয় একটা আনন্দ লাভ করলে। পরমুহূর্তেই তার মনে হল কাল ঊর্মি এসে এটাও হয়তো ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, রঙ্গনাকে দেবে সুর বসাতে, তারপর চেষ্টা করবে যাতে এটাও গ্রামোফোন কোম্পানিরা নেয়। তার আয় বাড়াবার জন্যে ঊর্মির চেষ্টার অন্ত নেই। ঊর্মির মুখটা মনে পড়ল, জীবন্ত মুখে সজীব চোখ দুটো যেন নাচছে, আর তার সঙ্গে নাচছে তার কানের দুপাশের অলকগুচ্ছ।

।। নবম পরিচ্ছেদ ।।

যদিও দুজনে একই সময়ে একই হাউসে রোমিও জুলিয়েট দেখতে গিয়েছিল তবু দিবসের সঙ্গে রঙ্গনার দেখা হয়নি। দেখা হল সিনেমা ভাঙবার পর রাস্তায়। রঙ্গনাই প্রথমে কথা কইল।

"ও, আপনিও এসেছিলেন! ভারী চমৎকার, না?"

'সুন্দর! কি সুন্দর অভিনয় দেখেছেন ওদের, নিখুঁত একেবারে।"

মিনিট খানেক নীরবে হাঁটার পর রঙ্গনা প্রশ্ন করলে, "আচ্ছা, করুণ বিয়োগান্ত নাটক দেখে আমরা আনন্দ পাই কেন বলুন তো?"

"সত্য বলে। শোক, দুঃখ, বিরহ, ব্যথা এ সবই সত্য। যা সত্য তাতেই আনন্দ পাই আমরা।"

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটল।

"আপনি হেঁটে যাবেন না কি? আপনার বাসা তো অনেক দূর এখান থেকে"—রঙ্গনাই প্রশ্ন করলে।

"কম রোজগার করি, হেঁটেই যেতে হবে। তুমি কি বাসে উঠবে? তুমি বলে ফেললুম মাপ করবেন।"

"তাতে কি হয়েছে, আপনি বয়সে, শুধু বয়সে কেন, সব বিষয়েই আমার চেয়ে বড়। এখন থেকে, 'তুমি'ই বলবেন।"

"বেশ। বাসে যদি যেতে চাও, চল তোমাকে উঠিয়ে দিই। ওই দিকে চল তাহলে।"

"না, চলুন আমিও হেঁটে যাই।"

"সেই ভালো! গল্প করতে করতে চলে যাওয়া যাবে।"

তারা যখন হাঁটছিল তখন একটা ধাবমান ট্যাক্সি থেকে গোবিন্দ সাণ্ডেলের বন্ধু জগমোহন সেন যে এদের দেখে চলে গেলেন তা এরা টের পেল না। জগমোহন দিবসকে চিনতেন, কিন্তু দিবস যে বাড়ি থেকে অন্তর্ধান করেছে এ খবর জানতেন না। জানলে ট্যাক্সি থামাতেন হয়তো তিনি। কয়েকদিন পরে গোবিন্দ সাণ্ডেলের মুখে খবরটা শুনে অবাক হয়ে গেলেন এবং বললেন যে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন দিবস একটি মেয়ের সঙ্গে.....।

কিছুক্ষণ হেঁটে একটু হেসে রঙ্গনা বলল, "আপনি একটা মেসের চাকর একথা কিন্তু ভাবতে ইচ্ছে করে না।"

"কেন?"

"কেমন যেন বাধে।"

"কেন বাধে বলতো"—পরমুহূর্তেই আবেগ সঞ্চারিত হল দিবসের কণ্ঠস্বরে—"এ যুগের ছেলে মেয়ে আমরা বাইরের তুচ্ছ ঐশ্বর্যকে আমরাও যদি বড় করে দেখি—"

"ঐশ্বর্যকে খুব বড় করে দেখা অন্যায়, কিন্তু দারিদ্র্যও কি ভালো?"

"অপরের উপার্জিত অর্থে আস্ফালন করা কি তার চেয়েও খারাপ নয়?"

"অপরের মানে?"

"নিজের বাবারও যদি হয় তা-ও আস্ফালন করার মধ্যে গ্লানি নেই কি?"

"তা বলে ভদ্রলোকের ছেলে মেসের চাকর হবে?"

"আপিসের চাকর হওয়ার বেলায় তো এ আপত্তি ওঠে না?"

"ওঠে না কারণ সমাজে ওটা চলে গেছে।"

"এটাও চালিয়ে দিলে চলে যাবে। মহাত্মাজি থার্ড ক্লাসে চড়ার পর থেকে থার্ড ক্লাসের অসম্মান ঘুচে গেছে যেমন।"

এর উত্তরে রঙ্গনা যা বললে তা যুক্তিযুক্ত নয় মোটেই, সে নিজেও যে সেটা না বুঝল তা নয়, কিন্তু তবু তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, "এ সব কথা কিন্তু মেসের চাকরের মুখে বড্ড বেমানান ঠেকছে যাই বলুন।"

"যদি মোটা মাইনের বড় দরের চাকর হতাম তাহলে ঠেকত না, নয়?"—হেসে জবাব দিলে দিবস।

"আপনি একটা আদর্শ সৃষ্টি করবার জন্যে এ কাজ করছেন তা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু সবাই কি আপনার আদর্শ নেবে মনে করছেন? আমাদের দেশে তো আদর্শের অভাব নেই, মহাপুরুষেরও অভাব নেই, কিন্তু ক'টা লোক মানছে সে সব? আপনার মাঝ থেকে শুধু কষ্ট করাই সার হবে।"

"তুমি 'গীতা' পড়েছ কখনও?"

"না।"

"পড়লে বুঝতে পারতে কেন আমি এ কাজ করছি।"

"কেন বলুন তো?"

"আমরা যদিও মনে করি যে 'আমি এটা করছি' 'আমি ওটা করছি', আসলে কিন্তু আমি কিছু করছি না, করবার ক্ষমতা নেই আমার, আমার ভিতর থেকে কে যেন আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। সেই 'কে'টা পরমাত্মা, না বিবেক, না ভগবান, না শিক্ষা তা জানি না। তার নির্দেশ অনুসরণ করা ছাড়া কিন্তু গতি নেই। সেই 'কে'টাই আসল মালিক। সুতরাং—"

মুচকি হেসে রঙ্গনা বললে, "আমি জানি সে 'কে'।"

"কে বল তো?"

"বললে রাগ করবেন না তো?"

"না রাগ করব কেন!"

"আপনার অহংকার।"

অপ্রত্যাশিত কথাটা শুনে দিবস মনে মনে একটু থমকে গেলেও হেসেই জবাব দিলে, "তাই যদি হয়, তবু সেই অহংকারের নির্দেশই মানতে হবে আমাকে।"

"সেটা কি ভালো?"—রঙ্গনার চোখে হাসি চিকমিক করে উঠল। ওই হাস্যদীপ্ত দৃষ্টির আলোকে আসল রঙ্গনার খানিকটা যেন চকিতে দেখা গেল। ক্ষণিকের জন্য দিবস কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। রঙ্গনার বিচার যে ঠিক এ কথা তার নিজেরও মনে হল এবং মনে হওয়া মাত্র আদর্শের হিমালয়টা হঠাৎ বল্মীকস্তূপে পরিণত হয়ে গেল তার চোখের সামনে। তবু কিন্তু জবাব দিতে ছাড়ল না সে। অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবেই সে বললে, "ভালো মনে করি বলেই তো করছি।"

"মেসের চাকর থেকে আপনি সন্তুষ্ট থাকতে পারবেন?"

"না পারার কোনও হেতু দেখছি না।"

"একটা কথা জিগ্যেস করছি মাপ করবেন। বিয়ে হয়েছে কি আপনার?"

"না।"

"ও তাই"—হেসে ফেললে রঙ্গনা।

"আমি যদিও বিয়ে করিনি কিন্তু মেসের চাকররা তো হরদম বিয়ে করছে এবং বেশ সুখেই আছে।"

"দরকার নেই আমার অমন সুখে"—বলে ফেলেই রঙ্গনা বুঝতে পারলে যে বেফাঁস হয়েছে কথাটা। কানের পাশটা গরম হয়ে উঠল তার এবং যদিও সে ঠিক করেছিল যে দিবসের সঙ্গে হেঁটেই যাবে বরাবর কিন্তু মত বদলে ফেললে হঠাৎ।

"আর হাঁটতে পারছি না, একটা ট্যাক্সি ডাকুন।"

কথাটা বলেই কিন্তু অনুতপ্ত হল রঙ্গনা। ট্যাক্সি করে গেলে এখনই অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে যাবে আবার। সংগীত ভবন খুলে যে ক'টা টাকা চুনীলাল পেয়েছে তা রঙ্গনার কাছেই আছে। তার থেকেই সে ছবি কিনেছে। আয়নাও কিনতে হবে একটা, আবার ট্যাক্সি করে গেলে....।

"ট্যাক্সি?"

"থাক না হয় চলুন।'

"কাছে পিঠে ট্যাক্সি তো দেখতেও পাচ্ছি না।"

কিছুদূর গিয়েই কিন্তু ট্যাক্সি দেখা গেল একটা এবং দিবস হাত তুলতে দাঁড়িয়ে পড়ল সেটা।

"থামালেন কেন, হেঁটেই যাই চলুন।"

"না, তোমার কষ্ট হচ্ছে যখন, দরকার কি।"

ট্যাক্সিটা কাছে আসতে কিন্তু দেখা গেল যে ড্রাইভারের পাশে ওড়না-পরা একটি তরুণী বসে রয়েছে। শুধু তাই নয় তরুণীটি অপ্রত্যাশিতভাবে দিবসকে সেলামও করলে। দিবস প্রথমে বিস্মিত হয়েছিল কিন্তু আর একটু কাছে গিয়ে চিনতে পারলে। দিন কয়েক আগে যে বেদের মেয়েটি কিরণের বাড়ির কাছে নাচছিল যাকে একটা টাকা দিয়েছিল সে, এ সেই। চোখে সুর্মা আর গায়ে ওড়না দিয়ে নূতন শ্রী খুলেছে। মেয়েটিকে সেলাম করতে দেখে রঙ্গনারও বিস্ময় কম হয়নি।

"মেয়েটি আপনাকে চেনে দেখছি।"

দিবস রঙ্গনার কথার জবাব না দিয়ে সেই মেয়েটিকেই বললে "ও চিনতে পেরেছি তোমাকে, তুমিই সেদিন রাস্তায় নাচছিলে না?"

"জী হাঁ। মগর অব ম্যয় নহী নাচতী হুঁ"—মেয়েটি হেসে জবাব দিলে এবং ড্রাইভারকে দেখিয়ে বললে—"ড্রাইভার সাব নে মুঝকো আপনী বিবি বানা লিয়া"—তারপর গ্রীবাভঙ্গি করে ড্রাইভারের দিকে চেয়ে হাসলে।

"বাঃ"—বেশ খুশি হয়ে উঠল দিবস। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে বলল, "আমি একটা ট্যাক্সি ভেবে তোমাদের দাঁড় করিয়েছিলাম। আচ্ছা তোমরা যাও, খুব খুশি হলাম। এদিকে ট্যাক্সিও তো দেখছি না।"

"চলিয়ে ম্যয় আপকো পৌঁছা দু'। কিত্‌নী দূর যাইয়ে গা?"

"শ্যামবাজার।"

"আ যাইয়ে।"

সারাটা রাস্তা রঙ্গনা আর একটি কথাও বলল না। দিবসও বলল না। পাশাপাশি নীরবেই বসে রইল দু'জনে। দু'জনের মনে কিন্তু একই কথা জাগছিল। দু'জনেই ভাবছিল—'হেরে গেলাম।'

দিবসের সম্বন্ধে ব্রজ যে খবরটা পেয়েছিল তা সূর্য চৌধুরীরও অজ্ঞাত রইল না। দিবস একটা মেসে সামান্য চাকর হয়ে আছে এ খবরে চৌধুরী মশায় বেশ বিচলিত হলেন একটু।

বিচলিত হলেও বাইরে কিন্তু তা প্রকাশ করবার উপায় ছিল না। ব্রজ এবং গোবিন্দ সাণ্ডেল দুজনের কাছেই তিনি 'ও-নিয়ে-আমি-মাথা-ঘামাতে-চাইনা-মোটেই' গোছের যে ভড়ংটা করেছিলেন তা ত্যাগ করে ছেলের জন্য দাপাদাপি করে বেড়াতে তাঁর লজ্জা করছিল। দ্বিতীয়ত দাপাদাপি করাটা নিরর্থকও মনে হচ্ছিল তাঁর। ঠিকানা না পেলে কোথায় তিনি ছুটোছুটি করবেন। তৃতীয়ত তাঁর বিশ্বাস ছিল দিবস কখনই এমন কিছু করবে না যা লজ্জাকর। সত্যিই মনে মনে তিনি প্রত্যাশা করছিলেন যে দিবসের ভবিষ্যৎ আচরণ তাঁর মুখ রক্ষা করবে। গোবিন্দ সাণ্ডেলকে জোর গলায় তিনি বলতে পারবেন—"দেখলে? আজকালকার ছেলেদের তুমি যা মনে কর তা নয় তারা।"

তবু তিনি বার কয়েক ট্রাম ডিপোয় গিয়ে কিরণকে ধরবার চেষ্টা করলেন কিন্তু ধরতে পারলেন না।

নিস্তারিণীও গিরিবালার দেখা পেলে না, তার ঠিকানাও মনে করতে পারলে না। তবে সে বলেছে গিরিবালার ঠিকানা সে থাকোর কাছ থেকে জোগাড় করতে পারবে। থাকোর সঙ্গে গিরিবালার খুব ভাব। থাকোর ঠিকানা নিস্তারিণী জানে, সেখানে গিয়েওছিল, কিন্তু থাকো তার মাসির বাড়ি গেছে। বর্ধমান জেলার কোন এক গ্রামে তার মাসি থাকে। দিন পনর পরে সেখান থেকে ফিরবে থাকো। তখন গিরিবালার ঠিকানা পাওয়া যাবে।

সুতরাং নিষ্ফল আক্রোশে ছটফট করা ছাড়া ব্রজর আর গত্যন্তর রইল না।

গভীর রাত্রে নিজের নির্জন ঘরটিতে একা জেগেছিল রঙ্গনা। উর্মি যে গানটা তাকে দিয়ে গিয়েছিল তাতেই সুর দিচ্ছিল সে গুনগুন করে। নিজের অন্তরের যে আকুলতাকে কিরণ দিয়েছিল ভাষা রঙ্গনার অন্তরের আকুলতা সুর দিচ্ছিল তাতে। গভীর নিশীথের অন্তরালে তার অন্তর যেন ধরতে চাইছিল সেই অধরাকে যে স্বপ্নে দেখা দেয় কিন্তু বাস্তবে ফোটে না। ফোটে না সে জানে, তবু গাইছিল—

শোন মর্ত্যের বনে শাখে শাখে
ডাকিছে বকুল যূথি চম্পা
মুগ্ধ কবির হিয়া ডাকে
ওগো, কর কর কর অনুকম্পা।

॥ দশম পরিচ্ছেদ ॥

সে যে অহংকার বশেই এত কাণ্ড করেছে রঙ্গনার কাছে একথাটা শুনে এবং স্বীকার করে দিবস যে দমে যায়নি তা নয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার আত্ম-জিজ্ঞাসাও জেগেছিল একটা। সভায় দাঁড়িয়ে যে আদর্শ সেদিন সে প্রচার করেছিল সে আদর্শকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করেও একথা তার মনে হচ্ছিল যে রিসার্চ করবার সুযোগ পেলে এ নিয়ে সে এত হৈ চৈ করত না। শুধু তাই নয় তার বাবা যদি তাকে কলেজে যাবার জন্য সেদিন অমন করে না বকতেন তাহলেও হয়তো করত না। দুদিন পরে হয়তো সে কলেজে যেতও। সত্যিই যেন এক টুকরো খড় কুটোর মতো ভেসে চলেছি আমরা অদৃশ্য এক স্রোতে, কোথা থেকে এক একটা ঢেউ আসছে আর ভাসিয়ে

নিয়ে যাচ্ছে আমাদের নব নব দেশে—এই ধরনের দার্শনিক কথাই মনে হচ্ছিল তার। রঙ্গনার সঙ্গে আকস্মিক দেখা এবং ক্রমশ মাখামাখি হওয়াটাকেও সে যদিও আর একটা অদৃশ্য তরঙ্গাঘাতের ফল স্বরূপই মনে করছিল তবু কিন্তু নিজের সঙ্গে বিচিত্র বোঝা-পড়াও চলছিল তার অহরহঃ। রঙ্গনাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে কল্পনা করে তার মানস-নয়ন যেমন স্বপ্নাতুর হয়ে উঠেছিল তেমনি জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তার অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী মনও। সে যেন স্বপ্নটাকেই যাচিয়ে দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছিল। গোপনে গোপনে যে আদর্শের ধ্বজাবাহকরূপে সে রঙ্গনার সামনে নিজেকে প্রকট করেছিল রঙ্গনা যদি এই ধ্বজাটাকে দেখে বিগলিত হয়ে পড়ত তাহলে হয়তো রঙ্গনার প্রতি তার আকর্ষণটা কমেই যেত। রঙ্গনা তার আদর্শটা মানুক এ অবশ্য সে চাইছিল, আদর্শটা সে সত্যি সত্যি মানবে কি না তা নির্ধারণ করবার জন্যে তার সঙ্গে আরও তর্ক করতেও প্রস্তুত ছিল সে, কিন্তু প্রতিবাদ করাতে সে চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিল। সাধারণ মেয়ে হলে 'বাহবা' দিত তাকে। সে তাব আদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল বলেই দিবসের অন্তরতম সত্তা যেন তাকে চুপি চুপি বলছিল—তোমার আদর্শের বিরুদ্ধবাদিনী হয়েও ও তোমাকে যদি চায়....। এর পর আর ভাবতে পারছিল না সে, আশা করতে পারছিল না। আদর্শটাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকবে সে ঠিক করে ফেললে, অন্য কোনও কারণে নয়, আদর্শের বিরোধ সত্ত্বেও রঙ্গনা তাকে চায় কি না এইটে দেখবার জন্যে। তার এক্‌স্‌পেরিমেন্ট-লোলুপ মন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল।

যে ছাত্রটি অঙ্ক পড়তে চেয়েছিল দিবস তার সঙ্গে দেখা করে দুপুরে পড়াবার ব্যবস্থা করে ফেললে তার পর দিনই। ছেলেটির বা তার গার্জেনরা আপত্তি করলে না এতে। সুতরাং মেসের কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যা আটটার পর গহনচাঁদের বাড়িতে সরোদ শিখতে আসার আর কোনো বাধা রইল না।

সন্ধ্যার পর গহনচাঁদের বাড়িতে গানের আসর খুব জমে উঠেছিল সে দিন। নবাগতা ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথমে যে ইমনের গৎটা গহনচাঁদের কাছে পেয়েছিল সেইটেই একযোগে বাজাচ্ছিল সেতার আর এস্রাজে। চমৎকার লাগছিল। গহনচাঁদ চোখ বুজে বসে শুনছিলেন। রমজান আর সীতারাম আনন্দে বিভোর হয়ে বাজিয়ে চলেছিল। চুনীলাল বারান্দায় ওৎ পেতে বসেছিল পূর্ববৎ, যদি কোনো নূতন ছাত্র বা ছাত্রী আসে এই আশায়। তার মনেও ইমন সাড়া তুলছিল, নিজের অজ্ঞাতসারেই তার পায়ের আঙুলগুলো গতের সঙ্গে তাল রাখছিল। খানিকক্ষণ বেজে গৎ থেমে গেল। চুনীলালেরও দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল একটা। কই, আজ আর নূতন কেউ এল না তো।

"আমার নাচটা দেখবেন আজ আর একবার?"

"বেশ তো।"

সবাই সরে বসল। মেজের উপর খড়ি দিয়ে আঁকা হল ময়ূর। ঊর্মি নাচতে লাগল। গহনচাঁদ মুখে নাচের বোলগুলো বলতে লাগলেন। রমজান সীতারাম বাজাতে শুরু করল আবার। বারান্দায় উপবিষ্ট চুনীলালও পায়ের পাতা নাচাতে নাচাতে সে কথা স্বীকার করলে মনে মনে।

ঊর্মির নাচ শেষ হতে গহনচাঁদ বললেন, 'হয়েছে অনেকটা, এইবার আবীর নিয়ে এস একদিন দেখা যাক আবীরের উপর ময়ূর ফোটাতে পার কি না।"

"রঙ্গনাদিকে আজ দেখছি না"—উর্মিই জিগ্যেস করলে প্রথমে।

"পড়াশোনা করছে বোধহয় ভিতরে। চুনী, রঙ্গনা কোথায়?"

চুনীলাল জানে রঙ্গনা কেন ভিতরে বসে আছে। সীতারাম রমজানও জানে। রঙ্গনা প্রসঙ্গ ওঠাতে তাদের চোখে চোখে একটা কথা হয়ে গেল। চুনীলাল রঙ্গনাকে যখন বকছিল তখন তারা বারান্দায় বসে তা শুনেছিল। গহনচাঁদ তখন বাড়ির ভিতরে আহ্নিক করতে ব্যাপৃত ছিলেন বলে শুনতে পাননি। চুনীলালের ব্যবহারে সীতারাম রমজান দুজনেই মনে মনে বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিল। না হয় একটা আয়না অসাবধানে ভেঙেই ফেলেছে তার জন্যে অত বকুনি কেন!

চুনীলাল ভিতরে আসতেই গহনচাঁদ আবার প্রশ্ন করলেন—"রঙ্গনাকে আজ দেখছি না? পড়াশুনা করছে নাকি?"

"না, তার রাগ হয়েছে। আয়না ভাঙার কথা বলেছিলাম বলে। এমন বিশেষ কিছুই বলিনি—এই এঁরা তো ছিলেন—"

সীতারাম এবং রমজান কিন্তু উভয়েই আড়চোখে চুনীলালের দিকে চেয়ে যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তাতে চুনীলালকে থেমে যেতে হল।

"আরে, একটা আয়না ভেঙেছে তো কি হয়েছে, ডেকে নিয়ে এস ওকে, বুঝলে?" —গহনচাঁদ বললে হেসে—"ডাক —"

"আজ্ঞে হ্যাঁ যাই।"

চুনীলাল চলে গেল। অকারণে কিংবা কেবল যে আয়না ভাঙার জন্যে চুনীলাল রঙ্গনাকে বকেছিল তা নয়। সংগীত ভবনের টাকা খরচ করে রঙ্গনা ছবি কিনেছে, সিনেমা দেখেছে, ট্যাক্সি চড়ে এসেছে, গিরিডি যাবে বলে বায়না ধরেছে। যাবেও, ছাড়বে না। আয়নাটা দুদিন পরে কিনলেও তো চলে। চুনীলাল নিজের হাড় বা মাংসের কথা আর চিন্তাই করছিল না, সে সব তো বহুদিন আগেই গেছে, অবশিষ্ট আছে শুধু চামড়াখানা, সেইটেকেই প্রাণপণে বাঁচাবার চেষ্টা করছে চুনীলাল। কিন্তু তা-ও বাঁচান যাবে না, ওই চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে তবে এরা ছাড়বে। এই ধরনের চিন্তা করতে করতে চুনীলাল বাড়ির ভিতর গেল। গিয়ে দেখলে রঙ্গনা নিজের পড়ার ঘরে খিল দিয়ে বসে আছে। খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইল চুনীলাল। চোখ দুটো চক্‌চক্ করতে লাগল।

"রঙ্গনা, জামাইবাবু ডাকছে তোকে।"

ভিতর থেকে কোনো সাড়া এলো না।

"বেশ তো, কাল আয়না কিনেই আনিস। আমি কি কিনতে মানা করেছি তোকে—এই রঙ্গনা শুনছিস?"

"তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।"

চুনীলাল ভ্রূকুঞ্চিত করে আরও ক্ষণকাল চেয়ে রইলেন দরজাটার দিকে। তারপর ছাতে চলে গেলেন নির্জনে বিড়িটি ধরিয়ে চিন্তা করবার জন্যে।

একটু পরে রঙ্গনা যখন বাইরে এল তখন তার মুখ দেখে মনে হল না যে একটু আগে তার মনে তুফান বইছিল। সপ্রতিভ মুখে মৃদু হেসে সে বললে, "আমাকে ডাকছিলেন বাবা?"

"কি করছিলি ভিতরে?"

"পড়ছিলাম।"

"ঊর্মি খুঁজছে তোকে।"

"সেই গানটার কথা জিগ্যেস করছিলাম। কালকেরটা নয়, সেই সেদিন যেটা দিয়েছিলাম—"

"ও, সেটার সুর বসিয়েছি একটা। বাবাকে এখনও শোনানো হয়নি।"

"শোনা তাহলে।"

রমজান এবং সীতারাম রঙ্গনাকে দেখেই অকারণ পুলকে পুলকিত হয়েছিল মনে মনে। তাদের উদ্ভাসিত মুখে সে ভাবটা ফুটে উঠলেও কিন্তু নীরব ছিল তারা। গানের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়াতে সীতারাম আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না।

"হাঁ হাঁ গাইয়ে গাইয়ে শুনা যায়।"

"জরুর"—রমজানও সায় দিলে সোৎসাহে।

রঙ্গনা বসল। গহনচাঁদ স্নেহভরে চেয়ে রইলেন তার দিকে। আশ্চর্য, এর মধ্যেই গানে সুর দিতে শিখেছে! সেদিনকার সে গানটাতে বেশ চমৎকার সুর দিয়েছিল। রঙ্গনা হার্মোনিয়মটা টেনে নিয়ে বাজাতে লাগল।

খানিকক্ষণ বাজিয়ে গহনচাঁদের দিকে চেয়ে বলল, "আমার লজ্জা করছে এত লোকের সামনে গাইতে।"

"লজ্জা কি! সবাই তো ঘরের লোক। সেদিন কনফারেন্সে অত লোকের সামনে গাইলি—"

"ভালো হয়নি সুরটা।"

"শুনিই না।"

রঙ্গনার সত্যিই গান গাইতে ইচ্ছে করছিল না। মনের ভিতর কি যেন একটা তোলপাড় করছে—যা অযৌক্তিক কিন্তু অনিবার্য, যা সে বলতে পারছে না কিন্তু অনুভব করছে। কয়েকদিন থেকেই মনে হচ্ছে একটা অদৃশ্য জাল যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তার দিকে, তাকে ধরা পড়তেই হবে, তার সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা চিন্তা কল্পনাকে বিসর্জন দিয়ে চিরাচরিত প্রথায় যূপকাষ্ঠে বাড়িয়ে দিতেই হবে গলাটা। নারীর স্বাধীনতা নেই—বাল্যে পিতামাতার, যৌবনে স্বামীর, বার্ধক্যে পুত্রের অধীন হয়ে থাকাটাই তার জীবনের চরম সার্থকতা। এদেশের সবাই একথা মেনেছে, তাকেও মানতে হবে। প্রতিটি পয়সার জন্য তাকে হাত পাততে হবে অপরের কাছে...।

ঘাড় হেঁট করে অনেকক্ষণ ধরে হার্মোনিয়াম বাজিয়ে তার পরে গানটা ধরলে সে। গানটা ধরবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু তার মনের রঙ বদলে গেল। কিরণের কবি মন যে আশার রঙে আলোকিত হয়ে উঠেছিল, যে রঙ সে তার গানের প্রতিটি কথায় মাখিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল, সেই রঙ রঙ্গনার মনেও সঞ্চারিত হল। কিরণের গানের কথাগুলো তারই মনের কথা হয়ে উঠল যেন। আবেগভরে প্রাণ দিয়ে সে গাইতে লাগল—মিথ্যা জেনেও স্বপ্নটাকে আঁকড়ে ধরতে চাইল।

কার ডাকে ওগো কার
তিমির রজনী শেষে
খুলিছে উষার দ্বার।
সুর জাগে মনে মনে
রঙ লাগে বনে বনে
কার কর-পরশনে
কাঁপিছে বীণার তার
কমল কলির দলে
জাগে সুরভির আশা।
আঁধারের বুকে জ্বলে
কোন সে আলোর ভাষা
বিজন পথের বাঁকে
এলো কে চিনি না তাকে।
সহসা কাহার ডাকে
ঘুম ভাঙে তমসার।

"চমৎকার হয়েছে! বাঃ—"

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন গহনচাঁদ। সীতরাম ও রমজানও প্রায় সমস্বরে বলে উঠল—"সাবাস!"

ঠিক এই সময় দিবস এসে হাজির হল দ্বারপ্রান্তে। তার হাতে সরোদ। বাইরে কার দিকে চেয়ে যেন সে বললে—"ওটা বাইরেই থাক। দেওয়ালে ঠেসিয়ে রেখে দাও। এই নাও তোমার ভাড়া।"

একটি কুলি জাতীয় লোককে পয়সা দিয়ে দিবস ঘরে এসে ঢুকল।

"ও, তুমি, এস এস। আর একটু আগে এলে রঙ্গনার সুর দেওয়া চমৎকার গান একটা শুনতে পেতে। এস, বস।'

গহনচাঁদের আহ্বানে দিবস হাসিমুখে এসে বসল সপ্রতিভভাবে। কিন্তু মনে মনে তখনও সে উৎকণ্ঠিত হয়েছিল। কারণ যে এক্‌স্‌পেরিমেন্টটা সে করতে যাচ্ছিল তার ফলাফলটা কি হবে তা তখনও অনিশ্চিত ছিল তার কাছে।

দিবস আসাতে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা ভাবল এইবার বোধহয় সরোদের ক্লাস আরম্ভ হবে। তাছাড়া তাদের সকলের যাওয়ার সময়ও হয়েছিল, একে একে চলে গেল সবাই। ঊর্মিও রঙ্গনাকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে কি বললে (খুব সম্ভবত এই গানটাও যাতে রেকর্ড হয় সেই সম্বন্ধে কিছু একটা) তারপর চলে গেল। ঊর্মি চলে যাবার পর বারান্দার দেওয়ালে ঠেস্যানো প্রকাণ্ড আয়নাটা রঙ্গনার চোখে পড়ল।

"আয়নাটা কার? আপনি এনেছেন নাকি?"—ঘরে ঢুকে দিবসের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে রঙ্গনা।

"হ্যাঁ।"

তারপর গহনচাঁদের দিকে ফিরে বললে, ‘‘আপনাকে কিন্তু অনুমতি দিতে হবে।’’

‘‘কিসের?’’

গহনচাঁদের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

‘‘সেদিন দেখে গেলাম রঙ্গনা তার আয়নাটা ভেঙে ফেলেছে, আমি তাকে একটা আয়না কিনে দিচ্ছি, এতে আপনি আপত্তি করতে পারবেন না।’’

‘‘না, না, আপনি কেন—এ অন্যায় কিন্তু—’’

এই পর্যন্ত বলেই রঙ্গনা থেমে গেল।

গহনচাঁদ হাসিমুখে চুপ করে রইলেন ক্ষণকাল, তারপর বললেন—‘‘তুমি দিতে চাইছ দাও, আপত্তি করব না। কিন্তু তুমি যদি মনে কর যে এই ভাবে বাঁকা পথে আমাকে প্রণামী দেওয়া হল, তাহলে ভুল করবে। সত্যিই যদি আমার শিষ্য হতে চাও তাহলে একটা কথা জেনে রেখ, গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্ক প্রাণের। ওতে কোনো রকম ভেজাল চলবে না।’’

‘‘সে তো ঠিকই। আমি সে ভাবে আনিনি। আমি—’’

গহনচাঁদের পরবর্তী প্রশ্নে আয়না-প্রসঙ্গ চাপাই পড়ে গেল।

‘‘তুমি সরোদ কি বাজিয়েছ আগে?’’

‘‘মাস ছয়েক সেধেছি।’’

‘‘শোনাও দেখি একটু।’’

দিবস সারোদটা বাঁধতে লাগল। এই আয়নার ব্যাপারে একটা ঘটনা কিন্তু ঘটে গেল যা সকলের চোখ এড়িয়ে গেলেও সামান্য নয় খুব। রমজান এবং সীতারাম উভয়েই দিবসের সম্বন্ধে খুব সশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল। তারা মুখে যদিও কিছু বলল না, কিন্তু তাদের চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল সে ভাষা। তারা দিবসের সম্বন্ধে কিছু না জেনেও কৃতনিশ্চয় হল যে ছেলেটি ‘রইস্’ অর্থাৎ অভিজাত-বংশীয়। তাদের শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় আরও বেড়ে গেল একটু পরে দিবস যখন সরোদে বসন্ত আলাপ শুরু করলে। দিবস যে অমন চমৎকার সরোদ বাজাতে পারবে তা গহনচাঁদও প্রত্যাশা করেননি। খুব খুশি হয়ে উঠলেন তিনি। রঙ্গনারও নিশ্চয় ভালো লাগত, কিন্তু সে উঠে গিয়েছিল। দিবসের সামনে বসে থাকতে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল সে। উঠে গিয়ে সে ঘরে খিল দিয়েছিল আবার। আর একটি ঘটনাও ঘটল নেপথ্যে। বিড়িটি শেষ করে ছাত থেকে নেমে এসে চুনীলালও আয়নাটি দেখতে পেলে বারান্দায়। ‘ও, এর মধ্যে কেনা হয়ে গেছে’ এই ভাষা ফুটে উঠল তার চোখের দৃষ্টিতে। বাইরের ঘরে বসন্তের গৎ খুব জমে উঠেছে তখন। চুনীলাল একবার উঁকি মেরে দেখলে কে বাজাচ্ছে। দিবসকে দেখে মনটা আরও অপ্রসন্ন হয়ে উঠল তার। ও সেই ধূর্ত ছোকরা এসেছে দেখছি, ওকে দিয়েই রঙ্গনা আয়নাটা আনিয়েছে ঠিক। একটি পয়সা খরচ না করে ওস্তাদ হতে চায় ছোকরা—এই ভাবটা মনের ভিতর খেলে যেতেই বসন্তের সমস্ত মাধুর্য ব্যর্থ হয়ে গেল তার কাছে। সক্রোধে আর একটা বিড়ি বার করে দেশলায়ের উপর সেটা ঠুকতে ঠুকতে বেরিয়ে গেল সে রাস্তায়।

বসন্তের গৎ শেষ হতেই গহনচাঁদ, সীতারাম এবং রমজান তিনজনেই সমস্বরে বাহবা দিয়ে উঠলেন। গহনচাঁদ সোৎসাহে বললেন, ‘‘ছ’ মাসের মধ্যে বেশ তো দখল হয়েছে তোমার। হবে, চেষ্টা করলে ভালো হাত হবে তোমার। দরবারি কানাড়া জান?’’

"না।"

"ওই গৎটা তাহলে শেখ। রঙ্গনার খাতায় টোকা আছে। রঙ্গনা কোথা গেলি। রঙ্গনা, ও রঙ্গনা—"

"যাই—"

নেপথ্যে রঙ্গনার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"রঙ্গনার খাতা থেকে গৎটা টুকে নাও, তারপর আমি বাজিয়ে দেখিয়েও দেব।"

রঙ্গনা এসে হাজির হল।

"তোর খাতায় দরবারি কানাড়ার যে গৎটা টোকা আছে সেটা এঁকে দে তো।"

দিবস বললে, "আমি সঙ্গে কোনো খাতা আনিনি, কাল এসে টুকে নিয়ে যাব।"

"কাল যে আমি গিরিডি যাচ্ছি।"

"ও কালই গিরিডি যাবি না কি তোরা?"—গহনচাঁদ প্রশ্ন করলেন।

"হ্যাঁ"—তারপর দিবসের দিকে চেয়ে রঙ্গনা বললে, "খাতাটা আপনি না হয় নিয়ে যান।"

"সেই ভালো। টুকে দিয়ে যাব।"

রঙ্গনা খাতা আনতে ভিতরে চলে গেল আবার।

"তুমি কি কর?"—হেসে প্রশ্ন করলেন গহনচাঁদ।

"চাকরি।"

"ও।"

এর বেশি আর কিছু জানবার কৌতূহল হল না তাঁর। দিবস সুরজ্ঞ এবং ভদ্রলোক এর বেশি আর কোনও পরিচয়ের প্রয়োজনই ছিল না তাঁর। রঙ্গনা ফিরে এল একটু পরে।

"এই নিন"—খাতাটা দিয়েই চলে গেল সে।

খাতাটা নিয়ে দিবস গহনচাঁদকে বললে, "আজ তবে উঠি?'

"এস।"

দিবস বেরিয়ে যেতে রঙ্গনাও ভিতর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল আর একটা দ্বার দিয়ে।

"আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।"

তড়িতস্পৃষ্টবৎ ফিরে দাঁড়াল দিবস।

"কি কথা?"

"আপনি বড়লোকের ছেলে, ইচ্ছে করলেই একটা আয়না কিনতে পারেন তা মানছি। কিন্তু সে ইচ্ছেটা আপনি এমনভাবে আস্ফালন করবেন তা প্রত্যাশা করিনি। আয়নাটা ফিরিয়ে দিয়ে আমি আপনাকে অপমান করতে চাই না। শুধু একটা অনুরোধ করছি উপহার দেবার ছুতোয় আমাদের দারিদ্র্যকে এমনভাবে আর উপহাস করবেন না।"

কথাগুলো বলেই চলে গেল রঙ্গনা।

স্মিতমুখে দিবস খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। একটা অবর্ণনীয় আনন্দে তার সমস্ত মন যেন পাখা মেলে উড়ছিল। তার এক্সপেরিমেন্ট সফল হয়েছে! না, রঙ্গনা আজকালকার মেয়েদের মতো হ্যাংলা নয়, তার আত্মসম্মানবোধ আছে। আয়নাটা পেয়ে সে খুশি হয়নি, ক্ষুব্ধ হয়েছে এই আনন্দে মশগুল হয়েই সে সমস্ত রাস্তাটা হয়তো চলে যেত।

কিন্তু পরের মোড়েই দেখা হয়ে গেল চুনীলালের সঙ্গে। দিবসের সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই চুনীলাল দাঁড়িয়ে ছিল ওৎ পেতে।

"শিখলেন সরোদ?" হাসিমুখেই এগিয়ে এল চুনীলাল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

নিমেষের মধ্যে দিবসের মনে পড়ে গেল আগের দিনের ঘটনাটা এবং সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত পুরে সে মানিব্যাগটা বার করে ফেললে।

"আপনার আপিসে এসে মাইনে জমা করা হয়ে উঠবে না। এখনই টাকাটা নিয়ে নিন। রসিদটা পরে না হয় নিয়ে নেব আপনার কাছ থেকে। দশ টাকা করে মাইনে তো? অ্যাডমিশন ফীও লাগে না কি কিছু?

চুনীলাল এটা প্রত্যাশা করেনি। একটু থতমত খেয়ে গেল। এত দ্রুতবেগে একটা লোকের সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তন করতে সে চায়ও না, অভ্যস্তও নয়।

"দাঁড়ান"—ভ্রূকুঞ্চিত করে চকিতে সে একবার দিবসের মুখের দিকে চাইলে, তারপর একটু হেসে বললে—"দাঁড়ান, দাঁড়ান। হয়তো আপনিই আমার কাছে পাবেন কিছু। আয়নাটা তো আপনি এনেছেন, কত দাম নিলে?"

"ওর দাম দিতে হবে না। ওটা আমি রঙ্গনাকে দিলুম।"

"দিলেন? মানে?"

চুনীলালের দুই ভ্রূর মাঝখানে চার পাঁচটা গভীর রেখাপাত হয়ে গেল। ছোকরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মাইনে দিতে চাইছে, আয়নার দাম নিতে চাইছে না, সেদিন রঙ্গনার সেতারের দামটাও দিয়েছিল না কি।.... যে সন্দেহটা এক্ষেত্রে অভিভাবক শ্রেণীর লোকেদের স্বভাবতঃই হওয়া উচিত তা যে চুনীলালের হল না তা নয়, কিন্তু বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে সেটাকে খুব বেশি আমোল দেওয়াও সংগত মনে হল না তার। চুপ করে চেয়ে রইল সে।

দিবস হেসে বললে, "মানে টানে কিছু নেই। আমার সামনেই আয়নাটা ভেঙে গেল সেদিন, এমনি দিলাম তাই—"

"ভালোই হল,—চুনীলালও হেসে জবাব দিলে—"সামনেই ওর বিয়ে তো, কাজে লেগে যাবে।"

"বিয়ে নাকি?"

"হ্যাঁ।"

চুনীলাল আর একবার চাইলে দিবসেব মুখের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে। কিন্তু এমন কিছুই দেখতে পেলে না যা সন্দেহজনক।

"দশ টাকা দেব? না আরও কিছু লাগবে?"

"না, দশ টাকাই।"

টাকাটা দিয়ে নমস্কার করে দিবস চলে গেল। নোটটা হাতে করে তার প্রস্থান পথের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুনীলাল। তার হঠাৎ কেমন যেন আশা হল, মনে হল মেঘ কেটে যাচ্ছে বোধহয়, এবার সুরাহা মিলবে একটা।

দিবসের ঠিকানাটা পাওয়া গেলে কি ভাবে অগ্রসর হবে তা মনে মনে এঁচে রেখেছিলেন সূর্য চৌধুরী। ব্রজ বা নিস্তারিণীর উপর তিনি নির্ভর করছিলেন না ঠিক—যদিও সেদিক থেকেও ঠিকানাটা পাবার সম্ভাবনা ছিল—তিনি আশা করছিলেন কিরণ এসে তাকে ঠিকানাটা দিয়ে যাবে। কিরণের সঙ্গে তাঁর হঠাৎ একদিন রাস্তায় অপ্রত্যাশিত ভাবেই দেখা হয়েছিল। কিরণের কাছ থেকে যে উত্তরটা তিনি পেয়েছিলেন তাও অপ্রত্যাশিত। তবু তিনি প্রত্যাশা করছিলেন। কিরণকে যখন তিনি জিগ্যেস করলে—"দিবস কোথায় থাকে জানো?"

কিরণ উত্তর দিলে—"হ্যাঁ জানি।"

"ঠিকানাটা দাও তো।"

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে কিরণ একটু হেসে বললে, "মাপ করবেন আমাকে। তার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে তার ঠিকানা আপনাকে জানাব না। তার সঙ্গে দেখা হলে ফের তাকে জিগ্যেস করব, সে যদি আপত্তি না করে তাহলে ঠিকানাটা জানিয়ে আসব আপনাকে।"

"বেশ!"

আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে এর বেশি আর কিছু বলা চলে না। একটু হেসে উকিল সূর্য চৌধুরী একটি টোপ শুধু ফেলে এসেছিলেন।

"তাকে বোলো যে তার মন্দ যাতে হয় এমন কিছু কখনও করিনি, এখনও করবার ইচ্ছে নেই। তবে তোমাদের চেয়ে আমাদের বয়স বেশি আভিজ্ঞতাও বেশি। আমাদের অভিজ্ঞতা যদি তোমরা মূল্যহীন বলে মনে কর, নিও না। কিন্তু তার জন্যে ঘর ছাড়া হবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। নূতন যুগের নূতন আদর্শ সত্যিই যদি যুগান্তকারী হয় তা মেনে নিতে আমার অন্তত কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু তার জন্যে এমন একটা বেয়ারা কাণ্ড করবার দরকার কি? আমি তার বাবা এটা সে ভুলে যাচ্ছে কেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ সে তো ঠিকই। আমি বুঝিয়ে বলব তাকে।"

কিরণ যখন চলে গেল তখন তার উপর গভীর একটা শ্রদ্ধা হল সূর্য চৌধুরীর। তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস হল যে কিরণ নিশ্চয় দিবসকে বুঝিয়ে বলবে এবং ঠিকানাটা দিয়ে যাবে। অবশ্য একটা ভয় তাঁর ছিল। কিরণের কাছে যে যুক্তিটা তিনি দিয়েছিলেন সেটা এত দুর্বল যে তা বলতে নিজেরই বাধছিল তাঁর, দিবসের কাছে ও যুক্তি কি টিকবে? অত বড় ঐতিহাসিক সব উদাহরণ রয়েছে—বুদ্ধ, চৈতন্য, বিবেকানন্দ, তাঁরা আদর্শের জন্যেই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন, একথা দিবসের মনে পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। তাছাড়া দিবস যে কেন ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে তা কি তিনি জানেন না? ঝরনা যে কারণে পাহাড় ফেটে বেরোয় দিবসও সেই কারণে বেরিয়ে গেছে—প্রিয়বন্ধু গোবিন্দ সাণ্ডেলকে আসল কারণটা প্রথম দিনই তিনি বলেছিলেন। ও যে এখন কি করবে কোথায় যাবে কোন্ রাস্তা নেবে তা নিজেই বোধহয় ও জানে না। বেগটাই ওর প্রধান সম্বল এবং সেটা দুর্বার। এই সবই তিনি জানেন। তবু সেদিন ওই দুর্বল যুক্তিটা তিনি কিরণের কাছে পেশ করেছিলেন, ইচ্ছে করেই পেশ করেছিলেন, তার কারণ ওকালতি করতে করতে এ অভিজ্ঞতাটা তাঁর হয়েছে যে অতিশয় দুর্বল যুক্তিও অনেক সময় বড় বড় জাঁদরেল হাকিমের মন টলিয়ে দেয় যদি তা আঁতে ঘা দিতে পারে। এই কথাগুলো হয়তো দিবসের আঁতে ঘা দিতে পারবে। এ শুনে দিবস হয়তো ফিরেও আসতে পারে। ফিরে যদি না আসে

ঠিকানাটা জানাতে অন্তত তার আপত্তি হবে না। আর একটা বিচিত্র ব্যাপারও ঘটছিল তাঁর মনে। সূর্য চৌধুরীর মনের একটা অংশ যদিও সাগ্রহে কামনা করছিল যে দিবস ফিরে আসুক, আর একটা অংশ কিন্তু সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল যে বিদ্রোহী দিবস এমন একটা কিছু করে ফেলুক যাতে গোবিন্দ সাণ্ডেলের মুখটি চুন হয়ে যায়। সেই 'এমন একটা কিছু' যে ঠিক কী জাতীয় জিনিস হবে তা সূর্য চৌধুরীর কল্পনাতীত ছিল, কিন্তু তা যাই হোক মহিমাময় যেন হয় এই তিনি আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন সর্বান্তঃকরণে। তাকে বিষয়-সম্পত্তি থেকে চ্যুত করবার ভয় দেখালেই সে সুট সুট করে ফিরে আসবে গোবিন্দ সাণ্ডেলের এই ধারণাকে ভূশায়ী করে দেবার মতো একটা জোরালো প্রমাণ তিনি আশা করছিলেন দিবসের আচরণ থেকেই। দিবস তাঁর এ আশা কি পূর্ণ করবে? যদি না-ও করে—(তাঁর উকিল মন অন্যান্য সম্ভাবনাগুলোর সম্বন্ধে উদাসীন ছিল না)—তাহলে ঠিকানা পাওয়ার পর কি করবেন তা তিনি মোটামুটি ভেবে রেখেছিলেন। ব্রজ তাঁকে যতটা নিশ্চিন্ত ভাবছিল ততটা নিশ্চিন্ত তিনি ছিলেন না। দিবস মেসে যে একটা সামান্য চাকর হয়ে আছে এ খবর বিশ্বাসই করছিলেন না তিনি, খবরটা নিতান্তই বাজে উড়ো-খবর মনে হচ্ছিল তাঁর। দিবস অনায়াসেই একটা টিউশনি জুটিয়ে নিতে পারবে, আর কিছু না পারুক, সে মেসের চাকর হতে যাবে কেন? কিন্তু দিবসের বক্তৃতার কথাগুলো মনে পড়ে মাঝে মাঝে আবার সন্দেহও হচ্ছিল। কি জানি কিছুই বলা যায় না—! ঠিক খবর না পাওয়া পর্যন্ত এ সংশয়ের মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। ঠিকানা না পেলে ঠিক খবরও পাওয়া যাবে না। তিনি ভেবে রেখেছিলেন ঠিকানা পেলে তিনটি উপায়ের একটি অবলম্বন করবেন। প্রথম চিঠি লেখা যেতে পারে। কিন্তু এই চিঠি লেখা ব্যাপারটায় খুব বেশি উৎসাহ পাচ্ছিলেন না তিনি। তাঁর উকিল-বিবেকের সঙ্গে আত্মসম্মানবোধ মিলে গোপনে গোপনে নিরুৎসাহিত করছিল তাঁকে। লিখিত কিছু করাটা উচিত হবে কি না দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ভাবছিলেন তিনি। আবেগের মুখে বা অনবধানতাবশত এমন কিছু হয়তো লিখে ফেলতে পারেন যার জন্যে পরে অনুতাপ করতে হতে পারে। দ্বিতীয়ত, সেখানে যাওয়া যেতে পারে। নিজেই যেতে পারেন তিনি। কিন্তু এইখানেই একটা ভয় ছিল তাঁর, যদিও এই ভয়টার বিরুদ্ধে নিজের সঙ্গেই তর্ক করছিলেন তিনি—(দিবসের মতো ছেলে তাঁকে কি অপমান করতে পারে, একি সম্ভব!)—তবু ভয়টা ছিল এবং তার মূলে ছিল ওই আত্মসম্মানবোধ। তৃতীয়ত, নিজে না গিয়ে অপর কাউকে পাঠানো যেতে পারে। কাকে পাঠাবেন তা-ও নির্বাচন করে রেখেছিলেন মনে মনে। ব্রজ কিংবা গোবিন্দ সাণ্ডেলকে নয়। কারণ প্রথমত এ দু'টি লোকের কাছে দিবসের সম্বন্ধে যে আপাত-ঔদাসীন্য তিনি বহাল রেখেছেন তা ক্ষুণ্ণ হবে, দ্বিতীয়ত, এদের মধ্যে যে কোনও একজন গেলে উদ্দেশ্যটিও ব্যর্থ হয়ে যাবে। দিবস যদিও বা আসত এদের জন্যেই আসবে না। প্যাচপেচে ভাবোচ্ছ্বাস দিবস সহ্য করতে পারে না একেবারে। ব্রজ হয়তো গিয়ে বুক চাপড়ে হাউ হাউ করে এমন কাঁদতে শুরু করে দেবে যে দিবসকে সরে পড়তে হবে বাধ্য হয়ে। ঠিকানাই বদলে ফেলবে হয়তো আবার। আর গোবিন্দ সাণ্ডেলকে দেখলে তো বদলে ফেলবেই। সুতরাং এই দুটি লোক যদিও হিতৈষী এবং সহজলভ্য তবু এদের দিবসের কাছে পাঠাবার কথা চিন্তাও করলেন না তিনি। তিনি তাঁর ভাগ্নে ঘণ্টুর কথা ভেবে রেখেছিলেন। ঘণ্টু আজকালকার ছেলে, দিবসের প্রায় সমবয়সীও। তাকে পাঠালে বরং কাজ হতে পারে। ঘণ্টুকে চিঠি লিখলেই সে

আসবে। কিন্তু তাঁর নিজেরও যেতে ইচ্ছে করছিল মাঝে মাঝে। এ বিষয়ে এখনও মতিস্থির করতে পারেননি বলেই ঘণ্টুকে চিঠি লেখেননি।

সূর্য চৌধুরীর মানসিক পরিস্থিতি যখন এই ধরনের অনিশ্চয়তার দোলায় দোদুল্যমান তখন গোবিন্দ যে খবরটি আনলেন তাতে দোলাটা থেমে গেল হঠাৎ।

"শুনেছ হে, যা ভেবেছিলাম আমি ঠিক তাই!"—এই গৌরচন্দ্রিকা করে গোবিন্দ সাণ্ডেল ঢুকলেন এসে।

"কি?"

"যা বলেছিলাম তাই। একটি আধুনিক মেয়েকে নিয়ে তোমার আধুনিক ছেলে রাত দুপুরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়।"

"কে বললে তোমাকে?"

"জগু সেন। স্বচক্ষে দেখেছে।"

"ভুল দেখেছে।"

"জগু সেন ভুল দেখবার লোক নয়। সে স্পষ্ট দেখেছে দিবস একটি মেয়ের সঙ্গে হাসাহাসি করতে করতে চলেছে ফুটপাথের উপর দিয়ে।"

গোবিন্দ সাণ্ডেল সবিস্তারে এবং সালংকারে বর্ণনা করলেন ঘটনাটির। শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন সূর্য চৌধুরী। তারপর মৃদু হেসে পা দুলিয়ে বললেন, "বিশ্বাস করলুম না।"

"দেখ, জেগে যে ঘুমোয় তাব ঘুম ভাঙানো শক্ত। জগু সেনের কথা অবিশ্বাস করবার মানে? তাকে তুমি মিথ্যেবাদী বলতে চাও?"

"না, জগু সেন হয়তো ঠিকই দেখেছে। ঘটনাটা হয়তো ওই, কিন্তু তুমি ওতে রঙ চড়িয়ে যেটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ সেটা আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই।"

"তা না করবারই বা হেতু কি?"

"যথেষ্ট প্রমাণ নেই। তা ছাড়া দিবসকে আমি চিনি।"

"তাহলে আমার আর বলবার কিছু নেই। আমি উঠলুম।"

গোবিন্দ সাণ্ডেল বাড়ি গেলেন না। তিনি গেলেন বেলেঘাটার একটা মেসে। তাঁর এক দূর সম্পর্কের শালা তাঁকে বলেছিল যে বেলেঘাটার ঐ মেসটা না কি যত ফেপারি লোকের আড্ডা। যদি দিবসকে সেখানে পাওয়া যায় এই আশায় গেলেন তিনি সেখানে। কিন্তু সেখানে যে যাচ্ছেন তা সূর্য চৌধুরীকে বলে গেলেন না। গোবিন্দ সাণ্ডেলও বন্ধুর প্রতি কর্তব্যবোধে দিবসকে খুঁজছেন রোজই। কিন্তু গোপনে গোপনে। তাঁরও কেমন একটা রোক চড়ে গিয়েছিল ভিতরে ভিতরে ছেলেটাকে খুঁজে বার করতেই হবে।

গোবিন্দ সাণ্ডেল চলে গেলে সূর্য চৌধুরী ঘণ্টুকে আসবার জন্যে চিঠি লিখলেন।

গভীর রাত্রি। দ্বিতলের একটা ঘরে গহনচাঁদ একা অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। আলো জ্বেলে রঙ্গনা সন্তর্পণে এসে ঢুকল। খানিকক্ষণ চেয়ে রইল ঘুমন্ত পিতার মুখের দিকে। শান্ত প্রসন্ন মূর্তি।

"বাবা!'

"কে, ও রঙ্গনা, কি?"

"তোমার কাছে কিছু টাকা আছে কি?"

"কেন ক'টাকা চাই, টাকার কি দরকার এত রাত্রে?"

"এখন দরকার নেই। কাল সকালে তো আমি গিরিডি যাব—তাই—"

"ও। চুনী বলেছিল টাকা দিয়ে দেবে সে।"

"মামার কাছ থেকে টাকা নেব না আমি।"

"কেন, কি হল, ঝগড়া হয়েছে বুঝি?"

রঙ্গনা হাঁটু গেড়ে বিছানার পাশে বসে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল।

"এই দেখ এই দেখ, কি হয়েছে বল্ না?"

রঙ্গনা কিন্তু কিছুই বলল না। নিজের কাছে সে নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। গিরিডি যাওয়াটা এমন বিশেষ কোনও প্রয়োজনীয় ব্যাপার নয় যার জন্যে এত হাঙ্গামা করতে হবে। কলেজের মেয়েরা আমোদ করে যাচ্ছে সে-ও যাবে বলেছে। মামা আরবার বোলপুর যেতে আপত্তি করেননি তো। এখন দোকানটা ফেল পড়ার পর থেকে কেমন যেন হয়ে গেছেন। মামীমা রাগ করে চলে গেছেন বাপের বাড়ি। মামা এবারও টাকা দিতে চাইছেন কিন্তু সে নেবে না। আয়নার কথা অমনভাবে বলছেন কেন তিনি? সে কি দিবসবাবুকে আয়না আনতে বলেছিল? খানিকক্ষণ বালিশে মুখ গুঁজে থেকে রঙ্গনা অবশেষে উঠে দাঁড়াল।

"কি হয়েছে ব্যাপারটা?"

"থাক আর টাকা চাই না। গিরিডি যাব না।"

"কটা টাকা চাই তোর?"

গহনচাঁদ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন।

"আর টাকার দরকার নেই। গিরিডি নাই গেলাম। কথা রাখতে পারলাম না। বলে মেয়েরা একটু ঠাট্টা করবে, তা করুক।"

"টাকা দিচ্ছি তোকে। ক'টা টাকা চাই বল্ না। আবার চুপ করে আছে! কত চাই?"

"গোটা পনের হলেই হবে।"

"আমার কাছে দুখানা দশটাকার নোট আছে, তাই নিয়ে যা।"

"নাই গেলাম।"

"না, না যা। সবাই মিলে আমোদ করে ঠিক করেছিস যখন, যা। কাল সকালেই গাড়ি নাকি?"

"হ্যাঁ।"

সহসা রঙ্গনা গহনচাঁদের গলা জড়িয়ে ধরে তার কোলে বসে কাঁধে মাথা রাখলে। গহনচাঁদ দু হাত দিয়ে তাকে বেষ্টন করে বলে উঠলেন, "দেখ, দেখ পাগলীর কাণ্ড দেখ। তুই কি আর ছোট আছিস যে কোলে নেব?"

একটু পরে রঙ্গনা নেবে গেল। নীচের ঘরে, দিবসের দেওয়া আয়নাটায় নিজের প্রতিফলিত মূর্তির দিকে চেয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। নিজের চেহারা দেখছিল না, দিবস তাকে কি চক্ষে দেখছে তাই কল্পনা করছিল সে। দিবসের চক্ষে সে কি কেবল এই দেহটা? না, আর কিছু? তার অসংখ্য সংগত অসংগত দাবির ফর্দ কি দিবস কল্পনা করেছে কোনও দিন?

দুঃসময়ে তাকে রক্ষা করবার সামর্থ্য আছে কি তার? পরমুহূর্তেই তার মনে হল এ ধরনের চিন্তা কেন আসছে মনে! দিবস তো এমন কিছুই প্রকাশ করেনি যা......ছি, ছি, ভারী অন্যায়। লজ্জিত হয়ে ছুটে চলে গেল সে পাশের ঘরে।

দিবস এবং রঙ্গনার আলাপ যে ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে ঊর্মির মুখে এই সংবাদ পেয়ে কিরণ খুব গম্ভীর হয়ে গেল। রঙ্গনাকে আয়না কিনে দিয়েছে একটা? যে আদর্শের ধ্বজা বহন করে সে গৃহত্যাগ করে এসেছে (একমাত্র পুত্র হয়েও পিতার মনে অত বড় আঘাত হানতে ইতস্তত করেনি) সে আদর্শের সঙ্গে এ ঘটনাটা ঠিক খাপ খাচ্ছে না তো। কৃচ্ছ্রসাধনের আগুনে কর্মযজ্ঞ করবার এই কি নমুনা? কিরণের গম্ভীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মুচকি হেসে ঊর্মি বললে—"কেমন লোক দেখুন তো দিবসবাবু, যে-ই রঙ্গনাদিকে ভালো লেগেছে অমনি একটি আয়না কিনে দিলেন। আর আপনার জন্যে আমি এত করে মরছি আপনি তো সামান্য মাথার কাঁটাও কিনে দেননি আমাকে একটা।"

ঊর্মির এই উক্তির অন্তরালে যে মিনতি প্রচ্ছন্ন ছিল তা কিরণের কাছে প্রচ্ছন্ন রইল না। একটু হেসে সে চেষ্টা করলে সেটাকে আরও প্রচ্ছন্ন করে দিতে।

"অতএব বোঝা যাচ্ছে তোমাকে আমার ভালো লাগেনি।"

"মিথ্যুক কোথাকার।"

হাসি উপছে পড়ল ঊর্মির চোখ থেকে। সে হাসির প্রত্যুত্তরে কিরণকেও একটু হাসতে হল। পরমুহূর্তেই কিন্তু সে গম্ভীর হয়ে গেল আবার। দীনতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এই গাম্ভীর্যটাই তার স্বাভাবিক মুখভাব হয়ে গেছে। শত্রুর চোখে ধুলো দেবার জন্য ক্ষেত্রে যেমন নানারকম কৌশল অবলম্বন করা হয় কিরণ তেমনি খাড়া করেছিল এই বিষণ্ণ গাম্ভীর্যটা। পরাজয়ের গ্লানিটা সে বুঝতে দেবে না কাউকে। অন্তরের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিরুদ্ধ করে ক্ষুরধার সংকীর্ণ পথে আত্মোপলব্ধির দিকেই হয়তো অগ্রসর হচ্ছে সে, কিন্তু তার আধ্যাত্মিক আনন্দ সে পাচ্ছে না কিছুতেই। আধিভৌতিক অভাবের তাড়নায়, অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার অনলে সব পুড়ে যাচ্ছে। সে জীবনকে স্থূল ভাবেই উপভোগ করতে চায় (বৈদান্তিক বুলি সে মাঝে মাঝে আওড়ায় বটে, কিন্তু তা তার অন্তরের নিগূঢ় সত্তার আকুতি হয়নি এখনও), ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করবার জন্যেই প্রাণপণ করছে সে, কিন্তু মুশকিল হয়েছে পশুর মতো তা সংগ্রহ করতে তার বাধছে! স্বল্প শিক্ষার আলো-আঁধারিতে আত্মসম্মানটাকেই সে লাঠির মতো আঁকড়ে ধরে আছে। যখন তখন আস্ফালন করছে সেটা। আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে এ বাজারে ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করা যে অসম্ভব এ-ও সে বুঝছে এবং যতই বুঝছে ততই অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে চারিদিকে, ততই সে আস্ফালন করছে ওই আত্মসম্মানের যষ্টিটা। মানসলোকের এই অন্ধকারেই বাস তার। এই অন্ধকারেই সে কল্পনার স্বপ্নময় কাব্যলোকও সৃষ্টি করেছে। ঊর্মিকে সে পেতে চায় এ কাব্যলোকের মানসবিহারেই। ঊর্মি নিজে যদিও বাস্তব জগতে তার পাশে এসে দাঁড়াতে রাজি আছে কিন্তু তার এ অধঃপতন কিরণ কল্পনা করতে চায় না। সে জানে বাস্তবের ঊর্মিকে পরিপূর্ণ ভাবে পাবার ক্ষমতা তার নেই। ঊর্মি কাছে এলে সে তাই বিব্রত হয়ে পড়ে। তার মুখের দিকে ভালো করে চাইতেও ভয় হয় তার। ঊর্মি যে নিজেকে অবনত করে ধূলিতে নেমে আসতে

চাইছে এর ইঙ্গিতও সে ঊর্মির আচরণে দেখতে চায় না; অথচ দেখতে লোভও হয়। আর একবার আড়চোখে চাইলে সে ঊর্মির দিকে, দেখলে ঊর্মির হাসিমাখা চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে তখনও! কিরণ কেমন যেন কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল একটু। তার মনে হল কিছু একটা বলা উচিত।

"আমি গরিব মানুষ, তোমাকে দেবার মতো জিনিস কোথায় পাব বল?"

"বাজে কথা বলবেন না। দেবার মতো জিনিস কেবল বাজারেই পাওয়া যায় বুঝি?"

কিরণ ঊর্মির মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। তার ঠোঁট দুটো কাঁপছে, চোখের হাসিতে বিদ্যুত ঠিকরে পড়ছে যেন।

"আমি চললুম।"

পরমুহূর্তেই চলে গেল ঊর্মি। কিরণ বসে রইল চুপ করে। আত্মসম্মানের লাঠিটা সবলে চেপে ধরে অনেকক্ষণ বসে রইল সে। তারপর দিবসের কথা মনে পড়ল। প্রাণের প্রাচুর্যে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে কি কাণ্ডটাই ও করছে! রঙ্গনার সঙ্গে আলাপ হতে না হতেই তার প্রেমে পড়ে গেল, আবার প্রেমে পড়তে না পড়তেই উপহার নিয়ে ছুটোছুটি করছে। না,—মনে মনে মাথা নাড়লে কিরণ—এ ধরনের আচরণ তার কাছে প্রত্যাশা করেনি সে, এ আচরণ প্রশংসনীয়ও নয়। তার হঠাৎ মনে পড়ল সূর্য চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হওয়ার ঘটনাটা। শুধু তাই নয় দিবসের ঠিকানাটা এবং দিবসের এই সব আচরণ তাঁকে জানানো বন্ধু হিসেবে তার কর্তব্য কি না এ-ও সে চিন্তা করতে লাগল। তার এ চিন্তার উৎস নিছক বন্ধু-প্রীতি বা অবচেতন মনের ঈর্ষা যাই হোক, চিন্তাকে বেশিক্ষণ কিন্তু আমোল দিল না সে। ঠিক করে ফেললে দিবসের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত সে কিছু করবে না। তাকে না জানিয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাটা অনুচিত হবে। তাছাড়া এ বিষয়ে তার বক্তব্যটা শোনা উচিত বই কি। চেয়ার থেকে উঠে ক্যাম্প চেয়ারটায় শুয়ে পড়ল। চোখ বুজে শুয়ে রইল চুপ করে। তার মানস নয়নের সম্মুখে রঙ্গনা আর দিবসের ছবিটা ফুটে উঠল পাশাপাশি। দিবস যেন আবেগ ভরে কি বলে চলেছে, অবনতমুখী রঙ্গনা শুনছে যেন বসে তার মুখে সরমস্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠেছে। হঠাৎ সে দেখতে পেল ঊর্মি যে আড়ি পেতে শুনছে সব, তার চোখে মুখেও একটা দুষ্টু হাসি ঝলমল করছে। ঊর্মির সঙ্গে হঠাৎ যেন তার চোখাচোখি হয়ে গেল। চোখাচোখি হতেই ঊর্মির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে, চোখেব কোণে টলমল করতে লাগল অশ্রু।

তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে শুয়েই রইল সে।

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ ॥

উপর্যুপরি কয়েকদিন সৌদামিনীর সঙ্গে দিবসের দেখাই হয়নি। দিবস ভোরে উঠে বেরিয়ে যায়, ফেরে রাত্রি দশটা এগারোটার পর, অত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে পারে না সৌদামিনী। পটলির স্বামীর অসুখ কিন্তু বেড়ে চলেছে ক্রমশ, সৌরেন ডাক্তার আরও দু'একবার এসে দেখে গেছেন, ইন্‌জেক্‌শন্ দিয়েছেন কিন্তু কিছু হচ্ছে না। সৌদামিনী দিবসকে ধরবে বলে জেগে বসেছিল সেদিন। মোহন ঠাকুরের হোটেলে খবর নিয়ে জেনেছিল যে দিবস সন্ধ্যার সময়ই

খেয়ে গেছে কখন ফিরবে কে জানে। দিবসের ঘরের সামনেই আঁচল পেতে শুয়ে পড়েছিল সৌদামিনী তাই।

দিবস ফিরল যখন তখন প্রায় এগারোটা হবে। গহনচাঁদের বাড়িতে গানের আসরটা খুব জমেছিল সেদিন! দরবারি কানাড়ার গৎটা ওইখানে বসেই সাধছিল সে।

"কত রাত করলে বলতো!" সৌদামিনী উঠে বসল।

"এ কি, এখানে শুয়ে কেন?"

"তোমার অপেক্ষায়। আজকাল অত ভোরে উঠে কোথায় বেরিয়ে যাও, দু'দিন এসে তোমাকে পাইনি।"

"আর একটা টিউশনি নিয়েছি। গিরিবালা ক'দিন থেকে কাজে যাচ্ছেনা কেন বলতো? রোজই ভাবি খোঁজ করব কিন্তু ভুলে যাই।"

"তারও জ্বর হয়েছে। আর হরুর অসুখও তো কমবার কোনও লক্ষণ নেই। সেই সম্বন্ধেই তোমার সঙ্গে পরামর্শ করব বলে বসে আছি।"

"হরু কে?"

"পটলির স্বামী। কাশির সঙ্গে থোকে থোকে রক্ত উঠছে তার।"

"তাই নাকি! সৌরেন এসেছিল?"

"তিনি বলছেন হাসপাতালে নিয়ে যেতে।"

"ও, তাই নাকি! সে নিজেই না কি হাসপাতাল করেছে একটা শুনছি।"

"হ্যাঁ, সেই হাসপাতালেই নিয়ে যেতে চাইছেন। কি যে করা যায়, মহা মুশকিলে পড়া গেছে। পটলি তো কেঁদে কেটে অনত্থ করছে।"

দিবস ঘরে ঢুকল। সৌদামিনীও ঢুকল পিছু পিছু।

সরোদটা রেখে দিবস সৌদামিনীর দিকে বললে, "আমি এখনই তাহলে সৌরেনের কাছে যাই একবার। দিনের বেলা তো আমার সময় নেই মোটে, আর দিনে তার দেখা পাওয়াও মুশকিল। তুমি ঘরের ভেতরেই শোও ততক্ষণ তাহলে।"

"এখনই যাবে, এত রাত্রে?"

"তাতে কি হয়েছে?"

"এত রাত্রে নাই বা গেলে?"

দিবস হাসি মুখে চাইলে একবার সৌদামিনীর দিকে। কোনো কথা বললে না। কথা বলে অনর্থক সময় নষ্ট করে কি হবে এই ভাবটা বরং যেন ফুটে উঠল তার হাসি মাখা দৃষ্টিতে। 'অপর কেউ হলে সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর অত রাত্রে নিতান্ত অনাত্মীয়ের জন্যে ডাক্তারের বাড়ি ছুটত না'—এই ধারণাটাই যেন দিবসকে যেতে উৎসাহিত করলে আরও। এর মধ্যে বাহাদুরি দেখানোর ভাব একটু ছিল, তাছাড়া ছিল অপ্রত্যাশিত দুরূহ সমস্যার দুর্জয়তাকে অতিক্রম করবার জেদ। কাজটা শক্ত মনে হওয়া মাত্রই সেটা করবার জন্যে লোলুপ হয়ে ওঠাটাই তার স্বভাব। এই স্বভাবই তাকে ঘর ছাড়া করেছে।

"অনেক রাত হয়ে গেছে আজ থাক।"

একথা সৌদামিনী আর একবার বললে যদিও কিন্তু মনে মনে সে জানত (প্রত্যাশাই

করছিল) যে দিবস যাবেই, কোনও কথা শুনবে না। আর একটু হেসে দিবস পরমহূর্তেই বেরিয়েও গেল। সৌদামিনী গালে হাত দিয়ে বললে, "কি দস্যি ছেলে বাবা"। তারপর তার নিজের উপরই রাগ হল—এত রাত্রে অসুখের কথা না বললেই হত। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার মনে হল, না·বললেই বা উপায় কি? শেষটা রাগ হল গিরিবালার উপর এবং সর্বশেষে নিজেদের দূরদৃষ্টির উপর। মিটমিটে লণ্ঠনের আলোয় দিবসের ঘরে একা দাঁড়িয়ে হঠাৎ সৌদামিনীর মনে হল দিবস ছাড়া তাদের নির্ভরযোগ্য আপনার লোক কেউ নেই। তারপর মনে হল দিবস পরের ছেলে, ভদ্রলোকের ছেলে, খেয়ালের মাথায় শখ করে খোলার ঘরে দুদিনের জন্য এসেছে, দুদিন পরে চলে যাবে। মনে হওয়ামাত্র সে কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগল। বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল যেন।

সৌরেন ডাক্তারও আদর্শবাদী লোক। কোন্ শিক্ষিত বাঙালী নয়? ভাবের জগতে বাঙালীর যে প্রতিভা কর্মের জগতে তার শতাংশের একাংশও সম্বল যদি তার থাকত তাহলে সে বিশ্বজয় করতে পারত। যে সংহতি যে একতা থাকলে কর্মজগতে উন্নতি হয় তা বাঙালীর নেই। সে যা করছে তা একাই করছে। অখ্যাত সৌরেন ডাক্তারও তাই করছিল। গরিব বলে সে মেডিকেল কলেজে পড়বার সুযোগ পায়নি। স্কুল থেকে তাকে পাশ করতে হয়েছিল। পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিয়ে হল তার। বিয়ে করেছিল সে একটি বিধবার মেয়েকে। অতসী রূপসী ছিল যদিও কিন্তু ঠিক রূপের জন্যে তাকে বিয়ে করেনি সৌরেন। সে তাকে বিয়ে করেছিল টাকার জন্যেই। তার শাশুড়িই তাকে ছোটখাটো ডিসপেন্সারিটি করে দেন, শাশুড়ির টাকাতেই মোটরটিও কিনেছিল সৌরেন। গঙ্গার ধারে দোতলা বাড়িটিও সৌরেনেরই হবে শাশুড়ির মৃত্যুর পর, কারণ অতসী তাঁর একমাত্র মেয়ে,—এইসব ভেবেই পিতৃমাতৃহীন স্বল্পবিত্ত সৌরেন বিশেষ খোঁজ-খবর না করেই (খোঁজ-খবর নেবার মতো অভিভাবকও তার ছিল না বিশেষ) অতসীকে বিয়ে করেই ফেলেছিল। বিয়ে করবার আগে একটু বিস্মিত সে যে হয়নি তা নয়—এমন সুন্দর মেয়ে, টাকাকড়ি আছে অথচ পাত্র জুটছে না কেন—কিন্তু বিস্ময়টাকে আমোল দেবার মতো সচ্ছলতা তার নিজের ছিল না। বিবাহের প্রস্তাবটাকে সৌভাগ্য ভেবে বিবেচনা না করেই সে বিয়ে করে ফেলেছিল। বিয়ে হয়ে যাবার অল্পদিন পরেই সে লক্ষ্য করলে যে অতসীর রোজ সন্ধ্যার সময় জ্বর হয়, শুধু অতসীর নয় অতসীর মায়েরও। তারপর সে খবরটা পেলে শ্বশুরবাড়িরই দূরসম্পর্কীয় একজন আত্মীয়ের মুখে। অতসীর ঠাকুরদা বাবা দুজনেই যক্ষ্মায় মারা গেছেন। অতসী এবং অতসীর মা-ও মারা গেল তার কিছুদিন পরে।

ডাক্তার হিসাবে এই যক্ষ্মারোগের সমস্যাটাকে এতদিন নৈর্ব্যক্তিক ঔদাসীন্য সহকারে আলোচনা করছিল সে। অতসী এবং অতসীর মায়ের মৃত্যুর পর ডাক্তার সৌরেনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল হঠাৎ। আমাদের দেশের প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে যে করাল ব্যাধি ছায়া-পাত করছে, নিদারুণ দারিদ্র্য যে ব্যাধির মূল কারণ, শুধু আর্থিক দারিদ্র্য নয়, নৈতিক দারিদ্র্য, মানসিক দারিদ্র্যও, যে ব্যাধির আধুনিক চিকিৎসা বিপুল ব্যয়সাধ্য, সেই ব্যাধির বিরুদ্ধে সহায়সম্বলহীন আদর্শবাদী এই ছোকরা ডাক্তার যুদ্ধ ঘোষণা করে বসল একদিন। ঠিক করে ফেললে গরিব যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসা বিনা পয়সায় করবে সে। গঙ্গার ধারের সে বাড়িটাকে রূপান্তরিত করে ফেললে অতসী ক্লিনিকে। একজন সহৃদয় রেডিওলজিস্ট এবং একজন সহৃদয় যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দেখা করে, তাদের

খোশামোদ করে, (প্রায় হাতে-পায়ে ধরে) ঠিক করে ফেললে যে কেবল খরচটুকু মাত্র দিয়ে তাঁরা অতসী ক্লিনিকের রোগী রোগিণীদের সাহায্য করবেন। অতসী ক্লিনিকে দশটি রোগীর থাকবার ব্যবস্থা করেছে যে। রোগীদের বাড়িভাড়া লাগে না, ডাক্তারের ফী লাগে না। ওষুধ রোগীরা নিজেদের পয়সায় কিনে আনে, খাবার খরচও তাদের নিজেদের। দুটি নিতান্ত গরিব রোগীর খাবার এবং ওষুধের খরচ সৌরেন নিজে দেয়। এ সব ছাড়া প্রত্যেক রোগীকে প্রতিদিন এক টাকা করে দিতে হয় চাকর মেথর আলো প্রভৃতির জন্য। যারা দিতে পারে না তাদের ব্যয়ভার সৌরেন নিজেই বহন করে। এই ব্যাপারেই জীবন উৎসর্গ করবে ঠিক করেছে সে। সকালে বিকালে সে ডিসপেন্সারিতে বসে এই ক্লিনিকের জন্যই অর্থোপার্জন করবে বলে। বাকি সময়টা এই ক্লিনিকেই থাকে সে। একাধারে সে-ই ডাক্তার এবং নার্স। একটি মেথরকে তালিম দিয়ে সে নিজের সহকারী করে নিয়েছে। তার অবর্তমানে সেই মেথরই রোগীদের দেখাশোনা করে। অতি দীনভাবে ক্লিনিকটা আরম্ভ করেছে সে। একটা সত্যিকার সেবা-সদন করে তুলতে হবে এই তার জীবনের আকাঙ্ক্ষা।

দিবস ডিসপেন্সারিতে গিয়ে সৌরেনের দেখা পেল না। কম্পাউন্ডারটি বললে, "তিনি তো তাঁর ক্লিনিকে আছেন! রাত্রে তো ফিরবেন না।"

"সেখানে ফোন নেই?"

"নেবার চেষ্টা করছেন, এখনও পাননি। আপনার খুব বেশি যদি দরকার থাকে চলে যান সেখানেই।"

ঠিকানাটা নিয়ে দিবস বেরিয়ে পড়ল।

.....সমস্ত শুনে সৌরেন ডাক্তার বললে, "আমার বিছানা খালি আছে একটা। হরুকে এই খানেই পাঠিয়ে দাও। এক্স্‌রে করে তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। ওখানে থেকে চিকিৎসা হবে না ভালো।"

"তুমি এইখানেই থাক নাকি?"

"না থেকে উপায় কি, এতগুলি রোগী রয়েছে। একটা ভালো নার্স পাচ্ছি না ভাই কিছুতে। পঁচাত্তর টাকা মাইনে দিতে রাজি আছি। কিন্তু টি. বি. শুনে কেউ আসছে না। আমাদের দেশে দলে দলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে শুনছি কিন্তু কই এদিকে তো এগোচ্ছে না একজনও। চল তোমার হরুকে দেখেই আসি।"

"এত রাত্রে যাবে আবার?"

"চল, আমার তো এই কাজ, তোমাকে পৌঁছেও দিয়ে আসি, তেল পেয়েছি আজ।"

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল সৌরেন ডাক্তার।

হরিদাসবাবু আর আত্মসম্বরণ করে থাকতে পারলেন না। মোহরের ঘড়াটা খুলে দেখবার খুবই লোভ হল তাঁর। সুযোগও ঘটল।

সেদিন টুরে বেরুবেন তিনি।

দিবসকে বললেন, "তুমি আমার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত চল না, আমাকে তুলে দিয়ে আসবে। জিনিসপত্র সামলে টিকিট করে ভিড় ঠেলে একা ট্রেনে চড়াই দায় আজকাল।"

"বেশ তো যাক না তোমাকে তুলে দিয়ে আসুক"—গোবর্ধনবাবুও সমর্থন করলেন কথাটা।

হরিদাসবাবুর সুটকেস আর কুঁজোটা নিয়ে দিবস বেরিয়ে পড়ল তাঁর সঙ্গে। ফুটপাথে হরিদাসবাবু আগে আগে চলছিলেন দিবস পিছু পিছু যাচ্ছিল। হরিদাসবাবু মুশকিলে পড়েছিলেন। কথাটা কি করে পাড়া যায়। একটা ধাবমান খালি ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে সেটাকে থামালেন তিনি, তাঁর মনে হল সমস্যাটার সমাধান হল এতে। দিবসকে দিয়ে মালপত্র বইয়ে নিয়ে যেতে বাধছিল তাঁর, কিছু বলতেও পারছিলেন না, ট্যাক্সিটা পাওয়াতে সুবিধা হল। আর একটা সুবিধাও হল ট্যাক্সিতে দিবসকে ঘনিষ্ঠতর ভাবে পাওয়া যাবে। ট্যাক্সিটা থামতে মালপত্র তুলে দিয়ে দিবস যথারীতি ড্রাইভারের পাশে বসতে যাচ্ছিল হরিদাসবাবু বলে উঠলেন, "আপনি আমার পাশে এসেই বসুন।"

দিবস সবিস্ময়ে হরিদাসবাবুর দিকে চাইতেই হরিদাসবাবুর দৃষ্টি হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"আসুন। এইখানে বসুন।"

ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়তে পড়তে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ঘটনার আবির্ভাবে মনে যে ভাব হয় সেই রকম ভাব নিয়ে দিবস গিয়ে বসল হরিদাসবাবুর পাশে। বিশেষ কোনো ভূমিকা না করে হরিদাসবাবু হেসে দিবসের দিকে চেয়ে বললেন, "সেদিন ছাত্র-সভায় আপনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতে আমি উপস্থিত ছিলাম"—তারপর ড্রাইভারকে বললেন—"হাওড়া চল।"

দিবস যে কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

হরিদাসবাবুই আবার কথা বললেন, "তারপর থেকে আমি বরাবর আপনাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছি এবং এখন আর বলতে বাধা নেই সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেছি আমি! এখন আপনার আসল পরিচয়টা জানবার ভারী আগ্রহ হচ্ছে আমার। আপনার বাড়ি কি এখানেই? হঠাৎ এ খেয়ালই বা হল কেন আপনার?"

দিবস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "আপনাকে সব খুলে বলছি, কিন্তু একটি প্রতিশ্রুতি চাই, একথা মেসের আর কাউকে বলবেন না, কিংবা আমার বাড়িতেও খবর দেবেন না।"

"বেশ দিলাম।"

দিবস তখন সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে বললে—"আপনাদেব মেসে চাকরি করে, এবং দুটো টিউশনি করে, মাসে আমি আজকাল আশি টাকা রোজগার করছি। এতে আমার খরচটা চলে যাচ্ছে। আরও কিছু বেশি রোজগারের উপায় যদি হয় তাহলে সে টাকাটা আমি জমাব, জমিয়ে আসছে বছর আবার ওই রিসার্চ লাইনেই ঢুকব ইচ্ছে আছে, যদি অবশ্য সুযোগ পাই।"

সমস্ত শুনে হরিদাসবাবু চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর একটু কেসে গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "দেখুন যে কথাটা আমি বলতে যাচ্ছি তা শুনেই যেন চটে যাবেন না। আপনি নিজের পৌরুষের জোরে নিজের পায়ে দাঁড়াতে যাচ্ছেন তাতে বাধা সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য নয়, নিজের মহত্ত্ব আস্ফালনও আমি করতে যাচ্ছি না। আমি শুধু এইটুকু বলে রাখছি যে দরকার হলে কিছু টাকা আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি আপনার রিসার্চের জন্যে।"

"এখন তো টাকার দরকার নেই, এ বছর তো ঢোকা যাবে না। আসছে বছর টাকার দরকার হবে, ততদিনে আমি জমিয়ে ফেলতে পারব কিছু।"

"তা যদি পারেন ভালোই। আর না যদি পারেন আমার কথাটা মনে রাখবেন। আমি হাজার পাঁচেক পর্যন্ত আপনাকে দিতে পারব। শোধ যদি না-ও করেন—"

হরিদাসবাবুর কথা শেষ করতে দিলে না দিবস।

"বাঃ শোধ করব বই কি যদি নি।"

হরিদাসবাবু মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন দিবসের দিকে। তাঁর লাইফ ইনসিওরেন্সের টাকাটার হয়তো একটা সদগতি হবে ভেবে পুলকিত হয়ে উঠলেন তিনি।

ট্যাক্সি হাওড়া স্টেশনে এসে থামল।

"কুলি ডাকুন, আপনি আর ঘাড়ে করবেন না স্যুটকেসটা"—হেসে বললেন হরিদাসবাবু।

"আপনি যদি এরকম করেন তাহলে তো মেসের চাকরিটি ছাড়তে হবে আমাকে। আপনার মতো লোকের অন্তত সংকোচ হওয়া উচিত নয় এসবে—"

"আচ্ছা, বেশ যা খুশি করুন তবে। আমি টিকিটটা করি গিয়ে।"

হরিদাসবাবু গেট দিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়েছিলেন। দিবস কাঁধে স্যুটকেস এবং একহাতে কুঁজো নিয়ে ভিড়ে পিছিয়ে পড়েছিল। সে তার প্লাটফর্ম টিকিটটা আর কুঁজোটা এক হাতে সামলাতে ব্যস্ত ছিল বলেই যে স্যুটকেসটার দিকে তেমন মন দিতে পারছিল না তা নয় হরিদাসবাবুর নূতন পরিচয় পেয়ে তার মন আকাশে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল। হরিদাসবাবু তাকে টাকা দেবেন বলে নয়, হরিদাসবাবুকে সে মুগ্ধ করতে পেরেছে বলে। তার অসমসাহসিক প্রকৃতি দমকা হাওয়ার মতো তার জীবনতরণীর পালে লেগে তাকে যে পথে নিয়ে গেছে সে পথের মোহ তার নিজেরই কেটে আসছিল ক্রমশ—ওই মেসের চাকরি আর টিউশনি তার ভালো লাগছিল না মোটেই। কিন্তু জেদের বশে তবু সে ফেরেনি, ফিরবেও না। নিজের পায়ে ভালো ভাবে দাঁড়িয়ে তবে সে ফিরবে। কিন্তু মনে মনে তার দুঃখ ছিল যে তার এই কৃচ্ছ্রসাধনের প্রশংসা কেউ করল না। হরিদাসবাবুর প্রশংসাটা তাই উপভোগ করছিল সে। না, কেউ তার প্রশংসা করেনি। বাবা, কিরণ, সৌদামিনী, কেউ নয়। এমন কি রঙ্গনা পর্যন্ত—স্যুটকেসটা কার মাথায় যেন লেগে গেল।

"এই কুলি দেখতে পাও না চোখে, ধাক্কা দিয়ে চলে যাচ্ছ!"

চমকে ফিরে দাঁড়াল দিবস। রঙ্গনাও অবাক হয়ে গেল।

"একি, তুমি এখানে কোথা থেকে?"

"আমি গিরিডি থেকে ফিরছি। আপনি স্যুটকেস ঘাড়ে করে কোথায় চলেছেন?"

"আমার মনিবকে উঠিয়ে দিতে যাচ্ছি ট্রেনে। আসছি এখনই।"

দিবস চলে গেল। রঙ্গনার সঙ্গিনীরা এগিয়ে বাসে ট্যাক্সিতে উঠল। রঙ্গনা দিবসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। মিনিট পাঁচেক পরেই ফিরে এল দিবস।

"সত্যি আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন যাই বলুন, কুলিগিরি করবেন তা বলে?"

"স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশাই কুলিগিরি করেছিলেন তা জান? আমরা তো নগণ্য লোক।"

কথাটা দিবসের নিজেরই কানে লাগল। মনে হল 'চাল' দেওয়ার মতো শোনাল। এ রকম কথা সে যদি আর কারও মুখে শুনতে তাহলে নির্জলা চালিয়াৎ ভাবত তাকে। মনে হওয়ামাত্রই লজ্জা হল তার। অপরের কাছে বাহাদুরি দেখানোর লোভটা সে কিছুতেই সামলাতে পারছে না কেন? হরিদাসবাবুর সঙ্গে এখনই যে সব কথা হল তার মধ্যেও এই ধরনের একটা সুর অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেমন যেন উপচে পড়ছিল হাবভাবে।

রঙ্গনা হেসে বললে, "আসল বিদ্যাসাগর বড় হতে পারেন কিন্তু নকল বিদ্যাসাগর হাস্যকর! আপনাকে মানাবে আপনার অরিজি—মানে স্বকীয়তায়"—তারপর হেসে বললে—"কেমন চমৎকার শুদ্ধ বাংলা বলছি দেখছেন? জানেন, আমরা ক'জন বন্ধু মিলে আবার আজ প্রতিজ্ঞা করেছি যে পারতপক্ষে ইংরেজী কথা বলব না"—কথাটা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে রঙ্গনা। কিন্তু কৃতকার্য হল না।

"আমার স্বকীয়তাটাও তো বরদাস্ত করতে পারলে না সেদিন"—দিবস বললে।

"কোনটা?"

"আয়না কিনে দেওয়াটা। ও অবস্থায় অন্য কেউ হলে দিত না, মানে দিতে সাহস করত না, আমি বলেই দিয়েছিলাম, ওইটেই আমার স্বকীয়তা। কিন্তু তুমি সেদিন যা বললে তাতে মনে হয় তোমার কাছে স্বকীয়তারও কোনো দাম নেই।"

চলতে চলতে রঙ্গনা ঘাড় ফিরিয়ে বললে, "বুঝতে পারলাম না ঠিক। একটা আয়না কিনে দেওয়ার মধ্যে বিশেষত্বটা কি থাকতে পারে তাতো বুঝতে পারছি না!"

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে অবশ্য মনে মনে বলছিল—"বুঝেছি, কিন্তু বলব না সেটা!"

দিবস বললে, "একটা উদাহরণ দিচ্ছি"—বলেই আবার চুপ করে গেল। উপমার সাহায্যে নিজের চরিত্রের যে বিশ্লেষণটা সে করেছিল তা অকপটে বলা উচিত কি না খটকা লাগল তার। উপমাটাও হাস্যকর।

"কি উদাহরণ?"

দিবস তবু চুপ করে রইল।

"চুপ করে আছেন কেন, বলুন না কি উদাহরণ?"

দিবস অবশেষে বলাই ঠিক করে ফেললে। অর্থাৎ না বলে পারলে না। 'এর কাছে যদি অকপটে না বলতে পারি তাহলে কার কাছে আর বলব' এ কথাগুলো যদিও স্পষ্টভাবে তার মনে জাগল না কিন্তু তার মনে হল এর কাছে বললে আর ক্ষতি কি!

"উদাহরণটা হচ্ছে, সব প্রাণীই দরকার হলে লাফায় কিন্তু লাফানোটা ফড়িংয়েরই একটা বিশেষত্ব বলতে পার। অতি সামান্য কারণে তড়াক করে সে লাফিয়ে ওঠে। আমার সেই দশা। সেদিন তুমি যখন আয়নাটা ভেঙে ফেললে তখন তোমার মুখটা দেখে ভারী কষ্ট হয়েছিল আমার। আয়না কিনে দেওয়ার লোভটা সামলাতে পারলাম না কিছুতে তাই। কিন্তু তুমি সেদিন ওটার যে ব্যাখ্যা করলে তাতে অপমানিত বোধ করেছিলাম, সত্যি বলছি। একটা কথা বিশ্বাস কর তুমি, আস্ফালন করবার মতো বিশেষ কিছু নেই আমার, সামান্য যেটুকু আছে সেটাকে সাজিয়ে গুজিয়ে ফলাও করে দেখবার মতো সময়ও নেই। কিন্তু তবু আমি বেখাপ্পা রকম কাণ্ড করে ফেলি মাঝে মাঝে তার কারণ মনের ভিতর ফড়িং আছে একটা। কারণে অকারণে লাফিয়ে ওঠে সেটা—।"

রঙ্গনা চুপ করে রইল, কিন্তু মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল তার। সে হাসি অর্থহীন নয়, কিন্তু কি যে তার অর্থ তা-ও বলা শক্ত।

দিবস বললে, "আর একটা কথা—না থাক সেটা আর বলব না তোমার কাছে—।"

রঙ্গনার হাসিটা আর একটু ফুটে উঠল।

"কেন, কি এমন কথা সেটা?"

"বললে আত্মপ্রশংসার মতো শোনাবে। এমনিই তো তুমি আমার চরিত্রে অনেকগুলো খুঁত বের করে ফেলেছ সে তালিকা দীর্ঘ করে লাভ কি?"

আমার কাছে নিজেকে নিখুঁত প্রমাণ করেই বা লাভ কি?"—রঙ্গনার চোখের হাস্যদীপ্ত দৃষ্টিতে যে আলোটা চকমক করে উঠল তা ঠিক শাণিত ছুরির মতোই। দিবসের মনের ভিতরটা চিরে দেখতে চাইছে যেন। ছুরিটা ভোঁতা হয়ে গেল কিন্তু দিবসের সপ্রতিভ হাসিতে।

"কিসে আমার লাভ লোকসান তা আমি নিজেই জানি না, তোমাকে কি করে বলব বল? এইটুকু শুধু বলতে পারি এখন তোমার চোখে নিজেকে খেলো করাটা লোকসান বলেই মনে হচ্ছে, কেন জানি না। দু'দিন পরে হয়তো হবে না।"

"কি যে যা তা বলছেন, আমি আপনাকে খেলো মনে করেছি কি করে জানলেন?"

"ও, মনে করনি তাহলে, যাক বাঁচা গেল!"

"বাজে কথা ছেড়ে কি বলছিলেন বলুন।"

"কি বলছিলাম বল তো?" দিবস সত্যিই ভুলে গিয়েছিল প্রসঙ্গটা।

"ওই যে কি বলতে বলতে থেমে গেলেন।"

'ও হ্যাঁ। না-ই শুনলে সেটা?"

"শুনিই না। সত্যি, ভারী দুষ্টু আপনি।"

"শোন তবে। মেয়েদের সম্বন্ধে আমার একটা ভারী দুর্বলতা আছে। কোনও বিপন্ন মেয়েকে সাহায্য করবার জন্যে আমি সব করতে পারি। না করতে পারলে আমার পৌরুষ যেন তৃপ্তি পায় না।"

হঠাৎ পটলি আর তার স্বামীর ছবিটা ভেসে উঠল রঙ্গনার চোখের উপর। সৌদামিনীর মুখে যা সে শুনেছিল তা-ও মনে পড়ল।

"সেদিন তোমাকে যে আয়নাটা কিনে দিলুম তার কারণও ওই। যা ভেবেছ তা মোটেই নয়। ওকি, তোমার এক কানে দুল কেন?"

রঙ্গনা তাড়াতাড়ি কানে হাত দিয়ে দেখলে সত্যিই তো একটা দুল নেই।

"ওই গেটের কাছেই পড়ে গেছে তাহলে। যা ধাক্কা আপনি দিয়েছিলেন স্যুটকেস দিয়ে!"

আবার গেটের কাছে ফিরে গেল তারা। সৌভাগ্যক্রমে একটু খুঁজতেই পাওয়া গেল দুলটা।

"চলুন এবার যাওয়া যাক"—দুলটা পরতে পরতে বললে রঙ্গনা।

"চল। তুমি কিসে যাবে?"

"ট্যাক্সিতে যাই চলুন, আমার কাছে টাকা আছে।"

"আমি বাসে যাব। ভবানীপুরে যেতে হবে একবার।"

"কিছুদূর যাই চলুন একসঙ্গে। পথে নাবিয়ে দেব আপনাকে।"

"এখানে খালি বাস পাব, এখান থেকে ওঠাই তো ভালো?"

"যান তাহলে।"

নীরবে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল দুজনে। দিবসের মনে হতে লাগল রঙ্গনা আবার যদি অনুরোধ করে তাহলে তাকে ট্যাক্সিতেই যেতে হবে। রঙ্গনা কিন্তু ভাবছিল অন্য কথা। সে ভাবছিল দিবস

নিশ্চয়ই তাকে বিলাসী ভাবছে। তার নিজের বিবেকও দংশন করেছিল, মনে হচ্ছিল তার বাসে যাওয়াই উচিত, ট্যাক্সি চড়ে এমনভাবে টাকাগুলো খরচ করা উচিত নয়....। কিন্তু....।

স্টেশনের বাইরে এসে পড়েছিল তারা।

"আচ্ছা আমি চলি তাহলে এখন। সন্ধ্যার পর দেখা হবে আবার।"

দিবস বাসের আড্ডার দিকে চলে গেল। রঙ্গনা দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। দূরে তিন চারখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

....দিবস একটি খালি বাসের এক কোণে বসেছিল চুপ করে। রঙ্গনার কথাই ভাবছিল। একটা নৌকা তীর ছেড়ে ক্রমে ক্রমে দূরে চলে যাচ্ছে—এই ধরনের একটা ভাব তার মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কিরণের কথাই ঠিক। যে আদর্শকে সে বরণ করেছে সে আদর্শ রঙ্গনাকে মুগ্ধ করবে না। রঙীন শাড়ি গয়না পরে ট্যাক্সি চড়তেই চায় ওরা। রঙীন শাড়ি গয়না পরে ট্যাক্সি চড়াটা যে পাপ দিবসও তা মনে করে না। ও লোভে মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দেওয়াটাই অন্যায় তার মতে। রঙ্গনা হয়তো মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দিচ্ছে না, সংগতি আছে হয়তো গহনচাঁদবাবুর...। তাছাড়া চুনীলালের কথাটাও মনে পড়ল।

"চলুন আপনার সঙ্গেই যাই।"

রঙ্গনা হাসিমুখে এসে উঠল বাসে।

"কেন ট্যাক্সির কি হল?"

"পেলাম না তেমন সুবিধা মতো।"

দিবসের পাশে বসে সে দুলটা আবার পরবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তার মনের ভিতর যে দ্বন্দ্বটা চলছিল তার আভাস তার চোখমুখে প্রতিভাত হচ্ছিল না একটুও। মুখ দেখে মনে হচ্ছিল দুলটাকে নিয়েই যেন সে ব্যস্ত আছে, দুলটাকে ঠিকমতো পরতে পারছে না বলেই যেন তার ভুরুতে জেগেছে বিরক্তির কুঞ্চন, অধরে ফুটেছে অপ্রস্তুত হাসি। কিন্তু মনে মনে সে লজ্জায় মরে যেতে চাইছিল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে দিবসের বাসে এসে উঠল কেন? তার মনের একটা অংশ তর্জনী আস্ফালন করে তারস্বরে প্রশ্ন করছিল কেন, কেন, কেন—আর একটা অংশ অসহায়ভাবে অপ্রস্তুত মুখে বসেছিল নতমস্তকে। আত্মসম্মানের সঙ্গে আত্মসমর্পণের দ্বন্দ্বে সে ব্যস্ত ছিল বলেই দুলটা পরতে দেরি হচ্ছিল তার আরও। অস্বাভাবিক রকম দেরি হচ্ছে এ সম্বন্ধে নিজেই সে সচেতন হল পরমুহূর্তে।

"দুলটা মাড়িয়ে দিয়েছে বোধহয় কেউ, আঁকড়াটা বেঁকে গেছে।"

"কই দেখি?'

দিবস দুলটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দেখলে তারপর ফিরিয়ে দিলে। এবার বেশ সহজে পরা গেল।

"আপনি ভবানীপুরে কোথায় যাবেন?"

"হরিশ মুখার্জি রোড।"

"সেখানে এখন যাচ্ছেন যে? মেসে আপনার চাকরি নেই এখন?"

"এখন তো প্রায় এগারোটা বাজে। মেসে বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত আমার ছুটি, আমি যাচ্ছি এখন একটি ছেলেকে পড়াতে।"

"কি পড়ান আপনি?"—নিজেই এই অকারণ কৌতূহলে লজ্জিত হল সে একটু মনে মনে।

"অঙ্ক।"

"ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলে?"—আবার জিগ্যেস করে ফেললে সে।

"না, বি-এস-সি পড়ে। অঙ্কে অনার্স আছে ছেলেটির।"

কথাটা শুনে ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত হয়ে পড়ল রঙ্গনা। যে দিবসকে মেসের চাকর মনে করে সে ব্যঙ্গ করছিল সেই দিবসই যে বি-এস-সি অনার্সের অঙ্ক পড়াতে পারে এই সংবাদে দিবসের সম্বন্ধে তার ধারণাটা বদলে গেল যেন হঠাৎ। দিবস যে ভালো ছেলে তা সে তার বক্তৃতা শুনেই বুঝেছিল, সে যে ধনীর সন্তান এ-ও সে শুনেছিল সৌদামিনীর কাছে সে ভালো সরোদ বাজাতে পারে তা-ও সে জানে, কিন্তু সে যে অঙ্কেও এত বড় পণ্ডিত একথা শুনে তাক লেগে গেল তার, কারণ নিজে সে অঙ্কে ভয়ানক কাঁচা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আড়চোখে চাইল সে একবার দিবসের দিকে। দিবস পথের দিকে চেয়ে বসেছিল চুপ করে।

"আপনার সঙ্গে আরও কিছুদিন আগে আলাপ হলে আমি আই-এ না পড়ে আই-এস-সি পড়তাম। অঙ্কের ভয়ে আই-এস-সি নিতে পারিনি।"

"যা ভালো লাগে, যেটা তোমার পক্ষে সহজ, তাই পড়াই তো ভালো। আই-এস-সি পড়ে লাভটাই বা কি হত?"

"ডাক্তারি বা ওই ধরনের কোনও একটা রোজগারের রাস্তায় ঢুকতে পারতাম। আই-এ, বি-এ, এম-এ পাশ করে এক মাস্টারি ছাড়া আর কোনো গতি নেই।"

"আমাদের দেশে ডাক্তার মাস্টার দুই-ই দরকার এখন প্রচুর। দেশের দেহ মন কোনোটাই সুস্থ নয়।"

"আমি দেশের কথা ভাবছি না, নিজের কথা ভাবছি। ডাক্তারিতে বেশি পয়সা রোজগার করা যায়। আমাদের যা অবস্থা তাতে আমার ডাক্তার হওয়াই উচিত, কিন্তু কি করব বলুন, অঙ্কটা কিছুতেই মাথায় ঢোকে না।"

তাব হাসির অন্তরালে একটা অপ্রস্তুতভাব থাকাতে হাসিটা মলিন দেখাতে লাগল। তাদের অবস্থা যে খারাপ এই খবরটা দিবসকে দিয়ে ফেলে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল সে।

দিবস বললে, "নাই বা ঢুকল। দিনকতক পরেই তো বিয়ে হয়ে যাবে। তখন—"

দিবসের মুখের হাসিটাও নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল। চুনীলালের মুখে যে কথাটা সেদিন সে শুনেছিল তার তাৎপর্যটা যেন এখন এতক্ষণ পরে অতিশয় রূঢ়ভাবে এসে আঘাত করল তাকে। রঙ্গনাকে আয়না কিনে দিয়ে তার মন পরীক্ষা করবার যে এক্‌স্‌পেরিমেন্টটা করেছিল সে (এখনই একটু আগেই রঙ্গনাকে আয়না কেনার যে ব্যাখ্যাটা সে দিয়েছিল সেটাও মিথ্যে নয়), রঙ্গনা তার আদর্শকে স্বীকার করেও তাকে চাইবে কি চাইবে না এই অনিশ্চয়তাকে ঘিরে স্বপ্ন-সৃজন—সমস্তই যেন ব্যর্থ হয়ে গেল—রঙীন মেঘের মতো মিলিয়ে গেল সব।

"দিনকতক পরে বিয়ে হয়ে যাবে কে বললে আপনাকে?"

"চুনীলালবাবু।"

"মামার সঙ্গে কবে কথা হয় আপনার?"

"যেদিন তোমাকে আয়না কিনে দিয়ে গেলাম সেই দিনই।"

রঙ্গনা চুপ করে রইল। 'বাস'টা এতক্ষণ খালি ছিল, কয়েকজন যাত্রী এসে উঠল। একটু পরেই আবার নেবে গেল তারা।

রঙ্গনা দিবসের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বলল, "আমি এখন বিয়ে করব না। ওখানে তো নয়ই।"

"কেন?"

"ওরা পাঁচ হাজার টাকা পণ চায়। বাবাকে বাড়ি বাঁধা দিতে হচ্ছে।"

"তাই নাকি!"

"হ্যাঁ।"

পাশাপাশি বসে রইল দুজনে। কারও মুখে কথা নেই।

হঠাৎ রঙ্গনা বলে উঠল—"আচ্ছা, হঠাৎ যদি আমি কোনও দিন বিপদে পড়ে আপনার সাহায্য চাই দেবেন তো?"

একটু আগেই দিবস যে কথাগুলো বলেছিল—'কোনও বিপন্ন মেয়েকে সাহায্য করবার জন্যে আমি সব করতে পারি। না করতে পারলে আমার পৌরুষ যেন তৃপ্তি পায় না'—সেই কথাগুলোকে রঙ্গনার মন যে আঁকড়ে বসেছিল তা নিজেও সে টের পায়নি এতক্ষণ। এই খাপছাড়া প্রশ্নটা তার নিজের কানেই বেসুরো ঠেকল তাই। চকিতে দিবসের দিকে চেয়ে দিবসের চোখে কিন্তু যা দেখলে সে, তাতে তার মনের কুণ্ঠিত ভাবটা কেটে গেল।

উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে দিবস বললে, "নিশ্চয়।"

এর পর আর একদল যাত্রী উঠল বাসে। বেশ ভিড় হল। কথাবার্তার সুযোগ আর পেলে না তারা। পাশাপাশি বসে রইল কেবল।

ভালো মন্দ যা-ই হোক নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কেউ যখন সুনিশ্চিত হয়ে পড়ে, নিজের পৌরুষ দিয়ে ভবিষ্যতকে বদলাবার আশাও যখন আর থাকে না, তখনই লোকে সাধারণত পর-চর্চায় মন দেয়। ভবিষ্যৎ যদি অন্ধকার হয় তাহলে পরের সম্বন্ধে চিন্তাটা আরও বেশি পেয়ে বসে। কিরণের তাই হয়েছিল। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আর কোনও আলো সে দেখতে পাচ্ছিল না। যেটুকু আলো ছিল নিজের আকাঙ্ক্ষার কাল্পনিক আলোর কাছে তা এতই ম্লান যে সেটাকে আলো বলেই মনে হচ্ছিল না তার। ঊর্মিকে ঘিরে কল্পনায় যে অলকাপুরী সে সৃষ্টি করে রেখেছিল তা বাস্তবে কোনও দিন রূপ পরিগ্রহ করবে না তা সে জানত। যে ট্রাম ড্রাইভারি সে নিয়েছে (যেটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তরও নেই) তাতে কোনোক্রমে একটা খোলার ঘরে মাথা গুঁজে পশু-জীবন যাপন করা চলে, আর কিছু হয় না। বাস্তব ঊর্মির চিন্তাটাকেও দুহাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে রেখেছে সে কর্দমাক্ত বাস্তবলোক থেকে। অন্ধকারলোকে বসে দিবসের চিন্তাই করছে সে আজকাল। তার ক্রমাগতই মনে হচ্ছে দিবস ভুল করছে। এ-ও অবশ্য তার মনে হচ্ছে অনুরূপ অবস্থায় পড়লে সে-ও কি ভুল করত না? নিজের মধ্যে নিতান্ত জৈবিক যে ক্ষুধাটা সে অনুভব করে মাঝে-মাঝে তা দিবসও নিশ্চয় করে এ-ও তার মনে হচ্ছিল। এই সব অনুভব করার ফলে দিবসের ভ্রান্তিটাকে যদিও সে ক্ষমার চক্ষেই দেখছিল কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছিল না। বার বার তার মনে হচ্ছিল দিবসের

সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে বলেই তার প্রতি কর্তব্যও আছে একটা। ভ্রান্তির কবল থেকে তাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা যদি সে না করে তাহলে সে কর্তব্যে ত্রুটি হবে। এ বিষয়ে দিবসের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। আলোচনা করে দিবসকে যদি সে ফেরাতে পারে ভালোই, যদি না পারে তাহলে তার বাবাকেই খবর দিতে হবে। দিবসকে জানিয়েই খবর দেবে। এটা কর্তব্য তার। পরক্ষণেই তার কল্পনানেত্রে ফুটে উঠেছিল অপরূপ একটা ছবি। দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র। সমুদ্রের স্বচ্ছ নীল জলে অসংখ্য তরঙ্গের শিহরন। তাতে একটি মাত্র নৌকো ভেসে চলেছে। সোনার তরী। জ্যোৎস্নাশুভ্র পালে লেগেছে হাওয়া। আকাশের মেঘমালায় বিচিত্র বর্ণসম্ভার। নৌকোর একধারে বসে আছে দিবস আর একধারে রঙ্গনা। রঙ্গনা যেন মৃদুকণ্ঠে গান গাইছে—গানের কথাগুলোও মূর্ত হয়ে উঠল তার মনে।

স্বপন মাখা চোখে চলেছি মেঘ লোকে
মাটির মায়া ছেড়ে চলেছি আকাশেতে
সূর্য শশী তারা যে দেশে দিশাহারা
রূপের শতধারা উঠেছে যেথা মেতে।

এমন সুন্দর ছবিকে নষ্ট করে দেওয়া উচিত কি? কিন্তু বন্ধু হিসাবে..... ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে রইল কিরণ। তারপর মনে হল দিবসের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত। কিন্তু দিবসের সঙ্গে দেখাই হচ্ছে না যে। তিনবার তার বাড়ি গিয়ে ফিরে এসেছে সে। খবরের কাগজটা তুলে পড়বার চেষ্টা করলে। আরও মন খারাপ হয়ে গেল। আগাগোড়া কেবল দুঃসংবাদ। শুধু দুঃসংবাদ নয়, মিথ্যা সংবাদ। বানিয়ে বানিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে এমনভাবে লিখেছে যে সংবাদের স্বরূপটাই গেছে বদলে। চামড়া বাঁচাচ্ছে নিজেদের!

"মা পাঠিয়ে দিলেন।"

পাশের বাড়ির ছেলেটি একটা বাটি হাতে করে দাঁড়িয়েছে দ্বার প্রান্তে। 'আঃ' কিরণ বলে উঠল মনে মনে। পাশের বাড়ির লোকটি ধনী হয়েছেন সম্প্রতি কালো বাজারের কৃপায়। তা হোন, কিরণের আপত্তি থাকলেও কিছু করবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু তার প্রৌঢ়া গৃহিণীর বদান্যতার জ্বালায় অস্থির হয়েছে সে। তিনি অনুকম্পাভরে প্রায়ই এটা সেটা পাঠিয়ে দেন তাকে। এই অনুকম্পা পাগল করে তুলেছে যেন, এটাও যেন ওদের ঐশ্বর্য-আস্ফালনের আর একটা উপায়। মোটরের হর্ন, রেডিওর গাঁক গাঁক চিৎকারই তো যথেষ্ট, বাড়িতে খাবার পাঠিয়েও কি জানান দরকার যে আমাদের যথেষ্ট খাবার আছে, আহা তুমি খেতে পাও না, নাও খাও তোমাকেও একটু দিচ্ছি!

"কি ওটা—"

"মাংস।"

"আজ রবিবার আমি মাংস খাই না"—মিছে কথাই বললে সে।

"ফিরে নিয়ে যাই তাহলে?"

"যাও।"

মাংস নিয়ে চলে গেল ছেলেটি। কিরণের খিদে পেয়েছিল খুব! কিরণ উঠে দাঁড়াল, ঘরের

ভিতর অন্যমনস্কভাবে ঘুরে বেড়াল খানিকক্ষণ। তারপর জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। রাস্তাতেই মুক্তি। জনতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে যতক্ষণ অন্যমনস্ক থাকা যায়...।

সৌদামিনী আর গিরিবালা ফিরছিল সৌরেন ডাক্তারের অতসী ক্লিনিক থেকে। পটলি আর তার স্বামীকে সেইখানেই রেখে এল তারা। সৌরেন ডাক্তারের ভদ্রতা দেখে মুগ্ধ হয়েছে দুজনেই। আর সব চেয়ে বিস্মিত হয়েছে সৌরেনের উপর দিবসের প্রভাব দেখে। দিবস ওদের সঙ্গে যেতে পারেনি। চিঠি দিয়েছিল একটা। সেই চিঠি দেখে কি খাতিরটা করলেন ডাক্তারবাবু। দিবসের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল সৌদামিনী। দিবসের সম্বন্ধে এমনভাবে কথা কইতে কইতে আসছিল সে যেন দিবস তার নিজের সম্পত্তি।

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥

দিবসের ঠিকানা পাওয়ার আগেই ঘণ্টু এসে হাজির হল। এমনি চিঠি লিখলেই সে হয়তো এসে পড়ত, কারণ বাংলাদেশের অসংখ্য যুবক যে সম্প্রদায়ভুক্ত ঘণ্টুও তাদের একজন। সে বেকার। বি-এ পাশ করে বাড়িতে বসে রাজনীতি, সাহিত্য, নূতন নূতন ব্যবসার প্ল্যান প্রভৃতি নিয়েই দিন কাটাচ্ছিল সে। সূর্য চৌধুরী তাকে আসতে লিখলেই সে চলে আসত। কিন্তু সূর্য চৌধুরী পত্রে যে কারণটা দেখিয়েছিলেন তাতে আরও তাড়াতাড়ি চলে আসতে হল তাকে। সূর্য চৌধুরী লিখেছিলেন যে তাঁর শরীরটা ভালো নয় সে যেন অবিলম্বে চলে আসে। উকিল মানুষ তিনি ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক চেহারা দেবার জন্যে চিঠি লেখার পর থেকেই অসুখের ভাণ করতে লাগলেন। একটু আধটু ব্লাড প্রেসার তাঁর ছিলই, ব্লাড প্রেসারের লক্ষণও জানা ছিল কিছু কিছু, সুতরাং রোগী সাজতে বেশি বেগ পেতে হল না তাঁকে! চিঠি লেখার পরই তিনি ব্রজকে বললেন—"ব্লাড প্রেসার বেড়েছে বোধহয়, মাথাটা টলছে।" পরের দিন থেকে কাছারি যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। ব্রজ ব্যস্ত হয়ে উঠল ডাক্তার ডাকবার জন্য। একজন ডাক্তার এসে দেখেও গেল। তাঁর ব্যবস্থা অনুযায়ী সূর্যকান্ত চলতেও লাগলেন। পটভূমিকাটি চমৎকার তৈরি হয়ে রইল। দিবসের জন্য ব্রজর আকুলতাটা একটু বাড়ল বটে কিন্তু তাতে সূর্য চৌধুরীর খুব বেশি অসুবিধা হল না। ব্রজর অর্ধ-স্বগত আক্ষেপোক্তি, প্রকাশ্য তর্জন, অশ্রু, দীর্ঘশ্বাস এ সবে অভ্যস্ত তিনি। এত আগে থাকতে সূর্য চৌধুরী এত আয়োজন করেছিলেন শুধু ঘণ্টুর বিশ্বাস উৎপাদন করবার জন্যেই নয়। তিনি ঘণ্টুর মারফত দিবসের কাছে নিজের অসুখের সংবাদটাই পাঠাবেন এঁচে রেখেছিলেন। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস তাঁর অসুখের খবর পেলে দিবস নিশ্চয়ই আসবে। তাছাড়া আর একদিক থেকেও বাঁচবেন তিনি। ব্রজ এবং গোবিন্দ সাণ্ডেলের কাছে দিবসের সম্বন্ধে যে ঔদসীন্যটা তিনি জাহির করে রেখেছিলেন (যা করার কোনও প্রয়োজনই ছিল না) এতে সেটা জাহিরই থেকে যাবে। যেন অসুখের জন্যেই বাধ্য হয়ে তাঁকে খবর পাঠাতে হচ্ছে ছেলেকে, এইটেই বড় হয়ে উঠবে, তিনি যে ছেলের জন্য আকুল হয়ে উঠেছেন এই সত্যটা চাপা পড়ে যাবে। ঠিকানা পাওয়ার পর ঘণ্টু এলেই ভালো হত, কারণ তাহলে, ঘণ্টু পরে যা করল সময়াভাবে তা করবার সুযোগই পেত না হয়তো। প্রথমত গোবিন্দ সাণ্ডেলের সঙ্গে সূর্যকান্তের কথোপকথনের খানিকটা আড়াল থেকে

শুনে আকাশ-কুসুম রচনা করবার সময় পেত না এবং দ্বিতীয়ত জটিল গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর যা সে ভেবেছিল—তাও ভাবত না। কিন্তু ঠিকানা পাওয়ার আগেই সে এসে পড়ল এবং ব্রজর মুখে সমস্ত শুনে 'থ' হয়ে গেল। যা তার সুদূরতম কল্পনারও বাইরে ছিল তা প্রথমে তার কল্পনাধীন হল ব্রজরই শ্লেষোক্তিতে। সে যেদিন এল তার পরদিন তাকে জলখাবার দিতে দিতে ব্রজ বললে, "তোরই তো পোয়া বারো হল এবার। রামের তো বনবাস হয়ে গেছে এইবার তুই রাজত্ব কর।"

"আমি রাজত্ব করব মানে?"

"সেই ব্যবস্থাই তো হচ্ছে শুনছি। তোমার মামা আর গোবিন্দবাবু মিলে দিবুকে বিষয়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবে পরামর্শ আঁটছে। ওরা মনে করছে আমি কিছু জানি না, কিন্তু আমি সব জানি, সব দিকে কান থাকে আমার।"

সিঙারায় কামড় দিয়ে উৎক্ষিপ্ত ভ্রূ ঘণ্টু বললে, "তার মানে?"

"মানে তোমারই পোয়া বারো। দিবু যদি বিষয় না পায় তুমি পাবে। দিবুর পর তোমারই তো ক্লেম।"

ব্রজ মাঝে মাঝে দু'একটা ইংরেজি কথাও বলে। ব্রজ বেশিক্ষণ আর দাঁড়াল না, (বেশিক্ষণ সে কোথাও দাঁড়ায় না, কাজে, অকাজে, বিনাকাজে চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্বদা) কিন্তু যে বীজটি সে ঘণ্টুর মনে বপন করে গেল তা ঘণ্টুর মনোজগতে বিপর্যয় ঘটাতে লাগল ক্রমশঃ। যে ঘণ্টু হালে পানি পাওয়া দূরে থাক নৌকোই জোটাতে পারেনি একটা, তার হাতে যেন আলাদিনের প্রদীপ দিয়ে গেল ব্রজ একটা। দিবুদা যদি না আসে তাহলে মামার এত সম্পত্তির সে-ই উত্তরাধিকারি হবে। ভাবা যায় না। কিন্তু আইনত হওয়া তো উচিত! দিবুদা আসছে না কেন? না আসবার কারণটা কি? সামান্য একটু বকেছে বলে, এতদিন নিখোঁজ হয়ে থাকবে? নিশ্চয়ই গুরুতর ব্যাপার আছে কিছু একটা ভিতরে। ব্রজর কথাটা শোনার পর থেকে ঘণ্টুর মনে এই ধরনের নানা ঢেউ উঠতে লাগল। মাঝে মাঝে এ-ও তার মনে হতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত দিবুদা ঠিক এসে পড়বে, এত বড় সম্পত্তি ছেড়ে বিবাগী হয়ে যাবে এ কথা ভাবা যায় না এ যুগে (কথায় কথায় 'একথা ভাবা যায় না' বলাটা ঘণ্টুর একটা মুদ্রা দোষ), তাছাড়া দিবুদা যদি না-ও আসে, মামা যে সম্পত্তি তাকেই দেবেন তারই বা নিশ্চয়তা কি?... ঘণ্টুর চিত্তের যখন এই রকম দোলায়মান অবস্থা তখন একদিন দোতলার জানালা দিয়ে যেতে যেতে সে মামার এবং গোবিন্দ সাণ্ডেলের কথোপকথনের খানিকটা শুনতে পেয়ে গেল হঠাৎ। শোনামাত্র শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল তার ক্ষণিকের জন্য, শিহরন বয়ে গেল সর্বাঙ্গে।

"গোবিন্দ সাণ্ডেল বলছিলেন—"আমি বলছি সে আসবে। ঘণ্টুর নামে বিষয়টি উইল করে দিয়ে সেই খবরটি তাকে পাঠাও। ছুটতে ছুটতে আসবে।"

সূর্যকান্ত বললেন—"সে যদি নিতান্তই না আসে ঘণ্টুই তো বিষয় পাবে, আমার আর কে আছে বল?"

ঘণ্টু আর শুনতে পারল না, তাড়াতাড়ি দালানটা পেরিয়ে ছাতে উঠে গেল সে। বুকের ভিতরটা টিপ টিপ করছিল। এবার তার বিশ্বাস হল সত্যিই মামার বিষয়টা পেয়ে যাবে সে দিবুদা না এলে। শৈশবেই সে পিতৃমাতৃহীন হয়েছে। মামাই তার পড়ার খরচ জুগিয়েছেন।

সেও তো মামার ছেলেরই মতো। 'সে যদি না আসে তাহলে ঘণ্টুই তো বিষয় পাবে, আমার আর কে আছে বল'—সূর্যকান্তের এই কথাগুলো আবার বেজে উঠল কানে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। প্রকাণ্ড বাড়িটার ছবি মানসপটে ফুটে উঠল, ওই প্রকাণ্ড বুইক গাড়িখানা....... এ সবই তার হবে? ভাবা যায় না!

তারপর দিন রাস্তায় দেখা হয়ে গেল জটিল গাঙ্গুলীর সঙ্গে। জটিল গাঙ্গুলী তার আধুনিকতম বন্ধু। ঘণ্টুর ব্যবসার প্ল্যান যেমন বদলায় বন্ধুও তেমনি বদলায়। বইয়ের দোকান করবার মতলব মাথায় খেলছিল যখন তখন বন্ধু ছিল উদীয়মান কবি গোপেন সাহা। গোপেন সাহাই বুদ্ধিটি দিয়েছিল তাকে। বইয়ের দোকান কিন্তু খোলা হল না সুশীল গুহর চক্রান্তে। সুশীল গুহ তাকে বলেছিল, "আরে বই ক'টা লোক পড়ে? ওতে ক'পয়সা পাবে তুমি? তার চেয়ে চাল ডাল তেল নুনের দোকান কর, হু হু করে চলবে।' সুশীল গুহর সঙ্গে দিনকতক খুব মাখামাখি হল ওই সূত্রে। জটিল গাঙ্গুলী আসতে কিন্তু সুশীল গুহকে রণে ভঙ্গ দিতে হল। জটিল গাঙ্গুলীর মস্ত বড় 'কোয়ালিফিকেশন' সে বম্বেতে অনেকদিন কাটিয়েছে। সে বললে—"আরে ছোঃ, চাল ডালের ব্যবসা কি একটা ব্যবসা নাকি? ওর স্কোপ কত লিমিটেড! ওর ফিউচার কি! এখন ফিউচার আছে প্ল্যাস্টিকের। কিছু ক্যাপিটাল যদি ছাড়তে পার দু'দিনেই লাল হয়ে যাবে!"

লাল-স্বপ্ন-জনক এই জটিল গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াতে মনের নিরুদ্ধ ভাব চেপে রাখা অসম্ভব হল ঘণ্টুর পক্ষে। একটি পার্কে বসে সমস্ত কথা সে বললে তাকে। জটিল স্বল্পভাষী লোক। ঘাড়টি ঈষৎ বাঁকিয়ে সিগারেট টানতে টানতে ঘণ্টুর সমস্ত কথা শুনেও চুপ করে রইল সে। কারণ ঘণ্টু যা বললে তাতে সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার মতো কোনও মালমশলা আছে বলে তার মনে হল না।

"মামার বিষয়টা যদি পেয়ে যাই তাহলে ক্যাপিটালের ভাবনা কি? মামার হার্ড ক্যাশই নাকি এক লাখ টাকা আছে শুনেছি। তবে দিবুদা যদি এসে পড়ে তাহলে অবশ্য—"

এইবার জটিল গাঙ্গুলী বোম্বাই ফোড়নটি ছাড়লেন।

"তোমার মামার টাকার উপর সত্যিই যদি নির্ভর করতে চাও তাহলে তোমার দিবুদা যাতে না ফেরেন সেই চেষ্টাই করা উচিত তোমার।"

"তা কি করে সম্ভব। দিবুদা কোথায় আছে তাই জানা নেই প্রথমত। দ্বিতীয়ত—"

"যদি সম্ভব হয় তাহলেই বলছি। না যদি সম্ভব হয় তাহলে আর কি করে করবে? আচ্ছা উঠি এবার।"

"হ্যাঁ চল, মামার জন্যে ওষুধ আনতে যেতে হবে আমাকে।"

জটিল গাঙ্গুলীর সঙ্গে আলাপের পর ঘণ্টুর চিন্তাধারা জটিলতর হয়ে গেল। তার এবং তার ভবিষ্যতের মাঝখানে নিরুদ্দিষ্ট দিবসের ছায়ামূর্তিটা প্রেতের মতো সঞ্চরণ করে বেড়াতে লাগল।

গহনচাঁদ নিজের ঘরে বসে তানপুরা বাজিয়ে নূতন যে শিব-স্তোত্রটিতে সুর দিয়েছিলেন সেইটে গাইছিলেন তন্ময় হয়ে।

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে
স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো
ভূতেশ ভীত-ভয়-সূদন মামনাথং
সংসার দুঃখ গহনাজ্জগদীশ রক্ষ।

মহাদেবের মহিমায় ততটা নয়, তিনি যে স্তোত্রটাতে সুর বসাতে পেরেছেন এরই আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠেছিল তাঁর মন। তাঁর বন্ধু বিশ্বনাথ কথক একটু পরেই আসবেন চুনীলাল তাঁকে আনতে গেছে স্টেশনে। একাই গেছে। চুনীলাল আর একটা মতলব করেছিল ইতিমধ্যে। সে ভেবেছিল বাড়িটা বাঁধা দিয়ে যদি বেশি কিছু টাকা পাওয়া সম্ভব হয় তাহলে সেই বাড়তি টাকাটা নিয়ে হরলাল সিংহির ধারটা সে শোধ করে ফেলতে পারবে। কিন্তু বেশি টাকা পাওয়া সম্ভব কি না, বিশ্বনাথ কথক টাকা পাবার কোথায় কি বন্দোবস্ত করেছেন এই সবেরই একটা হদিস পাওয়ার জন্যে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্টেশনে গিয়েছিল বিশ্বনাথ কথককে আনতে। গহনচাঁদও সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু গহনচাঁদকে কৌশল করে নিবৃত্ত করেছিল সে। কারণ গহনচাঁদের সামনে ওসব টাকাকড়ির আলোচনা উত্থাপনই করা যাবে না। স্টেশনে যেতে না পেয়ে গহনচাঁদ শঙ্করাচার্যের স্তোত্রটাকে নিয়ে পড়েছিলেন। বিশ্বনাথকে তাক লাগিয়ে দেবেন তিনি! সীতারাম এখনও এসে পৌঁছায়নি এই চিন্তাটা মাঝে মাঝে অধীর করছিল তাঁকে, এই জন্যে মাঝে মাঝে একটু অন্যমনস্কও হয়ে পড়ছিলেন, তথাপি তিনি মশগুল হয়েই ছিলেন। সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে সুর মিলে অদ্ভুত পরিবেশ হয়েছিল একটা।

পাশের ঘরে ছিল ঊর্মি আর রঙ্গনা। ঊর্মির সঙ্গে রঙ্গনার বন্ধুত্ব বেশ জমে উঠেছিল এই কদিনের মধ্যেই। বয়স যখন কম থাকে তখন বন্ধুত্বটা খুব তাড়াতাড়ি জমে যায়। তাছাড়া ঊর্মির অদ্ভুত একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। আলাপ না করে সে ছাড়ে না। ইনসিওরেন্স কোম্পানির লোকেরা খবর পেলে নিশ্চয় তাকে দালাল নিযুক্ত করতে চাইত এবং করে লাভবানও হত। রঙ্গনার গানের প্রশংসা করে মলঙ্গা লেনের সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে কিরণের গান রেকর্ড করবার ব্যবস্থা প্রায় সে করে ফেলেছে। জীবনের আরম্ভে ভাগ্য-দেবতা যদিও প্রতিকূল স্রোতের মুখে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, সে কিন্তু সাঁতরে ঠিক পার হয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই দমবে না। ঊর্মি না হয়ে আর কেউ হলে রঙ্গনার সঙ্গে এত সহজে আলাপ জমাতে পারত না। রঙ্গনা লোক খারাপ নয়, কিন্তু মনে সুখ নেই তার, কিরণের মতোই তার মনের অবস্থা, স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের মিল হচ্ছে না কিছুতেই এবং তার ফলে মনের ভিতর এতরকম প্যাঁচের সৃষ্টি হয়েছে যে ইচ্ছে থাকলেও কারও কাছে সে মন খুলতে পারে না সহজে। অনেকগুলো প্যাঁচ কিন্তু সহসা শিথিল হয়ে গেছে দিবসের সংস্পর্শে এসে। তার স্বপ্নটা যেন বাস্তবে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। যাবজ্জীবন-কারাবাস-দণ্ডিত বন্দী হঠাৎ যেন আভাস পেয়েছে সে মুক্তি পাবে, কোথায় কি ভাবে তা যদিও সে জানে না, কিন্তু মুক্তির আভাস যেন হাওয়ায় ভাসছে। দিবসের সম্বন্ধেই কথা হচ্ছিল তাদের। রঙ্গনার মন দিবসের সম্বন্ধেই আলোচনা করতে চাইছিল কারও সঙ্গে, ঊর্মির মতো সহৃদয় সহানুভূতিশীল সঙ্গী পেয়ে বেঁচে গেছে যেন সে।

...বিশ্বনাথ কথক, চুনীলাল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রমজান সীতারাম এসে পড়াতে

গহনচাঁদের সংগীত-চর্চা এবং রঙ্গনার কল্পনাবিলাস ব্যাহত হল। সবাই বাইরের ঘরে এসে হাজির হলেন।

"আরে, এর মধ্যেই ট্রেন এসে গেল নাকি। বস বস বস। ট্রেনে কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই, যা ভিড় আজকাল। বস বস।"

গহনচাঁদ এমন নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেছিলেন বিশ্বনাথকে যে বসা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

"ছাড় ছাড়, এমন জড়িয়ে ধরলে বসব কি করে?"

সীতারাম রমজানের অভিবাদনের উত্তরে কথক মশাই হেসে বললেন, "তোমরাও বেশ জমে গেলে দেখছি এখানে—অ্যাঁ!"

রঙ্গনাও এগিয়ে এসে প্রণাম করল।

"আরে এটা যে লাউডগার মতো তরতরিয়ে বেড়ে উঠেছে দেখছি!"

সবাই উপবেশন করলে পর কথক মশাই গহনচাঁদের দিকে সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, টাকার জোগাড় করে এনেছি, এবার মা-জননীর বিয়েটা লাগিয়ে দাও। পাত্রটি তো বেশ ভালো পেয়েছ চুনীর মুখে শুনলাম।"

রঙ্গনা অপ্রত্যাশিত ভাবে বলে উঠল, "আমি বিয়ে করব না ওখানে। আমার বিয়ের জন্যে বাড়ি বাঁধা দিয়ে পণ সংগ্রহ করতে হবে না।"

বলেই সে উঠে চলে গেল। ঊর্মিও অনুসরণ করল তাকে।

কথক মশাই হতভম্ব হয়ে গেলেন। অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন গহনচাঁদ। কথক মশাই বললেন, "বিয়ের কথা উঠলে আগে তো ছেলেরাই বলত বিয়ে করব না। আজকাল মেয়েরাও বলছে না কি?"

গহনচাঁদ অপ্রস্তুতমুখে বললেন, "বাড়ি বাঁধা দিয়ে পণের টাকা সংগ্রহ করা হচ্ছে কি না সেইজন্যেই ওর রাগ। লেখাপড়া শিখেছে তো!"

"বাড়ি বাঁধা না দিলে পণের টাকা পাবে কোথায় তুমি? আর পণ না হলে বিয়েই বা হবে কি করে?"

"সে তো আমি বুঝেছি। বুঝিয়ে বলেওছি ওকে।"

মুচকি হেসে কথক বললেন, "ঘাবড়ো না, সব ঠিক হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত। এক কাজ করা যাক, সাবিত্রী সত্যবানের কথকতাটা ওকে শুনিয়ে দেওয়া যাক। শুনলে বুঝবে যে আমাদের কিছুই হাত নেই, সবই বিধির নির্বন্ধ। ধর্মগ্রন্থ তো পড়ে না আজকালকার ছেলেমেয়েরা।"

এ শুনে গহনচাঁদ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

"বেশ তো কালই লাগাও। তৈরি আছে তোমার তো?"

"হ্যাঁ, আমি সব সময়ই তৈরি। তুমি এখানে একটা গানের ইস্কুল খুলেছ না কি শুনলাম।"

"হ্যাঁ জুটে গেছে কিছু ছাত্র-ছাত্রী এখানেও। আমি আর একটা কাজ নিয়ে মেতে আছি। শিব-স্তোত্রগুলোতে নতুন নতুন সুর বসাবার চেষ্টা করছি। শোনাব তোমাকে।"

"বেশ তো, চুনী কোথায় গেল, আমার তোরঙ্গটা নাবিয়েছে কি না।"

"সব নাবিয়েছে"—নেপথ্যে থেকে উত্তর দিলে চুনীলাল। বেচারা দমে গিয়েছিল। বাড়ি বাঁধা দিয়ে সাত হাজার টাকার বেশি পাওয়া যায়নি। ও টাকাটা তো বিয়েতেই খরচ হয়ে যাবে, কিছুই বাঁচবে না!

"চল চল ভেতরে চল। সীতারাম, রমজান, বস তোমরা।"

বিশ্বনাথ কথককে নিয়ে গহনচাঁদ শশব্যস্ত হয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন।

সীতারাম এবং রমজান দুজনেই কিন্তু বজ্রাহতবৎ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। গুরুজির কাশীর বাড়ি বাঁধা দিয়ে পণের টাকা সংগ্রহ করা হচ্ছে! সে কি! এর একটা বিহিত করতে হবে তো। রঙ্গনার মতো মেয়েকে বিয়ে করতে পাওয়াটাই তো ভাগ্যের কথা, তার জন্যে আবার পণ লাগবে অত টাকা, বাড়ি বাঁধা দিতে হবে? নিম্নকণ্ঠে পরামর্শ করে ঠিক করে ফেললে তারা যে দিবসবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে 'সল্লা' করতে হবে। গুরুজির বাড়িটা মহাজনের হাতে যেতে দেওয়া হবে না। দিবসবাবু লোকটিকে যতই দেখছে তারা, ততই তার উপর শ্রদ্ধা বাড়ছে। তিনি হয়তো ব্যবস্থা করতে পারবেন কিছু। ব্যবস্থা করতেই হবে! জরুর!

দিবসের মনের নেপথ্যলোকে পরিবর্তনের যে আভাসটা জাগছিল ধীরে ধীরে তা আর আভাসমাত্র রইল না। ক্রমশ সে উপলব্ধি করল যে এই সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ কল্পনা-উল্লাস-বর্জিত কর্মজীবনে আনন্দ সে আর পাচ্ছে না। এই 'রুটিন'-চিহ্নিত জীবন তার কাছে কারাগারের মতো ঠেকছিল, তার কারণ এতে কল্পনার খোরাক নেই, আত্মানুসন্ধান নেই, অজানার উদ্দেশ্যে অভিযানের আয়োজন নেই, আছে কেবল শুষ্ক কাজ, যা প্রেরণাহীন, উদ্দীপনাহীন। একই জিনিসের বিরামহীন পুনরাবৃত্তি।

যে বি-এস-সি ছেলেটিকে সে দুপুরে পড়ায় তার সান্নিধ্যে এলেই সে চাঙ্গা হয়ে ওঠে খানিকক্ষণের জন্য। একদিন ছেলেটির অসুখ করেছিল, সেদিন সে সোজা চলে গেল কলেজে। প্রফেসারদের সঙ্গে কথা বললে, দু'একজন সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হল, ল্যাবরেটরিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াল খানিকক্ষণ, এটা সেটা নাড়লে, তারপর চলে এল। একজন প্রফেসার প্রশ্ন করেছিলেন, "কি করছ তুমি আজকাল? শুনেছিলাম ল' কলেজে ঢুকেছ?"

"তেমন বিশেষ কিছুই করছি না। ল' কলেজ ছেড়ে দিয়েছি।"

"আমরা আশা করেছিলাম তুমি রিসার্চ লাইনেই থাকবে।"

"দেখি আর বছর চেষ্টা করব।"

নিজের বর্তমান জীবনের কথা কাউকেই কিছু বললে না সে। কলেজের চারিদিকে ঘুরে সে যেন ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল। নিজের প্রিয়া অপরের গলায় মাল্যদান করেছে দেখলে প্রথম উত্তেজনার পর যে অবসাদ আসে সেই ধরনের একটা বিষাদ তার সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে ফেললে। কলেজ থেকে বেরিয়ে একটা গলিতে ঢুকে সোজা হাঁটতে লাগল। সদর রাস্তা দিয়ে পারতপক্ষে সে হাঁটতে চায় না, কারণ হাঁটতে হাঁটতে সে চিন্তা করে, অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

রঙ্গনাকে ঘিরে তার চিত্তে যে বর্ণলোক সৃজন করেছিল তার দ্যুতিও ম্লান হয়ে এসেছে। গিরি-নির্ঝরিণী যে গহ্বরে পড়ে কিছুক্ষণের জন্য প্রপাতের আনন্দে পথহারা হয়েছিল সে গহ্বর পূর্ণ হয়ে গেছে, জল উপচে পড়ছে, নির্ঝরিণী নূতন পথ খুঁজছে আবার। রঙ্গনাকে তার যে

আর ভালো লাগছিল না তা নয়, ভালো খুবই লাগছিল, কিন্তু উন্মাদনাটা আর ছিল না। নেশাটা হঠাৎ কেটে গেছে যেন। সেদিন স্টেশনে 'বাস' ট্যাক্সির আলোচনার জন্যই হোক বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক তার অন্তর্যামী মনে যেন জানতে পেরেছে যে তার দারিদ্র্যের আদর্শকে মেনে নিয়ে শুধু তার গৌরবে গৌরবান্বিত হবার প্রবণতা বা চারিত্রিক বল রঙ্গনার নেই। আর পাঁচটা মেয়ের মধ্যে রঙ্গনা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার করতে চায়। আদর্শের দুরূহ পথে অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে মরু-পর্বত উত্তীর্ণ হবার বাসনা তার নেই। সামর্থ্যও নেই বোধহয়। তার নিজেরই কি আছে? একটা আদর্শকে রূপ দেবার জন্যেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, এরই মধ্যে অবসন্ন হয়ে পড়ছে কেন? কি তার কাম্য? গবেষণার কল্পলোকে একদিন তাকে পৌঁছতেই হবে, কিন্তু তার আগেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে কেন? সহসা তার মনে হল গীতা উপনিষদ সে কিছু কিছু পড়েছে বটে, নিষ্কাম কর্মের তত্ত্বটা আওড়াতেও পারে, কিন্তু তা তার অন্তরে সঞ্চারিত হয়নি, চরিত্র গঠন করেনি, তাই তার এই বিষাদ। পরমুহূর্তেই তার আবার মনে হল যা তার নেই তা নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই, যা তার আছে সেইটে সম্বল করেই তাকে অগ্রসর হতে হবে। কি সেটা?

কিছুক্ষণ পরে তার মনে হল অজানাকে জানবার আকাঙক্ষাই তার একমাত্র সম্পদ। অসংখ্য মুনি ঋষি বিজ্ঞানী আবিষ্কারক যে প্রেরণায় বহুবিধ কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন, সেই প্রেরণাই তারও সম্বল। সেই অজানাই হয়তো ভগবান। এই কথাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তো বলেছেন—

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিসু।

আমিই পৃথিবীতে পুণ্য গন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সর্বভূতে জীবন এবং তপস্বিগণের তপোবল। তার নিউক্লিয়ার এনার্জির গবেষণাও তাহলে ভগবদারাধনাই। সে জিজ্ঞাসু। তাহলে সে এত অবসন্ন হয়ে পড়ছে কেন? এই একটা বছর কষ্ট করে সে যদি কিছু টাকা জমাতে পারে তাহলে আবার সে নিজের অভীষ্টপথে চলতে পারবে। তার মনের ভিতর কে যেন বলে উঠল—'তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়'। হঠাৎ সে যেন আত্মস্থ হল এবং আত্মস্থ হয়েই আনন্দিত হল। তার মনে হল গীতার নিষ্কাম বৈরাগ্য হয় সে লাভ করতে পারেনি (পারেনি বলে খুব যে একটা দুঃখ আছে তাও নয়) কিন্তু গীতার কর্ম-প্রেরণা সে লাভ করেছে, এই কর্ম-প্রেরণাই হয়তো একদিন তাকে নিষ্কাম লোকে উত্তীর্ণ করে দেবে। যদিও সে বিজ্ঞানের ছাত্র কিন্তু গীতা উপনিষদের প্রতি তার একটা শ্রদ্ধা আছে, হয়তো বিজ্ঞানের ছাত্র বলেই শ্রদ্ধাটা আরও গভীর। যে সত্য সন্ধানে বিজ্ঞান ব্যাপৃত, তার মনে হয়েছে সেই সত্যের আভাস, সন্ধান এবং উপলব্ধির সংবাদ ওই গ্রন্থগুলিতেই আছে সুতরাং গীতার বাণীর সঙ্গে তার আচরণের খানিকটা মিলও যে আছে এটা আবিষ্কার করে সে খুশি হল। আপন মনেই শিস দিলে খানিকক্ষণ। শিস দিতে দিতেই চলেছিল। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল কিরণের সঙ্গে।

"তিনবার তোর বাসায় গিয়ে ফিরে এসেছি। তুই বাড়িতে থাকিস কখন আজকাল?"

"রাত এগারোটার পর!"

"দুপুরে কি করিস?"

"দুপুরে একটা টিউশনি নিয়েছি।"

"সন্ধের পর?"

"সরোদ শিখতে যাই। তুই যাস না কেন?"

"সময় হয় না ভাই।"

নীরবে কিছুক্ষণ পাশাপাশি হাঁটবার পর কিরণ বললে, "তোর বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল একদিন রাস্তায়।"

"তাই না কি?"

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল দিবস।

"তারপর?"

"তোর ঠিকানাটা জানতে চাইলেন।"

"দিয়েছিস না কি?"

তার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে উঠল, আশঙ্কায় নয়, আশায়।

কাল রাত্রেই সে ভাবছিল বাবা যদি হঠাৎ এসে পড়েন—তারপর যে কি হবে তা সে কল্পনা করতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলেছিল, ফিরে যে যাবে না তা ঠিক, কিন্তু বাবা যদি আসেন, তাহলে—

"না। তুই মানা করেছিলি, তোকে না জিগ্যেস করে ঠিকানা দিতে পারি কখনও?"

দিবস বললে বটে—"ঠিক করেছিস" কিন্তু ভিতরে একটু হতাশ হল সে। আরও কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটার পর কিরণ মুচকি হেসে বললে—"আমি আশা করেছিলাম যে এর মধ্যে একদিনও অন্তত তুই আমার বাসায় যাবি, অন্তত রবিবারটায়।"

"সময়ই পাচ্ছি না।"

"সময় না পাবার যে কারণগুলো তুই বললি তাছাড়া আর একটা কারণেরও খবর পেয়েছি ঊর্মির কাছে।"

"কি?"

"রঙ্গনা।"

"আরে দুৎ, পাগল না কি! কি বলেছে তোকে ঊর্মি?"

কিরণের ভয় হল দিবস তো ঊর্মির সম্বন্ধে এখনই একটা খারাপ ধারণা করে বসবে—ভাববে সাধারণ মেয়েদের মতো ঊর্মিও হয়তো পরনিন্দা-পরচর্চা-পরায়না।

"না, না এমন বিশেষ কিছু বলেনি সে। তুই যেদিন রঙ্গনার জন্যে আয়নাটা কিনে নিয়ে গিয়েছিলি সেদিন ঊর্মি সেখানে ছিল কি না, সেই আয়নার খবরটাই আমাকে বলছিল। আর কিছুই বলেনি। মানে তুই যা—"

কথার পারম্পর্য আর ঠিক রাখতে পারলে না সে, কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল সব। রঙ্গনার সম্বন্ধে দিবসকে যতটা কড়া ভাষায় সে সাবধান করে দেবে ভেবেছিল ঊর্মির প্রসঙ্গ উঠে পড়াতে ততটা কড়া হবার সামর্থ্যই আর তার রইল না।

"একটা আয়না কিনে দিয়েছি বটে, তার কারণ আমার চোখের সামনেই ওর আয়নাটা ভেঙে গেল কি না, হঠাৎ কেমন একটা শিভলরি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। মনের ভিতর, বুঝলি?"—মুচকি হেসে চাইলে সে কিরণের দিকে—"তাছাড়া আর একটা কথাও মনে হয়েছিল, সত্যি এত বিচিত্র আমাদের মন—"

"কি কথা?"

"মনে হল আয়নাটা কিনে দিয়ে দেখিই না ও কি করে। রিঅ্যাকশন্‌টা কি রকম হয়?"

"কি রকম হল?"

"ভালোই হল। অর্থাৎ চটে উঠলে সে। সাধারণ মেয়ে হলে খুশি হত।"

"তাহলে রঙ্গনা যে অসাধারণ মেয়ে এ ধারণাটা তোর হয়েছে অন্তত?"

"হয়েছিল কিন্তু টিকল না। তোর কথাই ঠিক খোলার ঘরে ও আসবে না, এলেও স্বস্তি পাবে না। থাক, ও কথা নিয়ে আমি আর মাথাই ঘামাচ্ছি না। সেই যে তুই একটা কবিতা লিখেছিলি মনে আছে? 'হয় তো স্বপন হয় তো ভুল, ফুটিল এবং ঝরিল ফুল' এখন আমার মনের অনেকটা সেইরকম অবস্থা"—অকৃত্রিম হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল দিবসের মুখ।

"মানে রঙ্গনার সম্বন্ধে মোহটা তোর কেটে গেছে বলছিস?"

"একেবারে।"

"সত্যি?"

"সত্যি বলছি।"

দিবসের কণ্ঠস্বরে এমন একটা সুনিশ্চিত দৃঢ়তার সুর বাজল যে কিরণ নিঃসংশয় হল। নিঃসংশয় হয়ে সে শুধু অবাকই হল না, একটু ক্ষুব্ধও হল, কেমন যেন একটু হিংসাও হল তার। মনে হল আহা সেও যদি ঊর্মির মোহটা এমনি ভাবে কাটিয়ে উঠতে পারত। কথাটা বলে দিবসও কেমন যেন একটু বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। রঙ্গনাকে সে ভালোবাসতে পারল না এই সত্যটা যেন তাকে পীড়িত করতে লাগল। তার মনে হতে লাগল একটা গোটা মানুষকে একটা বিশেষ আদর্শের মাপে মাপতে গিয়ে যদি কিছু ঘাটতিই পড়ে থাকে তাই বলে তাকে ভালোবাসা যাবে না কেন? সহসা একটা সত্যের সম্মুখীন হল সে। তার মনে হল ওটা ছুতো। যে নিগূঢ় কারণে প্রথম দর্শনেই প্রেম হয় সেই নিগূঢ় কারণটারই অভাব আছে এক্ষেত্রে। দোকানে টাঙানো নূতন ধরনের ছিট যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে রঙ্গনাও তেমনি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তার প্রেমে সে পড়েনি। পড়লে আদর্শের কথা ভাববারই অবসর হত না তার। আবার মনে হল সত্যিই কি হত না? এতই দুর্বল সে? তার চিন্তাধারা বিঘ্নিত হল কিরণের প্রশ্নে।

"সত্যিই তুই বাড়ি ফিরবি না নাকি?"

"নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তারপর ফিরব। তার আগে নয়।"

"তোর বাবা বলেছিলেন বাড়ি ফিরে গিয়েও তুই তোর নিজের আদর্শ অনুসারে যদি চলতে চাস তাহলে বাধা দেবেন না তিনি।"

"তিনি হয়তো বাধা দেবেন না, কিন্তু ওই বাড়িতে থাকাটাই একটা বাধা যে, এটা তুই বুঝতে পারছিস না। আমি নিজেকে যাচিয়ে দেখতে চাই যে নিজের শক্তিতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি কি না, তার জন্যে সব রকম কষ্ট সহ্য করতে পারি কি না। বাড়িতে থেকে তা হবে কি করে?"

"তোর ঠিকানাটা তাহলে তোর বাবাকে জানাব না?"

"সেটা তোমার ইচ্ছে। তুমি তো আমার চাকর নও যে তোমাকে আমি হুকুম করতে পারি।"

কথাটা এর বেশি অগ্রসর হবার আর সময় পেল না। একটা দোতলার জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে সীতারাম সহসা কলরব করে উঠল—"ওয়া ওয়া ওয়া—দিবসবাবু যা রহে হেঁ। দিবসবাবু এক মিনিট ঠহর যাইয়ে।"

দিবস ঊর্ধ্বমুখ হয়ে থেমে গেল।

কিরণ বললে, "আমি চললুম। সময় করে আসিস মাঝে মাঝে আমার বাসায়। এ সপ্তাহটা সন্ধের পর আমি রোজই বাসায় থাকব। ন'টা নাগাদ যদি আসিস দেখা হবে।"

"আচ্ছা চেষ্টা করব।"

কিরণ চলে গেল। তার বিশ্বাস হল যে রঙ্গনার মোহ দিবস সত্যিই কাটিয়েছে, ও নিয়ে উদ্‌বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই আর। সূর্য চৌধুরীকে দিবসের ঠিকানাটা না জানানোই ঠিক করে ফেললে সে। দিবসের যখন সেটা আন্তরিক ইচ্ছে নয় তখন দরকার কি।

সীতারাম তাড়াতাড়ি উপর থেকে নেমে এল।

"ওফ, তফাক সে আপকো দর্শন মিল গ্যয়া। আপ হি কো বাত হম দোনো স্মরণ কর রহে থে।"

দিবসকে টেনে সে উপরে নিয়ে গেল এবং রঙ্গনার বিয়েতে গহনচাঁদের যথাসর্বস্ব বাড়িটি যে সুদখোর মহাজনের হাতে চলে যাচ্ছে তা সবিস্তারে বর্ণনা করে দিবসকে এর উপায় নির্ধারণ করতে বললে। দিবস কি যে বলবে তা ভেবেই পেল না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললে, "আচ্ছা দেখি কি করতে পারি।"

বিকাশবাবু মনের আনন্দেই ছিলেন। এর অর্থ এ নয় যে তিনি রঙ্গনাকে পাওয়ার স্বপ্নেই বিভোর হয়ে ছিলেন সর্বদা। তিনি তাঁর বেহালা, ক্লাব, টেনিস, মোটর, সমরেশ জাতীয় বন্ধুর খোশামোদ প্রভৃতি উপাদানে গড়া তাঁর নিজস্ব জগতে নিজেকে নিয়েই কাল কাটাচ্ছিলেন যথারীতি। যে মেয়েটিকে হঠাৎ দেখে পছন্দ হয়েছিল সেই মেয়েটিই বধূরূপে অদূর ভবিষ্যতে তাঁর গলায় মাল্যদান করবে এই ধারণাটা তাঁর আকাশকে কিছুটা রঙীন করে তুলেছিল নিশ্চয়ই কিন্তু তা নিয়ে মনে মনেও তিনি খুব একটা মাতামাতি করছিলেন না। আলতোভাবে উপভোগ করছিলেন পরিস্থিতিটা। জ্যাঠামশাই মত না দিলে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হত তিনি মত দেওয়াতে তাও হয়নি। কুষ্ঠি নিয়ে একটা গোলমালের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু চুনীলালবাবু বুদ্ধিমান লোক, মাস্টার 'কি'র (key) মতো এমন এক মাস্টার কুষ্ঠি এনে দিয়েছিলেন যে সে কুষ্ঠির সঙ্গে যে কোনও কুষ্ঠির মিল হতে বাধ্য। রঙ্গনার কুষ্ঠিটা দেখে জ্যাঠামশাই খুব পুলকিত হয়েছেন না কি। কুষ্ঠি ব্যাপারে বিকাশবাবুর নিজের তেমন আস্থা নেই। তাঁর মতে জীবনে যখন প্রতি মুহূর্তে কত অজানাকে মেনে নিতে হবে তখন ভাবী পত্নীর অদৃষ্ট সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলেই যে জীবনযাত্রা নিষ্কণ্টক হয়ে যাবে এ বিশ্বাস মূঢ়তারই নামান্তর।

বিকাশবাবুকে দেখলে আধুনিক মনে হওয়ারই কথা। তিনি আধুনিক সময়ে জন্মেছেন, আধুনিক শিক্ষা পেয়েছেন, আধুনিক চাল-চলনে চলেন, কিন্তু সত্যিকারের আধুনিকতা, যা প্রাচীন কুসংস্কারকে ভেঙে নূতন পথ সৃষ্টি করে তা তাঁর নেই। তিনি একালে জন্মেছেন বলেই ড্রেসিং গাউন গায়ে দিয়ে পাইপ টানেন, সেকালে জন্মালে শাল গায়ে দিয়ে গড়গড়া টানতেন।

নির্বিবাদী লোক তিনি, গতানুগতিক ধারায় ঝড়ঝাপটা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নির্বিঘ্ন জীবন যাপন করতেই তিনি অভ্যস্ত। তাই চুনীলালের অনুরোধটা রাখতে পারলেন না। চুনীলাল এসে অনুরোধ করেছিল বিকাশবাবু যদি তাঁর জ্যাঠামশাইকে একটু বলেন পণের টাকাটা হয়তো কম করে দেবেন তিনি।

বিকাশবাবু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—"দেখুন পণের টাকার প্রতি 'পারসোনালি' আমার কোনও লোভ নেই, কিন্তু জ্যাঠামশাইকে পণের টাকা কমাবার কথা আমি বলতে পারব না। কারণ ওটা ওঁর এলাকা, পরের এলাকায় ঢুকে ঝামেলা সৃষ্টি আমি করতে পারব না, আমাকে মাপ করুন।"

চুনীলালকে মাপ করতে হয়েছিল। বিকাশবাবুর কাছে একটা প্রতিশ্রুতি অবশ্য সে আদায় করে নিয়েছিল। বিয়েটা হয়ে গেলেই তিনি তাঁর নূতন বাড়ির জন্য অন্নদা বিশ্বাসের ইলেকট্রিক দোকানের মালপত্রগুলো কিনে নেবেন। চুনীলাল দোকানটাকে অন্নদা বিশ্বাসের দোকান বলেই চালিয়েছিল বিকাশবাবুর কাছে। তার মনে হয়েছিল তাহলেই বিকাশবাবুর কাছে 'অ্যাপীল' করারও সুবিধা হবে, দামের সম্বন্ধে কোনও গোলযোগ হবে না। মামাশ্বশুরের দোকান জানতে পারলেই ছোকরা 'গয়ং গচ্ছ' করবে, আর দাম যদি কম করতে বললে, 'না' করা যাবে না।

বিশ্বনাথ কথক আসার পরদিনই চুনীলাল বিকাশকে জানিয়ে গেল যে প্রকাশবাবু রঙ্গনাকে দেখার দিন স্থির করে ফেলেছেন। মেয়ে পছন্দ হলে সাতদিনের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যাবে। মেয়ে যে পছন্দ হবেই এ সম্বন্ধে বিকাশের অন্তত কোনও সন্দেহ ছিল না।

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ॥

সেদিন স্টেশনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দিবসের বাসে উঠে রঙ্গনা মনে মনে লজ্জায় মরে গিয়েছিল, তার বারবার মনে হয়েছিল যেচে গিয়ে অমন করে গায়ে পড়ে আলাপ করার কোনও অর্থ হয় না। মনে হয়েছিল বটে, যাবার লোভ কিন্তু সে সম্বরণ করতে পারেনি। অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে এর স্বপক্ষে একটা যুক্তিও সে খাড়া করেছিল অবশেষে। যাকে ভালো লাগে তার কাছে যাবেই না বা কেন? নিজেকেই প্রশ্ন করেছিল সে। আত্মসম্মানহানিকর কোনও আচরণ না করলেই হল।

দ্বিতীয় দিন কলেজ-ফেরত দিবসের বাসার উদ্দেশ্যে সে যখন চলেছিল তখন যে ক্ষোভ তার চিত্তকে মথিত করছিল তা আত্মগ্লানিজনক নয়। তার ভয় হচ্ছিল দেরি হয়ে গেছে, দিবসকে হয়তো বাসায় পাওয়া যাবে না। মালাগুলো কিনতেই দেরি হয়ে গেল তার। আজ সন্ধ্যার পরই কথকতা করবেন বিশ্বনাথ কথক। গহনচাঁদ তাই তাকে কলেজ-ফেরত কিছু ফুলের মালা কিনে আনবার ফরমাস দিয়েছিলেন। বিশ্বনাথ কথক আসবার পর দিবস আর যায়নি একদিনও। তাকে যেতে হচ্ছিল অতসী ক্লিনিকে। 'দিবস কেন যায়নি' এই কৌতূহলটাকে কিছুতেই দমন করতে না পেরে শেষে দুটো ওজুহাত খাড়া করেছিল রঙ্গনা। দিবসের 'আই উইল্ নট্ রেস্ট' বইটা তার কাছে রয়েছে, এইবার সেটা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। তাদের বাড়িতে কথকতা হচ্ছে এ খবরটাও তাকে দেওয়া উচিত। দ্বিবিধ ঔচিত্যবোধের তাগিদে

সে যেন একটা কর্তব্য সম্পাদন করতে চলেছিল। সেদিন 'বাসে' মনের যে অংশটা কুণ্ঠিত হয়েছিল সে-ই এখন ধমকাচ্ছিল অতি-বিশ্লেষণকারী অংশটাকে। এই অতি-বিশ্লেষণকারী অংশটা কিন্তু ছিল, তার প্রতিবাদ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল যদিও, তবু সে বলে যাচ্ছিল এ ঠিক হচ্ছে না, যতই ব্যাখ্যা কর, কিন্তু ঠিক হচ্ছে না, আত্মসম্মানে ঘা লাগছে।

রঙ্গনা গিয়ে দেখলে দিবসের ঘরে তালা বন্ধ। সোজা চলে গেল উঠোনে। হাঁসটা বসেছিল একধারে গুটিসুটি হয়ে। তার কাছে গিয়ে রঙ্গনাও বসল। রঙ্গনাকে বসতে দেখে প্রতিবাদ করে উঠল হাঁসটা।

"আঃ আঃ চু চু"—মালার ঠোঙা দেখিয়ে ডাকল সে হাঁসটাকে। হাঁসটা সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল একবার। খাবার-টাবার দেবে না কি সত্যি?

এমন সময় সৌদামিনী এল।

"ও আপনি।"

"দিবসবাবু বেরিয়ে গেছেন বুঝি? তাঁর ঘর বন্ধ দেখলাম।"

"সে গেছে হাসপাতালে বোধ হয়।"

"কেন?"

"পটলির স্বামীকে দেখতে। তাকে হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে কিনা।"

"ও, খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল বুঝি?"

"খুব। কয়েকটা ইনজেকশন পড়াতে এখন একটু ভালোর দিকে।"

সৌদামিনীর সঙ্গেই দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগল রঙ্গনা।

সাড়ম্বরে কথকতা শুরু করেছিলেন বিশ্বনাথ কথক।

আবেগভরে কিন্তু যে সুর ধরেছিলেন তিনি—(সেই চিরন্তন সুর যা যুগে যুগে নিত্যনব বেশে ফিরে ফিরে আসছে বারবার)— সেই সুর যে তাঁদের উদ্দেশ্যটাকেই পণ্ড করে দিচ্ছে এ খেয়াল ছিল না তাঁর। 'বিধির নির্বন্ধ' কথাটা প্রথম প্রথম দু'একবার উচ্চারণ করেছিলেন তিনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাবাবেগে তিনি যে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছিলেন তা কোনও রকম নির্বন্ধ দিয়েই সীমাবদ্ধ নয়।

"প্রেম এমনই জিনিস"—বলে চলেছিলেন তিনি—"কুসুমের মতো কোমল অথচ বজ্রের মতো কঠিন, আকাশের মতো সীমাহীন অথচ রত্নের মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ, সৌরভের মতো সূক্ষ্ম অথচ পর্বতের মতো দৃঢ়। স্বয়ং সৃষ্টি-কর্তা যার জন্যে প্রতি জীবের অন্তরে ভিখারী সেজে বসে আছেন সেই প্রেমই মানব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বপ্ন, সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য। মানবের সমস্ত কাব্য, সমস্ত পুরাণ তাই প্রেমের মহিমাতেই সমুদ্ভাসিত। বস্তুত এই আমাদের তপস্যা, এই তীর্থেই আমরা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে উত্তীর্ণ হতে চাচ্ছি। প্রেমই ভগবান, প্রেমই শক্তি। এই শক্তিতেই জনক-দুহিতা সীতা তুচ্ছ করতে পেরেছিলেন ত্রিভুবনজয়ী রাবণের ঐশ্বর্যকে, বৃষভানুনন্দিনী রাধা সহ্য করতে পেরেছিলেন সমাজের সহস্র অত্যাচার। প্রেম এমনিই জিনিস। তা মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে দিয়ে গিরি লঙ্ঘন করায়। প্রেম ঐশ্বর্যের কাঙাল নয়, প্রেম মোহ নয়, প্রেম দিব্য দৃষ্টি। শ্রীরাধিকা মথুরার রাজা শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসেননি, ভালোবেসেছিলেন

রাখালরাজা শ্রীকৃষ্ণকে। সীতার প্রেম গাঢ়তর হয়েছিল বনগমনোন্মুখ চীর-ধারী নিঃস্ব রামচন্দ্রকে ঘিরে। রাজকন্যা দময়ন্তীর প্রেম উজ্জ্বলতর হয়েছিল ভাগ্যহত নলের দীনতার অন্ধকারে। এই প্রেমই পথ দেখিয়েছিল সাবিত্রীকে। দরিদ্র বনবাসী স্বল্পায়ু সত্যবানকে বরণ করতেও দ্বিধা করেননি তিনি। পিতামাতার আদেশ অমান্য করেও বনবাসী সত্যবানের পর্ণকুটিরে বনবাসিনী হয়েছিলেন রাজনন্দিনী সাবিত্রী। প্রেমই তাঁকে সে শক্তি দিয়েছিল।"

গান গেয়ে উঠলেন বিশ্বনাথ কথক—

ওগো প্রেম, বিশ্বমাঝে
  তুমিই গতি পরাৎপর
তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই বিষ্ণু,
  তুমিই ভোলা মহেশ্বর,
ভুবন ভরা তোমার আলো
দেয় ঘুচিয়ে সকল কালো
মহাকালের মন ভুলালো
  তোমার লীলা কি মনোহর।

তোমার রূপ যে পুষ্পে ফোটে
  আকাশ ভরা তারায় জ্বলে
স্বর্গে ওঠে ধরায় লোটে
  তরঙ্গিনীর ধারায় চলে।
তোমার জোরে সাগর মাঝে
শঙ্কাহীনা বেহুলা যে
শিবের সতী অমৃত যে
  অরুন্ধতী অনশ্বর।

শুনতে শুনতে রঙ্গনার জন্মান্তর ঘটে গেল যেন। যেটুকু শঙ্কা সংকোচ দ্বিধা সন্দেহ ছিল তা অবলুপ্ত হয়ে গেল একেবারে। কল্পনায় অদ্ভুত এক স্বপ্নলোক সৃজন করতে লাগল সে। দিবসের খোলার ঘরে গিয়ে সে যেন তার ঘরণী হয়েছে। নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের সঙ্গে যেন সংগ্রাম করছে অহরহ। দিবসের শরীর যেন ভেঙে পড়েছে। রোগে সে যেন শয্যাশায়ী। সহসা দ্বারপ্রান্তে একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল। সেই ছায়ামূর্তিকে রঙ্গনা এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলে—'তুমি কে?' ছায়ামূর্তি যেন উত্তর দিলে—'আমি দারিদ্র্য, আমি ওর যম, ওকে গ্রাস করব। রঙ্গনা বললে—'তা পারবে না। সাবিত্রী যেমন যমের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন সত্যবানকে তোমার হাত থেকে তেমনি আমি উদ্ধার করব আমার স্বামীকে।'

বিশ্বনাথ কথকের গান শেষ হয়ে গেল। তিনি আবার আরম্ভ করতে যাবেন এমন সময় বারান্দা থেকে চুনীলাল উঁকি দিয়ে হেসে বললে, "প্রকাশবাবু খবর পাঠিয়েছেন পরশু দিন রঙ্গনাকে দেখতে আসবেন তাঁরা।"

"তাই না কি?"

গহনচাঁদ উঠে বাইরে গেলেন।

দিবস ফিরল সেদিন অনেক রাত্রে।

পটলির স্বামীর কাসিটা একটু কমেছে, জ্বরটাও কমের দিকে। দিবসের গল্প জমে উঠেছিল সৌরেন ডাক্তারের সঙ্গে। সৌরেন তার সহপাঠী ছিল বটে কিন্তু তার জীবনকাহিনী সে কিছুই জানত না। ডাক্তারি পাস করে আর পাঁচজনের মতো ডিসপেনসারি খুলে সে ব্যবসা আরম্ভ করেছে এইটুকুই শুধু জানা ছিল তার। এখন সব কথা শুনে সে অবাক হয়ে গেল। শুধু অবাক নয় মুগ্ধ হল। যে যক্ষ্মা ব্যাধিতে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে ও একা দাঁড়িয়েছে, এর বীরত্বটাই শ্রদ্ধান্বিত করে তুললে তাকে। সাধারণ লোক হলে ও গভর্নমেন্টের ঔদাসীন্যর উপর সমস্ত দোষারোপ করে যথারীতি টাকা রোজগারে মন দিত। সৌরেন কিন্তু তা করেনি। সে যথাসাধ্য একাই চেষ্টা করছে কারও মুখাপেক্ষী না হয়ে। সৌরেনের সংস্পর্শে এসে তার মন আরও যেন উতলা হয়ে উঠল। মনে হতে লাগল তার কর্তব্য থেকে দূরেই সরে রয়েছে এখনও সে। কবে তার টাকা জমবে, তারপর সে রিসার্চ লাইনে যাবে, সে তো এখনও বহুদূর। বাবার কাছে ফিরে যাবে আবার? কিরণকে তিনি বলেছেন তার আদর্শ অনুসারে তাকে চলতে দেবেন। দেবেন কি সত্যি ? কিন্তু না লক্ষ্যভ্রষ্ট সে হবে না। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের মেরুদণ্ডের জোরেই উন্নতি করতে হবে। বড় মুখ করে সকলকে যে কথাটা বলেছে তার মান রাখতেই হবে তাকে।

বাড়ি ফিরে দেখলে সৌদামিনী তার ঘরের মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। দিবসের সাড়া পেয়ে উঠে বসল।

"বড় দেরি হল আজ যে?"

"সৌরেনের সঙ্গে গল্প কবছিলাম।"

"ওই আড্ডা দেওয়া স্বভাবটা ছাড়। যা দিনকাল পড়েছে বাড়ি ফিরতে দেরি হলে ভাবনা হয়।"

টেবিলের উপর ঢাকা দেওয়া বাটিটা দেখিয়ে দিবস জিগ্যেস করলে, "এটা কি?"

সৌদাম্নিনী কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল একটু;

"পেঁয়াজ বড়া ভেজেছিলাম আজ সন্ধেবেলা। ভাবলাম তুমি যদি এসে পড় গরম গরম খাবে দুটো। কিন্তু যা দেরি করলে, এখন কি আর ভালো লাগবে?"

দিবস বাটি খুলে একটা বড়া মুখে পুরে চিবোতে লাগল।

"বা চমৎকার হয়েছে!"

"আসল খবরটি বল এখন। কি বললেন ডাক্তারবাবু?"

বললেন গয়না বেচে টাকা জোগাড় করবার দরকার নেই। গিরি রোজগার করে যতটুকু পারে দেয় যেন কিছু কিছু। ওষুধের দাম টামগুলো দিয়ে দেয় যেন আস্তে আস্তে। তোমাদের পীড়ন করে ও কিছু নিতে চায় না।"

"খুব ভালো লোক তো!"

"দেবতা।"

সৌদামিনী সস্নেহে চেয়ে রইল দিবসের দিকে। মনে মনে বলতে লাগল তুমি বা কি কম। তারপর তার মনে হল আজকালকার ছেলেরা সবাই ভালো। মেয়েরাও। হঠাৎ মনে পড়ল রঙ্গনার কথা।

"হ্যাঁ ভালো কথা মনে পড়েছে, সেই মেয়েটি এসেছিল আজ বিকেলে। তোমার বইটা দিয়ে গেছে। তাদের বাড়িতে কথকতা হচ্ছে আজ সন্ধ্যাবেলা, তার নেমন্তন্ন করে গেছে। তুমি যা রাত করে ফিরলে, সকাল সকাল এলে যেতে পারতে।"

"রঙ্গনা এসেছিল?"

"হ্যাঁ।"

"মেয়েটির মাথায় ছিট আছে একটু, না?"

"কেন বল তো ?"

"তোমার ওই রাজহাঁসকে নিয়ে কি কাণ্ডই যে করছিল! যাবার সময় শেষে হাঁসের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে গেছে একটা।"

"মালা? মালা এনেছিল না কি?"

"অনেকগুলো। বাড়িতে কথকতা হবে কি না তাই বোধ হয় কিনে নিয়ে যাচ্ছিল।"

"হাঁসের গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছে?"

"হ্যাঁ গো, আর তোমার হাঁসও কি তেমনি, মালাটি কেমন পরলে। খানিকক্ষণ পরেই অবশ্য ছিঁড়ে ফেলেছে।"

দিবস ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইল।

কথকতা শেষ করেই বিশ্বনাথ কথককে চলে যেতে হল। গোয়াবাগানে তাঁর এক বড়লোক আত্মীয় ছিলেন, তিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সীতারাম রমজানও চলে গেল। তারা আশা করেছিল যে দিবস কথকতা শুনতে নিশ্চয় আসবে, তখন তার সঙ্গে বাড়ি বাঁধা দেওয়ার সম্বন্ধে আর এক প্রস্থ আলোচনা করা যাবে। দিবস না আসাতে তারা হতাশ হয়েছিল একটু। ঊর্মি যায়নি। সে গহনচাঁদকে ময়ূর নাচটা আর একবার দেখাবে বলে আবীর নিয়ে বসেছিল। সিনেমার ডিরেকটার কালই তার নাচটা দেখতে চান, যদি পছন্দ হয় ছবিতে কোথাও ঢুকিয়ে দেবেন বলেছেন। নাচটা যদি 'হিট্' করে—ওফ্ তাহলে—আর ভাবতে পারছিল না ঊর্মি। অধীর আগ্রহে সে অপেক্ষা করছিল কথকতাটা কখন শেষ হবে। ঊর্মি ভাবছিল রঙ্গনাকে দিয়েই কথাটা পাড়বে সে। কিন্তু কথকতা শেষ হতেই রঙ্গনা উঠে ভিতরে চলে গেল। ঊর্মি সংকোচ পরিহার করে নিজেই শেষে বললে, "আমি আবীর এনেছি, ময়ূর নাচটা আর একবার আপনাকে দেখাব আজ, কাল একজন সিনেমা ডিরেকটার নাচটা দেখতে চেয়েছেন।"

"বেশ তো! আর একটু আগে বললে সীতারাম রমজানকেও আটকে রাখতাম। আবীর ছড়িয়ে আর দরকার নেই, এমনিই নাচো, যদি ভুল হয় আমি বুঝতে পারব। রঙ্গনা কোথা গেল? সেতারটা বাজাক না! চুনীলাল রঙ্গনাকে ডাক তো।"

চুনীলাল ভিতরের দিকে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বললে, "রঙ্গনা ঘরে খিল দিয়েছে, ডাকাডাকি করলাম কোনও সাড়া দিলে না। আশ্চর্য মেয়ে!"

"সে কি!"—প্রথমে বিস্মিত এবং পরমুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন গহনচাঁদ। নিজে গেলেন। রঙ্গনা কিন্তু কপাট খুললে না। জানলার ফাঁক দিয়ে গহনচাঁদ দেখতে পেলেন কাঁদছে। বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ক্রন্দনাবেগে সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। আরও দুচারবার ডাকলেন, অনুনয় করলেন, কিন্তু রঙ্গনা উঠল না। কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়লেন তিনি। বাইরে এসে ঊর্মিকে বললেন, "তুমি একবার দেখ দিকি, ওর কি হল হঠাৎ।"

ঊর্মি ভিতরে চলে গেল। চুনীলাল জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। গহনচাঁদ চুনীলালের দিকে ফিরে বললেন, "বুঝলে চুনী, আমার মনে হচ্ছে ওকে দেখতে আসবে এই খবরটা পেয়েই ও—"

কি বলে, যে শেষ করবেন তা ঠিক করতে না পেরে থেমে গেলেন।

"এ খবরে কাঁদবার কি আছে?"

ঈশান কোণে মেঘ দেখলে জীর্ণ তরীর মাঝি যে ভাবে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকে চুনীলাল সেই ভাবেই চেয়ে রইল খোলা জানলাটার দিকে। সত্যি সত্যি সে যেন আকাশের মেঘটাই দেখতে পাচ্ছিল।

"গোড়াগুড়িই এ বিয়েতে ও আপত্তি করছে কিনা।"

চুনীলাল এবার ভ্রূকুঞ্চিত করে গহনচাঁদের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললে, "আপত্তি করবারই বা কি আছে। এর চেয়ে ভালো পাত্র কি জুটবে এ বাজারে?"

"পাত্রর সম্বন্ধে ওর আপত্তি নেই। ও আপত্তি করছে পণের ব্যাপারে।"

"পণ না হলে কি বিয়ে হয়? আপনি ক্ষেপলেন নাকি?"

"না, না আমি ক্ষেপব কেন। ও যা বলছে তাই বললাম তোমাকে।"

"ও রকম পাত্রের আজকাল বাজার দর কত জানেন? টোয়েণ্টি থাউজান্ড। আমাদের কাছে তো কিছুই নিচ্ছে না ওরা।"

গহনচাঁদ কি বলবেন ভেবে পেলেন না। অপ্রস্তুত মুখে নীরবে থুতনিতে হাত বুলাতে লাগলেন। রঙ্গনা যা বলছে তা যে যুক্তিযুক্ত, কোনো ভদ্রলোকেরই যে এমনভাবে পণ দাবি করা উচিত নয়, তা তিনি বুঝছিলেন। কিন্তু সমাজের যা অবস্থা তাতে চুনীলাল যা বলছে তাও ঠিক। দু'তরফেই তাঁর মন সায় দিচ্ছে। আসলে তাঁর মনে হচ্ছে কোনও রকমে এখন এই গোলক ধাঁধা থেকে বেরুতে পারলে তিনি বেঁচে যান। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্রটাতে সুর বসাবার জন্য মন ছটফট করছে তাঁর। বাজে ঝামেলাটা যে কোনো প্রকারে মিটে গেলেই তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন যেন। মিটিয়ে ফেলবার জন্যই তিনি বাড়িটা বাঁধা দিতে ইতস্তত করেননি। এ আবার কি বখেড়া এসে উপস্থিত হল! রঙ্গনা সত্যি সত্যি যদি এ বিয়ে না করতে চায় জোরজবরদস্তি করবারই বা কি দরকার। এ সম্বন্ধ ভেঙে দিয়ে আবার খোঁজা যাক না। আবার যখন পাত্র পাওয়া যাবে এবং সে-ও যদি পণ চায় (চাইবেই গহনচাঁদের ধারণা) তখন পণের ব্যাপারটা রঙ্গনার কাছে চেপে গেলেই হবে। এটা যখন জানাজানি হয়ে গেছে তখন আড়চোখে তিনি চাইলেন একবার চুনীলালের দিকে। চুনীলাল বাইরের অন্ধকারের দিকেই চেয়েছিল নির্নিমেষে। হঠাৎ তার মনে হল একটি বিড়ি খাওয়া দরকার। বাইরে বেরিয়ে গেল সে। একা একা গহনচাঁদ কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগলেন। ভাবছিলেন উঠে আবার রঙ্গনার কাছে যাবেন কি না। ঊর্মি যখন ফিরে এল না তখন রঙ্গনা নিশ্চয়ই কপাট খুলেছে। উঠতে যাবেন এমন সময় তাঁর এক ছাত্রী এসে হাজির হল।

"ও আপনি বাইরেই আছেন? দরবারি কানাড়ার গৎটার এক জায়গায় কেমন যেন গোলমাল হচ্ছে। এ দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম ভাবলাম আপনাকে জিগ্যেস করে যাই। অসুবিধা হবে কি এখন?"

গহনচাঁদ যেন বেঁচে গেলেন।

"না, না, কিছুমাত্র না। এস, এস, বস। কোথায় গোলমাল হচ্ছে?"

সেতার তুলে তিনি মেয়েটিকে দিলেন।

"বাজাও তো দেখি।"

দরবারি কানাড়া শুরু হয়ে গেল। তাতেই বেশ খানিকক্ষণ সময় কেটে গেল গহনচাঁদের। এ সময়টুকু এভাবে কাটাবার সুযোগ না পেলে তিনি ঠিক গিয়ে হাজির হতেন রঙ্গনার ঘরে এবং ঊর্মি-রঙ্গনার আলাপে বাধা সৃষ্টি করে ব্যাপারটাকে জটিলতর করে তুলতেন। রঙ্গনার ঠিক মনোভাবটা জানবার সুযোগ ঊর্মিও হয়তো পেত না তখন।

ছাত্রীটি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ঊর্মি এসে ঢুকল।

"কি বললে রঙ্গনা? ঘরে খিল দিয়েছিল কেন?"

"ওর কোথায় আপনারা বিয়ের সম্বন্ধ করছেন তাতেই ও ক্ষেপে উঠেছে।"

"বিয়ে দিতে হলে বিয়ের সম্বন্ধ করতেই হবে, তাতে আপত্তি করলে চলবে কেন? আর পণপ্রথাটা এখনও যখন চালু রয়েছে তখন সেটাকেও মানতে হবে।"

"ও সেটা মানতে চায় না।"

"তাহলে বিয়ে হবে না। ও কি বিয়েই করতে চায় না?"

ঊর্মি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "একটি ছেলের সঙ্গে যদি সম্বন্ধ করেন তাহলে ও রাজি হবে।"

"কে?"

"দিবসবাবু। যিনি আপনার কাছে সরোদ শেখেন—"

"ও, সে তো চমৎকার ছেলে! ওরা কি ব্রাহ্মণ?"

"হ্যাঁ।"

"সে-তো চমৎকার হয়! কোথায় যেন চাকরি করে বলছিল। ওদের বাড়িটা কোথায়?"

"ঠিকানাটা আমি ঠিক জানি না, তবে জোগাড় করে দিতে পারি। আপনি আগে দিবসবাবুর কাছে কথাটা পেড়ে দেখুন, তিনি যদি রাজি হন আর সব খবর আমি জোগাড় করে দেব।"

দিবসের খবর ঊর্মি অস্পষ্টভাবে জানত, কিন্তু এখন এর বেশি আর বলা সে সংগত মনে করলে না। দিবস যে খেয়ালের ঝোঁকে বাড়ি থেকে চলে এসে যা-তা কি যেন করে বেড়াচ্ছে। (কিরণের কাছে আবছা আবছা শুনেছিল সে, কিন্তু নিজের ব্যাপার নিয়েই এত ব্যস্ত থাকতে হয় তাকে যে পরের ব্যাপারে মাথা ঘামাবার অবসরই নেই তার)। এ খবর শুনলে গহনচাঁদবাবু হয়তো ভড়কে যাবেন তাই সে সম্বন্ধে সে কোনো উচ্চবাচ্যই করলে না। চুপ করে রইল।

"বেশ তো, সে এলেই কথাটা আমি পাড়ব তার কাছে। চুনী, ও—"

চুনীলালের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন তিনি।

মেসে গোবর্ধনবাবুও ব্যগ্র হয়ে হরিদাসবাবুর পথ চাইছিলেন রোজ। হরিদাসবাবু 'টুর' থেকে ফেরেননি। এদিকে উমেশ কর্তৃক উৎসাহিত হয়ে ধূর্জটিবাবুর সংগীত-চর্চা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সাধারণ-ধৈর্য-বিশিষ্ট গোবর্ধন বেশ কাবু হয়ে পড়েছেন। অথচ ধূর্জটিকে কিছু বলা যায় না। তিনি নিজের বাড়িতে বসে পত্নীশোক ভোলবার জন্য বেহালা এস্রাজ না

বাজিয়ে যদি ক্যানেস্তারাও পিটতেন তাহলেও কারও কিছু বলবার থাকত না। গোবর্ধন আপিস থেকে ফিরে জলখাবার খেয়ে সরে পড়েন আজকাল খবরের কাগজটি বগলে করে। পার্কে বসে পড়েন সেটি। অঘোর অধিকাংশ সময়েই মেসে থাকে না, নিজের ধান্দায় ঘুরে বেড়ায়, সুতরাং সে ততটা ঘায়েল হয়নি। রাত্রি দশটার পর সে যখন ফিরে আসে তখন ধূর্জটিও ক্লান্ত হয়ে পড়েন। এই ভাবে চলছিল। চলতও হয়তো আরও কিছুদিন। কিন্তু একদিন বিকেলে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়াতে সব গোলমাল হয়ে গেল। বৃদ্ধ গোবর্ধন (গোবর্ধনের বয়স প্রায় ষাট, যদিও আপিসের খাতায় তিপ্পান্ন লেখান আছে) পার্কে ভিজে গেলেন আপাদমস্তক। কাশ্মীর সমস্যায় এমনই তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন তিনি যে আকাশের ঘনঘটা তাঁর নজরে পড়েনি। বৃদ্ধ বয়সে বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগে গেল তাঁর। পরের দিন আপিসে গেলেন বটে কিন্তু পার্কে যেতে পারলেন না। ধূর্জটির কণ্ঠ-সংগীত এবং যন্ত্র-সংগীতের প্রবল বর্ষণ সহ্য করতে হল তাঁকে ঘরে বসে বসে। দৈবাৎ অঘোরও সেদিন বাসায় ছিলেন।

গোবর্ধন বললেন, "ওহে অঘোর, তুমি সেদিন সেই কোন্ এক ওস্তাদের খবর এনেছিলে, সেইখানেই নিয়ে যাও না ওকে। আর তো পারা যায় না। ভেবেছিলুম হরিদাস এলে যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে, কিন্তু এ যে পাগল করে তুলেছে।"

"বলে দেখতে পারি, কিন্তু ও যাবে কি, সেই কাগজটা কোথায় ফেললুম।"

সৌভাগ্যক্রমে কাগজটা পাওয়া গেল। চুনীলালের ছাপানো সেই হ্যান্ডবিলটা।

"ও এই যে রয়েছে।"

"যাও যাও বলে দেখ একটু"—গোবর্ধনের কণ্ঠস্বরে সত্যিকারের আগ্রহ ফুটে উঠল—"তোমার তো লোক পটাবার ক্ষমতা আছে, ইনসিওরেন্সের দালালি কর যখন—যাও, কাগজটা নিয়েই যাও।"

"দেখি। হরিদাস বললে আরও ভালো হত।"

"তুমি দেখই না চেষ্টা করে। যদি রাজি হয় কাল রবিবার আছে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও পারবে।"

অঘোর কাগজটা নিয়ে চলে গেলেন।

ধূর্জটিও বেশ দিশাহারা হয়েছিলেন। সেতার এস্রাজ ম্যান্ডোলিন বেহালা এই চারটে যন্ত্রের কবলে পড়ে তিনি যে যন্ত্রণা পাচ্ছিলেন তা বাইরে কারো কাছে প্রকাশ করা যায় না। তা ছাড়া তাঁর জেদ চড়ে গিয়েছিল বলে বাইরের লোকেরা ঠিক উল্টোটাই ভাবছিল। ভাবছিল ওই চারটে যন্ত্রের সঙ্গে তাঁর বাগযন্ত্র মিলিয়ে এক নাগাড়ে বেসুরো চিৎকার করে আনন্দই পাচ্ছেন বুঝি তিনি। আনন্দ তিনি পাচ্ছিলেন না। এ কসরৎ তিনি যদি পরিত্যাগ করতেন তাহলে অন্যায় কিছু হত না। কিন্তু তা তিনি করেননি, কারণ এই পথেই আনন্দ পাবেন বলে তিনি বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। এ যুগের অনেকেরই মতো তাঁরও ধারণা ছিল যে চেষ্টা করলে সবাই সব কিছু করতে পারে, বিশেষত টাকার জোর থাকে যদি। বারংবার ব্যর্থকাম হয়ে একজন ওস্তাদের কথা তিনিও ভাবছিলেন। অঘোরবাবু তাঁর ঘরে যখন ঢুকলেন তখন এস্রাজ বাজাচ্ছিলেন তিনি। অঘোর স্মিতমুখে এমন ভাব করে দাঁড়িয়ে রইলেন যেন মুগ্ধ হয়ে গেছেন।

"কি দেখছেন কি?" বাজনা থামিয়ে মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন ধূর্জটি।

"ভাবছি আপনার যে রকম পার্টস আছে, আপনি যদি গহনচাঁদ বাবুর কাছে কিছুদিন শেখেন দিগ্বিজয় করতে পারবেন।"

"গহনচাঁদবাবুটি কে?"

"কাশী থেকে একজন বিখ্যাত ওস্তাদ এসেছেন। অনেককে শেখাচ্ছেন। নিতান্ত আনাড়িও নাকি মানুষ হয়ে যাচ্ছে তাঁর কাছে। আপনার মতো শিষ্য পেলে তো বর্তে যাবেন তিনি।"

"বেশ তো নিয়ে চলুন না আমাকে। কোথায় তিনি?"

"ঠিকানাটা আছে আমার কাছে। দাঁড়ান আনি।"

যদিও ঠিকানাটা তাঁর পকেটেই ছিল তবু তিনি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। তখনই পকেট থেকে কাগজটা বার করলে ধূর্জটির হয়তো সন্দেহ হতে পারে এই আশঙ্কা হল তাঁর। একটু পরে ঘুরে এসে কাগজটা তিনি ধূর্জটির হাতে দিলেন এবং বললেন "গোবর্ধনবাবুও বলছেন খুব ভালো ওস্তাদ উনি, নাম আছে।"

"আলাপ আছে না কি আপনাদের সঙ্গে?"

"না। আলাপ কি করে হবে বলুন, আমরা তো ও পথের পথিক নই, তবে নামডাক শুনছি খুব।"

ধূর্জটি ভ্রূকুঞ্চিত করে বিজ্ঞাপনটি পড়লেন।

"বেশ চলুন। আপনাদেরও যেতে হবে সঙ্গে কিন্তু।"

"তাতে আর আপত্তি কি? কাল রবিবার আছে। গোবর্ধনবাবুর ছুটি, আমারও তেমন কোনও কাজ নেই, কালই যাওয়া যাক তাহলে।"

"বেশ।"

অঘোর এসে গোবর্ধনকে সুখবরটি দিলেন।

গোবর্ধন বললেন, "আমাকে আবার টানছ কেন? তুমি একাই নিয়ে যাও না।"

"চলুনই না, তাতে হয়েছে কি? আপনি একজন বিজ্ঞ লোক, আপনি সঙ্গে থাকলে ভরসা পাবেন ধূর্জটিবাবু।"

অঘোর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাস্য গোপন করলেন।

"দেখ, তোমরা, আজকালকার ছেলে ছোকরারা বড্ড বেশি ডেঁপো হয়ে পড়েছ আর সেই জন্যেই ফেল মারছ সব কাজে।"

"ফেল মারছি মানে? গত মাসে নগদ একশ পঁচিশ টাকা কামিয়েছি তা জানেন?"

"জানি জানি। হাড়ে হাড়ে চিনি তোমাদের।"

স্রোতস্বিনী দিক পরিবর্তন করেছিল আবার। দিবসের যে মন মাত্র কয়েক দিন আগে রঙ্গনাকে ঘিরে স্বপ্ন রচনা করছিল সে মন এখনও স্বপ্ন রচনা করছে, কিন্তু এখন আর রঙ্গনাকে ঘিরে নয়। নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রির নব নব সম্ভাবনার স্বপ্নে আবার মেতে উঠেছে সে। যে অজানাকে জানবার আগ্রহ মানবসমাজকে চিরকাল দুর্গম পথে টেনে নিয়ে গেছে সেই অজানার রহস্যময় আহ্বান আবার উতলা করে তুলেছে তাকে। বস্তুত অজানাকে জানবার কৌতূহলই তাঁর জীবনের মূল সুর। সে নিজেও কথাটা ভালো করে জানে না হয় তো। বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি তার আছে কি না, সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হতে হলে যে কষ্ট

স্বীকার অনিবার্য তার সম্মুখীন হতে সে পারে কি না এই কৌতূহলই তাকে মেসের চাকরে পরিণত করেছিল। রঙ্গনার চরিত্র যতক্ষণ অজানা ছিল ততক্ষণই তা মুগ্ধ করেছিল তাকে। যেই তার মনে হল রঙ্গনা-চরিত্রে রহস্যময় আর কিছুই নেই—সে-ও শাড়ি-ব্লাউস-বিলাসিনী আর পাঁচজন মেয়ের মতো—তখনই তার মোহ কেটে গেল, তার সম্বন্ধে আর বিশেষ কোনও কৌতূহল রইল না। বাবাকে ছেড়ে এসে তার যে ধরনের দুঃখ হয়েছিল রঙ্গনার সম্বন্ধে মোহ-মুক্ত হয়েও তার সেই ধরনের একটা দুঃখ হচ্ছিল অবশ্য। রঙ্গনাকে তার যে আর ভালো লাগছিল না তা নয় কিন্তু তার মধ্যে অতি-প্রত্যাশিত সেই পুরাতনীকে আবিষ্কার করে সে একটু হতাশ হয়ে পড়েছিল। সে রঙ্গনার মধ্যে প্রত্যাশা করেছিল অপ্রত্যাশিত এমন একটা কিছু যার বিস্ময় পুলকিত করে তুলবে তার অন্তরতম সত্তাকে। কিন্তু তা হল না।

মনের মোড় ফিরে গিয়েছিল তার। সে ঠিক করে ফেলেছিল নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি নিয়েই পড়াশোনা শুরু করবে আবার। মনে হচ্ছিল রোজ সন্ধ্যাবেলা সরোদ নিয়ে অত সময় নষ্ট করার অর্থ হয় না। গহনচাঁদবাবুর কাছে সপ্তাহে একদিন গেলেই যথেষ্ট। নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি বিষয়ক বইও সে জোগাড় করে এনেছিল দু একখানা। আনতেও দিয়েছে একটা দোকানে। বইগুলো শেল্‌ফে রাখতে গিয়ে রঙ্গনার গতের খাতাটা চোখে পড়ল তার। সেই খাতাটা ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিল সে। রঙ্গনার কথাই ভাবছিল। রঙ্গনার বিয়ে দিতে গহনচাঁদবাবুর যথাসর্বস্ব বিকিয়ে যাচ্ছে সীতারাম-রমজানের মুখে এই সংবাদ শুনে লজ্জায় যেন মাথা কাটা যাচ্ছিল তার সেদিন। কন্যার বিবাহে বহু পিতা সর্বস্বান্ত হচ্ছে এ দেশে, কিন্তু কন্যাদের তরফ থেকে তেমন জোরালো কোনো প্রতিবাদ তো শোনা যাচ্ছে না। বাপকে পথে বসিয়ে তারা তো বেশ হাসিমুখে বিয়ে করে যাচ্ছে! সেই বহুকাল আগে স্নেহলতা পুড়ে মরেছিল, আরও হয়তো মরেছে কেউ কেউ.... সহসা কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগল সে। সৌরেন ডাক্তারের অতসী ক্লিনিকের ছবিটা ফুটে উঠল চোখের সামনে। তারপর ফুটে উঠল দেশজোড়া একটা শ্মশানের ছবি.....।

গহনচাঁদের বাড়িতে সে যখন পৌঁছল তার ঠিক একটু আগেই চুনীলাল 'তবে যা খুশি করুন' বলে রেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। দিবসের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করা হোক এতে চুনীলাল এত আপত্তি করছে কেন তা গহনচাঁদের মাথায় ঢুকছিল না। তিনি ভাবছিলেন মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে লোকে পাঁচ জায়গায় তো সম্বন্ধে করেই থাকে। বিকাশবাবুদের পাকা কথাও দেওয়া হয়নি তেমন কিছু। তাঁরা মেয়ে দেখতে আসছেন আসুন না। দিবসের কাছেও কথাটা পাড়া যাক। দিবস যদি রাজি হয় খোঁজখবর নিয়ে ঠিক করা যাবে কে ভালো পাত্র। চুনীর এতে আপত্তি কেন? গহনচাঁদ ইলেকট্রিক গুডস্, অন্নদা বিশ্বাস এবং হরলাল সিংহির খবর জানতেন না।

দিবস যে সম্ভাব্য পাত্র হতে পারে এ সংবাদে রমজান সীতারাম উল্লসিত হয়ে উঠেছিল খুব। তাদের মনে হচ্ছিল দিবসই এ সমস্যার সমাধান করে দেবে। দিবস যখন এল তখন অবশ্য তারা ছিল না কেউ। বাড়িতে তখন এক গহনচাঁদ ছাড়া আর কেউ ছিল না। রঙ্গনাও না। গতরাত্রের ঘটনার পর থেকে রঙ্গনা বাড়ির সবাইকে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সকালে উঠেই পড়ার ছুতো করে এক সহপাঠিনীর বাড়ি গিয়ে বসেছিল। দুপুরে খেতে এসেছিল। একটি কথা

বলেনি কারও সঙ্গে। খেয়ে উঠেই বেরিয়ে যাবার আর একটা ছুতো পেয়ে গেল। বিশ্বনাথ কথক তাঁর আত্মীয়ের মোটরে তাঁদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের নিয়ে চিড়িয়াখানা দেখতে বেরিয়েছিলেন। তিনি যাবার মুখে খোঁজ করতে এসেছিলেন রঙ্গনা যাবে কিনা। রঙ্গনা এ সুযোগ ত্যাগ করেনি। সম্ভব হলে সে নিজের কাছ থেকেও পালিয়ে যেত।

দিবস আসতেই গহনচাঁদ হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা করলেন।

"ও, তুমি এসেছ, এস এস। কাল থেকেই তোমার কথা ভাবছি। এস বস, হাতে ওটা কি?"

"রঙ্গনার সেই গতের খাতাটা ফিরিয়ে দিতে এসেছি।"

"ও, আচ্ছা। রঙ্গনা চিড়িয়াখানা দেখতে বেরিয়েছে, দাও আমিই রেখে দিই।"

খাতাটা নিয়ে টেবিলের উপর রেখে দিলেন।

"বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন।"

দিবস বসতে গহনচাঁদও বেশ বাগিয়ে বসলেন এবং বার দুই গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "আচ্ছা তোমরা ব্রাহ্মণ তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"গোত্র কি তোমাদের?"

"ভরদ্বাজ। আমাদের আসল উপাধি মুখোপাধ্যায়।"

গহনচাঁদের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"মুখোপাধ্যায়! আরে তাহলে তো আমাদের পালটি ঘরই!"

এর বেশি অগ্রসর হবার কিন্তু সুযোগ পেলেন না তিনি। কারণ ঠিক সেই মুহূর্তেই দ্বারপ্রান্তে ধূর্জটি, গোবর্ধন আর অঘোর এসে দাঁড়ালেন। ধূর্জটির এক হাতে বেহালা, আর এক হাতে ম্যান্ডোলিন। গোবর্ধনের হাতে সেতার, অঘোরের হাতে এস্রাজ। দিবস উঠে দাঁড়াল এঁদের এখানে আবির্ভাব সে প্রত্যাশাই করেনি।

"আরে, তুমি এখানে যে! গহনচাঁদবাবুর বাড়ি কি এইটেই?"—ধূর্জটি প্রশ্ন করলেন।

"ইনিই গহনচাঁদবাবু।"

দেখিয়ে দিয়ে দিবস বাইরে চলে গেল। কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল তার।

"নমস্কার, নমস্কার।"

নমস্কার বিনিময়ান্তে উপবেশন করলেন তিনজনই।

"দিবু এখানেও চাকরি করে না কি?"- - গোবর্ধন প্রশ্ন করলেন।

"না, ও এখানে সরোদ শিখতে আসে।"

"সরোদ শিখতে আসে! বলেন কি!"

"এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?"—একটু বিস্মিত হয়ে জিগ্যেস করলেন গহনচাঁদ।

"আশ্চর্য হবার নেই? ও যে আমাদের মেসের চাকর মশাই!"

"চাকর? মানে? কি করে?"

"ঘর ঝাড়ু দেয়, জুতো বুরুশ করে, ফাই-ফরমাস খাটে।"

"বলেন কি! দিবস—"

দিবস বারান্দা থেকে নেমে চলে যাচ্ছিল, গহনচাঁদের ডাক শুনে ফিরে এল আবার।

"আমাকে কিছু বলছেন?"

"তুমি এঁদের মেসের চাকর?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তাতো জানতাম না।"

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলেন গহনচাঁদ। দিবস মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে গেল আবার।

"আপনার ছোঁয়াচ লেগে এইটি হয়েছে"—ধূর্জটির দিকে চেয়ে গোবর্ধন মন্তব্য করলেন।

"খুব সম্ভব"—হেসে সমর্থন করলেন অঘোর।

"আপনারা কি প্রয়োজনে এসেছেন জানতে পারি কি?"—গহনচাঁদ প্রশ্ন করলেন। হঠাৎ এ কি উৎপাত—মনে হচ্ছিল তাঁর।

"ইনি আপনার কাছে গান-বাজনা শিখতে চান"—ধূর্জটিকে দেখিয়ে গোবর্ধনই পাড়লেন কথাটা।

গহনচাঁদ কেমন যেন বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন এদের উপর।

"মাপ করবেন, আমার সময় নেই।"

"একটু সময় আপনাকে করতেই হবে"—কাতরকণ্ঠে অনুরোধ করলেন গোবর্ধন।

"উনি কি শিখতে চান? গান না বাজনা?"

"দুই-ই।"

"এই সব বাজনা ওঁর?"

"সব।"

"সবগুলো উনি বাজাতে পারেন?"

"চেষ্টা করেন। তবে সবগুলো সড়গড় হয়নি এখনও।"

একবার গোবর্ধন একবার অঘোর গহনচাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন।

"গানও করেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—ধরা গলায় ধূর্জটি উত্তর দিলেন এইবার।

"শুনিয়ে দিন না একটু"—গোবর্ধন বললেন।

ধূর্জটি বেহালার বাক্স খুলে বেহালা বার করতে লাগলেন। গহনচাঁদ আর মানা করতে পারলেন না। ভদ্রতায় বাধল। গান ধরবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন তিনি এবং মিনিট খানেক পরেই বলতে বাধ্য হলেন—"থামুন, থামুন যথেষ্ট হয়েছে।"

তিনজনেই চাইলেন গহনচাঁদের দিকে।

গহনচাঁদ ধূর্জটির দিকে চেয়ে ভদ্রভাবেই বললেন, "গান বাজনা আপনার দ্বারা হবে না। এ পথ আপনার নয়। এ আপনি ছেড়ে দিন।"

গোবর্ধন বিজ্ঞ লোক। তাঁর মনে হল গহনচাঁদবাবু বোধহয় নিজের দর বাড়াচ্ছেন। কিন্তু কিছু না বলে তিনি চুপ করে রইলেন।

অঘোর মুচকি হেসে বললেন, "ছাড়তে উনি পারবেন না, অত্যন্ত আগ্রহ ওঁর।"

"আগ্রহ থাকলেই সব জিনিস কি সকলে শিখতে পারে?"

"আপনি শিখিয়ে দিন না, না হয় বেশি কিছু দেব আপনাকে"—ধূর্জটি বললেন একথা শুনে।

'এইবার ওষুধ পড়েছে'—মনে মনে বললেন গোবর্ধন—'এইবার ওস্তাদ ভিজবে। কিন্তু এত চট করে বেশি টাকার কথাটা পাড়া ঠিক হয় নি'। সুতরাং ধূর্জটির ভুলটা সংশোধন করতে প্রবৃত্ত হলেন তিনি।

"দরকার হলে বেশি টাকা আপনাকে উনি দেবেন। আপনাকে হোল টাইম রেখে দেবার সামর্থ্যও ওঁর আছে। তবে প্রথমটা দেখুন না চেষ্টা করে এমনিতেই যদি হয়—"

যে বিরূপতাটা গহনচাঁদ ভদ্রতার আবরণে ঢাকছিলেন এতক্ষণ, সেটা সরে গেল এবার। বেশ রাগত কণ্ঠেই তিনি বললেন, "আপনার কি ধারণা টাকা খরচ করলে গর্দভও বুলবুল হয়ে যেতে পারে?"—তারপর অর্ধ-স্বগতোক্তি করলেন—"যত সব গাড়োল জোটে এসে।"

গোবর্ধনের মাথায় ডাণ্ডস্ মারলে কেউ যেন। তিনি অনেকদিন ধরে আপিসের বড়বাবুগিরি করছেন, সবাই সমীহ করে কথা বলে তাঁর সঙ্গে, গহনচাঁদের কথায় ক্ষেপে গেলেন তিনি। উঠে পড়লেন এবং ধূর্জটির দিয়ে চেয়ে বললেন, "উঠুন মশাই। টাকা ফেললে কোলকাতা শহরে ওস্তাদ ঢের পাওয়া যাবে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। এঁরা বোধহয় ওই চাকর ক্লাসকেই শেখাতে পারেন, ভদ্রলোকের জায়গা এ-নয়। উঠুন।"

ধূর্জটিও যথেষ্ট অপমানিত বোধ করছিলেন। তিনজনেই উঠে পড়লেন। অঘোর যাবার পূর্বে বক্রোক্তি করে গেলেন—"কথাটা পাড়বার আগেই আমাদের ভাবা উচিত ছিল উনি দিবুর মাস্টার।"

সবাই চলে গেলে গহনচাঁদ নির্বাক হয়ে বসে রইলেন। মুহূর্তের মধ্যে একটা ভূমিকম্প হয়ে গেল যেন। তিনি যেন সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। প্রত্যেক রসিককেই অনিবার্যভাবে কতকগুলো বেরসিকের সংস্পর্শে আসতে হয় সুতরাং ধূর্জটির দল তাঁকে তেমন বিচলিত করেনি। অর্থের আস্ফালনটাও এ যুগে গা-সওয়া হয়ে গেছে তাঁর। দিবসের খবরটা শুনেই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। দুটো কারণ ছিল। প্রথম তিনি আশা করেছিলেন যে হয়তো দিবসের সঙ্গে রঙ্গনার বিয়েটা হয়ে যাবে এবং তা হয়ে গেলে তাঁর জীবনের মস্ত বড় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে একটা। রঙ্গনারই শুধু নয় তাঁরও দিবসকে খুবই ভালো লেগেছিল। চমৎকার ছেলে! কিন্তু একটা মেসের চাকরের সঙ্গে কি করে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায়? দ্বিতীয় কারণটা তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল তা এই যে দিবসের মতো একজন সংগীত-রসিককে পেটের দায়ে ওই বেরসিকগুলোর দাসত্ব করতে হচ্ছে। এইটেই বেশি মর্মান্তিক হয়েছিল তাঁর পক্ষে। ব্রাহ্মণের ছেলেকে দিয়ে জুতো বুরুশ করায় ওরা! এর থেকে দিবসকে কি করে উদ্ধার করা যায় এই ভাবনায় উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠলেন তিনি। রঙ্গনার বিষয়ের চেয়েও এটা বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে হতে লাগল তাঁর কাছে। দিবস যখন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে তখন সে তো তাঁর পুত্র স্থানীয়। তার এমন সংকটের কথা শুনে চুপ করে বসে থাকা তো উচিত নয়। খুব সঙ্কটেই সে পড়েছে তা না হলে ও রকম চাকরি নেয়? পরমুহূর্তেই তাঁর মনে হল রঙ্গনাকে সেতার কেনবার সময় ও টাকা দিয়েছিল, তাঁকে মাইনে নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল, সেদিন অত দাম দিয়ে আয়না কিনে

এনেছে, অর্থসংকট থাকলে এসব কি করে করা সম্ভব! প্রশ্নটা মনে জাগবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটাও জাগল। দিলদরিয়া লোকের পক্ষে সবই সম্ভব। এই সব ব্যাপাবে টাকা খরচ করতে গিয়েই হয়তো আরও নিঃস্ব হয়ে পড়েছে, বাধ্য হয়ে ওই জঘন্য চাকরি নিতে হয়েছে। নিমি, হরিশচন্দ্র, কর্ণ প্রভৃতি কয়েকটা নাম পর পর জেগে উঠল মনে। তারপর সহসা তাঁর মনে হল দিবস হয়তো বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

"দিবস—"

কোন সাড়া এল না। গহনচাঁদ উঠে বেরিয়ে দেখলেন দিবস চলে গেছে।

সূর্যকান্ত ভিতরে ভিতরে খুবই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। রোগীর অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে দেখে চিকিৎসক যেমন ভিতরে ভিতরে ভীত হয়ে পড়েন অথচ সে ভাবটা কারো কাছে প্রকাশ করতে পারেন না, সূর্য চৌধুরীর অবস্থা সেই রকম হয়েছিল অনেকটা। তার চেয়েও খারাপ হয়েছিল, কারণ চিকিৎসকের নৈর্ব্যক্তিক ভাবটা তাঁর ছিল না। দিবসের ঠিকানাটা এখনও পাননি তিনি। কিরণ আসেনি, কিরণকে ধরতেও পারেননি আর। সেদিন নানা কথাবার্তায় আর একটা মস্ত ভুলও হয়ে গিয়েছিল। কিরণের বাসার ঠিকানাটা জেনে নেওয়া হয়নি। সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটা আগেও যেমন অথৈ জলে ছিল, এখনও তেমনি আছে। গোবিন্দ সাণ্ডেল তাঁর এক আত্মীয়ের বিয়েতে বাইরে গেছেন কয়েকদিনের জন্য। সুতরাং দিবসের আলোচনাটাও চাপা পড়ে গেছে। ব্রজও কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেছে। আজকাল বকেও না। সমস্ত বাড়িটা কেমন যেন থমথম করছে। অসুখের ভান করে পড়ে আছেন তিনি। ডাক্তার সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলে গেছে। সুতরাং ঘণ্টু নিচে থেকেই মক্কেলদের বিদায় করে দিচ্ছে। ঘণ্টু প্রাণপণে সেবাও করছে তাঁর। তার মনে যে আশার অঙ্কুর গজিয়েছিল তা বাড়ছিল ক্রমশ। শুধু তাই নয়, দিবসের প্রতি শ্রদ্ধাও কমে আসছিল তার। দিবসের মতো ছেলের বিষয় থেকে বঞ্চিত হওয়াই উচিত এই ধরনের একটা ন্যায়সঙ্গত যুক্তিও মনে মনে খাড়া করেছিল সে। খাড়া করে অদ্ভুত ধরনের সুখও পাচ্ছিল।

....ঘণ্টু ডাক্তারবাবুর কাছে গেছে। একা চুপ করে শুয়ে আছেন সূর্য চৌধুরী। দিবসের মায়ের কথাটা বার বার মনে পড়ছে। সেই কচি মুখখানা বার বার ভেসে উঠছে মানসপটে। তিনি কি দিবসকে বকে অন্যায় করেছেন? ছেলেকে শাসন করা কি অন্যায়? দিবসের মতো বুদ্ধিমান ছেলে ওকালতি পাশ করে এসে তাঁর জায়গায় বসুক এ ব্যবস্থাটা কি খুব খারাপ ব্যবস্থা হয়েছিল? তিনি তাঁকে আই-এস-সি পড়তে দিয়েছিলেন মেডিকেল কলেজে বা ইনজিনিয়ারিং লাইনে ঢোকাবেন বলে। কিন্তু দিবস এত ভালো করে পাশ করল যে আর মেডিকেল কলেজে ঢুকতে চাইল না। তার কোন্ এক সাহেব প্রফেসার ওকে বুদ্ধি দিলেন যে তুমি এখন কোনও লাইনে যেও না, এম-এস-সি পর্যন্ত পড়ে যাও। তিনি বাধা দেননি। হঠাৎ সূর্যকান্তের চিন্তাধারা বিঘ্নিত হল। নিচে ব্রজ আর নিস্তারিণী তুমুল ঝগড়া বাধিয়েছে। কান পেতে শুনলেন সূর্যকান্ত। কোন্ এক গিরিবালার কাছে যাবার জন্য ব্রজ নিস্তারিণীকে নাকি রিকশ ভাড়া দিয়েছিল। কিন্তু নিস্তারিণী সে রিকশ ভাড়াটি খরচ করে ফেলেছে। ব্রজ নিস্তারিণীকে রিকশ ভাড়া কেন দিয়েছিল তা সূর্যকান্ত জানেন। তাঁর একবার ইচ্ছে হল ব্রজকে

ডেকে বলেন যে নিস্তারিণী যদি পয়সাটা খরচ করে ফেলে থাকে আবার পয়সা দাও না ওকে, কিংবা না হয় মোটরটা নিয়েই যাক না। কিন্তু পারলেন না। ব্রজর কাছে খেলো হতে পারবেন না তিনি কিছুতে। পাশ ফিরে শুলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল একটা। ব্রজও তাহলে দিবুর ঠিকানা জোগাড় করতে পারেনি!

দিবসের যে ফ্যাকড়াটি গহনচাঁদ তুলেছিলেন তা ফেঁসে যাওয়াতে চুনীলাল নিশ্চিন্ত হয়েছিল। এই সব আর্টিস্ট জাতীয় লোকেদের নিয়ে সবাই কেন যে এমন উন্মত্ত হয়ে ওঠে তা চুনীলাল বুঝতে পারে না। তার তো ধারণা এ রকম অকেজো দায়িত্বজ্ঞানহীন সাংসারিক বুদ্ধি-বিবর্জিত লোকেদের পাগলা গারদে ডবল তালা মেরে রেখে দিলে সংসারের কিচ্ছু ক্ষতি হত না, লাভই হত বরং। আর একটু হলে সব পণ্ড করে দিয়েছিল! উফ্ খবরটা শুনে অবধি রঙ্গনা খুব গম্ভীর হয়ে গেছে যদিও—তা যাক্। দামী গয়না কাপড় পরে বিকাশবাবুর মোটরে বার দুই চক্কোর মারলেই মুখে হাসি ফুটবে এখন। লভ-টভ সব তখন তলিয়ে যাবে। কি হয়েছে আজকালকার মেয়েরা। ছ্যা ছ্যা! একটা সুন্দর চেহারা দেখলেই অমনি বাস—! আর ওই দিবস ছোকরাই বা কি রকম! তুই মেসের সামান্য চাকর একটা, তুই ভদ্রলোকের মেয়ের উপর নজর দিস! এবার বাড়িতে এলে কান ধরে দূর করে দিতে হবে। সোহাগ করে আয়না কিনে দেওয়া হয়েছে! রাসকেল কোথাকার! সমাজের অবস্থা দিন দিন হয়ে দাঁড়াল কি! তুই মেসের চাকর, তুই শিখবি সরোদ! উফ্।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে চুনীলাল রুমাল ঘোরাতে ঘোরাতে নিজেকে হাওয়া করছিল আর চিন্তা করছিল। কালকের ঘটনার পর থেকে বাড়িতে সে বড় একটা থাকছে না। রঙ্গনার সঙ্গে মুখোমুখি হতে কেমন যেন একটা সংকোচ হচ্ছে। রঙ্গনা শুধু গম্ভীরই হয়নি একটা বিষাদের ছায়াও পড়েছে তার মুখে। কি আশ্চর্য। আবার বনবন করে রুমাল ঘোরাতে লাগল চুনীলাল। এ সময় পদ্মমুখী থাকলে সুবিধা হত। পদ্মমুখীকে সে পাঠিয়েছিল মানিকলালের কাছে, তার কাছ থেকে যদি কিছু টাকা বাগাতে পারে। পারবে কি না সন্দেহ, কারণ মানিকলালও ঘুঘু একটি। পিসিমাকে এখনো টাকা পাঠানো হয়নি এ মাসে। ছিরু (তার মামাতো ভাইয়ের ছেলে) দেশে অসুখে পড়েছে, ছিরুর মা টাকা পাঠাতে লিখেছে কিছু। চুনীলালের নিজের যদিও ছেলেপিলে হয়নি, কিন্তু এই ধরনের খুচখাচ খরচ তার লেগেই আছে। রঙ্গনার সমস্ত খরচ সেই তো চালিয়েছে এতকাল। কর্পোরেশনের ট্যাক্সও বাকি পড়ে গেছে। ভাগ্যে বাবা বাড়িটা করে গিয়েছিলেন তা না হলে কি দুর্দশাই যে হত! ছিরুর মাকে টাকাটা আজ পাঠাতেই হবে। টাকা আছে কিছু জামাইবাবুর ছাত্রছাত্রীদের মাইনে বাবদ কিছু টাকা জমেছে (মুদির বিলও জমেছে ওদিকে বেশ!) কিন্তু সে টাকাটা আছে রঙ্গনার কাছে। আজকে রঙ্গনার মুখোমুখি হওয়া অসম্ভব। আবার বনবন করে রুমাল ঘোরাতে লাগল চুনীলাল। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সামনের গলি থেকে অন্নদা বিশ্বাস বেরুল। তার সাদা শুষ্ক মুখ শুষ্কতর হয়েছে মনে হল, গোঁফ যেন আরও ঝুলে পড়েছে।

"এই যে ভাই তোমার কাছে যাচ্ছিলাম। সর্বনাশ হয়ে গেছে—"

"তোমার সর্বনাশের কথা পরে শুনব। আগে আমার একটা কথার জবাব দাও। গোটা দশেক টাকা দিতে পার এক্ষুনি?"

বিস্ময়ে অন্নদা বিশ্বাসের ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেল। জিব দিয়ে শুষ্ক ওষ্ঠাধরকে ঈষৎ সরস করে নিয়ে সে বললে, "টাকা! টাকা তো নেই। আমার যথাসর্বস্ব তো তোমার কাছে আছে ভাই।"

"কালই দিয়ে দেব। আমার এক ভাইপো দেশে অসুখে পড়ে গেছে, আজই তাকে টাকাটা পাঠান দরকার। বাড়িতে টাকা আছে কিন্তু বার করবার উপায় নেই।"

"কেন?"

অসংকোচে মিথ্যে কথা বললে চুনীলাল।

"পরিবার চাবি নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে। কাল ফিরবে। অথচ টাকাটা আজই পাঠাতে পারলে ভালো হয়। অসুখের ব্যাপার তো—"

অন্নদা বিশ্বাস চুপ করে রইল।

"এইবার তোমার সর্বনাশের ব্যাপারটা কি শুনি?"

"আমি যে পোস্টাফিস থেকে টাকা বার করে ব্যবসাতে ঢেলেছি তা পরিবার টের পেয়ে গেছে ভাই। আমার ছোট শালাকে কথাটা প্রাইভেটলি বলেছিলুম, সে ফাঁস করে দিয়েছে সব।"

"তাতে আর কি হয়েছে? দিন পনেরো কুড়ির মধ্যে তোমার সব টাকা সুদসুদ্ধ দিয়ে দেব। বিকাশবাবু দোকানের মালপত্র সব কিনে দেবেন কথা দিয়েছেন। বিয়েটা হয়ে গেলেই—"

"বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে না কি?"

"সেদিন তোমাকে বললাম যে।"

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছিলে বটে। সেই রঙ্গনার সঙ্গেই? তুমিই ঘটকালি করলে না কি?"

চুনীলাল ঘাড় নেড়ে স্মিতমুখে চেয়ে রইল কেবল, কোনও কথা বললে না। রঙ্গনা যে তার নিজেরই ভাগ্নি এ কথা অন্নদার কাছে প্রকাশই করেনি সে।

"বাহাদুরি আছে বটে তোমার"—অন্নদার শুষ্কমুখে হাসি ফুটল একটু।

"দিন পনেরো পরেই টাকাটা পাব ঠিক তো?"

"ঠিক।"

"দেখো ভাই। শুনে অবধি পরিবার তো কাক চিল বসতে দিচ্ছে না বাড়িতে। এমন মাথা খুঁড়েছে যে কপালের মাঝখানটা আবের মতো ফুলে উঠেছে।"

"একটা বাজে বোধহয়; নয়? টাকাটা আজকে পাঠাতে পারলে বড় ভালো হত।"

"কালই দিয়ে দেবে তো ঠিক? আমাদের আপিসের চাটুজ্যে মশাই মশারির কাপড় কিনবার জন্যে গোটা পঁচিশেক টাকা দিয়েছেন। তার থেকেই দশটা টাকা নাও, মশারির কাপড় পরশু কিনব না হয়।"

"দাও। এগারোটা টাকাই দাও। মনিঅর্ডার করতে তো কিছু লাগবে? চল সঙ্গে সঙ্গে মনিঅর্ডার করেই দিই।"

"বেশ চল।"

দুজনে পোস্টাফিস অভিমুখে রওনা হলেন। কিছুদূর গিয়েই মোড়ে পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন অন্নদা বিশ্বাস।

"একটা সোডা দাও তো হে।"

"শুধু শুধু সোডা খাচ্ছ কেন? ভ্রুকুঞ্চিত করে প্রশ্ন করলেন চুনীলাল।

"শুধু শুধু নয়, পেটটা কেমন ঠোস মেরে আছে। আজকালকার তেল তো আর তেল নয়, বিষ।"

আসলে মাঝে মাঝে সোডা খাওয়া অন্নদা বিশ্বাসের একটি বিলাস। এই একটি মাত্র বিলাসই আছে তাঁর। কিন্তু সেটা যে বিলাস তা স্বীকার করতে লজ্জিত হন ভদ্রলোক। এমন কি নিজের কাছেও।

ফেনায়িত সোডার বোতলটা মুখে তুলে অন্নদা বিশ্বাস এমন একটা মুখভাব করলেন যেন তিনি ওষুধ খাচ্ছেন, বাধ্য হয়ে যেন খেতে হচ্ছে। চুনীলাল ভ্রূ-কুঞ্চিত করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

দিবস নিজেকে রঙ্গনার কাছে মেসের চাকর হিসেবেই পরিচিত করেছিল, প্রয়োজন হলে গহনচাঁদের কাছেও সে পরিচয় দিতে তার আপত্তি ছিল না, কিন্তু সে পরিচয় যখন দিতে হল তখন গ্লানিতে তার সমস্ত মন যেন ক্লেদাক্ত হয়ে উঠল। এই গ্লানিটার জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না, নিজের এই দুর্বলতায় নিজের কাছেই অপ্রতিভ হয়ে পড়ল সে। তার বাহবা-লোলুপ মনোবৃত্তির গালে বিধাতা যেন এটা চপেটাঘাত করে বলে দিলেন—তুই বড়লোকের ছেলে, তুই এম-এস-সি পাশ তা সত্ত্বেও তুই আদর্শের জন্যে সামান্য একটা চাকর হয়ে আছিস—এই সম্পূর্ণ খবরটা রঙ্গনা জানতে পেরেছিল বলেই তুই তার কাছে বক্তৃতার পেখম মেলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলি। তোর ইচ্ছেটা ছিল গহনচাঁদবাবুও সমস্ত খবরটা জেনে বাহবা দিয়ে উঠুন। কিন্তু তা হল না। তিনি ওর কুৎসিত অংশটুকুই জানতে পারলেন শুধু। এর জন্যে তোর যদি গ্লানি হয়ে থাকে বাড়ি ফিরে যা। লোককে তাক লাগিয়ে দেবার অনেক উপকরণ আছে সেখানে। আর একটা ঘটনাও হয়তো ঘটতে পারে, এখনই অত দমে যাচ্ছিস কেন? রঙ্গনার মুখে গহনচাঁদবাবু হয়তো তোর উজ্জ্বল অংশটারও খবর পাবেন।

এই ধরনের আত্ম-বিশ্লেষণের পর এবং গহনচাঁদের "আরে তুমি তো তাহলে আমাদের পালটি ঘর" এই উক্তির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে দিবস ঠিক করে ফেললে গহনচাঁদের বাড়িতে আর সে যাবে না। আরও ঠিক করলে দ্বিগুণ উৎসাহে মেসের চাকরিটাকেই আঁকড়ে থাকতে হবে তাকে এখন কিছুদিন। নিছক মেসের চাকর হিসাবে লোকসমাজে নিজের পরিচয় দিতে যতদিন না সে গৌরব বোধ করছে ততদিন থাকতে হবে। যে গ্লানি সে কিছুক্ষণ আগে অনুভব করেছে সে গ্লানির মূলোৎপাটন করে তবে ছাড়বে। ছাত্রজীবনে এই ধরনের গোঁ তাকে ভর করত মাঝে মাঝে। এক একটা শক্ত অঙ্ক নিয়ে সমস্ত রাত কেটেছে তার। অঙ্কটা যত বেশি জটিল মনে হত জেদও ততই বাড়ত। মেসের কারও কাছে সে নিজের সত্য পরিচয় দেবে না তা-ও ঠিক করে ফেললে। হরিদাসবাবু যদি ফিরে থাকেন তাহলে তাঁকে মানা করে দিতে হবে।

তারপর দিন সকালে মেসে গিয়ে সে প্রথমেই নিশ্চিন্ত হল হরিদাসবাবু ফেরেননি দেখে। পটলির স্বামীর অসুখের জন্য গিরি কয়েকদিন থেকে আসছে না (গিরির নিজেরও জ্বর হচ্ছে মাঝে মাঝে), গিরির কাজগুলো প্রথমেই সে করে ফেললে। খানকয়েক বাসন মাজতে কতক্ষণই বা লাগে। সেদিন মনের বেগটা প্রবল ছিল বলে আরও কম সময় লাগল।

বাসনগুলো মেজে উনুনে আগুন দিয়ে দিলে সে। তারপর ঝাঁটাটা নিয়ে উপরে উঠল। উঠেই দেখা হয়ে গেল গোবর্ধনের সঙ্গে।

"আসুন, আসুন, ওস্তাদবাবু আসুন। সরোদ শেখা হল কাল? না আমরা যাওয়াতে রসভঙ্গ হয়ে গেল?"

দিবস কিছু না বলে ঘর ঝাড়ু দিতে লাগল মৃদু হেসে। উপহাসটা গায়ে মাখলে না।

"সত্যিই তুমি সরোদ বাজাও নাকি হে?"—প্রশ্ন করলেন অঘোর।

"আজ্ঞে হ্যাঁ বাজাই।"

"কালে কালে কতই যে দেখব!"

গোবর্ধনবাবু পাঁজি দেখছিলেন, পাঁজিরই পাতা ওলটাতে লাগলেন। দিবস মুখে মৃদু হাসিটুকু ফুটিয়ে রেখে ঘর ঝাড়ু দিয়ে যেতে লাগল। মুখের এই হাসিটুকু ফুটিয়ে রাখতে (তার অর্থ যেন কিছুই হয়নি) যে কি পরিমাণ শক্তি খরচ করতে হচ্ছিল তাঁদের ওই চাকরটিকে তা যদি গোবর্ধনবাবু বুঝতে পারতেন। গোবর্ধন তার মুখের হাসিটা লক্ষ্যও করছিলেন না তেমন, তিনি সম্পূর্ণ অন্য এক ব্যাপারে নিমগ্ন ছিলেন।

"এই দেখ অলাবু ভক্ষণ নিষেধ, বললুম আমি, এই দেখ"—অঘোরের সামনে পাঁজিটি তুলে ধরলেন তিনি—"তুমি তো এক দিগগজ লাউ কিনে আনলে।"

"কাল খাওয়া যাবে।"

"তাহলে তুমি বাজারে যেও। মাছের মাথা কিংবা চিংড়ি মাছ নিজে দেখে কিনে এনো, লাউ অমনি খাওয়া যায় না।"

"বেশ তাই যাব। এখন ধূর্জটিবাবুকে নিয়ে কি করা যায় বলুন তো? বড়ই দমে গেছেন ভদ্রলোক।"

"হরিদাস আসুক। ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। আজই হরিদাসের আসবার কথা।"

"মিত্তির মশাই আছেন না কি?"—নীচে থেকে হাঁক শোনা গেল একটা।

"সিংহির গলা না? দেখ তো।"

অঘোর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন এবং উঁকি মেরে দেখলেন।

"হ্যাঁ। মিত্তির মশাই আছেন, আসুন ওপরে।"

হরলাল সিংহি এসে যখন ঢুকলেন তখন দিবস তক্তাপোশের নীচে শরীরের খানিকটা দিয়ে কোণের দিকের ময়লাগুলো টেনে বার করছিল।

"এস এস"—অভ্যর্থনা করলেন গোবর্ধন—"শ্রীরামপুর থেকে আসছ?"

"হ্যাঁ।"

"খবর সব ভালো তো?"

"হ্যাঁ এদিকে ভালোই। কিন্তু সেই চুনীলালের খপ্পর থেকে এখনও উদ্ধার পাই নি ভাই।"

"কি হল?"

"শুনেছিলাম টাকাটা সে দিয়ে দিতে চায়। চিঠি লিখলাম, কোনও উত্তর নেই। তাই আমাদের উকিল সূয্যিবাবুর কাছে যাচ্ছি আর একবার। তিনি কয়েকটা সাক্ষী জোগাড় করতে বলেছিলেন—"

দিবস চৌকির তলা থেকে বেরিয়ে এল। হরলাল সিংহি আকাশ থেকে পড়লেন।

"আরে দিবুবাবু যে! আপনি এখানে। এ কি!"

কোনও উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে গেল দিবস। এ ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। এ-ও সে নিমেষে বুঝতে পারলে মেসের চাকরিটিও ছাড়তে হবে, কারণ একটু পরেই বাবা এসে হাজির হবেন এখানে।

গোবর্ধন বিস্মিত হয়েছিলেন হরলালের ব্যবহারে।

"একে চেন নাকি তুমি?"

"চিনি বইকি। সূয্যিবাবু উকিলের ছেলে।"

"বল কি! আমাদের মেসে চাকর হয়ে আছে কদিন থেকে।"

"সে কি! চাকর হয়ে আছে?"

হরলাল বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইলেন।

অঘোর মন্তব্য করলেন, "আজকাল ভদ্দরলোকের ছেলেদের এই দুর্দশাই তো হবে। পড়াশোনার দিকে মন নেই তো কারও। আমার ছেলেটা তিন বছর ধরে ফোর্থ ক্লাসে ডিগবাজি খাচ্ছে।"

"না, না দিবুবাবু সে রকম ছেলে নন। এম-এস-সি পাশ করে ল' পড়ছিলেন। বাপের সঙ্গে তাহলে হয়েছে নিশ্চয় কিছু একটা। খবর নিতে হচ্ছে।"

গোবর্ধনের চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবার মতো হল। তিনি কিছু বলবার আগেই কিন্তু দিবস বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায়। দিবসকে দেখতে না পেয়ে হরলাল ঘরে ঢুকলেন আবার।

"এম-এস-সি পাস করে ল পড়ছিল!"—গোবর্ধনের মুখে কথা সরল এতক্ষণে।

"হ্যাঁ, হীরের টুকরো ছেলে।"

গোবর্ধন এবং অঘোর দৃষ্টি বিনিময় করল। হরলাল সিংহি যদি সঙ্গে সঙ্গে সূর্যকান্তকে খবর দিতে পারতেন তাহলে হয়তো দিবসের নাগল পাওয়া সম্ভব হত। কিন্তু তিনি ক্লান্ত ছিলেন। তিনি ভাবলেন একটু পরে যখন সূর্য চৌধুরীর ওখানে যাবেন তখন ঘটনাটা বলবেন তাঁকে। তা ছাড়া তিনি আশা করছিলেন যে, দিবস যখন এইখানেই আছে তার মুখে ব্যাপারটা শোনা যাক প্রথমে। দিবস যে মেসে আর ফিরবে না ধারণা করতে পারেননি তিনি।

দিবস রাস্তা ধরে সোজা হাঁটতে লাগল। কয়েকদিন আগে রঙ্গনার যেমন মনে হয়েছিল তারও তেমনি মনে হতে লাগল একটা বেড়াজাল সহসা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে তার চারিদিকে। যে দুটি মুক্তির ক্ষেত্রে সে নিজেকে বিস্তার করছিল তা পর পর রুদ্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। গহনচাঁদের বাড়িতে আর যাওয়া যাবে না, ও মেসেও আর চাকরি করা যাবে না। হরলালবাবুর মুখে খবর পেয়ে বাবা দলবল নিয়ে এসে পড়বেন এই বার। সৌদামিনীর সংস্রবও ত্যাগ করতে হবে। রঙ্গনা তার বাসার ঠিকানা জানে। বাবা যদি মেসে থেকে গহনচাঁদ বাবুর বাড়ির যান (যাবেনই) তাহলে সেখান থেকে তার বাসায় অনায়াসে আসতে পারবেন। তারপর শুরু হবে সেই মামুলি তর্কাতর্কি, সেই কথা কাটাকাটি, ব্রজ হয়তো কাঁদবে, বাবা গুম হয়ে যাবেন, চিমটি কেটে কেটে কথা বলবেন গোবিন্দ সাণ্ডেল—এই সবের আবর্তে আবর্তিত

হতে হতে শেষ কালে আবার গিয়ে হয়তো ঠেকতে হবে তাকে ল' কলেজে। তার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। মনে পড়ল একটা বইয়ের দোকানে সে নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রির একটা বই কিনতে দিয়েছিল। বইটা দোকানে ছিল না। দোকানদার দিবসের চেনা, (এর দোকান থেকে দিবস বই কেনে বরাবর) বইটা খুঁজে আনিয়ে রাখবেন বলেছিলেন। হয়তো বইটা এসে গেছে। সোজা দোকানের উদ্দেশ্যেই চলতে লাগল সে। একটি কথাই বারবার মনে হতে লাগল—আত্মরক্ষা করতে হবে। যেমন করে হোক দৈবের এই প্রতিকূলতাকে জয় করতে হবে। পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়াতে তার অন্তরের অন্তস্থল থেকে একটা ঘুমন্ত শক্তি জেগে উঠেছিল যেন, একটা অভিনব আনন্দও। শক্তি পরীক্ষা করবার আর একটা সুযোগ পেয়ে তার সমস্ত সত্তা যেন উন্মুখ হয়ে উঠেছিল নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবার জন্যে। না, কিছুতেই সে দমবে না, কিছুতেই না। নিজে যেচে না গিয়েও অকস্মাৎ বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাতে সে প্রথমটা খুশি হয়ে উঠেছিল একটু, কিন্তু এই দেখা হওয়ার পরিণাম ভাবতে গিয়েই তার মন বিদ্রোহ করে উঠল। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল এই দুর্বলতার ভাঙন কোথায় গিয়ে থামবে। "না, দুর্বলতাকে কিছুতে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না"—এই কথা ভাবা সত্ত্বেও বাবার মুখটা কিন্তু মাঝে মাঝে ফুটে উঠতে লাগল মনে। বিশেষ করে সেই ফোটোর মুখটা, চোখের সেই প্রসন্ন দৃষ্টি, যার মধ্যে কোনো নীচতা নেই।.... রঙ্গনার মুখটাও.....। একবার একথাও তার মনে হল যে রঙ্গনার চোখের দৃষ্টিতে দু'একবার চকিতে সে এমন আলো দেখছে যার সঙ্গে তার আচরণের মিল নেই। তার বাইরের আচরণটা কি তবে আবরণ শুধু? তার আসল সত্তাটার পরিচয়ই সে পায়নি হয়তো। ক্ষণিকের জন্য এই কথাটা মনে হল তার, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যই। দোকানে পৌঁছে সে সব ভুলে গেল। দোকানী বললেন, বইটা আনতে একটি লোককে পাঠিয়েছি। এখনই সে এসে পড়বে। আপনি একটু অপেক্ষা করে যান।"

দিবস দোকানের ভিতর ঢুকে এ বই সে বই উলটে উলটে দেখতে লাগল এবং ক্রমশ তন্ময় হয়ে গেল। হঠাৎ এক সময়ে সে ঠিক করে ফেলল অন্তত কিছুদিনের জন্য তাকে কোলকাতার বাইরে চলে যেতে হবে। আজই। তা নাহলে বাবা ঠিক ধরে ফেলবেন তাকে। কোলকাতার বাইরেই কোথাও গিয়ে সে রোজগার করে টাকা জমাবে। আজই এখনই চলে যেতে হবে। টাকাকড়ি তার সঙ্গেই ছিল। দুখানা কাপড় আর জামা দুটো বাসা থেকে নিয়ে আসতে পারলে ভালো হত। তখনই মনে হল, বাবা যদি ইতিমধ্যে এসে থাকেন সেখানে! তা ছাড়া আর একটা কথাও মনে হল, যে ছেলেটিকে সে অঙ্ক পড়ায় তারও ব্যবস্থা করে যেতে হবে একটা। অন্ততপক্ষে খবরটা দিতে হবে তাকে। এমন সময় তার বইটা এসে পড়ল। সাগ্রহে বইটার পাতা ওলটাতে লাগল সে। আবার তন্ময় হয়ে গেল। তারপর খেয়াল হল সেই ছেলেটিকে খবর দিতে হবে। নেবে পড়ল রাস্তায়। ঘড়ির দিকে একবার চেয়ে দেখল এগারোটা বেজেছে। তারপর রাস্তার দিকে চেয়ে সে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখতে পেলেন তাকে। সৌদামিনী একা রিকশ করে চলেছে।

"কোথায় গিয়েছিলে?"

একটু মুচকি হেসে সৌদামিনী বললে, "কালীঘাটে পুজো দিতে গিয়েছিল মানত করেছিল কি না। সরে এস এদিকে।"

সরে যেতেই পুজোর ফুল বেলপাতা দিবসের মাথায় ঠেকিয়ে দিয়ে সৌদামিনী বললে, "পেসাদ বাড়ি গিয়েই খেও। মনে করে খেও যেন।"

"আমি এখন বাড়ি ফিরব না। আমাকে বাইরে যেতে হবে আজ"—হঠাৎ একটা কথা মনে হল দিবসের—"তুমি একটি উপকার করতে পারবে দিদি?"

"কি?"

"আমার কাপড় দুটো, গেঞ্জিটা, আর জামাটা আমার সেই ক্যাম্বিসের থলিতে পুরে এই বইয়ের দোকানে যদি পাঠিয়ে দিতে পার কারও হাত দিয়ে তাহলে আর আমাকে বাসায় যেতে হয় না।"

"তা না হয় দিতে পারি, কিন্তু যাওয়া হচ্ছে কোথা?"

"বর্ধমানে"—হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল দিবসের।

"হঠাৎ বর্ধমান?"

"দরকার আছে একটু।"

"ফিরবে কবে?"

"তার ঠিক নেই।"

"তোমার মেসের কাজ কে করবে তাহলে?"

"মেসের কাজ ছেড়ে দিয়েছি। তুমি কাপড় জামা পাঠিয়ে দিও তাহলে—এদের বলে দি।"

সৌদামিনীর কাছেও বেশিক্ষণ দাঁড়াতে সাহস হচ্ছিল না দিবসের। তাড়াতাড়ি সে তাই বইয়ের দোকানে ঢুকে পড়ল আবার।

"একজন আমার একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ এখানে এনে রেখে দেবেন, আমি একটু পরে এসে নিয়ে যাব।"

"আচ্ছা।"

দোকান থেকে নেমে সৌদামিনীর দিকে চেয়ে বললে—"আচ্ছা, চলি তাহলে।"

"শোন। পেসাদটুকু খেয়ে যাও।"

রাস্তায় দাঁড়িয়ে আধখানা প্যাঁড়া এবং একটা বাতাসা দিবসকে খেতে হল।

রঙ্গনা বাড়িতে একা ছিল। নিজের সেই কোণের ঘরটিতে বসে ছিল সে। একাগ্র হয়ে প্রতীক্ষা করছিল গহনচাঁদবাবু কি খবর নিয়ে আসেন। গহনচাঁদবাবু চুনীলালকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। রঙ্গনাকে বলে গিয়েছিলেন বিকাশবাবুর জ্যাঠার কাছে বলতে যাচ্ছেন যে তাঁরা এখন মেয়ে দেখতে যেন না আসেন। চুনীলাল অন্য দিকে চেয়েছিল, কিছুই বলেনি। মৌন সম্মতিব লক্ষণ এই প্রবাদ বাক্যানুসারে চুনীলালের তাতে সায় ছিল একথা যদি কেউ মনে করেন তাহলে তাঁরা চুনীলালদের চেনেন না। সে কোনও রকমে বিনা ঝামেলায় রঙ্গনার সান্নিধ্যটা এড়াতে চাইছিল। রাস্তায় বেরিয়েই সে গহনচাঁদকে বললে, "আপনি কি সত্যিই ওদের মানা করতে যাচ্ছেন না কি?"

"রঙ্গনা যখন অত আপত্তি করছে তখন তা করা ছাড়া উপায় কি?"

"রঙ্গনার বিয়ে দিতেই হবে একদিন। এমন সৎপাত্র হাতছাড়া হয়ে গেলে কিন্তু পরে পস্তাতে হবে।"

"কি করতে বল তুমি আমাকে তাহলে—"

গহনচাঁদ অসহায়ভাবে চাইলেন চুনীলালের দিকে।

"ওরা যেমন মেয়ে দেখতে আসছে আসুক। বরং ব্যাপারটা ওরা যাতে তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলে সেই কথাই বলি গে চলুন ওদের। তারপর রঙ্গনাকে বোঝান যাবে। আজ টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি—পদ্ম চলে আসুক। মামীকে খুব ভালোবাসে রঙ্গনা। পদ্ম বুঝিয়ে বললে সব ঠিক হয়ে যাবে। মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষই বোঝাতে পারে, ও আপনার আমার কর্ম নয়।"

কথাটা গহনচাঁদের যুক্তিযুক্ত মনে হল।

রঙ্গনা কিন্তু কোণের ঘরটিতে বসে প্রতীক্ষা করছিল। শুধু গহনচাঁদ কি খবর আনেন তার জন্যেই নয় দিবসেরও একটা খবর সে প্রত্যাশা করছিল। দিবসের প্রকৃত পরিচয় সে গহনচাঁদকে বলেনি। তার মনের খবরটা ভাবে-ভঙ্গিতে উর্মির কাছে প্রকাশ হয়ে পড়াতেই লজ্জায় মাথা কাটা গেছে তার। উর্মি কথাটা বাবার কাছ প্রকাশ করে দিয়েছে, বাবা দিবসবাবুর কাছে বিয়ের প্রস্তাবও করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ওই মেসের ভদ্রলোকেরা এসে পড়াতে সব গোলমাল হয়ে গেল, এ সমস্ত খবরই সে তার বাবার কাছ থেকে শুনেছে। দিবস যে মেসের সামান্য একটা চাকর মাত্র এই বিস্ময়কর খবরটাও গহনচাঁদ সাড়ম্বরে বলেছেন রঙ্গনাকে। তবু রঙ্গনা চুপ করে ছিল, দিবসের প্রকৃত পরিচয় দেননি। দিবসের প্রকৃত পরিচয়টা উদ্‌ঘাটন করে তার হয়ে ওকালতি করতে শুধু যে তার লজ্জা করছিল তা নয়, আত্মপ্রশংসা করতে যে ধরনের একটা সংকোচ হয় সেই রকম একটা সংকোচও হচ্ছিল। সত্যবান রাজার ছেলে—এইটেকে বড় করে তোলার মধ্যে কেমন যেন একটা ইতরোমি আছে এ কথাও মনে হচ্ছিল তার। তাই সে চুপ করে ছিল। দিবসের বিষয়ে একটি কথাও বলেনি কাউকে। কিন্তু সে প্রতীক্ষা করছিল। কিরণের লেখা গানের লাইনগুলো স্বপ্ন সৃজন করছিল তার মনে—

আঁধার রজনী শেষে
আলোক উজল বেশে
আসিবে সে আসিবে সে
আসিবে সে
জানি আমি জানি আমি জানি গো।

হঠাৎ বাড়ির সামনে মোটর এসে দাঁড়াল একটা। জানলাটা ঈষৎ ফাঁক করে সূর্য চৌধুরীকেই দেখতে পেল সে প্রথমে। দেখেই চিনতে পারল। তাঁর ফোটোটা সে দিবসের বাসায় দেখেছিল। সহসা কেমন যেন শঙ্কিত হয়ে পড়ল সে। নিমেষের মধ্যে সে বুঝতে পেরে গেল দিবসের সন্ধানেই এসেছেন উনি এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল দিবসকে উনি যদি ধরে নিয়ে যান, তাহলে দিবস হয়তো চিরদিনের জন্য তার নাগালের বাইরে চলে যাবে। খোলার-ঘর-বাসী দিবস তার কাছে সুলভ, কিন্তু প্রাসাদ-বাসী সূর্য চৌধুবীর একমাত্র পুত্র দিবস আকাশের চাঁদের চেয়েও দুর্লভ তার কাছে। সূর্য চৌধুরীর ঠিকানাও জানা নেই রঙ্গনার। দিবস যদি বাবাব কাছে ফিরে যায় তাহলে...।

সূর্য চৌধুরী ছাড়া মোটরে অঘোর এবং হরলাল ছিলেন।

হরলাল নেবে এসে দুয়ারের কড়া নাড়তে লাগলেন। রঙ্গনা বেরিয়ে এল।

"কাকে খুঁজছেন?"

"দিবসবাবু এখানে সরোদ শিখতে আসেন?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি কোথায় থাকেন বলতে পারেন?"

"তাতো জানি না।"

"গহনচাঁদবাবু কোথা?"

"তিনি বেরিয়েছেন একটু। তিনিও দিবসবাবুর ঠিকানা জানেন না।"

"ও।"

"দিবসবাবু কখন আসেন সাধারণত ?"

"তার ঠিক নেই।"

"এলে বলে দেবেন যে তাঁর বাবা তাঁকে নিতে এসেছিলেন। তিনি যেন আজই দেখা করেন তাঁর সঙ্গে।"

"আচ্ছা, আসেন তো বলে দেব।"

সূর্য চৌধুরীর মোটর চলে গেল। নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রঙ্গনা। হঠাৎ যেন তার মনে হল দিবস আর আসবে না। কেন মনে হল তা যদিও সে বলতে পারত না কিন্তু তার মনে হল দিবস যে কদিন থেকে তার সম্বন্ধে একটু উদাসীন হয়ে পড়েছে একথা সে অন্তরে অন্তরে অনুভব করছিল, কিন্তু মানতে চাইছিল না। সেই অনুভূতিটা এখন যেন কানে কানে তাকে বলে গেল—দিবস আর আসবে না।

দিবসের কিন্তু বর্ধমান যাওয়া হল না। বইয়ের দোকানে সৌদামিনী যে ক্যাম্বিসের ব্যাগটা বসন্তর মারফত পাঠিয়ে দিয়েছিল সেটা যদি সে আগে খুলে দেখত তাহলে হাওড়া পর্যন্ত যাবারও দরকার হত না। বর্ধমানের নামটা যখন মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল তখন বর্ধমানে যাওয়াই স্থির করেছিল সে। স্টেশনে গিয়ে সে খোঁজ করল বর্ধমানের গাড়ি কখন। দেরি আছে শুনে স্টেশনে ঘোরাফেরা করল খানিকক্ষণ। হুইলারের দোকানে বই ওলটাল মিনিট পনেরো ধরে। এই সময়ে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মহেন্দ্র কুণ্ডুর।

"আরে, আপনি এখানে। আমি যে আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। কোথায় চলেছেন আপনি?"

"বর্ধমান যাব।"

"হাঁসটা ভালো আছে?"

"হ্যাঁ।"

"ওটাকে এসে নিয়ে যাব এবার একদিন। বাসা পেয়েছি একটা।"

"বেশ তো।"

"আসুন।"

সিগারেটের বাক্সটা দিবসের সামনে খুলে ধরলেন কুণ্ডু মশায়।

"আমি তো সিগারেট খাই না।"

"ও।"

কুণ্ডু মশায়ের মুখটা ছুঁচলো হল একটু। তারপর নিজেই একটি সিগারেট নিয়ে ধরালেন সেটি। ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে দিবসের দিকে চেয়ে বললেন, "আচ্ছা চলি তবে। এসে হাঁসটা নিয়ে যাব একদিন। আপনি কখন বাড়িতে থাকেন?"

"আমি? প্রায়ই থাকি না। আমি না থাকলেও নিয়ে যাবেন, আপনারই তো হাঁস।"

"বেশ বেশ।"

মহেন্দ্র কুণ্ডু চলে গেলেন।

হুইলারের দোকানে মনোমত কোনো বই না পেয়ে দিবস ঠিক করলে এখনই যে বইটা কিনেছে সেইটেই ওলটান যাক ওয়েটিং রুমে বসে বসে। বইটা সে ক্যাম্বিসের ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছিল। ওয়েটিং রুমে গিয়ে ক্যাম্বিসের ব্যাগ থেকে বইটা বার করতে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল খামের একখানা চিঠি। চিঠিটা সকালের ডাকে তার বাসায় এসেছিল। সৌদামিনী সেটা তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। কার চিঠি? চেনা হাতের লেখা। লন্ডনের ছাপ রয়েছে। চিঠিখানা খুলে দিবস অবাক হয়ে গেল। তার জীবনের গতিটাই বদলে গেল যেন হঠাৎ। কল্পনায় যে রঙে সে নিজের ভবিষ্যতের ছবি এঁকেছিল তার চেয়ে শত সহস্রগুণ উজ্জ্বল বর্ণে মহিমান্বিত হয়ে উঠল যেন সে ছবি।

দিবসের চিঠির উত্তরে তার সেই সাহেব প্রফেসার যা লিখেছেন তার বাংলা অনুবাদ এই—

প্রিয় চৌধুরী,

তোমার চিঠি পেয়ে যুগপৎ আনন্দিত ও দুঃখিত হলাম। আমাকে এখনও মনে রেখেছ জেনে আনন্দ পেলাম, কিন্তু তুমি তোমার বাঞ্ছিত পথে চলতে পাওনি শুনে দুঃখ হচ্ছে। তুমি যে পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে চাইছ তা অভিনব বটে। তবে তার সাফল্য বা অসাফল্য সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না এখন। আমি এখানে একটা ল্যাবরেটারির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছি, তুমি যদি কোনোক্রমে এখানে এসে পড়তে পার, তাহলে তোমাকে গবেষণার পথে চলতে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারব। এখানে থাকার এবং খাওয়ার খরচ অবশ্য তোমাকে নিজেকে উপার্জন করতে হবে। উপার্জনের পথে বাধা বিস্তর, কিন্তু তোমার কাজ করবার শক্তি ও ইচ্ছা যদি প্রবল এবং খাঁটি হয় তাহলে জুটে যাবেই কিছু একটা। উদ্যমশীল মানুষকে কোনো বাধাই নিরস্ত করতে পারে না। তুমি যদি এখানে আসতে চাও বেশি দেরি কোরো না, কারণ যে সুযোগ তোমাকে দিতে পারব ভাবছি দেরি করে ফেললে তা হয়তো পারব না।

আশা করি কুশল সব। আমার স্নেহ গ্রহণ কর। ইতি—

চিঠিটা পড়বার পরমুহূর্তেই তার মনে হল হরিদাসবাবুর কথা। তিনি প্রয়োজন হলে অর্থ সাহায্য করবেন বলেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বেরিয়ে পড়ল সে।

নিজের বাসার সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার ভয় হতে লাগল গিয়ে যদি দেখে বাবা বসে আছেন। বসন্তকে দেখতে পেলে হঠাৎ। বসন্তও তাকে দেখে এগিয়ে এল।

"আপনি বর্ধমান যাননি?"

"না। আমাকে খুঁজতে এসেছিল কেউ?"

"না তো।"

"দিদি কোথায়?"

"বাসাতেই আছে।"

"গিরি এ বেলা কাজে গেছে কি?"

"যায়নি, কিন্তু যাবে বলছিল, ওই যে আসছে।"

গিরিও বেরিয়ে এল।

"তুমি মেসে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ। আজ যাবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু আপনি চলে গেছেন শুনে যাচ্ছিলাম। কেউ না গেলে বাবুদের যে কষ্ট হবে। ঠাকুরটি যা শ্রীমন্ত!"

"চল আমিও যাই।"

"আপনি বর্ধমান যাননি?"

"না। শোন একটা কাজ করতে হবে তোমাকে।"

"কি?"

"আমি আর মেসে ঢুকব না। আমার আসল পরিচয় জেনে ফেলেছেন সবাই। তবে হরিদাসবাবু যদি ফিরে থাকেন তাঁকে আড়ালে ডেকে একটু বল যে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই একবার বিশেষ দরকারে। আমি মেসের পাশের গলিটাতে অপেক্ষা করব তাঁর জন্যে। গোপনে ডেকে বোলো কিন্তু, জানাজানি না হয়ে যায় যেন!"

"আচ্ছা।"

মেসের কাছাকাছি এসে সৌভাগ্যক্রমে হরিদাসবাবুর সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল। তিনি খানিকক্ষণ আগে টুর থেকে ফিরে স্নানাহার সেরে আপিসের দিকেই যাচ্ছিলেন।

গিরি মেসে ঢুকে পড়ল।

হরিদাসবাবু দিবসের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "সব জানাজানি হয়ে গেছে দেখছি। এখন কি করবেন?"

"আপনি যদি সাহায্য করেন একটু লম্বা পাড়ি দেব।"

"কি রকম?"

সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করে প্রফেসারের চিঠিটা হরিদাসবাবুকে দিবস দেখালে। তারপর বললে—"আপনি যদি টাকা দেন তাহলে—"

দিবসের কথা শেষ করতে না দিয়ে হরিদাসবাবু বললেন, "চলুন এখনই দিচ্ছি। ক'টা বেজেছে?"

"একটা বোধহয়।"

"চলুন তাহলে সোজা পোস্টাফিসের দিকেই যাওয়া যাক।"

।। চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।।

সে দিন সন্ধ্যার পর দিবস গড়ের মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিল একা। সে আনন্দে যেন বুঁদ হয়ে গিয়েছিল। আনন্দের নেশায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল মাতালের মতো। কোন এক অদৃশ্য বিধাতার কথা মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল তার অস্পষ্টভাবে। মনে হচ্ছিল তার হাতে বোধ হয় ইলেকট্রিক সুইচের মতো কিছু একটা আছে। ইচ্ছা মতো আলো বা অন্ধকার করে দিতে পারেন মুহূর্তের মধ্যে। আলোর রঙও বদলে দিতে পারেন খুশি মতো। খানিকক্ষণ আগেই হতাশার অন্ধকার নেমে এসেছিল চারিদিকে, এখন আবার কি চমৎকার হয়ে গেল। হরিদাসবাবু সমস্ত টাকাটাই দিয়ে দিয়েছেন তাকে। একটা রসিদ পর্যন্ত নিতে চাচ্ছিলেন না। দিবস জোর করে একটা হ্যান্ডনোট লিখে দিয়েছে। কি অদ্ভুত ভদ্রলোক। টাকার প্রতি কোনো মমতাই নেই। অথচ তা নিয়ে কোনও আস্ফালনও নেই। অনাড়ম্বর আবরণের তলায় কত মহত্ত্বই যে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে তা আমরা দেখতে পাই না। পরমাণুর মধ্যে যে এত সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন ছিল তাই বা কে জানত এতদিন? সহসা একটা কথা মনে হওয়াতে অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইল সে। তার মনে হল প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যেই যেমন বিরাট শক্তি নিহিত আছে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেও তেমনি হয়তো নিহিত আছে বিরাট মহত্ত্ব। আমরা প্রত্যেকেই হয়তো হরিদাসবাবু। একটা বিশেষ প্রেরণার সংঘাতে হরিদাসবাবুর মহত্ত্ব প্রকট হয়েছে, অন্য রকম প্রেরণার সংঘাতে আর একজনের মহত্ত্ব হয়তো তেমনি উদঘাটিত হবে। নুন জলের সংস্পর্শে গলে, সোনা গলে অ্যাকোয়ারিজিয়াতে, কিংবা আগুনের তাপে সোহাগার স্পর্শে। সব জিনিসই গলে, সব জিনিসই বাষ্প হয়। সব মানুষও তেমনি হয়তো মহত্ত্বে বিকশিত হতে পারে..... হঠাৎ বাবার কথা মনে পড়ল। বিলেত চলে যাওয়ার আগে বাবার সঙ্গে দেখা করে গেলে কেমন হয়? কিন্তু যদি তিনি বাধা দেন। অসম্ভব নয়। গোবিন্দ সাণ্ডেলের মুখটা মনে পড়ল। মনে পড়ল ব্রজকে। এরা বাধা দেবেই। তাছাড়া সে তো নিজের পায়ে দাঁড়ায়নি এখনও। নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে সে ফিরবে না বাড়িতে। নিজের পৌরুষের অমর্যাদা সে করবে না। জোর গলায় যে কথাটা সে প্রচার করেছে তা রাখতেই হবে। বিলেতে পৌঁছে বাবাকে একটা খবর দিলেই হবে। আবার সে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আলোকোজ্জ্বল চৌরঙ্গিটা ইন্দ্রপুরীর মতো মনে হতে লাগল দূর থেকে। মনে হল মাটির পৃথিবীতে অন্ধকার রাত্রে এই ইন্দ্রপুরী সম্ভব হয়েছে মানুষের অক্লান্ত অধ্যবসায়ে। নির্নিমেষে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল সে। মনে হল মানব-মনীষার জয়যাত্রার মিছিলে সেও চলেছে।

...ইচ্ছে করেই বেশি রাত্রে বাড়ি ফিরল। বাবা যদি ইতিমধ্যে খোঁজ নিতে এসে থাকে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত বসে থাকবেন না নিশ্চয়। ঘরের সামনে এসেই কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে। ঘরের কপাট খোলা কেন? সৌদামিনীর কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে, সেই শুয়েছে নাকি এসে? বাবা অপেক্ষা করছেন না কি! নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে ক্ষণকাল। তারপর ঘরে ঢুকল। ঢুকে যা দেখল তা সে প্রত্যাশা করেনি, কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল প্রত্যাশা করেছিল, অতি সংগোপনে অন্তরের অন্তস্তলে। খাটের উপর রঙ্গনা বসে আছে।

"এ কি, তুমি হঠাৎ এ সময়ে?"

"অনেকক্ষণ থেকে বসে আছি। চারটে থেকে।"

"কেন?"

"পালিয়ে এসেছি বাড়ি থেকে। আমাকে দেখতে এসেছিল আজ একদল লোক। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে আমার বিয়ে দেবে মনে করেছে ওরা। চলে এসেছি তাই।"

আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল দিবসের সর্বাঙ্গ।

"বেশ করেছ। চারটে থেকে বসে আছ? খেয়েছ কিছু?"

"না। খিদে নেই।"

দিবসের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"খাবার আছে আমার। মোহন ঠাকুর দিয়ে যায়নি বুঝি এখনও? দেখি—"

"দিয়ে গেছে, ওই যে কোণে রেখে দিয়েছি ঢাকা দিয়ে।"

"ওইটেই দুজনে ভাগ করে খাওয়া যাবে। ব্যাপারটা সব খুলে বল দিকি। আমার কাছে এলে যে হঠাৎ? আমি কি করতে পারি?"

রঙ্গনা মুচকি হেসে বললে, "তা আপনি জানেন। বিপন্ন নারীকে উদ্ধার করতে আপনি অসাধ্য সাধন করতে পারেন বলেছিলেন একদিন। সেই ভরসাতেই এসেছি।"

"বলেছিলাম না কি?"

"বলেন নি? সেই যে হাওড়া স্টেশনে!"

দিবসের মনে পড়ল। কিন্তু সে একটু বিব্রত হল। সত্যিই তো কি করতে পারে সে এ অবস্থায়!"

"আপনাকে অসুবিধায় ফেলতে চাই না তা বলে। আমাকে আশ্রয় দিতে বা সাহায্য করতে যদি না পারেন এখনই আমি চলে যাচ্ছি।"

"না, না, চলে যাবে কেন? কি করে তোমায় সাহায্য করতে পারি তাই ভাবছি। আচ্ছা, এস আগে খেয়ে তো নেওয়া যাক।"

"সত্যি খেতে ইচ্ছে নেই আমার একটুও। তার চেয়ে বরং শোওয়ার ব্যবস্থা করুন একটা। সৌদামিনীর ঘরে জায়গা হবে না একটু?"

"সৌদামিনীর ঘরে কেন? এইখানেই শোও না। তুমি খাটে শোও, আমি মেঝেতে সতরঞ্চিটা পেতে শুচ্ছি। চেষ্টা করলে একটা খাটিয়া পাওয়া যাবে হয়তো। তার দরকার নেই।"

"এক ঘরে শোব বলছেন? সেটা কি ভালো দেখাবে?"

"তুমি যে এমন ভাবে পালিয়ে এসেছ সেটাই কি ভালো দেখাচ্ছে? কুসংস্কার যখন ভাঙবে ঠিক করেছ তখন ওসব নিয়ে আবার খুঁতখুঁত করছ কেন? এক সঙ্গে ঘরে শুলে সত্যিই তো আর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। আমাদের কারও মনে যখন কোনও পাপ নেই তখন লোকে কি বলবে এই ভেবে—"

"বেশ, বেশ তাই শোব, আপনাকে আর বক্তৃতা করতে হবে না।"

ছদ্ম কোপের ঝলকে অপরূপ হয়ে উঠল তার চোখ দুটি।

"সৌদামিনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?"

"হয়েছিল। সেই তো চাবি খুলে দিয়ে আমাকে অপেক্ষা করতে বললে। সৌদামিনী কিন্তু হাসপাতালে গেছে পটলিকে কালীঘাটের প্রসাদ দিতে। বলে গেল আজ হয়তো ফিরবে না।"

"গিরি এসেছিল?"

"না। সে-ও সেখানে যাবে।"

"ও, আচ্ছা বেশ। এস খাওয়া যাক তাহলে।"

"সত্যি বলছি খিদে নেই।"

"আমার আরও নেই। আমি একটা চায়ের দোকানে পেট ভরে খেয়েছি একটু আগে। তুমিই বরং সবটা খাও।"

"কি যে এক জিদি লোক আপনি। বলছি খিদে নেই—"

খুব ভোরে রুদ্ধ দ্বারে টোকা পড়ল।

দিবস ঘরের একপ্রান্তে মেজেতে শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল, তার ঘুম ভাঙল না। রঙ্গনা কিন্তু উঠে বসল ধড়মড় করে। সে দিবসের খাটেই শুয়েছিল। আর একবার টোকা পড়তেই সে উঠে গিয়ে কপাট খুলে দিলে। তাকে দেখেই কিরণ সবিস্ময়ে পিছিয়ে গেল একটু। রঙ্গনা বারান্দায় বেরিয়ে এল।

"আপনি এখানে?"

সহসা এ প্রশ্নের উত্তরে রঙ্গনা কিছু বলতে পারল না। তার কানের পাশটা লাল হয়ে উঠল। মুখে ফুটে উঠল অপ্রতিভ হাসি।

"দিবস কোথা?"

"ঘুমুচ্ছেন। ডেকে দেব কি?"

"না থাক! পরে আসব এখন।"

কিরণ আর দাঁড়াল না, চলে গেল। সে অপমানিত বোধ করছিল। তার মনে হচ্ছিল দিবস তাকে প্রতারণা করেছে। সমস্ত নারীজাতির প্রতি সে কেমন যেন বিরূপ হয়ে উঠল সহসা। সোজা চলে গেল সূর্য চৌধুরীর বাড়িতে। সূর্য চৌধুরীকে অবশ্য রঙ্গনার কথা বললে না কিছু। দিবসের ঠিকানাটা দিয়ে চলে এল কেবল। হাঁটতে হাঁটতে কেবলি তার মনে হতে লাগল, ঠিকানাটা আরও আগে দিয়ে আসা উচিত ছিল। তার মনে হচ্ছিল সে যেন সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। দিবসের চরিত্রে অবিশ্বাস করতে হবে এ কথা তো সে স্বপ্নেও ভাবেনি। দিবসের সঙ্গে কয়েকদিন দেখা হয়নি, তাকে ধরবে বলে তাই খুব ভোরেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। কিন্তু এসে একি দেখলে সে! একসঙ্গে বাস করছে! কই ঊর্মি তো কিছু বলেনি। হঠাৎ মনে পড়ল ঊর্মি কাল তাকে সন্ধ্যার পর বাসায় থাকতে অনুরোধ করেছে। সেই ডিরেকটারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে না কি।

ঘাড় হেঁট করে ভাবতে ভাবতে গলির পর গলি পার হতে লাগল কিরণ। দিবসের উপর বিশ্বাস হারিয়ে কেমন যেন দুর্বল বোধ করতে লাগল সে। নিজের অজ্ঞাতসারে দিবসের বলিষ্ঠ চরিত্রের উপর সে যেন অনেকখানি নির্ভর করেছিল। তার মনে হয়েছিল যে হতাশার অন্ধকারে

সে পথ দেখতে পাচ্ছে না, দিবসের প্রাণবন্ত চরিত্র টর্চের মতো সে অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে পথ আবিষ্কার করতে পারবে হয়তো। কিন্তু দিবস....।

কিরণ যখন দিবসের ঠিকানাটা, সূর্য চৌধুরীকে দিয়ে গেল তখন নীচের ঘরে তিনি একাই ছিলেন। ঠিকানাটা দিয়েই কিরণ চলে গেল। সূর্য চৌধুরী চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। অন্য লোক হলে হৈ চৈ করত কিন্তু তিনি নিঃশব্দে বসে রইলেন। অকারণ হৈ চৈ করা স্বভাব নয় তাঁর। ঘণ্টু উঠুক তখন তাকে পাঠালেই হবে অসুখের খবরটা দিয়ে। ব্রজ বা গোবিন্দ সাণ্ডেল কাউকে কিছু বলবেন না ঠিক করলেন। উঠতে যাবেন এমন সময় হরলাল প্রবেশ করলেন এসে।

"দিবুবাবুর খবর পেলেন?"

"পেয়েছি।"

"যাক বাঁচা গেল।"

এর বেশি কিছু বলতে হরলাল আর সাহস করলেন না।

তারপর নিজের কথা পাড়লেন।

"আমি কি করব তাহলে বলুন। চুনীবাবু চিঠির যখন কোনও উত্তর দেননি তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করলে কি লাভ হবে কিছু? আপনি যে সাক্ষী যোগাড় করতে বলেছিলেন তা আমি করেছি, কেসটা ফাইলই করে দেবেন না কি তাহলে?"

গোবিন্দ সাণ্ডেলও ঢুকলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

"আবার কোর্টে বেরুচ্ছ না কি তুমি?"

"না। তুমি একটি কাজ কর দিকি ভাই। চুনীবাবু তো তোমার পরিচিত লোক বলছিলে। এঁর সঙ্গেই তাঁর মকোদ্দমা হবার উপক্রম হয়েছে। এখনও টাকাটা দেননি তিনি। ভদ্রলোক সত্যি যদি টাকাটা দিয়ে দিতে চান তাহলে আর মকোদ্দমার হাঙ্গামা করতে হয় না। তুমি একবার বলে দেখ না তাঁকে। হরলালবাবুকে সঙ্গে নিয়েই যাও তুমি।"

গোবিন্দ সাণ্ডেল জাতীয় বেকার লোকেদের স্বকীয় কোনো কাজ থাকে না তাঁরা ক্রমাগত বনের মোষ খুঁজে বেড়ান তাড়িয়ে সময়ক্ষেপ করবার জন্য। দিবসের পুরাতন প্রসঙ্গটা নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন বলেই তিনি এসেছিলেন। এই নূতন ব্যাপারটিতে সংশ্লিষ্ট হতে পেরে তিনি খুশি হলেন। হরলালবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "বেশ চলুন তাহলে। আমার ধারণা চুনী আপনার টাকা দিয়ে দিয়েছে। এখনও দেয়নি?"

"আজ্ঞে না। আমি চিঠি লিখেছিলাম তার উত্তর পর্যন্ত দেয়নি।"

"কালটি যে কলি, সেটি খেয়াল আছে!"—চোখে নাচিয়ে হরলালের দিকে চাইলেন তিনি—"চলুন, দেরি করলে আবার সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বে হয়তো।"

"চলুন।"

দুজনে চলে যাওয়াতে সূর্য চৌধুরী মনে মনে আরাম বোধ করলেন।

দিবসের সন্ধান পাওয়া গেছে শুনে ঘণ্টু আনন্দিত হল না। সে একটু বিস্মিত হল, দমেও গেল। ইতিমধ্যে তার আকাশ কুসুমে অনেক রঙ অনেক সুষমা বিস্তার করেছিল। জটিল গাঙ্গুলীর সঙ্গে তার দেখাও হয়েছিল আরও বার কয়েক। দিবস আর আসবে না এইটে ধরে

নিয়েই মনে মনে সে প্লাস্টিকের প্রকাণ্ড কারবার-কাব্য ফেঁদে বসেছিল। দিবসের সন্ধান পাওয়া গেছে এই খবরটাতে তার কাব্যে বেশ ছন্দপতন হল। জটিল গাঙ্গুলীর উপদেশ মনে পড়ল তার। মামার টাকার উপরই যদি তাকে নির্ভর করতে হয় তাহলে তার চেষ্টা করা উচিত দিবস যাতে আর না আসে। কিন্তু সে চেষ্টা যে কি করে করবে তা সে ভেবে পাচ্ছিল না। যাই হোক মামার আদেশে দুর্গানাম স্মরণ করে সে বেরিয়ে পড়ল দিবসের উদ্দেশে। রাস্তায় যেতে যেতে ভাবতে লাগল দিবুদাকে এমন কি বলা যেতে পারে যাতে সে আসবে না। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল একটা।

.... দিবস আর রঙ্গনা চা খাচ্ছিল গরম সিঙাড়া-সহযোগে।

দিবস বলছিল—"তুমি যে পালিয়ে এসেছ, পালিয়ে আসতে পেরেছ, এতে আমি যে কত খুশি হয়েছি তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। এই তো চাই। নাকে কাঁদলে পণ প্রথা উঠবে না, কোনও কুপ্রথাই উঠবে না। তার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়াতে হবে।"

"দাঁড়িয়েছি তো। এইবার কি করব বলুন?"

"কাজ কর। নিজের পায়ে দাঁড়াও এইবার।"

"থাকব কোথায়?"

"কেন, এইখানে।"

"আপনার সঙ্গে?"

"তাতে ক্ষতি কি! মেয়ে সম্বন্ধে সাধারণ লোকের যে অশুচি ধারণা আছে তা দূর করবার দায়িত্ব তো তোমাদেরই। সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দাও যে যে-কোনও অবস্থায় আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার ক্ষমতা তোমাদের আছে।"

"তারপর?"

"একটা কাজ জোগাড় করে রোজগার করতে লেগে যাও।"

"কি কাজ?"

"যে কোনও কাজ। সৌদামিনী একটা ঝি-গিরি জোগাড় করে দিতে পারবে।"

"ও কাজ আমি পারব না।"

"পারবে না কেন? সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের ঘরে-ঘরে মেয়েরা ঝি-গিরিই তো করছে। তোমার যদি গরিবের ঘরে বিয়ে হয় ঝি-গিরিই তো করতে হবে তোমাকেও। পারবে না কেন?"

"না, আমি পারব না। অন্য কিছু ভাবুন একটা।"

মেয়েদের পক্ষে কি কি কাজ করা সম্ভব ভাবতে গিয়ে সৌরেন ডাক্তারের কথা মনে পড়ে গেল দিবসের।

"হয়েছে"—সোৎসাহে বলে উঠল দিবস।

"কি?"

ঠিক এই সময় ঘণ্টু এসে হাজির হল দ্বারপ্রান্তে।

"দিবুদা আছেন?"

"আরে, ঘণ্টু যে, কি খবর?"

ঘণ্টু আড়চোখে রঙ্গনার দিকে চেয়ে একটু সংকুচিত হয়ে পড়ল। মনে মনে বলল—ও বাবা, এ কি কাণ্ড! সারাটা পথ সে যে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এসেছিল সেটা এখানে প্রকাশ করা সংগত হবে কি না দ্বিধা জাগল তার মনে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মনে হল, 'না এই তো ঠিক হয়েছে, এইখানেই ও সুর জমবে ভালো।' দিবসের প্রতি তার শ্রদ্ধাটা হঠাৎ যেন হু হু করে কমে গেল। মিথ্যা কথা বলে দিবসকে ঠকাতে এসেছে এটাও আর তত অন্যায় বলে মনে হল না।

মৃদু হেসে ঘণ্টু বললে, "আপনাকে ডাকতে এসেছি।"

দিবস রঙ্গনা দুজনেরই মুখ শুকিয়ে গেল।

"কে ডাকছে?"

"মামাবাবু।"

"কেন, কিছু বলেছেন?"

ঘণ্টু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আপনার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে এক জায়গায়"—বলেই আবার হাসলে সে।

"তাই না কি?"

"হ্যাঁ। মোটা পণ দেবে তারা। মেয়েটি কিন্তু ঘোর কালো।"

রঙ্গনার দিকে সে আড়চোখে চাইলে আর একবার। রঙ্গনার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। দিবস চুপ করে রইল। অপমানে তার মাথা নুয়ে পড়ছিল। তার বাবা....আর ভাবতে পারছিল না সে।

"বাবাকে বলে দাও গিয়ে যে আমি যাব না।"

ঘণ্টু আবার একটু হেসে বললে, "তা আমি জানতাম। যাওয়া উচিতও নয়। তাহলে আপনি এক কলম লিখে দিন। না হলে মামাবাবু হয়তো ভাববেন যে আমি খবরই দিইনি আপনাকে। বেশি কিছু নয়—ঘণ্টুর মুখে সব শুনলাম, আমি যাব না, আমাকে ক্ষমা করবেন। বাস্।"

দিবস উঠে গিয়ে খস খস করে ঐ কথাগুলোই লিখে দিলে একটা কাগজে। কাগজটা নিয়ে ঘণ্টু বেরিয়ে গেল। ঘণ্টু চলে যাবার পর একটা নিবিড় নীরবতা ঘনিয়ে এল ঘরটার মধ্যে। চুপ করে বসে রইল দুজনে।

"আমাদের কিন্তু এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়, আপনার বাবা হয়তো এসে পড়বেন এখনই"—রঙ্গনাই কথা কইলে প্রথমে।

"পড়লই বা। আমরা এমন কোনও অন্যায় কাজ করিনি যার জন্যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে।"

"তিনি এসে যদি জোর করে ধরে নিয়ে যান?"

"তা তিনি পারবেন না।"

রঙ্গনা চুপ করে রইল।

"আমি এখন কি করি বল তো? কি যে একটা বলছিলেন—"

"নার্স হতে পারবে? তাহলে সৌরেনের ক্লিনিকে ঢুকিয়ে দিতে পারি তোমাকে যক্ষ্মা রুগীর সেবা করতে হবে।"

"আমার বড্ড ভয় করে ও সব রোগকে।"

"বাসন মাজতে পারবে না, নার্স হতে পারবে না, কি পারবে তাহলে।"

ধমক খেয়ে অপ্রতিভ হয়ে পড়ল রঙ্গনা। তার অপ্রতিভ মুখ অসহায় চোখের দৃষ্টি নীরব আর্ত ভাষায় যেন বলে উঠল—বোকো না অমন করে বোকো না, সত্যিই বড় দুর্বল, বড় অসহায় আমি। রঙ্গনার মুখের দিকে চেয়ে দিবসের কেমন যেন কষ্ট হতে লাগল। অবর্ণনীয় একটা কষ্ট। তার মনে হতে লাগল ক্ষতবিক্ষত বাণবিদ্ধ একটা পাখিকে ধমক দিয়ে সে যেন আকাশের মহিমা বোঝাতে চাইছে। আকাশের মহিমা ও জানে, কিন্তু ওর পক্ষ যে অবশ। ও উড়তে চাইছে, কিন্তু পারছে না।

"কোনও স্কুলে শিক্ষয়িত্রী হতে পারি। আপনার জানাশোনা যদি কেউ থাকে—"

"মনে তো পড়ছে না। আচ্ছা দেখি ভেবে। সৌরেনের ক্লিনিকে কিন্তু ঢুকলে পারতে। সে লোক খুব ভালো। পঁচাত্তর টাকা করে মাইনেও দেবে। যক্ষ্মাকে এত ভয় কেন? যক্ষ্মার বীজাণু তো সকলেরই ভিতর আছে ডাক্তাররা বলে।"

"তাই না কি?"

"বলে তো। না-ও যদি থাকত তাহলেই বা ভয় কি। মরতে তো হবেই একদিন। আর্তের সেবা করতে গিয়ে যদি মরেই যাও, তাতেই বা কি। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের নাম শুনেছ? নফর কুণ্ডুর? তুমি যে ওদের দলে যেতে ভয় পাবে এ আমার কল্পনার অতীত ছিল।"

রঙ্গনা হেসে বললে, "আপনাদের কল্পনা কল্পনা-বিলাস। যা কল্পনা করে সুখ পান তাই কল্পনা করেন। আমাদের সুখ-দুঃখের কথা সত্যি যদি ভাবতেন ও রকম উদ্ভট কল্পনা করতেন না।"

অপ্রত্যাশিত আঘাতটা পেয়ে দিবস একটু বিস্মিত হল। রঙ্গনার যে অপ্রত্যাশিতভাবে আঘাত দেওয়ার ক্ষমতা আছে তার পরিচয় আগেও পেয়েছিল সে। আহত হয়েই তার সম্বন্ধে কৌতূহল জেগেছিল তার। এখন রঙ্গনার কথাটি শুনে তার মনে হল তাই কি? নিজের কল্পনাকে পুলকিত করবার জন্যেই কি সে তাকে মারাত্মক যক্ষ্মারোগের মুখে ঠেলে দিতে চাইছে? ওর শুভাশুভের চেয়ে নিজের আত্মবিনোদনটাই কি বড় হয়ে উঠেছে নাকি! রঙ্গনা একটা মহৎ আদর্শের জন্যে যদি নিজেকে বলি দেয় তাতে সত্যিই তার আত্মবিনোদ হবে না কি? হবে। কেন হবে ভাবতে গিয়েই কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল। এবং গোলমাল হয়ে গেল বলেই এর পর যা সে বলল তা এলোমেলো গোছের শোনাল।

"আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গে তোমার সুখ-দুঃখটা কেমন যেন জট পাকিয়ে গেছে মনে হচ্ছে। তাই নিজে আমি যা করে সুখ পেতাম তোমার জন্যেও তাই ব্যবস্থা করছি। হয়তো সেটা ভুল—"

যে কথাটা জানবার জন্যে রঙ্গনার অন্তরাত্মা এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল তার আভাস পেয়ে রঙ্গনার মুখের চেহারা বদলে গেল।

"বেশ বেশ তাই হবে। সৌরেনবাবুর কাছেই চলুন। তিনি যদি নার্সের চাকরিটা দেন তাই করব।"

অপূর্ব হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখ।

"উঠুন! বসে আছেন যে।"

"সত্যিই যেতে চাও, না রাগ করে বলছ?"

"সত্যিই যেতে চাই। কি মনে করেন আপনি আমাকে? ঠাট্টা করে একটা কথা বললুম আর অমনি সেটা সত্যি বলে ধরে নিলেন! চলুন যাওয়া যাক!"

"চল। আমাকে বাজারেও ঘুরতে হবে একটু। কাপড়-চোপড় কিনতে হবে কিছু।"

"এখন কাপড় চোপড় কিনবেন?"

"হ্যাঁ। ও, একটা কথা তোমাকে বলিনি এখনও। দু'একদিনের মধ্যেই আমি লম্বা পাড়ি দিচ্ছি।"

"কোথায়?"

"লন্ডন।"

রঙ্গনার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল আবার।

"লন্ডন? মানে?"

"চল রাস্তায় যেতে যেতে বলছি। প্রায় আরব্য উপন্যাসের গল্পের মতো।"

দুজনে বেরিয়ে পড়ল।

সূর্য চৌধুরীর মুখটা ঠিক পাথরের মুখের মতো মনে হচ্ছিল। দিবসের চিঠিটার দিকে তিনি নির্নিমেষে চেয়ে ছিলেন। সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ঘণ্টু। চিঠি থেকে চোখ তুলে ঘণ্টুর দিকে চাইলেন তিনি আবার।

"আমার অসুখের কথা বলেছিলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

আবার চিঠির দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

"ঘরে যে মেয়েটি বসেছিল কত বয়স হবে তার?"

"আঠারো উনিশ।"

ঘণ্টু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আবার একটু বললে, "মনে হল একসঙ্গে বাস করছে ওরা।"

"আচ্ছা তুমি যাও।"

ঘণ্টু চলে গেল। নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন সূর্য চৌধুরী। দিবু না আসতে পারে—কিন্তু ওই মেয়েটি কে? হয়তো পাড়ার কেউ। আজকালকার মেয়েরা তো......। শোরগোল করতে করতে গোবিন্দ সাণ্ডেল এসে ঢুকলেন।

"ওহে শুনছ চুনীর মুখে যা শুনলুম তাতো ভয়ানক।"

"কি?"

"চুনীর ভগ্নীটিকে নিয়ে দিবস না কি সরেছে।"

"কিরকম?"

"চুনীর ভগ্নীপতির কাছে দিবস সরোদ শিখতে যেত—"

সমস্ত ঘটনাটা সাড়ম্বরে বর্ণনা করতে লাগলেন সাণ্ডেলমশাই।

সূর্য চৌধুরী নিস্তব্ধ হয়ে শুনে গেলেন সব। গোবিন্দ সাণ্ডেলের সমস্ত শ্লেষ সহ্য করলেন নীরবে। একটি কথাও বললেন না। বক্তব্য শেষ করে নানারকম উপদেশ দিয়ে গীতার বচন আউড়ে সাণ্ডেল মশাই চলে গেলেন অবশেষে! সূর্যকান্ত ধীরে ধীরে উঠে বাইরে এলেন। ড্রাইভারকে বললেন মোটরটা বার করতে। নিজের চোখে না দেখলে এ অবিশ্বাস্য কথা বিশ্বাস করবেন না তিনি।.... দিবসের বাসায় এসে কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। দিবস তখনও বাজার থেকে ফেরেনি! খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে সূর্য চৌধুরী আবার বাড়ি ফিরে এলেন।

উর্মির আগ্রহে মেট্রোতে আসতে হয়েছে কিরণকে। সেইখানেই সিনেমা ডিরেকটারের সঙ্গে কিরণের আলাপ হল। সিনেমাও দেখতে হল।

সিনেমার পর উর্মি বললে, "চলুন মাঠে গিয়ে বসা যাক একটু।"

কিরণ যন্ত্রচালিতবৎ উর্মির অনুসরণ করছিল। উর্মির মুখে রঙ্গনার অন্তর্ধানের কথা শুনে (এবং সকালে রঙ্গনাকে দিবসের বাসায় দেখে) তার সমস্ত সত্তা যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। উর্মির সংসর্গে নিজের অনুরূপ অধঃপতনের আশঙ্কায় তার অন্তরাত্মা সজাগ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু কিছুতেই সে নিজেকে উর্মির কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারছিল না।

একটু নির্জন স্থান দেখে উর্মি বললে, "আসুন এইখানে বসা যাক।"

"বাড়ি ফিরলে হত না?"

"বসুনই না একটু!"

কিরণ বসে পড়ল।

উর্মি বললে, "সেই যে সেদিন আপনাকে বলেছিলাম হাতিবাগানে ছোট্ট বাসার সন্ধান পেয়েছি একটা, কাল চলুন সেটা দেখে আসা যাক, আশি টাকা ভাড়া চাইছে, তা আমাদের দুজনের আয় মিলিয়ে দিতে পারব না? এই ছবিটা যতদিন চলবে ততদিন আমি একাই চালাতে পারব সমস্ত আপনার মাইনেটা জমিয়ে রাখা যাবে, কি বলেন? চমৎকার বাসাটি, দক্ষিণ দিকে খোলা, সদর রাস্তা থেকে দূরেও আছে বেশি গোলমাল নেই, আপনার কবিতা লেখার সুবিধে হবে"—উর্মি থামতে চাইছিল না কিছুতে, তার ভয় হচ্ছিল থামলেই কিরণ প্রতিবাদ করবে, তা কিছুতেই হতে দেবে না উর্মি, কিরণকে তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সে, ওই এঁদো গলিতে খোলার ঘরে কিছুতেই সে থাকতে দেবে না কিরণকে—আপনার যদি পছন্দ না হয় আর একটা বাড়িও দেখে রেখেছি আমি বেহালা অঞ্চলে, বড্ড দূর হবে সেটা কিন্তু, নয়?"

কিরণ চুপ করে বসেছিল।

"কথা বলছেন না যে?"

"একটা কবিতা ভাবছি।"

"কবিতা পরে ভাববেন আগে আমার কথার উত্তর দিন। কাল সকালে হাতিবাগানের বাসাটা দেখবেন তো?"

কবিতাটা শোন আগে"

"বলুন।"

"যে ফুল ফোটেনি কভু স্বপ্নে তারে চাও
যে গান গাহেনি কেহ স্বপ্নে তাহা গাও
কল্পনার কুঙ্কুমে
বাস্তবের ধূলি ধূমে
কেন সখি, বৃথাই লুটাও
আকাশ-কুসুম দল
আকাশেই সমুজ্জ্বল
আকাশ-মর্যাদা তাদের দাও।"

"এর মানে কি—"

"আমি উঠলুম।"

হঠাৎ আত্মস্থ হয়ে কিরণ উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ যেন নিজেকে ফিরে পেল সে।

"হাতিবাগানের বাসাটা দেখবেন না কাল?"

"না।"

"কবে দেখবেন?"

"আমার দেখবার দরকার কি? তুমি থাকবে তুমিই দেখ।"

"একসঙ্গেই থাকি চলুন না দুজনে।"

"তা হয় না। সবাই দিবস নয়। আমি চলি।"

কিরণ চলতে শুরু করল। এর পর ঊর্মির চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধরে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হাস্যদীপ্ত হয়ে উঠল।

"কিরণদা একটা কথা শুনে যান।"

কিরণ ফিরে দেখলে একটা অদ্ভুত হাসিতে ঊর্মির সমস্ত মুখ ঝলমল করছে।

"আপনি দিবস নন তা জানি বলেই আপনার সঙ্গে থাকতে যাচ্ছি। অন্য রকম মনে করলে চাইতাম না। আপনি আমাকে এত খেলো মনে করলেন কেন বলুন তো?"

কিরণ ক্ষণকাল তার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর হঠাৎ ঘুরে চলতে শুরু করে দিলে। ঊর্মি দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল কিরণ চলে যাচ্ছে। ক্রমশ ভিড়ে মিলিয়ে গেল সে। আর তাকে দেখা গেল না।

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥

যদিও সূর্যকান্ত কিছু বলেননি তবু ব্রজ টের পেয়ে গেল যে দিবসের ঠিকানাটা পাওয়া গেছে। ঘণ্টুই বলেছিল তাকে। ঘণ্টুর উদ্দেশ্য ছিল ব্রজর কাছে দিবসের কুকীর্তি ঘোষণা করে ব্রজকে নিজের দলে টানা। কিন্তু হয়ে গেল অন্য রকম। ব্রজর মনে হল দিবসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে একটা। সূর্যকান্তর সঙ্গে এ সম্বন্ধে হেস্তনেস্ত করবার জন্যে হনহন করে দোতলায় উঠে গেল সে। কপাট ঠেলে ঘরে ঢুকতে গিয়ে কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে।

ঘরের ভিতরে গোবিন্দ সাণ্ডেল এবং সূর্যকান্ত দিবসের বিষয়েই কি বলছে যেন। ব্রজ আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল।

গোবিন্দ সাণ্ডেল বলছিলেন—"আমি যা বলছি তাই করে দেখ না। ওকে খবর দাও যে অবিলম্বে না ফিরে এলে বিষয় সম্পত্তি সব ঘণ্টুকে দিয়ে দেব।"

"উইল করেছি আমি একটা"

"ওই খবরটি এবার পাঠাও তার কাছে।"

"বেশ ঘণ্টুকে আবার পাঠাই তাহলে!"

ব্রজ ঘরে ঢুকল নাটকীয় ভাবে।

"এবার ঘণ্টু যাবে না, আমি যাব।"

ব্রজ গিয়ে পৌঁছবার আগেই রঙ্গনা চলে গিয়েছিল অতসী ক্লিনিকে। দিবস একটা সুটকেসে জিনিসপত্র গোছাচ্ছিল।

"দিবু, দিবু, ও দিবু, দিবু"—ডাক শুনে দিবস চমকে উঠল।

"কে ব্রজদা!"

ব্রজ এসেই দিবসকে জাপটে ধরে, কাঁদতে শুরু করে দিলে। কান্নার বেগ একটু থামতে বললে, "ছি, ছি, ছি, এ কোথায় আছিস তুই! তুই মানুষ না পাষাণ! অসুখে পড়ে তোর বাপ তোকে ডাকতে পাঠালে তুই কোন্ আক্কেলে গেলি না? এই তুই লেখাপড়া শিখেছিস?"

"বাবার অসুখ নাকি! কিছু জানি না তো?"

"ঘণ্টু আসেনি?"

"এসেছিল। কিন্তু সে অসুখের কথা কিছু বলেনি তো। সে বরং বললে তোমরা নাকি পণের লোভে এক কুচ্ছিত মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ করছ!"

"আজই ঝাঁটা পেটা করে বিদেয় করবে ছোঁড়াকে। কালসাপ একটা। গোড়াতেই বুঝেছিলাম।"

দিবস বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল।

"বাজে কথা না কি সব? মিথ্যা কথা বানিয়ে বললে এসে?"

"তোর নামেও অনেক মিথ্যা কথা বানিয়ে বলেছে। তুই নাকি একটা মেয়ের সঙ্গে বাস করছিস?"

"বাস করছি!!"

"এই সব বলেছে গিয়ে। বিষয়টি হাতাবার চেষ্টায় আছে। আর এক মুহূর্ত দেরি করলে চলবে না, এখুনি যেতে হবে। চল্, দাঁড়িয়ে রইলি যে!"

দিবস স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ক্ষণকাল।

তারপর বললে—"আচ্ছা চল।"

একটা ট্যাক্সি করেই এল তারা।

নেবেই দেখা হল নিস্তারিণীর সঙ্গে।

"ঘণ্টু কোথা?"—ব্রজ জিগ্যেস করলে।

"বেরিয়ে গেলেন একটু আগে।"

দিবস ট্যাক্সিটাকে অপেক্ষা করতে বলে উপরে উঠে গেল।

গোবিন্দ সাণ্ডেল তখনও বসেছিলেন। দিবস বাবাকে প্রণাম করে গোবিন্দ সাণ্ডেলকেও প্রণাম করলেন।

"আপনার অসুখের কথা ঘণ্টু আমাকে বলেনি কাল। কি হয়েছে আপনার?"

"ব্লাড প্রেসারটা বেড়েছে একটু। তেমনি কিছু নয়—"

একটু থেমে গোবিন্দ সাণ্ডেলের দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে সূর্য চৌধুরী তারপর বললেন, "একটা কথা জিগ্যেস করবার জন্যে তোমাকে ডেকেছি। সে দিন তোমার সঙ্গে আলোচনা করে যা বুঝলাম তাতে মনে হচ্ছে আমার বিষয়-সম্পত্তি তুমি চাও না। তুমি নিজের পায়েই দাঁড়াতে চাও। বেশ ভালো কথা। কিন্তু আমাকে আমার বিষয়-সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করে যেতে হবে। কখন কি হয় বলা তো যায় না। আমি ঠিক করেছি ঘণ্টুকেই সব দিয়ে যাব। সেই রকম উইলও করেছি একটা। আমার ইচ্ছে তাতে সাক্ষী হও। সই করে দাও এতে।"

পাশের টেবিলের ড্রয়ার থেকে উইলটা বার করে কোন্ জায়গায় সই করতে হবে দেখিয়ে দিলেন। দিবসের পকেটে ফাউণ্টেন পেন ছিল, বিনা দ্বিধায় সে সই করে দিলে।

সূর্যকান্তের সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। গোবিন্দ সাণ্ডেলের দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তিনি।

সই করা হয়ে গেলে সূর্য চৌধুরী প্রশ্ন করলেন—"আর একটা কথা জিগ্যেস করতে চাই তোমাকে। তুমি বিয়ে করেছ কাউকে?"

"না।"

"ঘণ্টু বললে সে তোমার ঘরে একটি মেয়ে দেখে এসেছে।"

"হ্যাঁ, তখন একটি মেয়ে ছিল বটে। আমি যে ওস্তাদের কাছে সরোদ শিখি তাঁরই মেয়ে। ওঁরা মেয়েটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক জায়গায় বিয়ের ঠিক করছিলেন, পাত্রপক্ষরা দেখতে এসেছিল সেই সময় মেয়েটি আমার বাসায় পালিয়ে এসেছিল খানিকক্ষণের জন্য।"

"ও।"

গোবিন্দ সাণ্ডেলের দিকে আর একটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন সূর্য চৌধুরী। দিবসের একবার মনে হল বিলেত যাওয়ার খবরটা দেবে কি না। কিন্তু তখনই ঠিক করে ফেললে দেবে না। কি হবে দিয়ে? উইলটায় সই করবার পর সে নিজেকে কেমন যেন বিচ্ছিন্ন মনে করছিল। প্রাণপণে চেষ্টা করছিল যেন নাটকীয় কিছু করে না ফেলে শত চেষ্টা সত্ত্বেও যে সূক্ষ্ম অভিমানটাকে সে কিছুতে দাবাতে পারছিল না সেটা যেন প্রকাশ না হয়ে পড়ে।

"আচ্ছা আমি চললুম তাহলে।"

প্রণাম করে সে নেমে এল এবং ট্যাক্সিতে চড়ে বসল।

ব্রজ নেবেই চলে গিয়েছিল খাবারের দোকানে। দিবসের প্রিয় খাবারগুলি নিয়ে এসে নিস্তারিণীকে এক ধমক দিলে সে—"আরে, তোকে বলে গেলাম যে কাচের প্লেটগুলো বার করতে। কি করছিস এতক্ষণ ধরে?"

"দিবুবাবু তো চলে গেলেন, কার লেগে বার করব।"

"চলে গেলেন!"

বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল ব্রজ। খাবারের ঝুড়িটা মেজেতে নামিয়ে দোতলায় যখন সে গেল তখন সূর্য চৌধুরী উইলটা কুঁচি কুঁচি করে ছিঁড়ছেন এবং আনতচক্ষু সাণ্ডেলের দিকে চেয়ে বলছেন—"দেখলে তো? তোমাকে আগেই বলেছিলাম আজকালকার ভালো ছেলেদের তুমি চেন না—"

"দিবু চলে গেল?"—ব্রজ এসেই প্রশ্ন করলে রুক্ষ কণ্ঠে।

"হ্যাঁ।"

"ধরে রাখতে পারলে না তাকে?"

"না থাকলে কি করব বল!"

"আমি ফের যাচ্ছি সেখানে।"

ব্রজ যে ফের আসতে পারে এ আশঙ্কা দিবসেরও হয়েছিল। সে তাই বাসায় এসে তার জিনিসপত্র সব ট্যাক্সিতে তুলে সোজা চলে গেল অতসী ক্লিনিকে। সৌদামিনী, গিরি, রঙ্গনা সকলেই সেখানে আছে। সেইখান থেকেই সে প্লেন ধরবে ঠিক করলে।

॥ ষোড়শ পরিচ্ছেদ ॥

পরদিন হরিদাসবাবুর মনে হল যাত্রার প্রাক্কালে দিবসকে একটা ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু তখনই আবার মনে হল দিবসের ঠিকানাটা তো তিনি জানেন না। দিবস তাকে যে হ্যান্ডনোটটা লিখে দিয়েছিল সেটা খুলে দেখলেন, তাতে তার বাড়ির ঠিকানাটা দেওয়া রয়েছে। কেয়ার অফ সূর্যকান্ত চৌধুরী যখন লেখা আছে তখন ওটা ওর বাড়ির ঠিকানাই। ও ঠিকানায় কি দিবস আছে? থাকবার কথা নয়, তবু একবার চেষ্টা করা উচিত।

সূর্য চৌধুরী নীচের ঘরেই বসেছিলেন। হরিদাসবাবু এসে প্রবেশ করলেন।

"দিবসবাবুর কি এই বাড়ি।"

"হ্যাঁ। দিবস কিন্তু বাড়িতে নেই। কি দরকার আপনার?"

"আজকের প্লেনে তাঁর বম্বে যাবার কথা, তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। বম্বে থেকে তিনি বিলেত যাবেন।"

ইচ্ছে করেই খবরটা দিলেন হরিদাসবাবু। তাঁর মনে হল খবরটা পেলে অকারণ দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবেন ভদ্রলোক। সূর্য চৌধুরী যে দিবসের বাবা তা চেহারা থেকেই অনুমান করেছিলেন তিনি।

"বিলেত যাবে? আজকের প্লেনে বম্বে যাচ্ছে?"

আকাশ থেকে পড়লেন সূর্য চৌধুরী।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ঠিক জানেন আপনি?"

"ঠিক জানি।"

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে সূর্যকান্ত বললেন, "কটায় প্লেন ছাড়বে জানেন?"

“তা ঠিক জানি না। এরোড্রামে গিয়ে সে খবরটা নিতে হয়।”

“চলুন তাই যাওয়া যাক।”

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হলেন গোবিন্দ সাণ্ডেল গহনচাঁদকে সঙ্গে নিয়ে।

সাণ্ডেল মশাই পরিচয় করিয়ে দিলেন, “ইনিই দিবসের ওস্তাদ। এঁর কাছেই দিবস সরোদ শিখত। সব কথা ওঁকে বলেছি আমি।”

“দিবু এই প্লেনেই বিলেত যাচ্ছে না কি। চল তার সঙ্গে দেখাটা করে আসি। ক'টায় ছাড়ছে তাও তো জানি না। আচ্ছা চল তো, কোথাও থেকে ফোন করে জেনে নিলেই হবে! আমার ফোনটা খারাপ হয়ে গেছে তা নাহলে এখান থেকেই ফোন করা যেত।”

দেখা কিন্তু হল না।

অনেক ঘোরাঘুরির পর সূর্যকান্তর মোটর যখন এরোড্রামে পৌঁছল ঠিক তার একটু আগেই দিবসের প্লেনটা উড়েছে। অপস্রিয়মাণ প্লেনটার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। আবার পুত্রগর্বে তাঁর বুকটা ভরে উঠল।

সীমারেখা

।। এক ।।

এই গল্পে যে হাসপাতালের কথা বলছি তা আর আজকাল কোথাও নেই। সেকালে ছিল। প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বাইরের চেহারাটা অনেক বদলেছে আজকাল। তবে মানুষের ভিতরটার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি।

সেকালের এই হাসপাতালের ভিতর সুব্যবস্থা প্রায় ছিল না বললেই হয়। ইংরেজরা তখন সবে এসেছে, তারা দয়া করে যতটুকু করত ততটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত সবাই। ভিক্ষার চাল কাঁড়া হলেই বা কি আকাঁড়া হলেই বা কি।

হাসপাতালের আসল নামটা গোপন রাখলাম। যে শহরের একপ্রান্তে এটা অবস্থিত ছিল সেটার ঠিক নাম কি ছিল জানি না। লোকে বলত কাপ্তেনগঞ্জ। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল হাসপাতালটা। প্রথমে মিলিটারি ছাউনি হিসাবে এর পত্তন হয়েছিল, পরে হাসপাতালে রূপান্তরিত হয়।

এই হাসপাতালের প্রকাণ্ড হাতার একধারে আর একটা পোড়োগাছের বাড়ি ছিল, সেটাকে সবাই বলত অ্যানেক্স (annexe); মানে হাসপাতালেরই একটা প্রত্যঙ্গ। এর চারদিকে ছিল জঙ্গল। কচু, ঘেঁটু তো ছিলই, বিছুটিও ছিল। ঘরের ছাদ ছিল টিনের। তাও মরচে-পড়া। ঘরের দেওয়ালে শ্যাওলা। সিঁড়িগুলো ভাঙা; সেখানে ঘাস গজিয়ে গেছে। বাড়িতে কোনও কালে যে প্লাস্টার ছিল তা বোঝা যায় না। বাড়ির সামনের দিকটা হাসপাতালের দিকে, আর পিছনটায় একটা মাঠ। মাঠ আর বাড়িটার মাঝখানে একটা বেড়া, ভাঙা বেড়া, লোহার তার আর পেরেক দিয়ে তৈরি। কাঠের থামগুলো প্রায় সবই পড়ে গেছে। বেড়াটা তার আর পেরেকের বোঝায় জড়ামড়ি হয়ে ভ্যাংচাচ্ছে যেন বাড়িটাকে।

এসব দেখে শুনে আপনার যদি ভয় না হয় হাসপাতালের বাঁ দিক থেকে যে সরু রাস্তাটা অ্যানেক্সের দিকে গেছে সেইটে দিয়ে আমার সঙ্গে এসে ভিতরের অবস্থাটা দেখুন একবার। বাড়িটার সামনের দুয়ারটা খুললেই একটা দালানের মতো জায়গায় এসে পড়বেন। ইংরেজিতে যাকে বলে 'প্যাসেজ'। হাসপাতালের যত ঝড়তি-পড়তি বাজে রাবিশ এখানে স্তূপীকৃত করা আছে এক দিকের দেওয়াল ঘেঁষে। একটা পাহাড়ের মতো হয়ে গেছে। ছেঁড়া গদি, লেপ, তোশক, বালিশ, ভাঙা চেয়ার, স্ট্রেচার, ড্রেসিং গাউন, ছেঁড়া জামা, জুতো সব আছে সেখানে। দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ানো যায় না।

কিন্তু নন্দী—অ্যানেক্সের রক্ষক—এই রাবিশের স্তূপের উপরই থাকে। নন্দী এককালে মিলিটারিতে সাহেবদের চাপরাশি ছিল। তাই সে প্রায় সর্বদাই খাকি প্যান্ট আর মিলিটারি কোট গায়ে দিয়ে থাকে। অবশ্য কোট প্যান্ট দুইই শতচ্ছিন্ন, তালিমারা। সিগারেট খায়। অভাবে বিড়ি। তাছাড়া তাড়িখোর। ভুরু দুটো ঝাঁকড়া, কানেও চুল আছে। মুখের ভাব অনেকটা লোম-ওলা বিলিতি কুকুরের মুখভাবের মতো। নাকের ডগাটা লাল, শরীরটা পাকানো পাতলা। কিন্তু তাহলে কি হয়, তাকে দেখলেই কেমন যেন ভয় করে। হাত দুটোও বিলিতি কুকুরের থাবার

মতো, বেশ চওড়া এবং বলিষ্ঠ। পৃথিবীর অধিকাংশ পাহারাওয়ালার মতো সে-ও একবগ্‌গা, বিশ্বাসী, কর্মপটু এবং ঈষৎ নির্বোধ। তার কাছে একটি মাত্র জিনিসই মূল্যবান—উপরওলার আদেশ। এ আদেশ অমান্য করবার সাধ্য তার নেই, ইচ্ছাও নেই। আর একটি জিনিসে তার বিশ্বাস আছে—মার। সে জানে মারের তুল্য ওষুধ নেই। যত বড় বদমায়েশই হোক ঠিক শায়েস্তা হয়ে যাবে। যখনই দরকার হয় তখনই দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে সে ঘুষি চালায়— মুখে, বুকে, পেটে, পিঠে কোথাও বাদ দেয় না। তার দৃঢ়বিশ্বাস শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে মারের তুল্য মোক্ষম জিনিস আর নেই।

দালান পার হয়েই বড় হল-ঘর। ঘরটি বড় বটে, কিন্তু বিশ্রী। দেওয়ালে ময়লাটে নীল রং, ঘরের ছাদটা কালিঝুলে ভরতি। মনে হয় উনুনের ধোঁয়া বেরুবার পথ না পেয়ে ছাদে আশ্রয় করেছে। জানলাগুলোয় মোটা মোটা লোহার গরাদ দেওয়া। দেখলেই ভয় হয়। ঘরের মেঝে কাঠের, কিন্তু কাঠ সব ফেটে ফেটে গেছে আর সেই সব ফাটলের ভিতর ঢুকেছে প্রচুর ময়লা আর ধুলো। তাছাড়া ঘরটা নানারকম দুর্গন্ধে ভরতি। পচা তরকারির গন্ধ, কেরোসিন ল্যাম্পের গন্ধ, ছারপোকার গন্ধ, প্রস্রাবের গন্ধ। ঘরে ঢুকলেই মনে হয় কোনও জানোয়ারের খাঁচায় ঢুকলুম বুঝি।

ঘরের প্রত্যেকটি খাট মেঝেতে স্ক্রু দিয়ে আঁটা। যারা খাটের উপর বসে কিংবা শুয়ে আছে তাদের গায়ে হাসপাতালের ইউনিফর্ম। নীল রঙের গাউন আর টুপি। এখন এসব ইউনিফর্ম উঠে গেছে।

এরা সবাই পাগল।

পাঁচজন আছে। এদের মধ্যে একজন শুধু উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। বাকি চারজন সাধারণ শ্রেণীর। দ্বারের সব চেয়ে কাছে যার বিছানা সে লোকটি লম্বা, রোগা। তার গোঁফ জোড়াটি যদিও পুষ্ট, কিন্তু অবিন্যস্ত। ঝুলেও গেছে। কেঁদে কেঁদে চোখ দুটি লাল। লোকটি তার দুই হাতের মুঠোর উপর থুতনিটি রেখে সামনের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে বসে আছে। তার দুঃখের অন্ত নেই। দিবারাত্রি কখনও কাঁদছে, কখনও মাথা নাড়ছে, কখনও দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, মাঝে মাঝে এক-আধবার ম্লান হাসিও হাসছে। ঘরের বাকি চারজনের সঙ্গে তার বাক্যালাপ নেই বললেই চলে। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেয় না। যখন হাসপাতালের খাবার আসে তখন যন্ত্রচালিতবৎ সেগুলো খেয়ে ফেলে। কোনও মন্তব্য করে না। সর্বদাই কাশছে। গালের হাড় দুটো উঁচু আর লাল। মনে হয় কাল-রোগ যক্ষ্মায় ধরেছে ওকে।

এর পরের বিছানাটিতে যে আছে, সে বৃদ্ধ, কিন্তু খুব চঞ্চল আর ছটফটে। বেঁটে লোক, ছুঁচলো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আছে। মাথার চুলগুলি কাফ্রিদের চুলের মতো কোঁকড়ানো আর কালো। সারাদিন সে ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। কখনও এ জানলায়, কখনও ও জানলায়, কখনও এ কোণে কখনও ও কোণে। যখন বিছানায় এসে বসে একটা পাযেব উপর আর একটা পা দিয়ে বসে। আর ক্রমাগত শিস দেয়, দোয়েলও বোধ হয় ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিস দিতে পারবে না। মাঝে মাঝে মৃদুকণ্ঠে গানও গায়। কিন্তু শিস দেওয়ার দিকেই ঝোঁক বেশি। রাত্রেও শিশুর মতো ছটফট করে। দেখে মনে হয় যেন খুব আমোদেই আছে। প্রার্থনা করতে বসে খুব

ঘটা করে এবং দমাদ্দম নিজের বুকে ঘুষি মারে। তারপর কপাটের কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করে নন্দী কোথায় আছে। এর নাম টুপি-ওলা জিতেন। এককালে হ্যাটের ব্যবসা ছিল। টুপির দোকানে আগুন লেগে যাবার পরই পাগল হয়ে যায়। কুড়ি বছর হাসপাতালে আছে।

জিতেনই একমাত্র লোক যে হাসপাতাল থেকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছে। সে অ্যানেক্স্ থেকে বেরিয়ে হাসপাতালের হাতায় তো ঘুরে বেড়ায়ই, বাজারেও চলে যায়। হাসপাতালে অনেকদিন ধরে আছে বলেই এবং তার পাগলামির মধ্যে বিপজ্জনক কিছু নেই বলেই তাকে এই সুবিধাটা দেওয়া হয়েছে সম্ভবত। জিতেন শহরের রাস্তায় রঙ্গরসের একটা জীবন্ত উৎস। সকলেই তাকে নিয়ে একটু না একটু রসিকতা করে। প্রায়ই দেখা যায় রাস্তায় জিতেনের পিছু পিছু একপাল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আর দু'তিনটে নেড়ী কুকুরও চলেছে। জিতেনকে পেয়ে সবাই খুশি। টুপি আর লম্বা-গাউন পরা জিতেন, কখনও ছেঁড়া চটি পরে কখনও বা খালি পায়ে রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়ায় আর প্রত্যেক দোকানে গিয়ে পয়সা চায়। অনেকে পয়সা দেয়, অনেকে খেতেও দেয়। কেউ একেবারে বঞ্চিত করে না তাকে। এই সব নিয়ে অ্যানেক্সে ফিরে আসে। আসামাত্রই নন্দী সব নিয়ে নেয়। জোর করে কেড়ে নেয় আর চিৎকার করে বলতে থাকে—এ শালাকে আর কখনও বাইরে বেরুতে দেব না। হাসপাতালের মানসম্ভ্রম নষ্ট করে দিলে ব্যাটা। হাসপাতালের আইন কি করে টিকবে এরকম করলে?

জিতু কিচ্ছু আপত্তি করে না। জিতেন এমনি লোকও ভালো। তার সঙ্গীদের কারও তেষ্টা পেলে বাইরে থেকে জল এনে দেয়, গায়ে ঢাকাও দিয়ে দেয় যখন কেউ আদুড় গায়ে ঘুমিয়ে পড়ে, সবাইকে বলে, এবার তোমার জন্যে পয়সা এনে দেব, ভালো টুপিও করিয়ে দেব। ঠিক তার পাশের বিছানায় যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীটি আছে জিতুই তাকে চামচ দিয়ে খাবার খাইয়েও দেয়। ঠিক যে দয়াপরবশ হয়ে দেয় তা নয়, মহৎ মনুষ্যত্বে উদ্বুদ্ধ হয়েও দেয় না। সে তার অন্য পাশের রোগীটির নকল করে মাত্র, নকল না করে পারে না। যন্ত্রচালিতবৎ নকল করে যায়।

চিন্ময় সান্যালের বয়স তেত্রিশ বছর। ভালো ঘরের ছেলে, কিছুদিন আদালতে গভর্নমেন্ট আপিসে কাজ করেছিল। এখন পাগল। একটা নাম-হীন ভয় তাকে উন্মাদ করে তুলেছে। ডাক্তারি ভাষায় এ রোগের নাম পারসিকিউশন ম্যানিয়া (persecution mania)—তার ভয় ওই বুঝি কেউ তাকে ধরতে আসছে। হয় সে সমস্ত দিন বিছানায় মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকে, না হয় সারা ঘরে পায়চারি করে বেড়ায় যেন এক্সারসাইজ করছে। বিছানায় সে বসে না, বসলেও কদাচিৎ বসে। সর্বদাই উত্তেজিত হয়ে আছে সে, শুধু উত্তেজিত নয়, উৎকণ্ঠিতও। একটা অজানা অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় সর্বদা অভিভূত হয়ে আছে, সর্বদাই প্রত্যাশা করছে এইবার বুঝি সেটা এসে পড়ল। দালানে সামান্য খসখস শব্দ হলে কিংবা উঠানে সামান্য শব্দ পাওয়া গেলেই সে মাথা উঁচু করে কান পেতে শোনে—তাকে ধরতে এল নাকি? তাকেই কি তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে না, আর কাউকে? এই সময় তার সমস্ত মুখের পেশীগুলো শক্ত হয়ে ওঠে, চোখে ফুটে ওঠে একাগ্র ভীত দৃষ্টি। বীভৎস দেখায় মুখটা।

চিন্ময় সান্যালকে আমার ভালো লাগে। তার মুখটা বেশ বড়সড়, রং পাণ্ডুর, গালের হাড়

দুটো উঁচু উঁচু, আর সমস্ত মুখখানি, ম্লান, বিষণ্ণ। মনে হয় মুখের আয়নায় যন্ত্রণাজর্জরিত অন্তরটা প্রতিফলিত হয়েছে। তার মুখভঙ্গি অদ্ভুত এবং বিশ্রী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মুখে যে সব সূক্ষ্ম রেখার দাগ পড়েছে তা গভীর বেদনার দ্যোতক, মনে হয় সে সবের মধ্যে একটা বুদ্ধিদীপ্ত অনুভূতি মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাই চোখের দৃষ্টিও বুদ্ধিদীপ্ত। লোকটিকে আমার বেশ ভালো লাগে। এমনিতে কথাবার্তায় বেশ শিষ্ট, বিনয়ী, আর এক নন্দী ছাড়া সকলের সঙ্গে তার ব্যবহারও ভদ্র। যদি কারো হাত থেকে একটা বোতাম বা একটা চামচ মেঝেতে পড়ে যায়, অমনি বিছানা থেকে লাফিয়ে ওঠে চিন্ময় এবং সেটা কুড়িয়ে যার জিনিস তাকে দিয়ে দেয়। সকালে উঠেই প্রত্যেকের সামনে গিয়ে 'গুড মর্নিং,' রাতে শুতে যাবার আগে 'গুড্ নাইট'।

তার ভীতচকিত মুখভঙ্গি দেখলে মনে হয় বরাবরই সে একটা আতঙ্কের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। কিন্তু তার পাগলামির আসল প্রকাশটা হয় অন্যভাবে। সন্ধের দিকে সে জামাকাপড় সর্বাঙ্গে জড়িয়ে কাঁপতে থাকে, তার দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক করে শব্দ হয় আর সারা ঘরময় সে দাপাদাপি করে বেড়ায়। মনে হয় যেন তার কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে। দাপাদাপি করতে করতে মাঝে মাঝে সে হঠাৎ থেমে গিয়ে তার সঙ্গীদের মুখের দিকে এমনভাবে চেয়ে থাকে যেন সে তাদের একটা দরকারি কথা বলতে চায়, কিন্তু পরমুহূর্তেই মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সরে যায়—ভাবটা যেন এদের কাছে কিছু বলা বৃথা, এরা কেউ শুনবেও না, বুঝবেও না। কিন্তু একটু পরেই এ ভাবটাও কেটে যায়, তখন সে মনের আবেগে অনর্গল বকতে থাকে, যেন তোড়ে জল বেরুচ্ছে নল থেকে। জ্বরের ঘোরে প্রলাপের মতো শোনায় তার এ অসংলগ্ন বক্তৃতা, সব বোঝা যায় না, কথাও স্পষ্ট নয় অনেক জায়গায়। কিন্তু তবু মনে হয় তার বক্তৃতায় এমন একটা কি যেন আছে যা তুচ্ছ করবার মতো নয়, যার আবেদন অন্তরকে স্পর্শ করে। একটা পাগল আর একটা সুস্থ মানুষ যেন একসঙ্গে কথা বলে চলেছে এক মুখ দিয়ে। তার এ বকুনি কাগজে লিপিবদ্ধ করা যায় না। তার বক্তব্য প্রধানত মানুষের নীচতা নিয়ে, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, যে অত্যাচার জীবনে নিয়ত নানারূপে সত্যকে সৌন্দর্যকে ধ্বংস করে দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে। সে বলে যে, এমন দিন থাকবে না, নূতন জীবনের নূতন প্রভাত একদিন আসবেই। জানলার লোহার গরাদের বিরুদ্ধে তার ভয়ানক রাগ। বলে ওইগুলোই অত্যাচারী মানুষের প্রতীক। অসংলগ্ন অস্পষ্ট ভাষায় যা বলে যায়, মনে হয় তা একটা অদ্ভুত সংগীত, যার শেষ কলি এখনও গাওয়া হয়নি।

।। দুই ।।

প্রায় দশ পনেরো বছর আগে শ্রীযুক্ত সুরথ সান্যাল শহরে বড় রাস্তার উপর তাঁর নিজের বাড়িতে বাস করতেন। গভর্নমেন্টের উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। ধনী মানী বলে সকলে তাঁকে সম্মান করত। তাঁর দুই ছেলে ছিল—মৃন্ময় ও চিন্ময়। মৃন্ময় বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর পড়বার পর সাংঘাতিক যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় এবং তারপরই সান্যাল পরিবারে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটতে শুরু করে। মৃন্ময়ের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরেই সুরথবাবু জুয়াচুরি এবং তহবিল-তছরূপের দায়ে ধরা পড়ে কারারুদ্ধ হন এবং কিছুদিনের মধ্যেই জেলে মারা যান

টাইফয়েড হয়ে। তাঁর বাড়িঘর, স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি নীলামে বিক্রি হয়ে গেল। নিঃসম্বল হয়ে পড়ল চিন্ময় আর তার বিধবা মা।

তার বাবা যখন বেঁচে ছিলেন তখন চিন্ময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। তিনি মাসে মাসে তাকে পঞ্চাশটি করে টাকা পাঠাতেন। বলা বাহুল্য, এ টাকা সে যুগের পক্ষে যথেষ্ট। চিন্ময় বিলাসের মধ্যেই লালিতপালিত হয়েছিল, অভাবের তীক্ষ্ণ-দন্তের দংশন তাকে অনুভব করতে হয়নি। কিন্তু এই শোচনীয় দুর্ঘটনার পর তাকে কোমর বাঁধতে হল। ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত সামান্য বেতনে টিউশনি করতে লাগল সে। এর মধ্যে আবার দরখাস্তও লিখে দিতে হত। কিন্তু এত করেও সে নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করবার মতো টাকা বাঁচাতে পারত না। যা রোজগার করত পাঠিয়ে দিত তার বিধবা মাকে। কিন্তু এ জীবনে মোটেই অভ্যস্ত ছিল না বেচারা, শেষ পর্যন্ত আর চালাতে পারল না। অসুখে পড়ে গেল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া ছেড়ে দিয়ে ভগ্নহৃদয়ে অবশেষে দেশে ফিরে এল সে। দেশ মানে, ছোট একটা শহর। জেলা শহর। বন্ধুদের সুপারিশে সেখানে একটা স্কুলে মাস্টারি জুটল তার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পারল না চাকরিটা। সহকর্মীদের সঙ্গে তেমন বনল না, ছাত্রদের সঙ্গেও না। শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হল। এর পর তার মা মারা গেল। ছ'মাস রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল সে, কোনোদিন অনাহারে, কোনোদিন অর্ধাহারে। মুড়ির বেশি আর কিছু জোটেনি। তারপর আদালতে চাকরি পেল একটা। বেলিফের চাকরি। এই চাকরিই সে করছিল, কিন্তু শরীর খারাপ হওয়াতে তা-ও ছেড়ে দিতে হল শেষ পর্যন্ত।

সে ছাত্রজীবনে কোনোদিনও খুব বলিষ্ঠ ছিল না। রোগা-রোগাই ছিল। দেখে মনে হত শরীরে রক্ত নেই। ফ্যাকাশে চেহারা। সর্দি কাশি প্রায়ই লেগে থাকত। অগ্নিমান্দ্য ছিল, রাত্রে ঘুমও হত না। এক কাপ চা বা কফি খেলে সারারাত বসে কাটাতে হত তাকে। আর একটা কথা। ছাত্রজীবনে যদিও অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, কিন্তু কারও সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়নি। তার স্বভাবটাই এমন রগচটা গোছের ছিল, সকলকেই সে এমন সন্দেহের চোখে দেখত যে, কেউ তার আপনজন হয়নি। শহরের একটিও লোকের উপর সে প্রসন্ন ছিল না। বলত, জানোয়ার সব, গাড়োলের দল। তাদের কথা যখন উল্লেখ করত তখন ঘৃণা যেন উপছে পড়ত তার চোখ মুখ দিয়ে। তীক্ষ্ণ জোরালো গলার স্বর ছিল তার। কথাও বলত খুব জোরে আর খুব আবেগভরে। বলতে বলতে আত্মহারা হয়ে পড়ত, হয় ঘৃণায়, না হয়, বিস্ময়ে, না হয় আনন্দে। তার কথা শুনলে একটা কথা মনে হত কিন্তু, যা বলছে তার মধ্যে ভণ্ডামি নেই, আন্তরিকতা আছে। আর তার কথার একটি মাত্রই ধুয়ো ছিল, যাতে সে বার বার ফিরে আসত। তার সঙ্গে যে বিষয়েই আলাপ শুরু করা যাক্ না সে আলোচনার মোড় ফিরিয়ে ঠিক সেই ধুয়োটিতে এনে হাজির করবে। ধুয়োটি হচ্ছে এই ঃ চারিদিকের আবহাওয়া ক্রমশ শ্বাসরোধকর হয়ে আসছে, জীবনের কোনও বৈচিত্র নেই, সমাজে কোথাও উচ্চাদর্শ নেই। প্রত্যেকেই একটা অর্থহীন কদর্য জীবন যাপন করে চলেছে, সেই গ্লানিময় জীবনকে মধ্যে মধ্যে বৈচিত্র্য দান করছে হিংসা, রিরংসা আর ভণ্ডামি। পাপীদেরই জয়জয়কার, পুণ্যবানদের মহাকষ্ট। সমাজকে এই সর্বগ্রাসী ধ্বংস থেকে বাঁচাতে হলে ভালো স্কুল চাই, আদর্শবাদী খবরের কাগজ চাই, ভালো নাট্যমঞ্চ ও নাটক চাই, ভালো বক্তা চাই। দেশের প্রতিভা আর সদবুদ্ধি যদি এর বিরুদ্ধে

একসঙ্গে লাগে তাহলেই কাজ হবে। সমাজকে জাগাতে হবে, সবাইকে জানাতে হবে কি ভয়ঙ্কর পাঁকে তোমরা ডুবে যাচ্ছ। তার সমসাময়িক লোকদের ছবি যখন সে আঁকত তখন বেশ গাঢ় রঙেই আঁকত। আর মাত্র দুটো রঙই ব্যবহার করত— কালো আর সাদা। মাঝামাঝি কোনো রঙের চিহ্নও থাকত না। তার মতে সমাজে দু'রকম লোকই আছে— পুণ্যাত্মা আর পাপাত্মা। মাঝামাঝি কিছু নেই। নারীদের সম্বন্ধে, বিশেষ করে প্রেমের সম্বন্ধে কথা বলতে বলতে গদগদ হয়ে পড়ত সে, যদিও নিজে সে জীবনে কখনও প্রেমে পড়েনি।

তার এই 'ক্ষেপচুরিয়াস' মেজাজ এবং তেরিয়া মনোভাব সত্ত্বেও শহরের প্রায় সকলেই ভালোবাসত তাঁকে। চিনু বলে ডাকত সবাই। তার ভদ্র ব্যবহার, তার পরোপকার করবার প্রবৃত্তি, তার উচ্চাদর্শ আর নৈতিক চরিত্র, তার রোগজীর্ণ চেহারা, তার পারিবারিক দুর্দশা— এই সব কারণে সবাই তাকে স্নেহের চক্ষে দেখত। তার জন্য দুঃখও করত সবাই। এমন শিক্ষিত ছেলে, অথচ কি দুর্দশা! জ্ঞানের পরিধি তার সত্যিই অনেক বড় ছিল। সে না জানত কি? লোকে তাকে চলন্ত এন্‌সাইক্লোপিডিয়া (বিশ্বকোষ) বলে মনে করত।

খুব পড়ত। ক্লাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে নিজের ফ্রেঞ্চকাট দাড়িটিতে হাত বুলোতে বুলোতে সে ক্রমাগত পড়ত—মাসিকপত্র, বই,—রিডিং রুমের টেবিলে যা থাকত সব। তাকে দেখলে মনে হতো সে পড়ছে না, যেন গোগ্রাসে গিলছে। এই পড়াটা তার নেশার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল—যা পেত তাই পড়ত। পুরোনো কাগজ, বিজ্ঞাপন কিচ্ছু বাদ দিত না।

বাড়িতে যখন থাকত, শুয়ে থাকত। শুয়ে শুয়ে পড়ত। খালি পড়ত।

।। তিন।।

ভাদ্র মাসের একদিন সকালে তাকে বেরুতে হয়েছিল সমন জারি করবার জন্য। মেজাজ, শরীর কোনোটাই ভালো ছিল না! কোটের কলার দিয়ে কান দুটো ঢেকে প্যাচপেচে কাদায় তবু যেতে হয়েছিল তাকে। যেতে যেতে সে দেখতে পেল, দুজন লোককে হাতকড়ি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে চারজন সশস্ত্র পুলিশ কনেস্টবল। এ রকম দৃশ্য বিরল নয়, চিনু আগেও দেখেছে, এদের দেখে বরাবরই তার খারাপ লাগত, কষ্ট হত। কিন্তু সেদিন একটা নূতন অনুভূতি জাগল তার মনে। কেন জানি না সেদিন তার মনে হল তারও তো ঠিক ওই দশা হতে পারে। তাকেও যদি ঠিক ওই রকম হাতকড়ি লাগিয়ে, কাদায় হাঁটিয়ে, আগু-পিছু পুলিশ পাহারা দিয়ে জেলে নিয়ে যায়, বাধা দেবে কে। ফিরবার পথে তার চেনা একজন পুলিশ ইন্‌স্‌পেকটরের সঙ্গে দেখা হল। সে ভদ্রলোক নমস্কার করে এগিয়ে এলেন এবং তার সঙ্গে গল্প করতে করতে গেলেন কিছুদূর। ব্যাপারটা এমন কিছু নয়, কিন্তু চিন্ময়ের কেমন যেন সন্দেহ হল। বাড়ি ফিরে এসে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল, সেই হাতকড়ি পরা লোক দুটো আর বন্দুকধারী পুলিশ চারটের কথা বার বার মনে জাগতে লাগল। সমস্ত দিন ওই চিন্তাই আচ্ছন্ন করে রাখল তার মনকে। কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল সারাদিন। পড়ায় মন বসাতে পারলে না, অন্য কোনো কথা ভাবতেও পারলে না। সন্ধ্যাবেলা আলো জ্বালালে না তার ঘরে, রাত্রে ঘুমও হল না, একটি কথাই বার বার মনে হতে লাগল যদি তাকেও অমনি হাতকড়ি দিয়ে জেলে নিয়ে যায়। সে

জানে সে কখনও কোনো দোষ করেনি। সে শপথ করে বলতে পারে সে কখনও চুরি করেনি, রাহাজানি করেনি, ঘরে আগুন লাগায়নি বা খুন করেনি। কিন্তু অজ্ঞাতসারেও তো এসব করা অসম্ভব নয়। না জেনে না বুঝে কত লোকই তো দুষ্কর্ম করে ফেলে। তাছাড়া ভুলও তো হতে পারে। বদমায়েশি করে কেউ তাকে ফাঁসিয়েও তো দিতে পারে, বিচারকদের ভুলও হতে পারে। এ রকম কাহিনী তো কত শোনা গেছে। বিশ্বাসো নৈব কর্তব্য স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ। এ শ্লোকের কি কোনো মানে নেই? আজকাল বিচার আর বিচারকদের যা ধারা তাতে তো যে কোনও লোক যে কোনও মুহূর্তে তাদের ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে পারে। বিচারক, পুলিশ আর ডাক্তাররা মানুষের দোষ-দুঃখ-কষ্টকে সহৃদয়ভাবে দেখতে পারে না, ওই সব নিয়ে তাদের দৈনন্দিন আপিসের কাজ, সহৃদয় হলে চলে না, ক্রমশ তাদের মন অসাড় হয়ে যায়। হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কসাইরা যেমন ছাগল ভেড়া গরু কাটে। তারা কি ব্যবসা ছাড়া আর কিছু ভাবে? আর একবার এই হৃদয়হীন পুলিশ আর জজেদের খপ্পরে পড়লেই সর্বনাশ। তাদের একটি মাত্র নজর তখন আইনের উপর, যে আইন চালু রাখবার জন্য তারা মাইনে পাচ্ছে। সেই আইনটুকু দেখে নিতে যতটুকু সময়—বাস্। তারপর তুমি জেলে যাও আর ফাঁসিই যাও, তারা কেয়ারও করবে না। আদালতে কখনও বিচার হয়? যখন দেশের সর্বত্র জাল জুয়াচুরি অবিচার অত্যাচার দিনের আলোয় স্বচ্ছন্দে চলছে, তখন সুবিচারের প্রত্যাশা কি মূঢ়তার নামান্তর নয়?

তার পরদিন সকালে চিন্ময় যখন বিছানা থেকে উঠল তখন তার সমস্ত দেহ-মন ভয়ে আচ্ছন্ন, তার দৃঢ় ধারণা হয়ে গেছে যে কোনও মুহূর্তে তাকেও পুলিশে ধরে নিয়ে যেতে পারে। ভয়টা কিছুতেই মন থেকে দূর হতে চায় না। ঘুরে ফিরে ওই একটি চিন্তাই মনে বার বার আসে। এ চিন্তা তার মনে জাগছে কেন? নিজেই প্রশ্ন করে, নিজেই উত্তর দেয়—নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। এমন সময় একজন পুলিশ কনেস্টবল ধীরে ধীরে জানলার কাছ দিয়ে চলে গেল। এর মানে কি? তারপর দুজন লোক তার বাড়ির সামনে এসে থামল আর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল! অমন চুপ করে আছে কেন?

এরপর থেকে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি ওই এক দুশ্চিন্তা। যখনই কেউ তার জানলার কাছ দিয়ে যায় কিংবা বাড়ির দিকে তাকায় তখনই তার মনে হয় নিশ্চয় পুলিশের লোক কিংবা ডিটেক্‌টিভ। একজন ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ ইন্‌সেপক্‌টর প্রত্যহ জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে তার বাড়ির সামনে দিয়ে যেতেন। এই রাস্তা দিয়েই নিজের বাড়ি থেকে আপিসে যেতেন তিনি। চিন্ময়ের মনে হত উনি এত জোরে গাড়ি হাঁকাচ্ছেন কেন, ওঁর চোখ-মুখের ভাবই বা অমনধারা কেন। চিন্ময়ের মনে হত উনি বোধহয় ঊর্ধ্বশ্বাসে থানায় চলেছেন খবর দিতে যে একটা ভয়ংকর আসামী এই শহরে লুকিয়ে আছে। দুয়ারের কড়া নড়লে এবং গেটের কাছে সামান্য শব্দ হলে সে চমকে উঠত। গৃহকর্ত্রীর ঘরে কোনও অচেনা লোক এলে তার অস্বস্তির আর সীমা থাকত না। রাস্তায় কোনও পুলিশ বা পাহারাওলার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেলে মুচকি মুচকি হেসে বা শিস দিয়ে পাশ কাটাবার চেষ্টা করত সে, এমন একটা সপ্রতিভতার ভান করত যেন সে নির্দোষ, পুলিশ দেখে কিছুমাত্র ভয় পায়নি। পাছে তাকে পুলিশে হাতকড়ি দিয়ে ধরে নিয়ে যায় এই ভয়ে রাত্রে তার ঘুম হতো না। কিন্তু সে এমনভাবে নাক ডাকাতো আর

এমনভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলত যেন তার গৃহকর্ত্রী (তিনি পাশের ঘরেই থাকতেন) সন্দেহ না করেন যে, সে ঘুমুচ্ছে না। কারণ গৃহকর্ত্রী যদি জানতে পারেন যে ও ঘুমুচ্ছে না তখনই তিনি এই অনিদ্রার কারণ অনুসন্ধান করতে চাইবেন, হয়তো তাঁর মনে হবে নিশ্চয়ই ওর বিবেকে কোনও গলদ আছে, তাই ঘুম আসছে না এবং শেষে হয়তো এই অনিদ্রাটাই ওর বিরুদ্ধে মস্ত একটা প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে। চিনু অবশ্য নিজের যুক্তি দিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারছিল যে, তার এ ভয় অমূলক, এও বুঝতে পারছিল যদি তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলেই পুরে রাখে তাতেই বা মারাত্মক এমন কি আছে, যদি তার নিজের বিবেকে কোনো গলদ না থাকে। যতই সে যুক্তি দিয়ে নিজেকে বোঝাতে চাইছিল ততই যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল সব, ততই অস্থির হয়ে পড়ছিল। তার অবস্থা অনেকটা সেই তপস্বীর মতো হল। এক তপস্বী একবার এক জঙ্গলে গিয়ে ঠিক করলেন যে, খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে সেখানে তপস্যা করতে বসবেন। কিন্তু শেষে দেখলেন, যতই তিনি কুড়ুল দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করছেন ততই জঙ্গল আরও ঘন হয়ে গজিয়ে উঠছে তার চারিদিকে। চিন্ময়েরও অনেকটা তাই হল। যুক্তির হালে পানি না পেয়ে শেষে যুক্তি-টুক্তি সব বিসর্জন দিয়ে ভয় আর হতাশার কাছেই আত্মসমর্পণ করে ফেলল সে।

মানুষের সঙ্গ পরিত্যাগ করে একা একা নির্জনে থাকত। আদালতের এই চাকরিটা তার কোনও দিনই ভালো লাগেনি, এখন বিষবৎ মনে হতে লাগল তা। তার ভয় হত যদি কোনও লোক বদমায়েশি করে তার পকেটে তার অজ্ঞাতসারে ঘুষের টাকা ঢুকিয়ে দেয়, আর তার উপর হাকিমের কাছে নালিশ করে অপদস্থ করে তাকে, কিংবা আপিসের কাগজপত্রে নিজেই হযতো সে এমন ভুল করে বসতে পারে যে, ওপরওলার ধারণা হবে সে দলিল জাল করতে চেষ্টা করছিল কিংবা আপিসের টাকা যদি সে হারিয়ে ফেলে কোনোদিন! এর যে কোনও একটার জন্যেই তো তাকে পুলিশে হাতকড়ি লাগিয়ে ধরে নিয়ে যেতে পারে। এই ধরনের নানা উদ্ভট চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে থাকত সে সর্বদা। এ বিষয়ে তার উদ্ভাবনীশক্তি আর কল্পনা প্রখর থেকে প্রখরতর হয়ে উঠছিল ক্রমশ। নানারকম অলীক কল্পনা করে সে ভাববার চেষ্টা করত কি ভাবে এবং কত অপ্রত্যাশিত উপায়ে তার সম্ভ্রম এবং স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে। বাইরের জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক ক্রমশই শিথিল হয়ে আসছিল, বই পড়তেও আর ভালো লাগত না, স্মৃতিশক্তিও ক্ষীণ হয়ে আসছিল।

তার বাড়ির কাছে একটা নদী ছিল। ছোট নদী। নাম খুকী। একদিন বর্ষার বানে সেই নদীতে একটি স্ত্রীলোক আর শিশুর মৃতদেহ ভেসে এল। দেখেই মনে হয় স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, কেউ খুন করে ভাসিয়ে দিয়েছে। শহরে তুমুল আলোড়ন উঠল ওই মড়া দুটোকে কেন্দ্র করে। নানারকম গুজব উঠতে লাগল। পাছে লোকে চিন্ময়কেই খুনি সন্দেহ করে তাই তাদের চোখে যেন ধূলো দেবার জন্যেই সে হাসিমুখে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল আর পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হতেই আলোচনা করতে লাগল যে, অসহায় নারী আর শিশুকে হত্যা করার মতো হীন পাপ আর নেই। হতে পারে না। বলতে বলতে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যেত, কখনও বা লাল হয়ে উঠত। কিন্তু এরকম ভান করতে করতেও ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে। অবশেষে ঠিক করলে যে, তার পক্ষে চিলেকোঠার ঘরে লুকিয়ে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ। এক দিন, এক রাত্রি এবং তার পরদিন সে চুপ করে বসে রইল চিলেকোঠার খালি ঘরটাতে।

তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে চোরের মতো পা টিপে টিপে ফিরে এল নিজের শোবার ঘরে। শোবার ঘরের মাঝখানে সারারাত দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে ঘাড়টা ঈষৎ বেঁকিয়ে, যেন কি শুনছে। ভোরবেলায় কলের মিস্ত্রী এল কয়েকটা। চিন্ময় ভালো করেই জানত যে, কলের মিস্ত্রী আসবে রান্নাঘরের কলটা সারাতে। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল মিস্ত্রীর ছদ্মবেশে পুলিশই এসেছে। তাকে ধরবে বলে এসেছে। সে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে বাড়ি থেকে জামা গায়ে না দিয়েই বেরিয়ে গেল রাস্তায়। বেরিয়েই চোঁ চাঁ দৌড়। কয়েকটা কুকুর ডাকতে ডাকতে তার পিছুতে ছুটল, কয়েকজন মানুষও। তার কানের দু'পাশ দিয়ে শোঁ শোঁ করে হাওয়া বইছে, মনে হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত দানবীয় শক্তি একত্রিত হয়ে যেন তাড়া করছে তাকে।

একটু পরেই ধরা পড়ল। ধরে সবাই নিয়ে এল তাকে তার বাড়িতে। গৃহকর্ত্রী ডাক্তাব ডাকলেন। এলেন হাসপাতালের ডাক্তার যামিনীভূষণ দত্ত। এসে মাথায় বরফ দিতে বললেন, ঘুমের ওষুধ দিলেন, তারপর করুণভাবে মাথা নেড়ে বললেন তাঁর আর আসবার দরকার নেই, চিন্ময়বাবু উন্মাদ হয়ে গেছেন। সারবেন না। ফি দিয়ে ডাক্তাব ডেকে চিকিৎসা করবার সামর্থ্যও ছিল না চিন্ময়ের, সেই জন্যে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। অনেক কষ্টে যোগাড় হল একটা বিছানা, ভেনিরিয়েল ওয়ার্ডে। সমস্ত রাত ঘুমুল না চিন্ময়, সমস্ত রাত চিৎকার চেঁচামেচি করে আর কাউকে ঘুমুতেও দিলে না। ডাক্তার যামিনীভূষণ দত্ত শেষে তাকে পাঠিয়ে দিলেন অ্যানেক্সে—পাগলারা থাকে যেখানে।

এক বছর পরে চিন্ময়ের কথা আর কারো মনে রইল না। গৃহকর্ত্রী তার বইগুলো পাড়ার ছেলেদের বিলিয়ে দিলেন।

।। চার ।।

আগেই বলেছি চিন্ময়ের বাঁ ধারে থাকত জিতু পাগলা আর ডান ধারে থাকত কিম্ভূতকিমাকার অদ্ভুত একটা লোক। জাতে বোধ হয় চণ্ডাল। বলিষ্ঠ বিশাল চেহারা, চোখ দুটো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে, কিন্তু সে দৃষ্টি অর্থহীন, মুখ ভাবলেশশূন্য। অদ্ভুত মোটা আর তাগড়া লোকটা। সর্বাঙ্গে ময়লা লেগে আছে আর গা থেকে বিকট দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে সর্বদা। কাছে দাঁড়ানো শক্ত।

নন্দীর কর্তব্য হচ্ছে এর দেখাশোনা করা। নন্দী এ কর্তব্য করে ঠেঙিয়ে। ভয়ানক মারে ওকে, পশুর মতো মারে, গায়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে মারে। মারতে মারতে নিজের হাতই জখম হয়ে যায় অনেক সময়। মারটা ভয়াবহ তো বটেই কিন্তু তার চেয়েও ভয়াবহ লোকটা মার খেয়ে কিছু বলে না। একটি শব্দ বেরোয় না তার মুখ থেকে, নিজেকে বাঁচাবার একটু চেষ্টাও করে না। মার খেয়ে কেবল দোলে প্রকাণ্ড একটা জালার মতো।

এই ওয়ার্ডের পঞ্চম এবং শেষ রোগীটিও এই শহরের। আগে ডাকঘরের পিয়ন ছিল। রোগা পাতলা চেহারা, মাথার চুল কটা, চোখে মুখে একটা দুষ্টু দুষ্টু ভাব। হাবভাব দেখে মনে হয় না পাগল। মনে হয় সে যেন কি একটা গোপন করতে চেষ্টা করছে। সে তার বালিশের বা তোশকের নীচে কিছু একটা লুকিয়ে রেখে দেয়। কাউকে দেখায় না। জিনিসটা হাতছাড়া হয়ে

যাবে বলে নয়, লজ্জায়। কখনও জানালার ধারে গিয়ে সকলের দিকে পিছু ফিরে নিজের বুকে কি যেন একটা ঝুলিয়ে দেয়, তারপর ঘাড় হেঁট করে চেয়ে চেয়ে দেখে সেটা। এই সময় কেউ যদি তার কাছে এসে পড়ে তৎক্ষণাৎ সেটা তাড়াতাড়ি খুলে ফেলে বিব্রত হয়ে পড়ে। কিন্তু ও যে কি গোপন করতে চায় তা সবাই জেনে গেছে।

নিজেই একদিন বলেছিল চিন্ময়কে, "জানেন? গভর্নমেন্ট আমাকে দিয়েছে মেডেল একটা। সোনার মেডেল। এ মেডেল সাধারণতঃ সাহেবদের দেওয়া হয়, কিন্তু আমার কাজকর্ম দেখে আমাকেই দিয়েছে। আমি এটা প্রত্যাশাও করিনি। কেন দিয়েছে বলুন তো—"

"আমি জানি না"— চিন্ময় গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়।

"কিন্তু এর পর আমি কি হব জানেন?"

চোখ ছোট ছোট করে ধূর্তের মতো সে চেয়ে থাকে চিন্ময়ের দিকে। চিন্ময় কোনো উত্তর দেয় না।

"এর পর আমি রায়বাহাদুর হব। নিশ্চয় হব। সব ঠিক হয়ে গেছে! রায়বাহাদুর হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। কিন্তু আমার এমনিতেই হবে।"

এই অ্যানেক্সের জীবন অত্যন্ত একঘেয়ে। ওই পক্ষাঘাতগ্রস্ত আর মোটা রোগীটি ছাড়া বাকি সকলে সকালবেলায় ওই দালানের মতো জায়গাটায় গিয়ে একটা কাঠের টব থেকে জল নিয়ে হাত মুখ ধোয়। গামছা তোয়ালে কিছু নেই, নিজেদের জামা-কাপড়েই হাত মুখ মুছে ফেলে। তারপর নন্দী টিনের মগে চা এনে দেয় তাদের। এক মগের বেশি কেউ পায় না। দুপুরে তারা পায় লাল চালের ভাত, একটু ডাল আর শাক-সবজির একটা তরকারি। রাত্রেও তাই। ডাল আর শাকসবজি ওবেলারই। বাকি সময়টা তারা হয় বিছানায় শুয়ে ঘুমোয়, না হয় জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে, কেউ কেউ ঘরের চারিদিকে পায়চারি করে বেড়ায়। পোস্টাপিসের পিয়নটাও তার সেই মডেলের আর রায়বাহাদুর হওয়ার গল্পই করে রোজ। কোনও বৈচিত্র্য নেই।

এখানে নতুন মুখ প্রায় দেখাই যায় না। ডাক্তারবাবু নতুন পাগল রোগী আর ভরতি করেন না। এই পাগলাদের দেখবার জন্যে বাইরের লোকও বড় একটা আসে না কেউ। দু'মাস অন্তর অন্তর তিনু নাপিত আসে। নন্দীর সাহায্যে সে যে কি করে ওই পাগলাদের চুল আর নখ কাটে তা অবর্ণনীয়। সদাহাস্যমুখ মাতাল তিনুকে দেখলেই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে সবাই।

তিনু ছাড়া বাইরের কোনও লোক অ্যানেক্সে আসে না। দিনের পর দিন ওই নন্দীর নির্জলা সঙ্গসুখ উপভোগ করতে হয় রোগীগুলোকে। সম্প্রতি অবশ্য একটা গুজব শোনা যাচ্ছে হাসপাতালে। ডাক্তারবাবু নাকি নিয়মিতভাবে অ্যানেক্সে যাতায়াত আরম্ভ করেছেন।

।। পাঁচ ।।

গুজবটা সত্যিই অদ্ভুত।

ডাক্তার যামিনীভূষণ দত্তকে অসাধারণ লোকই বলা উচিত। প্রথমে যৌবনে তিনি খুব ধার্মিক ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল পড়াশোনা শেষ করে কোনও মঠে বা আশ্রমে প্রবেশ করবেন।

কিন্তু তাঁর বাবা বাধা দেন এতে। তিনি বড় ডাক্তার ছিলেন একজন। সার্জারিতে খুব নাম ছিল। তিনি বেঁকে দাঁড়ালেন। বললেন, তুমি যদি ওই ধর্মের বুজরুগিতে মাতো, তাহলে আমি তোমাকে ত্যাজ্য পুত্র করব। জানি না কথাটা কতদূর সত্য, কিন্তু শুনেছি যামিনীবাবু বলতেন যে, ডাক্তারীতে বা কোনও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তাঁর রুচি ছিল না।

সে যাই হোক, ডাক্তারী পাস করবার পর তিনি কোনও মঠে বা আশ্রমে আর যাননি। তাঁর মধ্যে বিশেষ কোনো ধর্মের ভড়ংও দেখা যেত না। বাইরে থেকে অনাড়ম্বর সাদাসিধে মানুষই মনে হত তাঁকে।

কিন্তু তাঁর চেহারাটা ছিল একটু অদ্ভুত। ছিমছাম ভদ্রলোকের মতো নয়। বলিষ্ঠ গঠন চাষার মতন ছিলেন অনেকটা। তাঁর প্রকাণ্ড মুখ, তাঁর দাড়ি, তাঁর মাথার খাড়া খাড়া চুল, তাঁর বলিষ্ঠ গঠন, লম্বা লম্বা হাত পা—না, তাঁকে ডাক্তার বলে মনে হত না। মনে হত কোনো হোটেলের মালিক বুঝি। সুপুষ্ট দেহ, মুখের ভাবে একটা একগুঁয়েমি আর জেদ, কোমলতার লেশমাত্র নেই। তাঁর সমস্ত মুখে অসংখ্য ছোট ছোট শিরার জাল থাকাতে আরও ভয়ঙ্কর দেখাত। চোখ দুটি ছোট ছোট। নাকের ডগা লাল। বেশ লম্বা লোক। বৃষস্কন্ধ, ব্যূঢ়োরস্ক। আজানুলম্বিত বাহু, হাতের থাবা দুটো প্রকাণ্ড। মনে হয় এক ঘুষি মারলে একটা ষাঁড়ও বোধ হয় ঘুরে পড়ে যাবে।

কিন্তু ডাক্তার দত্ত যখন হাঁটেন, তখন খুব সাবধানে হাঁটেন, পায়ের শব্দ হয় না। অনেকটা বিড়ালের হাঁটার মতো। চলতে চলতে যদি কারো সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে পড়েন তাহলে তিনি নিজেই আগে থেকে একটু পাশ কাটিয়ে বলেন, 'সরি'। তাঁর চেহারা দেখে মনে হয় তাঁর গলার স্বরও বুঝি খুব জোরালো হবে। কিন্তু তা নয়, খুব কোমল কণ্ঠ, বাঁশির মতো। তাঁর ঘাড়ের একধারে একটা আব আছে। তাই তিনি শক্ত কলার পরতে পারেন না, নরম কলারের সুতোর কামিজই পরে বেড়ান। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদও ডাক্তারের মতো নয় ঠিক। একটা স্যুট তাঁর দশ বছর যায়। তাঁর আর একটা স্বভাব নূতন স্যুট করান না। যখন দরকার হয় পুরোনো জামাকাপড়ের দোকান থেকে কেনেন। তাই স্যুট যখন বদলানও, তখনও মনে হয় পুরোনো স্যুটই পরে আছেন। তিনি ওই এক স্যুট পরেই রোগী দেখেন, খাবার খান, বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িও যান। কৃপণতার জন্য যে এসব করেন তা নয়—ওই স্বভাব—নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে উদাসীন।

যামিনীবাবু যখন ডাক্তারখানার চার্জ নিয়ে আসেন তখন হাসপাতালের অবস্থা ভয়াবহ ছিল। দুর্গন্ধের চোটে ওয়ার্ডে, বারান্দায় এমন কি হাসপাতালের বাইরের উঠোনেও দাঁড়ান যেত না। হাসপাতালের নার্সরা, চাকররা সপরিবারে ওই হাসপাতালেই বাস করত রোগীদের সঙ্গে। আরশোলা, ছারপোকা আর ইঁদুরের রাজত্ব ছিল হাসপাতালে। অপারেশন করলেই সেপ্‌টিক হয়ে যেত। এখন বললে লোকে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সত্যিই তখন হাসপাতালে দুটির বেশি ছুরি ছিল না। থার্মোমিটার ছিলই না মোটে। রোগীদের স্নান করবার বাথটবে আলু রাখা হত। হাসপাতালের সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট, মেট্রন, আর কম্পাউণ্ডাররা রোগীদের খাবার চুরি করত। যামিনীবাবুর আগে যে বুড়ো ডাক্তারবাবুটি ছিলেন তিনি হাসপাতালের ওষুধপত্র—বিশেষ করে স্পিরিট আর ব্র্যাণ্ডি বিক্রি করতেন। চরিত্রও খুব খারাপ ছিল তাঁর। হাসপাতালে নার্স, এমন কি রোগিনীদের নিয়েও বদনাম ছিল খুব। শহরের সবাই এসব জানত, এসব নিয়ে বাড়িয়ে

বাড়িয়ে গালগল্পও জমত অনেক আড্ডায়—কিন্তু কেউই এর উন্নতির জন্য মাথা ঘামাত না। অনেকে বলত—গরিব-গুর্বোদের জন্য হাসপাতাল আর কত ভালো হবে, ওদের বাড়িতে যা অবস্থা তার চেয়ে তো ভালো। ওদের কি ছানা মাখন খাওয়াতে হবে? কারো কারো মত ছিল ওপরওলা গভর্নমেন্ট সাহায্য না করলে ভালো হাসপাতাল হবে কি করে। গভর্নমেন্ট দয়া করে যতটুকু দিয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কিন্তু ওপরওলা গভর্নমেন্ট এদিকে আর নজর দেননি। দেওয়া দরকারও মনে করেননি। একটা হাসপাতাল যখন আছে আর তাতেই যখন চলে যাচ্ছে তখন আর ও নিয়ে মাথা ঘামানো কেন।

যামিনীবাবু প্রথমে যখন হাসপাতালে আসেন তখন তাঁর মনে হয়েছিল, এর আগাগোড়া সবই দুর্নীতিতে ভরতি। এখানে রোগীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি তো হবেই না, ক্ষতিই হবে বরং। তাঁর মনে হয়েছিল রোগীদের বিদায় করে দিয়ে হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়াটাই সুবুদ্ধির কাজ হবে। কিন্তু পরে তিনি ভেবে দেখলেন, তিনি ইচ্ছে করলেই এ পাপ দূর হবে না, কোনও উপকারও হবে না। দৈহিক এবং নৈতিক জঞ্জালগুলো যদি এক জায়গা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা যায় তাহলে আর এক জায়গায় গিয়ে জমবে সেগুলো। ওগুলো যতক্ষণ না আপনা থেকে যাচ্ছে ততক্ষণ ওদের হাত থেকে নিস্তার নেই। এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তাছাড়া লোকে যখন এই রকম একটা হাসপাতাল খুলেছে আর তার নামে অনুষ্ঠিত অনাচারগুলো সহ্য করছে, তখন মেনে নিতে হবে এইই ওরা চায়। অন্ধ কুসংস্কার আর দৈনন্দিন এই সব নোংরামি ওদের পক্ষে প্রয়োজনীয়। কালক্রমে এই জিনিসই ভালো জিনিসে পরিণত হবে, ভালো ফসল ফলাবে, গোবর পচে যেমন জমি উর্বরা হয়। পৃথিবীতে বোধ হয় এমন ভালো জিনিস কমই আছে যার আদিম উৎস মন্দ জিনিস নয়।

যামিনীবাবু যখন কাজ আরম্ভ করলেন তখন হাসপাতালের বিশৃঙ্খলা, দুরবস্থা প্রভৃতি নিয়ে বেশি হৈ চৈ করেননি। তিনি কেবল নার্স আর হাসপাতালের চাকরদের বললেন, হাসপাতালের ওয়ার্ডে রাত্রিবাস করা চলবে না। আর সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি রাখবার জন্য গোটা দুই আলমারি কিনলেন। আর সব যেমন ছিল তেমনি রইল। সেই সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট, সেই মেট্রন, সেই সেপ্‌টিক হওয়া— কিছু বদলালো না।

মনে মনে যামিনীবাবু যুক্তি এবং সততার খুব পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু সেই যুক্তি এবং সততাকে নিজের চারিদিকে মূর্ত করতে হলে যে চরিত্রবল থাকা দরকার, তা তাঁর ছিল না। এমন কি নিজের ক্ষমতার উপর, নিজের কর্তৃত্বের উপর আস্থা ছিল না তাঁর। তাই মনে মনে যে সাধুতা আর যুক্তির তিনি ভক্ত ছিলেন নিজের কর্মজীবনে তা গড়ে তুলতে পারতেন না। তিনি কাউকে হুকুম করতে পারতেন না, জোর করে কোনো অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে পারতেন না, এমন কি—এটা হোক, এটা করতেই হবে—এ কথাও তিনি জোর করে বলতে পারতেন না কাউকে। চড়া গলায় কোনো কিছু বলা যেন অসম্ভবই ছিল তাঁর পক্ষে। হুকুমই করতে পারতেন না— "ওটা দাও", "ওটা নিয়ে এস"—এ ধরনের কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বেরুত না। যখন ক্ষিধে পেত তখন রাঁধুনীর কাছে গিয়ে একটু ইতস্তত করে একটু কেশে বলতেন— "একটু চা খেলে মন্দ হত না" কিংবা "খাওয়ার কত দূর"।

সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট তাঁর চোখের সামনে চুরি করত, বাইরের ভ্যাগাবন্ডের দল হাসপাতালে

এসে ঘুরে বেড়াত—তিনি কিছু বলতে পারতেন না। বলার ক্ষমতাই ছিল না তাঁর। যখন কেউ তাঁর কাছে মিথ্যা কথা বলত, কিংবা তাঁর খোশামোদ করত, কিংবা মিথ্যা ভাউচারে সই করতে বলত নিজেই তিনি লজ্জায় লাল হয়ে উঠতেন এবং মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলেও সুড়সুড় করে সই করে দিতেন। রোগীরা যখন তাঁর কাছে নালিশ করত যে, তারা ক্ষিদের সময় খাবার পায় না, নার্সরা তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে তখন মহাবিপদে পড়ে যেতেন তিনি। আমতা আমতা করে মৃদুকণ্ঠে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলতেন খালি— "আচ্ছা, আমি দেখব। নিশ্চয়ই কোথাও কোনো গোলমাল হয়েছে—"

প্রথম প্রথম যামিনীবাবু খুব উৎসাহ সহকারে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। বেলা বারোটা পর্যন্ত রোগী দেখতেন, অপারেশন করতেন, এমন কি প্রসূতি-বিভাগেও যেতেন মাঝে মাঝে। মেয়েরা তাঁর খুব সুখ্যাতি করত। তিনি যত্ন করে দেখতেন, ভালো ডায়াগ্‌নোসিস করতেন, চিকিৎসাও করতেন অদ্ভুত। বিশেষত, মেয়েদের আর শিশুদের চিকিৎসায় খুব নামডাক হয়েছিল তাঁর। কিন্তু কিছুদিন পরে সব যেন মিইয়ে গেল। একঘেয়ে কাজ করতে করতে আর চারিদিকের অনিবার্য দুর্নীতি আর অপটুতা দেখতে দেখতে কেমন যেন মনমরা হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। আজ ত্রিশটা রোগী দেখলেন, তার পরদিন পঁয়ত্রিশ জন এল, তার পরদিন চল্লিশ। শহরে মৃত্যুর হার বেড়েই চলেছে। তার নতুন রোগীও। আউটডোরে বসে দুঘণ্টায় চল্লিশ জন রোগীর চিকিৎসা করা অসম্ভব। চিকিৎসার নামে প্রতারণা করতে হয়। যেমন ভাবেই হিসাব করুন, ওই দাঁড়ায়। বছরে যদি বারো হাজার রোগী আউটডোরে দেখা হয়, তার অর্থ বারো হাজার স্ত্রী-পুরুষকে ঠকানো হয়েছে। শক্ত রোগীদের হাসপাতালে ভরতি করে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাও সম্ভব নয়, যদিও আইন-কানুনের অভাব নেই, কিন্তু বিজ্ঞানের অভাব আছে। বিজ্ঞান বাদ দিয়েও যদি অন্ধভাবে কেবল আইন-কানুন মেনে চলা যায়—যেমন অন্যান্য ডাক্তারে সাধারণত করে—তাহলেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা, পুষ্টিকর খাবার, সচ্চরিত্র অ্যাসিস্ট্যান্ট, এসব থাকা দরকার, কিন্তু যা আছে তা পরিচ্ছন্নতা নয়—জঞ্জাল, পুষ্টিকর খাদ্য নয়—শাকসিদ্ধ, সচ্চরিত্র লোক নয়— চোর।

তাছাড়া যামিনীবাবুর মনে হত মরাই যখন পৃথিবীর নিয়ম তখন কি হবে এদের বাঁচিয়ে? একটা দোকানদার বা কেরানির জীবনের মেয়াদ পাঁচ বা দশ বছর বাড়িয়ে লাভ কি! যদি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হয় মানুষের যন্ত্রণা লাঘব করা তাহলে প্রশ্ন ওঠে যন্ত্রণা লাঘব করে কি হবে? প্রথমত, লোকে বলে যে, কষ্টেই মানুষের উন্নতির সোপান, দ্বিতীয়ত যদি একটা বড়ি বা এক দাগ ওষুধ খেয়ে কারো কষ্ট কমে যায় তাহলে এতকাল যে ভগবানকে ডেকে বা যে ধর্মকে আঁকড়ে ধরে লোকে সান্ত্বনা বা সুখ পেত তা কি আর পাবে? লোকে ভগবানকে, ধর্মকে ভুলে যাবে। পৃথিবীর কত মহাপুরুষ রোগের যন্ত্রণায় জীবনে অসীম কষ্ট পেয়েছেন, মৃত্যুশয্যাতেও তাঁদের কষ্টের অবধি ছিল না। রামা শ্যামা যদুর তুচ্ছ জীবনের জন্য আমাদের অত মাথাব্যথার দরকার কি তাহলে? কষ্টে পড়লেই এরা বরং প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করবে। এদের অহরহ তোয়াজ করলে এরা তো পশুত্বের স্তরে নেমে যাবে!

এইসব ভেবে-চিন্তে যামিনীবাবু আর হাসপাতালে কাজ করার উৎসাহ পেলেন না। রোজ হাসপাতালে যাওয়া ছেড়েই দিলেন তিনি।

।। ছয় ।।

তাঁর দৈনন্দিন কার্যক্রম এই হয়ে দাঁড়াল।

সকাল প্রায় আটটা নাগাদ উঠতেন। উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে চা খেতেন। তারপর নিজের লাইব্রেরীতে বসে পড়তেন খানিকক্ষণ। কোনও কোনও দিন হাসপাতালেও চলে যেতেন। গিয়ে দেখতেন হাসপাতালের সরু বারান্দায় আউটডোর রোগীর ভিড়, ভরতি হতে চায় অনেকেই। হাসপাতালের পুরুষ এবং স্ত্রীলোক অ্যাসিস্ট্যান্টরা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে জুতো খট্‌খটিয়ে। হাসপাতালের জীর্ণশীর্ণ ইন্‌ডোর রোগীরা লম্বা গাউন গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ইতস্তত মড়া পড়ে আছে কোথাও, বিষ্ঠার পাত্র বয়ে নিয়ে যাচ্ছে মেথররা, ছেলে-মেয়েরা চিৎকার করছে, আর সবার উপর দিয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়া বইছে বারান্দার উপর। এ পারিপার্শ্বিক যে রোগীদের পক্ষে অনুকূল নয়, বিশেষ করে যক্ষ্মা আর জ্বরগ্রস্ত রোগীদের পক্ষে যে নয়, তা তিনি বুঝতেন, কিন্তু করবেন কি! তাঁর ঘরে তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাক্তার ঘোষাল তাঁকে দেখলেই নমস্কার করে উঠে দাঁড়াতেন। ডাক্তার বিশ্বম্ভর ঘোষাল মোটাসোটা বেঁটেখাটো গোল-গাল লোক। পরিষ্কার কামানো মুখটিতে ভদ্রতার ছাপ। ঢিলে-ঢালা নূতন স্যুটে তাঁকে ডাক্তার মনে হত না, মনে হত বুঝি কোনও সেনেটার। শহরে তাঁর খুব প্র্যাকটিস। তাঁর টাইটি শাদা এবং তাঁর ধারণা প্র্যাকটিস-হীন যামিনীবাবুর চেয়ে তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান অনেক বেশি। ঘরে দুখানি ছবি টাঙানো। একটি রায়বাহাদুর শিবশঙ্কর চৌধুরীর। তিনি পূর্বে এই হাসপাতালের জন্য অনেক কিছু করেছিলেন। আর একটি পার্লামেন্টের ছবি। ডাক্তার ঘোষাল একটি কালীর পটও টাঙিয়ে রেখেছিলেন একধারে। রাউন্ডে বেরুবার আগে প্রণাম করে যেতেন।

রোগী অনেক, সময় অল্প। সুতরাং দু'একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেই ডাক্তারবাবুকে যাহোক একটা ব্যবস্থা করতে হত। ক্যাস্টর অয়েল, কুইনিন, মিকশ্চার, মালিশ আর মলম— এই সবই দিতেন সাধারণত। যামিনীবাবু সাধারণত বাঁ হাতটা বাঁ গালের উপর দিয়ে টেবিলে ভর দিয়ে বসতেন, অন্যমনস্কভাবে রোগীদের প্রশ্ন করতেন এবং যন্ত্রচালিতবৎ ব্যবস্থা করে যেতেন। ডাক্তার ঘোষালও বসে থাকতেন এবং হাত দুটো কচলাতে কচলাতে ফোড়ন দিতেন মাঝে মাঝে।

"আসল ব্যাপার কি জানেন, আমাদের ভগবানে বিশ্বাস চলে গেছে, তাই এতো কষ্ট, তাই এতো রোগ।"

ডাক্তার দত্ত অপারেশন করতেন না। অনেকদিন অপারেশন না করে অপারেশন করার অভ্যাসটাই চলে গিয়েছিল। এখন রক্ত দেখলেও বিচলিত হয়ে পড়েন। সামান্যতেই বিচলিত হন আজকাল। কোনও শিশুর গলা পরীক্ষা করবার সময় যদি ছেলেটা চেঁচামেচি করত বা হাত-পা ছুঁড়ত তাহলে তাঁর মাথা ঘুরত, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ত, তিনি তাঁর মাকে বলতেন সরিয়ে নিয়ে যেতে। এমনি একটি প্রেসকৃপশন করে দিতেন।

রোগীদের ভীরুতা আর মূর্খতা দেখে দেখে, ধর্মপ্রাণ ডাক্তার ঘোষালের টিপ্পনী শুনে শুনে, ঘরের ওই ছবিগুলোর উপর রোজ চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে আর তাঁর নিজের অন্তরের প্রশ্নবাণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে (এসব প্রশ্ন গত কুড়ি বছর ধরে ক্রমাগত তাঁর মনে জাগছে) ক্লান্ত হয়ে

পড়েছিলেন তিনি। পাঁচ ছ'টা রোগী দেখেই উঠে পড়তেন, বাকিগুলো সামলাতেন ডাক্তার ঘোষাল।

তাঁর যে প্রাইভেট প্র্যাকটিস নেই, বাড়িতে যে রোগীর দল তাঁকে বিরক্ত করতে আসবে না—এই মনোরম চিন্তায় মশগুল হয়ে বাড়ি গিয়েই বই নিয়ে বসে যেতেন। তিনি পড়তেন প্রচুর এবং পড়ে আনন্দ পেতেন। তিনি যা মাইনে পেতেন তার অর্ধেক যেত বই কিনতে। তাঁর ছখানি ঘরের তিনটিই বইয়ে ঠাসা। নানারকম বই, নানারকম মাসিকপত্র। ইতিহাস এবং দর্শনের বইই বেশি পড়েন তিনি। ডাক্তারী কাগজ একটা নেন বটে, কিন্তু ভালো করে পড়েন না। যখন পড়েন তখন শেষ থেকে পড়েন। অক্লান্তভাবে অনেকক্ষণ তিনি পড়তে পারেন। চিন্ময় সান্যাল যেমন আবেগের সঙ্গে পড়ত সে-আবেগ অবশ্য ডাক্তার দত্তের ছিল না। তিনি ধীরে সুস্থে ভেবে-চিন্তে আস্তে আস্তে পড়তেন। অনেক জায়গা দুবার তিনবার করে পড়তেন, হয় ভালো লাগত বলে, না হয় দুর্বোধ্য বলে। পাশে থাকত ব্র্যান্ডির গ্লাস আর কিছু শশা কুঁচোনো। পড়তে পড়তে, বই থেকে চোখ না তুলেই, মাঝে মাঝে এক চুমুক ব্র্যান্ডি বা এক-আধ টুকরো শশা খেতেন। শশার বদলে কখনও আপেল।

দুটোর পর চেয়ার থেকে উঠতেন, তারপর রান্নাঘরে সন্তর্পণে গিয়ে উঁকি মেরে একটু কেশে বলতেন, "পাঁচির মা, রান্নার আর কত দেরি?" পাঁচির মা যা রাঁধত তা অখাদ্য। কিন্তু তাই নির্বিবাদে খেয়ে নিতেন ডাক্তারবাবু। খাওয়ার পর দুই বগলে দুই হাত দিয়ে নিজের ঘরেই ঘুরে বেড়াতেন তিনি। চিন্তা করতেন। ঘড়িতে চারটে বাজত, পাঁচটা বাজত, যামিনীবাবু ভ্রূক্ষেপ করতেন না। চিন্তা করতেন আর ঘুরে বেড়াতেন। মাঝে মাঝে পাঁচির মায়ের ঝাঁকড়া-চুল-ভরা-মাথা দেখা যেত।

"চা করে দেব?"

"এখন নয়, আর একটু পরে—। বেশি নয়, একটু পরে—"

সন্ধ্যার সময় আসতেন পোস্ট মাস্টার সতীশবাবু। শহরের মধ্যে ইনিই একমাত্র লোক যাঁর সঙ্গ ডাক্তারবাবু পছন্দ করতেন। সতীশবাবু এককালে বেশ বড়লোক ছিলেন, অনেক জমিজায়গা ছিল, গালার ব্যবসা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই রাখতে পারেন নি। শেষে এক সাহেবের দয়ায় এই চাকরিটি পেয়েছেন। বুড়ো বয়সে সাধারণত এ চাকরি কেউ পায় না। সতীশবাবু রোগা বা খেঁকুরে প্রকৃতির লোক নন। বেশ হৃষ্টপুষ্ট এবং হাসিখুশি। পাকা গোঁফ জোড়াটি তো দেখবার মতো। তাঁর আচরণও বেশ ভদ্র। একটু চেঁচিয়ে কথা বলেন, কিন্তু শুনতে খারাপ লাগে না। একটু অভিমানী, কিন্তু বদরাগী নন। পোস্টাপিসে কোনও লোক কোনও ব্যাপার নিয়ে হল্লা করলে সতীশবাবুর মুখ চোখ লাল হয়ে যায়, তিনি কাঁপতে থাকেন এবং চিৎকার করে ওঠেন, "চুপ করুন।" সুতরাং অনেকেই তাঁকে ভয় খায়। সতীশবাবু সাধারণ লোকদের মানুষের মধ্যেই গণ্য করেন না, কিন্তু ডাক্তার যামিনী দত্তকে খুব খাতির করেন। তিনি বলেন, শহরের মধ্যে উনিই একমাত্র লোক যাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়। যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনি মেধা।

"এই যে আমি এসে গেছি ডাক্তার সাহেব,"— এই বলে চিৎকার করে রোজ ঢোকেন তিনি। "কেমন আছেন? আমি রোজ রোজ আসি, বিরক্ত হন না তো?"

"আরে না, না। কি যে বলেন"—বলে ওঠেন যামিনীবাবু—"আপনি কি জানেন না, আপনি এলে কত খুশি হই। আসুন, বসুন।"

দুই বন্ধুতে সোফায় বসে সিগারেট ধরাতেন। নীরবেই ধূমপান চলত খানিকক্ষণ।

"পাঁচির মা, এবার একটু চা হলে কেমন হয়?"

পাঁচির মা দু'পেয়ালা চা দিয়ে যায় একটু পরে। চা-টাও দুজনে নীরবে খান। যামিনীবাবুকে একটু চিন্তিত মনে হয়। কিন্তু সতীশবাবুর মুখ আনন্দ-দীপ্ত, মনে হয় তিনি যেন একটা মজার সংবাদ এনেছেন।

যামিনীবাবুই সাধারণত প্রথমে আলাপ শুরু করেন। খুব শান্তভাবে আস্তে আস্তে সতীশবাবুর মুখের দিকে না চেয়ে (তিনি কারও মুখের দিকে তাকান না) বলতে আরম্ভ করেন তিনি।

"এটা কি খুবই দুঃখের কথা নয় সতীশবাবু যে, এই শহরে এমন একটি লোক নেই, যার সঙ্গে সদালাপ করা যায়? সদালাপ করবার যোগ্যতাই কারো নেই। মনে হয় যেন উপবাস করছি। শহরের যাঁরা ছাপ-মারা শিক্ষিত লোক, তাঁরাও তুচ্ছতার উপরে উঠতে পারেন না। মনে হয় তাঁদের মনের গঠন আর তথাকথিত অশিক্ষিত ছোটলোকদের মনের গঠন এক। কোনও তফাত তো দেখি না?"

"ঠিক বলেছেন। আমারও তাই মত।"

ডাক্তারবাবু শান্ত অনুচ্চকণ্ঠে বলতে থাকেন, "আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, পৃথিবীতে মানুষের মনের উন্নত আধ্যাত্মিক বিকাশ ছাড়া বাকি সব তুচ্ছ, অর্থহীন। মানসিক বিকাশের মানদণ্ড দিয়েই আমরা ঠিক করি— সে মানুষ না পশু। মানুষের মধ্যে আমরা দেবত্বের আভাস পাই, যে অমৃতকে আমরা ধারণার মধ্যে আনতে পারি না তারও ইঙ্গিত মানুষের মধ্যেই আমরা পেয়ে থাকি। এর থেকে এইটুকু বলা যায় যে, মানুষের মনই আনন্দের উৎস! কিন্তু সে-মনের পরিচয় তো এখানে কোথাও পাই না, তাই বোধহয় আমরা সবাই নিরানন্দ হয়ে আছি। বই অবশ্য আছে, কিন্তু ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয়, ব্যক্তিগত মনের স্পর্শ আলাদা জিনিস। একটা উপমাতে যদি আপনি আপত্তি না করেন তাহলে বলব বই হচ্ছে—গানের ছাপা স্বরলিপি এবং ব্যক্তিগত আলাপ হচ্ছে সত্যিকার গান।"

"ঠিক বলেছেন—"

এর পর খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন দুজনেই। পাঁচির মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দ্বারের পাশে দাঁড়ায়, আর গালে হাত দিয়ে অবাক হয়ে এঁদের কথাবার্তা শোনবার চেষ্টা করে। একটু পরে সতীশবাবু চোখ দুটো ঈষৎ বিস্ফারিত করে বলেন, "আজকাল কি মানুষের মন বলে কিছু আছে মনে করেন?"

এর পর তিনি অতীত কালের আলোচনা আরম্ভ করেন। "সেকালে কি সব লোক ছিল! বলিষ্ঠ, সবল, জীবন্ত। শিক্ষিত লোকেরা তখন সত্যিই মানী লোক ছিলেন, তাঁদের নিজেদেরও মান ছিল, তাঁরা অপরের মানও রাখতে জানতেন। বন্ধুত্বকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন তাঁরা। তাঁরা টাকা ধার দিতেন কিন্তু তার জন্যে হ্যান্ডনোট লিখিয়ে নিতেন না, দুঃস্থ বন্ধুকে সাহায্য করা কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করতেন তাঁরা। তাছাড়া সেকালের লোকেরা কত পরিশ্রম করতেন, কি

খেতেন, দোল-দুর্গোৎসবে কি খরচ করতেন! সেকালের মেয়েরাই বা কি ছিল। এক হাতে কি অসাধ্য সাধনই না করতেন তাঁরা। খেতেও পারতেন খুব। আধসের চালের ভাত তো সাধারণ খোরাক ছিল সকলের। তদুপযুক্ত ডাল-তরকারি। আমার বন্ধু সনাতনের দিদিমা ভরপেট খাওয়ার পর আড়াই সের ক্ষীর খেতে পারতেন। একটা বড় জামবাটি ভরতি ক্ষীর—''

''ওমা, বলে কি!''—

পাঁচির মা আড়াল থেকে মন্তব্য করে।

যামিনীবাবু অন্যমনস্ক হয়ে শুনে যান, কথাগুলো ঠিক তাঁর মর্মে প্রবেশ করে না। চায়ে চুমুক দিতে দিতে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস ভাবতে থাকেন তিনি।

''মাঝে মাঝে আমি বুদ্ধিমান লোকের স্বপ্ন দেখি, বুঝলেন, এবং কল্পনায় তাদের সঙ্গে আলাপও করি''—হঠাৎ বলে ওঠেন যামিনীবাবু সতীশবাবুর কথার মাঝখানেই—''বাবা আমাকে ভালো কলেজে ভালো শিক্ষাই দিয়েছিলেন, কিন্তু সেকালের কেমন একটা কুসংস্কার ছিল,—কুসংস্কারই বলতে হবে একে—যে ডাক্তার হলেই বুঝি সব দুঃখ ঘুচে যাবে, তাই আমাকে জোর করে তিনি ডাক্তারী পড়তে পাঠিয়েছিলেন। তা না হলে আমি আজ নিশ্চয়ই দেশের চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণ করতাম, হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটার হতাম, কিংবা ওই ধরনের একটা কিছু।

এটা অবশ্যই ঠিক যে, পৃথিবীতে সবই ক্ষণস্থায়ী, মানুষের মনও মরে যায়, চিন্তাধারাও লুপ্ত হয়। কিন্তু তবু আমি মনকে প্রাধান্য দিয়েছি, কেন দিয়েছি তা আগেই বলেছি আপনাকে। আমাদের জীবন একটা জঘন্য ফাঁদ বই তো আর কিছু নয়। একজন বুদ্ধিমান লোক কিছুদিন পরেই বুঝতে পারে—লোহারি বাঁধনে বেঁধেছে সংসার দাসখৎ লিখে নিয়েছে হায়! এর থেকে পালাবার কোনো উপায় নেই। আর সব-চেয়ে মজার জিনিস হচ্ছে, এ ফাঁদে সে ইচ্ছা করে পা দেয় না। অজানা কোনো যোগাযোগের ফলে অদৃশ্য থেকে হঠাৎ জন্ম হয় তার। কেন হয়? জীবনের অর্থ এবং উদ্দেশ্য কি জানবার জন্য সে যদি চেষ্টা করে, কোনও সদুত্তর পায় না, যা পায় তা হয় ধাঁধা, না হয় ভাঁওতা। দ্বারে দ্বারে সে আঘাত করে বেড়ায়, কিন্তু কোনও দ্বারই খোলে না। তারপর এক দিন মৃত্যু এসে হাজির হয়, তাও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। একই রকম দুর্ভাগ্যের কবলে পড়ে জেলের কয়েদীরা যেমন একত্র হতে পারলে সুখী হয়, তেমনি যারা চিন্তাশীল, যারা বিশ্লেষণপটু, যারা জাগতিক ব্যাপারের দক্ষ দর্শক তারা পরস্পরের সান্নিধ্য কামনা করে এবং আলাপ-আলোচনা করে সুখ পায়। আলোচনা করে তারা অনেক সময়েই ভুলে যায় যে, তারা একটা জটিল ফাঁদে আটকে পড়ছে, উচ্চাঙ্গের আলোচনা করেই জীবনের দিন ক'টা সুখে কাটিয়ে দেয়। এই দিক থেকে বিচার করলে শিক্ষিত মনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। কারণ মানুষের জীবনে মনই আনন্দেরই স্রষ্টা এবং ভোক্তা।''

''ঠিক বলেছেন—''

সতীশবাবুর চোখের দিকে না চেয়ে যামিনীবাবু মৃদু শান্তকণ্ঠে একটু ইতস্তত করে বলে চলেন, বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে আলাপ করলে কি আনন্দ পাওয়া যায়, সে আনন্দের গভীরতা কত দূর আর সতীশবাবু নিবিষ্টভাবে তাঁর কথা শোনেন আর মাঝে মাঝে বলে ওঠেন, ''ঠিক বলেছেন—''

হঠাৎ সতীশবাবু জিজ্ঞাসা করেন, ‘‘আত্মার অমরত্বে কি আপনার বিশ্বাস নেই?’’

‘‘না, মাস্টার মশাই, নেই। বিশ্বাস করবার কোনও হেতু আমি দেখতে পাই না।’’

‘‘সত্যি কথা বলতে কি, আমিও পাই না। কিন্তু মনে মনে কেমন একটা বিশ্বাস আছে যে, আমি মরব না। মাঝে মাঝে নিজেকেই জিজ্ঞেস করি—কি রে, এবার তো মরবার সময় হল, এবার তৈরি হয়ে নে। কিন্তু ভিতর থেকে কে যেন বলে, ও সব বিশ্বাস করিস না, তুই মরবি না।’’

ন’টার পর সতীশবাবু উঠে পড়েন। যাবার আগে ওভার কোটটা গায়ে দিতে দিতে বলেন, ‘‘ভাগ্য আমাদের গভীর গাড্ডায় ফেলেছে বুঝলেন। এখান থেকে আর বেরোবার উপায় নেই। এখানেই মরতে হবে।’’

।। সাত ।।

সতীশবাবু চলে যাওয়ার পর আবার বই নিয়ে বসতেন ডাক্তার দত্ত। নীরব নিথর রাত্রি, মনে হচ্ছে সময় নিঃশব্দ গতিতে যেন এসে দাঁড়িয়েছে ডাক্তারবাবুর পাশে আর তাঁর পড়া দেখছে। পৃথিবীতে যেন ওই বইটি আর ওই সবুজ শেড দেওয়া আলোটি ছাড়া আর কিছু নেই। মানব-মনের বিচিত্র সংস্পর্শে তাঁর পরুষ মুখভাব ধীরে ধীরে প্রেম শ্রদ্ধায় স্মিত হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি ভাবেন মানুষ অমর হয়নি কেন? মানুষের এই রহস্যময় মস্তিষ্ক, চোখের দৃষ্টি, বাচনভঙ্গি, আত্ম-উপলব্ধি, প্রতিভা এসব—যদি শেষ পর্যন্ত সব শেষ হয়ে চিতার আগুনে পুড়ে যায়, তারপর সেই ভস্মরাশি পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে কোটি কোটি বৎসর ধরে সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে তাহলে সে সবের কি কোনো অর্থ নেই? সবই উদ্দেশ্যহীন? সবই নিরর্থক? অজানা মহাশূন্য থেকে মানুষের মতোন এমন বিরাট বিচিত্র সত্তা সৃষ্টি করে তারপর তাকে এমন ভস্মস্তূপে পরিণত করা কি একটা অদ্ভুত পরিহাস নয়?

রাসায়নিক পরিবর্তন! অমরত্বের বদলে এই নিয়ে এক মূর্খ ছাড়া আর কি কেউ সান্ত্বনা পেতে পারে? হীনতম মানুষের মধ্যেও কিছু জ্ঞান, কিছু ইচ্ছাশক্তি থাকে, কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্তন সৃষ্টির যে-স্তরে হয় সেখানে কি জ্ঞানের কোনও স্থান আছে? কেবল যারা ভীরু বা মূর্খ, যারা মৃত্যুভয়ে ভীত, যাদের আত্মসম্মান নেই, তারাই এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করবার চেষ্টা করে যে, মৃত্যুর পর তারা ঘাসের পাতায়, পাথরে বা কোনও ব্যাঙের মধ্যে আবার নবজীবন যাপন করবে। রাসায়নিক পরিবর্তনে অমরত্ব কল্পনা করা একটা বেহালা ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তার বাক্সটার উজ্জ্বল ভবিষ্যত কল্পনা করার মতো হাস্যকর।

প্রত্যেকবার ঘড়ি বাজলেই যামিনীবাবু চোখ বুজে ইজিচেয়ারে আরও ভালো করে ঠেস দিয়ে বসেন এবং খানিকক্ষণ নিজের চিন্তাধারাকে ঘনীভূত করবার চেষ্টা করেন। যে-বইটি পড়ছিলেন তারই আলোকে তিনি নিজের জীবনের অতীত এবং ভবিষ্যত বিশ্লেষণ করেন। নিজের অজ্ঞাতসারেই করেন। অতীতের কথা মনে হলেই তাঁর অন্তরের জুগুপ্সা জেগে ওঠে, সে সম্বন্ধে চিন্তা করতেই প্রবৃত্তি হয় না তাঁর। আর বর্তমানও তো অতীতেরই মতো। তিনি অনুভব করেন, তাঁর বর্তমান চিন্তাধারা যখন ক্রমশ শীতল পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের চারিদিক

প্রদক্ষিণ করছে, কাছেই হাসপাতালে কত লোক রোগে কষ্ট পাচ্ছে, আবর্জনায় লুটোচ্ছে, কেউ হয়তো জেগে আছে, কেউ হয়তো ছারপোকা মারছে, কারও ঘা হয়তো দূষিত হয়ে গেছে, কেউ হয়তো টাইট ব্যান্ডেজের যন্ত্রণায় চিৎকার করছে, কেউ হয়তো তাস খেলছে, কেউ বা নার্সদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মদ খাচ্ছে। গত বছর বারো হাজার লোক প্রতারিত হয়েছে। সমস্ত হাসপাতালটাই চুরি, ঝগড়া, গুজব, পক্ষপাতিত্ব আর নির্লজ্জ হাতুড়ে ডাক্তারদের আড্ডা। কুড়ি বছর আগে যা ছিল, এখনও তাই আছে, মানুষের স্বাস্থ্য-লাভের মূর্তিমতী বাধা। যামিনীবাবু জানেন যে, ছ'নম্বর ওয়ার্ডের নন্দী রোগীদের ঠেঙায় আর জিতু রোজ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে শহরে ভিক্ষা করে।

এ-ও তিনি জানেন যে, গত পঁচিশ বছরের মধ্যে ডাক্তারী বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। আশ্চর্যজনক উন্নতি। যখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন তখন তাঁর মনে হত যে, পুরাকালে অ্যালোপ্যাথি আর মেটাফিজিক্সের যা পরিণতি হয়েছিল ডাক্তারীশাস্ত্রেরও বোধহয় তাই হবে, কিন্তু এখন তাঁর সে-ধারণা বদলেছে। রাত্রে ডাক্তারী বই আর মাসিকপত্র পড়তে পড়তে তিনি বিস্ময়ে আর আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েন। কি অপ্রত্যাশিত উন্নতি, আগে কল্পনাও করা যেত না। আগে যে-সব অপারেশন করলে মৃত্যু অবধারিত ছিল, আজকাল অ্যান্টিসেপ্টিক ওযুধের কল্যাণে তা করা কত সহজ হয়ে গেছে। সাধারণ ডাক্তাররা আজকাল অ্যামপুটেশন করছে, হাঁটুর উপর অপারেশন আজকাল আকছার করছে সবাই। মৃত্যুসংখ্যাও খুব কম। কথায় কথায় পেট কাটা হচ্ছে, চোখের অপারেশন হচ্ছে। সিলিফিস সম্পূর্ণরূপে সেরে যাচ্ছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের নানা বিভাগে নিত্য নূতন আবিষ্কারে সেকালের অন্ধকার আর নেই, আলোকিত হয়ে গেছে চিকিৎসা-বিজ্ঞান, শুধু দৈহিক অসুখ নয়, মানবিক অসুখের ক্ষেত্রেও যুগান্তর এসেছে। নূতন ধরনের চিকিৎসা, রোগনির্ণয়ের নূতন নূতন পদ্ধতি যেন পর্বতের মতো উঠেছে অতীতের সমতলক্ষেত্রের উপর। মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে বা স্ট্রেট জ্যাকেট পরিয়ে আজকাল পাগলাদের চিকিৎসা করা হয় না। তাদের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করা হয়। এও তিনি পড়েছেন যে, তাদের জন্য থিয়েটার, নাচ এইসবের ব্যবস্থাও করা হয়। কিন্তু এসব কেতাবে পড়ে তো লাভ নেই। কাপ্তেনগঞ্জ হাসপাতালে ছ'নম্বর ওয়ার্ডের রোগীরা আগেও যে তিমিরে ছিল এখনও সেই তিমিরেই আছে। আধুনিক যুগে একটা মূর্তিমান বিদ্রূপ যেন! এ সম্ভব হয়েছে, কারণ কাপ্তেনগঞ্জ স্টেশন থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে। এসব ব্যাপারে এখানের যাঁরা কর্তা অর্ধশিক্ষিত যো-হুজুরের দল, ডাক্তারকে তাঁরা বিজ্ঞানী মনে করেন না, বোধহয় পুরোহিতজাতীয় কোনো জীব মনে করেন। তাঁর মুর্খতা এবং যথেচ্ছাচারকেও মেনে নিতে আপত্তি নেই তাঁদের। তিনি যদি কোনো রোগীর কানে বা মুখে গরম সীসেও ঢেলে দেন এঁরা মেনে নেবেন, মনে করবে রোগীর হিতার্থেই ওটা করা হচ্ছে। অন্য কোনো দেশ হলে এই সব হাসপাতালকে ভেঙে-চুরে নিঃশেষ করে দিত।

"কিন্তু শেষ পর্যন্ত লাভ কি"—চক্ষু বিস্ফারিত করে যামিনীবাবু নিজেকেই আবার প্রশ্ন করেন—"শেষ পর্যন্ত লাভ হয়েছে কি কিছু? অ্যান্টিসেপ্টিক্, কক্, পাস্তুর কি মূল পরিবর্তন আনতে পেরেছেন কিছু? মৃত্যু আর রোগ তো যেমন ছিল তেমনিই আছে। পাগলাদের জন্য থিয়েটার আর নাচের বন্দোবস্ত হয়েছে, কিন্তু তারা তো পাগলা-গারদেই রয়েছে এখনও। সবই

বাইরের আড়ম্বর। তলিয়ে ভেবে দেখলে ভিয়েনার হাসপাতালে আর আমার হাসপাতালে মলত কোনো তফাৎ নেই।

তবু কিন্তু একটা দুঃখ এবং ঈর্ষার ভাব তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সম্ভবত ক্লান্তির জন্যই হয় এটা। তিনি বইটার উপর ঝুঁকে পড়েন এবং এই গালের উপর হাত দুটোকে রেখে আর একটু আরাম করে বসে চিন্তা করতে থাকেন।...

"আমি শয়তানের দাসত্ব করছি এবং যাদের কাছ থেকে মাইনে নিচ্ছি তাদের ঠকাচ্ছি। আমি জোচ্চোর। কিন্তু সবাই জোচ্চোর। বিরাট শয়তানী কারখানায় আমি ছোট্ট একটা 'নাট' বা বল্টুমাত্র। সব অফিসাররাই চোর, সবাই কিচ্ছু না করে মাইনে নেয়।... এই-ই যুগের হাওয়া, এ আমার একার দোষ নয়।... হয়তো দুশো বছর পরে জন্মগ্রহণ করলে আমি অন্যরকম হতাম।"

ঘড়িতে যখন টং টং করে তিনটে বাজল, তখন আলো নিবিয়ে তিনি নিজের শোবার ঘরে গেলেন। কিন্তু চোখে ঘুম নেই।

।। আট ।।

কর্তৃপক্ষরাও মাঝে মাঝে উদার হন। প্রায় বছর দুই আগে তাঁরা একবার স্থির করেছিলেন যে, যতদিন না একটা ভালো হাসপাতাল খোলা হচ্ছে ততদিন এই হাসপাতালেই বছরে হাজারখানেক টাকা দেওয়া হোক, হাসপাতালে আরও কর্মচারী নিয়োগ করবার জন্য, বিশেষ করে ডাক্তার। জেলার ডাক্তার বীরেন দস্তিদার সুতরাং আমন্ত্রিত হলেন যামিনীবাবুর কাজে সাহায্য করবার জন্য। বীরেন দস্তিদার একেবারে ছোকরা, বয়স ত্রিশের নীচেই। লম্বা, কালো, গালের হাড় দুটো উঁচু উঁচু, ছোট ছোট চোখ। তিনি একেবারে কপর্দকশূন্য অবস্থায় এসে হাজির হলেন। সঙ্গে কেবল একটি ছোট ট্রাঙ্ক, আর একটি সাদা-মাটা-গোছের তরুণী, তার কোলে আবার একটি শিশু। তরুণীটির তিনি পরিচয় দিলেন নিজের রাঁধুনী বলে। ডাক্তার দস্তিদারের পোশাক-পরিচ্ছদও খুব সাধারণ গোছের। মাথায় শোলার হ্যাট, পায়ে বুট, গায়ে সস্তাদামের একটা স্যুট। তিনি এসেই ডাক্তার ঘোষাল আর হাসপাতালের কেরানিটির সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললেন। বাকি সকলকে, কেন জানি না, তিনি বলতেন, "ওরা সব বড়লোক, অ্যারিস্টোক্র্যাট।" তাঁর কাছে একটি মাত্র বই ছিল, একটি প্রেসকৃপ্সনের বই। নানা রোগের নানারকম প্রেসকৃপ্সন লেখা আছে তাতে। যখন কোনো রোগী দেখতে যেতেন এই বইটি সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সন্ধ্যার সময় ক্লাবে গিয়ে বিলিয়ার্ড খেলতেন। তাস খেলায় তাঁর তেমন রুচি ছিল না। তাঁর কতকগুলো কথার মাত্রা ছিল। প্রায়ই বলতেন—"যা বাব্বা, বেশ জমে উঠল তো" কিংবা, "আরে মশাই, মানুষ জন্মেছে ফূর্তি করতে"—এই ধরনের কথা সব।

হাসপাতালে সপ্তাহে দু'দিন যেতেন, ওয়ার্ডে রাউন্ড দিতেন, তারপর আউটডোরে গিয়ে বসতেন। তিনি যখন আবিষ্কার করলেন যে, হাসপাতালে অ্যান্টিসেপ্টিক নেই, কিন্তু কাচের বাক্সে জিনিসপত্র অনেক আছে, তখন তাঁর মেজাজটা বিগড়ে গেল একটু, কিন্তু পাছে ডাক্তার দত্ত কিছু মনে করেন এই ভেবে আর উচ্চবাচ্য করলেন না, যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। কিন্তু মনে মনে তিনি ধারণা করলেন ডাক্তার দত্ত একটি [illegible], হয়তো বেশ ধনীও, একটু হিংসাও হল। ভাবলেন, এ লোকটাকে যদি দাবাতে পারি বেশ হয়।

।। নয় ।।

একদিন চৈত্র মাসের মাঝামাঝি একটু বৃষ্টির পর আবার বেশ গরম পড়ে গেছে, কোকিলরা ডাকাডাকি করছে, যামিনীবাবু তাঁর বন্ধু সতীশবাবুর সঙ্গে গল্প শেষ করে তাঁকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলেন। ঠিক সেই সময় জিতু পাগলা তার শহর পরিভ্রমণ শেষ করে হাসপাতালের গেটে এসে ঢুকল। মাথার টাকে কাদার ছিটে, গায়ে ছেঁড়া একটা আলখাল্লা, পায়ে ছেঁড়া কাদামাখা বুট। হাতে একটি ছোট থলি, তাতে ভিক্ষার পয়সা আর অন্যান্য জিনিস।

"একটা পয়সা দেবেন হুজুর"— জিতু পাগলা হাত পেতে ডাক্তারবাবুর কাছেই পয়সা চাইল। যামিনীবাবু কাউকেই প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না। একটি সিকি দিলেন তাকে।

কিন্তু তার মনে হল—"কি কাণ্ড! এই বৃষ্টিতে ও শহরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল—"

যুগপৎ করুণা আর বিরক্তিতে তাঁর অদ্ভুত একটা কষ্ট হতে লাগল। জিতুর পিছু পিছু তিনি অ্যানেক্সে গেলেন। যেতে যেতে বার বার তিনি জিতুর কাদামাখা টাক আর জুতো দেখতে লাগলেন। ডাক্তারবাবুকে দেখে নন্দী তার রাবিশের স্তূপ থেকে তড়াক করে নেমে এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

"নন্দী, জিতু এভাবে ঠাণ্ডায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওকে এক জোড়া ভালো বুট দিলে কেমন হয়?"

"আচ্ছা, আমি 'সুপার' সাহেবকে বলব।"

"হ্যাঁ বোলো। আমার নাম করে বোলো। এরকমভাবে ঠাণ্ডায় ঘুরে বেড়ালে ওর নিমোনিয়া হয়ে যেতে পারে।"

ভিতরে ঢুকবার কপাটটা খোলাই ছিল। চিন্ময় সান্যাল একটা কনুয়ের উপর ভর দিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে উৎকর্ণ হয়ে বাইরের কথাবার্তা শুনছিল। অপিরিচত কণ্ঠস্বর শুনলেই সে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। কিন্তু ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বর চিনতে তাব দেরি হল না। চেনবামাত্রই রাগে কাঁপতে লাগল সে, এক লাফে বিছানা থেকে নেমে পড়ল, সমস্ত মুখ ভীষণ লাল হয়ে উঠল, মনে হতে লাগল চোখ দুটো এখনি বুঝি ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। বিছানা থেকে নেমে দৌড়ে সে চলে গেল ঘরের মধ্যে।

"ডাক্তার এসেছে, ডাক্তার"— হা হা করে হেসে চিৎকার করে উঠল চিন্ময়— "শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছেচে ভদ্রলোক। আমাদের কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য, শেষ পর্যন্ত, দয়া করে এখানে পদার্পণ করেছেন উনি। পাজি শয়তান কোথাকার—"

মেঝেতে পা ঠুকে হাত পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে একটা ভীষণ কাণ্ড করে তুলল চিন্ময়। এতটা সে আগে কখনও করেনি।

"খুন করে ফেল ব্যাটাকে। না, খুন করলে ঠিক শাস্তি হবে না। পায়খানায় ফেলে দাও ওকে!"

যামিনীবাবু একটু এগিয়ে এসে কপাটের ভিতর মুণ্ড ঢুকিয়ে শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন— "এত রাগ কেন?"

"কেন!"—চেঁচিয়ে উঠল চিন্ময়—তারপর গটগট করে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। নিজের

ঝলঝলে জামাটা কোমরে জড়িয়ে ঘূর্ণিত লোচনে দাঁত কড়মড় করে বলে উঠল—"কেন? তুমি একটা চোর"—তারপর মুখ ভেংচে বললে—"হাতুড়ে, কসাই"...

"না, না, অত উত্তেজিত হয়ো না"—মৃদু হেসে একটু যেন ক্ষমা-চাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন ডাক্তারবাবু—"আমি তো জীবনে কখনও কারো জিনিস চুরি করিনি। হাতুড়ে, কসাই— কি যা তা বলছ সব। অত উত্তেজিত না হয়ে একটু শান্ত হও, মনে হচ্ছে আমার উপর রাগ হয়েছে খুব। কেন, কি অপরাধ আমার। একটু শান্ত হয়ে ভেবে বল দেখি।"

"আমাকে এখানে আটকে রেখেছেন কেন?"

"কারণ তুমি অসুস্থ।"

"আমি অসুস্থ সন্দেহ নেই। কিন্তু বাইরে রাস্তায় যে হাজার হাজার পাগলা বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে তারা কি? তারা স্বাধীনতা ভোগ করছে কেন? কারণ তুমি, হাতুড়েরাম, তাদের রোগ ধরতে পারনি। তাহলে আমি আর এই হতভাগারা কেন এখানে পচে মরছি? অপরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে? তুমি, তোমার অ্যাসিস্টেন্ট, ওই ইন্‌সপেক্‌টর তোমাদের দলকে দল আমাদের প্রত্যেকের চেয়ে অনেক নিচু স্তরের লোক—তবে তোমরা এখানে না থেকে আমরা থাকব কেন? এ কি রকম যুক্তি?"

"নীতি দিয়ে বা যুক্তি দিয়ে এসব মাপা যায় না! সবই ঘটনাচক্রের উপর নির্ভর করে। যাদের এখানে আনা হয়েছে, তারা এখানে থাকবে আর যাদের আনা হয়নি তারা স্বাধীনতা ভোগ করবে। ব্যস্—এই হল কথা! তুমি পাগল আর আমি ডাক্তার—এর মধ্যে কোনও নীতি বা যুক্তির স্থান নেই। ঘটনাচক্রের হেরফেরে যে যা হয়েছি তাই হয়েছি!"

"তোমার ওসব বুজরুকি আমি শুনতে চাই না।"

চিন্ময় সান্যাল হতাশাভরা আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে বিছানার ধারে বসে পড়ল।

ডাক্তারবাবুর সামনে নন্দী জিতুকে খানাতল্লাসী করতে সাহস করেনি। সে তার আহরিত সম্পত্তি বিছানার উপর ছড়িয়ে বসল—রুটির টুকরো, কাগজের টুকরো, হাড়ের টুকরো, আরও সব কত কি! সত্যি, ঠাণ্ডায় বেচারা কাতর হয়ে পড়েছিল, তখনও কাঁপছিল। জিনিসগুলোর সামনে বসে বিড়বিড় করে বলতে লাগল সে, যেন দোকান খুলেছে, খদ্দের ডাকছে।

"আমাকে ছেড়ে দাও"—হঠাৎ আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল চিন্ময় সান্যাল।

"আমি তা পারি না।"

"কেন? না পারবার হেতু?"

"কারণ তা আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই। তুমি নিজেই ভেবে দেখ না, তোমাকে ছেড়ে দিয়ে লাভ হবে কি? ধরে নাও তোমাকে ছেড়ে দিলাম, কিন্তু শহরের লোকেরা কিংবা পুলিশের লোকেরা আবার তোমাকে ধরে এখানে টেনে আনবে।"

"ঠিক বলেছ, ঠিক। আবার এখানে টেনে আনবে। কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! কি করব আমি তাহলে? বল, বল, সেটা বল আমাকে—"

যদিও তার মুখভাবে একটা ভীষণ ভাব ফুটে উঠেছিল তবু তার তরুণ মুখে বুদ্ধির দীপ্তি নিবে যায়নি। ডাক্তার দত্তর মনে অনুকম্পার সঞ্চার হল; ভাবলেন, ওকে দুটো মিষ্টি কথা বলে একটু সান্ত্বনা দিই। তার পাশে তার বিছানায় গিয়ে বসলেন।

"তুমি জিজ্ঞেস করছ, তোমার কি করা উচিত! তোমার পক্ষে সব চেয়ে ভালো কি হবে জানো, যদি পালাতে পার। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাতে কোনো ফল হবে না। অবিলম্বেই আবার ধরা পড়ে যাবে তুমি। আবার তোমাকে নিয়ে আসবে এখানে। সমাজ যখন চোর বদমায়েশ খুনিদের বা পাগলদের বা অন্য কোনো বিপজ্জনক লোকেদের সঙ্গ পরিহার করতে চায় তখন তাকে থামানো অসম্ভব। সেইজন্য এখন একমাত্র উপায় এখানেই আত্মসমর্পণ করা, ভেবে নেওয়া যে, তোমার উপস্থিতি এখানে প্রয়োজন।"

"কিন্তু কার কি প্রয়োজন তা তো বুঝতে পাচ্ছি না।"

"যখন জেলখানা আর পাগলা-গারদ আছে তখন সেগুলোকে ভরতি করবার জন্য লোকও প্রয়োজন। তুমি যদি না থাক আর একজন থাকবে। অপেক্ষা কর— এমন একদিন আসবে যখন জেলখানা বা পাগলা-গারদ থাকবে না, যখন এই শিক-দেওয়া জানালা আর হাসপাতালের গাউন লোপ পেয়ে যাবে। আজ হোক, কাল হোক এ সুদিন আসবেই।"

চিন্ময় সান্যালের মুখে অবজ্ঞার একটা হাসি ফুটে উঠল। চিন্ময় সান্যাল 'আপনি' আর 'তুমি'র প্রায় গোলমাল করে ফেলত। তাই বলল, "আপনি যা বললেন, তা আপনি নিজে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন না?—"

চোখ দুটো কুঁচকে গেল তার।

"সেদিন যদি আসে আপনার আর আপনার ওই সহকারী নন্দীর কি গতি হবে তাহলে? কিন্তু এটা জেনে রাখুন—সে সুদিন আসবে। আসবেই। আমি হয়তো গুছিয়ে বলতে পারছি না, আমার বক্তব্য হয়তো হাস্যকর মনে হচ্ছে, কিন্তু এটা জেনে রাখুন সেই সুদিনের নব-প্রভাত দশদিক উদ্ভাসিত করে একদিন আসবে, সত্যের জয় হবে, আমরাও সে-আলো দেখব। আমি হয়তো দেখবো না, কিন্তু অন্য লোকের নাতির নাতিরা দেখবে। আমি আজ সমস্ত অন্তর দিয়ে তাদের অভিনন্দন করে আনন্দ অনুভব করছি। তাদের মুক্তির জন্যেই এ আনন্দ। এগিয়ে যাও বন্ধুগণ, ভগবান তোমাদের সহায় হোন---"

চিন্ময় সান্যালের চোখ দুটো চকচক করে ওঠে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে দু'হাত প্রসারিত করে সে বলতে থাকে—"এই কারাগার থেকে তোমাদের আশীর্বাদ জানাচ্ছি। সত্যের জয় হোক। কি আনন্দ, কি আনন্দ"—

"আমি তো আনন্দের কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না"— মৃদু হেসে ডাক্তার দত্ত বললেন। যদিও চিন্ময়ের এই উচ্ছ্বাস থিয়েটারি মনে হচ্ছিল তাঁর, তবু এই জন্যই তাকে ভালোও লাগছিল। তিনি বললেন, "ভবিষ্যতে হয়তো জেল আর পাগলা-গারদ থাকবে না, প্রকৃতির শেষ মারটি কিন্তু থেকে যাবে। তোমার মতে যা সত্য তার হয়তো জয় হবে। কিন্তু প্রকৃতির হাতে পরাজয় হবেই শেষ পর্যন্ত। মানুষ অসুখে পড়বে, বুড়ো হবে এবং এখন যেমন মরছে তখনও তেমনি মরবে। নব-প্রভাতের আলো যতই না উজ্জ্বল হোক, শেষ পর্যন্ত তোমাকে খাটিয়ার উপর কাপড়-ঢাকা দিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে শ্মশানে নিয়ে যাবে। এর থেকে পরিত্রাণ আছে কি?"

"কেন, অমরত্ব বলে একটা কথা যে শোনা যায়—"

"সেটা অর্থহীন, রাবিশ।"

"তোমার এতে বিশ্বাস না থাকতে পারে, কিন্তু আমার কাছে। দস্তয়ভস্কি না ভল্‌তেয়ার কে যেন বলেছিল মনে নেই যে ঈশ্বর যদি না-ও থাকতেন তাহলে নিজের প্রয়োজনেই মানুষ তাঁকে তৈরি করত। আমার বিশ্বাস আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অমরত্ব বলে কিছু যদি না-ও থাকে— আজ না হয় কাল মানুষের বিরাট মন তা আবিষ্কার করবে।"

"বাঃ বেশ বলেছ"—বলে উঠলেন ডাক্তার দত্ত হাসি-মুখে—"তোমার যে বিশ্বাস আছে, এটা খুব ভালো। এরকম বিশ্বাস থাকলে লোকে বন্দী অবস্থাতেও সুখী থাকে। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি বেশ শিক্ষিত লোক—"

"হ্যাঁ, আমি কলেজে পড়েছিলাম, যদিও গ্র্যাজুয়েট হতে পারিনি।"

"যে-কোনও অবস্থার মধ্যে পড়ে তুমি চিন্তার সাহায্যে সান্ত্বনা লাভ করতে পার। এটা কম কথা নয়। গভীর স্বাধীন চিন্তা— যা মানুষের চিত্তে সম্পূর্ণ মুক্তির আস্বাদ এনে দিতে পারে— আর যে আস্বাদ পেলে পৃথিবীর দৈনন্দিন মূঢ়তা তুচ্ছ হয়ে যায়— এর চেয়ে বেশি সম্পদ মানুষের কি আছে? তুমি এই জঘন্য ঘরে বন্দী অবস্থায় বাস করেও সে সম্পদেব অধিকারী হতে পার। দার্শনিক ডায়োজিনিস একটা কাঠের টবে বাস করতেন কিন্তু তিনি রাজার চেয়েও সুখী ছিলেন।"

"তোমার ডায়োজিনিস একটি গাড়োল ছিলেন"—বলে উঠল চিন্ময়—"ডায়োজিনিসের কথা আর মানবজীবনে চিন্তার সম্পদ এসব বাজে ভাওতা দিয়ে লাভ কি!"—হঠাৎ ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়ায় চিন্ময়—"আমি জীবনকে ভালোবাসি, ভয়ানক ভালোবাসি। কিন্তু একটা অদ্ভুত যন্ত্রণার ভয়ে আমি অস্থির। অদৃশ্য নামহীন এই ভয় আমার জীবনকে দুর্বহ করে তুলেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ওই ভালোবাসার তৃষ্ণাও আমাকে অস্থির করে তোলে, দুর্নিবার এই জীবন-তৃষ্ণা, তখন ভয় হয়। হয়তো আমি পাগল হয়ে যাব। আমি বাঁচতে চাই, ডাক্তার, মানুষের মতো বাঁচতে চাই—"

উত্তেজনাভরে পায়চারি করতে করতে ঘরের ওদিকে চলে যায় চিন্ময়। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলে—"জানেন, স্বপ্নে মাঝে মাঝে আমি ভূত দেখি! নানারকম লোক আসে আমার কাছে, অনেক রকম কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, অনেক রকম গান। মনে হয় আমি যেন কোনো অরণ্যে বা কোনো সমুদ্রতীরে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছি। তখন আবার সমাজের ভিড়ের মধ্যে, সমাজের দুঃখের মধ্যে ফিরে আসতে ইচ্ছে করে। ওখানে কি হচ্ছে বলুন তো—" হঠাৎ বলে ওঠে সে—"বাইরের পৃথিবী কিভাবে চলছে?"

"আমাদের শহরের কথা শুনতে চাইছ, না, পৃথিবীর সাধারণ খবর?"

"প্রথমে শহরের খবরই শোনা যাক্। তারপর পৃথিবীর খবর শোনা যাবে।"

"বেশ, তবে শোন। শহরের খবর হচ্ছে একঘেয়েমি, একটানা একঘেয়েমি। শহরে কথা বলবার একটি লোক নেই, কথা শোনবার লোকও নেই। নতুন মানুষ নেই। সম্প্রতি আমাদের মধ্যে একজন নতুন লোক এসেছেন অবশ্য, ডাক্তার ঘোষাল।"

"হ্যাঁ, আমি জানি। নিশ্চয়ই গাড়োল একটি—"

"না, খুব মার্জিতরুচির লোক বলে মনে হয় না। বড় মজা লাগে, বুঝলে— যা শুনি— অবাকও লাগে! সবাই বলে এখানে নাকি জড়তা নেই, সবাই নাকি প্রাণোচ্ছল, সাংস্কৃতিক

আবহাওয়া নাকি এখানে বুদ্ধির সৌরভে ভরপুর। তার মানে এখানে নাকি সত্যিকার মানুষ আছে, কিন্তু যা দেখি তাতে তো হতাশ হতে হয়। মনে হয় অভিশপ্ত শহর—"

"অভিশপ্ত, ঠিক বলেছেন"—চিন্ময় সান্যাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সায় দেয়, তারপর হেসে ওঠে—"দুনিয়ার খবর কি? মাসিকপত্রে সাময়িকপত্রে কি সব খবর বেরোয় আজকাল।"

ওয়ার্ডের ভিতর অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। যামিনীবাবু উঠে দাঁড়ালেন এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাগজের খবর সব বলতে লাগলেন। বিদেশের লোকেরা কে কি বলছে, আধুনিক চিন্তাধারা কোন্ খাতে বইছে, এই সব। চিন্ময় শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল। তারপর হঠাৎ কি যেন ভয়ঙ্কর একটা মনে পড়ে গেল তার, দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে শুয়ে পড়ল সে বিছানায় ডাক্তারের দিকে পিঠ করে।

"শরীরটা ভালো লাগছে না?"— জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তারবাবু।

"আর একটি কথাও বলব না"—হঠাৎ রুক্ষস্বরে বলে উঠল চিন্ময়—"আমাকে একা থাকতে দাও।"

"কেন, কি হল হঠাৎ।"

"তুমি চলে যাও, দূর হও, আমায় একা থাকতে দাও বলছি। কি আপদ্!"

যামিনী দত্ত একটু অপ্রস্তুত হলেন। তারপর মৃদু হেসে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। বাইরে যেতেই নন্দীর সঙ্গে দেখা হল।

"বুঝলে নন্দী, এই জায়গাটা একটু সাফসুত্রো করলে কেমন হয়। বড়ই দুর্গন্ধ ছাড়ছে।"

"আচ্ছা, করিয়ে দেব হুজুর।"

"ছোকরাটি ভালো"—বাড়ি যেতে যেতে ভাবতে লাগলেন ডাক্তার দত্ত—"এতদিন পরে এই প্রথম মনে হল যে, একটা লোকের মতো লোকের সঙ্গে কথা কইলুম; বেশ বুদ্ধিমান ছেলে, দেখবার চোখ আছে—"

সেদিন সন্ধ্যার সময় পড়তে পড়তে এবং পরে রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়েও ওই চিন্ময় সান্যালের কথাই বার বার মনে হতে লাগল তাঁর। পরদিন সকালে উঠেও তাঁর মনে হল একটি চমৎকার বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাঁর।

ঠিক করলেন আবার তাঁর কাছে যাবেন।

।। দশ ।।

যামিনীবাবু চিন্ময়কে আগের দিন যেমন দেখে গিয়েছিলেন ঠিক তেমনই দেখলেন। দু'হাত দিয়ে মাথা ধরে, হাঁটু দুটো গুটিয়ে, দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে।

"কি ভাই, কেমন আছ"—জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তার দত্ত—"ঘুমুচ্ছ না কি?"

"প্রথম কথা, আমি তোমার ভাই নই"—বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজড়ে বলে উঠল চিন্ময়,—"দ্বিতীয় কথা, আমি কেমন আছি তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আমি তোমাকে একটি কথাও বলব না।"

"এ কি কাণ্ড"—মৃদু হেসে বললেন ডাক্তার দত্ত, "কাল অতক্ষণ ধরে গল্প করলাম,

তারপর হঠাৎ এমন চটে উঠলে কেন। আমি বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছি কি? কিংবা হয়তো তুমিই ভুল বুঝছ আমাকে—"

"আপনি কি আশা করেন যে, আপনার কথায় আমি আর বিশ্বাস করব"— চিন্ময় সান্যাল উঠে বসল এবং ডাক্তারের দিকে ব্যঙ্গপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। দৃষ্টিতে কেবল ব্যঙ্গ ছিল না, ঈষৎ ভয়ও ছিল।

"আপনি যান, অন্যত্র গিয়ে স্পাইগিরি করুন। আমি আপনার একটি কথারও উত্তর দেব না। কালই বুঝেছিলাম আপনি কেন এসেছেন।"

ডাক্তারবাবু লক্ষ্য করলেন চিন্ময়ের চোখের পাতাগুলো কেমন যেন ফোলা ফোলা আর লাল।

"আরে কি মুশকিল! তুমি আমাকে স্পাই ভেবেছ?"— হাসবার চেষ্টা করলেন ডাক্তার দত্ত।

"হ্যাঁ! হয় তুমি পুলিশের স্পাই, না হয় ডাক্তার গুপ্তচর। ওরা, তোমাকে আমার পিছনে লাগিয়েছে।"

"আরে, অদ্ভুত লোক তো তুমি!"

ডাক্তার তার বিছানার পাশে টুলের উপর বসলেন।

"ধরে নিলাম তুমি যা বলছ তা সত্যি। ধরে নিলাম আমি তোমার গোপন কথা বার করে তোমাকে শেষে পুলিশে ধরিয়ে দেব। তোমাকে তারা তখন ধরে নিয়ে যাবে, তোমার বিচার হবে। কিন্তু এখন তুমি যে অবস্থায় আছ তার চেয়ে বেশি খারাপ আর কি হতে পারে। তোমাকে যদি সশ্রম কারাদণ্ড দেয়, কিংবা ধর যদি নির্বাসনেও পাঠায় তাহলে তা কি এই অ্যানেক্সে থাকার চেয়ে খারাপ হবে? আমার তো তা মনে হয় না। তুমি তাহলে ভয় পাচ্ছ কেন? এর চেয়ে খারাপ আর কি হতে পারে?"

এতে কিছু ফল হল বলে মনে হল। একটু নরম হল যেন চিন্ময়। চারটে বেজে গিয়েছিল। এই সময়টা ডাক্তারবাবু সাধারণত নিজের ঘরে পায়চারি করেন, আর পাঁচির মা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে চা করে দেবে কি না।

"বিকেল বেলা একটু বেড়াতে বেরিয়েছি। ভাবলাম তোমার কাছেই যাই। চমৎকার দিনটি আজ। বসন্তকাল এসে গেছে—"

"এটা কি মাস? মার্চ?"

"মার্চের শেষ?"

"বাইরে তেমনি ময়লা আর ধুলো আছে?"

"না, অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে।"

"কি ইচ্ছে করছে জানেন? ইচ্ছে করছে বেশ বড় একটা জুড়ি গাড়ি করে শহরের বাইরের একটা লম্বা চক্কোর দিয়ে আসি।"

সে তার ফোলা ফোলা চোখ দুটো দু'হাতে কচলাতে লাগল, যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে।

"তারপর বাড়ি ফিরে এসে নিজের লাইব্রেরী ঘরটিতে ঢুকে একজন ভদ্র ডাক্তার ডেকে আমার মাথা ধরার একটা ব্যবস্থা করি... এসব ভুলে গেছি, মানুষের মতো কি করে বাঁচতে হয় তা ভুলে গেছি। এখানে চারিদিকে এত নোংরা, এত দুর্গন্ধ, সহ্য করা যায় না।"

সম্ভবত আগের দিনের উত্তেজনার জন্য সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তার কণ্ঠস্বরও বেশ ক্লান্ত শোনাচ্ছিল। হাতের আঙুলগুলো কাঁপছিল তার, মুখ দেখে মনে হচ্ছিল মাথার ভীষণ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছে বেচারা।

ডাক্তারবাবু বললেন, "আরামজনক লাইব্রেরী ঘরের সঙ্গে এই অ্যানেক্সের বিশেষ কোনো তফাত নেই। সুখ-শান্তির উপাদান যদি আমরা বাইরে খুঁজি তাহলে আমাদের ঠকতে হবে। সেটা নিজেরই মধ্যে খুঁজতে হবে।"

"তার মানে?"

"সাধারণ লোক সুখের সন্ধান করে বাড়ি, গাড়ি, লাইব্রেরী এই সব জিনিসে। কিন্তু বুদ্ধিমান লোক সেটার সন্ধান করে নিজের মধ্যে।"

"আপনি গ্রীসে গিয়ে ওসব বক্তৃতা করুন গে। সেখানকার জল-হাওয়া ভালো, হাওয়ায় কমলালেবুর গন্ধ ভেসে বেড়ায়, সেখানে ও বক্তৃতা ভালো শোনাবে। এদেশে ওসব অচল। ডায়োজিনিস-এর কথা কাকে বলছিলাম! আপনাকে?

"হ্যাঁ, কাল বলছিলে'—

"ডায়োজিনিস-এর লাইব্রেরী ঘরের দরকার ছিল না। সেদেশে এত অসহ্য গরমও নেই, এমন ভীষণ শীতও নেই সেখানে। কমলালেবু আর জলপাই খেতে খেতে টবে বসে দর্শনচর্চা করা সম্ভব। এদেশের গরমের বা শীতের পাল্লায় পড়লে বাপ বাপ করে ঘরের সন্ধানে দৌড়তেন তিনি। হয়তো ভিরমি খেয়ে যেতেন।"

"মোটেই না। যে-কোনও বাইরের জিনিসের মতো প্রাকৃতিক পরিবেশকেও উপেক্ষা করা হয়। মার্কাস অরেলিয়াস বলেছেন, 'কষ্ট হচ্ছে কষ্টের অনুভূতি মাত্র, এই অনুভূতিকে যদি আমরা ঝেড়ে ফেলতে পারি, কষ্ট নিয়ে যদি বেশি মাথা না ঘামাই, কষ্ট আর থাকবে না।' ঠিকই বলেছেন তিনি। ঋষিদের সঙ্গে বা জ্ঞানী লোকদের সঙ্গে সাধারণ লোকের ওইখানেই তো তফাত। তাঁরা দুঃখ-কষ্টকে তুচ্ছ করতে পারেন, তাঁরা যে-কোনও অবস্থাতেই সন্তুষ্ট, তাঁরা কোনও কিছুতেই আশ্চর্য হন না।"

"তাহলে আমি নিশ্চয়ই বোকা, কারণ আমি কষ্ট হলে দুঃখ পাই, আমার অবস্থায় আমি একটুও সন্তুষ্ট নই। লোকের নীচতা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই।"

"ওইখানেই তোমার ভুল। তুমি যদি সমস্ত জিনিসের মূল পর্যন্ত অনুসন্ধান কর বুঝতে পারবে যে, যেসব বাইরের জিনিসে আমাদের মন বিচলিত হয় তা কত তুচ্ছ। জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করবার চেষ্টা কর, তাহলেই শান্তি পাবে।"

"উপলব্ধি!"— চিন্ময় সান্যাল একটু আহত-কণ্ঠে বলে উঠল—"বাইরের জিনিস, তার মূল— ক্ষমা করবেন, এসব জিনিস আমার মাথায় ঢোকে না। একটি জিনিস যা আমি বুঝি, সেটা হচ্ছে"— চিন্ময়ের চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল, যামিনী দত্তর দিকে কটমট করে তাকিয়ে সে বলল—"সেটা হচ্ছে যে, ভগবান আমাকে রক্ত-মাংসের মানুষ করে তৈরি করেছেন। হ্যাঁ সার, তপ্ত রক্ত, কাঁচা মাংস, আর স্পর্শকাতর স্নায়ু দিয়ে আমি তৈরি। এর জীবনী শক্তি যদি থাকে বাইরের আঘাতে তা সাড়া দেবে। তাই আমি সাড়া দি। কষ্ট পেলে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ে, চিৎকার করে কাঁদি। নীচতা দেখলে মনে ঘৃণা জাগে, বর্বরতা দেখলে সমস্ত মন

বিরূপ হয়ে যায়। এই আমি বুঝি, আমার কাছে এই হচ্ছে জীবনের অর্থ। নিম্নস্তরের জীবরা এতটা স্পর্শকাতর নয়, তাই তারা আমাদের মতো চেঁচামেচি করে না। যারা উচ্চস্তরের প্রাণী, যারা মানুষ, তারা বাস্তব জগতের রূঢ়তায় যত বেশি কষ্ট পায়, তত বেশি প্রতিবাদ করে। আশ্চর্য, আপনি ডাক্তার অথচ আপনি এই সামান্য সাধারণ কথাগুলো জানেন না! যে লোক কষ্টে বিচলিত হয় না, যে যে-কোনো অবস্থায় সন্তুষ্ট, যে কিছুতে বিস্মিত হয় না, তার তো ওই লোকটার মতো অবস্থা''—চিন্ময় সেই মোটা চণ্ডালটাকে দেখিয়ে দিলে— ''কিংবা সে এত কঠোর, এমন অসাড় হয়ে গেছে, তাকে মড়া বললেও ভুল হয় না। আমাকে মাপ করবেন''— চোখ আরও কটমট করে সে বলতে লাগল— ''মাপ করবেন, আমি মুনিও নই, ঋষিও নই, দার্শনিকও নই। ওসব ব্যাপারে আমার কোনও জ্ঞান নেই। আর আমি এসব নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্কও করতে চাই না''—

''কিন্তু তুমি কি চমৎকার তর্ক কর।''

''যে সব মুনি-ঋষিদের বচন আপনি আওড়ালেন তাঁরা বড়লোক ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের চিন্তাধারা দু'হাজার বছর আগে যেখানে ছিল, আজও সেইখানেই আছে। একটুও এগোয়নি। এগোতে পারে না, কারণ তাঁরা যা বলেছেন তা করা যায় না, তা অবাস্তব। সেকালে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ সমাজে তাঁদের এসব দর্শনের খ্যাতি ছিল। এই সীমাবদ্ধ সমাজে লোকের কাজই ছিল নানারকম চেখে চেখে বেড়ানো। কিন্তু দেশের জনসাধারণ ওর মর্ম গ্রহণ করেনি, করতে পারেনি। গীতার নামও শোনেনি অনেকে, শুনলেও, বা পড়লেও গীতার ধর্ম ক'জন লোক পালন করেছে? পালন করেনি, কারণ করা যায় না। যে ধর্ম আর্থিক সম্পদ আর স্বাচ্ছন্দ্যকে তুচ্ছ করে, দুঃখ বা মৃত্যু সম্বন্ধে যে ধর্ম উদাসীন তা সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য। সাধারণ লোক সম্পদ আর স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাদই পায়নি, তাদের পক্ষে এসবকে অস্বীকার করা মানে জীবনকেই অস্বীকার করা। যারা সারাজীবন দুঃখ-দারিদ্র্য অনাহার-অত্যাচারে দগ্ধ তারা সে প্রদাহ সম্বন্ধে উদাসীন থাকবে কি করে। তারা ক্ষুধা-তৃষ্ণা মৃত্যুভয়ে সর্বদা জর্জরিত, এই তাদের জীবন, এরই মধ্যে তারা সুধারও সন্ধান করেছে, এর সম্বন্ধে তারা কি উদাসীন থাকতে পারে? সেইজন্য আমি আবার বলছি। ওই সব মুনি-ঋষিদের বচন আমাদের কাছে অর্থহীন, ওর কোনো ভবিষ্যৎ নেই, থাকতে পারে না। চিরকাল মানুষ যা সম্বল করে সভ্যতার পথে এগিয়েছে তা হচ্ছে দুঃখ-কষ্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার আর যুদ্ধ করবার শক্তি। এব উপরই তার মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত।''

চিন্ময় সান্যাল হঠাৎ চিন্তার খেই হারিয়ে চুপ করে গেল, তারপর কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বিরক্তিভরে বলে উঠল, ''আমি আপনাকে খুব দরকারি একটা কথা বলতে চাইছিলাম, কিন্তু সব গুলিয়ে গেল। কি বলছিলাম, বলুন তো? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। গ্রীসের একজন স্টোয়িক প্রতিবেশীকে রক্ষা করবার জন্য নিজেকে একজন দাসব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে ফেলেছিল। এর মানে সে প্রতিবেশীর দুঃখের সম্বন্ধে নির্বিকার থাকতে পারেনি। দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা' হলে পরের জন্য এত বড় আত্মবিসর্জন সম্ভব হত না। আরও অনেক উদাহরণ আছে, এই জেলে থেকে থেকে সব ভুলে গেছি। যীশুখ্রিস্টের কথাই ধরুন না। বাস্তবের সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন কি? তিনি কাঁদতেন, শোকপ্রকাশ করতেন, হাসতেন, রাগতেন, দুঃখিত

হতেন। দুঃখ-কষ্টকে তিনি হাসিমুখে কখনও স্বীকার করেননি, তিনি মৃত্যু সম্বন্ধেও উদাসীন ছিলেন না।”

চিন্ময় হা হা করে হেসে উঠে বসল।

“ধরে নিলাম আপনি যা বলছেন তাই ঠিক, সুখ-শান্তি মানুষের অন্তরেই আছে, বাইরে নেই! ধরে নিলুম দুঃখকে আর মৃত্যুকে হাসিমুখে মেনে নেওয়াই উচিত। কিন্তু একথা প্রচার করবার আপনার কি অধিকার আছে? আপনি কি মুনি, না ঋষি?”

“না আমি মুনি বা ঋষি নই। কিন্তু তবু আমার মনে হয় একথা সকলেরই প্রচার করা উচিত। কারণ এই হচ্ছে যুক্তিযুক্ত সত্য কথা।”

“কিন্তু এই সত্য কথা প্রচার করবার ভার আপনি নিলেন কেন? জীবনের সম্বন্ধে এই উপলব্ধি, দুঃখের সম্বন্ধে এই উদাসীনতা এসব প্রচার করে বেড়াবার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে? আপনি কি কখনও দুঃখ পেয়েছেন? দুঃখ যে কি জিনিস তার সামান্যতম পরিচয় কি আপনার জানা আছে? আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি বলে ক্ষমা করবেন, বাল্যকালে আপনি বেত খেয়েছেন কখনও? আপনাকে কি কেউ কখনও চাবকেছে?’

“না। আমার বাবা-মা ওসবের বিরোধী ছিলেন।”

“কিন্তু আমার বাবা আমাকে নির্দয়ভাবে চাবকাতেন। তিনি ভয়ঙ্কর রাগী ছিলেন। বড় অফিসার ছিলেন তিনি, তাঁর লম্বা নাক ছিল, গর্দানটা ছিল হলদে রঙের, অনেকটা বাঘের গর্দানের মতো। অর্শে ভুগতেন। আপনার কথাই বলি। সারাজীবন আপনার গায়ে একটু আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি, কেউ আপনাকে ভয় দেখায় নি, কেউ আপনার উপর অত্যাচার করেনি। আপনার চেহারা বলিষ্ঠ ঘোড়ার মতো। বাবার আদরে মানুষ হয়েছেন, বাবার টাকায় লেখাপড়া শিখে একটি শাঁসালো চাকরি পেয়েছেন। গত কুড়ি বছর ধরে আপনি চমৎকার আলো-বাতাসওলা গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারে বিনা পয়সায় আরামে বাস করছেন, আপনার চাকর আছে। আপনি নিজে আপনার মরজিমতো কাজ করেন, কিংবা করেন না। আপনি অলস, হচ্ছে-হবে-গোছের মানুষ আর সেই জন্য গা-বাঁচিয়ে বিপদ এড়িয়ে নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। আপনি আপনার সমস্ত কাজের ভার দিয়ে দিয়েছেন হাসপাতালের নচ্ছার অ্যাসিস্ট্যান্টগুলোর উপর আর নিজে বেশ আরামে আছেন, টাকা বাঁচাচ্ছেন, বই পড়ছেন আর নানারকম গাঁজাখুরি দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে মশগুল হয়ে আছেন। আর আপনার”—চিন্ময় সান্যাল যামিনীবাবুর নাকের দিকে এক নজর চেয়ে বলল—“আপনার চোখ-মুখ দেখে মনে হয় আপনি মদও খান। মোট কথা, জীবন বলতে যা বোঝায় তা আপনি দেখেননি, তার পরিচয়ও আপনার জানা নেই। বাস্তব জীবনের একটা ভাসা ভাসা ধারণা আছে আপনার। দুঃখকে অগ্রাহ্য করে, বহির্জগৎ সম্বন্ধে নির্বিকার থেকে যে সুখ-শান্তি আপনি কল্পনা করেছেন তা অলস লোকেরই শোভা পায়। যারা কুঁড়ে তারাই ভাবে জগৎ মিথ্যা, বাইরের দুঃখ অলীক কিংবা মায়া। এসব হচ্ছে কুঁড়েদের দর্শন। একজন তার বউকে ধরে ঠাঙাচ্ছে, ঠ্যাঙাক, বাধা দেবার দরকার কি? কারণ এ তো জানা কথা আজ না হয় কাল ওরা দুজনেই মরবে। তাছাড়া যে ঠ্যাঙাচ্ছে সেই অবনত করছে নিজেকে, যাকে ঠ্যাঙাচ্ছে তার আর ক্ষতি কি। মদ খেয়ে মাতাল হওয়া অশোভন বিশ্রী ব্যাপার— কিন্তু যে মদ খায় সেও শেষ পর্যন্ত মরে, যে না খায় সেও মরে? সুতরাং মদ খেলে কি এমন ক্ষতি! কেউ আপনার কাছে দাঁতের ব্যথা নিয়ে এল, দাঁতে ব্যথা হয়েছে তো কি হয়েছে! ব্যথা তো মনের একটা অনুভূতি মাত্র, আর সে অনুভূতি তো

মায়া। তাছাড়া এটা কি আশা করা উচিত যে, তোমার সারাজীবন কোনও কষ্ট না পেয়ে কেটে যাবে? শেষ পর্যন্ত তো মরতেই হবে। সুতরাং মশাই, দাঁতের ব্যথার আর চিকিৎসা করার দরকার নেই। আমাকে একটু আরামে থাকতে দিন। কোনও ছোকরা যদি কষ্টে পড়ে এসে আপনার পরামর্শ চায় সে কি করবে, কোথা চাকরি পাবে। অন্য লোক হলে হয়তো একটু ভেবে উত্তর দিত। কিন্তু আপনার উত্তর তো ছকাই রয়েছে—জীবনকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর, প্রকৃত সুখ-শান্তি কি তা জানবার চেষ্টা কর, তাহলেই আনন্দ পাবেন, তাহলেই তোমার মুক্তি। কিন্তু এই মুক্তি ব্যাপারটা কি? কোনও উত্তর দিতে পারেন? পারেন না, কারণ এর উত্তর কেউ জানে না। আমাদের এখানে একটা খাঁচার মধ্যে পুরে রেখেছেন, মারছেন, পচাচ্ছেন। আপনি বলবেন— হলই বা! এই গারদ আর চমৎকার বৈঠকখানার সঙ্গে আসলে তো কোনো তফাতই নেই। মূল অনুসন্ধান করলে তো মায়া। ভারি সুবিধাজনক দর্শন আপনার, বাঃ! এ দর্শন থাকলে করবার কিছু নেই, বিবেকে কোনো গলদ নেই, নিজেকে আপনি বোধহয় মনে করছেন শংকর বা রামানুজ। বাঃ বাঃ চমৎকার! কিন্তু শুনুন, ওসব দর্শনও নয়, উপনিষদও নয়—আপনি যা করছেন তা ধাষ্টামি। কুঁড়েমি পেজোমি আর বোকামির সমন্বয়। আসলে কি করছেন জানেন? যা আছে কপালে বলে চোখ বুজে বসে আছেন। হ্যাঁ মশাই যা বললাম তা সত্যি"—চিন্ময় সান্যাল আরও রুখে উঠল—"আপনি বলছেন দুঃখ-কষ্টকে তুচ্ছ করতে? কিন্তু আপনার কড়ে আঙুলটা যদি কপাটে চেপে যায় তাহলে আপনি আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠবেন।"

"বোধহয় উঠব না"—যামিনী দত্ত হেসে উত্তর দিলেন।

"উঠবেন না? বলেন কি। ধরুন যদি এখনি আপনার স্ট্রোক হয়ে পক্ষাঘাত হয়, কিংবা যদি কোনো গুণ্ডা তার শক্তি বা উচ্চপদের সুযোগ নিয়ে আপনাকে প্রকাশ্যে অপমান করে এবং আপনি যদি বুঝতে পারেন যে, তার শাস্তি হবে না, তাহলেই আপনি বুঝবেন যে, সবাইকে আপনি যে সব বাজে উপদেশ দিয়ে বেড়াচ্ছেন তার প্রকৃত অর্থ কি? জীবনকে উপলব্ধি করা কিংবা জীবনের দুঃখ-কষ্টকে তুচ্ছ করা অত সোজা নয়, বুঝলেন।"

"বাঃ চমৎকার"—বলে উঠলেন ডাক্তারবাবু—"তোমার বক্তৃতা ভারি ভালো লাগল। চমৎকার বলেছ। আর আমার চরিত্রের সম্বন্ধে যা বললে তা তো একেবারে নিখুঁত। তোমার সঙ্গে কথা কয়ে ভারি খুশি হয়েছি। তোমার কথা তো আদ্যোপান্ত সব শুনলুম, এইবার আমার তরফের কথাটা শোন—"

।। এগারো ।।

তারা প্রায় আরও এক ঘন্টা আলাপ চালাল। যামিনী দত্তের কথা শুনে চিন্ময়ও যেন আশ্বস্ত হলো একটু। এর পর থেকে ডাক্তারবাবু রোজই অ্যানেক্সে আসতে লাগলেন। সকালবেলায় যেতেন, বিকেলেও খাওয়া-দাওয়ার পর যেতেন। চিন্ময় সান্যালের সঙ্গে কথা কইতে কইতে প্রায়ই সন্ধ্যা গড়িয়ে যেত। প্রথম প্রথম চিন্ময় তাঁর সঙ্গে একটু দূরত্ব রেখে চলত, তার সন্দেহ ছিল যে, ডাক্তার হয়তো গুপ্তচর। খোলাখুলি সেকথা বলতও। কিন্তু ক্রমশই কোমল হল। আর রূঢ় কর্কশ কথা বলত না। তবে কথাবার্তায় ব্যঙ্গের সুরটা ফুটে উঠত।

ক্রমশই ব্যাপারটা চাউর হয়ে গেল যে, ডাক্তারবাবু রোজই ছ'নম্বর ওয়ার্ডে যাচ্ছেন। ডাক্তারবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্টরা, নার্সরা বা নন্দী কেউ বুঝতেই পারত না কেন উনি রোজ ওখানে যাচ্ছেন, কেনই বা অতক্ষণ থাকছেন, এত কথাই বা কি বলছেন। সেখানে একটা প্রেসকৃপ্‌সনও লিখতেন না তিনি। তবে যান কেন? তাঁর চালচলন, হাবভাবও অদ্ভুত মনে হতে লাগল সকলের। পোস্টমাস্টারবাবু প্রায়ই তাঁর দেখা না পেয়ে ফিরে যেতেন। পাঁচির মা দেখত ডাক্তারবাবু প্রায়ই আজকাল চা না খেয়ে বেরিয়ে যান, অনেক রাত্রে ফেরেন, খাওয়ার দেরি হয়ে যায়। পাঁচির মা-ও ডাক্তারের এই পরিবর্তনে বিস্মিত হয়।

একদিন ডাক্তার ঘোষাল যামিনী দত্তের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে পেলেন না। ভাবলেন হয়তো আশেপাশে কোথাও আছেন, কিন্তু বেরিয়ে দেখতে পেলেন না তাঁকে। কে একজন বলল, তিনি অ্যানেক্সে আছেন। গেলেন সেখানে। সেখানে গিয়ে শুনতে পেলেন ভিতরে তিনি যেন কার সঙ্গে কথা বলছেন। বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়ে তিনি শুনতে লাগলেন।

"না, না, তোমাকে আমার মতে আমি দীক্ষিত করতে মোটেই চাইছি না"— যামিনী দত্তের কণ্ঠস্বর বড় শান্ত এবং করুণ শোনাল, যেন চিন্ময় যে তাঁকে ভুল বুঝেছে এতে তিনি দুঃখিত হয়েছেন—"আসল কথা তা নয় বন্ধু। আমি দুঃখভোগ করেছি কি না তার সঙ্গে আসল প্রশ্নটাকে জড়াচ্ছ কেন? দুঃখ এবং সুখ দুই-ই ক্ষণিক, সুতরাং দুটোকেই অগ্রাহ্য করা উচিত, ও সব ধর্তব্যের মধ্যেই নয়! আসল কথা হচ্ছে— তুমি আমি দুজনেই চিন্তা করতে পারি। আমরা পরস্পরের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বকে প্রত্যক্ষ করি, এতেই আমাদের আনন্দ। আমাদের মতে যদি অমিল থাকে তাতেও কিছু এসে যায় না। যে সমাজে বাস করি তার পাগলামি, ন্যাকামি, পেজোমি, বোকামি দেখে দেখে আমি যে কত ক্লান্ত তা যদি জানতে! তোমার কাছে আসি, কারণ তোমার সঙ্গে কথা কয়ে সুখ পাই। তুমি বুদ্ধিমান, তোমার সঙ্গ তাই ভালো লাগে। তাই এখানে আসি ভাই।"

ডাক্তার ঘোষাল কপাটটা ইঞ্চিখানেক ফাঁক করে সন্তর্পণে দেখলেন, যামিনী দত্ত চিন্ময় সান্যালের পাশে তার বিছানায় বসে আছেন। চিন্ময় নানারকম মুখভঙ্গি করে নিজের গায়ের কাপড়টা বার বার জড়াচ্ছে আর যামিনীবাবু চুপ করে বসে আছেন। তাঁর মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে, মুখটা মনে হচ্ছে লাল। কেমন যেন একটা অসহায় বিষণ্ণ মূর্তি। ডাক্তার ঘোষাল কাঁধ দুটো ঈষৎ তুলে মুচকি হেসে নন্দীর দিকে চাইলেন। তার সঙ্গে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল একটা।

তার পরদিন ডাক্তার ঘোষাল একজন মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। সেদিনও দুজনে অমনি আড়ি পেতে যামিনীবাবুর আলোচনা শুনলেন।

ফিরে যাবার সময় ডাক্তার ঘোষাল বললেন, "বুড়োর মাথাটাও বেঠিক হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।"

অ্যাসিস্ট্যান্টটি পথের কাদা থেকে নিজের জুতোটি বাঁচিয়ে বললেন, "ভগবান কার অদৃষ্টে কি যে লিখেছেন, কে জানে। আপনি যা বললেন আমারও তাই সন্দেহ। অনেকদিন থেকেই মনে হচ্ছে যে, এই রকম একটা কিছু হবে শেষ পর্যন্ত।"

।। বারো ।।

এরপর থেকেই ডাক্তার দত্ত অনুভব করতে লাগলেন তাঁকে ঘিরে যেন একটা রহস্যময় চক্রান্ত চলছে। হাসপাতালে তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট, নার্স বা রোগীদের সঙ্গে দেখা হলে তারা কেমন যেন অদ্ভুতভাবে তাঁর দিকে চেয়ে থাকে, তারপর তিনি চলে গেলেই নিজেদের মধ্যে ফুসফুস গুজগুজ করে। সুপারিন্‌ন্টেন্ডেন্টের মেয়ে মায়ার সঙ্গে তাঁর বেশ ভাব ছিল। দেখা হলেই তার মাথায় গালে হাত বুলিয়ে তাকে আদর করতেন। এখন সে তাঁকে দেখলে পালিয়ে যায়। তাঁর বন্ধু পোস্টমাস্টার সতীশবাবু সোৎসাহে এখন তাঁর প্রতি কথায় 'ঠিক, ঠিক' বলেন না; কেমন যেমন বিড়বিড় করে বলেন, 'তা বটেই তো তা বটেই তো'— এবং তাঁর দিকে কেমন যেন একটা বিষণ্ণ চিন্তিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলবার চেষ্টা করেন অত বই পড়া ভালো নয়, চা-ও একটু কম খাওয়া উচিত। উদাহরণ দেন। যজ্ঞেশ্বরবাবু বড় অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু বেশি পড়ে পড়ে শেষটা মাথার অসুখ হয়ে পড়ল তাঁর। গোপেন সরকার বড় উকিল ছিল, দিনরাত চা খেত খালি, শরীরটা ভেঙে পড়ল তাঁর! আকারে-ইঙ্গিতে সতীশবাবু ডাক্তার দত্তকে সাবধান করবার চেষ্টা করতেন। ডাক্তার ঘোষাল দু'একবার অযাচিতভাবেই এলেন তাঁর বাড়িতে। তাঁকে বিশ্রাম নিতে বললেন এবং ঘুমের ওষুধ খেতে বলে গেলেন।

দিনকতক পরে মেয়রের কাছ থেকে যামিনীবাবু চিঠি পেলেন একটা। মেয়র তাঁর সঙ্গে জরুরী দরকারে দেখা করতে চান। টাউন হলে গিয়ে যামিনীবাবু দেখলেন সেখানে অনেক পদস্থ অফিসাররা সমবেত হয়েছেন। পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, স্কুল ইন্‌স্‌পেকটর, মিউনিসিপাল কাউন্সিলের একজন মেম্বার, ডাক্তার ঘোষাল এবং শহরের নামজাদা একজন মোটাসোটা ডাক্তার।

কাউন্সিলের মেম্বার বললেন, "আমরা একটা দরখাস্ত পেয়েছি, সে সম্বন্ধে আপনার মতামত জানা দরকার। ডাক্তার ঘোষাল বলেছেন যে, হাসপাতালের মেন বিল্‌ডিংয়ে ডিস্‌পেন্সারির স্থান সংকুলান হচ্ছে না। সেজন্য ওটাকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত, হাসপাতালের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় নিয়ে গেলে ভালো হয়। এতে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু আমরা ভাবছি মেরামত না করলে সেটা কি সম্ভব"—

"হ্যাঁ, মেরামতের খুবই দরকার"—যামিনীবাবু বললেন—"দক্ষিণ দিকের বারান্দায় যদি নিয়ে যান তাহলে ওটা ভালো করে মেরামত করতে হবে। তার মানে অন্তত হাজার দেড়েক টাকা খরচ হবে। কিন্তু ও খরচ করে লাভ কি?

সবাই চুপ করে রইলেন।

যামিনীবাবু বলতে লাগলেন, "দশ বছর আগেই আপনাদের আমি বলেছিলাম যে, আমাদের শহরের আয়ের অনুপাতে আমাদের হাসপাতালটি এখন যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থাতেও সেটিকে একটি বিলাসের ব্যাপার বলা যেতে পারে। যখন এটা তৈরি হয়েছিল তখন অবস্থা অন্য রকম ছিল। আমার মনে হয় আপনারা বিল্‌ডিংয়ে আর নমিনেশনে যে টাকা অনর্থক খরচ করবেন তা দিয়ে দুটি আদর্শ হাসপাতাল করা যায়।"

"বেশ তাহলে আপনি যা বলছেন সেই অনুসারেই হাসপাতালের ব্যবস্থা করা যাক"—

''আমি তো আগেই বলেছি, হাসপাতালের ভার মিউনিসিপালিটির উপর না দিয়ে গভর্নমেন্টের হাতেই দেওয়া উচিত।''

''গভর্নমেন্টের হাতে দেওয়া মানে''—মোটা ডাক্তারবাবু হেসে বললেন—''আমাদের টাকাকড়ি যা কিছু আছে সব তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া। সে টাকা যদি তাঁরা চুরি করেন, আমাদের কোনও কথা চলবে না।''

''তা তো চলবেই না''—কাউন্সিলার সায় দিলেন হেসে।

যামিনীবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর মোটা ডাক্তারবাবুটির দিকে তিক্ত দৃষ্টি হেনে বললেন,—''আমাদের পক্ষপাত শূন্য হওয়া উচিত।''

নীরবতা ঘনিয়ে এল খানিকক্ষণের জন্য। বেয়ারা এসে চা দিয়ে গেল। পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট যেন একটু বেশি বিরক্ত হয়েছেন মনে হল। তিনি একটু ঝুঁকে যামিনীবাবুর গায়ে হাত দিয়ে বললেন, ''আপনি তো আমাদের একেবারে বয়কট করছেন মশাই। আপনি একা একা থাকাই পছন্দ করেন তা জানি। তাস খেলেন না, ক্লাবে যান না, আড্ডা দেন না, প্রেম করেন না। আমাদের মতো লোকের সঙ্গ আপনার ভালোই লাগে না বোধহয়''—

এরপর সবাই কথা বলতে লাগল। প্রসঙ্গ এক—এ শহরে ভদ্রলোকের পক্ষে বাস করা মুশকিল। থিয়েটার নেই, গানবাজনার মজলিস নেই, কিচ্ছু নেই। অধিকাংশ লোক চিত্তবিনোদনের জন্য হয় তাস পাশা খেলে, কিংবা মদ খায়, কেউ গোপনে, কেউ প্রকাশ্যে। কারুর দিকে না চেয়ে যামিনীবাবুও ধীর শান্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা। শহরের অধিকাংশ লোকেরা তাস পাশা খেলে বা মদ খেয়ে বা বাজে হুল্লোড় করে সময় কাটাচ্ছে। এর চেয়ে শোচনীয় অবস্থা তিনি কল্পনা করতে পারেন না। মানসিক উন্নতি, সংস্কৃতির চর্চা, বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা বা ভালো বই পড়ার রেওয়াজই নেই মোটে। আনন্দের খোরাক কোথাও নেই। মনের এ খোরাক সংগ্রহ করবার ইচ্ছাও নেই, সামর্থ্যও নেই অনেকের। অথচ ভেবে দেখলে মানুষের জীবনে মনটাই আসল, বাকি সব বাজে ভুয়ো জিনিস।

ডাক্তার ঘোষাল মন দিয়ে যামিনীবাবুর কথা শুনছিলেন। হঠাৎ তিনি বেমক্কা প্রশ্ন করে বসলেন, ''ডাক্তারবাবু, আজ কোন্ তারিখ বলুন তো''—

যামিনীবাবু বললেন। তারপর অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রশ্ন হতে লাগল। সেই মোটাসোটা ডাক্তারটি জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কি বার। তারপর এক বছরে ক'টা দিন থাকে। তারপর হেসে বললেন, ''আপনার ছ'নম্বর ওয়ার্ডে নাকি অসাধারণ প্রতিভাবান একজন লোক আছে?''

এই প্রশ্নে যামিনীবাবুর কান দুটো লাল হয়ে উঠল।

''হ্যাঁ, সে রোগী। কিন্তু সত্যি অসাধারণ লোক।''

এরপর আর কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করল না। তিনি যখন বেরিয়ে আসছেন তখন পুলিশের বড় সাহেব তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে মৃদু হেসে বললেন, ''আমরা বুড়ো হয়েছি, এবার আমাদের রিটায়ার করা উচিত। কি বলেন।''

টাউন হল থেকে বেরিয়ে যামিনীবাবু বুঝতে পারলেন যে, তাঁর মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁকে এই কমিশনের সামনে ডাকা হয়েছিল। যে সব প্রশ্ন তাঁকে করা হল তা ভেবে লজ্জা হল তাঁর। আবার কান দুটো লাল হয়ে উঠল। তাঁর জীবনে এই প্রথম তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুকম্পান্বিত হলেন।

ডাক্তারবাবুরা তাঁকে যা প্রশ্ন করেছিলেন, তা ভেবে তাঁর মনে হল— ‘‘হায় ভগবান, এই এদের বিদ্যের দৌড়! এই কিছুদিন আগেই এরা মানসিক ব্যাধি বিষয়ে পড়ে পরীক্ষা দিয়ে এসেছে— অথচ সে সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই নেই এদের। কি আশ্চর্য!’’

জীবনে এই প্রথম তিনি অপমানিত বোধ করলেন, জীবনে এই প্রথম তাঁর রাগ হল।

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় পোস্টমাস্টার সতীশবাবু এলেন এবং এসেই তাঁর দু'হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বেদনাবিহ্বল কণ্ঠে বললেন, ‘‘আপনি আমাকে যে আপনার বন্ধু বলে মনে করেন এবার সেটা প্রমাণ করুন। আপনি শুধু আমার বন্ধু নন, ঘনিষ্ঠতম বন্ধু।’’

যামিনীবাবুকে কোনো কথা বলবার অবসর না দিয়েই তিনি বলে যেতে লাগলেন, ‘‘আপনার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য আর উদার হৃদয়ের জন্য আপনাকে আমি ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। এখন আসল কথাটা শুনুন। প্রফেসনাল এটিকেটের জন্য আপনার ডাক্তার বন্ধুরা সত্যি কথাটা আপনাকে বলতে পারছেন না। কিন্তু আমি মশাই মন-খোলা লোক, সোজাসুজি আপনাকে বলেই দিচ্ছি— আপনি অসুস্থ হয়েছেন। মাপ করবেন, কিন্তু এইটি হচ্ছে সত্যি কথা। সবাই এটা লক্ষ করছে, অনেকদিন থেকেই লক্ষ করছে। যোগেনবাবু এই একটু আগেই বলছিলেন, ডাক্তারবাবু ঠিক সুস্থ নন। তাঁর এবার বিশ্রাম নেওয়াই উচিত। বিশেষ করে মনকে শান্ত করবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। ঠিকই বলেছেন। আর সুবিধাও হয়ে গেছে। কয়েকদিন পরে আমি ছুটি নিয়ে চেঞ্জে যাচ্ছি। ফাঁকা হাওয়ায় একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চাই। সাঁওতাল পরগনার ওদিকে যাব ভাবছি। মধুপুর কিংবা দেওঘর। আপনি চলুন আমার সঙ্গে। আপনি সত্যিই যে আমার বন্ধু সেটা প্রমাণ করুন।’’

‘‘আমার তো কোনও অসুখ হয়নি’’— যামিনীবাবু একটু থেমে বললেন—‘‘আপনার সঙ্গে আমি যাব কেন শুধু শুধু। অন্য কোনও উপায়ে আপনার বন্ধুত্বের প্রমাণ দেওয়া যাবে।’’

অকারণে চলে যাব কেন। তাঁর মনে হল তাঁর পড়াশোনা, পাঁচির মায়ের সেবা, যত্ন, তাঁর দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম ত্যাগ করে, এই কুড়ি বছরের বাঁধা পথ ছেড়ে কোথায় যাবেন। অদ্ভুত পাগলামী হবে যে সেটা। তারপরই টাউন হলে যা হয়েছিল তা মনে পড়ল। মনে পড়ল কি বিমর্ষভাবে বাসায় ফিরেছিলেন তিনি। তারপর ভাবলেন—এই হতভাগা শহর ছেড়ে চলে যাওয়াই ভালো। যেখানকার মূর্খ গাড়োল লোকেরা তাঁকে পাগল বলে মনে করে কি হবে সেখানে থেকে!

‘‘মধুপুর, না দেওঘর কোথায় যাবেন ঠিক করেছেন?’’

‘‘কিছু ঠিক করিনি এখনও। আপনি যদি চান মন্দারেও যেতে পারি, কিংবা কাশী। কাশীতে কিছুদিন আগে ছিলাম। অদ্ভুত শহর। চমৎকার। চলুন যামিনীবাবু, কাশীই চলুন আমার সঙ্গে। বাবা বিশ্বেশ্বর আবার ঠিক ভালো করে দেবেন আপনাকে—’’

॥ তেরো ॥

এক সপ্তাহ পরে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ ডাক্তার যামিনী দত্তকে বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করলেন, অর্থাৎ ভদ্র ভাষায় কাজে ইস্তফা দিতে বললেন। ডাক্তারবাবু বিনা প্রতিবাদে প্রায়

নির্বিকারভাবেই ইস্তফা দিয়ে দিলেন কাজে। আর এক সপ্তাহ পরে বেরিয়ে পড়লেন সতীশবাবুর সঙ্গে হাওয়া বদলাতে। আকাশ নীল, গরম নেই, বাতাস বেশ পরিষ্কার— প্রাকৃতিক পরিবেশ ভালোই ছিল. ট্রেনেও জায়গা পেতে কষ্ট হল না।

স্টেশনে ফেরিওলাগুলো অবশ্য বড্ড নোংরা ছিল। সতীশবাবু তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে বচসা করছিলেন, চটেও যাচ্ছিলেন মাঝে মাঝে। আর তারপর গল্প করছিলেন. ক্রমাগত, বকবক করছিলেন বললেই ঠিক হয়। কত শহরে তিনি ঘুরেছেন, কত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, কত রকম ঝঞ্ঝাটে কতবার পড়েছিলেন আর কিভাবে উদ্ধার পেয়েছিলেন এই সব গল্প। তাঁর চোখ-মুখের ভঙ্গি দেখে সন্দেহ হচ্ছিল যে, সব কথা বোধহয় সত্যি নয়। যামিনীবাবুর অসুবিধা হচ্ছিল। কারণ সতীশবাবু তাঁর মুখের খুব কাছে মুখ এনে চেঁচিয়ে কথা বলছিলেন। খুব জোরে হাসছিলেন তাঁর কানের কাছে। তাঁর নিশ্বাসও মুখে এসে লাগছিল যামিনীবাবুর। যামিনীবাবুর ভালো লাগছিল না, তাঁর চিন্তাধারা ব্যাহত হচ্ছিল।

পয়সা বাঁচাবার জন্যে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটেছিলেন তাঁরা। সতীশবাবু ক্রমশ অনেক যাত্রীর সঙ্গে ভাব করে ফেললেন এবং তাদের পাশে বসে চিৎকার করে বলতে লাগলেন যে, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ির অসুবিধা দূর করবার জন্যে সকলের আন্দোলন করা উচিত। চারিদিকে নোংরা, পাইখানা অপরিষ্কার, মেঝেতে বিড়ির টুকরো, লেবুর খোসা, চিনাবাদামের খোলা ছড়ানো। কখনও বোধহয় ঝাড়ু পড়ে না। তাঁর এই অবিরাম বকুনি আর মাঝে মাঝে অট্টহাসি ক্রমশ বিরক্তিজনক হয়ে উঠছিল যামিনী দত্তের কাছে।

"আমাদের দুজনের মধ্যে কাকে পাগল বলা উচিত"— ভাবছিলেন তিনি "প্যাসেঞ্জারদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্য আমি এক পাশে চুপ করে বসে আছি, আর এ লোকটা ষাঁড়ের মতো ক্রমাগত চেঁচিয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করছে যে, ওর মতো বুদ্ধিমান সবজান্তা লোক আর ভূ-ভারতে নেই। কাউকে একদণ্ড শান্তিতে থাকতে দেবে না।"

দেওঘরে নামবার আগে সতীশবাবু নিজের ট্রাঙ্ক থেকে কোট প্যান্ট আর টুপি বার করে পরে ফেললেন। বললেন, সাহেবী পোশাক পরা থাকলে অনেক সুবিধা। দেওঘরে কুলি-খানসামা সবাই তাকে সেলামও করতে লাগল। সতীশবাবুর ভাবভঙ্গি দেখে যামিনীবাবু বুঝলেন যে, সতীশবাবু সাহেবদের ভালো গুণ একটিও নিতে পারেননি। নিয়েছেন খারাপ গুণগুলো। কথায় কথায় 'ড্যাম', 'সোয়াইন' বলছিলেন। একটা হোটেলে গিয়ে চ্যাঁচামেচি করে এমন কাণ্ড করলেন যে, যেন তিনি কোনো নবাব খাঞ্জা খাঁ। যামিনীবাবু লক্ষ করলেন, তাঁর শালীনতারও কোনো বালাই নেই। আন্ডারওয়্যার পরে হোটেলের ঝি-এর সামনে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! 'তুই' বলতে লাগলেন সকলকে। ছোটলোকের মতো মুখ খারাপ করেও গালাগালি দিলেন একটা চাকরকে। খুব খারাপ লাগতে লাগল যামিনীবাবুর।

তারপর তিনি মহাদেবের মন্দিরে গিয়ে পট্টবস্ত্র পরে শিবপুজো আরম্ভ করলেন সাড়ম্বরে। তাঁর গদগদ ভাব দেখে অবাক হয়ে গেলেন যামিনীবাবু। চোখ দিয়ে জল পড়ছে, নাক ফুলে ফুলে উঠছে, গড়গড় করে সংস্কৃত স্তোত্র বলে যাচ্ছেন। প্রণাম করছেন তো করছেনই, আর ওঠেন না।

যামিনীবাবুকে বললেন, "বিশ্বাস করুন আর নাই করুন প্রার্থনা করতে ক্ষতি কি! হেঁট হয়ে ভালো করে প্রণাম করুন বাবা বদ্যিনাথকে। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

যামিনীবাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন, তারপর ভদ্রতার খাতিরে মাথাটা ঝোঁকালেন একটু, কিন্তু ঠিক ভক্তি-গদগদ হতে পারলেন না। এ দেখে গম্ভীর হয়ে গেলেন সতীশবাবু, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগলেন। তারপর ফিস্ ফিস্ করে স্তোত্র আওড়ালেন একটা, তাঁর চোখ জলে ভরে উঠল। যামিনীবাবু বিব্রত বোধ করতে লাগলেন।

তারপর তারা দেওঘরের ত্রিকূট পাহাড়ে গেলেন, আরও নানা দ্রষ্টব্য জায়গা দেখলেন।

তারপর একটা হোটেলে গেলেন। সেখানে গিয়ে বললেন, "ডবল ডিমের আমলেট্ দাও। আর কাটলেট যদি গরম ভেজে দিতে পার, তা-ও খানচারেক করে।"

।। চোদ্দ ।।

ডাক্তার যামিনী দত্ত অনেক কিছু দেখলেন, অনেক জায়গায় ঘুরলেন, হোটেলে ভালো ভালো খাবার খেলেন। কিন্তু সতীশবাবুর উপর তাঁর বিরক্তি বাড়তেই লাগল। লোকটা ছিনে জোঁকের মতো তাঁর সঙ্গে লেগে আছে! একদণ্ড নিস্তার নেই। তাঁর মনে হতে লাগল, কি করে পালাই, কি করে এর হাত থেকে উদ্ধার পাই। সতীশবাবু এমন ভাব দেখাচ্ছিলেন যেন যামিনীবাবুর সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা থাকা তাঁর একটা কর্তব্য, তাঁর মনকে সর্বদা প্রফুল্ল রাখতে হবে। তাই তাঁকে নিয়ে নানা জায়গায় যাচ্ছিলেন, নানারকম জিনিস দেখাচ্ছিলেন। কিছু না পেলে গল্প করে তাঁকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু যামিনীবাবুর কিছুই ভালো লাগছিল না। তিনি দুদিন সহ্য করলেন, তৃতীয় দিন বললেন, আমি আর কোথাও বেরুব না। বাড়িতেই থাকব। সতীশবাবু বললেন, তাহলে আমিও থাকব। একটু বিশ্রাম করা দরকার বই কি। বড্ড বেশি হৈ হৈ করা হচ্ছে। শুয়ে পড়লেন যামিনীবাবু। সতীশবাবুর দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে শুনতে লাগলেন তার বকবকানি। সতীশবাবু বলছিলেন, ব্রাহ্ম সমাজের পরমায়ু বেশিদিন নেই। ওরা বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে। তারপর বলতে লাগলেন চোর-জোচ্চোরে সব লুটে পুটে খাচ্ছে, দেশের অবস্থাও দিন দিন শোচনীয় হয়ে উঠছে। তারপর হঠাৎ বললেন, কেবল শিং বা খুর দেখে যেমন গরুর আসল পরিচয় পাওয়া যায় না, বাইরের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মানুষ চেনাও তেমনি শক্ত। প্রায় সবাই মুখোশ পরে আছে। যামিনীবাবুর মনে হল তাঁর বুক ধড়ফড় করছে, কানের ভিতর ঝিঁঝি ডাকছে। কিন্তু তিনি ভদ্রলোক, তিনি সতীশবাবুকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলতে পারলেন না, কথা বলতে বারণও করতে পারলেন না। সতীশবাবু নিজেই খানিকক্ষণ পরে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বললেন, "আমি একটু বেড়িয়ে আসি।"

তিনি চলে যাওয়ার পর যামিনীবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন, অনেকদিন পরে শান্তির আস্বাদ পেলেন যেন। মনে হল একা ঘরে বিছানায় চুপ করে শুয়ে থাকা কি আরামের! নির্জনতাই সুখ। স্বর্গের পরিবেশ বোধহয় এই রকম নির্জন শান্ত। এ ক'দিন যা সব দেখেছেন সে সব বিষয়ে ভাববার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দেখলেন সতীশবাবুই তাঁর সমস্ত মগজ অধিকার করে বিরাজ করছেন।

"কি আশ্চর্য, লোকটা আমার জন্যই ছুটি নিয়ে আমার ভালোর জন্যই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। ওর উদারতা আর বন্ধুত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই"— ভাবতে লাগলেন যামিনীবাবু—

"কিন্তু কি যন্ত্রণাদায়ক ওর এই উদারতা আর বন্ধুত্ব! লোকটার গুণ অনেক, কিন্তু ভীষণ একঘেয়ে ওর কথাবার্তা। সাংঘাতিক একঘেয়ে। কেবল চেষ্টা—কি করে আমাকে জ্ঞানের কথা আর ধর্মের কথা শোনাবে। কিন্তু বুঝতে দেরি হয় না যে, ও একটা গাড়োল ছাড়া আর কিছু নয়।"

এরপর কয়েকদিন আর যামিনীবাবু নিজের ঘর ছেড়ে বেরুলেন না। শরীর খারাপ হয়েছে এই ছুতোয় ঘরেই বসে রইলেন। সতীশবাবু যতক্ষণ থাকতেন ততক্ষণ যামিনীবাবু শুয়ে থাকতেন দেওয়ালের দিকে মুখ করে, সতীশবাবুর কথার একটিও উত্তর দিতেন না। সতীশবাবুর কথাবার্তা আর বক্তৃতা অসহ্য মনে হত তাঁর। সতীশবাবু বেরিয়ে যাবার পর নিশ্চিন্ত হতেন তিনি। সতীশবাবুর সঙ্গে এখানে এসেছেন বলে তাঁর নিজের উপরই রাগ হতে লাগল। সতীশবাবুর উপর ক্রমশ বিরূপ হয়ে যাচ্ছিল তাঁর মন। লোকটা আরও যেন বেশি গায়ে পড়া হয়ে যাচ্ছে, বক্তৃতার মাত্রা বাড়ছে রোজ রোজ। যামিনীবাবু যে ধরনের চিন্তা করতে অভ্যস্ত তা করবার সুযোগই পাচ্ছিলেন না। লোকটা কানের কাছে ক্রমাগত ঘ্যানর ঘ্যানর করে যাচ্ছে। ভাবছিলেন, "চিন্ময় ছোকরা যে ধরনের বাস্তবের কথা বলত সেই বাস্তবের পাল্লায় পড়ে যন্ত্রণা ভোগ করছি।

তিনি এই তুচ্ছ ব্যাপারের ঊর্ধ্বে উঠতে পারছিলেন না বলে তাঁর রাগ হচ্ছিল নিজের উপরই। শেষে ভাবলেন, "যাক, ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর লাভ নেই। যখন ফিরে যাব তখন আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।"

এর পর তাঁরা মধুপুর গেলেন। সেখানেও ওই একই ব্যাপার। একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন তাঁরা। যামিনীবাবু সেই ঘরে বিছানার উপর চুপচাপ শুয়ে থাকতেন দেওয়ালের দিকে মুখ করে। কেবল খাওয়ার সময় উঠতেন।

"মন্দারে যাবেন? চলুন সেখানে যাওয়া যাক। মন্দার পাহাড়ের কাছেই আমার এক বন্ধুর বাড়ি আছে, সেইখানেই খাসা থাকা যাবে। চলুন সেইখানেই যাই—"

"কি হবে মন্দারে গিয়ে"— করুণকণ্ঠে বললেন যামিনীবাবু— "যদি যেতে চান, আপনি একাই যান। আমি বাড়ি ফিরে যাই।"

"আরে না না, সে কি হয়"— সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন সতীশবাবু— "মন্দারের মতো জায়গা খুব কম আছে। কি সুন্দর জলহাওয়া, যা খাবেন তাই হজম হয়ে যাবে। জিনিসপত্রও খুব সস্তা। ফাঁকা জায়গা, তাছাড়া মধুসূদন আছেন। পাহাড়ের উপর তাঁর মন্দিরটি চমৎকার। আমি ওখানে পাঁচ বছর কাটিয়েছি, কি সুখেই যে ছিলাম।"

যামিনীবাবু বেশি প্রতিবাদ করতে পারলেন না। সতীশবাবুর সঙ্গে মন্দার যেতে হল। সেখানেও ওই একই ব্যাপার। ঘরে নিজের বিছানাতে শুয়ে থাকতেন যামিনীবাবু। রাগে বিরক্তিতে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। বাসার চাকরগুলো বাংলা কথা বোঝে না। বুঝতে চায় না। তাঁদের সঙ্গে হিন্দীতে কথা কওয়া অসম্ভব. শুধু তাই নয়, হাস্যকরও। হিন্দী তিনি মোটেই বলতে পারেন না। কিন্তু সতীশবাবু মহানন্দে অদম্য উৎসাহে প্রাণের প্রাচুর্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন চারিদিকে। সকালে বিকালে সন্ধ্যায়, কখনও বিরাম নেই। পুরোনো বন্ধুদের খুঁজে খুঁজে বার করছেন। কখনও কখনও বন্ধুদের বাড়িতে রাতও কাটাচ্ছেন। একদিন বাইরে সমস্ত রাত কাটিয়ে সকালবেলা এসে হাজির হলেন! ভয়ানক উত্তেজিত, চোখ মুখ লাল, চুল বিস্রস্ত। এসে ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ থেমে বললেন, "মানই সবার চেয়ে বড়।"

তারপর আবার খানিকক্ষণ পায়চারি করে বললেন, "হ্যাঁ, মানের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। কি কুক্ষণেই যে মন্দারে আসার বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছিল! জানেন ডাক্তারবাবু, আপনি শুনলে হয়তো আমাকে ঘৃণা করবেন, ঘৃণা করাই উচিত, জানেন, কাল রাত্রে আমি জুয়া খেলেছি। জুয়া খেলে হেরে গেছি। আমাকে শ দুই টাকা দিতে পারেন?"

যামিনীবাবু ক্ষণকাল তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর নীরবে টাকাটা বার করে দিলেন।

সতীশবাবু লজ্জায় রাগে চোখ-মুখ লাল করে অসংলগ্ন ভাষায় কি যে বললেন তা বোঝা গেল না। তারপর বেরিয়ে গেলেন তিনি। ফিরলেন ঘণ্টা দুই পরে। ফিরে ইজি চেয়ারটায় ধপাস করে বসে বললেন, "যাক মানটা আমার বেঁচেছে। মানে মানে উদ্ধার পেয়েছি। চলুন সরে পড়ি, এখানে আর একদণ্ড থাকব না। এ একটা জোচ্চোরদের আড্ডা!"

শীত পড়েছিল। চারিদিকে বেশ ঠাণ্ডা। দুই বন্ধু ফিরে এলেন, স্বস্থানে যামিনীবাবু এসে দেখলেন তাঁর জায়গায় ডাক্তার ঘোষাল কাজ করছেন। তিনি তাঁর পুরোনো বাসাতেই আছেন, কিন্তু প্রতীক্ষা করছেন যামিনীবাবু ফিরে এসে কোয়ার্টারটা খালি করে দিলেই তিনি সেখানে চলে আসবেন। যে মেয়েটি তাঁর সঙ্গে এসেছিল যাকে তিনি রাঁধুনী বলে পরিচয় দিয়েছিলেন, সে হাসপাতালের একধারেই বাস করছে। শহরে হাসপাতাল সম্বন্ধে একটা জোর গুজব রটেছিল। ওই রাঁধুনী মেয়েটির সঙ্গে নাকি ইন্‌সপেক্‌টরের খুব ঝগড়া হয়ে গেছে এবং ইন্‌স্‌পেক্‌টর নাকি হাঁটু গেড়ে মেয়েটির কাছে ক্ষমা চেয়েছে।

যামিনীবাবু এসেই ঘর ভাড়া করতে বেরুলেন।

"একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, মনে কিছু করবেন না"—সতীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে— "আচ্ছা, কত টাকা আপনার আছে বলুন দেখি—"

যামিনীবাবু তাঁর ব্যাগ বার করে গুনে বললেন, "একশো আশি টাকা।"

"না, না, ব্যাগে কত আছে তা জানতে চাইছি না"— একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন সতীশবাবু— "সবসুদ্ধ কত টাকা আছে আপনার?"

"ওইতো বললাম, একশো আশি টাকা। ওই আমার যথাসর্বস্ব।"

সতীশবাবু অবাক হয়ে গেলেন। যদিও তিনি জানতেন যে, যামিনীবাবু সৎ লোক, অসদুপায়ে কখনও কোনো উপার্জন করেননি, তবু তাঁর ধারণা ছিল যে, অন্ততঃ হাজার বিশেক টাকা তিনি জমিয়েছেন। কিন্তু এখন দেখলেন তিনি প্রায় নিঃস্ব, বাকি জীবনটা চালাবার মতো অর্থও তাঁর নেই। হঠাৎ তাঁর দুই চোখ জলে ভরে গেল, তিনি যামিনীবাবুকে দুহাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

।। পনেরো ।।

একটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাড়িতে শেষে ঘর ভাড়া করলেন যামিনীবাবু। বাড়ির মালিক পুরুষ নয়, মেয়েছেলে। নাম সিন্ধুবালা। সিন্ধুবালার তিনটি ছেলে। স্বামীটি দুশ্চরিত্র মাতাল। বাড়িতে তিনটি মাত্র ঘর। দুটি ঘর যামিনীবাবু নিয়েছিলেন। তৃতীয় ঘরটিতে পাঁচির মা আর

সিন্ধুবালা রাত্রে শুত। সিন্ধুবালার স্বামী প্রায় রাত্রে বাড়ি ফিরত না। কিন্তু যেদিন ফিরত, মত্ত অবস্থায় ফিরত। এসে চিৎকার গালাগালি করত কুৎসিত ভাষায়, মাঝে মাঝে মারতেও যেত। ঘরের মধ্যে চেয়ার টেনে এনে বসত। তার উপর আবার চিৎকার করে বলত, মদ চাই। জলদি মদ আনাও। ছেলেগুলো ভয়ে কাঁদত। যামিনীবাবু তখন তাদের এনে নিজের ঘরে শোয়াতেন এবং তাদের ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতেন। এতে যেন বিশেষ আনন্দ পেতেন তিনি একটা।

যেমন তাঁর চিরকালের অভ্যাস, সকালে আটটায় উঠে চা খেয়ে পড়তে বসতেন। নূতন বই কেনার পয়সা ছিল না, পুরোনো বই আর মাসিকপত্রগুলোই পড়তেন। আগে পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে যেতেন, কিন্তু এখন আর তা হওয়া সম্ভব ছিল না। পুরোনো বই পড়তে পড়তেই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন তিনি শেষ পর্যন্ত। এইসব কারণে বই পড়া ছেড়ে দিলেন। বই গোছানোর দিকে মনোযোগ দিলেন। বইগুলির তালিকা করলেন, বইগুলির পিছনে কাগজ সেঁটে নম্বর দিলেন, সেগুলি ঝেড়েঝুড়ে সাজিয়ে রাখলেন আলমারিতে। এই একঘেয়ে কাজ করেও কিন্তু বেশ একটা শান্তি পেলেন তিনি। মনে কোনও চিন্তার ঝড় বইত না, প্রশান্ত মনে বই গুছিয়ে যেতেন তিনি। সময় বেশ কেটে যেত। এমন কি শেষে আলু পটল ছাড়াতেও ভালো লাগত তাঁর। পাঁচির মার অনেক কাজ করে দিতেন। চাল ডাল বেছে দিতেন। বেশ লাগত। সকাল সন্ধ্যায় পুজো করতে আরম্ভ করলেন। চোখ বুজে আসন বসে থাকতেন চুপ করে। নানারকম দেবদেবীর মূর্তি ভেসে উঠত চোখের উপর। নানারকম ধর্ম, নানারকম দর্শনের কথা মনে হত। বেশ ভালো লাগত পুজো করে।

চিন্ময় সান্যালের সঙ্গে গল্প করবার জন্য দুবার তিনি হাসপাতালে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুবারই দেখলেন চিন্ময় মোটেই প্রকৃতিস্থ নেই। ভয়ানক উত্তেজিত, ভয়ানক রাগ। তাঁকে দেখেই বলে উঠল, ''আমাকে রেহাই দাও না বাবা। কেন বাজে বকবক করে জ্বালাতন করছ। আমার উপর যতদূর অত্যাচার করা সম্ভব তা তো করেইছ, একাও থাকতে দেবে না? এটুকু দয়াও করবে না?''

দুবারই যখন যামিনীবাবু তাকে নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন চিন্ময় চিৎকার করে উঠল—''জাহান্নমে যাও—।''

যামিনীবাবু তৃতীয়বার যেতে আর সাহস করলেন না, যদিও যেতে তাঁর খুবই ইচ্ছা করছিল।

আগে যামিনীবাবু বিকেলে চা খেয়ে ঘরে পায়চারি করতে করতে চিন্তা করতেন, কিন্তু এখন আর তা ভালো লাগত না। চুপ করে শুয়ে থাকতেন বিছানায় দেওয়ালের দিকে মুখ করে। সন্ধ্যার সময় পাঁচির মা আর এক কাপ চা দিয়ে যেত। এরপর নানারকম তুচ্ছ চিন্তা পেয়ে বসত তাঁকে। একটা কথা খুব বেশি করে মনে হত—তিনি কুড়ি বছর চাকরি করছেন, গভর্নমেন্টের উচিত তাঁকে পেন্‌সন দেওয়া। কিন্তু কই কিছু দিচ্ছে না তো। যদিও চাকুরি জীবনে তিনি সব সময়ে বিবেক-নির্দিষ্ট পথে চলতে পারেননি। কিন্তু গভর্নমেন্ট কি বিবেক নিয়ে খুব মাথা ঘামায়? যারা চাকরি করছে, তারা সৎ বা অসৎ যাই হোক, শেষ পর্যন্ত পেন্‌সন তো পায়। তাঁর বেলায় এ ব্যতিক্রম কেন। তাঁর টাকাকড়ি ফুরিয়ে গিয়েছিল। রাস্তা দিয়ে চলতে লজ্জা করত তাঁর, দোকানদাররা চেয়ে থাকত তাঁর দিকে। অনেক বাকি পড়ে

গেছে। প্রায় একশো টাকা ধার হয়ে গেছে দোকানে। সিন্ধুবালাকেও বাড়িভাড়া দেওয়া হয়নি। পাঁচির মা গোপনে তাঁর বই আর জামাকাপড় বিক্রি করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করত। সে সিন্ধুবালাকে বলত ডাক্তারবাবু শিগগিরই অনেক টাকা পাবেন।

সতীশবাবুর পাল্লায় পড়ে বেড়াতে গিয়ে তাঁর প্রায় হাজার-খানেক টাকা খরচ হয়ে গেছে। ভেবে আপসোস হত। টাকাটা এখন থাকলে সুবিধা হত অনেক। আর বিরক্ত হতেন তিনি কেউ এলে। একা থাকতে দেবে না তাঁকে কিছুতে। কর্তব্যবোধে ডাক্তার ঘোষাল প্রায়ই দেখতে আসতেন তাঁকে। অসুস্থ সহকর্মীকে দেখাশোনা করা উচিত বই কি। কিন্তু যামিনী দত্ত বিরক্ত হতেন এতে। ঘোষালের টেবো-টেবো গাল, তাঁর মেকী ভদ্রতা, তাঁর "দাদা দাদা" বলে পিঠচাপড়ানো অসহ্য বোধ হত তাঁর। লোকটা বুট পায়ে দিয়ে আসত। এতে আরও বিরক্ত হতেন তিনি। কিন্তু ঘোষাল যে তাঁর কাছে আসা একটা কর্তব্য বলে ধরে নিয়েছেন এবং তাঁর চিকিৎসার ভার নিয়েছেন একথা মনে হলে তাঁর রাগের আর সীমা থাকত না। প্রতিবারই ডাক্তার ঘোষাল সঙ্গে করে একটা জোলাপ আর ঘুমের ওযুধ আনতেন।

সতীশবাবুও কর্তব্যবোধে তাঁর কাছে আসতেন। তাঁর উদ্দেশ্য তাঁর মনটাকে চাঙ্গা করা। এ আর এক বিরক্তিকর ব্যাপার।

পুরাতন বন্ধুদের দাবি নিয়ে, চোখে-মুখে একটা মেকী আনন্দের ভাব ফুটিয়ে ঘরে ঢুকতেন তিনি। ঢুকেই বলতেন, "বাঃ চেহারা তো আজ বেশ ভালো দেখছি। এইবার ঠিক সেরে যাবেন।" তাঁর ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হত তিনি যেন যামিনী দত্তকে খরচের খাতায় লিখে রেখেছিলেন। মন্দারে যে টাকাটা তিনি নিয়েছিলেন সেটা ফেরত দেননি, আর এ লজ্জাটা ঢাকবার জন্যই সম্ভবত তিনি আরও জোর করে হাসতেন আর মজার মজার গল্প করতেন। তাঁর মজার গল্প যেন আর ফুরোতে চাইত না এবং শেষ পর্যন্ত তা সতীশবাবু এবং যামিনীবাবু উভয় পক্ষেই যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠত।

সতীশবাবু এলেই যামিনীবাবু পাশ ফিরে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাকতেন, আর দাঁতে দাঁত চেপে তাঁর কথা শুনতেন। তাঁর মনে হত তাঁর মনের উপর কেউ যেন কাদার প্রলেপ দিয়ে যাচ্ছে এবং ক্রমশ তা যেন তাঁর শ্বাসরোধ করে ফেলছে।

একটি কথা ভেবে তিনি সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করতেন— কিছুদিন পরে কেউ থাকবে না। তিনি, ডাক্তার ঘোষাল, সতীশবাবু কোনো চিহ্ন না রেখে মহাকালগর্ভে বিলীন হয়ে যাবেন। এককোটি বছর পরে কোনও বিদেহী আত্মা যদি পৃথিবীর আকাশ দিয়ে উড়ে যায় তাহলে পৃথিবীতে সে কাদা আর পাথর ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। সংস্কৃতি, সভ্যতা, ধর্ম সব লোপ পাবে, ঘাসের একটি পাতাও গজাবে না। এই যদি হয় তাহলে ওই দোকানদারের চাউনি, ডাক্তার ঘোষালের জঘন্য ব্যবহার, সতীশবাবুর উৎপীড়ন— এসবে কিইবা এসে যায়।

কিন্তু এ সান্ত্বনাও মাঝে মাঝে ঘোলাটে হয়ে যেত। তিনি কল্পনা করতেন যে, এককোটি বছর পরে ডাক্তার ঘোষাল হয়তো কোনও পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছেন, কিংবা সতীশবাবু অট্টহাস্য করতে করতে এসে চুপি চুপি তাঁর কানে কানে বলছেন, "আপনার মন্দারের ধারটা আমি শোধ করে দেব, দিনকয়েক পরেই দেব, সত্যি দেব।"

।। ষোলো ।।

একদিন ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে সতীশবাবুও এলেন। যামিনী দত্ত বিছানায় শুয়েছিলেন, অতি কষ্টে উঠে বসলেন। দেখতে পেলেন ডাক্তার ঘোষাল তাঁর জন্যে আবার ঘুমের ওষুধ এনেছেন।

"বাঃ আপনি আজ বেশ ভালো আছেন দেখছি"—সতীশবাবু শুরু করলেন—"কালকের চেয়েও আজ আপনাকে ভালো দেখাচ্ছে। চমৎকার দেখাচ্ছে।"

"দাদা, তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন" —ডাক্তার ঘোষাল তাঁর পিঠ চাপড়ে বললেন,—"এভাবে শুয়ে থাকতে কি আপনারই ভালো লাগছে।"

"আরে না না, এইবার সেরে উঠছেন উনি"—বলে উঠলেন সতীশবাবু—"লাট্টুর মতো ছুটে বেড়াবেন চতুর্দিকে। আরও একশো বছর আমরা পৃথিবীকে ভোগ করবো, দেখে নেবেন।"

"একশো বছরের কথা বলতে পারি না"—মৃদু হেসে ডাক্তার ঘোষাল বললেন— "কিন্তু আরও বছর কুড়ি ওঁর কাটানো উচিত। কিন্তু দাদা, মনে হচ্ছে আপনি দমে গেছেন। দমবার কি আছে, বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে উঠুন—"

"উঠবেন তো"—চিৎকার করে উঠলেন সতীশবাবু—"আমরা যে কি মাল দিয়ে তৈরি তা দেখতে পাবেন। দেখিয়ে দেব আমরা। এর পরের বার আমরা হরিদ্বারে বেড়াতে যাব, ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে উঠব, মনের আনন্দে বলব—হেট্ হেট্ হেট্। তারপর হরিদ্বার থেকে ফিরে এসে বিয়ের ব্যবস্থা করব"— বাঁ চোখটা একটু কুঁচকে বললেন—'হ্যাঁ হ্যাঁ মশাই, ভালো কনে খুঁজে আপনারই বিয়ে দেব—"

যামিনী দত্ত যেন অনুভব করলেন তাঁর গলা পর্যন্ত কাদা ভরে উঠেছে। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে।

"এসব কি নোংরামি"— হঠাৎ উঠে তিনি জানালার কাছ পর্যন্ত গেলেন—"এরকম অসভ্যতা করছেন কেন আপনারা—"

তিনি মৃদু শান্ত কণ্ঠেই কথাগুলো বলবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু তা হল না, তিনি ঘুষি পাকিয়ে দুহাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, "বেরিয়ে যান এখান থেকে।" তাঁর মুখ লাল হয়ে গেল, রাগে তিনি কাঁপতে লাগলেন। "বেরোন, বেরোন, দুজনেই বেরিয়ে যান—"

ডাক্তার ঘোষাল আর সতীশবাবু দুজনেই দাঁড়িয়ে উঠলেন, অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন যামিনী দত্তের দিকে।

"বেরিয়ে যান দুজনেই"—আবার চিৎকার করে উঠলেন যামিনী ডাক্তার—"গেট, আউট্! বোকা হাঁদার দল সব। তোমাদের বন্ধুত্বও চাই না, ওষুধও চাই না। বেরোও এখান থেকে। ছোটলোক, পাজি—"

ডাক্তার ঘোষাল আর সতীশবাবু পরস্পরের দিকে চেয়ে পিছু হাঁটতে হাঁটতে দরজার কাছ পর্যন্ত এলেন। তারপর দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন।

যামিনীবাবু ঘুমের ওষুধের বোতলটা তুলে নিয়ে তাদের পিছু পিছু গিয়ে ছুঁড়ে দিলেন সেটা। ঝনঝন করে চুরমার হয়ে গেল বোতলটা।

"চুলোয় যাও, জাহান্নমে যাও সব।"

যামিনীবাবুর চিৎকারে কান্নার আভাস পাওয়া গেল একটা। তারপর তিনি কাঁপতে লাগলেন, কম্প দিয়ে জ্বর এল যেন। বিছানায় শুয়ে পড়লেন। শুয়ে শুয়ে বলতে লাগলেন— "বোকা হাঁদা ছোটলোক সব!" একটু যখন শান্ত হলেন তখন তাঁর মনে হতে লাগল, ছি ছি! সতীশবাবু হয়তো কি মনে করছেন। কি কাণ্ড করে ফেললেন তিনি। ছিঃ! এমন বেসামাল তো তিনি আগে হননি। তাঁর ভদ্রতা, সুরুচি, শালীনতা— এসব লোপ পেল কি করে?

ধিক্কারে আর লজ্জায় তাঁর মন ভরে উঠল। সমস্ত রাত তিনি ঘুমুতে পারলেন না। সকালে উঠে সতীশবাবুর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইলেন। সতীশবাবু তখন পোস্টাপিসে ছিলেন।

"আরে না না, ওসব কথা মনে রাখবার মতো নয়"—সতীশবাবু খুব দরদ দিয়ে বললেন— "যা হয়ে গেছে, যেতে দিন। ঝামরু"—পিয়নকে এমন জোরে হাঁক দিলেন তিনি যে, পোস্টাপিসের সকলে চমকে উঠল—"এই ঝামরু! একটা চেয়ার দিয়ে যাও এখানে। বাছা, একটু থাম না অমন ঘোড়ায় চড়ে এলে কি কাজ হয়, নিচ্ছি তোমার রেজিস্ট্রী। দেখছ না ব্যস্ত আছি।"

একজন বুড়ি একটা রেজিস্ট্রী এনেছিল, সে বেচারা একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল।

"যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে, বুঝলেন, ও নিয়ে আর কচলাবেন না। বসুন, বসুন।"

তারপর তিনি মিনিট খানেক ধরে হাঁটু নাচালেন। তারপর বললেন, "বিশ্বাস করুন, আমার একটুও রাগ বা দুঃখ হয়নি। অসুখে পড়লে লোকের মেজাজ খারাপ তো হবেই। ডাক্তার ঘোষাল আর আমি দুজনেই কাল কিন্তু আপনার ওই ব্যাপার দেখে একটু ভড়কে গেছলাম। আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা হল ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে। আপনি আপনার অসুখটাকে অবহেলা করছেন কেন? এ বিষয়ে একটু সিরিয়াস হোন। আমি আপনার বন্ধু বলেই বলছি।" —তারপর কণ্ঠস্বর একটু নিচু করে বললেন— "কিন্তু আপনি যেখানে আছেন সে জায়গাটা অতি বদ। চারিদিকে ছোটলোকের ভিড়, কথা কইবার লোক নেই, নোংরা, কেউ যত্ন করবার নেই। ওখানে আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকতে পারে না। একটা কথা শুনবেন? ডাক্তার ঘোষালেরও এই মত। আপনি হাসপাতালে চলুন। সেখানে ভালো খাবার পাবেন, আপনাকে সবাই যত্ন করে সেবা-যত্ন করবে। ডাক্তার ঘোষাল খুব মাই ডিয়ার লোক, ডাক্তারও ভালো, তাঁর উপর বিশ্বাস করা যায়। তিনি বলেছেন যে, ভালোভাবে আপনার দেখাশোনা করবেন। যা বলছি শুনুন, বুঝলেন—"

যামিনীবাবু পোস্টমাস্টারের আকুলতা দেখে, বিশেষ করে তাঁর চোখে জল দেখে বিচলিত হলেন।

"আপনি আমার ঘনিষ্ঠ এবং শ্রদ্ধেয় বন্ধু"—যামিনীবাবু বললেন—"আপনাকে আমি বলছি ওঁদের কথা বিশ্বাস করবেন না! ওঁরা যা বলছেন তা মিথ্যা। আমার কোনো অসুখ নেই। আসল ব্যাপার হচ্ছে গত কুড়ি বছরের মধ্যে আমি একটিমাত্র বুদ্ধিমান লোকের দেখা পেয়েছি এবং *সে লোকটি পাগল*। আমার কোনও অসুখ নেই, আমি একটা দারুণ ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গেছি, তার থেকে বেরুতে পারছি না। এই আমার অবস্থা। এখন আপনারা যা ইচ্ছে করুন। আমি গ্রাহ্য করি না।"

"আপনি হাসপাতালেই যান।"

"তাতেও আপত্তি নেই। আপনারা যদি চান, আমাকে জীবন্ত কবরও দিতে পারেন।"

"একটা প্রতিশ্রুতি দিন আমাকে। ডাক্তার ঘোষালের পরামর্শ অনুসারে চলবেন।"

"বেশ দিলুম। কিন্তু আমি আবার আপনাকে বলছি, আমার অসুখ করেনি, আমি একটা ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে গেছি। বুঝতে পারছি এখন থেকে সব কিছুই, এমন কি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর গভীর সমবেদনাও একই অনিবার্য পরিণতির দিকে আমাকে টেনে নিয়ে যাবে— সে পরিণতি হচ্ছে আমার মৃত্যু। আমি মরছি এবং সেটা উপলব্ধি করবার সাহস আমার আছে।"

"কিন্তু আমি বলছি, আপনি ভালো হয়ে যাবেন।"

"এসব কথা বলে লাভ কি। পৃথিবীর নিয়মই এই। সবাইকে এই একই পথে চলতে হবে। ব্যক্তি বিশেষে একটু ইতর-বিশেষ হতে পারে। আপনার কিডনি খারাপ হোক, কিংবা হার্টই খারাপ হোক, কিংবা মাথাই খারাপ হোক—যেই লোকে ধরে ফেলবে যে, আপনার কিছু একটা খারাপ হয়েছে, অমনি আপনি ঘূর্ণাবর্তে পড়ে যাবেন—তার থেকে আর উদ্ধার নেই। যত হাঁকুপাঁকু করবেন তত আরও ডুবে যাবেন। সুতরাং আত্মসমর্পণ করাই উচিত। কেউ আপনাকে বাঁচাতে পারবে না। অন্তত এই আমার মত।"

ইতিমধ্যে পোস্টাপিসের জানালার কাছে বেশ ভিড় জমে গিয়েছিল। তা দেখে যামিনীবাবু উঠে পড়লেন। সতীশবাবু এগিয়ে দিয়ে এলেন তাঁকে দরজা পর্যন্ত। যাবার আগে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা আবার মনে করিয়ে দিলেন।

সেই দিনই সন্ধ্যার সময়ে ডাক্তার ঘোষাল এলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। তাঁর গায়ে গরম জামা, পায়ে বুট। যেন বিশেষ কিছু নয় এমনিভাবে কথাটা পাড়লেন।

"দাদা, আপনার কাছে একটা দরকারে এসেছি। হাসপাতালের একটা রুগীর বিষয়ে আপনার একটু পরামর্শ চাই। রুগীটাকে দেখবেন গিয়ে?"

যামিনীবাবুর মনে হল ঘোষাল তাঁর ভালোর জন্যই এসেছে। ভেবেছে বোধহয় যে, হাসপাতালে গিয়ে রুগী-টুগী দেখলে তাঁর মনটা ভালো থাকবে, হাঁটলেও হয়তো শরীরটা চাঙ্গা হবে একটু। আগের দিন ঘোষালের সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করেছেন তার জন্য লজ্জিত হলেন। ঘোষাল সে কথার উল্লেখ পর্যন্ত করল না দেখে কৃতজ্ঞতাও অনুভব করতে লাগলেন। ঘোষালের কাছে এ ধরনের ভদ্রতা তিনি প্রত্যাশা করেননি।

"আপনার রুগী কোথায়?"

"হাসপাতালে। অনেকদিন থেকেই ভাবছি আপনাকে দেখাব। অদ্ভুত কেসটা—"

তাঁরা হাসপাতালে এলেন। এসে সোজা চলে গেলেন অ্যানেক্সের দিকে। দুজনেই নীরব। অ্যানেক্সে আসতেই নন্দী যথারীতি সেলাম করে উঠে দাঁড়াল।

"এইখানেই একটা রুগীর লাংসে কি যেন হয়েছে"— আমতা আমতা করে বললেন ডাক্তার ঘোষাল—"আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি এখুনি, স্টেথোস্‌কোপটা নিয়ে আসি।"

বলেই তিনি চলে গেলেন।

।। সতেরো ।।

চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। চিন্ময় সান্যাল নিজের বিছানায় বালিশে মুখ গুঁজে শুয়েছিল। পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটা বসেছিল অনড় হয়ে, চোখ দিয়ে জল পড়ছিল তার, ঠোঁট দুটো ক্রমাগত নড়ছিল। কেউ জেগে ছিল না। সেই মোটা লোকটাও ঘুমিয়ে পড়েছিল। গাঢ় নীরবতা ঘনিয়ে এসেছিল ঘরটায়।

যামিনী দত্ত চিন্ময়ের বিছানার একধারে বসেছিলেন। আধ ঘণ্টা কেটে গেল, ডাক্তার ঘোষাল এলেন না। তাঁর বদলে এল নন্দী। তার হাতে এক সেট রোগীর পোশাক।

"হুজুর, পোশাকটা বদলে ফেলুন। এইটে আপনার খাট— "একটা খালি খাট দেখিয়ে নন্দী বলল— "ভালো হয়ে যাবেন হুজুর, ভাববেন না, ভগবান দয়া করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

ডাক্তার যামিনী দত্ত তখন বুঝতে পারলেন সব। একটি কথাও না বলে তিনি খাটটায় গিয়ে বসলেন। তারপর যখন বুঝলেন নন্দী পোশাকগুলো নিয়ে অপেক্ষা করছে, তখন নিজের পোশাক খুলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে গেলেন তিনি। অদ্ভুত লাগছিল তাঁর। তারপর হাসপাতালের পোশাক পরে ফেললেন। কোটটা একটু বেশি ঢলঢলে মনে হল। মনে হল কোট থেকে একটা আঁশটে গন্ধ ছাড়ছে।

"কিচ্ছু ভাববেন না হুজুর, ভগবান দয়া করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

তাঁর কাপড়চোপড়গুলো নিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে নন্দী চলে গেল।

"সবই সমান"— ঢলঢলে কোটটাকে গায়ে জড়িয়ে ভাবতে লাগলেন তিনি, "কোনো তফাত নেই। ভালো দরজির তৈরি জামা আর এই জামাতে কোনো তফাত নেই। সব সমান"—

কিন্তু তাঁর ঘড়িটা? নোটবুকটা? সিগারেটগুলো? নন্দী সবই নিয়ে গেল নাকি! তখন তাঁর মনে হল এ জীবনে বোধহয় তিনি আর ওসব জামাকাপড় পরতে পারবেন না। অদ্ভুত লাগছিল তার প্রথমে। কিন্তু ক্রমশ তিনি উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর বাড়িতে আর এই ছ'নম্বর ওয়ার্ডে কিছু তফাত নেই। পৃথিবীতে সবই অর্থহীন, সবই অলীক, সবই মায়া। কিন্তু তাঁর হাত দুটো কাঁপতে লাগল। চিন্ময় সান্যাল যে তাঁকে এই বেশে দেখবে এই ভেবে তিনি দমে গেলেন। তিনি উঠে পায়চারি করলেন একটু, তারপর আবার এসে বসলেন।

আধ ঘণ্টা কাটল, তারপর এক ঘণ্টা, ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তিনি। তাঁর মনে হল দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কি এইভাবে কাটানো সম্ভব? আবার একটু পায়চারি করলেন. আবার খাটে এসে বসলেন, তারপর জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চাইলেন একবার। বাস্, এরপর আর কি করবার আছে? কিচ্ছু নেই! তারপর ছবির মতো বসে থাকতে হবে খাটের উপর? না, না, তা অসম্ভব, অসম্ভব।

যামিনীবাবু খাটটায় শুয়ে পড়লেন. তারপর উঠে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে। তারপর জামার হাতা দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে ফেললেন। আবার অনুভব করলেন জামাটায় ভীষণ আঁশটে গন্ধ।

"না, না, ওরা ভুল করেছে"— হঠাৎ দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন তিনি— "ওদের বলতে হবে। ওরা ভুল করেছে—"

চিন্ময় সান্যালের ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসল সে। দুই মুঠোর উপর গাল দুটো রেখে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর থুতু ফেলল। তারপর যামিনীবাবুর দিকে চেয়ে দেখল এক নজর। প্রথমটা কিছু বুঝতে পারেনি। তারপরই কিন্তু সমস্ত মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। একটা নিষ্ঠুর আনন্দ যেন চকমক করতে লাগল তার চোখে-মুখে।

"ও, তোমাকেও তাহলে ওরা এনেছে এখানে। স্বাগত, স্বাগত! এতদিন তুমি পরের রক্ত শুষেছিলে, এবার ওরা তোমার রক্ত শুষবে। বাঃ"—

"ওরা ভুল করেছে"— মৃদুকণ্ঠে বললেন যামিনীবাবু। চিন্ময়ের ভাবভঙ্গি দেখে ঘাবড়ে যাচ্ছিলেন তিনি। আবার বললেন, "ওরা ভুল করে এনেছে আমাকে এখানে।"

চিন্ময় সান্যাল আবার থুতু ফেলে শুয়ে পড়ল। "অভিশপ্ত জীবন!"— শুয়ে শুয়েই বলতে লাগল সে— "আর সবচেয়ে মর্মান্তিক হচ্ছে যে, আমাদের এই নিদারুণ কষ্টের শেষে আমরা ভালো কিছু পাব না, নাটকে যেমন হয়, দুঃখের শেষে সুখ, তেমন কিছু হবে না। আমরা এখানে মরব। আর দুটো মেথর এসে আমাদের পা ধরে, টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে। বাস্। কিন্তু কুছপরোয়া নেই। এ জীবনের পরে আমাদের সুদিন আসবে। আমি ভূত হয়ে এদের ভয় দেখাব, এদের জীবন দুর্বহ করে তুলব"—

এই সময় জিতু ফিরে এল। ডাক্তারবাবুকে দেখে হাত বাড়িয়ে বললে, "একটা পয়সা দিন না হুজুর——"

।। আঠারো ।।

যামিনীবাবু জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিলেন। অন্ধকার হয়ে এসেছিল, শীর্ণ পাণ্ডুর চাঁদ উঠছিল দূরে, কিছুদূরে সাদা প্রকাণ্ড জেলটা দেখা যাচ্ছিল। পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা।

"এই তাহলে বাস্তব"— হঠাৎ মনে হল যামিনীবাবুর। ভীত হয়ে পড়লেন তিনি। সবই ভয়ঙ্কর মনে হতে লাগল। চাঁদ, জেলখানা, কাঁটাতার দেওয়া রেলিং, দূরে ইঁটের ভাটায় যে আগুন জলছিল সেই আগুনের হল্‌কা— সমস্তই ভয়ঙ্কর। হঠাৎ মনে হল তাঁর, পিছনে দাঁড়িয়ে কে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। দেখলেন একজন লোক নানারকম মেডেল ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর তাঁর দিকে চেয়ে শয়তানের মতো হাসছে।... যামিনীবাবু নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, কিছুই ভয়ঙ্কর নয়, সবই স্বাভাবিক। ওই চাঁদ, জেলখানা, যে সব লোক গভর্নমেন্টের অনুগ্রহ আর মেডেল পায় তারা, সবাই স্বাভাবিক। কালক্রমে সবই নষ্ট হয়ে ধুলোয় বিলীন হবে। কিছুই কিছু নয়। কিন্তু আবার সহসা হতাশায় তিনি যেন অভিভূত হয়ে পড়লেন। দু'হাতে জানালার গরাদগুলো ধরে ঝাঁকানি দিতে লাগলেন। মজবুত গরাদ নড়ল না। তারপর একটু পায়চারি করলেন। ভাবলেন, না এভাবে দমে যাওয়া ঠিক নয়। চিন্ময়ের কাছে গিয়ে বললেন, "ভাই, বড়ই দমে গেছি। কি করি বল তো—"

"আপনার মায়াবাদ আওড়ান—"

"মায়াবাদ? হ্যাঁ, মনে পড়ছে তুমি একদিন বলেছিলে যে, এদেশে সবাই দার্শনিক, এমন কি চাষা পর্যন্ত। কিন্তু দার্শনিক হলে ক্ষতি কি? মায়াবাদ কি অনিষ্টকর?"

যামিনীবাবুর কণ্ঠস্বর কান্নার মতো শোনালো। "আমাকে ব্যঙ্গ করছ কেন বন্ধু? মায়াবাদের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে বেড়ানো ছাড়া আর আমাদের কি করবার আছে বল? সুখ তো কোথাও নেই। আমি লেখাপড়া শিখেছিলাম, বাবা আমাকে ডাক্তারী পড়িয়েছিলেন, ডাক্তারী 'নোব্‌ল' প্রফেসন! কিন্তু আমি সারাজীবন কি নোব্‌ল কাজ করলাম? দাদের মলম, ম্যালেরিয়ার প্রেসকৃপশন, ফোড়াকাটা আর আপিসের কেরানিগিরি, আর অসংখ্য অসভ্য লোকের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করা। এ ছাড়া আর করেছি কি! উঃ ভগবান, এই কি কপালে লিখেছিলে!"

"আপনি যা তা বলছেন, ডাক্তার হতে যদি আপত্তি ছিল, রাজনৈতিক নেতা হতে পারতেন।"

"না, ভাই, কিছু করবার উপায় নেই। বন্ধু, আমরা দুর্বল... আমি আগে এ সব ভাবতামই না, তর্ক করতাম, যুক্তি নিয়ে আস্ফালন করতাম। কিন্তু জীবনের রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে মুখোমুখি হয়েই কাবু হয়ে পড়লাম আমি—একেবারে শুয়ে পড়লাম। ভাই আমরা দুর্বল, আমরা অসহায়। তুমিও তাই। তুমি বুদ্ধিমান, উদার, মায়ের দুধের সঙ্গে তোমার বংশের গরিমাধারা তোমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে—কিন্তু জীবন আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি কাবু হয়ে পড়েছ। দুর্বল, আমরা সবাই দুর্বল—"

একটা কিসের যেন অভাব অনুভব করছিলেন তিনি অনেকক্ষণ থেকে। তারপর হঠাৎ বুঝতে পারলেন। চা আর সিগারেট।

"আমি এখুনি আসছি"—চিন্ময়কে বললেন তিনি— "ওদের একটা আলো দিতে বলি। অন্ধকারে থাকা যাচ্ছে না, থাকা অসম্ভব।"

যামিনীবাবু এগিয়ে গিয়ে কপাটটা খুললেন। সঙ্গে সঙ্গে নন্দী এসে হাজির হল।

"কোথা যাচ্ছেন? বাইরে যাওয়া চলবে না।"

"আমি বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি। হাসপাতাল কম্পাউন্ডেএকটু বেড়িয়ে আসব।"

নন্দীর মুখের দিকে চেয়ে ঘাবড়ে গেলেন তিনি।

"না, বাইরে যাবার হুকুম নেই। আপনি কি জানেন না?"

নন্দী তাঁর মুখের উপর দড়াম্ করে কপাটটা বন্ধ করে দিয়ে কপাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।

"একটু বেড়িয়ে এলে ক্ষতি কি! এ তো আমার মাথায় ঢুকছে না। আমাকে যেতে দাও নন্দী, আমাকে যেতেই হবে।"

"কেন বৃথা হাল্লা করছেন আপনি"—নন্দীর কণ্ঠস্বরে একটা ভর্ৎসনার সুর ফুটে উঠল।

"এ কি সাংঘাতিক কাণ্ড"—হঠাৎ চিৎকার করে উঠল চিন্ময় সান্যাল—লাফিয়ে উঠল বিছানা থেকে—বাইরে যেতে দেবে না কেন? আমাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করবার কি অধিকার আছে তোমার? গভর্নমেন্টের আইন হচ্ছে বিনা বিচারে কেউ কাউকে আটকে রাখতে পারবে না! এ জুলুম! এ অবিচার।"

"নিশ্চয়ই অবিচার"—চিন্ময়ের সমর্থন পেয়ে যামিনীবাবু যেন একটু জোর পেলেন।

"আমি বেরোতে চাই। আমাকে বেরোতে হবেই। ওর কি অধিকার আছে আমাকে বাধা দেবার। কপাট খোল, কপাট খোল বলছি।"

"ওরে ব্যাটা শুনতে পাচ্ছিস না"—দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে চিন্ময় চিৎকার করতে লাগল— "খোল কপাট, তা না হলে এক লাথিতে ভেঙে ফেলব। বেটা কসাই কোথাকার!"

কপাটের ওপার থেকে নন্দী বলতে লাগল, ''বলে যাও, যা খুশি বলে যাও।''

''কপাট না খোলো তো ডাক্তার ঘোষালকে ডেকে আন। তাঁর সঙ্গে কথা বলব।''

''তিনি কাল আসবেন।''

''ওরা আমাদের কিছুতেই বেরুতে দেবে না''—

চিন্ময় বললে—''আমাদের পচাবে এখানে। মৃত্যুর পর যদি নরক না থাকে তাহলে কি হবে, এই পাষণ্ডগুলো ছাড়া পেয়ে যাবে? বিচার বলে কি কিছুই নেই? ওরে, খোল না কপাটটা। দম বন্ধ হয়ে আসছে যে আমাদের''—তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল চিন্ময়। কপাটে লাথি মারতে লাগল—''আমি এখানে মাথা খুঁড়ে রক্তাক্ত হয়ে মরব। খুনে, খুনে, এরা সব খুনে—''

নন্দী হঠাৎ কপাট খুলে এক ধাক্কায় চিন্ময়কে সরিয়ে দিল একধারে। তারপর যামিনী দত্তকে ধরে শুইয়ে ফেলল বুকে হাঁটু দিয়ে, তারপর এক প্রচণ্ড ঘুষি মারল তাঁর মুখের উপর। যামিনীবাবু কেমন যেন অসাড় হয়ে গেলেন। নন্দী তাঁর পা ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল তাঁকে তাঁর বিছানার কাছে। যামিনীবাবু মুখে কেমন যেন নোনতা স্বাদ পেলেন একটা। তাঁর দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ছিল। তিনি আকুলভাবে হাত নাড়তে লাগলেন। কিন্তু উঠতে পারলেন না। মনে হল কে যেন তাঁকে আরও দুটো ঘুষি লাগাল। যামিনীবাবু শুনতে পেলেন চিন্ময়ও চিৎকার করছে, নন্দী তাকেও ঠ্যাঙাচ্ছে খুব।

তারপর সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না ঘরে ঢুকল, মেঝের উপর জালের মতো ছায়া পড়ল একটা। সমস্তই ভয়ঙ্কর মনে হতে লাগল যামিনীবাবুর। বিছানার উপর রুদ্ধশ্বাসে শুয়ে ছিলেন তিনি, অপেক্ষা করছিলেন, নন্দী আরও বোধহয় মারবে। তাঁর মনে হচ্ছিল তাঁর পেটের ভিতর একটা কাস্তে ঢুকিয়ে কে যেন সেটা ক্রমাগত ঘোরাচ্ছে। বুকের ভিতরও। অসহ্য যন্ত্রণায় বালিশ কামড়ে ধরছিলেন তিনি, দাঁতে দাঁত দিয়ে, দু'হাত মুঠো করে বিছানায় পড়ে ছিলেন। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল তাঁর, বিহ্বল হয়ে পড়লেন তিনি। মনে হল এ লোকগুলোও তো দিনের পর দিন এই কষ্ট পেয়েছে। এখন ম্লান জ্যোৎস্নায় তারা ছায়ার মতো দেখাচ্ছে। গত কুড়ি বছর তিনি কি করে উদাসীন ছিলেন এ সম্বন্ধে? এদের ব্যথা কি বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন কোনওদিন? না, তিনি কিচ্ছু করেননি। এ সম্বন্ধে কোনও ধারণাই ছিল না তাঁর। তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না, তাঁর ধারণাই ছিল না। নন্দীর মতো তাঁর বিবেকও তাঁকে রেহাই দিল না। মনে হল তাঁর পিঠের শিরদাঁড়া দিয়ে বিদ্যুৎ শিহরন বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তাঁর ইচ্ছে হল লাফিয়ে উঠে চিৎকার করি। নন্দী, ঘোষাল, কম্পাউন্ডার, নার্স—সবাইকে খুন করে শেষে নিজে আত্মহত্যা করি। কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে একটি শব্দও বেরুল না। তাঁর পা দুটো অবশ হয়ে পড়ে রইল। রাগে ক্ষোভে দুঃখে শেষে তিনি হাসপাতালের জামাটাকে ছিঁড়তে লাগলেন। ছিঁড়তে ছিঁড়তে শেষে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

।। উনিশ ।।

পরদিন যখন যামিনীবাবুর ঘুম ভাঙল তখন তাঁর মাথা দপদপ করছে, কানের ভিতর ঝিঁঝিঁ শব্দ হচ্ছে অদ্ভুত একটা, আর সর্বাঙ্গে ব্যথা। গত রাত্রের কথা ভেবে তাঁর কোনও লজ্জা হল

না। মনে হল তাঁরই দোষ, তিনি নিজেই কাপুরুষের মতো ব্যবহার করেছিলেন। চাঁদকে তাঁর ভয় করছিল! তাছাড়া এমন সব কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল যা তাঁর মুখ দিয়ে বেরোনো উচিত ছিল না। সাধারণ লোক দুর্বল বলে দর্শনের আশ্রয় নিয়েছে? এটা বলা উচিত হয়েছে কি? কিন্তু এখন তাঁর আর কোনো দুঃখ বা ভয় ছিল না। বেপরোয়া হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কিচ্ছু খেলেন না, অনড়, নির্বাক হয়ে পড়ে রইলেন বিছানায়।

''আমি আর কারো তোয়াক্কা করি না'— ভাবতে লাগলেন তিনি—''কারো কথার আর জবাব দেব না। কিচ্ছু তোয়াক্কা করি না।''

দুপুরের পর সতীশবাবু চা আর মিষ্টি নিয়ে দেখা করতে গেলেন। পাঁচির মা-ও এল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। তার বিষণ্ণ মুখ আর দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল সত্যিই সে যামিনীবাবুকে শ্রদ্ধা করত। ডাক্তার ঘোষাল এক শিশি ঘুমের ওষুধ নিয়ে এলেন। এসে নন্দীকে বললেন, ''চারিদিক সাফসুতরো কর। ফিনাইল দাও! ভালো করে ধুনো দাও।''

সন্ধের দিকে সন্ন্যাসরোগে যামিনীবাবু মারা গেলেন। প্রথমে কম্প হল, তারপর বমি। তাঁর মনে হতে লাগল জঘন্য কি যেন একটা বস্তু তাঁর শরীরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে আঙুলের ডগা পর্যন্ত। পেট থেকে মাথা পর্যন্ত উঠছে, চোখ কান নাক সব যেন ভরে যাচ্ছে। সমস্ত জিনিস যেন পাণ্ডুর হয়ে যাচ্ছে তাঁর চোখের সামনে। তিনি বুঝতে পারলেন মৃত্যু এসেছে। এও তাঁর মনে হল চিন্ময় সান্যাল, সতীশবাবু এবং আরো লক্ষ লক্ষ লোকে অমরত্বে বিশ্বাস করে। সত্যি এরকম কিছু আছে কি? ইহলোকের পর পরলোক আছে? কিন্তু এ নিয়ে আর বেশি ভাববার ইচ্ছা হল না তাঁর। এমনি একবার মনে হল শুধু। কয়েকদিন আগে একটা বই পড়েছিলেন। তাতে হরিণের কথা ছিল। তাঁর মনে হল একদল হরিণ যেন তাঁর চোখের সামনে দিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে ঃ তারপর দেখলেন একটি সুন্দরী মেয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছে; তারপর পোস্টাপিসের জানালার সেই বুড়ি মেয়েটা, যে চিঠিটা রেজিস্ট্রি করতে এসে ধমক খেয়েছিল সতীশবাবুর কাছে, তাকেও দেখতে পেলেন যেন!..তারপর সব মিলিয়ে গেল, সব অন্ধকার, যামিনীবাবু সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

হাসপাতালের দুটো মেথর এসে তাঁর হাত পা ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে আর একটা ঘরে রাখল।

তারপর সৎকার সমিতিকে খবর দেওয়া হল। জন ছয়েক লোক এসে একটা দড়ির খাটিয়ায় তুলে, শাদা চাদর ঢাকা দিয়ে, কিছু ফুলপাতা সাজিয়ে বলহরি হরিবোল করতে করতে নিয়ে গেল তাঁকে শ্মশানে। সতীশবাবু শ্মশানের সব খরচ বহন করলেন। পাঁচির মা কাঁদতে কাঁদতে শ্মশান পর্যন্ত গেল।

এ পি. শেখভের 'ওয়ার্ড নম্বর সিক্স' গল্পের ভাবানুবাদ

ত্রিবর্ণ

।। এক ।।

গণেশ হালদার ডায়েরি লিখছিলেন।

"যে দেশে আমাদের বাড়ি ছিল, যে দেশের ক্ষেত-খামার, পুকুর-বাগান, যে দেশের আকাশ-বাতাস, ফুল-ফল, পশু-পক্ষী, নদী-প্রান্তর, যে দেশের লোকজন (এমন কি মুসলমানরাও) আমাদের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ছিল, সে দেশ এখন আমাদের দেশ নয়। আমরা সে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছি। ভারতবর্ষের গণ্যমান্য লোকেরা একদিন আমাদের ভালোর জন্যেই নাকি দেশ ভাগ করে নিজেরা গদিতে বসেছিলেন। তাঁরা এখনও গণ্যমান্যই আছেন, কিন্তু আমরা, যারা নগণ্য, তারা আরও নগণ্য হয়ে গেছি। এমন কি আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষায় কারও সঙ্গে কথা বলি, সবাই হাসে, ঠাট্টা করে। তাই আপনাদের ভাষাতেই আমার ডায়েরি লিখছি, আপনাদের যদি কেউ কখনও এ ডায়েরি পড়েন সহজে বুঝতে পারবেন।

আমাদের দুঃখ-দুর্দশার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে আপনাদের মনে অনুকম্পা সঞ্চার করবার বাসনা আমার নেই। লিখছি সময় কাটাবার জন্যে, আর কিছু করবার নেই বলে। স্থানীয় স্কুলে শিক্ষকতা করি। সকাল-সন্ধ্যা হাতে অনেক সময় থাকে। যা মনে আসে লিখে যাই। আমাদের দুর্দশার অনেক বিবরণ কাগজে বেরিয়েছে, আমাদের সম্বন্ধে সহানুভূতিপূর্ণ অনেক প্রবন্ধও আমি পড়েছি, আমাদের মতো গৃহহারাদের পুনরায় গৃহস্থ করবার জন্য সদাশয় গভর্নমেন্টেরও চেষ্টার অন্ত নেই, খরচও নাকি অনেক করছেন তাঁরা, এ সবাই জানে, এ-ও জানে যে, তবু আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই আছি। এ দেশের উপর যেন আমাদের কোনও দাবি নেই আমরা সকলেরই কৃপা-পাত্র, আমরা কারও আপন-জন হতে পারিনি, এমন কি যাঁরা আমাদের রক্তসম্পর্কের আত্মীয় তাঁরাও আমাদের আপন-জন বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন। তাঁরাও আমাদের দূর থেকে দয়া করেন, কাছে টেনে নিতে চান না। না, কারও মনে করুণা উদ্রেক করবার ইচ্ছা আর আমার নেই। ওই সব লোক-দেখানো বা কর্তব্য-প্রণোদিত করুণাব উপর ঘৃণা জন্মে গেছে। গাছের ফুলকে বৃন্তচ্যুত করে শৌখিন ফুলদানিতে যাঁরা তাদের জলে ডুবিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চান, তাঁরা শৌখিন দয়ালু লোক হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা ফুলের আপন লোক নন। কিন্তু তবু এই অনাত্মীয় শত্রুভাবাপন্ন আত্মীয়দের মধ্যেই বাস করতে হচ্ছে। প্রাণপণে চেষ্টা করতে হচ্ছে আমার যোগ্যতা প্রমাণ করবার, এ দেশের উপর আমারও যে একটা দাবি আছে, আমি যে কতকগুলো খামখেয়ালী বা স্বার্থপর লোকের হস্তের ক্রীড়নকমাত্র নই—এই বোধটা জাগ্রত রাখবার।

হ্যাঁ, আমি যে যোগ্য সেইটে প্রমাণ করবার জন্যেই উন্মুখ হয়ে আছি। এ যোগ্যতার প্রমাণ সংগ্রহ করা সহজ নয়। জমিটা যে উর্বর তা প্রমাণ করবার জন্যে যুক্তির দরকার হয় না। যখনই সে জমিতে সবুজ ঘাস গজায় তখনই বোঝা যায় সে জমির উর্বরতা আছে, ভালো সার দিলে সে জমিতে ফসলও ফলানো যাবে। কিন্তু আমার জীবনের মরুভূমিতে একটি তৃণাঙ্কুরও গজায়নি এখনও। বিস্মিত হয়ে ভাবি, কেন গজায়নি! আমার জীবনের সব রস কি নিঃশেষে

শুকিয়ে গেছে? আমার জীবন তো সত্যই মরুভূমি ছিল না। অনেক আশা, অনেক আকাঙক্ষা, অনেক স্নেহ, অনেক ভালোবাসা, অনেক বিশ্বাস, অনেক স্বপ্ন... না, মনে হচ্ছে আমি যেন নিজের উপর রাশ টেনে রাখতে পারছি না।

আমার জীবন কেমন ছিল তার একটু নমুনা দিচ্ছি। পদ্মার ধারে একটি ছোট গ্রামে বাড়ি ছিল আমার। গ্রামের নাম না-ই জানলেন। আমাদের বাড়ি পাকা ছিল না। মাটির দেওয়াল, টিনের ছাদ। বাড়ির উঠান ছিল প্রকাণ্ড। উঠানের চারধারে ঘর। পুবের কোঠা, পশ্চিমের কোঠা, দক্ষিণের কোঠা আর উত্তরের কোঠা। তা ছাড়া ছিল ঠাকুরঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর। রান্নাঘর দু'রকম—আমিষ এবং নিরামিষ। বাড়ির চারিধারে অনেকখানি জমি। সামনে পুকুর, পিছনে পুকুর। তা ছাড়া একটা বাগান। সে বাগানে না ছিল কি! আম, জাম, কাঁঠাল, গোলাপজাম, জামরুল, গাব, কাউ, চালতা, লেবু, সফেদা, সাপটু, পেয়ারা সব ছিল। সেই বাগানে জন্মাত নানা জাতের অজ্ঞাত-কুল-শীল লতা, আর তাতে ফুটত কত অদ্ভুত সুন্দর ফুল। সেই বাগানে কত নিস্তব্ধ দুপুর কাটিয়েছি, আমি আর আমার বোন বুলি। গাছে উঠে ফল পেড়ে খেয়েছি, অজানা বন্যলতা ফুল গুঁজে দিয়েছি বুলির খোঁপায়। পাখির বাসার সন্ধানে ফিরেছি উদ্‌গ্রীব হয়ে। জলে নেমে গামছা দিয়ে ছোট ছোট মাছ ছেঁকে তুলেছি খালের জল থেকে, ছোট ছোট মাছও ধরেছি পুকুরে বসে ছিপ দিয়ে। বুলি যখন একাগ্র দৃষ্টিতে নীরবে ফাতনাটার দিকে চেয়ে বসে থাকত তখন তাকে মনে হত যেন মাছরাঙা পাখি। জামদানী ঢাকাই শাড়ি আঁটসাঁট করে পরা, খোঁপায় একগোছা মৌরী ফুল, ভুরু আর নাক ঈষৎ কোঁচকানো, একাগ্র তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফাতনার উপর, তারপর ছিপ ধরে আকস্মিক টান এবং বঁড়শির মুখে জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব— বাটা বা পুঁটিমাছের ছটফটানি। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। ওর নাম ছিল বুলবুলি, কিন্তু ওকে আমি মাছরাঙাই ভাবতাম মনে মনে। আর একটা কথাও মনে পড়ছে। বেতবন থেকে পাকা বেত-ফল এনে সে জাঁকাতো নানারকম মসলা দিয়ে। খিড়কি পুকুরের ঘাটে বসে তাই তারিয়ে তারিয়ে খেতাম দুজনে। বুলি পা নাচিয়ে নাচিয়ে খেত, আর খেতে খেতে চোখমুখ কুঁচকে যেভাবে চাইত আমার দিকে ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে তা এখনও ভুলিনি।

আর মনে পড়ছে মা-কে। স্বয়ং লক্ষ্মীকে কখনও দেখিনি, আমার মায়ের সঙ্গে লক্ষ্মীর তুলনা চলবে কি না জানি না। কিন্তু আমার মা যা ছিলেন তা বর্ণনার সীমায় ধরবার ক্ষমতা আমার নেই। টকটকে লাল-পেড়ে গরদ পরে তিনি যখন ঠাকুরঘরে রাধাবল্লভের সামনে পুজো করতেন—তাঁর চারপাশে পূজার উপচার আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি—নানারকম ফুলের মালা, চন্দন, ধূপ, শ্বেতপাথরের থালায় নৈবেদ্য, রুপোর ছোট ছোট থালায় কতরকম ফল, রূপোর গ্লাসে গ্লাসে জল, মধু আর দুধ, চকচকে তামার পরাতে অজস্র ফুলেব রাশি—সে যে কি অবর্ণনীয় মহিমা—সে মহিমা রাধাবল্লভের, না মায়ের, না আমার কল্পনার তা জানি না—কিন্তু তা অপরূপ। হ্যাঁ, যদিও এই প্রসঙ্গে অবান্তর বলে মনে হবে, কিন্তু এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সেটা—গোয়ালন্দগামী স্টীমারের ভোঁ। মা যখন পূজা করতেন তখন পদ্মার উপর দিয়ে স্টীমারখানা যেত, ভোঁ দিয়ে যেত, সাড়া দিয়ে যেত, মাকে যেন অভিনন্দন জানিয়ে যেত। যেন বলে যেত, আমিও বন্দরে চলেছি, তুমিও চলেছ, আবার দেখা হবে। রোজই ডাক দিয়ে যেত স্টীমারটা। গভীর নিশীথে ঘুমের ঘোরেও তার ডাক শুনেছি। এখনও

হয়তো ডাকে সে। আমরা আর শুনতে পাই না। মা কি শুনতে পান? কে জানে। মা এখন কোথায়? বুলিই বা কোথায়? এই দুটো প্রশ্ন অনেক দিন আমার দিবসের শান্তি এবং রাত্রের নিদ্রা হরণ করেছে, কিন্তু এখন আর করে না। মনের সে শাণিত ভাবটা ভোঁতা হয়ে গেছে। একদিন যা এক কোপে মানুষের মাথা কেটে ফেলতে পারত এখন তা সামান্য তরকারিও কাটতে পারে না। সব যেন অসাড় হয়ে গেছে। যারা আমাদের দেশের সর্বনাশ করেছে তাদেরই অধীনে চাকরি করছি, যে দেশের লোকেরা পর ভেবে আমাদের বারবার পায়ে ঠেলছে সেই দেশের লোকেদের সঙ্গেই আত্মীয়তার দাবি করছি এবং আমার এই দাবিটা যে মুখোশের দাবি নয়, অন্তরের দাবি, তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করছি নিজের কাছেও। কিন্তু দাবি কি নেই? ভালোবাসার দাবিই তো—কিন্তু না, এ দাবির কথা মুখ ফুটে বলবার নয়। যে অতীত আমার জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে পুড়ে গেছে, যার দগ্ধাবশেষের সম্বলও আমার কাছে আর নেই, যার কয়লা আর ছাইগুলো পর্যন্ত নিঃশেষে গ্রাস করেছেন মহাকাল—আমার সেই অতীত জীবনে যখন বাস করতাম তখন তো এ ধরনের দাবির কথা মনেও হয়নি কখনও—মাছেদের যেমন মনে হয় না জলের উপর দাবির কথা যতক্ষণ তারা জলের ভিতর থাকে, জল থেকে টেনে তুললেই তাদের মনে হয়, এ কি হল—এ কি দুর্দৈব—এ কি চক্রান্ত! ডাঙায় উঠে ছট্‌ফট্ করতে করতে হয়তো কিছুক্ষণের জন্য তার মনে হয়, যেখানে এসে পড়েছি, সেখানে কি আমার কোনও দাবি আছে এবং এ প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর পাওয়ার আগেই হয়তো তার মৃত্যু হয় এবং ঝাল ঝোল অম্বল কাটলেট ফ্রাই চপে রূপান্তরিত হয়ে হয়তো সে— না খেই হারিয়ে ফেলেছি। দাবির কথা আর তুলব না। একটা কথা মনে হচ্ছে—যখন আমার বাড়িতে পিশাচদের তাণ্ডব চলছিল তখন আমি সেখানে ছিলাম না। বিলেতে তখন আমি ডিগ্রি-অর্জনের চেষ্টা করছিলাম। বিধবা মায়ের সমস্ত গয়না বিক্রি করে বিলেত যাওয়ার দুর্মতি আমার কেন হয়েছিল বারবার এই কথাটাই মনে হয় এখন। কিন্তু যদি সে সময়ে আমি বাড়িতে থাকতাম তা হলে কি হত? ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিতাম? ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতাম? না, কোথাও পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতাম? ঠিক জানি না, কি করতাম। আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে কে কি করবে তা আগে থাকতে কেউ ঠিক করতে পারে কি? অনেকগুলো সম্ভাবনা থাকে, যে-কোনও একটাকে সে আঁকড়ে ধরে। আঁকড়ে ধরে শেষ পর্যন্ত বাঁচবে বলেই। কখনও বাঁচে, কখনও বাঁচে না। বুলি কি বেঁচে আছে? আমার মা? কোথায় অবলুপ্ত হয়ে গেল তারা। আমিও তো অবলুপ্ত হয়ে গেছি আমার গ্রামের লোকদের কাছে। হরি, আবদুল, ফজলু, মিঠি, বদা এরা কি আমার খবর রাখে আর? মিঠিকে আমি যে বাঁশিটা দিয়েছিলাম সেটা বাজাবার সময় আমার কথা কি তার মনে পড়ে? কিন্তু আমি তো দিব্যি বেঁচে আছি। বুলি আর মা কি তেমনি কোথাও... সহসা মনে হচ্ছে, বেঁচে আছে কি না তা জানবার জন্যে আমার ততটা আগ্রহ নেই, আমার কৌতূহল কেমন করে বেঁচে আছে তাই জানবার জন্য। অর্থাৎ তারা না, কথাটা স্পষ্টভাবে ভাবতেও ভয় করে। অথচ কেউ যদি প্রশ্ন করে ভয়টা কিসের, ওসব ঝুটো কুসংস্কার যে কতটা মূল্যহীন তা কি তুমি জান না, বিলেতে তুমি কি দেখনি যে, যে সমাজকে আমরা আদর্শ করেছি, হিন্দুরা যাকে সতীত্ব বলে সে জিনিসের কোনও কদর নেই সে সমাজে? সেখানে রাস্তায় ঘাটে পার্কে গার্ডেনে নর-নারীর

মিলনের অবাধ সুযোগ কি দেখে আসনি তুমি? জাত নিয়ে, সতীত্ব নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটা কি প্রাদেশিকতা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার মতো হাস্যকর জিনিস নয় একটা? এসব নিয়ে কিছু ভাবা অনর্থক, কিছু লেখা বৃথা বাগাড়ম্বর মাত্র। এ বিষয়ে একটিমাত্র সত্যই আমার কাছে একমাত্র সত্য—কাঁটার মতো বিঁধে আছে কথাটা বুকের ভিতর। সে কাঁটা তোলবার উপায় নেই, কাউকে দেখাবারও উপায় নেই।

...হঠাৎ চীনে মুরগি দুটো ডেকে উঠল তারস্বরে। চীনে মুরগিরা যখন ডাকে মনে হয় আর্তনাদ করছে। অন্য মুরগিরাও ডাকতে শুরু করেছে, কোলাহল করছে, বিশেষ করে লাল বড় মোরগটা। তারপর খুব সরু গলায়— "বাবু, মুল্‌গি আণ্ডা দেলকে, আণ্ডা দেলকে—"

ডাক্তারবাবুর বুড়ী দাইয়ের নাতি বিজয়ের গলা। উঠতে হল। মুরগির ঘরের চাবি আমার কাছে। উঠে বেরিয়ে এলাম আর একটা জগতে, বাইরের জগতে. যে জগতে এখন আমি আছি।

এ জগৎটা খারাপ নয়। অতি সুন্দর। শহর থেকে দূরে, গঙ্গার তীরে। ছেলেবেলা উদ্দাম পদ্মার তীরে কেটেছে, যৌবনে টেম্‌সের সুসজ্জিত সৌন্দর্য্য উপভোগ করেছি, জীবনের আসন্ন অপরাহ্ণে এসেছি গঙ্গার তটে। আমি যেখানে আছি সেখানে গঙ্গা দুকুল-প্লাবিনী নয়, সন্ন্যাসিনী। তার বিরাট খাতে কখনও জল থাকে, কখনও থাকে না। শীতকালেই সে বৈরাগিনীর মূর্তি ধারণ করে। সামান্য শীর্ণধারা বইতে থাকে এদিকে ওদিকে, তবু তারই চারধারে নামে শীতের অতিথি পাখিরা। খঞ্জন, কাদাখোঁচার দল, সোআলোর ঝাঁক, কখনও কখনও ছোট-বড় হাঁসও নানারকম। এই হাঁসেরা আসে গভীর রাত্রে। অন্ধকারে-শিহরন-জাগানো তাদের ডাক শুনে সেটা বুঝতে পারা যায়। কাছাকাছি মানুষ এলেই কিন্তু উড়ে যায় অদ্ভুত পাখার শব্দ করে। বন্দুকধারী মাংসাশী মানুষদের ওরা চিনে ফেলেছে। মানুষরাই মানুষদের কাছ থেকে পালায়, পাখিরা তো পালাবেই। জলের স্রোতে অসংখ্য ছোট ছোট মাছ, প্রতিবেশী বালক-বালিকাদের মনের এবং দেহের খোরাক জোগায়। ওদের দেখে মনে পড়ে যায় আমার ছেলেবেলার কথা। মনে পড়ে যায় মাছরাঙাকে। গঙ্গার চরে শুধু বালি নয়, পলিমাটিরও প্রাচুর্য খুব। শীতকালে জমি চষে, গম যব বুট বুনে দেয়, কিছুদিন পরেই ধূসর চর শ্যামল হয়ে ওঠে। তারপর যখন শস্য পাকে তখন চরের আর এক রূপ। দিগন্তের নীলে গিয়ে মিশেছে পাকা ফসলের তরঙ্গিত স্বর্ণ-কান্তি। সকালে-বিকালে ভরদ্বাজ পাখির আকাশ-বন্দনা, কৃষকের কণ্ঠে প্রাণ-খোলা গান, আশ-পাশের গ্রাম থেকে ছেলেমেয়েদের লুকিয়ে ফসল চুরি করা, স্তূপীকৃত কাটা ফসলের রূপ, গরু দিয়ে ফসল মাড়ানো, তার চারধারে শুধু মানুষ নয়, শালিক-কাক-ফিঙেদের ভিড়, মাথার উপর নীলকণ্ঠের কর্কশ-কণ্ঠের প্রেয়সী-বন্দনা, নিঃশব্দ দুপুরে চিল আর শকুনদের নিঃশব্দ আকাশ-পরিক্রমা—এই সমস্তটা মিলিয়ে গঙ্গার চরের যে শোভা আমার মনে আঁকা হয়ে গেছে, তা গঙ্গারই শোভা, কিন্তু সে গঙ্গা প্রবলা প্রত্যক্ষবর্তিনী নয়, তা রহস্যময়ী নেপথ্যবাসিনী, গঙ্গা এখানে যেন উদাসিনী সন্ন্যাসিনী, কর্মচঞ্চল্য তরুণী নয়। তার রাজত্ব সে যেন ছেড়ে দিয়েছে চরকে, তার চিরপরিচিত রূপ লুকিয়ে দেখা দিয়েছে যেন

নূতন রূপে। দেখা দিতেই হবে, রূপ লুকিয়ে রাখা যায় না। চরের ওপারেই কিন্তু গঙ্গার সাবেক রূপ, তরঙ্গমুখর স্রোতস্বিনী। লোকে সেখানে স্নান করছে, পান করছে তার জল, পূজার অর্ঘ্য রচনা করছে, সাঁতার কাটছে, নৌকা ভাসাচ্ছে। একই গঙ্গার দুই রূপ। গঙ্গার ওই তরঙ্গমুখর রূপ মাঝে মাঝে দেখব বলে বেরিয়ে পড়ি, হেঁটে চর পার হয়ে যাই। শুধু গঙ্গা দেখব বলে নয়, মাছরাঙা দেখব বলে। ওখানে মাঝে মাঝে মাছরাঙা দেখা যায়।

বিজয় সরু গলায় আবার বললে, "বাবু, আণ্ডা দেলকে মুলগি।"

"চল, কোথায় দেখি।"

বিজয়ের বয়স চার বছর। তার দৈনন্দিন কর্মসূচী বিবিধ এবং বিচিত্র। যে-কোনও ছুতোয় জল ঘাঁটা, ধুলো ঘাঁটা, বারবার গুলি আর বল হারানো, তার বোন শালিয়ার সঙ্গে খুনসুটি করা, লুকিয়ে পালিয়ে গিয়ে তার পিসি রুক্‌মিনিয়ার কাছে খাবার খেয়ে আসা (কখনও কখনও মারও), ডাক্তারবাবুর মোটরটা যখন তাঁর ড্রাইভার বার করে পরিষ্কার করে তখন তার চারদিকে ঘুরঘুর করা এবং সুযোগ পেলেই তাতে চড়ে বসা, গিনিপিগ আর খরগোশের খাঁচার কাছে বসে তাদের সঙ্গে আলাপ করা এবং তাদের উচ্ছিষ্ট ছোলা পেলে এদিক-ওদিক চেয়ে সেটা মুখে পুরে দেওয়া, একটা ভাঙা তোবড়ানো ছোট টিনের মোটরে দড়ি বেঁধে সেটা টেনে নিয়ে বেড়ানো, কিন্তু তার সবচেয়ে বড় কর্তব্য মুরগির ঘর থেকে ডিমটি সংগ্রহ করে মাইজিকে দিয়ে আসা। মাইজি মানে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী। মুরগির ঘরের চাবিটা থাকে আমার কাছে, কারণ তার সঙ্গে গেটের চাবিটাও থাকে এক রিং-এ।

ডাক্তারবাবুর বাড়ির প্রকাণ্ড কম্পাউন্ডের এক ধারে যে 'আউট-হাউস'টা আছে তাতেই আমি থাকি। কিছুদিন আগে যখন এখানে চাকরি নিয়ে এসেছিলাম, তখন বাড়ি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ডাক্তারবাবু তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁর 'আউট-হাউস'টাতে। আমি ভাড়ার কথা তুলেছিলাম, কিন্তু ডাক্তারবাবু বললেন, আমি বাড়িভাড়া দিই না। তবে আপনি যতদিন খুশি থাকতে পারেন। আমি বললাম, এভাবে কি থাকা যায়। তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, তা হলে থাকবেন না। তাঁর চোখে একটা চাপা কৌতুকহাস্য যেন লক্ষ করেছিলাম, কিন্তু তখন আর কিছু বলতে সাহস পাইনি।

ডাক্তারবাবু লোকটি একটু অদ্ভুত ধরনের। তাঁর সঙ্গে বেশি কথা কইতে সাহস হয় না। প্রায় সমস্ত দিনই বাইরে থাকেন। রোগীর সন্ধানে ঘোরেন না, রোগীরাই তাঁর সন্ধানে ঘোরে, তিনি থাকেন ঘাটে মাঠে পথে প্রান্তরে। ডিস্‌পেন্সারিতে যান অবশ্য খানিকক্ষণের জন্য, যদি দৈবাৎ সে সময় রোগী থাকে, তার চিকিৎসাও করেন, কিন্তু রোগীর জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে তাঁকে কেউ কখনও দেখেনি। প্রথম প্রথম আমার অবাক লেগেছিল, কিন্তু, কারণটা কখনও জিজ্ঞাসা করতে সাহস করিনি। একদিন তাঁরই এক বন্ধু এসে এ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তাঁর সঙ্গে। আমি তখন তাঁর ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে আলোচনাটা শুনেছিলাম। শুনে আরও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল ইনি বোধ হয় আমাদের মতো লোকের নাগালের বাইরে থাকেন। বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি প্র্যাকটিস্ যখন ছেড়ে দাওনি তখন রোগীদের অমন করে অবহেলা কর কেন? ডাক্তারবাবু হেসে বললেন,

রোগীদের মধ্যে চিকিৎসা-ক্রেতা খুঁজি না, খুঁজি প্রণয়ী বা প্রণয়িনী। আমার মনের কথা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অনেক আগে বলে গেছেন— 'যে জন আমার লাগি উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষিয়া থাকে, সেই ধন্য করিবে আমাকে।' যারা ঠং ঠং করে ডাক্তারের ফি গুনে দিয়ে মনে করে ডাক্তারের মাথা কিনে নিলুম, তারা কখনও আমার রোগী হবে না। যেসব ঘাটে হাজার হাজার ডাক্তার বিদ্যের বুদ্ধির ডিগ্রীর ছিপ ফেলে নিজের নিজের ফাতনার দিকে সাগ্রহে চেয়ে আছে সেসব ঘাটের ত্রিসীমানাও আমি মাড়াব না। ছিপ ফেলার ইচ্ছেই নেই আমার। রোগী আমাকে খুঁজবে, প্রয়োজন তার। বন্ধু বললেন, কিন্তু এ মনোভাব নিয়ে বসে থাকলে ব্যবসা চলে না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন ডাক্তারবাবু, আমি ডাক্তার, বেনে নই। আমার ডাক্তারির উপর যাদের আস্থা আছে, তারা আমার জন্য অপেক্ষা করবে, অপেক্ষা করেও যদি না পায়, আবার ফিরে আসবে। এতে টাকা কম পাওয়া যায়, কিন্তু আনন্দ অজস্র। ওইটেই আমি চাই। আমার বাবার কাছে এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার দৈনন্দিন সংসারযাত্রার সম্বল তিনি রেখে গেছেন। উনুনে হাঁড়ি চড়িয়ে আমাকে চাল ডাল কেনবার পয়সা রোজগার করবার জন্য বেরুতে হয় না। আমি সারা জীবন যদি কিছুই না রোজগার করি তা হলেও আমার চলে যাবে। তাঁর বন্ধু তখন প্রশ্ন করলেন, কিন্তু তোমার সময় কাটে কি করে? বাড়িতে তো তোমাকে পাওয়া যায় না। আবার হেসে উত্তর দিলেন ডাক্তারবাবু, ঘুরে বেড়াই মনের আনন্দে, চোখ কান খোলা রেখে। তাতে কি যে আনন্দ তা তোমাদের বোঝাতে পারব না।

এই অদ্ভুত প্রকৃতির খামখেয়ালী লোকটির আওতায় আমি বাস করি। দশটা পাঁচটা স্কুল করি, বাকি সময়টা এখানেই কাটাই। কারও সঙ্গে আলাপ করতে সাহস পাই না। ভয় হয় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু বলে পাছে কেউ করুণা করে। কিন্তু কয়েকদিন পরেই করুণা তাড়া করে এসে আমার ঘরে ঢুকল। প্রথম প্রথম হোটেলে খেয়েছিলাম কয়েকদিন। কিন্তু একদিন ডাক্তারবাবুর বুড়ী ঝি এসে বললে, মাইজি বললেন, আপনি আজ থেকে এখানেই খাবেন। হামি আপনের খানা দিয়ে যাব। কুছ তক্‌লিফ হোবে না। আপনি হোটেলে খাবেন না, ওখানে তর্কারিতে খুব মশালা দেয়, ভাত ভি শকত্ থাকে। ওখানে নীরদবাবু খেতেন, পেটের অসুখে তিনি খতম হয়ে গেলেন। আপনি ওখানে আর খাবেন না, মাইজি মানা করে দিয়েছে।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রীকে আমি কখনও দেখিনি। তিনি বোধ হয় আধুনিকা নন, বাইরে কখনও বেরোন না। অসূর্যম্পশ্যা হয়তো নন, কিন্তু গোঁড়া অন্তঃপুরিকা। তাঁর ছেলেমেয়ে হয়নি। বিয়েও শুনেছি অল্পদিন হয়েছে। আপাতত বুড়ী ঝিয়ের মাতৃহারা নাতি-নাতনীদের নিয়েই তাঁর সংসার। তা ছাড়াও আছে জন দুয়েক চাকর। তারাও বাড়ির পরিজনের শামিল। আর আছে মুরগি, কুকুর, গিনিপিগ, খরগোশ, ভেড়া আর গরু। গিনিপিগ, খরগোশ আর ভেড়া ডাক্তারবাবুর ল্যাবরেটরির। তিনি মাঝে মাঝে এদের রক্ত নেন রোগীদের রক্ত পরীক্ষা করবার জন্য। অবশ্য তা কচিৎ। কারণ, রোগীরা প্রায়ই তাঁর নাগাল পায় না।

বুড়ী ঝিয়ের মারফত ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর প্রস্তাব শুনে আমি প্রথমে অবাক এবং পরে ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। আত্মসম্মান-শজারুর কাঁটাগুলো খাড়া হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিলাম ডাক্তারবাবুকে বলব, 'আমার আর এখানে থাকা পোষাচ্ছে না। আপনি বাড়িভাড়াও নেবেন না, তার উপর বিনা পয়সায় খেতেও দেবেন, এত দয়া আমি বরদাস্ত করতে পারব না। আপনি আমার জন্য

যা করেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এভাবে চিরকাল চলতে পারে না। আপনি হয় আমাকে পেইং গেস্ট করে রাখুন, না হয় আমাকে ছেড়ে দিন, আমি অন্য একটা আস্তানা খুঁজেনি। এখানে 'চন্দ্রগুপ্ত' হোটেলে একটা ঘর খালি আছে শুনেছি।'

কিন্তু দেখলাম এ কথা ভাবা যত সহজ, কাজে পরিণত করা তত সহজ নয়। ডাক্তারবাবু সকালের দিকে অবশ্য বাড়িতে থাকেন, দশটার আগে বেরোন না কোথাও, যতক্ষণ থাকেন বাড়ির বাইরে মাঠেই থাকেন, কিন্তু তাঁর চতুর্দিকে এমন একটা অদৃশ্য দুর্ভেদ্য দেওয়াল সর্বদা তাঁকে ঘিরে থাকে যে, সে দেওয়াল পেরিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া শক্ত। সাধারণত এ সময় তিনি তাঁর জন্তুজানোয়ারদের নিয়েই থাকেন। তাদের সঙ্গে কথা কন। প্রায়ই ইংরেজীতে।

"Hallo, Jamboo, what is your opinion about things in general?"

'কি হে জাম্বু, দুনিয়ার হাল-চাল সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি রকম?'

তাঁর উচ্চকণ্ঠের এ উক্তি প্রায়ই শোনা যায়। জাম্বু তাঁর পোষা কুকুর। স্প্যানিয়েল জাতের। গা ভরতি কুচকুচে কালো লোম। ভালুকের মতো দেখতে ছিল বলে ডাক্তারবাবু নাকি ওর নাম রেখেছিলেন জাম্বুবান। শুনেছি জাম্বুবানের এককালে খুব প্রতাপ ছিল। কিন্তু এখন স্থবির। বোধ হয় কানেও শুনতে পায় না। কিন্তু ডাক্তারবাবু যা বলেন তা বুঝতে পারে। কারণ, দেখা যায় ওর মুখে অদ্ভুত একটা স্মিত হাস্য ফুটে উঠেছে, ধীরে ধীরে ল্যাজ নাড়ছে। ডাক্তারবাবু যখন ওর মাথা চাপড়ে আদর করেন— 'জাম, জাম, জামটু জামলিশ''— তখন ও যেন বিগলিত হয়ে যায়, চোখের দৃষ্টি থেকে স্নেহ যেন ঝরে পড়ে, তারপর হঠাৎ মাথাটা নেড়ে কান চট্‌পট্ করে হেঁচে ফেলে সে। ওইটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিশেষ ভঙ্গি। ডাক্তারবাবু যখন জাম্বুকে আদর করেন তখন ভুটানটা তাঁর মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তার ভাবটা যেন, আমার দিকে মন দেবে কখন। ভুটান ছোট্ট কুকুর, কিন্তু অদ্ভুত সুন্দর। খাঁদা নাক, চ্যাপ্টা মুখ, গা ভরতি সাদায় কালোয় লোম। ল্যাজটি ঠিক ক্রিসানথিমাম্ ফুলের মতো, সর্বদাই নড়ছে।

ডাক্তারবাবু এই সব নিয়ে এমন তন্ময় হয়ে থাকেন যে, তাঁর কাছে গিয়ে নিজের কথা বলতে সঙ্কোচ হয়। একদিন তাঁর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু মনে হল তিনি যেন আমাকে দেখতেই পেলেন না, মনে হল তিনি যেন অনেক দূরে আছেন। এইটেতেই আমার আরও বেশি কষ্ট হয়। আমি যে তাঁর বাড়িতে তাঁরই আমন্ত্রণে তাঁর কাছাকাছি আছি, তাঁর আশ্রয়ে নিজেকে সার্থক করে তুলতে চেষ্টা করছি, সেটা যেন তিনি লক্ষ্যই করেন না। আমাব অস্তিত্বই তিনি যেন স্বীকার করতে চান না, এইটেতেই আমার আত্মসম্মানে আরও আঘাত লাগে। যে দেশ একদিন আমার নিতান্ত আপন ছিল আজ দেখছি তা আর আমার নয়, তা পরের। অস্ট্রেলিয়া, ইংলন্ড, আমেরিকাতে গিয়ে বরং বাস করতে পারি, কিন্তু পাকিস্তানে গিয়ে বাস করা আর সম্ভব নয়। কোথায় কি যেন ছিঁড়ে গেছে, আর জোড়া লাগবে না। যে মুসলমানদের কখনও পর ভাবতে পারিনি, তারা আজ পর। বিতাড়িত হয়ে এখন আমরা যে হিন্দুস্থানের লোকদের আপন করে নিতে চাইছি তারা যদি ভদ্রভাবে আশ্রয় না দেয় তা হলে আমরা যাবো কোথায়? ডাক্তারবাবুর মতো লোক কুকুরের সঙ্গে গল্প করেন, কিন্তু আমার দিকে একবার ফিরে চাইতেও তাঁর ইচ্ছা হয় না। যে অনুকম্পাভরে তিনি রাস্তায় ভিখারীকে

একটা পয়সা ছুঁড়ে দেন বোধ হয় তার চেয়ে বেশি অনুকম্পাভরে তিনি আমাকে থাকতে দিয়েছেন খেতে দিতেও চাচ্ছেন। অথচ আমার সঙ্গে একটা কথাও বলেন না। আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে এটা কি সহ্য করা যায়? আমিও তো শিক্ষিত লোক, তাঁর মনোযোগের উপর আমার একটু দাবিও কি নেই!

একদিন মরিয়া হয়ে এগিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। তিনি তখন ভুটান নামক ছোট্ট জাপানী কুকুরটাকে নিয়ে মেতে ছিলেন।

'ভুটুন্, ভুটুন্, ভুট্‌নি ভুটুন্' বলে টুসকি দিচ্ছিলেন। আর ভুটান তার পিছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে নাচছিল।

"আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।" সসঙ্কোচে এগিয়ে গিয়ে বললাম। তিনি এমনভাবে আমার দিকে চাইলেন যেন আমাকে এর আগে আব কখনও দেখেননি। খানিকক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, "ও আপনি! কি বলবেন বলুন।"

এরপর খানিকক্ষণের জন্য বাক্‌সঙ্কট হল আমার। কিভাবে কথাটা বলব তা সহসা ঠিক করতে পারলাম না;

"কি বলবেন, বলুন!"

একটু ইতস্তত করে বললাম, "আপনার এখানে এরকমভাবে কতদিন থাকব?"

"কি রকম ভাবে?"

"আপনার অনুগৃহীত হয়ে। বিনামূল্যে আপনার বাড়িতে থাকবার খাবার দাবি তো আমার কিছু নেই—"

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন ডাক্তারবাবু। মনে হল তাঁর কণ্ঠ থেকে শব্দের তুবড়ি বিস্ফোরণ হল যেন। আমি হকচকিয়ে গেলাম। এত জোরে তাঁকে আর কখনও হাসতে শুনিনি।

হাসি থামিয়ে তিনি পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ দুটো মুছে ফেললেন। হাসতে হাসতে তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল। তারপর বললেন, "আপনি দাবিদাওয়া নিয়ে খুব মাথা ঘামান দেখছি। ওকালতি পড়েছিলেন না কি?"

সত্যিই আমি ওকালতি পড়েছিলাম। কিন্তু তাতে শেষ পর্যন্ত সুবিধা হবে না ভেবে অন্য পথ ধরেছি। বি-এ ডিগ্রিটার জোরে এখানে চাকরি করছি। মাস্টারি।

"ওকালতি পড়েছিলাম। কিন্তু যারা উকিল নয় তাদেরও তো আত্মসম্মান থাকা উচিত।"

"তাই শুনেছি। শুদ্ধ ভাষায় ছেলেবেলায় প্রবন্ধ রচনা করেছিলাম, মনুষ্যত্বের সহিত আত্মসম্মান ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। কিন্তু বড় সন্দেহ জেগেছে। মনে হয়েছে আমি কি এমন একটা রাজা-উজির যে নিজেকে ক্রমাগত সম্মান করে যাব? ওই যে শালিকদম্পতি আমার বারান্দায় বাসা বেঁধেছে ওরা আমার অনুমতি নেয়নি। আত্মসম্মান নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় না, ওরা নিজেদের ধান্দাতেই ব্যস্ত, ওরা সুখী। আপনি শুধু শুধু আত্মসম্মানের ঝামেলা তুলে কেন কষ্ট পাচ্ছেন তা আমার মাথায় ঢুকছে না। এখানে যদি আপনার কোনো অসুবিধা থাকে বলুন, সেটা দূর করবার চেষ্টা করতে পারি।"

"আমি শালিক পাখি নই, মানুষ। তাই আপনার বাড়িতে বিনা ভাড়ায় থাকতে আর বিনা খরচায় খেতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে।"

"টাকা আমি নিতে পারব না আগেই বলেছি। এতে আপনার যদি অসুবিধা হয় অন্যত্র যেতে পারেন। কিন্তু যাবেনই বা কেন আমি ভেবে পাচ্ছি না।"

"আমার অস্বস্তি হচ্ছে। আমাকে দিয়ে অন্তত কিছু কাজ করিয়ে নিন। সকালবেলা আর বিকেল পাঁচটার পর আমার ছুটি। সে সময় আপনার কোনও কাজে যদি লাগতে পারি তা হলে আমার সঙ্কোচের কারণ থাকবে না।"

"আপনাকে কি কাজে লাগাব? কাজ বলতে লোকে যা বোঝে তা তো আমি কিছু করি না। আমি যা করি তাকে লোকে বলে অকাজ। এই যে এখন কুকুরদের সঙ্গে আলাপ করছি ওর মধ্যে আপনাকে কাজে লাগাব কি করে?'

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ডাক্তারবাবু বললেন, "তা ছাড়া আমি সমস্ত দিন যে-সব জায়গায় ঘুরি, যেখানে যাই, যা করি, সেখানে দ্বিতীয় লোকের স্থান নেই। আমার ড্রাইভার বেচুও সেখানে থাকে না।"

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, "আপনার ডিস্‌পেন্সারির হিসাবপত্র আমি রাখতে পারি। যদি বলেন—"

আবার তাঁর গলায় হাসির তুবড়ি ছুটল।

"আমার ডিস্‌পেন্সারি নেই, আমি ওষুধ বিক্রি করি না। যা আছে তা বেহিসাবী ব্যাপার। ওর জন্য কোনও হিসাব-রক্ষক দরকার নেই। এই রকেট, রকেট, ডোন্ট ডু দ্যাট। কাম্ হিয়ার।"

প্রকাণ্ড অ্যাল্‌সেসিয়ান কুকুর রকেট ছুটে এল। তার মুখে একটা কাঠের টুকরো, চক্ষু উদ্ভাসিত। প্রকাণ্ড ল্যাজ নাড়াতে নাড়াতে কাছে এসে দাঁড়াল, যেন কাঠের টুকরো কুড়িয়ে এনে মহা কৃতিত্ব করেছে একটা।

"ফেল্ ফেল্, ওটা ফেলে দে।"

কাঠের টুকরোটা রকেট কিছুতেই ফেলবে না। ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ছুটে ছুটে বেড়াতে লাগল। এমন সময় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হল চার বছরের বিজয়। সে কিন্তু রকেটকে তর্জনী তুলে শাসন করে যেই বলল, "লকেট লকেট কাম্ কাম্ ছিট্ (sit) ছিট্"— কি আশ্চর্য অমনি রকেট তার সামনে এসে বসল আর তার সামনের পা-টা তার কাঁধের উপর তুলে দিল। কাঠের টুকরোটাও পড়ে গেল তার মুখ থেকে। হঠাৎ ডাক্তারবাবু তাঁর পকেট থেকে একটা টেনিস বল বার করে ছুঁড়ে দিলেন সেটা। বিদ্যুৎবেগে রকেট ছুটল সেটার পিছু পিছু এবং নিমেষে সেটাকে নিয়ে এল।

"দে, আমাকে দে ওটা।"

কিছুতেই দেবে না রকেট। ডাক্তারবাবু তাকে খোশামোদ করতে লাগলেন। রকেট দুষ্টু ছেলের মতো বলটা মুখে করে ছুটে বেড়াতে লাগল।

বিজয় চোখ পাকিয়ে তর্জনী তুলে এবারও বলল, "লকেট কাম্ ছিট" কিন্তু এবার রকেট বিজয়ের কথাও শুনলে না। কারণ সে জানে ওই বলটার উপর বিজয়েরও লোভ আছে, বিজয়ের হাতে পড়লে বলটা হয়তো ও আর দেবে না। হঠাৎ ডাক্তারবাবুর খেয়াল হল বিজয়কে তিনি যে স্যান্ডাল-জোড়া দুদিন আগে কিনে দিয়েছিলেন সেটা তো ওর পায়ে নেই।

"বিজয়, তোর জুতো কই?"

আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে বিজয় বলল, "হালা গেলে।" অর্থাৎ হারিয়ে গেছে। এর জন্য বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত নয় সে।

"এই পেট্‌কি, এই পেট্‌কি, কোথা যাচ্ছিস্।"

একটা লেগ হর্ন মুরগি ছুটতে ছুটতে যাচ্ছিল। ডাক্তারবাবুর ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল একবার, ঘাড়টা একবার কাত করে চাইল তাঁর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে, তারপর ছুটতে লাগল।

ডাক্তারবাবু আমার দিকে সহাস্য দৃষ্টি মেলে জিজ্ঞাসা করলেন, "ও কি বললে বুঝতে পারলেন?"

"না—"

"ও বললে আমি ডিম দিতে যাচ্ছি, আমাকে পিছু ডাকছ কেন? এখনই ও ডিম দেবে?" বিজয়, যা।"

বিজয় চলল মুরগির পিছু-পিছু। এই সব ছেলেমানুষি কাণ্ড-কারখানার মধ্যে আমি আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব, চলে যাচ্ছিলাম। ডাক্তারবাবু ডাকলেন।

"আপনাকে নিয়ে মহা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি। আপনার আহত আত্মসম্মানে কি মলম দিলে সুফল ফলবে তা তো মাথায় আসছে না। আপনাকে যদি ঝি-চাকরের কাজ করতে বলি তা হলে তো আপনার আত্মসম্মান আরও কাহিল হয়ে পড়বে—"

"কি কাজ?"

"ধরুন যদি আপনাকে সুপুরি কুঁচুতে বা তরকারি কুটতে বলি?"

"মাপ করবেন, তা আমি পারব না।"

"আমি জানতাম। আমিও পারি না ওসব।"

ভুরু কুঁচকে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "আপনাকে কাজ দিতে হলে আমাকেও কাজ করতে হয় কিছু। কখনও করিনি, কিন্তু আপনার যদি সুবিধা হয় করা যাবে না হয়।"

"কি রকম কাজ সেটা—

"পাঠোদ্ধার। আমি সমস্ত দিন যখন ঘুরে ঘুরে বেড়াই তখন নানারকম আইডিয়া মাথার মধ্যে আসে। আসে আর উড়ে যায়। কখনও তাদের কথার খাঁচায় বন্দী করবার চেষ্টা করিনি। আপনার যদি সুবিধা হয় করব। লিখে ফেলব না হয়। কিন্তু আমার হাতের লেখা এমন যে পরদিন হয়তো নিজেই আমি পড়তে পারব না। আপনি যদি পারেন, পরিচ্ছন্ন করে লিখতে পারেন সেগুলো—"

"তাতে কি হবে?"

"আপনি একটা কাজ পাবেন। আপনাকে একটা কাজ দেওয়াই লক্ষ্য। আপনার আত্মসম্মানকে সজীব রাখবার আর তো কোনও উপায় ভেবে পাচ্ছি না। লিখবেন?"

ভদ্রলোককে হঠাৎ খুব ভালো লেগে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মনটা আনন্দে ভরে উঠল।

"লিখব। কিন্তু পরিষ্কার করে লিখে তারপর কি করব ওগুলো?"

"আপনার যা খুশি। রেখেও দিতে পারেন, যদি আপনার ভালো লাগে। অনেক ফোটোগ্রাফার নিজের তোলা ফোটোর কপি রেখে দেন, আমার মনের নানা মেজাজের ফোটো যদি পরিচ্ছন্ন করে রাখতে পারেন, রাখুন, আমার আপত্তি নেই। ভালো যদি না লাগে, ফেলে দেবেন, ফেলেই বা দেবেন কেন, দাইকে দিয়ে দেবেন সে বাজে কাগজ দিয়ে ঘুঁটে ধরায়। দেখুন, দেখুন, ওটাকে চেনেন?"

একটা সবুজ রঙের ছিপছিপে পাখি এসে টেলিফোনের তারের উপর বসল।

"না, আমি চিনি না।"

"বাঁশপাতি। ওদের সঙ্গে ভাব করুন না। ওরা লোক ভালো।"

মুচকি হেসে চলে আসছিলাম। আবার ডাকলেন ডাক্তারবাবু।

"রাঘব ঘোষালের সঙ্গে আলাপ আছে আপনার?"

"না, কে তিনি?"

"তিনিও একজন ডাক্তার। এবং একজন উদ্বাস্তু। সে হিসাবে আমার সম-গোত্র। আমার বাড়ির পশ্চিমে ওই যে ছোট্ট বাড়িটা দেখছেন, ওতেই উনি থাকেন। তাঁর চেহারা দেখে মাঝে মাঝে আলাপ করতে ইচ্ছে হয়—বোধ হয় একবার এসেওছিলেন আমার কাছে—কিন্তু আমি সময় করে উঠতে পারিনি। আলাপ-টালাপ করা আমার ধাতে নেই। আপনাদের দেশের লোক, আলাপ করলে হয়তো ভালো লাগবে। আলাপ করুন না গিয়ে একদিন। আর কিছু না হোক, সময় তো কাটবে—"

"তাঁর কপালের উপর কি একটা আব আছে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভদ্রলোক।"

"আচ্ছা, গিয়ে আলাপ করব একদিন।"

চলে এলাম ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে। একটা অপরূপ সুর যেন বাজতে লাগল মনের তন্ত্রীতে।

গণেশ হালদার সেদিন পর্যন্ত লিখে তাঁর ডায়েরি বন্ধ করলেন। নিয়মিতভাবে না হলেও প্রায়ই তিনি তাঁর ডায়েরি লেখেন, আর এই ডায়েরিতেই তাঁর স্বরূপ চেনা যায়। বাইরে তিনি ভীরু, স্বল্পবাক্ এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর।

।। দুই ।।

হিন্দী ভাষায় যাকে বলে 'চাল্‌তা পূরজা', রাঘব ঘোষাল লোকটি তাই। বলিষ্ঠ-গঠন দীর্ঘাকার ব্যক্তি। মাথার সামনের দিকটা কেশবিরল, পিছনের দিকে গোছা-গোছা চুল, কটা রঙের। চোখের তারাও কটা। আর একটা বৈশিষ্ট্য, চোখের পলক কম পড়ে। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকবার পর একবার মাত্র পলক পড়ে, তখন অন্য দিকে তাকান। কপালের উপর আবটা প্রকাণ্ড। গায়ের রং তামাটে। গোঁফ দাড়ি কামানো। বেশ ভারী-ভরাট মুখ। মিলিটারি ছাঁটের খাঁকি কোট-প্যান্ট পরতে ভালোবাসেন। পায়েও মিলিটারি বুট। যৌবনে নাকি মিলিটারিতে

কাজও করেছিলেন। এখন তাঁর বয়স প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায়, পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। এ শহরে কিছুদিন আগে এসেছেন। এসেই জমিয়ে ফেলেছেন বেশ। ভালো ডাক্তার বলে নয়, নিরঙ্কুশ ব্যক্তি বলে। পয়সা রোজগার করবার কোনো উপায়কেই তিনি হেয় মনে করেন না। মিথ্যা সার্টিফিকেট দেন, অবৈধ গর্ভপাত করেন, জুয়া খেলেন, ফ্লাশ খেলাতে দক্ষতা আছে, অনেক চোরা-কারবারে টাকা খাটান। তা ছাড়া, ডাক্তারির জোরে যতটা উপায় করা সম্ভব তা তো করেনই। যে অসুখ তিন দিনে সারার কথা, সেটা সারাতে তাঁর প্রায় তিন সপ্তাহ লেগে যায়, প্রেস্‌কৃপশনের পর প্রেস্‌কৃপশন বদলান। লোকে বলে, ডাক্তারবাবুর ওষুধের দাম নাকি সস্তা, কিন্তু রোগীরা বুঝতে পারে না যে তিনি অনেকদিন ধরে চিকিৎসা করে ওষুধের দাম শেষ পর্যন্ত অনেক বেশি নিয়ে নেন। কিন্তু তবু তিনি জনপ্রিয়, তার কারণ তাঁর নাটকীয় ধরন-ধারণ। ডিসপেন্সারিতে যখন অনেক রোগীর ভিড় তখন হয়তো শুনলেন শহর থেকে দশ মাইল দূরে কোনো লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে আছে, গরিব লোক, ফি দেবার সামর্থ্য নেই, আসতে পারছে না। অমনি রাঘব বলে উঠলেন, কুছ পরোয়া নেই। আমি গিয়ে দেখে আসছি। ঝরঝরে সেকেলে ফোর্ড গাড়িটা বের করে চলে গেলেন সেখানে। তার চিকিৎসা করলেন, একটি পয়সাও নিলেন না। অন্তরঙ্গ বন্ধু বিসুকে আড়ালে মৃদু হেসে বললেন, একটু পাবলিসিটি হলো। বিসু হিন্দু নয়, মুসলমান। পুরো নাম বিসমিল্লা। মোটর মেকানিক। রাঘব ঘোষালের গাড়িটা ওই সচল রেখেছে। তবে এটা বললেও অন্যায় হবে যে, তিনি সব সময়ে পাবলিসিটির জন্যেই উদারতার ভান করেন। বিলুবাবুর মেয়ের বিয়ের জন্য হাজার টাকা তিনি লুকিয়েই দিয়েছিলেন তাঁকে। বিলুবাবু তাঁর তাস খেলার সঙ্গী, প্রায়ই হেরে যান ঘোষালের কাছে— এইটুকুই তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক। ঘোষালের মধ্যে সত্যিই দিলদরিয়া ভাব আছে একটা। শুধু দিলদরিয়া নয়, বেপরোয়া মরিয়া ভাব। যখন ঠিক করেন কিছু একটা করবেন, একেবারে যেন ঝাঁপিয়ে পড়েন তার মধ্যে, তা সে ভালো মন্দ যাই হোক। অনেক সময় প্রাণ তুচ্ছ করেও। এইজন্যেই বোধহয় স্ত্রীলোকেরা আকৃষ্ট হতেন তাঁর দিকে। ডাক্তার ঘোষালের গৃহিণী নেই। পরকীয়া নিয়েই সারা জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর জীবনে একাধিক নারী এসেছে। কেউ দু-চার দিন থেকেছে, কেউ দু-চার মাস, কেউ বা দু-চার বছর। ঘোষাল যদিও এখানে নিজেকে উদ্বাস্তু বলে পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু উদ্বাস্তু বলতে ঠিক যা বোঝায়, তিনি তা নন। তিনি দাঙ্গার সময় কিছুদিন পূর্ববঙ্গে ছিলেন অবশ্য, আবার দাঙ্গার ঠিক পরেই এ-দেশে চলেও এসেছিলেন তা সত্য, কিন্তু তবু তিনি উদ্বাস্তু নন। কারণ পূর্ববঙ্গে তাঁর কোনো বাস্তু নেই। শোনা যায়, তিনি অনেক দেশে ঘুরেছেন। রেঙ্গুনে ছিলেন, মালয়ে ছিলেন, চীনদেশেও নাকি ছিলেন। আসলে তিনি ভবঘুরে লোক। হোটেলে হোটেলে কিংবা বড় জোর বাসা ভাড়া করে কাটিয়েছেন সারা জীবন। কিন্তু হিন্দুস্থানে এসে উদ্বাস্তুদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা তিনি আদায় করেছেন। কোথায় কি পৈরবী করলে কাজ হাসিল হবে তা তিনি ভালো করেই জানেন। এখানকার যে অফিসারটি উদ্বাস্তুদের হর্তা-কর্তা-বিধাতা সেই মিস্টার সেনের সঙ্গে ঘোষালের গলায় গলায় ভাব। সুতরাং উদ্বাস্তুদের প্রাপ্য সমস্ত সুবিধাই তিনি পেয়েছেন। এখানকার উদ্বাস্তু কলোনীর ডাক্তার তিনি। তার জন্যে কিছু ভাতা পান এবং তাই দিয়েই একটি বাসা ভাড়া করে আছেন শহরে। তিনি উদ্বাস্তু কলোনীর ভিতরে থাকতে চান না। কেন চান না, সেটা

একটা রহস্য। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, ও কলোনীতে যারা থাকে তাদের সঙ্গে মেলে না আমার। তিনি শহরে যে বাসাটি ভাড়া নিয়েছেন সেটি ডাক্তারবাবুর বাসার কাছেই। ছোট বাসা, একখানি শোবার ঘর। সেইটেই আসবাবপত্রে ঠাসা। দ্বিতীয় ঘরটি বড়, সেটি আড্ডাঘর। এক ধারে একটি গোল টেবিল আর তার চারপাশে চেয়ার, আর এক ধারে দেশী ব্যবস্থা, প্রকাণ্ড একটা তক্তাপোশ পাতা, তার উপর একটা শতরঞ্জি আর গোটাকতক তাকিয়া। এখানেই সাধারণত তাস-পাশা খেলা হয় বাজি ধরে। শোনা যায় শহরের অনেক গণ্যমান্য লোকও নাকি আসেন এখানে। ডাক্তার ঘোষালের নিজের কোনও ডিস্‌পেন্সারি নেই। শহরের একটি ডিস্‌পেন্সারির সঙ্গে তাঁর 'বন্দোবস্ত' আছে। সেইখানেই তিনি সকাল-বিকাল বসেন। সেইখান থেকেই তাঁর সমস্ত প্রেসকৃপশন বিক্রি হয়। ডাক্তার ঘোষালের নির্দেশ অনুসারে তাঁর প্রেসকৃপশনের দাম বাজারদরের চেয়ে কিছু কম নেওয়া হয়। ডাক্তার ঘোষাল এ শহরে এসেই তাঁর প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করেছিলেন। খামখেয়ালী ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়েছিলেন প্রথমেই, কিন্তু তাঁর ধরন-ধারণ কথাবার্তা শুনে আর দ্বিতীয়বার যাননি। বুঝেছিলেন এঁর পালক অন্যরকম, এঁর সঙ্গে মেশা যাবে না। ডাক্তারবাবুর বাড়িতে গণেশ হালদার থাকেন, এ তিনি জানতেন। গণেশ যে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু এ-ও তাঁর অবিদিত ছিল না। কিন্তু তবু তিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করেননি। বোধ হয় পূর্ববঙ্গের লোক বলেই করেননি (পূর্ববঙ্গের লোককে পারতপক্ষে তিনি এড়িয়ে চলতে চান), কিংবা শিক্ষক বলেই তাঁকে এড়িয়ে গেছেন। শিক্ষকদের সান্নিধ্য সাধারণত তিনি সহ্য করতে পারেন না। বলেন, ওরা এক অদ্ভুত ভিদ্‌ভিদে জাত, নাইদার ফিশ্‌ নর ফ্লেশ (neither fish nor flesh)। সমাজের সম্মানিত এই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে রাঘব ঘোষালের এই ধারণা গণেশ হালদারের জানা ছিল না, থাকলে তিনি তাঁর সঙ্গে যেচে আলাপ করতে যেতেন না। তিনি প্রথমত মুখ-চোরা লোক, দ্বিতীয়ত, বিলেতে কিছুদিন বাস করার ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে বিলিতি ছাপটা তাঁর মনে বসে গেছে তাতে যখন তখন যার তার সঙ্গে যেচে গিয়ে আলাপ করা শক্ত তাঁর পক্ষে। কেউ পরিচয় করিয়ে না দিলে (ইংরেজীতে যাকে introduce করিয়ে দেওয়া বলে) কারও সঙ্গে আলাপ করতে পারেন না তিনি। স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষককেই এড়িয়ে চলেন। ভাব একমাত্র ভবতোষ গাঙ্গুলীর সঙ্গে। তা-ও খুব মন-খোলা ভাব নয়। পরস্পর দেখা হলে মুচকি হাসেন কেবল। তবু গণেশ হালদার রাঘব ঘোষালের সঙ্গে যেচে আলাপ করতে গেলেন একদিন। যাওয়ার আসল কারণটা তাঁর মনে স্পষ্ট হয়নি সম্ভবত। গেলেন খামখেয়ালী ডাক্তারবাবুকে তাঁর হঠাৎ ভালো লেগে গিয়েছিল বলে। নিজের অজ্ঞাতসারেই হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল তিনি যখন ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে আলাপ করতে বলেছেন তখন সেটা করা উচিত। তাঁর কথাটা অমান্য করাটা ঠিক হবে না।

হালদার মশায় সন্ধ্যার পর ডাক্তার ঘোষালের কাছে গেলেন। গিয়ে দেখলেন বাইরের ঘরটা খোলা রয়েছে, আর ঘোষাল এক প্যাকেট তাস নিয়ে নিবিষ্টচিত্তে প্রত্যেক তাসের পিছনগুলো পর্যবেক্ষণ করছেন। সন্তর্পণে উঁকি দিলেন হালদার মশায়, তারপর গলা-খাঁকারি দিলেন, তাও খুব আস্তে। ঘোষাল তাসের পিছন দিকে চেয়ে এত তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে,

তিনি ছোট্ট গলা-খাঁকারিটা শুনতে পেলেন না। আর একটু জোরে কাশলেন হালদার। বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ লাফিয়ে উঠলেন ঘোষাল এবং বলে উঠলেন, 'কাউ'! হালদার মশায়ের মনে হল একটা বাঘ যেন 'হাঁউ' করে উঠল। 'কাউ' ঘোষাল ডাক্তারের অনুচর। ঠিক ভৃত্য নয়, অনুচর। সে চাকরি করে অন্য জায়গায়, কিন্তু থাকে ঘোষাল ডাক্তারের বাড়িতে। ঘোষাল ডাক্তার ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় ঘুরেছেন। গৌহাটি, লখিমপুর, শিলং, কাঁথি, সম্বলপুর, পাটনা, দিল্লি অনেক জায়গায় টোপ ফেলে ফেলে বেড়িয়েছেন তিনি। আর সর্বত্রই 'কাউ' তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আছে। রেঙ্গুন থেকে এসে প্রথমে তিনি কলকাতায় ছিলেন কিছুদিন। বেশ কিছুদিন, প্রায় এগারো বছর। কিন্তু কলকাতায় তিনি সুবিধা করতে পারেননি। কলকাতাতেই 'কাউ'য়ের সঙ্গে তাঁব প্রথম পরিচয়। তখন তার বয়স দশ বছর। কলকাতার এক রেস্তোরাঁয় কাজ করত। ডাক্তার ঘোষাল থাকতেন একটা একতলা ফ্ল্যাটে। একদিন অনেক রাত্রে তিনি ফিরে এসে দেখলেন, বারান্দায় এক কোণে একটা ছেলে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে। জিজ্ঞেস করে জানলেন, তার নাম কালু। তার মা নাকি তাকে এখানে বসিয়ে রেখে গেছে। রাত্রে তার মা আর ফিরল না। তার পরদিনও না। ঘোষালই কালুকে খেতে শুতে দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোর মা কোথায় উধাও হল? কি নাম তোর মায়ের? কালু বললে, সবাই তাকে সুশী বলে ডাকত। মা আর ফিরবে না। মা যে বস্তিতে থাকত সে বস্তির লোকেরা মাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তার মা কোথায় গেছে তা কালু বলতে পারলে না। বললে, কেউ জানে না মা কোথা গেছে। মা বোধ হয় আর আসবে না। আমাকে এইখানে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। ডাক্তার ঘোষাল তখন তাকে বললেন, তা হলে এইখানেই থেকে যা তুই। তবে চাকরিটা ছাড়িস না। সেই থেকে কালু, ডাক্তার ঘোষালের বাড়ির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তখন ডাক্তার ঘোষাল যে যুবতী চাকরানীটিকে রেখেছিলেন তার একটি ছোট ছেলে ছিল, আধো-আধো কথা বলত। সে-ই কালুকে 'কাউ' 'কাউ' বলে ডাকত। সেই থেকে তার নামই হয়ে গেল কাউ। তারপর ঘোষাল যখন কলকাতা থেকে গৌহাটি গেলেন, কাউও গেল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। গৌহাটিতেও অন্য জায়গায় একটি কাজ জুটিয়ে নিলে সে, থাকত কিন্তু ঘোষালের বাসায়। এইভাবেই বরাবর চলেছে। ঘোষাল মশায় আপাত-দৃষ্টিতে অবিবাহিত ব্যক্তি। বহুকাল আগে, তাঁর প্রথম যৌবনে, তিনি বিবাহ করেছিলেন। বিবাহ করলেও সংসার পাততে পারেননি, কারণ বিয়ের কিছুদিন পরেই তাঁর স্ত্রী উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছিল। এর পর ঘোষাল আর বিবাহের পাকা পথে পা বাড়াননি। গলি-ঘুঁজির স্বল্পালোকিত রাস্তাতেই এর পর থেকে চালিয়েছেন তাঁর দাম্পত্যজীবনের দ্বিচক্রযান। সে যানে কখনও আলো ছিল, কখনও ছিল না। তাতে কখনও ঘণ্টা বাজত, কখনও বাজত না। নিঃশব্দেই পার হয়ে যেতেন তিনি গলি। তাঁর পদ্ধতি—ইংরেজীতে যাকে বলে 'টেকনিক'—এই রকম ঃ যেখানে যেতেন সেইখানেই কমবয়সী একটি ঝি বহাল করতেন, সেই ঝি ক্রমশ উন্নীত হত গৃহিণী পদে। তারপর সে জায়গা যখন ছেড়ে যেতেন তখন খেসারত-স্বরূপ কিছু টাকা দিয়ে দিলেই অতীতেব সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকে যেত। এই টেকনিকটা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন বর্মা থেকে। এ-দেশে এসেও ওতে ভালোই ফল পাচ্ছিলেন, কিন্তু এখানে এসে প্রথম বাধা পেলেন তিনি। 'নুক্' বেঁকে দাঁড়িয়েছে। নুকের পুরো নাম ঝিনুক। ডাক্তার ঘোষাল ওটাকে সংক্ষেপ করে নিয়েছেন। এর কাহিনী পরে বলব।

তার আগে হালদার মশায়ের সঙ্গে ঘোষাল ডাক্তারের প্রথম সংঘর্ষটা বিবৃত করা যাক। সংঘর্ষ কথাটা ইচ্ছে করেই লিখলাম, কারণ সংঘর্ষই হয়েছিল।

'কাউ' বলে চিৎকার করে উঠেই নির্নিমেষ হয়ে গেলেন ডাক্তার ঘোষাল। ঘাড় একটু নিচু করে চেয়ে রইলেন হালদারের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন।

"কে মশাই আপনি? হু আর ইউ?"

বাংলা বলে সঙ্গে সঙ্গে সেটার ইংরেজী তর্জমা করা ডাক্তার ঘোষালের মুদ্রা-দোষ বা বৈশিষ্ট্য। সব সময়ে না হলেও প্রায়ই এটা করেন।

"আমার নাম গণেশ হালদার। ডাক্তার মুখার্জির বাড়িতে আমি থাকি।"

"বুঝেছি. আই সি। আই হ্যাভ প্লেস্‌ড ইউ।"

হাসলেন। নীরব হাসি, কিন্তু ভয়ানক। প্রায় কান পর্যন্ত বিস্তৃত হল সে হাসি, বেরিয়ে পড়ল হলদে রঙের বড় বড় দাঁতগুলো। ঘাড় ঈষৎ নিচু করে হাসিমুখেই রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর কথা বললেন।

"বসুন। আপনাকে অন্য নামে চিনতাম। আপনার আসল নামটা আজ প্রথম শুনলাম।"

গণেশ হালদার বসলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করলেন, "আমার তো দ্বিতীয় নাম নেই। কি নাম শুনেছেন আমার?"

ঘোষাল আবার তাঁর সেই হাসি হাসলেন।

"রাগ যদি করেন বলব না। আই শ্যাল কিপ মাম্।"

"না, রাগ করব কেন?"

"এখানে সকলে আপনাকে 'ফোর্থ ডগ্' বলে ডাকে।"

"তার মানে?"

"ডাক্তার মুখার্জির তিনটে আসল কুকুর আছে, লোকে বলে আপনি তাঁর মনুষ্যবেশী চতুর্থ কুকুর।"

হালদারের মনে হল কে যেন তাঁর গালে ঠাস্ করে চড় মারলে একটা। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ব্যাপারও ঘটল, নিজের অজ্ঞাতসারেই। ডাক্তার মুখার্জিকে যেন আরও ভালোবেসে ফেললেন তিনি, তাঁব সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন যেন আরও দৃঢ় হয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন গণেশ হালদার। তাঁর মনে হল তিনি যেন জমে গেছেন। হাত-পা নড়ছে না, কথা বেরুচ্ছে না মুখ দিয়ে। কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু জাগ্রত হল তাঁর স্বাভাবিক আত্মসম্মানবোধ, তাঁর গভীর গোপন সত্তা থেকে যেন উৎসারিত হল একটা উষ্ণ পস্রবণ, গলে গেল যেন অপমানজনিত হিমশীতলতা। তিনি সুস্থ হলেন; শুধু তাই নয়, তাঁর মনে রসিকতা জাগল।

বললেন, "আপনারা আমাকে এ সম্মান দিয়েছেন সেজন্য ধন্যবাদ। কুকুর-প্রেমিক একজন বিখ্যাত লোক বলে গেছেন— The more I see of men, the more I love my Dog. (মানুষের যত পরিচয় পাচ্ছি আমার কুকুরটাকে তত বেশি ভালো লাগছে)। যে দেশের মানুষেরা অধঃপতিত সে দেশে কুকুর নামে পরিচিত হওয়া সৌভাগ্য মনে করি। স্বাধীনতা পাওয়ার পর মানুষেরা কুকুরের চেয়েও অনেক নীচে নেমে গেছে।"

"আরে মশয়, আপনি দেখছি গুণী লোক। বসুন, বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?"

ডাক্তার ঘোষাল এগিয়ে এসে হালদারের দুই কাঁধে হাত দিয়ে জোর করে তাঁকে বসিয়ে দিলেন একটা চেয়ারে। গণেশ হালদারকে অনুভব করতে হল রাঘব ঘোষাল শক্তিমান ব্যক্তি। তাঁর হাত দুটো যেন বাঘের থাবা।

"কাউ কাউ, জলদি এস। Put in your appearance immediately, please."

কাউ আসতেই বললেন, "পাঠানী হালুয়া আর কফি নিয়ে এস এক পেয়ালা। আমার জন্যে কিছু আনতে হবে না।"

কাউ চলে গেল ভিতরের দিকে।

"কফির চেয়ে উগ্রতর কিছু চলে নাকি আপনার? জানি না হয়তো ভুল করে সিংহকে সুক্তো খেতে দিচ্ছি, I wonder, if I am offering fodder to a lion—স্কচ্ হুইস্কি আছে, যদি অনুমতি করেন—"

"না, ওসব আমার চলে না। আমি নিরামিষ মানুষ—"

"বাই জোভ, তাই নাকি? পাঠানী হালুয়া মুরগির মাংস আর ডিম দিয়ে তৈরি যে—"

"মাংস ডিম আমি খাই। পাঠানী হালুয়ার নাম কিন্তু আগে শুনিনি।"

"শোনবার কথা নয়। ও জিনিস আমারই সৃষ্টি, অনাসৃষ্টিও বলতে পারেন। More a carricature than a creation -- পাঠানকোটে একটা হোটেলে খেয়েছিলাম, ওঃ, সে এক স্বর্গীয় ব্যাপার! কিন্তু বাবুর্চিটা কিছুতেই রান্নার সিক্রেটটা আমাকে বললে না। কিন্তু আমি তো যেটা ধরি ছাড়ি না, নিজেই মাথা খাটিয়ে বানিয়ে ফেললাম। তবে সেটা ওর মতো 'বেহেস্তি' খানা হয়নি। দেখুন, আপনার কেমন লাগে—"

কাউ ফিরে এসে বললে, "ঝিনুক দিদি হালুয়া দিচ্ছে না। বলছে অল্প একটু আছে, সেটা আপনি খাবেন, আপনি তো খাননি।"

লাফিয়ে উঠে পড়লেন ঘোষাল এবং ভিতরের দিকে ছুটে চলে গেলেন।

পরমুহূর্তেই নারীকণ্ঠের এক তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল।

"আমি দেব না, দেব না, কিছুতেই দেব না।"

তারপরই দড়াম করে শব্দ একটা।

"ওগো মাগো—"

করুণ আর্তরবটা হঠাৎ থেমে গেল।

গণেশ হালদার আর বসে থাকতে পারলেন না। উঠে পড়লেন। দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগলেন ভিতরে ঢোকা সমীচীন হবে কি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়াই স্থির করলেন। গিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গেল। দেখলেন একটি অপরূপ রূপসী মেয়ে মেঝেতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে, আর ডাক্তার ঘোষাল হাঁটু গেড়ে তার মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছেন।

"এ কী ব্যাপার? কী হলো?" গণেশ হালদার বললেন।

ঘোষাল ঘাড় ফিরিয়ে হাসলেন, তারপর নিম্নকণ্ঠে বললেন, "টেবিলের উপর প্লেটে হালুয়াটা আছে, আপনি আগে খেয়ে নিন তো মশাই। এ রাক্ষুসীর জ্ঞান হলে আর আপনাকে খেতে দেবে না। টপ্ করে খেয়ে নিন।"

অবাক্ হয়ে গেলেন গণেশ হালদার।

"এ অবস্থায় কি খাওয়া যায় মশাই। কি যে বলছেন—"

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন ঘোষাল।

"আপনাকে খেতেই হবে। ইউ মাস্ট্। মাই ওয়ার্ড ইজ্ ল ইন্ মাই হাউসহোল্ড। আমার বাড়িতে আমি ডিক্টেটর—"

গণেশ হালদারের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে তাকে বসিয়ে দিলেন একটা চেয়ারে। তারপর হালুয়ার প্লেটটা ঠেলে দিয়ে বললেন, "খান।"

"কি যে করছেন আপনি!"

"ঠিকই করছি।"

তারপর তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "খেয়ে নিন। না খেলে নুকের কাছে আমার প্রেস্টিজ থাকবে না খান—"

নিজেই খানিকটা হালুয়া তুলে গুঁজে দিলেন হালদার মশায়ের মুখে।

"চিবুন। চিউ। বাঃ, দ্যাট্স গুড।"

হালুয়াটা মুখে ঢুকতেই খুব ভালো লেগে গেল হালদারের। তিনি যন্ত্রচালিতবৎ চিবুতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর বিবেকও দংশন করতে লাগল খুব।

"আপনিও খান একটু।"

"বেশ, আপনার অনুরোধ ঠেলব না। চলুন প্লেটটা নিয়ে বাইরে যাই। কাউ, বাইরে কফি নিয়ে এস।"

"কিন্তু এ ভদ্রমহিলাকে এরকমভাবে ফেলে রেখে—"

"নুককে ভদ্রমহিলা বলে অপমান করবেন না। ডোন্ট ইন্সাল্ট্, হার প্লীজ, শী ইজ এ ফিমেল রাইনো। ওই ছিপছিপে সুন্দর চেহারার তলায় একটি গণ্ডার লুকোনো আছে। ওর সঙ্গে প্রায়ই আমার মার-পিট হয়। আমার সঙ্গে পারে না। অজ্ঞান হয়ে পড়লেই একটা কোরামিন্ ইনজেকশন দিয়ে দি। আজও দিয়ে দিয়েছি। ওর জ্ঞান হবার আগে হালুয়াটা শেষ করে ফেলুন। এখনই ও উঠে বসবে।"

কাউ লোকটি নীরব। এত যে কাণ্ড হল সে একটি কথা বলেনি, একটু বিচলিত হয়নি। নীরবে এসে কফির খালি পেয়ালা আর খালি প্লেট নিয়ে গেল। তারপর বেরিয়ে এসে বললে, "আজ আমার রাতে ডিউটি পড়েছে। এখন চললুম।"

"খেয়েছিস কিছু?"

"দোকানে খেয়ে নেব।"

"পয়সা নিয়ে যা। সস্তা হোটেলে খেয়ে যেন শরীর নষ্ট করো না।"

পকেট থেকে দশ টাকার নোট বার করে দিলেন। গণেশ হালদার উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিলেন। এরকম লোক তিনি আগে কখনও দেখেননি। এরকম লোক যে থাকতে পারে তা-ও তাঁর কল্পনায় ছিল না। তাঁর মনে হচ্ছিল ডিকেন্স বা স্টিভেন্সনের নভেলের কোনও আজগুবি চরিত্র বুঝি হঠাৎ মূর্ত হয়েছে এসে। মনে মনে খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন, বাইরে সহজ হবার চেষ্টা করলেন তবু।

''এ লোকটি বুঝি অন্য জায়গায় চাকরি করে? আমি ভেবেছিলাম আপনারই চাকর।''

''না, ও আমার চাকর নয়, আমার ছেলে। হি ইজ্ মাই সন। তবে ও সেটা জানে না। বহুকাল আগে ওর মা ওকে আমার কলকাতার বাসার বারান্দায় বসিয়ে দিয়ে পালিয়েছে। ভেগেছে বোধ হয় কারও সঙ্গে হারামজাদী। মহা বজ্জাত ছিল।''

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন, ঘাড় ফিরিয়ে দেওয়ালের দিকে চেয়ে নিষ্পলক হয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, ''কাউ খুব ভালো ছেলে, ওয়াণ্ডারফুল বয়। কিন্তু ও যদি জানতে পারে আমি ওর বাবা, তা হলে আর ওয়াণ্ডারফুল থাকবে না। বাই দি বাই, কথাটা আপনাকে বললাম। দেখবেন কাউ যেন না জানতে পারে।''

গণেশ হালদার হেসে বললেন, ''কথাটা তা হলে আমাকে না বললেই পারতেন। আমি অবশ্য কাউকে বলব না। কিন্তু এ কথা আমাকে জানিয়ে লাভ কি—''

''আপনাকে আপনার করে নেওয়া। অন্তরের গোপন কথা বললেই ফট্ করে তার সঙ্গে আত্মীয়তা হয়ে যায়। এ এক আজব তামাশা। তবে আসল কথাটা কি জানেন?''

''কি?''

''আমি কিছু চেপে রাখতে পারি না। আরও অনেককে বলেছি কথাটা। কাউ সম্ভবত শোনেনি কখনও। ওর চাল-চলনে অন্তত সেটা প্রকাশ পাচ্ছে না।''

''যদি প্রকাশ পায় তখন কি করবেন?''

''দূর করে দেব। আই শ্যাল সিম্‌প্লি টার্ন হিম আউট।''

নির্বিকারভাবে কথাগুলি বলে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তিনি। গণেশ হালদারের মুখের দিকে, তারপর অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ে পলক ফেলে শিস্ দিলেন একটু। তারপর আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হেসে বললেন, ''মায়া-টায়া কিছু নেই। কঠিন প্রস্তর দিয়ে গড়া এ হৃদয়। আমার আপন লোক, আই মীন ব্লাড্ রিলেশন্‌স, কেউ নেই। বন্ধুরাই আমার আপন। আমিও তাদের জন্যে জান দি, তারাও আমার জন্যে জান দেয়। আপনি কি রেফিউজি?''

''হ্যাঁ। শুনেছি আপনিও তাই।''

''হ্যাঁ, খাতায়পত্রে তাই বটে। কিন্তু আসলে আমি হোমলেস্ ভ্যাগাবণ্ড। আফ্রিকাতেও গিয়েছিলাম। কিন্তু থাকতে পারলুম না। পূর্ববঙ্গে আমি দাঙ্গার সময় ছিলাম। তারপর এখানে পালিয়ে এসেছি, আর মিস্টার সেনের দৌলতে যতটা টাকা টানা সম্ভব তা টেনে নিয়ে গ্যাঁট্ হয়ে বসে আছি।''

তারপর নিষ্পলক দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে বললেন, ''আপনার তাই করা উচিত। ওই পাগল ডাক্তারটার পিছু-পিছু ঘুরে মবছেন কেন? ওর দ্বারা কিছু হবে না। ও খালি কাব্যি করে। আপনি আমার দলে ভিড়ে যান। তাস খেলতে জানেন? তাস মানে অবশ্য জুয়া। ওর অনেক গুণ। যদি ইচ্ছে করেন আসতে পারেন আমার আড্ডায়। নানারকম পংখী আসে এখানে। মিস্টার সেন, যিনি উদ্বাস্তুদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তিনিও আসেন। তাঁর নেক-নজরে যদি পড়ে যেতে পারেন, বাজি মাত করতে পারবেন। গভর্নমেন্ট অজস্র টাকা ধাব দিচ্ছে। ইজি ইন্‌স্টলমেন্ট। জমি কিনুন। স্বনামে কিনুন, বেনামে কিনুন। বাড়ি করুন। যতটা পারেন আদায় করে নিন ওদের কাছ থেকে। ওরা আমাদের পথে বসিয়ে নিজেরা বেশ গুছিয়ে নিয়েছে, আমরাও যতটা পারি কেড়ে-বিগড়ে নিয়ে নি আসুন। উচিত নয়? শুড্ উই নট্?

চোখ দুটো বিস্ফারিত করে ঈষৎ-ব্যায়ত আননে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন রাঘব ঘোষাল।

গণেশ হালদার মৃদু হেসে কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন, "আমি তো তাস খেলতে জানি না—"

"শিখুন। শুধু তাস খেলা শিখলেই হয় না। তাস খেলে কি করে টাকা রোজগার করতে হয় তা-ও শিখতে হবে। ইউ জাস্ট জয়েন মাই গ্যাং— আমার দলে চলে আসুন— আমি আপনাকে ওস্তাদ বানিয়ে ছেড়ে দেব। এটা ভুলবেন না, আমরা উদ্বাস্তু, দয়াটয়া কেউ করবে না, আমাদের লড়তে হবে। লড়বার প্রধান অস্ত্র টাকা— তর্জনীর উপর বুড়ো-আঙুলের টোকা দিয়ে টাকা বাজাবার মুদ্রাটা দেখিয়ে দিলেন—"দ্যাট উই মাস্ট আর্ন, সেটা রোজগার করতে হবে সৎ অসৎ যে-কোনো উপায়ে হোক। মরালিটির ছুঁচিবাই নিয়ে যদি ধানাই-পানাই করেন, 'মৃত্যুরেব ন সংশয়।" ভিড়ে যান আমার দলে—"

গণেশ হালদার কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু পারলেন না।

সেই সুন্দরী মেয়েটি (যে মূর্ছা গিয়েছিল) পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে ঝনাৎ করে চাবির একটা গোছা ফেলে দিল টেবিলের উপর।

"আমি চললাম।"

বলেই বেরিয়ে গেল সে।

তার প্রস্থান-পথের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে রাঘব ঘোষাল বললেন, "হারামজাদী—"

বলা বাহুল্য, গণেশ হালদারও কম বিস্মিত হননি। কিন্তু এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে স্বভাবতই তিনি ইতস্তত করছিলেন।

রাঘব ঘোষাল তাঁর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "মনটা উস্‌খুস করছে, না? বয়লিং?"

গণেশ স্মিত হেসে তখন সসঙ্কোচে জানতে চাইলেন, মেয়েটি কে। রাঘব হাসিমুখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, "ও হচ্ছে আমার রাখনি, শুদ্ধ ভাষায় রক্ষিতা, কাব্যের ভাষায় প্রেয়সী। রাম র‍্যাজলা এবং হাড়-হারামজাদা। এরকম স্যাম্পল্ আমি আর জীবনে পাইনি!"

বাইরে একটা গাড়ি আসার শব্দ হল এবং পরমুহূর্তেই "ঘোষাল আমরা এসে গেছি" বলে এক বেঁটে ফরসা ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন, তাঁর পিছু পিছু আরও দুজন।

"আসুন আমি রেডি হয়ে বসে আছি।" তারপর গণেশের দিকে চেয়ে বললেন, "এইবার আমরা মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হব। অর্থাৎ তাস খেলব। আপনি কি বসবেন?

"না!"

"তা হলে আলাপ করিয়ে দি আসুন। ইনি মিস্টার সেন— আমাদের ভাগ্য-বিধাতা, ইনি দরবেশ পাণ্ডা— এখানকার স্টেশন-পতি, আর ইনি সুবেদার খাঁ— ইঞ্জিন-চালক। আর ইনি হচ্ছেন, কি নাম মশাই আপনার?

"গণেশ হালদার।"

"গণেশ, দি গ্রেট সিদ্ধিদাতা। কিন্তু এঁর আসল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় ইনি উদ্বাস্তু। গণেশ ইজ হোমলেস্।"

মিস্টার সেন এবং দরবেশ পাণ্ডা মুচকি হাসলেন। কিন্তু হো হো করে উঠলেন সুবেদার খাঁ "আমি মুসলমান, উদ্বাস্তু দেখলেই একটু অস্বস্তি বোধ করি। মনে হয়, আমার জাত-ভাইরা এঁদের দুর্দশার কারণ। বিহারে অনেক মুসলমানও মারা গেছে, অনেকে উদ্বাস্তু হয়েছে। তাদের দেখলে আপনাদেরও মনের অবস্থা বোধ হয় এইরকমই হয়। কিন্তু আমি সান্ত্বনা পেয়েছি স্পেনের বুল-ফাইটের গল্প শুনে। ষাঁড়ে আর মানুষের লড়াই হয় সেখানে। দুর্বল মানুষেরাই সাধারণত মরে। অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে মরে। এর জন্যে ষাঁড়েরা দায়ী নয়, যারা দায়ী তারা সমাজে সভ্য বলে পরিচিত এবং সম্মানিত। এই কথাটা মনে রাখলে হালদার মহাশয়ের আমার উপর রাগ থাকবে না। আদাব—"

এই বলে তিনি হাতটা বাড়িয়ে উদ্ভাসিত মুখে করমর্দন করলেন গণেশ হালদারের।

"এখনই চলে যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। পরে আবার দেখা হবে।"

নমস্কারাদি বিনিময় করে চলে এলেন হালদার মশায়।

।। তিন ।।

ডাক্তার মুখার্জির পুরো নাম সুঠাম মুখোপাধ্যায়। একটু অদ্ভুত গোছের নাম। তাঁকে এ নামে এখানে কেউ কোনোদিন ডাকেনি। তাঁর বিহারী এবং মারোয়াড়ী রোগীদের কাছে তিনি সুটোম ডাক্তার নাম পরিচিত। কেউ কেউ পাগলা ডাক্তারও বলে। বাঙালীরা তাঁকে ডাক্তার মুখার্জি বলেই ডাকেন। নিজের লোকেরা কেউ থাকলে হয়তো তাঁকে স্বনামে ডাকতে পারতেন, কিন্তু, তাঁর তিন কলে কেউ ছিল না। বিবাহ করেছেন মাত্র কিছুদিন আগে, দেশ স্বাধীন হবার পর। শ্বশুরকুলের পরিচয়ও কেউ জানে না। বস্তুত তাঁর সম্বন্ধে কোনও কথাই কেউ জানে না। তিনি নিজের কথা কাউকে বলেননি, নিজের কথা বলতে তিনি ভালোবাসেন না। তাই তাঁর সম্বন্ধে সত্য খবর জানা নেই কারও। সেইজন্য নানারকম গুজব প্রচলিত আছে। সবাই বলে তিনি বিলেত-ফেরত ডাক্তার। এখানকার এক সাহেব সিভিল সার্জন নাকি একবার প্রকাশ করেছিলেন যে, ডক্টর মুখার্জি বিলেতে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। ধাত্রীবিদ্যায় এবং প্যাথলজিতে তিনি পারঙ্গম। অথচ তাঁর ছাপানো প্যাডে শুধু লেখা আছে ডক্টর এস মুখার্জি। কোনও ডিগ্রীর ল্যাজ নেই। এ-ও শোনা যায়, তাঁর ব্যাংক ব্যালান্স নাকি কয়েক লক্ষ টাকা। এ খবরটা সম্ভবত মিথ্যা নয়, কারণ ব্যাংকেরই এক কর্মচারী কথাটা প্রচার করেছেন। এত টাকা তিনি কোথা থেকে পেলেন তা নিয়েও লোকে মাথা ঘামাতে কসুর করেনি। এ বিষয়ে সর্ববাদিসম্মত যে মতটি জনসাধারণ মেনে নিয়েছে সেটি এই ঃ কলকাতায় তাঁর যে পৈতৃক সম্পত্তি ছিল (খান কয়েক বাড়ি এবং প্রায় পনর বিঘা জমি) সেইটে দাঁও মাফিক বিক্রি করেই তিনি নাকি লক্ষপতি হয়েছেন। তাঁর বাবা ব্যারিস্টার ছিলেন। তাঁরও ব্যাংক ব্যালান্স নিন্দনীয় ছিল না। এই শহরে তাঁর পিতৃবন্ধু হরিশঙ্করবাবু থাকতেন। তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলেন ডাক্তার মুখার্জি। যে বাড়িতে ডাক্তার মুখার্জি এখন থাকেন সেটা হরিশঙ্করবাবুরই বাড়ি। হরিশঙ্করবাবু দারপরিগ্রহ করেননি। তিনি এই শহরে ওকালতি করতে এসেছিলেন। বেশ

ভালো পসার ছিল তাঁর। তিনি এই বাড়িতে সারা জীবন ঝি চাকর নিয়ে কাটিয়ে গেছেন। ডাক্তার মুখার্জি যখন এখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন তখন (তাঁর বুড়ো চাকর রঘুবীরের রিপোর্ট এটা) তিনি নাকি বলেছিলেন, 'এই বাড়িটা আমার মৃত্যুর পর কে ভোগ করবে তা নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা হয়েছে আমার। আমাব একমাত্র উত্তরাধিকারী ভাইপো থাকে বম্বেতে। তার সেখানে সিনেমার কারবার। সে এখানে এসে বাস করবে না। সে এ বাড়ি বিক্রি করে দেবে। যে সবচেয়ে বেশি দাম দিতে রাজি হবে সে-ই নেবে বাড়িটা। কাবুলী, মারোয়াড়ী, মুচি, মুদ্দফরাস যে কেউ ক্রেতা হতে পারে, কিন্তু আমার ইচ্ছে এ বাড়িতে ব্রাহ্মণ বাস করুক। এটা আমার কুসংস্কার বলতে পার, কিন্তু এইটেই আমার ইচ্ছে।' এ কথা শুনে ডাক্তার মুখার্জি নাকি বলেছিলেন, 'আপনি যদি অনুমতি করেন এবং আমার সাধ্যে যদি কুলোয় বাড়িটা এখনই আমি কিনে নিতে পারি। কথা দিচ্ছি আপনার মৃত্যুর পর আমি এসে বাস করব এখানে। আপনার আগে যদি আমার মৃত্যু হয়, বাড়িটা রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করে দেবেন, কারণ আমার উত্তরাধিকারী কেউ নেই।' হরিশঙ্করবাবু নাকি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আর আমি কি তোমার বাড়িতে অমনি থাকব?' সুঠামবাবু উত্তর দিয়েছিলেন তৎক্ষণাৎ— 'নিশ্চয় আপনি আমার বাবার বন্ধু, পিতৃতুল্য, আমার বাড়িতে আপনার থাকবার ষোল আনা অধিকার আছে।' সেই সময় হরিশঙ্করবাবু জলের দামে বাড়িটা বিক্রি করে দেন সুঠাম ডাক্তারকে। বাড়ি বিক্রি করবার পর তিনি বছর দুই বেঁচে ছিলেন। তারপর একদিন হঠাৎ মারা যান। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরে এক ইঞ্জিনিয়ার এসে বাড়িটার মেরামত করে, রং ফেরায়। তারও প্রায় বছরখানেক পরে সুঠামবাবু এসে এ বাড়িতে বসবাস আরম্ভ করেন। যেদিন তিনি প্রথম এলেন, একাই এলেন, তখনও তিনি বিয়ে করেননি। শোনা যায়, তিনি নাকি দেশ-ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন। বহু স্থান বেড়িয়ে তারপর এখানে এসে প্র্যাকটিস শুরু করেন। তিনি এসে যখন বাজার থেকে কুলি এনে বাড়িঘর পরিষ্কার করাচ্ছিলেন তখন দেখলেন গেটের সামনে একটি বলিষ্ঠাকৃতি-কালো-কালো আধবয়সী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পিছনে দু-তিনটি ছোট ছেলে-মেয়ে আর একটি লম্বা গোছের ছোকরা। সুঠামবাবু গেটের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কে, কি চায়। সেই লম্বা ছোকরাটি বললে, 'এ হচ্ছে রঘুবীরের বউ আর আমি হচ্ছি রঘুবীরের শালা। আর এ দুটি হচ্ছে রঘুবীরের নাতি আর নাতনী, এদের মা নেই। আর এইটি হচ্ছে আমার ছেলে।' পরিষ্কার বাংলায় বলল কথাগুলি। বিহারীর মুখে এরকম বাংলা শুনবেন প্রত্যাশা করেননি ডাক্তার মুখার্জি। রঘুবীরের স্ত্রীও বাংলা ভাষাতেই কথা বলল। তবে তার ভাষা যদিও বাংলা কিন্তু উচ্চারণে বিহারী টান আছে। সে বলল, 'হর্‌রিবাবুর কাছে হামরা ছিলাম। হামি পাকাতাম। হর্‌রিবাবু মরে গেল, হামাদের আশা-ভরোসা চলে গেল।' সুঠামবাবু তৎক্ষণাৎ বললেন, 'আমারও তো লোক দরকার। তোমরা ইচ্ছে কর তো আমার কাছেও থাকতে পার হরিবাবুর কাছে যেমন ছিলে।' সেইদিন থেকেই দাই, তার নাতি-নাতনী (বিজয় আর শালিয়া) এবং ভাই রংলাল ডাক্তার মুখার্জির পরিবারভুক্ত হয়ে গেল। রংলালই দিনকতক পরে দুর্গাকে জুটিয়ে আনলে। বহাল হয়েই দাই প্রশ্ন করেছিল, 'মাইজি কোথায়, কবে আসবে?' ডাক্তার মুখার্জি একটু দ্ব্যর্থবোধক উত্তর দিয়েছিলেন, 'মাইজি এখনও আসেন নি। এইবার আসবেন।' তখনও তিনি যে বিবাহ করেননি এ কথা স্পষ্ট করে জানাননি দাইকে।

প্রথম প্রথম তিনি ব্যস্ত ছিলেন। নিজের ল্যাবরেটরি নিয়ে। এসেই তাঁর খুব নাম হয়ে গেল, কারণ তিনি ল্যাবরেটরির সাহায্য না নিয়ে কোনও রোগী দেখতেন না। এসেই তিনি যে ক'টা রোগী দেখেছিলেন, সবগুলোই ভালো হয়ে গিয়েছিল। হৈ হৈ করে নাম হয়ে গেল তাঁর। তিনি কিন্তু হৈ হৈ করে সাড়া দিলেন না। তাঁর নিজস্ব গয়ংগচ্ছ চালে চলতে লাগলেন। দশটায়, কখনও কখনও এগারোটার আগে ল্যাবরেটরিতে যেতেন না। মেরে-কেটে ঘণ্টা দুই থাকতেন সেখানে। তারপর বেরিয়ে পড়তেন মোটর নিয়ে। জেলের ডাক্তার প্রিয়বাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে পেলেন জাম্বুবানকে। ক্রমশ ভুটানও এসে জুটল এবং সবশেষে রকেট। ল্যাবরেটরির জন্য ভেড়া, গিনিপিগ আর খরগোশও তাঁকে কিনতে হয়েছিল। মুরগি আর গরু তখন তিনি কেনেননি, কিনেছিলেন স্ত্রী আসার পর। তারপরই গোয়াল আর মুরগি রাখবার ঘর তিনি তৈরি করান। তিনি তাঁর স্ত্রীকে হঠাৎ একদিন নিয়ে এলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। তাঁর আসার কথা কাউকে বলেননি, এমন কি দাইকেও না। তিনি দাইকে বলে গিয়েছিলেন কলকাতায় ওষুধ কিনতে যাচ্ছেন। ফিরবার সময় ওষুধের সঙ্গে স্ত্রীকেও নিয়ে এলেন। দাই চমকে গিয়েছিল বউয়ের রূপ দেখে। এমন রূপসী সে আগে কখনও দেখেনি। ডাক্তারবাবু কিন্তু সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন সে বিষয়ে। দাই অবাক হয়ে যেত। বোসবাবু যখন নতুন বিয়ে করে এনেছিলেন তখন কত কাণ্ড। বাজনা বেজেছিল, ভোজ হয়েছিল, আত্মীয়-স্বজন এসেছিল কত। কিন্তু ডাক্তারবাবু বউ নিয়ে এলেন, কিছুই হল না, 'শুনশান্' (ফাঁকা)। বাইরের লোকেও এই পাগলা ডাক্তারের মতিগতি বুঝতে পারেনি, ঘরের লোকেও পারেনি। তবে একটা জিনিস দেখে দাইয়ের খুব ভালো লেগেছিল। ডাক্তারবাবু মাইজিকেই শুধু গয়না-কাপড়ে মুড়ে দেননি, তাদেরও দিয়েছিলেন। তাকে, তার নাতনীকে কিনে দিয়েছিলেন রুপোর গয়না, দামী জামা-কাপড়ও। খেলো সস্তা জিনিস কেনা পছন্দই করেন না ডাক্তারবাবু। অন্য বাড়িতে এমন জামা-কাপড় দাই-চাকরকে কেউ দেয় না। আর একটা জিনিসও তিনি করেছিলেন মাইজিকে আনবার সঙ্গে সঙ্গে। মঙ্গলা গাইকে ঘরে এনেছিলেন। তখনও মঙ্গলা গাই হয়নি, বক্না ছিল। একটা কসাইয়ের হাত থেকে চতুর্গুণ দাম দিয়ে নাকি কিনেছিলেন তাকে। মঙ্গলা যখন ঘরে আসে তখন তাকে তেল সিঁদুর জল দিয়ে বরণ করেছিলেন ডাক্তারবাবুর স্ত্রী, তাকে ভিতরের উঠোনে নিয়ে এসে। বাইরে তিনি বড় একটা বেরুতে চান না। সেইদিন বাড়িতে শাঁকও এসেছিল। মঙ্গলার মাথায় তেল সিঁদুর আর খুরে জল দিয়ে শাঁক বাজিয়েছিলেন ডাক্তারবাবুর স্ত্রী। দাই আর একটা জিনিসও লক্ষ করেছে। মাইজির যদিও জাতবিচার নেই, মুরগি-টুরগি সবই খান, কিন্তু ঠাকুরদেবতায় তাঁর খুব ভক্তি। একটা ঘরে নানারকম ঠাকুরদেবতার পট টাঙিয়ে, লক্ষ্মীর আসন বসিয়ে সেটাকে চমৎকার ঠাকুর-ঘরে রূপান্তরিত করেছেন তিনি। সেইখানেই অধিকাংশ সময় হাতজোড় করে চোখ বুঁজে থাকেন। ধূপ-ধুনো আর ফুলের গন্ধ আমোদিত করে রাখে ঘরখানাকে।

এখানে আসবার কিছুদিন পরেই ডাক্তারবাবু এখানকার স্কুলে দশ হাজার টাকা দান করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে কিছু সম্মান লাভ করেছিলেন। স্কুলের ভালো লাইব্রেরি ছিল না, লাইব্রেরি করবার জন্যেই তিনি টাকাটা দিয়েছিলেন। মাসে দশ টাকা করে চাঁদাও বরাবর দিচ্ছেন। তাঁকে স্কুল কমিটির মেম্বার এবং প্রেসিডেন্ট করবার প্রস্তাব করেছিলেন স্কুলের

কর্তৃপক্ষ। কিন্তু রাজি হননি তিনি। বলেছিলেন, আমি নেপথ্যেই থাকতে চাই। মাসে মাসে নিয়মিত স্কুল কমিটির মিটিং-এ আমি যেতে পারব না। আমার সময় নেই, ওসব ব্যাপারে সামর্থ্যও নেই তেমন। তবে মাঝে মাঝে যদি কোনও সাহায্যের দরকার হয় বলবেন, তখন যতটা পারি করে দেব। স্কুলের ইংরেজী পড়াবার মাস্টারের যখন দরকার হল, তখন স্কুলের কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন দিলেন। তারপর স্কুলের সেক্রেটারি তুলসীবাবু একদিন একগোছা দরখাস্ত এনে ডাক্তারবাবুকে বললেন, কাকে বহাল করা উচিত এ নিয়ে আমাদের মধ্যে মত-ভেদ হয়েছে, মিস্টার সেন তাঁর একজন আত্মীয়কে ঢোকাবার চেষ্টা করছেন। আমাদের তাতে আপত্তি আছে। শেষে কাল মিটিং-এ ঠিক হয়েছে আপনি যাকে বেছে দেবেন, তাকেই আমরা বহাল করব। ডাক্তারবাবুও এ গোলমেলে ব্যাপারে মাথা গলাতে চাননি। কিন্তু সকলের আগ্রহাতিশয্যে শেষকালে তাঁকে রাজি হতে হল। ডাক্তারবাবু কিন্তু নিজে নির্বাচন করেননি। নির্বাচন করতে দিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীকে। খুব বিদুষী না হলেও তাঁর স্ত্রী মোটামুটি বাংলা ইংরেজি জানতেন। তিনিই নির্বাচন করেছিলেন গণেশ হালদারকে। এ কথা অবশ্য স্কুলের কর্তৃপক্ষ বা গণেশ হালদার কেউ জানতে পারেননি। গণেশ হালদার অবশ্য যোগ্যতম প্রার্থীই ছিলেন। মফস্বলের স্কুলে যে একজন অক্স্ফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট আসবেন এবং এসে টিকে থাকবেন এ আশা স্কুলের কর্তৃপক্ষেরা করেননি. তাই তাঁরা গণেশ হালদারকে বহাল করতে ইতস্তত করেছিলেন প্রথমে। কিন্তু ডাক্তারবাবু যখন তাঁকে মনোনীত করলেন তখন আর কেউ আপত্তি করেননি। ডাক্তারবাবু বললেন, ইংরেজি পড়াবার জন্য এই লোকই ভালো হবে। মাইনেটা অবশ্য কম। আচ্ছা, আসুন তো, ওঁর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা না-হয় আমার ওখানেই হবে। আমার আউট হাউসটা তো খালিই পড়ে থাকে।

এসব খবর গণেশ হালদার কিছুই জানতেন না। প্রথম প্রথম তাই তিনি একটু সঙ্কোচ অনুভব করেছিলেন। কিন্তু খামখেয়ালী ডাক্তারবাবুকে ভালো লেগে যাবার পর এ ভাবটা আর থাকেনি, বিশেষ করে তাঁর স্বরচিত খামখেয়ালী রচনাগুলি পরিষ্কার করে লেখার সুযোগ পেয়ে তিনি আরও যেন ভালোবেসে ফেলেছিলেন এই লোকটিকে। গণেশ হালদার ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। শুধু তাই নয়, তিনি সাহিত্যরসিকও। তাই তিনি সুঠাম ডাক্তারের দুষ্পাঠ্য লেখার পাঠোদ্ধার করে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এ লোকটি কেবল ডাক্তার নন, কবিও। পেপিস-এর (Pepys) লেখা ডায়েরি এখন যেমন ইংরেজি সাহিত্যের আসরে সমাদৃত হয়েছে, ওঁর লেখাও হয়তো তেমনি একদিন হবে। অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে লেখা, কিন্তু ওর উপর শাশ্বতের আলো পড়েছে।

সেদিন সকালে গণেশ হালদার ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়েছিলেন একটা কথার পাঠোদ্ধার করবার জন্যে। একটি রোগীর জরুরি দরকারে সেদিন ডাক্তারবাবুকে একটু সকাল সকালই ডিস্পেন্সারিতে যেতে হয়েছিল। লোকটি বাইরে থেকে এসেছিল, রক্ত-পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে ট্রেন ধরবে। সেদিন রবিবার গণেশ হালদারেরও ছুটি ছিল। তিনি এগারোটা নাগাদ ডিস্পেন্সারিতে যখন গেলেন তখন ডাক্তারবাবু রিপোর্ট লিখছিলেন। গণেশবাবুকে দেখে বিস্মিত হলেন।

"কি খবর?"

"একটা কথা পড়তে পারছি না।"

"ও। আচ্ছা, বসুন।"

তারপর চোখে-মুখে হাস্য বিকীর্ণ করে বললেন—"আমিও পারব কি না সন্দেহ।" গণেশ হালদার বসলেন। তারপরই ঢুকলেন একটি অপরিচিত লোক। রোগা-রোগা লম্বা চেহারা, মুখখানা ধূর্ত শৃগালের মতো। ডাক্তারবাবুকে সেলাম করে সে বললে, "বসন্তলালের রিপোর্টটা নিতে এসেছি।"

"বসন্তলাল কই?"

"সে আসতে পারল না। আমাকেই রিপোর্টটা নেবার জন্য পাঠাল। এই চিঠি দিয়েছে।"

ডাক্তারবাবু চিঠিটা পড়ে রেখে দিলেন একধারে। তারপর রিপোর্টটা শেষ করে দিলেন তার হাতে। সে লোকটা ফি দিয়ে বলল, "একটা টাকা কম আছে।"

"কম কেন? বসন্তলাল তো গরিব নয়। তার অনুরোধে তাকে চার টাকা ছেড়েও দিয়েছি। আবার কমাচ্ছে কেন? আর কমাব না।"

"একটা টাকা ছেড়ে দিন।"

"আর এক পয়সাও ছাড়ব না।"

"ছেড়ে দিন একটা টাকা। আমি হিলসাপুরে প্র্যাক্‌টিস করি। আপনাকে অনেক রোগী পাঠাব।"

বোমার মতো ফেটে পড়লেন ডাক্তারবাবু।

"আমি রোগী চাই না। আপনি বাকি টাকাটা দিয়ে তবে রিপোর্ট নিয়ে যান।"

লোকটার চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

"ছাড়বেন না একটা টাকা?"

"না। বসন্তলাল আমাকে বারো টাকা দেবে বলে গেছে।"

"আমি চেয়ে নিচ্ছি একটা টাকা।"

"তোমাকে চিনি না, তোমাকে দেব কেন? তোমার চেয়ে গরিব লোকের অভাব নেই, দিতে হলে তাদের দেব।"

লোকটা গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। বিড়বিড় করে কি যেন বললে। তারপর টাকাটা বের করে দিয়ে রিপোর্টটা নিয়ে চলে গেল।

সে চলে গেলে ডাক্তারবাবু গণেশ হালদারের দিকে মুচকি হেসে বললেন, "আমাকে চামার মনে হচ্ছে না? কিন্তু এ লোকটা দালাল। ডাক্তারের টাউট, দু'একটা কেস এনে দিয়ে মনে করে মাথা কিনে নিলুম। ওদের আমি কখনও প্রশ্রয় দিই না। ওই টাকাটা ও নিজেই গাপ করত। কই দেখি কোনখানটা পড়তে পাচ্ছেন না?"

গণেশ হালদার দেখালেন।

ডাক্তারবাবুও অনেকক্ষণ ধরে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে রইলেন লেখাটার উপর। তারপর হাসিমুখে চোখ তুলে বললেন, "আপনার কি মনে হচ্ছে কথাটা?"

গণেশ সসঙ্কোচে বললেন, "যা পড়তে পারছি তার থেকে তো কোনো মানে হচ্ছে না। ল, জ, ভু ও কনিথবং, কোনও ডাক্তারি কথা নাকি?"

"না, সংস্কৃত কথা।— গজভুক্তকপিত্থবৎ। আমার নিজেরই পড়তে একটু সময় লেগে গেল। মোটর যখন চলছিল তখনই লিখেছিলাম। কলমের কালি ফুরিয়ে যেতে পেন্সিল দিয়েই লিখেছি ওখানটা। আমার 'গ'-গুলো প্রায়ই 'ল'য়ের মত হয়ে যায়, আর 'প'-গুলো দন্ত্য 'ন'য়ের মতো। আবার 'ল'য়ে আর তালব্য 'শ'য়ে অনেক সময় কোনও তফাত থাকে না।"

বলেই তিনি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

গণেশ হালদার বললেন, "এখানটাও এবার পরিষ্কার হল তা হলে। 'অহঙ্কারের লজ' আমি বুঝতে পারছিলাম না। ওটা হবে 'অহঙ্কারের গজ'। এইবার ঠিক হয়েছে।—"

আর একটি লোক এসে প্রবেশ করল। দীন-দরিদ্র চেহারা, মাথার চুল উষ্কখুষ্ক, জামা কাপড় তালি দেওয়া। বললে, "আমার উরুতে, আর হাতের অনেক জায়গায় অসাড় হয়ে গেছে। সাদাও হয়ে গেছে অনেক জায়গায় জায়গায়। ঠাণ্ডার আর গরমের তফাতও বুঝতে পারি না।"

ডাক্তারবাবু তাকে পরীক্ষা করে বললেন, "মনে হচ্ছে কুষ্ঠ হয়েছে। রক্তটক্ত পরীক্ষা করতে ষোল টাকা খরচ হবে।"

সে তখন একটি চিঠি বার করে ডাক্তারবাবুর হাতে দিলে। চিঠিটা পড়ে তিনি বললেন, "ও, তাই না কি? আচ্ছা, তোমাকে কিছু দিতে হবে না। কাল দশটার পর এসো।"

ডাক্তারবাবু উঠে পড়লেন। গণেশ হালদারও উঠলেন।

"চলুন, বাড়ি যাওয়া যাক। এখুনি খেয়েই আমাকে বেরুতে হবে।"

খেয়েই বেরিয়ে এলেন।

"বেচু, রেসকোর্সে যাব।"

"চলুন।"

বেচু ডাক্তারবাবুর ড্রাইভার। এ-দেশের লোক নয়। কলকাতা থেকে এনেছিলেন। সে-ও বাড়ির পরিজনদের মধ্যে। তবে সে বাড়িতে খায় না। সে মাইনে ছাড়া নগদ দু' টাকা করে খোরাকি পায়। তাই নিয়ে পথেঘাটে যখন যেখানে যেমন সুবিধা পায় খেয়ে নেয়। তাতেই ও খুশি। বেচুর প্রধান গুণ নির্বাক। ডাক্তারবাবু বাক্যবাগীশ চাকর পছন্দ করেন না। ডাক্তারবাবু সাধারণত লোকালয়ের বাইরে যান। মাঠে, গঙ্গার তীরে, জঙ্গলে যেখানে যখন খুশি। জায়গাটা জনবিরল হলেই হল। বেচু তাঁকে সেই জায়গায় নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা একটু দূরে নিয়ে চলে যায়। যতক্ষণ ডাক্তারবাবু না ফেরেন ততক্ষণ সে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে বসে থাকে ধৈর্যভরে। সব সময় ঘুমোয় না। অনেক সময় পড়ে। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। বেচু ম্যাট্রিক পাস, ইংরেজি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়বার মতো বিদ্যে তার আছে। সে দিনকতক কলকাতায় ট্যাক্সি চালিয়েছিল। এক ট্যাক্সিতেই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তার আলাপ হয়। তারপর ডাক্তারবাবুকে চিঠি লিখেছিল সে একটা। ডাক্তারবাবুর প্রয়োজন আর মাইনের বহর শুনে সে ট্যাক্সির চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে। সুখেই আছে।

ডাক্তারবাবু গিয়ে নামলেন পীরবাবার সমাধিটার কাছে। অনেককাল আগেকার সমাধি, কতকালের কেউ তা জানে না। হিন্দু মুসলমান সকলেরই ভক্তি আকর্ষণ করেছে পীরবাবা।

সমাধিটিকে ছায়া করে আছে দুটি গাছ। অদ্ভুত গাছ দুটি। চিরশ্যাম। ভালো করে দেখলে তবে বোঝা যায় দুটি গাছ দু'জাতের, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তারা যেন সহোদর। একটি গাছ ভগ্ন-কাণ্ড, কুব্জদেহ, বিধ্বস্ত। শোনা যায় একবার নাকি বাজ পড়েছিল তার উপরে। কিন্তু পীরবাবার সেবক বলে তার মৃত্যু হয়নি। বস্তুত, গাছটি তার খণ্ডিত ন্যুব্জ দেহ নিয়ে কি করে যে বেঁচে আছে তা এক বিস্ময়ের ব্যাপার। ডাক্তারবাবু যখনই এখানে আসেন তখনই গাছ দুটোকে বারবার পরিক্রমণ করেন। তাঁদের সঙ্গে কথাও কন। সেদিন এসে বললেন, "কি ভায়'রা, কেমন আছ? না, ঠিকই আছ দেখছি, দমে যাওনি। কিন্তু যা যুগ পড়েছে, তোমাদের আদর্শ সব বানচাল হয়ে গেল। এখন মুখোশেরই আস্ফালন। তোমরা কেউ হিন্দুও নও, মুসলমানও নও, অথচ সেবা করে চলেছ এক মুসলমান পীরের। যাই হোক্, বেড়ে আছ তোমরা। আমিও যদি তোমাদের দলে ভিড়তে পারতুম! কিন্তু তা অত সহজ নয়।"

গাছের পাতায় পাতায় হাত দিয়ে আদর করলেন তাদের। তারপর চেয়ে রইলেন পাশের সর্ষে ক্ষেতটার দিকে। রেলের লাইন চলে গেছে মাঠের ধার দিয়ে। দুটো লাইন। ছোট লাইন, বড় লাইন তারপই ছোট একটি সর্ষে ক্ষেত। সেটির দিকে ডাক্তারবাবু এমনভাবে চেয়ে রইলেন যেন কোনো আত্মীয়কে দেখছেন। বড় ভালো লাগে তার জায়গাটি। চলে গেলেন ক্ষেতের মধ্যে। ক্ষেতের মাঝখানেই একটি ছোট অশ্বত্থ গাছ। সেও ডাক্তারবাবুর বন্ধু। গিয়ে তাকেও একবার পরিক্রমণ করলেন। কচি কচি পাতাগুলো থেকে আলো যেন পিছলে পড়ছে। তারপর একটা বসবার জায়গা খুঁজতে লাগলেন। একটা পাথর ছিল। তার উপরই গিয়ে বসলেন। প্রথমে কিন্তু তেমন জুত হল না। তাঁকে লিখতে হবে, চাই একটা ঠেস দেওয়ার মতো জায়গা। তিনি ইচ্ছা করলেই ভালো করে বসবার এবং লেখবার সাজসরঞ্জাম আনতে পারেন, বেচু একটা ভালো জায়গা দেখে তাঁর বসবার এবং লেখবার বন্দোবস্তও করে দিতে পারে, কিন্তু এ ব্যবস্থা সুঠাম মুখুজ্যের মনোমতো নয়। তিনি যখন প্রকৃতির কোলে এসে বসতে চান, এক জামা কাপড় ছাড়া মানবসভ্যতার অন্য কোনো আড়ম্বর তিনি সঙ্গে আনতে চান না। তাঁর মনে হয় ওগুলো যেন প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগের বাধা। ওসব আনলে প্রকৃতির ঠিক কোলটিতে বসা যাবে না। এতদিন তিনি কোনও অসুবিধা ভোগ করেননি, কিন্তু যেদিন থেকে গণেশ হালদারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, প্রতিদিন তাঁর জন্যে কিছু লিখবেন সেদিন থেকে একটু অসুবিধা বোধ করছেন। সর্ষে ক্ষেতের মাঝে তিনি টেবিল চেয়ার আনতে রাজি নন। অথচ লিখতেই হবে; প্রতিশ্রুতিভঙ্গ তিনি করতে পারবেন না। হঠাৎ চোখে পড়ল রেলের ওপারে একটা কাটা গাছের গুঁড়ি রয়েছে। তাতে ঠেস দিয়ে বসলে লেখার খুব অসুবিধা হবে না। সেইখানেই গেলেন। গিয়েই দেখতে পেলেন কয়েকটা ঘেঁটু-গাছও রয়েছে সেখানে, আর আশে-পাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। 'বাঃ।' বলে বসে পড়লেন তিনি সেইখানেই চাপটালি খেয়ে। তাঁর পায়জামা খুব ঢিলা-ঢালা, সেজন্য বসবার কোনও অসুবিধা হল না। পকেট থেকে বার করলেন কয়েক টুকরো কাগজ—ওষুধের বিজ্ঞাপন। উত্তোলিত জানুর উপর সেগুলো রেখে ভাবতে লাগলেন কি লিখবেন। বিজ্ঞাপনের ভালো ভালো কাগজে অনেক সাদা জায়গা থাকে। সেই সব ফাঁকগুলোই ভরিয়ে ফেলবেন ঠিক করলেন। লেখার বিষয় আগে থাকতে ভেবে আসেন না। ওখানে বসে যা মনে হয় লেখেন। খানিকটা লেখা নিয়ে কথা। এদিক ওদিক

চেয়ে ভাবতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ ঘেঁটুগাছগুলোর দিকে চেয়ে তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। আর একটু এগিয়ে গেলেন সেদিকে এবং অনেকক্ষণ ঝুঁকে কি যেন দেখলেন। তারপর ফিরে এসে লিখতে শুরু করলেন।

"এতক্ষণ ধরে যা দেখলুম, তা আগেও দেখেছি, পরেও দেখব. কিন্তু এখন যে কথাটা মনে উদ্ভাসিত হল তা হয়তো আর কখনও মনে হবে না। তাই লিখে রাখাই ভালো। হালদার মশায়ও হয়তো এর থেকে চিন্তার খোরাক পাবেন কিছু। ব্যাপারটা কিছু নয়, একটা মাকড়সার জাল। ভোরে বেড়াতে এসে আগে এরকম জাল অনেক দেখেছি। জালের উপর শিশিরবিন্দু পড়ে অপরূপ দেখায় তখন ওগুলো। মনে হয় মণি-মাণিক্য-খচিত ওড়নার টুকরো পথে-ঘাটে ফেলে গেছে বোধ হয় রাতের পরীরা। কিন্তু এখন, দুপুরে, দেখছি ওটা সত্যিই জাল। দুপুরে রোদে শুধু ওর একটা নয় দুটো রূপ খুলেছে। স্বচ্ছ সুতো দিয়ে তৈরি গোল চাকার উপর মোটা সাদা সুতোর তৈরি কারুকার্যও এখন দেখা যাচ্ছে। বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত সোজা চলে এসেছে এই মোটা সুতোর কাজ তির্যক রেখায়। একটি চমৎকার সুতোর চাকা, যার শুদ্ধ বাংলা চক্র। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে শুধু চক্র নয় চক্রান্তও। সকাল বেলায় শিশিরের পরিমণ্ডলে যে জীবটিকে দেখতে পাওয়া যায় না, আমি অন্তত আগে দেখিনি, এখন রৌদ্রকিরণে তাঁর তিনটি রূপ দেখলাম। তিনি জাল সৃষ্টি করেছেন তাই তিনি ব্রহ্মা, তিনি ছোট ছোট পোকাকে ধ্বংস করছেন তাই তিনি মহেশ্বর এবং ওই পোকাগুলি খেয়ে নিজেকে তিনি পালন করছেন, সুতরাং তাঁকে পালনকর্তা বিষ্ণু বললেও অন্যায় হবে না। হঠাৎ মনে হল সকলের মধ্যেই এই ত্রয়ী বিরাজ করছেন। তা হলে আমরা কি সকলেই ভগবান। একটু তফাৎ অবশ্য আছে। একটু নয়, মস্ত তফাত। এই সব ক্ষুদে ভগবান ত্রয়ী হয়েছেন স্বার্থের প্রেরণায়। বৃহৎ ভগবানের প্রেরণা আনন্দ। একটু আগে জালে নিপাতিত ছোট পোকাটাকে যখন ছটফট করতে দেখলাম, আর তার-সঙ্গেই যখন দেখলাম জালাধিপতি মাকড়সাটার বিপুল আনন্দ— তখন হঠাৎ, কেন জানি না, পোকাটার দুঃখে মনটা গল-গল হয়েছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনের আর একটা অংশ প্রথম অংশটার গালে এক চড় মেরে বললে, ওরে বেকুব, গল-গল হবার কি আছে এতে? প্রকৃতির ওই নিয়ম, ওরা নিয়ম পালন করে চলেছে, ওরা ল-অ্যাবাইডিং, সুতরাং সাত-খুন-মাপ। তা ছাড়া আর একটা ব্যাপারও আছে, নিয়মভঙ্গ করবার ক্ষমতাই ওদের নেই। কোটি কোটি খুন-জখম হচ্ছে প্রকৃতির লীলা-নিকেতনে এ নিয়ে খবরের কাগজে লেখালেখি হয় না। তবু এটা সত্য।

এই পর্যন্ত লিখে ডাক্তারবাবু হঠাৎ দেখতে পেলেন দুটো বুলবুলি পাখি উড়ে এসে সামনের একটা নাম-না-জানা গাছের সরু ডালে বসে ডাকছে—কৃষ্ট প্রিয়। দেখে ডাক্তারবাবু সন্তর্পণে একটি ঠোঙা বার করলেন পকেট থেকে। তাতে পাঁউরুটির গুঁড়ো, লজেন্সের গুঁড়ো, বুট ভাজা, বাদাম ভাজা, নানারকম ডাল, ধান একসঙ্গে মেশানো আছে। তিনি তার থেকে একমুঠো বার করে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগলেন বুলবুলি দুটোর দিকে। একটু এগিয়েই ছুঁড়ে ছড়িয়ে দিলেন গুঁড়োগুলো। তাঁর ইচ্ছে বুলবুলিরা ওগুলো খাক। বুলবুলিরা কিন্তু খেল না, উড়ে গেল। বিমর্ষ হয়ে বসে রইলেন সুঠাম মুখুজ্যে। খানিকক্ষণ বসে থেকে পকেট থেকে

একটা হুইস্‌ল্ বার করে বাজালেন সেটা। এটা বেচুকে গাড়ি আনবার সঙ্কেত। একটু পরেই দেখা গেল, বেচু গাড়ি আনছে। গাড়ি আসতেই চড়ে বসলেন তাতে।

"চল গঙ্গার ধারে কোথাও। যে দিকটায় ইঁটের ভাটাগুলো আছে, সেই দিকে চলো।"

।। চার ।।

গণেশ হালদার যে আউট-হাউসটাতে থাকেন তার সঙ্গে ছোট্ট একটা দরজা দিয়ে বাইরের রাস্তার সঙ্গে যোগাযোগ আছে। বাইরের দিকে ছোট একটা ঘরও আছে। সেইটেতেই একটা ছোট টেবিল আর চেয়ার পেতে গণেশ হালদার নিজের পড়াশোনার ঘর করেছেন। খুব ভোরে ওঠেন তিনি। উঠেই ছোট একটা স্টোভ জ্বেলে চায়ের জল চড়িয়ে দেন তাতে। তারপর প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে স্বহস্তে প্রস্তুত এক কাপ চা খেয়ে তিনি খানিকক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকেন ধ্যানাসনে। ঠোঁটগুলো নড়তে থাকে। মনে হয় কোনও স্তোত্র পাঠ করছেন। একটু পরেই তাঁর ঘড়িতে অ্যালার্ম বেজে ওঠে। ঠিক পাঁচটার সময় হালদার মশায় টেবিলে এসে বসেন। শীতকালে আলো জ্বালতে হয়, গ্রীষ্মকালে সামনের ছোট জানালাটি খুলে দিলেই আলো আসে। প্রথমেই হালদার মশায় স্কুলের ছেলেদের খাতাগুলি সংশোধন করেন। তিনি এখানে এসে 'হোম টাস্ক' (home task) ব্যাপারটা পুনঃপ্রবর্তন করেছেন। খাতাগুলো দেখে সময় থাকলে তিনি নিজের ডায়েরি লেখেন। সম্প্রতি ডাক্তারবাবুর লেখাগুলো পরিষ্কার করে টোকাও তাঁর আর একটা কাজ হয়েছে। প্রথমে তিনি নিজের ডায়েরিই লেখেন। তারপর ডাক্তারবাবুর লেখাটার পাঠোদ্ধার করেন। তবে এটা অনেক সময় রাতে খাওয়ার পরও করেন।

সেদিন তিনি ডায়েরিতে লিখছিলেন ঃ—"এক দেশ থেকে উন্মূলিত হয়ে দলে দলে মানুষ অন্য দেশে গেছে ইতিহাসে একথা নূতন নয়। কিন্তু আমাদের বেলায় একটু নতুন ধবনের ব্যাপার হয়েছে। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের তদারকে এক্সচেঞ্জ অব পপুলেশন হল, পাকিস্তানের হিন্দুরা তাদের বিষয়সম্পত্তির মূল্যও পেল, কিন্তু বাংলা দেশের ক্ষেত্রে সেটা হল না। বাংলা দেশের উদ্বাস্তুরা জলে-স্থলে অনলে-অনিলে ছড়িয়ে পড়ল অসহায় গরু-ভেড়ার মতো। কেন? এ কেন'র উত্তর কর্তৃপক্ষেরা দিয়েছেন কি না আমার জানা নেই। আর একটা কথাও মনে হচ্ছে। এই ব্যাপারটার সঙ্গে আমি নিজে জড়িত তাই আমার কষ্ট হচ্ছে, মনে হচ্ছে আমাদের মর্মের উপর দিয়ে এই যে তপ্ত লোহার রোলার চালানো হল এর কি কোনও প্রতিকার নেই? কিন্তু ইতিহাস পড়তে পড়তে এ-সব কথা মনে হয়নি, এত কষ্ট পাইনি। কোটি কোটি মানুষ নিহত হয়েছে মানুষেরই হাতে, এই তো মানুষের ইতিহাস। আমি যখন ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম, তখন চেঙ্গিস খাঁ বা তৈমুরলঙ্গের রক্তাক্ত কাহিনী পড়ে কি শিউরে উঠতুম? ইজিপ্টের ফারাও যখন 'জু'-দের ইজিপ্ট থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তা পড়ে কি মনে কোনও শিহরন জেগেছিল আমার? ওল্ড্ টেস্টামেন্টের এ সব কাহিনী তো উপন্যাসের মতো পড়েছি। আমাদের নিয়ে কি কোনো ওল্ড্ টেস্টামেন্ট রচিত হবে? আমাদের মধ্যে কি মোজেস্ আছে কেউ? কে জানে! ইতিহাসের স্তরে স্তরে কিন্তু জমা হচ্ছে অনেক জিনিস। এই

ইহুদীদের উপর কি কম অত্যাচার হয়েছে? হয়ে শেষ হয়ে যায়নি, যুগে যুগে হচ্ছে। কিন্তু কি বিচিত্র ঐশ্বর্যপূর্ণ ওদের জাতীয় ইতিহাস! মানব সভ্যতার এমন কোনো বিভাগ আছে কি, যা ওদের দানে সমৃদ্ধ নয়? সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্প, নৃত্যকলা, খেলাধূলা এমন কি সার্কাসে পর্যন্ত ওদেরই কৃতিত্ব। অথচ হিটলার ওদের উপর কি পাশবিক অত্যাচারই না করেছিল! আজ হিটলার কোথায়? কিন্তু জর্মন-সভ্যতার অঙ্গে অঙ্গে আজ ওদের দেওয়া মণি-মাণিক্য ঝলমল করছে। তা কি কেউ কখনও মুছে দিতে পারবে? পারবে না। কিন্তু কথায় কথায় আমি প্রসঙ্গান্তরে চলে এসেছি। যে কথাটা আমি এখনি ভাবছিলাম তা হচ্ছে ইহুদী নরনারীর উপর নাৎসী জার্মনীর যখন অকথ্য অত্যাচার চলছিল, তখন আমি কি মুষড়ে পড়েছিলাম? হিরোশিমায় জাপানীদের উপর যখন মার্কিনী অ্যাটম্‌বোমা পড়ল সে খবর পড়ে কি আমার রাত্রির নিদ্রা বিঘ্নিত হয়েছিল? লজ্জার সহিত স্বীকার করতে হচ্ছে, হয়নি। সে খবর শোনার পরও আমি ঘুমিয়েছিলাম। শুধু তাই নয়। আমার চোখের সামনে একবার একটা ছেলে মোটর চাপা পড়েছিল, তার রক্তাক্ত দেহটা আমি দেখেছিলাম। তাকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, আমি কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। তার ঘাড় লটকে পড়েছিল, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল, ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল তার গালটা তার কপালটা। কিন্তু এসব প্রত্যক্ষ করেও আমি তেমন বিচলিত হইনি। তারপর বাড়ি গিয়ে স্নান করেছিলাম, খেয়েছিলাম, একটি ফুটবল ম্যাচও দেখেছিলাম এবং তার দুদিন পরে সব ভুলেও গিয়েছিলাম। আজ হঠাৎ তার কথা মনে পড়ছে। আর একটা জিনিসও লক্ষ করেছিলাম তখন। মোটর চাপা পড়তেই খুব ভিড় হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে, রাস্তার কয়েকটা গুণ্ডাগোছের ছোকরা ড্রাইভারটাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নৃশংসভাবে মারধোর করেছিল, পুলিশ এসেছিল, কিন্তু যে-ই এটা নিঃসংশয়ে জানা গেল যে ওই ছেলেটি কারও আত্মীয় নয়, তখনই ভিড় কমে গেল, আস্তে আস্তে সরে পড়ল সবাই। এখন মনে হচ্ছে ছেলেটির কি মা বাবা ছিল? ভাই বোন ছিল? কোথায় ছিল তারা তখন? তাদের বুক-ফাটা আর্ত হাহাকার শুনতে পাইনি বলে মনে হচ্ছে সেই দুর্ঘটনার মধ্যে যেন একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল, যা হওয়া উচিত ছিল যেন হয়নি। এরকম ঘটনা পৃথিবীতে অহরহ ঘটছে, কিন্তু এ কথা কি আমাদের অহরহ মনে থাকে যে অত্যন্ত নিকট আত্মীয় ছাড়া কেউ হাহাকার করে না? অনাত্মীয়ের বিয়োগে কেউ আন্তরিক শোকপ্রকাশ করে না এইটেই নিয়ম। তবু আমি আশা করছি কেন যে, আমাদের শোকে ভারতবর্ষ-সুদ্ধ লোক হাহাকার করবে? করা তো নিয়ম নয়। কিন্তু তবু আশা করছি, কামনা করছি, দাবি করছি, আন্দোলন করছি ওরা আমাদের নিতান্ত আপন লোক, আমাদের ক্ষতিপূরণ করুক। ওরা করছেও, তবু আমরা সন্তুষ্ট হচ্ছি না। হচ্ছি না, কারণ মনে করেছিলাম ওরা আমাদের আত্মীয়, ওরা আমাদের নিতান্ত আপন লোক, আমাদের দুঃখের সময় আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে, কিন্তু এখন আবিষ্কার করেছি ওরা আমাদের অনাত্মীয়, ওরা পর, ওরা যা করছে তা বাইরের শোভনতা বজায় রাখবার জন্য করছে, অভিনয় করছে (আমাদের নেতাদের মধ্যে যে অনেক উঁচুদরের অভিনেতা আছেন তাতে সন্দেহ কি) সত্যিকার দরদ ওদের মধ্যে নেই, থাকতে পারে না, থাকা নিয়ম নয়। আসলে ওরা মনে মনে জানে আমরা সব অবাঞ্ছিত জঞ্জাল, কিন্তু বাইরে ভান করছে অন্যরকম। সাপ ছুঁচোকে ধরেছে, গিলতেও পারছে না, ফেলতেও পারছে না। এ রকম

ধরনের নানা কথা মনে হয়। আবার এ-ও মনে হয়, আমার এ সব ধারণা হয়তো ভুল। হয়তো ওরা—কিন্তু আমার এই মনে হওয়াটাকে আবৃত করে ফেলে একটা নিদারুণ ছবি। শিয়ালদহ স্টেশনের উদ্বাস্তুদের ছবি। বুলিকে আর মাকে খোঁজবার জন্যে অনেকদিন সেখানে ঘুরেছি। যে সব মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখেছি তা ভোলবার নয়। মনুষ্যত্বের এত বড় লাঞ্ছনা, এত বড় অপমান যারা নির্বিকার হয়ে সহ্য করছে তাদের আপন লোক বলে ভাবি কি করে? একদল অসহায় নরনারী, শিশু, পীড়িত, জলে ভিজছে, রোদে পুড়ছে, শীতে কাঁপছে, উঞ্ছবৃত্তি করছে সুসভ্য কলকাতা শহরের বুকে। লোকে যেমন সার্কাসের জন্তু-জানোয়ার দেখতে যায়, তেমনি তাদের দেখে দেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদল দর্শক। মুখে সহানুভূতি প্রকাশ করছে, কিন্তু কেউ ক্ষেপে উঠছে না, কেউ জোর গলায় বলছে না, আমরা এ অত্যাচার সহ্য করব না— যতক্ষণ না এর প্রতিকার হচ্ছে ততক্ষণ আমরা কলকাতাবাসীরা অন্নজল ত্যাগ করব, আমরাও ওদের সঙ্গে মরব। দেখেছি, উপহাসও করছে অনেকে! এরা কি সভ্য? এরা কি আপনার লোক? প্রথম বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় রাখী বন্ধন উৎসব হয়েছিল শুনেছি, সেই ইংরেজ রাজত্বের আমলেও অচেনা লোকের হাতে রাখী বেঁধে দিয়ে একান্ত আত্মীয়তার দাবি জানিয়েছিল বাঙালী। কবি গান গেয়েছিলেন, 'বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন, এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান'। এ সব কি স্বপ্ন? ভাঙা বাংলা জোড়া লেগে আবার ভেঙে গেল। বিদেশী রাজনৈতিকের চালে হেরে গেল আমাদের শিক্ষিত প্রতিভাবান আদর্শবাদী নেতারা? অস্বীকার করবার উপায় নেই, হেরেই গেছে। ডিভাইড অ্যান্ড রুলের শোণিত খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে আমাদের আদর্শ, আমাদের স্বপ্ন, আমাদের আশা-ভরসা। আমরা পথের ভিখারী হয়ে গেলাম, আর সেই ভিখারীর ভিড়ে হারিয়ে গেল আমার মা আর বুলি... একই কথা রোজ নানাভাবে লিখি, একই রহস্যের সমাধানের চেষ্টা করি নানা পথ দিয়ে, কিন্তু সমাধান করতে পারি না কিছু। মনে হয় সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। যা সরল ছিল, তা কুটিল থেকে কুটিলতর হচ্ছে প্রত্যহ। একদিন যাকে ভালো মনে করেছিলাম, সুন্দর মনে করেছিলাম, তার বীভৎস কুৎসিত রূপ আজ দেখতে পেয়েছি। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে, অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু তলিয়ে যেতে যেতেও ভাবছি তল একটা মিলবে। এ আশার, এ ভাবনার শেষ নেই। মস্তিষ্ক এখনও দেউলিয়া হয়ে যায়নি, এখনও তাই আশা করছি আমাদের এই গাঢ় তমিস্রাকে ছিন্নভিন্ন করে উদিত হবে সুস্থ-বুদ্ধির প্রদীপ্ত সূর্য। এখনও আশা করছি। কিন্তু খুব বেশি হতাশ হবার কারণ আছে কি? আমরা চেয়ে থাকি রাজনৈতিক নেতাদের দিকে, দেশের লোকের দিকে তাকাই কি? এ-দেশে কি সবাই খারাপ? তা তো নয়। যে ডাক্তারবাবুর আশ্রয়ে আছি, তিনি তো খারাপ লোক নন। তিনি পূর্ববঙ্গের বাঙাল, না. পশ্চিমবঙ্গের 'ঘটি' তা জানি না, তা জানবার প্রয়োজনও হয় না। তিনি রাজনীতির ধার ধারেন না, খবরের কাগজ একটা আসে বটে, কিন্তু সেটা তিনি পড়েন কি না সন্দেহ, কোন 'ইজ্‌ম্‌'-এরও দাস নন। তিনি মানুষ, মনে হয় কোনো দেশেই তাঁকে বেমানান মনে হবে না। তাঁর বিশাল সহৃদয়তা, তাঁর প্রবল প্রাণপ্রাচুর্য, তাঁর সহজ জীবন-জিজ্ঞাসা তাঁকে সর্বত্রই সুশোভন করবে। কোথাও তিনি বেসুরো হবেন না। তাঁর যে বৈশিষ্ট্য আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে তা তাঁর নিত্য নূতন দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি রোজই যেন নূতন করে আত্ম-আবিষ্কার করছেন, নতূন করে প্রকাশ করছেন নিজেকে। তিনি

কবে যে কোথায় যাবেন, কি করবেন, কি ভাববেন, কি লিখবেন তা আগে থাকতে নিজেও জানেন না বোধ হয়। কিন্তু যখনই যেখানেই যান পরিবেশের সঙ্গে মিশে যান একেবারে। তাঁর লেখার বিষয়ও অদ্ভুত। আকাশের মতো তাঁর মন। কখন কোন্ রূপে সে যে সাজবে তা সে নিজেও জানে না।''

গণেশ হালদার এই পর্যন্ত লিখেছিলেন, এমন সময় বাধা পড়ল। টোকা পড়ল বাইরের দরজায়। বিস্মিত হলেন একটু। এ সময়ে তাঁর কাছে কেউ তো আসে না। কপাটে খিল বন্ধ ছিল, উঠে গিয়ে খুলে দিলেন। দেখলেন, দাঁড়িয়ে আছে এক অর্ধ-অবগুণ্ঠিতা নারী। তারপর চিনতে পারলেন! ডাক্তার ঘোষালের নুক্। সে কিছু বলল না, নমস্কার করে একটা খামের চিঠি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। বিস্মিত হালদার মশাই দেখলেন চিঠির উপর তাঁরই নাম লেখা, গোটা গোটা মুক্তোর মতো অক্ষরে। চিঠিটা পড়ে আরও বিস্মিত হলেন।

সবিনয় নিবেদন,

সেদিন ডাক্তার ঘোষাল আপনাকে আমার সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা সর্বৈব মিথ্যা। আপনি যদি সে কথা বিশ্বাস করেন বড়ই দুঃখিত হব। আপনি যেদিন এ-শহরে এসেছেন, তার আগে থেকেই আপনার নাম শুনেছিলাম। আপনাকে এখানে স্কুলে চাকরি দেওয়া নিয়ে নানারকম আলোচনা হত আমাদের বাসায়। ডাক্তার ঘোষালের কাছে যে মিস্টার সেন আসেন তাঁর ইচ্ছা ছিল না যে, আপনি এখানে আসেন। ডাক্তার সুঠাম মুখার্জির জোরে আপনি এখানে এসেছেন। আগে মিস্টার সেন আপনাদের স্কুল কমিটিতে ছিলেন, আপনাকে নেওয়া হল বলে সেখান থেকে ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছেন। আপনাকে নিয়ে ডাক্তার ঘোষালের বাড়িতে প্রচুর আলোচনা হত। তাই আপনার কথা আমি জানতাম। তার পর আপনি যখন এলেন তখন কনকের মুখে আপনার অজস্র প্রশংসা শুনলাম। কনক আমার ভাই-পো, আপনার ছাত্র। তার চোখে আপনি দেবতা। স্কুলের সব ছাত্রই আপনাকে ভক্তি করে। সেদিন আপনি যখন ডাক্তার ঘোষালের বাড়িতে এসেছিলেন, তখন আমি জানতাম না যে, আপনি এসেছেন। আপনি যে ও-বাড়িতে আসতে পারেন এ আমি ভাবতেই পারিনি। সেদিনকার ঘটনার জন্য আমি লজ্জিত। আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার মতো লোক যে আমার সম্বন্ধে হীন ধারণা পোষণ করে থাকবেন, এ আমি সহ্য করতে পারব না, তাই এই চিঠি লিখলাম। যদি বিরক্ত হয়ে থাকেন, ক্ষমা চাইছি। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি— ঝিনুক।

চিঠিটা পড়ে ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন গণেশ হালদার। রূপ মানুষকে অভিভূত করে। অভিভূত হয়েই বসে রইলেন খানিকক্ষণ। এ রকম রূপ আগে কখনও দেখেননি তিনি। বুলবুলিও দেখতে সুন্দর ছিল, তার সৌন্দর্যের মধ্যেও একটা শিকারীভাব ছিল যার জন্যে তিনি তার নাম দিয়েছিলেন মাছরাঙা, কিন্তু ঝিনুকের সৌন্দর্য আরও তীক্ষ্ণ, ও যেন আসল ইস্পাতের একখানা ঝকঝকে তলোয়ার, আর সেই তলোয়ারের উপর প্রতিফলিত হয়েছে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। গণেশ হালদার কৌতূহলী হলেন। এ মেয়ে ঘোষালের পাল্লায় পড়ল কি করে? সেদিন তো চাবির গোছা ফেলে দিয়ে চলে এসেছিল, আবার কি ফিরে গেছে? পর পর এই

ধরনের চিন্তার ঢেউ তাঁর মনে এসে লাগতে লাগল খানিকক্ষণ। তারপর যে কথাটা বিদ্যুৎ-চমকের মতো অভিভূত করে ফেলল তাঁকে তা ঝিনুকের চিঠির একটি লাইনেই ছিল—'ডাক্তার মুখার্জির জোরে আপনি এখানে এসেছেন।' ডাক্তার মুখার্জির জোরে? তিনি তো স্কুল কমিটিতে নেই। তাঁর টাকাতেই যে স্কুলের লাইব্রেরিটি হয়েছে, এ খবরও তিনি জানতেন না। লাইব্রেরিতে ডাক্তার মুখার্জি নিজের নাম দিতে দেননি। স্কুল কমিটির একটা অধিবেশনে এই দানের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়েছিল কেবল। কিন্তু এ-সব খবর হালদার জানতেন না। ডাক্তার মুখার্জিও তো তাঁকে কিছু বলেননি। অন্য লোক হলে আস্ফালন করত, নানা ছুতোয় প্রকাশ করত আমিই তোমার চাকরিটা করে দিয়েছি। কিন্তু উনি ঘুণাক্ষরেও এ প্রসঙ্গ তোলেন নি একদিনও। উনি এত অন্যমনস্ক থাকেন যে, সে কথা হয়তো ওঁর মনেও নেই। হঠাৎ গণেশ হালদারের ইচ্ছা হল ডাক্তার মুখার্জিকে একটা প্রণাম করে আসেন। কিন্তু তা সম্ভব নয়। উনি এখন তাঁর কুকুর--মুরগি-বাগান-আকাশ নিয়ে এমন একটা নিশ্ছিদ্র পরিবেশে বসে আছেন যে, তার মধ্যে ঢোকা শক্ত, ঢোকা উচিতও নয়, কারণ হালদার মশায়ের ধারণা, এ সময়ে কেউ গেলে তিনি বিরক্ত হন। তাই তিনি তাঁর সেই খাতাটা বার করলেন যাতে তিনি তাঁর লেখা টোকেন। ওই লেখার মধ্যেই তিনি যেন আত্মপ্রকাশ করেছেন, ওইগুলো পড়লেই তাঁকে যেন ঠিক চেনা যায়, এই তাঁর ধারণা। তাঁর ইচ্ছে খাতাটার একটা নামকরণ করেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কোনও পছন্দসই নাম তাঁর মাথায় আসেনি। মাত্র তিনটি লেখাই তিনি দিয়েছেন এ পর্যন্ত, তিনটি লেখা তিন রকম। সেইগুলোই আবার পড়তে লাগলেন তিনি। সেই পড়ার ভিতর দিয়েই যেন তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করতে লাগলেন। লেখাগুলো তিনি সাজিয়েছেন, 'অ', 'আ' প্রভৃতি বর্ণমালা দিয়ে। তিনি ভেবে রেখেছেন শেষ পর্যন্ত বইটার নাম 'বর্ণমালা'ই দেবেন। নানা রঙের খেলা আছে লেখাগুলোর মধ্যে। তা ছাড়া আর একটা মানেও হয়। ওঁর রহস্যময় চরিত্রগ্রন্থ এই সব বর্ণমালাতেই বিধৃত হয়ে আছে। পড়তে লাগলেন।

মানুষ বিদ্যায় বুদ্ধিতে অনেক বড় হয়েছে, সে মাটির নীচে শহর বসাবার কল্পনা করেছে, আকাশে উঠে চাঁদের সঙ্গে মিতালি জমাবার চেষ্টায় আছে, তার এ ক্ষমতাও নাকি হয়েছে যে, সে নিজের ঘরে বসে সুইচ্ টিপে আর একটা দেশ ধ্বংস করে দিতে পারে। সবই হয়েছে, কিন্তু বিনয়ের বড়ই অভাব। আমাদের এখানকার পণ্ডিতজীর অগাধ পাণ্ডিত্য। তিনি সংস্কৃতে সপ্ত-তীর্থ তো বটেনই, ইংরেজী, বাংলা এমন কি উর্দুতেও তাঁর প্রচুর জ্ঞান। কিন্তু বাইরে তার কোনও প্রকাশ নেই। মুখে সর্বদাই স্নিগ্ধ মধুর হাসি। তাঁর সঙ্গে কথা কইলে মনে হয় গঙ্গায় অবগাহন করলাম। সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই বিনয়ী। কেন জানি না, ইংরেজী-নবীসরা একটু যেন উদ্ধত। তাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ একটু যেন বেশি কঠোর। তারা আঙুরের মতো নয়, বেলের মতো। বেলটিকে কিন্তু অহঙ্কারের গজ গ্রাস করেছেন। এ শিক্ষার বাইরের চেহারাটা হয়তো বজায় থাকবে কিছুকাল, কিন্তু সেটা থাকবে গজভুক্তকপিত্থবৎ। অন্তঃসারশূন্য। এই কথা লিখলাম একটি লাল সুতোর জন্য। সেদিন মাঠে একপাল শালিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টা করেছিলাম। ওরা সমাজবাসী মানুষের সঙ্গে অনেকটা পরিচিত। ভাবছিলাম, হয়তো আমল দেবে, কিন্তু দিলে না। দেখলাম, ওদের সঙ্গে আলাপ করাও সহজ

নয়। শুনেছি দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে পাখিদের সঙ্গে ভাব করেছিলেন, কিন্তু আমি পারলাম না। দেখলাম, একটু কাছাকাছি এলেই ওরা 'পিড়িং' করে উড়ে পালাচ্ছে সদলবলে। তবু কিন্তু আমি হাল ছাড়িনি, ওদের পিছু পিছু সন্তর্পণে যাচ্ছিলাম ধান গম ছড়াতে ছড়াতে, হঠাৎ চোখে পড়ল একটা লাল সুতো এঁকেবেঁকে পড়ে আছে মাঠের মধ্যে। কুড়িয়ে নিলাম। দেখলাম শুধু লাল নয়, হলদে এবং জরির সুতোও জড়িয়ে আছে ওর সঙ্গে। আর সুতোর দুই প্রান্তে দুটি রঙিন থোপ্না। বুঝতে বাকি রইল না যে, এটা রাখী, এর আড়ালে লুকিয়ে আছে অনেক শ্রদ্ধা-স্নেহ-ভালোবাসা, অনেক ঐতিহ্য, মনে হল কোথা থেকে এল এটা এখানে? এমন সময় সুট্ করে পাশ দিয়ে চলে গেল একটা সাইকেল। দেখলাম, তরুণ প্রফেসার হরেন চট্টখণ্ডী যাচ্ছেন। পরনে সাহেবী পোশাক, চোখে কালো গগলস্। কিছুদূর গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন আমার দিকে, তারপর যেমন যাচ্ছিলেন যেতে লাগলেন। একটা নমস্কার করলেন না, আমাকে যে চেনেন তারও কোনও আভাস ফুটল না তার মুখে। অথচ উনি আমাকে খুব চেনেন, ওঁর ছেলেমেয়ের চিকিৎসা করেছি বিনা পয়সায়, কিন্তু তাঁর ব্যবহার থেকে মনে হল, আমি তাঁর অপরিচিত। মনে হল দেখতে পাননি। তবু আমি ডাকলাম। সাইকেল ঘুরিয়ে ফিরে এলেন তিনি। সবিস্ময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে ডাকছিলেন? কণ্ঠস্বরে আত্মীয়তার সুর একটুও বাজল না, বরং মনে হল বিরক্তই হয়েছেন। বললাম, 'এই রাখীটা এখানে কি করে এল বলুন তো?' শুনে তিনি বিলিতী কায়দায় শ্রাগ (shrug) করলেন, তারপর বললেন, 'এ বিষয়ে কোনও আলোকপাত করতে পারলাম না, সরি।' এই বলে আর একবার শ্রাগ্ করে চলে গেলেন। তাঁর কথার মধ্যে কোনও অভদ্রতা নেই, কিন্তু কেমন যেন সহৃদয়তার অভাব। ব্যবহারটা অনাত্মীয়সুলভ। অথচ, ভগবান জানেন, ওঁর সঙ্গে আমি বরাবর আত্মীয়সুলভ ব্যবহারই করে এসেছি। অনেকক্ষণ সাইকেলটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখি শালিকগুলো ফিরে এসে আমার ছড়ানো খাবারগুলো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। আমি সেদিকে চাইতেই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলে গেল। ওরা চুরি করে খাচ্ছিল। আমার সঙ্গে ওদের কোনো আত্মীয়তার বন্ধন হয়নি। আত্মীয়তা হওয়া সত্যিই সহজ নয়। তার জন্যে তপস্যা করতে হয়। দস্যু রত্নাকর যতদিন দস্যু ছিল, কেউ তার কাছে আসেনি। কিন্তু যেই সে তপস্যা শুরু করল অমনি বল্মীকরা এসে বাসা বাঁধল তার চারদিকে, আপন লোক মনে করে। বাল্মীকি সম্পূর্ণরূপে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে। বল্মীকরা তাঁর মধ্যে বেসুরো কিছু পায়নি, পেলে আসত না। একটু দূরেই দেখতে পাচ্ছি কাক, শালিক আর ফিঙেরা এক-সঙ্গে চরে বেড়াচ্ছে, একটুও ঝগড়া করছে না। কেউ কারো কাছ থেকে পালাচ্ছে না। সকলেই নিজের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত, কিন্তু কেউ কারো সঙ্গে ঝগড়া করছে না। এইসব ভাবছিলাম, এমন সময় দেখতে পেলাম পণ্ডিতজী আসছেন মাঠামাঠি। মাঠের ওপারেই তাঁর বাড়ি। হেঁটে রোজ শহরে আসেন। স্কুলের পড়ান, নানা জায়গায় টিউশনি করেন। সব পায়ে হেঁটে। তাঁর দাড়ি-গোঁফ কিছুদিন বেশ পরিষ্কার কামানো থাকে, কিছুদিন পরেই আবার দেখা যায়, তাঁর সারা মুখ কাঁচা-পাকা দাড়ির জঙ্গলে ভরে গেছে। এর অর্থ, নাপিতের যখন দেখা পান তখনই কেবল কামিয়ে নেন। স্থান কালের বিচার নেই। কখনও বা ঘোর দুপুরে রাস্তার ধারে কারও বারান্দায় বসে, কখনও বা কোনও সকালে রাস্তার ধারে ইঁটের উপর বসে, কখনও বা সন্ধ্যার সময়

কোনও গাছতলায়। নাপিত পেলেই তাকে ধরে ফেলেন। কিন্তু যে নাপিত তাঁর প্রিয় নাপিত— বিষুণ ঠাকুর— তার দেখা কালে ভদ্রে পান। যোগাযোগটা প্রায়ই হয় না। আমাকে দেখেই নমস্কার করে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন তিনি। তাঁকেও রাখী সমস্যার কথা বললুম। তিনি হেসে উত্তর দিলেন, 'রাখী কোথা থেকে এল তা ভেবে আর কি হবে। রাখী পেয়েছেন, রাখী বেঁধে দেবার লোকও পেয়ে গেলেন, আসুন আপনার হাতেই বেঁধে দি ওটা।' বললাম, 'যদি বাঁধতেই হয় আমিই আপনার হাতে বাঁধব। তিনি যাবার জন্য পা বাড়ালেন। তাঁর দাঁড়াবার সময় নেই। তিনি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে এম-এ ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের পর্যন্ত পড়ান। বললেন, 'মাপ করবেন, দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে গল্প করবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অনেক জায়গায় যেতে হবে।' নমস্কার করে চলে গেলেন। পণ্ডিতজীর সঙ্গে হরেনবাবুর তফাত আছে। তবে আর একটা কথাও গোপনে লিখে রাখছি। পণ্ডিতজী লিখিত, সহৃদয়, সদাহাস্যমুখ, কিন্তু সংস্কারমক্ত নন। আমাকে অবশ্য খাতির করেন খুব, কিন্তু আমি 'মচ্ছিখোর' বাঙালী বলে আমার প্রতি তাঁর ঈষৎ বিরূপতা আছে। মুখে সেটা বলেন না কখনও, কিন্তু বুঝতে পারি।

তিনটি ছোট ছোট গাছ, পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে, যেন তিনটি যমজ ভাই। দেখছিলাম নহরপুর মাঠে। প্রথমে দেখতে পাইনি, পরে দেখেছিলাম। সেদিন দুপুরবেলা মাঠে গিয়ে প্রথমেই তাক লেগে গিয়েছিল আকাশে মেঘের কাণ্ডকারখানা দেখে। যত রকম মেঘের কথা বইয়ে পড়েছি সব সেদিন হাজির ছিল আকাশে। স্তর মেঘ, স্তূপ মেঘ, পালক মেঘ, ফড়িংয়ের মতো হালকা মেঘ, পাহাড়ের মতো ভারী মেঘ, ঝরনার মতো মেঘ, প্রপাতের মতো মেঘ, সব ছিল। এ ছাড়া ছোট ছোট তুলোর টুকরোর মতো দুষ্টু মেঘও ছিল কয়েকটা, তারা ছটফট করে বেড়াচ্ছিল। মেঘ নিয়েই আত্মহারা হয়ে ছিলাম, গাছ তিনটিকে দেখতেই পাইনি। আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম, হোঁচট খেলাম হঠাৎ, ওই গাছ তিনটেতেই হোঁচট খেলাম। ওরা যেন নিজেদের দিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে নিলে। দেখলাম, বাঃ, কি চমৎকার! ছোট ছোট তিনটি গাছ, কিন্তু কি রূপ তাদের! কতদিন নহরপুর মাঠে এসেছি, এদের তো দেখতে পাইনি। চোখেই পড়েনি। দেখলাম ভালো করে। মনে হল, ওরা যেন মুচকি হেসে বলছে, আকাশের দিকে সমস্তক্ষণ চেয়ে চেয়ে বেড়াচ্ছ, মাটির দিকেও দৃষ্টি নামাও একটু, আমাদের সঙ্গেও আলাপ কর, আমরা কি ফেল্‌না? এতদিন এদের দেখতে পাইনি বলে অনুতাপ হল। ঝুঁকে ভালো করে দেখলাম। পাতার রং শুধু সবুজ নয়, সবুজের ভিতর থেকে সোনালী আভাও বেরুচ্ছে। পাতাগুলি গোল গোল, অনেকটা সেকালের দু-আনির মতো। পাতা দিয়ে গাছগুলি আপাদমস্তক ঢাকা। পাতাগুলির ধারে ধারে খুব সরু সরু দাঁতের মতো। কিন্তু দাঁত মনে হয় না। মনে হয় যেন গানের গিটকিরি। প্রত্যেক পাতার মাঝখানে একটি করে সাদা ফোঁটা আর তার থেকে পাঁচটি করে সরু শির সরল রেখায় চলে গেছে পাতার ধারের দিকে। মনে হয় যেন ছোট ছোট সোনালী-সবুজ জাপানী ছাতা। তিনটি গাছ ভরতি এক রকম জাপানী ছাতা। অবাক্ লাগল এ জিনিস আগে দেখতে পাইনি কেন। এর নাম কি? কি এর পরিচয়? জানবার চেষ্টা করলাম। দেখলাম, একটু দূরে মাঠে চাষারা জমি চষছে। তাদের একজনকে ডেকে এনে দেখালাম গাছগুলো। বললে, জংলী গাছ। এর বেশি আর কৌতূহল নেই তাদের। আমরা নিজেদের শিক্ষিত বলে মনে করি, তাই জ্ঞানের পরিধি

আরও বাড়াতে চাই। আমি তাই গাছের ছোট একটি ডাল কেটে নিয়ে গেলাম বোটানির প্রফেসার হর্ষনাথবাবুর কাছে। তিনি উল্টে-পাল্টে দেখলেন, তারপর বললেন, এর ফুল ফল না দেখলে বলা যাবে না এটা কোন্ ন্যাচারাল অর্ডারের। শুধু ডাল বা পাতা দেখে বলা যাবে না। আমার কেমন যেন রোখ চড়ে গেল, গাছটার নাম জানতেই হবে। তার পরদিন আবার গেলাম সেখানে। দুর্গাকে নিয়ে গেলাম। পচা গোবর আর পাতার সারও নিয়ে গেলাম সঙ্গে করে। দুর্গা গাছ তিনটির গোড়া বেশ ভালো করে খুঁড়ে সার দিয়ে দিলে। মনে হল গাছ তিনটি খুশি হয়েছে, তাদের সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন একটা তৃপ্তির স্নিগ্ধ ভাতি বিকীর্ণ হচ্ছে। আশা হল। এইবার তাড়াতাড়ি ফুল ফুটবে। প্রায় রোজই যেতাম গাছ তিনটিকে দেখতে। সানন্দে লক্ষ করতাম, সার পেয়ে বেশ সতেজ হচ্ছে। পাতাগুলো আরও সুন্দর হয়েছে। ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতাম, বড় ভালো লাগত। ক্রমশ কেমন যেন স্নেহ জন্মে গেল গাছ তিনটের উপর। রোজ যেতে আরম্ভ করলাম। মাস খানেক পরে মনে হল কুঁড়ি হয়েছে যেন। আনন্দে অধীর হয়ে পড়লাম। কিন্তু হায়, আমার ভাগ্য লাউথার সাহেবের ভাগ্যের মতো নয়। লাউথার সাহেব এ-দেশে চাকরি করতে এসে অনেক পাখির ছবি তুলেছেন। শুধু পাখির নয়, পাখির বাসার, ডিমের আর বাচ্চার। সহজ কাজ নয়, খুবই কঠিন। এর জন্যে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন ভদ্রলোক। একবার মানভূমে গিয়ে তিনি 'ক্রেস্টেড সুইফট' নামক পাখিটি দেখতে পেলেন। এ পাখির ছবি তুলতে হবে। শুধু ছবি নয়, পাখি ডিমে বসে তা দিচ্ছে— এই রকম একটি ছবি। পাখিটি তাল-চোঁচ জাতীয় পাখি, মাথায় কিন্তু বুলবুলির মতো ঝুটি আছে, খুব ছটফটে ছোট্ট পাখি। অনেক খুঁজে খুঁজে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন একটা গাছের ডালে ওর বাসা রয়েছে, একটা পাখি বসে তা-ও দিচ্ছে। কাছেই মাচা বাঁধলেন। অনেক উঁচু মাচা বাঁধতে হয়েছিল, পাখিটাকে ক্যামেরায় নাগালের মধ্যে আনতে। ভয় ছিল এই সব তোড়জোড় দেখে পাখিটা না উড়ে যায়। কিন্তু সে উড়ল না। সাহেব ঠিক করলেন, তার পরদিন এসে ফটো তুলবেন। কিন্তু তার পরদিন এসে দেখলেন পাখি নেই, ভাঙা ডিমটি নিচে পড়ে রয়েছে। তাঁর শিকারী 'সকরু' আরও বাসার খবর নিয়ে এল, কিন্তু সে-সব জায়গায় মাচা বাঁধবার সুবিধা নেই। কিন্তু তিনি থামলেন না, ক্রমাগত সন্ধান করে যেতে লাগলেন। এক বছর সন্ধানের পর তবে তাঁর আকাঙক্ষা পূর্ণ হয়েছিল। চমৎকার ফটো তুলেছিলেন তিনি, ফটোটা তাঁর বইয়ের প্রথমেই আছে। কিন্তু আমার আকাঙক্ষা পূর্ণ হল না। একদিন গিয়ে দেখলাম কুঁড়িগুলি প্রায় ফোট-ফোট হয়েছে, পাপড়িগুলির স্বর্ণাভা ফুটে বেরুচ্ছে সবুজের ধার দিয়ে দিয়ে। আশা করলাম, কাল এসে নিশ্চয়ই পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুলগুলি দেখতে পাব। কিন্তু পেলাম না— এসে দেখি গাছ নেই। সেখানে কতকগুলি মহিষ চরে বেড়াচ্ছে। বুঝলাম, গাছগুলি তাদের উদরে গেছে। খুব কষ্ট হয়েছিল। অনেকদিন আগের ঘটনা এটা, তখন কষ্ট হয়েছিল, এখন হাসি পায়। নিজেকেই বলি, গাছকে দেখে আনন্দ পেয়েছিলে এই যথেষ্ট, যতটুকু পেয়েছিলে ততটুকুতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত ছিল। তুমি ওর নাম জানবার চেষ্টা করতে গেলে কেন? তাইতেই কষ্ট পেলে। জ্ঞানের কি শেষ আছে? কত জানবে? তারপর, তারপর ... এ যে অশেষ।

মাস্টার মশাই, আমার এই সব রাবিশ টুকে যাচ্ছেন এ কথা ভেবে আমি বড়ই সঙ্কোচ

বোধ করছি। কিন্তু কি করব, যা করছি তা আপনারই অনুরোধে। আপনাকে কাজ দেবার জন্যে আমাকে এই অকাজ করতে হচ্ছে।

আজ একটা বড় মজার লোক দেখেছি। আমি যা দেখব বলে মাঠে আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে গিয়েছিলাম, সেটাও দেখেছি, অগস্ত্য নক্ষত্রকে, এ লোকটা ফাউ। আমার বাড়ি থেকে অগস্ত্য নক্ষত্রকে দেখা যায় না। কারণ, আমার বাড়ির দক্ষিণ দিকটায় লম্বা লম্বা গাছ থাকাতে দক্ষিণ আকাশটা ঢাকা থাকে। তাই অগস্ত্যকে দেখবার জন্য আমি মাঠে যাই মাঝে মাঝে। এ নক্ষত্রটির উপর আমার পক্ষপাতিত্ব আছে। এর কাবণ, ওর সঙ্গে ইতিহাস জড়িত আছে খানিকটা। পাথুরে-প্রমাণ-ওলা, ইতিহাস নয়, পুরাণ-কথা। শোনা যায়, অগস্ত্য মুনির শিষ্য বিন্ধ্য পর্বতের নাকি খুব বাড় বেড়েছিল, সে নাকি আকাশ ছোঁয়ার বাসনায় ক্রমাগত মাথা উঁচু করে চলেছিল। যখন সূর্য-চন্দ্রের গতি রুদ্ধ হবার মতো হল তখন অগস্ত্য ঋষি তাঁর শিষ্যের কাছে গেলেন। এখন ভালো শিষ্যেরাও সবাই গুরুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে না, তখন উদ্ধত শিষ্যরাও গুরুর পায়ের কাছে মাথা নোয়াত। গুরুদেবকে দেখে প্রণাম করলেন বিন্ধ্য মাথা নুইয়ে। অগস্ত্য বললেন, আমি দক্ষিণে যাচ্ছি, যতদিন সেখান থেকে না ফিরি ততদিন তুমি মাথা নত করেই থাক। অগস্ত্য আর দক্ষিণ থেকে ফেরেননি। বিন্ধ্য পর্বতের উচ্চ শিরকে চিরকালের মতো অবনত করে দিয়ে গেছেন তিনি। এই পৌরাণিক গল্পের সঙ্গে তাল রেখে অনেকে কল্পনা করেন যে, অগস্ত্য নামক ঋষি দাক্ষিণাত্যে আর্যসভ্যতা প্রচার করতে গিয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে দুরারোহ বিন্ধ্য পর্বত লঙঘন করতে হয়েছিল। এখন এভারেস্ট লঙঘনকারীকে আমরা যে মর্যাদা দিই, তখন তাঁকে সেই মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। তিনি দাক্ষিণাত্য থেকে আর ফিরতে পারেননি, তাই দক্ষিণ আকাশের ওই উজ্জ্বল নক্ষত্রটার নাম দেওয়া হয়েছিল অগস্ত্য। কিংবা এ-ও হতে পারে, বিন্ধ্য পর্বত নামে কোনও শক্তিমান অনার্য নেতা ছিলেন, অগস্ত্যের কাছে হার মেনেছিলেন তিনি। এ সব সত্য কি মিথ্যা তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না কখনও। এ কাহিনী আমার মানসকাননে কল্পনার ফুল ফোটায়, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। শিশুরা যেমন ঠাকুমাদের মুখে রূপকথা শুনে আত্মহারা হয়, আমিও তেমনি পুরাণের রূপকথা শুনে হই। আমি যেন একজন পিঙ্গলকেশ নীল-চক্ষু গৌরবর্ণ যুবককে কল্পনা-নেত্রে দেখতে পাই। তিনি বিরাট বিদ্বান, নিপুণ বিচারক, ক্লান্তিহীন পর্যটক। দাক্ষিণাত্যের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, প্রচার করছেন আর্য ধর্মের মহিমা। যে দাক্ষিণাত্যকে আজ আমরা দেখছি কন্যাকুমারীতে, মীনাক্ষী মন্দিরে, চিদম্বরমে, যার অপরূপ প্রকাশ মূর্ত হয়ে আছে অসংখ্য মন্দিরে, যে বাণী পরে নূতন ভাষা পেয়েছিল শঙ্করাচার্যের জীবনে— এ সবের আদি জনক হয়তো অগস্ত্য, তিনি যে বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন তাই পরে মূর্ত হয়েছে এক নূতন সভ্যতায়। অগস্ত্যের দিকে চেয়ে চেয়ে সেদিন এই সব কথাই মনে হচ্ছিল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল বেচুর হয়তো শীত করছে। বেচুকে মোটরটা রবিনসন সাহেবের বাড়িতে রাখতে বলেছিলাম। রবিনসন অনেকদিন আগে মারা গেছে। এখন তার প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা বাড়িটা একজন মারোয়াড়ীর বাগানবাড়ি। কয়েকটা মালী ছাড়া আর কেউ থাকে না। বেচু সঙ্গী পাবে বলে ওইখানে গাড়িটা রাখতে বলেছিলাম। হুইসল্ বাজিয়ে পা চালালাম রবিনসনের বাড়ির দিকে। অনেক দূর চলে এসেছিলাম আকাশ

দেখতে দেখতে, মনে হল বেচু হয়তো হুইসল্ শুনতে পাবে না এতদূর থেকে। অগস্ত্যের কথা ভাবতে ভাবতেই পথ চলছিলাম। ... হঠাৎ অনুভব করলাম আমার সামনে আরও দুটো লোক যাচ্ছে। অন্ধকারে তাদের দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু তাদের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। প্রথমে যার কথা শুনতে পেলাম তার গলা খুব মোটা। মনে হল হিসেব দিচ্ছে। বলছিল, এই শোন না, টিকে দু' আনার, তামাক ছ' আনার, আলু আধ সের চার আনার, কপি একটা পাঁচ আনার। হঠাৎ তাকে থামিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় লোকটি সরু গলায় বলে উঠল— আরে, হয়েছে, হয়েছে, অত হিসেব দিতে কে বলেছে তোকে। তোর কাছ থেকে আমি সাড়ে তিন টাকা পাব, বাস্ সোজা কথা। মোটা গলা প্রতিবাদ করল তৎক্ষণাৎ— কি করে সাড়ে তিন টাকা পাবে তুমি! দিয়েছিলে তো চার টাকা। হিসেবটা শোন না ঃ টিকে দু'আনার, তামাক ছ'আনার, আলু চার আনার এই তো বারো আনা হল। তাছাড়া কপি একটা পাঁচ আনার, সতেরো আনা হল, বুটের ডাল এক পো ছ'আনা, তেইশ আনা হল, এক আনা পালং শাক, চব্বিশ আনা, তার মানে দেড় টাকা। আবার সরু-গলা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, আরে বাপু কে চাইছে তোর কাছে হিসেব, তুই আমার আপন লোক, তুই কি ঠকাবি না, তোকে আমি অবিশ্বাস করছি? অত হিসেবে কাজ কি, আমি তোর কাছে সাড়ে তিন টাকা পাব— এই তো সোজা হিসেব বাপু। তোর কাছে হিসেব চাইছে কে? কেন্ বকে মরছিস? মোটা গলার তখন ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বলে উঠল, এ শালার কাণ্ড দেখেছ! এর পর লোক দুটো রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হল। তাদের কথা আর শুনতে পেলাম না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমার মোটরের আলোও দেখা গেল। এতদূর থেকে বেচু হুইস্‌লের শব্দ শুনেছে দেখে মনে মনে তার শ্রবণশক্তির প্রশংসা করলাম। বেচু যখন পড়ে না, অপেক্ষা করে, তখন দুটো হাঁটুর মধ্যে তার মুণ্ডটা ঢুকিয়ে দিয়ে তার উপর একটা চাদর ঢাকা দিয়ে কূর্মাকৃতি হয়ে বসে থাকতে ভালোবাসে। কিন্তু এই অবস্থাতেও সব দেখতে পায়, সব শুনতে পায়। পাতলা রোগা লোক শরীরটাকে যেমন খুশি দোমড়াতে মোচড়াতে পারে। সার্কাসে ও অনায়াসে ভালো চাকরি পেতে পারত। সেদিন মোটরে যেতে যেতে অগস্ত্য এবং সাড়ে তিন টাকার হিসাব দুটোই পাশাপাশি মনে ফুটে উঠতে লাগল। মনে হল এই আমাদের জীবন। গাম্ভীর্য এবং হাস্যরস, উচ্চ এবং তুচ্ছ, জীবন এবং মৃত্যু, সুখ এবং দুঃখ পাশাপাশি ফুটে উঠেছে সর্বদা। কখনও আমরা দেখতে পাচ্ছি, কখনও পাচ্ছি না। আর একটা মজাও আছে। যেটাকে আমরা হাস্যরস ভাবছি, তুচ্ছ বলে অবজ্ঞা করছি সেটা আসলে হয়তো হাস্যরসও নয়, তুচ্ছও নয়। তা হয়তো খুব করুণ, খুব গম্ভীর গভীর ব্যাপার। ওই সাড়ে তিন টাকার সম্পূর্ণ রহস্য যদি উদ্ভেদ করতে পারতাম তা হলে হয়তো দেখা যেত যে, ওই সরু-গলার কাছে সাড়ে তিন টাকা হয়তো জীবন-মরণ সমস্যা, লোভে পড়ে নানারকম জিনিস কিনে ফেলেছে, কিন্তু সাড়ে তিনটে টাকা ওর নিতান্ত প্রয়োজন। তাই সাড়ে তিন টাকা যে নেই, থাকতে পারে না এ কথাও কিছুতেই স্বীকার করতে চাইছে না, স্বীকার করতে ওর বুক ফেটে যাচ্ছে।

আমি একজন লোকের কথা জানি, তার একমাত্র ছেলে বিদেশে হঠাৎ মারা গিয়েছিল। সে লোকটি কিন্তু কোনোদিন স্বীকার করেনি যে তার ছেলে মারা গেছে। বলত, আমার ছেলে মরেনি, মরতে পারে না, ওসব ভুল খবর। একদিন-না-একদিন সে ফিরে আসবেই এ বিশ্বাসকে

সে প্রাণপণে আঁকড়ে ছিল। উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকত বাড়িতে। বাড়ির সামনে গাড়ি কিংবা রিক্‌শা থামলে দৌড়ে বেরিয়ে আসত, ভাবত ছেলে এসেছে। সবাই তাকে পাগল ভাবত। কিন্তু সে যদি পাগল হয় আমরা অনেকেই তা হলে পাগল; কারণ আমরা অনেকেই এমন অনেক অসম্ভব আশা আঁকড়ে বসে আছি। শুধু বসে নেই, উৎকর্ণ উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছি। তাকেই কেন্দ্র করে ঘুরে মরছি নানান জটিল পথে। তারই প্রেরণা অদ্ভুতভাবে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করছে। আগেকার যুগের অ্যাল্‌কেমিস্টরা বহু রকম জিনিস ফুটিয়ে গলিয়ে সোনা তৈরি করবার চেষ্টা করেছিলেন। এ যুগের হিটলার নিজেকে আর্য মনে করে আর্য-রাষ্ট্র স্থাপন করতে চেয়েছিলেন বহু-আঁসলা (শুধু দো-আঁসলা নয়) নাৎসীদের নিয়ে। এঁরা বিপক্ষ দলের যুক্তি শুনতে চান না, হিসাব মানতে চান না, এঁরা সবাই ওই সরু-গলা লোকটার দলে, সে তার সাড়ে তিন টাকার দাবি কিছুতেই ছাড়তে চায় না। এই সূত্র ধরে আরও অনেক এলোমেলো দর্শন, অনেক আগড়ম-বাগড়ম কথা মনে আসছে। এমন কি, আমাদের আত্মসম্মান বলিদান দিয়ে এই মুর্খ দেশে যাঁরা আদর্শ ডেমক্রাসি প্রবর্তন করবেন বলে আশা করে আছেন, তাঁদের সম্বন্ধেও দু-চার কথা বলতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু আপনার ধৈর্যের একটা সীমা আছে এ কথা মনে পড়াতে থেমে গেলাম।

এগুলো আবার পড়ে প্রচুর আনন্দ পেলেন হালদার মশায়। তাঁর মনে হল ডাক্তারবাবুর কাছে একবার যাই। তাঁর শেষ যে লেখাটা তিনি কাল দিয়েছেন সেটা যদিও তিনি সব পড়তে পেরেছেন, তবু পড়তে পারেননি এই ছুতো করে তাঁর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। কাগজটা হাতে করে বেরিয়ে পড়লেন। বেরিয়েই মনে হল না মিথ্যার আশ্রয় নেব না, এমনিই যাই। কিন্তু যেতে পারলেন না শেষ পর্যন্ত। গোয়ালের থামটার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন ডাক্তারবাবুর কাণ্ডকারখানা। অনুভব করলেন, ওর মধ্যে গেলে ছন্দ-পতন ঘটবে।

ডাক্তারবাবু মুরগিগুলোকে খাওয়াচ্ছিলেন। ওদের প্রত্যেকের নাম আছে। পেট্‌কি, ছুটকি, সাঁওতালনী আর রেজলি। পেট্‌কি আর ছুটকি লেগহর্ন, সাঁওতালনী আর রেজলী দেশি। এই চারটি মুরগি, আর মোরগটার নাম পুরো ইংরেজি, মিস্টার চ্যান্টিক্লিয়ার (Chanticlear), সংক্ষেপে চ্যান্টি। বিজয় একটা ছোট টুকরিতে ধান-গম-মকাই একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে এসেছিল মাইজির কাছ থেকে। ডাক্তারবাবু সেগুলো ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন আর ধমক দিচ্ছিলেন সাঁওতালনী আর রেজলিকে, ওরা পেট্‌কি আর ছুটকির কাছ থেকে কেড়ে খাচ্ছিল বলে। এই এক অদ্ভুত স্বভাব ওদের—বিশেষ করে দেশি মুরগিগুলোর—নিজেদের সামনে খাবার থাকতেও ওরা অপরেব কেড়ে খাবে। ডাক্তারবাবু নীতি উপদেশ দিতে দিতে এমনভাবে ধমকাচ্ছিলেন, যেন ওরা মানুষ। চ্যান্টিকেও ধমকাতে হচ্ছিল। সে নিজে না খেয়ে— কোঁ-কোঁ-কোঁ-কোঁ করে আহ্বান করছিল তার প্রেয়সীদের নিজে না খেয়ে ওদের খাওয়াবে! ডাক্তারবাবু বললেন, তুই আগে নিজে খা, ওদের খাবার তো রয়েছে। বিজয় বিজ্ঞের মতো বললে, বলা বাদমাছ্ ছে (বড় বদমাশ)। ডাক্তারবাবু বললেন, তুমিও কম বদমাশ নও। কাল আমার খবরের কাগজ ছিঁড়েছ কেন? বিজয় ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাববার চেষ্টা করল। তারপর হেসে ফেলল দাঁত বার করে। বললেন, ওক্‌লামে ছবি ছেলে (ওতে ছবি ছিল)। ডাক্তারবাবুর কাছেও এ যুক্তিটা অকাট্য মনে হল। বললেন, ও।

তারপর ছুটে এল রকেট উন্মত্ত ঝড়ের মতো, তাড়া করে গেল মুরগিগুলোকে। তারা কলরব করে ছুটে পালাল। এতেই রকেটের আনন্দ। সে ওদের কামড়াতে চায় না, ওদের সঙ্গে হুড়োহুড়ি করতে চায়। ডাক্তারবাবু গর্জন করে উঠলেন, রকেট, রকেট। রকেট থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ঘাড়টা ঈষৎ নিচু করে সম্ভবত মুচকি হাসিটাই গোপন করে ফেলল। 'কাম হিয়াল্'— তর্জনী তুলে আদেশ করল বিজয় চোখ বড় বড় করে। কাম হিয়ার, কাম হিয়ার, ডাকতে লাগলেন ডাক্তারবাবু। রকেট একছুটে চলে এল ডাক্তারবাবুর কাছে আর লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে এমন করতে লাগল যেন কিছুই হয়নি। কাম হিয়ার এন্ড সিট— আবার আদেশের সুরে গর্জন করে উঠলেন ডাক্তারবাবু। ছিট ছিট,— বিজয়ও বলল। তারপর আড়চোখে চেয়ে দেখল ডাক্তারবাবুর দিকে। তাঁর গর্জনে সেও একটু ভয় পেয়েছিল। রকেট মাথা হেঁট করে বসল এসে ডাক্তারবাবুর সামনে। তার কান ধরে ডাক্তারবাবু বললেন, মুরগিদের তাড়া করেছিলি কেন? অ্যাঁ? কুঁই কুঁই করতে লাগল রকেট ল্যাজ নেড়ে নেড়ে। ভুটান আর জাম্বুও এল ছুটে। ভুটান বিস্মিত। জাম্বু একটু যেন খুশি। রকেটের চ্যাংড়াপনা তার ভালো লাগে না। রকেটের উপর তার হিংসাও আছে একটু। ডাক্তারবাবু রকেটের কান ছেড়ে দিলেন।

"শেক্ হ্যান্ডস্।"

রকেট থাবা তুলে ধরল ডাক্তারবাবুর দিকে। ডাক্তারবাবু তার সঙ্গে শেক্‌হ্যান্ড করলেন। আনন্দের আভা ফুটে উঠল রকেটের চোখে মুখে। সে বুঝল বিপদ কেটে গেছে। তারপর যা করল তা সে প্রায়ই করে, ডাক্তারবাবুর কোলে মাথা গুঁজে লম্বা ল্যাজটা নাড়তে লাগল। ডাক্তারবাবুও তার কানে পিঠে ল্যাজে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন তাকে। তাঁর আদরের ভাষা অদ্ভুত।

"মখমল কেনো, বাঘ-নেজু, নাক-ভিজে, গুন্টু-মুখো, পাজি, পাজি— পাজকু।"

এত আদর খেয়েও রকেট কোল থেকে মুখ তোলে না। তার ভাবটা যেন এত বকেছ, কান মলে দিয়েছ, আরও আদর চাই। ডাক্তারবাবু আর এক প্রস্থ আদর করলেন।

"রকেট, রকটি, রক, রকাই, রুকলি-রু, রুকি, রুম—"

রকেট খুশি হল এবার। আর, একবার শেক্‌হ্যান্ড করে কাছেই বসল। ভুটানও মহাখুশি, কৃতিত্বটা যেন তারই। সে পিছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে একবার নেচে নিলে। জাম্বু কিন্তু সন্তুষ্ট নয়। সে ছোট্ট একটু হেঁচে গা দুলিয়ে চলে গেল অন্যদিকে, তার ভাবটা যেন এসব আদিখ্যেতা আমার ভালো লাগে না। এমন সময় ডাক্তারবাবু দেখতে পেলেন মাস্টার মশাইকে। এমনভাবে চাইলেন যেন অচেনা লোককে দেখছেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিই ওই রকম, কেউ যেন তাঁর চেনা নয়, কেউ যেন আপন নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি যা বললেন তার সঙ্গে তাঁর দৃষ্টির মিল পাওয়া গেল না।

"আসুন মাস্টার মশাই। কি খবর?"

গণেশ হালদার এগিয়ে এসে হেসে বললেন, "আপনি রকেটকে যে সব নামে আদর করছিলেন তা বড় অদ্ভুত লাগল। মখমল-কেনো, বাঘ-নেজু এসব কথা তো আগে শুনিনি কোথাও।"

তুবড়ি ছুটল ডাক্তারবাবুর কণ্ঠে।

"সমাস করে ওসব আমি নিজেই তৈরি করেছি। মখমলের মতো কানের স্পর্শ যার সে মখমল-কেনো, বাঘের মতো লম্বা লেজ যার সে বাঘ-নেজু, গুন্টু-মুখো মুখ যার সে গুন্টু-মুখো। আরও কত তৈরি করি যখন যা মনে হয়—"

"চমৎকার হয়েছে কথাগুলো।"

"অবর্ণনীয়কে বর্ণনা করবার হাস্যকর প্রচেষ্টা। কিন্তু কিছু হয়নি। যাক ও কথা। একটু আগে আমাদের পাড়ায় এক রোমাঞ্চকর কাণ্ড ঘটে গেল, তার খবর পাননি নিশ্চয়। রীতিমতো দাঙ্গা—"

"দাঙ্গা? না কোনও সাড়াশব্দ পাইনি তো।"

"সাড়াশব্দ পাওয়া উচিত ছিল, কাকগুলো ডাকছিল তো খুব।"

"কিসের দাঙ্গা?"

"একটা বাজ এসে বসেছিল ওই ইউক্যালিপটাস গাছের উপর। আর যায় কোথা! যত কাক আর ফিঙে লেগে পড়ল তার বিরুদ্ধে। বাজটাও কিছুতে যাবে না, কখনও এ গাছে বসছে, কখনও ও গাছে বসছে, কিন্তু ওরাও না-ছোড়। শেষ পর্যন্ত তাকে পাড়া ছাড়া করে তবে ছাড়লে। বহিঃশত্রুকে বিতাড়ন করে ওই দেখুন না, বিজয়গর্বে বসে আছে সব।"

ডাক্তারবাবু উদ্ভাসিত চক্ষে একদল কাককে দেখালেন। টেলিগ্রাফের তারের উপর সার বেঁধে বসে আছে বিজয়ী বীরের মতো। একটু দূরে ফিঙেও বসে আছে দুটো।

ডাক্তারবাবু ফিঙে দুটোকে দেখিয়ে বললেন, "ওই যে ফিঙেদের দেখছেন, ওরা মহা ওস্তাদ লোক। বিখ্যাত ভিংরাজ পাখি ওদের আত্মীয়। ওরা শুধু যোদ্ধা নয়, বড় আর্টিস্টও। চমৎকার গান করে। অবশ্য কান পেতে না রাখলে ওদের গান শোনা যায় না। একদিন শোনাব আপনাকে।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, "ওরা তো ফরমাশ মতো গাইবে না। যখন গাইবে তখন হয়তো আপনাকে পাওয়া যাবে না। পাখিদের গান শুনতে হলে কান পেতে থাকতে হয়। হলদে পাখিগুলো আরও দুষ্টু, লুকিয়ে বেড়ায়, তারপর পাতার আড়াল থেকে হঠাৎ এমন একটা মিষ্টি সুর ছাড়ে যে, চমকে যেতে হয়।"

পাখির বিষয়ে আরও হয়তো বলতেন। কিন্তু বাধা পড়ল।

কাউ এসে হালদার মশায়কে নমস্কার করে একটা চিঠি দিয়ে চলে গেল।

"কার চিঠি?"

"ডাক্তার ঘোষালের।"

"আলাপ করেছেন নাকি?"

"গিয়েছিলাম একদিন।"

"কি লিখেছেন?"

"ওঁর সঙ্গে দেখা করতে লিখেছেন আজ সন্ধ্যার সময়।"

"লোকটি করিৎকর্মা। ও রকম লোকের সঙ্গে ভাব-সাব রাখা ভালো।"

গণেশ হালদার নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। চিঠিটা পড়লেন আর একবার। চিঠিটির লেখবার ধরন অদ্ভুত।

প্রিয় হালদার মশায়,

টু কোট দ্বিজেন্দ্রলাল— আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে যদি মদীয় কুটিরে আপনার পবিত্র পদরজঃ ঝাড়েন আমার চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার পাইবে। টু কোট ঘোষাল— প্লীজ কাম টু মাই প্লেস দিস ইভনিং, ও ডার্লিং। ঘোষাল।

।। পাঁচ ।।

সন্ধ্যার একটু পরেই গণেশ হালদার ডাক্তার ঘোষালের বাড়ির দিকে গেলেন। একটি সরু গলির মধ্যে ডাক্তার ঘোষালের বাড়ি। আশেপাশে আর বাড়ি নেই তেমন। ফাঁকা পড়তি জমি পড়ে আছে দু'দিকে। নির্জনতার জন্যেই সম্ভবত বাড়িটি পছন্দ হয়েছিল ডাক্তার ঘোষালের। শহরের মধ্যে অথচ কেমন যেন পাড়াগাঁ পাড়াগাঁ ভাব। গলির মধ্যে ঢুকেই হালদার মশায় উচ্চকণ্ঠের বাদ-প্রতিবাদ শুনতে পেলেন। ঘোষালের বাইরের ঘরে বসে কারা যেন তর্ক করছে। হালদার দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওই তর্ক-বিতর্কের মধ্যে ঢুকতে তাঁর প্রবৃত্তি হল না। ভাবলেন, ফিরে যাই। কিন্তু ফেরা হল না, বাইরের কপাটটা খুলে গেল এবং কাউ ছুটে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার ঘোষাল এবং ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার উপর। তারপর তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন ঘরের ভিতর।

কাউ চেঁচাতে লাগল, "আমার পাওনা আমাকে চুকিয়ে দিন। যদি না দেন, আমি যেমন করে পারি আদায় করে নেব।"

তার চেয়েও উচ্চকণ্ঠে গর্জন করে উঠলেন ঘোষাল, "চোপ রও হারামজাদা। হালদার মশায় এলে, তিনি যা দিতে বলবেন তাই দিয়ে দেব। তার আগে তুমি এক পাও নড়তে পাবে না এখান থেকে। তোমার পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে নিয়ে রসিদ লিখে দিয়ে তবে যাবে। কে দাঁড়িয়ে ওখানে?"

হালদার মশায়ের অস্পষ্ট মূর্তিটা দেখতে পেয়েছিলেন ঘোষাল।

"আমি—"

আমতা আমতা করে হালদার মশায় বললেন।

"আমি কে? হু ইজ আই?"

"আমি হালদার।"

"ও আসুন, আসুন।"

সঙ্গে সঙ্গে সুর করে গেয়ে উঠলেন, "তোমারি পথ চেয়ে বসে আছি বঁধু হে, জানালার কিনারে।"

তারপর হালদার কাছে আসতেই ফিসফিস করে বললেন, "সব ফাঁস হয়ে গেছে। The cat is out of the bag, কাউ জানতে পেরেছে যে, সে আমার ছেলে এবং যা বলেছিলাম, as I predicted, একদম বদলে গেছে। বনবেড়াল এখন টাইগারের প্লে করছে। আসুন, ভিতরে আসুন।"

হালদার মশায় ভিতরে গিয়ে দেখলেন কাউ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওষ্ঠাধর দৃঢ়নিবদ্ধ, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, চোখ দুটো জ্বলছে।

"কী ব্যাপার?"

হালদার মশাই সহজ হবার চেষ্টা করে মুচকি হেসে চাইলেন কাউ-এর দিকে। ঘোষালও নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল। কাউ কোনো জবাব দিলে না।

ঘোষাল বললেন, "ব্যাপার হচ্ছে এই, কাল থেকে ওঁর ধারণা হয়েছে উনি কাউ নন, উনি কর্ণ। আসল কর্ণ সূর্যের সম্পত্তি ক্লেম করেননি, উনি করছেন। ওঁর এক মা— কুন্তী বলতে পারেন তাঁকে—হাজির হয়েছেন হঠাৎ শূন্য থেকে। She has materialised from nowhere, ছেলেকে এসে এই মন্ত্রণা দিয়েছেন। Well, I am game, আমার কিচ্ছু আপত্তি নেই। আপনি দু' পক্ষের কথা শুনে যা বলে দেবেন তাই আমি দিয়ে দেব। আপনাকেই আমরা সালিস মানছি।"

"আমাকে! আমাকে এসবের মধ্যে টানছেন কেন!"

"আমি টানিনি, নুক টেনেছে। আমি বলেছিলাম মিস্টার সেন আর পাণ্ডা যা ঠিক করে দেবে, আমি তাই মেনে নেব। কাউ তাতে রাজি নয়, ওরা নাকি আমার পেটোয়া লোক। তখন নুক ওকে পরামর্শ দিয়েছে আপনাকে সালিস মানতে। ও তাতে আপত্তি করেনি। It is Nook's selection."

এই বলে তিনি হাঁটু নাচাতে নাচাতে শিস দিতে লাগলেন এবং টেবিলে আঙুলের টোকা দিয়ে তাল রাখতে লাগলেন শিসের সঙ্গে সঙ্গে।

হালদার বললেন, "নুকই বা আমাকে এসবের মধ্যে টানছে কেন?"

"নুকের বদ্ধ ধারণা হয়েছে আপনি মহাপুরুষ। হয়তো সত্যিই আপনি মহাপুরুষ। মহাপুরুষরা প্রায়ই আপনার মতো ভীতু লোক হয়। কিন্তু মহাপুরুষ অর নো মহাপুরুষ, কাজটি আপনাকে করে দিতে হবে।"

গণেশ হালদার বড়ই বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন। মাথা চুলকোলেন একবার, তারপর কাশলেন। শেষে বললেন, "আচ্ছা ভেবে দেখি।"

"ভেবে দেখবার তো সময় নেই। ও মাগীকে আজই বিদেয় করতে হবে। I must drive her out to-day."

যদিও গণেশ হালদারের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, তবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কাকে?"

"ওই কুন্তীকে। কাউ, তোমার গর্ভধারিণীকে ডাক। এখুনি ফয়সালা হয়ে যাক।"

কাউ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এইবার বলল, "আমার মায়ের সম্বন্ধে মুখ সামলে কথা বলবেন তা বলে দিচ্ছি।"

বলেই বেরিয়ে গেল সে।

কাউ-এর ভাব-ভঙ্গি দেখে বেশ একটু অবাক হয়ে গেলেন গণেশ হালদার। প্রথম দিন তাকে খুব নীরব নিরীহ মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন মনে হল ঠিক উলটো। একটা আগ্নেয়গিরি যেন এতদিন চুপচাপ ছিল। এইবার নিজ মূর্তি ধরেছে।

একটু পরেই কাউ-এর পিছু পিছু একটি আধঘোমটা দেওয়া লম্বা মেয়ে-মানুষ এসে ঘরে ঢুকল। রাঘব ঘোষাল গণেশ হালদারের দিকে চেয়ে ভুরু দুটো ঈষৎ নাচালেন। ভাবটা এইবার আপনার কাজ শুরু করে দিন। ইতস্তত করতে লাগলেন হালদার, কিন্তু এটাও বুঝলেন কিছু একটা করতে হবে, ফাঁদে পড়ে গেছেন, পালাবার উপায় নেই।

জিজ্ঞেস করলেন, “আপনারা কি চান, খুলে বলুন।”

মেয়েটির উত্তর শুনে চমকে যেতে হল তাঁকে। মেয়েটি খোনা।

বলল, “শুঁনেচি, রাঁঘব এঁক লাঁখ টাঁকা জঁমিয়েছে। আঁমি ওঁর স্ত্রী, কাঁলুঁ ওঁর ছেঁলেঁ। আঁমাদেঁর দুঁ'জনের সঁব সুঁদ্ধ পঁচাত্তর হাঁজাঁর টাঁকাঁ পাঁওয়াঁ উঁচিত। কিঁন্তু আঁমরাঁ পঁঞ্চাশ হাঁজাঁর পেঁলেই চঁলেঁ যাঁব।”

রাঘব ঘোষালের মুখে একটা নীরব হাসি ফুটে উঠল। গণেশ হালদার কয়েক মূহুর্তে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনার আর কিছু বলবার আছে?”

“নাঁ। আঁমি টাঁকাঁ পেঁলেঁই চঁলে যাঁবঁ।”

রাঘব ঘোষাল তখন বললেন, “এইবার আমার কথা শুনুন। আমার প্রথম কথা, আমি উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তুরা যে এ-দেশে কি দুর্দশায় আছে তা আপনার অবিদিত নেই। সবাই জানে মিস্টার সেনের অনুগ্রহে এখানে কোনোরকমে টিকে আছি। আমার একটা ডাক্তারি পেশা আছে বটে, কিন্তু আমি সাব-অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন, মাসে দুশো টাকাও রোজগার করতে পারি না, আপনি খোঁজ করলে বুঝতে পারবেন অধিকাংশ লোকই আমাকে ফি দেয় না। উদ্বাস্তু কলোনীর ডাক্তার হিসেবে শ'খানেক টাকা মাইনে পাই। সব মিলিয়ে কোনোক্রমে দিন গুজরান করি। আমার মতো দরিদ্র লোক এক লাখ টাকা জমাবে এ কি সম্ভব? আমার ব্যাঙ্কের খাতা দেখলেই বুঝতে পারবেন কোনোরকমে চালাচ্ছি আমি— হ্যান্ড টু মাউথ। আমার দ্বিতীয় কথা, এই মেয়েটি কালুর মা নয়। একে আমি কখনও দেখিনি। কালুর মা খোনা ছিল না। সে অনেকদিন আগে কালুকে আমার কাছে রেখে চলে গিয়েছিল। কালুকে আমি চ্যারিটি বয় হিসেবে মানুষ করেছি, একে আমি চিনি না।”

“সঁব মিছেঁ কঁথাঁ। আঁমিই কাঁলুঁর মাঁ। আঁমিঁ আঁগেঁ খোঁনাঁ ছিঁলুঁম না। এঁক বঁছঁর আঁগেঁ আঁমাঁর টাঁগরাঁ ছ্যাঁদাঁ হঁয়ে এঁই রঁকঁম হঁয়ে গেছিঁ সঁবই কঁপালেঁর নেঁকঁন।”

ঘোষাল বললেন, “সিফিলিটিক ওম্যান।”

কালুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। কি একটা বলতে গিয়ে সে থেমে গেল হঠাৎ। হাত দুটো মুঠো করে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গণেশ হালদার কাউকে জিজ্ঞেস করলেন, “ইনিই তোমার মা?”

“ইনিই আমার মা।”

কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিল কাউ।

রাঘব ঘোষাল দাঁড়িয়ে উঠলেন এবার। মুখে কপালে একবার হাত বুলিয়ে গির্জায় পাদ্রীরা যেভাবে বক্তৃতা দেয়, সেইভাবে বলতে লাগলেন কাউকে উদ্দেশ করে ঃ

“দেখ কাউ, তুমি যে আমার ছেলে, তার কোনো প্রমাণ নেই। আর এই মেয়েটি যে কোনো কালে আমার স্ত্রী ছিল, তা-ও প্রমাণসাপেক্ষ। এ যা বলছে, তা ডাহা মিথ্যে কথা, আনডাইল্যুটেড লাই। তবে একটা কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে, আমি তোমাকে নিজের ছেলের মতোই মানুষ করেছি, ছেলের মতোই ভালোবেসেছি এবং শেষ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে বাপের মতোই ব্যবহার করে যাব, তুমি যদি ওই স্ত্রীলোকটির ভাঁওতায় না ভোল। তুমি

যদি ওর সঙ্গে জুটে আমাকে চোখ রাঙাও, আমি একটি আধলা দেব না তোমায়। কিন্তু তুমি আগে যেমন ছিলে, তেমনি যদি থাকো তা হলে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, I solemnly promise, তোমাকে আমার উত্তরাধিকারী করে যাব। ওর পাল্লায় পড়ো না তুমি। ও এতদিন কোথায় ছিল? কে তোমাকে এতদিন ক্ষিধের খাবার আর তেষ্টার জল জুগিয়েছে? অসুখের সময় কে তোমাকে ওষুধ খাইয়েছে, সেবা করেছে? এখানে আসবার কিছুদিন আগে আমি পাটনায় ছিলাম, কিন্তু সেখানে তুমি একটা ছুঁড়ির সঙ্গে লট্‌পটিয়ে পড়লে তোমাকে বাঁচাবার জন্যেই তোমাকে নিয়ে সেখান থেকে পালাতে হল আমাকে, যদিও সেখানে আমার প্র্যাকটিস বেশ জমে উঠেছিল। সমস্ত কথা ভালো করে ভেবে দেখ। তুমি এর সঙ্গে জুটেছ কেন?"

"ওঁ জুঁটবেঁ কেঁন, আঁমিই জুঁটেছিঁ ওঁর সঁঙ্গে! আঁমি খেঁতে পাঁই না, ওঁ আঁমার ছেঁলে, তাঁই ওঁকে খুঁজে বাঁর কঁরেঁছিঁ। ওঁকে পেঁটে ধঁরেঁছিলুঁম, ও আঁমাঁকে অঁসঁমঁয়ে দেঁখবেঁ নাঁ? বিঁষয়ের অঁর্ধেক নাঁ নিঁয়ে আঁমি নঁড়ব নাঁ এঁখাঁন থেঁকেঁ।"

গণেশ হালদারের মনে হচ্ছিল অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি যেন একটা পুতিগন্ধময় নোংরা নর্দমার মধ্যে পড়ে গেছেন। শ্বাসরোধ হয়ে আসছিল তাঁর। নর্দমাকে কি করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা যায়, এ কথা ভাবছিলেন না তিনি, তাঁর মনে হচ্ছিল, কি করে এখন উদ্ধার পাওয়া যায়।

রাঘব ঘোষাল তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, "কি করা উচিত বলুন তো এখন।"

গণেশ হালদার ইতস্তত করতে লাগলেন।

"কিছু বলুন, Please say something, don't shut up like a troubled snail. বিপন্ন শামুকের মতো মুণ্ডু টেনে নেবেন না। Thats not manly, ওটা কি মানুষের মতো কাজ?"

হালদার বললেন, "কালু যখন একে নিজের মা বলছে, তখন এর ভারও আপনাকে নিতে হবে। ওকে তো কালু ফেলতে পারবে না। একসঙ্গে যদি দিতে না পারেন, মাসে-মাসে কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিন-না-হয়।"

"বেশ বলুন কত দেব? Name that sum।"

"মাসে পঞ্চাশ টাকার কম কি চলবে আজকাল?"

"বেশ, মাসে পঞ্চাশ টাকাই দেব, কিন্তু ওকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। কাউকে প্রত্যেক মাসে আমি টাকাটা দিয়ে দেব, ও পাঠিয়ে দেবে।"

"আঁমি অঁর্ধেক বিঁষঁয় নাঁ পেঁলেঁ নঁড়বঁ নাঁ এঁখাঁন থেঁকেঁ।"

রাঘব ঘোষাল নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর উঠে গিয়ে কোণের আলমারিটা খুলে তার ভিতর থেকে বন্দুক বার করলেন। তারপর হঠাৎ সেটা তুলে চিৎকার করে উঠলেন, "বেরিয়ে যাও এখান থেকে, গেট আউট।" তারপরেই দড়াম করে শব্দটা হল। চিৎকার করে ছুটে পালাল খোনা মেয়েটা। কাউ দাঁড়িয়ে রইল গুম হয়ে। তারপর সে-ও চলে গেল। পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল নুক।

"কি হল!"

"তাড়িয়ে দিলুম মাগীকে।"

সঙ্গে সঙ্গে নুকও বেরিয়ে গেল।

গণেশ হালদার উঠে দাঁড়ালেন।

"বসুন, বসুন, আপনি যাচ্ছেন কেন, আমাকে এমন বিপদে ফেলে চলে যাওয়াটা কি উচিত হবে? বাঙালীকে বাঙালী না দেখলে আর কে দেখবে! তা ছাড়া আপনিও উদ্বাস্তু, আমিও উদ্বাস্তু, ডবল বন্ধন। বসুন, যাবেন না। হিম্মত করিয়ে।"

ঘাড়ের উপর প্রকাণ্ড থাবার মতো হাত রেখে জোর করে বসিয়ে দিলেন।

হালদার বললেন, "মাপ করবেন আমাকে, এসব খুন-জখমের ব্যাপারে আমি থাকতে চাই না।"

"খুন-জখম কোথা দেখলেন! ব্লাংক ফায়ার করলাম, ওকে ভয় দেখাবার জন্যে, just to scare her away —একবিন্দু রক্তপাত হয়নি, not a drop of blood has been shed! ফায়ার না করলে ও মাগী যেত না। সমানে ঘ্যান ঘ্যান করে অতিষ্ঠ করে তুলত, would have whined and whined till your patience collapsed."

এই বলে ঘোষাল হলদে দাঁত বার করে তাঁর সেই আকর্ণবিস্তৃত হাসিটি হাসলেন।

হালদার জিজ্ঞেস করলেন, "ও, আপনার স্ত্রী নয়?"

"না। তবে আমার রক্ষিতা ছিল কিছুদিন। কাউ ওর ছেলে এ-ও ঠিক। ও যদি বরাবর ফেথফুল থাকত, ওকে আমি ছাড়তাম না। কিন্তু তা রইল না। একদিন গিয়ে দেখি, গজু গাড়োয়ান ওর ঘরে ঢুকেছে। সেই দিনই বললাম, মাপ কর, গজু গাড়োয়ানের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারব না। জগৎসিংহ বা ওসমান হলেও বা কথা ছিল। সেই দিনই I washed my hands, মাগীর প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে চলে এলাম। তারপর ও কাউকে আমার বারান্দায় বসিয়ে রেখে কোথায় যে ভেসে গেল আর টের পাইনি। এখন বারো বছর পরে ফিরে এসে আমার অর্ধেক সম্পত্তি দাবি করছে। Silly—। শুনেছি ওর original বাড়িও এখানে নাকি!"

কিছু একটা বলা উচিত এই ভেবে হালদার বললেন, "কিছু দিয়ে মিটিয়ে নিন—"

"তাই নিতে হবে। কিন্তু সোজায় হবে না। মাসে পঞ্চাশ টাকা দিতে তো রাজি হলাম, নিলে? সোজা আঙুলে ঘি বেরুবে না। আঙুল বেঁকাতে হবে। পাণ্ডার সঙ্গে এখানকার দারোগার খুব দহরম মহরম। সে লোকও খুব জবরদস্ত। কথায় কথায় হান্টার হাঁকরায়। তাঁর কাছে একদিন পিটুনি খাক, তবে ঠিক হবে।"

এমন সময় নুক ফিরে এল।

ঘোষাল সোৎসাহে উঠে দাঁড়ালেন— "তোমার সঙ্গে কিছু কথা হল নাকি?"

নুক জবাব দিল না।

"এ কি, তোমার হাতের চুড়ি গলার হার কোথা?"

এ কথারও কোনো জবাব না দিয়ে নুক ভিতরে চলে গেল।

"দেখলেন, কি কাণ্ড করে এল! এই কিছুদিন আগেই ওকে চুড়ি আর হার গড়িয়ে দিয়েছি তিন হাজার টাকা খরচ করে। স্বচ্ছন্দে দিয়ে চলে এল! নাঃ, অনেক রকম মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করেছি, কিন্তু এরকমটা আর দেখিনি। She is a problem girl, ও মানুষ নয়, মূর্তিমতী হেঁয়ালি একটা—"

হঠাৎ ডাক্তার ঘোষালের মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। দাঁত কিড়মিড় করে ঘুঁষি পাকিয়ে তিনি বললেন, "হারামজাদীকে ঠেঙিয়ে পস্তা উড়িয়ে দেব আজ।"

তিনি ছুটে ভিতরের দিকে যাচ্ছিলেন, গণেশ হালদার তাঁকে আটকালেন।

"না, না, মারধোর করবেন না। বসুন, একটু স্থির হোন—"

রাঘব ঘোষালের মতো বলিষ্ঠ লোককে জোর করে বসাবার সাধ্য হালদার মশায়ের ছিল না। কিন্তু তিনি নিজেই বসে পড়লেন। তাঁর মুখে ফুটে উঠল সবিস্ময় কৌতুকহাস্য। তিনি ভুরু দুটো কপালে তুলে চোখ বড় বড় করে বললেন, "হোয়া—ট্! আপনিও গুড় খেয়েছেন নাকি?"

"গুড় খেয়েছি, মানে ?"

সত্যিই কথাটা বুঝতে পারেননি গণেশ হালদার।

"আমাদের সারকেলে গুড় খাওয়ার একটি মানেই হয়। প্রেমে পড়া! আপনি জানতেন না বুঝি? আপনি একেবারে ভিন্ন জাতের লোক দেখছি! হা-হা-হা! ওর প্রতি হঠাৎ দরদ দেখে সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, খবরদার, ও প্যাঁচে পড়বেন না। কিন্তু সাবধান করা বৃথা। আপনার ভিতর লোহা থাকলে, I mean base metal, ও আপনাকে টানবেই। ও একটি সাংঘাতিক চুম্বক, she is a powerful magnet."

তারপর নিম্নকণ্ঠে বললেন, "সুবেদার, পাণ্ডা দুজনেই হাবুডুবু খাচ্ছে। নুকই এদের ফাঁসিয়ে রেখেছে এখানে। Nook has hooked them here। তাতে আমাদের ব্যবসার সুবিধে হয়েছে খুব। পরে আপনাকে— এই দেখুন, আবার আমি একটা টপ সিক্রেট আপনাকে বলে ফেললুম। বলা উচিত ছিল না।"

তারপর অন্দরমহলের দিকে তাকিয়ে আবার ফিসফিস করে বললেন, "আশা করি নুক শুনতে পায়নি। শুনলে এখনি ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার উপর। ও একটা বাঘিনী। She is a tigress."

গণেশ হালদার সত্যিই বিস্মিত এবং অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

বললেন, "আমি এ রকম মেয়ে দেখিনি—"

"আমি সারা জীবন মেয়েমানুষ চরাচ্ছি মশাই, আমিই কি দেখেছি? দেখিনি। ও না জানে কি, না পারে কি! ইংবিজি জানে, বাংলা জানে, সংস্কৃত জানে, গান গাইতে পারে, মোটর চালাতে পারে, ছোরা খেলতে পারে। তার উপর ওই রূপ। মানুষের কল্‌জের ভিতর বসে যায় একেবারে। হীরের তৈরি বাঘ-নখ একটি।"

অপ্রত্যাশিতভাবে কাউ এসে প্রবেশ করল ভিতর দিক থেকে।

মাসিমা বলছেন, "খাবার দেওয়া হয়েছে, খেয়ে নিতে—

কাউ প্রথমে ঝিনুককে দিদি বলত। ইদানীং কিছুদিন থেকে কেন জানি না, 'মাসিমা' বলছে।

"তোমার মা কোথা গেলেন?"

"আমি জানি না, মাসিমা জানেন।"

"তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে গেলে না?"

"না। মাসিমা এখানে থাকতে বললেন।"

"মাসিমা কি এ বাড়ির মালিক নাকি?"

কাউ এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে বাড়ির ভিতর চলে গেল।

"এ তো আচ্ছা জবরদস্তি দেখছি। আমার বাড়িতে আমি কেউ নই। I am a cipher in my household. কান্ট বি।"

এক লম্ফে ঘোষাল ভিতরের দিকে চলে গেলেন। হালদার ভাবলেন এই সুযোগে সরে পড়ি। কিন্তু তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারলেন না, তাঁর মনে হতে লাগল কে যেন তাঁকে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দিয়েছে চেয়ারটার সঙ্গে। উৎকর্ণ হয়ে বসে রইলেন। ঘোষাল কি বললেন তা শুনতে পাওয়া গেল না। কিন্তু নুকের তীক্ষ্ণকণ্ঠ শোনা গেল একটু পরেই।

"আমার গয়না আমি যাকে খুশি দিয়েছি, তোমার তাতে কি।"

তারপর, "হ্যাঁ, কাউ এখানে থাকবে। ওকে নইলে আমার চলবে না। তোমার ভালোর জন্যেই ওকে যেতে দিইনি। ও এখানে থাকবে, থাকবে—"

এর পরই দড়াম্ করে একটা শব্দ হল। এবং তারপরই আর একটা বিরাট শব্দ হল, মনে হল একটা হাঁড়ি চুরমার হয়ে গেল বুঝি। গণেশ হালদার তড়াক করে উঠে ভিতরে ছুটে গেলেন। গিয়ে যা দেখলেন তা দেখবেন বলে প্রত্যাশা করেননি। দেখলেন, ডাক্তার ঘোষাল সর্বাঙ্গে ডাল মেখে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর কোট প্যান্ট ডালে মাখামাখি, মাথা থেকে কপাল থেকে টপটপ করে ডাল পড়ছে। তাঁর হাতে একটা মোটা লাঠি। ঘরের আর এক প্রান্তে নুক দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে বঁটি। কাউ নেই। গণেশ হালদারকে দেখেই নুক বঁটিটা ফেলে দিয়ে বাইরে চলে গেল।

গণেশ হালদারের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ঘোষাল হেসে ফেললেন, তারপর জিব বার করে ঠোঁটের উপর যে ডালটা পড়েছিল, সেইটে চাটতে চাটতে বললেন, "অদ্ভুত মেয়ে, না? Isn't she interesting?"

গণেশ হালদারও হাসলেন একটু।

"যান, স্নান করে ফেলুন।"

"তা তো ফেলবই। আহা, ডালটার চমৎকার টে-স-ট হয়েছিল। সমস্ত বরবাদ করে ফেললে হারামজাদী।"

"আপনি স্নান করুন। আমি আজ যাই।"

"একটু বসুন না বাইরে। আমি চট করে আসছি—"

"এখন আমার একটু কাজ আছে। কাল না হয় আসব।"

"কাল? জানেন না, কাল always পলাতক? বিশেষ করে আগামী কাল? Tomorrow is very elusive. যাক, আপনি যখন থাকবেন না, যান। Many thanks, Good night"

গণেশ হালদার বেরিয়েই দেখলেন একটা মোটর এসে দাঁড়াল। মোটর থেকেই সুবেদার খাঁ হাঁক দিলেন— "ডাক্তার ঘোষাল, মাল এসে গেছে। আনিয়ে নিন। শ্রীমতী ঝিনুক কোথায়?'

এইটুকু শুনেই গণেশ হালদার চলে গেলেন। তিনি ভাবছিলেন গিয়ে একটু লেখাপড়া করবেন। কিন্তু বিধাতা সেদিন জ্ঞানার্জনের অন্য রকম ব্যবস্থা করেছিলেন। গিয়ে দেখলেন তাঁর বাইরের দরজার কাছে নুক দাঁড়িয়ে আছে।

নুকই এগিয়ে এসে বললে, "আমার দুর্ভাগ্য যে, যখনই আপনি আমাদের ওখানে যাচ্ছেন, তখনই এমন একটা কিছু ঘটছে যাতে আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু

আমার জীবনকাহিনী যদি শোনেন আমাকে অত খারাপ মনে হবে না। আজই আপনাকে শোনাতাম, কিন্তু দেখতে পেলাম মোটর আমাদের বাড়িতে ঢুকল, এখনই আমার খোঁজ পড়বে। তাই এখন আর দাঁড়াতে পারছি না। কিন্তু আপনাকে আমার জীবনের সব কথা বলবার ভারি ইচ্ছে, কখন আপনার সুবিধা হবে বলুন তো?''

''কি করব আমি আপনার জীবনকাহিনী শুনে? শুনে লাভ কি বলুন?''

''আমার তৃপ্তি। হয়তো অন্য লাভও আছে, কিন্তু সে কথা এখন বলা যাবে না। আগে সব শুনুন, পরে বিচার করবেন।''

একটু ইতস্তত করে গণেশ হালদার শেষে বললেন, ''আমি এখানকার স্কুলের শিক্ষক। আমাকে কেন্দ্র করে কোনো খারাপ গুজব রটে এটা আমি চাই না। কিন্তু আপনাদের সংস্রবে এলেই গুজব রটবে। নানা লোকে নানা কথা বলবে। আমি কার মুখ চাপা দেব? সেইজন্য আমি এসবের মধ্যে যেতেই চাইছি না। আমাকে মাপ করবেন।''

''আপনাদের গাঁয়ের গিরিশ বিদ্যার্ণবকে মনে আছে?''

''হ্যাঁ, খুব ছেলেবেলায় তাঁকে আমি দেখেছি। তিনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। তাঁর কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?''

''তিনি আমার বাবা। বাবা আর দাদা রায়টে মারা গেছেন। ডাক্তার ঘোষাল আমাদের দুই বোনকে, এক কাকাকে আর ভাইপোকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। সে সময় ওঁর যে সাহস দেখেছিলাম তা অপূর্ব।''

''আপনি আমাদের গাঁয়ের মেয়ে? আপনাকে কখনও গাঁয়ে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।''

''আমি গাঁয়ে খুব কম থেকেছি। কলকাতায় বোর্ডিংয়ে থেকে পড়তাম। গাঁয়ে বিশেষ যেতাম না, ওই দাঙ্গার ঠিক আগে গিয়ে পড়েছিলাম। আপনার বোন বুলি আমাকে চেনে। তার মুখেই আপনার কথা প্রথম শুনি, তখন আপনি বিলেতে। এখানে আপনি যখন এলেন তখন আপনার নাম শুনে সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু প্রথমে বুঝতে পারিনি যে, আপনি আমাদের গাঁয়েরই গণেশ হালদার। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি—''

''মা আর বুলি কোথায় জানেন?'' ঝিনুকের কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন গণেশ হালদার।

''আপনি শোনেননি?''

''না, আমি কিচ্ছু জানি না। তাদের কোনো খবর যোগাড় করতে পারিনি।''

''আপনার মা গুণ্ডাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছেন। রাধাবল্লভজীর মূর্তিকে কাপড় দিয়ে বুকে বেঁধে দু হাতে দুখানা দাও নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি যুদ্ধ করেছিলেন বলেই বুলি বেঁচেছে।''

''বুলি এখন কোথায়?''

''ঠিক জানি না। কার সঙ্গে যেন কলকাতার দিকে চলে এসেছিল শুনেছি। আমি ঠিক জানি না।''

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন গণেশ হালদার। ঠিক সেই সময় মোটরের হর্নটা খুব জোরে জোরে বাজতে লাগল।

"ওরা আমাকে ডাকছে, আমি যাই।"

ঝিনুক চলে গেল। হালদার দাঁড়িয়েই রইলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে এ সংবাদটা শোনার জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। মনে হল দাঙ্গা হয়ে যাওয়ার অনেকদিন পরে তিনি বিলেত থেকে ফিরেছিলেন। দেশেও গিয়েছিলেন, কিন্তু একটাও চেনা মুখ দেখতে পাননি। গ্রামে পুরোনো লোক কেউ ছিল না। এমন কি, পুরোনো মুসলমানরাও না। গ্রামে পাঞ্জাবী আর বিহারী মুসলমানরা বসবাস করছিল। হঠাৎ একটা বিপুল গর্বে তাঁর মনটা ভরে উঠল। মা যুদ্ধ করতে করতে মারা গিয়েছিলেন। তিনিই বুলিকে রক্ষা করেছেন! সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুমূর্ষু বাবার মুখটাও মনে পড়ল। মৃত্যুশয্যায় শায়িত তাঁর সমস্ত চেহারাটাই ভেসে উঠল চোখের উপর। চোখ বুজেছিলেন তিনি, চোখের দু' কোণ বেয়ে জল পড়ছিল। ছেলেবেলায়-দেখা এই ছবিটাই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল তাঁর চোখে। তিনি নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

।। ছয় ।।

ঝিনুক ফিরে গিয়ে দেখল সুবেদার খাঁ, পাণ্ডা আর ঘোষাল তিনজনেই উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তার প্রত্যাশায়। ঘোষাল স্নান করে কাপড়-চোপড় বদলেছেন। ঝিনুককে দেখে উদ্ভাসিত মুখে এগিয়ে এলেন তিনি, যেন কিছুই হয়নি।

"হ্যালো নুক, কোথায় গিয়েছিলে তুমি? সুবেদার সাহেব অস্থির হচ্ছেন তোমার জন্যে। লালপুরের মাঠে যেতে হবে তোমাকে। এবার জালে অনেক মাছ উঠেছে। It is a big catch this time."

সুবেদার খাঁ সাগ্রহে এগিয়ে এলেন। চুপি চুপি বললেন, 'লালপুর মাঠের কাছে যে গুমটিটা আছে, তার থেকে কিছু দূর পশ্চিমেই ডিস্‌ট্যান্ট সিগনালটা। সেই সিগনালের নীচেই যে ঝোপটা আছে সেইখানেই ব্যাগটা ফেলেছি। গিয়ে নিয়ে এস এক্ষুনি। এত রাত্রে যদিও ওখানে অন্য লোক যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, তবু এখনই নিয়ে আসা ভালো। সাবধানের বিনাশ নেই। তুমি গাড়িটা নিয়ে এখনই চলে যাও।"

ঝিনুক চুপ করে রইল ক্ষণকাল। তারপর বলল, "গতবারের অংশ আমি এখনও পাইনি। তা না পেলে আমি যাব না।"

ঘোষাল আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে বললেন, "ওকে ফাঁকি দেওয়া চলবে না, she is a tough nut, ও বড় শক্ত ঘাঁটি। পাণ্ডা, দিয়ে দাও ওর প্রাপ্যটা—"

পাণ্ডা তৎক্ষণাৎ কোটের ভিতরের পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করে দিলেন নুককে।

"দশখানা নম্বরী নোট আছে, গুনে নিন।"

ঝিনুক গুনলে না, নোটের তাড়াটা বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দিল।

"আমরা তা হলে তাসে বসি। সেনও এক্ষুনি আসবে। তুমি আর দেরি করো না। সেন আসবার আগেই তুমি বেরিয়ে পড়।"

ঝিনুক ভিতরে গিয়ে একটা বেঁটে কোট পরে এল। তারপর সোজা গিয়ে স্টিয়ারিং ধরে বসল এবং চমৎকার দক্ষতার সঙ্গে গাড়িটা ব্যাক করে বোঁ করে বেরিয়ে গেল।

ঝিনুক চলে যাওয়ার খানিকক্ষণ পরেই মিস্টার সেন এলেন আর একটা গাড়ি করে, আর তাঁর সঙ্গে তাঁর মেয়ে তনিমা।

তনিমাকে দেখে বিগলিত হয়ে পড়লেন ঘোষাল।

"আরে আসুন, আসুন, আসুন। সূর্য আজ পশ্চিম দিকে উদিত হয়েছে দেখছি, the sun has preferred the west today, what a wonder, কি সৌভাগ্য আমার।"

মুচকি হেসে নমস্কার করলে তনিমা। ঘোষাল প্রতি-নমস্কার করে আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

"আপনাকে দেখে আনন্দও যেমন হচ্ছে, ভয়ও তেমনি করেছে। আপনি যদি আমার বিরুদ্ধে খেলতে বসেন তা হলে তো নির্ঘাত নিঃস্ব হয়ে যাব আজ। You will suck me outright."

মুচকি হেসে তনিমা ঘাড় দুলিয়ে বললে, "তা হলে খেলব না। বাপি, আমি বরং ফিরে যাই, ফিরে গিয়ে গাড়িটা পাঠিয়ে দিই তোমাকে। কেমন?"

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন ঘোষাল।

"আরে না, না, সে কি হয়! আপনার সঙ্গে খেলব, হেরে যাব জেনেও খেলব, আপনার সঙ্গে হেরে যাওয়ার একটা সুখ আছে যে। আজ শুধু আপনার সঙ্গে খেলব না, সর্বস্বপণ করে খেলব। I shall stake everything today."

বক্র দৃষ্টিতে মুচকি হেসে ঘোষালের দিকে চেয়ে রইল তনিমা সেন ঘাড় বেঁকিয়ে। মিস্টার সেনের চক্ষে এসব মোটেই অশোভন ঠেকল না। মিস্টার সেন জাতীয় লোকের কাছে ঠেকে না। তাঁর ডায়োসেসনে-পড়া মেয়ের তিনি ইয়ার। বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ের সঙ্গে পিতার গাম্ভীর্য রক্ষা করাটা তিনি সেকেলে কুসংস্কার মনে করেন। তনিমার গত জন্মদিনে তাকে এক সেট হ্যাভেলক এলিস কিনে উপহার দিয়েছেন। কিছুদিন আগে লোলিটা (ললিতা?) নামক বইটা কিনে নিজে পড়েছেন, মেয়েকেও পড়িয়েছেন, আধুনিক সাহিত্য-কৃতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে।

তনিমা তাস খেলায় নাকি সিদ্ধ-হস্ত। ঠিক তার বাপের উলটো। মিস্টার সেন খেলতে বসলেই হেরে যান। ডাক্তার ঘোষালের কাছে তাঁর নাকি দেড় হাজার টাকার উপর ধার হয়ে গেছে। তাস খেলার ধার! সেই ধার শোধ করবার জন্যে তিনি মাঝে মাঝে তনিমাকে নিয়ে আসেন।

"বাপি থাকব?"

"থাকো না। এসেইছ যখন দু হাত খেলে যাও।"

ঘোষাল দু হাত জোড় করে বললেন, "দয়া করুন, প্লীজ স্টে।"

মিস্টার সেন হেসে উঠলেন। তিনি সাধারণত মুচকি হাসেন, জোরে হাসেন না। কিন্তু যখন হাসেন তখন অদ্ভুত শব্দ হয় একটা। সে শব্দ প্রায় অবর্ণনীয়। মনে হয় কুলকুচো করার শব্দের সঙ্গে হেঁচকি ওঠার শব্দ মিশছে।

পাণ্ডাও অনুরোধ করলেন তনিমা সেনকে। দরবেশ পাণ্ডা বেঁটে মোটা লোক। মনে হয় যেন একটা চতুর্ভুজের উপর তাঁর মুণ্ডু গলা হাত পা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। পিতলের বোতামওলা ঢিলে কালো বা নীল রঙের গলাবন্ধ কোট গায়ে দেন। মুখটাও চতুষ্কোণ, কান দুটোও প্রায় সেই রকম, মনে হয় যেন মুখের অনুকরণ করবাব চেষ্টা করছে। দু থাক চিবুক, ভুঁড়ো নাক, ঝাঁকড়া ভুরু। তাঁর কথাবার্তার মধ্যে একটু যেন হুকুমের সুর থাকে। যখন অনুরোধ করেন তখনও সেই সুরটা বাজে। প্রচুর ঘুষ এবং খোশামোদ পেয়ে পেয়ে এই অবস্থা হয়েছে।

তনিমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "আমাদের সুখী করতে যদি আপনার অনিচ্ছা থাকে, যেতে পারেন।"

তনিমা ঘাড়টি একদিকে কাত করে চোখে মুখে নিরুদ্ধ হাসির আভা বিকীর্ণ করে বললেন, "আচ্ছা, থাকব।"

সুবেদার খাঁ যাবার জন্যে উস্‌খুস করেছিলেন, এ সুযোগ তিনি উপেক্ষা করলেন না।

"আপনারা তো চারজন হয়েই গেলেন। আমাকে ছেড়ে দিন তা হলে আজ। আমি সমস্ত দিন ডিউটিতে ছিলাম, বড় ক্লান্ত লাগছে, বসতে ইচ্ছে করছে না। ডাক্তারবাবুর 'বাইক'টা ঠিক আছে? পেতে পারি?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, সারটেনলি।"

সুবেদার খাঁ বাইকে চড়ে বেরিয়ে গেলেন। সবাই ভিতরে ঢুকে টেবিলের চারধারে বসলেন।

"কাউ, আমাদের কফি দাও।"

ঘোষাল চিৎকার করে দ্বারের দিকে চাইলেন। কাউকে দেখা গেল না।

"কাউ নেই নাকি?"

ঘোষাল ভিতরের দিকে চলে গেলেন।

তারপরই ফিরে এসে বললেন, "নো কাউ, নো নুক। আমিই জলটা চড়িয়ে এলাম ইলেকট্রিক কেতলিতে। কফি না খেলে জমবে না। নুক খানিকটা শিককাবাব বানিয়ে রেখেছে দেখছি। আনব?"

মিস্টার সেন মুচকি হেসে বললেন, "শুধু মাংস কুকুরে খায়। মানুষ মাংসের সঙ্গে আরও কিছু চায়, কি বলেন মিস্টার পাণ্ডা। আমি অবশ্য বাড়িতে এক পেগ চড়িয়ে এসেছি।"

ঈষৎ নাকিসুরে তনিমা বললে, "বাপি, তুমি আজকাল বড্ড বেড়েছ। মাম্‌মি যদি জানতে পারে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করবে।"

ঘোষাল কিছু না বলে আলমারি থেকে এক বোতল হুইস্কি বার করে বললেন, "হিয়ার ইউ আর"—বলেই টেবিলের উপর রাখলেন সেটা ঠক্ করে। তারপর গ্লাস বার করতে লাগলেন।

সকলেরই চোখে মুখে বেশ একটা প্রফুল্ল ভাব ফুটে উঠল।

।। সাত ।।

সেদিন সুঠাম মুকুজ্যের অভিযান একটু নূতন ধরনের হয়েছিল। তিনি সেদিন দিনে না বেরিয়ে অনেক রাত্রে বেরিয়েছিলেন। রেল লাইনের ধারে যে উঁচু টিলাটা ছিল সেইখানেই

গিয়ে উঠেছিলেন তিনি। রাত্রে বেরুলে রকেটকে সঙ্গে নিয়ে বেরোন তিনি। রকেট বাধ্য কুকুর, চুপ করে থাকে তাঁর কাছে, থাবার উপর মুখ রেখে। টুঁ শব্দটি করে না। ডাক্তার মুখার্জির একটা ছোট টেলিস্কোপ আছে। সেইটে নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে বেরোন, রাতের আকাশ দেখতে। মাঝে মাঝে এর থেকে তিনি প্রচুর আনন্দ আহরণ করেন। অনেক দিন আগে সন্ধ্যার আকাশে বৃহস্পতি গ্রহের একটা চাঁদকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। যদিও একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো, তবু এটা যে বৃহস্পতিরই চাঁদ তাতে তাঁর সন্দেহ ছিল না। আনন্দে মেতে উঠেছিলেন সেদিন। তার কিছু দিন পরে একটা বইয়েও পড়েছিলেন যে, ছোট টেলিস্কোপ দিয়েও বৃহস্পতির চাঁদ দেখা যায়। তখন থেকে বৃহস্পতি গ্রহ আকাশে উঠলেই তিনি টেলিস্কোপটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কিছুদিন আগে আর একটি জিনিস দেখেও তিনি প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলেন।

টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে একজায়গায় তিনি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো একটা জ্যোতিষ্ক দেখতে পান। তাঁর মনে হল এ জায়গায় তো এ রকম নক্ষত্র আগে দেখিনি। তাহলে বোধ হয় ওটা ধূমকেতু, আমাদের পৃথিবীর দিকে আসছে। দুই দিন পরেই ঠিক দেখা গেল একটা ছোট ধূমকেতু দেখা দিয়েছে আকাশে।

সেদিন তিনি গিয়েছিলেন অ্যান্ড্রোমিডা (Andromeda) নক্ষত্রপুঞ্জে যে নীহারিকাটা আছে সেইটে দেখতে। এর সম্বন্ধে সেদিন একটা বইয়ে অনেক নূতন খবর পড়েছিলেন, তাই এটাকে আর একবার দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর। অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল দুটি কারণে। প্রথম কারণ অ্যান্ড্রোমিডার সঙ্গে আমাদের রেবতী নক্ষত্র জড়িত। দ্বিতীয় কারণ অ্যান্ড্রোমিডার সম্বন্ধে গ্রীক উপাখ্যানটি। গ্রীক পুরাণে অ্যান্ড্রোমিডা সিফিউস রাজার সুন্দরী কন্যা। কিন্তু সে কন্যার জীবনে নিদারুণ অভিশাপ নেমে এসেছিল তার মায়ের জন্য। তার মা বড়াই করে বেড়াতেন যে, তাঁর মেয়ে Neireidesদের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী। এই কথা শুনে সমুদ্রাধিপতি Poseidon ক্রুদ্ধ হয়ে সিফিউসের রাজ্যে বিরাট ভয়াবহ এক সামুদ্রিক দানবকে পাঠিয়ে দিলেন। সে সিফিউসের (Cepheus) রাজত্ব ধ্বংস করতে লাগল। শেষে অনেক অনুনয় বিনয়ের পর ভবিষ্যদ্বাণী হল যে, সিফিউস যদি তাঁর মেয়েকে ওই দানবের কবলে দিয়ে দেন, তা হলে তাঁর দেশ রক্ষা পাবে। নিরুপায় সিফিউস শেষে তাঁর মেয়ের হাতে পায়ে শিকল বেঁধে তাকে টাঙিয়ে দিলেন এক সামুদ্রিক পাহাড়ের উপর। সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন বীর পারসিউস। এ গল্পটা যখন প্রথম পড়েন (কিছু দিন আগেই পড়েছিলেন গল্পটা) তখন কেন জানি না, তাঁর হঠাৎ মনে হয়েছিল আমাদের দেশবিভাগের কথা। মনে হয়েছিল পাকিস্তানই বুঝি ভারতবর্ষের অ্যান্ড্রোমিডা। যে সর্পিল কুণ্ডলিত নীহারিকাটাকে নিয়ে জ্যোতির্বিদেরা এত গবেষণা করেছেন সেটাকে তিনি কল্পনা করে রেখেছিলেন ওই সামুদ্রিক দানবটার সঙ্গে। পরে অবশ্য তাঁর ভুল ভেঙেছিল যখন পড়লেন এবং প্রত্যক্ষ করলেন যে, সামুদ্রিক দানবটাকে নিয়েও আর একদল নক্ষত্রপুঞ্জ চিহ্নিত হয়ে আছে আকাশে।

সেদিন ওই ছোট সাদা মেঘের মতো নীহারিকাটার দিকে চেয়ে তিনি মনে মনে আকাশ-ভ্রমণ করছিলেন। কয়েকদিন আগেই তিনি গ্রহনক্ষত্রের বই পড়েছিলেন একটা। তার দ্বারা

প্রভাবিত হয়ে তিনি মনে মনে এমন একটা যানে চড়েছিলেন, যার গতি-বেগ মিনিটে এগারো মিলিয়ন মাইল। চলেছিলেন তিনি অ্যান্‌ড্রোমিটার ওই নীহারিকার উদ্দেশে। অঙ্কের হিসাব অনুসারে পৌঁছতে প্রায় দেড় মিলিয়ন বৎসর লাগার কথা। কিন্তু কল্পনায় কি এত সময় লাগে? চাঁদ নিমেষের মধ্যে পার হয়ে গেলেন, তারপরই দেখা গেল আমাদের সুদুরতম গ্রহ প্লুটো, সেটাও পার হলেন। তারপর আমাদের সৌরজগতের এলাকা ক্রমশ পার হতে লাগলেন, দেখলেন সৌরজগতের সীমানার কাছাকাছি নানা চেহারার একদল ধূমকেতু ঘোরাফেরা করছে, সময় হলেই পৃথিবীর সীমানায় এসে চমৎকৃত করে দেবে সকলকে। কিছুক্ষণ পরেই লুব্ধক নক্ষত্রের কাছাকাছি এসে পড়লেন, তারপর স্বাতীর, তারপর জ্যেষ্ঠার। চেনা অনেক নক্ষত্রপুঞ্জ পেরিয়ে যেতে যেতে শুধু নক্ষত্রই দেখলেন না, অনেক জ্যোতির্বাষ্পও দেখলেন, জ্যোতির্ময় মেঘের মতো ঝলমল করছে সব, তারপর... হঠাৎ রকেটের চিৎকারে তাঁর স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। রকেট এক ছুটে টিলা থেকে নেমে চলে গেল ডিসট্যান্ট সিগনালের কাছে। আর তারপরই ঝিনুকের আর্তচিৎকার।

ডাক্তার মুখার্জি কল্পনায় অনেকদূর চলে গিয়েছিলেন, তাই ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে তাঁর কিছু সময় লাগল। করবামাত্রই তিনিও উঠে দ্রুতপদে নেমে গেলেন। রকেট ঝিনুককে কামড়ায়নি, কিন্তু তার চারধারে চিৎকার আর দাপাদাপি করে এমন কাণ্ড করছিল যে, তা কামড়ানোর বাড়া। ডাক্তারবাবু ডাকতেই থেমে গেল রকেট। বিস্রস্তবাসা ঝিনুকের দিকে চেয়ে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন তিনি। ঝিনুক যে ভদ্রলোকের মেয়ে, তা বুঝতে তাঁর দেরি হয়নি। ঝিনুককে তিনি আগে দেখেননি, চিনতে পারলেন না। ঝিনুক কিন্তু তাঁকে চিনেছিল। ডাক্তার মুখার্জি এ শহরের বিখ্যাত ব্যক্তি।

ডাক্তার মুখার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি এ সময়ে এখানে কি করছিলেন? আমার মতো আপনারও নক্ষত্র-দেখার বাতিক আছে নাকি?"

ঝিনুক সপ্রতিভাবে বলল, "না, আমি নক্ষত্র দেখতে আসিনি। একটা ব্যাগ খুঁজতে এসেছি। আমার এক আত্মীয় একটু আগে ট্রেনে আসছিলেন, তাঁর হাত থেকে একটা ব্যাগ পড়ে গেছে এইখানে। সেইটেই খুঁজছি, যদি পাওয়া যায়—"

"ও, তাই নাকি? পেয়েছেন?"

"না, এখনও পাইনি। এইখানেই ঝোপে-ঝাপে আছে কোথাও।"

ডাক্তার মুখার্জি পকেট থেকে টর্চ বার করে দেখতে লাগলেন এদিকে ওদিকে আর রকেট শুঁকতে লাগল ঝিনুককে। একটু পরেই ডাক্তার মুখার্জি বেশ বড় একটা ব্যাগ দেখতে পেলেন।

"এই তো রয়েছে একটা ব্যাগ। এইটে কি?" সুঠাম মুকুজ্যে তুলে নিলেন সেটা।

"এ তো বেশ ভারী দেখছি। এ ব্যাগ তো হাতে ঝুলিয়ে নেবার নয়। কি আছে এতে?"

কি আছে, তা ঝিনুক জানতো না। সোনা-রূপো, হীরে-জহরত, আফিং-কোকেন যে-কোনও জিনিস থাকতে পারে। যারা বে-আইনীভাবে সুবেদার খাঁয়ের মারফত জিনিস পাঠায়, তারাই বলতে পারে, কি আছে ওর মধ্যে। ঝিনুক একজন বাহক মাত্র।

"আমি ঠিক জানি না।"

এর পরই ঝিনুকের গাড়িটা দেখতে পেলেন তিনি। একটু দূরে ছিল সেটা, গাছের আড়ালে।

"ও গাড়িটা কি আপনার?"

"হ্যাঁ।"

"অত দূরে দাঁড় করিয়েছেন কেন? সঙ্গে ড্রাইভার আছে?"

"তবে চলুন, আমিই তুলে দি এটা আপনার গাড়িতে। আচ্ছা দাঁড়ান, বেচুকে ডাকি, বেশ ভারী এটা।"

তিনি পকেট থেকে হুইস্‌ল বার করে ফুঁ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রিভলবারের আওয়াজ হল একটা। গুলিটা ডাক্তার মুখার্জির বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। লাগল না।

"এ কি কাণ্ড।"

সবিস্ময়ে বলে উঠলেন তিনি। ঝিনুকও অবাক হয়ে গেল। প্রথমে সে ঠিক বুঝতে পারেনি। তারপরই পারল। অন্ধকারে সুবেদার খাঁর লম্বা চেহারাটাও দেখতে পেল সে। সুবেদার খাঁ বাইকে চড়ে ঝিনুকের কাছেই এসেছিলেন। এসেই তিনি যখন দেখতে পেলেন যে ঝিনুকের সঙ্গে অপরিচিত কে একজন কথা কইছে, তখনই তাঁর মনে হল, বামালসুদ্ধ ঝিনুক ধরা পড়েছে নিশ্চয়। সম্ভবত পুলিশের কোনো লোক। হয়তো সন্ধেবেলা থেকেই লুকিয়েছিল আশেপাশে। অন্য কোনো সম্ভাবনা কল্পনাই করতে পারলেন না তিনি। তারপর যখন হুইস্‌ল বাজল, তখন তাঁর আর কোনো সন্দেহ রইল না। বুঝলেন পুলিশই এসেছে। তিনি অনায়াসে নিঃশব্দে সরে যেতে পারতেন, কিন্তু ঝিনুককে পুলিশের কবলে ফেলে আর যে-ই পালাক, সুবেদার খাঁ পালাবেন না। তিনি নিমেষের মধ্যে ঠিক করে ফেললেন, এই পুলিশটাকে জখম করে ঝিনুককে নিয়ে পালাবেন তিনি মোটরে করে। সাইকেলটাও তুলে নেবেন মোটরের কেরিয়ারে। তাঁর সঙ্গে একটা লোডেড রিভলভার সর্বদা থাকে।

ঝিনুক তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল সুবেদার খাঁর দিকে। কাছাকাছি এসে বলল, "কি করলেন কি আপনি! উনি ডাক্তার মুখার্জি। ভাগ্যে গুলিটা লাগেনি ওঁকে। ছি, ছি, কি কাণ্ড করলেন বলুন তো—"

রকেট এতক্ষণ চুপ করেছিল, কিন্তু সুবেদার খাঁকে দেখে আবার তেড়ে গেল সে।

'নো রকেট, কাম্ হিয়ার।'

স্থিরকণ্ঠে আদেশ করলেন ডাক্তার মুখার্জি। রকেট চুপ করল। এগিয়ে এলেন সুবেদার খাঁ।

"আমি খুবই দুঃখিত ডাক্তার সাহেব। আমি আপনাকে ঠিক দেখতে পাইনি। আমি খরগোশ শিকার করতে এসেছিলাম। সন্ধ্যার পর এদিকটায় খরগোশ বেরোয়—আমি প্রায়ই শিকারে আসি। আপনার লাগেনি তো?"

"বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা একটু ছড়ে গেছে। বিশেষ কিছু নয়।"

বেচু গাড়ি নিয়ে হাজির হল। ঝিনুকের দিকে চেয়ে প্রশান্ত হাসি হেসে ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "বেচু আপনার জিনিসটা তুলে দিয়ে আসুক।"

ঝিনুক ডাক্তারবাবুর প্রশান্ত হাসি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার ভয় হচ্ছিল কি কাণ্ডই না উনি করবেন। কিন্তু কিচ্ছু করলেন না তিনি।

"বেচু, এই ব্যাগটা ওই গাড়িতে তুলে দিয়ে এস।"

বেচু ব্যাগ নিয়ে চলে গেল।

ডাক্তার মুখার্জি তখন সুবেদার খাঁকে বললেন, "আপনি কেন গুলি চালিয়েছিলেন তা আমি জানি না। কিন্তু একটা কথা জানি—"

শঙ্কিত হয়ে উঠলেন সুবেদার খাঁ।

"কি কথা?"

"এ অঞ্চলে খরগোশ নেই। আমি এ অঞ্চলে প্রায়ই আসি, খরগোশ কখনও চোখে পড়েনি।"

হাসিমুখে চেয়ে রইলেন সুবেদার খাঁর দিকে। তারপর আর একটু হেসে বললেন, "তবে চোখের দৃষ্টি প্রখর থাকলে হয়তো দেখা যায়। আমার চোখের দৃষ্টি হয়তো তত প্রখর নয়।"

বেচু ফিরে আসতেই বললেন, "আমার ওষুধের বাক্সটা বার করে নিয়ে এস আর বড় টর্চটা।"

ওষুধের বাক্স থেকে টিঞ্চার আয়োডিন বার করে আঙুলে লাগালেন। তারপর নিজের রুমালটা ছিঁড়ে বললেন, এখানটা ব্যান্ডেজ করে দে।" সেটাও আয়োডিন দিয়ে ভিজিয়ে দিলেন।

নীরব বেচু এবার সরব হল।

"কি করে লাগল ওখানে?"

"টিলা থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম পা হড়কে।"

সুবেদার খাঁ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ডাক্তারবাবুর গাড়ি চলে যাবার পর ঝিনুক বলল, "উনি বুঝতে পারেননি বোধ হয়।"

"তুমি যে এত বোকা তা তো জানতাম না। উনি সবই বুঝেছেন, কিন্তু কিছু বললেন না। এখন বলে তো কোনো লাভও নেই। কিন্তু ওঁর উপর নজর রাখতে হবে। ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে আমাদের।"

"কি আছে ওর ভিতর?"

"আমি ঠিক জানি না। তবে খবর পেয়েছি, সোনা রূপা আর জুয়েলারি আছে। হংকং থেকে আসছে। আমার মনে হয় আজ রাত্রেই এগুলোকে বিক্রি করে ফেলা উচিত। ধরা পড়ে গেলেই সর্বনাশ। আমরা হংকং-এর এজেন্ট দুজনকে দশ হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছি। অন্তত সে টাকাটা আমাদের পাওয়া দরকার। হরিবোলের মারফত নম্বর ওয়ান বলে পাঠিয়েছিল সোনা রূপা জহরত এলে ভালো দাম দেব। চল, সোজা আমরা হরিবোলের কাছেই যাই।"

ঝিনুক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল?

"চল যাই—"

ঝিনুক তবু নড়ে না।

"ভয় পেয়েছ নাকি?"

"না ভয় পাই নি। ভাবছি—"

"কি ভাবছ?"

"ভাবছি আমরা না হয় নরকে নেমেছি নিজেদের স্বার্থের জন্য। একটা আদর্শের জন্যও বলতে পারেন। কিন্তু আপনি নেমেছেন কেন। আপনার স্বার্থ কি শুধু টাকা?"

"হঠাৎ এ কথা আজ জানতে চাইছ কেন? এতদিন তো চাওনি?"

"হঠাৎ মনে হল কথাটা—"

"মনে হল কেন জান? আমি মুসলমান এই কথাটা কিছুতে ভুলতে পারছ না, এই তো?"

"সত্য কথাটা ভুলব কি করে?"

"মুসলমান হলেও আমি ভদ্র হতে পারি এ বিশ্বাসটাও কি নেই? বিশ্বাস কর তোমারও যেমন একটা আদর্শ আছে, আমারও তেমনি আছে।"

চুপ করে রইল ঝিনুক।

সুবেদার খাঁ বললেন, "আমি এই উপায়ে যত টাকা রোজগার করি তা তোমাদের জন্যই খরচ করি। তোমাদের মানে হিন্দু উদ্বাস্তুদের। অনেক ছেলেমেয়ের পড়ার খরচ দি, অনেকের মেয়ের বিয়ের খরচ দিয়েছি। এ খবর এতদিন কেউ জানত না, আজ তোমাকে এখন বলছি। তোমাকেও বলতাম না, কিন্তু দেখছি, তোমার মনে সন্দেহ জেগেছে। আমাকে সন্দেহ করো না ঝিনুক। আমি মুসলমান হলেও তোমাদের হিতৈষী।"

সুবেদার খাঁর গলার স্বর একটু কেঁপে গেল। এই কম্পনটা অনেকক্ষণ থেকে আশা করছিল ঝিনুক।

বলল, "আপনি হিন্দু উদ্বাস্তুদের ভালোবাসেন তা জানি। কিন্তু যে কথাটা জানি না সেইটেই স্পষ্টভাবে এখন জানতে চাইছি। আপনার এ ভালোবাসায় কি কোনও স্বার্থ নেই?"

সুবেদার খাঁ চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "এর উত্তর আর একদিন দেব। হয়তো আমাকে দিতেও হবে না, তুমি নিজেই বুঝতে পারবে। এখন চল যাই। এখন কথা শুধু বিশ্বাস করতে অনুরোধ করছি, আমি নীচ নই, কোনও বিশেষ মতলব নিয়ে আমি এ কাজে নামিনি।"

ঝিনুক কোনও উত্তর না দিয়ে গাড়িটার দিকে অগ্রসর হল।

ডাক্তার মুখার্জি সেদিন মাঠ থেকে বাড়ি ফিরলেন না। সোজা নিজের ল্যাবরেটরিতে গেলেন। গিয়েই প্রথমে তাঁর আঙুলটা ড্রেস করে নিলেন ভালো করে। রুমাল খুলে স্টিকিং প্লাসটার দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিলেন ক্ষতটা। বিশেষ লাগেনি, রক্তও তেমন পড়ছিল না। এ নিয়ে বেশি হৈ-চৈ হয় তা চাইছিলেন না। কি ভেবে ইন্‌জেক্‌শনও নিয়ে নিলেন নিজেই নিজের পেটে ছুঁচ ফুটিয়ে। বেচু একটু বিস্মিত হচ্ছিল, কিন্তু তার বিস্ময় বাঙ্ময় হল না। ডাক্তারবাবুর সম্বন্ধে তার কৌতূহলের অন্ত ছিল না বলেই বোধ হয় সে কৌতূহলের ধারও ছিল না আর তার কাছে। অতি-ব্যথায় যেমন নির্ব্যথা হয়, অনেকটা তেমনি। ডাক্তারবাবু লিখতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অত রাত্রেও এক রোগী এসে হাজির। বললে, দুবার আপনাকে খুঁজে গেছি। যদি এখন—। ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "কাল দশটার পর এস। এখন কিছু হবে না।"

"এখানে সমস্ত রাত থাকার অসুবিধা আছে ডাক্তারবাবু, ধরমশালায় জায়গা নেই।"

"তুমি হোটেলে থাক গিয়ে। যা খরচ লাগে আমি দেব। তাড়াহুড়ো করে চিকিৎসা হয় না।"

লোকটি চলে গেল।

ডাক্তারবাবু লিখতে শুরু করলেন।

"সঙ্গে সঙ্গে লিখে না ফেললে হয়তো মনের ভাব অনেকখানি উবে যাবে। আমাদের মনের ভাব ইথারের চেয়েও ভলাটাইল (volatile)। আমরা অহরহ মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছি, মৃত্যুর অসংখ্য সম্ভাবনার ভিতর দিয়ে সর্বদাই পার হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু সর্বদা সে খবর আমরা পাই না। সামনে একটা বাঘ বা সাপ দেখলে আমরা ভয়ে চমকে উঠি, কিন্তু অসংখ্য মারাত্মক ব্যাক্‌টিরিয়া যে সর্বদা আমাদের আচ্ছন্ন করে আছে, এ খবর জেনেও আমাদের তত ভয় করে না। প্রত্যক্ষ দর্শনের জোর অনেক বেশি। স্থান কালের উল্লেখ করব না, কিন্তু আজ প্রত্যক্ষ মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমাকে লক্ষ করে রিভলবার ছুঁড়েছিল একটা লোক। পরমায়ু ছিল তাই লাগেনি। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় তার সঙ্গে জড়িত ছিল একটি নারী, যে নারী মা হয়, মেয়ে হয়, প্রেয়সী হয়, তাদেরই একজন। আমি অন্ধকারে পরিষ্কার দেখতে পাইনি, কিন্তু তবু মনে হল মেয়েটি রূপসী। সে বলল সে নাকি ট্রেন থেকে পড়ে যাওয়া একটা ব্যাগ কুড়োতে এসেছে ডিস্‌ট্যান্ট সিগনালের কাছে। কেন সে ওখানে ব্যাগটা নিতে এসেছিল তা জানবার দরকার নেই, যে দরকারের কথা সে বলল তাও যাচাই করবার চেষ্টা আমি করিনি, কারণ সে যা বলল তা যে মিথ্যা তা বোঝবার জন্যে খুব বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না। এই জন্যেই যেন বেশি ভালো লেগে গেল মেয়েটিকে। নিজের কাজ হাঁসিল করবার জন্যে অনায়াসে কেমন অভিনয়টা করে গেল। ওর কথা ভেবে হঠাৎ মনে পড়ল একটি ছোট ছেলের কথা। সে তখন খুবই ছোট ছিল। বছর চার পাঁচের বেশি নয়। চা খাচ্ছি, সে এসে বলল, আমাকে চা দাও। বললাম, একটুকু ছেলে চা খায় না, বড় হলে চা খায়। সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার দিকে। তার দৃষ্টির ভাবটা বেশ স্পষ্ট। বড়, মানে কত বড়? আমি তখন পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বললাম, যখন গোঁফ হবে তখন চা খেও। সঙ্গে সঙ্গে সে চলে গেল এবং একটু পরেই ঘুরে এসে বললে, এইবার দাও। গোঁফ হয়েছে। দেখি সে কালীর দোয়াতে আঙুল ডুবিয়ে ঠোঁটের উপর গোঁফ এঁকে এনেছে। তখন এ দেখে খুব হেসেছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি সবই ওই রকম কালী দিয়ে গোঁফ এঁকে কাজ হাঁসিল করবার চেষ্টা করছে। সেটা যে হাস্যকর হচ্ছে তাও বুঝতে পারছে না অনেকে। একটু দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে বেশ মজা লাগে। এই মজার আস্বাদ আজ কিছুটা পেয়েছি—ওই মেয়েটিকে দেখে। তারপরই করুণা হয়েছিল, মনে হয়েছিল, উঃ, জীবনযুদ্ধ কি নিদারুণ ব্যাপার! মানুষকে কোথায় থেকে কোথায় নিয়ে যায়। অনেকে নিপুণভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করে, অনেকে পারে না। প্রাণিজগতে এবং উদ্ভিদ্‌জগতেও এ ছদ্মবেশ ধারণের নানারকম বিস্ময়কর নমুনা দেখা যায়। এক বিশেষ জাতের গিরিগিটিই শুধু বহুরূপী নামে পরিচিত, কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে—প্রধানত পেটের তাগিদে— অনেককেই বহুরূপ ধারণ করতে হয়। যখন বায়োলজি পড়তাম তখন ওদের নানা কাহিনী পড়ে বিস্মিত হয়েছি। সেদিন একটা দেখলামও। মাঠে বসেছিলাম। পাশেই শুকনো কাঠির মতো পড়ে ছিল কি একটা। অনেকক্ষণ সেটাকে লক্ষ্যই করিনি। হঠাৎ কানের ভিতরটা চুলকে উঠল, আমার কানে কাঠি দেওয়ার অভ্যাস আছে। একটা কাঠির খোঁজে এদিক-ওদিক

চাইতেই দেখতে পেলাম সেটাকে। হাত দেওয়া মাত্রই কিন্তু লাফিয়ে চলে গেল। কাঠি নয় ফড়িং। বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে আত্মরক্ষা করবার জন্যই জীবজগতে ছদ্মবেশের প্রয়োজন। উপনিষদ বলেছে, অরূপই আনন্দের প্রেরণায় বহুরূপ ধারণ করেছেন। কি সত্য, তা জানি না। কিন্তু এটা দেখছি বহুরূপ ধারণ না করলে সংসারে চলে না। পিতার কাছে আমার যে রূপ, পুত্রের কাছে সেই রূপেই নূতন রঙের আমেজ লাগাতে হয়। প্রভুর কাছে আমি যে রূপে থাকি, ভৃত্যের কাছে সে রূপে থাকি না। বন্ধুকে যে রূপে দেখা দিই, শত্রুকে সে রূপে দিই না। প্রত্যেকেই আমরা বরাবর রূপ বদলাচ্ছি। অনেক সময় টেরও পাই না যে, বদলাচ্ছি। আজ সন্ধ্যায় যে মেয়েটি চোরাই মাল সরাতে এসে অতগুলো মিথ্যা কথা বলে গেল, সে কি মিথ্যাভাষিণী ছাড়া আর কিছু নয়? আমি জানি সে অনেক-কিছু। সে নিশ্চয় সত্য কথাও বলে, আবাব ছলনাও করে। সে প্রাণভরে ভালোও বাসে, ঘৃণাও করে। একরূপে থাকবার উপায় নেই আমাদের, আমরা সবাই বহুরূপী। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, ওই বহুরূপী মেয়েটা যদি ধরা পড়ে তা হলে আর একজন বিচারকবেশী বহুরূপী তাকে সাজা দেবেন। যে সমাজ ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না, সেই সমাজকে রক্ষা করতে হলে চোর-ডাকাতকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। চোর-ডাকাতদেরও নিজেদের স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি আছে। যে লোকটি আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল সে সম্ভবত ওই মেয়েটিরই দলের লোক। মেয়েটিকে নিরাপদ করবার জন্যেই গুলি করেছিল আমাকে। নিজের স্বার্থরক্ষা করবার জন্য কে না গুলি চালিয়েছে পৃথিবীতে? পৃথিবীর সভ্য লোকেরাই তো এ কাজ করে, অনেক সময় তারা এজন্য বীর বলেও গণ্য হয়, খবরের কাগজে তাদের খবর ছাপা হয়, আমরা তাদের ছবি টাঙিয়ে রাখি, ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম ওঠে। আমি যদি ওই লোকটার সঙ্গে যুদ্ধ করে ওকে পেড়ে ফেলতে পারতাম, যদি ওকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে যেতে পারতাম থানায়, তা হলে আমারও জয়-জয়কার হত। হয়তো আমারও নাম কাগজে ছাপা হত। কিন্তু এসব ব্যাপার আমার কাছে বড়ই হাস্যকর মনে হয়। পৃথিবীতে অহরহ যুদ্ধ হচ্ছে, আমিও একজন যোদ্ধা, শুধু শুধু আর একজন যোদ্ধাকে বিপর্যস্ত করা কি উচিত? আমি যাদের বিরুদ্ধে সুযোগ পেলেই গুলি-গোলা ছুঁড়ছি সেই ব্যাক্টিরিয়াগুলো যদি কোনও মন্ত্রবলে মনুষ্যরূপ ধারণ করে আমাকে টানতে টানতে থানায় নিয়ে যায়, কেমন হয় তা হলে; তারা যদি বলে আমরা আমাদের নিজেদের বাস্তুভূমিতে সুখ-স্বচ্ছন্দে ছিলাম, এই লোকটা নানাভাবে আমাদের উৎখাত করবার চেষ্টা করছে? ও লোকটা আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল, আমি বেঁচে গেছি এইটেই আমার পক্ষে যথেষ্ট, আমি আবার পাল্টা আক্রমণ করবার চেষ্টা করলে ও আবার আক্রমণ করবে এবং এই হেঁইও হেঁইও ব্যাপার অনেক দূর গড়াবে। আমিও একজন যোদ্ধা, প্রত্যেকেই যোদ্ধা হতে বাধ্য, যোদ্ধা না হলে বাঁচা যায় না, কিন্তু আমার মনের কথা হচ্ছে আমি যোদ্ধা হতে চাই না। আমি চাই সবায়ের সঙ্গে যথাসম্ভব বনিবনাও করে দূর থেকে দাঁড়িয়ে যুদ্ধটা দেখি। কিন্তু তা অসম্ভব! কিছুতেই হচ্ছে না। এত চেষ্টা করেও বনিবনাও হয় না কারও সঙ্গে। কেউ কাছে আসে না, সবাই পালিয়ে যায়, কিংবা অতর্কিতে আক্রমণ করবার চেষ্টা করে। আকর্ষণের যে সূত্রে সবাইকে কাছে টানা যায় সে সূত্র এখনও খুঁজে পাইনি, এইটেই বোধ হয় আমার জীবনের ট্র্যাজেডি, হয়তো অনেকেরই জীবনের ট্র্যাজেডি, কিন্তু অধিকাংশ লোক সেটা বুঝতে পারে না,

অনুভব করে না। আমিই বুঝেছি সকলের সঙ্গে প্রেমের বন্ধনে বাঁধা না পড়তে পারলে আনন্দ নেই, কিন্তু সে আনন্দ পাওয়ার যোগ্যতাও আমার নেই বোধ হয়। আমি কাছে এলেই সবাই পালায়, আমাকে দেখতে পেলে কেউ বা গুলি ছোঁড়ে, কেউ বা নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে, অনেকেই আড়ালে নিন্দে করে, কিংবা চক্রান্ত করে, আমাকে অপ্রস্তুত করবার। মানে, আমাকে কেউ চায় না, হয় আমাকে দিয়ে নিজেদের কাজ উদ্ধার করাতে চায়, কিংবা তাদের স্বার্থসিদ্ধির অন্তরায় হলে সরিয়ে দিতে চায়। সুসভ্য মানবসমাজেও একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের অন্য সম্বন্ধ নেই। আমার পক্ষে এটা মর্মান্তিক। আরও মর্মান্তিক এই জন্যে যে, সকলেই মনে করে আমি খুব সুখী।''

এই পর্যন্ত লিখে চুপ করে বসে রইলেন সুঠাম মুকুজ্যে। অনেকক্ষণ বসে রইলেন। তারপর হাঁক দিলেন, বেচু, চল এবার বাড়ি যাই।

।। আট ।।

ঝিনুক সেদিন রাত্রে ঘোষাল ডাক্তারের আড্ডায় ফিরবার আগে নিজের বাড়ি গেল। ডাক্তার ঘোষালই ঝিনুকের পরিবারের জন্য একটা আলাদা আস্তানা করে দিয়েছিলেন। ঝিনুক অবশ্য প্রায় অধিকাংশ সময়েই ডাক্তার ঘোষালের বাসায় থাকত, কিন্তু তার ছোট বোন শামুক, কাকা যতীশবাবু আর ভাইপো কনক থাকত আলাদা একটা বাড়িতে। সে বাড়ির সমস্ত খরচ চালাত ঝিনুক। কেমন করে চালাত যতীশবাবু সে খবর রাখা প্রয়োজন মনে করতেন না। তিনি যেন ধরেই নিয়েছিলেন সংসার চালাবার দায়িত্ব তাঁর নয়। তিনি এমন একটা ভাব দেখাতেন যে, দেশ ছেড়ে তিনি আসতে চাননি, ঘোষালের ধাপ্পায় আর ওই মেয়ে দুটোর জেদে তাঁকে তাঁর জন্মভুমি ত্যাগ করে চলে আসতে হয়েছে। সুতরাং তারাই সংসার চালাক। তাঁর কথাবার্তা শুনলে মনে হয়, তিনি যেন কোনও পলাতক রাজা, বাধ্য হয়ে নিজের রাজত্ব ছেড়ে বিদেশে বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে বাস করছেন; বাস করতে হচ্ছে তাঁকে। যারা তাকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে এনেছে তারাই তাঁর ভরণ-পোষণ করবে, করতে বাধ্য তারা। তিনি নিজে কিছু কাজ করতেন না, বলতেন— আমি কাজ করতে অভ্যস্ত নই। কাজ করবার দরকার হয়নি কখনও। দেশে খাওয়ার অভাব ছিল না। জমিতে ধান ছিল, পুকুরে মাছ ছিল, গাছে নারকেল ছিল, দুধের বান বয়ে যেত বাড়িতে, তরিতরকারি প্রচুর হত নিজেদেরই বাগানে। দেশে তাঁর কাজ ছিল থিয়েটার করা, বাচ খেলা, মাছ ধরা আর মোড়লি করে বেড়ানো। তাঁর এখনও ধারণা, দেশে যদি তিনি থেকে যেতেন তা হলে ওই হৈ-হল্লার তুফানটা কেটে গেলে আবার সাবেকভাবে থাকতে পারতেন তিনি। মুসলমানরা সবাই খারাপ নয়। অনেকেই তাঁকে ভালোবাসত। হল্লাটা কেটে গেলে আবার তিনি তাঁর সাবেক আসন ফিরে পেতেন। একটা কথা অবশ্য তিনি চেপে যান। মুসলমানরা যখন তাঁদের বাড়ি আক্রমণ করেছিল, তাঁর দাদাকে এবং ভাইপোকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল, মেয়ে দুটোকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন তিনি যে পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করেছিলেন, ডাক্তার ঘোষাল নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে গুলি চালিয়ে ওই ক্ষিপ্ত জনতার সম্মুখীন না হলে যে এখানে এসে এইসব বাহাদুরি

করবার সুযোগও তিনি পেতেন না—এসব কথা যতীশবাবু উল্লেখ করেন না। ঝিনুক এখানে তাঁকে বেশ ভালোভাবেই রেখেছে। তিনি দেশে প্রত্যহ একটা মাছের মাথা খেতেন, এখানেও তাই খান। বাজারের সেরা তরি-তরকারি ঝিনুক তাঁর জন্যে কেনবার ব্যবস্থা করেছে। খাওয়ার পর দই পায়েস মিষ্টান্ন খাওয়া তাঁর অভ্যাস, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় না। খুব সরু আলো চালের ভাত, মুগের ডাল, একদিন অন্তর মাংস (হয় খাসি, না হয় মুরগি, না হয় কাছিম)—কোনোরকম অভাব রাখেনি ঝিনুক। তিনি প্রতিদিন যখন খেতে বসেন তখন মনে হয় বাড়ির জামাই খেতে বসেছেন। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদও জামাইয়ের মতো। ফিতেপাড় কাঁচি ধুতি, পেটেন্ট লেদারের পাম-শু, গ্রীষ্মকালে ভালো আদ্দির পাঞ্জাবি, শীতকালে দামী গরম জামা, শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, এমনকি বালাপোশ পর্যন্ত কিনে দিয়েছিল তাঁকে ঝিনুক। কিন্তু তবু তিনি ঝিনুকের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সন্তুষ্ট হতেন যদি বাড়ির কর্তৃত্বটা হাতে থাকত। কিন্তু ঝিনুক সেটা দেয়নি। তাঁর ইচ্ছা ঝিনুক শামুক দুজনে যা রোজগার করবে, সব তাঁর হাতে এনে দেবে, তিনিই যাকে যা দেবার দেবেন। বলতেন, আমি পোষা-ময়না হয়ে থাকতে চাই না। আমি ওদের গুরুজন, আমিই বাড়ির কর্তা, আমাকে সেইরকম ভাবে রাখতে হবে। না হলে—। না হলে তিনি যে কি করবেন তা আর খুলে বলতেন না। কিন্তু সর্বদাই একটা চোখ-রাঙানির ভাব নিয়ে থাকতেন। প্রথম চোখ-রাঙানি— আমাকে কেন দেশ থেকে জোর করে আনা হয়েছে। দ্বিতীয় চোখ-রাঙানি— এখানে কেন আমাকে বাড়ির সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হয়নি। তাঁর কথাবার্তা শুনলে মনে হত তিনি এসব লাঞ্ছনা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত সহ্য করবেন না। সকালে যখন গরম চায়ের সঙ্গে মাখন-লাগানো টোস্ট আর ডিম-ভাজা আসত, সুট সুট করে খেয়ে নিতেন। তারপর খবরের কাগজ নিয়ে পড়তেন, বর্তমান গভর্নমেন্টকে গালাগালি দিতেন খানিকক্ষণ, তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করতেন। ওঠ-বস করতেন কয়েকবার, তারপর পার্কে গিয়ে চক্কর দিতেন অবশেষে। এখানে শরীরটাই হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রধান অবলম্বন। কি করে শরীরটা ভালো থাকবে এই নিয়ে ক্রমাগত খুঁতখুঁত করতেন। নানারকম খুঁতখুঁতনি ছিল তাঁর। তেষ্টা পেয়েছে, এক গ্লাস জল চাইলেন। জল পেয়ে চোঁ চোঁ করে খেয়ে ফেললেন, তারপর বললেন জলটা ভারি মিষ্টি লাগছে। তার মানেই শরীর খারাপ হয়েছে। আর একদিন সেই একই জল খেয়ে বললেন, জলটা বিস্বাদ লাগছে আজ। এরও ওই এক সিদ্ধান্ত, শরীর খারাপ হয়েছে। সকাল বেলা প্রায়ই পেট চাপড়াতেন। বলতেন, পায়খানা পরিষ্কার হয় না। বলতেন, এদেশের জলই এমন কষা যে পায়খানা পরিষ্কার হওয়া অসম্ভব। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি নানারকম ওষুধ খেতেন। বলতেন, কিছুতে কিছু হয় না। দেশে না ফিরলে শরীর ভালো থাকবে না। পনরো দিন অন্তর ওজন নিতেন। ফিতে দিয়ে নিজের বুক, পেঠ, কবজি মাপতেন। একটু উনিশ-বিশ হলেই দুশ্চিন্তা। মাথা নেড়ে বলতেন, এ দেশে শরীর টিকবে না। দেশেই ফিরে যেতে হবে। কিন্তু দেশে যাওয়ার কোনও চেষ্টা করতে কেউ কখনও দেখেনি তাঁকে। সকলকে কেবল শাসাতেন, আর নয়, এইবার চলে যাব। পাড়ায় একটা চায়ের দোকান ছিল, সেখানে চপ কাটলেটও পাওয়া যেত, সেখানে প্রায়ই যেতেন যতীশবাবু। রোজ চপ কাটলেট খেতেন আর ফলাও করে গল্প করতেন দেশের। এ দেশের সঙ্গে ও দেশের তুলনামূলক সমালোচনা করে চায়ের দোকানের মালিক গোষ্ঠবাবুর দিকে চোখ

পাকিয়ে বলতেন, যথেষ্ট হয়েছে, এ দেশে আর থাকব না মশাই, এ দেশে আমাদের শরীর টেঁকে না।

এরকম একটা বাঁধা খদ্দের বেহাত হয়ে যাবে ভেবে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে নিরস্ত করবার প্রয়াস পেতেন গোষ্ঠবাবু। বলতেন, এ দেশে যখন এসেই পড়েছেন, এইখানেই মন বসিয়ে থাকুন, কোথাও যাবেন না। ক্রমশ এ দেশের জল-হাওয়া আপনার সয়ে যাবে। শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াবে তাই সয়। আমাদের বাড়িও শুনেছি পদ্মার ধারে ছিল এককালে। আমরা ঠাকুরদা সেখান থেকে এসেছিলেন। আমরা তিনপুরুষ এ দেশে বাস করছি। খাসা আছি। এ দেশের জল-হাওয়া বেশ বরদাস্ত হয়ে গেছে আমাদের। দেখুন আমার বুকের ছাতি আর হাতের গুলি। রোজ আধ সের চালের ভাত হজম করছি। তোফা আছি। থেকে যান, যাবেন না। যতীশবাবু সাময়িকভাবে বোধ হয় আশ্বস্ত হতেন। দু-চার দিন আর যাওয়ার কথা তুলতেন না। তারপর আবার তুলতেন কিছুদিন পরে। এই প্রসঙ্গটা নিয়ে বারবার আলোচনা করাও তাঁর সময় কাটাবার একটা উপায় ছিল। তিনি শেষ পর্যন্ত হয়তো চলেই যেতেন, কিন্তু একটা ব্যাপারের জন্য তিনি এ দেশ থেকে নড়তে পারছিলেন না। আর সেটা এমন ব্যাপার যে, কাউকে বলাও চলে না। তিনি যদিও কোনও প্রমাণ পাননি কিন্তু তিনি এটা বুঝতে পারছিলেন যে, ঝিনুক-শামুক দুজনেই দেদার টাকা রোজগার করছে। কিভাবে রোজগার করছে তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে চাইতেন না, কিন্তু তিনি যে সে উপার্জনের কোনও অংশ পাচ্ছেন না, এতেই তিনি বড় ক্ষুব্ধ হয়ে থাকতেন মনে মনে। পাকিস্তান থেকে তাঁর এক বন্ধু তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন, প্রচুর টাকা নিয়ে এখানে যদি আসতে পার তা হলে এখানেও বেশ সুখে থাকতে পারবে। টাকা ছাড়তে পারলে এখানেও বেশ আরামে থাকা যায়। যতীশবাবু প্রচুর টাকার আভাস পাচ্ছিলেন, কিন্তু তা ধরতে ছুঁতে পারছিলেন না, সেইটে হস্তগত করবার আশাই ছিল তাঁর এখানে থাকার প্রধান আকর্ষণ।

সেদিন অনেক রাতে ঝিনুক যখন এল তখনও তিনি জেগে বসে আছেন। ঝিনুক-শামুক বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত তাঁর ঘুম হয় না। বাড়িতে তিনি একা থাকেন, কনককে পর্যন্ত ঝিনুক বোর্ডিংয়ে দিয়ে দিয়েছে। তাঁর ঘুম আসে না। ডিটেকটিভের মনোভাব নিয়ে জেগে থাকেন যতীশবাবু। ভাবেন, ওরা রোজই নিশ্চয় কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে আসে। টাকাটা রাখে কোথায়? কত টাকা আনে? এইসব চিন্তায় তাঁর ঘুম হয় না। তিনি ওত পেতে বসে থাকেন।

ঝিনুকের সঙ্গে সত্যিই সেদিন অনেক টাকা ছিল। ওরা যে চোরা-কারবারে লিপ্ত তার থেকে মাঝে মাঝে বেশ দমকা টাকা পাওয়া যায়। সেদিন সন্ধ্যার সময়ই ঝিনুক পাণ্ডার কাছ থেকে হাজার টাকা পেয়েছিল। তারপর ডিসট্যান্ট সিগন্যালের কাছ থেকে যে ভারী ব্যাগটা তারা তুলে নিয়ে গিয়েছিল তাতে অনেক দামী মাল ছিল। সুবেদার খাঁ মালটাকে নিজের হেফাজতে রাখতে ভরসা পাননি। ডাক্তারবাবুর আপাতনিরীহ ব্যবহারে তাঁর সন্দেহ ঘোচেনি। যে ধনী ব্যবসায়ীটি সাধারণত তাঁদের মাল গোপনে কেনেন, সুবেদার খাঁ সেইদিন রাত্রেই ব্যাগটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর কাছে। এই ক্রেতার সঙ্গে এঁদের কারো প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। পরিচয় রাখাটা নিরাপদ নয়। এদের কারবারটা চলে বড় অদ্ভুত উপায়ে। শহরের প্রান্তে হরিবোল নামে এক অন্ধ বৈরাগী থাকে। তার বাড়িতেই চোরা মালটা আনা হয় প্রথমে। সেইখানেই মালটার

একটা দামও ঠিক করে ফেলেন সংগ্রাহকরা। তারপর সেই জিনিসগুলো আর দামের বার্তা নিয়ে একটা রিক্‌শায় চড়ে হরিবোল যায় যেই ধনী ক্রেতার কাছে। ধনী ক্রেতা হরিবোলের মারফতই একটু দর-দস্তুর করেন। তারপর মালটা কিনে নেন। হরিবোলই রিক্‌শায় করে মাল নিয়ে যায়, টাকাও নিয়ে আসে। এরজন্য প্রতিবারে সে এক শ' টাকা নগদ পায়। হরিবোল ঠিক করেছে ওই টাকা জমিয়ে সে ছোট-খাটো একটি মন্দির করবে তার কুঁড়েঘরের পাশে, আর সে মন্দিরের নাম দেবে হরিবোল মন্দির। সুবেদার খাঁ তাকে প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন এই ব্যবসার কথা যদি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ পায় তা হলে তার মৃত্যু হবে। আর সে যদি ভালোভাবে কাজ করতে পারে তা হলে তার মজুরি ছাড়াও পরে আরও কিছু টাকা "বোনাস" স্বরূপ তাকে দেওয়া হবে। হরিবোল যে শুধু টাকার লোভেই এ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিল তা নয়, এর সঙ্গে কৃতজ্ঞতার আমেজও ছিল কিছু। ডাক্তার ঘোষালের রোগী সে। প্রায়ই পেটের অসুখে ভোগে এবং ডাক্তার ঘোষাল বিনা পয়সায় তার চিকিৎসা করেন। ডাক্তার ঘোষালই ওকে এই কাজের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। দিনের বেলা হরিবোল নাকি ঠকঠক করে হরিনাম গেয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে বেড়ায়। এই লোকই যে এত বড় একটা ব্যবসায় সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে তা কল্পনা করা সত্যই শক্ত। তা ছাড়া সে অন্ধ বলে আরও সুবিধা হয়েছিল। কারও মুখ দেখতে পেত না।

সেদিন ব্যাগের ভিতর ছিল সোনারূপার বাট আর কিছু জহরত, চুনি পান্না হীরে, এই সব। সুবেদার খাঁ এর দাম ঠিক করেছিলেন পঁচাত্তর হাজার টাকা। কিন্তু ধনী ক্রেতাটি এ দাম দিতে রাজি হননি। জিনিসগুলি দেখে তিনি বললেন, এসব পাচার করতে আমাকে আরও অনেক খরচ করতে হবে, বেগও পেতে হবে প্রচুর। তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি দিতে চাননি। সুবেদার খাঁ রাজি হলেন না এ টাকায়। অবশেষে ষাট হাজার টাকায় রফা হয়। হরিবোলকে সেদিন কয়েকবারই রিক্‌শায় করে যাতায়াত করতে হয়েছিল। অবশ্য প্রত্যেকবারই আলাদা রিক্‌শায়। সুবেদার খাঁ এসব ব্যাপারে খুব-সাবধানী। এ ব্যবসায়ের বারোজন অংশীদার। এই শহরে চারজন— ঘোষাল, পাণ্ডা, সুবেদার খাঁ আর ঝিনুক। বাইরের আটজন। সকলেই সমান অংশ পায়। হংকং-এর দুজন অংশীদারকে দশ হাজার টাকা আগেই দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। ঝিনুকের অংশে যে পাঁচ হাজার টাকা হয়েছিল, সে টাকাটা সে তো পেয়েই ছিল, সুবেদার খাঁ নিজের অংশের টাকাটাও সেদিন দিয়েছিলেন তাকে। ঝিনুক প্রথমে নিতে চায়নি। সুবেদার খাঁ কিন্তু যখন বললেন যে না নিলে তিনি এ ব্যবসার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখবেন না, তখন ঝিনুককে রাজি হতে হল। কারণ সুবেদার খাঁর সাহায্য না পেলে এ ব্যবসা অচল। ঝিনুক জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনার অংশের টাকা আমাকে দিতে চাইছেন কেন? সুবেদার খাঁ উত্তর দিয়েছিলেন, তোমার আদর্শের সঙ্গে যে আমার আদর্শের কিছুমাত্র অমিল নেই সেইটে প্রমাণ করবার জন্য। আগেই তোমাকে বলেছি, এই ব্যবসায়ের সব টাকা আমি হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্যই খরচ করছি, ও টাকা আমি নিজের কাজে লাগাই না. আমি যা মাইনে পাই তাতেই আমার স্বচ্ছন্দে চলে যায়। বিহার রায়টে আমার পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আমি এখন একা। আমার বেশি টাকার দরকার নেই। টাকাতে আমার লোভও নেই। এভাবে আমি এ টাকা রোজগার করছি কেবল দুঃস্থ উদ্বাস্তুদের সাহায্য করবার জন্য, রূপকথার রবিনহুড আমার

আদর্শ। গরিব মুসলমান উদ্বাস্তুদেরও সাহায্য করতে হবে। কিন্তু আপাতত তার সুযোগ নেই। তা ছাড়া যারা নিপীড়িত অত্যাচারিত অসহায় তাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান নেই, তারা সব এক জাত, তারা গরিব। তাদের কারও উপকারে এ টাকা লাগলে তা সার্থক হবে। তুমি যখন এ পথে নেমেছ তুমিই এ টাকা নাও। এর পর ঝিনুক আর কিছু বলতে পারেনি। কিন্তু তার সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে এত টাকা সে রাখবে কোথায়? ব্যাংকে বা পোস্টাফিসে রাখবার উপায় নেই, পুলিশ ধরবে। বাড়িতে রাখা আরও বিপজ্জনক, যতীশবাবু শ্যেনদৃষ্টি মেলে বসে আছেন। অবশেষে আধুনিক মনা ঝিনুক তাই করতে বাধ্য হয়েছিল যা প্রাচীন-পন্থীরা করতেন। একটা বড় শিশিতে নোটগুলো পুরে সেটা পুঁতে রেখে এসেছিল একটা মাঠের প্রান্তে। লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্য জায়গাটা ঢেকে দিয়েছিল ঘাসের চাপড়া আর ইটপাটকেলের স্তূপ দিয়ে। এ কাজ সহজসাধ্য নয়। তাই প্রত্যহ সেখানে সে যেতে পারত না। হাতে বেশি কিছু টাকা জমলে যেত। তাও গভীর রাত্রে। অন্য সময়ে টাকাটা সে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরত। এবার ভাবছিল অন্য আর এক জায়গায় পুঁতে রাখবে। কিন্তু এত রাত্রে তা করবার সুবিধা ছিল না।

সুবেদার খাঁ যখন ঝিনুককে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গেলেন, তখন গভীর রাত। ঝিনুকের সাড়া পেয়ে যতীশবাবু গলা খাঁকারি দিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন। বাড়িতে ওঁদের কথাবার্তা খাঁটি পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় হয়। সেই ভাষাতেই তিনি ঝিনুকের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। কলকাতার ভাষায় অনুবাদ করলে তা নিম্নলিখিত রূপ হয়।

"কি রে ঝিনুক, ফিরলি? আজ বড় রাত হল। এত রাত অবধি কোথায় ছিলি? ঘোষালবাবুর বাসায়? সেখানে তাসের আড্ডা খুব জমেছিল বুঝি?"

"সে তো রোজই জমে।"

"আজ তা হলে এত বেশি দেরি হল কেন, তা জিজ্ঞাসা করতে সাহস হলো না তাঁর, যদিও ইচ্ছে হচ্ছিল খুব। বেশি দেরি হওয়া মানেই যে বেশি টাকা রোজগার করা এ তিনি ধরেই নিয়েছিলেন। ও মেয়ে যে বিনা মজুরিতে বেশি কাজ করবে এ তিনি বিশ্বাসই করতেন না, কিন্তু কথাটা প্রকাশ করতে পারছিলেন না তিনি। কোনোদিনই পারেন না। একটু থেমে তাই বললেন, "শামুকও আজ আসেনি এখনও।"

শামুক মিস্টার সেনের বাড়িতে কাজ করে। সে বাহাল হয়েছিল মিস্টার সেনের পক্ষাঘাতগ্রস্ত পত্নীর শুশ্রূষা করবার জন্য, কিন্তু ক্রমশঃ সে মিস্টার সেনের বাড়িতে কর্ত্রী হয়ে উঠেছে। মিস্টার সেনের উত্থান-শক্তি-রহিতা পত্নীর নির্দেশে বাড়ির সব কাজই করে। এমন কি মিস্টার সেনের 'টাই'ও বেঁধে দেয়। মিসেস সেন নাকি রোজ বেঁধে দিতেন। মিসেস সেন অসুস্থ হয়ে পড়ার পর মিস্টার সেন নিজেকে নাকি বড়ই অসহায় মনে করতেন। বন্ধুদের বলতেন, আমি এখন কোথায় আছি জান? যে নৌকো ডুবছে তার উপর দাঁড়িয়ে আছি। সে নৌকো থেকে পালাবার উপায় নেই, আমার পা দুটো নৌকোর পাটাতনের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে, কর্তব্যের দড়ি দিয়ে। বলতেন আর হাসতেন। তাঁর সেই কুলকুচো-হেঁচকি হাসি।

ঝিনুক বলল, "হয়তো আজ মিসেস সেনের অসুখ বেড়েছে। প্রায়ই তো তাঁর ফিট হয়। হয়তো রাত্রে থাকতে হবে—"

যতীশবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "বেশি কাজ করলে তোরা ওভারটাইম পাস না? কত করে দেয়?"

ঝিনুক কোনও জবাব না দিয়ে হেঁট হয়ে তার বাক্সটা খুলছিল টাকাগুলো রেখে দেবে বলে। হঠাৎ সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে নিঃশব্দ চরণে যতীশবাবু তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

"আপনি উঠে এলেন কেন?"

"না, এমনি। জিজ্ঞাসা করছিলাম তোরা কত করে ওভারটাইম পাস।"

সর্পিণীর মতো ফোঁস করে উঠল ঝিনুক।

"তা জেনে আপনার লাভ কি?"

"লাভ-লোকসানের কথা নয়, আমি তোমাদের কাকা, তোমাদের বিষয় সব কথা জানবার অধিকার আমার নেই কি?"

"না। সে অধিকার আপনি অনেক আগেই হারিয়েছেন। আপনি যদি কাকার কর্তব্য করতেন আমরা অন্যরকম হতাম। আপনি আমাদের গুণ্ডার মুখে ফেলে দিয়ে জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়েছিলেন। ডাক্তার ঘোষাল না থাকলে আমাদের যে কি হত তা ভাবতেও পারি না। তবু আপনাকে আমরা ত্যাগ করিনি। শুধু তাই নয়, যতটা সম্ভব সুখে রাখবার চেষ্টা করেছি।"

"তা না করলেই পারতে। এভাবে বসে বসে ভালো লাগে নাকি?"

"বসে না থেকে আপনি করবেন কি? আপনি ম্যাট্রিকও পাশ করেননি, এক মজুরগিরি ছাড়া অন্য কাজ আপনার জুটবে না, আত্মসম্মান থাকলে তাই করতেন। তা তো পারেন না, সুতরাং আপনাকে বসেই থাকতে হবে। যতদিন আমাদের সামর্থ্যে কুলুবে আপনার খাওয়া-পরার কষ্ট হবে না। এর বেশি আমাদের কাছে দাবি করবেন না কিছু।"

"আমি দেশে ফিরে যেতে চাই। জলিল মিঞা খবর পাঠিয়েছে যে, সেখানে ফিরে গেলে আমাকে তার মাছের ব্যবসার অংশ দেবে, আর আমাকে ব্যবসার ম্যানেজার করে দেবে।"

"বেশ, আপনি ফিরে যান। আমরা ফিরব না।"

"ফিরতে হলে টাকা চাই। অন্তত হাজার কয়েক টাকা না হলে তার ব্যবসার অংশীদার হতে পারি না। তোমরা দুই বোনে ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা রোজগার করছ, আমাকে একটি পয়সাও দাও না, আমাকে পোষা ময়না বানিয়ে রেখেছ। এ আমি আর সহ্য করতে পারি না।"

একটু থেমে তারপর কোমল কণ্ঠে মিনতির সুরে বললেন, "আমাকে রোজ কিছু কিছু করে দে, তাই জমিয়েই আমি দেশে ফিরে যাব। তোরা যা রোজগার করিস তার অর্ধেক দিলেই এক বছরের মধ্যেই আমি দেশে ফিরতে পারি। রোজ কিছু কিছু করে দে। আজ কত এনেছিস দেখি—"

হঠাৎ যতীশ ঝিনুকের হাতটা ধরে ফেললেন।

"দেখি, লক্ষ্মীটি কত পেয়েছিস আজ, দেখি—"

ঝিনুক এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে দেখলে যতীশের গায়ে অসুরের শক্তি। সহজে হাত ছাড়ানো যাবে না।

"আমার হাত ছেড়ে দিন। জোয়ান মেয়ের গায়ে হাত দিতে লজ্জা করে না আপনার! ছেড়ে দিন।"

"যতক্ষণ না আমায় টাকা দিবি, ছাড়ব না হাত। আমাকে পর মনে করছিস কেন ঝিনুক? এত টাকা রোজগার করছিস, শেষ পর্যন্ত তা নিয়ে কি করবি? আমার সঙ্গে পরামর্শ করিস না কেন, আমি তোর কাকা, আমাকে পোষা ময়না করে রেখেছিস কেন? শোন, শোন, কথা শোন।"

"আমার হাত ছেড়ে দিন।"

যতীশবাবুর হাতের মুষ্টি দৃঢ়তর হল। চোখে মুখে লোভ মূর্ত হয়ে উঠল কুৎসিতভাবে। ঝিনুকও হার মানবার পাত্রী নয়। ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। ঝিনুকের কাপড় চোপড় বিস্রস্ত হয়ে পড়ল। তার ভয় হতে লাগল, বুকের ভেতর থেকে নোটের বান্ডিলগুলো না পড়ে। হঠাৎ সে কামড়ে ধরল যতীশের হাতটা। তার ধারালো দাঁত করকর করে বসে গেল যতীশের হাতের মাংসে।

"উঃ, কি করিস রাক্ষুসী! ছাড় ছাড়, ছাড়—

নিমেষের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে গেল ঝিনুক। রাস্তায় বেরিয়ে ছুটতে লাগল। চিৎকার করে উঠল একটা পেঁচা, ডেকে উঠল একদল শেয়াল। ঝিনুক ছুটতে লাগল। কিছুদূর গিয়েই তার মনে হল এভাবে কোথায় চলেছি। এখনি তো পুলিশের হাতে পড়ে যেতে পারি। দূরে একটা চৌকিদাবের হাঁকও শোনা গেল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে একটা বটগাছের তলায়। ভাবতে লাগল কোথায় যাব এখন? ডাক্তার ঘোষালের বাড়ি? সেখানেই রাখব টাকাগুলো? তৎক্ষণাৎ মনে হল, না, ওখানে রাখা নিরাপদ নয়। ডাক্তার ঘোষালের টাকার প্রতি লোভ নেই তা ঠিক, কিন্তু তিনি জুয়াড়ী মানুষ, টাকা হাতে পেলে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। তা ছাড়া মিস্টার সেনের ওই মেয়েটা, রং-মাখা কাজল-পরা, পেট-কাটা কাঁধ-কাটা ব্লাউস-পরা ওই প্রেতিনীটা এখন ভর করে আছে ওঁর উপর। ও এলেই ঘোষালের চোখের দৃষ্টিতে যে ভাষা ফুটে ওঠে তার অর্থ ঝিনুকের অবিদিত নেই। আবেগের মাথায় এক নিমেষে ওর হাতে সব তুলে দিতে পারে ঘোষাল। না, ঘোষালের কাছে টাকা রাখা চলবে না। পরমুহূর্তেই মনে হল 'কাউকে কি বিশ্বাস কবা চলবে? সে তো তাকে ভক্তি করে। আর সাহায্য নিয়ে কি দু-একদিনের জন্য টাকাটা কোথাও লুকিয়ে রাখা যায় না? পরমুহূর্তেই মনে পড়ল তার মায়ের কথা। ঝিনুক তাকে নিজের হার আর চুড়িগুলো দিয়ে বলেছিল, এইগুলো নিয়ে তুমি এখন চলে যাও। পরে তোমাকে আরও কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব। সে কি চলে গেছে? অত সহজে চলে যাওয়ার পাত্রী সে নয়। তার হাতে যদি কোনো রকমে টাকাটা পড়ে যায় তাহলে টাকাটা আর পাওয়া যাবে না। কিন্তু এ টাকা কিছুতেই হাতছাড়া করবে না ঝিনুক। এই টাকার জোরেই তার স্বপ্নকে সফল করে তুলবে সে। এর থেকে একটি আধলা সে কাউকে দেবে না। সুবেদার খাঁর কথা মনে হল। তাঁর হাতে গিয়ে টাকাটা তুলে দিলে অবশ্য ভয় নেই। কিন্তু তাঁর বাসাটা কোথায় তা সে ঠিক জানে না। তিনি এক ঠিকানায় বেশি দিন থাকেন না, প্রায়ই বাসা বদল করেন। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ঝিনুক ভাবতে লাগল। নিজেকে হঠাৎ বড় অসহায় মনে হল তার।

।। নয় ।।

ঝিনুকের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে নিদারুণ খবরটা পেয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন গণেশ হালদার। কিছুক্ষণের জন্য তিনি যেন সমস্ত সুখদুঃখের অতীত হয়ে নিথর নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর দেহটা দাঁড়িয়ে ছিল মাটির উপর কিন্তু তাঁর অদেহী নির্বিকার সত্তা যেন দেহ ছেড়ে চলে গিয়েছিল দূর আকাশলোকে, কিছুক্ষণের জন্য সেই মহাশূন্য থেকে তিনি যেন উপলব্ধি করছিলেন বিরাট বিশ্বের বিশালত্ব আসক্তি-শূন্য হয়ে। তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি যেন একটা অতি ক্ষুদ্র বুদ্বুদের মতো ভেসে বেড়াচ্ছেন মহাশূন্যে। তিনি যেন মানুষ নন, মনুষ্যত্বের উপর সমস্ত দাবি যেন হারিয়ে ফেলেছেন চিরকালের জন্য।

হঠাৎ দাইয়ের গলার স্বর শুনে সংবিৎ ফিরে পেলেন তিনি।

''মাস্টারবাবু কাঁহা গেল, আপনের পুড়ি (লুচি) এনেছি। গরম গরম খেয়ে লেন। মাস্টারবাবু—''

ভিতরে ঢুকতে হল গণেশ হালদারকে। দাই টেবিলের উপর সব সাজিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

''গরম গরম খেয়ে লেও বাবু। হাঁথ মুখটা আগে ধুয়ে লিন্। বালতিতে জল আছে বারান্দায়, এই যে গামছা—''

তাড়াতাড়ি গামছা এগিয়ে দিলে দাই। ''এই ডিমের ডালনা আর গোরবা (চিংড়ি) মাছের মালাইকারি মাইজি নিজে হাতে বানিয়েছেন আপনের জন্যে। যদি ভালো লাগে বলবেন, আরও এনে দেব। এই ডাল আলুর দম হামি বানিয়েছি। পেট ভরে খেয়ে লেন বাবু। আপনার শরীরটা দুবলা, ভালো করে খেয়ে শরীরটা ঠিক করে লেন। বাবুর এখানে খাবার কোনো দুখ নেই।''

গণেশ হালদার দাইয়ের দিকে চেয়ে দেখলেন। মনে হল, মাকেই যেন মূর্ত দেখলেন ওর মধ্যে। ওই কালো চেহারা, জরাগ্রস্ত মুখ, কিন্তু সমস্তকে উদ্ভাসিত উজ্জ্বল করে তুলেছে অন্তরের আলো, ভালোবাসার আলো। দাই তাঁকে রোজ দাঁড়িয়ে খাওয়ায়, মা যদি থাকত ঠিক এমনিভাবেই নিশ্চয় খাওয়াত, হঠাৎ মনে হল তাঁর। মায়ের কথা তাঁর রোজই মনে পড়ে, যে মা তাঁর একলার নিজস্ব। এতদিন মনের কোণে একটা ক্ষীণ আশা ছিল, মা নিশ্চয়ই কোথাও বেঁচে আছেন, একদিন হয়তো দেখা হবে। সেই আশার ক্ষীণ আলোটা হঠাৎ নিবে গেল। নিবে গিয়ে কিন্তু অন্ধকারে ছেয়ে গেল না চারদিক, একটা নূতন ধরনের আলো যেন জ্বলে উঠল কোথায়। যে শিখা থেকে এ আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা তিনি দেখতে পেলেন না, কিন্তু যে স্নিগ্ধ নূতন আলোতে তাঁর অন্তর প্লাবিত হল সেই আলোতে তিনি দেখতে পেলেন দাইকে আর দাইয়ের পিছনে আর একটি অবগুণ্ঠিতা নারীকে, কুয়াশায় ঢাকা এক রহস্যময়ী মূর্তিকে, ডাক্তার মুখার্জির স্ত্রীকে। তিনি তাঁকে হোটেলে খেতে দেননি।

''আরও গরম পুড়ি এনে দি—''

কোনও উত্তর দেবার আগেই দাই ছুটে গেল ধত্‌পত্‌ করে। গণেশ হালদার আর পারলেন না। টপটপ করে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তাঁর মনের মধ্যে একটা অনুচ্চারিত ভাব মন্ত্রের মতো ধ্বনিত হতে লাগল, কিছু হারায় নি, কিছু হারায় না।

সাধারণত খেয়েই তিনি শুয়ে পড়েন। সেদিনও অভ্যাসমতো শুয়েছিলেন, কিন্তু ঘুমুতে পারলেন না। অনেকক্ষণ চোখ বুঁজে শুয়ে রইলেন, ঘুম এল না। মায়ের চেহারাই বারবার ফুটে উঠতে লাগল মনে। মায়ের নানা চেহারাই। ছেলেবেলায় মা তাঁকে পদ্মার পাড়েই স্নান করিয়ে দিতেন, পদ্মার জলে নামতে দিতেন না। গামছা দিয়ে জোর করে তাঁর মুখ আর কানের পাশ ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে দিতেন, তারস্বরে কাঁদলেও ছাড়তেন না। জোর করে ঘাড় ধরে ভাত খাইয়ে দিতেন তাঁকে, বড় বড় ডেলা পাকিয়ে ভাতের গ্রাস মুখে পুরে দিতেন; অনেক বড় বয়স পর্যন্ত কাপড়-জামা পরিয়ে দিতেন তাঁকে, চুল আঁচড়ে দিতেন। যেদিন সরু চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে মাথায় ময়লা বার করতেন সেদিন কি প্রাণান্তকর ব্যাপার হত। সব আজ মধুময় স্মৃতি রয়ে গেল এক নিমেষে। সত্যি মা নেই? ঝিনুক যা বলল... হঠাৎ মনে পড়ল মা একদিন মেরেছিলেন তাঁকে, খেতেও দেননি, তারপর গোবর খাইয়ে পদ্মায় স্নান করিয়ে তবে খেতে দিয়েছিলেন। অপরাধ ছিল, মিথ্যাভাষণ। বারবার তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল কখনও মিথ্যা কথা বলব না। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন তিনি এ-যাবৎ। কিন্তু কি লাভ হয়েছে তাতে? মিথ্যাবাদী, মুখোশপরা ভণ্ড পাজিদেরই তো জয়জয়কার। সত্য তো তাঁকে বাঁচাতে পারল না। তিনি তো তলিয়ে গেলেন। তখন বিদেশে গিয়েছিলেন প্রতি ডাকে মাকে চিঠি লিখতে হত। তিনি কিন্তু খুব কম চিঠি লিখতেন, বুলি লিখত প্রায়ই। তাঁর শেষ চিঠিতে লিখেছিলেন, বাবা, পড়াশুনা মন দিয়ে কোরো, ধর্মে মতি রেখো, এর চেয়ে বড় আর কোনো কামনা নেই আমার। তুমি মানুষ হও, দেশের দশের মুখ উজ্জ্বল কর, তা হলেই আমার বুক ভরে উঠবে তোমাকে পেটে ধরা সার্থক হবে। মায়ের এ চিঠি তাঁর কাছে নেই। বিলেত থেকে আসবার সময় অনেক তুচ্ছ ফোটোগ্রাফ, পিক্‌চার পোস্টকার্ড সংগ্রহ করে এসেছিলেন, কিন্তু এ চিঠিখানা যত্ন করে রাখবার কথা তাঁর মনে হয়নি। এ চিঠির যে একদিন এত মূল্য হবে তা কে ভেবেছিল তখন। মায়ের ফোটোও নেই। সেকালের মেয়েরা ফোটো তোলাতে চাইতেন না। বাইরে মায়ের সব চিহ্ন অবলুপ্ত হয়েছে। যে ঘরে তিনি রাধাবল্লভের পূজা করতেন সে ঘর পুড়ে গেছে। যে গ্রাম তাঁর নিজের ছিল, যে গ্রামের নদী ঘাট মাঠ বাগান খাল বিলের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন তিনি, বদলে গেছে সে গ্রামের চেহারা। যুগ যুগান্তরে পরিণত হয়েছে। তবু কি মা মরেছেন? না, মরেননি। তিনি প্রবলভাবে বেঁচে আছেন তাঁর সারা হৃদয় জুড়ে। সেখানে তিনি শুধু জীবন্ত নন, তিনি মহীয়সী। অনেকক্ষণ চোখ বুঁজে শুয়ে রইলেন তিনি। অনেকবার এপাশ ওপাশ করলেন। বাইরের একটানা ঝিল্লী-ঝঙ্কারের দিকে কান পেতে রইলেন। ঘুম এল না। শেষে উঠে আলো জ্বেলে ডায়েরি লিখতে লাগলেন।

"মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে আজ অনেক কথা মনে হচ্ছে। তিনি যে মরেননি, এই কথাই কেবল মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে তিনি আরও বেশি করে বেঁচে আছেন। সারা বিশ্বে তাঁর স্নেহ ছড়িয়ে পড়েছে। একটু আগে যে বুড়ী দাইয়ের স্নেহ আকুলতা দেখলাম তার মাঝে তিনি আছেন, যে মহিমময়ী রমণী অন্তঃপুরের অন্তরাল থেকে আমার মঙ্গল চিন্তা করছেন, যাঁকে কখনও দেখিনি, হয়তো কখনও দেখব না, তাঁর মাঝেও তিনি আছেন। মায়ের কখনও মৃত্যু হয় না। তিনি জগদ্ধাত্রী, চিরকাল তিনি জগৎকে ক্রোড়ে ধারণ করে রক্ষা করেন, তাঁর যেদিন মৃত্যু হবে সেই দিনই মহাপ্রলয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে জগৎ। তিনি নানারূপে অহরহ সর্বত্র

আছেন বলেই জগৎ টিকে আছে, তিনি যেদিন থাকবেন না জগৎও থাকবে না। আমাদের শাস্ত্রে যে শক্তিকে দেবী বলে কল্পনা করা হয়েছে, তাঁর অনেক রূপ। দুর্গা, চণ্ডী, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী সবই তাঁর রূপ। নানা রূপে তিনি আমাদের চালিত করছেন জীবনের নিত্য নূতন পথে, যে পথ অনাদি অনন্ত, যে পথের বাঁকে বাঁকে নিত্য নূতন লীলা। শুধু তিনি আমাদের চালিত করছেন না, মঙ্গলকে রক্ষা করছেন অমঙ্গলের হাত থেকে, পাঁকের ভিতর থেকে ফোটাচ্ছে পদ্ম, পশুকে রূপান্তরিত করছেন সহৃদয় মানুষে। এর জন্যে প্রয়োজন হলে ভীষণাও হতে হয়েছে তাঁকে, অস্ত্রও ধারণ করতে হয়েছে। নির্বীর্য কাপুরুষের অন্তরে শৌর্য সঞ্চার করবার জন্য তিনিই তো যুগে যুগে বর্ষণ করেছেন অগ্নিবাণী। মনে পড়ছে বিদুলার কথা, মনে পড়ছে লক্ষ্মীবাঈয়ের কথা, মনে পড়ছে প্রীতি ওয়াদ্দারের কথা। অনুভব করছি এঁদের সঙ্গে আমার মা-ও একাসনে বসে আছেন। আমার গর্বের আজ অন্ত নেই। শুধু যে এঁদের সঙ্গেই বসে আছেন তা নয়, পৃথিবীর সব বীরপুরুষদের সঙ্গেও বসে আছেন। পৃথিবীতে নীচতা, হীনতা, পাশবিকতা, মূর্খতার বিরুদ্ধে যাঁরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা নারী কি পুরুষ এ প্রশ্ন অবান্তর। বানার্ড শ'য়ের সেন্ট জোয়ান নামক বিখ্যাত নাটকে জোয়ানের মুখ দিয়ে এক জায়গায় তিনি বলিয়েছেন, 'আমি সুন্দরী ছিলাম না, আমি কাঠখোট্টা গোছের ছিলাম, আমি সৈনিক ছিলাম। আমি পুরুষ হলেও ক্ষতি ছিল না। পুরুষ হতে পারিনি বলে আমার দুঃখ হয়। তবে আমি পুরুষ হলে হয়তো তোমরা আমাকে নিয়ে এতটা মাততে না। কিন্তু আমি যাই হই, আমার মাথা আকাশ স্পর্শ করেছিল, ঈশ্বরের মহিমা নেমে এসেছিল আমার উপর, সেইজন্য নারীই হই বা পুরুষই হই যতক্ষণ তোমরা কাদায় মুখ গুঁজড়ে পড়েছিলে ততক্ষণ আমি তোমাদের রেহাই দিতাম না, বিব্রত করতামই।' আমার মা যখন ওই গুণ্ডাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন তখন তাদের কি বলেছিলেন? সে কথা কেউ লিখে রাখেননি, কিন্তু আমি জানি না, যা-ই তিনি বলে থাকুন, তার সঙ্গে সেন্ট জোয়ানের কথার খুব অমিল ছিল না। সে কথার মর্মার্থ—তোমরা যতক্ষণ পশু থাকবে আমি তোমাদের ততক্ষণ মানুষ করবার চেষ্টা করব। দরকার হলে তাঁর জন্যে প্রাণ দেব। সে চেষ্টা আপাতত নিষ্ফল জেনেও আমি থামব না, থামবার অধিকার আমার নেই, শক্তিও নেই, কারণ ঈশ্বরের পরোয়ানা আমার হাতে আছে। ভালোবাসা দিয়ে যে পাথরের বুকে ফসল ফলাতে পারি না, ডিনামাইট দিয়ে তাকে উড়িয়ে দিই। সে ডিনামাইটের নিষ্ঠুর আর্তনাদ সঙ্গীত হয়ে জন্মগ্রহণ করে ভবিষ্যতের জঠরে। তখন ডিনামাইট থাকে না, পাথর থাকে না, থাকে শুধু সঙ্গীত, থাকে শুধু সুন্দর। তাই চিরন্তন। তার বিনাশ নেই। প্রাণ দিয়ে একেই আমরা আহ্বান করি। দক্ষিণে যখন দুর্যোগ ঘনায়, পূর্বাকাশে তখন গান জমে, সুর ফোটে, রং জাগে। মনে পড়ছে এলিয়টের কবিতা : দক্ষিণে কি পাখিরা গান গাইছে? ঝঞ্ঝাহত সিন্ধু-শকুনদের চিৎকার ছাড়া তো শব্দ নেই। বসন্তের পদচিহ্ন কি দেখা যাচ্ছে? না, পুরাতনের মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নেই, কোনো সাড়া নেই, তৃণাঙ্কুর নেই, হাওয়া নেই। দিন কি বাড়ছে? দিন যত বাড়ছে আঁধার তত বাড়ছে, রাত্রি তত ছোট হচ্ছে, তত ঠাণ্ডা হচ্ছে। বাতাস বইছে না, রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে প্রকৃতি। বাতাস কিন্তু অপেক্ষা করে আছে পূর্বাকাশে। ক্ষুধার্ত কাকের দল একাগ্র হয়ে বসে আছে মাঠে ঃ বনের অন্ধকারে পেচকেরা সাধছে প্রলয়ের সঙ্গীত। এ কোন্ নিদারুণ বসন্তের আভাস? বাতাস কিন্তু অপেক্ষা করছে

পূর্বাকাশে। মায়ের মৃত্যু কি সেই বাতাস হয়ে অপেক্ষা করছে পূর্বাকাশে? যে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর চক্রান্ত আমাদের দেশকে দ্বিধাবিভক্ত করে রক্তের স্রোত বইয়ে দিলে, মায়ের মৃত্যু কি ঝড়ের মতো এসে সে চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে ভাঙা দেশকে আবার জুড়ে দেবে? নিষ্ঠুর গ্রীষ্মের পর বর্ষা কি নামবে না? জানি না, কিন্তু আশা করি। এখন কিন্তু আমার সবচেয়ে বেশি আনন্দ হচ্ছে যে আমার মা এখন কেবল আমার মা নন। একটা ছোট গ্রামের ছোট গৃহস্থের ছোট-খাটো গৃহস্থালি কাজকর্ম বেঁধে রাখতে পারেনি তাঁকে সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে। তিনি এখন উত্তীর্ণ হয়েছেন অসীমের মধ্যে, সঙ্গীতের মধ্যে, কবিতার মধ্যে। এখন তিনি সকলের, এখন তিনি মানুষ নন, মহৎ ভাবের প্রতীক। এখন তিনি ইতিহাসের নমস্য বীরদের সঙ্গে একাসনে সমাসীন। তিনি এখন আমার একার নন, তিনি সর্বকালের, সবার।... এই পর্যন্ত লিখে অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। মনে হচ্ছিল আমার মা সকলের মা হয়ে গেছেন, এতে কি আমি সত্যিই খুশি হয়েছি? হওয়া উচিত হয়তো, কিন্তু অকপটে সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, হইনি। আমার মা আজ নেই বলে সত্যি এইসব কথা ভেবে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করছি। আমার মা বিশ্বের মা হয়ে গেছেন এই ভেবে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করবার প্রয়াস পাচ্ছি, তা ঝুটো, অন্তঃসারশূন্য। আমার মাকে আমার জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে একান্তভাবে না পেলে তাঁকে পাওয়া হয় না। তাঁকে ছোট করে অত্যন্ত স্বার্থপরের মতো কেবল নিজের জন্যে পেলেই তবে তৃপ্তি। তার জন্যে আমার মায়ের মহৎ হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার স্নেহে অন্ধ হয়ে তিনি যদি পরশ্রীকাতর হন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হন, আমার মঙ্গলের জন্য তিনি যদি মিথ্যা ভাষণ করেন, চুরি করেন, তাহলে তাতেই আমার বেশি সুখ। মায়ের হাতের আলোনা পোড়া রান্না খেয়েও আমার যে তৃপ্তি, মহার্ঘ হোটেলে নিখুঁত খাদ্যপানীয়ে আমার সে তৃপ্তি নেই। মায়ের ব্যাপারে আমি স্বার্থপর। মায়ের ভালোবাসায়, মনের, মনোযোগের, সেবার সবটা আমিই দখল করতে চাই। কাউকে ভাগ দেওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারি না। আমার জন্মের বেশ কিছুদিন পরে বুলির জন্ম হয়। আমার বয়স যখন চার বছর তখন বুলির জন্ম। আঁতুড়ঘর থেকে বেরিয়ে মা ওকে যখন প্রথম কোলে নিয়ে বারান্দায় বসলেন, আর আমি কোলে উঠতে গেলে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, এখন নয় বাবা, পরে তোমাকে কোলে নেব, এখন বোনটিই কোলে থাক, কেমন? মনে আছে সেদিন যে গভীর দুঃখ, যে প্রবল আঘাত আমি পেয়েছিলাম-তা বর্ণনাতীত। সেই আমার জীবনের প্রথম সত্যকার দুঃখ। আমার মা আর আমার একার নয়, আর একজন মায়ের কোলে জুড়ে বসেছে। আমার চোখ দিয়ে জল পড়েনি, আমি সঙ্গে সঙ্গে সরে গিয়েছিলাম। হয়তো আমার মুখে একটু ম্লান হাসিও ফুটেছিল, কিন্তু আমার সেই হাসির অন্তরালে যে গভীর বেদনা লুকিয়েছিল তা মায়ের চোখ এড়ায়নি। তিনি তৎক্ষণাৎ বুলিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কোলে টেনে নিয়েছিলেন আমাকে। তখুনি চুমু খেয়েছিলেন। এরপর আমি আর আত্মসংবরণ করতে পারিনি, মায়ের গলা জড়িয়ে, তাঁর বুকে মুখ গুঁজে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলাম। আমার বোন বুলির বদলে যদি সারা বিশ্ব এসে মাকে ঘিরে দাঁড়ায় তাহলে কি সহ্য করতে পারব আমি তা? না, পারব না। এতক্ষণ আমি নিজেকে ছলনা করছিলাম, ভোলাচ্ছিলাম, ঠকাচ্ছিলাম। অভিনয় করছিলাম। মা নেই, মাকে আর কখনও দেখতে পাব না এ শোকের সান্ত্বনা নেই, কিন্তু এই নিদারুণ সত্যটার সঙ্গে

আমি নিজেকে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছি না। অথচ এ কথাও তো সত্য, মানুষ যখন অমর নয় তখন মায়ের একদিন না একদিন মৃত্যু হতই। কিন্তু সে মৃত্যু আর এ মৃত্যু কি এক? স্বাভাবিক মৃত্যু তো রোজ হয়, ঘরে ঘরে হয়, অনাদিকাল থেকে হয়ে আসছে। কিন্তু সে মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বিনিদ্র রজনীর উৎকণ্ঠা, জড়িয়ে থাকে আসন্ন শোকের অন্ধকারে অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে চিরবিচ্ছেদের আশঙ্কা, জড়িয়ে থাকে আশা-হতাশার দ্বন্দ্ব, জড়িয়ে থাকে অসংখ্য স্মৃতি, অসংখ্য আকৃতি, ভালোবাসার অসংখ্য অবর্ণনীয় ইতিহাস, প্রেমের স্পর্শে সে মৃত্যু মহৎ হয়ে ওঠে। গুণ্ডা আর কষাইয়ের হাতে মায়ের যে মৃত্যু হয়েছে, পশুত্বের কাছে মনুষ্যত্বের এই শোচনীয় পরাভব—না, আমার মা পরাভব স্বীকার করেননি, যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছেন, শ্রীমতী ঝিনুকেব দেওয়া এই সংবাদটুকুর জন্য আমি তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আমার মা অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি, এটা বহুমূল্য সংবাদ আমার কাছে। এইটে আঁকড়ে ধরেই বেঁচে থাকতে হবে। আশা করি বুলিও নিজের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছে। হঠাৎ একটা কথা মনে হচ্ছে, নিদারুণ কথা সেটা! ঝিনুক মায়ের খবর জানে, কিন্তু বুলির বেলায় বললে, ঠিক জানি না। সত্যি কি ঠিক জানে না? অপ্রিয় সংবাদ বলে চেপে গেল সেটা আমার কাছে? ঝিনুক কি ধরনের মেয়ে? সেদিন ডাক্তার ঘোষালের মুখে তার যে পরিচয় শুনেছি তা তো ভয়ানক। গিরিশ বিদ্যার্ণবের মেয়ে ডাক্তার ঘোষালের রক্ষিতা হয়ে আছে! একথা ভাবা যায় না। ঝিনুকও এ কথা বিশ্বাস করতে মানা করেছে। বলেছে, ডাক্তার ঘোষাল যা বলেছেন তা সর্বৈব মিথ্যা, কিন্তু একথাও তো অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ডাক্তার ঘোযালের মতো লোকের কাছে ও টিকে আছে। ডাক্তার ঘোষালের মতো বে-পরোয়া দুর্ধর্ষ লোকের কাছে কি সসম্মানে থাকা যায়? বিশ্বাস করা কঠিন। তা ছাড়া আর একটা মেয়েকেও দেখেছি ওদের আড্ডায়। মনে হয় মানবীর বেশে সর্পিণী। ও মেয়ের সঙ্গে ঝিনুকের ঘনিষ্ঠতা আছে না কি! একটা কথা কিন্তু আমাকে স্বীকার করতেই হবে। ঝিনুকের চোখে মুখে আমি একটা ভাব লক্ষ করেছি যা খেলো নয়, সস্তা নয়, যার মধ্যে অনন্যতা আছে, যা মনকে কলুষিত করে না, পবিত্র করে, কিন্তু— না, যে কথাটা এখনি মনে হল তা আমি মানব না। ঝিনুক আমাকে বিচলতি করেনি, আমার বিবেককে অপবিত্র করেনি। তবে এটা অবশ্য ঠিক যে, আমি চাই ওর বাইরেটা যেমন সুন্দর, ভিতরটাও তেমনি সুন্দর হোক। আশা করি ভিতরটা ওর সুন্দরই। তনিমা সেনকে দেখামাত্র সমস্ত শরীরটা যেমন ঘিনঘিন করে ওঠে, ঝিনুককে দেখে তা ওঠে না। মনে হয় ওর মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা আবিষ্কারযোগ্য, যা আবিষ্কার করতে পারলে আনন্দ পাওয়া যাবে। কিন্তু আবিষ্কার করবার জন্যে আমি কি উৎসুক? অস্বীকার করতে পারব না, ঔৎসুক্য আছে—"

হঠাৎ গণেশ হালদার থেমে গেলেন। বাইরের দুয়ারে কে কড়া নাড়ছে। রকেট ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল ও বাড়িতে। কড়া নাড়ার সামান্য আওয়াজ পেলেই ও চিৎকার করে। গণেশ হালদার ভ্রূকুঞ্চিত করে চাইলেন বাইরের দিকে। আবার কড়া নাড়ার শব্দ হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টাওয়ার ক্লকের ঘণ্টা বাজল টং, টং। দুটো বেজেছে? গণেশ হালদার নিজের ঘড়িটা দেখলেন, হ্যাঁ, দুটোই তো। এত রাত্রে কে আসবে তাঁর কাছে? উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে রইলেন তিনি বাইরের দিকে। আবার কড়া নাড়ল। তিনি কপাট খুলে বাইরের উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। বাইরের উঠোনটা পার হয়ে তবে বাইরের দরজাটা। তিনি এতক্ষণ ঘরে খিল দিয়ে লণ্ঠনের

আলোয় বসে লিখছিলেন। বাইরের উঠোনে পা দিয়েই তিনি যেন একটা রূপকথালোক আবিষ্কার করলেন। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে, আর তার আলোটা পড়েছে শিরীষ গাছের উপর। সেই শিরীষ গাছের ছায়াটা পড়েছে তাঁর উঠোনে। মনে হচ্ছে যেন একটা কালো মখমলের উপর রুপোর বিচিত্র কাজ করা রয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে গণেশ হালদারের মনের রং বদলে গেল। মুহূর্তের মধ্যে, নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি যেন কবি হয়ে গেলেন। তিনি যেন উপলব্ধি করলেন আপাতদৃষ্টিতে যে দেখা যায় তা দর্শন নয়। বিশেষত যে আপাতদৃষ্টি বহু নরনারীর দৃষ্টির সাক্ষ্য মানতে অভ্যস্ত সে আপাতদৃষ্টির ভুল সহজেই ধরা পড়ে যদি সে ভুলকে ভুল বলে চেনবার চোখ খুলে যায়। সেই চোখ যেন তাঁর সহসা খুলে গেল। তাঁর বাড়ির পাশের নিতান্ত তুচ্ছ শিরীষ গাছটাকে সকলের সাক্ষ্য মেনে এতদিন তিনি শিরীষ গাছ বলেই মেনে এসেছেন। আজ তাঁর মনে হল ওটা কেবল শিরীষ গাছ নয়, ওটা এমন একটা জিনিস যা ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাতে পারে। প্রখর দিবালোকে তার যে রূপ, ম্লান জ্যোৎস্নায় তার সে রূপ থাকে না। সে তখন শিল্পী। জ্যোৎস্নার সাহায্যে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে সে রুপোর কাজ-করা অপূর্ব কালো মখমলের অপূর্ব গালিচা সৃষ্টি করতে পারে। দিনের বেলায় ঘন গুচ্ছ পত্রপল্লবের ফাঁকে ফাঁকে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়ে সে যা করে তাতো সবাই জানে, সবাই দেখেছে। কিন্তু তার এই কীর্তিটা! মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। হয়তো আরও খানিকক্ষণ থাকতেন। কিন্তু আবার কড়া নড়ল। এগিয়ে গিয়ে কপাটটা খুলে দিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ঝিনুক ঢুকল এসে। কপাটটায় খিল দিয়ে চাপা গলায় বলল, আমি ঝিনুক। ঘরের ভিতর চলুন। গণেশ হালদার কোনো প্রশ্ন করলেন না। ঘর থেকে বেরিয়েই তিনি যে রূপকথার অঙ্গ বলে মনে হল তাঁর। তিনি যন্ত্রচালিতবৎ ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন, ঝিনুকও তাঁর পিছু পিছু ঘরে এসে ঢুকল।

"আমাকে এ সময়ে দেখে খুব আশ্চর্য হয়েছেন, না?"

গণেশ হালদার আশ্চর্য হয়েছিলেন। কিন্তু মুখে যা বললেন তা অন্যরকম।

"না, আশ্চর্য হবার কি আছে এতে। এসেছেন কেন, দরকার আছে কিছু?"

"এইগুলো দেখে দিন।"

ঝিনুক কাগজে মোড়া কয়েক বান্ডিল নোট বার করে হালদারের হাতে দিয়ে বলল, "আপাতত এগুলো আপনার কাছে থাক, আমি পরে এসে আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাব। কথাটা কিন্তু গোপন রাখবেন। কেউ যেন জানতে না পারে।"

"কি এগুলো?"

"টাকা। এগার হাজার টাকা আছে ওতে—"

"এত টাকা কোথায় পেলেন আপনি এত রাত্রে?" গণেশ হালদারের বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে গেল। একটু আতঙ্কিত হলেন তিনি।

"এত টাকা কোথায় পেলেন?"

আবার প্রশ্ন করলেন তিনি।

"সে-সব পরে বলব। আমার সব কথাই বলব আপনাকে। মুখে না বলতে পারি চিঠি লিখে জানাব। সব জানাব আপনাকে।"

ঝিনুক সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে চলে গেল। গণেশ হালদারের ভয় করতে লাগল। তাঁর মনে হল অনিবার্যভাবে তিনি এদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন, এটা ভালো হচ্ছে কি?

ঝিনুক নিজের বাড়ি গেল না, গেল ডাক্তার ঘোষালের বাড়ির দিকে। সে জানত নিজের বাড়িতে তার কাকা জেগে বসে আছেন। ওই নপুংসক লোকটাকে তার ভয় ছিল না, কিন্তু চিৎকার চেঁচামেচিতে একটা গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে এই ভয়ে সে আর গেল না সেখানে। যতীশবাবু তাঁর আপন কাকা নন। গিরিশ বিদ্যার্ণব তাঁর পিসতুতো ভাই। বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন হয়ে তিনি গিরিশ বিদ্যার্ণবের স্ত্রীর কাছে মানুষ হন। কুটুম্বের ছেলে বলে কেউ তাঁকে কিছু বলত না। কুটুম্বের বাড়িতে পোষ্য হয়ে মানুষ হলে সাধারণত যা হয় এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। যতীশবাবু সুস্থ সবল মানুষ হতে পারেনি, হয়েছেন কুটিল কুচক্রী স্বার্থপর অমানুষ। গ্রামের বিস্তৃত পরিবেশে তাঁর সঙ্গ তত পীড়াদায়ক মনে হত না, ঝিনুক শামুক তো কলকাতার বোর্ডিং-এ থাকত বেশির ভাগ সময়, তাই যতীশবাবুর সত্য পরিচয়ও তারা ঠিক ধরতে পারেনি। দাঙ্গার সময় তাঁর স্বরূপ বেরুল। তারপর এখানে এসে একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি বাস করে তাঁব আসল পরিচয় আরও পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে। যতীশবাবু টাকা চান। যেভাবেই হোক ঝিনুক-শামুক রাশি রাশি টাকা রোজগার করে আনুক, যেমন করে পারে আনুক, তিনি সেটার উপর কর্তৃত্ব করবেন। তিনি যে নিজেকে পূর্ববঙ্গের একজন বড় জমিদার বলে পরিচয় দিয়েছেন, চায়ের দোকানে বসে রং চড়িয়ে নানা গল্প বলে আস্ফালন করেছেন, সেটা হাতে-কলমে প্রমাণ করবার চেষ্টা করবেন, এবং অবশেষে পাকিস্তানে চলে গিয়ে সেখানে টাকা ছড়িয়ে আরামে থাকবেন, এইটেই আপাতত তাঁর লক্ষ্য। সত্যিই তিনি ঝিনুকের ফিরবার আশায় জেগে বসে ছিলেন। ঝিনুক কিন্তু গেল না। সে গেল ডাক্তার ঘোষালের বাড়ি। সেখানে যাওয়ার অন্য একটা কারণও ছিল। ডাক্তার ঘোষালের প্রাপ্য টাকাটা নিশ্চয়ই তাঁকে দিয়ে গেছেন সুবেদার খাঁ। সুবেদার খাঁ সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিয়ে দেন সবাইকে, কারও টাকা তিনি নিজের কাছে রাখেন না। ডাক্তার ঘোষাল টাকাটা নিয়ে কি করলেন, কোথায় রাখলেন, এই চিন্তাও ছিল ঝিনুকের। ঘোষাল সাধারণত যখন যা পান ঝিনুককেই দিয়ে দেন, এমন কি জুয়া খেলে যে টাকা রোজগার করেন সে টাকাও। গত কয়েকদিন থেকে কিন্তু ঝিনুককে কোনো টাকা তিনি দিচ্ছেন না। মুদির দোকানে ধার জমে গেছে, দুধওলা দাম চাইছে, মদের দোকানেও অনেক ধার... আজকের এ টাকার খানিকটা অন্তত ঝিনুকের পাওয়া নিতান্ত দরকার। তা না হলে চালানো যাবে না।

ঝিনুক গলির মধ্যে ঢুকেই সোজা বাড়ির দিকে গেল না। উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। সে আশঙ্কা করেছিল তাস খেলার হুল্লোড় তখনও বোধ হয় থেমে যায়নি। কিন্তু কোনো শব্দ শোনা গেল না। আর একটু এগিয়ে দেখল বাড়ির সামনে কারো গাড়ি দাঁড়িয়ে নেই। বাড়ির সামনের দরজাটা খোলা। তারপর নজরে পড়ল দরজার পাশে কে যেন বসে আছে।

"কে?" এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল ঝিনুক।

"আমি কাউ।"

"ওখানে অমনভাবে বসে কেন?"

"আপনার অপেক্ষাতেই বসে আছি।"

"ডাক্তার ঘোষাল কোথায়?"

"তিনি একটু আগে বেরিয়ে গেছেন।"

"খেয়ে গেছেন?"

"ডিম পাঁউরুটি খেয়ে গেছেন। আজ তো রান্না হয়নি। মিস্টার সেনের ওখানেই উনি বোধ হয় খাবেন।"

ঝিনুক আর একটু এগিয়ে এল। ঝিনুক আসতেই একটা কাগজের পুলিন্দা বার করে কাউ বললে, "এই নিন।"

"কি আছে এতে।"

"আপনার চুড়ি আর হার!"

"সে কি! ওগুলো তো তোমার মাকে দিয়েছিলাম। তিনি ফিরিয়ে দিলেন?"

"না, আমি কেড়ে এনেছি। আপনার গয়না আমি ওকে নিতে দেব না।"

"তোমার মা কোথায়?"

কাউ এ কথার কোনো উত্তর দিল না। দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

।। দশ ।।

ডাক্তার সুঠাম মুখোপাধ্যায় সেদিন গঙ্গার ধারে গিয়েছিলেন। গঙ্গার যেসব জায়গায় সবাই যায়, পরিচিত জনতার প্রতিদিনের পদক্ষেপে যেসব জায়গা ঘাটে পরিণত হয়েছে তিনি সেখানে যাননি। তিনি আঘাটায় গিয়ে বসেছিলেন একটা ভাঙা বাড়ির চত্বরে। বহুকাল পূর্বে শহর থেকে দূরে জনতার ছোঁয়াছ বাঁচিয়ে যে লোকটি এখানে কেবল সুরধুনীর সঙ্গ লাভ করবার জন্য বাড়ি করিয়াছিলেন, তার নামও অনেকে ভুলে গেছে। দু-একজন বৃদ্ধ লোক বলেন, ওটা ফুদিবাবুর বাড়ি। তিনি কলকাতা থেকে এসে এখানে জমি কিনে এই বাড়ি অনেক শখ করে করিয়াছিলেন বাস করবেন বলে। প্রথম কিছুদিন তাঁর পরিবারবর্গও ছিলেন এখানে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকতে পারেননি। সমাজের বাইরে নির্জন স্থানে থাকবার জন্য যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ সংস্কৃতির প্রয়োজন তা তাঁদের ছিল না। অধিকাংশ মানুষের স্বভাব লতার মতো, তা অপরকে আশ্রয় করে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে না থাকতে পেলে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে। তাদের জন্য সমাজের মাচা চাই। নিজের জোরে খাড়া একা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে বনস্পতি। এ রকম বনস্পতি মানুষের মধ্যে খুব বেশি নেই। ফুদিবাবু সেই রকম বনস্পতি ছিলেন। তাঁর পরিবারবর্গ এখানে থাকতে পারেননি, কিছুদিন থেকেই কলকাতা চলে গিয়েছিলেন তাঁরা। ফুদিবাবু যাননি। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবরটাও আশ্চর্যজনক। তিনি যেদিন হৃদয়ঙ্গম করলেন শরীর অপটু হয়েছে সেদিন তিনি ডাক্তার ডাকেননি, গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, আর ওঠেননি। এখানকার লোকের ধারণা, তিনি এ বাড়ি ছেড়ে যাননি। অনেকে তাঁকে এ বাড়িতে ঘোরা-ফেরা করতে দেখেছে। এই জন্যেই এ বাড়ি কিনতে চায় না কেউ। ফুদিবাবুর ছেলেরা বিক্রি করবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ক্রেতা পাওয়া যায়নি। বাড়িটা এমনই পড়ে আছে। লোক কপাট জানালা খুলে নিয়ে গেছে। কিন্তু রেকতার গাঁথুনি ভেঙে ইটগুলো নিয়ে যেতে পারেনি এখনও।

গঙ্গার দিকে যে বিরাট বারান্দাটা আছে তাতেই বসে ছিলেন সুঠাম মুখুজ্যে। একদল খঞ্জন

পাখির দিকে চেয়ে চুপ করে বসে ছিলেন। ওপারের বালুচরে গৃধিনিও ছিল কয়েকটা। বেশ হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছিল তারা। মনে হচ্ছিল তারাও যেন প্রাত-ভ্রমণে বেরিয়েছে। এপারে বাঁশের উপর বসে ছিল একটা মাছরাঙা পাখি। গঙ্গার জল কমে গিয়েছিল, জলের ধারে ধারে সাদা বক ঘুরে বেড়াচ্ছিল দু-একটা। আর ঘাপটি মেরে বসে ছিল একটা কোঁচ বক। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তার রং এমন মিলে গিয়েছিল যে, চেনা যাচ্ছিল না তাকে। হঠাৎ ডাক্তারবাবু সেটাকে দেখতে পেলেন। তাঁর মুখে কৌতুকের মৃদু হাসি ফুটে উঠল। পকেট থেকে কাগজ বার করে লিখতে শুরু করলেন।

''আজ আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছি। ভেবেছিলাম কিছু করব না, তার স্মৃতি নিয়ে বসে থাকব চুপ করে। কিন্তু দেখলাম চুপচাপ বসে থাকা যায় না। দেহটাকে জোর করে এক জায়গায় বসিয়ে রাখলেও মন বসে থাকে না। আর মনকে ঠিক যে জিনিসটা ভাবতে বলা যায় তাও সে ভাবে না। চঞ্চল শিশুর মতো ছুটোছুটি করে বেড়ায় সর্বত্র। যোগীরা হয়তো মনকে বাগ মানাতে পারেন, আমি পারলুম না। তাই চুপচাপ বসে থাকার সঙ্কল্প ত্যাগ করে ফুদিবাবুর বাড়ির চালাতে এসে বসেছি। এখানে এই নির্জনে এসে একটা জিনিস আবিষ্কার করে অবাক হয়ে গেলাম, মন নিগূঢ়ভাবে বন্ধুর কথাই ভাবছে। ওই কোঁচ বকটার মতো বন্ধুর ভাবনাটাও আত্মগোপন করে বসে ছিল এতক্ষণ মনেরই ভিতর। আমি দেখতে পাইনি। সেই ভাবনাটাকেই প্রণিধান করতে লাগলাম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। ওই বকটার সূত্র ধরেই মনে পড়ছে মহাভারতের বিখ্যাত বকের কথা, যে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেছিল— পৃথিবীতে সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস কি। যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন, দিবারাত্রি আমরা দেখছি যে সবাই একে একে মরে যাচ্ছে, তবু আমরা একবারও ভাবি না যে. আমরাও মরে যাব। এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি হতে পারে? যুধিষ্ঠির যা বলেছিলেন তা খানিকটা সত্য বটে, কিন্তু আমরা যে নিজেদের মৃত্যুর কথা একেবারে ভাবি না, তা সত্য নয়। আমরা প্রত্যেকেই জানি, অনুভব করি যে, আমাদের মরতে হবে, মৃত্যুদণ্ড মাথায় নিয়েই আমরা সবাই জন্মগ্রহণ করেছি। ক্রিশ্চানদের মতে আমরা পাপী হয়েই জন্মগ্রহণ করি। এটা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তা জানি না, কিন্তু এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আমরা মরব বলেই জন্মেছি। কিন্তু এই নিদারুণ সত্যটা মনে রাখলেই কি আমরা মৃত্যুর হাত এড়াতে পারব? তা যদি না পারি তা হলে এ নিয়ে বেশি মাতামাতি করে লাভই বা কি? আমার বন্ধু জীবনে অনেক কীর্তি রেখে গেছে, সে যদি সর্বদা মরণের ভয়ে ভীত হয়ে বসে থাকত তা হলে সে কি কিছু করতে পারত? মানুষের ওইখানেই তো মহত্ত্ব, সে জানে যে, তাকে মরতে হবে, তবু জীবনকে ভোগ করতে সে বিরত হয় না, জীবন নশ্বর জেনেও জীবনকে তারা ভালোবাসে, মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনেও সে অমৃতের সন্ধান করে ভঙ্গুর জীবন-লীলায়। ওই যে খঞ্জনের দল লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে ওরা কি আমাদের মতোই জানে যে, মৃত্যুকে এড়াবার উপায় নেই? ওদের মৃত্যু-ভয় আছে, কিন্তু হবেই এ দৃঢ় প্রত্যয় আছে কি? জানি না। কোনো কিছুর সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলতে ভয় পাই। কে জানে, একদিন হয়তো আবিষ্কৃত হবে পাখিরা আমাদেব চেয়ে ঢের বেশি বুদ্ধিমান। মানুষ একদিন মনে করত পৃথিবী চতুষ্কোণ এবং স্থির, এখন প্রমাণিত হয়েছে পৃথিবী গোল এবং অস্থির। পাখিদের সম্বন্ধে হয়তো চমকপ্রদ অনেক অবিশ্বাস্য তথ্য প্রকাশ পাবে ভবিষ্যতে। তবে একটা কথা জানি, মৃত্যুর সম্বন্ধে না হলেও জীবন সম্বন্ধে ওরা আমাদের চেয়ে ঢের বেশি পটু।

ওরা প্রাণ ভরে বাঁচতে জানে। মানুষের তৈরি খাঁচায় বন্দী হয়ে যারা বাঁধা বুলি কপচাতে শেখেনি তারা অনবদ্য। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তারা ডানা মেলে ওড়ে, গান গায়, জীবনের উৎসবে মেতে ওঠে, নেচে, গেয়ে, পক্ষবিস্তার করে সঙ্গিনীর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে। ওদের ডাক্তার নেই, উকিল নেই, রাজনীতি নেই, স্বাদেশিকতা নেই, ফ্রন্টিয়ার নেই। জীবনের আনন্দেই ওরা ভরপুর। আমার যে বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়েছি সেও অনেকটা ওই পাখিদের মতোই ছিল। তার প্রাণ-প্রাচুর্যের অকালপরিণতিতেই তার মৃত্যু। সে পাখি ছিল না, সভ্যতার আওতায় মানুষ হতে হয়েছিল তাকে, তাই নানারকম রোগ ঢুকেছিল তার শরীরে। কিন্তু সে ছিল প্রাণের খর-বেগে বেগবান অমিতবীর্য চির-যুবা। রোগের হুমকি সে মানেনি, ডাক্তারের উপদেশ শুনে জীবনের সুরকে বেসুরো করে ফেলেনি। যখন যা খুশি করেছে, তাই মরে গেল। সে জানত মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু সাবধান হয়নি তবু, সাবধান হতে সে জানত না। খুব অসুস্থ হলে কিছুদিন বিছানায় শুয়ে থাকত, ডাক্তারদের বলত এবার আপনাদের কথা শুনব। কিন্তু ভালো হলে আবার যে-কে সেই। অনিবার্যকে নিবারণ করবার চেষ্টা করেনি সে, তাই হঠাৎ একদিন থেমে গেল। মনে হয় ঠিক সমে এসেই থেমেছে। এই সূত্রে কেন জানি না মনে পড়ছে সেদিনকার সেই রূপসী মেয়েটিকে, সেদিন রাত্রে ডিসট্যান্ট সিগনালের কাছে ব্যাগ কুড়োতে গিয়েছিল! সেও বেপরোয়া, সেও জীবনকে ভোগ করতে চায় বলে মরণকে ভয় করে না। যে লোকটি গুলি চালিয়েছিল তার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ কি? কিন্তু এটা লিখেই সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে— ওরে উৎসুক, এসব জেনে কি হবে? কতটুকু বা জানতে পারবি? তার চেয়ে কল্পনা কর। কল্পনায় অনেক রং ফুটবে, অনেক দূর যেতে পারবি, শেষ পর্যন্ত হয়তো যে সিদ্ধান্তে পৌঁছবি তা দুনিয়ার নিরিখ-প্রমাণ অনুসারে হয়তো ভুল, কিন্তু তাতেই তুই সুখ পাবি। ওরা দুজনে প্রণয়-প্রণয়ী এ কথা ভেবে আনন্দ করতে ক্ষতি কি? আমাদের দেশের পুরাণকাররা এর চেয়ে ঢের বেশি দুঃসাহসিক কল্পনা করেছেন। স্বয়ং ভগবানকে নিয়ে গেছেন বৃন্দাবনের গয়লাপাড়ায় আর তাঁকে দিয়ে যেসব প্রণয়-লীলা করিয়েছেন তা আধুনিকতম ফরাসী সমাজে এ বোধ হয় বেমানান হবে না। শুধু তাই নয়, তাঁদের কল্পনা এত প্রবল, এমন বর্ণাঢ্য, এমন মর্মস্পর্শী যে তা সত্য কি মিথ্যা তা যাচাই করবার প্রশ্নও আমাদের মনে জাগেনি, আমরা পুজো করেছি সে লীলা-উৎসবকে যুগ-যুগান্ত ধরে...''

এই পর্যন্ত লিখে ডাক্তারবাবু দেখতে পেলেন বালুর চর ভেঙে কে যেন আসছে এবং তাকে দেখেই মাছরাঙা পাখিটা উড়ে গেল। ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন। কে আসছে চর ভেঙে এ সময়ে? কাছে আসতে চিনতে পারলেন গণেশ হালদারকে। তিনি ওপারের চরে গেলেন কি করে? তারপর তাঁর মনে পড়ল, তাঁর বাড়ির সামনে যে চরটা আছে সেটা দিয়ে এখানে আসা যায়। আজ রবিবার ছুটি আছে, তাই মাস্টারমশাই বেড়াতে বেরিয়েছেন। অনেক দূর হেঁটেছেন তো। বালির চরের উপর দিয়ে প্রায় পাঁচ-ছ মাইল হাঁটতে হয়েছে। মাস্টারমশাই ওপারে এসে যে বাঁশটার উপর মাছরাঙাটা বসে ছিল সেইটের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মুখ তুলে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু পরেই পাখিটা হঠাৎ আবার ফিরে এল। ফিরে এসে নদীর মাঝখানে শূন্যে নিজেকে স্থির রেখে পাখা দুটো নাড়তে লাগল ঘন ঘন, তারপরই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে একটা মাছ তুলে নিয়ে উড়ে গেল। মাস্টারমশাই সাগ্রহে চেয়ে রইলেন

পাখিটার দিকে, আর ডাক্তারবাবু নদীর ওপারে একটা ভাঙা বাড়ির চাতালের উপর বসে সকৌতুকে দেখতে লাগলেন তাঁকে। গণেশ হালদারের যে পাখি দেখার এত ঝোঁক তা তিনি জানতেন না। জেনে খুশি হলেন। তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা একটু যেন বেড়ে গেল। এই মাছরাঙাদের সম্বন্ধেই অনেক গল্প শোনাতে পারেন তিনি তাঁকে। এককালে তিনিও ওই মাছরাঙাদের পিছু-পিছু ঘুরেছেন। হঠাৎ গণেশ হালদার দেখতে পেলেন ডাক্তারবাবুকে। হাত তুলে নমস্কার করলেন। তারপর মুখের দু পাশে হাত রেখে চিৎকার করে বললেন, "ওদিকে পারঘাটা পেরিয়ে আমি আসছি। আসব?"

ডাক্তারবাবুও চেঁচিয়ে উত্তর দিলেন, 'আসুন।' মাস্টারমশাই নদীর ওপারে বালুর চরে হাঁটতে লাগলেন পারঘাটার দিকে, আর ডাক্তারবাবু তাঁর দিকে চেয়ে বসে রইলেন। তিনি যেমন ঔৎসুক্যভরে পাখি বা প্রজাপতি দেখেন, ঠিক তেমনিভাবেই তিনি দেখতে লাগলেন গণেশ হালদারকে। তাঁর মনে হল ওই লোকটিও একটি পর্যবেক্ষণীয় জীব যাঁর সম্বন্ধে তাঁর তেমন কোনও জ্ঞান নেই, শুধু এইটুকু আভাস পেয়েছেন, লোকটির মন দামী ঘড়ির হেয়ার-স্প্রিং-এর মতো স্পর্শকাতর, ইংরেজিতে যাকে বলে sensitive। তারপর তাঁর মনে হল পাখি প্রজাপতি জন্তু-জানোয়ারদের সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা সহজ, তারা কখনও কিছু গোপন করে না, কিন্তু যে মানুষ সর্বদা ছদ্মবেশ ধারণ করে থাকে, তাকে চেনা সহজ নয়। অ্যালেক্সিস্ ক্যারেলের মতো বিখ্যাত ডাক্তার সারাজীবন মানুষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে বই লিখেছেন— Man, the unknown। প্রত্যেকটি মানুষ শুধু চেহারায় নয়, ব্যক্তিত্বে আলাদা। পাখির বা প্রজাপতির সম্বন্ধে বই পড়ে তাদের চেনা যায়, কিন্তু মানুষের অ্যানাটমি ফিজিওলজি পড়ে মানুষ চেনা যায় কি? শুধু বোঝা যায় ও মানুষ,— বাঁদর বা বাঘ নয়। কিন্তু ওই বোঝাটাই কি যথেষ্ট? মনুষ্য-রূপী লোকটার মধ্যে যে বাঁদর বা বাঘ, সাপ বা শকুন, দানব বা দেবতা প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে সেটার চেহারা তো মানুষের বাইরের চেহারা দেখে ধরা যায় না। মনে পড়ল, কিছুদিন আগে কতকগুলো খুনের ফটো দেখেছিলেন। প্রত্যেকটা চেহারা দেব-দুর্লভ। কারও মুখে শিশুর সরলতা, কারো চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, কারও দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর ঔদাসীন্য। কেবল চেহারা দেখে তাদের খুনে বলে চেনা অসম্ভব। চিন্তার এই সূত্র ধরে তিনি আর একটা সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হল, পাখি বা প্রজাপতির সম্বন্ধে বই পড়ে যে জ্ঞান আমরা আহরণ করি সেটা কি সম্পূর্ণ জ্ঞান? একটা পাখি ঠিক কি আর একটা পাখির মতো? পৃথিবীর সব প্রজাপতিই কি একরকম? তাদের কি আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব নেই? তাদের সকলের মনই কি একরঙা? কোনও বৈচিত্র্য নেই? মনে পড়ল, তাঁর বাড়ির করবী গাছে একটা দোয়েল এসে বসত বহুকাল আগে। তাকে লক্ষ করলে মনে হত, তার যেন একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে, বিশেষ মেজাজ আছে। করবী গাছটার ডালপালায় সে যখন ঘোরাফেরা করত, মনে হত না যে, সে পোকার সন্ধানেই ঘুরছে খালি। মনে হত, সে যেন করবী গাছে এমন কিছু সন্ধান করছে যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, এ কথা সে জানে, তবু খুঁজছে। মানুষের মধ্যে যে মানসিকতা থাকলে সে কবি বা বিজ্ঞানী হয়, ওই পাখিটার মধ্যে তারই আভাস যেন ছিল। কিছুদিন পরে দোয়েলটাকে আর দেখতে পাননি তিনি। আরও কিছুদিন পরে আবার দেখতে পেলেন তাকে ওই করবী গাছেরই ডালে। দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন, পাখিটা নড়ছে না। ডানা দুটো ঈষৎ খোলা, যেন এখনই উড়বে। কিন্তু উড়ছে না। কাছে গিয়ে দেখলেন মরে গেছে। দেহের এতটুকু বিকৃতি হয়নি, গায়ের সেই আশ্চর্য সুন্দর মসৃণ কালোয়-সাদা রং

তেমনি আশ্চর্য সুন্দরই আছে, মনে হচ্ছে এখুনি বুঝি শিস দেবে, সর্বাঙ্গে জীবন্ত প্রাণের আকৃতি, চোখের দৃষ্টিতে অনন্ত কৌতূহলের আভাস, সব ঠিক আছে, কেবল প্রাণ নেই। এখনও তিনি ঠিক করতে পারেননি, পাখিটা কেন মরেছিল। পাখিদের সাধারণত 'হিট্ স্ট্রোক' (Heat stroke) হয় না। কাছাকাছি কোনো ইলেকট্রিক তারও ছিল না। এখন তাঁর হঠাৎ মনে হল, সে বোধ হয় চরম সত্যের দেখা পেয়েছিল। মৃত্যুর ঠিক আগেই চরম সত্যের দেখা পাওয়া যায়। তারপর তার কাছে সব মিথ্যা হয়ে যায়। ডাক্তারবাবুর মনে হল তাঁর এ চিন্তাগুলোও লিখে ফেললে হয়। হয়তো সবই রাবিশ, তবু হালদার মশাই কাজ পাবেন। পকেট থেকে বিজ্ঞাপনের কাগজ বার করে রাখলেন হাঁটুর উপর, তারপর লিখতে শুরু করলেন।

গণেশ হালদার যখন এসে পৌঁছলেন তখনও তিনি লিখছেন। তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, একটু বসুন, এটা শেষ করে নিই। গণেশ হালদার ওধারে গিয়ে বসলেন একটা বেঞ্চিতে। মোজায়েকের কাজ করা চমৎকার বেঞ্চি। সমস্ত চাতালটাই তাই। সবিস্ময়ে তিনি চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন। এই ভাঙা বাড়িটার ভিতর এ সৌন্দর্য দেখবেন তা তিনি প্রত্যাশা করেননি। তারপর তাঁর হঠাৎ চোখে পড়ল, মাছরাঙাটা আবার এসে বসেছে বাঁশের উপর। সেই দিকেই চেয়ে রইলেন তিনি।

"তারপর, কি খবর? প্রতি রবিবারেই আপনি বেড়াতে বেরোন নাকি?"

"হ্যাঁ, প্রায়ই বেরোই। আজ সকালে আপনাব লেখাটা টুকে ভাবলাম আপনার সঙ্গে সে-বিষয়ে একটু আলাপ করি। কিন্তু বেরিয়ে দেখি আপনি চলে গেছেন। আজ একটু সকাল সকাল বেরিয়েছেন, না?"

"হ্যাঁ, আমার এক বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে। নিজেকে ভোলাবার জন্যে তাই বেরিয়ে পড়েছি—"

তারপর হেসে বললেন, "অনেকে শোকের সময় গীতা পড়ে। কিন্তু আমি দেখেছি ওতে কোনো সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। আসলে শোকের কোনো সান্ত্বনা নেই। বাইরে বেরিয়ে প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করলে তবু যেন একটু ভুলে থাকা যায়। আহত শিশু মায়ের কোলে গিয়ে যেমন ভোলে অনেকটা তেমনি।"

গঙ্গার দিকে চেয়ে হঠাৎ চুপ করে গেলেন তিনি। তারপর হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ে গেল তাঁর। বললেন, "আমাকে কি বলবেন আমার লেখা নিয়ে? খুব ভালো হচ্ছে না, না?"

"চমৎকার হচ্ছে। না, আমি বলছিলাম অন্য কথা। আপনি কাল যে ঘটনাটির কথা লিখেছেন, তা সত্য, না কল্পনা?"

ডাক্তারবাবু হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। "যদি সত্য হয়, আপনি কি করবেন? পুলিশে খবর দেবেন?"

"উচিত বই কি। আপনার দিকে গুলি চালিয়েছিল। যদি লেগে যেত?"

"একটু লেগেওছিল।"

ডাক্তারবাবু নিজের বাঁ হাতটা তুলে দেখালেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, "বেঁচে গেছি।"

"অথচ আপনি তো কাউকে কিচ্ছু বলেননি!"

"বলে কি করব! মৃত্যুর হাত থেকে তো প্রতি মুহূর্তে বেঁচে যাচ্ছি। অসংখ্য বিষাক্ত ব্যাকটিরিয়া

অহরহ ঢুকছে বেরুচ্ছে শরীর থেকে। কিছুদিন আগে নাককাটিয়ার জঙ্গলে গিয়েছিলাম 'ফটিক জল' পাখি দেখবার জন্যে। একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে ছিলাম। গুঁড়িটা ফাঁপা পুরনো। হঠাৎ দেখলাম ঠিক আমার পাশ দিয়ে বিরাট একটা গোখরো সাপ বেরিয়ে এল। প্রথমে সে বুঝতেই পারেনি আমি ওখানে বসে আছি। একটু দূরে গিয়ে বুঝতে পারল আর সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠল ফণা তুলে। আর একবার আর এক মাঠে পড়েছিলাম বুনো শুয়োরের পাল্লায়। একটু দূরে একটা জঙ্গলে দোসাদরা বর্শা নিয়ে শুয়োর শিকার করছিল। একটা শুয়োর ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল বন থেকে। তার সামনে পড়লে ঠিক আমাকে চিরে দিয়ে চলে যেত। আর একবার একটুর জন্যে বজ্রাঘাতের পাল্লা থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। ঘোর দুর্যোগে দাঁড়িয়েছিলাম একটা গাছতলায়, দূরের একটা গাছে বজ্র পড়ল, আমার গাছটায় পড়ল না। আমি বেঁচে গেলাম। আমরা সবাই প্রত্যহ মৃত্যুর কবল এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, যেদিন ধরা পড়ব সেদিন আর পালাতে পারব না। এই তো হল ব্যাপার। এর মধ্যে দারোগা পুলিশ এনে কি করব!"

"সেদিন রাত্রে যে মেয়েটিকে দেখেছিলেন তাকে দিনের আলোয় চিনতে পারবেন?"

"এ জেরা করছেন কেন? তাকে আমি পুলিশে দেব না। তার সম্বন্ধে আমার আর বিশেষ কৌতূহলও নেই। তবে একেবারে যে নেই তা নয়, কিন্তু সেটা সে চোর বলে নয়।"

ডাক্তারবাবু হাসলেন।

"তবে?"

"সে রূপসী বলে। সেদিন অন্ধকারে টর্চের আলোয় তার যে চেহারা দেখেছি তা সচরাচর পথে-ঘাটে দেখা যায় না। চুরি ডাকাতি করবার মতোই চেহারা মেয়েটির। দিনের আলোয় দেখা হলে আলাপ করতাম।"

এ উত্তরের জন্য গণেশ হালদার প্রস্তুত ছিলেন না। একটু চুপ করে রইলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, "আপনার কি এটা দৃঢ় বিশ্বাস ও চোরাই মাল পাচার করবার জন্যেই ওখানে গিয়েছিল?"

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, "কোনো কিছু দৃঢ় বিশ্বাস করবার মতো বিদ্যে-বুদ্ধির সিমেন্ট কি আছে? নেই। তবে সেদিন ওদের ভাবভঙ্গি দেখে সন্দেহ হয়েছিল ওরা চোরাই মালই বোধহয় পাচার করছে। থলিটি বেশ ভারী ছিল, ওরকম ভারী থলি জানালা দিয়ে হাত ফসকে পড়ে গেছে একথা মন মানতে চায় না। দ্বিতীয়ত ওই গুলি-ছোঁড়া ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকেছিল। তিনি বললেন একটা খরগোশ লক্ষ্য করে উনি গুলি ছুঁড়েছিলেন। কিন্তু খরগোশ তো ওখানে দেখিনি কোনোদিন। তাছাড়া রিভলভার দিয়ে খরগোশ শিকারের কথা শুনিইনি কখনও।"

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন ডাক্তারবাবু। তারপর বললেন, "হঠাৎ আপনার ও মেয়েটির সম্বন্ধে এ কৌতূহল কেন?"

গণেশ হালদার একটু ইতস্তত করতে লাগলেন বলবেন কি না। কিন্তু শেষে বলেই ফেললেন।

"আমার মনে হচ্ছে আমি মেয়েটিকে চিনি।"

"চেনেন? আগে আলাপ ছিল?"

"আমার কাছে এসেছিল কাল রাত্রে—"

"এসেছিল? কি রকম?"

এইবার গণেশ হালদারের মনে হল কাজটা অনুচিত হচ্ছে। ঝিনুকের অনুমতি না নিয়ে তার কথাটা প্রকাশ করা কি উচিত হবে? ঝিনুক বলেছিল কথাটা গোপন রাখবেন। কেউ যেন জানতে না পারে। ঝিনুক যে চিঠি লিখবে বলেছিল সে চিঠি এখনও আসেনি। অতগুলো টাকা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাঁরও এ সন্দেহ হয়েছিল যে টাকাটা নিশ্চয় চুরির টাকা। অত রাত্রে হঠাৎ এত টাকা পেল কোথায় সে? তারপর ডাক্তার মুখার্জীর লেখায় সেদিনের ঘটনার বিবরণ পড়ে চমকে গেলেন তিনি। তাঁর মনে হল যে মেয়েটির কথা লিখেছেন তিনি নিশ্চয়ই সে ঝিনুক। এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে তিনি নিশ্চয় পারবেন। ঝিনুকের সঙ্গে যে লোকটি ছিল, যে ডাক্তারবাবুকে লক্ষ করে গুলি ছুঁড়েছিল, সে হয়তো তার সহকারী এবং (এই কথাটা ডাক্তারবাবুর মনে হয়েছিল, তাঁরও হয়েছিল) হয়তো সে তার প্রণয়ী। ব্যাপারটা কাল থেকে মনের শান্তি বিঘ্নিত করছিল তাঁর, তারপর ডাক্তারবাবুর শেষ লেখাটা পড়বার পর তিনি স্থির করে ফেলেছিলেন ডাক্তারবাবুকেই বলতে হবে ঘটনাটা। তাঁর মনে একটা দ্বন্দ্ব চলছিল। ঝিনুককে তিনি কিছুতেই খারাপ ভাবতে পারছিলেন না। তার বিরুদ্ধে যে-সব প্রমাণ অনিবার্যভাবে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল তা সত্ত্বেও তাঁর বারবার মনে হচ্ছিল, না, কোথায় যেন ভুল হচ্ছে! ডিটেকটিভ উপন্যাসে যেমন আপাতদৃষ্টিতে নির্দোষ লোককেও দোষী বলে মনে হয়, এও হয়তো তাই হচ্ছে। ঝিনুকের মতো মেয়ে কখনও চোর হতে পারে না, কখনও সে একটা খুনের প্রণয়িনী হতে পারে না।

"চুপ করে আছেন কেন?"

ডাক্তারবাবুর কথায় যেন চমক ভাঙল হালদারের। বললেন, "আমি একটা কথা ভেবে ইতস্তত করছি। সে মেয়েটিকে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে কথাটা গোপন রাখব। তাই ভাবছি—"

"এতে আর ভাবনার কি আছে। প্রতিশ্রুতি যখন দিয়েছেন তখন তা রাখতেই হবে। আমার শোনবার কোনও আগ্রহও নেই তেমন। ও সুন্দর, এইটুকুর জন্যেই ওর সম্বন্ধে আমার ঔৎসুক্য। একটা সুন্দর ফুল, সুন্দর পাখি, সুন্দর গাছ, সুন্দর মাঠ বা সুন্দর জঙ্গল দেখবার জন্য আমি মাইলের পর মাইল ছুটোছুটি করি। সুন্দরকেই দুচোখ ভরে দেখতে চাই। সেদিন মেয়েটি অন্ধকারে চকিতে দেখা দিয়ে চলে গেল, আর হয়তো দেখা হবে না। মনে হচ্ছিল একটা লোকসান হয়ে গেল।"

"ও যদি খারাপ হয়, ও যদি চোর হয় তাহলেও ওর সম্বন্ধে আপনার এ মনোভাব থাকবে শেষ পর্যন্ত?"

"থাকবে বই কি। আমরা সংসারে যে যা হয়েছি তা ঘটনার চাপে দায়ে পড়ে হয়েছি, বাধ্য হয়ে হয়েছি, We are dumb driven cattle — ভালোমন্দ নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি করবার অধিকার আমাদের নেই। আপনি সেই গ্রীক গল্পটা জানেন?

"কোন গল্পটা বলুন তো? নাম কি?"

"নামটাম আমার মনে থাকে না, গল্পটা মনে আছে। এক পরমাসুন্দরী মেয়ে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে একটা লোককে খুন করে ফেলেছিল। ধরাও পড়ে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। দোষও স্বীকার করেছিল। কারো আর সন্দেহ রইল না বিচারের ফল কি হবে। তার পক্ষের উকিল তাকে কিন্তু এক অদ্ভুত পরামর্শ দিলে। বললে, তুমি যদি একটা কাজ কর, তাহলে

তোমার বাঁচবার আশা আছে। কি করতে হবে? জিজ্ঞাসা করল মেয়েটি। উকিল বলল, তোমাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। মেয়েটি রাজি হল। পরদিন সে যখন উলঙ্গিনী হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে তখন বিচারককে সম্বোধন করে উকিল বললেন, ক্রোধের বশে আমরা অনেকেই অন্যায় কাজ করি। করাটাই স্বাভাবিক, স্বয়ং জিউসও (Zeus) এ কাজ করেন। এ মেয়েটি নিজের দোষ স্বীকার করেছে। সে শাস্তি নেবাব জন্যও প্রস্তুত। আমি কেবল আপনাকে একটি প্রশ্ন করছি, এই নিতান্ত স্বাভাবিক অপরাধের জন্য আপনি এমন একটা সুন্দরীকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন? সামান্য একটা কারণে ভগবানের এমন একটা অসামান্য সৃষ্টিকে নষ্ট করা কি উচিত হবে? ওর দিকে ভালো করে চেয়ে দেখুন। বিচারক রসিক ছিলেন, মেয়েটিকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন না। সভ্যজগৎ থেকে কালক্রমে মৃত্যুদণ্ড উঠে যাবে। হয়তো জেলখানাও যাবে। ভবিষ্যতে সমাজকে এমনভাবে গড়তে হবে যাতে সবাই সুখে থাকতে পারে। এটম বম তৈরি করে অবশ্য তা হবে না, এমন পরিবেশ, এমন মানসিকতা তৈরি করতে হবে যাতে মানুষের খারাপ হওয়ার প্রবৃত্তি এবং প্রয়োজন কমে যাবে।"

ডাক্তারবাবু হঠাৎ চুপ করে গেলেন। তারপর হেসে বললেন, "এই দেখুন, কি কাণ্ড করছি, আপনার মতো পণ্ডিত লোকের কাছে শফরীর মতো ফরফর করছি— "

গণেশ হালদার লজ্জিত হলেন।

"না, না, কি যে বলছেন, আমি মোটেই পণ্ডিত নই। বিলিতী ডিগ্রী থাকলেই কি পণ্ডিত হয়?"

হালদার মশায়ের এই কথায় ডাক্তারবাবু যেন আর একটা প্রমাণ পেলেন যে তিনি সত্যিই শিক্ষিত লোক। কিন্তু সে কথা বললেন না, অন্য প্রসঙ্গে উপনীত হলেন।

"আমার একটা বিষয়ে বড় আশ্চর্য লাগে, আপনার মতো বিলিতী ডিগ্রীওলা লোক, কোনো ভালো জায়গায় চাকরি পেলেন না কেন?"

হালদার মশায় হাসিমুখে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, "কারণ বোধহয় আমি উচ্চবর্ণের গরিব হিন্দু এবং বাঙালী। বাংলার বাইরে পারতপক্ষে নূতন কোনও বাঙালীকে চাকরি দেওয়া হয় না। এঁবা মুখে যতই বলুন, সভায় যতই বক্তৃতা দিন যে আমাদের প্রাদেশিকতা নেই, কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় সবাই সঙ্কীর্ণমনা। সব প্রদেশেই কেবল প্রাদেশিকতাই নয়, আত্মীয় পোষণ করবার জন্যেও সবাই ব্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গে আমার পৃষ্ঠপোষক কেউ ছিল না, তাই চাকরি পাইনি। তাছাড়া বাঙালী হিন্দুদের উপর আমাদের সরকারেরও যেন একটা বিশেষ রাগ আছে, মুখে যদিও সে কথা কখনও বলেন না, কিন্তু আচরণে বোঝা যায়।"

"এ রাগের কারণ কি—"

"এর উত্তর রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বে দিয়ে গেছেন দু'লাইন কবিতায়। 'ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে, ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।" সে ব্যঙ্গের প্রথম শুরু স্বাধীনতার নামে গদি পাওয়া আর বাংলাদেশকে দু'ভাগ করে দেওয়া। আমি একটা লোকের কথা জানি সে জন্তুজানোয়ারদের কষ্ট দিয়ে আনন্দ পেত। তার প্রধান আনন্দ ছিল পাখির একটা ডানা কেটে দিয়ে সেটা ছেড়ে দেওয়া। সেটা ছিন্ন রক্তাক্ত ডানা নিয়ে মাটিতে ঝটপট করতো আর তাই দেখে আনন্দ পেত লোকটা। এদের ব্যবহার দেখলে তার কথা মনে হয়।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "তবে এটাও কি ঠিক নয় যে বাংলা আর পাঞ্জাবে হিন্দু মুসলমানরা মিলে মিশে থাকতে পারেনি, থাকতে চায়নি?"

"জানি, কিন্তু সেটা উগ্র কুৎসিত রূপ ধারণ করেছিল বিদেশি শাসক ছিল বলে। মানুষে মানুষে ভাবও হয়, ঝগড়াও হয়। তার জন্যে দেশ ভাগ করবার দরকার হয় না। একদিন লন্ডনের রাজনৈতিক ঝগড়াও ঠিক আমাদের দেশের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গারই রূপ নিয়েছিল। এর আভাস পাবেন ডিকেন্সের লেখা বার্নাবি রুজ (Barnaby Rudge) বইটাতে। প্রায় প্রত্যেক দেশেই দুটো তিনটে করে রাজনৈতিক দল থাকে, তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটিও কম হয় না, কিন্তু তাঁর জন্যে কেউ দেশকে ভেঙে দু'তিন টুকরো করেনি। অখণ্ড ভারতে মুসলিম লীগ একটা রাজনৈতিক পার্টি হয়ে অনায়াসে থাকতে পারত, ওর জন্যে পাকিস্তান করবার দরকার ছিল না।"

"কিন্তু জিন্না সাহেবের ভয় ছিল brute majority তার পার্টিকে গ্রাস করে ফেলবে—"

"এরকম ভয় আজকাল অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরই হয়েছে।

সবাই হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের ভয়ে আতঙ্কিত। সবারই মনে হচ্ছে বান এলো বলে, সবাই নিজের নিজের ঘটিবাটি সামলাতে ব্যস্ত। ভাষার ভিত্তিতে সবাই এখন আলাদা হতে চাইছে। গভর্নমেন্ট প্রতি প্রদেশে সীমানা নির্দেশ করবার জন্য যে কমিটি করেছিলেন, তার বিচার বাংলাদেশের বেলায় ন্যায়সঙ্গত হয়নি। তারা সবাই ভীত এবং অসন্তুষ্ট। পাঞ্জাবেও তাই। এঁরা জিন্নার দাবিকে মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু এঁদের দাবিকে মানতে চাইছেন না, এঁদের দাবিকে লিঙ্গুইজম বলে ব্যঙ্গ করছেন। এঁদের দাবির যুক্তি কি জিন্নার দাবির যুক্তির চেয়ে কম জোরালো?"

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, "থাক, ওসব রাজনৈতিক তর্কের আবর্তে পড়লে থই পাব না। আমি স্রোতের কুটো, ভাসতে পেলেই সন্তুষ্ট। জলটা ঘোলাটে না পরিষ্কার, গঙ্গার না ব্রহ্মপুত্রের তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।"

"আপনি ঠিক কুটো নন, আপনি পালক, আপনার গায়ে জল লাগে না, লাগলেও সঙ্গে সঙ্গে পিছলে পড়ে সে জল। কিন্তু আমি সত্যিই কুটো, জলে আমার সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, তাই জলের সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারি না। রাজনীতির স্রোত কোন্ খাতে বইছে তার সঙ্গে আমাদেব অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আমরা ঘর-পোড়া গরু, আসামের কাণ্ড দেখে আরও আতঙ্কিত হয়েছি। নিজেদের দেশ থেকে উৎখাত হয়েছি. এরপর কোথায় যাব, বিহারে না দণ্ডকারণ্যে, আন্দামানে না উড়িষ্যায় তা নির্ভর করছে ওই রাজনৈতিকদের খেয়াল-খুশির উপর, যাঁরা আমাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। তাই রাজনৈতিক আবহাওয়া আমাদের কাছে উপেক্ষার জিনিস নয়। এখানে শুনেছি আপনার দয়ায় আমার চাকরিটা হয়েছে, আপনি—"

গণেশ হালদার আর বলতে পারলেন না। তিনি উত্তেজিত হয়েছিলেন হঠাৎ তাঁর বাক রোধ হয়ে গেল।

ডাক্তারবাবুও কোনো কথা বললেন না সঙ্গে সঙ্গে। একটু চুপ করে থেকে বললেন, "একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন, কারো উপর কেউ দয়া করতে পারে না, সে সামর্থ্য কারো নেই। আপনি চাকরি পেয়েছেন আপনার যোগ্যতার জোরে। চলুন, এবার ওঠা যাক। এই নিন আজকের লেখাটা। দেখুন, দেখুন ওই খঞ্জনটা, ওই যে একা বাঁ ধারে চরছে। বুকটা হলদে, ডানায় চকোলেট রং। দেখতে পেয়েছেন? শীতের অতিথি হিসাবে এসেছিল, কিন্তু এখনও ফেরেনি দেখছি। এদেশের উপর মায়া বসে গেছে নাকি! সাধারণত মায়া বসে না ওদের। ওরা নির্মম। এক জাতের পাখি তারা বছরে তিন-চারবার বাচ্চা তোলে। কিন্তু শেষের বাচ্চাগুলোকে অনেক সময় ফেলে পালায়। যেই মাইগ্রেশনের সময় হয়, যেই অজানা বাইরের ডাক তাদের অন্তরকে আকুল করে

তোলে, তখন আর তারা পিছন ফিরে তাকায় না। কচি বাচ্চাগুলোকে ফেলেই চলে যায়। চলুন, এবার বেরিয়ে পড়ি। এখানকার সুন্দরবন দেখেছেন? চলুন সেইখানেই যাওয়া যাক।"

গণেশ হালদার মৃদু হেসে বললেন, "দেখেছি সুন্দরবন। বড়লোকের সাজানো বাগান। অনেক রকম গাছ আছে, দেখলে মনে হয় বাগানের মালিক বেশ বড়লোক।"

"আপনি যে চোখ নিয়ে বাগানটা দেখেছেন সে চোখ নিয়ে দেখলে আনন্দ পাওয়া যায় না। বাগান বড়লোকের না ছোটলোকের, বাঙালীর, বিহারীর না মারোয়াড়ীর— এসব অতি অবান্তর ব্যাপার। বাগানে গিয়ে রূপ দেখবেন; গাছের রূপ, ফুলের রূপ, পাখির রূপ, প্রজাপতির রূপ। নানারকম অদ্ভুত অচেনা পোকা দেখবেন নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাতায় পাতায়, অভিজাত গাছের পাশে প্রোলিটারিয়েট গাছের ভিড় দেখবেন, চন্দন গাছের বা নাগালিঙ্গম গাছের পাশে দেখবেন ঘেঁটুকে কিচ্ছু বেমানান দেখাচ্ছে না, দেখবেন নানারকম ছোট বড় সুন্দর পাথরের টুকরো ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করে আছে রসিকের স্নেহস্পর্শ লাভ করবার জন্য, মাকড়শার জাল দেখবেন নানারকম। বাগানটার মালিক কে, তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। পৃথিবীর সমস্ত বাগানের এক এবং অদ্বিতীয় মালিক প্রকৃতি, ভগবানও বলতে পারেন তাকে। আমরা মানুষরা দু-চারদিন ফপরদালালি করি মাত্র। আমাদের এই আবদার প্রকৃতি হাসিমুখে সহ্য করেন, এই এক মজার জিনিস। উঠুন, সুন্দরবনে না যান, অন্য জায়গায় যাই চলুন। চোখ থাকলে দেখবার জিনিসের অভাব নেই। বেচুকে ডাকি—"

ডাক্তারবাবু পকেট থেকে হুইস্‌ল বার করে বাজালেন। বেচু কাছেই ছিল, এসে পড়ল।

।। এগারো ।।

সেদিন রাত্রে 'কাউ'কে নিয়ে মহা বিপদে পড়েছিল ঝিনুক। সত্যিই সে রাত্রিটা তার জীবনের একটা স্মরণীয় রাত্রি। দেশের বাড়িতে যে রাত্রে গুণ্ডারা হানা দিয়েছিল, সে রাত্রির কথা বাদ দিলে এমন রাত্রি তার জীবনে আর আসেনি।

কাউ তার পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল শেষে।

"কি হয়েছে বল না, কাঁদছ কেন?"

কাউ কোনো জবাব দেয়নি।

"তোমার মায়ের কাছ থেকে এগুলো কেড়ে আনলে কেন, তাকে তো আমি দিয়েছিলাম এগুলো, এ-ও বলেছিলাম দরকার হলে তাকে আরও কিছু টাকা পাঠাব, কিন্তু তাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।"

হঠাৎ কাউ লাফিয়ে উঠল। মনে হল. কে যেন কশাঘাত করল তাকে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, "সে জন্মের মতো চলে গেছে, আর কখনও আসবে না তোমাদের টাকা নিতে।"

"সে কি!"

"হ্যাঁ।"

কাউয়ের চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবার মতো হল।

"কি হয়েছে কি! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

কাউ কিন্তু কিছু বলল না, চোখ বড় বড় করে সামনের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল কেবল, যেন সেখানে কিছু একটা দেখছে।

"জন্মের মতো চলে গেছে মানে? কি হয়েছে বলছ না কেন?"

কাউ হঠাৎ অনুনয়ের সুরে বলল, "তুমিই বল, তোমার গয়না ছোঁবার কি যোগ্যতা ছিল ওর"— তারপরই চিৎকার করে উঠল সে— "পচা গলা বুড়ী বেশ্যা একটা। ওর এত বড় আস্পর্ধা হবে কেন। বেশ হয়েছে, বেশ করেছি।"

"কি করেছ—"

"তাকে ফেলে দিয়েছি কুয়োয়"— তারপর আবার চিৎকার করে উঠল— "খুন করেছি, খুন করেছি, নিজের মাকে খুন করেছি। বাপকেও করব, তারপর ফাঁসি যাব।"

অন্ধকারে হাত দুটো তুলে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

শিউরে উঠল ঝিনুক। কিন্তু বিপদে পড়ে আত্মহারা হবার মেয়ে নয় সে। সে কাউয়ের গায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগল।

"ছি, ওসব পাগলামি করে না। ওই মাঠের ধারে যে ন্যাড়া ইঁদারাটা আছে, তাতেই পড়ে গেছে তোমার মা? চল, এখুনি তুলতে হবে তাকে। ছি, ওরকম মাথা গরম করতে নেই।"

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কাউ।

"চল, দেরি কোরো না। লোকজন ডেকে তোমার মাকে তোলবার চেষ্টা করি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে এখনও হয়তো বাঁচবেন তিনি।"

"না বাঁচবেন না। তার গলা টিপে মেরে ফেলে দিয়েছি।"

হঠাৎ কাউ ঝিনুকের হাত দুটো ধরে মিনতির সুরে বলে উঠল, "মাসিমা, চলুন আমরা পালাই। ওই পাষণ্ড ডাক্তার ঘোষালের কাছে আপনি আছেন কেন? ও কি একটা মানুষ? ও পিশাচ, ও জানোয়ার।"

"চুপ কর।"

ধমক দিয়ে উঠল ঝিনুক।

"আমি পাগল হয়ে গেছি মাসিমা, ক্ষেপে গেছি, আমি—"

"আর একটা কথা বোলো না। আমার সঙ্গে এস।"

"আমি—"

"না, আর একটি কথা নয়, এস আমার সঙ্গে।" কঠিন কণ্ঠে এবার আদেশ করল ঝিনুক। সে আর ভিতরে ঢুকল না। ডাক্তার ঘোষালের বাড়ির কাছেই যে ভাঙা পোড়ো ইঁদারাটা ছিল, সেই দিকেই অগ্রসর হল।

কাউও তার পিছু পিছু গেল।

ইঁদারার কাছে তারা যখন গিয়ে দাঁড়াল, তখন কৃষ্ণপক্ষের চাঁদটা পশ্চিম আকাশের দিকে হেলে পড়েছে। চাঁদটার দিকে চেয়ে শিউরে উঠল ঝিনুক। মনে হল, কামড়ে কে যেন খানিকটা ছিঁড়ে নিয়েছে, চাঁদ কিন্তু নির্বিকার, তবু হাসছে। তার পাশের তারাটাও হাসছে। আমাদের হাসিই থেমে যাবে? হঠাৎ মনে হল তার। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো পাখি ডেকে উঠল একযোগে। ঝিরঝির করে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠল একটা, তার পরই চতুর্দিক সচকিত করে

কর্কশকণ্ঠে চিৎকার করতে করতে উড়ে গেল একটা পেঁচা, একযোগে ডেকে উঠল শেয়ালগুলো। ঝিনুক বুঝতে পারল সকাল হচ্ছে। যা করবার এখুনি করতে হবে।

"আমি থানায় খবর দিতে যাচ্ছি, তুই এখানে বসে থাক। আমাদের সাড়া পেলে তুইও কুয়োর ভিতরে নেমে যাস। তারপর আমরা এসে তোকে তুলব। আমি একটা দড়ি জোগাড় করে আনব।"

"আমি কুয়োয় নেমে যাব? কেন?"

"আমি গিয়ে থানায় বলব তোর মা হঠাৎ পড়ে গেছেন, তাকে তোলার জন্য তুইও লাফিয়ে পড়েছিস।"

"আমি পারব না ওর মধ্যে নামতে, আমি পারব না, কিছুতেই পাবব না। আমাকে ওর মধ্যে নামতে বোলো না মাসিমা, আমি পারব না।"

"তোমাকে পারতেই হবে। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এস, আমার সামনেই নাম তুমি।"

কাউ কিছুতেই নামবে না। তারপর ঝিনুক যা করলে তা অবিশ্বাস্য। কাউ ন্যাড়া ইঁদারাটার ধারেই দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে এক ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে ঝিনুক। চপাৎ করে একটা শব্দ হল।

আর্তনাদ করতে লাগল কাউ ইঁদারার ভিতর থেকে।

"এ কি করলে মাসিমা, বাঁচাও বাঁচাও আমাকে।"

ঝিনুক ঝুঁকে আশ্বাস দিলে তাকে, "এক্ষুনি আসছি। ভয় নেই—"

ঝিনুকের প্রথমেই থানায় যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সে গেল মিস্টার সেনের বাড়ি। ঘোষালের গাড়িটা নিয়েই বেরিয়ে গেল। যতীশবাবুর কথা সে ভোলেনি। কিন্তু যে কথাটা প্রবলভাবে তার মনে হচ্ছিল, সে কথাটা এই—কাউয়ের মা মারা গেছে। সে আর ঘোষালকে বিরক্ত করতে আসবে না। তার অজ্ঞাতসারেই একটু আনন্দের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছিল তার মনে। তারপরই মনে হল, তনিমার সঙ্গে ঘোষালের ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে? কিছুদূর যে গড়িয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কতদূর? নিজের বাড়ি ছেড়ে এত রাত্রে ওখানে যাওয়ার মানে কি। কাউয়ের কথাগুলো তার কানে বাজছিল, ও কি একটা মানুষ? ও পিশাচ, ও জানোয়ার। গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দিলে সে, দৃঢ় মুষ্টিতে স্টিয়ারিংটা চেপে ধরে সে বসে রইল, চোখের দৃষ্টিতে আগুন জ্বলে উঠল।... মিস্টার সেনের বাড়ি থেকে কিছুদূরে থামাল সে গাড়িটা। তারপর গাড়ি থেকে নেমে চোরের মতো নিঃশব্দচরণে সে গিয়ে দাঁড়াল সেনের বাড়ির সামনে। সমস্ত বাড়িটাই অন্ধকার। হঠাৎ নজরে পড়ল নীচের দিকে একটা ছোট ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। জানালাটা বন্ধ। বন্ধ খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। খড়খড়িটা সন্তর্পণে তুলে ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করল সে। বিশেষ কিছু দেখা গেল না। তারপর সামনের দুয়ারে গিয়ে সে কড়াটা নাড়ল। কোনো সাড়া এল না ভিতর থেকে। ঠেলতেই কিন্তু কপাটটা খুলে গেল। সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকেই আলোকিত ঘরটা দেখতে পেল সে। সে ঘরের কপাটটাও খোলা। সেই খোলা কপাট দিয়ে সে দেখতে পেল ডাক্তার ঘোষাল মদে চুর হয়ে একটা সোফায় হেলান দিয়ে রয়েছেন, আর তাঁর পাশেই তনিমা, সেও চুর। তার একখানা হাত ঘোষালের ঘাড়ের উপর ঝুলছে। বাঘিনীর মতো একলম্ফে ঘরের ভিতর ঢুকে

পড়ল সে। এক ঝটকায় তনিমার হাতখানা সরিয়ে দিলে ঘোষালের কাঁধ থেকে। তারপর ঘোষালকে ঝাঁকি দিয়ে বলল, "ওঠ, ওঠ, চল। গাড়ি এনেছি! সর্বনাশ হয়ে গেছে। কাউয়ের মা আত্মহত্যা করেছে, শিগগির চল—"

ঘোষাল খুব প্রকৃতিস্থ ছিলেন না, তবু তিনি খাড়া হয়ে বসলেন। চোখ বড় বড় করে বললেন, "আত্মহত্যা করেছে? হোয়াট!"

তারপর একটু ভেবে বললেন, "লাশটা কোথা!"

"মাঠের ধারে যে পোড়ো ইঁদারাটা আছে, তার মধ্যে। শীগ্‌গির চল, ওটাকে এখনি তুলতে হবে।"

তনিমার সাড় ছিল না। তার কাপড়জামাও বিস্রস্ত হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঝিনুক দেখতে পেলে তার আলুলায়িত ব্লাউসের মধ্যে এক তাড়া নোট রয়েছে। বিনা দ্বিধায় নোটের তাড়াটা তুলে নিলে সে।

বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইলেন ডাক্তার ঘোষাল। তারপর তাঁর মুখে সেই আকর্ণ বিশ্রান্ত হাসিটি ফুটল।

"ওটা কি ঠিক হল নুক? Isn't that a bit shady?"

নুক একথার কোনো উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না। তার চোখের দৃষ্টি আরও জ্বলন্ত হয়ে উঠল কেবল। তারপর ঘোষালের হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, "নষ্ট কববার মতো সময় এখন নেই। যদি না যাও, আমি নিজেই থানায় যাচ্ছি—"

থানার নামে ঘোষাল চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। ঝিনুক তাঁর অনেক দুষ্কৃতির খবর জানে, রাগের মাথায় যদি ফাঁস করে দেয় কিছু!

"থানায় কেন!"

"বললাম না, কাউয়ের মা মারা গেছে কুয়োয় পড়ে। কাউও লাফিয়ে পড়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে। থানায় খবর দিতে হবে না? চল, চল্!"

টানতে টানতে ডাক্তার ঘোষালকে নিয়ে মোটরে তুলল সে।

থানায় খবর দিয়ে অকুস্থলে পৌঁছে তারা দেখল অত ভোরেও ওই ফাঁকা মাঠের মাঝে এঁদো কুয়োটাকে ঘিরে লোক জমে গেছে বেশ। দড়ি ফেলে কাউকে তুলেওছে তারা। কাউ সর্বাঙ্গে কাদা জল মেখে মাথা হেঁট করে একধারে বসে কাঁদছে, আর কাঁপছে। কপালের একধার দিয়ে রক্তও পড়ছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ল পুলিশের গাড়ি।

।। বারো ।।

গণেশ হালদার ঝিনুকের চিঠি পড়ছিলেন। সেদিন স্কুলে যাবার আগে স্নান করে বাইরের ঘরে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন চিঠিটা পড়ে আছে। ঝিনুক কখন যে চিঠি ফেলে গেছে তা তিনি জানতেই পারেননি। ঝিনুক ডাক্তার ঘোষালের বাড়িতে বা নিজের বাড়িতে বসে এ-চিঠি লেখেনি। এ-চিঠি লেখার সুযোগ এ দুটো বাড়ির কোনও বাড়িতেই ছিল না। শুনে আশ্চর্য মনে হবে, ঝিনুক এ-চিঠি লিখেছিল মিস্টার সেনের বাড়িতে বসে। তনিমার সঙ্গে পরদিনই গিয়ে

সে দেখা করেছিল। ফিরিয়ে দিয়েছিল তাকে টাকা। মৃদু হেসে বলেছিল, "কাল একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিলে ভাই। ভাগ্যে আমি এসে পড়েছিলাম, তা না হলে অতগুলো টাকা মারা যেত।" তনিমা লজ্জিত হয়নি, বিগলিত হয়ে পড়েছিল। একটু আশ্চর্যও হয়েছিল। টাকাই তার জীবনের ধ্যান জ্ঞান মোক্ষ মুক্তি— সব। টাকাটা হারিয়ে যাওয়াতে বড়ই হতাশ হয়ে পড়েছিল সে। ফিরে পেয়ে সে যেন আকাশের চাঁদই হাতে পেল অপ্রত্যাশিতভাবে। সর্বাঙ্গ দুলিয়ে হেসে উঠেছিল হি-হি করে। শুধু তাই নয় ঝিনুকের গালে একটা চুমু খেয়ে বলেছিল, 'তুই যে এত উদার, এত নির্লোভ তা তো জানা ছিল না ভাই। আর কেউ হলে অতগুলো টাকা ফিরিয়ে দিত কি? কক্ষনো দিত না। তোর কি উপকারে লাগতে পারি বল।"

ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে তাকে অমনভাবে দেখেও ঝিনুক তাকে কিছু বললে না, এতেও ভারী আশ্চর্য লেগেছিল তার। ঝিনুকের সঙ্গে ডাক্তার ঘোষালের যে সম্পর্ক সে আন্দাজ করেছিল, তার সঙ্গে তার এ-আচরণের কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছিল না সে। সত্যিই অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। ঝিনুক এর পর যা বলল, তাও সে প্রত্যাশা করেনি।

ঝিনুক বলল, "আমি মাঝে মাঝে একলা থাকতে চাই ভাই। তোমাদের বাড়িতে তো অনেকগুলো ঘর। মাঝে মাঝে পালিয়ে এসে একটা ঘরে খিল দিয়ে যদি থাকি খানিকক্ষণ, তা হলে তোমার অসুবিধা হবে কি? সব সময় কচকচি ভালো লাগে না।"

তনিমা বলল, "অসুবিধা কিসের? স্বচ্ছন্দে এস। তবে দোতলায় যেও না। সেখানে শামুকের রাজত্ব। আমিও যেতে সাহস পাই না। একতলায় পূর্ব দিকের ঘরটার চাবিই দিয়ে দেব তোমাকে। যখন খুশি এস। বাপিও খুশি হবেন এতে।" এই বলে যে অর্থপূর্ণ হাসিটা হেসেছিল তনিমা, তা অন্য লোকের কাছে কদর্য মনে হত, কিন্তু ঝিনুকের কাছে হয়নি। অন্তত তার মুখভাবের কোনো পরিবর্তন দেখা দেয়নি। তনিমার মতো মেয়ের মুখে এই ধরনের হাসিই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল তার। সে বলল, "বেশ, তাই আসব। চাবিটা দাও তা হলে—"

এই ঘরে বসেই চিঠিটা লিখেছিল ঝিনুক।

শ্রীচরণেষু,

আপনাকে যে এ-চিঠি লিখছি, তা আমাদের দলের কেউ জানে না। তাদের অনুমতি নিয়ে লেখাও সম্ভব নয়, কারণ জানি তারা অনুমতি দেবে না। আমাদের দলের কথা কাউকে বলবার হুকুম নেই। এ-হুকুম অমান্য করলে প্রাণ দিয়ে জবাবদিহি করতে হয়। এত বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও আপনাকে এ-চিঠি লিখছি কেন, এ-কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে হবে। লিখছি প্রাণের তাগিদে। যে প্রাণ ভঙ্গুর দেহ-পিঞ্জরে শশকের প্রাণের মতো ধুকধুক করছে, সেই ক্ষুদ্র প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যে বৃহৎ প্রাণের তাগিদে আজ আপনাকে চিঠি লিখতে বসেছি, তারই কিছু পরিচয় এই চিঠিতে দিতে চেষ্টা করব। আমি যা বলব, তা হয়তো ছোট মুখে বড় কথার মতো শোনাবে। কিন্তু যা অনুভব করছি, তা কাউকে বলতে না পারলে আমি পাগল হয়ে যাব। বলবার মতো কোনও লোককে কাছে পাইনি। আপনাকে কাছে পেয়ে আমি যেন বর্তে গেছি। এর জন্য যদি আমাকে মৃত্যুও বরণ করতে হয়, তা হলেও আমার ক্ষোভ থাকবে না। এই সান্ত্বনা নিয়ে আমি অন্তত মরতে পারব যে, একজন আদর্শবাদী লোকের কাছে আমি আমার কথাটা বলবার সুযোগ পেয়েছি। আমার এ-আদর্শে নূতন কথা কিছু নেই। এ-আদর্শের মূল কথা আমাদের বাঁচতে হবে, পশুর মতো নয়, মানুষের মতো বাঁচতে হবে। আমি পৃথিবীর বৃহৎ মানবগোষ্ঠীকেও আমার

আদর্শের গণ্ডিতে টেনে আনতে চেষ্টা করিনি। আমাদের অনেক বড় নেতা এই কাজ করে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে অনেক হাততালি কুড়িয়েছেন। কিন্তু আমার সে যোগ্যতা নেই, সে স্পর্ধাও নেই এবং সত্যি কথা বলতে কি, সে ইচ্ছেও নেই। যেসব বড় অভিনেতা রঙ্গমঞ্চের উপর যুধিষ্ঠিরের অভিনয় করেন, আমি জানি রঙ্গমঞ্চের বাইরে তাঁরা সবাই যুধিষ্ঠির নন। এমন কি, অনেক সাধারণ মানুষের চেয়েও নীচু স্তরের লোক তাঁরা। তাঁদের একমাত্র মূলধন তাঁদের অভিনয়-দক্ষতা। বুদ্ধ, যীশু, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং আরও অনেক মহাপুরুষের বাণী থেকে এইটুকু বুঝেছি যে, আত্মজ্ঞানই মানুষের চরম এবং পরম জ্ঞান। আত্মরক্ষাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যীশুখৃস্ট ক্রুশের উপরে প্রাণদান করে আত্মরক্ষাই করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুই তাঁকে অমরত্বের অক্ষয় কবচ পরিয়ে দিয়ে গেছে। আমাদের আদর্শও এই আত্মরক্ষা এবং আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানের আধ্যাত্মিক পর্যায়ে পৌঁছবার যোগ্যতা এখনও হয়নি আমার। আর তা না হলে তা নিয়ে আস্ফালন করা ভণ্ডামিই হবে আমাদের পক্ষে। যেটুকু আত্মজ্ঞান আমাদের হয়েছে, তাতে বুঝেছি নিজের পায়ে নিজের জোরে দাঁড়াতে না পারলে আমরা পড়ে যাব। আর আমাদের নিপতিত দেহের উপর দিয়ে নিষ্ঠুর জনতার মিছিল নির্বিকারভাবে আমাদের দলে পিষে দিয়ে চলে যাবে। অনেকেই চেষ্টা করছেন যাতে আমরা পড়ে যাই, অনেকে ধাক্কা মারছেন, অনেকে লেংগি দিচ্ছেন, অনেক মুখোশধারী হিতৈষী উপদেশ দিচ্ছেন, শুয়ে পড়, শুয়ে পড়, এদের কাছে নির্বিচারে আত্মসমর্পণ করলেই সুফল ফলবে। আর এটাও সত্যি কথা, আমরা অনেক শুয়ে পড়েছি, ভীষণ প্রভঞ্জনের দাপটে অনেক বিশাল বিশাল মহীরূহও আজ ধরাশায়ী। এদের তুলতে হবে। সবাইকে তোলবার সামর্থ্য আমার নেই। আমাদের গাঁয়ের যে ক'জনের খবর আমি পেয়েছি, তাদের কথাই আমি ভাবছি কেবল। আমি নিজেও পড়-পড় হয়েছি। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছি, পড়ব না। যেমন করে পারি দাঁড়িয়ে থাকব। তেলিপাড়ার মোহিনীকে মনে আছে? সে আজকাল দেহ বেচে পয়সা রোজগার করছে কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে। ছবি পিক্‌পকেট হয়েছে। শাপলা বাধ্য হয়ে বিয়ে করেছে একটা কসাইকে। বাবার বন্ধু তিনকড়ি শিরোমণি এখানে পালিয়ে এসে একটা তৃতীয় শ্রেণীর নেতার মোসায়েব হয়েছেন পেটের দায়ে। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, উজ্জ্বল মেধা এখন নিযুক্ত হয়েছে চাটুকার বৃত্তিতে। তাঁর মতো পণ্ডিত লোক এখন 'জল উঁচু, জল নীচু' করছেন। আমরাও পালিয়ে এসে যে-নরক ঘাঁটছি, যে-অপমান সহ্য করছি, মাঝে মাঝে মনে হয়, তার চেয়ে মৃত্যুও ভালো ছিল। আমি পণ করেছি, যখন মরিনি, তখন বাঁচার মতো বাঁচতে হবে। এবং সেই বাঁচার উপকরণ সংগ্রহ করতে হলে যদি সূক্ষ্ম নীতির পথ ত্যাগ করতে হয়, তা-ও করতে হবে। আমাদের যাঁরা ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করেছিলেন, তাঁরা নীতির পথে চলেননি। আপনাকে সব কথা যখন খুলেই বলছি, তখন সবই বলব। বাঁচবার প্রধান উপকরণ টাকা আমরা সংগ্রহ করেছি অসদুপায়ে। তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আপনি না-ই জানলেন, আমিও সব জানি না। আমাদের দলে ক'জন লোক আছে, তা-ও আমি ঠিক জানি না। শুনেছি আট-দশজন। সবই হচ্ছে ডাক্তার ঘোষালকে কেন্দ্র করে। ওঁর মতো লোক আমি আর দেখিনি। অসুরের মতো লোক, পাহাড়ের মতো লোক, বজ্রের মতো লোক। প্রবল, অনড়, দুর্বার। যখন গুণ্ডারা আমাদের বাড়ি ঘিরে ফেলেছিল, তখন উনি আমাদের বাড়িতে ছিলেন। কয়েকদিন আগে এসেছিলেন বাবাকে দেখতে। বাবার জ্বর হয়েছিল। যখন এসেছিলেন, তখন অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম, কারণ ওঁর সঙ্গে আমাদের কোনো আলাপ ছিল না। পরে বলেছিলেন, আসলে উনি আমাকেই দেখতে এসেছিলেন নাকি, বাবার অসুখটা নাকি

ছুতো। ডাক্তার ঘোষালের সরলতা, অকপটতা আর সত্য ভাষণের স্পষ্টতা ভয়াবহ। তিনি কোনো কিছু রেখে ঢেকে বলেন না, বলতে পারেন না। তাঁর মনের নগ্নতা আর পাশবিক লুব্ধতার পরিচয় পেলে তাঁকে ঘৃণ্য জীব মনে করাই স্বাভাবিক। তাঁর আচরণও অনেকটা পশুর মতোই, কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর কাছে আমি আছি কেবল তাঁর সরল আন্তরিকতার জন্য। উনি নিজের জীবন বিপন্ন করে, নিজের সর্বস্ব ব্যয় করে আমাদের বাঁচিয়েছেন। উনি সে সময় না থাকলে আমরা কেউ বাঁচতাম না। অদ্ভুত ওঁর চরিত্র। ওঁর সঙ্গে রাত্রে পশুর মতোন আমরা যখন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সন্তর্পণে পথ হেঁটেছি, তখন ওঁর চরিত্রে দেবতার মহত্ত্ব দেখেছি আমি। যে সময় উনি আমাদের সর্বনাশ করতে পারতেন, সে সময় উনি আমাদের গায়ে হাত পর্যন্ত দেননি। ওঁর চোখে কোনও কু-দৃষ্টি তখন দেখিনি। তারপর যখন সব বিপদ পার হয়ে এখানে এসে পৌঁছলাম, তখন উনি আমাকে একদিন বললেন, 'তোমাকে আমার কাছে থাকতে হবে। আমি অসহায় লোক, আমার কেউ নেই, কিছু নেই। এমন কি, সচ্চরিত্রও নই। সারা জীবন নানা স্রোতে ভেসেছি, অনেক ঝড়-ঝাপটা সহ্য করেছি. বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছি, কিন্তু কখনও হার মানিনি। ধাক্কা খেয়ে খেয়ে তুবড়ে গেছি, কিন্তু ভাঙিনি। একটা বিশ্বাস আমার আছে, আমি এখানেও জমিয়ে ফেলব। যেমন করে হোক টাকা রোজগার করব। কোথাও আমার টাকার অভাব হয়নি, এখানেও হবে না। কিন্তু যে জিনিসের অভাব আমার সারা জীবনে মেটেনি, সেই অভাবটা তুমি মেটাও। তুমি আমার ভার নাও। কিন্তু এ-ও বলে দিচ্ছি, আমার মতো বুনো শুয়োরের ভার নেওয়া সহজ নয়। আমি বারবার তোমার বাধানিষেধ চুরমার করে তছনছ করে দেব। আমি এত বর্বর যে, তোমার গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা হবে না আমার, যত কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দেওয়া সম্ভব, তা-ও আমি দেব, তোমার চোখের সামনেই হয়তো এমন সব কাণ্ড করব, যা কোনও সাধারণ মেয়েমানুষ সহ্য করতে পারে না। অনেকে এসেছে, কিছুদিন থেকে সরে পড়েছে। আমাকে কেউ বুঝতে পারেনি, বুঝতে চায়ওনি। আমি আমার স্বভাব বদলে ভদ্র ভণ্ড হতে পারিনি, যদিও জানি ওই ভদ্র ভণ্ডামির মুখোশটা সবাই পছন্দ করে। তোমার মতো মেয়ের অনেক ভালো পাত্র জোটা উচিত, কিন্তু আমি জানি জুটবে না। তুমি পাকিস্তানের রিফিউজি, এই তোমার সবচেয়ে বড় কলঙ্ক। আর এ-কথাটাও তো মিথ্যে নয় যে, আমি তোমাকে একটা মুসলমান গুণ্ডার আলিঙ্গন থেকেই উদ্ধার করেছিলাম। এই ঘটনার পর তুমি নিজেও কি কোনও ভদ্র পরিবারে গিয়ে স্বস্তি পাবে? আর এমন ভদ্র পরিবার কি এ দেশে আছে, যারা সব জেনেও তোমাকে সানন্দে বরণ করে নেবে? এ-দেশের পণ্ডিতরা নানারকম উদার বিধান দেন, কিন্তু সে-বিধান মানে না কেউ। এদেশের রাজনৈতিক পণ্ডিতরাও বক্তৃতার আসরে বড় বড় ফতোয়া দেন, কিন্তু কার্যকালে কোনোটাই ফল প্রসব করে না। এ-দেশে ছুঁচিবাই বড় প্রবল। যদিও অবশ্য মজা, অধিকাংশ অশুচি জিনিসই গোবর, গঙ্গাজল স্পর্শে শুদ্ধ হয়, কিন্তু যে-স্ত্রীলোক পরপুরুষ স্পর্শ-দুষ্ট, তার আর শুদ্ধি নেই। সমাজে তাদের ভদ্রভাবে স্থান কিছুতেই হয় না। অবশ্য ডাক্তার ঘোষাল ঠিক এই ভাষাতেই কথাগুলো বলেননি আমাকে। তাঁর ইংরেজি বাংলা মেশানো ভাষা তো আপনার জানা আছে, সেই ভাষাতেই বলেছিলেন। একটা ইংরেজি বাক্য মনে পড়েছে—

–The blessed cowdung and Ganges water purify every unholy objects in our country, except a ravished woman!

তাঁর কথা শুনে আমি চুপ করে ছিলাম খানিকক্ষণ, তারপর প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি কি

আমাকে বিয়ে করতে চান? তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন— বিয়ের বাঁধনটা কি খুব শক্ত বাঁধন? তা যে নয়, তার প্রমাণ সর্বদেশে, সর্বকালে অসংখ্য, অগণিত। বিয়ের একমাত্র সার্থকতা বংশধরদের পিতৃ-পরিচয়টার পাকা সামাজিক দলিল করা। বিয়ে করা সত্ত্বেও অনেক সময় সে-পরিচয় পাকা হয় না, যিনি 'ক' বাবুর ছেলে বলে পরিচিত, আসলে তিনি 'খ' বাবুর ছেলে। তা ছাড়া পিতৃ-পরিচয়ই কি সব সময়ে সুপরিচয়? মাতাল, চোর, চরিত্রহীন, অমানুষ বাবার ছেলেমেয়েরা কি পিতৃ-পরিচয়ে গৌরবান্বিত হয়? মানুষের গৌরব নিজের পরিচয়ে। আমি কয়েকটা মাত্র নাম করছি— যীশু খ্রীস্ট, লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চি, আলেকজান্দার দুমা— এঁদের পিতৃ-পরিচয় কুয়াশায় ঢাকা, কিন্তু তবু এঁরা নিজেদের আকাশে প্রদীপ্ত সূর্যের মতো জ্বলছেন। আইনসঙ্গত পিতৃ-পরিচয় নেই বলে এঁদের কেউ অবহেলা করতে সাহস করেনি। মানবসভ্যতাকে অলঙ্কৃত করেছেন এঁরা। পুরাণেও এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে। সূতপুত্র কর্ণ, দাসীপুত্র বিদুর, ঘটোদ্ভব দ্রোণ, এঁরা কি হেয়? আমি বললাম, 'এসবের উত্তর যুক্তি দিয়ে দেওয়া কঠিন। ওটা ব্যক্তিগত রুচি আর সংস্কারের কথা। আপনি আমাকে আপনার ভার নেওয়ার কথা বলছেন, কিন্তু যে আইনের জোর থাকলে সে-ভার নেওয়া যায়, সেটা আপনি এড়িয়ে যেতে চাইছেন। আপনার সঙ্গে ভবিষ্যতে যদি না বনে, আর আপনি যদি আমাকে দূর করে দেন, তখন কয়েকটা জারজ সন্তান নিয়ে আমি কোথায় যাব. কে আমাকে আশ্রয় দেবে? কর্ণের কথায় এখানে যাত্রা-থিয়েটারে হাততালি পড়তে পারে, কিন্তু কর্ণের নজিরে কেউ আমার জারজ সন্তানদের সুচক্ষে দেখবে না।' ডাক্তার ঘোষাল লাফিয়ে উঠলেন— 'বিয়ে করার পরও তোমাকে যদি দূর করে দি, সমাজ তোমাকে ঠাঁই দেবে কি? কোর্টে গিয়ে তুমি মকদ্দমা লড়তে পারবে? বেশ চল, এক্ষুনি তোমাকে বিয়ে করে ফেলছি। তিন আইনে বিয়ে হবে কিন্তু। পুরুত টুরুত ডাকতে পারবে না।' বলেই তিনি আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলেন বাইরে। আমি বললাম, 'দাঁড়ান, এত তাড়াতাড়ি এসব জিনিস হয় না। আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন। আমার বাবা-মা যদি সম্বন্ধ করে প্রাচীন প্রথায় আপনার সঙ্গে বিয়ে দিতেন, তা হলে আমার কিছু বলবার থাকত না। চোখ বুজে অদৃষ্টকে মেনে নিতাম। কিন্তু তা যখন হচ্ছে না, তখন আমাকে ভাবতে সময় দিন একটু। একবার দুবার নয়, দশ-দশবার আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে ভেঙে গেছে। আমি দশবার নীরবে নতমুখে অপরিচিত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে রূপের পরীক্ষা দিয়েছি, দশবার আমার ঠিকুজি-কুষ্ঠি নিয়ে পণ্ডিতেরা বিচার করেছেন, দশবার দশটা চামার এসে পণ নিয়ে বাবার সঙ্গে দর-কষা-কষি করেছে, আমি বাবার মুখ চেয়ে কিছু বলিনি, কিছু ভাবিনি। আজ আমার জীবনে এই প্রথম সুযোগ এসেছে ভাববার, আমি বিয়ে করব কি না, করলেও আপনাকে করব কি না। আমাদের জন্য আপনি যা করেছেন, তা আমাদের পরমাত্মীয়েরাও করেনি, এজন্য আপনার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব। আপনার গৃহস্থালির সমস্ত ভারও আমি বইব, কিন্তু আপনাকে বিয়ে করব কি না, তা ঠিক করতে একটু সময় চাই। আর একটা কথাও এইসঙ্গে বলে রাখছি— আমি প্রত্যাশা করব, আপনি আমার নারীত্বের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবেন।' ডাক্তার ঘোষাল হাসিমুখে চুপ করে রইলেন একটু। তারপর বললেন, 'আমি ভণ্ডামি করতে পারি না, I am incapable of wearing a mask । আমি শিশুর মতো লোভী, পশুর মতো নিরঙ্কুশ। আমি যে নিজেকে সংবরণ করে রাখতে পারব, এ-ভরসা তোমায় দিতে পারি না। খুব সম্ভবত বারবার তোমার so-called নারীত্বকে ক্ষুণ্ণ করবার চেষ্টাই আমি করব। কিন্তু তোমাকেও আত্মরক্ষা করবার অধিকার দিলুম। তুমি আমার বেচাল দেখলে যেমন করে পার

নিজেকে বাঁচিও। আমাকে লাথিও, জুতিও, দরকার হলে গুলি চালিও। আমি এ বিষয়ে তোমাকে blank-cheque দিয়ে দিচ্ছি। আমি নিজেকে বদলাতে পারি না, পারো যদি তুমি আমাকে বদলে দাও, it is for you to do and that will be a great act if you can. আমি খানিকটা কাদার তাল, আমাকে বলা বৃথা তুমি হেন হও, তুমি তেন হও। আমি কাদা, আমি কিছুই হতে পারি না, যতক্ষণ না কেউ আমার ভার নিচ্ছে। তুমি আমাকে নিয়ে যা খুশি বানাও— পুতুল, প্রতিমা, মূর্তি, হাঁড়ি, কলসী, সরা— যা খুশি তোমার।' ওই দুর্ধর্ষ লোকটার মুখে এ-কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, 'আপনাকে কাদা বলে কখনও ভাবিনি, ভাবতে পারি না। ডাক্তার ঘোষাল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'না, না, ভুল বলেছি, কাদা নয়, পাঁক। তুমি যদি আমার ভার নাও, পঙ্কোদ্ধার করতে হবে।' সেই থেকে ডাক্তার ঘোষালের কাছে আছি এবং তাঁর সমস্ত ভার নিয়েছি। আর জানি না এ-কথাটা বললে বিশ্বাস করবেন কি না তবু বলছি, এ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করতে পেরেছি। ডাক্তার ঘোষাল মহিষাসুরের মতো দুর্দান্ত, যা মুখে আসে বলেন, অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেন, কথায় কথায় তেড়ে যান, গায়ে হাত দিতেও কসুর করেন না, কিন্তু তবু বিশ্বাস করুন, আমার আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ আছে। ওঁকে আমি ছেড়ে যেতে পারিনি, তার কারণ শুধু কৃতজ্ঞতা নয়, তার কারণ আরও গভীর। ওঁর মধ্যে সকল পৌরুষের প্রবল প্রকাশ লক্ষ করেছি, তা নগ্ন হলেও বিরল। ওঁকে যদি সত্যি ভালো করে গড়তে পারি, তা হলে তা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হবে। ওঁকে ছেড়ে না যাবার গভীরতর কারণও কিছু আছে, কিন্তু তা নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি, কারণ তা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। কারও সঙ্গে আলোচনা করে ও বিষয়ে কেউ কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি, আমিও পারব না। ও কথা থাক। যেজন্য বিশেষ করে আপনাকে এই চিঠিটা লিখছি, সেই কথাটা এইবার বলি। আপনি আমাদের দলে আসুন। আমাদের দল কিসের দল, তা দলে যোগ না দিলে ঠিক বোঝাতে পারব না আপনাকে। আপনাকে যে টাকা দিয়ে এসেছি, তা ওই দলের টাকা, কোথাও নিরাপদে রাখবার সুযোগ না পেয়ে আপনার কাছে দিয়ে এসেছি, আপনি আপনার কাছে কিছুদিন রেখে দিন ওটা। পরে আপনার কাছ থেকে নিয়ে আসব। আমাদের দল কিসের দল, তার একটু ইঙ্গিত দিচ্ছি আপনাকে উপমার সাহায্যে। আমাদের দল পিপাসিতের দল। তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে তাদের, কিন্তু নির্মল জল কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না তারা তাই নালা-নর্দমা থেকে আঁজলা আঁজলা জল তুলে খাচ্ছে, আর সবাই হাসছে তাই দেখে। আমাদের আদর্শ হচ্ছে ওদের জন্য নির্মল জল সংগ্রহ করা। ওই মোহিনীকে, শাপলাকে, ছবিকে, তিনকড়ি শিরোমণিকে, আমার বোন শামুককে, আমার যতীশ কাকাকে নির্মল জলের সন্ধান দিতে হবে। ভেবেছিলাম, এ-দেশেই সে-জলের সন্ধান পাওয়া যাবে, কিন্তু দেখছি— যাবে না। এখানে সমস্তই কলুষিত। ধর্ম-মন্দির, বিদ্যামন্দির, ন্যায়প্রতিষ্ঠান, সমস্তই অন্যায়ে পরিপূর্ণ। এ ঘুষের দেশ, খোশামোদের দেশ, স্বার্থপর পশুর দেশ, এ-দেশে প্রতিপদে আত্মসম্মান বলি না দিলে কোনো কিছু পাওয়া যায় না। তাই ঠিক করেছি, এ-দেশে আর থাকব না আমরা। ভারতবর্ষের অনেক লোক আজ বিদেশে গিয়ে বাস করছে। সেখানে সসম্মানে আছে তারা, নির্মল জলের সন্ধান পেয়েছে অনেকে। আমাদের বর্তমান সভ্যতার আসল উৎস যেখানে, সেইখানে যাওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ। এ-দেশে এঁরা 'হিন্দী হিন্দী' বলে বাইরে যতই আস্ফালন করুন, মনে-প্রাণে সকলেই সাহেব, নকল সাহেব, যাঁদেরই পয়সায় কুলিয়েছে, তাঁরাই তাঁদের নিজেদের ছেলেমেয়েদের বিদেশে পাঠিয়েছেন শিক্ষার জন্য। এই স্বদেশী

হিন্দুস্থানের প্রতি দপ্তরে আজও বিলিতি ডিগ্রীর বেশি কদর। এ-দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পাওয়ার জন্য এ-দেশি ভাষারও ডিগ্রী আনতে ছুটতে হয় লন্ডনে, জার্মানীতে, আমেরিকায়। তবে ভালো চাকরি জোটে। সংস্কৃতের আসনে কাশী বা নবদ্বীপের সংস্কৃত পণ্ডিতেরা কলকে পান না, সে-আসন অলঙ্কৃত করেন বিদেশি ডিগ্রীধারীরা। অতি মূর্খ হিন্দী ভাষার লন্ডনী ডি-লিটরা এ-দেশের বড় বড় পণ্ডিতদের মাথায় পা দিয়ে উপরে উঠে গেছেন। বিদেশে সংস্কৃতির আঁস্তাকুড় ঘেঁটে এসে এ-দেশের কৃতী সাহিত্যিক শিল্পীরা কৃতার্থ। বিদেশের মোহ আমাদের যায়নি, বেড়েছে। নূতন নাগপাশে বাঁধছে আমাদের সে-মোহ। গান্ধী বা রবীন্দ্রনাথের গঙ্গাজল ছিটিয়ে বিদেশি ছাঁচেই ঢালা হচ্ছে এ-দেশের সমাজ, সাহিত্য। শুধু যে যন্ত্রের জন্যই আমরা ওদের কাছে ঋণী তা নয়, ওদের পায়ে আমরা আমাদের আত্মা, সত্তা সব বিকিয়ে দিচ্ছি ক্রমশ। বড় বড় পণ্ডিতেরাও বলছেন— সীমান্ত সব ভেঙে দাও। কবির স্বপ্ন সফল হোক— জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে-জাতির নাম মানব জাতি। এই যদি আদর্শ হয়, তা হলে আমরা পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে এ-দেশের বনে-বাদাড়েই বা শিয়াল-কুকুরের মতো থাকব কেন। আমরা ইংলন্ডে যাব, জার্মানীতে যাব, আমেরিকায় যাব, অস্ট্রেলিয়ায় যাব, জাপানে যাব, চীনে যাব, রুশে যাব। যেখানে নির্মল জলের সন্ধান পাব, সেইখানেই যাব। 'জু'দের কথা, 'জিপ্‌সি'দের কথা নিশ্চয়ই আপনি জানেন। তাদের উপর কি পাশবিক অত্যাচার হয়েছে, তাও নিশ্চয় আপনার অবিদিত নেই। 'জু'রা, 'জিপসী'রা আজ সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে। শুধু ছড়িয়ে নেই, তারা তাদের সম্মান আজ পৃথিবীর সভ্যসমাজের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে। বাঙালীরা যদি ভদ্রভাবে বাঁচতে চায়, তা হলে তাদেরও তাই করতে হবে। এ-দেশে তাদের কোনো আশা নেই। ভালো হবার, বড় হবার সুযোগই পাবে না তারা। আর সুযোগ না পেলে যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলবে ক্রমশ। এখন কথা হচ্ছে, বিদেশে আমাদের থাকতে দেবে কেন? পাসপোর্ট ভিসা কিছুই পাওয়া যাবে না। আমাদের দলের একজনের সঙ্গে বিদেশগামী এক জাহাজের ক্যাপটেনের আলাপ আছে। তিনি খানিকটা আশ্বাস দিয়েছেন। তবে তিনি এ-ও বলেছেন, এর জন্যে টাকা চাই। এক-আধ টাকা নয়, অনেক টাকা। বিদেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে ভিখারীর বেশে গেলে চলবে না। ভিক্ষুকের সম্মানিত স্থান কোনও সভ্য দেশে নেই। নিজেদের খাওয়া-পরার সম্বল নিয়ে যেতে হবে। তাই আমরা টাকা সংগ্রহ করছি। এই টাকারই কিছুটা আপনার কাছে রেখে এসেছি সেদিন। ইতিহাসে পড়েছি, বাঙালীরা একদিন ভারতবর্ষের বাইরে নিজেদের কীর্তি স্থাপন করেছিলেন। বিজয় সিংহ লঙ্কা জয় করেছিলেন—'শ্যাম, কম্বোজ, ওঙ্কারধাম, মোদেরই প্রাচীন কীর্তি' লিখে গেছে কবি সত্যেন্দ্রনাথ। এসবের ঐতিহাসিক প্রমাণও আছে অজস্র। আমরা এ-যুগের গৃহহারা বাঙালীর দল কি ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে কোনও কীর্তির বুনিয়াদ গাঁথতে পারব না? পারি আর না পারি, চেষ্টা করে দেখতে হবে। এ-স্বপ্ন হয়তো হাস্যকর, এ অবাস্তব কল্পনা হয়তো উপহাসেরই খোরাক যোগাবে, তবু ঠিক করেছি, দুঃসাধ্য হলেও একেই সফল করবার চেষ্টা করব। কারণ এটা নিঃসংশয়ে বুঝেছি, যে বাঙালীর ছেলেমেয়েরা বুকের রক্ত দিয়ে অসহ্য কষ্ট বরণ করে একদিন স্বাধীনতা-যজ্ঞের হোমাগ্নি জ্বেলেছিল, তাদের বংশধরদের স্বাধীন ভারতে কোনও সম্মানের স্থান নেই। তারাই আজ সবচেয়ে বেশি আহত, সবচেয়ে বেশি অপমানিত। দুঃখ-দারিদ্র্য অপমান-অবহেলার চাপে তারা আত্মসম্মানও হারিয়ে ফেলেছে। সম্মানের আসন না পেলে বাঙালী বাঁচতে পারে না। সে-আসন আপাতত এ-দেশে আর নেই, যা আছে তা ভণ্ডামির ন্যক্কারজনক মুখোশ।

বিদেশে আছে কি না, সেইটে খুঁজে দেখতে হবে। আপনাকেও আমাদের দলে চাই। আপনি আমাদেরই, আপনাকে আমি ছাড়ব না। বুলিকে খুঁজে বার করতে হবে। তারপর সবাই মিলে আমরা যাত্রা করব নূতন শ্যাম-কম্বোজের সন্ধানে, ভাসব অজানা সমুদ্রে, আবার প্রতিষ্ঠিত করব নিজেদের হয়তো অখ্যাত কোনও দ্বীপে বা বিখ্যাত কোনও শহরে। কিন্তু এদেশে আর নয়। আপনার সঙ্গে আবার একদিন দেখা করব এসে। আজ এইখানেই থামি। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবেন। ইতি— ঝিনুক।

চিঠিটা পড়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন গণেশ হালদার। তাঁর মনে হতে লাগল তিনি যেন একটা নূতন দেশে গিয়েছিলেন, নূতন পরিবেশে নিশ্বাস নিচ্ছিলেন, নূতন আশার রঙীন আলোয় রঙীন স্বপ্ন দেখছিলেন। চিঠিটা শেষ হওয়া মাত্রই যেন সব শেষ হয়ে গেল। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, ক্রমশ তাঁর মনে হতে লাগল ঝিনুক যা লিখেছে তা কি অসম্ভব কল্পনা-বিলাস মাত্র? তা কি সম্ভব হতে পারে না? তারপর হঠাৎ মনে হল এ বিষয়ে ডাক্তার সুঠাম মুখার্জির সঙ্গে পরামর্শ করলে কেমন হয়। তিনি হয়তো আমাদের পথ দেখাতে পারবেন। ঝিনুক ঠিকই লিখেছে এ-দেশে থাকলে আমাদের উন্নতির আশা নেই, brute majority-র পায়ের তলায় আমাদের গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে আপত্তি নেই, যদি সবাই সব প্রদেশে সমান মর্যাদা পায়, কিন্তু তা তো হচ্ছে না, বাংলার বাইরে বাঙালীর স্থান নেই, বাংলার ভিতরেও নেই। আমরা কোথায় যাব তা হলে? তখনই, তার মনে হল প্রাচীন কালের বাঙালী আর আধুনিক বাঙালী কি এক? পোশাক-পরিচ্ছদে আহারে-বিহারে সাহিত্যে-শিল্পে তারা কি বদলায় নি? নূতন যুগের নূতন উপাদান নিয়ে সে যদি আরও বদলায় তাতেই বা ক্ষতি কি? পরিবর্তনই তো জীবনের লক্ষণ।

তারপর ঘড়িটার দিকে একবার চেয়ে তিনি উঠে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে দাইয়ের গলা শোনা গেল— 'মাস্টারবাবু, ভাত এনেছি, আসেন। ইস্কুলের টাইম হয়ে গেলো।" গণেশ হালদার বাইরের ঘরে বসে ছিলেন, ভিতরের দিকে গেলেন। দাই টেবিলের উপর খাবার সাজিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মাস্টারমশাই খেতে বসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিজয়ও এসে প্রবেশ করল। তার হাতে একটা বাটি।

"ফুফু মাস্টালজিকে বাস্তে তলকালি ভেজি দেলকে।"

(পিসি মাস্টারজির জন্য তরকারি পাঠিয়ে দিয়েছে।)

দাই একমুখ হেসে বলল, "আমার বেটী ভালো পাকায় (রাঁধে)। খাবেন? মটর শাগের ভুঁজি আছে।"

"দাও।"

অন্যমনস্কভাবে খেতে লাগলেন গণেশ হালদার। কিছু মন্তব্য করলেন না মটর শাকের ভুঁজির বিষয়ে। ঝিনুকের চিঠির কথাই তাঁর মাথায় ঘুরছিল। দাই কিন্তু অন্যরকম ভেবে বসল।

"কেন যে মেয়েটা তরকারি ভেজে দেয় (পাঠিয়ে দেয়) বুঝি না। বাবু ভেইয়ার কি ইসব পসিন (পছন্দ) হয়? ঝুটমুট ঝঞ্ঝাট।"

দাইয়ের অভিমানাচ্ছন্ন মুখের দিকে চেয়ে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন হালদার।

বললেন, "শাকভাজা তো চমৎকার হয়েছে। তোমার মেয়ে চমৎকার রাঁধতে পারে দেখছি।"

হাসি ফুটল দাইয়ের মুখে।

"হাঁ আচ্ছাই রিনে (রাঁধে), হামারদের তো খুব ভালো লাগে।"

"আমারও ভালো লাগছে। কি করে তোমার মেয়ে।"

"বাড়িতেই থাকে। বিধবা হোয়ে গেল সেদিন। এখন ভাইয়ের সংসার সামহারছে (সামলাচ্ছে)। আর কি করবে? সবই নসিব।"

হঠাৎ মুরগি ডেকে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটল বিজয়। মুরগি ডিম দিয়েছে, ডিমটা তাকে সংগ্রহ করতে হবে।

দাই বেরিয়ে ডাকতে লাগল, 'রকেট, রকেট।'— রকেট ছুটে এল। রকেট দাইকে খুব ভালোবাসে।

"রকেটকে ডাকলে কেন?" হালদার মশাই জিজ্ঞাসা করলেন।

"বড় বদমাশ যে, এখনি বিজয়ের হাত থেকে আণ্ডাটা ছিনে নেবে। বৈঠ, বৈঠ বদমাশ!"

রকেট বসল। মাস্টারমশাই খেতে লাগলেন।

।। তেরো ।।

ডাক্তার সুঠাম মুখোপাধ্যায়ের নিজের একটি ছোট গোলাপবাগান আছে। বেশি গাছ নেই। পঁচিশটি মাত্র, কিন্তু সেই বাগানেই অনেকক্ষণ সময় কাটে তাঁর। সেদিন সকালে তিনি বাগানে ঘুরে ঘুরে কুঁড়িগুলির উপর পোকা-তাড়ানো ওযুধ দিচ্ছিলেন। রকেটও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল, যেন সে-ও এসবের খুব বড় সমজদার। ডাক্তার মুখার্জি তাকে মাঝে মাঝে ধমকাচ্ছিলেন।

"তুই ঢুকেছিস কেন এখানে, ছোট গাছগুলো মাড়িয়ে দিবি।"

দিন সাতেক আগে নূতন গাছ এনে পুঁতেছিলেন তিনি কয়েকটা। নিতান্তই ছোট্ট, ভয় হচ্ছিল রকেটের থাবার চাপে সেগুলো জখম না হয়। রকেট কিন্তু খুব সন্তর্পণে গাছগুলো বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে ঘুরছিল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। ডাক্তার মুখার্জির এ ভয়ও হচ্ছিল বড় গাছগুলোর লম্বা লম্বা ডালপালার কাঁটায় ও ক্ষত-বিক্ষত না হয়ে যায়। কিন্তু রকেট তাও বাঁচিয়ে চলছিল বেশ! কুকুর নয়, যেন মানুষ। বেশ মজা লাগছিল সুঠাম মুকুজ্যের। এই নিয়েই মশগুল হয়ে ছিলেন তিনি। জাম্বু বা ভুটানের এসব বিষয়ে তেমন আগ্রহ নেই। জাম্বু বুড়ো হয়ে গিয়ে সব বিষয়ে যেন উদাসীন হয়ে পড়েছে। ডাক্তার মুখার্জি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন সিঁড়ির উপর যেখানে রোদটি এসে পড়েছে সেইখানে বেশ আরামে শুয়ে আছে সে। আর ভুটান গেটের ফাঁকে মুখটি লাগিয়ে দেখছে নিবিষ্ট চিত্তে বাইরের রাস্তাটা, যদি দৈবাৎ কোনো প্রণয়িনীর আভাস পায়! সে জানে ডাক্তার মুখার্জি তাকে রাস্তায় বেরুতে দেবেন না, সে যা করছে তা-ও বে-আইনী, তবু ডাক্তারবাবুর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিতে সে ছাড়ে না। যখনই সুবিধা পায় গেটের ফাঁকে মুখটি লাগিয়ে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকে পথের দিকে।

"ভুটান, ভুটান, এদিকে আয়।"

হাঁক দিলেন ডাক্তারবাবু। ভুটান ঘাড় ফিরিয়ে দেখল একবার, কিন্তু এল না।

"আয়, এদিকে আয়।"

ধমকে উঠলেন ডাক্তারবাবু। তখন সে কেঁচোর মতো এঁকেবেঁকে আসতে লাগল ঘাড় নীচু করে।

"আয়, আয়—"

রকেট দৌড়ে চলে গেল তার কাছে। আলতোভাবে তার কানটা ধরে টানতে লাগলো।

খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল ভুটান। জাম্বু সামান্য একটু ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিলে ব্যাপারটা তারপর যেমন শুয়ে ছিল, তেমনি শুয়ে রইল।

"রকেট কাম হিয়ার, ভুটানকে বিরক্ত করো না।"

রকেট দু-একবার অবাধ্যতা করবার চেষ্টা করল বটে কিন্তু ডাক্তারবাবুর হাঁকা-হাঁকিতে শেষ পর্যন্ত ফিরে আসতে হল তাকে।

ডাক্তারবাবু বাগান থেকে বেরিয়ে মাঠে গিয়ে বসলেন চেয়ারে। আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। দেখলেন একটা অদ্ভুত জিনিস। কয়েকটা সাদা মেঘ মিলে একটা ময়ূরপঙ্খী রচনা করেছে, পাল তুলে ভেসে চলেছে বিরাট একটা নৌকো আকাশসমুদ্রে। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন সেদিকে।

"গুল্‌লি দে নি।"

(গুলি দাও না।)

চেয়ারের পিছনে বিজয় কখন এসে দাঁড়িয়েছে তা তিনি টের পাননি। প্রায়ই তাকে কাঁচের গুলি কিনে দেন তিনি, আর প্রায়ই সে হারিয়ে ফেলে।

"সেদিন যে বারোটা গুলি কিনে দিলাম, কি করলি?"

"হেলা গেলে।"

(হারিয়ে গেছে।)

ধমকে উঠলেন ডাক্তারবাবু।

"রোজ রোজ তোকে গুলি কিনে দেব আর রোজ তুই হারিয়ে ফেলবি? আর দেব না, যা—"

রুকমিনীর মেয়ে (দাইয়ের মেয়ে রুকমিনী) পাকিয়াও দাঁড়িয়েছিল এসে। সে সরু গলায় বললে, "উ জংগল মে গুললি ফেকি দেইছে বাবু—"

(ও জঙ্গলে গুলি ফেলে দেয়, বাবু।)

বিজয়ের উপর পাকিয়ার হিংসে আছে একটু। বিজয় নির্বাক হয়ে চোখ পাকিয়ে চেয়ে রইল পাকিয়ার দিকে। সে যে এত বড় বিশ্বাসঘাতিকা হতে পারে এ তার ধারণার অতীত ছিল।

গুলিগুলোকে জঙ্গলের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার খুঁজে বার করা এই ছিল খেলা, পাকিয়াও সে খেলায় যোগ দিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব গুলিগুলোই হারিয়ে গেল, একটাও খুঁজে পাওয়া গেল না। পাকিয়া যে এ-কথাটা ডাক্তারবাবুকে বলে দেবে তা বিজয় ভাবতেই পারেনি। অথচ ডাক্তারবাবুর কাছে সব কথা খুলে বলবারও উপায় নেই। সে চোখ পাকিয়ে রইল পাকিয়ার দিকে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে। তারপর ডাক্তারবাবুর পিছনে গিয়ে ছোট্ট ঘুঁষি তুলে পাকিয়াকে জানিয়ে দিল যে, এর প্রতিশোধ সে নেবে যথাসময়ে।

ডাক্তারবাবু বললেন, "পিছনে কি করছিস, সামনের দিকে আয়।"

বিজয় সামনে এল। ডাক্তারবাবু ছদ্মক্রোধে চেয়ে রইলেন তার দিকে। হঠাৎ তাঁর মনে হল বিজয়ের গাল দুটো বেশ চকচক করছে। এ সময়ে তেল মেখেছে নাকি?

"গালে কি মেখেছিস?"

"কিলিম।"

"কিলিম কি?"

পাকিয়া ব্যাখ্যা করল, "কিরিম, কিরিম।"

তখন ডাক্তারবাবু বুঝতে পারলেন ক্রীম লাগিয়েছে।

"ক্রীম কোথা পেলি?"

বিজয় তখন বুক ফুলিয়ে বললে, "মাইজি লাগা দেলকে।"

(মাইজি লাগিয়ে দিয়েছে।)

পাকিয়া বলল, "হাম কো ভি দেলকে।"

(আমাকেও দিয়েছে।)

এগিয়ে এসে ঘাড় বেঁকিয়ে গালটা দেখাল। ডাক্তারবাবু দেখলেন তার গালেও ক্রীম লাগানো। তারপর পাকিয়া জিনিসটাকে আরও বিশদ করে বলল—"জাড়ো মে গাল ফাটি যাইছে নে? ওহি বাস্তে লাগা দেলকে।"

(শীতকালে গাল ফেটে যায় কিনা, তাই লাগিয়ে দিয়েছে।)

ডাক্তারবাবু রোজ বিজয়ের দৈনন্দিন খবর নেন।

"বিজয় কাল দুপুরে কি করেছিলি?"

পাকিয়া উত্তর দিলে, "কাদো গিঁজে ছেলে, বাবু।"

(কাদা ঘাঁটছিল বাবু।)

বিজয় চোখ বিস্তারিত করে চেয়ে রইল তার দিকে, তারপর বলে উঠল, "ঝুঠ্‌ঠা। হাম্ কালী মুলতি বানাইছেলে, বাবু।"

(মিছে কথা। আমি কালী মূর্তি বানাচ্ছিলাম, বাবু।)

"কই দেখি, কি রকম মূর্তি বানিয়েছিস?"

সমস্যাটার যে এত সহজে সমাধান হয়ে যাবে বিজয় তা ভাবেনি। সে ছুটে গিয়ে লিলির ঝোপের পিছন থেকে তার মূর্তি নিয়ে এল। একটা বড় কাদার ডেলার উপর আর একটা ছোট্ট ডেলা। ছোট্ট ডেলাটার দুপাশ থেকে আঙুলের মতো লম্বা লম্বা কি নেমে এসেছে। কালী মূর্তির সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য নেই, কিন্তু বিজয় বলল বড় ডেলাটা কালী মূর্তির ধড়, ছোট ডেলাটা মাথা আর ওই আঙুলের মতো জিনিস দুটো হাত।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "চোখ কই? আঁখ কাঁহা? কালী মাই কি অন্ধী ছে?"

(কালী মা কি অন্ধ?)

"দেখো নি আচ্ছা করি কে। ছে আঁখ।"

(ভালো করে দেখ না। চোখ আছে।)

ডাক্তারবাবু ভালো করে দেখলেন। সত্যিই ছোট ডেলাটার দু-পাশে ছোট ছোট দুটো গর্ত রয়েছে।

সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন ডাক্তারবাবু, "বাঃ, চমৎকার হয়েছে। তুই তো দেবীপ্রসাদকে হার মানিয়ে দিবি দেখছি। আচ্ছা, তোকে গুললি এনে দেব আজ।"

পাকিয়াও ফরমাশ করল।

"হামারা বাস্তে ভি কুছু লাইও। হামরা কড়াই আর হাঁড়িয়া টুটি গেলছে।"

(আমার জন্যেও কিছু এনো। আমার কড়াই আর হাঁড়ি ভেঙে গেছে।)

ডাক্তারবাবু কিছুদিন আগে পাকিয়াকে এক সেট খেলা-ঘরের বাসন কিনে দিয়েছিলেন।

বিজয় এবার সুযোগ পেল।

"ওকলা, হাঁলিয়া, কলহাই, চুলহা, খনতি, সব হলায় গেলে।"

(ওর হাঁড়ি, কড়াই, উনুন, খুনতি সব হারিয়ে গেছে।)

"তোহি তো সব ফেক ফেক দেইছে।"

(তুই তো সব ফেলে ফেলে দিস।)

ফোঁস করে উঠল পাকিয়া।

সুঠাম মুকুজ্যে আর মীমাংসার মধ্যে গেলেন না। তিনি বুঝলেন, গুলি আর খেলনা আবার কিনে আনতে হবে। পাছে ভুলে যান সেজন্য বেচুকে ডেকে বলে দিলেন। তারপর এক হৈ হৈ কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। ভেড়াটা খুলে গেল হঠাৎ আর রকেট গেল তাকে তাড়া করে। ভেড়াটার নাম ভেটুক। সে ভালো মানুষ লোক, গায়ে হাতটাত বুলিয়ে দিলে আপত্তি করে না। সর্বাঙ্গে বড় বড় লোম। মুনি ঋষির মতো চেহারা। দেখলে সমীহ করতে ইচ্ছে করে। রকেট তাড়া করে গেল বটে কিন্তু একটু এগিয়েই থেমে যেতে হল তাকে। দ্রুত ছন্দে দুবার খটখট শব্দ করে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ভেটুক। রকেট আর এগোতে সাহস করল না। ঘাড়টা নীচু করে একটু দূর থেকে লম্বা ল্যাজটা নাড়তে লাগল কেবল।

"রকেট, কাম হিয়ার।"

"কাম হিয়াল"— বিজয়ও বলল।

"হিঁয়া পর আ বিজৈয়া। ভেড়োয়া বড়া মারখুণ্ডা ছে।" (বিজয় এখানে চলে আয়, ভেড়াটা বড় গুঁতুনে।)

ডাক্তারবাবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন পাকিয়া টপ করে পেয়ারা গাছটায় উঠে পড়েছে। এই ছোট পেয়ারা গাছটায় ফল হলে সেগুলো মুড়িয়ে খায় ওরা দুজনেই। শালিয়া, মালিয়াও (বিজয়ের বোন) জোটে। হনুমানরাও লুটপাট করে যখনই সুযোগ পায়। গাছটার একটা ডাল খুব নিচু বলে গাছটাতে ওঠাও যায় সহজে।

পাকিয়াকে দেখে ডাক্তারবাবু হেসে ফেললেন। বিজয় কিন্তু গম্ভীর। সে সবিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে বলল, "দেখলো, দেখলো?"

(দেখলে দেখলে?)

তার ভাবটা যেন দেখলে আমাদের বিপদের মুখে ফেলে ও কেমন স্বচ্ছন্দে গাছে উঠে বসে আছে।

"রকেট. কাম হিয়ার।"

"কাম হিয়ার, রকেট—"

বিজয় একটা ছোট কঞ্চিও তুলে নিল, কি জানি ভেড়াটা যদি তেড়ে আসে।

"কাম হিয়ার রকেট—"

রকেট কিন্তু অবাধ্যের মতো দাঁড়িয়ে রইল। একটা ভেড়ার কাছে পরাজয় স্বীকার করে তাকে ফিরে যেতে হবে এতে অপমানে যেন তার মাথা কাটা যাচ্ছিল। ঘেউ ঘেউ করতে করতে আর একটু এগোবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভেটুক আবার খটাখট শব্দ করে

ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়াল। সামনের পা দুটোর খুরে খুরে ঠোকাঠুকি করেই সে শব্দটা করছিল সম্ভবত। বেশ মজা লাগছিল ডাক্তারবাবুর। তিনি আর রকেটকে ডাকলেন না। ভাবলেন এই দ্বন্দ্বে কে জয়ী হয় দেখা যাক। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটল আর এক কাণ্ড। মুংলি (মঙ্গলা) গাইটা হঠাৎ দড়ি ছিঁড়ে এসে আক্রমণ করল রকেটকে পিছন থেকে। রকেট রণে ভঙ্গ দিয়ে ছুটে পালাল। হাততালি দিয়ে হেসে উঠল বিজয়, হাসির একটা ঝরনা বয়ে গেল যেন। মুংলি ভেটুকের খুব বন্ধু। দু'জনা এক গোয়ালে থাকে। দৈবাৎ যদি মুংলি দড়ি খুলে বাইরে চলে যায়, ভেটুক ডাকতে থাকে। যতক্ষণ মুংলিকে আবার গোয়ালে ফিরিয়ে না আনা হয়, ততক্ষণ তার ডাক থামে না। মুংলির কাণ্ড দেখে ডাক্তার মুখার্জির মনে পড়ল গত যুদ্ধে আমেরিকার যোগদানের কথা। আমেরিকা যোগ না দিলে হিটলারকে হারানো সম্ভব হত কি? হঠাৎ ভয় হল ডাক্তার মুখার্জির। মুংলি আসন্ন-প্রসবা। এ অবস্থায় এত লাফালাফি করা কি ভালো? এসব ব্যাপারে দুর্গাই একমাত্র সহায়।

"দুর্গা—দুর্গা—"

রোগা পাতলা দুর্গা ছুটতে ছুটতে এল বাড়ির ভিতর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে 'সিচুয়েশন' 'কনট্রোলে' এসে গেল। রকেট ছুটে আত্মরক্ষা করছিল।

"এই রকেট— ইধার আ।"

দুর্গা প্রথমেই তাকে নিয়ে বেঁধে ফেললে। তারপর মুংলির দিকে ফিরে বললে, "আ, চল।" এগিয়ে গিয়ে তার গলার দড়িটা ধরে ফেলল। দাঁড়িয়ে রইল মুংলি, আপত্তি করল না। তার পর ভালোমানুষের মতো তার সঙ্গে সঙ্গে গোয়ালঘরের দিকে চলল। ভেটুকও চলল পিছু-পিছু। শান্তি পুনঃস্থাপিত হল।

ডাক্তারবাবু হেঁকে বললেন, "দুর্গা, অনেকদিন গোলাপবাগানে ঢোকা হয়নি। ওকে বেঁধে আয়।"

দুর্গা আসতেই তিনিও তার সঙ্গে বাগানে ঢুকলেন।

"সব গাছগুলো আজ খুঁড়ে দে ভালো করে। কাল জল দিস।"

দুর্গা এসেই ত্বরিত হস্তে খুঁড়তে আরম্ভ করে দিয়েছিল একটা গাছ।

"আচ্ছা—"

ডাক্তারবাবু একটা গোলাপকুঁড়ির দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। একটা কথা তাঁর মনে হল যা আগে কখনও হয়নি। একটা কুঁড়ি ফুটতে কত সময় লাগে? কেউ কি এর খবর রেখেছে কখনো? প্রতি গাছই কি এক সময় নেয়? এর সঙ্গে আলোবাতাসের সম্বন্ধ আছে কি? উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল তাঁর কল্পনা। তিনি বাগান থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা খাতা নিয়ে এলেন। অনেক ডায়েরি পান তিনি। এই বাঁধানো চমৎকার খাতাটা তিনি কি কাজে লাগাবেন ভাবছিলেন। কাজে লেগে গেল। তাতে তিনি টুকতে লাগলেন প্রত্যেক গাছের নাম। আর যে-সব গাছে ক্ষুদ্রতম কুঁড়ি দেখতে পেলেন সেই গাছের তলায় তলায় দিলেন তারিখ আর সময়। তারপর দুর্গাকে বললেন, দেখ, যে-সব ডালে এই ছোট কুঁড়িগুলো আছে সেইসব ডালে আলতো করে সুতো বেঁধে দিস একটা করে।

"কাহে বাবু?"

সুঠাম মুকুজ্যে তখন সোৎসাহে বাগানের মোড়াটায় বসে ব্যাপারটা বোঝাতে লাগলেন

তাকে। দুর্গা গাছ খুঁড়তে খুঁড়তে শুনতে লাগল। দুর্গা তার মনিবটির নানা ছেলেমানুষিতে অভ্যস্ত, সুতরাং বিস্মিত হল না।

"আজই বেঁধে দিস, কেমন?"

"আচ্ছা।"

সুঠাম মুকুজ্যের এই ধরনের নানা উদ্ভট খেয়ালের সে সহকারী আর এই জন্যেই সম্ভবত বাবুকে সে ভালোও বাসে। শুধু তাই নয়, এই ধরনের ব্যাপারে নানারকম ছোটখাটো খবরও সে সংগ্রহ করে এনে দেয়। বাবুই পাখির বাসা সে-ই পেড়ে এনে দিয়েছিল তাঁকে। রেড়ির গাছে যেসব শুটিপোকা ঘুরে বেড়ায়, তাও ধরে এনে দিয়েছিল তাঁকে একবার। জন্তু-জানোয়ার সম্বন্ধে দুর্গারও ঔৎসুক্য কম নয়। পাড়ার নেউল ইঁদুর ছুঁচোর খবরও সে রাখে কিছু-কিছু। কয়েকদিন আগে বলেছিল এ পাড়ায় 'খিনখিন' (বোধহয় খেঁকশিয়াল) এসেছে একটা। সাপ দেখলেই ধরে ফেলে। সাপের ল্যাজটা ধরে একটা ঝটকা দিলেই সাপটা কাবু হয়ে পড়ে। গাছ খুঁড়তে খুঁড়তে দুর্গা অদ্ভুত খবর দিলে একটা। ঘোঘার কাছে এক জায়গায় সিহাই-এর (শজারুর) খোঁজ পেয়েছে সে। তার শালা নাক্‌টা তার 'মান'টাও (গর্তটাও) দেখে এসেছে। বাবু যদি যান সে নিয়ে যেতে পারে। রাত বারোটার পর শজারুটা গর্ত থেকে বেরোয় নাকি।

"সেখানে মোটর যায়?"

"ঘোঘা নালা পর পুল নেইছে। ট্রেন সে যাইলে পড়তে।"

(ঘোঘা নালার উপর পুল নেই। ট্রেনে যেতে হবে।)

"সন্ধে সাতটার ট্রেনটাই ভালো হবে। কি বলিস?"

"হাঁ।"

সোৎসাহে মোড়া থেকে উঠে দাঁড়ালেন সুঠাম মুকুজ্যে।

"তুই যাবি?"

"যা-ই পারেছি। মগর হামরা কি কিছু জরুরৎ ছে? নাক্‌টা সব কার দেতে।"

(যেতে পারি। কিন্তু আমার যাবার কি দরকার? নাক্‌টাই তো সব করে দেবে।)

"কিন্তু আমি যে রকেটকে নিয়ে যাব। তুই না গেলে ওকে সামলাবে কে?"

চুপ করে রইল দুর্গা। দুর্গা সাধারণত সন্ধ্যার পর নিজের বাড়িতে চলে যায়। ওর একটা আড্ডা আছে, সেইখানে গিয়ে ও খঞ্জনি বাজিয়ে ভজন গায়। জনশ্রুতি, নাচেও নাকি।

"কি রে যাবি?"

"বোলেছে তো, যাইলেই পড়তে।"

(বলছ যখন, যেতেই হবে।)

ডাক্তার মুখার্জি উৎফুল্ল মুখে যে যে গাছে ছোট ছোট কুঁড়ি আছে তাদের নাম টুকতে লাগলেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন বাগান থেকে।

"বেচু, গাড়ি বার কর। আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরুব।"

ল্যাবরেটরিতে এসে ডাক্তার মুখার্জি দেখলেন তাঁর অপেক্ষায় দুটি লোক বসে আছে। একটি খুব রোগা, আর একটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট।

রোগা লোকটি তার রোগের বর্ণনা করতে লাগল।

"অনেক দূর থেকে আপনার নাম শুনে এসেছি। সকাল থেকে বসে আছি। শুনলাম আপনি

এগারোটার আগে আসবেন না। বারোটায় আমার ট্রেন ছেড়ে যায়, তা যাক, আমি না হয় সন্ধের ট্রেনটাই ধরব। আপনি দয়া করে আমার চিকিৎসার ভারটা নিন।"

"কি হয়েছে আপনার?"

"দুর্দশার চরম সীমায় এসে পৌঁছেছি, ডাক্তারবাবু। কিচ্ছু হজম হয় না, যা খাই সব গ্যাস হয়ে যায়। পেট চব্বিশ ঘন্টাই দমসম। কখনও কখনও ব্যথাও করে। কখনও খাবার পরে, কখনও খাবার আগে। কখনও ডান পাশটা, কখনও বাঁ পাশটা, কখনও কখনও মাঝখানে। কখনও সামনের দিকে, কখনও পিছনের দিকে। বুকেও ঠেলে ওঠে মাঝে মাঝে। আর মাথাতেও অসহ্য যন্ত্রণা, নানারকম যন্ত্রণা। কখনও টিপটিপ করছে, কখনও ঝনঝন করছে, কখনও ঘুরছে, মনে হয় এখুনি বুঝি পড়ে যাব। গত দশ বৎসর থেকে এই কাণ্ড। চিকিৎসার ত্রুটি করিনি। সব প্রেসকৃপশন আছে আমার কাছে। কলকাতার অধিকাংশ বড় ডাক্তারকে দেখিয়েছি। ওষুধ খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে, এই দেখুন।"

এক বান্ডিল প্রেসকৃপশন্ তিনি ডাক্তার মুখার্জিকে দিলেন। ডাক্তারবাবু উলটে-পালটে দেখলেন। তারপর বললেন, "আমি আপনার চিকিৎসা করতে পারব না।"

"পারবেন না? কেন?"

"আপনার অসুখ সারবে না। আমি কারো কাছ থেকে ঠকিয়ে টাকা নিই না।"

"তা হলে আমার এত কষ্ট করে এত দূর আসা বৃথা হল? আপনি কোনো প্রেসকৃপশন্ দেবেন না?"

"না।"

লোকটি হঠাৎ হাত জোড় করে বলে উঠল,— দয়া করুন ডাক্তারবাবু। আমাদের গ্রামের একটি লোক সেরে গেছে আপনার ওষুধ খেয়ে। তার কথাতেই এখানে এসেছি। আপনি কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিন।"

সুঠাম মুকুজ্যে হেসে বললেন, "যে ব্যবস্থার কথাটা আমার মনে হচ্ছে সেটা কি আপনার পছন্দ হবে?"

"বলুন। আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব।"

"আপনাকে জপ করতে হবে।"

"জপ? কোনও মন্ত্র?"

"না, মন্ত্র নয়। রোজ সকাল সন্ধে অন্তত একশ' বার করে আপনি জপ করবেন, আমি ভালো হয়ে যাব, আমি ভালো হয়ে যাব। লোকে যেমন পুজো করতে বসে, তেমনি আসন করে বসবেন আর চোখ বুজে জপ করে যাবেন।"

"কোনও ওষুধ দেবেন না।?"

"না। ওষুধ তো অনেক খেয়ে দেখলেন।"

"কি খাব আমি?"

"কি খান রোজ?"

"পুরোনো চালের পোরের ভাত, সিদ্ধ তরকারি, তেল ঘি মসলা কিচ্ছু দিই না। গাঁদাল পাতার ঝোলটা রোজ খাই। তা-ও হজম হয় না।"

"ঘি-ভাত খেয়ে দেখেছেন কখনও?"

"না। ওসব কল্পনাতেও আনতে পারি না।"

"খেয়ে দেখুন না। এতকাল অখাদ্য খেয়েছেন, এবারে একটু সুখাদ্য খেয়ে দেখুন। হয়তো হজম হতে পারে। সামান্য একটু তেল বা ঘিয়ের সঙ্গে দু'এক কুঁচি আদা পেঁয়াজ নিয়ে ভাতটা ভেজে নেবেন ভাল করে।"

"ওরে বাস্, ও কি আমার হজম হবে?"

"না হয় ছেড়ে দেবেন। সব রকমই তো করেছেন, এবার এটাও করে দেখুন।"

অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন ভদ্রলোক।

"আপনার ফি—"

"দিতে হবে না। যদি ভালো থাকেন আবার এসে দেখা করবেন, কিংবা খবর দেবেন।"

ভদ্রলোক এ ধরনের চিকিৎসা প্রত্যাশা করেননি। তাঁর গ্রামের যে লোকটি সেরে গিয়েছিল তাকে ডাক্তারবাবু খুব দামি একটা ইন্‌জেকশনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই একটু ইতস্তত করে বললেন, "কোনো ইন্‌জেকশন টিন্‌জেক্‌শন দিলে যদি—

"না, সে-সব দরকার নেই। যা বললুম, তাই করুন গিয়ে। নমস্কার।"

নমস্কার করে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন। তিনি যাবার পর হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোকটি এলেন। একটু থপ্‌থপে গোছের চেহারা। বেশ সপ্রতিভ হাসি-হাসি মুখ।

"নমস্কার ডাক্তারবাবু, আমি আমার পরিবারবর্গকে ধরমশালায় বসিয়ে এসেছি। আনব?"

"অসুখ কার?"

"তা তো ঠিক বুঝতে পারছি না, সেইটি আপনাকে ঠিক করতে হবে।"

"ব্যাপারটা কি আগে শুনি।"

"আমার ছেলে হচ্ছে না। চার চারটে বিয়ে করেছি, কিন্তু ভাগ্য এমন খারাপ যে, চারটেই বাঁজা। আপনি ওদের পরীক্ষা করে বলে দিন ওদের একজনেরও ছেলে হবার চান্স আছে কি না। নিয়ে আসি ওদের, কেমন?"

"না। এখন আনতে হবে না। আমার মনে হচ্ছে ছেলে না হওয়ার কারণ আপনার মধ্যেই আছে। আপনাকেই আগে পরীক্ষা করতে হবে।"

"আমাকে? আমার তো কোনও অসুখ নেই!"

"আপনার শুক্রটা (semen) পবীক্ষা করা দরকার। খুব সম্ভবত সন্তান হওয়ার বীজ আপনার শুক্রে নেই। তাই ছেলে হচ্ছে না! আগে সেইটে পরীক্ষা করতে হবে।

আমি সব লিখে দিচ্ছি। যা লিখে দিচ্ছি ঠিক তেমনি করবেন। তারপর কাল ঠিক এই সময়ে 'সিমেন'টা নিয়ে আসবেন।

"কত ফি দিতে হবে?"

"যোল টাকা।"

"যোল টাকা দিতে আপত্তি নেই। কিন্তু ছেলে হবে তো?"

"সেটা তো পরীক্ষা না করে বলা যাবে না।"

ভদ্রলোক যোল টাকা বার করে দিলেন। ডাক্তারবাবু একটা কাগজে লিখতে লাগলেন কি কি করতে হবে।

ঘণ্টা খানেক পরে নদীর ধারের একটা গাছতলায় বসে ডাক্তারবাবু লিখছিলেন : "আজ শজারু দেখব বলে মনটা খুব উৎসুক হয়ে আছে। বন্য অবস্থায় শজারু কখনও দেখিনি। ওরা নিশাচর প্রাণী। দিনের বেলায় সাধারণত দেখা যায় না। শুধু নিশাচর নয়, ওরা অসাধারণ প্রাণী। অসাধারণ বলছি, কারণ ওদের সম্বন্ধে নানা গুজব প্রচলিত আছে। এ দেশের চাষীরা মনে করে শজারুরা ওদের ফসল নষ্ট করে। আলুর ক্ষেত খুঁড়ে আলু খেয়ে যায় নাকি। বিদেশেও ওদের নানা রকম বদনাম প্রচলিত। অসাধারণ ব্যক্তিদের নামেই সাধারণত বদনাম রটে, তাই বলছি শজারু অসাধারণ প্রাণী। ও-দেশে অনেকের ধারণা শজারু নাকি তার পিঠের কাঁটায় বিঁধিয়ে ডিম, আপেল প্রভৃতি নিয়ে পালায়। ওরা নাকি আপেল গাছতলায় বা ডিমের ঘরে গিয়ে গড়াগড়ি দেয়, আর ডিম আপেল সব বিঁধে যায় ওদের গায়ের কাঁটায়। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় ব্যাপারটা গুজব মাত্র। গায়ের কাঁটা খাড়া করে গড়াগড়ি দেওয়া সহজসাধ্য কি? ধরলুমই না হয়, কোনোরকম দুঃসাধ্য কসরত করে ওরা ডিম বা আপেল বিঁধিয়ে নিয়ে গেল, কিন্তু খাবার সময় ওদের সেগুলি খুলে দেবে কে? তবে কি ওরা পরস্পরের সাহায্যে অপহৃত জিনিসগুলির সদ্ব্যবহার করে? একজনের পিঠ থেকে আর একজন খায়? কিন্তু এরকম পরস্পরহিতৈষী নিখিল-বিশ্ব-শজারু-সমবায় সমিতির কোনও চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায়নি এ পর্যন্ত। শেয়ালরা শুনেছি পরস্পরের সাহায্যে আখ খায়। একটা শেয়াল আখটা চিবোয়, আর একটা শেয়াল নীচে শুয়ে থাকে মুখ হাঁ করে। তার খাওয়া হয়ে গেলে সে আবার চিবোতে থাকে, অন্যটা তখন নীচে মুখ হাঁ করে শোয়, একজন চাষী আমাকে বলেছিল সে নাকি এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছে। শজারু সম্বন্ধে আর একটা গুজব আছে. সেটা আরও অদ্ভুত। বিলেতের অনেক গোয়ালাদের ধারণা শজারুরা নাকি গরুর বাঁটে মুখ লাগিয়ে দুধ খেয়ে ফেলে। এ দেশে ঢেমনা সাপের বিরুদ্ধে এ নালিশ অনেকে করে। একজন বিদেশি গোয়ালা বলেছে, শজারু এসে তার গরুর বাঁট থেকে প্রায় আড়াই গ্যালন দুধ খেয়ে ফেলেছিল! শজারুর মতো একটা সর্বাঙ্গ-কণ্টকিত জানোয়ার গরুর বাঁটে মুখ লাগিয়ে দুধ খাচ্ছে সেটা বিনা প্রতিবাদে সহ্য করছে এরকম লক্ষ্মী গরুর কথা ভাবা যায় না। একজন প্রকৃত পর্যবেক্ষক (Naturalist) এ শুনে বলেছেন, তিনি একটা মরা শজারুর পেট চিরে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, একটা শজারুর পেটে ১/৫ পাইন্টের বেশি জল ধরে না। উক্ত গোয়ালার উক্তি যদি সত্য হয় তা হলে বুঝতে হবে, ও অঞ্চলে যত শজারু ছিল সবাই এসেছিল দুধ খেতে, এবং তারা একের পর এক যখন দুধ খেয়ে যাচ্ছিল তখন গরুটি চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, কিচ্ছু বলেনি। শজারুদের এরকম সম্মিলন বা গরুর এরকম শজারু-বাৎসল্য কল্পনা করাও শক্ত। তবু এ গুজব প্রচলিত আছে। সেইজন্যই বলছিলাম শজারু অসাধারণ জানোয়ার, তা না হলে ওকে কেন্দ্র করে এতরকম গল্প-গুজব আবর্তিত হত না। শেক্সপীয়রের নামে নানারকম গুজব ছিল। আমাদের দেশে বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধিজী, এমন কি নেহেরুর সম্বন্ধেও নানারকম অদ্ভুত গল্প অনেকেই শুনেছেন নিশ্চয়। আমি একজন ক্ষত্রিয় জমিদারের কথা জানি! তাঁর মতো সুদর্শন পুরুষ আমি আর দেখিনি। অসাধারণ রূপবান ছিলেন তিনি, সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে নানারকম গুজবও প্রচলিত ছিল। লোকে বলত তিনি অত সুন্দর দেখতে, তার কারণ তাঁর সমস্ত খাবার জ্যোৎস্না উঠলেই নাকি ছাতে সাজিয়ে দেওয়া হত। সেগুলো দু' ঘণ্টা জ্যোৎস্নায় থাকত, তারপর তিনি খেতেন। এইজন্য কৃষ্ণপক্ষের শেষের দিকে শেষরাত্রে খেতে হত তাঁকে।

অমাবস্যার কাছাকাছি খেতেনই না কিছু। কেবল দুধ আর কলা খেয়ে থাকতেন। বর্ষাকালে নাকি রাজপুতানার দিকে চলে যেতেন, কারণ ওসব অঞ্চলে বর্ষার ঘন-ঘটায় নাকি চাঁদ তত ঢাকা পড়ে না, যত পড়ে এ দেশে। তবু যেদিন চাঁদ উঠত না, সেদিন খেতেন না। প্রতাপ সিং অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, তাই তাঁর সম্বন্ধে এ গুজব প্রচলিত ছিল। পৃথিবীর বিখ্যাত সুন্দরীদের সম্বন্ধেও গুজব কম নেই। কেউ নাকি দুধে স্নান করতেন, কেউ নাকি গোলাপজলে। এসব গুজব সত্য কি মিথ্যা তা নির্ণয় করা শক্ত। কিন্তু যে সত্যটা অতি স্পষ্ট সেটা হচ্ছে, যাদের সম্বন্ধে গুজব রটে তারা অসাধারণ লোক। মাঝে মাঝে আমার এ কথাও মনে হয় যে, আসল লোকটাকে আমার হয়তো দেখতেই পাই না কখনও, যে গুজবগুলো তাকে ঘিরে ময়ূখমালা রচনা করে সেইগুলোকেই লোকটার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করি। আমরা আসল সূর্যকে দেখতে পাই না, আসল চন্দ্রকেও না। আমরা যা দেখি তা বিচ্ছুরিত বা প্রতিফলিত রূপ, আসল রূপ নয়। ইতিহাসের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিকে এই গুজব অদ্ভুত রূপদান করেছে। আলেকজান্দার দি গ্রেট, নেপোলিয়ন, মোজেস্, মার্টিন লুথার— এদের সম্বন্ধে বহু গুজব প্রচলিত। শেক্‌পীয়রের কথা আগেই বলেছি, আলেকজান্দার দুমা, বায়রন— এদের সম্বন্ধেও গুজবের অন্ত নেই। জি. বি. এস. একবার রহস্য করে বলেছিলেন, আমার সম্বন্ধে প্রচলিত বহুরকম গুজব আমাকে যে দানবের রূপ দিয়েছে, বিশ্বাস করুন আমি সে দানব নই। আমি আপনাদের মতো মানুষ। নানারকম গুজব শজারুকেও অসাধারণের পর্যায়ে ফেলেছে। একটা শুয়োর-মুখো জানোয়ার সর্বাঙ্গে কাঁটার বোঝা হয়ে বেড়াচ্ছে, কেউ আক্রমণ করতে গেলে সর্বাঙ্গ গুটিয়ে গোল হয়ে প্রকাণ্ড একটা কদম ফুলের মতো হয়ে যায়— এর সম্বন্ধে গুজব তো রটবেই। এ দেশে অবশ্য ওর নামে তত বেশি গুজব নেই, অনেকে কেবল আলুচোর বলে বদনাম দেয় ওর। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেছেন ওরা নিরামিষ জিনিস বড় একটা খায় না। আমিষ জিনিসের উপরই ওদের লোভ বেশি। মড়া পর্যন্ত নাকি খায়। নানারকম পোকা-মাকড়ই ওদের ভোজ্য, বিশেষ করে গুব্‌রে পোকা জাতীয় পোকা খুব প্রিয় খাদ্য ওদের। আলুর ক্ষেতে ওরা সম্ভবত পোকার খোঁজেই আসে। আলুর আলুগুলো খোঁড়াখুঁড়ি করে পোকারই সন্ধানে। ডিম আর পাখির ছানা পেলেও ছাড়ে না। আর এসবই বেচারাদের সংগ্রহ করতে হয় রাতের অন্ধকারে গোপনে গোপনে। এই জন্যেই সম্ভবত ওরা আন্‌পপুলার। কিন্তু ওই চেহারা নিয়ে দিনের আলোয় বেরুলে তো লোকে ঠেঙিয়ে মেরে ফেলবে। তাই ওদের নিশাচর হতে হয়েছে। মানুষের মধ্যেও যাঁরা অসাধারণ তাঁদেরও রাত্রিচর বললে অত্যুক্তি হয় না। প্ল্যাটফর্মবিহারী রাজনৈতিক নেতাদের আমি অসাধারণ ব্যক্তি বলে মনে করি না, তাঁদের মধ্যে যাঁরা অসাধারণ তাঁরা রাজনীতি বা প্ল্যাটফর্মের দৌলতে অসাধারণ হননি, হয়েছেন নিজস্ব প্রতিভাবলে। সাধারণত রাজনৈতিক নেতারা ফেরিওলা জাতীয় লোক, নিজেদের ঢোল নিজেরাই শোরগোল করে বাজিয়ে বেড়ান, সুতরাং দিনের হাটেই তাঁদের হট্টগোল বেশি শোনা যায়। কিন্তু যেসব কবি, যেসব বিজ্ঞানী, যেসব তপস্বী অজানা পথ আবিষ্কার করে অচিন লোকের সন্ধান করেন, যাঁদের নিরন্তর সাধনায় মানবসভ্যতা সমৃদ্ধ, তাঁরা প্রায়ই রাত্রিচর, তাঁদের সাধনার সাক্ষী আকাশের তারা আর রাত্রির দীপ। অন্ধকারের গহনেই আলোর সন্ধান করেন তাঁরা। আমি শজারুকে ওঁদের সঙ্গে একাসনে বসাতে চাই না (সেটা হাস্যকর হবে) কেবল বলতে চাই রাত্রিচর বলেই জীবটি হেয় নয়। আর একটা কথা ভেবেও আমার এতদিন খুব আশ্চর্য লাগতো। লোকে সব রকম জানোয়ারই পোষ মানিয়েছে। বহুকাল আগে একটা ছবিতে দেখেছিলাম এক মেম-

সাহেব কুমীর-টানা গাড়িতে চড়ে বেড়াচ্ছেন। দুটো কুমীরকে পোষ মানিয়েছিলেন তিনি। তারা তাঁর গাড়ি টেনে বেড়াত। সাপ পোষ মানিয়েছে এরকম লোকের খবর ও বাঘভালুক সিংহের পোষ মানার কথা তো আপনিও শুনেছেন নিশ্চয়। ভাবতাম কেউ শজারু পোষে না কেন? সেদিন একটা ইংরেজি প্রবন্ধে এর উত্তর পেয়ে গেলাম। শজারুদের গায়ে নাকি ছোট বড় অসংখ্য মাছি থাকে, ঠিক মাছি নয়, ফ্লি (flea), এর বাংলা কি জানি না। এইজন্যেই ওরা গর্তের ভিতর লুকিয়ে থাকে দিনের বেলা। লুকিয়েও নিস্তার পায় না বেচারারা। ছোট ছোট ফ্লি-রা গর্তের ভিতরও আক্রমণ করে ওদের। অসাধারণত্বের লক্ষণ কিন্তু। বড় বড় প্রতিভাবানদেরও এইরকম অসংখ্য ফ্লির জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়। এরা মানুষ-ফ্লি, চাটুকারের দল। প্রতিভাবানদের ঘাড়ে চড়ে ওরাও নিজেদের জাহির করতে চায় সমাজে।... এই পর্যন্ত লিখে শজারু প্রসঙ্গ থামিয়ে দিতে হয়েছিল। হঠাৎ গাছের উপর থেকে একটা পাখির বাসা পড়ে গেল আমার সামনে। বাসাটায় ভিতর দেখি তিনটি বাচ্চা রয়েছে। শালিক পাখির বাচ্চা। তাদের মা-বাবা আত্মীয়স্বজনরা তারস্বরে মহা চিৎকার জুড়ে দিলে। উঠতে হল। হুইস্‌ল্ বাজিয়ে বেচুকে ডাকলাম। বললাম বাসাটা গাছের উপর তুলে দিতে হবে। বেচু কলকাতার ছেলে, ট্রামে বাসে উঠতে পারে, গাছে উঠতে পারে না। বললে, ''এর আগে গাছে চড়িনি।'' বললাম, ''এর আগে তো তুমি অনেক কিছুই কর নি। আজ তেসরা বৈশাখ সকালে যেখানে এসেছ সেখানে কি আগে এসেছিলে? আসনি। এসে তো বেশ দিব্যি আছ। চেষ্টা করলে গাছেও উঠতে পারবে। এক কাজ কর। তোমার ওই গামছাটায় পাখির সমস্ত বাসাটা তুলে আলতোভাবে বেঁধে ফেল। তারপর আমার কাঁধে পা দিয়ে ওই নীচের ডালটা ধর। ওটা ধরতে পারলে ওঠা সহজ হবে। তারপর বাসাটা গাছের উপরে কোথাও বসিয়ে দিয়ে নেমে এস। কিছুই শক্ত নয়। এস।'' বেচু তবু ইতস্তত করতে লাগল। আবার বললাম, ''ওঠ, নিশ্চয়ই পারবে। ভয় কি, আমি ধরে ফেলব তোমাকে যদি পড়ে যাও।'' তখন বেচু আসল কথাটি কুণ্ঠিতভাবে ব্যক্ত করল। আমার কাঁধের উপর পা দিয়ে সে গাছে উঠতে চায় না। অনেক কষ্টে তাকে অবশেষে রাজি করালাম। বললাম, ''নিজের ছেলেকে তো লোকে কাঁধে দাঁড় করায়। তুমি তো ছেলেরই মতো। তা ছাড়া, তুমি তো অবজ্ঞা করে আমার গায়ে পা দিচ্ছ না। এই তিনটি অসহায় প্রাণীকে বাঁচাতে হবে তো। এর মানে যে অন্য।'' অনেক বলা-কওয়ার পর অবশেষে রাজি হল। গাছে উঠে পাখির বাসাটাকে দুটো ডালের ফাঁকে রেখে নেমে এল সে। কিন্তু কাজ হল না। সে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার পড়ে গেল বাসাটা। তখন বেচুকে বললাম, ''তুমি এক কাজ কর তা হলে, মোটর নিয়ে চলে যাও। বাজার থেকে একটা খাঁচা কিনে নিয়ে এস। খাঁচার ভিতর বাচ্চাগুলোকে পুরে টাঙিয়ে দেওয়া যাক, তা হলে আর পড়বে না।'' বেচুর মনেও একটু উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছিল, সে মোটর হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি বাচ্চাগুলোকে আগলে বসে রইলাম। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি, চারিদিকের প্রকৃতি সম্পূর্ণ উদাসীন, যে গাছটায় বাসাটা ছিল সে এতটুকু বিচলিত হয়নি, ঘাসের ফুলগুলোর হাসিও অম্লান, একদল শালিক পাখি চিৎকার করছে কেবল, আর আমি প্রতীক্ষা করে বসে আছি কখন বেচু ফিরবে। শালিক পাখিগুলোর ভাবভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছিল আমি যে ওদের ভালোর জন্যেই চেষ্টা করছি, এ বোধ ওদের নেই। আমি কেন তাদের বাচ্চাকে আগলে বসে আছি এই তাদের রাগ। দু-একটা পাখি এসে আমাকে ঠোকরাবার চেষ্টাও করতে লাগল। এটা আমি অনেকবার লক্ষ করেছি, আমি যে ওদের বন্ধু, আমি যে ওদের বন্ধুত্ব কামনা করি এটা ওরা কিছুতেই বুঝতে পারে না। সর্বদা আমাকে সন্দেহের চোখে

দেখে। একটু পরে বেচু ফিরল খুব ভালো একটা খাঁচা নিয়ে। খাঁচার মুখটা বড় ছিল। আমি সমস্ত পাখির বাসাটাকেই পুরে দিলাম খাঁচার ভিতর। ওরা খড়কুটো দিয়ে যেমন নরম বিছানা তৈরি করে আমরা তেমন পারি না। বাসাটা সুদ্ধ দেওয়াতে বাচ্চাগুলো বেশ আরামেই থাকবে মনে হল। খাঁচার কপাটটা খুলে দিলাম বেশ ভালো করে। খুলে বেঁধেও দিলাম, যাতে বন্ধ না হয়ে যায়। তারপর বেচু আবার আমার কাঁধে চড়ে খাঁচাটা টাঙিয়ে রেখে এল গাছে। তখন বেচুকে বললাম, "বেচু, চল এইবার আমরা সরে পড়ি। আমরা এখানে থাকলে ওদের মা-বাপ ওদের কাছে ভিড়বে না। চল, আমরা একটু দূরে সরে গিয়ে দেখি ওরা কি করে। দুরবীনটা গাড়িতে আছে, তাই দিয়ে বেশ দেখা যাবে।" তাই করলাম। একটু দূরে গিয়ে দূরবীন দিয়ে দেখতে লাগলাম খাঁচাটাকে। প্রথম কিছুক্ষণ পাখি দুটো (মা-বাবা) খাঁচাটাকে একটু সন্দেহের চক্ষে দেখতে লাগল, ভাবতে লাগল, ফাঁদ বুঝি। উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগল আশেপাশে। প্রায় আধ ঘন্টা পরে দেখলাম একটা পাখি ঢুকেছে খাঁচার মধ্যে। আর একটু পরে দেখলাম বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছে। নিশ্চিন্ত চিত্তে বাড়ি ফিরে গেলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর সাধারণত একটু বিশ্রাম করি। কিন্তু সেদিন আর বিশ্রাম করা হল না। বেচুকে বললাম, চল দেখে আসি ওদের নূতন গৃহস্থালি কি রকম চলছে। প্রায় দশ মাইল পথ আবার মোটরে করে গেলাম। গিয়ে হতাশ হতে হল। গিয়ে দেখি খাঁচা নেই, কে নামিয়ে নিয়ে গেছে। পাখিগুলোও নেই, একটা রুক্ষ নীরবতা আচ্ছন্ন করে আছে চারিদিক। গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। যে ছোট তিনটি গাছের কথা আগে লিখেছি সেইগুলির কথা মনে পড়ল। ডাক্তারী জীবনে এটা বরাবর উপলব্ধি করেছি, সেদিন আবার একবার করলাম, আমি কাউকে বাঁচাব ইচ্ছে করলেই সে বাঁচে না, সে যদি বাঁচবার হয়, তবেই বাঁচে। তবু হতাশ হলে চলবে না, যখনই সুযোগ পাব তখনই বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে আর একটা কথা মনে হল। আমি এতক্ষণ ধরে যা করলাম, খবরের কাগজের ভাষায়, তা উদ্বাস্তু-সমস্যা-সমাধান-প্রচেষ্টা। কিন্তু আমার প্রচেষ্টা সফল হল না। সেজন্য আমার দুঃখ হয়েছে, কিন্তু অনুতাপ হয়নি। কারণ আমি নিজের স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ওদের উদ্বাস্তু করবার চেষ্টা করিনি। লক্ষ লক্ষ লোককে গৃহহারা আত্মীয়হারা করে যারা একটা খণ্ডিত স্বাধীনতার নামে আজ আত্মরতিতে উন্মত্ত, তাদের প্রতি লক্ষ কণ্ঠের যে অভিশাপ বর্ষিত হচ্ছে, সে অভিশাপ আমাকে কুড়োতে হয়নি। কিন্তু এটা লিখেই মনে হল, কে বললে হয়নি। তুমি যখন ওই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলে, তাদের ভালো করবার চেষ্টায় নানারকম ফন্দি আঁটছিলে তখন তাদের মা-বাবা আত্মীয়-স্বজনরা চারিদিকে উড়ে উড়ে তারস্বরে যে চিৎকারটা করছিল তাকে আর যাই বল আশীর্বাদ বা বাহবা বলা যাবে কি? মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। সত্যিই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছি না কোথাও।"

সেদিন মাঠ থেকেই ডাক্তারবাবুকে ফিরতে হল ল্যাবরেটরিতে। বেচুকে বললেন, "একটু জোরে চালাও বেচু, সাড়ে পাঁচটার সময় একটি লোককে আসতে বলেছি।"

সেই হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক শুক্র নিয়ে বসেছিলেন। সেটি পরীক্ষা করে ডাক্তার মুখার্জি গম্ভীর হয়ে গেলেন।

"কি দেখলেন ডাক্তারবাবু?"

"আপনার ছেলে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আপনি যখন বিয়ে করেছিলেন তখন বহু বিবাহের সম্বন্ধে আইন ছিল না সম্ভবত।"

"আজ্ঞে না। একজনেরও ছেলে হবে না?"

"হবে কি করে? আপনিই যে বাঁজা। এক কাজ করুন।"

"হাঁ হাঁ, কি বলুন—"

"ওরা যদি রাজি থাকে ওদের চারজনকেই আইনত মুক্তি দিন আপনি। চেষ্টা করুন যাতে ওদের আবার বিয়ে হয়।"

ভদ্রলোকের মুখটা একটু 'হাঁ' হয়ে গেল।

"কি বলছেন আপনি সার? এই পরামর্শ নেবার জন্য অত দূর থেকে আপনার কছে এলাম! ওষুধ দেবেন না?"

"এ অবস্থায় যা সবচেয়ে সমীচীন সভ্য উপায় তাই আপনাকে বললাম। আপনাকে এখনি পাঁচ শ' টাকা দামের প্রেসকৃপশন্ লিখে দিতে পারি। পেটেন্ট ওষুধের অনেক ফর্দ আছে আমার কাছে। সেগুলো টুকে দেওয়া কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু আমি জানি ও সবে কিছু হবে না। তাই আর ওষুধ দেওয়ার চেষ্টা করলাম না।"

"আমার স্ত্রীদের একটু দেখবেন না? নিয়ে আসব তাদের?"

"না, যেখানে seed নেই, সেখানে soil দেখে কি হবে?"

"তা হলে আমার কোনো আশা নেই?"

"ভগবান দয়া করলে, আছে। আমাদের হাতে কিছু নেই। ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করুন, আর সংযম করে থাকুন বছরখানেক। হয়তো miracle হয়েও যেতে পারে।"

"আমার অনুরোধ আমাদের স্ত্রীদের একবার দেখুন। বড়টা অকালে বুড়ো হয়ে গেছে, মেজোটার তলপেটে অসহ্য ব্যথা, সেজোটার ফিট হয়, ছোটটার বুকে ব্যথা—"

"মাপ করবেন। আমি ওদের চিকিৎসা করতে পারব না। ওদের অসুখের কারণ আপনি। আপনার কবল থেকে ওরা যদি মুক্তি পায়, আপনিই ভালো হয়ে যাবে।"

"একবার দেখতে ক্ষতি কি?"

"না, আমার সময় নেই। আমাকে এখনি ট্রেন ধরতে হবে।"

ডাক্তারবাবু উঠে পড়লেন।

।। চোদ্দো ।।

ভাগ্যক্রমে সেদিন চারটে বার্থ-ওলা একটা পুরো ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট পেয়ে গেলেন সুঠাম ডাক্তার। চারটে টিকিট কিনে পুরো কামরাটাই দখল করলেন তিনি। রকেটকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, কামরায় অন্য প্যাসেঞ্জার থাকলে অসুবিধা হত। দুর্গার জন্যও তিনি একখানা ফার্স্ট ক্লাস টিকিটই কিনেছিলেন, কিন্তু দুর্গা একটা থার্ড ক্লাস গাড়িতে গিয়েই উঠল। বললে, তার একজন দোস্ত থার্ড ক্লাসে যাচ্ছে। আসল কথা, ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে মুখোমুখি বসে যেতে তার আপত্তি, বিড়ি খেতে পাবে না। রকেটকে নিয়েই ডাক্তারবাবু উঠলেন খালি কামরাটাতে। ঘোঘা বেশি দূর নয়। তিনটে স্টেশন মাত্র। তাই তিনি গাড়ির দরজা আর 'লক' করলেন না। গাড়িটা ছাড়তেই কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে উঠে পড়ল ডাক্তারবাবুর গাড়িতে। আর তার পিছু পিছু দৌড়তে দৌড়তে এলেন মিস্টার সেন।

চিৎকার করে বললেন, "ডাক্তারবাবু, আমার মেয়ে রাগ করে পালাচ্ছে, ওকে পরের স্টেশনে নামিয়ে দেবেন, আমি গাড়ি নিয়ে সেখানে যাচ্ছি।"

ডাক্তার মুখার্জি এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। মিস্টার সেন আর তাঁর মেয়েকে তিনি দূর থেকে দুচারবার দেখেছেন, কিন্তু এঁদের কারো সঙ্গে তাঁর ভালো করে আলাপ ছিল না। গণেশ হালদারের চাকরির ব্যাপারে মিস্টার সেন তাঁর উপর একটু অসন্তুষ্ট এ খবরটাও তিনি শুনেছিলেন। তাই আর ওঁদের সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টাও করেননি।

অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তিনি তনিমা সেনের দিকে। সে হাঁপাচ্ছিল। কাপড়-চোপড়ও বিস্রস্ত হয়ে পড়েছিল তার। ডাক্তার মুখার্জির মনে হল তার গা থেকে মদের গন্ধও ছাড়ছে। তনিমা ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই রকেট ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করে উঠেছিল একবার, কিন্তু ডাক্তার মুখার্জির ধমক খেয়ে চুপ করে বসল আবার কোণে গিয়ে। কিন্তু একটু পরেই সে উঠে এসে শুঁকতে লাগল। তনিমা চিৎকার করে উঠল, বেঞ্চিতে দাঁড়িয়ে উঠে বলতে লাগল "ওকে সরে যেতে বলুন। আমার বড্ড ভয় করছে। সরিয়ে নিন, সরিয়ে নিন ওকে।"

আদেশ করতেই রকেট গিয়ে আবার কোণে বসল।

"ও কিছু বলবে না আপনাকে। ওরা অচেনা লোক দেখলেই শোঁকে। আপনি ভালো করে বসুন। ও কিচ্ছু বলবে না।"

তনিমা চোখ পাকিয়ে বলল, "আপনি গাড়ির ভিতর একটা বাঘের মতোন কুকুর নিয়ে যাচ্ছেন, এটা কি বে-আইনী নয়?"

"এই কম্‌পার্টমেন্টের চারটে বার্থই আমার রিজার্ভড্। আপনিই বে-আইনী কাজ করেছেন। আপনি চলন্ত ট্রেনে দৌড়ে উঠেছেন এবং যে বার্থটার উপর বসেছেন সেটা আপনার নয়, রকেটের। সুতরাং রকেটের আপত্তি করবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে।

রকেট কান খাড়া করে বিস্ফারিত চক্ষে সব শুনছিল। মনে হচ্ছিল সে যেন ডাক্তার মুখার্জির প্রতিটি কথা বুঝতে পারছে। তাঁর কথা শেষ হতেই সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাইল তনিমার দিকে, তার গলা থেকে গররর্ করে শব্দেও বেরুল একটা। সে যেন বুঝতে পারল ডাক্তার মুখার্জি তনিমাকে বক্‌ছেন।

"রকেট, বি কোয়ায়েট অ্যান্ড সিট ডাউন প্রপারলি।"

রকেট ইংরেজি বেশ বোঝে। সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত থাবা দুটোর উপর মুখটা রেখে বসল। বকুনি খেয়ে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল যেন। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল একটা। ডাক্তার মুখার্জির দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখল একবার। বুকের ভিতর থেকে অন্তর্নিরুদ্ধ একটা ক্ষোভও যেন বাঙ্ময় হতে চাইল। কিন্তু আর সে ঘেউ ঘেউ করল না।

তনিমা রকেটের দিকে চেয়ে বলল, "ও তো আপনার কথা খুব শোনে দেখছি। আমাকে আর কিছু বলবে না?"

"না।"

"ওই বাঘের মতো কুকুরকে কি করে বশ করলেন? খুব ট্রেনিং দিয়েছেন বুঝি? একজনকে দেখেছি কুকুর কথা না শুনলে বেত মারত।"

"হ্যাঁ, ট্রেনিং দিয়েছি। তবে ট্রেনিং-এর আসল কথা বেত নয়, ভালোবাসা। ওরা ভালো জাতের কুকুর, ভালোবাসার মর্ম বোঝে। যে ভালোবাসে তার কথা শোনে।"

"তাই নাকি?"

তনিমা বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রকেটের দিকে। ডাক্তার মুখার্জির মনে হল নিতান্ত ছেলেমানুষ মেয়েটি। রাগ করে বাড়ি থেকে পালাচ্ছে? কেন? কিছুক্ষণ কোনো কথা হল না। চলন্ত ট্রেনের দোলানিতে দু জনেই একটু একটু দুলতে লাগলেন নীরবে।

সুঠাম মুখার্জি তারপর প্রশ্ন করলেন, "আপনি কোথায় যাবেন?"

"কোলকাতা। আপনি?"

"আমি ঘোঘায় নামব। তিনটে স্টেশন পরে।"

"এর জন্যে চারটে বার্থ রিজার্ভ করেছেন?"

"তা না হলে রকেটের কষ্ট হত।"

রকেটের নাম করা মাত্র রকেট খাড়া করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল ডাক্তার মুখার্জির দিকে। তারপর আবার থাবায় মুখ রেখে বসল।

"Dog Box-এ অনেকে কুকুর নিয়ে যায়। কিন্তু তাতে কুকুরের কষ্ট হয় খুব।"

এ কথা শুনে তনিমা ঘাড়টি ঈষৎ বেঁকিয়ে স্মিতমুখে চেয়ে রইল ডাক্তার মুখার্জির দিকে। তারপর যা বলল তা সাধারণ সভ্য কোনও মেয়ে অত স্বল্প পরিচয়ে বলতে পারত না।

"আপনার অনেক টাকা আছে বুঝি?"

এ কথা শুনে সুঠাম মুকুজ্যে রাগ করলেন না, কৌতূহলী হলেন। এই কথাগুলিতে তিনি যে এই অপ্রকৃতিস্থ মেয়েটির আসল রোগের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করলেন। তাঁর ডাক্তারি মন এতে অপ্রসন্ন হল না, উৎসুক হয়ে উঠল। তাঁর মন যেন বলে উঠল—এই তো রোগ ধরা পড়েছে। একে সারানো যায় না?

হেসে উত্তর দিলেন, "অনেক টাকা কোথায় পাব? তবে মোটামুটি সুখে থাকবার মতো সঙ্গতি আছে।"

এ কথায় তনিমা যেন সন্তুষ্ট হল না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে রইল বাইরের অন্ধকারের দিকে। ট্রেন চলতে লাগল, ডাক্তারবাবুও কয়েক মিনিট কিছু বললেন না। কি বলবেন ভেবে পেলেন না। তারপর তাঁর হঠাৎ মনে পড়ল মিস্টার সেন ওকে পরের স্টেশনেই নামিয়ে দিতে বলেছেন।

"পরের স্টেশন তো এসে পড়ল, আপনার বাবা বলে গেলেন পরের স্টেশনে আপনাকে নামিয়ে দিতে।"

"আমি কি একটা লগেজ (luggage) যে নামিয়ে দেবেন? আমি কিছুতেই নামব না। আপনি বললেই আমি নেবে যাব? ইস্।"

"আগেই আপনাকে বলেছি, সমস্ত কামরাটা আমি রিজার্ভ করেছি। রাত্রি নটা বেজে গেছে। পরের স্টেশনে গার্ডকে ডেকে বললেই সে আপনাকে নামিয়ে দেবে।"

"আমি কিছুতেই নামব না। আপনি গার্ডকে খবর দিলেই আমি সায়ানাইড খাব। আমার সঙ্গে সায়ানাইড আছে।"

"আপনি সায়ানাইড খেলে পুলিশকেও খবর দিতে হবে। তারা আপনাকে টানাটানি করে নিয়ে যাবে একটা হাসপাতালে। হাসপাতালে আপনার মুখের ভিতর নল চালিয়ে stomach wash করবে, তারপর আপনাকে জেলে নিয়ে যাবে, আপনি আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছিলেন বলে

আপনার শাস্তি হবে। আমার অনুরোধ, এত হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়ে আপনি বাবার সঙ্গে ফিরে যান। এখন রাগ আছে বলে এ কথা বলছেন, কিন্তু রাগ বেশিক্ষণ থাকবে না।"

"বাবা হলে ফিরে যেতাম। কিন্তু ও বাবা নয়, রাক্ষস। আমি যক্ষপুরী থেকে পালিয়ে যাচ্ছি। আপনি বাধা দেবেন না, আপনি আমাকে বাঁচান, শুনেছি আপনি খুব ভালো লোক। আমার কেউ নেই—"

হঠাৎ তনিমা কেঁদে ফেলল। চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়বে এটা সে-ও ভাবতে পারেনি। অপ্রস্তুত হয়ে অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ে রইল।

"কাউকে বাঁচাবার সাধ্য কারো নেই। আমি অনেককে বাঁচাবার চেষ্টা করেছি, পারিনি। তবে আমি চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু বাঁচাবই এ স্পর্ধা আমার নেই, এ প্রতিশ্রুতিও আমি দিতে পারি না।"

"আপনি চেষ্টা করবেন?"

ঘাড় ফিরিয়ে সাগ্রহে প্রশ্ন করল তনিমা। সুঠাম মুকুজ্যে দেখলেন তার চোখের জলে আশার আলো ঝলমল করছে।

"আগে সব শুনি, তারপর বলতে পারব। কিন্তু তার আগে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। আপনার সঙ্গে আগে আমার পরিচয় হয়নি। আমার সম্বন্ধে খুব সম্ভবত আপনি বিশেষ কিছু জানেন না। আমাকে বিশ্বাস করে আপনি আপনার সব কথা বলবেন কি করে? বলবেনই বা কেন?"

"আমি আপনার বিষয়ে অনেক কথা জানি। ঝিনুকদি আমাকে বলেছেন, আর ঝিনুকদি শুনেছেন গণেশবাবুর কাছে, যিনি আপনার বাড়িতে থাকেন।"

"ঝিনুকদি কে?"

"ডাক্তার ঘোষালের রাঁধুনী। গণেশবাবুর সঙ্গে ওঁর বোধ হয় আত্মীয়তা আছে।"

"ও!"

ডাক্তার মুখার্জি চুপ করে গেলেন। ভাবতে লাগলেন এত বড় একটা ঝুঁকি তিনি নেবেন কিনা। কোনো কিছুর ভার নিলে সেটা সম্পূর্ণভাবে বহন করবার চেষ্টা করেন তিনি। আর একটি মেয়ের কথা মনে পড়ল, তার ভার নিয়েছিলেন, কিন্তু তার সমস্যার সমাধান এখনও করতে পারেননি।

গাড়ির গতি ক্রমশ মন্থর হয়ে এল। তারপর হুইস্‌ল শোনা গেল। পরের স্টেশন এসে পড়েছে।

"স্টেশন তো এসে পড়ল। কি করবেন আপনি?"

"আমি বাথরুমে ঢুকে খিল দিয়ে দিচ্ছি। কেউ যদি আসে বলবেন, আমি নেমে গেছি।"

তনিমা ঢুকে পড়ল বাথরুমে।

গাড়ি স্টেশনে থামতেই ডাক্তার মুখার্জি উঠে জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালেন। কাউকে দেখতে পেলেন না। মিস্টার সেন সম্ভবত এসে পৌঁছতে পারেননি। স্টেশনে স্টপেজ খুব কম। মিনিট দুই-এর বেশি নয়। ডাক্তার মুখার্জি এদিক-ওদিক দেখলেন। না, মিস্টার সেন আসেননি। মিনিট দুই পরে গার্ডসাহেবের হুইস্‌ল শোনা গেল। ট্রেন চলতে আরম্ভ করতেই তনিমা বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে।

"স্টেশনে আপনার বাবাকে দেখলাম না।"

"সম্ভবত পৌঁছতে পারেননি। তবে তিনি যে চেষ্টা করেছেন এতে সন্দেহ নেই। এবার বোধ হয় থানায় যাবেন।"

"বাড়িতে আপনার মা আছেন?"

"না। আমার আপন মা নেই। ভাই-বোনও নেই। আমার সৎমা আছেন, তিনি পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী।"

"এ অবস্থায় আপনি বাড়ি থেকে চলে এলেন? ছি, ছি, অন্যায় করেছেন। মিস্টার সেনের খুব কষ্ট হবে।"

"হবে। তবে আমার জন্য ততটা নয় যতটা অন্য কারণে।"

"অন্য আর কি কারণ থাকতে পারে?"

তনিমা মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। তারপর হঠাৎ কাপড়ের ভিতর থেকে একটা নোটের বাণ্ডিল বার করে বললে, "এই কারণে। এ টাকাটা এবার তাঁকে দিইনি।"

"কোথা পেলেন আপনি এত টাকা?"

অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন সুঠাম মুকুজ্যে। তাঁর একবার সন্দেহ হল, চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে না তো?

তনিমা ভুরু নাচিয়ে উত্তর দিল, "রোজগার করেছি। আমি যে রোজগারী মেয়ে।"

বলেই হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়ল সে।

"বরাবর রোজগার করে তাঁর হাতে টাকা তুলে দিয়েছি। এবার দিইনি। এবার টাকাটা নিয়ে পালিয়ে এসেছি। টাকার জন্যেই তিনি ছুটে এসেছিলেন স্টেশনে, আমার জন্যে নয়।"

তনিমা পাগলের মতো হি হি করে হাসতেই লাগল। হাসির বেগে তার সারা দেহটা ঝুঁকে ঝুঁকে পড়তে লাগল সামনের দিকে। হয়তো মদ খেয়েছিল বলেই হাসির বেগ থামাতে পারছিল না সে।

সুঠাম মুকুজ্যে অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন।

"কোলকাতায় কোথায় উঠবেন।"

"হোটেলে।"

"এতগুলো টাকা নিয়ে হোটেলে ওঠা কি নিরাপদ? কোলকাতা যাচ্ছেন কেন?"

"আর কোথায় যাব? ওই শহরেই তো সব সমস্যার সমাধান মেলে।"

"সমস্যাটা কি?"

তনিমা অধোমুখে বসে রইল। তার মুখে যেন বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে এল একটু। তার ঠোঁট দুটি দু-একবার নড়ে উঠল, কিন্তু বলি বলি করেও কথাটা সে বলতে পারল না। আড়চোখে ডাক্তার মুখার্জির দিকে চেয়ে দেখল, তিনি একাগ্র দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

"ও কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। আমি বলতে পারব না।"

ডাক্তার মুখার্জি হেসে বললেন, "শোনবার আগ্রহও আমার নেই। তবে আপনাকে যদি সাহায্য করতে হয় আপনার সব কথা অকপটে আমাকে বলতে হবে। তা না হলে কিছু করতে পারব না। আপনি তা হলে ভালো করে শুয়ে পড়ুন। মাঝে একটা স্টেশন, তারপর আমিও নেমে যাব।"

"আপনি রুগী দেখতে যাচ্ছেন বুঝি?"

"না। শজারু দেখতে যাচ্ছি।"

"শজারু!"

"হ্যাঁ, জন্তু-জানোয়ার দেখার শখ আমার আছে। খবর পেয়েছি ঘোঘার কাছে মাঠে এক জায়গায় শজারুর গর্ত আছে। শজারুটা রাত্রে গর্ত থেকে বেরোয়। তাকেই দেখতে যাচ্ছি।"

"সারা রাত মাঠে মাঠে ঘুরবেন?"

"দরকার হলে ঘুরব। তবে সেখানে রাত্রে থাকবার মতো একটা আস্তানা ঠিক করেছি। আমার এক বন্ধুর বাড়ি খালি পড়ে আছে। শজারু পর্ব শেষ করে সেখানেই যাব।"

উৎসাহে জ্বলজ্বল করে উঠল তনিমার চোখ দুটো। সে যেন অকূলে কূল পেল।

"আমাকে নিয়ে যাবেন? বুনো শজারু কখনও দেখিনি।"

সুঠাম মুকুজ্যে স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন তার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত। তাঁর মনে হল—নিতান্তই ছেলেমানুষ।

"বেশ চল। ভয় পাবে না তো?"

"না, আমার কিছু ভয় করবে না। আপনি তো সঙ্গে থাকবেন?"

স্নিগ্ধ হাসিতে সুঠাম মুকুজ্যের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। রাস্তায় এরকম সাথী জুটে যাবে তা ডাক্তার মুখার্জি প্রত্যাশা করেননি। তাঁর নিজের ব্যবহারেও তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন একটু। অজানা অচেনা একটা যুবতী মেয়েকে নিয়ে রাত্রে মাঠে মাঠে ঘোরাফেরা করলে যে অনিবার্য কুৎসা তাঁর নামে রটবে তা জেনেও তিনি বেশ রাজি হয়ে গেলেন তো! গেলেন, তার কারণ কুৎসাকে তিনি ভয় খান না। তিনি জানেন, কিছু না করলেও লোকে তাঁর নামে কুৎসা রটায়। কুৎসার ভয়ে কোনও সৎ কাজ থেকে তিনি পেছিয়ে যাবেন এত ভীতু তিনি নন। এ মেয়েটিকে দেখে তাঁর শুধু যে অনুকম্পা হয়েছিল তা নয়, তাঁর কৌতূহলী বিজ্ঞানী মন উৎসুকও হয়ে উঠেছিল। এমন একটা সুন্দর ফুল নর্দমায় কি করে পড়ল? ওকে নর্দমা থেকে তুলে পূজার বেদীতে স্থাপন করা কি একেবারেই অসম্ভব?

এই সব কথাই বারবার ঘুরে বেড়াচ্ছিল তাঁর মনে। এই প্রশ্নের উত্তরও খুঁজছিলেন তিনি। শেষে ঠিক করে ফেললেন, চেষ্টা করে দেখতে হবে। হঠাৎ ঝুঁকে বেঞ্চির নীচে থেকে একটা বাক্স বার করে খুলে ফেললেন সেটা। তার থেকে বেরুল একটা লম্বা টর্চ, একটা ক্যামেরা, একটা রিভলভার, কয়েকটা নানা মাপের কৌটো, গগল্স্, চশমা, ঘড়ি, বাইনাকুলার, কয়েকটা ওষুধের শিশি। তারপর তিনি একটা কাগজের প্যাকেট বার করে বললেন, এই যে আছে। বলেই সেটা ছুঁড়ে দিলেন তনিমার দিকে।

"কি এটা?"

"রবারের বালিশ। আমার একটা বিছানা আছে, সেটা দু'জনে ভাগ করে নেওয়া যাবে। কিন্তু বালিশ মাত্র একটি আছে বিছানায়। এটা আমার emergency box, ওতে নানারকম জিনিস থাকে। হঠাৎ মনে হল ওতে একটা রবারের বালিশ থাকতে পারে, অনেকদিন আগে কিনে রেখেছিলাম। দেখুন, কেমন কাজে লেগে গেল আজ। রবারের বালিশে শুতে পারবেন তো? আপনি না পারেন আমি পারব।"

শিশু-সুলভ অকৃত্রিম হাসিতে আলোকিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ।

"এই টাকাটাও রেখে দিন আপনার বাক্সে।"

"কত টাকা আছে?"

"পাঁচ হাজার।"

ডাক্তার মুখার্জি ক্ষণকাল কি ভাবলেন। তারপর বললেন, "আচ্ছা দিন।"

ঘোঘার আগের স্টেশনেই দুর্গা এসে গাড়িতে উঠল।

"দুর্গা, আমরা একজন সঙ্গী পেয়ে গেছি। সেন সাহেবের মেয়েও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। খাবারে কুলুবে তো? না কুলোয়ে তো ঘোঘা স্টেশনে কিছু কিনে নিস।"

"খানা বহুত ছে।"

(খাবার অনেক আছে)

"বিছানা কি রকম আছে? দু'জনের হয়ে যাবে?"

"হাঁ।"

সুঠাম মুকুজ্যে জানতেন হয়ে যাবে। দুর্গা যখন সঙ্গে থাকে তখন সব জিনিসই সে বেশি বেশি নেয়। গ্রীষ্মকালেও লোটা-কম্বলের বোঝা বইতে তার আপত্তি নেই। তার যুক্তি বিদেশে 'বখতপর' (কাজের সময়) কখন কি দরকার হয় বলা যায় কি? ডাক্তার মুখার্জি যখন বাইরে বেরোন, তখন তাই বিরাট মোটঘাট তাঁর সঙ্গে থাকে।

তাঁর কম্‌পার্টমেন্টটা দৈবক্রমে ইনজিনের ঠিক পাশেই ছিল। ঘোঘায় যখন মোটঘাট নামানো হচ্ছিল তখন ইনজিনের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে সুবেদার খাঁ দেখলেন ডাক্তারবাবুকে।

"আদাব ডাক্তার সাহেব।"

"আদাব। ও আপনি! আপনি ড্রাইভার নাকি? কতদূর যাবেন?"

"আমি সাহেবগঞ্জ থেকে ফিরব।"

"ও, তা হলে তো ভালোই হল! যদি পারেন মিস্টার সেনকে খবর দিয়ে দেবেন যে, আমি তাঁর মেয়েকে এখানে নামিয়ে নিয়েছি। সাবোরে তাঁকে দেখতে পেলাম না।"

"ও, আচ্ছা।"

সুবেদার খাঁ বক্রদৃষ্টিতে তনিমার দিকে চাইলেন। তার স্বরূপ অজ্ঞাত ছিল না তাঁর। ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে এ মেয়েকে দেখবেন প্রত্যাশা করেননি তিনি। বিস্মিত হলেন একটু। ট্রেন ছেড়ে দিল।

ঘোঘা নালার ধারে অন্ধকারে একটা বড় গাছের তলায় ডাক্তার মুখার্জি বসেছিলেন। গাছতলায় অন্ধকার ছিল বটে, কিন্তু বাইরে জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছিল। কিছু দূরে আর একটা গাছতলায় বসেছিল রকেটকে নিয়ে। তনিমা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। ডাক্তার মুখার্জিকে অকপটে সব খুলে বলেছিল সে। শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তার অবিশ্বাস্য কথাগুলো তখনও তাঁর কানে বাজছিল।

"আমাকেই টোপের মতো ব্যবহার করতেন বাবা। আমাকে তাঁর ওপর-ওলার কাছে বলি দিয়েছিলেন বলেই তাঁর চাকরিতে উন্নতি। আমার রোজগারের টাকাতেই তিনি দামি দামি মদ কিনেছেন; আমার টাকাতেই কিনেছেন নিত্যনূতন বিলাস-সঙ্গিনী। মুনাফাখোর লম্পট ধনী দুরাত্মাদের কাছ থেকে টাকা যোগাড় করতে আমি গেছি। তথাকথিত সংস্কৃতি-বৈঠকে নেচে গেয়ে গুলজার করেছি আমি, আর গভীর রাত্রে সেই বৈঠকের পাণ্ডার কাছে গিয়ে ভালোবাসার অভিনয় করে টাকা আদায় করে এনেছি। এক আধ টাকা নয়, অনেক টাকা। ডাক্তার ঘোষাল চোরা-বাজার থেকে টাকা রোজগার করেন, বাবা সে কথা জানেন, কিন্তু ডাক্তার ঘোষালকে পুলিশে ধরিয়ে দেননি তিনি। আমাকে পাঠিয়েছেন ভুলিয়ে তাঁর কাছ থেকে টাকাটা আদায়

করে আনতে। বাবার বন্ধুরাই আমাকে মদ খেতে শিখিয়েছেন, মাতাল হলে আমার মুখ থেকে যেসব কথা বেরোয় তা নাকি তাঁদের শুনতে ভারী ভালো লাগে! বাবা এতে আপত্তি করেননি। কারণ যে সমাজে তিনি মেশেন সে সমাজে মদ না খেলে, খারাপ কথা না বললে "অছ্‌ছুত" হয়ে থাকতে হয়। সে সমাজে মদ খাওয়াটা শুধু ফ্যাশন নয়, প্রয়োজন।

"আমি ধাপে ধাপে নেমে গেছি, বাবাই আমাকে হাত ধরে নামিয়েছেন, আর আমার সৎমা যিনি আজ পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী তিনি আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু আমি আর পারলাম না। একটা দৈত্যের মতো লোক সেদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিল, তার ঠোঁটে ধবল, মুখটা সিংহের মতো। সে আমার দিকে এমনভাবে চাইছিল যেন তখুনি আমাকে গিলে খাবে। সে খুব বড় চাকরি করে, বড় ডিগ্রীও নাকি আছে, অনেক টাকা মাইনে পায়। তার নেকনজরে পড়লে বাবার চাকরিরও উন্নতি হবে। সে লোকটা হঠাৎ বলল, তোমার মেয়েকে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি করব। যা মাইনে চায় তাই পাবে। সে চলে যাওয়ার পর থেকে বাবা আমাকে ক্রমাগত তার কাছে যেতে বলছেন। আমি বললাম, ও লোকটা কুঠে, ওর কাছে আমি যাব না। বাবা কিন্তু না-ছোড়। কাল থেকে জোরজবরদস্তি শুরু হয়েছে। তাই পালিয়ে এসেছি..."

তনিমার কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। সুঠাম মুকুজ্যের মনে হচ্ছিল তিনি বহু দূর অতীতে ফিরে গেছেন যেন, ইতিহাসের বিস্মৃতপ্রায় এক অধ্যায় যেন মূর্ত হয়েছে তাঁর চোখের সামনে। তিনি যেন এক ধর্ষিতা ক্রীতদাসীর কান্না শুনছেন। তাঁর মনে হচ্ছিল দাস-বিক্রয় প্রথা উঠে যায়নি, তার বাইরের চেহারাটা বদলেছে কেবল। কামের দাস, লোভের দাস, অহঙ্কারের দাস, মানুষ আগে যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে, কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার উপায়টা শুধু বদলেছে। সেকালকার মানুষের একটা ধর্মভয় ছিল, কুসংস্কারবশত তারা অনেক সময় নিরস্ত হত, এখন ধর্মহীন কুসংস্কারমুক্ত পাষণ্ডেরা যা খুশি করছে। ষড়রিপুর প্রভুত্বটা অনেক বেড়েছে আজকাল, এখন সমাজে ওরাই প্রভু, ওদের ব্যবসাই বৃহত্তম ব্যবসা, সে ব্যবসার বিজ্ঞাপন আজ সিনেমার ছবিতে, শিল্পীর তুলিতে, সাহিত্যিকের লেখায়, বিজ্ঞানের আবিষ্কারে, নেতাদের আস্ফালনে। চারিদিকেই ফাঁদ পাতা। প্রলুব্ধ, কামুক, লোভী, ক্ষুধিত নর-নারীর দল ছুটে চলেছে সেই নিষ্ঠুর ফাঁদে ধরা দেবে বলে। মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শের কথা আজ শুধু কেতাবের পাতায় লেখা আছে, মানুষের জীবনে আর নেই। আজকাল তথাকথিত সভ্য দেশেও ভ্রূণ হত্যার সংখ্যা লক্ষ লক্ষ, পাগলা গারদের সংখ্যা বাড়িয়েও সব পাগলাদের জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না, ওষুধের বাজারে ট্র্যাংকুইলিজারের চাহিদা সব চেয়ে বেশি। অত ওষুধ গিলেও কারও শান্তি নেই। তবু ওদেরই আমরা নকল করছি। নবযুগের ক্রীত দাস-দাসীদের অন্তর্নিহিত যন্ত্রণার রূপও নবরূপ ধারণ করেছে। ঢাকা পড়ছে না তা বাহ্যিক বিলাসের আড়ম্বরে, ফুটে বেরুচ্ছে রুজ-পাউডার লিপস্টিকের প্রলেপ ভেদ করে। মধ্যবিত্ত বাঙালী আজ বিত্তহীন নিঃস্ব। কেরানিগিরি করা ছাড়া আর কিছু করবার সামর্থ্য তার নেই। সে কেরানিগিরিও আজ তার কাছে দুর্লভ। ক্ষুধার জ্বালায়, লোভে, মোহে তাই আজ সে আত্মবিক্রয় করছে দুরাত্মা ধনীর কাছে। নানাভাবে করছে? না করে তার উপায় নেই। প্রাচীন সমাজ আজ একটা বিরাট পোড়োবাড়ির মতো জীর্ণ হয়ে গেছে, সেখানে এখন চামচিকে বাদুড়ের বাস। যেসব সুন্দর নিয়ম একদা এই সমাজকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, সে-সব নিয়মও আজ জীর্ণ, সে সবের উপরে আর কারো আস্থা নেই। ব্রাহ্মণের ছেলেদেরও আজকাল সময়ে উপনয়ন হয় না, ঘরে ঘরে

অবিবাহিতা কুমারীর দল নানা রঙে সেজে, নানা ঢঙে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারও মুখে আনন্দের আভা নেই, সকলেই বিমর্ষ, সকলেই খুঁজছে উপার্জনের পথ। যেন-তেন প্রকারেণ উপার্জন করতে হবে তাদের। নগদ টাকা না পেলে তারা বাঁচতে পারবে না। তাদের চরিত্রকে সুগঠিত করবার দায়িত্ব কেউ নেইনি। পিতামাতারাও এ বিষয়ে উদাসীন। শিক্ষকরাও। শিক্ষকদের কিছু করবার ক্ষমতা নেই। তাঁরা সামান্য কেরানির মতো স্কুলে চাকরি করেন মাত্র। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য পয়সা রোজগার করা আর উপরওয়ালাকে সন্তুষ্ট রাখা। নীতির দণ্ড ধারণ করবার শক্তি তাঁদের বাহুতে নেই, মনেও নেই বোধ হয়। সমাজে তাই অমানুষের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের বাইরের চেহারা যদিও মানুষের মতো, পোশাক যদিও বিচিত্র, কিন্তু আসলে তারা পশু ছাড়া আর কিছু নয়। যে দু'চারজন আসল মানুষ এখনও আছে, তারা এই পশুদের নখ-দন্ত-শৃঙ্গ-প্রহারে ছিন্ন-ভিন্ন, রক্তাক্ত। তারাও ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। এ যুগের একমাত্র মন্ত্র যা সরবে বা নীরবে সবাই জপ করে যাচ্ছে তা হল টাকা। টাকা, টাকা, টাকা। টাকা এবং প্রতিপত্তি। আত্মসম্মান, সতীত্ব, দেশ-প্রেম, আদর্শ, মনুষ্যত্ব সব বিক্রি করেও যদি এসব পাওয়া যায় তাতেও পশ্চাৎপদ নয় কেউ। যেমন করে হোক টাকা চাই, যেমন করে হোক পাদ-প্রদীপের সামনে লাইমলাইটে আসতে হবে। বেগবান এই পশুত্বের স্রোতে বড় বড় ঐরাবত ভেসে যাচ্ছে, বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য সব তলিয়ে গেলেন।

সুঠাম মুকুজ্যে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন তনিমা আর কাঁদছে না। জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছে। বড় করুণ মনে হল দৃশ্যটা। হাঁটুর উপর মুখ রেখে দু'হাত দিয়ে সেই হাঁটুটা জাপটে ধরে বসে আছে চুপ করে মাঠের দিকে চেয়ে। পিঠটা ধনুকের মতো বেঁকে আছে। মাথার বিনুনিটা বিস্রস্ত হয়ে পড়ে আছে পিঠের উপর। ডাক্তার মুখার্জির মনে হল মেয়েটি বড় রোগা। কামনাকলুষিত বর্তমান ঝঞ্ঝা যেন বিধ্বস্ত করে দিয়েছে পুষ্পিতা বল্লরীকে। একটি সুন্দর মূর্তি পড়ে গিয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে যেন। আবার চেয়ে দেখলেন তার দিকে—স্থির হয়ে বসে আছে সে। হঠাৎ ডাক্তার মুখার্জির মনে হল ও অপেক্ষা করছে। নিজের সব কথা অকপটে বলার পর ও অপেক্ষা করছে তিনি কি বলেন তাই শোনবার জন্য। কি বলবেন তিনি? ও কি করবে তা তিনি জানেন, কিন্তু ওকে বাঁচাবার কি ব্যবস্থা করতে পারেন তিনি? তিনি নিজে কি ওর ভার নিতে পারেন? সেটা কি সম্ভব, না শোভন? মনে পড়ল কিছুদিন আগে তাঁর এক বন্ধু তাঁকে চিঠি লিখেছিল যে, আমেরিকায় সে একটা ভালো চাকরি পেয়ে চলে গেছে। বাকি জীবনটা তার ওই দেশেই কাটাবার ইচ্ছে। লিখেছে, আমার কলকাতার বাড়িটা তোমার হেফাজতে রেখে যাচ্ছি। 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি, এই সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম। তুমি বাড়িটার যা হয় একটা ব্যবস্থা করো। ভাড়া দিতে পার, বিক্রি করে দিতে পার যা তোমার ইচ্ছে। ছেলেটি ইন্ডিয়ান ক্রিশ্চান, বড় ডাক্তার। তারও তিন কুলে কেউ নেই। ডাক্তার মুখার্জির সহপাঠী ছিল বিলেতে। ভারতীয় গণতন্ত্রের আবহাওয়ায় সে স্বস্তি পাচ্ছিল না। মাস খানেক আগে সে চলে গেছে। বাড়িটার এখনও কোনো ব্যবস্থা করতে পারেননি সুঠাম মুকুজ্যে। তাঁর মনে হল মেয়েটি কি ওখানে একা থাকতে পারবে?

জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি তোমার বাবার কাছে আর ফিরে যাবে না?"

"না।"

"কোথায় যাবে?"

''কোলকাতায়।''

''সেখানে গিয়ে কি করবে?''

''চাকরি।''

''চাকরি ঠিক করেছ কোনও?''

''না। পেয়ে যাব কোথাও একটা।''

''যতদিন না পাও ততদিন কোথায় থাকবে?''

''কোনো হোটেলে।''

তারপর মৃদু হেসে বললে— ''কিছুদিন কোনো নার্সিং হোমেও থাকতে হবে।''

এই ইঙ্গিতটার নিগূঢ় অর্থ শেলের মতো বিঁধল ডাক্তার মুখার্জির বুকে। শুধু যে বেদনা পেলেন তা নয়, লজ্জিতও হলেন। তিনি জানেন, তাঁরই সমব্যবসায়ী এমন অনেকে আছেন যাঁদের একমাত্র কাজ কুমারীদের অবাঞ্ছিত গর্ভ-নাশ করা। বড়লোক বলেও সমাজে খাতির পান তাঁরা। এই রকম কোনও একটা পাষণ্ডের কবলে গিয়ে তনিমা পড়বে এ ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন তিনি।

''আপনি ট্রেনে বললেন আমাকে সাহায্য করবেন। আপনাকে তো সব খুলে বললাম।''

''তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারি, কিন্তু একটি শর্তে।''

''কি, বলুন।''

''তোমার পেটের ছেলেকে নষ্ট করতে পারবে না।''

''যে ছেলেকে সমাজ চায় না তাকে নিয়ে আমি কি করব? তা ছাড়া আমাকে এখন চাকরি করতে হবে।''

''তোমাকে এখন চাকরি করতে হবে না। কোলকাতায় গেলেই চাকরি পাওয়া যাবে না।''

''ধরুন যদি যায়, আমার এক বান্ধবী লিখেছে সে আমাকে একটা চাকরি যোগাড় করে দেবে।''

''যদি দেয় করো, এ অবস্থায় তুমি অনায়াসে চাকরি করতে পার অবশ্য। কিন্তু না করলেই ভালো।''

''চাকরি আমাকে করতেই হবে। আমার আসল সমস্যা কি নামে নিজের পরিচয় দেব। দিন কতক পরেই তো লোকে জানতে পারবে।''

''মিসেস ঘোষাল বলেই নিজেকে পরিচিত করো, তুমি যখন বলছ ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গেই তোমার বেশি ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল— ''

''আগেই আপনাকে বলেছি অনেকের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আমার পেটে কার ছেলে আছে তা আমি ঠিক জানি না।''

চুপ করে রইলেন ডাক্তার মুখার্জি। এর পর তনিমা একটা নাটকীয় কাণ্ড করে বসল। ডাক্তার মুখার্জির পা দুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, ''আমার উপর দয়া করুন। আমাকে মরতে দিন। আমার সঙ্গে সায়ানাইড আছে, খানিকক্ষণের মধ্যেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।''

''কোথায় পেলে তুমি সায়ানাইড?''

কথাটা বলেই তিনি বিস্মিত হলেন একটু। কখন থেকে তিনি তনিমাকে 'তুমি' বলতে আরম্ভ করেছেন তা মনে করতে পারলেন না।

"অনেক দিন থেকে এটা আমার কাছে আছে। যখন বি. এস-সি পড়তাম তখন থেকেই যোগাড় করে রেখেছি।"

"ভালো সায়ানাইড?"

"মার্কের।"

"কই, দেখি।"

তনিমা শিশিটা বার করে দিতেই সেটা নিজের কোটের ভিতরের পকেটে রেখে ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "এটা আমার কাছে থাক। একটা কথা ভুলে যেও না, আমি ডাক্তার, আমার কাজ বাঁচাবার চেষ্টা করা। না পারতে পারি, কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে চেষ্টা আমি করব। তোমাকে অনুরোধ করছি আমাকে তুমি সাহায্য কর। তুমি নিজে যদি বাঁচতে না চাও, আমার চেষ্টা ব্যর্থ হবে। জীবনে ভুল অনেকেই করে, তুমিও করেছ। তাতে হয়েছে কি? ভুল শুধরে নেওয়াও যায়। এমন সুন্দর পৃথিবীকে ছেড়ে যাবে কেন? সুন্দরভাবে তাকে ভোগ কর। ইচ্ছে করলেই তা করা যায়।"

তনিমা চুপ করে রইল।

"উত্তর দিচ্ছ না যে!"

"আপনি বলুন, কি করে করব।"

"তোমার পেটে যে সন্তান আছে তাকেই ভালোভাবে মানুষ করা তোমার জীবনের লক্ষ্য হোক।"

"জারজ সন্তানের কি সমাজে স্থান আছে?"

"আছে বই কি।"

ডাক্তার ঘোষাল ঝিনুককে যা বলেছিলেন, ডাক্তার মুখার্জিও তনিমাকে তাই বললেন।

"অনেক বিখ্যাত লোকের পিতৃপরিচয় নেই। তাতে কি কিছু এসে গেছে? তোমার সন্তান সত্যিই যদি গুণের আকর হয়, সমাজ তাকে মাথায় করে রাখবে।"

"প্রতিভাবান হলে হয়তো রাখবে। আমার ছেলে প্রতিভাবান না-ও হতে পারে, খুব সম্ভব হবে না। তখন? আমার মতো দুশ্চরিত্রার গর্ভে প্রতিভাবান ছেলে জন্মাবে এ আশা দুরাশা।"

"প্রতিভাবানের জন্ম কখন কোথায় কি ভাবে হয় তা কেউ জানে না। মানুষের সমাজেও কাকের বাসায় কোকিল জন্মায়। নীচকুলে প্রতিভাবান লোক জন্মেছে এরকম উদাহরণ ইতিহাসে বিরল নয়। তোমার সন্তান যদি প্রতিভাবান না-ও হয় তাতেই বা কি। সে যদি ভালো হয় তা হলেই যথেষ্ট। আর সে ভালো হবে কি না সেটা নির্ভর করবে তোমার উপর, তুমি যদি আন্তরিকভাবে চাও সে ভালো হোক, তা হলে সে ভালো হবেই।"

অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল তনিমার মুখে।

"আমার মতো পতিতার ছেলে কি কখনও ভালো হতে পারে! কি যে বলেন!

"ঠিকই বলছি। তুমি যদি ভালো করে তার দেখাশোনা কর, নিশ্চয় সে ভালো হবে। জীবনের পথে যে-সব লুকোনো গর্ত থাকে তাতে পড়েই তো লোকে ক্ষত-বিক্ষত হয়। তুমি সে সবের সন্ধান জানো, তাই তুমি আরও ভালো করে তাকে বাঁচাতে পারবে। তোমাকে শক্ত হতে হবে, তোমাকে একাগ্র হতে হবে, তা যদি হতে পার নিশ্চয় তোমার ছেলে ভালো হবে।"

"আমাকে তা হলে এখন কি করতে বলেন?"

"আমার মতে তোমার বাবার কাছে ফিরে যাওয়া উচিত। তারপর তাঁকে জানিয়ে তুমি

কোলকাতা চলে যেও। সেটা সব দিক দিয়েই ভালো হবে। তা না হলে হয়তো তিনি থানায় খবর দেবেন, আমাকে নিয়ে টানাটানি করবেন, সে এক বিশ্রী কাণ্ড হবে।"

"কিন্তু বাবা যদি আমাকে যেতে না দেন?"

"তুমি সাবালিকা হয়েছ, পুলিশের সাহায্য নিয়ে তুমি চলে যেতে পার। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক পুলিশ ছাড়া আর কেউ তোমাকে আটকাতে পারে না। তোমার বাবাও নয়। আর পুলিশ তোমাকে আটকাবে তুমি যদি বে-আইনী কিছু কর। তাই বলছি বে-আইনী কিছু করবার চেষ্টা করো না। এখন বাবার কাছে ফিরে যাও।"

"তারপর?"

"তারপর কোলকাতা যেও। সেখানে ভদ্রভাবে যদি থাকতে চাও একটা বাসার সন্ধান তোমাকে দিতে পারি। আমার এক ডাক্তার বন্ধুকেও চিঠি লিখে দিতে পারি, তিনি তোমার দেখাশোনা করবেন। তিনি ভালো লোক, ভালো গাইনকোলজিস্ট।"

"কোলকাতার বাসা আপনার নিজের বাড়ি?"

"ঠিক নিজের নয়, একজন বন্ধুর। সে এখন আমেরিকা চলে গেছে, বাড়িটা এখন আছে আমার হেফাজতে। তুমি কিছুদিন গিয়ে অনায়াসে থাকতে পার।"

ঠিক সেই সময় রকেট ডেকে উঠল আর দুর্গা চিৎকার করে বলল, "বাবু, শিহাই নিকল্‌লো ছে।" (বাবু, শজারু বেরিয়েছে)। রকেট ঘেউ ঘেউ করে ছুটল মাঠের দিকে। ডাক্তারবাবুও তাড়াতাড়ি উঠে দ্রুতপদে যেতে লাগলেন তার পিছু-পিছু। তনিমাও চলল।

ডাক্তারবাবু কিছু দেখতে পাননি, তিনি রকেটকে অনুসরণ করছিলেন। রকেট একটা মাঠ পেরিয়ে আর একটা মাঠে পড়ল। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। ডাক্তার মুখার্জি যখন সেখানে পৌঁছলেন তখন দেখলেন পুঁটুলির মতো কি একটা পড়ে আছে আর সেটাকে লক্ষ করে রকেট ক্রমাগত ডেকে চলেছে, কিন্তু খুব কাছ ঘেঁষতে সাহস করছে না। শজারুটা সর্বাঙ্গে কাঁটা খাড়া করে গোল হয়ে পড়ে ছিল একটা তাকিয়ার মতো। ডাক্তার মুখার্জি টর্চ ফেলে ফেলে সেটাকে দেখতে লাগলেন ভালো করে। অদ্ভুত দৃশ্য।

"ওই শজারু নাকি?" বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল তনিমা।

"হ্যাঁ।"

"ওর মুখ কই?"

"লুকিয়ে রেখেছে। ওই হচ্ছে ওদের আত্মরক্ষার উপায়। দুর্গা, তুই ছুটে গিয়ে আমার ক্যামেরাটা আনতে পারবি? এর একটা ফটো তুলে ফেলি।"

গাছতলাতেই ডাক্তারবাবুর ব্যাগ ছিল। দুর্গা ছুটল। ডাক্তারবাবু লক্ষ্য করলেন রকেট ক্রমশ সাহস সঞ্চয় করে শজারুটাকে ওল্‌টাবার চেষ্টা করছে থাবা বাড়িয়ে। একবার যদি ওলটাতে পারে তা হলেই গলাটা কামড়ে ধরবে।

ডাক্তারবাবু ধমকালেন, "এই থাবালু, ডোন্ট ডু দ্যাট। ডোন্ট..."

সম্প্রতি ডাক্তারবাবু রকেটের নূতন নামকরণ করেছেন থাবালু, তার থাবাগুলো বড় বড় বলে। তনিমা নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। চোখ বড় বড় করে সে শজারুটা দেখছিল খালি। ডাক্তার মুখার্জির মনে একটা উপমা জাগল সহসা। তনিমা যেন ওই শজারু আর রকেট যেন সমাজ। তনিমার সর্বাঙ্গের উদ্যত কাঁটাগুলোও তিনি যেন দেখতে পেলেন।

একটু পরেই দুর্গা ফিরল। শজারু আর রকেটের ফটো তুললেন তিনি ফ্ল্যাশ লাইটে। তারপর দুর্গাকে বললেন রকেটকে নিয়ে যেতে। রকেট কিছুতে যেতে চায় না। দুর্গা শিকলে বেঁধে জোর করে তাকে নিয়ে গেল। তারপর ডাক্তার মুখার্জি তনিমাকে বললেন, "এস, আমরা একটু দূরে সরে দাঁড়াই।"

একটু দূরে সরে দাঁড়াতেই মিনিট কয়েক পরে শজারুর কুণ্ডলীকৃত অবস্থাটা সরল হল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল সে। গলা দিয়ে অদ্ভুত শব্দ বেরুল একটা। তারপর ছুটে পালাল।

তনিমাকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তার মুখার্জি যখন তাঁর বাসায় ফিরে এলেন তখন রাত অনেক হয়েছে। মুখ তুলে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন হংসমণ্ডল (Cygnus) আর অভিজিৎ (Lyra) প্রায় মধ্যগগনে। একবার তাঁর মনে হল, তনিমাকে নক্ষত্রগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে কেমন হয়? বৃশ্চিক, ধনু, আর ছায়াপথও বেশ চমৎকার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তার ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে সে ইচ্ছা বর্জন করতে হল। "চল, এবার শুয়ে পড়া যাক! দেড়টা বেজে গেছে—"

শোবার ঘর দুটি। একটিতে ডাক্তার মুখার্জি শুলেন, আর একটিতে তনিমা। দুর্গা তনিমার ঘরের দুয়ারের কাছে বিছানা পাতল। রকেট শুল ডাক্তার মুখার্জির ঘরে, তাঁর বিছানার পাশে। অত অসুবিধার মধ্যেও ডাক্তার মুখার্জি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন। তনিমার কিন্তু ঘুম এল না। বিছানায় শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগল সে। নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ চিন্তাই তার চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। সে ঠিক করতে পারছিল না কি করবে। সে দৈবক্রমে চলন্ত গাড়িতে ডাক্তার মুখার্জির কামরায় উঠে পড়েছিল। যদি অন্য গাড়িতে উঠত, কি হত তা হলে? কোলকাতায় পৌঁছেই বা কি করত? তার যে বান্ধবীটি তাকে অনেকদিন আগে চিঠি লিখেছিল, 'এখানে এলে একটা চাকরি হতে পারে'— সে কি সত্যই তাকে আশ্রয় দিত? সত্যিই সে কি নির্ভরযোগ্য? তা ছাড়া তার পেটের ওই হতভাগ্য সন্তান, কি করবে তাকে নিয়ে! হত্যা করবে? এতদিন সে যা করেছে, তা পাশবিক সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে হত্যার কলঙ্ক স্পর্শ করেনি। কিন্তু একটা পিতৃ-পরিচয়হীন সন্তান নিয়ে সে করবেই বা কি! ডাক্তার মুখার্জি যে-সব বড় বড় কথা বললেন, তা শুনতে বেশ ভালো লাগল, কিন্তু বাস্তব জগতে সে-সবের কি কোনও দাম আছে? ছেলে বা মেয়ে হলেই পাড়াপড়শীরা তার নাম জানতে চাইবে। স্কুলে ভর্তি করতে গেলেও বাবার নাম চাই। নিজেকে বিধবা বলে পরিচিত করবে? কোনও কল্পিত মৃত স্বামীর নামে চালাবে নিজেকে? কিন্তু তা করলে তাকে বিধবার মতোই থাকতে হবে। তা সে পারবে না। নিরাভরণ হয়ে থান পরে থাকা অসম্ভব তার পক্ষে। কোনও সদাশয় লোক কি সব জেনে শুনেও তাকে বিবাহ করতে পারে না? ডাক্তার মুখার্জি কি এরকম কোনও ব্যবস্থা করতে পারেন না? ডাক্তার মুখার্জি নিজে কি বিবাহিত? কই, তাঁর স্ত্রীকে সে বাইরে কখনও দেখেনি তো। হঠাৎ সে বিছানায় উঠে বসল। বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। অনেকক্ষণ সে বসে রইল চুপ করে।

রকেট চিৎকার করে উঠতেই ডাক্তার মুখার্জি বিছানায় উঠে বসলেন। ঘরের এক কোণে

বিছানার কাছেই একটা লণ্ঠন কমানো ছিল। উঠে সেটা বাড়িয়ে দিতেই তনিমাকে দেখতে পেলেন তিনি। তনিমা ঘরের দরজার সামনে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়ে ছিল।

"কি হল! এই রকেট, চুপ কর— সিট্ ডাউন।"

রকেট বসতেই তনিমার দিকে চেয়ে বললেন, "ঘুম হচ্ছে না?"

"না। ভিতরে আসতে পারি?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এস, বস।"

তনিমা এসে তাঁর বিছানার এক ধারে বসল।

"ঘুম হচ্ছে না কেন? অচেনা জায়গায় অনেকের ঘুম হয় না। আমার বাক্সে ঘুমের ভালো ওষুধ আছে একটা দিতে পারি।"

"না থাক।"

তারপর একটু থেমে বলল— "একটা কথা ভেবে কিছুতেই ঘুম আসছে না।"

"কি কথা?"

তনিমা কয়েক মিনিট চুপ করে রইল। তারপর বলল, "আচ্ছা, আমার সব কথা জেনে আমাকে বিয়ে করতে পারে, এরকম সদাশয় লোক কি আপনার জানা-শোনা নেই? আপনি নিজেই তো খুব সদাশয় লোক। আপনার মতো ভালো লোক আমি আর দেখিনি। আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি? কিছু মনে করবেন না তো?"

"কি, বল।"

"আপনি কি বিবাহিত?"

"একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন!"

বিস্মিত হলেন ডাক্তার মুখার্জি।

তনিমা কিছু না বলে অন্য দিকে চেয়ে কাপড়ের আঁচলটা বুড়ো আঙুলে জড়াতে লাগল।

"এ কথা জানতে চাইছ কেন?"

আবার প্রশ্ন করলেন ডাক্তার মুখার্জি সবিস্ময়ে।

তনিমার ঘাড় একটু হেঁট হল। তারপর প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে সে বললে, "আপনি যদি অবিবাহিত হন, তা হলে—"

হো-হো করে হেসে উঠলেন ডাক্তার মুখার্জি। হাসির একটা ঝড় বইয়ে দিলেন তিনি। এ হাসি তনিমা আগে শোনেনি। হকচকিয়ে গেল। চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। হাসি থামিয়ে ডাক্তার মুখার্জি কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ দুটো মুছে ফেললেন, "না, তা হলেও আমি তোমার সমস্যার সমাধান করতে পারব না।"

"কেন? এই তো একটু আগে বললেন. সব ভুলই শুধরে নেওয়া যায়, বললেন আমাকে আপনি বাঁচাতে চান! আমাকে যদি বিয়ে করেন, তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।"

"না, তা হয় না।"

"আপনি কি বিবাহিত? কই, স্ত্রীকে কখনও তো আপনার গাড়িতে দেখিনি, কোথাও দেখিনি। আমি তো সব জায়গায় ঘুরে বেড়াই।"

"আমি বিবাহিত কিনা, সে প্রশ্ন এখানে অবাস্তব। আমি তোমাকে যদি বিয়ে করি, তা হলে আমি তোমার জন্য যা করতে চাইছি, তার একটি অর্থই লোকে করবে, যা আমি চাই না।"

‘‘কেন চান না? আমাকে বিয়ে করলে কি আপনার সম্মান কমে যাবে? তার মানে আপনি আমাকে মনে মনে ঘৃণা করেন। এতক্ষণ দূর থেকে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে মহত্ত্বের অভিনয় করছিলেন মাত্র। ওরকম শুকনো দয়া আমার কোনো কাজে লাগবে না।

তনিমার চোখের দৃষ্টিতে আগুন জ্বলতে লাগল। তার গ্রীবাভঙ্গিতে ফুটে উঠল কুপিতা ফণিনীর হিংস্রতা। ডাক্তার মুখার্জি একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন।

কান দুটো খাড়া করে রকেট চেয়ে ছিল তনিমার দিকে। মনে হল ডাক্তার মুখার্জির কাছ থেকে সামান্য ইঙ্গিত পেলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপর। তনিমার উপর ডাক্তার মুখার্জি যে অসন্তুষ্ট হয়েছেন তা তাঁর ভাব-ভঙ্গি থেকে রকেট বুঝেছিল। ডাক্তার মুখার্জি অনেকক্ষণ কোনো কথা বললেন না। বালিশের নীচে থেকে ঘড়িটা বার করে দেখলেন, তারপর রেখে দিলেন। তিনটে বেজেছে। আর ঘণ্টা তিনেক পরেই তাঁর ফেরবার গাড়ি। মুখার্জি বললেন, ‘আমি তোমাকে যা বলেছি সেটা ভালো করে ভেবে দেখ। তাতে যদি রাজি থাক, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমাকে সাহায্য করতে।’’

তনিমা উঠে পড়ল।

‘‘আপনার সাহায্য আমি চাই না। আমার টাকাটা দিন. আমি এখনই চলে যাচ্ছি।’’

‘‘কোথা যাবে?’’

‘‘তা আমি বলব না।’’

‘‘কিন্তু এভাবে তোমাকে আমি যেতে দিতে পারি না। আমার সঙ্গে তুমি যদি ফিরে না যাও তা হলে আমাকে বাধ্য হয়ে পুলিশে খবর দিতে হবে।’’

‘‘পুলিশে! তা হলে আমার জেল হোক এইটেই আপনার ইচ্ছে? এতক্ষণ যে লম্বা লম্বা লেকচার দিলেন তা অর্থহীন?’’

‘‘আমার লেকচার অর্থহীন কিনা সে আলোচনা এখন থাক। তুমি তোমার বাবার কাছে এখন ফিরে চল, তারপর সেখান থেকে যেখানে খুশি যেও।’’

‘‘বাবার কাছে ফিরে যাওয়া মানেই তো আবার নরকে ফিরে যাওয়া। সেখান থেকে আর কি আমি ছাড়া পাব? ওখানকার পুলিশ আমাকে সাহায্য করবে না, ওরা সবাই বাবার বন্ধু।’’

‘‘আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তুমি যদি তোমার বাবার কাছে না থাকতে চাও না হলে পুলিশ প্রোটেকশন্ দিয়ে তোমাকে আমি অন্যত্র পাঠিয়ে দেব। আজকাল যিনি ম্যাজিস্ট্রেট তিনি ভালো লোক. আমার সঙ্গে আলাপ আছে, সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু এখন তোমাকে আমার সঙ্গে ফিরে যেতে হবে।’’

‘‘আপনি কথা দিচ্ছেন?’’

‘‘দিচ্ছি।’’

তনিমা অবাক হয়ে চেয়ে রইল সুঠাম মুকুজ্যের দিকে। শুধু বিস্ময় নয়, ক্রমশ শ্রদ্ধাও ফুটে উঠল তার দৃষ্টিতে। গত তিন চার বছরে তার যে অভিজ্ঞতা তারও রং বদলে দিলেন এই ভদ্রলোক। আজ পর্যন্ত কেউ তাকে একলা পেয়ে নিজের ভদ্রতা বজায় রাখতে পারেনি। ইনি পেরেছেন। শুধু তাই নয়, অপমানিত হয়েও ইনি বিচলিত হননি, সমানে তার ভালো করবার চেষ্টা করছেন। সহসা তনিমার মনে হল এ লোকটির কাছে আত্মসমর্পণ করলে ঠকতে হবে

না। এসব কথা মনে হবার পর একটা নাটকীয় কাণ্ড করে বসল সে। হঠাৎ ডাক্তার মুখার্জির পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, "আপনাকে অনেক কটু কথা বলেছি, আমাকে মাপ করুন।"

ডাক্তার মুখার্জি শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন—"ছি ছি, ও কি করছ! আমি জানি, রাগ হলে মাথার ঠিক থাকে না। ওতে আমি কিছু মনে করিনি। ওঠ—"

॥ পনেরো ॥

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে আবার একদিন গভীর রাত্রে গণেশ হালদারের বাইরের ঘরের কড়া নড়ল। তিনি জেগেই ছিলেন। শুধু সেদিন নয়, ঝিনুকের চিঠি পাওয়ার পর থেকে রোজই তিনি জেগে থাকেন, রোজই প্রতীক্ষা করেন ঝিনুক আসবে। ঝিনুক যে টাকাটা রেখে গিয়েছিল সেটাও নিয়ে যায়নি। বাণ্ডিল বাঁধা এগারো হাজার টাকার নোট তাঁর ট্রাঙ্কের তলাতেই আছে এখনও। তিনি এজন্য মনে মনে অস্বস্তি ভোগ করছিলেন, কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করবার উপায় ছিল না। সেজন্য অস্বস্তিটা আরও পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল। কড়া নাড়ার শব্দ পেয়েই তিনি বেরিয়ে কপাটটা খুলে দিলেন। খুলে দিতেই ঝিনুক এসে ঢুকল। হালদার মশাই কপাটটা ভালো করে বন্ধ করে দিয়ে তারপর এলেন। কেউ যদি তখন তাঁকে দেখতে পেত তা হলে লক্ষ করতে পারত যে, তাঁর মুখে একটা দোষীর ভাব ফুটে উঠেছে, যেন তিনি যা করছেন তা তাঁর বিবেক অনুমোদন করছে না।

ঝিনুক ঢুকেই তার অপূর্ব হাসি হেসে বললে, "আমার আগেই আসা উচিত ছিল, কিন্তু আমি এখানে ছিলাম না।"

"ও, ছিলেন না? কোথায় গিয়েছিলেন?"

"কলকাতায়। তেলিপাড়ার মোহিনীকে আর ছবিকে বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে এসেছি। মোহিনী গেল লণ্ডনে। ও বি-এ পাস, ওর সঙ্গে কিছু টাকাও দিয়ে দিয়েছি, আশা করি ও ভদ্রভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। ছবি গেল জাপানে। দু'খানা হাতই ওর সম্বল। খুব ভালো মূর্তি গড়তে পারে, ছবিও আঁকতে পারে। কিন্তু এখানে সেসব করবার সুযোগ পায়নি। তাই পিক্-পকেট হয়েছিল। জাপানে শুনেছি শিল্পীর সমাদর আছে। দেখা যাক সেখানে ও কি করতে পারে।"

"এসব করছেন কি করে! বিদেশে যেতে হলে তো অনেক হাঙ্গামা—"

"সুবেদার খাঁ সব করছেন।"

বলেই ঝিনুক থেমে গেল।

"নামটা বলে অন্যায় করে ফেললাম। যাক, যখন বলেই ফেললাম তখন ওঁর পরিচয়টা দিয়ে ফেলি। ওঁর মতো লোকও দুর্লভ। উনি বাঙালী, বেহারী কি পাঞ্জাবী তা জানি না। চেহারাটা পাঞ্জাবীর মতো লম্বা-চওড়া, বাংলা হিন্দী দুই-ই চমৎকার বলেন। রায়টের সময় ওঁর আত্মীয়স্বজনরা ছিলেন বিহারে, উনি ছিলেন পাঞ্জাবে। ফিরে এসে দেখেন ওঁর আত্মীয়স্বজনকে কেটে কুয়োয় ফেলে দিয়েছে হিন্দু বিহারীরা। ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। বৃটিশ রাজত্বের সময় উনি বিলেতে গিয়েছিলেন। সেখানে ইন্‌জিন্ ড্রাইভারের ট্রেনিং নিয়েছিলেন কিছুদিন। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সুপারিশে উনি সেই ট্রেনিংটা সম্পূর্ণ করেন এ-দেশে। সেই সময় একজন মেরিন ইন্‌জিনিয়ারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় ওঁর। সেই ঘনিষ্ঠতার ফলে উনি বিদেশগামী জাহাজের

খবর-টবর পান, দু-একজন ক্যাপটেনের সঙ্গেও ভাব করেছেন। ওঁরই সাহায্যে মোহিনী আর ছবি চলে গেল। উনি বলেছেন বাকি সবাইকেও পার করে দেবেন।”

“উনি আপনাদের দলের লোক?”

“হ্যাঁ। ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে ওঁর আগেই পরিচয় ছিল। ডাক্তার ঘোষালকে কেন্দ্র করেই আমাদের দলটা গড়ে উঠেছে। আমার ইচ্ছে আপনিও আমাদের দলে আসুন। আমি দলের কাউকে এ কথা বলিনি রাজি হলে বলব। আমার বিশ্বাস সকলেই এতে খুশি হবে।”

“আপনাদের দলের কাজ কি?”

“আপাতত টাকা সংগ্রহ করা। আমরা সাধারণত বে-আইনি স্মাগলিং করে টাকা সংগ্রহ করি। বার্মায়, চীনে ডাক্তার ঘোষালের পরিচিত লোক কয়েকজন আছেন। তাঁরা সস্তায় নানারকম জিনিস লুকিয়ে পাঠান, আমরা বেশি দামে সেগুলো এখানে বিক্রী করি।”

গণেশ হালদারের সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। এরা তা হলে চোর! ঝিনুকও ওই দলে! তাঁর মনে এ কথা জাগল বটে, কিন্তু মুখে তিনি কিছু বললেন না, নত-নেত্রে চুপ করে বসে রইলেন। ঝিনুকই অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করল।

“আপনি আমাদের দলে যোগ দিচ্ছেন তো?”

“না। চোর-ডাকাতদের দলে যোগ দেবার সামর্থ্য বা ইচ্ছে কোনোটাই নেই আমার।”

“একার সামর্থ্যে পৃথিবীতে কোনও দলই কখনও গড়ে ওঠে না। অনেকের সম্মিলিত সামর্থ্যই দলকে পুষ্ট করে, চালিত করে। তা ছাড়া আপনার সামর্থ্য যে কতটা তা আপনি নিজেও বোধ হয় জানেন না ভালো করে। কার্যক্ষেত্রে নামলে সেটা বোঝা যায়। কিন্তু ইচ্ছে নেই বলছেন কেন?”

“চোর ডাকাত গুণ্ডাদের আমি চিরকাল ঘৃণা করেছি। কোনো কারণেই তাদের সঙ্গে আমি নিজেকে যুক্ত করতে পারব না।”

“চোর ডাকাত?” আলেকজান্ডার আর রবারের গল্পটা কি আপনি তা হলে পড়েননি? আমাদের দেশে আজকাল যাঁরা ক্ষমতার শিখরে আসীন, আপনাদের কি বিশ্বাস তাঁরা সবাই নিখুঁত ধর্ম-পথে চলে সে শিখরে পৌঁছেছেন? অগ্নিযুগে যাঁরা দেশকে উদ্ধার করবার জন্য নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করে, নিজেদের সর্বস্ব খুইয়ে, নিজেদের অবলুপ্ত করে দিয়ে, অতি কষ্টে বোমা-রিভলভার সংগ্রহ করে বিদেশি শাসকদের হত্যা করবার আয়োজন করেছিলেন তাঁদের কি আপনি সাধারণ খুনেদের পর্যায়ে ফেলছেন নাকি! খুন করাও অনেক সময় মহান কর্তব্য, স্বয়ং ভগবান অর্জুনকে স্বজননিধনে প্ররোচিত করেছিলেন, তা কি আপনি পড়েন নি?”

ঝিনুকের চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধরে গেল। তার মুখের দিকে চেয়ে গণেশ হালদার ভয় পেয়ে গেলেন। একটু ইতস্তত করে বললেন, “না, অগ্নিযুগের বীরদের আমি সাধারণ খুনেদের পর্যায়ে ফেলিনি। তাঁদের আমি সম্মান করি। কিন্তু এ কথাও কি সত্য নয় যে, তাঁর দলে দলে প্রাণ দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৃতকার্য হতে পারেননি? এ কথাও কি সত্য নয় যে, তাঁদের মধ্যেও বিশ্বাসঘাতক দেখা দিয়েছিল। বে-আইনি পথে চলে প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে বেশি দিন দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে হয়। তাতে লাভ কি। অগ্নিযুগের অগ্ন্যুৎসবে আমাদেরই ঘরবাড়ি পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে, আর কারও কোনো ক্ষতি হয়নি। বরং, আমাদের প্রতি ইংরেজের ক্রোধের সুবিধা নিয়ে অনেক সুবিধাবাদী নিজেদের

কোলে ঝোল টানবার সুযোগ পেয়েছে। আমার বিশ্বাস ইংরেজ যাওয়ার সময় যে বাংলা আর পাঞ্জাবের বুকে খড়্গ হেনে গেল তা ওই অগ্নিযুগের ক্রিয়াকলাপেরই জবাব।"

"কিন্তু এ জবাব শুনে আমরা কি চুপ করে বসে থাকব? সেইটেই কি মনুষ্যত্বের পরিচয় হবে?"

"কিন্তু চুপ করেই তো বসে আছি। কোথাও তো কোনো প্রতিবাদ শুনি না। কোথাও তো কেউ বলে না যে, ভাঙ্গা দেশকে জোড়া লাগাবার জন্যে আমরা প্রাণ পণ করব। কোথাও তো কেউ রেফিউজিদের আপন লোক বলে বুকে টেনে নেয়নি। সবাই তো দেখি কোট -প্যান্ট পরে কলার নেকটাই ঝুলিয়ে নকল সাহেব সেজে নিজের নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টাতেই ব্যস্ত। সভায় সভায় নাচগানের বহর আর উপর-ওলা তোষণের ব্যবস্থা দেখে তো মনে হয় না দেশ বিভক্ত হয়েছে বলে আমরা খুব মর্মাহত। ক'জন বাঙালী সত্যি সত্যি বাঙালী জাতিকে নিয়ে মাথা ঘামায়? চায়ের টেবিলে বা আড্ডায়, মজলিসে বাঙালীরা মুখে বাঙালী সম্বন্ধে যতটুকু হা হুতাশ করে তা নিছক পরচর্চার আনন্দেই করে থাকে। ওর মধ্যে সত্যিকার স্বজাত্য-বোধ নেই, সত্যিকার প্রেম নেই। থাকলে ও নিয়ে তারা গুলতানি করত না, লজ্জায় অধোবদন হয়ে থাকত বাঙালী মেয়েদের কোথায় কবে কত অপমান কি ভাবে কারা করেছে তার নির্লজ্জ উলঙ্গ বর্ণনা বাঙালীরাই করে। শুধু মুখে নয়, ছাপিয়েও করে। তার আত্মসম্মান থাকলে কখনই সে এ কাজ কবত না। ভারতবর্ষের অন্য কোনো প্রদেশের লোক নিজেদের নিন্দায় কি এমন পঞ্চমুখ? মহে হয় না।"

"কিন্তু এটাও তো সত্যি যে, আমাদের উপরই সবচেয়ে বেশি অত্যাচার, সবচেয়ে বেশি অবিচার অতীতেও হয়েছে, এখনও হচ্ছে। এটা কি আমরা মুখ বুজে সহ্য করে যাব চিরকাল?"

"ইতিহাস পড়লে বুঝতে পারবেন অত্যাচার-অবিচারের পরমায়ু কম। কখনই কোনো দেশে তা অমরত্ব লাভ করেনি। কলুষিত শাসনপদ্ধতির মধ্যেই তার বিনাশের বীজ নিহিত থাকে। যথাকালে এ মেঘ কেটে যাবে। চুরি ডাকাতি বা খুন করে এর সত্য প্রতিকার হবে না। আমাদের এখন একমাত্র কর্তব্য আত্মরক্ষা। আপনিও আপনার চিঠিতে ওই কথা বলেছেন। কিন্তু ওর জন্য যে উপায় আপনি অবলম্বন করতে চান তা আমার মনোমত নয়। দেশের মধ্যে থেকেই দেশকে ভালো করতে হবে, দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে তা হবে না। এর জন্যে তপস্যা চাই, ধৈর্য চাই—"

"ওরকম নপুংসক ধৈর্য আমার নেই। যে দেশে পথেঘাটে দিবালোক নারীরা অপমানিত হয় আর রাজপুরুষরা চোখ বুজে থাকেন, যে দেশের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করবার ন্যায্য দাবি উপেক্ষিত হয়, সে দেশে আমি থাকতে পারব না। দেশ বলতে আমি শুধু বাংলা দেশই বুঝি না, সমস্ত ভারতবর্ষই আমার দেশ। কিন্তু আজ সে ভারতবর্ষে আমার স্থান কোথাও নেই। বর্তমান শাসনপদ্ধতিতে আজ পাঞ্জাব পাঞ্জাবীর, বিহার বিহারীর, উড়িষ্যা ওড়িয়ার, মহারাষ্ট্র মারাঠীর, বাংলা কিন্তু বাঙালীর নয়, সেখানে সবাই ভিড় করেছে, সবাই সেখানে প্রশ্রয় পাচ্ছে। যে সামান্য ভূখণ্ড আজ বাংলাদেশ বলে চিহ্নিত, সেখানেও আমরা চাকরি পাই না। সর্বভারতীয় উদারতার প্রকোপ বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশি। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে অপমানের কুশাঙ্কুরে আমাদের চলার পথে ছেয়ে ফেলেছে। আমরা এদেশে থাকতে পারি কুকুরের মতো, হয় রাস্তার ঠোঙা চেটে কিংবা প্রভুর পদলেহন করে। এরকম অনেক কুকুর পথেঘাটে ঘুরছেও দলে দলে। অগ্নিযুগেও এই কুকুরের দল ছিল স্পাই হয়ে। এদের সঙ্গে আত্মীয়তা করে আমি থাকতে পারব না।"

"কিন্তু এই অধঃপতিতদের উদ্ধার করবার দায়িত্ব কি তোমার নেই?"

“এ-দেশে থেকে সে দায়িত্ব বহন করবার সামর্থ্য যে আমার নেই। এ-দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে সে সামর্থ্য যদি সংগ্রহ করতে পারি তা হলে নিশ্চয়ই অধঃপতিতদের উদ্ধার করবার চেষ্টা করব। সামর্থ্য মানে, টাকা। টাকা থাকলে এই অমানুষদেরই শিক্ষা দিয়ে, চাকরি দিয়ে, ধর্মবোধ জাগিয়ে আবার হয়তো মানুষ করা যায়। প্রথমেই দরকার খাবার এবং বাসস্থান, তার জন্যে টাকা চাই। কিন্তু সে টাকা এ-দেশে সৎপথে থেকে রোজগার করা যাবে না। বিদেশে নিজের চেষ্টায় যদি কিছু করতে পারি তা হলে দেশকে নিশ্চয়ই ভুলব না। ও-দেশে গুণীর কদর আছে শুনেছি। সেইজন্যে আপনার মতো শিক্ষিত লোককে আমাদের দলে নিতে চাইছি।”

“কিন্তু আপনারা এখন যা করছেন আমি তো তার কিছুই করতে পারব না। ইন্‌জিন্‌ড্রাইভার হয়ে বে-আইনীভাবে চোরাই মালও আনতে পারব না, আর ডিস্‌টান্ট সিগন্যালের নীচে থেকে লুকিয়ে গিয়ে সে মাল পাচারও করতে পারব না। স্বদেশী ডাকাতি করবার যোগ্যতা আমার নেই।

কথাটা শুনে ঝিনুকের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল! “আপনি এসব জানলেন কি করে?”

“ডাক্তার মুখার্জির কাছ থেকে। তিনি আপনাদের স্বরূপ চিনতে পেরেছিলেন। আপনার ওই ব্যাগে সেদিন কি ছিল তাও তিনি আন্দাজ করেছেন।”

“আর সে কথা বলেছেন আপনাকে!”

“ঠিক বলেননি। তিনি রোজ ডায়েরি লেখেন, আর সে ডায়েরি আমি টুকি। তাতেই লিখেছেন এ কথা, কারও নাম লেখেননি, কারণ কারও নাম তিনি জানেন না, ঘটনাটা লিখেছেন, কিন্তু আমি সেই ডায়েরি থেকে বুঝতে পেরেছি, যে মেয়েটি ডিস্‌টান্ট সিগন্যালের নীচে থেকে ব্যাগটি আনতে গিয়েছিল, সে মেয়েটি কে। ডাক্তার মুখার্জিকে খুন করবার চেষ্টাও হয়েছিল। কিন্তু আমাদের ভাগ্য ভালো যে, গুলিটা তাঁকে ঠিক লাগেনি। অমন একটা ভালো লোক যদি মারা যেতেন তা হলে কি কাণ্ড হত বলুন তো! কথাটা ভাবলে এখনও আমার সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। আমার সবচেয়ে খারাপ লেগেছে আপনার মতো মেয়ে এই জঘন্য ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত আছেন জেনে।”

ঝিনুক স্মিতমুখে চেয়ে রইল হালদারের মুখের দিকে। গণেশ হালদার বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগল ঝিনুকের উজ্জ্বল দৃষ্টি যেন ছুঁচের মতো তাঁর কপালে বিঁধছে।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর ঝিনুক বলল, “একটা অনুরোধ আছে। রাখবেন?”

“কি অনুরোধ, বলুন।”

“আমাকে আর ‘আপনি’ বলবেন না। ‘তুমি’ বলুন। তুই বললে আরও সুখী হব। আমরা এক গ্রামেরই ছেলেমেয়ে। আপনার কাছে এটুকু দাবি করবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে। ডাক্তার মুখার্জির ব্যাপারে আমিও খুব দুঃখিত। সেদিন তিনি আমাদের সঙ্গে যে ভদ্র ব্যবহার করেছিলেন তার তুলনা হয় না, অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন তাঁর ব্যবহারে। সত্যিই মনে হয়েছিল দেব-চরিত্র লোক উনি। কিন্তু সম্প্রতি একটা খটকা লেগেছে—”

“কিসের খটকা।”

“তনিমা সেনের ব্যাপার শোনেননি কিছু?”

“না। তনিমা সেন কে?”

“মিষ্টার সেনের মেয়ে। তাকে আপনি দেখেছেন নিশ্চয় ডাক্তার ঘোষালের বাড়িতে। চোখে পড়বার মতো চেহারা। উগ্র রকম সাজগোজ করে আসত। চোখে কাজল, ঠোঁটে রং, পেটকাটা জামা, ডগমগে রঙের শাড়ি—”

"হ্যাঁ, দেখেছি মনে হচ্ছে। কি হয়েছে তার?"

"পালিয়েছে। আর যতদূর খবর পেয়েছি ডাক্তার মুখার্জি তার পলায়নে সাহায্য করেছেন।"

"কি রকম?"

ঝিনুক সব খবরই জানত। ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে তার ঘোঘা যাওয়ার খবর সুবেদার খাঁর মুখে শুনেছিল সে। সেখানে সে যে তার সঙ্গে একটা বাড়িতে রাত্রিবাস করেছিল এ খবরও সে সংগ্রহ করেছিল। দুর্গাই সম্ভবত এসে গল্পটা করেছিল পাঁচজনের কাছে। ডাক্তার মুখার্জি তাকে কথাটা গোপন রাখতে বলেননি, সে কথা মনেও হয়নি তাঁর। সেইটে অতিরঞ্জিত হয়ে পল্লবিত হয়েছিল। ঝিনুক বলল, ডাক্তারবাবু নাকি ফাঁকা মাঠের মাঝখানে তাকে সঙ্গে নিয়ে একটা গাছের অন্ধকারে পাশাপাশি বসেছিলেন এবং তারপর ফিরে এসে শুয়েছিলেন একটা ঘরে তাকে সঙ্গে নিয়ে। পরদিন সকাল বেলা তিনি তনিমাকে নিয়ে ফিরে এসেছিলেন বটে, কিন্তু তাকে মিস্টার সেনের বাড়িতে নিয়ে যাননি। নিয়ে গিয়েছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলোয়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে তাঁর কি কথা হয়েছিল তা কেউ জানে না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মিস্টার সেনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তনিমা কিছুতেই তার বাবার সঙ্গে ফিরে যেতে চায়নি। সে নাকি বলেছিল তাকে যদি বাবার বাড়িতে জোর করে পাঠানো হয় তাহলে সে আত্মহত্যা করবে (ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের স্টেনো মিঃ রক্ষিতের দেওয়া খবর এটা)। সে এ-ও বলেছিল যে, সে কলকাতায় একটি বাড়ি ঠিক করেছে, সেই বাড়িতে থেকে সে কোথাও চাকরি করবে। তাকে অনেক বুঝিয়েও কোনো ফল হয়নি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অবশেষে দু'জন কনেস্টবল সঙ্গে নিয়ে তাকে নাকি কলকাতাতেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। মিস্টার সেনও তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিলেন, কিন্তু মেয়েকে ফেরাতে পারেননি। তিনি একলা ফিরে এসেছেন। এসে বলেছেন যে, যে বাড়িতে তনিমা উঠেছে সে বাড়িটা নাকি ডাক্তার মুখার্জির। তিনি আস্ফালন করে বেড়াচ্ছেন ডাক্তার মুখার্জির নামে মকদ্দমা করবেন। তনিমাকে তিনিই নাকি নষ্ট করেছেন।

সব বর্ণনা করে ঝিনুক স্মিতমুখে প্রশ্ন করল, "এসব শুনে কি মনে হয় আপনার?

গণেশ হালদার বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁর সুদূরতম কল্পনাতেও তিনি ডাক্তার মুখার্জিকে তনিমা সেনের সঙ্গে জড়াতে পারলেন না। নির্বাক হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, "তুমি যা বলছ তা কি সত্যি?"

"হলফ করে বলতে পারব না। তবে ওই রকমই শুনেছি, আর যাদের মুখ থেকে শুনেছি তাদের অবিশ্বাস করবার হেতু তো খুঁজে পাই না। আপনি কিছু শোনেননি?"

"না, আমি কারও সঙ্গে মিশি না, তাই এসব খবর আমার কানে আসে না। কিন্তু আমি একটা কথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, ডাক্তারবাবুর যতটুকু আমি দেখেছি এবং তাঁর ডায়েরি থেকে তাঁর যে পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে বলতে পারি, কোনো কারণেই তিনি নিজেকে অবনত করবেন না। করবার সামর্থ্যই বোধ হয় ওঁর নেই। তবে ওঁর পরোপকার করবার বাতিক আছে, আমার মতো নিতান্ত অপরিচিত লোককেও তাই উনি বাড়ির লোক করে রেখেছেন। ওঁর দাইয়ের ছেলেমেয়েরা ওঁর আত্মীয়ের মতো, অসংখ্য গরিব লোকের উনি বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেন। তনিমা সেনের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ কোনও কারণে যদি ঘটেই থাকে তা হলে এই কথাই আমি ভাবব যে, মেয়েটি বিপন্ন হয়ে তাঁর সাহায্য ভিক্ষা করেছিল এবং সে সাহায্য তিনি করেছেন। তুমি যেটুকু বললে তার থেকেই এটা বোঝা যায়। তাঁর যদি

খারাপ মতলব থাকত তা হলে তাকে নিয়ে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যেতেন না। এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট একজন মারাঠী ভদ্রলোক। ডাক্তার মুখার্জিকে খুব খাতির করেন শুনেছি। এ ব্যাপারে কোনও নৈতিক গলদ থাকলে তিনিও তার প্রশ্রয় দিতেন না। তোমার সঙ্গে সেদিন রাত্রে ওই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে তাঁর দেখা হয়েছিল, এজন্য তিনি তোমার উপর রাগ করেননি, তোমাকে পুলিশে দেবার চেষ্টাও করেননি। বরং আমাকে বলেছিলেন মেয়েটিকে আমার ভালো লেগেছে, সুযোগ পেলে ওর সঙ্গে আলাপ করতুম। অদ্ভুত ভালো লোক উনি, আলাপ যদি কখনো হয় দেখবে, ওঁর সম্বন্ধে কোনও খারাপ ধারণা করা শক্ত।"

ঝিনুকের চোখের দৃষ্টি উৎসুক হয়ে উঠল। ওঁর ভদ্র ব্যবহারে আমিও সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। কি করে ওঁর সঙ্গে আলাপ করা যায় বলুন ত।"

"আচ্ছা, আমি চেষ্টা করব। তবে বাড়িতে বা ল্যাবরেটরিতে আলাপ করবার সুবিধা হবে না। উনি রোজ বেড়াতে বেরোন, সেই সময় হতে পারে। উনি যদি আপত্তি না করেন, তোমাকে খবর দেব।"

গণেশ হালদার উঠে পড়লেন এবং ট্রাঙ্ক খুলে নোটের বান্ডিলটা নিয়ে এসে বললেন, "এই নাও তোমার টাকা।"

"থাক না এখন আপনার কাছে।"

"না, এসব ব্যাপারের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখবার ইচ্ছে নেই। এটা নিয়ে যাও তুমি। আমি গরিব স্কুল-মাস্টার, চোর অপবাদ নেবার সাহস আমার নেই।"

"সাহস আপনার আছে, ইচ্ছা নেই বলুন।"

"না, ইচ্ছাও নেই। এ কথা তো আগেই বলেছি। নাও এটা।"

ঝিনুকের নোটের বান্ডিলটা নিয়ে কুটিল হাসি হেসে বলল, "আপনি যে মাইনেটা পান সেটাও কি ন্যায়ত আপনার প্রাপ্য? দরিদ্র দেশের রক্ত শোষণ করে গভর্নমেন্ট যে টাকা সংগ্রহ করছেন আপনি সেই টাকাতেই ভাগ বসিয়েছেন। বসাবার অধিকার আছে কি? গরিব দেশের ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দিয়ে তার জন্য অত মজুরি আপনি নিচ্ছেন কোন যুক্তিতে?"

"আমার বেতন মোটেই বেশি না। যা নিচ্ছি তা না নিলে আমি বাঁচব কি করে?"

"ঠিক ওই যুক্তি দেখিয়ে আপনি তা হলে তৃষিতকে এক গ্লাস জল দিয়ে বা ক্ষুধিতকে এক মুঠো অন্ন দিয়ে তার দাম নেবেন?"

ঝিনুক বুঝতে পারছিল, সে যা বলছে তা যুক্তিহীন, তবু কঠিন কথাগুলো বলে সে যেন তৃপ্তি পেল। তারপর হঠাৎ চুপ করে গেল সে।

নোটের বান্ডিলটা নিয়ে ঝিনুক বসে রইল চুপ করে। এতক্ষণ তার চোখ দুটো হাসছিল, কিন্তু ক্রমশ হাসি নিবে এল চোখের। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে এল ক্রমশ। আরও কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে বলল, "আপনি বিদ্যায় বুদ্ধিতে আমার চেয়ে অনেক বড়। আপনাকে কটু কথা বলবার স্পর্ধা আমার নেই। একটা কথা না বলে কিন্তু পারছি না। যদি অনুমতি দেন তা হলে বলি—"

"বল।"

"স্বার্থপর রাজনীতির কুটিল চক্রান্তে আমরা সবাই বিপন্ন। আমাদের বিপদে কেউ আমাদের সত্যিকার সাহায্য করছে না। আমার নিজেরাই নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে

নিজেদের বাঁচবার পথ সন্ধান করছি। আশা করেছিলাম, আপনি আমাদের সাহায্য করবেন, কিন্তু আমার অনুরোধ আপনি প্রত্যাখ্যান করলেন। আপনার যুক্তি, আমরা বিপথে যাচ্ছি। আমিও সেটা জানি। কিন্তু এ-ও জানি, সুখের দিনে যেটা বিপথ, বিপদে পড়লে অনেক সময় তাই আমাদের রক্ষা করে। গুণ্ডারা যখন আমাদের আক্রমণ করেছিল তখন আমরা রাজপথে চলবার সুযোগ পাইনি, সে পথে চলতে গেলে আমাদের মৃত্যু হত। বিপথে কুপথে চলেই প্রাণ বাঁচাতে হয়েছে আমাদের। দিনে জঙ্গলে লুকিয়ে থেকেছি, রাত্রে জঙ্গলের ভিতর দিয়েই পথ চলেছি। সুপথ দিয়ে চলবার চেষ্টা করলে আমরা কেউ বাঁচতাম না। এখনও যে আমরা নিরাপদ নই, তার প্রমাণ আসামের হত্যাকাণ্ড। মুসলমানরা জোর করে হিন্দুদের মুসলমান করল, এঁরা জোর করে অহিন্দীভাষীকে হিন্দীভাষী করতে চান। এঁদের মুখের বক্তৃতা অর্থহীন বাগাড়ম্বর মাত্র। কিন্তু তবু আমাদের বাঁচতে হবে, আমাদের আত্মসম্মানকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে, পথের শুদ্ধতা নিয়ে খুঁত-খুঁত করলে আমরা মারা যাব। আমার দুঃখ, আপনার মতো বুদ্ধিমান লোকও এই কথাটা বুঝলেন না। অনেক সময় কাপুরুষতা বড় বড় নীতিকথার আড়ালে আত্মগোপন করে থাকে। হয়তো আপনার সাহসের অভাবই আপনি নীতিকথার বক্তৃতায় ঢাকতে চাইলেন। কারণ যা-ই হোক, আপনার মতো মার্জিতরুচি শিক্ষিত লোককে আমরা কাজে লাগাতে পারলাম না বলে দুঃখিত। ডাক্তার ঘোষালের অনেক দোষ আছে। তিনি মাতাল, চরিত্রহীন, কিন্তু আপনার চেয়ে তিনি আমার কাছে ঢের বেশি পূজ্য, কারণ তিনি বিপদের সময় বুক দিয়ে প্রাণ তুচ্ছ করে আমাদের রক্ষা করেছেন এবং এখনও রক্ষা করতে প্রস্তুত। আপনার মতো নিখুঁত নীতিজ্ঞান তাঁর নেই, কিন্তু তাঁর যা আছে তা-ও এ যুগে দুর্লভ, তাঁর বেপরোয়া বলিষ্ঠ আত্মীয়-বাৎসল্য। তিনি আর যাই করুন, আমাদের বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে গা বাঁচিয়ে নীতির মন্ত্র জপতে জপতে সরে দাঁড়াবেন না। আমি চললুম। যাবার আগে একটা অনুরোধ করে যাচ্ছি, আশা করি সেটা রাখবেন— আমাদের কথা যেন কেউ জানতে না পারে। আমাদের গাঁয়ের ছেলে বিশ্বাসঘাতক অ্যাপ্রুভার হয়েছে এ অপবাদের কালি আমার মুখে মাখিয়ে দেবেন না। আমাদের কথা প্রকাশ পেলে শুধু যে আমাদের বিপদ তা নয়, আপনারও বিপদ আছে। আমাদের দলের লোকেরা নির্মম, বিশ্বাসঘাতককে তারা মশা ছারপোকার মতো পিষে মেরে ফেলতে ইতস্তত করে না।

ঝিনুক বেরিয়ে চলে গেল। গণেশ হালদার নির্বাক হয়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর ডায়েরি লিখতে শুরু করলেন।

"ঝিনুক যেন আমার মুখের উপর সপাসপ্ কয়েক ঘা বেত মেরে চলে গেল। তার এ রাগের অর্থ বুঝি, তাই খুব বেশি অপমানিত বোধ করছি না। কিন্তু ও যে পথে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিল সে পথে চলবার সামর্থ্য হয়তো আমার আছে— আমার বুদ্ধি দিয়ে অন্তত ওদের সাহায্য করতে পারতাম— কিন্তু রুচি নেই। ওরা রাগে অপমানে দুঃখে বেদনায় অন্ধ হয়েছে বলে দেখতে পারছে না, যে পথে ওরা চলতে চাইছে সে পথের শেষ কোথায়। আমি কিছুদিন বিদেশে বাস করে এসেছি, ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের সুষ্ঠু প্রকাশ যে দেশে ভদ্রভাবে ফুটেছে, সেই ইংলণ্ডেই আমি ছিলাম। তারা ভালো, খুব ভালো। তাদের ব্যবহার, আলাপ-আলোচনা, সময়জ্ঞান, কর্তব্যনিষ্ঠা, ভদ্রতা, কোনোটাই নিন্দের নয়। দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়, কিন্তু সে দেশে যখন ছিলাম তখন একটা উপমা প্রায়ই মনে হত। ওরা যেন ভালো আমের মতো, সুন্দর, সুগন্ধ,

মিষ্ট রসে ভরা, কিন্তু ভিতরে আঁটি আছে। কিছুদূর গিয়েই ওদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বাধা পায়, আর এগোতে চায় না। ওদের বাহ্যিক ব্যবহার-শোভা বাইরেই নিবদ্ধ, প্রথম কিছুদিন ভালো লাগে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে মন ভরে না, যে সীমা পেরুলে আমাদের মন ভরে সে সীমা ওরা কিছুতেই পার হতে দেয় না। সে বিষয়ে ওরা অত্যন্ত গোঁড়া। ওদের স্বাজাত্যবোধ অত্যন্ত প্রবল। বাইরের কোনো কিছুকেই ওরা অনেকবার না বাজিয়ে আমল দেয় না। এ দেশের অনেক ছেলে ও দেশের অনেক মেয়েকে বিয়ে করেছে জানি, কিন্তু সেই সীমারেখা তারা পার হয়েছে কিনা বলতে পারি না। বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না। বিয়ে করলেও ও দেশে প্রেমের বা একনিষ্ঠতার কোনো গ্যারান্টি নেই। বিবাহ একটা সামাজিক অনুষ্ঠান, নানা কারণে ওরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ওদের দেশে পছন্দ করে বিবাহ করার প্রথা প্রচলিত। কিন্তু ওদের ডিভোর্স কোর্টে ভিড় দেখে মনে হয়, ওদের পছন্দের মাপকাঠিটা খুবই ঠুন্‌কো। আমাদের দেশের ছেলেদের ওরা বিয়ে করে বা তাদের সঙ্গে প্রণয়-লীলায় মাতে। এর থেকে যে সীমারেখার কথা একটু আগে বললাম, তার কোনও খবর পাওয়া যায় না। ওদের বিবাহ বা প্রণয়-লীলা ওদের বাইরের পোশাকের মতোই অনেকটা। বদলাতে দেরি লাগে না। ক্ষণিক মোহে কেনে এবং একটু খুঁত বেরুলেই ফেলে দেয়। আমি যখন ও দেশে ছিলাম তখন দেশের জন্য মন কেমন করত। আমাদের দেশের অনেক দোষ আছে। এখানে হিন্দ-মুসলমানে খুনোখুনি হয়, আমাদের প্রাদেশিকতা আছে, অস্পৃশ্যতার কলঙ্কেও আমাদের ললাট অবলিপ্ত। এ দেশে অনেক অশিক্ষিত, অনেক বেকার, অনেক নিরন্ন। তবু এই দেশের জন্যই প্রাণ কাঁদত ওদেশের সুসজ্জিত পার্কে বসে। আধুনিক হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার কারণ ইংরেজ। আমাদের বিভিন্ন ধর্ম, সামাজিক নিয়ম এবং সংস্কার সত্ত্বেও ইংরেজ আসবার পূর্বে এ ধরনের দাঙ্গা আমরা করিনি। আগে মুসলমান রাজারা অসহায় হিন্দু প্রজার উপর নৃশংস অত্যাচার করেছে এ কাহিনী পড়েছি। কিন্তু এরকম দাঙ্গা আগে হয়নি। ইংরেজদের দেশেও সাম্প্রদায়িক রেষারেষি ছিল। কিছুদিন পূর্বেও (ভিতরে ভিতরে বোধ হয় এখনও) স্কচ এবং আইরিশদের সঙ্গে ওদের যে সম্পর্ক ছিল তাকে প্রেমের সম্পর্ক বলা যায় না। রাজনৈতিক স্বার্থপরতায় অন্ধ হয়ে ওরাও দাঙ্গা করেছে এরকম নজির ইতিহাসে আছে । এরকম দাঙ্গা সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু এরকম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অপরাধে আমরাই একমাত্র অপরাধী এ কথা সত্য নয়। স্বার্থপর মানুষ সব দেশেই আছে, সব দেশেই তারা স্বার্থের তাড়নায় দাঙ্গা খুন রাহাজানি করে থাকে। আমরাও করেছি। কিন্তু আমরা করেছি ইংরেজদের প্ররোচনায়, এখনও যে এসব হচ্ছে তার কারণ শক্তিশালী স্বার্থপর লোকদের উস্কানি। পৃথিবীর সর্বত্রই এরকম হচ্ছে। অস্পৃশ্যতা নিয়ে মহাত্মাজী যে আন্দোলন করেছিলেন তার ফলে পৃথিবীর সভ্যসমাজ জেনেছে যে, আমরা উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এত অধঃপতিত যে, হরিজনদের স্পর্শ করতে আমরা ঘৃণা করি। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তথাকথিত হরিজনদের অনেক সময় স্পর্শ করেন না তা ঠিক, কিন্তু তাদের যে তারা ঘৃণা করেন এ কথা ঠিক নয়। আমাদের দেশেই অনেক হরিজনদের সঙ্গে আমাদের প্রেমের সম্পর্ক আছে। আমরা শ্রীচৈতন্যের দেশের লোক, হরিজন হলেই তাকে অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা করব এতটা নীচ আমরা হতে পারি না। তাদের সঙ্গে কাকা দাদা মামা মাসি পিসি সম্পর্ক এখনও আমাদের আছে। কবীর, দাদু, রজ্জব, রবিদাস আজও আমাদের কাছে পূজ্য। মাদ্রাজের কথা আমি বলছি না, প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই, আমি বলছি বাংলা দেশের কথা। অস্পৃশ্যকে স্পর্শ না করার যে ঐতিহাসিক কারণ আছে তার কি পুনরাবৃত্তি হচ্ছে না আধুনিক যুগেও? আমরা পুরাতন অস্পৃশ্যকে নিয়ে হুজুগ করছি, কিন্তু এখনও

আমাদের দেশে কি নূতন অস্পৃশ্য তৈরি হচ্ছে না? যাঁরা অর্থহীন, যারা বেকার, ক্ষমতাবান রাজনৈতিক নেতারা যাঁদের পৃষ্ঠপোষক নন, বর্তমান যুগে তাঁরা কি নূতন অস্পৃশ্য-গোষ্ঠীতে পড়েননি? এদের দলের কেউ গিয়ে আমাদের দেশের মহামান্য বড়লোকদের কি স্পর্শ করতে পারে? কোনও বড়লোকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ কি সম্ভব তাদের পক্ষে? আইনত হয়তো বাধা নেই, কিন্তু কার্যত আছে। অনেক পুলিশ কর্ডন পার হয়ে, অনেক গুঁতো লাখি খেয়ে, অনেক সেক্রেটারির তোষামোদ করে তবে তাঁদের কাছাকাছি যাওয়ার অনুমতি ক্বচিৎ হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু তা সহজসাধ্য নয়। সব দেশেই এরকম অস্পৃশ্য সৃষ্টি হয়েছে। যে কারণে আজ সব দেশের বড় বড় নেতারা নিজেদের ঘিরে নানারকম দুর্লঙ্ঘ্য বেড়া তৈরি করেছেন, ঠিক সেই কারণেই একদা উচ্চবর্ণের হিন্দুরা আত্মরক্ষার জন্যে অস্পৃশ্যতার বেড়া তৈরি করেছিল। মানব-জাতির ইতিহাসে এরকম বেড়া বহুবার নির্মিত হয়েছে। আমাদের দেশে এই অস্পৃশ্যতার বেড়া হয়তো কালক্রমে লোপ পেয়ে যেত, বাংলা দেশে তেমন উগ্রভাবে এটা ছিলও না, কিন্তু এই হরিজন আন্দোলন হওয়াতে হরিজনদের সঙ্গে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল তাতে ক্রমশ বিদ্বেষের আমেজ লাগছে। মুসলমানদের মতো হরিজনরাও এখন আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায় হয়েছে, তাদের মনে এই কথাটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের আমরা ঘৃণা করতাম এবং সেই পাপের জন্য আমাদের শাস্তি পেতে হবে। তাই চাকরির ক্ষেত্রে এবং জীবনের অন্যান্য উপার্জনের ক্ষেত্রে হরিজনকে তুলে ধরবার জন্য সরকারের সবল সদয় হস্ত আজ প্রসারিত। উচ্চবর্ণের ভালো ছেলেরা তাই আজ যে চাকরি পায় না, হরিজনদের অতি সাধারণ ছেলেরা সেই চাকরি পায়। এর ফলে হরিজনদের প্রতি আমাদের প্রেম বাড়েনি, বরং যেটুকু প্রেম ছিল তাও লোপ পাবার যোগাড় হয়েছে। ধর্মের পার্থক্য অনুসারে বৃটিশ গভর্নমেন্ট এককালে ইলেক্‌শনের প্রবর্তন করেছিলেন বলে কংগ্রেসের খুব আপত্তি হয়েছিল। হরিজনদের ব্যাপারেও বর্তমান সরকার প্রকারান্তরে তাই করছেন। ভবিষ্যতে এর ফল ভালো হবে বলে মনে হয় না। হরিজন সমস্যার বা যে কোনও সমস্যার সমাধান পক্ষপাতদুষ্ট অন্যায় পিঠ-চাপড়ানির দ্বারা হবে না। তাতে শুধু তিক্ততা বৃদ্ধি পাবে মাত্র। হরিজনদের উন্নতি হোক এটা সব শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকই চায়, শুধু হরিজন কেন, সমাজের যে কোনও দুর্দশাগ্রস্ত সমাজই উন্নতি করবার ন্যায্য সুযোগ পাক এটা সকলেরই কাম্য, কিন্তু হরিজন বলেই তাকে অপরের মাথার উপর বসিয়ে দিতে হবে, এ নীতির ভবিষ্যৎ ভালো নয়। নিখুঁত ন্যায়ের নীতি অনুসরণ করবেন আশা করেই আমরা শাসক সম্প্রদায়কে শাসনের উচ্চ-সিংহাসনে বসিয়েছি। যেদিন আমাদের ধারণা হবে তাদের নীতি অন্যায়ের নীতি, পক্ষপাতের নীতি, সেইদিনই সে সিংহাসন টলমল করে উঠবে। আমাদের কপালে অস্পৃশ্যতার যে কলঙ্ক লেপে দেওয়া হয়েছে অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে যে, এরকম অস্পৃশ্যতা পৃথিবীর সব দেশেই কোনো-না-কোনো আকারে বিদ্যমান। ইংলন্ডে বাস করে আমি বুঝেছি, বাইরে তারা আমাদের সঙ্গে মুখে যত ভদ্রব্যবহারই করুক না কেন, মনে-মনে তারা আমাদের অস্পৃশ্য বলেই মনে করে। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, কিন্তু ওই হল সাধারণ নিয়ম। রবীন্দ্রনাথের মতো লোকের সম্বন্ধেও ওদের সত্য মনোভাব এই কিছুদিন আগেও প্রকাশ পেয়েছে ইয়েট্‌স্‌-এর অপ্রকাশিত পত্রগুলি প্রকাশিত হবার পর। রবীন্দ্রনাথ কেন, আমাদের দেশের আরও অনেক মনীষী সম্বন্ধেও ওদের এই একই মনোভাব। সুতরাং ঘৃণা বা অস্পৃশ্যতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য ও দেশে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। আমাদের জাতিভেদ নিয়েও ওরা নানারকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। কিন্তু ওদের দেশে কি

জাতিভেদ নেই? আমাদের দেশে গুণ এবং কর্মই জাতিভেদের মানদণ্ড ছিল, ওদের দেশে একমাত্র মানদণ্ড টাকা। জাতিভেদ ওঠানো বড় শক্ত। তা রূপ বদলে নানা আকার নানা বেশে দেখা দেবেই। আমাদের দেশে দেখতে পাচ্ছি সেকালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আর নেই, কিন্তু গুণ আর কর্ম অনুসারে নূতন নূতন জাতি সৃষ্টি হচ্ছে আবার। ডাক্তার, উকিল, রেলের বাবু, পুলিশের কর্মচারী, কেরানী, ব্যবসায়ী, লেখক, সিনেমা-শিল্পী, রাজনীতির কারবারী, থিয়েটারের লোক—এরা এখন প্রত্যেকে আলাদা আলাদা জাত। ওদের প্রত্যেকের কথাবার্তা, চিন্তাধারা, পোশাক-পরিচ্ছদ নিজস্ব। এদের সঙ্গে অপরের মিল নেই। প্রকৃত ব্রাহ্মণের অভাব ঘটেছে সমাজে। কিন্তু তবু কোথাও যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের আভাস মাত্র দেখা যায়, তা হলে আমরা শ্রদ্ধাভক্তির পসরা নিয়ে ছুটি তাঁর কাছে। বিচার করি না সে ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছে কি না। মহাত্মাজী যে লোকের মনে সাড়া জাগাতে পেরেছিলেন তার প্রধান কারণ এই। সব সমাজেই ভালো মন্দ মানুষ যেমন থাকবে, বিভিন্ন জাতের লোকও তেমনি থাকবে, তাদের বাইরের চেহারাটা বদলাবে কেবল। আর একটু ভেবে দেখলে মনে হয়, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র— এই চারিভাগেই মনুষ্যজাতি স্বাভাবিকভাবে বিভক্ত। ইতিহাসের নানা পর্যায়ে এদের বাইরের চেহারাটা বদলেছে বারবার, কিন্তু মূল সত্যটা বরাবর ঠিক আছে। সুতরাং জাতিভেদ আছে বলে আমাদের খুব বেশি লজ্জিত হবার কারণ নেই। এইসবের ভয়ে নিজের দেশ ছেড়ে পালানো অর্থহীন। বরং এ দেশে থেকেই আমাদের দোষগুলো সংশোধন করবার চেষ্টা করা উচিত। ঝিনুক যে এটা কেন বুঝতে পারছে না, জানি না। আমাদের উপর অবিচার, অত্যাচার অনেক হয়েছে তা সত্য, আমাদের অনেক অভাব আছে তা-ও সত্য, অন্নহীন গৃহহীন বেকার লোকের সংখ্যা এ দেশে অনেক। কিন্তু ওদেশে কি ওদের নেই? ওখানে কি বেকার বিদেশিদের প্রতি সুবিচারই হবে? ও দেশের নিরন্ন অসমর্থ লোক Alms house-এ যে দুর্দশা ভোগ করে, তা পড়েছি। আমাদের দেশের ভিখারীদের অবস্থা তাদের চেয়ে অনেক ভালো। আর কিছু না হোক, তারা অন্তত স্বাধীন। ভিখারীদের ভিক্ষা দেওয়া আমাদের দেশের গৃহস্থেরা এখনও পুণ্য কর্তব্য বলে মনে করেন। ও দেশের বেকার-সমস্যা আরও নিষ্ঠুর, যদিও ওরা একট' ভাতা পায় শুনেছি। কিন্তু তাতে কেউ সন্তুষ্ট নয়। আকাঁড়া ভিক্ষের চালে কেউ সন্তুষ্ট হয় না। আমাদের সরকার রিফিউজিদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু তাতে কেউ সন্তুষ্ট হয়নি। এখান থেকে পালিয়ে ও দেশে গেলেই যে আমরা সুখে থাকব, এ-আশা দুরাশা। ও দেশে গিয়ে রোজগার করতে না পারলেই মহাবিপদ। ও দেশেও রোজগারের পথ সরল নয়। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, বা বিশেষ বিষয়ে কৃতবিদ্য লোকেরা হয়তো কিছু রোজগার করতে পারেন, কিন্তু সাধারণ লোক ওদেশে গিয়ে কল্কে পাবে বলে মনে হয় না। যদি পেত, তা হলেই কি বিদেশে গিয়ে আমরা আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে সুখে থাকতে পারব? যেসব ভারতীয় বিদেশে বাস করছে, তাদের অনেকের মধ্যে স্বাজাত্যবোধের অভাব লক্ষ্য করেছি, যা কিছু ওদেশের তাই যেন ভালো, এই ধরনের একটা দাস-মনোভাব হয়েছে অনেকের। আগেই বলেছি, ওদের মধ্যে বর্ণবৈষম্য-বোধও বেশ আছে। ইংলন্ডের লোকেরা আড়ালে আমাদের সম্বন্ধে যে কথাবার্তা বলে, তা সম্মানজনক নয়। আমেরিকায় তো এই সেইদিনও নিগ্রো-লিনচিং হয়ে গেছে। আমাদের সকলের মন এখন আমেরিকামুখো, কিন্তু সেখানে বাস করে কি আমরা শান্তি পাব? যে ঐতিহ্য, যে সংস্কার, যে সংস্কৃতি আমাদের নিজস্ব এবং যা আমাদের মজ্জাগত, যার অভাবে আমাদের জীবন বিস্বাদ হয়ে যায়, তা ওদেশে নেই। ওদের রুচির সঙ্গে আমাদের রুচি মিলবে না।

ওদেশের যে সামাজিক চিত্র ওদের সাহিত্যে প্রতিফলিত দেখি, তা ন্যক্কারজনক, তা বীভৎস। সেদিন ওদের দেশের Pulitzer Prize পাওয়া একটা নামী নাটক পড়লাম, বইখানা সিনেমাতেও নাকি হিট্ পিক্চার। পড়ে অবাক্ হয়ে গেলাম। এই কি ওদের সমাজের চিত্র নাকি! ওই নাটকের মিলিয়নেয়ার পাত্র-পাত্রীরা যে ভাষায় কথা বলছে, তা এতই অশ্লীল, এতই কুৎসিত যে, তার জোড়া এ দেশের নিম্নতম স্তরে গিয়ে খুঁজতে হবে। খুঁজলেও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এ দেশের হাড়ি-চামার, বাগদি-মেথর, গাড়োয়ান-কুলিরাও বোধ হয় অত কদর্য ভাষায় কথা কয় না। বাপ মা ছেলে বউ পরস্পর যে ভাষায় আলাপ করছে, পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে খোলাখুলিভাবে যেসব উক্তি করছে, তার নমুনা আমাদের দেশের নিতান্ত অশিক্ষিত লোকদের মধ্যেও বিরল। বইটা সম্ভবত ওদের দেশের সমাজকে ব্যঙ্গ করেই লিখেছেন লেখক, কিন্তু সে লেখায় সমাজের যে চেহারা ফুটেছে, তা ভয়ঙ্কর। এই সমাজে গিয়ে ঝিনুকের মতো মেয়ে কি সুখে থাকতে পারবে? আর একটা কথাও মনে হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। আমেরিকার এই প্রভাব আমাদের দেশের সাহিত্যে, সিনেমায় প্রভাব বিস্তার করছে ক্রমশ। সেদিন এ দেশের একটা হিট্ পিক্চার দেখতে গিয়েছিলাম, শেষ পর্যন্ত দেখতে পারলাম না। দু একটা হিট্ বইও পড়েছি, ভালো লাগেনি। সাহিত্যের কাজ দেশকে বড় করা, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, সিনেমা এবং সাহিত্যই আজকাল দেশকে নামিয়ে দিচ্ছে, আমাদের মনকে কলুষিত করছে। পশুত্বের ফলাও এবং নিপুণ বর্ণনা করাটাই আজকাল অনেকের কাছে কৃতিত্ব বলে মনে হচ্ছে। এইসব সংস্কার করাই এখন আমাদের প্রধান কাজ হওয়া উচিত। দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলে তা কি হবে? এ নিয়ে আন্দোলন করাই আমাদের প্রধান কর্তব্য। শুধু এ নিয়ে নয়, আন্দোলন করবার মতো আরও অনেক গুরুতর বিষয় আছে। রাজনৈতিক দাবা খেলার চালে আমাদের দেশকে বিভক্ত করা হয়েছে। ধর্মবুদ্ধি যুধিষ্ঠিরের দ্যূতক্রীড়ার ফলে দ্রৌপদীকেও সভাস্থলে উলঙ্গ করবার চেষ্টা হয়েছিল। চেষ্টা কিন্তু সফল হয়নি। দ্রৌপদী শেষ পর্যন্ত স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আমাদের দেশেও রাজনৈতিক দাবা খেলা শেষ হয়ে যায়নি, এক দানে আমরা হেরেছি, কিন্তু আর এক দানে আমরা জিততে পারি। ভাঙা দেশ আবার জোড়া লেগে যেতে পারে। কংগ্রেসের সেই সনাতন আদর্শকে আমরা ত্যাগ করব কেন? মুসলমান যে আমাদের পর নয়, ভিন্নধর্মী হলেও, তাদের সঙ্গে মতের মিল না থাকলেও, তারা যে আমাদের দেশের লোক, এ কথাটা তারস্বরে প্রকাশ করতে আমরা ছাড়ব না। আমার মা যে গুণ্ডাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছিলেন, যে গুণ্ডাদের অত্যাচারে বুলি আজ নিরুদ্দেশ, যে গুণ্ডাদের দুষ্কৃতির কাহিনী অত্যন্ত রোমাঞ্চকর, তারা যে কতকগুলো মতলববাজ লোকের হস্তচালিত ক্রীড়নক মাত্র, এ কথা আমরা ভুলে যাব কেন? তাদের দুষ্কৃতির বীভৎসতা নিয়ে এখনও যদি আমরা কেবল রোদনই করি, তা হলে তা নিষ্ফল অরণ্যরোদন হবে না? সেই গুণ্ডাগুলো যে একদল পাষণ্ডের হাতের অস্ত্র মাত্র, এ কথা যখন বোঝা গেছে, তখন আমাদের চেষ্টা করতে হবে সেই পাষণ্ডদেরই দমন করবার জন্য। প্রধান পাষণ্ডের দল এ দেশ থেকে উৎখাত হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের চর-অনুচরেরা এখনও এ দেশের আনাচে-কানাচে, এমন কি, সদরে-অন্দরেও ঘোরাফেরা করছে। আমাদের নিজেদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করাই তাদের কাজ, কারণ আমাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধলেই তারা কাজ গুছিয়ে নিতে পারবে। এদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করতে হবে। আর তা করতে হবে আইনসঙ্গত উপায়ে। বেআইনী চোরাপথে আমি চলতে চাই না। The end justifies the means, এ নীতিতে আমি বিশ্বাসী নই। গণতন্ত্র

আমাদের দেশে স্থাপিত হয়েছে, গণতন্ত্রসম্মত উপায়েই আমাদের আন্দোলন চালাতে হবে। সুযোগ পেলে আর একবার চেষ্টা করব ঝিনুককে বোঝাতে। ডাক্তার মুখার্জি কি আমার দলে যোগ দিতে চাইবেন? তাঁকে আমার মনের কথা খুলে বলার ইচ্ছে আছে। কিন্তু তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, তিনি আমাদের নাগালের বাইরের লোক। এখুনি ঝিনুক তাঁর সম্বন্ধে যে সব কথা বললে, তা অবশ্য অবিশ্বাস্য। এ শহরের অনেক লোকই তাঁর উপরে বিরূপ, কারণ পপুলার হতে হলে চরিত্রে যে সব খাদ থাকা দরকার, তা তাঁর নেই। তিনি কারো সঙ্গে মেশেন না, কাউকে কেয়ার করেন না, নিজের জগতে তিনি একাই সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করেন, বাস করবার সঙ্গতি তাঁর আছে। এইটেই অনেকের অন্তর্দাহের হেতু। কিছু করতে না পেরে তাঁর নামে মিথ্যা গুজব রটায়। তিনি যদি দাশু খুড়ো বা হরিশ দাদার মতো সবায়ের সঙ্গে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে পরনিন্দা, পরচর্চা এবং তাস-পাশার আড্ডায় মেতে যেতে পারতেন, তা হলে হয়তো তিনি জনপ্রিয় হতেন। ঘোষাল ডাক্তার জনপ্রিয়। তাঁর চারিত্রিক ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। বরং অনেকে সেগুলো ঢাকতে চেষ্টা করে, সমর্থনও করে কেউ কেউ। ঝিনুকের মতো মেয়েও তাঁর ভক্ত। ডাক্তার মুখার্জি ভিন্ন জাতের লোক। শুনেছি, বড় বড় তপস্বীরা হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশে একা-একা থাকেন। মানুষের সঙ্গ তাঁরা পছন্দ করেন না। জনপ্রিয় হবার লোভ নেই তাঁদের। ডাক্তার মুখার্জি অনেকটা সেই জাতের। কিন্তু তিনি হিমালয়ে যাননি, সমাজে বাস করছেন। মানস-সরোবরের রাজহংস কোন্ খেয়ালে জানি না বাস করছেন এসে পাতিহাঁসদের সমাজে। বাস করছেন বটে, কিন্তু মানস-সরোবরবিহারী হংস তাঁর বৈশিষ্ট্য বর্জন করতে পারেননি। এই বিসদৃশতার জন্য কেউ বিস্মিত হয়নি, সবাই চটে গেছে। মানস-সরোবরের কোনো রাজহংস সত্যি-সত্যি যদি পাতিহাঁসদের মধ্যে এসে বাস করত, তা হলে তারা নিশ্চয় তাকে ঠুকরে ঠুকরে অস্থির করে দিত। আমাদের সমাজের পাতিহাঁসরাও ডাক্তারবাবুকে ঠোকরাবার চেষ্টা অহরহ করছে, কিন্তু আশ্চর্য কৌশলে তিনি তাদের নাগালের বাইরে সরে থাকছেন নির্বিকার ঔদাসীন্যের ডানা মেলে। তনিমা সেনের ওই ব্যাপারটায় পাতিহাঁসের দল প্যাঁক প্যাঁক করবার অনেক খোরাক পাবে। কিন্তু ডাক্তারবাবু যে এ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছেন না, তার প্রমাণ তো আজকে সকালেই পেলাম। তিনি দুর্গাকে দিয়ে বাড়ির কাছে বড় বড় গাছে নানা সাইজের বাক্স হাঁড়ি টাঙাচ্ছিলেন! আমি বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা কি হচ্ছে। জিজ্ঞেস করাতে হেসে বললেন, "পাখিদের জন্যে বাসা টাঙিয়ে দিচ্ছি, যদি কেউ কোনোটাতে দয়া করে ডিম পাড়ে। প্রায়ই পাড়ে না। মানুষকে ওরা সন্দেহের চোখে দেখে, হয়তো মনে করে ওগুলো ফাঁদ, তাই এড়িয়ে চলে। তবু আমি প্রতি বছর চেষ্টা করি যদি দৈবাৎ কেউ আমাকে বন্ধু বলে চিনে ফেলে।" তাঁকে দেখে বা তাঁর কথা শুনে মনে হল না যে, তনিমা বা তনিমা সংক্রান্ত ব্যাপার তাঁর মনে ছায়াপাত করেছে। মাঝে মাঝে ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর কথা আমার মনে হয়। এরকম প্রচ্ছন্ন নিঃশব্দ অস্তিত্ব যে সম্ভব, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতুম না। এতদিন এখানে আছি, তাঁর কণ্ঠস্বর শুনিনি একদিনও। তিনি যে আছেন, তার প্রমাণ পাই শঙ্খধ্বনি শুনে। তারপরই পুজোর প্রসাদ দিয়ে যায় বিজয়। ডাক্তারবাবু এত জায়গায় মোটরে করে ঘোরেন, কিন্তু তাঁকে তাঁর সঙ্গে যেতে একদিনও দেখিনি। অন্তঃপুরের সীমার বাইরে তিনি পা দেন না। অন্তঃপুরেও নাকি বেশি ঘোরাফেরা করেন না। দাই বলছিল, অধিকাংশ সময় পুজোর ঘরে কপাট বন্ধ করে বসে থাকেন। সংসারের সমস্ত ভার ওই বুড়ী দাইয়ের উপর। তবে রান্নাঘরে যান রোজ, রোজই কিছু রান্না করেন। ডাক্তারবাবুর খাওয়ার সময়

কাছে বসেন, আমার খাবার স্বহস্তে গুছিয়ে দেন। খাবারের মধ্যে দিয়ে তাঁর স্নেহস্পর্শ প্রতিদিন পাই। ওই নেপথ্যবাসিনীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর সম্বন্ধে আরও খবর জানতে কৌতূহল হয়। ডাক্তারবাবুর মতো লোকের কি প্রকৃত সহধর্মিণী হতে পেরেছেন তিনি? যে লোকে ডাক্তারবাবুর বসবাস, সেখানে কি প্রবেশ করতে পেরেছেন? তনিমার ঘটনাটা কি তাঁর কানে পৌঁছেছে? এই সব নানা কথা জানতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে তাঁর সঙ্গে যে অদৃশ্য স্নেহসূত্রে ক্রমশ বাঁধা পড়ছি, সেটাকে আরও স্পষ্ট করতে। আশ্চর্য মানুষের মন, আমার রক্তের সম্পর্ক যাদের সঙ্গে, যারা আমার নিতান্ত আপন, তারা কোথায় চলে গেল, তাদের বিয়োগ-ব্যথাটা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে ক্রমশ। ঘটনাচক্রে কোথায় এসে পড়েছি, যারা নিতান্তই অচেনা ছিল, তারাই ক্রমশ চেনা হচ্ছে। শুধু চেনা নয়, প্রতিদিনের পরিচয়ে তাদের আবিষ্কার করছি নূতনরূপে। যে ডাক্তারবাবুকে প্রথমে কত খারাপ লেগেছিল, কত দাম্ভিক মনে হয়েছিল, ক্রমশ তাঁর স্বরূপ যা দেখছি, তাতে মুগ্ধ হয়ে গেছি। তনিমার ব্যাপারটা কি, জানতে হবে। ডাক্তারবাবুকেই জিজ্ঞেস করব একদিন সাহস করে। ঝিনুক যে পথে পা বাড়াতে যাচ্ছে, সে পথ থেকে তাকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করতে হবে। কেন জানি না, ঝিনুকের সম্বন্ধেও আমার কৌতূহল ক্রমশ বাড়ছে। মেয়েটার একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। ও যে খারাপ, এ কথা মন কিছুতেই মানতে চায় না। ওর প্রতি আমার এই ঔৎসুক্য কি শুধু ও আমার গ্রামের মেয়ে বলেই? শুধু এই জন্যই কি ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি? কিছুদিন না গেলে এ প্রশ্নের ঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না।''

টাওয়ার ক্লকে দুটো বাজল। হালদার মশাই ডায়েরি লেখা বন্ধ করলেন।

। ষোলো ।।

কাউকে পুলিশের কবল থেকে রক্ষা করতে বেশ কিছু টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল ডাক্তার ঘোষালের। কাউ যে তার মাকে খুন করে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল এবং শেষে যে কোনও কারণেই হোক নিজে তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল (পুলিশের ধারণা ধস্তাধস্তি করতে গিয়েই পড়ে গিয়েছিল সে) এ সত্যটা পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায়নি। তার মায়ের গলায় যে দাগটা ছিল তার থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছিল যে টুঁটি টিপে তাকে মারা হয়েছে। কিন্তু ডাক্তার ঘোষাল করিতকর্মা লোক, কোথায় কোথায় কি কি তদ্বির করলে কার্যসিদ্ধি হয় তা তাঁর নখদর্পণে, সুতরাং শেষ পর্যন্ত তিনি কাউকে বাঁচাতে পেরেছিলেন। কিন্তু বেশ কিছু টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। টাকা খরচ হয়েছিল বলে কিন্তু তাঁর ক্ষোভ হয়নি— টাকার প্রতি প্রগাঢ় মমত্ব-বোধ তাঁর কোনোদিনই নেই— তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন প্যাঁচে পড়ে টাকাটা খরচ করতে হয়েছিল বলে, অর্থাৎ দাবা-খেলায় হেরে গিয়েছিলেন বলে। কাউ আর কাউয়ের মায়ের সমস্যা তিনি নিজের মতো করেই সমাধান করতেন, প্রায় করেই ফেলেছিলেন, কিন্তু ঝিনুক মাঝখান থেকেই বাহাদুরি করে নিজের গয়নাগুলো কাউয়ের মাকে দিয়ে দেওয়াতেই এই ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হল। আরও মুশকিল ঝিনুক এমন একটা কাণ্ড করতে লাগল যেন দোষটা ষোল আনা তাঁরই এবং ঝিনুক যা করছে সেইটেই সে দোষ-স্খালনের একমাত্র উপায়। খরচ তো যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু ঝিনুক তাতেও সন্তুষ্ট নয়। বলছে, কাউয়ের নামে কিছু টাকা পোস্টাফিসে জমা করে দিতে হবে। ঝিনুক মনে করছে এসব করে সে খুব একটা বাহাদুরি করছে। কিন্তু ওই সব ছোকরা হাতে টাকা পেলে যে কি মূর্তি ধরবে

তা তার ধারণা আছে কি? ঝিনুকের এই ঘর-জ্বালানে পর-ভুলানে মনোবৃত্তিতে দিক হয়ে উঠেছেন ডাক্তার ঘোষাল। তাছাড়া আর একটা থাপ্পোড়ও খেয়েছেন তিনি তনিমার ব্যাপারে। তনিমা তাঁকে কলা দেখিয়ে পাঁচটি হাজার টাকা বাগিয়ে নিয়ে কলকাতায় চলে গেছে। তা যাক্, ওরকম অনেক মেয়েমানুষ তিনি পার করেছেন, সে জন্য তাঁর কোনো দুঃখ নেই, কিন্তু বিপদে ফেলেছে ঝিনুক। সুঠাম মুকুজ্যের নামের সঙ্গে তনিমার নাম জড়িয়ে নানারকম গুজব রটছে শহরে। মিস্টার সেন নাকি শাসিয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি ডাক্তারবাবুর নামে কেস করবেন। ঝিনুক বলছে, যদি কেস করেন তাহলে আসল কথাটা ডাক্তার ঘোষালকে কোর্টে গিয়ে বলতে হবে। বলতে হবে তিনি জানেন তনিমা সেন ভ্রষ্টা মেয়ে, দরকার হলে তাঁর সঙ্গে তনিমার যে দৈহিক সম্পর্ক ঘটেছিল সেটাও আদালতে প্রকাশ করতে হবে। এর কোনও মানে হয়? এতে মিস্টার সেনের কেস হয়তো ফেঁসে যাবে, ডাক্তার মুকুজ্যের সুনামও হয়তো রক্ষা পাবে, কিন্তু নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা-ভঙ্গ করা কি হাস্যকর নয়? তা ছাড়া মিস্টার সেনকে চটিয়ে তাঁর ক্ষতি বই লাভ নেই। মিস্টার সেনের সাহায্যে তিনি এখানে অনেক রকম সুবিধা পেয়েছেন, তাঁর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করাটা কি উচিত হবে? উচিত যে হবে না তা তিনি মনে মনে বুঝছেন, তিনি জীবনে যে নীতি এতকাল অনুসরণ করে এসেছেন সে নীতি অনুসারে গর্হিত কাজ হবে এটা। অধর্ম হবে। শয়তানদেরও একটা নীতি-শাস্ত্র থাকে, সে শাস্ত্রেরও মেরুদণ্ড ইমান, এই ইমানের জোরেই তাদের সংহতি টিকে থাকে। সে ইমান বিসর্জন দেওয়ার অর্থ সমস্ত দলটাকেই বিপদের মুখে এগিয়ে দেওয়া। শয়তানদের বিচারে বেইমানের শাস্তি মৃত্যু। মৃত্যু-ভয় ঘোষালের নেই, অনেক আসন্ন মৃত্যুর হাত এড়িয়েছেন তিনি, এ বিশ্বাস তাঁর আছে, মৃত্যু যেদিন আসবে সেদিন কেউ তা ঠেকাতে পারবে না। আগে থাকতে সে ভয়ে ভীত হবার কোনো অর্থ খুঁজে পান না তিনি। আসল কথা তাঁর বিবেকে বাধছিল। যে মিস্টার সেন তাঁর এবং তাঁর সুপারিশে অনেক রেফিউজিদের উপকার করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলে পাপ হবে, বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। এই কথাটাই বারবার মনে হচ্ছিল তাঁর। ঝিনুক কিন্তু কিছুতেই কথাটা বুঝতে চাইছে না। তার স্বভাবের মধ্যে এমন একটা একগুঁয়েমি আছে যা অনড়, ডাক্তার ঘোষালের মতে, পশুদের মধ্যে যা কেবল খচ্চরদের মধ্যেই দেখা যায়।

কাল রাত্রেই ঝিনুক তাঁকে বলেছে, তোমার পাপের বোঝা ডাক্তার মুখার্জির ঘাড়ে তুলে দেবে তুমি, এ আমি কিছুতেই হতে দেব না। তুমি যদি নিজে না বল, আমি গিয়ে প্রকাশ করে দেব কথাটা আদালতে সবার সামনে।

এ বিপদ তিনি নিজেই ডেকে এনেছেন। ঝিনুকের কাছে তিনি কিছু লুকোতে পারেন না, এমন কি নিজের দুষ্কৃতির কথাও না। তনিমা সেনকে কি করে তিনি মোরব্বার মতো গ্রাস করেছিলেন তার সালঙ্কার সরস বর্ণনা নিজেই তিনি করেছেন ঝিনুকের কাছে। এখন মুশকিল হয়েছে। অথচ ঝিনুকের বিরুদ্ধে তিনি কিছু করতে পারছেন না। তাকে জুতো ছুঁড়ে মেরেছেন, চুলের ঝুঁটি ধরে ভূশায়ী করেছেন, কোনও ফল হয়নি। ঝিনুকও তাঁকে মারের পাল্টা জবাব দিয়েছে। তার ঘুষির জোর যে কতখানি তা তিনি অনুভব করেছেন তাঁর ঘাড়ের ব্যথা থেকে। ঝিনুককে যে কিছুতেই নোয়ানো যাবে না এটা তিনি নিঃসংশয়ে বুঝেছেন। ঝিনুক নিজে চোরাই-মাল-পাচারে একজন সহকারিণী। এজন্য তার মনে কোনও গ্লানি নেই, এজন্য তার বিবেক তাকে দংশন করে না, কারণ সে ওই চোরাই টাকার সঙ্গে একটা আদর্শ জড়িয়ে আছে। অনেকে খড়্গের সঙ্গে ধর্ম জড়িয়ে পাঁঠা

খাওয়ার লোভটাকে মহনীয় করে তোলে যেমন, অনেকটা তেমনি। একথা ভেবেই কিন্তু ঘোষালের মনে হয়েছিল উপমাটা ঠিক হল না, ও চোরাই টাকার এক আধলাও নিজের জন্য খরচ করে না। টাকাগুলো কোথায় রেখেছে তা-ও বলে না কাউকে। ঝিনুকের সংসার চলে তাঁর টাকায় আর শামুকের টাকায়। ঝিনুকের ঘরটার ভাড়াও তিনি দেন। ঝিনুক যে টাকাটা চোরাবাজার থেকে রোজগার করে তা দিয়ে শেষ পর্যন্ত ও কি করবে, ওর আদর্শ কি, এসব নিয়ে কোনও আলোচনাই সে করতে চায় না ঘোষালের সঙ্গে। বলে, পরে বলব। রাগে ঘোষালের সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। কিন্তু কিছু করবার উপায় নেই। ঝিনুক তাঁর জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সে তাঁর সংসারে নেই, একথা তিনি ভাবতেও পারেন না এখন। তাঁকে দূর করে দেবার সামর্থ্য অনেক আগেই তিনি হারিয়েছেন। বরং এই ভয় মাঝে মাঝে তাঁর হয়েছে— মেয়েটা ওই মিনমিনে মাস্টারটার সঙ্গে জুটল না তো। কিন্তু ঝিনুক যে ঠিক ও জাতের মেয়ে নয় এ প্রত্যয়ও তাঁর আছে। মহামুশকিলে পড়েছেন তিনি ওকে নিয়ে। ইতিপূর্বে যেসব মেয়েমানুষ নিয়ে তিনি থেকেছেন, তাদের সঙ্গে সোজাসুজি স্ত্রীর মতোই থেকেছেন, পছন্দ না হলে দূর করে দিয়েছেন, কিন্তু এর সঙ্গে অন্য চালে চলতে হচ্ছে। ঝিনুক তাঁকে বিয়ে করতে চায় না, স্ত্রীর মতো তাকে ব্যবহারও করা যায় না। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আর কিছুতেই এগোতে পারেন না ঘোষাল। ঝিনুকের কঠিন ব্যক্তিত্বের দেওয়াল উত্তুঙ্গ, তা অনতিক্রম্য মনে হয় তাঁর কাছে।

এইরকম যখন তাঁর মনের অবস্থা তখন গণেশ একদিন রবিবারে এলেন তাঁর বাসায়। গণেশ হালদার এসেছিলেন দুটো উদ্দেশ্যে। প্রথম, ডাক্তার মুকুজ্যের সম্বন্ধে গুজব কতদূর ছড়িয়েছে এবং সে সবের কোনও সত্যি ভিত্তি আছে কিনা তা জানবার জন্য। ডাক্তার মুখার্জি সম্বন্ধে আর একটা গুজবও সম্প্রতি তিনি শুনেছেন এবং শুনে খুব বেদনাবোধ করেছেন। ডাক্তার মুখার্জির স্ত্রী নাকি তাঁর স্ত্রী নন, ওঁকে নাকি তিনি কোথা থেকে 'ভাগিয়ে' এনেছেন এবং সেইজন্যই নাকি ভদ্রমহিলা বাড়ির বার হন না। এসব খবর ডাক্তার মুখার্জির কানে সম্ভবত পৌঁছয় না, কারণ এসব গুজব যে জাতীয় লোকেরা ছড়ায় তাদের সঙ্গে তিনি কোনও যোগাযোগ রক্ষা করতে চান না। বাইরের লোকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয় তাঁর ল্যাবরেটরিতে এবং যারা সেখানে আসে তারা প্রায়ই অবাঙালী। তিনি এবিষয়ে নির্বিকার হলেও গণেশ হালদার নির্বিকার থাকতে পারছেন না। তাঁর মন ক্রমাগতই বলছে, এ অন্যায় হচ্ছে, ঘোরতর অন্যায়, এর প্রতিবাদ করা উচিত। কিন্তু কোথায় কার কাছে কিভাবে প্রতিবাদ করবেন? ঝিনুকের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করে বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছেন তিনি। তারপর ঝিনুকের দেখাও আর তিনি পাননি। তাঁর আসার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য— ঝিনুকের দেখা যদি পান।

গণেশ হালদারকে দেখে নকল উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ঘোষাল।

"হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। এ কি সৌভাগ্য, What a piece of good luck! পথ ভুলে না কি!"

গণেশ হালদার এখানে আসার একটা ওজুহাত মনে মনে ঠিক করেই এসেছিলেন।

"শুনছি কাউয়ের মা নাকি কুয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। তার জন্যে আপনাকে নাকি খুব বেগ পেতে হয়েছিল?"

"হ্যাঁ, ওই আমার ললাটলিপি। Thats how I have been treated all along —

চিরকালই ওই হয়েছে। আমি চরিত্রবান শুকদেব নই, I suffer from the hunger of the flesh এবং সে ক্ষুধা মেটাবার সুযোগ পেলে আমি ছাড়ি না। কিন্তু তার জন্যে ন্যায্য এবং অনেক সময় অন্যায্য মূল্য আমি দিয়েছি। I have cheated বা deprived none, কিন্তু তবু আমাকে দাগা দিতে কেউ ছাড়েনি। সিংকিং সিংকিং ওয়াটার ড্রিংকিং যারা করে, আমি সে জাতের লোক নই। তাই আমাকে বেশি ভুগতে হচ্ছে। ওই আপনার সুঠাম ডাক্তার পরিচ্ছন্ন হাঁসটির মতো দিব্যি ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছেন। লোকে ভাবে উনি মহাপুরুষ, কিন্তু ওঁর নামে যা-সব শুনছি তাতো ভয়ানক!”

“কি শুনছেন?”

“ন্যাকা সাজছেন কেন মশাই। আপনি কি শোনেননি কিছু? শহরে ঢি ঢি পড়ে গেছে, মিস্টার সেন মামলা করবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন, আপনার কানে এ-সব যায়নি?”

“কিছু কিছু গেছে বই কি। কিন্তু যা শুনেছি তা বিশ্বাস করতে পারছি না। ডাক্তার মুখার্জির ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেয়েছি বলেই বিশ্বাস করতে পারছি না, মনে হচ্ছে ওসব গুজব মিথ্যা। আপনার কাছে এসেইছি সেইজন্যে। এ-সব গুজবের কোনও ভিত্তি আছে কি সত্যি?”

“আছে বই কি। আপনিই বলুন না, উনি যা করেছেন বিনা স্বার্থে কেউ কি তা করে?”

“উনি কি করেছেন তাও তো আমি ঠিক জানি না!”

“উনি তনিমাকে নিয়ে রাত্রে ঘোঘার মাঠে কাটিয়েছেন, তারপর ওকে নিয়ে একটা নির্জন বাড়িতেও নাকি ছিলেন। তারপর তাকে সঙ্গে করে এনে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সাহায্যে পুলিশ প্রোটেক্‌শন দিয়ে কলকাতায় পাঠিয়েছেন। যে বাড়িতে তনিমা উঠেছে সেখানে, সেটাও নাকি ওঁর বাড়ি। এত কাণ্ড উনি বে-ফয়দা করে যাচ্ছেন? A tiger stalking a deer for nothing?”

“আমি কিন্তু ওঁর সম্বন্ধে দু-একটা ঘটনা জানি তার থেকে মনে হয় ‘ফর নাথিং’ উনি অনেক কাজ করেন। এমন সব কাজ করেন, যার অর্থ আমাদের মতো লোকে খুঁজে পায় না। উনি মাঠের বুনো জংলী গাছকে সার দিয়ে সতেজ করবার চেষ্টা করেন, পাখির বাসা থেকে পাখির ছানা পড়ে গেলে সেগুলো শুধু তুলেই দেন না, যাতে তারা নিরাপদে থাকতে পারে, সেজন্য বাজার থেকে খাঁচা কিনে সেটা গাছে টাঙিয়ে দেন। এ-রকম অনেক বাজে কাজ করে আনন্দ পান উনি—”

“তাই না কি! Is it so?”

ডাক্তার ঘোষাল দাঁড়িয়ে উঠলেন, চোখ দুটো বিস্ফারিত করে চেয়ে রইলেন হালদারের দিকে। তারপর আবার বসে পড়লেন হঠাৎ।

“বুনো গাছ আর জংলি পাখির দিকে ঝোঁক আছে নাকি লোকটার? That's something, শুনে লোকটার উপর শ্রদ্ধা বাড়ল একটু। আমারও ছেলেবেলায় ওই সব বাতিক ছিল। ছেলেবেলায় একবার গাছে চড়ে ধনেশ পাখির বাসায় হাত ঢোকাতে গিয়ে বিরাট এক ঠোক্কর খেয়েছিলাম। হাতে এখনও দাগ আছে, এই দেখুন। অভ্যাসটা এখনও ঠিক ছাড়তে পারিনি। আজকাল মানুষ-ধনেশ-পাখির বাসায় হাত ঢুকিয়ে ঠোক্কর খাচ্ছি।”

ডাক্তার ঘোষাল হলদে দাঁত বার করে তাঁর সেই আকর্ণ-বিস্তৃত হাসিটি হাসলেন। বললেন, “মাথায় ছিট্ থাকলেও লোকটা ডাক্তার হিসাবে পণ্ডিত। আমি গত ছ মাস ধরে একটা

লোকের ডিসপেপ্‌সিয়ার চিকিৎসা করছিলাম নানারকম ওষুধ বদলে বদলে। He is a milch cow, বেশ শাঁসালো লোক, বেশ দু'পয়সা হাতাচ্ছিলাম তার কাছ থেকে রোজ। একদিন সে সুঠাম মুকুজ্যের কাছে গেল। তিনি ওর পেটে হাত দিয়ে টিপেটুপে বললেন, মনে হচ্ছে ক্যানসার হয়েছে, X-Ray করান। X-Ray করিয়ে দেখা গেল উনি যা বলেছেন তা ঠিক। ওঁর কাছেই চিকিৎসা করাতে গিয়েছিল সে। উনি সাফ জবাব দিয়েছেন— ও রোগ ভালো করবার বিদ্যে আমার নেই। That's something, মন দিয়ে প্র্যাক্‌টিস করলে ওঁর প্রচণ্ড প্র্যাকটিস হত। কিন্তু তা না করে উনি বনে-জঙ্গলে, মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ান। Very funny and very strange : কেন বলুন তো?"

ডাক্তার ঘোষাল একটু ঝুঁকে ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন সামনের দিকে, যেন দুর্নিরীক্ষ্য একটা কিছু দেখছেন।

তারপর বললেন, "ঠিক বুঝতে পারছি না। I may be wrong, হয়তো ভদ্রলোকের সম্বন্ধে ভুল ধারণাই করে বসে আছি। কিন্তু ভুল শুধরে নিতে আমি সর্বদাই তৈরি— I am always ready for correction— আচ্ছা উনি সমস্ত দিন করেন কি?"

"সমস্ত দিনের খবর জানি না। সকাল বেলা উনি নিজের পোষা জন্তু-জানোয়ারদের নিয়ে খেলা করেন। নিজের বাগানটিতে ঘোরাফেরা করেন। প্রত্যেকটি গোলাপ গাছের কাছেই অনেকক্ষণ থাকেন, দূর থেকে মনে হয় তাদের সঙ্গে যেন আলাপ করছেন। ওঁর চাকর দুর্গা বলছিল গোলাপের কুঁড়িগুলো ফুল হয়ে ফুটতে কত সময় নেয় তার একটা হিসাবও নাকি রাখছেন উনি নিজের নোটবুকে। মাকড়শা, পোকা, প্রজাপতি এদের সম্বন্ধে ওঁর কৌতূহলের অন্ত নেই। আজকাল উনি মেতে আছেন ওঁর গাই মঙ্গলাকে নিয়ে। শিগ্‌গিরই তার বাচ্চা হবে। তাছাড়া পাখিদের বাসা বাঁধবার জন্যে বাক্স, হাঁড়ি, নারিকেলের মালা, বিস্কুটের টিন টাঙিয়ে বেড়াচ্ছেন চারিদিকে—"

"লোকটা উন্মাদ নাকি!"— বলে উঠলেন ডাক্তার ঘোষাল— "Is he mad? এ লোকের তো পাগলা গারদের বাইরে থাকা উচিত নয়। হোয়াট! সত্যিই এসব করেন?"

"এসব তো করেনই, মাঠে-ঘাটে জঙ্গলে গিয়ে যে কি করেন তা ঠিক জানি না। ওঁর ড্রাইভার বেচুও জানে না। কারণ তাকেও দূরে বসে থাকতে হয়। তবে আমি আভাস পাই কিছু-কিছু।"

"ফলো করেন নাকি?"

"না। উনি মাঠে-ঘাটে বসেই রোজ কিছু লেখেন। সেইগুলো আমি টুকি।"

"কি লেখেন? ডায়েরি?"

ঘোষাল উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিলেন।

"না, ঠিক ডায়েরি নয়। নানা ধরনের কথা থাকে তাতে, অনেক রকম এলোমেলো চিন্তা। সামান্য সামান্য বিষয়, পড়তে কিন্তু বেশ লাগে।"

"অদ্ভুত স্যাম্পল্‌ দেখছি। Truth is stranger than fiction ! ওঁর বিয়ে হয়েছে?"

"হ্যাঁ"

"কিন্তু ওঁর স্ত্রীকে তো বাইরে কেউ কখনও দেখেনি। আজকালকার স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে এটা কি ভাবা যায়? স্ত্রীটি কাল্পনিক নয় তো, I mean, fictitious নয়তো?"

না, না। তবে মনে হয় সেকেলে ধরনের। বাড়ির বাইরে যেতে চান না। আমি ওঁর বাড়িতে খাই, রোজ রান্না করে পাঠান উনি। শুনেছি ঠাকুরঘরেই বেশির ভাগ সময় কাটান, পর্দাটা বেশি মানেন।"

"ছেলেপিলে নেই?"

"না।"

"পরিবারে তার কে আছে?" কেবল দ্যাবা আর দেবী?"

"পরিবার মস্ত। দাই চাকরদের ছেলেমেয়েরা ওঁর বাড়িতে থাকে। দাইয়ের নাতি বিজয় ওঁর বাড়ির একজন প্রধান লোক। তাছাড়া গরু, কুকুর, মুরগি, গিনিপিগ, ভেড়া এরাও পরিবারের পরিজন। আমি আছি। তাছাড়া দু'তিনটি ভিখারীও ওঁর বাড়িতে প্রায় রোজই খেয়ে যায়।"

ডাক্তার ঘোষাল ভ্রূকুঞ্চিত করে নাকের বড় বড় লোমগুলো টানতে লাগলেন। তাঁর চোখ দেখে মনে হচ্ছিল তাঁর ভিতরে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব তখনও চলছে।

"আর একটা কথা"— গণেশ হালদার বললেন— ঝিনুক কিছুদিন আগে রাত্রে ডিস্‌ট্যান্ট সিগনালের কাছ থেকে যে ব্যাগটা তুলে এনেছিল তা উনি জানেন। কাছেই টিলাটার উপরে বসে নক্ষত্র দেখছিলেন। ঝিনুকের ব্যাপার সব স্বচক্ষে দেখেছেন। ঝিনুকের একজন সহকর্মী ওঁর দিকে গুলিও চালিয়েছিল, কিন্তু উনি কাউকে কিছু বলেননি। আমি এটা জেনেছি ওঁর লেখা থেকে। উনি অনায়াসে পুলিশে খবর দিতে পারতেন, কিন্তু কিচ্ছু করেননি। এর থেকেই বুঝতে পারবেন লোকটি কি চরিত্রের। মনে হয় ঝিনুককে দেখে ওঁর ভালোও লেগেছে—"

হঠাৎ ডাক্তার ঘোষাল গর্জন করে উঠলেন, Let Jhinuk alone। ঝিনুককে নিয়ে আপনারা দেখছি সবাই বড্ড বেশি মাথা ঘামাচ্ছেন। You need not।"

বাঘের দৃষ্টির মতো হিংস্র হয়ে উঠল তাঁর দৃষ্টি।

"আমরা মাথা ঘামাতে যাব কেন। কি আশ্চর্য!

"ইউ নিড্‌ নট্‌।"

অন্য দিকে চেয়ে পা দুটো দোলাতে লাগলেন ডাক্তার ঘোষাল।

এরপর গণেশ হালদারের উঠে আসা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি উঠতে পারলেন না। তিনি এটা বুঝতে পারছিলেন যে সুঠামবাবুর স্বপক্ষে যতটা বলবার তিনি তা বলেছেন, আর কিছু বলবারও নেই, ডাক্তার ঘোষালকে এসব বলে কোনও লাভ আছে কিনা তা-ও অনিশ্চিত, তবু তিনি উঠতে পারছিলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিল তাঁর কাজ এখনও বাকি আছে কিছু। ঝিনুকের সঙ্গে দেখা হয়নি। ঝিনুক কোথায় তা এখন ডাক্তার ঘোষালকে জিজ্ঞাসা করবার সাহসও হচ্ছিল না তাঁর। তবু তিনি বসে রইলেন। আশা করছিলেন ঝিনুক হয়তো অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়বে। কিন্তু এল না। কাউ এল বাড়ির পিছন দিক থেকে। তার হাতে শাণিত একটা খড়গ। সে কারও দিকে না চেয়ে ভিতরের দিকে চলে গেল।

"কাউয়ের হাতে অত বড় খাঁড়া কেন?"

"গড্‌ নোজ (God knows), শুনেছি কোথায় নাকি কালীপুজোর আয়োজন করছে ঝিনুক। পাঁচ ছ'দিন থেকে ওই খাঁড়াটা শানাচ্ছে কাউ, শুনছি ওই নাকি পাঁঠাটা কাটবে। নিজের মাকে খুন করে এখন কালী মার পুজো হচ্ছে। Damned rascal।"

গণেশ হালদার খবরটা শোনেননি। চমকে উঠলেন।

"ওর মাকে ওই খুন করেছে? বলেন কি। শুনলাম কুয়ায় পড়ে—"

"ওসব আই ওয়াশ (eye wash) আসল খবরটা আপনি শোনেননি বুঝি। তাহলে আর বলব না। ঝিনুক শুনলে তেড়ে আসবে আমাকে। আমার ধারণা ছিল এখবর আপনি অন্তত শুনেছেন। আপনার না শোনবার ক্ষমতা দেখছি অদ্ভুত! I wonder how you manage to keep your ears shut ! কানে তুলো গুঁজে থাকেন নাকি!"

"না, তা থাকি না"— হেসে জবাব দিলেন হালদার মশাই— "মিশি না তো কারো সঙ্গে, তাই শুনিনি। খবরটা শুনে আশ্চর্য হলাম।"

ডাক্তার ঘোষাল এদিক-ওদিক চেয়ে চুপি চুপি বললেন, "এই হচ্ছে ফ্যাক্ট। নিজের মায়ের টুঁটি টিপে মেরে তাকে ও কুয়োয় ফেলে দিয়েছিল। ওকে বাঁচাবার জন্যে ঝিনুকও ওকে কুয়োয় ঠেলে ফেলে দেয়। That was a brilliant brain wave she had, তা না হলে ওকে বাঁচানো যেত না। দেখবেন, ঝিনুক যেন জানতে না পারে যে কথাটা আপনি আমার কাছে শুনেছেন। পুলিশে নিয়ে গেলেই আপদ চুকে যেত, কিন্তু ঝিনুক thinks otherwise : তার মতে পিতা হিসেবে ওর প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে। সুতরাং হু হু করে আমার অনেকখানি রুধির বেরিয়ে গেল। I had to bleed through my nose" —তারপর গর্জন করে উঠলেন— "কিন্তু সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে, বেশি জোরে টানলে লোহার শিকলও ছিঁড়ে যায়। ঝিনুক এটা বুঝতে পারছে না।"

"ঝিনুক হয়তো শিকলটা ছিঁড়তেই চায়"— বললেন হালদার।

"তার মানে? What do you mean by this? এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কোনও কথা হয়েছে নাকি! দেখুন মশাই, একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি, ঝিনুককে আমার বিরুদ্ধে নাচাবেন না। ও মেয়ে নানারকম আজগুবি হুজুকে নাচবার জন্যে পা বাড়িয়েই আছে, আপনি যদি মাদল ঘাড়ে নিয়ে ধিতাং ধিতাং করে এগিয়ে আসেন তাহলে তো সামলানো যাবে না। And it will have serious consquences— আমার ঘাড়ের লোম খাড়া হয়ে গেলে আমি কি.যে করব তা আমি নিজেই জানি না। রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যেতে পারে। আমাকে ক্ষেপাবেন না প্লীজ, ক্ষেপে গেলে I become a ferocious brute, সাবধান করে দিলুম। আপনাদের মতো মাস্টারদের হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান নেই, না বুঝে 'ইনোসেন্টলি' অনেক 'মিসচিফ্' করে বসেন আপনারা। I warn you।'

গণেশ হালদারের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল।

বললেন, "আমি আপনার বিরুদ্ধে ঝিনুককে কিছু বলিনি। ওসব প্রবৃত্তি আমার নেই। কিছু বলিনি, বলবও না। তবে আপনাকেও অনুরোধ করছি, আমাকে ভয় দেখাবেন না, আপনার মতো আমিও বাঙাল। রেগে গেলে আমারও জ্ঞান থাকে না। আমি আপনার মতো খিস্তিতে পাবদর্শী নই, কিন্তু 'বক্সিং'-এ আমার কিঞ্চিৎ পারদর্শিতা আছে—"

ডাক্তার ঘোষাল তাঁর বলিষ্ঠ ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন 'শেকহ্যান্ড' করবার জন্যে, আর বাঁ হাতটা তুলে বললেন, "বাস্ করো রামদাস!"

গণেশ হালদার শেকহ্যান্ড করলেন না, গুম হয়ে বসে রইলেন।

ঘোষাল কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন।

বললেন, "Come, shake hands, হাতে হাত মেলান।"

গণেশ হালদারের পক্ষে গাম্ভীর্য বজায় রাখা শক্ত হল। হেসে তিনি শেকহ্যান্ড করলেন। তারপর বললেন, "আপনার ওই 'বাস করো রামদাস' কথাটার মানে তো বুঝলাম না।"

আকর্ণ-বিস্তৃত হাসিটি হাসলেন ঘোষাল। হাসিমুখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "এর উত্তর দিতে হলে ছেলেবেলায় ফিরে যেতে হয়। ছেলেবেলায় আমার বাতিক ছিল টাইমটেবল পড়া আর স্টেশনে গিয়ে ট্রেন attend করা। এমন কি গভীর রাত্রেও যেসব ট্রেন আসত, তাও attend করে যেতাম। অদ্ভুত ভালো লাগত। একদল অচেনা লোক হু হু করে আসছে, আবার হু হু করে চলে যাচ্ছে। বেশ লাগত। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, অথচ যেন বাইরে নয়। এই থেকেই পরে দেশভ্রমণ করবার নেশা চাপে আমার। রাত দুটোয় একদিন স্টেশনে গেছি। দিল্লি থেকে একটা গাড়ি আসছে। কুলিরা সারি সারি শুয়ে ঘুমুচ্ছে প্ল্যাটফর্মে। এমন সময় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান একটা গার্ড এল খট্‌খট্ করে। সাদা-সুট-পরা, পায়ে কুচকুচে কালো বুট, ইয়া পাকানো কুচকুচে কালো গোঁফ। ঘুমন্ত একটা কুলিকে লক্ষ্য করে বললে— রামদাস উঠ যাও, ট্রেন আতা হ্যয়। রামদাস তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সাড়া পর্যন্ত দিলে না। তাগড়া জোয়ান অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সাহেব তখন এগিয়ে গিয়ে তার পেটে মারল এক লাথি। তড়াক করে উঠে পড়ল রামদাস এবং সঙ্গে সঙ্গে যা করল তাতে অবাক হয়ে গেলাম। ঠাস্ ঠাস্ করে চড়াতে লাগল সাহেবটাকে। তিনটে প্রচণ্ড চড় খাওয়ার পর সাহেব হাত তুলে বলে উঠল,— বাস্ করো রামদাস। উই আর কুইটস্। আপনার মেজাজ গরম হওয়াতে সেই কথাগুলো মনে পড়ে গেল। রাগ করবেন না, I am also a very helpless man, আর দয়া করে এমন কিছু করবেন না যাতে ঝিনুক আমার উপর বিগড়ে যায়। I am a sinking man and she is a buoy। হ্যাঁ জীবন-সমুদ্রে ওই আমার ভেলা এখন। ওর জোরেই ভেসে আছি। ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন না আপনারা, অবশ্য যদি নিতে চেষ্টা করেন আমি ছাড়ব না, শেষ পর্যন্ত লড়ব, I shall fight tooth and nail to the last, কিন্তু তা সত্ত্বেও ও বেহাত হয়ে যেতে পারে এ-ও জানি। তাই আপনাদের অনুরোধ করছি—"

গণেশ হালদারের হাত দুটো জাপটে ধরলেন ঘোষাল।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গণেশ হালদার বললেন, "কেড়ে নেবার কথা কেন মনে হচ্ছে আপনার? আমার মনে তো ওরকম কোনও কল্পনাও জাগেনি কোনোদিন। এসব কথা আপনার মনে জাগছে কেন?"

"কারণ আমি নীচ, because I am a mean fellow, আমি নিজে অনেকের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছি, তাই মনে-হয় সবাই আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে উদ্যত। পৃথিবীতে ভদ্রলোক আছে শুনেছি, কিন্তু তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারিনি। হয়তো দু-একজন আমার কাছে আসতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আমি তাদের বিশ্বাস করিনি, সন্দেহের বল্লম উঁচিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। আমার বিশ্বাস ভদ্রলোক কেউ নেই, সবাই স্বার্থপর পশু। আপনাদের কথা ঠিক জানি না, কারণ আপনাদের পুরো পরিচয় এখনও পাইনি। তবে আপনার মুখে যা শুনলাম তাতে সুঠাম ডাক্তারকে ভালো লেগেছে—don't know—শেষে কি দাঁড়াবে, ধোপে টিকবে কি না।"

"ঝিনুককেও কি আপনি স্বার্থপর পশু মনে করেন?"

"আমি লোলুপ পুরুষ আর ঝিনুক রূপসী যুবতী। ওর সম্বন্ধে আমার opinion কি কখনও correct হতে পারে? আমি রঙীন চশমা পরেছি যে। ওর ভদ্রতা, ওর শুচিতা, ওর আত্মসম্মান রক্ষা করবার চেষ্টা— আমার চোখে সবই ছলনা। তবে এটা বুঝেছি ওর জাত

একটু আলাদা। ওকে সহজে পোষ মানানো যাবে না, she is a tough nut to crake — আপনাদের কাছে শুধু অনুরোধ আপনারা এর মধ্যে এসে পড়বেন না, please keep the arena (এরিনা) clear for us—"

"আমার একটা কথা আজ মনে পড়ছে। আপনার সঙ্গে প্রথম যখন দেখা হয়েছিল আপনি বলেছিলেন, ঝিনুক আমার রক্ষিতা।"

"ঠিকই বলেছিলাম, গ্রামার ভুল হয়নি, ওকে রেখেছি তাই রক্ষিতা। ভক্ষিতা তো বলিনি।"

ডাক্তার ঘোষাল পুনরায় হলদে দাঁত বার করে হাসলেন।

ঝিনুক কোথায় এই কথাটা জিজ্ঞাসা করবার আবার ইচ্ছা হল হালদারের। কিন্তু সঙ্কোচ হল, কথাটা মনে এলেও মুখে আনতে পারলেন না তিনি।

বললেন, "আজ তা হলে উঠি এবার। ডাক্তারবাবুর নামে নানারকম কুৎসিত গুজব শুনে আপনার কাছে ব্যাপারটা জানতে এসেছিলাম। শুনে খুব খারাপ লাগছিল। আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করে মনটা হালকা হল।"

"কার কাছ থেকে শুনেছিলেন আপনি?"

ঝিনুকের কাছ থেকে শুনেছিলেন এ কথাটা বলতে পারলেন না গণেশ হালদার। কিন্তু ঝিনুকের বদলে কার নাম করবেন তা-ও মাথায় এল না। অস্পষ্টতার আশ্রয় নিলেন।

"এমনি নানাজনের মুখে। আচ্ছা, চলি, নমস্কার।"

"ঝিনুকের খবর না নিয়েই চলে যাচ্ছেন বড়।"

একটা দুষ্টুমিভরা হাসি ফুটে উঠল ঘোষালের চোখে।

"হ্যাঁ, ঝিনুককে দেখছি না তো। কোথা গেল সে?"

"Guess —? আন্দাজ করুন। "

"কালীপুজোর ব্যাপারে কোথাও গেছে নাকি?"

"আরে না, না। কালীপুজোতে মেতেছে কাউ। ঝিনুক ওর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে কালীপুজো করলে ওর মাতৃহত্যার পাপ ধুয়ে যাবে। অদ্ভুত এক ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছে ওর মাথায়, she has pumped a funny idea into his silly head—ও চাকরি-বাকরি ছেড়ে এখন ওই নিয়েই মেতে আছে। Needless to say, সব খরচ আমার। ঝিনুক চলে গেছে কলকাতা।"

"কলকাতায়? কেন?"

"Don't know, আমাকে যা বলে গেছে তা cock and bull story, বিশ্বাস হয় না।

"কি বলে গেছে?"

"ওদের গাঁয়ের শাপলাকে নাকি অস্ট্রেলিয়ায় পাঠাবে। মোহিনী আর ছবিকে নাকি আগেই কোথায় পাঠিয়েছে। সব উদ্ভট গল্প, মশাই। আমার মনে হয় আসলে এসব কিছু নয়। ও গেছে তনিমার সঙ্গে দেখা করতে। ওর 'রাইভাল' ছিল তো। তার নাড়িটা পরীক্ষা করতে গেছে। She has gone to feel her pulse! ঝানু মেয়ে তো!

কাউ আবার প্রবেশ করল। তখনও তার হাতে খাঁড়াটা রয়েছে। ডাক্তার ঘোষালের দিকে চেয়ে বলল, "আপনি এবার স্নান করে নিন। রান্না হয়ে গেছে। আমি এটা কামারের ওখানে দিয়ে এখুনি আসছি। এটাতে এখনও ভালো ধার হয়নি।"

"আমাকে আগে হুইস্কির বোতল আর গ্লাস দিয়ে যাও। কাল থেকে এক ফোঁটা পেটে পড়েনি। দুটো কলেরা রোগী নিয়ে সমস্ত দিন নাস্তানাবুদ হয়েছি। একটা পটলও তুলেছে। রাত্রে বাড়ি ফিরে দেখি আলমারির চাবিটি নিয়ে তুমি গায়েব হয়েছ।"

"আলমারির চাবি আমার কাছে নেই। মাসিমা নিয়ে গেছে।"

"দোকান থেকে এক বোতল মদ কিনে নিয়ে এস তা হলে।"

"আমি পারব না। মাসিমা মদ কিনতে বারণ করে গেছেন।"

"হো— য়াট্?"

গর্জন করে উঠলেন ডাক্তার ঘোষাল।

কোনো জবাব না দিয়ে কাউ বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার ঘোষাল হালদারের দিকে চেয়ে বললেন, ওর স্পর্ধাটা দেখুন একবার, look at his cheek—ঝিনুকের আশকারা পেয়ে ও ধরাকে সরা জ্ঞান করছে—a rat posing as a lion—damn it —"

পরমুহূর্তেই লাফিয়ে উঠে পড়লেন তিনি আবৃত্তি করতে করতে—"বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি।" ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন দ্রুতপদে। ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙার শব্দ হল। একটু পরেই ঘোষাল ফিরে এলেন হুইস্কির বোতল ও গ্লাস হাতে সহাস্য মুখে।

"আলমারির কাঁচগুলো ভেঙে ফেললুম। ঝিনুক পরে এসে সারাবে।"

তার পর গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে গান ধরলেন, তাঁরই নিজের তৈরি গান—

বনের হরিণ পালিয়ে গেল বনে
চিতাবাঘের মনের কোণে কোণে
তারই কথা জাগছে ক্ষণে ক্ষণে।

গণেশ হালদার সত্যিই এবার উঠে পড়লেন।

"আমি তা হলে চলি।"

"আপনি এ রসে যখন বঞ্চিত তখন আপনাকে আর বসতে বলি কি করে? আসুন।"

।। সতেরো ।।

সন্ধ্যার ঠিক পরেই মনুমেন্টের কাছাকাছি অপেক্ষাকৃত নির্জন একটা জায়গায় সুবেদার খাঁ দাঁড়িয়ে ছিলেন। দেখছিলেন মোটরের সারি। চোখের সামনে কয়েক কোটি টাকা ছুটোছুটি করছে। তাঁর মনে হচ্ছিল এ টাকাগুলো হাতে পেলে কত গরিব-দুঃখীরই না উপকার করা যেত। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে নজরও রাখছিলেন। ঝিনুকের এখানে আসবার কথা আছে। আজই আবার তাঁকে ফিরতে হবে। ছুটির দিনটাতে তিনি এসেছিলেন শাপলার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য। শাপলা আজ অস্ট্রেলিয়া চলে গেল। ক্যাপটেন সাহেব ওকে জাহাজের পরিচারিকা হিসাবে বহাল করে নিজের দায়িত্বে নিয়ে গেলেন। পরে ওর একটা ব্যবস্থাও করে দেবেন বলেছেন। সুবেদার খাঁ শাপলাকে নগদ টাকাও দিয়েছেন কিছু, যাতে ও-দেশে গিয়ে চাকরি পাওয়ার আগে ভদ্রভাবে থাকতে পারে কিছুদিন। শাপলার সেই কসাই স্বামীটা বখেড়া করেছিল একটু। টাকা দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করতে হয়েছে। ছেলেপিলে হয়নি এইটেই ভগবানের দয়া। কিন্তু ওর চোখমুখের চেহারা

দেখে সুবেদার খাঁর সন্দেহ হচ্ছিল বোধ হয় ওর রক্ত দূষিত হয়েছে। হাতের তেলোয় যেসব কালো কালো দাগ ছিল সেগুলো সন্দেহজনক। চোখের দৃষ্টিতে একটা অভব্যতার ছাপও পড়েছে। ক্যাপটেন সাহেব বিচক্ষণ লোক, তিনিও এসব লক্ষ করেছেন। হেসে বললেন, এইসব পচা মাল ও-দেশে পাচার করলে কি দেশের সুনাম বাড়বে খাঁ সাহেব? ভেবে দেখ ভালো করে। সুবেদার খাঁ উত্তর দিয়েছিলেন, এরা পচা মাল নয়। এ দেশের বিষাক্ত হাওয়ায় ওই রকম হয়ে গেছে। বিদেশে গিয়ে দেখুক, যদি সামলাতে পারে। সুবেদার খাঁ এ কথা নিঃসংশয়ে বলতে পেরেছিলেন শাপলাকে দেখে, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে। ভদ্রভাবে বাঁচবার জন্য, বিশুদ্ধ হাওয়ায় নিশ্বাস নেবার জন্য সে যেন ছটফট করছিল। একটা নরককুণ্ডে পড়ে দু হাত তুলে সে যেন দাঁড়িয়ে ছিল কে দয়া করে তাকে উদ্ধার করবে। এ কাজে ঝিনুককে সাহায্য করতে পেরে সুবেদার খাঁ কৃতার্থ হয়েছেন। ঝিনুক জানে না এর জন্য প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছেন তিনি, কিছু ধারও হয়েছে, মাইনে থেকে প্রতি মাসে সে ধার শোধ করতে হচ্ছে। ঝিনুককে এ কথা তিনি বলেননি। বললে ঝিনুক আর একটি পয়সা নিতে চাইবে না। ঝিনুকের আদর্শ আছে, কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধি কম। কত ধানে কত চাল হয় তা সে ঠিক জানে না। এসব ব্যাপারে প্রতি পদে সে কত টাকা খরচ করতে হয় তা তার ধারণা নেই। জাহাজের খালাসীরা ও অন্যান্য কর্মচারীরা জেনেছে যে ক্যাপটেন সাহেব তাঁর পেয়ারের মেয়েমানুষকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। তারা যাতে বিশ্বাসঘাতকতা না করে সে জন্য তাদেরও নানাভাবে তোয়াজ করতে হয়েছে। তাদের একটা বড় হোটেলে ভালো করে খাওয়াতে হয়েছে, এক কেস মদ কিনে দিতে হয়েছে। চোরাই কারবারে রোজই মোটা টাকা পাওয়া যায় না। সুযোগ আসে না সব সময়ে। আয় অনিশ্চিত, খরচ কিন্তু অনিবার্য। ঝিনুক হয়তো এসব বোঝে না। ঝিনুককে তিনি এসব বোঝাতেও চান না। ঝিনুককে দেখে তার চরিত্রের অনমনীয়তার পরিচয় পেয়ে, বিশেষ করে দেশের লোকের জন্য তার সর্বস্ব পণের পরিচয় পেয়ে, তার সাহস, চরিত্র আর বুদ্ধির অপূর্ব সমন্বয় প্রত্যক্ষ করে সুবেদার খাঁ মুগ্ধ। তিনিও ঝিনুকের জন্য সর্বস্ব পণ করতে প্রস্তুত, সর্বস্ব পণ করেওছেন। কিন্তু তিনি জানেন ঝিনুক তাঁর নাগালের বাইরে বরাবর থাকবে।

আবার তিনি এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। ঝিনুক এখনও আসছে না কেন? তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, ধীরে ধীরে পদচারণ করতে লাগলেন। এখানে এক জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে লোকের, বিশেষ করে পুলিশের নজর পড়তে পারে। এমনিতেই তাঁর মতো লম্বা লোক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

একটু পরেই একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। ঝিনুকই নামল মনে হল তার থেকে। ঝিনুকের সঙ্গে আর একটি রঙীন শাড়ি-পরা মেয়েও নামল যেন মনে হল সুবেদার খাঁর। ঝিনুক তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কইতে লাগল। তারপর মেয়েটি চলে গেল আর একটি ট্যাক্সি ডেকে।

ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন সুবেদার খাঁ। এত দূর থেকে ঠিক চিনতে পারলেন না মেয়েটিকে। ঝিনুককে চিনেছিলেন তার চওড়া লাল ডোরা-কাটা শাড়ি আর মাথার লম্বা বিনুনি দেখে। সুবেদার খাঁ ফিরে গেলেন মনুমেন্টের কাছে। সেইখানেই ঝিনুকের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ছিল। ঝিনুক দ্রুতপদেই মনুমেন্টের দিকে এগিয়ে এল।

"আপনাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি, না? আমার একটু দেরি হয়ে গেল।"

"সঙ্গে ও মেয়েটি কে ছিল?"

' তনিমা। ওর ঠিকানাটা বার করতেই দেরি হল।"

"তনিমা? মিস্টার সেনের মেয়ে?"

কঠিন হয়ে উঠল সুবেদার খাঁর মুখভাব। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর বললে, "খবর পেয়েছি, মেয়েটি খারাপ। ওর কাছে গিয়েছিলে কেন?"

"কতদূর খারাপ তাই জানবার জন্য।"

"একটা কথা মনে রেখো। খারাপ সংসর্গ থেকে দূরে থাকাই ভালো। রাস্তায় কত কাদা হয়েছে তা দেখতে গেলে অনেক সময় পা পিছলে নিজেরই কাদা মাখামাখি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।"

"তা জেনেই গিয়েছিলাম।"

ঝিনুকের চোখে মুখে ঝিকমিক করে উঠল।

বলল, "একটা কথা আপনি ভুলে যান খাঁ সাহেব এ দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কৃপায় অল্পবিস্তর কাদা আমাদের সবার গায়েই লেগেছে। আমরা পঙ্কিল পথে পা বাড়াতে চাইনি, আমাদের ধাক্কা মেরে সেখানে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, তা কি আপনি জানেন না? কাদা এখন আমাদের সকলের গায়ে। ওই আমাদের অঙ্গের ভূষণ এখন।"

ঝিনুকের প্রদীপ্ত চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধক্‌ধক্ করে উঠল।

"তনিমার কাছে গিয়েছিলে কেন?"

"একটা গোপন খবর জানতে।"

"কি গোপন খবর?"

"সেটা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনি না-ই শুনলেন।"

"বেশ।"

গম্ভীর হয়ে গেলেন সুবেদার খাঁ। তারপর তাঁর চোখের দৃষ্টিতে এক ঝিলিক হাসি ফুটে উঠল। বললেন, "তবে তোমাকে একটা খবর দিই। এই কলকাতা শহরে আমাদের তিনজন 'স্পাই' ওর গতিবিধির খবর রাখছে। একজন ওকে বরাবর নজরে রাখবে, ও যদি ভারতবর্ষের বাইরেও চলে যায়, সেও যাবে। একটু বেচাল হলেই ওর প্রাণসংশয়—"

"বেচাল মানে? ও তো বেচালেই চলে চিরকাল—"

"ও আমাদের দলের কথা সম্ভবত জানে। সেটা প্রকাশ করবার চেষ্টা করলেই ও বিপদে পড়বে। ও নিজে জাহান্নামে যাক তাতে আমাদের আপত্তি নেই।"

সুবেদার খাঁর কণ্ঠের দৃঢ়তায় ঝিনুকের বুকটা কেঁপে উঠল। তার পিছনেও 'স্পাই' আছে নাকি? দলের কথা সে-ও বলেছে গণেশ হালদারকে। কথাটা যদি প্রকাশ পায় তা হলে সুবেদার খাঁ তাকেও কি শাস্তি দেবেন? তবে তার বিশ্বাস আছে গণেশ হালদার কখনও তা প্রকাশ করবেন না।

খানিকক্ষণ নীরবতার পর সুবেদার খাঁ বললেন, "প্রত্যাশা করেছিলাম তুমি আজ জাহাজঘাটে যাবে। শাপলা বারবার তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিল।"

"আমি ইচ্ছে করেই যাইনি। আপনিই তো সব করেছেন, আমি গিয়ে আর কি করতাম। মোহিনী আর ছবির বেলাতেও দূরে সরে ছিলাম। আমার বড় কষ্ট হয়, কি যে কষ্ট হয় তা আপনি বুঝবেন না। ওরা আমারই গ্রামের ছেলেমেয়ে, কি সুখের সংসার ছিল ওদের, কোন্ অচেনা দেশে যে ওদের পাঠিয়ে দিচ্ছি, কি ওদের ভবিষ্যৎ, সবই অনিশ্চিত। মাঝে মাঝে ভয়

হয়, হয়তো ভুল করছি। কিন্তু যখনই আমাদের অত্যাচারের কথা ভাবি তখনই মনে হয়— না, এ দেশে আর থাকব না। শাপলা কি খুব কাঁদছিল?''

''না, হাসছিল। তাকে দেখলে তুমি চিনতে পারতে না। গাউন পরে মেমসাহেব সেজে এসেছিল। চমৎকার দেখাচ্ছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন আর ডাক্তারবাবু তাকে নার্স হিসেবে বহাল করেছে আপাতত। যিনি পাসপোর্ট পরীক্ষা করেন তাঁকে বেশ মোটা টাকা খাওয়াতে হয়েছে—''

''আপনার টাকা ফুরিয়ে গেলে বলবেন, আমার কাছে কিছু টাকা আছে। আর কোথাও টাকার সন্ধান মিলল?''

কথাটা বলেই ঝিনুকের আত্মসম্মানে যেন আঘাত লাগল। এই সত্যটা তার কাছে সহসা যেন প্রতিভাত হল, নিজের জীবন এবং মানসম্ভ্রম বিপন্ন করে সুবেদার খাঁ যা করছেন আপাতদৃষ্টিতে তার সঙ্গে ওঁর নিজের স্বার্থ জড়িয়ে নেই। মোহিনী, ছবি শাপলা ওঁর কেউ নয়, উনি যা করছেন তার জন্যেই করছেন। কেন করছেন এ কথা ঝিনুক অনেকবার জানতে চেয়েছে, উত্তরে উনি যা বলেন তা বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হয় না, কারণ এ যুগে একেবারে নিঃস্বার্থপর লোক আছে এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। কোনো যুগেই ছিল কিনা সন্দেহ। বিষধর গোক্ষুর দেখতে দেখতে ফুলের মালা হয়ে গেল এ ধরনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা রঙ্গমঞ্চেই দেখা যায়। কিন্তু তবু এ পর্যন্ত সুবেদার খাঁর আচরণে কোনও খুঁত সে দেখতে পায়নি। তার নিজের আচরণেই খুঁত বেরিয়ে পড়ল। এতদিন সে মুখ ফুটে টাকার কথা সুবেদার খাঁকে বলেনি। কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়াতে মনে মনে একটু লজ্জিত হল সে।

সুবেদার খাঁ বললেন, ''এখান থেকে হংকংয়ে কিছু জুয়েলারি পাঠিয়েছিলাম, দশ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে সেখানে। সেখান থেকে একটা চেক এসেছে আমার কাছে। ক্রস্‌ড্‌ চেক। চেকের উপর কারও নাম নেই। ওরা লিখেছে সুবিধা মতো কারও নাম বসিয়ে দেবেন। আমার তো কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই। আমাদের দলের কারও নাম দিয়ে ব্যাংকে জমা করাও বিপজ্জনক। বড়বাজারে একটি লোকের সন্ধান পেয়েছি, তাঁর হংকংয়ে ব্যবসা আছে। আজ তাঁর কাছে লোক পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছেন তাঁকে যদি আমরা হাজার টাকা বাটা দিই তা হলে তিনি চেকটা নিয়ে বাকি ন' হাজার টাকা আমাদের নগদ দিয়ে দেবেন। যিনি চেকে সই করেছেন তাঁর সঙ্গে এ ভদ্রলোকের টাকা লেন-দেন হয়, সুতরাং তাঁর চেক নিতে অসুবিধা হবে না এঁর। তবে এসব ব্যাপারে একটু 'রিস্‌ক' থাকেই, তাই এক হাজার টাকা চাইছেন।''

''আপনি কি করে এ লোকের সন্ধান পেলেন?''

''যিনি চেক পাঠিয়েছেন তিনিই ঠিকানা দিয়েছিলেন। আমিই যেতুম, কিন্তু আমাকে ঘণ্টা দুই পরে ডিউটিতে জয়েন করতে হবে। তাঁর কাছে যাওয়ার সময় নেই। তুমি কি তাঁকে চেকটা দিয়ে ন' হাজার টাকা নিয়ে নিতে পারবে? আমি তাঁকে খবর দিয়েছি, আমি না এলে আর কেউ আসতে পারে।''

''যাকে পাঠিয়েছিলেন তার মারফতই ভাঙিয়ে নিলেন না কেন?''

''তার হাতেই দিতে বলেছিলুম। কিন্তু তখন অত নগদ টাকা তাঁর কাছে ছিল না। আজ আনিয়ে রাখবেন বলেছেন। আজ যাকে পাঠিয়েছিলাম সেও চলে গেল। রাত দশটা পর্যন্ত ভদ্রলোকের দোকান খোলা থাকবে। তুমি ফিরবে কবে? আজই সেখানে যাওয়া দরকার। এখন সাড়ে আটটা বেজেছে।''

"আমার কাল ফেরবার কথা। হয়তো দু-একদিন দেরি হতে পারে। আচ্ছা, আমি না গিয়ে যদি তনিমাকে পাঠাই ক্ষতি কি? অচেনা লোকের কাছে যেতে আমাব কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন সুবেদার খাঁ।

"আমাদের দলের কারও যাওয়া অবশ্য নিরাপদও নয়। তাই আমি নিজে যাইনি লোক পাঠিয়েছিলাম। তোমারও না যাওয়াই ভালো। এসব ব্যাপারে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ যত কম হয় ততই নিরাপদ। কিন্তু তনিমা মেয়েটি তো ভালো নয়। একজন অচেনা লোক অত টাকা তোমাকে দিচ্ছে এর কি ব্যাখ্যা দেবে তাকে?"

"ধরুন যদি বানিয়েই বলি কিছু"

"তোমার নিজের দায়িত্বে যদি করতে পার কর। আমার আর আপত্তি কি। তনিমাকে আমার চেয়ে তুমি ভালো চেন। তবে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে নিস্তার পাবে না, ওর পিছনে লোক আছে।"

ঝিনুক চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর জিজ্ঞেস করল, "জুয়েলারি কোথায় পেয়েছিলেন?"

"এখানেই কিছুদিন আগে এক বড় লোকের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছিল। তারই অংশ আমাদের দলের একটা লোক কিনেছিল জলের দামে। মাত্র পাঁচ শ' টাকায়। যারা বিক্রি করেছিল তারা বুঝতে পারেনি যে ওগুলো অত দামী। তা ছাড়া এসব চোরাই মাল তাড়াতাড়ি বিক্রি করে তো, যাচাই করবার সময় পায় না। তাই তারা অত দরদস্তুর করেনি।"

"আপনি জড়িয়ে পড়বেন না তো—"

"যে লোকটা কিনেছিল সে যদি ধরা পড়ে আর আমার নাম বলে দেয় তা হলে জড়িয়ে পড়া অসম্ভব নয়। এসব ব্যাপারে একটু বিপদ সর্বদাই থাকে।"

তারপর হেসে বললেন, "আজ তোমার হঠাৎ এ কথা মনে হচ্ছে কেন? নাও চেকটা রাখ।"

"আপনি নিঃস্বার্থভাবে বারবার এইসব ঝুঁকি নিজের মাথায় নিচ্ছেন এতে আমার বড় সঙ্কোচ হয়। মনে হয় আপনার ভালো-মানুষির উপর আমরা অকারণ জুলুম করছি। আপনি কেন যে এসব করছেন, কেন এভাবে নিজেকে আমাদের সঙ্গে জড়িয়েছেন তা কিছুতেই মাথায় আসে না আমার।"

সুবেদার খাঁ মৃদু হাসলেন।

তারপর বললেন, "যদি বলি প্রায়শ্চিত্ত করছি। আমাদের জাত তোমাদের উপর যে পাশবিক অত্যাচার করেছে, তার ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া পরে আসবে, আপাতত আমি আমার জাতের হয়ে যতটা পারি প্রায়শ্চিত্ত করে নিচ্ছি, নিজের বিবেককে গ্লানিমুক্ত করবার জন্য। আমি মোটেই নিঃস্বার্থপর নই। আত্মসম্মান বজায় রাখবার তাড়নায় যা করছি সেটাও স্বার্থপরতা।"

"কিন্তু আপনি তো কোনও পাপ করেননি।"

"যে শাপলাকে আজ বিদেশে চালান করে দিলাম সে কি কোনও পাপ করেছিল? পাপের পঙ্কে আমরা সবাই ডুবছি। কবিগুরুর ভাষায়— এ আমার, এ তোমার পাপ। তুমিই তো একটু আগে বললে অল্পবিস্তর কাদা আমাদের সকলের গায়েই লেগেছে। আমি যতটা পারি সেই কাদা ধুয়ে ফেলবার চেষ্টা করছি। হিটলারের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ সমস্ত জার্মান জাতি

করছে। একজনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বহু লোককে করতে হয়, এটা ঐতিহাসিক সত্য। এবার কিন্তু যেতে হয়, আমার সময় হয়ে এল, আমি চলি। আজ কিন্তু একটা পুরস্কার পেলুম।"

"কি পুরস্কার?"

"তুমি আমার জন্য ভাবছ, এটা কি কম?"

মৃদু হাসি ফুটে উঠল সুবেদার খাঁর মুখে। তিনি বরাবর মৃদু হাসিই হাসেন।

"আর দাঁড়াতে পারব না। চলি এখন—"

একটু এগিয়ে গিয়েই ট্যাক্সি পেয়ে গেলেন। ঝিনুক দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে। তারপর সে-ও গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল।

গেল তনিমার কাছে।

।। আঠারো ।।

তনিমা যে বাড়িটাতে ছিল, সেটা বেহালা অঞ্চলে। ঝিনুক ঠিকানাটা জোগাড় করেছিল শামুকের কাছ থেকে। মিস্টার সেনও বাড়িটাতে এসেছিলেন কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তিনি তনিমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। ঝিনুক যাওয়াতে সে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। ভেবেছিল ঝিনুকও বুঝি তাকে ফেরাতে এসেছে। কিন্তু ঝিনুক যখন তাকে বললে, "যে পাখি খাঁচা থেকে বেরিয়ে পালিয়ে এসেছে তাকে আবার খাঁচার মধ্যে ঢোকাবার ষড়যন্ত্র আর যেই করুক, আমি করব না। আরও বড় আকাশের সন্ধান তোমাকে দিতে পারি যদি তুমি রাজি হও।"

"কি রকম বড় আকাশ?"

জিজ্ঞেস করেছিল তনিমা।

"এদেশে পচে মরছ কেন। বিদেশে যাও। পাসপোর্টের জন্য চেষ্টা কর। সেখানে গিয়ে আরও পড়াশোনা কর। এখানে কিছু হবে না, হবার উপায় নেই—"

কথাটা শুনে হি হি করে হেসে লুটিয়ে পড়েছিল তনিমা।

"আমার ধারণা ছিল ঝিনুকদি বুঝি বুদ্ধিমতী। এখন দেখছি ধারণাটা ভুল ছিল। তা না হলে আমার মতো ফাটা বেলুনকে আকাশের খবর দিচ্ছ?"

আবার হাসতে লাগল। তার এ ধরনের হাসি দেখে ঝিনুকের ভয় হল। পাগল হয়ে যায়নি তো? হাসিটা কেমন যেন অস্বাভাবিক!

"ফাটা বেলুনও সারানো যায়। আর একটা কথা ভুলে যেও না, মানুষ বেলুন নয়। সে অনেক বড়। সে ইচ্ছে করলেই আবার নবজন্ম লাভ করতে পারে।"

"তোমাদের ডাক্তার সুঠাম মুখার্জিও আমাকে এই ধরনের অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। যারা ভালো তাদের ওই একটা রোগ আছে, কথায় কথায় তারা লম্বা লম্বা উপদেশ দেয়। তারা বুঝতে চায় না যে ভাঙা কলসীতে জল ঢালা বৃথা।"

"ওসব বাজে কথা ছাড়। পাসপোর্টের চেষ্টা কর। ডাক্তারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট জোগাড় কর যে তোমার এমন ব্যাধি হয়েছে যা ইংলন্ডে না গেলে সারবে না। আমার ইচ্ছা শামুককেও পাঠাব। সেই চেষ্টাতেই এসেছিলাম এখানে। তুমি যদি যেতে চাও তোমার জন্যেও

চেষ্টা করতে পারি। আমার বিশ্বাস, মিস্টার সেনকে তুমি যদি বল তিনিও রাজি হবেন। তিনি চেষ্টা করলে—"

"বাবা? আমার ভালোর জন্যে বাবা চেষ্টা করবেন? বাবাকে তুমি চেনোনি এখনও?"

মিস্টার সেনকে ঝিনুক খুবই চিনত। তবু না-চেনার ভান করল। তনিমার কাছ থেকে সত্য কথাটা জানবার জন্যেই সে কলকাতা এসেছিল। তার মনে এল একটু অভিনয় না করলে সত্য কথাটা বেরুবে না।

"না না, ও কি বলছ। মিস্টার সেনের বাইরেটা দেখে তাঁকে বিচার করলে ভুল করা হবে। আসলে তিনি খুব ভালো লোক। কত রেফিউজিদেব তিনি উপকার করেছেন। আমরা তো বিশেষভাবে তাঁর কাছে ঋণী।"

চোখ মটকে মুখ টিপে হাসতে লাগল তনিমা। তারপর বললে, "কি ভণ্ড তুমি ঝিনুকদি। বাবা রেফিউজিদের উপকার করেছেন? তিনি যা করেছেন সেটা তো তাঁর চাকরি। রেফিউজিদের সুব্যবস্থা করবার জন্যে তিনি মাইনে পান। তোমাদের জন্যে উনি যা করেছেন তা কেন করেছেন তোমার অন্তত জানা উচিত। তুমি শামুকের দিদি। তোমাদের বাড়িতে জুয়াখেলার আড্ডায় কি তুমি ওঁর পরিচয় পাওনি? আমারও কি পরিচয় পাওনি? তোমাকে এত বোকা তো মনে হয় না। না, অন্য কোনো মতলবে এইসব ভণিতা করছ?"

ঝিনুক হাসিমুখে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। সে হাসি বহু অর্থবোধক।

তারপর বলল, "মতলব আবার কি থাকবে? তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। তুমি তোমার বাবাকে ছেড়ে আসতে ওখানে নানারকম গুজব সৃষ্টি হয়েছে। নানা লোকে নানা কথা রটাচ্ছে। তুমি যদি বিলেতে চলে যেতে পার, তাহলে তোমার চলে আসাটার অন্য অর্থ করবে সবাই। ভাববে বিলেত যাওয়ার জন্যেই তুমি চলে এসেছ। তোমার বাবার মর্যাদা-হানি হয়েছে তুমি চলে আসাতে। অনেক নিরীহ লোকের নামেও কলঙ্ক লাগল।"

"কোন্ নিরীহ লোকের নামে আবার কলঙ্ক লাগল?"

"ডাক্তার সুঠাম মুখার্জির নামে। তোমার বাবা শাসিয়ে বেড়াচ্ছেন তাঁর নামে মকদ্দমা করবেন।"

"করুন না, করলে মজাটি টের পাবেন।"

"ডাক্তার মুখার্জি তাহলে সত্যিই নির্দোষ?"

রহস্যময় হাসি হেসে তনিমা বললে, "তুমি এসব নিয়ে কেন মাথা ঘামাচ্ছ, ঝিনুকদি?"

"মাথা ঘামাইনি, একটু অবাক লাগছে। ডাক্তার মুখার্জির বাড়িতে যে মাস্টারমশাই থাকেন তিনি আমাদের গ্রামের লোক। তাঁর মুখে শুনেছি ডাক্তার মুখার্জি নাকি খুব ভালো লোক। আমরাও ওঁর কাছে কিছু উপকারের প্রত্যাশা করি। কিন্তু যা শুনছি তা যদি সত্যি হয়—"

"তা সত্যি কি মিথ্যে তাতো জানবার দরকার নেই। উনি যে সবার উপকার করবার জন্যে ব্যগ্র তাতে সন্দেহ নেই। এ কথাটা নির্জলা সত্য। আমি তার প্রমাণ। সেদিন ট্রেনে দৈবাৎ ওঁর কামরায় উঠে পড়েছিলাম বলেই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। মহৎ লোক সন্দেহ নেই। অনেক উপদেশ দেন। যিশু খ্রীস্ট ক্রুশে প্রাণদান করেছিলেন বলে জগৎ-পূজ্য হয়ে আছেন। তোমাদের ডাক্তারবাবুর মহত্ত্বটা ততখানি কি না জানি না। তবে লোক ভালো। কিন্তু অনেকের ভালোত্ব শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকে না—"

"হেঁয়ালিটা ভেঙে বল না বাপু। বুঝতে পারছি না ঠিক।"

"এর চেয়ে ভেঙে আর কিছু বলা যাবে না এখন। তুমি কি বসবে? আমাকে বেরুতে হবে একটু। চৌরঙ্গীতে যেতে হবে একবার।"

"আমিও বেরুব।"

"রাতে এখানেই ফিরবে তো?"

"ফিরব। চল না এক সঙ্গে বেরুই দুজনে। আমাকেও ওই অঞ্চলে যেতে হবে।"

"বেশ চল।"

সুবেদার খাঁর কাছ থেকে ফিরে ঝিনুক দেখল তনিমা তার অপেক্ষায় বসে আছে। তাকে দেখেই তনিমা বললে, "তোমার কথাই এতক্ষণ ভাবছিলাম বসে বসে। তোমার মতন আশ্চর্য মানুষ আমি আর দেখিনি।"

ঝিনুক চেয়ারে বসে ঘড়িটা দেখল একবার— ন'টা বেজেছে।

"আমার মধ্যে কি আশ্চর্য দেখলে আবার?"

"অন্য কোনো মেয়ে হলে আমার মুখ দেখত না। কিন্তু তুমি আমার ভালোর জন্যে চেষ্টা করছ!"

তারপর ভুরু তুলে গলার সুর একটু চড়িয়ে বলল, "তুমি মনে করছ এতে আমি খুব খুশি হচ্ছি। তা কিন্তু মোটেই হচ্ছি না। ভিক্ষে নিতে কারু ভালো লাগে না। আমার মধ্যে তোমরা সবাই কি এমন দেখেছ যে ক্রমাগত আমার ভালোর জন্যে চেষ্টা করছ। তোমাদের ভিক্ষা আমি চাই না।"

ঝিনুক মৃদু হেসে বলল—"কিসের ভিক্ষে খুলে না বললে তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক হয়েছিল তা তুমি জান। নিজের চোখেই দেখেছ একদিন। অথচ তুমি আমার উপর রাগ করনি। অতগুলো টাকা হাতে পেয়েও ফিরিয়ে দিয়েছ। এখন বলছ বিদেশে গিয়ে লেখাপড়া কর তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমার উপর এত দয়া করবার হেতুটা কি বুঝতে পারছি না। ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে তোমার যে সম্পর্কটা কল্পনা করেছিলাম সেটা কি ভুল তাহলে?"

ঝিনুক গম্ভীর হয়ে রইল। তারপর তার মুখে যদিও একটু হাসি ফুটল কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিতে যে অগ্নি-কণা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তার সঙ্গে সে-হাসির মিল ছিল না খুব।

ঝিনুক বলল, "কেউ যখন হঠাৎ পঙ্ককুণ্ডে পড়ে যায় তখন সে যা করে আমরা তাই করছি। অঙ্ক কষে হিসেব করে নীতিশাস্ত্রের সব আইন মেনে চলবার উপায় আমাদের নেই। আমরা যেমন করে পারি বাঁচবার চেষ্টা করছি। তুমি যদি আমার আচরণে অসঙ্গতি লক্ষ করে থাক তা ওই জন্যেই হয়েছে জেনো। ওসব কথা এখন থাক। তুমি আমার একটা উপকার করতে পারবে?"

"কি বল। সম্ভব হলে নিশ্চয় করব।"

"বড়বাজারের এই ঠিকানায় এই চেকটা নিয়ে গেলে ন'হাজার টাকা পাবে। টাকাটা গিয়ে এনে দিতে পার? কোনো কারণে আমি নিজে যেতে চাই না।"

চেকটা উলটে পালটে দেখে তনিমা বললে, "চেক তো দশ হাজারের। ন' হাজার বলছ কেন?"

"যিনি ভাঙিয়ে দেবেন তিনি এক হাজার টাকা বাটা নেবেন।"

"এখন কি ট্রাম বাস পাওয়া যাবে? বড়বাজার তো অনেক দূর।"

"আমি ট্যাক্সিটা ছাড়িনি। ওতেই তুমি চলে যাও। ওতেই ফিরে এস। এখানে ফিরে এলে ওর সব চার্জ মিটিয়ে দেব।"

"রাইট ও।"

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল তনিমা। পাশের ঘরে তাড়াতাড়ি গিয়ে পোশাক বদলে ফেললে। পরে এল পাঞ্জাবীর পোশাক। রঙীন দোপাট্টাটা সত্যিই চমৎকার। চোখে সুর্মার টান, ঠোঁটে রং, গালে রং, মাথায় বেণীটা দু'ভাগ করা। কয়েক মিনিটের মধ্যে তনিমার ভোলই বদলে গেল যেন। তার মোহিনী মূর্তির দিকে ঝিনুক অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এ যে মূর্তিমতী অগ্নি-শিখা!

"চলি—"

তনিমা বেরিয়ে যাচ্ছিল।

"এটাও সঙ্গে নিয়ে যাও।"

ঝিনুক একটা মখমলের-খাপে ঢাকা ছোরা বার করে দিলে তাকে নিজের কাপড়ের ভিতর থেকে।

"আমার কাছে দুটো ছোরা আছে।"

"কোথায়?"

"আমার চোখে। দেখতে পাচ্ছ না?"

"তবু এটা নিয়েই যাও।"

ছোরাটা না নিয়েই বেরিয়ে গেল তনিমা। পরমুহূর্তেই ফিরে এল আবার।

"যদি ক্ষিদে পায়, তুমি খেয়ে নিও ঝিনুকদি। পাশের ঘরে সব খাবার আছে মীটসেফের ভিতর। আমার জন্যে অপেক্ষা করো না।"

চলে গেল।

এই বিপদের মুখে তনিমাকে পাঠিয়ে দিয়ে অস্বস্তি হতে লাগল ঝিনুকের। নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল। তার অস্বস্তি আরও বাড়ল। যখন রাত্রি দুটো পর্যন্ত তনিমা ফিরল না। তনিমা চলে যাওয়ার আধঘণ্টা পরে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসেছিলেন তাঁর খোঁজ নিতে। এসেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, "মিসেস মুখার্জি কি বাড়িতে আছেন?"

"মিসেস মুখার্জি বলে তো এখানে কেউ থাকেন না। যিনি থাকেন তাঁর নাম মিস তনিমা সেন। তাঁর বিয়ে হয়নি।"

বিস্মিত হয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

"কিন্তু তিনি তো আমার কাছে পরিচয় দিয়েছেন মিসেস এস. মুখার্জি বলে। ডাক্তার সুঠাম মুখার্জির একটা চিঠিও এনেছিলেন তিনি। তাঁর জন্যে একটা ভালো নার্সিংহোম ব্যবস্থা করেছি। সেই খরবটাই দিতে এসেছিলাম।"

ঝিনুক বুদ্ধিমতী মেয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে বলল, "ও তা হবে। আমার ঠিক জানা ছিল না। আপনি আপনার নাম ঠিকানা রেখে যান। নার্সিং হোমের ঠিকানাটাও রেখে যেতে পারেন। ও ফিরে এল বলব।"

"কখন উনি ফিরবেন?"

"তার ঠিক নেই।"

ভদ্রলোক তাঁর কার্ড আর নার্সিং হোমের ঠিকানা রেখে গেলেন। কার্ডে একজন বিলাতী ডিগ্রীধারী ডাক্তারের নাম লেখা। সমস্তই কেমন যেন রহস্যময় মনে হতে লাগল ঝিনুকের।

তনিমা ফিরল রাত তিনটের সময়।

ঝিনুক সোফায় বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। হর্ন শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল, দেখল প্রকাণ্ড একটা দামী মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ট্যাক্সি নয়, প্রাইভেট গাড়ি। গাড়ি থেকে তনিমা নামল টলতে টলতে। ঝিনুক চমকে উঠল। মনে হল তার শরীর থেকে সমস্ত রক্ত কে যেন শুষে নিয়েছে!

ঘরে ঢুকেই তনিমা বলল, "এই নাও তোমার টাকা!"

নোটের তাড়াটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মেজের উপর।

"তোমার চেহারাটা তো ভালো দেখাচ্ছে না। শরীর খারাপ হয়েছে না কি?"

"খুব খারাপ, মদও গিলেছি অনেক।"

সোফার উপর বসে পড়ল ধপ করে; তারপর শরীরটা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল সোফার উপর। ঝিনুক মেঝে থেকে নোটের তাড়াটা তুলতেই তনিমা বলল, "গুনে নাও দশ হাজার আছে।"

"এক হাজার টাকা নিলেন না তিনি?"

"না। রসিক লোক যে, টাকাটা আমাকে দিলেন। শুধু রসিক নয়, বিরাট ধনী এবং প্রমত্ত গণ্ডার। এক হাজার টাকা ওর হাতের ময়লা। সেই ময়লাটা নিয়ে এসেছি।"

খিলখিল করে আবার হেসে উঠল তনিমা। হঠাৎ ঝিনুকের চোখে পড়ল তনিমার পাজামার পায়ে রক্তের দাগ।

"এ কি, তনিমা!"

তনিমা খিলখিল করে হাসতেই লাগল। ডাক্তারবাবুর কার্ডখানা তেপায়ার উপর ছিল। সেটা দেখিয়ে ঝিনুক বলল, 'ইনি তোমার যাবার পর এসেছিলেন। আমি এঁকে খবর দিতে চললুম। তোমার চেহারাটা ভালো মনে হচ্ছে না।"

ঝিনুক টাকাগুলো টেবিলের ড্রয়ারে রেখে বেরিয়ে গেল।

"ঝিনুকদি, যেও না, শোন, শোন—" ঝিনুক কিন্তু ফিরল না। ডাক্তারবাবুকে নিয়ে ফিরতে ঝিনুকের বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গেল। রেডক্রুসের গাড়ি চড়ে একজন নার্স আর ডাক্তার নিয়ে সে যখন ফিরল তখন ভোর হয়ে গেছে।

তনিমা আচ্ছন্নের মতো পড়েছিল সোফায়। ডাক্তারবাবু তখনি তাকে নিয়ে হাসপাতালে চলে গেলেন। বললেন, "এখানে কিছু করা যাবে না! অবস্থা ভালো নয়।"

ঝিনুক বলল, "চাকরটা এখনও আসেও নি। আমি কি আপনার সঙ্গে যাব।"

ডাক্তাববাবু বললেন, "আপনি এখন থাকুন। চাকরটা এলে যাবেন। আমি একটু পরে গাড়ি পাঠিয়ে দেব।"

ঝিনুক চুপ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। অনেক কিছু ভাবতে লাগল সে। তনিমার যে কি হয়েছে তা খানিকটা আন্দাজে বুঝেছিল সে। তার এক দূরসম্পর্কের কাকীমা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। পুকুরঘাটে পা পিছলে পড়ে গিয়ে তাঁর ওই রকম রক্তস্রাব হয়ে পেটের ছেলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তনিমার কি তাহলে—"

হঠাৎ তেপায়ার উপর একটা চিঠি নজরে পড়ল তার। তুলে তখনই পড়তে লাগল সেটা—

ডাক্তার শ্রীসুঠাম মুখোপাধ্যায় সমীপে—

শ্রীচরণেষু,

মনে হচ্ছে আমি আর বাঁচব না। আপনি বলেছিলেন পেটের সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখাই আমার জীবনের লক্ষ্য হোক। আমি রাক্ষসী, আমার কোলে কি সন্তান আসতে পারে? সে বাঁচল না। তাকে মেরে ফেলেছি আজ। আমিও একটু পরে মরব। ঝিনুকদির কাছে শুনলাম বাবা নাকি আমার সঙ্গে আপনার নাম জড়িয়ে মোকদ্দমা করতে চাইছেন। আমি মরবার আগে আজ মুক্তকণ্ঠে বলে যাচ্ছি, আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আপনি মানুষ নন, দেবতা। আপনার মতো দেবতার সংস্পর্শে আমি খানিকক্ষণের জন্য দৈবাৎ এসেছিলাম। তাইতেই আমার জীবন ধন্য হয়ে গেছে। আমি পাষাণী অহল্যা হলে হয়তো বেঁচে যেতাম। কিন্তু আমি পাষাণী নই, পিশাচী, রাক্ষসী। আমাকে অত সহজে উদ্ধার করা যায় না। তবে একটা কথা মনে হচ্ছে আপনার মতো লোক আমার জীবনে যদি আগে আসত তাহলে আমাকে অকালে এমনভাবে মরতে হত না। আপনার আদেশ আমি পালন করতে পারিনি, সত্যিই পারলাম না, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার বাবা আপনার বিরুদ্ধে কিছু করবার সাহস পাবেন না, কারণ তিনি পাপী, সেইজন্যই ভীতু। আমি এখানে এসেই আমার সমস্ত কথা অকপটে ওখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে লিখে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার সেই চিঠি থেকেই প্রমাণিত হবে, আমার দুর্দশার জন্য দায়ী কে। শেষে একটা কথা সসঙ্কোচে আপনাকে জানাচ্ছি। আপনি যে ডাক্তারবাবুর কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছে আমি আমার সত্য পরিচয় গোপন করে নিজেকে মিসেস এস. মুখার্জি বলে পরিচিত করেছিলাম। কলঙ্কের কালি মুখে মেখে নিজের সত্য পরিচয় দিতে হলে মনের যতটা জোর থাকা দরকার তা আমার নেই। আমার পেটে যে হতভাগ্য সন্তান এসেছিল তার বাবা কে তা আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু আমার লোভ ছিল তার একটা ভদ্র পিতৃ-পরিচয় দেবার। আশা ছিল মিথ্যা-মেকি-মুখোশের যুগে সে পরিচয়টা চলেও যাবে। কিন্তু তার আর দরকার হল না। তাকে সঙ্গে নিয়ে আমি যে দেশে চললাম সে দেশে সামাজিক ছাপের কোনও প্রয়োজনও নেই। আর লিখতে পারছি না, হাত কাঁপছে। জানি, আপনাকে প্রণাম করবার যোগ্যতা আমার নেই। তবু শত কোটি প্রণাম জানালাম, জানিয়ে ধন্য হলাম। আমি জানি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু সে ক্ষমা আমার কাছে পৌঁছবে কি?

ইতি—

প্রণতা তনিমা

চিঠিটা পড়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল ঝিনুক। তারপর তার চোখে পড়ল সোফাতেও রক্তের দাগ লেগেছে। নির্নিমেষে চেয়ে রইল দাগটার দিকে। মনে পড়ল সেই দিনের কথা, সেদিন তাদের বাড়িতেও রক্তের স্রোত বয়ে গিয়েছিল। বাবার রক্তে ভিজে গিয়েছিল তাঁর বিছানা বালিশ, দাদার রক্ত ভিজিয়ে দিয়েছিল ছিন্নমূল তুলসী গাছটাকে। মনে পড়ল মিস্টার সেনও পূর্ববঙ্গের লোক, তনিমারও জন্ম হয়েছিল তাদের গাঁয়ের কাছেই অন্য একটা গ্রামে। ওরাও পূর্ববঙ্গের অভিশপ্ত হিন্দু। যদিও ওরা আগেই পালিয়ে এসেছিল তবু রক্ত ওদের তাড়া করেছে। রক্তের দাগটার দিকে চেয়ে নির্বাক হয়ে বসে রইল সে। তার হঠাৎ মনে হল এ রক্ত বাংলা-মায়ের বুকের রক্ত। কোনও বিশেষ মানুষের রক্ত নয়। দাগটা ক্রমশ বড় হতে লাগল। সমস্ত ঘরটা রক্তাক্ত হয়ে গেল। মনে হল জানালা কপাট দিয়ে রক্তের স্রোত এঁকে-বেঁকে ঘরে ঢুকছে,

সমস্ত ঘর রক্তে আর ফেনায় ভরে গেল। উঠোনেও রক্ত, যতদূর দেখা যাচ্ছে— রক্ত, রক্ত, কেবল রক্ত। রক্তের সমুদ্রে সে যেন হাবুডুবু খেতে লাগল। তারপরই ছরছর করে একটা শব্দ হতেই চমকে উঠে আত্মস্থ হল সে। কলে জল এসেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বাথরুমে চলে গেল। গিয়ে দেখল চৌবাচ্চায় জল ভরাই আছে। বালতি বালতি জল তুলে মাথায় ঢালতে লাগল সে— যেন তারও সর্বাঙ্গে রক্ত লেগেছে, সেটা ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। উন্মাদের মতো জল ঢালতে লাগল। চৌবাচ্চা প্রায় খালি হয়ে গেল, তবু সে থামল না। বাথরুমের কপাট বন্ধ করে সর্বাঙ্গে সাবান মাখতে লাগল। সাবান মেখে আবার স্নান করল। চৌবাচ্চার জল ফুরিয়ে গেল। কল থেকে জল পড়ছে, এখনই আবার ভরে যাবে। কলের নলটার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে নির্নিমেষে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর আর পারল না। বসে পড়ল বাথরুমের মেঝের উপর। দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। কার জন্যে কান্না? তনিমার জন্য? তার বাবা-মায়ের জন্য? ডাক্তার ঘোষালের জন্য? শাপলা মোহিনী ছবির জন্য? তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলতে পারত না। কিন্তু কান্না সে রোধ করতে পারল না। অঝোর ঝরে কাঁদতে লাগল।

...বাইরে মোটরের হর্ন শোনা গেল একটা। তারপর কে একজন বাইরে থেকে বলল— ''মাইজি আপনার জন্য গাড়ি এনেছি।''

ঝিনুক উঠে দাঁড়াল।

।। উনিশ ।।

গণেশ হালদার সেদিনও পিওনকে জিজ্ঞেস করলেন, ''আমার নামে কোনও চিঠি আজও আসেনি?''

পিওন বললে, ''না। থাকলে তো আমি দিয়েই যেতুম।''

একটু হতাশ এবং বিস্মিত হলেন গণেশ হালদার। তাহলে ওঁরা কি প্রবন্ধটা পাননি। না পাবার কথা নয়, রেজেস্ট্রি করে দিয়েছিলেন। একটা ঠিকানা-লেখা খামও দিয়েছিলেন উত্তর পাওয়ার জন্য। মাসখানেক হয়ে গেল, এতদিন একটা উত্তর আসা উচিত ছিল। তবে কি...না, যে কথাটা তাঁর মনে হল সেটা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হল না। নামজাদা একটা কাগজে তিনি প্রাদেশিকতা নিয়ে একটা প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। প্রবন্ধে বর্তমান গভর্নমেন্টের অনেক সমালোচনা ছিল। তাঁর আশা ছিল এ প্রবন্ধ ছাপা হলে অনেকের চোখ ফুটবে, এ নিয়ে আন্দোলন হবে এবং ভবিষ্যতে গভর্নমেন্টও এ বিষয়ে সচেতন হবেন হয়তো। তাঁর বিশ্বাস গণতন্ত্র-মোটবকারের স্টিয়ারিং হুইল আর ব্রেক হচ্ছে সমালোচনা। শাসন পরিষদে যদি জোরালো বিরুদ্ধপক্ষ না থাকে, জনসাধারণ যদি মুক্তকণ্ঠে শাসন পরিষদের কার্যকলাপের সমালোচনা করবার সুযোগ না পায়, তাহলে সে শাসন-পরিষদে ঘুণ ধরতে বাধ্য, ক্রমশ তা ডিক্‌টেটারশিপে রূপান্তরিত হয়ে যায়। গণেশ হালদার প্রাদেশিকতা নিয়ে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে আমাদের বর্তমান গভর্নমেন্ট মুখে যাই বলুন, কার্যত তাঁরা প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। আমাদের সংবিধানেই এই প্রশ্রয়ের বীজ নিহিত আছে। ভারতবর্ষকে নানা প্রদেশে ভাগ করার ফলেই প্রাদেশিকতার সৃষ্টি হয়েছে, এই তাঁর বিশ্বাস। শুধু নানা প্রদেশে ভাগ করা হয়নি, প্রত্যেক প্রদেশকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রদেশ দু'চারটি ব্যাপার ছাড়া নিজেদের আভ্যন্তরীণ

ব্যাপারে যা খুশি করতে পারেন, কাউন্সিলে ভোটে সেটা 'পাস' হলেই হল। আমাদের কোনও প্রদেশের অধিবাসীরা এখনও পর্যন্ত কার্যত এমন উদারতার পরিচয় দেননি যার থেকে বোঝা যায় যে তারা অন্য প্রদেশবাসীকেও সমদৃষ্টিতে দেখেন এবং সমান সুযোগ দেন। ইংরেজ আসবার পূর্বে ভারতবর্ষ নানা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ রাঢ় বরেন্দ্র সমতট প্রাগজ্যোতিষপুর প্রভৃতি নানা প্রদেশ নানা সময়ে আমাদের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে এবং সে ইতিহাসের প্রধান কাহিনী কলহ আর যুদ্ধ। কনোজ, থানীশ্বর, মৌখরি, ইন্দ্রপ্রস্থ, গুর্জর, চোল—কেউ এর থেকে মুক্ত ছিল না। গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের সঙ্গে হর্ষবর্ধনের এবং আরও অনেকের সঙ্গে অনেকের যেসব যুদ্ধের কথা পড়েছি সেই যুদ্ধই ভিন্ন নামে আজও চলছে। সেকালে প্রায়ই ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ হত। শৈব শাক্ত বৌদ্ধ হিন্দু মুসলমানেরা ধর্মের ওজুহাতেই ঝগড়া করত পরস্পরের সঙ্গে। মাঝে মাঝে নারীও জড়িত থাকতেন, কখনও অলক্ষ্যে, কখনও প্রত্যক্ষে। নারীদের নিয়ে এখন যুদ্ধ হয় না, নারী এখন শস্তা, পথেঘাটে পাওয়া যায়, ঘর থেকে টেনে নিয়ে গেলেও তার কোনো প্রতিকার হয় না। আগেকার ধর্মও আর নেই, তার বদলে গজিয়েছে নানা রাজনীতি-তন্ত্র। এখন কেউ কংগ্রেসী, কেউ কম্যুনিস্ট, কেউ জনসংঘ, কেউ স্বতন্ত্র পার্টি, কেউ হিন্দুমহাসভা, কেউ বা মুসলিম লীগ। এর উপর আছে কেউ বাঙালী, কেউ বেহারী, কেউ ওড়িয়া, কেউ মাদ্রাজী, কেউ মারহাঠী, কেউ পাঞ্জাবী! সবাই নিজের নিজের প্রদেশ নিয়ে গর্ব করে। আমি ভারতবাসী, সমস্ত ভারতবর্ষ আমার দেশ, সমস্ত ভারতবর্ষের সুখদুঃখ আমার সুখদুঃখ, সমস্ত ভারতের স্বার্থ আমার স্বার্থ, এ বোধ ক'টা লোকের আছে? আর একটা মুশকিল, যাঁরা বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে সর্বভারতীয় প্রেমের ভারতমহাসাগর সৃষ্টি করেন তাঁরাই দেখি আবার নিজের বাড়ির উঠোনে প্রাদেশিকতার কুপ খননের জন্য বদ্ধপরিকর। এঁরা মুখে যা বলেন, কাজে তা করেন না। এবং আরও মুশকিল ভোটের কৌশলে এঁদের মধ্যে অনেকেই নেতা এবং দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়েছেন। এর ফলে প্রতি প্রদেশেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নানাভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছেন। রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দেখে তাঁরা আশ্বস্ত হন, কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁদের ভুল ভাঙে। এই প্রহসন গোড়া থেকেই চলছে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি এ-ও লিখেছিলেন যে, প্রাদেশিকতা লোপ করতে হলে প্রদেশ লোপ করতে হবে। শাসনের সুবিধার জন্য ছোট ছোট 'ইউনিট' সৃষ্টি করা যেতে পারে, কিন্তু সে-সবের নাম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ— এসব থাকবে না। সংখ্যা দিয়ে তাদের নামকরণ করা যেতে পারে। তাঁর মতে সে-সব ইউনিট পরিচালিত হবে একটি কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের নির্দেশে। সে নির্দেশে বাঙালী বেহারী ওড়িয়া মাদ্রাজী বা অন্য কোনো প্রদেশবাসীর প্রাধান্য থাকবে না। সে কেন্দ্রীয় পরিষদের সভ্যদের একমাত্র পরিচয় হবে তারা ভারতবাসী। সে পরিষদে প্রত্যেক ইউনিট থেকে সমান-সংখ্যক সভ্য নির্বাচিত হবে। প্রত্যেককে তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। সর্বভারতীয় সুবিধার জন্য হিন্দী বা অন্য কোনো ভাষাকে নির্বাচন করা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমানে বেশ কিছুদিন আমাদের ইংরেজিকেই আঁকড়ে থাকতে হবে। কারণ বর্তমানে ওই একমাত্র ভাষা যার মাধ্যমে আমরা নিখিল বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচয় পেতে পারি। ইংরেজিকে এখন ত্যাগ করলে আমরা পিছিয়ে পড়ব। এই ধরনের নানা কথা তিনি লিখেছিলেন ওই প্রবন্ধে। আর একটা কথা বিশেষ জোর দিয়ে লিখেছিলেন, গণতন্ত্রকে আদর্শ গণতন্ত্র করতে হলে ভোটদাতাগণকে সুশিক্ষিত হতে হবে। ভালো মন্দ বিচার করবার ক্ষমতা যেন তাদের থাকে। তাদের চরিত্রও সাধু হওয়া দরকার। অশিক্ষিত এবং অসাধু ভোটদাতাদের ভোট যেন-তেন-উপায়ে কুড়িয়ে যে গণতন্ত্র

গঠিত হয় তা কখনও আদর্শ গণতন্ত্র হয় না, হতে পারে না। ভোটদাতাদের সুশিক্ষিত এবং সাধু করবার দায়িত্বও গভর্নমেন্টের। কিন্তু বর্তমানে গভর্নমেন্টের সুশিক্ষার দিকে মোটেই নজর নেই। আড়ম্বর অনেক আছে, কিন্তু যা করলে সুশিক্ষার প্রসার হয় তার কোনও ব্যবস্থা নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রাদেশিকতা এবং আত্মীয় পোষণের বিষ-বাষ্পে সমাচ্ছন্ন। তাই স্কুলে-কলেজে ভালো শিক্ষকের অভাব হয়েছে। ভালো শিক্ষকের অপ্রাচুর্যের আর একটা কারণ শিক্ষকদের বেতন বড় কম। আমাদের দেশের ভালো ছেলেরা তাই ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার হয়, নামজাদা কলেজের বড় প্রফেসার হয়, সরকারী বেসরকারী বড় চাকরির চেষ্টা করে, কিন্তু স্কুলের শিক্ষকতা করতে কেউ চায় না। অথচ ওইখানেই ছাত্র-ছাত্রী-চরিত্রের বনিয়াদ তৈরি হয়। এই বনিয়াদ কাঁচা হয়ে গেলে সব গেল। পূর্বেও শিক্ষকেরা কম বেতন পেতেন, কিন্তু তার বদলে সম্মান পেতেন প্রচুর। এখন তাও পান না। এখন তাঁরা সমাজে হেয় অশ্রদ্ধেয় জীব। ছাত্ররা পর্যন্ত তাঁদের অপমান করছে এবং অপমান করে পার পেয়ে যাচ্ছে। এখন ছাত্রদের লক্ষ্য যেন-তেন-প্রকারেণ পরীক্ষা পাস করা এবং শিক্ষকদের লক্ষ্য যেন-তেন-প্রকারেণ পরীক্ষা পাস করিয়ে দেওয়া। শিক্ষকরা এখন তাই জীবিকা-নির্বাহের জন্য টিউশনি করেন, পরীক্ষার প্রশ্ন বলে দেন, শুনেছি মোটা টাকা দিলে পরীক্ষার খাতা পর্যন্ত বদলে দেন এবং নানাভাবে ওপর-ওলাদের খোশামোদ করে চেষ্টা করেন যাতে তিনি বারবার পরীক্ষক নিযুক্ত হতে পারেন। অর্থাৎ শিক্ষকরাও ক্রমশ চোর আর গুণ্ডা প্রকৃতির লোক হয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাই ন্যায়-বিচার হয় না এদেশে, শিক্ষার ক্ষেত্রেও সুনীতির আসনে দুর্নীতি জাঁকিয়ে বসেছে। স্কুল কলেজে থেকে তাই যেসব ছাত্র-ছাত্রী ডিগ্রীর তকমা নিয়ে বেরুচ্ছে, তারা আকৃতিতে মানুষ বটে, কিন্তু অন্তরে পশু। বিদেশি পোশাকে সজ্জিত, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যের বিগ্রহ এক একটি। এরাই ভবিষ্যৎ ভোটদাতা। ইলেকশনের সময় নেতারা এদের সাহায্য গ্রহণ করেন। এসব দেখে মনে হয় ভবিষ্যতেও যে এদেশে আদর্শ গণতন্ত্র স্থাপিত হবে তার কোনও আশা নেই। সে গণতন্ত্রেও প্রাদেশিকতার প্রচুর প্রভাব থাকবে। আমাদের দেশের বড় বড় নেতারা মুখে বলছেন বটে প্রাদেশিকতা বর্জন কর, কিন্তু তাঁদের হাব-ভাব আর আইন-কানুন দেখে মনে হয় সেটা নিতান্তই মৌখিক এবং রাঙ্গমঞ্চিক উপদেশ-বর্ষণ মাত্র। বিদেশে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরাও অভিজ্ঞ বিদ্বান মান্য-গণ্য ব্যক্তি হন। এদেশে হন তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা। এদেশেও বিদ্বান মান্যগণ্য অভিজ্ঞ অধ্যাপকের অভাব নেই, কিন্তু তাঁদের মধ্যেও লোভ ঢুকেছে, তাঁরা তাই গদির আশায় পলিটিক্স নিয়ে মেতে আছেন অনেকে। তাঁদের যেটা আসল কাজ, যে কাজে তাঁদের যোগ্যতা সবচেয়ে বেশি, সেদিকে তাঁদের আগ্রহ নেই, বেশি মাইনে দিয়ে সে কাজে তাঁদের নিয়োগ করবার দিকে গভর্নমেন্টেরও উৎসাহ নেই। মনে হয় যেদিন শিক্ষকদের বেতন এবং সম্মান উচ্চপদস্থ মিনিস্টারদের মতো হবে সেদিন শিক্ষার ক্ষেত্রেও ভালো লোক পাওয়া যাবে। কিন্তু তা কি হবে কখনও?

এই সব কথাই লিখেছিলেন গণেশ হালদার। তাঁর সন্দেহ হল প্রবন্ধটা কি ওঁরা শেষ পর্যন্ত ছাপবেন না? ভাগ্যে তিনি প্রবন্ধটার নকল রেখেছিলেন একটা। হঠাৎ মনে হল প্রবন্ধটা ডাক্তার মুখার্জিকে দেখালে কেমন হয়? হয়তো ওতে এমন অনেক কথা আছে যা ছাপা উচিত নয়। কিন্তু ওঁর কি সময় হবে?

একদিন প্রবন্ধটা নিয়ে সসঙ্কোচে গেলেন তিনি ডাক্তার মুখার্জির কাছে। ডাক্তার মুখার্জি যথারীতি বাইরে বসেছিলেন। তাঁকে দেখেই অভ্যর্থনা করলেন।

"আসুন মাস্টারমশাই। হাতে ওটা কি?"

"ওটা একটা প্রবন্ধ। আপনাকে দেখাতে এসেছি।"

"আমাকে? আচ্ছা দিন কোনও ফাঁকে পড়ে রাখব। আপনি লিখেছেন?"

"হ্যাঁ।"

সসঙ্কোচে মাথা নাড়লেন গণেশ হালদার।

"পড়ব। দু' একদিন দেরি হলে অসুবিধা হবে না তো? আজ একটু ব্যস্ত আছি। আমার গাই মঙ্গলার ব্যথা ধরেছে। ওর একটা কিছু না হওয়া পর্যন্ত কোনো দিকে মন দিতে পারছি না। দেখছেন কি রকম উঠ-বোস করছে।"

রকেট ভুটান জাম্বু সমভিব্যাহারে ডাক্তারবাবু গোয়ালের দিকে গেলেন। গণেশ হালদারও গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর মনে হল কুকুর তিনটিও যেন একটু চিন্তিত হয়েছে মঙ্গলার ব্যাপারে। তিনজনেই আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডাক্তারবাবুর পিছনে। গণেশ হালদারের মনে হল তিনজনই যেন বুঝতে পেরেছে যে, মুংলির কষ্ট হচ্ছে। রকেট ঘাড় নিচু করে সন্তর্পণে মুংলির কাছাকাছি গিয়েছিল, কিন্তু মুংলির তাড়া খেয়ে পালিয়ে এল। ডাক্তার মুখার্জিও বকলেন রকেটকে।

"ওকে এখন বিরক্ত করছ কেন রকেট। That's bad!"

রকেট অপরাধীর মতো মুখ ফিরিয়ে রইল।

গণেশ হালদার পিছু ফিরে দেখলেন মুরগিগুলোও গুটি গুটি এসে দাঁড়িয়েছে।

ডাক্তারবাবু দুর্গাকে বললেন, "একটা বড় হাঁড়ি করে গরম জল চড়িয়ে দে। আর খেতে দে মুরগিগুলোকে—"

তারপর তিনি এগিয়ে গিয়ে মঙ্গলাকে আদর করতে লাগলেন। হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন তার মাথায় আর গলায়। মুংলি লম্বা জিভ বার করে চেষ্টা করতে লাগল ডাক্তার মুখার্জির হাতটা চেটে দিতে। ডাক্তার মুখার্জি কিন্তু সে সুযোগ দিলেন না তাকে। গালে একটা ছোট চড় মেরে বললেন, "ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিস, এখনও দুষ্টুমি!"

বিজয় পাকিয়া আর শালিয়া দৌড়ে এসে খবর দিলে তাদের বক্‌রির পাঁচটা বাচ্চা হয়েছে।

"পাঁচটা? বলিস কি? চল চল দেখে আসি। মাস্টারমশাই যাবে না কি? একটা বক্‌রির পাঁচটা বাচ্চা সাধারণত দেখা যায় না।"

শিশুসুলভ উৎসাহে ডাক্তার মুখার্জি অগ্রসর হলেন গেটের দিকে। রকেট ভুটানও এই সুযোগে গেটের বাইরে যাওয়ার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু ডাক্তার মুখার্জি যেতে দিলেন না।

"যাও তোমরা। দুর্গা গেট বন্ধ করে দে—"

দাইয়ের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল দাইয়ের মেয়ে রুক্‌মিনিয়া সত্যিই পাঁচটা বক্‌রির বাচ্চা নিয়ে হাসিমুখে বসে আছে। আনন্দে তার সবগুলো দাঁতই বেরিয়ে পড়েছে। বাচ্চাগুলো খুবই ছোট ছোট। ডাক্তার মুখার্জি ঝুঁকে দেখলেন বেঁচে আছে সব কটাই।

"ওগুলোকে বাঁচাবি কি করে। ওর মা কি পাঁচটা বাচ্চাকে দুধ দিতে পারবে?"

দেখা গেল রুক্‌মিনিয়ার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে।

"ওর মা পারবে না। আমি ওদের বোতলে দুধ খাইয়ে মানুষ করব আর একবার এর পাঁচটা বাচ্চা হয়েছিল, আমি বোতলে পুরে দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে ছিলাম।"

রুক্‌মিনিয়া চমৎকার বাংলা বলে। সে ঘরে ঢুকে একটা ফিডিং বোতল বার করে আনলে।

"এই দেখুন।"

ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "ওর টিট্‌টা খাওয়ার পর ভালো করে ধুয়ে রাখিস। তা না হলে পেটের অসুখ করবে।"

"আচ্ছা।"

"মাই দেখ্‌ দেখ্‌।"

পাকিয়ার নির্দেশে সবাই চোখ তুলে দেখল একটা নীলকণ্ঠ পাখি এসে বসেছে ঘরের চালে। রুক্‌মিনিয়া দু'হাত তুলে প্রণাম কবল। বলল, "খুব, শুভ লক্ষণ। বাচ্চাগুলো তাহলে বাঁচবে।"

গণেশ হালদার অনুভব করলেন এই পরিবেশে ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে প্রাদেশিকতা নিয়ে আলোচনা জমবে না।

।। কুড়ি ।।

যেদিন কালীপুজো হল সেদিনও ঝিনুক কলকাতা থেকে ফিরল না। কাউকে একাই করতে হল সব। ডাক্তার ঘোষালের বাড়ির কাছে যে ফাঁকা মাঠটা ছিল তাতে সামিয়ানা খাটিয়ে পুজোটা নম-নম করে হল কোনোক্রমে। ডাক্তার ঘোষাল একবার এসে উঁকিও দেননি। তিনি নিজের প্র্যাকটিস নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কালীপুজোর রাত্রে এক টাইফয়েড রোগীকে দেখবার জন্য বাইরে চলে গিয়েছিলেন, সমস্ত রাত ফেরেননি। ইচ্ছে করলে অবশ্য ফিরতে পারতেন। কিন্তু সে ইচ্ছে তাঁর হয়নি। রোগীর বাড়িতেই কাটিয়েছিলেন রাতটা। সকালে ফিরে দেখলেন প্রকাণ্ড খাঁড়াটা তখনও ঝোলানো রয়েছে খাবার ঘরের দেওয়ালে টেবিলের সামনে। কাউ চা করছিল।

ডাক্তার ঘোষাল তাকে বললেন, "তোমার কালীপুজো তো হয়ে গেছে। খাঁড়াটা এবার ফিরিয়ে দাও যেখান থেকে এনেছ।"

"ওটা আমি কিনেছি।"

"কিনেছ? খাঁড়া কিনেছ। কেন?"

কাউ চুপ করে রইল। তার নীরবতার মধ্যেও যেন একটা ভাষা ছিল। ডাক্তার ঘোষাল কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন তার মুখের দিকে তারপর বোমার মতো ফেটে পড়লেন।

"তোমার ওই খাঁড়া ফাঁড়া নিয়ে বেরিয়ে যাও এখান থেকে। I cannot have an impudent pig hanging around me. শুয়োরের সঙ্গে বাস করা যায় না।"

"মাসিমা না এলে আমি কোথাও যাব না। তিনি আমাকে থাকতে বলে গেছেন।"

"মাসিমা কি এ বাড়ির মালিক? বেরোও এখান থেকে।"

কাউ সংক্ষেপে বললে, "আমি যাব না।"

এর পর যা অনিবার্য তাই হল। ডাক্তার ঘোষাল উঠে ঠাস্ করে এক চড় মারলেন তার গালে।

কাউ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মেজের উপর। তারপর ডাক্তার ঘোষাল তাকে লাথাতে লাথাতে বার করে দিলেন রাস্তায়। খাঁড়াটা দেওয়াল থেকে খুলে এনে ছুঁড়ে দিলেন বাইরে। ফিরে এসে কপাটটা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে একটা চেয়ারে ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে রইলেন গুম হয়ে। তারপর পা দোলাতে শুরু করলেন। একটু পরেই উঠে দাঁড়ালেন আবার। হেঁট হয়ে জানলার একটা ফোকর দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন কাউ কি করছে। যতটুকু দেখতে পেলেন সামনের রাস্তায় কেউ নেই। জানলাটা খুললেন আস্তে আস্তে। খট্ করে ছিট্‌কিনির শব্দ হওয়াতে চমকে উঠলেন, যেন কোথাও দুষ্কার্য করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন। জানলা খুলে দেখলেন কাউ নেই, খাঁড়াটাও নেই।

হঠাৎ তাঁর সমস্ত বুকটা যেন খালি হয়ে গেল। সত্যিই চলে গেল নাকি ছোঁড়াটা। হাজার হোক্ ছেলে তো! রাগের মাথায় মেরেছেন বলে চলে যাবে। আবার ভ্রূকুঞ্চিত হল তাঁর। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন ungrateful wretch! তারপরই স্টোভটার শোঁ শোঁ আওয়াজ সম্বন্ধে সচেতন হলেন তিনি। কাউ স্টোভটা জ্বেলে চায়ের জল করছিল। ভিতরে ঢুকে দেখলেন দুধের কড়াটা মেজেতে বসানো রয়েছে, একটা বেরাল খাচ্ছে দুধটা। মীট সেফের দরজাটা খোলা। তাঁকে দেখে বেড়ালটা পালিয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি কয়েক মুহূর্ত। মীট সেফে পাঁউরুটি রয়েছে, ডিমও আছে কয়েকটা, মাখনও আছে। তিনি কি এখন উবু হয়ে স্টোভের ধারে বসে নিজের জন্যে চা জলখাবার তৈরি করবেন? কখনও করেননি তো। বরাবরই কেউ না কেউ করে দিয়েছে। প্রবলভাবে ঝিনুকের কথা মনে পড়ল। সে এত দেরি করছে কেন? কি করছে সে কলকাতায়। অদ্ভুত হয়ে উঠল মুখেব ভাব। রাগ, ভয়, আক্রোশ, আফসোস একসঙ্গে মূর্ত হয়ে উঠল তাতে। হঠাৎ ঝুঁকে স্টোভটা নিবিয়ে দিলেন তিনি। মীট সেফের কপাটটা বন্ধ করলেন। জানালাটাও বন্ধ করে দিলেন। তারপর নিজের বড় সুটকেসটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে। ঘরের কপাটে ডবল তালা লাগিয়ে মোটরে গিয়ে উঠলেন। তারপর সোজা চলে গেলেন 'ক্ষুধা-হরণ' হোটেলে। হোটেলের মালিক তিনকড়ি বসাক তাঁর রোগী এবং ভক্ত। তাকে গিয়ে বললেন, "এইখানেই থাকব দিনকতক। চাকরবাকর সব পালিয়েছে। আমার জন্যে একটা আলাদা ঘর চাই। আছে? এখুনি খাবারও চাই কিছু। ভয়ঙ্কর ক্ষিধে পেয়েছে।"

"এখুনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

শশব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল তিনকড়ি।

খাবার খেয়েই তিনি ডিসপেন্সারিতে চলে গেলেন। অনেক রোগী বসেছিল তাঁর অপেক্ষায়। রোগী নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। একটা ছোট মেয়ের নাকে মকাইয়ের দানা ঢুকে গিয়েছিল। তাকে নিয়ে খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি করতে হল। বেরুল দানাটা। মেয়েটা তো চেঁচাচ্ছিলই, তার মা-ও তুমুল কলরব করে কাঁদতে লাগল। ডাক্তার ঘোষাল জোর ধমকদিলেন তাকে।

চোপরাও হারামজাদী। মেয়েকে যেখানে সেখানে ছেড়ে দেবে, আর এখানে এসেছে ন্যাকামি করে কাঁদতে।"

"মেয়েটির স্বামীটিও সঙ্গে ছিল। স্ত্রীর এবম্বিধ অপমানে একটুও ক্ষুব্ধ হল না সে। বরং সে ডাক্তার ঘোষালের কথায় সায় দিয়েই বললে, 'ঠিকই বলেছেন ডাক্তারবাবু। মেয়েকে ও কিছু দেখে না।"

লোকটি বেশ বলিষ্ঠ গঠন। ডাক্তার ঘোষাল ঘাড় ফিরিয়ে তাঁর বিস্ফারিত চক্ষুর দৃষ্টি স্থাপন করলেন লোকটার মুখের উপর।

"তুমি ফপরদালালি করছ যে, তুমি দেখতে পার না? চেহারা তো বেশ তাগড়া, কি কর তুমি?"

স্ত্রীটি চোখের জল মুছতে মুছতে বললে, "কিছু করে না ডাক্তারবাবু, বেকার বসে আছে।"

"তবু মেয়েটাকে দেখতে পার না রাসকেল। তোমার বউকে রাঁধতে হয়, বাসন মাজতে হয়, কাপড় কাচতে হয়—"

বউটি ফর্দ আরও বাড়িয়ে দিল।

"ঢেঁকিতে পাড় দিতে হয়, ছাতু পিষতে হয়, ঘুঁটে দিতে হয়। আমিই সংসার চালাই ডাক্তারবাবু।"

লোকটি অনুভব করল ফোড়ন দিতে গিয়ে বিপদে পড়ে গেছে সে। আর কিছু না বলে সে চোখ পাকিয়ে চেয়ে রইল বউটার দিকে।

"তোমাদের বাড়ি কি এখানেই?"— জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার ঘোষাল।

"আজ্ঞে না, আমরা রেফিউজি, সম্প্রতি এসেছি—"

"তোমাদের কথার টান থেকেই সেটা বুঝেছি। কি জাত?"

"জেলে।"

তারপর একটু থেমে বলল—"চিরকাল মাছের কারবার করেছি বাবু। এখানে তার কোনো সুবিধে নেই। তাই বেকার হয়ে বসে আছি।"

"রাঁধতে পার?"

"রাঁধা তো অভ্যাস নেই। তবে মোটামুটি পারি।"

"তাহলে আমার বাড়িতে এস। নাম কি তোমার?"

"হরসুন্দর।"

"কি মাইনে নেবে?"

"বিবেচনা করে যা দেবেন।"

"আমার বাড়িতে তাহলে এস কাল থেকে।"

"কোথায় আপনার বাড়ি?"

তার স্ত্রী অপ্রত্যাশিতভাবে বলে উঠল, "আমি জানি। ঝিনুক-দি ওঁর বাড়িতে থাকেন।"

"তুমি ঝিনুককে চেন?"

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন ডাক্তার ঘোষাল।

মেয়েটি মাথা হেঁট করে বলল, "চিনি।"

কি করে ঝিনুককে সে চিনলে তা আর সে খুলে বললে না। ভয় হল, শুনলে হয়তো ডাক্তার ঘোষাল চটে যাবেন। ঝিনুক সুযোগ পেলেই রেফিউজিদের বাড়ি বাড়ি ঘোরে, দুঃস্থ রেফিউজি পরিবারকে অর্থ সাহায্যও করে গোপনে। বলা বাহুল্য, সংসার খরচের টাকা বাঁচিয়েই সে এসব করে। ডাক্তার ঘোষাল সংসারের কোনো খবরই রাখেন না, এটাও

রাখেননি। খবরটা শুনে তিনি ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে চাইলেন মেয়েটার দিকে। সে আরও ভয় পেয়ে গেল। ভাবল ঝিনুকের সঙ্গে তার পরিচয় আছে এটা যেন তার অপরাধ। ডাক্তার ঘোষাল কিন্তু মনে মনে খুশি হয়েছিলেন, তাঁর মুখ দেখে যদিও অন্যরকম মনে হচ্ছিল।

বললেন, "আচ্ছা, আমার বাড়িতে এস।" তারপর বাকি রুগীদের দেখতে লাগলেন। নানা রকম রুগী। কারও জ্বর হচ্ছে, কারও হাঁপানি, কারও চোখ উঠেছে, কারও পেটের অসুখ, কারও একজিমা, কারও বাত। কোনো রুগীকে মিনিট পাঁচেকের বেশি দেখেন না ডাক্তার ঘোষাল। দেখবার সময় নেই। খুব তাড়াতাড়ি রোগ নির্ণয়ও করতে পারেন। খসখস করে প্রেসকৃপশন লিখছিলেন এমন সময় তাঁর কানে এল, "আমার কথাটা একটু শুনবেন?"

চোখ তুলে দেখলেন ঝিনুকের কাকা যতীশবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। নাদুস-নুদুস চেহারা, মাথায় চুলটি পরিপাটি করে আঁচড়ানো, পোশাক ফিটফাট।

"কি কথা বলুন।"

"ঝিনুক কলকাতা থেকে এখনও ফেরেনি। শামুকও শুনলাম কলকাতায় চলে গেছে। ঘরে চাল ডাল তরিতরকারি কিচ্ছু নেই। চাকরটা পালিয়েছে। আমার চলবে কি করে?"

ডাক্তার ঘোষাল নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তাঁর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর ক্রোধ ঘনিয়ে এল তাঁর চোখের দৃষ্টিতে।

"চলবে কি করে তা আমি কি করে বলব?"

"আপনারই তো বলবার কথা। আপনিই জোর করে আমাদের দেশ থেকে নিয়ে এসেছেন, আপনিই আমাদের ভরণপোষণ করছেন—"

"একটা ছাগলকে বাঘের মুখ থেকে বাঁচিয়েছিলাম বলে চিরকাল তাকে পুষতে হবে নাকি? আপনি এবার চরে খান।"

"আমাকে ছাগল বললেন, কিন্তু আমার ভাইঝি ঝিনুককে তো ছাগলী বলে তাড়িয়ে দেননি, তাকে মাথার মণি করে রেখে দিয়েছেন বরং—"

এর একটি উত্তরই ডাক্তার ঘোষালের মতো লোকের কাছে প্রত্যাশিত এবং তা তিনি সঙ্গে সঙ্গে দিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করলেন যতীশবাবুর গালে। যতীশবাবু পড়ে গেলেন। রোগীদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল। থানার হাবিলদার রামভরোসা সিং তাঁর পেটের দরদের জন্য ওষুধ নিতে এসেছিলেন। তিনি বরাবরই ডাক্তার ঘোষালের কাছে বিনামূল্যে ওষুধ পান, তাঁর চিকিৎসা-নৈপুণ্যের উপর হাবিলদার সাহেবের বিশ্বাসও অগাধ। তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন, ডাক্তার ঘোষালের দিকে। ভাবটা, আমাকে এখন কি করতে হবে বলুন। দেব নাকি আরও দু'চার ঘা?

ডাক্তার ঘোষাল ভালো হিন্দী বলতে পারেন না। বাংলায় বললেন, "লোকটা পাজি বদমায়েশ। আমার নামে একটা মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে আমার কাছ থেকে মোচড় দিয়ে টাকা আদায় করতে এসেছিল।" তারপর শেষে হিন্দীতে যোগ করে দিলেন, "উসকো হিয়াঁসে ভাগা দিজিয়ে।"

যতীশবাবু উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কপালটা কেটে রক্ত পড়ছিল। ডাক্তার ঘোষাল হেঁকে তাঁর অ্যাসিস্টেন্টকে বললেন, "ওহে, এর মাথাটা আইওডিন লাগিয়ে ড্রেস করে দাও।" তারপর পাঁচটা টাকার একটা নোট বার করে বললেন, "এইটে নিয়ে এখন ক্ষুন্নিবৃত্তি করুন। তারপর দেশে চলে যান। আপনার দেশে যাবার ব্যবস্থা আমি করে দেব।"

যতীশবাবু টাকাটা নিলেন না, ড্রেসও করালেন না। নীরবে বেরিয়ে গেলেন। ডাক্তার ঘোষাল তাঁর প্রস্থানপথের দিকে চেয়ে রইলেন ভ্রূকুঞ্চিত করে। লোকটার অবস্থা দেখে ভিতরে ভিতরে কষ্ট হচ্ছিল তাঁর, কিন্তু মুখে যা বললেন তা অন্যরকম। বললেন, স্কাউন্ডেল।

হাবিলদার সাহেব আশ্বাস দিলেন, ‘‘হম্ উস্‌কো ‘টাইট’ কর দেঙ্গে, হুজুর। আপ বে-ফিকির রহিয়ে।’’

ঘোষাল হাবিলদারের পেটের ব্যথার কারণ নির্ণয় করতে প্রবৃত্ত হলেন।

ঘন্টা দুই পরে হোটেলে ফিরে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। তাঁর মোটরের শব্দ পেয়েই হোটেলের মালিক বসাক মশাই বেরিয়ে এসে বললেন, ‘‘আসুন। আপনার খাবার তৈরি করিয়েছিলাম, কিন্তু এখনে আপনার খাওয়া হবে না। আপনি বাড়ি যান। একজন ভদ্রমহিলা এসে আপনার ঘর খুলে আপনার জিনিসপত্র নিয়ে গেছেন। আপনার জন্যে যে পোলাও মাংস করিয়েছিলাম তা-ও নিয়ে গেছেন। আমি দাম নিতে চাইনি, তবু তিনি দশটা টাকা জোর করে দিয়ে গেলেন আমাকে। আপনার সঙ্গে আমার টাকার সম্পর্ক নয়, সে কথা বারবার বললাম, কিন্তু তিনি শুনলেন না।’’

‘‘ভদ্রমহিলা আবার কে এল?’’

‘‘মনে হল আপনার স্ত্রী।’’

‘‘স্ত্রী? স্ত্রী তো আমার নেই—’’

‘‘ও, তা হলে অন্য কোনো আত্মীয়া হবেন। আপনার খুব পরিচিত বলে মনে হল। আপনি আপনার ঘরে যে তালা লাগিয়ে গিয়েছিলেন, সে তালার চাবিও ছিল তাঁর চাবির রিং-এ। তাঁর ভাব-ভঙ্গি দেখে আমিও আর কিছু বলতে সাহস করলাম না।’’

‘‘আচ্ছা—’’

বসাক মশাই নবাগত রেফিউজি। এসেই অসুখে পড়েছিলেন। ঘোষাল বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে তাঁকে ভালো করেছেন। ঝিনুকের খবরটা তাঁর কানে যায়নি তখনও।

ডাক্তার ঘোষাল মোটরে উঠতে যাচ্ছিলেন, বসাক মশাই এগিয়ে এসে বললেন, ‘‘এ টাকাটা ফেরত নিয়ে যান, ডাক্তারবাবু।’’

‘‘আমি তো টাকা দিইনি। যে দিয়েছে তাকে ফেরত দেবেন। মনে হচ্ছে রাঁধুনি ছুটি থেকে ফিরেছে।’’

‘‘ও—’’

মোটর ঘুরিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার ঘোষাল।

ঝিনুক রান্নাঘরে ছিল।

মোটরের শব্দ শুনে বেরিয়ে এল। এমনভাবে এল যেন কিছুই হয়নি।

‘‘কাউ কোথা, তাকে দেখছি না।’’

‘‘তাকে দূর করে দিয়েছি। ওরকম বেয়াদব লোকের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকা যায় না। ওর ভাব-ভঙ্গি দেখলে মনে হয়, ওর যেন একটা আক্রোশ আছে আমার উপর, he is nursing a grudge against me."

ঝিনুক শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল, "আক্রোশ থাকাটাই স্বাভাবিক। এ আক্রোশ যাতে ওর মন থেকে মুছে যায়, আমাদের সেই চেষ্টাই করতে হবে।"

"চেষ্টা কি কম করেছি? I have left no stone unturned; সব রকম করা হয়েছে। জলের মতো অর্থব্যয় করে ওকে ফাঁসি থেকে বাঁচিয়েছি। বারবার ওর চাকরি করে দিয়েছি, ওর ভরণপোষাণের সব ভার নিয়েছি। তুমি ওর মাথায় কালীপুজোর হুজুক ঢুকিয়ে দিয়ে সরে পড়লে. তারও সব খরচ আমি দিয়েছি। শ'দুই টাকা লম্বা হয়ে গেছে। আর কি করতে পারি বল! What can I do?"

"আসল জিনিসটাই করেননি। ওকে ভালোবাসতে হবে।"

"শুয়োরের বাচ্চাকে ভালোবাসা যায় না। I cannot love a pig— আমিও শুয়োর, আমাকেও কেউ ভালো বাসেনি। আমি জীবনে যা সুখসুবিধা ভোগ করেছি, তা আমাকে নগদ পয়সা দিয়ে কিনে ভোগ করতে হয়েছে, I had to pay for everything I enjoyed, I had to fight for every inch of ground I won—আমাকে ভালোবেসে কেউ কিছু দেয়নি। দেবে সে আশাও করি না।"

ডাক্তার ঘোষাল চক্ষু বিস্ফারিত করে ঈষৎ ব্যায়ত আননে চেয়ে রইলেন ঝিনুকের দিকে। তাঁর থুতনিটা ঈষৎ কেঁপে উঠল।

"ওসব কথা এখন যাক। রান্না হয়ে গেছে। এখন স্নান করে খেতে বসুন।"

"তুমি কলকাতায় এতদিন কোথায় ছিলে? কি করছিলে?"

"সব বলব, খাওয়া-দাওয়া চুকুক আগে।"

"তোমরা সবাই স্বার্থপর পশু। সবাই নিজের নিজের ধান্দাতে ঘুরছ। আমার দিকে চাইবার অবসর কারও নেই।"

ঝিনুক এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে মৃদু হেসে ভিতরে চলে গেল।

।। একুশ ।।

মিস্টার সেন অকূলপাথারে হাবুডুবু খেতে লাগলেন শেষ পর্যন্ত। এ যুগের তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারেই তিনি এ যুগের সাধনার আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু গোড়াতেই ভুল ছিল। লোল-জিহ্বা কামনা-রাক্ষসীকে তিনি ভুল করেছিলেন দেবতা বলে। বিপদে পড়তে হল সুতরাং। কামনারাক্ষসীর পূজাতে যে পঞ্চ-মকারের প্রাচুর্য তার সঙ্গে তন্ত্রসাধনার পঞ্চ-মকারের আপাতদৃষ্টিতে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও আসলে দুটো ম-কারের আকাশ-পাতাল তফাৎ। একটা ম-কার সাধককে অনন্ত আনন্দলোকে নিয়ে যায়, আর একটা তাকে টেনে নিয়ে যায় রসাতলে।

এই রসাতলের অন্ধকারেই দিশাহারা হয়ে ঘুরছিলেন মিস্টার সেন। পাপের পথে ধাপে ধাপে নেমে গিয়ে মানুষ শেষ পর্যন্ত যে রসাতলে পৌঁছে যায়, সে রসাতলের অন্ধকার বড় দুঃসহ, বড় নির্মম, বড় ভয়ঙ্কর। সেখানে শুধু অন্ধকারই থাকে না, প্রতি পদক্ষেপে সেখানে যে তীক্ষ্ণ কণ্টক, যে বিষাক্ত বৃশ্চিক দংশন করতে উদ্যত হয়, তা সত্যিই ভয়াবহ। এদের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় নেই, কারণ এসব কণ্টকজ্বালা নিজের পাপেরই জ্বালা, এসব দংশন, নিজের বিবেকেরই দংশন।

তনিমা চলে যাওয়ার পর থেকেই মিস্টার সেনের বিপদের শুরু হয়েছে। প্রথমে তিনি সন্দেহ করেছিলেন তনিমার অন্তর্ধানের সঙ্গে ডাক্তার মুখার্জির যোগাযোগ আছে। তাঁর নামে মকদ্দমা করবার জন্যেও প্রস্তুত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর উকিল তাঁকে বললেন, "এ মকদ্দমা টিকবে না। ডাক্তার মুখার্জির বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই। যে প্রমাণ আছে. তার থেকে বরং এই কথাই মনে হয় যে. তিনি নির্দোষ এবং আপনার মেয়ের হিতাকাঙক্ষী। প্রথমত, আপনার মেয়ে চলন্ত ট্রেনে হঠাৎ তাঁর কামরায় উঠেছিল, এটা অনেকেই দেখেছে। আগে থাকতে যে যোগসাজস ছিল এর কোনও প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত, ঘোঘা স্টেশনে নেমে ড্রাইভার সুবেদার খাঁকে তিনি বলেছেন যে, সাবোরে আপনাকে দেখতে পাননি বলে তনিমাকে সেখানে নামিয়ে দিতে পারেননি, কাল সকালে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। তৃতীয়ত, তাকে সঙ্গে করে উনি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলোয় গিয়েছিলেন এবং সব কথা তাঁকে খুলে বলেছিলেন। কুমতলব থাকলে এসব তিনি করতেন না। সব কথা শোনবার পর পুলিশ-প্রোটেক্শন দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কলকাতায় তনিমাকে যে বাসায় পাঠিয়েছিলেন, তা ডাক্তার মুখার্জির একজন বন্ধুর বাসা বটে, কিন্তু তনিমা সেখানে যাবার পর যে ডাক্তার মুখার্জি একবারও সেখানে গেছেন এর কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ঘোঘার মাঠে উনি শজারু দেখতে গিয়েছিলেন। আপনার মেয়ে ওঁর সঙ্গে ছিল বটে, কিন্তু ওঁর চাকর দুর্গাও সর্বক্ষণ ছিল ওঁর সঙ্গে। সুতরাং মনে হয়, ওঁর নামে মকদ্দমা করলে ওঁর কিছু হবে না। বরং উল্‌টে উনি যদি আপনার নামে মানহানির মকদ্দমা করেন, আপনি বিপদে পড়ে যাবেন। আপনি বলেছেন, ডাক্তার ঘোষাল তনিমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন, সেই টাকা নিয়ে সে চলে গেছে। সেজন্য মনে হচ্ছে ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে ওর চলে যাওয়ার হয়তো কোনও যোগাযোগ থাকতে পারে। ডাক্তার ঘোষাল ওকে শুধু শুধু পাঁচ হাজার টাকা দিতে গেলেন কেন? আপনি বলছেন ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা ছিল। কি রকম ঘনিষ্ঠতা? সেটা কতদূর গভীর? জেরার মুখে আদালতে এসব স্বীকার করতে হবে আপনাকে। তনিমাও যে জেরার মুখে কি বলবে তা অনিশ্চিত। কোথাকার জল যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কেউ বলতে পারে না। তাই আমার মনে হয় চেপে যান, মকদ্দমা করবেন না। কেঁচো খুড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে। আপনার নিজের স্লেট যখন পরিষ্কার নয়, তখন সেটা লুকিয়ে রাখাই ভালো আপাতত।"

অভিজ্ঞ উকিলের এ পরামর্শ শুনেছিলেন মিস্টার সেন। আর একটা কারণেও মকদ্দমা করবার আশা বিসর্জন দিতে হয়েছিল তাঁকে। হাতে টাকা ছিল না। তিনি যা মাইনে পান আর যে স্টাইলে থাকেন, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য হয় না। এ অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য-বিধান করত তনিমার উপার্জন। সত্যিই সে রোজগারে মেয়ে ছিল তাঁর। তাঁর নিজের উপার্জনেও বাঁ হাতের খেলা ছিল কিছু কিছু। সুযোগ পেলে ঘুষ-ঘাষ নিতেন। ডাক্তার ঘোষাল প্রতি মাসেই নানা ছুতোয় কিছু টাকা তাঁকে দিতেন। তাঁর জন্মদিন, তনিমার জন্মদিন, দোল-দুর্গোৎসব এসবে তো দিতেনই, তাস খেলায় মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে হেরে গিয়েও টাকা পাইয়ে দিতেন তাঁকে। ঘুষেরই নামান্তর এসব। তনিমা চলে যাওয়ার পর ঘোষালের বাড়িতে তাসের আড্ডাটা ভেঙে গেছে। স্টেশনমাস্টাব পাণ্ডা সাবধানী চতুর লোক। তনিমার আকস্মিক অন্তর্ধানে বিপদের

সম্ভাবনা আছে অনুমান করে আড্ডায় আসাই ছেড়ে দিয়েছেন। সুবেদার খাঁ তাসের আড্ডায় ক্বচিৎ আসতেন। এখন একেবারেই আসেন না। মিস্টার সেন তনিমাকে মাঝে মাঝে তাসের আড্ডায় নিয়ে যেতেন এবং যেদিনই নিয়ে যেতেন সেদিনই তনিমা খেলায় জিতে বেশ কিছু রোজগার করত। মিস্টার সেনের ধারণা, তনিমাই ছিল তাসের আড্ডার প্রাণস্বরূপিণী। সে চলে যাওয়াতেই আড্ডাটা মরে গেল। তনিমার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গিয়েছিলেন তার কলকাতার বাসায়। কিন্তু তনিমা কিছুতেই ফিরে এল না। ঘরে খিল বন্ধ করে বসে রইল, দেখাই করল না তাঁর সঙ্গে। বেশি ছুটি নিয়ে যাননি, তাই ফিরে আসতে হয়েছিল তাঁকে। ভেবেছিলেন আরও কিছুদিন পরে আবার একবার যাবেন, তখন ওর রাগটাও পড়বে, হাতের টাকাও ফুরিয়ে আসবে। কিন্তু কিছুদিন পরে গিয়ে দেখলেন, ঘরে তালা বন্ধ। পাড়ার লোকে বললে, প্রায় পনরো দিন বাড়িটা খালি পড়ে আছে। তনিমার খবর কেউ দিতে পারলে না। ফিরে এসেই তিনি গিয়েছিলেন ডাক্তার মুখার্জির কাছে। তিনিও বললেন, তিনি তনিমার কোনো খবর জানেন না। সে তাকে কোনও চিঠি লেখেনি, তিনিও লেখেননি। তনিমা সেখানে নেই শুনে বিস্মিত হলেন। বললেন, ওটা তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি, খালি পড়ে ছিল বলে তনিমাকে সেখানে থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন। তারপর আর কোনো খবর নেওয়া দরকার মনে করেননি। তিনি মিস্টার সেনকে বললেন পুলিশে খবর দিতে। এ-ও বললেন যে তনিমা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল, তিনি অনেক বুঝিয়ে তার কাছ থেকে সায়ানাইডের শিশিটা নিয়ে নিয়েছিলেন। তনিমা অন্তঃসত্ত্বা এ খবরটাও তিনি জানতেন, কিন্তু সেটা মিস্টার সেনকে খুলে বলা প্রয়োজন মনে করলেন না। কেবল বললেন ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝেছিলাম ও ঠিক সুস্থ নয়। শরীর মন কিছুই ওর ভালো বলে মনে হয়নি। তাই ওকে আমার এক ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলাম। চিঠিও দিয়েছিলাম একটা তার নামে। ঠিকানাটা আপনাকে দিচ্ছি। আপনিও সেখানে খোঁজ করে দেখতে পারেন।"

মিস্টার সেন গিয়েছিলেন সে-ডাক্তারের কাছেও। তিনি বললেন, "আপনার মেয়ের incomplete abortion হয়ে খুব bleeding হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে এনে অপারেশন করে অনেক কষ্টে বাঁচিয়েছিলাম। কিন্তু একটু ভালো হয়েই দিন কতক আগে কাউকে কিছু না বলে হাসপাতাল থেকে চলে গেছেন তিনি। তাঁর বাড়ির ঠিকানায় ফিরে যাননি। আমরা এখানকার থানায় একটা ডায়েরি করিয়ে দিয়েছি। আজই ভাবছিলাম ডাক্তার মুখার্জিকেও খবরটা দেব। আপনিই তা হলে খবরটা দিয়ে দেবেন তাঁকে। আপনাকে আমাদের হাসপাতালের ফর্মে একটা রিপোর্ট দিয়ে দিচ্ছি।"

রিপোর্ট দেখে চমকে উঠেছিলেন মিঃ সেন।

"মিসেস এস. মুখার্জি কে?

"ওই নামেই তো তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন।" ভ্রূকুঞ্চিত করে চুপ করে রইলেন মিস্টার সেন। তাঁর উকিল তাঁর মন থেকে যে সন্দেহটা ঘোচাবার চেষ্টা করেছিলেন সেইটেই আবার ছায়াপাত করল তাঁর মনে। কিন্তু তিনি ডাক্তারকে কিছু বললেন না। রিপোর্টটা নিয়ে ফিরে এলেন। শুধু রিপোর্টটা নয়, আর একটা খবরও নিয়ে এলেন। ডাক্তার কথা প্রসঙ্গে তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, যেদিন তনিমা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে সেদিন যে মেয়েটি তাঁকে ডাকতে

গিয়েছিল তার নাম ঝিনুক। তনিমার কাছ থেকেই নামটা জেনেছিলেন তিনি। কিন্তু পরে আর ঝিনুককে দেখতে পাননি।

মিস্টার সেন ফিরে এসে ডাক্তারের রিপোর্টটি নিয়ে একবার তাঁর উকিলের সঙ্গে দেখা করলেন। উকিল বললেন, "ওই এস. মুখার্জি থেকে কিছু প্রমাণ হয় না। এস দিয়ে সুরেন, সুধাংশু, সুধীর, সুকুমার, সুশীল, সুশোভন এবং আরও অনেক নাম হতে পারে। এস. মুখার্জি যে সুঠাম মুখার্জি এ কথা আদালতকে বোঝাতে হলে অন্য প্রমাণও চাই। তা ছাড়া, আপনার মেয়ে যে নিজের মিথ্যে পরিচয় দিয়ে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচতে চায়নি তাই বা আপনি কি করে জানলেন? সুঠাম মুখুজ্যের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই, তিনি শহরের কারও সঙ্গেই বড় মেশেন না একটা, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে এ ধরনের কোনও দুর্নাম কখনও শুনিনি। খামখেয়ালী বলে তাঁর একটা বদনাম আছে; মহৎ লোকেরা অনেক সময় খামখেয়ালী হন, কিন্তু উনি যে ভালো লোক এ খবরও পেয়েছি অনেকের কাছে। সেদিন দেখলাম এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবই ওঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সুতরাং ওঁর নামে মকদ্দমা করে আপনি সুবিধা করতে পারবেন না। আপনি বরং ডাক্তার ঘোষালের উপর আপনার টর্চটা ফেলুন। লোকটার চাল-চলন ধরন-ধারণ একটু আমিষ-গন্ধী, ইংরেজিতে যাকে বলে fishy, যে ঝিনুকের নাম করলেন সে-ও ওর বাড়িতেই থাকে, in what capacity I dont know ঃ আপনি ওই অঞ্চলেই খোঁজ নিন, কিছু হদিস হয়তো পাবেন।"

মিস্টার সেন তাঁর উকিলের উপর চটলেন, কিন্তু তাঁর উপদেশ অমান্য করতে সাহস করলেন না। উকিলটির দক্ষতার ও আইন-জ্ঞানের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। ডাক্তার ঘোষালকেও ঘাঁটাতে সাহস হল না তাঁর। ডাক্তার ঘোষাল যে তনিমাকে সরিয়েছে এ কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না তিনি। এ কথা বিশ্বাস করতে হলে এতদিন তিনি মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে যে জ্ঞান আহরণ করেছেন সেইটেকেই অস্বীকার করতে হয়। তিনিও জীবনে অনেকরকম মানুষ চরিয়েছেন, এখনও চরাচ্ছেন। তাঁর অভিজ্ঞতাও কম নয়। ডাক্তার ঘোষালের মতো লোক তিনি বেশি দেখেননি। লোকটি বয়স্ক কিন্তু শিশুপ্রকৃতির। লোভী খুব, কিন্তু মোহ নেই। অর্থ, মেয়েমানুষ, খাবার, মদ সবই তিনি সাগ্রহে ভোগ করতে চান, কিন্তু ওর কোনোটাই তাঁকে আসক্তির বন্ধনে বাঁধতে পারেনি। বিষয়ে যদি ওঁর আসক্তি থাকত তা হলে তিনি ওঁর হাত দিয়ে এত টাকা রোজগার করতে পারতেন না। ঝিনুক, শামুক আর তার কাকাকে উনি যেভাবে উদ্ধার করে এনেছিলেন (গল্পটা শামুকের মুখে শুনেছেন তিনি, ঘোষাল নিজের কৃতিত্বের কথা কারও কাছে বলেননি) তা বিস্ময়কর। সাধারণ স্বার্থপর লোক এসব ঝুঁকি ঘাড়ে নিত না। এখানেও নানারকম বে-আইনী সুযোগ সুবিধা তিনি তাঁর কাছে নিয়েছেন, কিন্তু তার অধিকাংশই গরিব রেফিউজিদের জন্য। নিজের জন্য বিশেষ কিছু নেননি। যতটা নিয়েছেন তার বহুগুণ ফিরিয়ে দিয়েছেন নানাভাবে। তা ছাড়া, তনিমাকে সরিয়ে ওঁর লাভই বা কি হয়েছে? বরং তাঁর মুখের গ্রাস সরে গেছে বলে রাগ হওয়ারই কথা। কিন্তু ঝিনুক মেয়েটিকে মিস্টার সেন বরাবরই একটু সন্দেহের চক্ষে দেখেন। মেয়েটির যেমন চোখ-ধাঁধানো রূপ, তেমনি ক্ষুরধার বুদ্ধি। ডাক্তার ঘোষালের বাড়ির সে-ই সর্বময়ী কর্ত্রী। ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা কত গভীর তা অনুমানসাপেক্ষ হলেও খুব অস্পষ্ট নয়। তাঁর বিশ্বাস

তনিমার সঙ্গে ডাক্তার ঘোষালের ঘনিষ্ঠতা ঝিনুক ভালো চক্ষে দেখেনি। ঝিনুকই সম্ভবত কোনোরকম কল-কাঠি নেড়ে তনিমাকে সরিয়ে দিয়েছে এ কথা আগেও একবার মিস্টার সেনের মনে হয়েছিল। ঝিনুক তনিমার বাসায় গিয়েছিল এ সংবাদে সন্দেহটা দৃঢ় হল। কিন্তু এ সন্দেহ নিরসনের উপায় কি? তাকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করা বৃথা। তার বোন শামুক মেয়েটি আরও চতুর। সে আশ্চর্যভাবে তার সঙ্গে প্রেমাভিনয় করত, নানা কৌশলে টাকাও আদায় করে নিয়েছে। কিন্তু তবু তাঁর অবস্থা গ্রীক পৌরাণিক উপাখ্যানের ট্যান্‌টালাসের মতো। জলে আবক্ষ নিমজ্জিত ট্যান্‌টালাসের মতো তাঁরও তৃষ্ণা মেটেনি। পান করতে গেলেই জল সরে গেছে। শামুক তার দিদির মতো রূপসী নয়, রং শ্যামবর্ণ, কিন্তু তার চোখেমুখে ভাব-ভঙ্গীতে এমন একটা প্রচ্ছন্ন রূপ আছে যা প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। কিছুদিন আগে শামুককে তিনি খোলাখুলিই বলেছিলেন, এমনভাবে থাকা যায় না। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারি। আমার স্ত্রী অসুস্থ ঃ ডিভোর্স করা অসম্ভব হবে না। উত্তরে শামুক যা বলেছিল তাতে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বলেছিল, আপনি বৈদ্য না কায়স্থ, মুচি না মেথর, তা আমি জানি না! কিন্তু আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে তা আমি জানি। আর কিছু বলেনি। এ কথা বলার পর থেকে সে যেন আরও নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল, একা কখনও তাঁর কাছাকাছি আসত না। মিস্টার সেন মনে মনে জ্বলছিলেন, ছটফট করছিলেন, এক কথায় ক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন; কিন্তু তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন যখন শামুকও একদিন অন্তর্ধান করল। শামুকের বাড়িতে লোক পাঠিয়ে জানলেন, বাড়িতেও সে নেই। তার বাড়িতে তখন কেউ ছিল না, যতীশবাবু বাইরে গিয়েছিলেন। শামুকের ভাইপো স্কুল-বোর্ডিং-এ থাকত। সেখানে খবর নিয়ে জানলেন, দু'দিন আগে তাকেও বোর্ডিং থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে শামুক। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন মিস্টার সেন। তাঁর মৈথিল চাপরাসী রান্নার ভার নিলেন বটে, কিন্তু তাঁর পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্ত্রী? তার সেবা কে করবে? হাসপাতালের নার্স রাখতে গেলে দৈনিক অন্তত দশ টাকা খরচ। তা-ও তারা সব সময় থাকবে না। ছুটি পাবে না। শামুকের উপর সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন তিনি। কি করবেন এখন? পরামর্শ করবার জন্য গেলেন ডাক্তার ঘোষালের কাছে।

ডাক্তার ঘোষালের কাছে গিয়ে তিনি যেন অকূলে কূল পেলেন। ঝিনুকের দেখা পেয়ে গেলেন। শুনলেন ডাক্তার ঘোষাল নেই, তিনি কলে বেরিয়ে গেছেন।

"আপনি কবে কলকাতা থেকে ফিরলেন?"

"আজই সকালে ফিরেছি।"

"আমি যে বিপদে পড়েছি তা জানেন নিশ্চয়।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ঝিনুক তাঁর মুখের দিকে, যেন কিছুই জানে না।

"তনিমা তো আগেই চলে গেছে, আজ শামুকও আসেনি। সে বাড়িতেও নেই। তোমার কাকাও নেই বাড়িতে। শুনলাম শামুক স্কুল থেকে সোনারও নাম কাটিয়ে তাকেও নিয়ে গেছে। কি যে ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না।"

তিনি তাঁর অবস্থাটাকে লঘু করবার চেষ্টা করলেন তাঁর সেই হেঁচকি-কুলকুচো হাসি হেসে।

ঝিনুকের মুখ পাথরের মতো ভাবলেশহীন।

"তুমি কোনও খবর জান?"

''আমি এখনও বাড়ি যাইনি। ওদের কোনো খবর আমি জানি না।''

''তনিমার কোনও খবর—?''

''তনিমা যেদিন খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে আমি সেদিন তার বাসায় গিয়েছিলাম তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। হেমারেজ হয়ে সে যখন খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল তখন আমিই ডাক্তার ডেকে তাকে নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দি। তারপর আর কোনও খবর জানি না। কারণ তারপর দিনই আমাকে কলকাতা ছাড়তে হয়েছিল।''

''তনিমা নার্সিং হোম থেকেও পালিয়েছে।''

ঝিনুক চুপ করে রইল।

''এখন কি করি বলুন তো? আমাব স্ত্রীর ব্যবস্থা কি করে হবে?''

আপনি হাসপাতালে খবর দিন, সেখানে কোনও নার্স পেতে পারেন। রেফিউজি কলোনীতে আমার একটি চেনা মেয়ে আছে, সে নার্সের কাজ জানে, আমি বললে সে আসবে। কিন্তু তার সঙ্গে ভদ্রব্যবহারের একটা গ্যারান্টি দিতে হবে। এক জায়গায় নার্সিং করতে গিয়ে সে অপমানিত হয়ে ফিরেছে—''

''নিশ্চয় নিশ্চয়, গ্যারান্টি দেব বইকি। আপনি তাহলে সে-ই ব্যবস্থাই করুন।''

''আচ্ছা। আজ খবর দেব তাকে।''

মিস্টার সেন তবু দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, ''আপনি যেতে পারেন কি? একশ টাকা করে মাইনে দেব। শামুককেও তাই দিতাম।''

''ডাক্তার ঘোষালকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।''

''আমি যদি ডাক্তার ঘোষালকে বলি—''

''না, তিনি রাজি হলেও আমি যাব না।''

মিস্টার সেন কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে শেষে বললেন, ''আচ্ছা, তাহলে চলি এখন। ডাক্তার ঘোষালকে আমার কথা বলবেন—''

মিস্টার সেন বাড়ি ফিরে এসে একখানি চিঠি পেলেন। শামুকের চিঠি।

সবিনয় নিবেদন,

আমি চলে এসেছি। কেন এসেছি তা আপনি জানেন। রাজনীতির কুটিল চক্রান্তে পড়ে আমরা গৃহহীন, সর্বস্বান্ত হয়েছি, আত্মীয়-স্বজন সব হারিয়েছি। বেড়াজালে যেমন মাছ ধরে তেমনি করে আমাদের ধরে এনে যে সব খাল বিল নালা পুষ্করিণীতে দয়ার অবতার কর্তৃপক্ষেরা ছেড়ে দিয়েছেন, সেখানেও হয়তো আমরা কোনো রকমে টিকে থাকতে পারতাম কিন্তু আপনাদের মতো হাঙ্গর-কুমিরের উপদ্রবের জ্বালায় তা-ও আর সম্ভবপর হল না। আপনি শুনেছি আমাদের দেশের লোক, কিন্তু আপনার সরকারী মুখোশের আড়ালে যে মূর্তি দেখলাম তা ভয়ঙ্কর। আশ্চর্য, দাঙ্গার সময় যে গুণ্ডারা আমাদের উপর অত্যাচার করেছিল তাদের সঙ্গে আপনাদের কোনও তফাত দেখতে পেলাম না শেষ পর্যন্ত। গুণ্ডাদের মুখোস ছিল না, আপনাদের আছে, এইটুকুই যা তফাত। আপনি হয়তো ভেবেছিলেন যেহেতু আমরা অসহায় এবং সর্বতোভাবে আপনার কৃপার অধীন তাই আমাদের মনুষ্যত্ব নেই, আমরা আপনার পশু-প্রবৃত্তির কাছে আত্মবিসর্জন করে কৃতার্থ হয়ে যাব। শুনেছি আমাদের দেশের অনেক মেয়ে এ রকম আত্মবিসর্জন করেওছে। আশ্চর্য নয়, প্রবল

বানের সময় অনেক কাঁচা মাটির বাঁধ ভেঙে পড়ে। আপনি আমাকেও সেই ধরনের বাঁধ ভেবেছিলেন বোধ হয়। আপনি আমাদের বংশ পরিচয় জানতেন না, তাই মনে হয় আমাকে প্রলুব্ধ করবার সাহস আপনার হয়েছিল। হেলে সাপ ধরতে অভ্যস্ত, কেউটে চিনতে পারেননি। আমি গিরিশ বিদ্যার্ণবের মেয়ে। আমার পিতামহী, মাতামহী দুজনেই স্বেচ্ছায় সতী হয়েছিলেন। চরিত্রবান শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতদের বংশে আমরা জন্মেছি। আপনি না জেনে আগুনে হাত দিয়েছিলেন। আগুনকে নিবিয়ে ফেলা যায়, কিন্তু অপবিত্র করা যায় না। তবে আপনার বাড়িতে গিয়ে আমার একটা পরম লাভ হয়েছে, আপনার স্ত্রীকে সেবা করবার সুযোগ আমি পেয়েছি। তিনি সতীলক্ষ্মী দেবী, আপনার পাপেই তিনি আজ পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছি, তাই আমার অক্ষয় কবচ, তাই আমাকে নির্ভয় করেছে। আপনার বাড়িতে থেকে আমার দ্বিতীয় লাভ আপনার মেয়ে তনিমা। তাকেও আপনি নষ্ট করেছেন। সে ওই পঙ্ককুণ্ড থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে তার উজ্জ্বল তীক্ষ্ণবুদ্ধি আছে বলে। তার দেহ কলঙ্কিত হয়েছে, মন হয়নি। তাই সে বেঁচে গেছে। পাপকে পাপ বলে চিনতে পারার ক্ষমতা তার ছিল বলেই সে পালিয়ে গেছে আপনার কবল থেকে। আর তারই সহায়তায় আমিও আজ নিরাপদে আপনার এলাকা পার হয়ে চলে আসতে পেরেছি। আপনি যখন এ চিঠি পাবেন তখন আমি অনেক দূরে। আপনি বা আপনার সরকার আর আমাকে আপনাদের লঙ্গরখানায় পুরতে পারবেন না।

আপনার মেয়ে তনিমার সম্বন্ধে আপনি হয়তো নানারকম ভাবছেন তাই আপনাকে খবরটা জানিয়ে দিলাম, সে ভালো আছে। এর বেশি আর কিছু জানাব না। কারণ সে এখন কোথায় তা আমিও ঠিক জানি না। আপনাকে চিঠি লেখবার আর একটা কারণও আছে। গত দশ মাস আপনার কাছে আমি বেতন নিইনি। বকশিশের ছুতো করে মাঝে মাঝে আপনি আমাকে টাকা দিয়েছেন বটে আমার সর্বনাশ করবার উদ্দেশে। কিন্তু সেটা মাইনে নয়। টাকা দিয়ে আমাকে কেনাও যায় না। আমাকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন বলেও টাকাটা আপনার জরিমানা হওয়া উচিত। কিন্তু আপনার টাকা আমি নেব না। আপনি সবসুদ্ধ দু'শ টাকা দিয়েছেন আমাকে। আমার মাইনে থেকে সে টাকাটা কেটে রেখে বাকী আটশ' টাকা আমার দিদি ঝিনুককে দিয়ে দেবেন। ইতি—শামুক।

চিঠিটা পড়ে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন মিস্টার সেন।

কান্নার শব্দ শুনে তাঁর চমক ভাঙল। বারান্দায় বেরিয়ে দেখলেন যতীশবাবু বেঞ্চের উপর বসে হু হু করে কাঁদছেন। মিস্টার সেনকে দেখে তাঁর কান্না আরও বেড়ে গেল।

''আমার কি গতি হবে হুজুর। মেয়ে দুটো আমাকে ফেলে চলে গেছে। ডাক্তার ঘোষালের কাছে গিয়েছিলাম তিনি আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিলেন। আপনি হাকিম তাই আপনার কাছে এসেছি, আমি কি করব তা বলে দিন।''

মিস্টার সেন তার কপালের ক্ষতচিহ্ন তার কাপড় জামায় রক্ত দেখে বিব্রত হয়ে পড়লেন। তারপর চটে গেলেন হঠাৎ।

''এখানে আপনি এসেছেন কেন, আমি ডাক্তারও নই, দারোগাও নই। আমি কি করব।''

''আপনি হুজুর হাকিম, আমাদের মতো অভাগাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। যা করবার আপনিই করুন, আমি আর কোথাও যাব না। আমি আর হাঁটতেও পারছি না, কাল থেকে খাইনি।''

"খাননি কেন? আপনাদের বাসায় তো একটা রাঁধুনি আছে শুনেছিলাম।"

"সে যা রাঁধে, তা আর খাওয়া যায় না। ওর রান্না খেয়েই শরীরটা আমার ভেঙে গেল।"

আর একবার হু হু করে কেঁদে চোখের জল মুছলেন। তারপর বললেন, "তাছাড়া আমার হাতে নগদ পয়সাও নেই, তরি-তরকারি কেনা হয়নি। শুধু আধসিদ্ধ ডাল ভাত কি খাব। ঝিনুকই রোজ বাজার খরচের পয়সা দিয়ে যেত, কিন্তু সে এখনও ফেরেনি।"

"সে ফিরেছে আপনি তার কাছেই যান।"

এ সংবাদে যতীশবাবু খুব প্রফুল্ল হলেন না। তিনি যা চান— নগদ কিছু টাকা— তা ঝিনুকের কাছে পাওয়া যাবে না। খাওয়া-দাওয়ার কথা যা তিনি বললেন, তা মিথ্যে। রাঁধুনীটি ভালোই রাঁধে, দৈনন্দিন বাজার খরচের টাকাও ঝিনুক তাকে দিয়ে গিয়েছিল। ঝিনুক-শামুকের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে যতীশ ঘোষালের কাছে গিয়েছিলেন মোচড় দিয়ে যদি কিছু আদায় করতে পারেন। কিন্তু সেখানে সুবিধা হল না, তাই তিনি এসেছিলেন মিস্টার সেনের কাছে। অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশ্য, তাঁর দুই ভাইঝির দুই প্রণয়ীর কাছ থেকে নেপথ্যে কিছু টাকা আদায় করে নেওয়া। মিস্টার সেনের কথা শুনে তিনি বললেন, "শামুককে আপনার কাছে দিয়েছিলাম, আপনি তাকে রাখতে পারলেন না। সে কোথায় গেল সে ঠিকানাটাও অন্তত আমাকে বলে দিন। আমি ওকে নিয়েই দেশে চলে যাই। সেখানেই দুঃখ-ধান্দা করে থাকব কোনোরকমে। এখানে নানা অসুবিধা। শামুক কোথায় গেছে?"

"শামুক পালিয়ে গেছে। কোথা গেছে তা জানি না।"

"পালিয়ে গেছে? জোয়ান মেয়েকে আপনার কাছে দিলাম, আপনি এখন বলছেন পালিয়ে গেছে? এ কথা কি আপনার মুখে শোভা পাচ্ছে।"

খেঁকিয়ে উঠলেন মিস্টার সেন।

"শোভা না পেলেও ওই হচ্ছে সত্যিকথা। আপনার ভাইঝিটি মানুষ নয়, শয়তান।"

"ও কত বড় বংশের মেয়ে তা জানেন?"

"তা জানবার আমার দরকার নেই। ও নিমকহারাম, পাজি, আমার সঙ্গে ছোটলোকের মতো ব্যবহার করে গেছে— এইটুকু জানি—

কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন যতীশবাবু।

তারপর বললেন, "ও যখন পালিয়ে গেছে তখন ওর প্রাপ্য বেতন নিশ্চয় নিয়ে যায়নি। সে টাকাটা আমাকে তাহলে দিয়ে দিন, আমি তাকে খুঁজবার চেষ্টা করি।"

"মাইনে ছাড়া অনেক বেশি টাকা নিয়ে গেছে সে।"

"তবু আমাকে কিছু দিন, তাকে খুঁজে বার করতে হবে তো।"

"আমি আর কিছু দেব না।"

"তাহলে আমি কি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ওখানে যাব? এর একটা ব্যবস্থা করা তো দরকার।"

"যেখানে খুশি যান।"

ঘরে ঢুকে দড়াম করে কপাটটা বন্ধ করে দিলেন মিস্টার সেন।

মিস্টার সেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যতীশবাবু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলোয় যাওয়ার সাহস ছিল না তাঁর। শুনেছিলেন লোকটি কড়া। বাড়িতে বদমেজাজী একটা বুলটেরিয়র কুকুরও নাকি আছে। তাছাড়া ঝিনুক বা শামুক সম্বন্ধে খুব একটা দুশ্চিন্তাও তাঁর হয়নি। তাঁর আসল লক্ষ্য টাকা। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়ে সে

লক্ষ্য ভেদ করতে পারবেন এ ভরসা তাঁর ছিল না। তিনি মিস্টার সেনকে একটু ভয় দেখিয়েছিলেন মাত্র। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রাস্তায় ঘুরছিলেন।

"আরে যতীশবাবু নাকি। ও কি, মাথায় চোট্ লাগল কোথা?"

যতীশবাবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন একটা খোলার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কাউ তাঁকে ডাকছে। একটা নোংরা বস্তির মধ্যে খোলার ঘরটা। তিনি অন্যমনস্ক হয়ে কোন গলি দিয়ে যে এখানে এসে পৌঁছলেন, তার খেয়াল ছিল না। যতীশবাবু ঘরে ঢুকে দেখলেন, সেটা একটা হোটেল। একটা নোংরা ঘরের মধ্যে দুধারে দুটো টেবিল আর টিনের চেয়ার কয়েকটা। একটাতে বসে একটা ভীষণদর্শন মজুর রুটি খাচ্ছে। টেবিলের উপর ইতস্তত চায়ের কাপ পড়ে রয়েছে কয়েকটা। মাছি ভন্‌ভন্ করছে।

যতীশবাবু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—"আরে, তুমি! তুমি এখানে কি করছ! তুমি ডাক্তার ঘোষালের বাড়িতে ছিলে না?"

"ছিলাম। কিন্তু ওই পিশাচের কাছে কেউ বেশি দিন থাকতে পারে না—"

"ঠিক বলেছ, ও পিশাচই। ওদের চক্রান্তে আমার ভাইঝি দুটো কোথায় উধাও হয়েছে। আজ খোঁজ নেবার জন্যে ডাক্তার ঘোষালের কাছে গিয়েছিলাম, আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিলে। পড়ে গিয়ে কপালটা কেটে গেল।"

যে ভীষণদর্শন লোকটা খাচ্ছিল, সে হো হো করে হেসে উঠল। মনে হল একটা ঘোড়া ডেকে উঠল যেন। হলদে হলদে দাঁত বের করে সে বললে, "সব পিশাচ মশাই। এ পিশাচের দেশ। ভালো লোক পাবেন কোথা! এদের শাসন করা দবকার। হবে, হবে, সময়ে সব হবে।"

লোকটা যে বাঙালী, তা যতীশবাবু বুঝতে পারেননি। কথার টান থেকে মনে হল পূর্ববঙ্গের। কাউয়ের চোখ দুটোও দপদপ করছিল।

খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সে জিজ্ঞাসা করল, "মাসিমা নেই ওখানে?"

"না।" শুনেছি কলকাতা গেছে। শামুকও কোথায় পালিয়েছে। ওরা আমার সর্বনাশ করে দিয়েছে। ঘরে খাবার পর্যন্ত নেই। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি—"

যতীশ দেশে থিয়েটারে ভালো অভিনয় করতেন। বেশ নাটকীয়ভাবে গলাটা কাঁপাতে পারলেন।

"এখানেই থাকুন স্যার, যত অভাগাদের এখানেই আড্ডা।"

সেই ভীষণদর্শন লোকটা খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল। কাউকে পয়সা দিয়ে বেরিয়ে গেল। যতীশবাবুকে বলে গেল, "যদি এখানে থাকেন, আবার দেখা হবে।"

কাউ বললে, "এ-হোটেলটা আমার। আপনি এখানেই চলে আসুন।"

"কিন্তু আমার হাতে যে পয়সা নেই ভাই। হোটেল-চার্জ দেব কি করে?"

"একটি পয়সা দিতে হবে না আপনাকে। আপনি মাসিমার কাকা, আমার দাদু। আপনার আশীর্বাদে ভালোই চলে যাচ্ছে আমার। মিলের অনেক কুলি-মজুরের সঙ্গে আলাপ আছে আমার, তারা অনেকেই এখানে খায়। রোজগার ভালোই হচ্ছে। পয়সার অভাব নেই। আপনাকে খাওয়াতে পারব। আপনি এখানেই চলে আসুন।"

যতীশ জিজ্ঞাসা করল, "যে লোকটি এখন খেয়ে গেল, ও লোকটি কে—"

"ওর নাম রমেশ। ট্রাক চালায়।"

তারপর নিম্নকণ্ঠে বললে, "আসলে একটি বড় গুণ্ডা।"

যতীশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন, "চলে আসব তোমার কাছে?"

"নিশ্চয়।"

যতীশ নাটকীয় কায়দায় আলিঙ্গন করলেন কাউকে।

"এ দেশে আর একদণ্ড থাকবার ইচ্ছে নেই ভাই। কিছু টাকা হাতে পেলেই আমি দেশে ফিরে যাব। সেখানে যদি মৃত্যুও হয়, তাহলেও একটা সান্ত্বনা থাকবে, যে-দেশে জন্মেছিলাম সেই দেশেই মরলাম।"

কাউ বললে, "আপনি এখানে আসুন। আমি যতটা পারি সাহায্য করব। আপনি এলে আমার সুবিধাও হবে একটা। সেবার কালীপুজোতে একটা বিঘ্ন হয়ে গিয়েছিল। আর একবার খুব ভালোভাবে কালীপুজো করতে চাই। আপনি বড়বংশের সদ্‌ব্রাহ্মণ, আপনার উপদেশ পেলে আমার অনেক কাজ হবে। আমার দ্বিতীয় আর-একটা উদ্দেশ্যও আছে, তাতে আপনার সাহায্য দরকার।"

"সেটা আবার কি?"

"আমি মাসিমাকে ওই পিশাচটার হাত থেকে উদ্ধার করতে চাই। মাসিমাকে আমি দেবীর মতো ভক্তি করি। তিনি সীতার মতো পবিত্র! ওই রাবণটার হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করতেই হবে। এর জন্যে আমি প্রাণ দিতেও রাজি—"

কাউয়ের গলার স্বরও কেঁপে গেল। কিন্তু সে-কম্পন থিয়েটারী নয়। যতীশবাবু এতখানি প্রত্যাশা করেননি। তাঁর মনে হল—এ আবার কি ব্যাপার। মুখে কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। শুধু অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে।

।। বাইশ ।।

সুঠাম মুখুজ্যে তন্ময় হয়ে মঙ্গলার বাছুরটাকে দেখছিলেন। এই তো সেদিন হল, এরই মধ্যে প্রতাপ কি! ল্যাজ তুলে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। মঙ্গলার জন্ম মঙ্গলবার হয়েছিল বলে তার নাম হয়েছিল মঙ্গলা। মঙ্গলার বাছুরও মঙ্গলবারে হল। ডাক্তারবাবু ইংরেজী Tuesday কথাটার সুবিধে নিয়ে ওর নাম রেখেছেন টুসি। টুসি মহানন্দে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল মুরগিগুলোকে ভয় দেখিয়ে। সে কাছে এলেই ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করে ছুটে পালাচ্ছিল তারা। পৃথিবীর সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা নেই, তাই সে অকুতোভয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। অমন যে বাঘের মতো কুকুর রকেট, তার কাছেও নির্ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। রকেটও তার সঙ্গে ভাব করবার জন্যে উৎসুক, মুখ নিচু আর ঘাড় লম্বা করে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে যাচ্ছে বারবার, যেন ওর ইচ্ছে ওকে একটা চুমু খায়। টুসিরও আপত্তি নেই এতে বিশেষ। সে-ও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মুখটা। কিন্তু ঘোর আপত্তি মঙ্গলার। রকেট টুসির কাছে এলেই সে দড়ি ছেঁড়াছেড়ি করছে, হাম্বা রবে মুখরিত করে তুলছে চতুর্দিক। টুসির কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই এতে। "শুধু অকারণ পুলকে" ল্যাজ তুলে সানন্দে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে সে। ডাক্তারবাবু স্মিতমুখে বসে উপভোগ করছেন দৃশ্যটা।

তাঁরও মুখমণ্ডল থেকে একটা অদ্ভুত প্রসন্নতা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ভুটান তাঁর পায়ের কাছে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে। এ সব প্রগলভতায় তার এখন তাদৃশ উৎসাহ নেই। কাল সমস্ত রাত ঘুম হয়নি তার। ক্যানাগাছের ঝোপের ভিতর একটা ছুঁচো তাকে সমস্ত রাত জ্বালিয়েছে। সেটার পিছনে ছুটোছুটি করতে হয়েছে অনেকক্ষণ। স্থবির জাম্বুবান আরও উদাসীন। একটু আগে তার পিঠ চুলকোচ্ছিল বলে ধুলোয় গড়িয়েছে খুব। গা-ময় ধুলো মেখে থাবার উপর মুখ রেখে শুয়ে আছে সে বারান্দার উপর।

সেদিন রবিবার ছিল। গণেশ হালদার দরজা খুলে আস্তে আস্তে বেরুলেন। ডাক্তারবাবুর দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। ইচ্ছেটা তাঁর সঙ্গে গিয়ে একটু আলাপ করেন। কিন্তু তিনি নিজে না ডাকলে তাঁর কাছে যাওয়ার সাহস নেই তাঁর। দূরে দাঁড়িয়েই এদিক-ওদিক চাইতে লাগলেন।

ডাক্তারবাবু দেখতে পেয়েই ডাকলেন তাঁকে। "মাস্টারমশাই, মা-বেটির কাণ্ড দেখেছেন। দুজনেই দাপাদাপি করছে, একজন বাঁধা, আর একজন ছাড়া।"

এগিয়ে এলেন গণেশ হালদার।

হেসে বললেন, "একজন স্বাধীনতার আনন্দে ছটফট করছে, আর একজন পরাধীনতার দুঃখে।"

"ঠিক বলেছেন। বসুন। আপনার সেই প্রবন্ধটি পড়েছি। খুব ভালো লেগেছে। যদিও আমার মতের সঙ্গে মেলেনি, কিন্তু আপনার যুক্তি খুব জোরালো, তা মানতেই হবে। আর আপনাদের দিক থেকে ভেবে দেখলে ঠিকই বলেছেন।"

"আপনার মতের সঙ্গে আমার মতের অমিল কোথায়, সেটা জানতে পারলে—"

"আমাদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গিই আলাদা। আপনারা মনে করেন, আপনারাই কেবল উদ্বাস্তু এবং উদ্বাস্তু বলে নানারকম সুখসুবিধা দাবি করবার অধিকার একমাত্র আপনাদেরই আছে। কিন্তু আমি জানি, আমিও উদ্বাস্তু, যদিও আমার দেশ পূর্ববঙ্গ, পাঞ্জাব বা সিন্ধু নয়। আমি জানি, যেখানে আমি জন্মেছি, সেখানে কিছুদিন আগে ছিলাম না। সেখানে আমার সম্মতিক্রমে আমাকে আনা হয়নি। কোন্ অজানা থেকে কেন আমি পৃথিবীতে এসে জন্মালাম তা আমার অজ্ঞাত। কোথায় যাব তা-ও জানি না। কিন্তু এই পৃথিবীতে এসে-থেকেই নানারকম দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে। এর জন্যে মানবজাতি সেই অনাদিকাল থেকে হা-হুতাশ করে আসছে নানারকম। এই দুঃখ দূর করবার জন্যে নানারকম ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে, এই দুঃখ নিবারণ করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা লড়ছেন, কবিরা কাব্য লিখছেন, সংস্কারকরা বিধান দিচ্ছেন। রাজনৈতিক নেতারা নূতন নূতন শাসনবিধি প্রবর্তন করছেন। দুঃখ কিন্তু কমছে না। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বাড়ি করেছি, কিন্তু তবু শীততাপের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই, কারণ সে-বাড়িতে একনাগাড়ে বসে থাকা যায় না, বসে থাকতে ইচ্ছে করে না। বাইরে বেরুতেই হয় এবং বেরুলেই চড় খেতে হয় প্রকৃতির হাতে—"

নিজের রসিকতায় হা-হা করে হেসে উঠলেন সুঠাম ডাক্তার।

গণেশ হালদার এরকম উত্তর শুনবেন বলে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি সবিস্ময়ে একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন।

"আপনার মতে তাহলে পৃথিবীসুদ্ধ লোকই উদ্বাস্তু?"

"হ্যাঁ, আমার মতে তাই। কিন্তু সকলে সেটা মনে করে না। অধিকাংশ লোকই নিজের নিজের দেশের বা গ্রামের বা বাড়ির একটা চৌহদ্দি ঠিক করে বসে আছে এবং তা নিয়ে

ক্রমাগত মারামারি করছে। চলতি ভাষায় যা ইতিহাস বলে পরিচিত তা এই মারামারি ইতিহাস। উগ্র স্বাদেশিকতা বা স্বাজাত্যবোধ মানুষকে সুখী করেনি। ভারতবর্ষের প্রাচীন পুঁথিতে ও দুটো নিয়ে কারো বিশেষ মাথাব্যথা নেই। আমারও মনে হয়, ওগুলো নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি করাটা শোভন নয়।"

"আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক গুরুরাও ওই কথা বলেছেন। আপনিও কি তাই বলছেন?"

"আত্মার খবর জানি না, তাই নিজেকে আধ্যাত্মিক পথের পথিক বললে ছোটমুখে বড় কথার মতো শুনাবে। পরম ব্রহ্মের খোঁজও আমি করিনি কখনও। তিনি আছেন কি নেই, তা-ও আমার অজানা। তাঁকে জানবার আগ্রহ আমার হয়নি। তৃষ্ণার্ত হলে লোকে জলের সন্ধান করে, আমার তৃষ্ণাই জাগেনি, তাই আত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতির খোঁজ করিনি। তবে ওসব খোঁজ না করেও আমি বুঝেছি যে পৃথিবীতে আমি প্রবাসী, আপনাদের ভাষায় উদ্বাস্তু। যেখানে আছি, সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে চেষ্টা করি, সেখানকার গাছ-পালা, পশু-পক্ষী, আকাশ-বাতাসের খবর নি, এবং তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করবার চেষ্টা করি, কিন্তু প্রায়ই আমাকে ব্যর্থকাম হতে হয়। আমি জানি, ওটা উদ্বাস্তুদের প্রাপ্য অনিবার্য দুঃখে। তাই ওটাকে মেনে নিয়েছি।"

"আপনি কিন্তু মানুষের সঙ্গে মেশেন না তো।"

"না, মিশতে পারি না। মানুষ বড় বিচিত্র জীব। নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রত্যেকে একটা অস্বাভাবিক বোরখার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। সে-বোরখা ভেদ করে আসল মানুষটাকে চেনা শক্ত। মাঝে মাঝে দু-একবার বোরখা খোলবার চেষ্টা করেছি, যা দেখেছি, তাতে শিউরে উঠেছি। তাই ও চেষ্টা আর পারতপক্ষে করি না। যাঁরা আমার কাছে নিজের গরজে আসেন, তাঁদের সঙ্গে কাজের কথাটুকু শেষ করে বিদায় করে দি। অন্তরঙ্গতা করবার দুঃসাহস আমার নেই।"

ডাক্তার মুখার্জি একটা ম্লান হাসি হাসলেন।

গণেশ হালদার ডাক্তারবাবুর ম্লান হাসির অর্থ বুঝলেন। তবু প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু মানুষের প্রতি আপনার একটা কর্তব্য আছে তো?"

"সেটা যতটা পারি করি। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু আব গৃহহারাদের সম্বন্ধেও আমি উদাসীন নই। যতটা পেরেছি করেছি।"

"তার প্রমাণ তো আমিই। আপনাব জন্যই আমার চাকরি—"

"না, ঠিক আমার জন্য নয়। আপনার যোগ্যতা ছিল, আরও একটা কারণ ছিল। কিন্তু ও আলোচনা এখন থাক। আপনার প্রবন্ধটি পড়ে আপনার চিন্তাশীল মনের পরিচয় পেয়েছি। আপনি আরও প্রবন্ধ লিখুন।"

এবার গণেশ হালদারকেও ম্লান হাসি হাসতে হল।

বললেন, "লিখে লাভ কি যদি তা প্রকাশিতই না হয়। আমি কাগজে প্রবন্ধটা ছাপতে দিয়েছিলাম, কাল ফেরত এসেছে। এ দেশের নামজাদা কাগজগুলো গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সমালোচনা ছাপতে চায় না।

"না চাওয়াই স্বাভাবিক। ওটা ওদের ব্যবসা। সরকারের সঙ্গে ঝগড়া করে ব্যবসা চালানো যায় না। আমাদের দেশে স্বদেশী আমলে দেশকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য যেসব কাগজ বেরিয়েছিল, সরকারের আইন সেগুলোর কণ্ঠরোধ করতে ইতস্তত করেনি। স্বদেশী সরকারের হাতেও সেসব আইন আছে। সুতরাং ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক।"

'ইংরেজদের রাজত্ব হলে স্বাভাবিক মনে করতুম। এখন আমাদের স্বদেশী গণতন্ত্র হয়েছে। এ গণতন্ত্রের যাঁরা নেতা, তাঁরা শুনেছি দেবতুল্য লোক। এ-ও শুনেছি, বিপক্ষ দলের অনুরোধ শুনতে তাঁরা সর্বদাই প্রস্তুত।"

"পৌরাণিক উপাখ্যানে কিন্তু পড়া গেছে যে, দেবতারাও অপ্রিয় সত্য বরদাস্ত করতে পারতেন না। মুনিঋষিরাও না। প্রায়ই রেগেমেগে অভিশাপ দিয়ে ফেলতেন।"

হা হা করে হেসে উঠলেন সুঠাম মুখুজ্যে। তারপর বললেন, "এবার উঠতে হবে। মাখানিয়ার মাঠে যাব। সেখানে একটা গাছে হলদে পাখিদের আড্ডা আছে। তাদের সাহচর্য অনেক দিন উপভোগ করিনি। আজ করবার ইচ্ছে আছে। দুর্গা, রকেটকে বেঁধে দে। টুসির সঙ্গে বড্ড বাড়াবাড়ি করছে—"

রকেট লাফাতে লাফাতে তাঁর কাছে ছুটে এল। ভাবটা, কই, এমন কিছুই করিনি তো। দুর্গা কিন্তু তাকে নিয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু উঠে পড়লেন।

গণেশ হালদারকেও উঠতে হল।

মাখানিয়ার মাঠে ডাক্তারবাবু যেখানে গেলেন সেখানে চার পাঁচটা বড় বড় ঝাঁকড়া গাছ এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল যে, দূর থেকে দেখলে হঠাৎ মনে হয় ওরা কি যেন একটা গোপন পরামর্শ করছে। সব ক'টাই পরস্পরের দিকে ঝুঁকে আছে। দুটো বটগাছ, একটা অশ্বত্থ, একটা গাম্‌হার আর একটা বেশ বড় প্রাচীন শ্যাওড়া। জনশ্রুতি, এখানে নাকি ভূত আছে। এ দেশের লোকেরা বলে দেও-বাবা। সেজন্য এখানে দিনেও বড় একটা কেউ আসে না। প্রতি অমাবস্যায় নিকটবর্তী গ্রামের লোকেরা দেও-বাবাকে শান্ত রাখবার জন্য এখানে পুজো দিয়ে যায়। তাই পাঁচটা গাছের গোড়াতেই সিঁদুর লেপা। ডাক্তার মুখার্জির এটি খুব প্রিয় স্থান। সময় পেলেই চলে আসেন। স্থানটির প্রধান আকর্ষণ নির্জনতা। অমাবস্যার দিন ছাড়া অন্য দিন এর ত্রিসীমানাতেও কেউ আসে না। কতকগুলো রাখাল এ মাঠে গরু চরাতে আসে বটে, কিন্তু তাঁরা এই পাঁচটি গাছের পঞ্চায়েত থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকে। ডাক্তারবাবু একটু দূরে মোটর থামিয়ে বাইনকুলার গলায় ঝুলিয়ে গাছগুলো প্রদক্ষিণ করলেন কয়েকবার। ছিল হলদে পাখি। তিন চারটে ছিল। দেখে খুব পুলকিত হয়ে উঠলেন। হলদে পাখি চোখে দেখবার আগেই তার ডাক শোনা যায়। তারপর পাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে দ্রুত আবার অন্য ডালে অন্য আড়ালে চলে যায়। অনেক রকম ডাক আছে ওদের। অপূর্ব অনন্য অবর্ণনীয় ডাক। তরল সুমিষ্ট আর কোমল। এমন মিষ্টি স্বর অন্য পাখির নেই। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখলেন। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে আর একটি পাখি দেখলেন তিনি। কুলো পাখি। ছোট্ট পাখিটি কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে ল্যাজটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচছে। সাদায় কালোয় চিত্রিত ছোট ল্যাজটি পিঠের উপর ঘুরিয়ে তুললেই কুলোর মতো দেখায়। বড্ড ছটফটে। ডাক্তার মুখার্জির বাইনকুলার তুলতে না তুলতেই ফুড়ুৎ করে পালিয়ে গেল। ডাক্তারবাবু গাছের পঞ্চায়েতের মধ্যে ঢুকে পড়লেন শেষে। ভিতরটা বেশ পরিষ্কার। একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে লিখতে শুরু করলেন।

"মাস্টারমশাই, এখানে এসে ঘুরে ঘুরে পাখি দেখছিলাম, কিন্তু আপনার সঙ্গে একটু আগে যে আলোচনাটা শুরু হয়েছিল তার রেশটা মন থেকে এখনও মিলিয়ে যায়নি। উদ্বাস্তুদের কথাই মনে

হচ্ছে নানাভাবে। হঠাৎ একটা কথা মনে জাগল। উদ্বাস্তু সম্বন্ধে আপনার ও আমার দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। আপনি নবযৌবনের আবেগে আইনসম্মত উপায়ে উদ্বাস্তুদের প্রতি অবিচারের যে প্রতিকার সন্ধান করেছেন, আমাদের সংবিধানের যে-সব দোষ-ত্রুটির সংশোধন কামনা করেছেন, প্রাদেশিকতা ও অন্যায় পক্ষপাত অবলুপ্ত করার যে যে কল্পনা করেছেন, তা নবোদগত অঙ্কুরের মতো আপনার প্রাণবন্ত জীবনী-শক্তির পরিচায়ক। সবুজ রঙের সঙ্গে তার মিল আছে, তা চিরনবীন, তা সুন্দর। আমার যে দৃষ্টিভঙ্গি তাতে বিশেষ কোনও রঙের প্রাধান্য নেই, অথচ সব রঙই তাতে আছে। তাকে সাদা বলতে পারেন। কিন্তু ভেবে দেখছি, এ ছাড়া তৃতীয় ভাবেরও ভাবুক একদল আছেন। তাঁদের রং লাল! তাঁরা ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে, যেন-তেন প্রকারেণ নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে চান। মিথ্যা-ভাষণ, জাল-জুয়াচুরি, কালোবাজার, ঘুষ, জবরদস্তি, খোশামোদ, খুন-জখম—কোনো কিছুতেই পিছপা নন তাঁরা। লাল বলছি, কিন্তু আমি কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে ইঙ্গিত করছি না। আমি ইঙ্গিত করছি সেই জাতের লোকদের যারা উগ্র রকম বেপরোয়া। উদ্বাস্তুদের মধ্যে এরকম অনেক লোক আছেন। এ জাতের অনেক উদ্বাস্তুদের খবর আপনিও পান নিশ্চয়। এদেরও স্বপক্ষে বলবার অনেক কথা আছে, যুক্তির জোর তো আছেই। বস্তুত জোরই এদের সবচেয়ে বড় যুক্তি। কোন রঙটা ভালো তা আমি জানি না। আমার দলেও আমার মতাবলম্বী লোক আছেন নিশ্চয়, কিন্তু আমি তাঁদের নাগাল বা খবর পাই না। তাই মাঝে মাঝে নিজেকে একক মনে হয়। উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে এই তিন জাতের ত্রিবর্ণ, একই সমস্যাকে নিয়ে তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি, তিন রকমের মনোভাব আবিষ্কার করে আমি যেন একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আনন্দ উপভোগ করছি। তিন সংখ্যাটি মানবসভ্যতাকে বহুদিন থেকেই প্রভাবিত করেছে। আমাদের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তো আছেনই, খ্রীস্টানদের ট্রিনিটি আছে, বৌদ্ধদের আছে বুদ্ধ, ধর্ম আর সংঘ। আমরা স্বর্গের নাম দিয়েছি ত্রিদিব, আর সমস্ত লোককে অভিহিত করেছি ত্রিলোক নামে। এরকম অনেক 'ত্রি' বিভিন্ন দেশের পুরাণে আছে। উদ্বাস্তু সমস্যাকে কেন্দ্র করেও যে তিনটে বিভিন্ন রঙ ফুটে উঠেছে এ ভেবে ভারি ভালো লাগছে। আমার এ-ও মনে হচ্ছে, পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যাকে কেন্দ্র করেই বোধ হয় মোটামুটি এই তিন ধরনের মনোভাব ফুটে ওঠে। একদল থাকেন উদার সমন্বয়-পন্থী, একদল নবীন সংশোধন-পন্থী আর তৃতীয় দল বে-পরোয়া উগ্রপন্থী, যে-কোনও উপায়ে স্বকার্যসাধন করাই এঁদের উদ্দেশ্য। এঁদের মধ্যে কে ভালো কে মন্দ, মানব-সভ্যতা কাদের সাহায্যে বেশি অগ্রসর হয়েছে, তা নির্ণয় করবার মতো বিদ্যা-বুদ্ধি আমার নেই। তবে একটা জিনিস জানি, প্রথম দলের লোকেরা, যাঁরা উদার সমন্বয়-পন্থী, যাঁদের রং আমি সাদা বলেছি, তাঁরা সাধারণত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন না। তার কারণ, মানবজাতির বা নিজেদের স্বার্থে তাঁরা কিছুই করেন না। না করেন পলিটিকাল হৈ চৈ, না করেন যুদ্ধের আয়োজন, না দেন ধর্মের উপদেশ। তাঁরা প্রায় একা একা আপন মনে থাকেন। তাঁর জানেন, দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে দূর করা যায় না। তাঁরা জানেন, একটা দুঃখকে দূর করতে যে উপায় উদ্ভাবন করি সেই উপায়ই শেষে অন্য নানা দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হাঁটার দুঃখ দূর করতে মোটর চড়ি, মোটর শেষে আবার নানা দুঃখ সৃষ্টি করে। এঁরা মনে করেন, দৈবক্রমে যে পরিবেশে এসে জন্মগ্রহণ করেছি, সেই পরিবেশের দুঃখকে মোটামুটি মেনে নেওয়াই সে দুঃখের হাত এড়ানোর সহজ উপায়। সব দুঃখই কালক্রমে সহ্য হয়ে যায়, লোকে পুত্রশোকও ভুলে যায়। এই সহ্য করবার শক্তির নাম শান্ত ধৈর্য, ইংরেজিতে একেই বোধ হয় 'টলারেন্স' বলে। এই শক্তি দাঁতে

দাঁত চেপে ভ্রূকুঞ্চিত রুদ্ধশ্বাসে সহ্য করার শক্তি নয়, এ হচ্ছে অনিবার্য কষ্টকে হাসিমুখে মেনে নেবার চরিত্রবল। এ শক্তি যে আমি অর্জন করেছি তা আমি বলছি না, তবে আমি এই পথেরই পথিক। আকাশ নীল বলে যদি আমার কষ্ট হয়, আমি যদি ইচ্ছা করি আকাশকে লাল বা সবুজ করব, তা হলে আমার সে ইচ্ছা কখনও পূর্ণ হবে না। এর জন্যে আমার যদি দুঃখ হয়, সে দুঃখকে সহ্য করা ছাড়া আমার উপায় নেই। অনিবার্যকে হাসিমুখে মেনে নিতে হবে। ওই হাসিমুখে মেনে নেওয়াটাই শক্ত ব্যাপার। কিন্তু ওই শক্ত জিনিসও সহজ হয়ে যায় যদি অন্তরে প্রেম থাকে। পৃথিবীর অধিকাংশ অনিবার্য ব্যাপারকেই আমরা প্রেমের স্পর্শ দিয়ে মধুর করে নিয়েছি, যা আছে তাকেই ভালোবাসতে শিখেছি। আমরা কেউ নীল আকাশকে লাল করতে চাই না, মেনে নিয়েছি বলে নীল আকাশই আমাদের কাছে এখন সুন্দর। মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর ব্যাপারও প্রেমের স্পর্শে আমাদের কাছে মনোহর হয়েছে। 'মরণে রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান'— রবীন্দ্রনাথের এ গান নিশ্চয়ই শুনেছেন। কিন্তু মজা হচ্ছে, অনেক ব্যাপারে আমরা আবার নিতান্ত অসহিষ্ণু। ধর্মের ব্যাপারে, রাজনীতির ব্যাপারে পৃথিবীতে বহু রক্তারক্তি হয়েছে। সমাজেও দেখি স্ত্রীলোকের একবার পদস্খলন হলে আর রক্ষা নেই, ক্ষমা নেই। যাঁরা সাদা দলের লোক তাঁদের কাছে সবই ক্ষমার্হ। তাঁরা জানেন, সৎ এবং অসৎ আমাদেরই সৃষ্টি এবং এই দুই মিলিয়েই জীবন। জীবনকে স্বীকার করতে হলে অসৎকেও স্বীকার করতে হবে। জলের তরলতা বাদ দিয়ে জলকে কল্পনা করা যায় না। আর একটা মজাও আছে। আজ যেটা অন্যায় বলে গণ্য হচ্ছে, ইতিহাস ওলটালে দেখা যাবে, অতীতে সেটা অন্যায় ছিল না। এই সেদিন পর্যন্ত সভ্য মানবসমাজেও দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল। এখন একটি স্ত্রীলোকের একটি স্বামী থাকবে এইটেই সুনীতি, কিন্তু বহুপূর্বে এক স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী থাকাটাই রেওয়াজ ছিল। অনেক সমাজে এখনও আছে। সুতরাং অসতী স্ত্রীলোক নিয়ে খুব বেশি দাপাদাপি করাটা সাদা দলের লোকেরা অশোভন মনে করেন। হঠাৎ একটা কথা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমি যেন নিজের প্রশংসাপত্র নিজেই লিখে যাচ্ছি। তা ঠিক নয়। আমি সাদাদের আদর্শের কথাই লিখছি, আমি নিজে সে আদর্শের অনুরূপ হতে পারিনি। অনেক পিছিয়ে আছি। এই সেদিন যখন মঙ্গলা গাইটা প্রসবব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিল, আমি নির্বিকার থাকতে পারিনি। রকেটও মাঝে মাঝে খাওয়া বন্ধ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন আমিও অস্থির হয়ে পড়ি। সুখে বিগতস্পৃহ এবং দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা হতে গীতা উপদেশ দিয়েছেন। সেই উপদেশ সর্বথা পালন করাই সাদাদের আদর্শ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ করবার জন্যে যেসব কথা বলেছেন তার সঙ্গে সাদাদের ততটা মতের মিল নেই। আপনার হয়তো মনে হবে, এ আদর্শ অনুসরণ করা মানে তা হলে তো বিনা প্রতিবাদে জীবনস্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া। আপাত-দৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু ঠিক তা নয়। এই সাদা মনোভাব বজায় রাখতে গেলে প্রায়ই নানারকম বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়তে হয়। এই লড়াটা কম শক্তিসাপেক্ষ নয়। আপাতদৃষ্টিতে এঁদের সংসার সম্বন্ধে উদাসীন মনে হলেও, এঁরা মোটেই উদাসীন নন। এঁদের দৃষ্টি সর্বদা-সজাগ, এঁরা জীবনের বৃহত্তর এবং পূর্ণতর সত্যের সন্ধানী, এঁদের মন হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, চীন, রাশিয়া বা আমেরিকায় নিবদ্ধ নয়, তা নিখিল বিশ্বে সঞ্চরণশীল। শেষ পর্যন্ত এঁরা যে কি নিধি পাবেন তা অবশ্য এঁরাও জানেন না। সহসা মনে হবে, এঁদের অবস্থা বুঝি রবীন্দ্রনাথের সেই ক্ষ্যাপাটার মতো যে সারাজীবন পরশ পাথর খুঁজে বেড়াত। যদি তাই হয় তা হলে বলব, এঁরা যে পরশ-পাথর খুঁজছেন, তার নাম প্রেম, এক নিমেষে যা লোহাকে সোনা করতে পারে। তবে একটু

তফাত আছে। তাঁদের মনে এ কথাও মাঝে মাঝে জাগে, লোহাকে সোনা করে দরকার কি? লোহা তার নিজের গৌরবেই কি যথেষ্ট বড় নয়? লোহাকে সোনা করবার জন্যে তাঁরা ব্যস্ত নন, তাঁরা দেখতে চান, যেটা আপাতদৃষ্টিতে লোহা বলে মনে হচ্ছে সেটা কি কেবল লোহাই? আর কিছু নয়? অর্থাৎ তাঁরা সাংখ্য-কথিত মায়ার আবরণটা ভেদ করতে চেষ্টা করছেন। পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধময় আচ্ছাদনের অন্তরালে তাঁরা সেই প্রচ্ছন্ন সত্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন যা আপাতদৃষ্টির অস্পষ্টতায় সহজে ধরা পড়ে না। এই সন্ধানই ওঁদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, এতেই ওঁরা আনন্দিত. কিন্তু এ সন্ধানের পথ সব সময় সুগম নয়। এই ধরনের প্রেরণাই হয়তো মানুষকে মহাকাশ যাত্রায় প্রবুদ্ধ করেছে। আমি সামান্য লোক, মহাকাশ যাত্রার মহাসুযোগ কখনও পাব না। কিন্তু আমি আমার চারপাশে মহাকাশ আবিষ্কার করে তন্ময় হয়ে আছি। হঠাৎ আমার মনে হচ্ছে, আকাশ শুধু আকাশেই নেই, সর্বত্র আছে। সামান্য একটা উদাহরণ দিই। আপনি জানেন, আমার ভ্রমণ অতি সীমাবদ্ধ। কিন্তু ওর মধ্যেই আমি অসীমের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা করি, আর সে চেষ্টাতে কি আনন্দ! সেদিন একটা ভ্রমণ-কাহিনী পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল, ভ্রমণের পুরো রসটা লেখক ঠিক পরিবেশন করতে পারেননি। কেমন যেন পল্লবগ্রাহী ছাড়া-ছাড়া আলতো-আলতো ভাব। ইতিহাসের কথা আছে, কিন্তু তা সব প্রচলিত ইতিহাস থেকে টোকা। কোন্ হোটেলে খেলুম, কার সঙ্গে হাসি-তামাশা করলুম, কি কি দৃশ্য দেখলুম— এইসব সাধারণ কথাতেই প্রবন্ধ পরিপূর্ণ। ভ্রমণকারীর অনুসন্ধিৎসা, পর্যবেক্ষণ ও নিজস্ব দৃষ্টির কোনো পরিচয় নেই। যে প্রকৃতি ও পরিবেশ একটা বিশেষ দেশের মানুষকে একটা বিশেষ রঙে রাঙিয়েছে, তার সরল পরিচয় না থাকলে ভ্রমণকাহিনী ব্যর্থ হয়। যদি লিখতে পারা যায়, তা হলে আমাদের বাড়ির পাশের যে ছোট গলিটা আছে সেই গলি-ভ্রমণ-কাহিনীও সুখপাঠ্য হবে, যদি আমরা সেই গলিটার অতীত ও বর্তমানকে সম্পূর্ণ মূর্ত করে তার ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিতে পারি। যে লোকটির নামে গলির নাম—বিধু পাল লেন— তাঁর পরিচয় ঘষাপয়সার মতো। কিন্তু যাদের কথা কেউ জানে না তাদের খবর চিত্তাকর্ষক। বিধু পালের যে পরিচয় আমি পেয়েছি তা মনোরম? তাঁর দান ছিল অজস্র। কোনও লোক কখনও তাঁর কাছ থেকে শুধু হাতে ফেরেনি। তাঁর এই গুণের-ছটায় তাঁর মস্ত দুটো দোষ ঢেকে গেছে। তিনি গাঁজা খেতেন এবং বিধবা ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে সহবাস করতেন। কিন্তু এ কথা কেউ মনে রাখেনি। তাঁর একজন অন্তরঙ্গের মুখে কথাটা শুনেছিলাম আমি। লোকে মনে করে রেখেছে তাঁর উদার হৃদয়ের কথাটা। এ গলির আরও পরিচয় আছে। গলিটার সমস্ত দক্ষিণ দিকটা জুড়ে প্রকাণ্ড স্কুল কম্পাউন্ড, সেই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা একজন বাঙালী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে তিনি গড়ে গেছেন বিরাট স্কুলটা। মিস্ত্রীদের সঙ্গে বসে নিজেও ইঁট গেঁথেছেন দেওয়ালের। ওই স্কুল গড়ার কাজে ব্যয় করেছেন তাঁর সমস্ত জীবন। এই গড়ার ইতিহাস একটা মহাকাব্যের খোরাক যোগাতে পারে। তারপর গলিটার দুপাশে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে যে ক'খানা বাড়ি আছে তাদের ভিতরকার খবর এমন চমকপ্রদ, এমন রসালো, এমন বীভৎস, অথচ এমন সুন্দর, তাতে হাসি-অশ্রুর, ভালোবাসা-ঘৃণার, ঈর্ষা-কুৎসার, প্রতিভা-পাগলামির, উদারতা-নীচতার, উত্থান-পতনের এতো আলো-ছায়া যে, যে-কোনোও কথাশিল্পী তার থেকে সারা জীবনের শিল্প-উপাদান সংগ্রহ করতে পারবে, অপূর্ব চিত্র-সম্পদে অলঙ্কৃত করতে পারবে বাণী মন্দিরকে। দুটো বড় বড় গাছ আছে গলিটার ভিতর, আর আছে ইউকালিপ্‌টাসের সারি, আর একটা আমবাগান। এদের কেন্দ্র করে প্রতি মুহূর্তে যে মহোৎসব হয়, সে খবর কি আমরা রাখি?

গলি-ভ্রমণের কাহিনী লিখলে এ মহোৎসবের কাহিনীও লিখতে হবে। শুধু ওইসব বড় গাছগুলোকে কেন্দ্র করেই নয়। গলির দুপাশে নামহীন অসংখ্য যেসব গাছ-গাছড়া, লতা-গুল্ম, অজস্র প্রাণ-প্রাচুর্যে নিত্য জন্মাচ্ছে তাদের কেন্দ্র করেও যে উৎসবের মহিমা সর্বদা স্বতঃস্ফূর্ত হচ্ছে— তাও লিখতে হবে। আমাদের গলিটা যে কত রকম পাখির ডাকে মুখরিত হয় তার খবর কটা লোকে রাখে? 'চোখ গেল' পাখিরা এ-পাড়া ছেড়ে ভিন্ন পাড়ায় চলে যাচ্ছে কেন এ নিয়ে কেউ গবেষণা করেছে কি? আমাদের গলিতে দিনের বেলা কত সুন্দর প্রজাপতি ঘোরাফেরা করে জানেন? রাত্রে কত সুন্দর সুন্দর 'মথ্' (moth) আর আলোর পোকা আসে লক্ষ করেছেন? ওরা ছাড়াও আরও নানা জীবের গতিবিধি আছে আমাদের গলিতে। এখানে অনেক ছুঁচো, অনেক ইঁদুর, অনেক নেউল,অনেক সাপও বাস করে। গভীর রাত্রে একদিন দেখেছিলাম, গলির মাঝখানে একটি বিরাট গোক্ষুর ফণা তুলে বসে আছে। আমাদের গলিতে ব্যাঙও বাস করে দু'জাতের টিকটিকি গিরগিটি তো অনেক। কাঠবিড়ালীও। আমি আর একদিন গভীর রাত্রে একটা অদ্ভুত প্রাণীকে দেখছিলাম আমার চৌহদ্দির দেওয়ালের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে সন্তর্পণে। আকারে নেউলের প্রায় দ্বিগুণ হবে। লম্বা মোটা লেজটা ছুঁচলো হয়ে গেছে শেষের দিকে। দুর্গা বললে, এ দেশে ওর নাম মুচুব্‌ভা, ওর গায়ে গন্ধ আছে। গন্ধ-গোকুল কি? ঠিক বুঝতে পারিনি। গলির ইতিহাসে এদের ইতিহাসও থাকবে। তা ছাড়া থাকবে (আসল কথাটাই ভুলেছিলাম!) হনুমানদের কথা, যারা এই গলিটার আসল মালিক। এরা কত রকম ফন্দী-ফিকির করে যে বেঁচে আছে তা লক্ষ করলে অবাক হতে হয়। এই গলির আশেপাশে আগে কেবল বাঙালীদেরই বাস ছিল। এখন বিহারীরাও এসেছেন। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো পাঞ্জাবী, সিন্ধীরাও আসবেন। মাদ্রাজীরাও আসতে পারেন। কারণ বর্তমান যুগে দেখছি এই তিনটি জাত জীবন-যুদ্ধে অপর প্রদেশবাসীদের হটিয়ে দিচ্ছে। গলি-ভ্রমণ-কাহিনীতে এসব কথাও থাকবে। এত সব লিখেও মনে হবে অনেক কিছু বাকি রয়ে গেল— ওই যে শিব-মন্দিরের পাতলা পাতলা ইঁটগুলো কোথাকার তৈরি, গঙ্গার ধারে ওই বিরাট কারখানায় যে সাতজন পীরের কবর আছে— তাঁরা কোথাকার লোক! শেষকালে মনে হবে, কিছুই লেখা হল না। প্রতিটি জিনিসের নিত্যনূতন সম্ভাবনায় মন আকুল হয়ে থাকবে। মনে হবে, যা দেখলাম তার অন্তরালে অদেখা যেন কিছু থেকে গেল। এই আজই আমার নূতন অভিজ্ঞতা হয়েছে হলদে পাখির সম্বন্ধে। হলদে পাখি দেখেছেন কি? ওর ইংরেজি নাম ওরিওল (Oriole), বাংলা নাম অনেক আছে। তিনটে মনে পড়ছে, হলদে পাখি, বেনে বউ, ইস্টিকুটুম। মাথাটি কালো, ডানার নীচে দুপাশে কালো, আর বাকি দেহটা হলদে। অদ্ভুত হলদে সোনার মতো। ওদের ডাকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ডাকটির সুমিষ্ট তরলতা। এক রকম ডাক ওরা ডাকে না। নানা সুরে ডাক দেয়, যখন যেটা খুশি। ওদের 'ইস্টিকুটুম' নামটা বোধ হয় ওদের একটা বিশেষ ডাকের জন্যই হয়েছে। অনেকে ওদের 'খোকা হোক' বলে। তা-ও বোধ হয় ওই ডাকের জন্য। আজ মনে হল 'ইস্টিকুটুম' না বলে ডাকটাকে 'মিষ্টি-কুটুম' বললেই বা ক্ষতি কি ছিল। কুটুমরা নানা কারণে সাধারণত মিষ্টি হয় না, কিন্তু এই পাখিটা বারবার তা অস্বীকার করে বলছে— মিষ্টি-কুটুম। তারপরই আর একটা যে মিষ্টি শব্দ করছে মাঝে মাঝে, সেটা শোনাচ্ছে যেন, 'তলিয়ে দেখ'। অর্থাৎ মিষ্টি-কুটুম, তলিয়ে দেখ। এর পর আর একটা ডাকের অর্থও সহসা প্রতিভাত হল আমার কাছে আজ। এ ডাকটা আগে অনেকবার শুনেছি, কিন্তু আজ ওই ডাকটার সরল বাংলা যেন

শুনতে পেলাম। যেন বলল— 'ওগো শুনছ, খিল খোল।' অদ্ভুত ব্যাপার। বারবার শুনলাম— ওগো শুনছ খিল খোল! খিল খোলাই তো পৃথিবীর আসল সমস্যা। আমরা সবাই তো নানা বদ্ধদ্বারে করাঘাত করে অহরহ বলছি, ওগো শুনছ, খিল খোল। ওই পাখিটার জীবনেও সেই সমস্যা আছে নাকি? কাছেই ওর সঙ্গিনী পাখিটা চুপ করে বসে ছিল। কোনো জবাব না দিয়ে উড়ে গেল সে। এটাও উড়ল ওর পিছু-পিছু। আবার শোনা গেল, ওগো শুনছ খিল খোল। আশ্চর্য ব্যাপার! এই সব তুচ্ছ জিনিস নিয়েই আমার জগৎ। এই জগতেই আমি আনন্দ পাই। পাকিস্তান-হিন্দুস্থান সমস্যা, প্রাদেশিকতা বা উদ্বাস্তুদের নিয়ে দাপাদাপি করতে তেমন উৎসাহ পাই না যেন।"

এই পর্যন্ত লিখে চুপ করে বসে ছিলেন ডাক্তারবাবু। মনের মধ্যে ওই একটা কথাই ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছিল— ওগো শুনছ, খিল খোল। এমন সময় ঝড়ঝড় করে ডাক্তার ঘোষালের মোটরটা এসে থামল একটু দূরে। ঝিনুক নামল তার থেকে। মোটরে আর কেউ ছিল না। ঝিনুক ড্রাইভ করে এনেছিল গাড়িটা। ডাক্তার মুখার্জি ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। কে মেয়েটি? ডাক্তার মুখার্জি যে এখানে আছেন এ খবর ঝিনুক পেয়েছিল গণেশ হালদারের কাছে। ডাক্তারবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবার পরই ঝিনুক তাঁর কাছে গিয়েছিল। তাঁর দেখা পায়নি, দেখা পেয়েছিল গণেশ হালদারের। তিনিই তাঁকে মাখানিয়া মাঠের খবরটা দিয়েছিলেন। মাখানিয়া মাঠ ঝিনুকেরও অপরিচিত স্থান নয়। ওই মাঠেই ওই কুখ্যাত পাঁচটি গাছের কাছেই সে কিছু টাকা পুঁতে রেখে গিয়েছিল। সে টাকা এখনও সেখানে আছে।

ঝিনুক এগিয়ে এসে প্রণাম করল।

ডাক্তার মুখার্জি সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন।

তারপর মৃদু হেসে বললেন, "চিনতে পারছি না তো ঠিক।"

"আমাকে আপনি একবার দেখেছিলেন কিন্তু।"

"কোথায়?"

"এখানকার রেল লাইনের ধারে ডিসট্যান্ট সিগনালের কাছে। আমি সেদিন সন্ধ্যার পর সেখানে একটা ব্যাগ কুড়োতে গিয়েছিলাম—"

"ও, মনে পড়েছে।"

খুশিতে ঝলমল করে উঠল তাঁর মুখখানা।

বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলটা তুলে বললেন—"এই যে, স্মৃতি-চিহ্ন এখনও রয়েছে। তারপর, এখানে এখন কি মনে করে?"

"হালদার মশাইয়ের কাছে শুনেছিলাম, আপনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলেন। এতদিন সুযোগ হয়নি. আজ একটু সময় পেয়েছি।"

"বস। মাটিতেই বসবে? এখানে তো বসতে দেবার কিছু নেই। তোমার শাড়িখানা নষ্ট হয়ে না যায়।"

সুঠাম মুকুজ্যে একটু যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি নিজে মাটিতেই বসেছিলেন গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে, কিন্তু ঝিনুকও যে তাই করবে, এটা তিনি প্রত্যাশা করতে পারছিলেন না।

"আমি মাটিতেই বসছি—"

"তাহলে ওইখানে ওই দুর্বাঘাসগুলোর উপর বস।"

ঝিনুক বসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে কোথায় থাক?"

"এখানে কলুচকে আমাদের একটা বাসা আছে। তবে আমি বেশির ভাগ ডাক্তার ঘোষালের বাসাতেই থাকি। কাজ করি তাঁর বাড়িতে।"

"ও। এখানেই কি তোমাদের দেশ?"

"না। আমরা পূর্ববঙ্গের লোক।"

"রেফিউজি বুঝি?"

ঝিনুকের চোখের দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে শাণিত হয়ে উঠল।

"হ্যাঁ। ওই নামেই আপনারা আমাদের অভিহিত করেছেন। কিন্তু আমরা এই ভারতবর্ষেরই লোক, ভারতের বাইরে থেকে আসিনি। বিদেশি র‍্যাডক্লিফ সাহেব দেশের উপর একটা লাইন টেনে দিয়েছেন বলে, আর আমাদের তথাকথিত নেতারা সেটা মেনে নিয়েছেন বলে আমরা পর হয়ে যাইনি। জোর করে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তারপর আমাদের রেফিউজি বলে অনুকম্পা করবার রেওয়াজই হয়েছে আজকাল। এদেশের লোকদের যদি ভদ্রতাবোধ থাকত, তাহলে তারা আমাদের রেফিউজি না বলে অতিথি বলতেন এবং সেইভাবেই আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করতেন।"

সুঠাম মুকুজ্যে চমৎকৃত হয়ে গেলেন। একটু চুপ করে তিনি বললেন, "অতিথিও তো পর। উচিত ছিল আত্মীয়ের মতো ব্যবহার করা। কিন্তু যা উচিত, তা তো সব সময় হয় না। শুধু এখানে নয়, পৃথিবীর কোথাও হয় না। যা পাওয়া যায়, সেইটেই যথালাভ, তাই নিয়েই সুখী হতে হয়।"

"যাদের আত্মসম্মান বোধ আছে, তারা সব সময়ে সব জিনিস মেনে নিতে পারে না। দুবেলা দুমুঠো খেতে পাচ্ছি বটে, কিন্তু প্রতি গ্রাসে অপমানের বালি কিচকিচ করছে। প্রতি মুহূর্তে সর্বাঙ্গ শিউরে উঠছে। রেফিউজি শব্দটা যোগরূঢ় শব্দের মতো আজকাল একটা বিশেষ অর্থ বহন করে, যার অর্থ ঘৃণ্য, কিন্তু কৃপার পাত্র। আপনার মুখ থেকে ও কথাটা শুনব আশা করিনি।"

ডাক্তার মুখার্জি হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তার দিকে। রোদে আর রাগে লাল হয়ে উঠেছে মুখটা। অনুভব করলেন, তপ্ত লোহায় হাত দিলে হাতে ছেঁকা লাগবে এখন। ও প্রসঙ্গ এখন চাপা দেওয়াই ভালো। কিন্তু ঠিক চাপা দিতেও পারলেন না।

বললেন, "তোমাকে রেফিউজি বললে তুমি কষ্ট পাবে, একথা জানলে ও কথা উচ্চারণ করতুম না। আমার কাছে কেউ ঘৃণ্য বা কৃপার পাত্র নয়। বিশ্বাস কর, তোমাদের কষ্ট দেখে আমারও খুব কষ্ট হয়। কি করব? একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, পৃথিবীতে সবাই কোনো-না-কোনো ভাবে কষ্ট পাচ্ছে। দুঃখের বিরাট সমুদ্রে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। তা সত্ত্বেও যারা হাসিমুখে সাঁতার কাটতে পারছে, সমুদ্রটাকে নিয়ে দিনরাত হা-হুতাশ করছে না, তারাই কতকটা সুখী।"

ঝিনুকের মুখে হাসির সামান্য আভা ফুটল।

"আমরাও সাহস করে সাঁতার কেটে চলেছি। কিন্তু মুখে হাসি এখনও ফোটাতে পারিনি। জানি না, তা কবে ফুটবে। হয়তো ফুটবেই না।"

"ফুটবে বইকি। মানুষের মন বড় অদ্ভুত জিনিস। অনিবার্য দুঃখের সঙ্গে ভাব করে সে

শেষকালে হাসে। শোক ভুলে যায়, ক্ষয়ক্ষতি সব ভুলে যায় সে। খাপ খাইয়ে নেওয়াই জীবনের ধর্ম।"

"তাই কি? আমার তো মনে হয়, সবচেয়ে নির্বিকার প্রাণহীন তো পাথর। সে-ই সব সময়ে সকলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। তার উপর যত অত্যাচারই হোক, সে প্রতিবাদ করে না। যাদের প্রাণ আছে, তারাই প্রতিবাদ করে।"

"ঠিক বলেছ। প্রতিবাদ করাও জীবনের লক্ষণ। খুব বড় লক্ষণ। কিন্তু প্রতিবাদেরও একটা সীমা আছে। নিষ্ফল প্রতিবাদ অর্থহীন। জীবনে এমন অনেক দুঃখ আছে, যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কোনও লাভ নেই। এই ধর না, গ্রীষ্মের, বর্ষার বা শীতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ওদের নিবারণ করা যায় না। বড়লোকেরা এয়ার কন্ডিশন্‌ড্ (air-conditioned) বাড়িতে থাকতে পারেন, দার্জিলিং সিমলা যেতে পারেন, বর্ষাকালে বর্ষাতি গায়ে দিতে পারেন, শীতকালে আগুন জ্বালাতে পারেন, কিন্তু সব লোক তা পারে না। তারা কষ্ট পায় এবং শেষ পর্যন্ত সেটা মেনে নেয়। কষ্টের সঙ্গেই তারা তখন আপোস করে এবং আপোস করে সুখে থাকে তখন। ওই কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতাও তখন তাদের মধ্যে জাগে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে adaptability বলে। অনিবার্য বিরুদ্ধ পরিবেশে সব প্রাণীই নিজেকে adapt করে নেয়। এই adapt করবার শক্তি মানুষেরই সবচেয়ে বেশি। আফ্রিকার দারুণ গরমে, হিমালয়ের হাড়-কাঁপানো শীতে, অরণ্যে, মরুভূমিতে, শহরে, গ্রামে, সর্বত্রই মানুষ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে এবং অধিকাংশ লোকই সুখে আছে। অনেকে আবার দুঃখকেই সুখের চেয়ে বড় স্থান দিয়েছে। কুন্তীর কথা নিশ্চয় পড়েছ। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁকে বর দিতে চাইলেন, তিনি বললেন, আমাকে দুঃখ দাও। আমিও অনেক লোক দেখেছি, যারা দুঃখকেই পছন্দ করে, সুখের চেয়ে দুঃখই তাদের কাম্য। আর এটাও ঠিক কথা, বাইরের দুঃখকে মেনে নিলে মনের ঐশ্বর্য বাড়ে। সেটা পরম লাভ।"

ঝিনুক বলল, "আপনি যেসব কথা বললেন, তা খুবই জ্ঞানগর্ভ। কিন্তু দুঃখের তীব্র কশাঘাতে, অপমানের মর্মান্তিক জ্বালায়, অবিচারের নিষ্ঠুর পীড়নে যারা অহরহ ক্ষতবিক্ষত, আপনার ওসব কথায় তারা মোটেই সান্ত্বনা পাবে না। নিজেদের স্বার্থের তাড়নায় যে বেপরোয়া ড্রাইভার অসহায় পথিকদের চাপা দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেয়— দুঃখের সৃষ্টিকর্তা বলে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হবার বা তাকে ঘিরে বাহবা বাহবা করবার প্রেরণা আর যেই পাক, সেই হতভাগ্য পথিকরা পাবে না। দুঃখের মহামূল্য রত্ন তাদের উপহার দিয়েছে বলে সে ড্রাইভারের পুজোও তারা করবে না। আমরা যে রকম দুঃখে পড়েছি, আপনি যদি সে রকম দুঃখের মুখোমুখি হতেন, তাহলে হয়তো আপনার গলা দিয়ে অন্য সুর বেরুত। যাঁরা আরামে বিলাসের কোলে লালিত হন, যাঁরা চর্বচুষ্যলেহ্যপেয় সব রকম খাবার খেয়ে, সুসজ্জিত বৈঠকখানায় পাখার তলায় আরাম-কেদারায় শুয়ে থাকেন, তাঁরাই সাধারণত দুঃখের জয়-গান করেন, আপনি এখন যেমন করলেন। ওসব জ্ঞানগর্ভ কথা আমাদের কাছে অর্থহীন।"

ঝিনুকের নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হতে লাগল।

ডাক্তার মুখার্জি একটু অপ্রস্তুত হয়ে চেয়ে রইলেন মাটির দিকে। তাঁর পায়ের কাছে যে দূর্বাঘাসগুলো ছিল, তাদের কাছেই তাঁর মন যেন আশ্রয় ভিক্ষা করতে লাগল।

তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, "আমি খেয়ে পরে সুখে থাকি, এটা আমার অপরাধ

নয়। সুখে থাকি বলেই দুঃখ সম্বন্ধে আমার ধারণা ভুল, এটা মনে করলে আমার উপর সুবিচার করা হবে না। মানুষের দুঃখ নিয়ে সত্য চিন্তা করেছেন, এরকম অন্তত দুটি লোকের খবর আমি জানি, যাঁরা ধনীর সন্তান ছিলেন। একজন গৌতম বুদ্ধ, আর একজন কার্ল মার্কস। এঁরা ধনীর সন্তান ছিলেন বলে এঁদের চিন্তাধারা অপাংক্তেয় হয়ে যায়নি। আমি অবশ্য ওঁদের মতো অত বড় নই, ওঁদের ধারে-কাছেও যেতে পারি না, আমি নতুন কথাও কিছু বলছি না, কিন্তু আমি খেতে পরতে পাই বলে এবং আমার বাড়ি পূর্ববঙ্গে নয় বলে কি আমার চিন্তা করবারও অধিকার নেই। বিশ্বাস করবে কি না জানি না তোমাদের দুঃখ যে কি তা সত্যিই আমি বুঝতে পারি, যে চক্রান্তের ফলে তোমরা আজ বিপন্ন তারও স্বরূপ কিছু কিছু জানি, যতটা পারি তোমাদের সাহায্যও করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও জানি দুর্ভাগ্যকে সহ্য করবার কৌশল অর্জন কবতে না পারলে দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। বেশি লম্ফঝম্ফ করলে উত্তপ্ত কটাহ থেকে জ্বলন্ত উনুনে পড়ে যাবারও ভয় থাকে। কথাটা উঠল বলেই যা আমি বিশ্বাস করি তাই তোমায় বললাম। আমার কথা না মানবার সম্পূর্ণ অধিকার তোমার কাছে। তর্ক করে কাউকে স্বমতে আনবার আগ্রহও আমার নেই। আগে ছিল। এখন বুঝেছি ও চেষ্টা বৃথা। জবাকে অপরাজিতা করা যায় না। যাক্ ওসব কথা—তোমার সঙ্গে সেদিন সন্ধ্যায় যে ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর সঙ্গে কিছুদিন আগে ঘোঘা স্টেশন দেখা হয়েছিল। তিনি যে রেলওয়ে ড্রাইভার তা জানতাম না। তিনি কি এখানেই থাকেন? তাঁর কি খবর?

"এখানে তাঁর একটা বাসা আছে শুনেছি। কিন্তু সেখানে শুনেছি তিনি প্রায় থাকেনই না। আমার সঙ্গে হঠাৎ মাঝে মাঝে দেখা হয়। তাঁর খবর আমি জানি না। তিনি ভবঘুরে লোক।"

ডাক্তার মুখার্জি হাসিমুখে চেয়ে রইলেন ঝিনুকের দিকে। তারপর একটু থেমে বললেন, "সেদিন কেন জানি না, মনে হয়েছিল লোকটির সঙ্গে তোমার ভাব আছে। আর তা মনে হওয়াতে সমস্ত মন এমন মাধুর্যে ভরে গিয়েছিল যে রিভলভারের গুলি খেয়েও তার রেশ কাটেনি। তোমার সেই ভবঘুরে বন্ধুটির সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে আছে। তাকেও এনো একদিন।"

ঝিনুক আনতচক্ষে মৃদুকণ্ঠে বলল, "সুযোগ পাই তো আনব।"

তারপর বলল, "আমি কথায় কথায় বড় রেগে যাই। আপনাকে এখন যেসব কটুকথা বললাম তার জন্য আমায় মাপ করুন। আমি জানি আপনি মাপ করবেন। কিন্তু আমি—"

হঠাৎ ঝিনুকের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গেল, সে আর কিছু বলতে পারলে না। তাঁর চোখ দিয়ে বোধ হয় জলও বেরিয়ে পড়ল একটু।

"ছি, ছি, কি ছেলেমানুষ তুমি"—শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন ডাক্তার মুখার্জি। "তুমি যা বললে তাতে আমার একটুও রাগ বা দুঃখ হয়নি। বরং আমি খুশি হয়েছি। অবশ্য অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম একটু, কিন্তু চমকে গেছি তোমার কথা শুনে। মনে হচ্ছিল একটা খাঁটি হীরে যেন ঝলমল করে উঠল রোদের ঝলক লেগে। তুমি যদি মতের অমিল সত্ত্বেও আমার কথায় ক্রমাগত 'হাঁ' দিয়ে যেতে তাহলেই বরং খারাপ হত, যা দেখলাম তা দেখতে পেতাম না। তোমার অনন্যতার পরিচয় দিয়েছ এতে রাগ বা দুঃখ করব কেন?"

ঝিনুক কয়েক মুহূর্ত নতমুখে বসে রইল তবু। তারপর বলল, "আমি যেজন্য আপনার কাছে এসেছি সেইটেই বলা হয়নি এখনও।"

"সেটা আবার কি!"

ঝিনুক ব্লাউসের ভেতর থেকে তনিমার চিঠিটা বার করে দিলে, যে চিঠিটা সে হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে পেয়েছিল তেপায়ার উপর। হাসপাতাল যাওয়ার আগে চিঠিটা ডাক্তারবাবুকেই লিখেছিল তনিমা।

"এই চিঠিটা আপনাকে দিতে এসেছি। এটা আপনারই চিঠি। তনিমা হাসপাতাল যাওয়ার আগে এটা লিখে রেখে গিয়েছিল।"

সুঠাম মুকুজ্যে চিঠিটা পড়ে খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন।

"সে কি! তনিমা মারা গেছে!"

"না মারা যায়নি। আপনি তাকে যে ডাক্তারবাবুর কাছে পাঠিয়েছিলেন তিনি অতি বিচক্ষণ লোক। অপারেশন করে তিনি বাঁচিয়ে তুলেছিলেন তনিমাকে। সে হাসপাতালে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছিল। গায়ে একটু জোর পেয়েই কিন্তু সে হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে—"

"পালিয়েছে? বল কি! কোথায় গেছে খবর পেয়েছ কি—"

"ঠিক খবর পাইনি। তবে মনে হয় এদেশে নেই, ইয়োরোপে গেছে।"

তারপর একটু থেমে বললে, "আমি ভেবেছিলাম আপনাকে হয়তো জানিয়েছে কিছু।"

"আমাকে? না, কিছু জানায়নি। তাকে কলকাতা পাঠাবার পর তার আর কোনও খবর আমি জানি না। এ তো বড় অদ্ভুত হল। ইয়োরোপে গেছে কি করে জানলে?"

"কোথা গেছে তা ঠিক জানি না। আমার বোন শামুক মিস্টার সেনের বাড়িতে চাকরি করত। সে-ও পালিয়েছে। আজ তার একটা ছোট চিঠি পেয়েছি লন্ডন থেকে।

এই যে—"

আর একটি চিঠি সে বার করে দিলে ডাক্তারবাবুকে।

ডাক্তারবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে পড়লেন ঃ

শ্রীচরণেষু,

দিদি, শিকল কেটে আকাশে উড়েছি। বিরাট আকাশ। তুমি আমার জন্যে ভেবো না। তনুদি আমার সঙ্গে আছেন। তিনি যে লোকটির সঙ্গে এখানে এসেছেন তিনি অসাধারণ লোক। বড় ব্যাংকার একজন। অনেক রকম ব্যবসাও আছে তাঁর এদেশে। তিনি আমাকে কোথাও ঢুকিয়ে দেবেন আশ্বাস দিয়েছেন। ওরা বোধ হয় কিছুদিন পরেই ইয়োরোপে টুরে বেরুবে। আনন্দে এবং সসম্মানে আছি। একটুও ভেবো না তুমি। কাকাকে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে তুমিও চলে এসো এখানে। খোকনও আমার সঙ্গে এসেছে। তাকে এখানেই স্কুলে ভরতি করবার চেষ্টা করছি। আমাদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা তনুদিই করেছেন। তুমিও এস। এখানেই ঘর বাঁধব আমরা। এদেশের অনেক দোষ আছে, কিন্তু এদের প্রধান গুণ এরা জীবন্ত। আব ভিতরে যা-ই থাক, বাইরে খুব ভদ্র। আমাদের দেশের ইতিহাস পড়ে আশা হয়েছিল যে এমন মহিমময় যাদের ইতিহাস সে দেশে নিশ্চয়ই মানুষের মতো মানুষ আছে। কিন্তু বিপদে পড়ে এক ডাক্তার ঘোষাল ছাড়া আর জীবন্ত মানুষ চোখে পড়ল না। অধিকাংশই প্রেত, পিশাচ আর শয়তান। মরা ইতিহাসের শুকনো পাতার ভাষ্য করে আর ভণ্ডামির ধ্বজা উড়িয়ে সবাই নিজেদের মতলব হাসিল করবার তালে আছে। তনুদি তোমাদের ডাক্তার মুখার্জির প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। বললেন তাঁকে চিঠি লিখবেন। তোমাকেও লিখবেন। তুমি ও কাকা আমার প্রণাম জেনো। ইতি— শামুক।

চিঠি পড়া শেষ করে ডাক্তারবাবু বললেন, কই, আমি তার কোনো চিঠি পাইনি তো!"

"আমিও পাইনি। আশা করে এসেছিলাম আপনার কাছে কিছু খবর পাব।"

"ভেব না। খবর আসবেই একটা।"

ঝিনুক ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল।

"আপনি এখানে এসে কি করছিলেন?"

"কিছুই করছিলাম না। নিজেকে নিয়ে ছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল এখানকার হলদে পাখিগুলোর সঙ্গে একটু আড্ডা দেওয়া। কিন্তু তারাও বিশেষ আমল দিল না। শুনলাম একটা পাখি তার সঙ্গিনীকে বলল, 'ওগো শুনছ, খিল খোল' বলেই দুজনে উড়ে গেল। তারপরই তুমি এলে।"

" 'ওগো শুনছ, খিল খোল' বললে পাখিটা?"

"হঠাৎ আজ আমার তাই মনে হল। এতদিন ওদের ডাক শুনেছি, আগে এ রকম মনে হয়নি। আজ যেন স্পষ্ট শুনলাম, বলছে 'ওগো শুনছ, খিল খোল'। মনে হল সবার অন্তরের এই আকুল প্রার্থনাটা হলদে পাখির কণ্ঠেও আজ শোনা গেল। বলতে পারি না, হয়তো ভুল শুনেছি।"

ডাক্তারবাবুর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এমন সময় গাছের উপর থেকে শব্দ হল, 'টিউ'। "হলদে পাখি এখনও আছে গাছে, পালায়নি। এই বটগাছটাকে খুব ভালোবাসে ওরা। ওইখানেই ওদের আড্ডা।"

ঝিনুক উৎসুক দৃষ্টি তুলে বটগাছটার দিকে চাইতে লাগল।

"কই দেখতে পাচ্ছি না তো?"

"চট্ করে দেখা যাবে না। ঘুরে ঘুরে একটু কষ্ট করতে হবে। খুব দুষ্টু পাখি, প্রায়ই পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে, কাকের মতো 'ফরোয়ার্ড' নয়। দেখতে চাও তো ওঠ।"

"চলুন।"

ঝিনুককে নিয়ে বাইনকুলার গলায় ঝুলিয়ে সুঠাম মুকুজ্যে সোৎসাহে বটগাছটা প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন।

।। তেইশ ।।

ভাগলপুরের একটা হোটেলে সুবেদার খাঁ বই পড়ছিলেন একা একটা ঘরে বসে। সুবেদার খাঁ এক ঠিকানায় বেশি দিন থাকেন না। অধিকাংশ সময়ে নানা হোটেলেই থাকেন তিনি। যে হোটেলে সিংগ্‌ল সিটেড রুম পান সেই হোটেলেই যান। হোটেলের আভিজাত্য বা খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ কোনো বাছবিচার নেই। তবে একা একটা ঘর পাওয়া চাই। সেদিন তাঁর সাহেবগঞ্জে থাকার কথা, কিন্তু সেখানে ডিউটির চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে তিনি চলে এসেছেন ভাগলপুরে। সাহেবগঞ্জের হোটেলে সিংগ্‌ল সীটেড্ রুম সেদিন পাননি। তাই ভাগলপুরে এসেছেন। তাঁর পড়ার নেশা খুব প্রবল। নির্জন ঘরে একা বসে তিনি পড়তে ভালোবাসেন। উপন্যাস পড়েন না, ইতিহাসের বই পড়েন। বিশেষ করে ভাতরবর্ষের ইতিহাসের বই। চারটে ভাষা জানা আছে—হিন্দী, উর্দু, বাংলা এবং ইংরেজি— সুতরাং নানারকম বইও পান। দেশের ইতিহাসের ভেতর দিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ করতে চান দেশের ভবিষ্যৎ। এইটাই তাঁর অবসর-বিনোদনের প্রধান অবলম্বন। আর

একটা অবলম্বন ঝিনুকের চিন্তা। ঝিনুককে তিনি যদি জীবনে পেতেন তাহলে তাঁর জীবন ধন্য হয়ে যেত। কিন্তু তিনি জানেন, ঝিনুককে তিনি পাবেন না। তিনি মুসলমান— একথা ঝিনুকের মর্মে রক্তের রঙে আঁকা আছে। এ রং কখনও উঠবে না। নিষ্ঠুরতার নির্মম তুলি দিয়ে এই রক্তের নিষেধ আঁকা হয়েছে বহু যুগ ধরে, সেই সোমনাথ লুণ্ঠনের সময় থেকে। থানেশ্বরের ভয়াবহ অত্যাচার, জহরব্রতের অগ্নিশিখা, সহস্র সহস্র সতীর আর্তনাদ, সহস্র সহস্র ছিন্নমুণ্ড রক্তাক্ত হিন্দুর অভিশাপ, জিজিয়া কর, কমুন্যাল অ্যাওয়ার্ড, কলকাতার ডাইরেক্ট অ্যাকশন, নোয়াখালির হত্যাকাণ্ড, পূর্ববঙ্গের ভীষণ অত্যাচার— এই স্তূপীকৃত নৃশংসতার হিমালয় উত্তুঙ্গ হয়ে আছে তাঁর ঝিনুকের মধ্যে। তিনি জানেন ঝিনুক এ হিমালয় পার হতে পারবে না, পার হতে চাইবে না। তিনি পার হতে পারেন, পার হতে চান, কিন্তু তাঁর এই দুঃসাহসের একটি অর্থ-ই ঝিনুক করবে— কামুকতা। কিন্তু এ কলঙ্ক তিনি নিজের ললাটে মাখতে চান না। তিনি যে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য ঝিনুককে চাইছেন না, তাকে জীবনের যোগ্য সঙ্গিনীরূপেই চাইছেন, একথা তিনি ঝিনুককে বোঝাতে পারবেন না বলেই ঝিনুককে পাওয়ার আশা বিসর্জন দিয়েছেন। পাওয়ার আশা বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু ঝিনুকের সংস্রব ত্যাগ করতে পারছেন না। সে যাতে সুখে থাকে, সে যাতে তার জীবনের আদর্শ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে, এই চেষ্টা করে তিনি তির্যকভাবে আনন্দ পেতে চান আর তা স্বার্থলেশহীন ভাবে পান বলে সেটা আরও মধুর, আরও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনে। বস্তুত, ঝিনুককে কেন্দ্র করেই তাঁর জীবন আবর্তিত হচ্ছে এখন। তিনি জানেন ঝিনুক ডাক্তার ঘোষালের খুব অনুরক্ত, যদিও তাঁকে বিয়ে করেনি, কিন্তু তাঁকে ছেড়ে ও যে কোথাও যাবে তা মনে হয় না। ডাক্তার ঘোষালের প্রতি ঝিনুকের পক্ষপাতের কারণ তিনি নাকি প্রাণ তুচ্ছ করে গুণ্ডাদের হাত থেকে ওদের বাঁচিয়েছিলেন। ব্যাপারটাকে বারবার বিশ্লেষণ করেছেন সুবেদার খাঁ। ওইটেই কি অনুরক্তির একমাত্র কারণ? তিনিও উদ্বাস্তুদের জন্য কম করেননি, তিনি বারবার নিজের জীবন বিপন্ন করে টাকা যোগাড় করেছেন ওদের জন্য, এখনও করছেন। ঝিনুক এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তার ব্যবহারও খুব ভদ্র, কিন্তু যার জন্য তিনি মনে মনে উৎসুক তার আভাসমাত্রও পাননি কখনও। তাঁর মহত্ত্বকে ঝিনুক স্বীকার করেছে, কিন্তু তাঁর প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করতে সে দ্বিধা করেনি। এর কারণ কি? এর কারণ ওই মামুদ শা, মহম্মদ ঘোরী, আলাউদ্দিন খিলজি আর আওরঙ্গজেবের নিষ্ঠুর ইতিহাস। এ কালিমা কি কোনোদিন ধুয়ে ফেলা যাবে না? কত চোখের জল লাগবে এজন্য? রাজপুত জাতির ইতিহাস পড়তে পড়তে এইসব কথাই ভাবছিলেন তিনি। রাজপুত জাতির ইতিহাসে মুসলমানদের কলঙ্ক ঘনমসিরেখায় আঁকা আছে। মুসলমান বাদশাহদের প্রতিপত্তি আজ নেই, হয়তো তাঁরা ভালো কাজও কিছু করেছিলেন, কিন্তু সে-সব কথা আজ কারও মনে নেই। কেবল মনে আছে তাঁরা ছিলেন কামুক, লোভী, পরস্ত্রী-লোলুপ, অমানুষ। বিচারশালায় আসামীর কাঠগড়ায় যারা চিরকাল দাঁড়িয়ে আছে, চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকবে, ওরা তাদের দলে। মাঝে মাঝে সুবেদার খাঁর মনে হচ্ছিল এসব ইতিহাস কি সত্য? মিথ্যা ইতিহাসও তো ছাপার অক্ষরে লেখা আছে অনেক। অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাসটা যে মিথ্যা তাতো প্রমাণ করে দিয়েছেন অক্ষয় মৈত্রেয়। হঠাৎ একটা অদ্ভুত আকাঙক্ষা হল তাঁর, তিনি যদি ইনজিন ড্রাইভার না হয়ে ঐতিহাসিক হতেন, বিরাট গবেষণা করে যদি মুসলমান সম্রাটদের কলঙ্ক স্খালন করতে পারতেন, যদি তাঁর সেই নির্ভুল গবেষণা ঝিনুকের চোখে পড়ত, যদি সে একবারও মনে ভাবত, না, আমি ভুল করেছিলাম...।

হঠাৎ সুবেদার খাঁর কল্পনা-জাল ছিন্ন হয়ে গেল। তাঁর ঘরের বন্ধদ্বারে কে যেন টুক্ টুক্ করে টোকা দিতে লাগল। খুলে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। একটা বাঁদর! কপাট খোলা পেয়েই বাঁদরটা টপ্ করে তাঁর ঘরে ঢুকে তড়াক করে টেবিলে লাফিয়ে উঠল। রাত্রে খাবেন বলে একটা আপেল কিনেছিলেন সুবেদার খাঁ, সেইটে তুলে নিয়ে টপ্ করে বেরিয়ে গেল আবার। সুবেদার তার পিছুপিছু গিয়ে দেখলেন, কিছু দূরে গিয়ে একটা ঘরে ঢুকে পড়ল সে। বিস্মিত হয়ে তিনিও দ্রুতপদে গেলেন সেখানে। গিয়ে দেখেন, ঘরের মধ্যে একটি ভদ্রলোক রয়েছেন। বাঁদরটা টেবিলের উপর আপেলটা রেখে দিয়েছে আর চেয়ারে বসে মিটিমিটি চাইছে ভদ্রলোকের দিকে। ভদ্রলোক মৃদু হেসে তার দিকে চেয়ে বলছেন, গুড়, গুড়, ভেরি গুড়। অবাক হয়ে গেলেন সুবেদার খাঁ।

একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, "কিছু যদি মনে না করেন—"

ভদ্রলোক ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন তাঁর দিকে।

"কে আপনি? কি চান?"

ভদ্রলোক দেখতে সুন্দর। পাতলা ছিপছিপে চেহারা। মুখে সূচালো ফ্রেঞ্চকাট কাটা দাড়ি, চঞ্চল চোখ দুটি নীলাভ। পরনে ফুলদার আদ্দির পাঞ্জাবি, ঢিলে পায়জামা। মখমলের চটি। মাথায় গোল টুপিটিও মখমলের। বাঁ হাতে খুব লম্বা সাদা সিগারেট, হোল্ডারে কালো ইজিপ্শিয়ান সিগারেট। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কিন্তু চমকে উঠলেন সুবেদার খাঁ। তাঁর মনে হল একটা নেকড়ে যেন মনুষ্যমূর্তি ধরেছে। সিগারেটে খুব সন্তর্পণে একটি টান দিয়ে তিনি আবার বললেন, "কি চান আপনি?"

সুবেদার খাঁ তাঁর স্বভাবসুলভ ভদ্রতাবশত বললেন, "আদাব। ওই বাঁদরটা কি আপনার পোষা? ও আমার ঘর থেকে আপেলটা নিয়ে এসেছে এখুনি।"

ভদ্রলোক একটু মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন। আর একবার টান দিলেন সিগারেটে। তারপর বাঁদরটাকে লক্ষ করে বললেন, মংকু, অন্যায় করেছ। এঁর মুখের গ্রাস কেড়ে এনেছ তুমি। দুঃখিত হয়েছেন ভদ্রলোক। যাও, দিয়ে এস ওটা ওঁর ঘরে।"

বাঁদরটা টপ্ করে চেয়ার থেকে নেমে আপেলটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ভদ্রলোক বললেন, "ও আপনার ঘরে গিয়ে ঠিক রেখে আসবে বসুন।"

সুবেদার খাঁ ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বসলেন।

"আপনার পোষা বাঁদর?"

"ও আমার ছেলে। ওর মা ওকে প্রসব করেই মারা যায়। আমি ওকে মানুষ করেছি।"

"এ কি করে সম্ভব হল?"

"আমি সার্কাসে animal trainer ছিলাম, পশুদের শিক্ষা দিতাম। তখনই ওকে মানুষ করেছিলাম। তারপর থেকেই ও বরাবর সঙ্গে আছে। ওর মা-ও আমাকে খুব ভালোবাসত।

"ও আপনার সব কথা শোনে?"

"সমস্ত। নিজের ছেলে হলে এত বাধ্য হত না।"

"বলেন কি! আপনি এখনও সার্কাসে চাকরি করেন?"

"অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি। মংকুই এখন রোজগার করে খাওয়ায় আমাকে—"

বলতে বলতেই মংকু ঘরে এসে ঢুকল, তার বগলে একটা পাঁউরুটি।

"ওই দেখুন। এটা সরিয়ে রাখা যাক। পাঁউরুটির মালিক যদি এসে হাজির হয়, তা হলে আজ রাত্রে উপবাস করতে হবে।"

মংকুর হাত থেকে পাঁউরুটিটি নিয়ে তিনি তাঁর স্যুটকেসে পুরে রাখলেন এবং সুবেদার খাঁর দিকে চেয়ে হাসলেন একটু।

"মংকু অতি-আধুনিক পদ্ধতিতে রোজগার করে। মানুষের অসাবধানতার সুযোগ নেয় ও। ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ীরাও তাই করে।"

সন্তর্পণে সিগারেটে টান দিতে লাগলেন। কোথায় যেন একটা ঘড়িতে বারোটা বাজল। "এবারে খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক্। আপনার খাওয়া হয়েছে? না হয়ে থাকে তো আমার সঙ্গে খেতে পারেন। মংকু আজ মন্দ রোজগার করেনি—"

"আমার খাওয়া হয়ে গেছে। আপনার বাড়ি কোথায়? বাংলাদেশে?"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "আমি world citizen ঃ আমার নাম পৃথিবী-নন্দন। অন্য কোনো পরিচয় এ যুগে অচল।"

মুচকি মুচকি ব্যঙ্গ হাসি ফুটে উঠল মুখে। সুবেদার খাঁর বিস্ময়ের ঘোর কেটে গিয়েছিল। তিনি এই অদ্ভুত লোকটির কথাবার্তায় কৌতুক অনুভব করছিলেন, লোকটির প্রতি আকর্ষণও অনুভব করছিলেন একটা। অপূর্ব ব্যঙ্গরসের চমক ভদ্রলোকের চোখে-মুখে, কথাবার্তায়। তাঁর কথা আরও শোনবার জন্যে তাই প্রশ্ন করলেন, "অচল? কি রকম?"

"অচল নয়? আপনি অতি সেকেলে লোক মনে হচ্ছে। এখনও অবশ্য আমরা যথেষ্ট উদার হতে পারিনি। এখনও নারকেল গাছে যে ফল ফলে তাকে আমরা নারকেলই বলি, কিন্তু বাংলা দেশে যে জন্মেছে সে নিজের পরিচয় বাঙালী বলে দিলেই আধুনিক উন্নত সমাজ, বিশেষ করে রাজনৈতিক সমাজ, নাক সিঁটকে ছ্যা ছ্যা করে। তাকে প্রাদেশিক বলে গালাগালিও দেয়। তাই আমি ও ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে দিয়েছি, তাই আমি পৃথিবী-নন্দন। আপনি কি বসবেন?"

"আপনার যদি আপত্তি না থাকে—"

"কিছুমাত্র আপত্তি নেই। তাহলে দাঁড়ান, কপাটটা ভেজিয়ে দিই। ক্ষিধে পেয়েছে, খেতে হবে। মংকুও অনেকক্ষণ কিছু খায়নি।"

পৃথিবী-নন্দন ঘরের কপাট বন্ধ করে বাক্স খুলে খাবার বের করলেন। একটি গোটা পাঁউরুটি, গোটা দুই কাটলেট, একটা সিদ্ধ ডিম, একটা পেয়ারা আর কয়েকটা কলা।

সুবেদার খাঁর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে মুচকি হেসে বললেন, "সব মংকু রোজগার করেছে—"

তিনি দুটি কলা, পেয়ারাটা আর আধখানা পাঁউরুটি মংকুকে দিলেন।

"মংকু মাংস খায় না। মনুষ্য সমাজেও অনেকে মংকুর আদর্শ অনুসরণ করছে। ধড়িবাজ, বদমায়েশরা আর দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকেরা প্রায় দেখবেন নিরামিষাশী। মংকু খাও—"

মংকু আদেশের জন্য অপেক্ষা করছিল। "খাও" বলতেই খাওয়া শুরু করে দিল।

সুবেদার খাঁ বললেন, "যদি একটা অনুরোধ করি, রাখবেন?"

"কি বলুন, অসম্ভব না হলে নিশ্চয়ই রাখব।"

"আমার আপেলটা এনে দি। আপনি আর মংকু খান। খেলে সত্যিই আমি খুশি হব।"

পৃথিবী-নন্দন স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, "তাহলে মস্ত বড় একটা ঝুঁকি নিতে হয়।"

"কিসের ঝুঁকি?"

"বন্ধুত্বের। আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হয় তাহলে। অচেনা লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা, অচেনা লোকেরা কাছ থেকে "চেক" নেওয়ার মতো অনেকটা। প্রায়ই দেখেছি dishonoured হয়, ধোপে টেকে না। ভুয়ো চেক আর ভুয়ো বন্ধুত্বের আজকাল ছড়াছড়ি। আমার মংকু যখন আপেলটা এনেছিল, তখন সেটা ছিল তার স্বোপার্জিত সম্পত্তি। তখন তাতে আমার দাবি ছিল। এখন আপনার কাছ থেকে যদি ওটা নিই তাহলে হয় দাম দিতে হবে, না হয় প্রতিদানে কিছু একটা করতে হবে। হৃদয় ছাড়া এখন আমার দেবার মতো আর কিছু নেই। সে হৃদয়ও ভগ্ন-হৃদয়। নেবেন কি সেটা? বিনিময়ে কি আপনারটাও পাব?"

"নিশ্চয় পাবেন।"

"আপনারটা আশা করি গোটা আছে।"

"না। চিড় খেয়েছে।"

"তাহলে মিলবে ভালো। আনুন আপেল।"

সুবেদার খাঁ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে আপেলটি নিয়ে এলেন। পৃথিবী-নন্দন সমান তিন ভাগে ভাগ করলেন সেটি। একটি সুবেদার খাঁকে দিলেন।

"আসুন, আপনাকে একেবারে বঞ্চিত করব না।"

তারপর একটি মংকুকে দিয়ে তৃতীয় টুকরোটি নিজে খেলেন।

আহারাদি শেষ হলে পৃথিবী-নন্দন তাঁর লম্বা সিগারেট হোল্ডারে আর একটি ইজিপ্শিয়ান সিগারেট পরিয়ে খুব মনোযোগ সহকারে ধরালেন সেটি। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "দেখুন মশাই, আপনার সঙ্গে বন্ধুত্বই যখন হল তখন প্রথমেই আপনাকে প্রাণের একটি মর্মস্পর্শী গোপন কথা নিবেদন করি। আশা করি সে অধিকার আমি অর্জন করেছি।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। কি কথা বলুন।

"আমি এখন কপর্দকশূন্য। আপনার কাছে কিছু অর্থ-সাহায্য চাই। মংকু আমার খাবারটা যোগাড় করে এনে দেয় বটে, মাঝে মাঝে টাকা-কড়িও এনে দেয়, কিন্তু ও এখনও expert pick-pocket হয়ে উঠতে পারেনি। আজ ভোরেই আমাকে এ হোটেল ছাড়তে হবে। অথচ পকেটে পয়সা নেই। হোটেল চার্জ পাঁচ টাকা। তা ছাড়া কিছু ট্রেনভাড়া—"

সুবেদার খাঁ আবার অবাক হলেন। ভদ্রলোকের পকেটে পয়সা নেই, অথচ হোটেলে এসে উঠেছেন! বললেন, "আমার কাছে কিছু আছে, দেব আপনাকে। তবে একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে—"

"বলুন। অকপটে বলুন। আপনি আমার বন্ধু—"

"আপনি কপর্দকশূন্য কিন্তু হোটেলে এসে উঠলেন কেন? আমার সঙ্গে যদি দেখা না হত?"

"আর কারও সঙ্গে হত। কিংবা আজ যাওয়া হত না, অপেক্ষা করতে হত,

মংকুই হয়তো কোন ফাঁকে হোটেল ম্যানেজারের টাকার থলিটা এনে দিত আমাকে, কিংবা আরও অপ্রত্যাশিত রকম কিছু হত। মোটকথা কিছু একটা হত।"

তারপর মৃদু হেসে বললেন, "জীবনে কোথাও আটকাইনি।"

হাসিমুখেই চেয়ে রইলেন তিনি সুবেদার খাঁর দিকে। সুবেদার খাঁ সবিস্ময়ে দেখলেন তাঁর মুখে চিন্তার লেশমাত্র নেই।

পৃথিবী-নন্দন বললেন, 'ঘৃণা হচ্ছে? বইয়ে পড়েছি এ দেশে আগে একরকম সাধু ছিলেন তাঁরা রোজগার করতেন না, ভিক্ষা করতেন না, রাস্তায় যখন যা পেতেন তাই কুড়িয়ে নিতেন। তাতেই তাঁদের চলে যেত। তাঁদের নাম ছিল উঞ্ছবৃত্তিধারী। সাধু সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব খাতির ছিল তাঁদের। আমিও অনেকটা সেই ধাঁচের লোক, রাস্তা থেকে যখন যা পাই তা কুড়িয়ে নিই। কিন্তু যুগ বদলেছে, ভদ্রলোক নেই, উদার লোক নেই, রাস্তায় আজকাল বড় একটা কিছু পড়ে থাকে না, তাই আমাকেও একটু বদলাতে হয়েছে। আপনার কাছে যে টাকাটা নিচ্ছি সেটা ধার নিচ্ছি না, ভিক্ষাও নয়, ওটা নিচ্ছি বন্ধুত্বের দাবিতে। এতে যদি আপনি রাজি না থাকেন, দেবেন না।"

"না, না, বন্ধুত্বের দাবিতেই দিচ্ছি এটা, ধার বা ভিক্ষা নয়। আপনার মতো লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়াতে খুবই আনন্দিত হয়েছি, আপনার মতো লোক আমি দেখিনি।"

ব্যাগ থেকে দশটি টাকা বার করে দিলেন তাঁকে।

"আর একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। আপনি কি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ান?"

"না। একটা উদ্দেশ্য আছে বইকি, কিন্তু সেটা এখন বলা যাবে না। আর একটা উদ্দেশ্য আছে— ফোটো তোলা। অনেক অচেনা লোকের ফোটো তুলি আমি। দেবেন আপনার একটা ফোটো তুলতে?"

"আমার ফোটো? বেশ তুলুন।"

পৃথিবী-নন্দন সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্যামেরা বার করে ফ্ল্যাশ-লাইটে একটা ফোটো তুলে ফেললেন সুবেদার খাঁর।

তারপর হেসে বললেন— "আপনার স্মৃতি-চিহ্ন রইল একটা আমার কাছে। কিন্তু আপনার পরিচয় তো কিছু পেলাম না, যদিও আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেললাম।"

"আমার নাম সুবেদার খাঁ। সামান্য লোক আমি। ইনজিন ড্রাইভার। রেলগাড়ি চালাই।"

"মুসলমান?"

সহসা পৃথিবী-নন্দনের মুখের নেকড়ে ভাবটা আরও প্রখর হয়ে উঠল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "রেলের ইনজিন ড্রাইভার? তাহলে তো মস্ত লোক আপনি। কখন ডিউটি আপনার?"

"চব্বিশ ঘন্টা পরে। সাহেবগঞ্জ থেকে আমি ডিউটিতে জয়েন করব।"

"ও। আমি তো একটু পরেই চলে যাব। আবার দেখা হবে। পৃথিবী গোল। আমি সার্কাসওলা আর ভবঘুরে। এখন প্রেয়সীর কণ্ঠহারের সন্ধানে ঘুরছি!"

"কি রকম?"

"সব কথা এখন বলা যাবে না। আর আধ ঘণ্টা পরে আমার ট্রেন। আসুন।"

হাত বাড়িয়ে দিলেন পৃথিবী-নন্দন। সোচ্ছ্বাসে করমর্দন করলেন।

"মংকু, তুমিও স্যালিউট্ কর।"

মংকুও মিলিটারি কায়দায় স্যালিউট্ করল। তারপর পৃথিবী-নন্দন আর একবার অভিবাদন করে স্যুটকেসটি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। মংকুও লাফাতে লাফাতে তার পিছু-পিছু চলে গেল। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সুবেদার খাঁ। এরকম অদ্ভুত লোক তিনি দেখেননি। হঠাৎ তাঁর মনে হল— লোকটা আমার ফোটো তুললে কেন?

।। চব্বিশ ।।

কিছুদিন পরে গণেশ হালদারও খুব অবাক হলেন। একদিন স্থানীয় একটা ছাপাখানা থেকে একটা কুলি প্রকাণ্ড প্যাকেট নিয়ে এসে হাজির হল্। কুলির হাতে একটি চিঠিও ছিল। ছাপাখানার ম্যানেজার লিখেছেন— "ডাক্তার সুঠাম মুখার্জির নির্দেশে এগুলি আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। দশ হাজার কপি আছে। প্রেসের বিল ডাক্তার মুখার্জি চুকিয়ে দিয়েছেন। অনুগ্রহ করে প্রাপ্তি-সংবাদ দেবেন।"

"কিসের কপি?"

যে ছোকরাটি সঙ্গে এসেছিল সে বলল, "ডাক্তার মুখার্জি একটা প্যামফেট ছাপতে দিয়েছিলেন।"

প্যাকেট নামিয়ে একটা প্যামফেট বার করেও দিল সে। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন গণেশ হালদার। প্রাদেশিকতা নিয়ে যে প্রবন্ধটি তিনি লিখেছিলেন, যেটি কাগজে ছাপা হয়নি, ফেরত এসেছিল, সেইটি এমন সুন্দর করে ছাপিয়ে দিয়েছেন তিনি! আনন্দে কৃতজ্ঞতায় তাঁর মন ভরে উঠল। তিনি প্রেসের ম্যানেজারকে তাড়াতাড়ি একটা প্রাপ্তি সংবাদ দিয়ে প্যামফেটের প্যাকেটটা নিয়ে ছুটলেন ডাক্তারবাবুর কাছে।

ডাক্তারবাবু তখন বিজয়কে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। বিজয়ের নামে তার পিসতুতো বোন পাকিয়া নালিশ করেছে। মাইজি যখন পুজোর ঘরে পুজো করছিলেন তখন বিজয় নাকি মুরগির ডিম নিয়ে সেখানে ঢুকে মাইজিকে বিরক্ত করেছিল। বিজয় বলছে, সে পুজোর ঘরে ঢুকছিল বটে কিন্তু মাইজিকে বিরক্ত করেনি; ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করেছে, ডিমটা কোথায় রাখবে। এতে মাইজি বিরক্ত হননি। পাকিয়ার নামেও বিজয় পালটা নালিশ রুজু করেছে একটা। পাড়ার দরজীর দোকানে যে পোষা বাঁদরীটা বসে থাকে, পাকিয়া বলছে বিজয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেবে, বাঁদরীটা নাকি বিজয়কে রোজ ডাকছে। এ খবরে ডাক্তারবাবু বেশ উৎসাহ বোধ করতে লাগলেন।

বললেন, ভালোই তো, বিয়ের সময় বিজয়কে তিনি লাল মখমলের টুপি, মখমলের কোট আর মখমলের প্যান্ট করিয়ে দেবেন। আর বাঁদরীটাকে দেবেন একটা বেনারসীর ঘাগরা।

বিজয় চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, "হম্ ওকরা পাস নেই যাম্।" (আমি ওর কাছে যাব না)।

"কেন যাবি না? পাত্রী তো ভালো।"

"ওকড়া বড়া বড়া 'ন' ছে।" (ওর বড় বড় নখ আছে।)

"সে বৈজু নাপিতকে ডেকে কাটিয়ে নিলেই হবে।"

"আংমে লম্বা লম্বা রোঁয়া ছে।" (গায়ে বড় বড় লোম আছে।)

"সে-ও বৈজু কেটে দেবে।"

"নেই, হম্ নেই যাম্। ওকরা পুছড়ি ছে।" (না আমি যাব না, ওর ল্যাজ আছে।)

"ভালোই তো। তোকেও আমি একটা চামড়ার ল্যাজ বানিয়ে দেব। প্যান্টের বেল্ট থেকে ঝুলবে। বেশ ভালো হবে। দুজনেই পেয়ারা গাছে উঠে পেয়ারা খাবি। উঁচু ডাল থেকে তোকে পাকা পাকা পেয়ারা খেতে দেবে। তুই তো উঁচুতে উঠতে পারিস না।"

"উ আপনে গবর গবর খাইতে।" (ও নিজেই গব গব করে খেয়ে ফেলবে।)

"না, না, তা কি হয়! তোকে দেবে—"

পাকিয়া ফোড়ন দিলে— "দরজীকে উ আম দেইছে। চল না, আপনা আঁখ সে দেখবি।" (দরজী আম দেয়। চল না, নিজের চোখেই দেখবি।)

"হম্ নেই যাম্। উ কাটাহা ছে।" (আমি যাব না। ও কামড়ায়।) এমন সময় রকেট আর ভুটান ছুটোছুটি করতে করতে এসে হাজির হ'ল। রকেট যথারীতি ভুটানের কান কামড়াচ্ছিল, আর ভুটান খ্যাঁক খ্যাঁক করে বকছিল তাকে। রকেট ভুটানের সঙ্গে খেলা করতে চায় কিন্তু ভুটান কিছুতেই রাজি হয় না। হয় না, কারণ এই বেমানান বপ্রক্রীড়ায় ভুটান বেচারা সত্যিই বিব্রত হয়ে পড়ে। রকেট তার সমস্ত মুণ্ডটাই মুখের ভিতর ঢুকিয়ে ফেলে, কখনও ল্যাজটা ধরে দোলায়। এতটা ভুটানের পক্ষে সহ্য করা শক্ত। বিজয় ভুটানের দুঃখ বোঝে, রকেট তার হাতটাও মাঝে মাঝে মুখে ঢুকিয়ে আলতোভাবে কামড়ে রাখে। বিজয় এগিয়ে গিয়ে রকেটকে ধমক দিয়ে কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল।

"নো, নো, কাম হিয়াল, কাম হিয়াল।"

রকেট কোনো আপত্তি করল না, ঘাড় নিচু করে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বিজয়ের সঙ্গে গেল।

"ছিট ডাউন।"

রকেট সামনের থাবা দুটোর উপর মুখ রেখে বসল। এরকম বসার মানে, এরা একটু অন্যমনস্ক হলেই ও উঠে পালাবে।

ঠিক এই সময় প্যামফেটের প্যাকেট হাতে নিয়ে মাস্টারমশাই এলেন।

আসুন মাস্টারমশাই, কি খবর? হাতে ওটা কি?"

"আপনাকেই তো জিজ্ঞেস করতে এসেছি, এ কি করেছেন আপনি?"

ডাক্তারবাবু প্যামফেটটা দেখে বললেন, "ও, ওটা বুঝি ছেপে দিয়ে গেছে। আমার মনেই ছিল না। ভালো ছেপেছে তো?"

উল্টে পাল্টে দেখলেন।

"ভালোই ছেপেছে। ব্যস, আর কি। এবার বিতরণ করুন। আপনার বক্তব্য পাঁচজনকে জানানোই তো আপনার উদ্দেশ্য—"

"আপনি হঠাৎ ছাপতে দিলেন কেন?" কুণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন গণেশ হালদার।

"প্রবন্ধটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। যদিও অনেক জায়গায় আপনার মতের সঙ্গে আমার মতের মিল নেই, কিন্তু প্রবন্ধটা আপনি লিখেছেন ভালো। আপনার বক্তব্যটা বেশ জোরালোভাবে ফোটাতে পেরেছেন তাই, ভাবলাম ছাপিয়ে দিই—"

কিন্তু আসল কথাটা ডাক্তার মুখার্জি বললেন না। প্রবন্ধটা কাগজে ছাপেনি, ফেরত দিয়েছে, এই কথাটা যখন গণেশ হালদার বলেছিলেন ডাক্তার মুখার্জিকে। তিনি তখনই ঠিক করেছিলেন ছাপিয়ে দেবেন প্রবন্ধটাকে। কতই বা খরচ!

"এতগুলো নিয়ে আমি এখন কি করব!"

"ওই যে বললাম। বিতরণ করুন। গণতন্ত্রে সবারই নিজের নিজের মত আইনত প্রচার করবার অধিকার আছে। কাগজওয়ালারা ভয়ে যখন আপনার মত ছাপতে চাইছে না, তখন আসুন আমরাই ছাপি। প্রবন্ধটাতে অনেক সত্য কথা বলেছেন আপনি।"

"স্কুলে বিতরণ করব?"

"ক্ষতি কি। এক কাজ করুন। একটা লোক বহাল করুন। সে স্টেশনে গিয়ে প্রতি ট্রেনে ট্রেনে কিছু বিলি করে আসুক। আপনার বন্ধুবান্ধবদেরও দিন কিছু-কিছু। এই দুর্গা, তোর ভাইটা আজকাল কি করছে?"

"ঘর মে বৈঠলো ছে।" (ঘরে বসে আছে।)

"ওকে তাহলে ডেকে নিয়ে আয়। এ রোজ বাবুর কাছ থেকে বই নিয়ে স্টেশনে প্রত্যেক ট্রেনের প্যাসেঞ্জারদের দিয়ে আসবে। মজুরি যা চায় আমি দিয়ে দেব।"

গণেশ হালদারের আত্মসম্মান এতে যেন আহত হল একটু।

"না, না, মজুরি আপনি দেবেন কেন? আপনি যা ঠিক করে দেবেন তা আমিই দিয়ে দেব। সব বিষয়ে আপনার উপর দাবি করাটা কি ভালো দেখায়? আপনি আমার জন্যে যা করছেন—"

গণেশ হালদার আর কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর চোখে জল এসে পড়ল।

ডাক্তারবাবু হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। তারপর বললেন, "বেশ, আপনার যা ইচ্ছে। এর থেকে একটা কথা কিন্তু বেশ বোঝা গেল।"

উৎসুক দৃষ্টিতে চাইলেন গণেশ হালদার।

"এতদিনেও আমি আপনাকে আপনার লোক করতে পারিনি। পারলে এসব কথা আপনার মনে জাগত না। আমার মতো উদ্বাস্তুদের এইটেই ট্র্যাজিডি। আমরা জোর গলায় কিছু দাবি করতে পারি না, কিন্তু মনে মনে আকাঙক্ষা, আশপাশের সকলকে আপন করি। কিন্তু পারি না। দৃশ্য এবং অদৃশ্য নানারকম বাধা এসে হাজির হয়। নানা রকম সংস্কার এসে দুর্লঙঘ্য দেওয়াল খাড়া করে।

তারপর একটু থেমে বললেন, "আপনি আপনার পথে চলে সুখী হোন এইটেই চাই। কোনো বিষয়ে জোর-জবরদস্তি করা আমার স্বভাব নয়।"

গণেশ হালদার অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "আমার স্কুলের সময় হয়েছে, এবার আমি যাই।"

"আমাকেও উঠতে হবে। স্কুলেও আপনার প্যামফেট কিছু বিলি করবেন। আমাকেও খান কয়েক দিন, ল্যাবরেটরিতে রেখে দেব। শিক্ষিত রোগী এলে দেব।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

গণেশ হালদার তাড়াতাড়ি চলে গেলেন এবং এক গোছা প্যামফেট ডাক্তারবাবুর মোটরে রেখে দিলেন।

রেস-কোর্সের মাঠে পীরবাবার সমাধির চারপাশে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে সেখানে গিয়েই বসেছিলেন ডাক্তার মুখার্জি। দূর্বাঘাসে ছেয়ে গিয়েছিল জায়গাটা। প্রথমে গিয়েই তাঁর মনে হয়েছিল পুরাতন বন্ধুরা যেন ভিড় করেছে এসে। অহেতুকভাবে মনে হয়েছিল কাছে গেলেই সোল্লাসে সম্বর্ধনা জানাবে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলেন, কিছুই হল না। তিনি কাছে এলেন বলে একটুও শিহরন জাগল না দূর্বাদলের আস্তরণে। আগেও তিনি বারবার অনুভব করেছেন, সেদিনও আবার করলেন, প্রকৃতিকে আপন করা যায় না। তার কাছে যাওয়া যায়। খুব কাছে যাওয়া যায়, কিন্তু সে কখনও আপন হয় না। মাঠের ঘাস আর আকাশের মেঘ, একটা খুব কাছে, আর একটা খুব দূরে, কিন্তু দুইই সমান নাগালের বাইরে। সমান উদাসীন। কেউ অন্তরঙ্গভাবে ধরা দেয় না। এই যে আশেপাশে রোজ এত জিনিস

দেখেন, ওই যে নীলকণ্ঠ পাখিরা চতুর্দিক সচকিত করে প্রেয়সী-বন্দনা করছে— ওদের তিনি কখনও আপন করতে পারবেন না। খাঁচায় বন্ধ করেও না। ওই যে অত কাছে শালিকগুলো চরছে, তারা কি কখনও আপন হবে? দেখা হলে আপনা থেকে কাছে আসবে? কখনও না। ওদের খাবার দিয়ে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করেছেন, ওরা নাগালের বাইরে থেকে খাবারটি খেয়ে যায়, কিন্তু ধরা দেয় না। তাঁর মনে হল এই বোধহয় কবি-কল্পিত অধরা। কাছাকাছি আছে, কিন্তু ধরা যায় না। চুপ করে বসে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর পকেট থেকে খাবারের ঠোঙা বার করলেন। পাখিদের জন্য খাবার এনেছিলেন। ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিলেন। শালিকগুলো উড়ে উড়ে পালাল। তিনি একটু দূরে গিয়ে বসলেন। তিনি জানেন কাছে থাকলে ওরা আসবে না। ওদের দিকে পিছন ফিরে বসে রইলেন। একটু পরে ঘুরে দেখলেন শালিকগুলো পালিয়েছে, কাকেরা এসে খাচ্ছে খাবারগুলো। মুচকি হাসলেন একটু। কাকেরা শত্রু নয় তাঁর, কিন্তু ওদের মধ্যে তিনি বাংলা প্রবচনের ধূর্ত 'নেপো'দের যেন প্রত্যক্ষ করলেন। একটা কথা মনে হল, পক্ষীজগতে ওরা বোধ হয় রাজনীতিবিদ। বিষ্ণুশর্মার সাহিত্যে ওদের বেশ একটা বড় স্থান আছে।... হঠাৎ মনে পড়ল গণেশ হালদারের জন্য কিছু লিখতে হবে। দেখলেন রেল-লাইনের ওপারে মাঠের মধ্যে সেই পাথরটা রয়েছে এখনও। মানুষে না সরালে পাথর সরে না। পাথরটার চারদিকে গজিয়েছে সবুজ ভুট্টার ফসল। শ্যাম শোভায় পাথরের রুক্ষকান্তি প্রায় ঢেকে গেছে। সেই দিকেই গেলেন সুঠাম মুকুজ্যে। গিয়ে একটি নূতন জিনিসও দেখতে পেলেন। পাতার একটি ছোট কুঁড়েও রয়েছে ক্ষেতের মধ্যে। এক ক্ষুদে পাহারাদারও বসে আছে সেখানে। তাকে গিয়ে বললেন, "আমি এখানে বসে লিখতে চাই। কোথা বসি বলতো।"

সে তৎক্ষণাৎ তার খড়ের ছোট্ট বিছানাটি দেখিয়ে বললে— "এইখানেই বসুন না।"

"তুমি কোথা বসবে?"

"আমি এধার ওধার ঘুরব।"

"তুমি খেয়ে এসেছ?"

"না। আমার মা রোজ খাবার দিয়ে যায়। আজ মায়ের কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে। এমনিই কাটিয়ে দেব দিনটা।"

"ক্ষিধে পাবে না?"

"ক্ষিধে পেলে পেয়ারা খাব। ওই যে একটা গাছ রয়েছে—"

এক মুখ দাঁত বার করে হাসলে। গাছটা একটু দুরে ছিল। পাছে তিনি অন্য কিছু মনে করেন এই ভেবে ছেলেটি বললে—

"গাছটাও এই ক্ষেতের মালিকের। তিনি আমাকে পেয়ারা খেতে বলেছেন।"

ডাক্তারবাবু লক্ষ করলেন যদিও ছেলেটি এদেশের ভাষায় কথা বলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু কথায় পূর্ববঙ্গের টান রয়েছে। বোধহয় রেফিউজি।

ডাক্তারবাবু বললেন—"শুধু পেয়ারা খেয়েই থাকবে? তার চেয়ে এক কাজ কর না। আমি দুটো টাকা আর তোমার মায়ের জ্বরের জন্য একটা প্রেসকৃপশন লিখে দিচ্ছি। তুমি ওষুধ নিয়ে মায়ের কাছে চলে যাও। মাকে দেখে খাবার খেয়ে চলে এস। আমি ততক্ষণ তোমার ক্ষেত পাহারা দিচ্ছি।"

"ওষুধ কোথায় পাব?"

"ওষুধের দোকানে। ও, আচ্ছা দাঁড়াও—"

পকেট থেকে হুইস্‌ল বার করে বাজালেন ডাক্তারবাবু।

ছেলেটা বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়েছিল তাঁর মুখের দিকে।

ডাক্তারবাবু বললেন, "আমার মোটর আসছে। তাতে চড়ে তুমি চলে যাও। ড্রাইভার তোমাকে ওষুধ কিনে বাড়ি পৌঁছে দেবে। তারপর তোমার খাওয়া হয়ে গেলে নিয়ে আসবে।"

বেচু এসে পড়ল।

ছেলেটার মুখ দেখে মনে হল ও যেন স্বপ্ন দেখছে। বিস্ময়ে আনন্দে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল সে। তার দাঁত আর ঢাকছিল না।

"আমি যাব? ওই মোটরে।"

"হ্যাঁ, আমি বেচুকে বলে দিচ্ছি। আমার ড্রাইভারের নাম বেচু।"

ডাক্তারবাবু বেচুকে ডেকে সব বুঝিয়ে বলে দিলেন। একটা প্রেসকৃপশন আর দুটো টাকাও দিয়ে দিলেন তাকে। ছেলেটাকে নিয়ে চলে গেল বেচু।

ডাক্তারবাবু তন্ময় হয়ে লিখছিলেন ঃ

"একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি মনে হচ্ছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সিদ্ধান্তকে প্রমাণের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে আমি এখন বিহার করছি সেখানে অনুভূতিই প্রমাণ, উপলব্ধিই শেষ কথা। আপনাকে কাজ দিতে হবে বলেই এটা লিখছি, তা না হলে লিখতুম না। প্রমাণের তখনই দরকার যখন সেটা বাইরের লোকের স্বীকৃতির ছাপ চায়। এখন যা মনে হচ্ছে তাতে বাইরের লোকের স্বীকৃতির প্রয়োজনই নেই। একটু আগেই মনে ক্ষোভ জাগছিল— জীবনে কাউকে আপন করতে পারলাম না। এখন মনে হচ্ছে জীবনে কাউকে আপন করা যায় না, যদি যেত তাহলে ভগবানের সৃষ্টি এক-রঙা হয়ে যেত। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের (এমনি কি এক যমজ ভাইয়ের সঙ্গে আর এক যমজ ভাইয়েরও) কিছু-না-কিছু পার্থক্য আছে বলেই সৃষ্টি এত মনোহর, এত বিচিত্র, বিস্ময়ের আধার। আর এই পার্থক্যের জন্যই প্রত্যেকের এত স্বাতন্ত্র্য। একটা স্বাতন্ত্র্য আর একটা স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে পুরোপুরি মিলতে পারে না। তাই কেউ কারো আপনার হয় না। আপনার হতে হলে নিজের সত্তাকে অপরের সত্তার সঙ্গে পুরোপুরি মিলিয়ে দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সবার রঙে রঙ মেলাতে হবে। এইটেই আমাদের কামনা—ইংরেজিতে বলতে হয় wishful thinking ঃ কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে জীবজগতে একটা রঙ আর একটা রঙের সঙ্গে মিলতে চায় না, মিলতে পারে না। প্রত্যেকেই নিজের বৈশিষ্ট্যের দুর্গে বন্দী হয়ে আছে, সম্ভবত নিজের অজ্ঞাতসারেই। ছবির জগতে, মানুষ-চিত্রকরেরা, অনেক সময় প্রকৃতিও, একটা রঙের সঙ্গে আর একটা রঙ মেলায়। যখন সত্যি মিলে তখন দুটো রঙের একটারও অস্তিত্ব থাকে না, তৃতীয় রঙের জন্ম হয়। ছবির জগতে এসব হয়, কিন্তু প্রাণীর জগতে হতে দেখিনি। প্রাণীর জগতে স্বাতন্ত্র্যের দুর্গ দুর্ভেদ্য। হরিহর-আত্মা বলে একটা কথা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু আসলে হরির সঙ্গে হরের মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। একজন আকাশ-বিহারী গরুড়-বাহন, আর একজন হিমালয়-বিহারী ষণ্ড-বাহন। দু'জনে দু'লোকে বাস করেন। প্রাণী-জগতে কেউ কারও আপন হয় না, তার আর একটা কারণও আছে। একজন প্রাণী আর একজন প্রাণীকে খেয়ে তবে বাঁচে। বাঁচবার জন্যে জীব-হিংসা প্রত্যেক প্রাণীর মজ্জাগত স্বভাব। যাদের পরস্পরের সঙ্গে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক তারা কি পরস্পরের আপন হতে পারে? মানুষ এককালে সব জানোয়ারই খেয়ে দেখেছে, এখন হয়তো সে কাকে খাবে সেটা নির্বাচন করে ফেলেছে, কিন্তু সকলেরই

অবচেতনলোকে ভয়টা প্রচ্ছন্ন হয়ে এখনও আছে। সবাই সবাইকে প্রচ্ছন্ন শত্রু মনে করে। হয়তো গাছেরাও আমাদের শত্রু মনে করে (জানি না মস্তিষ্ক জাতীয় কোনও যন্ত্র গাছেদের মধ্যে নেপথ্যে লীন হয়ে আছে কি না)— কিন্তু তারা পালাতে পারে না, তাদের ভাষাও আমরা বুঝি না, তাই তাদের বন্ধু মনে করি। গাছেরা নিজেরা কিন্তু সর্বগ্রাসী, সকলকে খেয়ে বেঁচে থাকে তারা। মাটির শরীর যবে মাটিতে মিশায় তখনই গাছ তার থেকে আহরণ করে পুষ্ট হয়ে ওঠে। তবু ওদের শত্রু বলে মনে হয় না, কারণ ওদের এই আহরণ বা শোষণটা প্রত্যক্ষ নয়, গোপন। বাঘের হরিণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার মতো, অথবা অন্তরীক্ষ থেকে বোমা নিক্ষেপ করে শত শত লোককে হনন করার মতো বীভৎস নয়। তাই বোধ হয় গাছকে আমরা বন্ধু ভাবি। গাছ অবশ্য আমাদের অনেক উপকারও করে। গাছকেও আমরা খাই— কেটে কুঁচিয়ে সিদ্ধ করে ভেজে পুড়িয়ে— নানা রকম করে খাই। গাছেরা আপত্তি করে না, তাদের চিৎকার না আর্তনাদ আমরা শুনতে পাই না। এই কারণেই সম্ভবত অনেক নিরামিষাশী লোক নিজেদের অহিংস-পন্থী মনে করেন। বাছুরের মুখ থেকে মাতৃদুগ্ধ কেড়ে খেয়েও নিজেদের অহিংস মনে করতে বাধে না তাঁদের। কিন্তু পরমাণু-বিজ্ঞানের যেরকম দ্রুত উন্নতি হচ্ছে তাতে মনে হয় অনেক অসম্ভবই হয়তো সম্ভব হবে, হয়তো এমন এক যন্ত্র আবিষ্কৃত হবে যার সাহায্যে আমরা শত শত গাছের আর্তনাদ আর হাহাকার শুনতে পাব। উঠোনের লাউ কুমড়ো শশা-গাছের আকুল রোদন যদি কর্ণগোচর হয় কোনোদিন, তাহলে 'কিচেন গার্ডেন'কেও কশাইখানার মতো শহরের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। এখন গাছ মূক, মৌন নীরব। আমাদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করে না। বোবার শত্রু নেই বলেই আমরা গাছের বন্ধু। গাছকে বড় ভালো মনে করি, কবিতাও রচনা করি তাকে নিয়ে। কিন্তু গাছেদের একটা অদৃশ্য দিক আছে সেটা অনেকের জানা নেই। বিজ্ঞানীরাই শুধু জানে সেটা। আমাদের অধিকাংশ অসুখের কারণ যে ব্যাক্‌টিরিয়া, তারাও উদ্ভিদ্। উদ্ভিদ্-বংশের তারাই আদিম জীব, কিন্তু তারা দুর্ধর্ষ, প্রবল, আমাদের ঘোর শত্রু। এদের কথা ভাবলে, উদ্ভিদ্‌দের কি আপন লোক ভাবা যায়? কিন্তু যে কথা বলতে শুরু করেছিলাম কথায় কথায় তার থেকে অনেক দূর সরে এসেছি। আমার কথাটা ছিল, পৃথিবীতে কাউকে আপনজন করা যায় না। যতক্ষণ নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেওয়া সহজ নয়। কিন্তু অসম্ভব কি? মনে হয় অসম্ভবও নয়। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়েছেন পৃথিবীতে এমন লোকও আছেন। যে মহা-উৎস থেকে নিখিল জগতের এত বৈচিত্র্য নিত্য উৎসারিত হচ্ছে সেই উৎসের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারলেই সকলের সঙ্গে মেলা যায়, সবাইকে আপন-করা সহজ হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই মহা-উৎসটা কি? ভগবান? প্রকৃতি? এর উত্তর আমার জানা নেই। আমাদের জ্ঞানের পরিধি বহু-বিস্তৃত, তবু ওই উত্তরটুকু এখনও অজানা রয়ে গেছে। যাঁরা সবজান্তা, তাঁরা হয়তো অবজ্ঞার হাসি হাসবেন (এ হাসি হাসাটা খুবই সোজা!) কিন্তু এই কথাটা এখন প্রবলভাবে মনে হচ্ছে সেই অজানাকে জানতে পারলেই সব বিরোধের অবসান ঘটবে। সবাই তখন হয়ে যাবে আপন লোক। সিংহের সঙ্গে জেব্রার, পূর্ববঙ্গের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের, শাসিতের সঙ্গে শাসকের, বস্তুত সকলের সঙ্গে সকলের মিল হয়ে যাবে তখন। এই কথাটা এখন মনে হচ্ছে, পরে হয়তো আবার অন্য রকম মনে হবে। মনের তো কোনও মতিস্থির নেই, যখন যেটা পায় তখন সেটাকে সত্য বলে আঁকড়ে ধরে। ধ্রুবলোক থেকে অনেক দূরে আছি তো!...”

ডাক্তারবাবু আরও হয়তো লিখতেন খানিকটা। বসে বসে ভাবছিলেন। এইটুকু লিখতেই তাঁর এক ঘণ্টার বেশি লেগে গিয়েছিল, টের পাননি। মোটরটা ফিরতেই ঘড়িটা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। আরও অবাক হলেন মোটরে সেই ছেলেটার সঙ্গে ঝিনুককে দেখে।

ঝিনুক নেমে এসে প্রণাম করল।

"তুমি কি করে এলে!"

"আপনার গাড়ি যখন গেল তখন আমি মনুদের বাড়িতে ছিলাম। মনুর মায়ের অসুখ শুনে দেখতে গিয়েছিলাম তাঁকে। ওঁরা আমাদের দেশেরই লোক তো। প্রায়ই আমি যাই ওঁদের বাড়ি।"

"ও, এর নামই বুঝি মনু।"

"হ্যাঁ, ওরা সদ্‌ব্রাহ্মণ। ওর বাবা পুরোহিত ছিলেন। রায়টের সময় মুসলমানেরা ওঁকে কেটে ফেলে। ওর মা এখানে এসে গভর্নমেন্টের দাক্ষিণ্যপ্রার্থী হয়ে আছেন। মিস্টার সেনের দয়ায় একখানা থাকবার ঘর পেয়েছেন।"

ঝিনুক চুপ করল।

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনিয়ে এল। তারপর সসঙ্কোচে ঝিনুক বলল, "একটা কথা যদি বলি রাগ করবেন না তো।"

"কি কথা?"

"মনুর মা আপনার টাকা আর প্রেশকৃপশন ফেরত পাঠিয়েছেন। ডাক্তার ঘোষাল তাঁকে সকালেই ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাই—"

ঝিনুক সসঙ্কোচে টাকা দুটো আর প্রেসকৃপশনটা রেখে দিলে ডাক্তার মুখার্জির সামনে।

"ও, ডাক্তার ঘোষাল ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন বুঝি। তা বেশ।"

হাসবার চেষ্টা করলেন ডাক্তার মুখার্জি।

"টাকা দুটো ফেরত দিচ্ছ কেন? ও টাকা তো মনুকে দিয়েছি।"

"না, মনু টাকা নেবে না। বাঙালী রেফিউজিদের বদনাম রটেছে তারা নাকি ভিখারী। তাই আমাদের চেনা-শোনা কাউকে আমরা ভিক্ষা করতে দিই না। সবাইকে রোজগার করেই খেতে হবে। ডাক্তার ঘোষাল ওকে এই ক্ষেত পাহারার কাজটা জুটিয়ে দিয়েছেন। ও ভিক্ষে নেবে কেন?"

এ শুনে ডাক্তার মুখার্জির মুখভাব যা হল তা অবর্ণনীয়। তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। চুপ করে রইলেন। তাঁর মুখের অপ্রস্তুত ভাব দেখে ঝিনুকেরও কষ্ট হল। এমন একটা ভালো লোকের মনে আঘাত করে অনুতপ্ত হল সে মনে মনে। তিনি যে এতটা আঘাত পাবেন সে ভাবেনি। তাছাড়া, শুধু টাকা ফিরিয়ে দিতেই সে আসেনি। ডাক্তার মুখার্জির কাছে তার আর একটা দরকারও ছিল। আইন-সঙ্গতভাবে আজকাল বিলাত যাওয়ার পথ বহু-কন্টকাকীর্ণ। কর্তৃপক্ষ সহজে অনুমতি দিতে চান না। ঝিনুক খবর পেয়েছিল দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য বা এ-দেশে অলভ্য উচ্চশিক্ষা লাভ করবার জন্য আবেদন নাকি সহজে মঞ্জুর হয়। দুরারোগ্য অসুখের জন্য একজন বড় ডাক্তারের সার্টিফিকেট প্রয়োজন। ডাক্তার মুখার্জি কি তাকে একখানা সার্টিফিকেট দিতে পারেন না? ঝিনুক শুনেছে তাঁর বড় বিলাতী ডিগ্রী আছে। কর্তৃপক্ষদের কাছে এখনও বিলাতী ডিগ্রীর কদর অনেক বেশি। সাব-অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন ডাক্তার ঘোষাল সেখানে কল্‌কে পাবেন না।

সুমিষ্ট হেসে ঝিনুক বলল, "আপনি রাগ করলেন না তো? কারো কাছ থেকে ভিক্ষা নেওয়া কি ভালো? এমনি তো আমরা চরম দুর্দশায় পড়েছি, অনেক বদনাম রটেছে আমাদের নামে, অনেক বদনাম সত্ত্বেও তাই আমরা একটা নীতির আদর্শ খাড়া করেছি। আপনি তাতে সাহায্য করুন।"

ডাক্তার মুখার্জি হেসে বললেন, "আমি তো ঠিক ভিক্ষে দিইনি। মানে, আমি ওই ছেলেটির ঘরটা দখল করে এসে বসলাম কি না—তাই মানে—"

নিজেকে ঠিক প্রকাশ করতে না পেরে আবার থেমে গেলেন ডাক্তার মুখার্জি। তারপর হঠাৎ একটু জোর করে হেসে বললেন, "না, আমি রাগ করিনি, কিছু মনেও করিনি।"

হাসির আভায় ঝলমল করতে লাগল ঝিনুকের দৃষ্টি। তারপর চোখ নামিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, "আমি জানতুম আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনাদের মতো উদার লোকই তো আমাদের ভরসা"—তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল কথাটা—"আপনি কিন্তু আমার একটা সত্যিকারের উপকার করতে পারেন। করবেন?"

"কি বল।"

কতকগুলো মিথ্যে কথা বলে গেল ঝিনুক।

"আমার একটা চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছি না। ডাক্তার ঘোষালের চিকিৎসায় কিছু হয়নি। উনি বলছেন জর্মনীতে নাকি এ ব্যায়রামের চিকিৎসা হয়। আমি যাবার টাকা জোগাড় করেছি। কিন্তু পাসপোর্ট পেতে হলে একজন বড় ডাক্তারের সার্টিফিকেট চাই। ডাক্তার ঘোষালের সার্টিফিকেটে কাজ হবে না। ইচ্ছা আছে ডাক্তার ঘোষালকেও নিয়ে যাব, সঙ্গী হিসেবে। আপনি একটা সার্টিফিকেট দেবেন?"

"আমি কি বড় ডাক্তার? না তো।"

ব্যঙ্গের মৃদু হাসি ফুটে উঠল ডাক্তার মুখার্জির মুখে।

"আপনার চেয়ে বড় ডাক্তার এ শহরে আর কে আছে! আপনার কত বিলাতী ডিগ্রী।"

চুপ করে রইলেন ডাক্তার মুখার্জি।

তারপর বললেন, "ডিগ্রী থাকলেই সরকারের দপ্তরে সেটা গ্রাহ্য হবে?"

"শুনেছি, হবে। আপনার ডিগ্রী তো লন্ডনের?"

"হ্যাঁ।"

তারপর ইতস্তত করে চুপ করে গেলেন। চোখের সম্বন্ধেই তাঁর বার্লিনেরও যে একটা বড় ডিগ্রী আছে একথা আর বললেন না।

"দেবেন একটা সার্টিফিকেট?"

"সেটা চোখে না দেখে বলতে পারছি না। এস একদিন আমার ক্লিনিকে। চোখটা আগে দেখি।"

"আমি কলকাতায় একজন বড় ডাক্তারকে দেখিয়েছিলাম, তিনি কোনও দোষ দেখতে পাননি। আমি কিন্তু বাঁ-চোখে ক্রমশই বেশি ঝাপসাই দেখছি।"

বলা বাহুল্য, কথাটা নির্জলা মিথ্যে। ঝিনুকের চোখের দৃষ্টি এত ভালো যে রাতের অন্ধকারেও সে বেশ দেখতে পায়।

ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "আচ্ছা, তুমি আমার ক্লিনিকে একদিন সন্ধ্যার পর এসো। আমি ভালো করে দেখব।"

বেচু মৃদুকণ্ঠে বলল, "গাড়িটা কি এখানেই থাকবে? না সরিয়ে রেখে দেব?"

"না, চল এবার যাই।"

তারপর ঝিনুকের দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি কোথা যাবে এখন—"

"বাড়ি যাব।"

"কোথায় তোমার বাড়ি? চল, আমি পৌঁছে দি—"

"ডাক্তার ঘোষালের বাড়ির কাছেই আমার বাড়ি। আপনার অসুবিধা হবে না তো।"

"না, না, কিছুমাত্র না। চল তোমাকে নাবিয়ে দি। রাস্তাতেই তো পড়বে।"

"চলুন।"

।। পঁচিশ ।।

কাউ যে পল্লীতে আড্ডা গেড়েছিল তা ভদ্রপল্লী নয়, তার ঠিকানাও ভদ্র রাস্তার ঠিকানা নয়। বড় রাস্তা থেকে গলির গলি তস্য গলি পার হয়ে সেখানে পৌঁছতে হয়। ছোটলোকদের বস্তি। এক-একটা খোলার ঘরে চার-পাঁচটা করে পরিবার বাস করে সেখানে একটা উঠোনকে কেন্দ্র করে। এখানে ভিড় করেছে সমাজের অতিনিম্নস্তরের লোকেরা। এদের দেখলে মনে হয় আমরা যে সভ্যতার গর্ব করি তা নিতান্তই ভুয়ো, অসার, অর্থহীন। যে সভ্যতা একদল নরনারীকে পঙ্ককুণ্ডে ঠেলে দিয়ে তাদের অস্তিত্ব সহ্য করতে পারে তা সভ্যতা নয়, তা ভয়ঙ্কর স্বার্থপরতা। এখানে কত রকম লোকই যে আছে! চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত যে মানুষ এমন হতে পারে। নুলো, খোঁড়া, অন্ধ, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত একদল ভিখারী তো এখানে থাকেই, আরও থাকে অনেক রকম লোক। তাড়কা রাক্ষসীর মতো মেয়ে আছে, নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা সুশ্রী মুখেরও অভাব নেই, মূর্তিমান শয়তানের মতো একদল গুণ্ডারও আড্ডা এখানে। কারও মুখ কুড়ুলের মতো, কারও মুখ ঘোড়ার মতো, কারও বা ঢালের মতো। প্রেতের মতো জরাজীর্ণ রোগীও এখানে কম নয়। কারো হাঁপানি. কারও যক্ষ্মা, কারও উদরাময়। প্রত্যেক ঘরে কিলবিল করছে শিশুর দল। মানুষ নয়, যেন পোকা। কেউ জারজ, কারো মা আছে বাপ নেই, কারও বাপ আছে মা নেই, কারো বা কেউ নেই। বেঁচে আছে সকলের দাক্ষিণ্যে। বেঁচে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। শুধু রোগের নির্যাতন নয়, মানুষের হাতেও নির্যাতন। চড়-চাপড়, ঝাঁটা-লাথি, ছোট ছেলেদেরও মারছে সবাই নিষ্ঠুরভাবে। পশুকেও লোকে বোধ হয় অত মারে না। সর্বদাই আর্তরোল চারিদিকে। সব বয়সের লোক আছে এখানে। কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, নানা চেহারার, নানা আকারের। সবারই মুখে একটা হিংস্র ভাব। ভোরে বেরিয়ে যায় সবাই রোজগারের চেষ্টায়। কেউ মুটে, কেউ গাড়োয়ান, কেউ কশাই, কেউ গুণ্ডা, কেউ চোর, কেউ দোকানদার, কেউ পকেটমার, কেউ ফিরিওলা, কেউ রিক্শা টানে, কেউ ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। মোটর ড্রাইভারও আছে। মেয়েরাও কাজ করে নানারকম। অধিকাংশই ঠিকে ঝি। বেশ্যাবৃত্তিও করে কেউ কেউ। এদেরই কারো কারো জন্য ঘোড়ার গাড়ি, এমন কি মোটর-গাড়িও দাঁড়ায় বড় রাস্তায় গভীর রাত্রে। কোনো কোনো যুবতী মেয়ে সেজেগুজে গিয়ে ওঠে তাতে। ভোরবেলা ফিরে আসে টাকা রোজগার করে। এসব নিয়ে অনেক মন কষাকষি, হিংসা-দ্বেষ, এমন কি খুন-জখম পর্যন্ত হয়। পুলিশ আসে, নির্যাতন করে কিছু লোককে, হৈ হৈ পড়ে যায়, আবার থেমে যায় সব। আবার

যেমন চলছিল তেমনি চলতে থাকে। মানব-সমাজের মরা-আধমরা বিগলিত বিকৃত অংশ নিয়ে এই সমাজ। কিন্তু আশ্চর্যরকম সজীব এরা। মরেও মরতে চায় না। অদ্ভুত জীবনীশক্তি। গাছপালা মরে গিয়ে যেমন সার হয়, আর সেই সার থেকে যেমন প্রাণপ্রাচুর্যে জীবন্ত নতুন গাছপালা আবার জন্মগ্রহণ করে, এদের অবস্থাও অনেকটা তেমনি। মৃত্যু আর জীবন এখানে পাশাপাশি বাস করছে। এই সমাজের গুণ্ডা আর যুবতী মেয়েদের স্বাস্থ্য দেখলে অবাক হতে হয়, ভাবাই যায় না যে ওদের চারিপাশে প্রত্যক্ষ মৃত্যু করাল ছায়া বিস্তার করে ওৎ পেতে বসে আছে। জীবন-মৃত্যুর নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব অহরহ চলছে এই সমাজে। এরা জীবনের উচ্চ-আদর্শের কথা শুনেছে কিন্তু এদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করছে বাঁচবার আগ্রহ। যেমন করে হোক বাঁচতে হবে।

কাউ এই বস্তিতে এসে হোটেল খুলেছিল। তার মাও ছিল এই বস্তিরই মেয়ে। যৌবনে কলকাতায় গিয়ে ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে পরিচয় হয় তার। এখানকার অনেকেই কাউ-এর চেনা। সে যখন এখানে ফিরে এল তখন সকলের আন্তরিক সম্বর্ধনা তো পেলোই, বন্ধুও পেয়ে গেল কয়েকজন। ভান্‌না, বিঠু, কাটরা, রমেশ, ঝাবরা এবং আরও অনেকে সোৎসাহে ডেকে নিল তাকে নিজেদের মধ্যে। এরা কেউ কোচোয়ান, কেউ ফেরিওলা, কেউ ফ্যাক্টরির কুলি, কেউ ট্রাক চালায়, কেউ বা আর কিছু, কিন্তু সকলেই আসলে গুণ্ডা। সুবিধা পেলেই বে-পরোয়া লুঠতরাজ করে। জনশ্রুতি, রমেশ, কাটরা আর ঝাবরা প্রত্যেকে নাকি খুনও করেছে। এই রমেশকে যতীশবাবু দেখে গিয়েছিলেন। এদেরই সাহচর্যে বাস করছিল কাউ। এদের সঙ্গে সে গোপনে গোপনে একটা চক্রান্তও করছিল। যতীশবাবু কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাউয়ের সঙ্গে থাকতে পারেননি। যে পরিবেশে কাউ অভ্যস্ত, সে পরিবেশ তিনি সহ্য করতে পারলেন না। এদের দেখে তাঁর ভয় করছিল। দম আটকে আসছিল যেন। তিনি তার পরদিনই চলে এলেন নিজের বাসায়। সেখানে রাঁধুনী ছিল। রাঁধুনীর কাছে যে ঝিনুক বাজারের পয়সা দিয়ে গেছে যতীশবাবু তা জানতেন। তাঁর মনে হল, কেবল খাওয়া-দাওয়ার জন্যে কাউয়ের ওই নরক-কুণ্ডে পড়ে থাকার কোনও মানে হয় না। তিনি কিছু টাকার চেষ্টায় বেরিয়েছিলেন, সে চেষ্টা যখন সফল হল না তখন অন্য উপায়ে আবার চেষ্টা করতে হবে। হাল ছেড়ে দিলে চলবে না, হাল ছেড়ে দেবার লোক তিনি নন। এবং সে চেষ্টা ঝিনুকের বাসায় থেকেই করতে হবে। ঝিনুকের হাতে যে টাকা আছে এ বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছিল। ঝিনুকের চালচলন যেন রাজরানীর মতো, যখন খুশি কলকাতায় চলে যাচ্ছে। টাকা না থাকলে এসব পারে কেউ? কলকাতা যাবার আগে রাঁধুনীর হাতে সে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে গিয়েছিল বাজার খরচের জন্য, তাঁকেও হাতখরচের জন্য দশ টাকা দিয়ে গিয়েছিল। কলকাতায় গেলে নিশ্চয়ই টাকা বেশ খরচ হয়, সেখানে প্রতি পদক্ষেপেই তো খরচ! এখানে চায়ের দোকানের সব ধার শোধ করে দিয়েছে! এতো টাকা ও পাচ্ছে কোথায়। টাকা নিশ্চয় আছে ওর হাতে। ওর কাছ থেকে দূরে সরে থাকলে সে টাকা পাওয়ার আশা থাকবে না। শামুকটা তো নাগালের বাইরে চলে গেল। মিস্টার সেনের কাছ থেকে ও অনেক টাকা কামিয়েছে নিশ্চয়। এমন অকৃতজ্ঞ নিমকহারাম মেয়ে, তাঁকে একটি পয়সাও দিয়ে গেল না। তিনি কি তার কাকা নন? তিনি কি ছেলেবেলায় তাকে কোলে করেননি। বাচ্‌ খেলা দেখতে নিয়ে যাননি? গ্রামে গণেশ অপেরার যাত্রা হচ্ছিল যেবার, দাদা শামুককে যেতে দিতে চাননি। ঝিনুক কলকাতায় ছিল। দাদা ঘুমোবার পর তিনিই কি লুকিয়ে শামুককে যাত্রা দেখিয়ে আনেননি? কি করে মানুষ সব ভুলে যায়, আশ্চর্য?

ওরা হাজার হাজার টাকা রোজগার করছে অথচ তাঁকে দেশে ফেরবার মতো টাকাটা দেবে না! কিছু টাকা পেলে এখন সেখানে মাছের ফলাও ব্যবসা করতে পারেন তিনি। অনেক মুসলমান জেলে এখনও তাঁকে খাতির করে। চিঠিও লিখেছে। এই ঘটিদের দেশে পড়ে থেকে কি হবে? এখানে কি মানুষ থাকতে পারে? ঝিনুক শামুক কি মানুষের জীবনযাপন করছে? পশুদের সংস্রবে এসে ওরাও পশু হয়েছে। ওই কু-চক্রী মতলববাজ ডাক্তার ঘোষালের পাল্লায় পড়ে ব্যভিচারিণীর জীবনযাপন করছে এরা। ব্যভিচারই যদি করতে হয় তা হলে দেশেই তো করা যেতে পারত। তার জন্যে পদ্মার এপারে আসবার দরকারটা কি?

এ ধরনের নানা চিন্তাজালে আচ্ছন্ন হয়ে যতীশ বাড়ি ফিরলেন।

ফিরে দেখলেন, বারান্দায় ঝিনুক দাঁড়িয়ে আছে।

"তুমি কোথা গিয়েছিলে, কাকা? আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান চারদিকে! ও কি, তোমার মাথায় কি হল?"

"তোমার বাবু মেরেছে।"

"আমার বাবু! আমার বাবু আবার কে!"

"বাবু না বল, কর্তা বল, মালিক বল, যা খুশি বল— ওই ডাক্তার ঘোষাল—"

হু হু করে কেঁদে ফেললেন যতীশবাবু। কান্নার অভিনয় চমৎকার হল।

"তাই নাকি? তুমি ডাক্তার ঘোষালের কাছে গিয়েছিলে কেন?"

"তুমি চলে গেলে, শামুক চলে গেল, আমি কাকে নিয়ে থাকব! এ দেশে থাকতে আমার ভালো লাগছে না। আমি দেশে ফিরে যেতে চাই, সেই কথাই ওঁকে বলতে গিয়েছিলাম—"

যতীশবাবু এলোপাতাড়ি মিথ্যে কথা বলেন। যখন বলেন তখন হুঁশ থাকে না, মিথ্যে কথাটা অচিরেই ধরা পড়ে যাবে। সামনের বিপদটা কাটিয়ে উঠতে পারলেই তিনি সন্তুষ্ট। মিথ্যে কথা ধরা পড়ে গিয়ে নতুন বিপদ সৃষ্টি হয় তখন দেখা যাবে— এই তাঁর মনোভাব। ঝিনুক কিন্তু সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়।

"এই কথা বলতে ডাক্তার ঘোষাল তোমাকে মারলেন?"

"হ্যাঁ। আমি কি মিছে কথা বলছি? উনি মানুষ নন, মহিষ। তুমি যে কি দেখেছ ওঁর মধ্যে তা তুমিই জান।"

"তুমি এসব কথা ওঁকে বলতেই বা গিয়েছিলে কেন! তুমি নিতান্তই যদি এখানে থাকতে না চাও, দেশে ফিরে যাও। ভিসাপাসপোর্টের ব্যবস্থা আমি করে দেব। ডাক্তার ঘোষালকে বলতে গেলে কেন, উনি কি করবেন?"

"ওঁর কথাতেই আমরা এ দেশে এসেছিলাম ওঁকে বলব না তো কাকে বলব!"

"ওঁর কথাতে আমরা এদেশে আসিনি। আমরা প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছিলাম, উনি সাহায্য করেছিলেন মাত্র। যাই হোক, তুমি ওঁকে আর এ বিষয়ে কিছু বলতে যেও না। দেশে ফেরবার ব্যবস্থা আমিই করতে পারব। ডাক্তার ঘোষালের কাছে যাবার দরকার নেই।"

"দেশে কিন্তু আমি খালি হাতে ফিরতে পারব না। সেখানে গিয়ে আমি মাছের ব্যবসা করব, আবার ঘর বাঁধব।"

"বেশ, তাই হবে। আমি ডাক্তার ঘোষালের কাছে যাচ্ছি। এখানে রান্না হয়ে গেছে, তুমি স্নান করে খেয়ে নাও। কোথা ছিলে তুমি?"

কাউ তাঁকে মানা করে দিয়েছিল, তার ঠিকানাটা ঝিনুককে যেন জানানো না হয়।

যতীশবাবু বললেন, "কোথায় আবার যাব! রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিলাম।"

"বেশ, এখন স্নান করে খেয়ে বিশ্রাম কর। আমি চললাম।"

ঝিনুকের প্রস্থানপথের দিকে চেয়ে যতীশবাবু বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। ঝিনুক তাঁর দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে, এ সংবাদ পেয়ে কি তিনি পুলকিত হলেন? তাঁর মুখ দেখে কিন্তু মনে হল না। বরং মনে হল, রেসে হেরে গিয়ে তিনি যেন সর্বস্বান্ত হয়েছেন।

ঝিনুক যখন ডাক্তার ঘোষালের বাড়ি পৌঁছল তখন ডাক্তার ঘোষাল খাওয়া-দাওয়া সেরে বাইরে বেরুচ্ছেন। কাউ-এর জায়গায় হরসুন্দরই কাজ করছিল। লোকটি ভালো। উপকৃত বলে কাজকর্ম আরও নিখুঁত। ফাঁকি দেবার চেষ্টা কোথাও নেই। ঝিনুক ডাক্তার ঘোষালের প্রাতরাশের ব্যবস্থা করে দিয়ে এক ফাঁকে বাড়ি গিয়েছিল যতীশবাবু ফিরেছেন কিনা দেখবার জন্য। তাঁর সহসা অন্তর্ধানে সত্যিই সে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। তাঁর কপালের কাটা দাগটা চাবুকের মতো আঘাত করেছিল তাকে। তার কাকার অনেক দোষ আছে সে জানে। তার কাকা অবুঝ, লোভী, ভীতু, স্বার্থপর— সবই ঠিক। কিন্তু এও ঠিক যে তিনি বড় বংশের ছেলে, সারা জীবন সসম্মানে সুখে জীবন কাটিয়েছেন দেশে। রাজনৈতিক পাশা খেলার চক্রান্তেই আজ তিনি বিতাড়িত, অবহেলিত, অপমানিত। আজ ডাক্তার ঘোষাল মেরে তাঁর কপাল ফাটিয়ে দিয়েছেন! দুরদৃষ্টের ঝড়ে যে লোকটা মুখ থুবড়ে মাটির উপর পড়ে গেছে, তারও মুখের উপর পদাঘাত! ঝিনুকের সর্বাঙ্গ রি রি করছিল।

বেরুবার মুখেই ঝিনুককে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন ডাক্তার ঘোষাল। বললেন, "আজ খানিকটা ভেড়ার মাংস দিয়ে গেছে রসুল। তুমি নিজে রান্না করো ওটা। হরসুন্দরের হাতে পড়লে ভেড়া কাঁচকলা হয়ে যাবে।"

"বেশ রাঁধব। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।"

ঝিনুকের ভাব-ভঙ্গি দেখে ঘোষাল বুঝলেন গতিক সুবিধার নয়। কিছু একটা হয়েছে।

"কর।"

"বাড়ি গিয়ে দেখলাম, কাকা ফিরেছেন। তাঁর কপালে একটা ঘা দগদগ করছে। কাকা বললেন আপনি তাঁকে মেরেছেন। সত্যি?"

"সত্যি। মেরেছি, কিন্তু কম মেরেছি। আরও মারা উচিত ছিল।"

"কেন? তাঁর অপরাধ?"

"তিনি একঘর রুগীর সামনে বলেছিলেন, আমি তোমাকে মাথার মণি করে রেখেছি, সুতরাং তাঁকে টাকা দিতে হবে। এর উত্তরে আমি তাঁকে মাত্র একটি চড় মেরেছি। আরও মারা উচিত ছিল।"

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঝিনুক।

তারপর বলল, "একটা কথা ভুলে যাবেন না, উনি এ দেশে বড় কষ্টেই আছেন। ওঁর মাথার ঠিক নেই। তা ছাড়া এটাও তো ঠিক, উনি যা বলেছেন নিতান্ত মিছে কথাও নয়। ভিতরে যাই থাক, বাইরে সবাই জানে আমিই আপনার বাড়ির কর্ত্রী। যাক সে কথা, উনি দেশে ফিরে যেতে চাইছেন সেই ব্যবস্থা করে দিন তা হলে।"

"দেব। মিস্টার সেনকে বলতে হবে। এখন চলি।"

বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার ঘোষাল। ঝিনুক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

।। ছাব্বিশ ।।

ডাক্তার ঘোষাল একটা দূরের কলে বেরিয়ে গেছেন রাত্রেই। কখন ফিরবেন স্থিরতা নেই। ঝিনুক ভাবল, এই ফাঁকে ডাক্তার মুখার্জির ক্লিনিকে গিয়ে চোখটা পরীক্ষা করানো যাক। তার চোখে যে কিছু হয়নি তা সে ভালো করেই জানে, তবু সে ভাবছিল, যদি ফাঁকি দিয়ে একটা সার্টিফিকেট আদায় করা যায়। সবাই বিলেত চলে গেছে, এইবার তাকে যেতে হবে। সুবেদার খাঁর চেনা ক্যাপ্টেন সাহেব বলে দিয়েছেন, লুকিয়ে-চুরিয়ে আর নিয়ে যাওয়া চলবে না। চারিদিকে বড়ই কড়াকড়ি। সুতরাং আইন-সম্মত উপায়ে পাসপোর্ট একটা জোগাড় করতেই হবে। এজন্যে যদি দুটো মিছে কথা বলতে হয়, তাও সে বলতে পিছপা নয়। এজন্যে তার অন্তরে বা বিবেকে বিন্দুমাত্র গ্লানি নেই। সে জানে, এসব পুজোর এই মন্ত্র।

একটা রিক্‌শায় চড়ে গেল সে ডাক্তার মুখার্জির ক্লিনিকে।

ডাক্তার মুখার্জি একটা রোগী দেখছিলেন তখন। ঝিনুককে দেখে বললেন, "ও, তুমি এসেছ! পাশের ঘরটায় গিয়ে বসো। আমি এই কেসটা শেষ করে তোমার চোখ দেখব।"

তারপর তাঁর ড্রাইভার বেচুকে ডেকে বললেন, "হাসপাতাল থেকে একজন নার্সকে ডেকে নিয়ে এস তো। এই চিঠিটা নিয়ে যাও।"

হাসপাতালের ডাক্তারের নামে একটা চিঠি দিয়ে দিলেন। বেচু গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

মেয়েদের বসবার যে ঘরটায় ঝিনুক গিয়ে ঢুকল সেখানে আর কেউ ছিল না। কয়েকটা মাসিকপত্র ছিল টেবিলের উপর। সেইগুলোই ওল্টাতে লাগল সে বসে বসে। হঠাৎ তার কানে গেল, ডাক্তারবাবু তাঁর রোগীটিকে বলছেন, "আপনাকে যে পথ্য লিখে দিলাম, তাই আগে মাসখানেক খেয়ে দেখুন। তাতে যদি উপকার না হয় তা হলে এই ওষুধগুলো কিনবেন। আমার মনে হয়, খাদ্যাভাবেই আপনার শরীরটা খারাপ হচ্ছে।"

"আমি তো মাছ মাংস ঘি দুধ প্রচুর খাই।"

"ফলও খেতে হবে।"

"বেদানা, পেস্তা, কিশমিশ— এইসব?"

"না। শশা, কলা, বেল, লেবু, তরমুজ, পেয়ারা— এইসব। আমি সব লিখে দিয়েছি—"

"ওষুধ এখন কিছুই খাব না?"

লোকটা যেন বুঝেও বুঝতে চাইছে না, ঝিনুকের মনে হল।

"না। যেসব খাবার লিখে দিলাম তা খেয়ে যদি ফল না হয় তা হলে ওষুধ খাবেন— এক মাস পরেই।"

"ও, আচ্ছা—"

লোকটা যেন অনিচ্ছাভরে উঠে গেল

"তুমি এবার এই ঘরে এস।"

ঝিনুক ওঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই বললেন, "একটু বসো। নার্সটা এসে পড়লেই তোমার চোখটা দেখব।"

"নার্স কেন?"

"ওটা আমাদের এটিকেট। রক্ষা কবচও বলতে পার। কোনো স্ত্রীলোককে নির্জনে একা পরীক্ষা করা আমাদের শাস্ত্রে মানা। বিশেষত তোমার চোখটা ডার্ক রুমে নিয়ে গিয়ে দেখতে হবে ভালো করে।"

কথাটা খুবই সঙ্গত। কিন্তু তবু এতে যেন ঝিনুকের মনে ঘা লাগল একটু। তার নিজের আত্মসম্মান সে নিজে বাঁচাতে পারবে না? তার জন্যে একজন ভাড়া-করা নার্স চাই!

ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে, "আপনাদের শাস্ত্র আমাদের এত ঠুনকো মনে করে?"

"হয়তো আমাদেরই ঠুনকো মনে করে। তাছাড়া অনেক মেয়েরোগী নানারকম দুরভিসন্ধি নিয়ে অনেক সময় আসে আমাদের কাছে। তাদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেও এই ব্যবস্থার প্রয়োজন। তুমি ততক্ষণ এক কাজ কর না। এখানে বসে বসেই ওই দেয়ালের টাঙানো অক্ষরগুলো পড়বার চেষ্টা কর।"

ঝিনুক সবগুলোই পড়তে পারছিল। কিন্তু খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সে বলল, "তৃতীয় লাইন পর্যন্ত বেশ পড়তে পারছি, তারপর সব ঝাপসা।"

ডাক্তারবাবু তাঁর ব্যাগ খুলে দু ফোঁটা ওষুধ দিয়ে দিলেন ঝিনুকের চোখে।

"একটু পরে আবার দেখব। ততক্ষণে নার্সটাও এসে পড়বে—"

একটু ইতস্তত করে ঝিনুক অবশেষে বলেই ফেললে কথাটা— "আপনার ফি কত?"

"আমি ষোল টাকা নি। তোমার কাছ থেকে নেব না কিছু।"

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনিয়ে এল। ঝিনুক মাথা হেঁট করে বললে, "সেদিন তো আপনাকে বলেছি, কারও কাছ থেকে ভিক্ষা নেব না এইটে আমার নীতি।"

ডাক্তার মুখার্জি হেসে বললেন, "তোমাদের যেমন নীতি আছে, আমারও তেমনি নীতি আছে একটা। আমি সবাইয়ের কাছ থেকে ফি নেই না। কার কাছে নেব, কার কাছে নেব না. সেটা আমিই ঠিক করি। আমার এ অধিকারে আজ পর্যন্ত কাউকে হস্তক্ষেপ কবতে দিইনি, তোমাকেও দেব না। ফি না নিলে তুমি যদি চোখ পরীক্ষা করাতে না চাও তা হলে অন্য ডাক্তারের কাছে যাও। এখানে ডাক্তার মিত্র ভালো চোখের ডাক্তার। সেখানে যেতে পার।"

ঝিনুকের চোখের অসুখ হয়নি, তার দরকার একখানা সার্টিফিকেট। ডাক্তার মুখার্জির বিলাতী এবং জার্মান ডিগ্রী আছে, সুতরাং গভর্নমেন্টের দপ্তরে যে তাঁর সার্টিফিকেটটি বেশি জোরাল হবে এ কথা ঝিনুকের অবিদিত নেই। কথাটা শুনে সে একটু মুশকিলে পড়ে গেল। একটু ইতস্তত করে বলল, "আপনার এতটা সময় নষ্ট হবে, আপনি যদি ফি না নেন—"

ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "চলতি ভাষায় যাকে সময় নষ্ট করা বলে, তাই করেই আমি বেশি আনন্দ পাই। মাঠে-ঘাটে গিয়ে বসে থাকি, সেখানে তো ফি পাই না। আমার একটা 'থিয়রি' আছে, সময় নষ্ট হয় না, সব জিনিসের মতো তারও রূপ-রূপান্তর আছে। জল জমে বরফ হয়, বর্তমান রূপান্তরিত হয় অতীতে, স্মৃতিতে; নষ্ট হয় না। বর্তমানকে যদি নির্দোষ আনন্দে উপভোগ করা যায় তা হলে স্মৃতির রূপান্তরে তা অপরূপ হয়ে ওঠে। নষ্ট হয় না।"

"তা হলে কারো কাছেই ফি না নিলে পারেন।"

"সব রোগী সমান হয় না। অনেকের আত্মসম্মান খুব প্রবল। তোমার যেমন। অনেকে ফি ফাঁকি দিতে চায়, তাদের কাছে আমি শাইলক। আবার এমন অনেক রোগী আছে যাদের কাছে

ফি নিতে বিবেকে বাধে। তাদের কাছে নিই না। আবার এমন অনেক রোগী আছে বিনা ফি-য়ে যাদের চিকিৎসা করলে আনন্দ পাই, তাদের কাছ থেকেও নিই না। আমার নিজের মনের মধ্যে একটা মাপকাঠি আছে তাই দিয়ে ওটা আমি ঠিক করি।"

"আমাকে কোন্ পর্যায়ে ফেললেন?"

হেসে জিজ্ঞেস করলে ঝিনুক।

"তা আর না-ই শুনলে।"

"কিছুতেই ফি নেবেন না?"

ডাক্তার মুখার্জি মাথা নেড়ে হাসিমুখে চেয়ে রইলেন।

"এ অন্যায়। আমি বউদিকে গিয়ে দিয়ে আসব। বউদির সঙ্গে একদিন আলাপ করবার ইচ্ছে আছে। কখন গেলে সুবিধা হয় বলুন তো।"

"সে কারও সঙ্গে দেখা করতে চায় না।"

"ও মা, কেন!"

"তার মনে একটা অদ্ভুত কম্‌প্লেক্স হয়েছে। জটিল একটা মনস্তত্ত্বের প্যাঁচে পড়েছে সে।"

"তাই নাকি।"

"হ্যাঁ।"

"কি করেন?"

"পুজোর ঘরে খিল দিয়ে অধিকাংশ সময় বসে থাকে।"

ঝিনুক ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। ব্যাপারটার ভিতরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করল।

"রান্নাবান্না করেন না?"

"তা রোজই করে দু-একটা তরকারি। কিন্তু সর্বদাই কেমন যেন বিমর্ষ, অন্যমনস্ক হয়ে থাকে।"

"এর কোনো চিকিৎসা করছেন না কেন?"

"আমার বিশ্বাস, চিকিৎসা করতে গেলে আরও খারাপ হবে। মনে হয়, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি অপেক্ষা করছি—"

শেষের কথাটা বড় করুণ ঠেকল ঝিনুকের কাছে। ঝিনুক কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হল না। হাসপাতাল থেকে নার্সকে নিয়ে বেচু ফিরে এল।

একটু পরে ঝিনুকের চোখ পরীক্ষা করে ডার্ক রুম থেকে ডাক্তার মুখার্জি বেরুলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। নার্সটি চলে গেল। ঝিনুক তাঁর সামনে এসে বসল চেয়ারে।

"কি দেখলেন?"

"কোনো দোষ তো দেখতে পেলাম না। এতো ভালো নর্মাল চোখ বহুকাল দেখিনি।"

"তাহলে আমি ঝাপসা দেখছি কেন?"

"ঝাপসা দেখা তো উচিত নয়। তবে দুটা কারণ হতে পারে যার জন্য ঝাপসা দেখছ। একটা কারণ হতে পারে হিস্টিরিয়া গোছের কোনও কম্‌প্লেক্স। দেখবার যন্ত্রপাতি সব ঠিক আছে, তোমার মনে হচ্ছে তুমি দেখতে পাচ্ছ না। আর একটা কারণ—"

বলেই থেমে গেলেন ডাক্তার মুখার্জি। মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

ঝিনুক উৎসুক হয়ে উঠেছিল, বলল—"আর একটা কারণ কি? বলতে বলতে থেমে গেলেন যে—"

"সেটা তোমার মুখের সামনে বলা উচিত হবে না। ভদ্রমহিলাদের অপমান করতে নেই—"

"আমার কিছু অপমান হবে না। বলুন আপনি, দ্বিতীয় কারণ কি হতে পারে।"

"দ্বিতীয় কারণ তুমি হয়তো মিথ্যে কথা বলছ। দেখতে পেয়েও বলছ দেখতে পাচ্ছি না।"

ঝিনুকের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

মিনিট খানেক চুপ করে থেকে বললে— "আমার সার্টিফিকেটের তা হলে কি হবে? দেবেন না।?"

"দেব কি করে? চোখে কোনও দোষ দেখতে পেলুম না যে। মিছে কথা তো লিখতে পারব না।"

"মিছে কথা লিখলে আমার যদি একটা উপকার হয়—"

"কি উপকার হবে! চোখের চিকিৎসার জন্যে তোমার কোথাও যাবার দরকার নেই। চোখ তোমার ঠিক আছে। এতো ভালো চোখ সাধারণত দেখা যায় না। চমৎকার চোখ।"

ঝিনুক লজ্জায় আনত করলে চোখের দৃষ্টি। তারপর বলল, "আসল কথা, আমি বিলেত যেতে চাই। চোখের অসুখ ছুতো। কোনও শক্ত অসুখের চিকিৎসার ওজুহাত দেখালে সহজে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।"

"তুমি বিলেত যেতে চাইছ কেন?"

"ওই দেশেই বাস করতে চাই। এ দেশে আমাদের স্থান নেই এটা বুঝেছি। বাঙালীর ছেলেমেয়েদের এখন নূতন দেশে নূতন দিগ্বিজয়ের আশায় বেরুতে হবে। এ দেশে ভোটের জোরে যারা রাজত্ব করছে, আদর্শকে বলি দিয়ে যারা দেশ-ভাগ করেছে, ভোটাধিক্য হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় পূর্ববঙ্গ ভাগ করেও exchange of population করেনি, তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বাঙালীকে দাবিয়ে রাখা। তাদের জুতোর টিপুনির তলা থেকে আমরা পালাতে চাই। অন্য দেশে গিয়েও হয়তো আমরা বাঁচব না। তবু এদেশে আর নয়।"

"আমি বলছিলাম—"

"আপনি কি বলবেন তা আমি জানি। অনেক ভালো ভালো কথা বলবেন, adaptability-র উপদেশ দেবেন, কিন্তু —"

"না, সে কথা বলব না। আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, তোমরাও কি এদেশের লোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেছ? তোমরা কি জবরদস্তি করে দেশের লোকের ঘরবাড়ি জমি দখল করনি?"

"দেখুন একটা গাছে অসংখ্য পাখি সুখে বাসা বেঁধে ছিল, সেই গাছটি কেটে ফেলা হয়েছে। সেই গাছের পাখিগুলি যদি এখন আপনাদের ইমারতের কার্নিসে এসে আশ্রয় নেয়, কিংবা আপনাদের বাগানের গাছে বাসা খোঁজে, সেটা কি খুব দোষের? আপনাদের দিক থেকে কি কোনও সহানুভূতি পেয়েছি আমরা? শিয়ালদহ স্টেশনে কখনও গিয়েছিলেন? নিতান্ত পেটের দায়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে যেসব ভদ্রঘরেব মেয়েরা দেহ বিক্রি করছে দেখেছেন তাদের?"

সমস্ত মুখটা লাল হয়ে উঠল ঝিনুকের।

ডাক্তার মুখার্জি তার আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর একটু স-সঙ্কোচে বললেন, "পাঞ্জাবী রেফিউজিরাও তো এদেশে এসেছে, তারা তো—"

"তারা আমাদের মতো নিঃস্ব হয়ে কেউ আসেনি। এক্সচেঞ্জ অব পপুলেশন (Exchange of population) ওদেশে হয়েছিল, তাই আমাদের মতো দুরবস্থায় কেউ পড়েনি। তাছাড়া এদেশের পাঞ্জাবী সমাজ ওদের দূর-ছাই করেনি, যাতে ওরা ভদ্রভাবে বসবাস করতে পারে

তার চেষ্টা সমবেতভাবে করেছে। আর একটা কারণও আছে। ওরা দেশে যে পরিবেশে যে-সব কাজ করতে অভ্যস্ত ছিল, এদেশে এসেও ওরা সেই পরিবেশ, সেই সব কাজই পেয়েছে। কিন্তু আমরা যে পরিবেশে যে-সব কাজ করতাম, সে-পরিবেশে সে-সব কাজ আমরা পাচ্ছি না। আমরা যা পাচ্ছি, তা ভিক্ষের আকাঁড়া চাল আর অর্থহীন সদুপদেশ।

ঝিনুক আবার থেমে গেল। তার গলায় স্বর যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। ডাক্তার মুখার্জি, ভেবে পেলেন না, কি বলবেন। এ নিয়ে আর কোনও আলোচনা করা সমীচীন মনে হল না তাঁর, তিনি চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তার পর অন্য কথা পাড়লেন।

"তুমি লেখাপড়া কতদূর করেছ?"

"আমি বি-এ পাশ করেছি। ইকনমিক্সে অনার্স ছিল।"

"কোন্ ক্লাস পেয়েছিলে?"

"ফার্স্ট ক্লাস।"

"তাহলে এক কাজ কর না। লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে পড়বার জন্যে দরখাস্ত করে দাও। আমি সে বিষয়ে তোমাকে কিছু সাহায্য করতে পারি। লন্ডনে আর দিল্লিতে দু'জায়গাতেই আমার চেনা লোক আছে। তাঁদের অনুরোধ করলে হয়তো কিছু কাজ হতে পারে।"

আগ্রহে জ্বলজ্বল করে উঠল ঝিনুকের চোখ দুটো।

"আপনি পারবেন?"

"পারতে পারি। কিন্তু প্রথমেই তোমাকে একটা বিষয়ে মনস্থির করতে হবে। যাদের বিরুদ্ধে তোমার এত রাগ, সে-রাগটা কমাতে হবে। এখন যাঁরা দেশের শাসনকর্তা, তাঁরা যে তোমার শত্রু নন, হিতৈষী, এটা স্বীকার না করলে তাঁদের সহানুভূতি পাবে না। আর তাঁদের সহানুভূতি না থাকলে বিলেত যাওয়ার অনুমতি পাওয়া শক্ত।"

ঝিনুকের চোখের দৃষ্টির রং বদলে গেল। "আপনি নিজে মিথ্যে সার্টিফিকেট দিলেন না, আর আমাকে মিথ্যাচার করতে বলছেন?"

ডাক্তার মুখার্জি এ উত্তর প্রত্যাশা করেননি। একটু চুপ করে থেকে বললেন, "এটাকে যদি মিথ্যাচার মনে কর, কোরো না!"

"আপনি কি সত্যিই মনে করেন, ওরা আমাদের হিতৈষী?"

"ওদের মনের কথা আমি জানি না, তাই তোমার কথার ঠিক উত্তর দিতে পারব না। কিন্তু একটা কথা জানি, হিতৈষী হলেই সব সময় উপকার করা যায় না। বাইরের অনেক রকম অপ্রত্যাশিত ঘটনা বাধার সৃষ্টি করে। ওরা হয়তো তোমাদের ভালো করতে চায়, কিন্তু পারছে না।"

"আমি তাহলে উঠি এবার।"

ঝিনুক উঠে দাঁড়াল। তার ছোট ব্যাগ খুলে ষোলটি টাকা বার করে টেবিলের উপর রেখে বলল, "আপনার ফি রেখে যাচ্ছি। যদি নিতে না চান ফেলে দেবেন।"

বলেই বেরিয়ে গেল সে।

ডাক্তার মুখার্জি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন। তারপর একটা চিঠি লিখলেন ডাক্তার ঘোষালকে।

নমস্কারান্তে নিবেদন,

ডাক্তারবাবু, শ্রীমতী ঝিনুক একটু আগে আমার কাছে চোখ পরীক্ষা করাতে এসেছিল। আমি

তার চোখে কোনও দোষ দেখতে পেলাম না। আমি তার কাছে ফি নিতে চাইনি, তবু সে জোর করে যোলটা টাকা রেখে গেল। আমি তার কাছে ফি নেব না। টাকাটা তাই আপনার কাছে ফেরত পাঠাচ্ছি। শুনেছি সে আপনার ওখানে কাজ করে। আপনি বুঝিয়ে সুজিয়ে এটা তাকে দিয়ে দেবেন। আশা করি ভালো আছেন। আমার আন্তরিক প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন।

ইতি—

ভবদীয়
শ্রীসুঠাম মুখোপাধ্যায়

।। সাতাশ ।।

গণেশ হালদার ভেবেছিলেন, তাঁর ছাপা পুস্তিকাটি বিতরিত হলে হয়তো জনসাধারণের মধ্যে ঈষৎ চাঞ্চল্য দেখা দেবে। হয়তো কেউ তাঁকে উৎসাহিত করবে তাঁর স্বাধীন চিন্তা এবং স্পষ্ট উক্তির জন্যে। হয়তো বাইরে থেকে দু'-একখানা চিঠিও আসবে। কিন্তু তিনি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, এ বিষয়ে কেউ উচ্চবাচ্যই করলে না। স্কুলে তাঁর সহকর্মীদের প্রত্যেককেই তিনি এক কপি করে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের মুখভাব দেখে মনে হল না যে তাঁরা সেটি পড়েছেন। দু'-একজন তাঁকে দেখে মুচকি হেসেছিলেন একটু,— ব্যস্, ওই পর্যন্ত। তিনি দেশের জন্য যে চিন্তা করছেন, সে চিন্তায়, কেউ প্রভাবিত হয়েছে, এর সামান্যতম প্রমাণ পাবার জন্য তিনি উৎসুক হয়েছিলেন, কিন্তু সে প্রমাণ তিনি পেলেন না। স্টেশনের প্রতি ট্রেনে গিয়ে তাঁর লোক পুস্তিকা বিতরণ করছিল। সে বললে, ভদ্রলোক দেখে দেখেই সে দিয়েছে। কিন্তু কই কারও তো সাড়া পাওয়া গেল না কোনো। আমাদের দেশের বাঙালী সমাজ তাহলে কি মৃত? যারা ফরসা জামা কাপড় পরে দেঁতো হাসি হেসে গাল-গল্প করে, যারা আপিসে যায়, বাজার করে, সিনেমা দেখে, বংশবৃদ্ধি করে, যারা পাড়া-প্রতিবেশীর নিন্দায় পঞ্চমুখ, নিজেদের বৈঠকখানায় বা ক্লাবে বসে যারা রাজা-উজির মেরে নেতাদের নিন্দায় ক্ষণে ক্ষণে গরম হয়ে ওঠে, তারা কি আসলে তাহলে প্রাণহীন শব? তাদের এইসব উল্লাস বা আক্ষেপ কি মৃতদেহ নিঃসৃত বাষ্প মাত্র? গণেশ হালদার লজ্জায় ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে দেখা করেননি। সকলের এই ঔদাসীন্যে তাঁর নিজেরই যেন লজ্জায় মাথা-কাটা যাচ্ছিল। দেখা হলেই তিনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, কই মশাই কি হল? আপনার ডাকে কেউ সাড়া দিলে কি? তখন তিনি কি বলবেন।

একদিন কিন্তু তাঁকে ডাক্তার মুখার্জির কাছে যেতে হলই। গল্পের একচক্ষু হরিণ যেমন আশা করেনি যে, অপ্রত্যাশিত দিক থেকে আততায়ী এসে মৃত্যুবাণ হানবে, তেমনি তিনিও প্রত্যাশা করেননি যে তাঁর স্কুল কমিটির সভ্যরা তাঁর প্রবন্ধ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এমন একটা চিঠি লিখবেন। হঠাৎ একদিন স্কুলের পিওন পিওন-বুকে এক চিঠি নিয়ে এসে হাজির হল সেক্রেটারির কাছ থেকে। সেই চিঠির মর্ম এই ঃ

"আপনি সম্প্রতি প্রাদেশিকতা নিয়ে যে প্রবন্ধটি ছাপিয়ে বিতরণ করেছেন, আমাদের স্কুল কমিটির বিচারে তাতে বর্তমান উদার গভর্নমেন্টকে, সংবিধানের নিয়মাবলীকে এবং আমাদের দেশের মহামান্য নেতাদের এবং শিক্ষক-সমাজকে অপমান করা হয়েছে। আপনি গর্ভনমেন্টের সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের বেতনভোগী শিক্ষক। আপনার এই দুর্মতি ও স্পর্ধা দেখে আমরা অত্যন্ত বিস্ময়বোধ করছি। অদ্য

মিটিংয়ে ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যগণ সকলেই একবাক্যে আপনার এই আচরণকে অত্যন্ত অশোভন এবং গর্হিত বলে নিন্দা করেছেন। তাঁদের সম্মতিক্রমে তাই আপনাকে অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, ভবিষ্যতে যদি আপনার আচরণে এরূপ গভর্নমেন্টবিরোধী মনোভাব প্রকাশ পায়, তাহলে আপনাকে আমরা স্কুলের শিক্ষকরূপে আর রাখতে পারব না। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও জানাচ্ছি যে, অবিলম্বে আপনাকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, আপনি ভবিষ্যতে আর কখনও এরূপ কার্য করবেন না। এ-প্রতিশ্রুতি যদি না দিতে চান, তাহলে আমার এই চিঠিকে নোটিশস্বরূপ গ্রহণ করবেন। এক মাস পরে আপনার স্থানে আমরা নূতন লোক বহাল করব।''

চিঠিখানির দিকে বিমূঢ়ভাবে চেয়ে রইলেন গণেশ হালদার। কিছুক্ষণের জন্য স্থিরই করতে পারলেন না, এ অবস্থায় কি করা উচিত।

শেষে ডাক্তারবাবুর কাছেই গেলেন তিনি।

ডাক্তারবাবু যথারীতি তাঁর কুকুর আর গরু-বাছুর নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সেদিন ব্যস্ত ছিলেন তাঁর ভেড়াটাকে নিয়ে। ভেটুকের ক্ষুরে ঘা হয়েছিল। দুর্গাকে দিয়ে ঘা পরিষ্কার করিয়ে ফিনাইল দেওয়াচ্ছিলেন তিনি। তাঁকে ঘিরে রকেট, জাম্বু, ভুটান আর মুরগিগুলোও দাঁড়িয়েছিল। যেন তারাও ব্যাপারটা তদারক করতে এসেছে। সকলেরই মুখে একটা চিন্তিত ভাব। কি হল ভেটুকের!

গণেশ হালদারকে দেখে ডাক্তারবাবু সহাস্যে সম্বর্ধনা জানালেন।

''আসুন মাস্টারমশাই, কি খবর?''

মাস্টারমশাই সেক্রেটারির চিঠিটা তাঁকে দিলেন।

চিঠিটা পড়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন ডাক্তারবাবু কয়েক মুহূর্ত। সেক্রেটারি তুলসী বাগচীর মুখটা তাঁর মানসপটে ভেসে উঠল। ধার্মিক লোক, ত্রিসন্ধ্যা করেন। কিছুদিন আগে তাঁর কাছে এসে ক্ষুদিরামের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। আমাদের প্রধান মন্ত্রী যে মজঃপুরে গিয়ে ক্ষুদিরামের মর্মর মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানাননি, এজন্যে তাঁর ক্ষোভের অন্ত ছিল না। তাঁর এই চিঠি! অনেকক্ষণ চিঠিখানার দিকে নীরবে চেয়ে রইলেন তিনি, তারপর বললেন, ''আমি হলে স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিতাম।''

গণেশ হালদার বললেন, ''আমিও তাই ঠিক করেছি। আমার যথেষ্ট টাকা থাকলে আমি আর-একটা কাজও করতাম, কিন্তু টাকা নেই বলে সাহস পাচ্ছি না।''

''কি সেটা?''

''ওয়ার্কিং কমিটির নামে নালিশ করতাম। আমার আইনসঙ্গত স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবার অধিকার আছে কি না, আদালতের মারফত জেনে নিতাম সেটা। কিন্তু তা করতে গেলে যত টাকার দরকার, তত টাকা আমার কাছে নেই।''

ডাক্তারবাবু প্রথমে মৃদু হাসলেন। তারপর হো-হো করে হেসে উঠলেন।

''আপনি দেখছি ক্রোধ-পর্বতের তুঙ্গে আরোহণ করে বসে আছেন। চলুন ওদিকে গিয়ে বসা যাক্। দুর্গা, তুই ফিনাইল জল দিয়ে ধুয়ে ক্ষুরটা ভালো করে ব্যান্ডেজ করে দে। মাছি না বসে। অন্য ক্ষুরগুলোও ধুয়ে দিস।''

মাঠেই চেয়ার ছিল কয়েকটা। সেইখানে গিয়েই বসলেন দু'জনে। রকেট আর ভুটান তাঁদের সঙ্গে এসে দু'পাশে থাবার উপর মুখ রেখে বসল, যেন তারাও এই আলোচনায় অংশ নেবে। জাম্বু কিন্তু বসে রইল অসুস্থ ভেটুকের কাছে।

কথাবার্তা আরম্ভ হবার আগেই উত্তেজিত বিজয় ছুটে এল একটা নালিশ নিয়ে।

"বাবু, বাবু, রকেট গোবল খাইলো ছে—" (বাবু, বাবু, রকেট গোবর খেয়েছে।)

রকেট থাবা থেকে মুখ তুলে চাইলে বিজয়ের দিকে। ডাক্তারবাবু কিন্তু তখন এ-ব্যাপারটায় তেমন গুরুত্ব আরোপ না করে বললেন, "আচ্ছা এখন তুই যা— এ-বিচার পরে হবে। এখন গোলমাল করিস না।"

বিজয় তখন ডাক্তারবাবুর দিকে চেয়ে সলজ্জে মুচকি হেসে বলল— "আমলুদ খাইবি? এক্‌ঠো পাক্‌কা আমলুদ ছে গাছো পল্‌। পাড়িও।"

(পেয়ারা খাবে? গাছে একটা পাকা পেয়ারা আছে। পেড়ে আনি?)

"না, এখন থাক। পেড়ে রাখ, পরে খাব।"

বিজয় একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। বিশেষ করে আরও হল রকেটের দিকে চেয়ে। রকেটের মুখে একটা ব্যঙ্গের ভাব ফুটে উঠেছিল। ভাবটা যেন, কেমন হল তো? ভারী যে নালিশ করতে এসেছিলে।

ডাক্তারবাবু মাস্টারমশাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "চাকরিটা আপনি ছেড়ে দিন, মোকদ্দমা করবেন না। ওদের ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। মোকদ্দমা করবার টাকা আমি আপনাকে দিতে পারি, কিন্তু কি হবে মোকদ্দমা করে? ওরাও তো পতিত, যদিও ওরা সেটা নিজেরা জানে না, সেই জন্যে অবস্থাটা আরও করুণ, আরও শোচনীয়। কি লাভ মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে?"

গণেশ হালদার চুপ করে রইলেন।

ডাক্তার মুখার্জি মুচকি হেসে বললেন, "মোকদ্দমা করলেও শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখবেন সর্ষের মধ্যেই ভূত আছে। আদালতের বিচারও সব সময়ে ন্যায়নিষ্ঠ হয় কি? আইন এমন একটা জিনিস যে তাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে নানারকম করা যায়।"

গণেশ হালদার চুপ করেই রইলেন।

তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "বেশ তাই হবে। আজই আমি কাজে ইস্তফা দিয়ে দিচ্ছি।"

"সেই ভালো।"

ইতস্তত করতে লাগলেন হালদার মশাই। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ডাক্তার মুখার্জি তাঁর মুখের দিকে।

"কালই তাহলে এখান থেকে চলে যাব আমি। এখানে যখন চাকরি রইল না তখন এখানে থাকব কি নিয়ে, অন্যত্র চাকরির সন্ধান করতে হবে। আপনার সঙ্গে স্নেহের যে বন্ধনে—"

আর বলতে পারলেন না তিনি। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

ডাক্তার মুখার্জি সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "আপনি যাবেন কেন! আপনি চাকরির সূত্রে এসেছিলেন বটে, কিন্তু অন্য আর-একটা সূত্রে যে বাঁধা পড়েছেন। সে-সূত্র তো কোনও পলিটিক্যাল খড়্গে ছিন্ন হবে না। আপনি এখন কি করবেন, কি করা উচিত, সে ভারটা আমার উপর ছেড়ে দিন।"

গণেশ হালদার এই ধরনেরই কিছু একটা প্রত্যাশা করছিলেন। তবু বললেন, "যখন এখানে চাকরিই থাকবে না—"

হেসে বললেন সুঠাম মুকুজ্যে। 'আপনি' কথাটার উপর জোর দিলেন। তারপর আর-একটু হেসে বললেন, "আমার এখানেও তো আপনি একটা চাকরি নিয়েছেন, আমার আবোল-

তাবোল টোকার। সে চাকরি তো আপনার যায়নি। আমি যতদিন থাকব সে চাকরি আপনার যাবেও না।

এর উত্তরে গণেশ হালদার কি বলবেন ভেবে পেলেন না। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন এক-একটা মুহূর্ত আসে যখন ভাষা দিয়ে মনের ভাব ব্যক্ত করা যায় না। গণেশ হালদার নীরব হয়ে রইলেন। ডাক্তার মুখার্জিও কয়েক মুহূর্ত কিছু বললেন না। কিন্তু তাঁর চোখ মুখের ভাব দেখে মনে হল তিনি কি একটা যেন বলতে চাইছেন, কিন্তু বলতে সাহস হচ্ছে না।

গণেশ হালদার বললেন, "কিন্তু আমার সময় কাটবে কি করে। আপনি রোজ যা লেখেন সেটুকু টুকতে আমার এক্ ঘণ্টার বেশি কোনোদিন লাগেনি। বাকি সময়টা আমি কি করব?"

"আপনাকে কাজ দেব। আমি প্রতি মাসে নানারকম বই কিনি, কিন্তু সেগুলো আমার লাইব্রেরিতে এলোমেলো অগোছালো হয়ে পড়ে থাকে। আমি গোছাতে পারি না। আপনি সেটার ভার নিন। আমার অবসরও কম। সব বই পড়বারও সময় পাই না, কেনবার নেশায় কিনে ফেলি। আপনি সে-সব বই পড়ে ভালো ভালো অংশগুলো যদি আমাকে সন্ধ্যার পর শোনান, তা হলে ভারি উপকার হবে আমার। এর জন্যে—"

আবার থেমে গেলেন সুঠাম মুকুজ্যে। তারপর যেন মরিয়া হয়েই বলে ফেললেন কথাটা।

"এর জন্যে আপনি স্কুলে যা পেতেন তাই আমি দেব। টাকাটা বাহুল্য, আসল কথা আপনাকে আত্মীয় করে নিতে চাই। আপনার সঙ্গে কোনো-কালেই আমার প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক হবে না এটা গোড়াতেই বলে রাখছি। আমি আপনার বন্ধুত্ব কামনা করি। সত্যিই আমি বড় একা—"

চুপ করে গেলেন সুঠাম মুকুজ্যে। গণেশ হালদারও চুপ করে রইলেন। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর গণেশ হালদার বললেন, "আপনি যা বললেন, যা দিলেন তা আমার স্বপ্নের অতীত ছিল। কিন্তু তবু একটা কথা না বলে পারছি না। এভাবে আপনার মহত্ত্বের উপর দাবি করবার সত্যিকার কোনো অধিকার আছে কি? হয়তো দয়ার বশবর্তী হয়ে আপনি—"

ডাক্তার মুখার্জি থামিয়ে দিলেন তাঁকে।

"আপনিই আমার উপর দয়া করুন। আমার উপর আপনার সত্যিকার কোনও অধিকার আছে কিনা এর জবাব আর একদিন দেব। আমার লেখার মধ্যেই পাবেন সেটা। সেটা হয়তো আপনি মানবেন। সে কথা কিন্তু এখন বলবার সময় হয়নি। সামনাসামনি বলাও যাবে না। কিন্তু তার চেয়েও যে বড় অধিকারে আমি আপনার সাহচর্য কামনা করছি তার নাম ভালোবাসা। এর সঙ্গে দয়া, অনুকম্পা বা সহানুভূতির কোনো সম্পর্ক নেই। প্রয়োজনটা আমার। সঙ্গী হিসাবে মনের মতো লোক পাওয়া যায় না। পয়সা খরচ করলে চাটুকার পাওয়া যায়, কিন্তু বন্ধু পাওয়া যায় না। ভাগ্যক্রমে আপনার দেখা পেয়ে গেছি। আপনাকে আমি সহজে ছেড়ে দেব না। আপনি মনে কোনও গ্লানি না রেখে যেমন আছেন তেমনি থাকুন। আপনার টাকা-কড়ির যখন প্রয়োজন হবে অসঙ্কোচে আমাকে বলবেন। আজই আপনাকে আমার লাইব্রেরি ঘরের চাবি দিয়ে দেব। আপনি ইচ্ছা করলে থীসিসের একটা খসড়াও করতে পারেন। সেদিন D. H. Lawrence -এর একটা প্রবন্ধে দেখলাম, তিনি গলস্‌ওয়ার্দির 'ফরসাইট সাগা'কে (Forsyte Saga) খুব গালাগালি দিয়েছেন। আমার মনে হয়েছিল গালাগালিটা ঈর্ষাপ্রসূত, আপনি পড়ে দেখুন না। সম্ভব হলে প্রবন্ধও লিখুন ও নিয়ে। সমসাময়িক সাহিত্যিকেরা যখন পরস্পরের নিন্দা-প্রশংসা করেন তা অধিকাংশ সময়েই যে নিরপেক্ষ সমালোচনা হয় না, ওই প্রবন্ধটা তার প্রমাণ। কীটস আজ ইংরাজি

সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর কবিখ্যাতি পেয়েছেন, কিন্তু অনেকে সন্দেহ করেন যে, Blackwood Magazine-এর কঠোর সমালোচনাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। এ দেশেও ওরকম হচ্ছে। লিখুন আপনি ওসব নিয়ে। আমার মতে ফরসাইট সাগা প্রথম শ্রেণীর বই।"

গণেশ হালদার স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলেন। সহসা তিনি হেঁট হয়ে ডাক্তার মুখার্জিকে প্রণাম করলেন।

।। আঠাশ ।।

ডাক্তার ঘোষাল ভুরু কুঁচকে সুঠাম মুকুজ্যের চিঠিখানা আবার পড়ছিলেন। একটু আগেই বেচু তাঁকে চিঠি আর ষোলটা টাকা দিয়ে গিয়েছিল। ঝিনুক বাড়িতে ছিল না। সে গিয়েছিল মিস্টার সেনের কাছে তার কাকার দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে।

ডাক্তার ঘোষাল নাকের লম্বা চুলগুলো টানতে লাগলেন, তারপর শুরু হল হাঁটুর দোলানি। ভিতর থেকে মশলা পেষার আওয়াজ আসছিল।

"হরসুন্দর—"

নব-নিযুক্ত সেই চাকরটি বেরিয়ে এল।

"ঝিনুক কখন ফিরবে তা বলে গেছে?"

"আজ্ঞে না। তিনি সেন সাহেবের বাসা থেকে বাজারে যাবেন। সেখান থেকে আপনার জন্যে মাংস আনবেন। আমাকে বলে গেছেন মশলা ঠিক করে রাখতে। উনি নিজেই এসে রান্না করবেন।"

তারপর একটু সান্ত্বনার সুরে বলল, "বেশি দেরি হবে না, ফিরলেন বলে।"

হরসুন্দরের ওইটুকুই বৈশিষ্ট্য। যখন দেখে কোনও কারণে কেউ কষ্ট পাচ্ছে বা চিন্তিত হয়েছে তখন আর কিছু না পারুক, সে সান্ত্বনা দেয়।

"আচ্ছা, যাও।"

হরসুন্দর আবার ভিতরে গিয়ে মশলা বাটতে লাগল। ডাক্তার ঘোষালের মনে হতে লাগল তাঁর বুকের উপরই যেন মশলাটা বাটা হচ্ছে। তাঁর অজ্ঞাতসারেই একটা আর্ত অসহায় ভাব ফুটে উঠেছিল তাঁর মুখে। গাড়িটা থাকলে তিনি ডিসপেন্সারি চলে যেতেন। কিন্তু ঝিনুক গাড়িটা নিয়েই বেরিয়ে গেছে। বলে গিয়েছিল, এখুনি আসছি। কিন্তু এক ঘণ্টা হয়ে গেল এখনও তার পাত্তা নেই। ডাক্তার মুখার্জির কাছে সে চোখ দেখাতে গিয়েছিল কেন? এই প্রশ্নটাই ঘুরে ফিরে মনে হচ্ছিল তাঁর। ঝিনুকের চোখের যে কোনও অসুখ আছে তা তো তিনি কখনও শোনেননি। ঝিনুককে দেখেও এ সন্দেহ হয়নি তাঁর, ঝিনুক তাঁকে বলেওনি। তিনি জানেন ঝিনুকের চোখের দৃষ্টি শ্বাপদের দৃষ্টির চেয়েও প্রখর। অন্ধকারেও সে দেখতে পায়। সুঠাম মুকুজ্যের কাছে ফি দিয়ে ও চোখ দেখাতে গিয়েছিল কেন তবে? সুঠাম মুকুজ্যেও চোখে কোনও দোষ পাননি। তিনি খবর পেয়েছিলেন ও লোকটি এফ. আর. সি. এস এবং এম. আর. সি. পি.। তা ছাড়া চোখের বিষয়েও একজন বিশেষজ্ঞ। জার্মানীর একটা ডিগ্রী আছে নাকি। তিনি যখন চোখের কোনও দোষ দেখতে পাননি, তখন দোষ নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু ঝিনুক গিয়েছিল কেন? ও ঘুজ্‌ঘুজ্ করে গণেশ হালদারের কাছেও যায় মাঝে মাঝে। এখন সুঠাম ডাক্তারের কাছেও টোপ ফেলতে আরম্ভ করেছে নাকি। নাক মুখ কুঁচকে মুখের বীভৎস একটা চেহারা করে সামনের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।...

হঠাৎ দেখতে পেলেন গণেশ হালদার আসছে।

"আসুন, আসুন, আপনার কথাই ভাবছিলাম। I was just thinking of you. বদন অমন প্রসন্ন কেন?"

"স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলাম।"

"তাই নাকি! হঠাৎ?"

"আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলুম। সেটাতে গভর্নমেন্টের সমালোচনা ছিল। ছাপা প্যামফেট তো আপনাকে একটা পাঠিয়েছিলাম। পাননি?"

"পেয়েছি। কিন্তু এখনও পড়া হয়নি। ডিসপেন্সারির টেবিলেই পড়ে আছে সেটা। কি লিখেছিলেন।"

"আমাদের উপর যে-সব অত্যাচার অবিচার হচ্ছে তাই নিয়ে লিখেছিলাম। মুখে এঁরা বক্তৃতা দিচ্ছেন প্রাদেশিকতা উঠিয়ে দাও, কিন্তু কাজের বেলায় দেখছি প্রাদেশিকতারই ছড়াছড়ি। এ দেশের বাঙালী আর উর্দুভাষী ছেলেমেয়েদের জোর করে হিন্দীতে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করছে! অথচ বক্তৃতা শুনুন—"

"আপনারও যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, ভীমরুলের চাকে খোঁচা মারতে গেছেন। চোরা কি ধর্মের কাহিনী শোনে? Thieves have their own logic and own religion ! এর জন্যই চাকরিটা গেল?"

"স্কুলের সেক্রেটারি তুলসীবাবু আমার প্রবন্ধ পড়ে আমাকে ধম্‌কে চিঠি লিখেছিলেন, যেন ভবিষ্যতে আমি ওরকম প্রবন্ধ না লিখি। আমি চাকরি ছেড়ে দিলাম।"

"ফট্ করে ছেড়ে দিলেন? এখন করবেন কি?"

"সুঠামবাবু আমাকে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি করে বহাল করে নিয়েছেন। আমার কোনও অসুবিধা হয়নি। ওঁর মতো মহৎ লোক আমি আর দেখিনি।"

ডাক্তার ঘোষালের মুখটা ঈষৎ ব্যাদিত হয়ে গেল। তিনি নির্বাক বিস্মিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন গণেশ হালদারের মুখের দিকে।

ব্যাপারটা সত্যিই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল ডাক্তার ঘোষালের। হঠাৎ সুঠাম মুকুজ্যে একটা মাস্টারকে বহাল করতে গেল কেন! তাঁর তো ছেলেমেয়ে কেউ নেই যে পড়াবে।

"কি করতে হবে আপনাকে?"

"তাঁর লাইব্রেরির ভারটা নিতে হবে। রোজ ঘণ্টা দুই কাজ করলেই যথেষ্ট। ও কাজ করেও আমার হাতে প্রচুর সময় থাকবে। তাই আপনার কাছে এসেছি একটা পরামর্শ করবার জন্য। এখানে যদি রেফিউজি ছেলেমেয়েদের জন্যে অবৈতনিক স্কুল করি, কেমন হয়?"

"অবৈতনিক স্কুল? ছাত্রের অভাব হবে না। ভাত ছড়ালে প্রচুর কাক জুটবে। আমাকে কি করতে বলছেন?"

"হরিহর মোক্তারের একটা বাড়ি খালি আছে, শুনেছি আপনার সঙ্গে তার খুব ভাব, সে বাড়িটা আমাকে জোগাড় করে দিতে পারেন? ভাড়া দেব।"

ডাক্তার ঘোষাল এমন একটা মুখ-ভাব করে চেয়ে রইলেন, যেন তিনি কোনও কিছুর থই পাচ্ছেন না।

"দেবেন জোগাড় করে? মাসে পঞ্চাশ টাকা করে ভাড়া আমি দিতে পারব। শুনলাম এর আগের ভাড়াটে ওই ভাড়াই দিত।"

ডাক্তার ঘোষালের মুখ দিয়ে এবার কথা ফুটল। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার আয়োজন কেন করছেন বলুন তো। It is no good running after wild buffaloes ঃ ওসব করতে গিয়ে আবার একটা বিপদে পড়বেন। রেফিউজি ছেলেমেয়ে কি একটা-আধটা? শ' দুই-তিন ছেলেমেয়েকে আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন? যাকে 'না' বলবেন সে-ই আপনার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।"

"তা ঠিক। একা ম্যানেজ করা কঠিন। আমি আর একটা কথাও ভেবেছি। ঝিনুক বি-এ পাশ শুনেছি। সে-ও যদি পড়ায়—"

লাফিয়ে উঠলেন ডাক্তার ঘোষাল। তারপর বোমার মতো ফেটে পড়লেন।

"না, না, না, ঝিনুক পড়াবে না। Do you understand ঝিনুক আর আপনাদের সংস্রবে যাবে না।—I shall see that she does not । আপনার আসল মতলব এতক্ষণে বুঝেছি। আপনি ধূর্ত শৃগাল, but you are no match for a tiger ।"

থতমত খেয়ে গেলেন গণেশ হালদার। তারপর একটু সামলে বললেন, "বেশ না পড়ান, না পড়াবেন। কিন্তু আপনি অত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন!"

"উত্তেজিত হচ্ছি, কারণ I have smelled a rat—ছুঁচোর গন্ধ পেয়েছি। একটা দুরভিসন্ধির আঁচ পেয়েছি। ঝিনুক মিছিমিছি সুঠাম ডাক্তারের কাছে চোখ দেখাতে গিয়েছিল জানেন? চোখের কোনও অসুখ নেই, তবু চোখ দেখাতে যাবার মানে? চোখটা ছুতো, আসল উদ্দেশ্য যাওয়া, shoulder rubbing ? আমি কি কচি খোকা যে একটা ধাপ্পার মোয়া হাতে দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে দেবেন?"

এ আলোচনাটা কতদূর পর্যন্ত গড়াতো তা বলা যায় না, কিন্তু অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনায় থেমে গেল সব। একটা বাঁদর লাফাতে লাফাতে এসে ঘরে ঢুকল এবং ঘোষালের খাবার ঘরে যে পাঁউরুটি ছিল সেটা বগল-দাবা করে বেরিয়ে গেল সটান। হরসুন্দর হৈ হৈ করে তেড়ে গেল।

ঘোষালও তড়াক করে সরে দাঁড়ালেন একধারে।

"বাঁদর? মংকি? এ অঞ্চলে তো দেখিনি কখনও।"

তারপর তাঁদের দৃষ্টি পড়ল পৃথিবীনন্দনের দিকে। তিনি মাঠের আর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে চেয়ে ছিলেন ডাক্তার ঘোষালের দিকে। তারপর হঠাৎ একটা ছোট ক্যামেরা বার করে ক্লিক করে একটা ফোটো তুলে নিলেন ডাক্তার ঘোষালের।

হনহন করে এগিয়ে গেলেন ডাক্তার ঘোষাল তাঁর দিকে। তারপর প্রায় ছুটে গিয়ে ধরলেন তাঁকে।

"কে মশাই আপনি? আমার ফোটো তুললেন কেন?"

"আপনার ফোটো তুলিনি। আপনার পিছনে ওই পেয়ারা গাছে ল্যাজ-ঝোলা পাখি বসেছিল তারই ফোটো তুলেছি। আমি একজন বার্ড ফোটোগ্রাফার। চিড়িয়া দেখলেই ফোটো তুলি। আচ্ছা চলি, টা টা—"

বাঁ হাতটা তুলে মৃদু হেসে চলে গেলেন পৃথিবীনন্দন। একটু দূরেই বাঁদরটি তাঁর অপেক্ষায় একটি ডালে বসেছিল। দেখেই নেবে এল। পৃথিবীনন্দন তার হাত থেকে পাঁউরুটিটি নিয়ে নিজের ব্যাগে পুরে ফেললেন।

ডাক্তার ঘোষাল আর গণেশ হালদার দুজনেই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

"কত রকম আজব চিজই যে আছে সংসারে"—

ডাক্তার ঘোষালের মুখ দিয়েই প্রথম কথা বেরুল।

গণেশ হালদার বললেন, "এ লোকটা শুধু আজব নয়. একটু সন্দেহজনকও"

"কি রকম?"

"ও পাখির ছবি তোলেনি, আপনারই ছবি তুলল। কেন, তা জানি না।"

দুজনেই চুপ করেই রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর গণেশ হালদার বললেন, "আমি এখন যাই তাহলে। ওই বাড়িটা যদি ঠিক করে দিতে পারেন, উপকৃত হব। কাছে-পিঠে অন্য কোনো বাড়ি পাচ্ছি না। আপনার যদি অমত থাকে তাহলে ঝিনুক ওখানে পড়াবে কেন? এসব কথা আপনার মনে উদয় হয় কেন তা-ও বুঝতে পারি না। ঝিনুক আমাদের গ্রামের মেয়ে, আমার ছোট বোনের মতো।"

"ছোট বোনদেরও সর্বনাশ করেছে এ রকম লোক আমি দেখেছি। যুগটা যে খারাপ। আমিও খারাপ। I am also a bad man—তাই কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না।"

"বেশ, ঝিনুক তাহলে পড়াবে না ওখানে। আমি একাই যতটা পারি পড়াব। বাড়িটা আপনি জোগাড় করে দিন।"

"চেষ্টা করব।"

"আচ্ছা, চলি তাহলে।"

নমস্কার করে গণেশ হালদার চলে গেলেন।

একটু পরেই ঝিনুক ফিরল।

মোটর থেকে নেবেই সে সহাস্যমুখে এগিয়ে এল।

"কাকার দেশে ফেরবার একটা ব্যবস্থা করে এলাম! প্রথমে সেন সাহেবের ওখানে গিয়েছিলাম। তিনি কেমন যেন বাঁকা ধরনের কথাবার্তা বলতে লাগলেন। মনে হল কিছু করতে চান না, অথচ সেটা বলতে পারছেন না। আমি তখন সোজা চলে গেলাম ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।"

ঝিনুককে দেখেই ডাক্তার ঘোষালের রাগ জল হয়ে গিয়েছিল। তিনি বেশ শান্ত কণ্ঠে বললেন, "তোমার কাকাকে দেশেই পাঠাবে ঠিক করলে শেষ পর্যন্ত? সেটা কি সুবুদ্ধির কাজ হবে?"

"উনি এখানে আপনাদের জুতো লাথি খেয়ে আর পড়ে থাকতে চান না। আমারও সেটা আত্মসম্মানে লাগে। ওঁর কপালের কাটা দাগটা আমাকে রোজ যেন চাবুক মারছে। উনি এখানে নগণ্য হতে পারেন কিন্তু আমাদের গাঁয়ে সবাই ওঁকে মান্য করত। এখনও এক ডাকে সবাই ওঁকে চিনবে। উনি সব জেনে শুনে যখন সেখানে ফিরে যেতে চাইছেন, তাই যান। অনেকে তো ফিরে যাচ্ছে। আমার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় সেখানে ঘর-বাড়ি বেঁধে বসবাস করছেন আবার। উনি তাঁর কাছেই থাকবেন।"

"কিন্তু শুনেছি উনি যাবার সময় বেশ কিছু নগদ টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছেন। অত টাকা কোথা পাব এখন?"

"আমি কি আপনার কাছে চেয়েছি এক পয়সাও?"

ঝিনুকের চোখ বাঘিনীর মতো দপ করে জ্বলে উঠল। ডাক্তার ঘোষাল অনুভব করলেন তিনি চালে ভুল করে ফেলেছেন। যতীশবাবু দেশে চলে গেলে যে একটা আপদ বিদায় হবে এ তিনি জানেন। কিন্তু তাঁর মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে একটা আশঙ্কাও জেগে ছিল, যতীশবাবুর পিছনে পিছনে ঝিনুকও না চলে যায় শেষে। ডাক্তার ঘোষাল দেখলেন, এ নিয়ে কোনও আলোচনা করা সমীচীন নয়।

বললেন, "বেশ, যা ভালো বোঝ কর। আমি এখন ডিসপেন্সারিতে চললাম।"

ডাক্তার ঘোষাল সোজা গিয়ে মোটরে উঠলেন এবং আর কোনো কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন সবেগে।

ঝিনুক দাঁড়িয়ে রইল মোটরটার দিকে চেয়ে। তারপর তার মুখে অতি সুমিষ্ট হাসি ফুটল একটি। হাসিমুখেই দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, এমন সময় পিয়ন এসে দুখানি চিঠি দিয়ে গেল। একখানি চিঠি লন্ডন থেকে এসেছে এয়ার মেলে। মনে হল তনিমার চিঠি। ভ্রূ কুঞ্চিত করে চেয়ে রইল ঝিনুক চিঠিটার দিকে। দ্বিতীয় চিঠিখানি মনে হল সুবেদার খাঁর। টাইপ-করা ইংরেজি চিঠি। তিনি যখনই চিঠি লেখেন (খুব কমই লেখেন যদিও) তখনই টাইপ করে লেখেন। চিঠির নীচে নামও সই করেন না। ঝিনুককে তিনি বলেই দিয়েছিলেন যে যদি কখনও তিনি চিঠি লেখেন, এই রকম ভাবেই লিখবেন। ঝিনুক চিঠি দু'টি ব্লাউজের মধ্যে পুরে ভিতরে চলে গেল। এখন চিঠি পড়ার অবসর নেই, মাংসটা আগে রাঁধতে হবে।

।। উনত্রিশ ।।

সুবেদার খাঁর চিঠি খুব সংক্ষিপ্ত। I shall take one jackfruit for you. Please attend Down Upper India Express on July, 25. (তোমার জন্য একটি কাঁঠাল নিয়ে যাব। ২৫শে জুলাই ডাউন আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসে এসো।)

ঝিনুক বুঝতে পারল কাঁঠালের ভিতর কোয়া ছাড়াও অন্য মালও নিশ্চয় থাকবে। পঁচিশে জুলাইয়ের এখন অনেক দেরি। ট্রেনটা আসে প্রায় একটা নাগাদ। সে সময় কাঁঠালটা নিয়ে কি করবে সে? কোথায় লুকিয়ে রাখবে? ডাক্তার ঘোষালকে কথাটা এখনই বলা উচিত কি? এই সব চিন্তায় একটু অন্যমনস্ক হয়ে রইল সে খানিকক্ষণ তারপর ঠিক করল সুবেদার খাঁ যেমন বলবেন তেমনি করা যাবে।

তনিমার চিঠি পড়ে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল। এ যে কল্পনাতীত!

তনিমা লিখেছে ঃ

ভাই ঝিনুকদি,

না জানি তোমরা আমার সম্বন্ধে কত কি ভাবছ! হাসপাতাল-পালানো চরিত্রহীনা মেয়েটার মুণ্ডপাত করছ নিশ্চয়। আমি কিন্তু যা করেছি তা খুব বেশি নিন্দনীয় নয়, যে সুযোগ হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আমার জীবনে এসেছিল সে সুযোগ আমি অবহেলা করিনি। এটা নিশ্চয় খুব গুরুতর অপরাধ নয়। যে চরিত্র আমি হারিয়েছি তা আর ফিরে পাব না। কাঁচের যে ফুলদানিটা

ফেটে গেছে, তাকে ফাটার কলঙ্ক সারাজীবন বহন করতে হয়। আমাদের সমাজে ফাটা ফুলদানিকে কেউ সম্মানের আসন দেয় না। হয় ডাস্টবিনে ফেলে দেয়, নয় লুকিয়ে সরিয়ে চোখের আড়ালে রাখে। একমাত্র ডাক্তার সুঠাম মুকুজ্যেই আমার সব কথা শুনেও আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখেছিলেন, আমার সত্যিকারের ভালো করবার চেষ্টা করেছিলেন, আমার পেটের সেই হতভাগ্য সন্তান যদি বাঁচত তাহলে তারও হয়তো একটা ভালো ব্যবস্থা উনি করে দিতেন। ওঁর মতো মহৎ লোক আমি আর দেখিনি। শামুকের চিঠি হয়তো পেয়েছ। সে এখানে আমার কাছে আছে। সে কি আমার সব কথা তোমাকে লিখেছে? ও কাজের মেয়ে, কাজের কথা ছাড়া আর কিছু লেখেনি বোধ হয়। ও সব কথা জানেও না। যে নূতন জীবন এখন আমি যাপন করছি, তার সূত্রপাত কে করেছিল জানো? তুমি। তোমার নিশ্চয় মনে আছে তুমি আমাকে দশ হাজার টাকার একটা চেক ভাঙাবার জন্যে বড়বাজারের একটি লোকের কাছে পাঠিয়েছিলে একদিন রাত্রে। ঝোলাগুড়ে মাছি পড়লে যে অবস্থা হয়, আমাকে দেখে লোকটিরও সেই অবস্থা হল। আমি সত্যিই ঝোলাগুড়, কিন্তু তাঁর চক্ষে হয়ে গেলাম দুর্লভ পদ্মমধু। লোকটিকে মাছি বলছি বটে কিন্তু সাধারণ মাছি নয়—মৌ-মাছি; কিন্তু আসলে সে হিপোপটেমাস। হিপোপটেমাস রূপে নয়, টাকার দিক দিয়ে। রূপে কন্দর্পকান্তি। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই তাঁর ব্যবসা আছে, কোটি কোটি টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন। এ হেন লোক আমার রূপের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাখা দুটি পুড়িয়ে বসল। তুমি বলেছিলে চেকটা ভাঙাতে হলে এক হাজার টাকা বাটা লাগবে। আমাকে দেখে উনি বললেন, আমাকে ও টাকা দিতে হবে না। আপনাকেই আমি দিলাম ওটা। তারপর আমাকে খাওয়ালেন খুব, শুধু খাবার নয়, ভালো মদও। অমন ভালো মদ আমি জীবনে কখনও খাইনি। এরপর যা ঘটল তাও অবিশ্বাস্য। অনেকটা আরব্য-উপন্যাসের গল্পের মতো। কথাবার্তায় যেই বেরিয়ে পড়ল যে আমার এখনও বিয়ে হয়নি এবং আমি সাবালিকা (অর্থাৎ বিয়ের জন্য বাবা মায়ের অনুমতির প্রয়োজন নেই) তখুনই তিনি বিয়ের প্রস্তাব করে বসলেন। লোকটি অকপট। বললেন, জীবনে অনেক মেয়েমানুষ ঘেঁটেছি, কিন্তু জীবন সঙ্গিনী করতে পারি এমন কাউকে পাইনি এখনও। তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে তুমি আমার শূন্য জীবন পূর্ণ করতে পারবে। তোমার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, কিন্তু তবু, কেন জানি না তোমার মধ্যেই আমি আমার মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছি। আমার সামনে হাঁটু গেড়ে আমার হাত দুটি ধরে চেয়ে রইলেন মুখের দিকে। সত্যি বলছি ঝিনুকদি, রূপসী বলে সেদিন আমার একটু গর্ব হয়েছিল। আমিও তখন আমার জীবনের সব কথা অকপটে খুলে বললাম তাঁকে। বললাম, আমি কুমারী বটে কিন্তু নিষ্কলঙ্ক নই। এ সব জেনেও যদি—। উনি উত্তরে কি বললেন জানো? বললেন, আগুনে অসংখ্য পতঙ্গ ঝাঁপিয়ে পড়বে, এইটেই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু তার জন্যে আগুন কখনও অপবিত্র হয় কি? আগুনকে কেউ কখনও কলঙ্কিত করতে পারেনি। তুমি যে এ-সব কথা অসঙ্কোচে বললে, বলতে পারলে, এইটেই প্রমাণ যে তুমি অপবিত্র হওনি। এরপর কি আর থাকা যায়? আমি আত্মসমর্পণ করলুম তাঁর কাছে। তিনি বললেন, মাসখানেক পরে তিনি বিলেত যাবেন। তার আগেই আমাকে বিয়ে করতে চান। বিয়ে করে আমাকেও নিয়ে যাবেন বিলেতে। আমি যেন যতশীঘ্র সম্ভব তাঁর কাছে ফিরে আসি। তিনি আমার অপেক্ষায় থাকবেন। বললেন, কাল আমি বম্বে যাব। ওই এক হাজার টাকা ছাড়াও আরও এক হাজার টাকা তুমি রেখে দাও। দিন সাতেক পরে বম্বে থেকে ফিরে তোমাকে যেন পাই। সেদিন রাত্রে ফিরেই যে রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে গেল, তাতো তুমি জানই। তুমি

জোর করে নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দিলে আমাকে। দিয়ে ভালোই করেছিলে। না দিলে হয়তো আমি মরেই যেতাম। যে সুখ এখন ভোগ করছি তা আর ভোগ করা হত না। তারপর নার্সিং হোমে ক'দিন থেকে একটু জোর পেলাম, দেখি সেদিনই ওঁর বম্বে থেকে আসবার তারিখ। যদিও একটু দুর্বল মনে হচ্ছিল, তবু আমি বেরিয়ে পড়লাম হাসপাতাল থেকে। গিয়ে দেখি তিনি আমার অপেক্ষায় রয়েছেন। বললুম, আমি হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছি। কেন হাসপাতালে গিয়েছিলাম তাও বললাম। উনি হেসে বললেন, ঠিক আছে। ভালোই হল, তোমার জীবনের অতীতটা নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল। আমারও মুছে গেছে। তার দুদিন পরে বিয়ে হয়ে গেল। উনি আবার বম্বে গেলেন, সেখানেই বিয়ে হল। সেখান থেকেই বিলেত চলে এসেছি। প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করার যে আরাম সে আরাম এখন আমাকে ঘিরে আছে। আমি কিন্তু তোমাদের ভুলিনি ঝিনুকদি। তোমাদের জন্যে ব্যবস্থাও করেছি কিছু। তোমার মুখে শুনেছিলাম তুমি বিদেশে চলে আসতে চাও। স্বদেশের স্বাধীনতার আবহাওয়ায় স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস নিতে পারছ না, একদিন বলেছিলে আমাকে। না পারবারই কথা। যেখানে আমার বাবার মতো পাষণ্ড তোমাদের রক্ষাকর্তা, সেখানে ভগবানও বোধ হয় কল্‌কে পান না সব সময়ে। ওদেশ থেকে এদেশে আসবার পথেও নানা রকম আইনের পাহারা বসিয়েছেন কর্তারা। খুবই কড়াকড়ি। অন্যায়-অবিচার-অপমান-পক্ষপাতের খাঁচায় বন্দী করে রাখতে চান তোমাদের। পাসপোর্ট-ভিসা পাওয়া খুবই শক্ত। আমি একটা ব্যবস্থা করেছি। আমার স্বামীর এখানে আপিস আছে। বেশ বড় আপিস। তাঁর ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং আমেরিকাতেও ব্যবসা আছে। ইউরোপের কাজকর্ম লন্ডন আপিস থেকেই হয়। আমেরিকায় নিউ-ইয়র্কে আপিস আছে। অস্ট্রেলিয়ায় আর জাপানেও আপিস খোলবার কথা হচ্ছে। লন্ডন আপিসে কয়েকজন লোক নেওয়া হবে। আমার অনুরোধে আমার স্বামী তোমাকে আর শামুককে তাঁর আপিসে বহাল করেছেন। শামুককে আর তোমার ভাইপোকে আসবার জন্যে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভিসা-পাসপোর্টের ব্যবস্থাও এখান থেকে হয়ে গেছে। তারা এসে পৌঁছেও গেছে এখানে। এবার তুমিও চলে এস। এখানে আপিসের কাজ কেরানিগিরি। মাইনে যা পাবে তাতে স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। জার্মান আর ফরাসী ভাষা যদি শিখতে পার তাহলে মাইনে অনেক বেশি পাবে। ওসব দেশে যাবারও সুযোগ মিলবে। তোমার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষে দুটো ভাষা আয়ত্ত করা মোটেই শক্ত হবে না। আমার আর একটা কথা মনে হয়েছে। জানি না, তুমি রাগ করবে কিনা। মনে হয়েছে, ডাক্তার ঘোষালকে ছেড়ে, তুমি বোধ হয় আসতে পারবে না। তাই তাঁর জন্যেও একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছি। গরিবদের নার্সিং হোম করবার জন্যে উনি অনেক টাকা দিয়েছেন। সেখানে ডাক্তার ঘোষালকে উনি কাজ দিতে পারবেন বললেন। আমি এই সঙ্গে তোমার ও ডাক্তার ঘোষালের নিয়োগপত্র পাঠালাম। এই দুটো দেখালে ওখানে পাসপোর্ট পাওয়া সহজ হবে। তোমরা যদি না পার উনি ব্যবস্থা করে দেবেন বলেছেন। শামুক আর তোমার ভাইপোর ব্যবস্থা উনিই করেছিলেন। টাকার জোরে সব হয় ঝিনুকদি। যাই হোক, তুমি চলে এস এখানে। উনি বাঙালী নন, কিন্তু বাঙালীদের উপর ওঁর শ্রদ্ধা খুব বেশি। ওঁর হংকংয়ে যে আপিস আছে, সে আপিসের চার্জে যিনি আছেন তিনি বাঙালী। এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি লন্ডনেও বাঙালী অনেক। সব রকম বাঙালী খাবার পাওয়া যায়। সেদিন একজন বাঙালী আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি দেখলাম সুক্তো আর তিতার ডাল করেছেন। খুব ভালো লাগল। আর একটা

কথা। যদিও আমি বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছি, তবু তোমাকে গোপনে বলছি, তাঁর জন্যে আমার খুব কষ্ট হয়। তুমি তাঁর একটু খবর নিও। যদি তাঁর টাকার দরকার হয় আমাকে জানিও, আমি তার ব্যবস্থা করব। টাকার আমার অভাব নেই এখন। আমাদের বড়বাজারের আপিস থেকেই টাকার ব্যবস্থা করতে পারব। চিঠির উত্তর দিতে দেরি করো না। আমার অনেক অনেক ভালোবাসা জেনো। তোমার ঋণ জন্মে শোধ করতে পারব না, ঝিনুকদি। তুমি না থাকলে সেদিন আমি মরেই যেতাম। ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়? আলাপ আছে? যদি সম্ভব হয় ওঁকেও আমার খবরটা দিও। আর আমার শতকোটি প্রণাম তাঁর পায়ে।

ইতি—

তনিমা

চিঠিখানার সঙ্গে দুটো নিয়োগপত্রও ছিল। ঝিনুক নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তার যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। হারুণ-অল-রশিদের প্রাসাদে নীত আবুহোসেনও বোধ হয় এত বিস্মিত হয়নি। কয়েক মুহূর্ত বসে থাকবার পর অদ্ভুত একটা প্রতিক্রিয়া হল তার মনে। সে হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে, ছেলেবেলায় ঠাকুর-ঘরে প্রণাম করেছে, শিবপূজাও করেছে। কিন্তু তারপর কলেজ-জীবনে আর ভগবানের কথা বড় একটা ভাবেনি সে। তারপর নিদারুণ নিষ্ঠুর বীভৎস অত্যাচারের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে এদেশে অন্যায়, অবিচার আর স্বার্থপরতার নিরঙ্কুশ মূর্তি দেখে, ভগবানের কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। সম্ভবত তার অবচেতনলোকে এ ধারণাও হয়েছিল— ভগবান নেই, ওটা একটা মিথ্যা সংস্কারমাত্র। তনিমার চিঠিটা পেয়ে কিন্তু সব মেঘ যেন সহসা কেটে গেল। সে দুহাত জোড় করে প্রণাম করতে লাগল। তার মুদিত চোখের সামনে ফুটে উঠল সেই বিষ্ণুমূর্তির ছবিটা যেটাকে তার মা রোজ সকাল-সন্ধ্যা প্রণাম করতেন। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে স্থির করে ফেলল ডাক্তার ঘোষালকে এখন কিছু বলবে না। যে রকম খামখেয়ালী মানুষ, বিলেতে যেতে রাজি হবেন কি হঠাৎ? কথাটা তাঁকে সইয়ে সইয়ে বলতে হবে। একথা ভাবতে গিয়ে ঝিনুকের আর একটা কথাও মনে হল। এত স্পষ্ট করে একথাটা এতদিন তার মনে হয়নি। ঘোষাল যদি বিলেত যেতে না চান তাহলে তাঁকে ফেলে সে কি যেতে পারবে? যে লোকটা প্রাণ তুচ্ছ করে তাদের বাঁচিয়েছে, এতকাল সমস্ত বিপদে আপদে নিজের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জোরে তাদের রক্ষা করেছে, তাকে ছেড়ে যাওয়া কি উচিত, ছেড়ে যাওয়া কি সহজ? এসব ছাড়াও তাঁর আর একটা যে পরিচয় সে পেয়েছে, ওই দুর্ধর্ষ লোকটার অনাবৃত যে রূপ সে দেখেছে, তা মুগ্ধ করেছে তার মাতৃ-হৃদয়কে যা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে প্রত্যেক নারীর মধ্যেই। দুর্দান্ত দামাল উলঙ্গ বলিষ্ঠ শিশু, যে অনিবার্য আকর্ষণে টানে প্রত্যেক নারীকে, সে আকর্ষণের প্রভাব ঝিনুকও এড়াতে পারেনি। সে এটাও অনুভব করতে লাগল— সে যদি আজ ডাক্তার ঘোষালকে ফেলে চলে যায় তাহলে উনি নোঙর-বিহীন নৌকার মতো তলিয়ে যাবেন। ওঁর টাকা লোটবার লোভে লোক অনেক জুটবে, কিন্তু সত্যিকার দরদ দিয়ে রক্ষা করবার লোক জুটবে কি? সারা জীবন উনি এরকম লোক খুঁজেছেন কিন্তু পাননি। সহসা ঝিনুক ঠিক করে ফেলল ডাক্তার ঘোষালকে সঙ্গে নিয়েই যেতে হবে। যেমন করে হোক রাজি করাতেই হবে ওঁকে। এই সিদ্ধান্তে এসে হঠাৎ পুলকিত হয়ে উঠল সে।

হঠাৎ মনে পড়ল মাংসটা এখনও চড়ানো হয়নি। ত্বরিতপদে ভিতরে চলে গেল।

।। ত্রিশ ।।

যতীশবাবু যদিও নিজের বাসাতেই ছিলেন কিন্তু কাউ-এর বাড়িতে রোজই একবার করে যেতেন। তার দোকানে চা খেতেন আর আড্ডা দিতেন খানিকক্ষণ। অশ্ব-প্রতিম রমেশের সঙ্গে তাঁর ভাব হয়েছিল খুব। রমেশ লোকটি মূর্খ নয়। সবাই তাকে গুণ্ডা বলে, সে গুণ্ডামিও করে, নৃশংসভাবে লোকও খুন করেছে একবার, কিন্তু তার প্রকৃতিটা ষোল আনা গুণ্ডা-প্রকৃতি নয়। কোনও ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি তার কার্যকলাপ চিত্রিত হত, তাহলে বিদ্রোহী বীর আখ্যা পেতে পারত সে। অনেকে তাকে কমিউনিস্ট বলে। কিন্তু ঠিক কমিউনিস্টও নয় সে। তার ভগবানে বিশ্বাস আছে, মা কালীর গোঁড়া ভক্ত সে, প্রতি বৎসর পিতামাতার শ্রাদ্ধ করে, কিছুদিন আগে গয়ায় পিণ্ডও দিয়ে এসেছে। কিন্তু সে গোঁয়ার, কাঠ-গোঁয়ার। কোনোরকম অন্যায়, বিশেষ করে গরিবদের উপর অন্যায় সে কিছুতেই সহ্য করবে না। সে নিজেই তার বিচার করবে এবং সাজা দেবে। যাকে সে খুন করেছিল, সে লোকটা মুসলমান। লোকটা ধর্ষণ করেছিল একটা ভিখারী মেয়েকে। রমেশের দল তাকে নিয়ে এসেছিল কিড্‌ন্যাপ করে মুখ বেঁধে, তারপর তাকে হত্যা করেছিল। এজন্য তার বিন্দুমাত্র অনুতাপ তো নেই-ই বরং একটা সৎকার্য করতে পেরেছে বলে মনে মনে গর্বিত সে। মশা, মাছি, ছারপোকা, সাপকে মেরে যেমন আমাদের দুঃখ হয় না, বরং মনে হয় একটা উচিত কর্মই করলাম, শয়তানদের মেরে তেমনি আনন্দ হয় রমেশের এবং রমেশের বন্ধু কাটরা আর ঝাবরার।

যতীশবাবু এদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করেননি। তিনি প্রায়ই আসতেন এবং নিজের দুঃখের কাহিনী ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতেন। সে কাহিনীর প্রধান "ভিলেন" ডাক্তার ঘোষাল। ডাক্তার ঘোষালের জন্যই যে তাঁর দু'দুটো জোয়ান ভাইঝি নষ্ট হয়ে গেল, ডাক্তার ঘোষালের জন্যই তাঁকে যে দেশ ছেড়ে আসতে হল, তাঁকে কোনো কথা বলতে গেলে যে তিনি মেরে তাড়িয়ে দেন—এই সব কথাই নানা রং দিয়ে ক্রমাগত বলেন তিনি। ডাক্তার ঘোষাল যে অতি পাজি লোক, এখানে তার মূর্তিমন্ত প্রমাণ কাউ নিজে। কাউ-এর মা যে সাধারণ শ্রেণীর পতিতা ছিল, ডাক্তার ঘোষাল যে আর পাঁচজন খদ্দেরের মতই তার কাছে এসেছিলেন, এ কথার উপর জোর দেয় না কেউ। ডাক্তার ঘোষাল যে কাউকে বাল্যকাল থেকে মানুষ করেছেন, তার জন্যেও এখানকার কেউ ডাক্তার ঘোষালের প্রশংসা করে না। এখানে যে কথা চালু হয়েছে সেটা হচ্ছে ডাক্তার ঘোষালই কাউ-এর মার সর্বনাশ করেছে, তারপর বুড়ো বয়সে তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, অন্ধকারে মাঠ পেরোতে গিয়ে কুয়োয় পড়ে মারা গেছে বেচারা। তারপর পাষণ্ডটা কাউকেও মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে একটি পয়সা না দিয়ে। এর মধ্যে যে খানিকটা মিথ্যা ছিল তা কাউ জানত। কিন্তু সেটা সে চেপে গিয়েছিল। চেপে গিয়েছিল, কারণ অপমানে তার বুক জ্বলছিল। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যেমন করেই হোক এ অপমানের সে প্রতিশোধ নেবেই। শুধু তার নিজের অপমান নয়, তার মাসিমা ঝিনুকের অপমান। তার বদ্ধ ধারণা ঝিনুককে ডাক্তার ঘোষাল যাদু করে রেখেছে। প্রখ্যাত শয়তানদের একটা যাদু করবার শক্তি আছে। সেই শক্তির জোরে লোকটা বেঁধে রেখেছে ঝিনুককে। তা না হলে অত অপমান সত্ত্বেও ঝিনুক তার কাছে আছে কেন? সে স্বচক্ষে দেখেছে লোকটা চুলের ঝুঁটি ধরে মারে ওকে। চড় মারে, লাথি মারে, তবু ঝিনুক আছে কেন ওখানে? নিশ্চয়ই যাদু করেছে। এই যাদু-পাশ ছিন্ন করতেই হবে যেমন করে

হোক। উদ্ধার করতেই হবে ঝিনুককে ওখান থেকে। কিন্তু কি করে তা করা যায়? রমেশ, কাটরা আর ঝাবরা তাকে বলছিল, তুই কি করতে চাস, জানাস আমাদের। আমরা ব্যবস্থা করে দেব। কাউ জানত সে কি করবে, কিন্তু ঠিক কেমন করে তা সম্ভব হবে, কবে সম্ভব হবে, তা ঠিক করতে পারেনি তখনও। কিন্তু মনের মধ্যে তার তুষানল জ্বলছিল দিবারাত্রি। সে তুষানলে যতীশবাবু এসে ইন্ধন জোগাতেন। তাঁর একটু স্বার্থও ছিল। একদিন কাউ তাঁকে বলেছিল, ''আমি যদি হাতে হঠাৎ কিছু টাকা পেয়ে যাই তাহলে সে টাকা আপনাকেই দেব যতীশবাবু। পাওয়া অসম্ভব নয়, ঝাবরা মাঝে মাঝে আমাকে টাকা এনে দেয়।''

যতীশবাবু আশায় আশায় ছিলেন।

।। একত্রিশ ।।

গণেশ হালদার স্কুলের জন্য যে ঘরটি চেয়েছিলেন সেটি পেলেন না। শৃগাল-বিষ্ঠার প্রয়োজন হলে শৃগাল পর্বত-শিখরে গিয়ে মল-ত্যাগ করে, এইরকম একটা জনশ্রুতি আছে। হরিবাবু শৃগালেরও উপরে টেক্কা দিলেন। মিথ্যা কথা বললেন তিনি। বললেন, তাঁর ভায়রাভাইয়ের শালা আসবে, তার জন্যই বাড়িটা তিনি রেখেছেন। বাড়িটা বাড়ি হিসেবে জঘন্য। ছাত ফাটা, কল, আলো, কিছুই নেই। চারিপাশে প্রতিবেশী নেই, আছে বন-জঙ্গল। ও বাড়িতে কেউ বাস করতে পারে না। বলেই বাড়ি খালি পড়ে আছে। বহুকাল আগে মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিয়ে একজন ভাড়াটে ছিল, কিন্তু সে ছিল মাত্র একমাস। তারপর থেকে বাড়িটা খালিই পড়ে আছে। ইচ্ছে করলেই তিনি বাড়িটা অনায়াসে দিতে পারতেন। কিন্তু যেই শুনলেন রিফিউজি ছেলে-মেয়েদের জন্য এখানে স্কুল করবেন স্কুল-বিতাড়িত বাঙাল মাস্টার গণেশ হালদার, অমনি ভড়কে গেলেন তিনি। রিফিউজিদের তিনি বিদ্বেষের চোখে দেখেন। অহেতুক একটা রাগ আছে তাদের উপর। তাঁর প্রাণের বন্ধু উকিল নবগোপালবাবু বললেন, খবরদার, দেবেন না মশাই, দিলে ও বাড়ি আর ফেরত পাবেন না। সুতরা হরিহর ডাক্তার ঘোষালকে হাত কচলে কচলে মিথ্যে কথাটি বললেন, ''আপনার কথা ফেলতাম না ডাক্তারবাবু। কিন্তু কি করব, আমার ভাইরাভাইয়ের শালা বটু চিঠি লিখেছে এখানে আসবে, তার জন্যে বাড়িটা যেন রেখে দি। আত্মীয় স্থল, রাখতেই হয়েছে কি করব।''

সব শুনে ডাক্তার মুখার্জি প্রশ্ন করলেন, ''আপনি দুপুরে ঘণ্টা দুয়েক পড়াবেন তো? তার জন্যে বাড়ির দরকার কি । আমাদের বাড়ির সামনের মাঠে যে বিরাট বটগাছটা আছে তার তলাতেই শুরু করে দিন না স্কুল। রবিবার আর বুধবার ওখানে হাট বসে, সে দু'দিন স্কুলের ছুটি থাকবে। বনস্পতি বিদ্যালয় নাম দিয়ে ওইখানেই শুরু করে দিন আপাতত। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ওই গাছতলাতেই আরম্ভ হয়েছিল। আজ তা বিশ্বভারতী হয়েছে।''

গণেশ হালদার বললেন, ''বেশ।''

ব্যাপারটা নতুন ধরনের হওয়াতে তিনি আরও বেশি উৎসাহিত হলেন। কিন্তু তাঁর উৎসাহ সীমা ছাড়িয়ে গেল যখন ডাক্তারবাবু বললেন, ''আমি আপনার স্কুলের ছেলে-মেয়েদের বই শ্লেট কেনবার জন্য একশ টাকা চাঁদাও দিচ্ছি। আপনি দরকার মতো কিনে দেবেন ওদের। পরশু

বৃহস্পতিবার, পরশু দিনই আরম্ভ করে দিন স্কুল। আজ সোমবার, তিনদিন হাতে পাচ্ছেন। রিফিউজি পাড়ায় খবরটা চাউর করে দিন।"

"বেশ।"

সোৎসাহে বেরিয়ে গেলেন গণেশ হালদার।

বৃহস্পতিবার মাত্র বারোজন ছাত্রছাত্রী জুটল। তাদের সঙ্গে তাদের বয়স্ক আত্মীয়রাও এসেছিল। গণেশ হালদার প্রত্যেককে একখানি করে বর্ণ পরিচয়, ধারাপাত এবং স্লেট দিলেন। বারোটা স্লেটের উপর বারোটি ছেলে-মেয়ের হাতেখড়িও দিয়ে দিলেন তিনি। বারোটি "অ" লেখা হল, তাতে দাগা বুলোতে লাগল তারা। খানিকক্ষণ দাগা বুলাবার পর শতকিয়া বোঝালেন নিজে। তারপর নিজে "বন্দে মাতরম্" গানটি গেয়ে শোনালেন। বললেন, "কাল থেকে এ গান স্কুল বসবার আগেই গাওয়া হবে। তোমরা সবাই মিলে আমার সঙ্গে গাইবে। সবাই মুখস্থ করে ফেল গানটা।" তিনি যে এত সুন্দর গান গাইতে পারেন তা আগে কেউ জানত না। যে সব বয়স্ক আত্মীয়েরা এসেছিলেন গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তাঁরা। তাঁদের মনে হল, এ গান নয়, এ যেন হৃদয় থেকে স্বতোৎসারিত ভক্তি-প্রস্রবণ।

গানের পর বক্তৃতা দিলেন একটি। বক্তৃতায় যা বললেন তা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারল না হয়তো, কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিরা বুঝল এবং রুদ্ধশ্বাসে শুনতে লাগল।

গণেশ হালদার বললেন— "তোমরা আমার আপনার লোক। তোমাদের যাতে ভালো হয় তার জন্যে যতটা আমার সাধ্যে কুলোয় তা আমি করব। কিন্তু তার আগে গোটাকতক কথা শুনে নাও। রাজনীতির চক্রান্তে আমরা পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হয়ে এ দেশে এসেছি। আবার যদি সুদিন আসে, আবার যদি ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়, আমরা হয়তো নিজেদের দেশে ফিরে যাব। কিন্তু একটা কথা তোমাদের মনে রাখতে হবে। যে দেশে আমরা এসেছি তা-ও আমাদের দেশ। আমাদের ভারত-মাতার এক রূপ নয়, অনেক রূপ। তিনি এক ভাষায় কথা বলেন না, অনেক ভাষায় কথা বলেন। একরকম খাবার এক মুখ দিয়ে খান না, বহুরকম খাবার বহু মুখ দিয়ে খান। কিন্তু যেখানেই যে রূপেই তিনি থাকুন, তিনি আমাদের মা, আমাদেরই আপন লোক। হিমালয় থেকে কুমারিকা এবং পাঞ্জাব থেকে আসাম সবই আমাদের দেশ। এক কথায় ভারতবর্ষের মধ্যে কোনো দেশই আমাদের বিদেশ নয়, সবই স্বদেশ। সব জায়গাতেই বাস করবার সমান অধিকার। সুতরাং তোমরা এদেশকে বিদেশ বলে মনে করো না। এদেশে তোমাদের উপর নানারকম অন্যায় অত্যাচার হচ্ছে তা জানি। নিজের মাতৃভাষায় যাতে তোমরা লেখাপড়া করতে পার তার কোনো সুবন্দোবস্ত নেই। তোমরা যে কাজে পটু সে কাজ করবার ব্যবস্থা নেই। তোমাদের প্রতিবেশীরা তোমাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, অনেক সময় বিদ্বেষের চোখে দেখে। এ সবই সত্য। এর জন্য লড়তে হবে। সেই লড়াইয়ের প্রধান উপকরণ— মনের জোর আর মনুষ্যত্ব। দেশে যখন ছিলে তখন কি তোমাদের উপর অত্যাচার হয়নি? বড়লোক জমিদার আর সুদ-খোর মহাজনদের অত্যাচারে কি বিপদে পড়নি? তখন যারা মানুষের মতো লড়তে পেরেছিল তারা জিতেছে, এ রকম নজির অনেক আছে। এখানেও সরকারের দপ্তরে অসাধু কর্মচারীর অভাব নেই, প্রতিবেশীদের মধ্যে পাজি লোক অনেক। এদের সঙ্গে লড়তে হবে, আইনত লড়তে হবে। কিন্তু এ যুদ্ধে তোমরা সকলের সহানুভূতি পাবে। তোমরা সত্যিই যদি ভালো লোক হও। এইটেই আসল কথা এবং

সবচেয়ে বড় কথা। ওরা পাজি বলে তোমরাও পাজি হবে এটা কোনও কাজের কথা নয়। তোমাদের ভালো হতে হবে। ভালো থাকবার একটা প্রধান উপায় কাজ করা। তোমরা মনের মতো কাজ পাচ্ছ না বলে কুঁড়ে হয়ে বসে থাকবে সরকারের দয়ায় যতটুকু ভাতা পাচ্ছ— "তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে, আর অলস হয়ে বসে পর-নিন্দা পর-চর্চা করবে, এ মনোভাব মোটেই ভালো নয়। কাজ অনেক আছে, করবার ইচ্ছে থাকলেই তা করা যায়। কাজের অভাব নেই। কিন্তু যে কাজই কর সৎ এবং ভদ্র থাকতে হবে, সবাই যাতে তোমাদের শ্রদ্ধা করতে পারে। নিজের মনুষ্যত্ব মর্যাদা হারিয়ে ফেললে চলবে না, আর তা যদি না ফেল তাহলেই দেখবে সবাই তোমাদের খাতির করবে, চেষ্টা করবে কিসে তোমাদের ভালো হয়। আর একটা অনুরোধও তোমাদের করছি, অন্যায় কখনও সহ্য করবে না। তোমরা নিজেদের একটা পঞ্চায়েত তৈরি কর। ইংরাজিতে এর নাম ইউনিয়ন। এই পঞ্চায়েতের কাজ হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। গোড়াতেই বলেছি, ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই তোমাদের সব রকম সুবিধা পাওয়ার ন্যায্য অধিকার আছে, সেই অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। দেশের সরকার এবং দেশের আইন তোমাদের পক্ষে। কতকগুলি নীচমনা স্বার্থপর রাজকর্মচারীর ষড়যন্ত্রে আমরা সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হই, তাহলে আমাদের প্রতিবাদ করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে। আজ আর বেশি কিছু বলব না। সর্বশেষে আবার তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা যে মানুষ তোমরা যে ভদ্র, তোমরা যে স্বাধীন দেশের নাগরিক, তোমরাও যে এই বিশাল দেশের যোগ্য অধিবাসী, এই বোধটা কখনও হারিও না। এই বোধটা যদি অন্তরে সদাসর্বদা জাগ্রত রাখ, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

প্রথম দিনই স্কুলের খবর এবং গণেশ মাস্টারের আচরণের কথা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে, শুধু রিফিউজি মহল নয়, অন্যান্য মহলেও।

।। বত্রিশ ।।

সব শুনে বিস্ময়ে ডাক্তার ঘোষালের চোখ দুটো চলকে বেরিয়ে আসবার মতো হল। তিনি এই অবিশ্বাস্য প্রস্তাব শুনে ঝিনুকের মুখের দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

"বিলেত যাব? তোমার সঙ্গে? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? Have you gone mad?"

"আমি পাসপোর্ট' ভিসার সব ব্যবস্থা করছি। সেজন্য আপনি ভাববেন না। কিন্তু আপনাকে যেতেই হবে। ও দেশেও ডাক্তারি করতে পারবেন শামুক লিখেছে।"

"আমি ওদেশে যাব কেন! What's the reason."

ঝিনুক গম্ভীর হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর যা বলল তা অপ্রত্যাশিত। অন্য কোনো সময়ে সে বোধ হয় এ কথা বলত না।

বলল, "আপনাকে যেতে হবে, কারণ আমি যাব।"

ডাক্তার ঘোষাল ঈষৎ হাঁ করে রইলেন খানিকক্ষণ।

"তুমিই বা যাবে কেন। এখানে কি এমন জলে পড়েছ?"

"তা আপনাকে পরে বোঝাব। তবে এটা জেনে রাখুন, আমি যাবই। এখন চলুন "চিত্রশালা'য় গিয়ে দুটো ফোটো তোলাই। তারপর ইনকাম্‌ট্যাক্স অফিসার আর পুলিশ সাহেবের কাছে যেতে হবে।"

"কেন?"

"পাসপোর্টের জন্য এসব দরকার। তারপর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ওখানে যাব।"

ডাক্তার ঘোষাল ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

"শুকনো ঘরে জল ঢেলে কাদা করছ কেন! বেশ তো আছি আমরা।"

"আপনি সুখে আছেন হয়তো, কিন্তু আমি নেই। কেন নেই সে আলোচনা পরে করব। এখন চলুন। পাসপোর্ট করিয়ে রাখলে তো কোনও ক্ষতি নেই। ইচ্ছে করলে না-ও যেতে পারেন। যাবেন কি না সেটি পরে ঠিক করবেন। এ-বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।"

ডাক্তার ঘোষাল বললেন, "ফোটো তোলার কথায় একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। কয়েকদিন আগে একটা লোক এসে আমার ফোটো তুলে নিয়ে গেছে। কোন্ দিন জান? যেদিন বাঁদরটা এসে পাঁউরুটি নিয়ে যায়। বাঁদরটার সঙ্গে লোকটার যোগাযোগ আছে কি না জানি না, কিন্তু এটা ঠিক, লোকটা আমার ফোটো তুলেছে। হালদার মশাইও দেখেছেন। তাকে ধরলুম গিয়ে, সে বললে সে একটা পাখির ছবি তুলেছে—"

"তাই নাকি!"

ঝিনুক ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। বুকটা কেঁপে উঠল তার। তারা যে চোরাই মালের কারবার করে এটা জানাজানি হয়ে যায়নি তো! লোকটা পুলিশের গোয়েন্দা নয় তো? ডাক্তার ঘোষালকে কেন্দ্র করেই এ চলছে। তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তিই এর প্রধান মূলধন। অজানা একটা লোক এসে ফোটো তুলে নিয়ে গেল কেন? সে বিস্মিত হল বটে, কিন্তু সামলে নিতেও দেরি হল না তার।

"যাকগে সে যা হবার হবে। ও নিয়ে এখন আর ভেবে লাভ নেই। এখন চলুন চিত্রশালায়।"

"কেন ওসব ফ্যাচাং তুলছ, আমি যাব না কোথাও—"

"চলুন লক্ষ্মীটি--"

ডাক্তার ঘোষালের বাহু ধরে মৃদু আকর্ষণ করল ঝিনুক। যদিও ডাক্তার ঘোষালের কপালে ভ্রূকুটি দেখা গেল, কিন্তু তিনি গলে গেলেন ভিতরে ভিতরে। এই বোধ হয় প্রথম তিনি ঝিনুকের কাছে একটু আদরের আস্বাদ পেলেন।

"কি যে হাঙ্গামা কর তুমি ফর নাথিং!"

একরকম জোর করেই ঝিনুক তাঁকে "চিত্রশালায় নিয়ে গেল।

।। তেত্রিশ ।।

একজন ইংরেজ মনীষী মানুষের সংজ্ঞা দিয়েছেন— Man is a building animal ঃ মানুষ স্রষ্টা, সে গড়ে। সে ঘর গড়ে, সমাজ গড়ে, সাহিত্য গড়ে, রং দিয়ে পাথর দিয়ে মাটি দিয়ে কাগজ দিয়ে গড়ে অনবদ্য শিল্প। কত কিছুই না সে গড়েছে। কিন্তু এর আর একটা দিকও সমান সত্য। সে গড়ে কিন্তু রক্ষা করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত সব ভেঙে যায়, লুপ্ত হয়। কত সভ্যতা, কত সাহিত্য, কত শিল্প-সম্ভার, মনুষ্য নামক জীবের কত অপরূপ সৃষ্টি সমাহিত

হয়েছে বিস্মৃতির তলায়। মাঝে মাঝে সে সব হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়ে আমাদের চমকে দেয়। অধিকাংশই কিন্তু অনাবিষ্কৃতই থেকে যায়।

মিস্টার সেন স্ত্রীকে পুড়িয়ে এসে এই সব দার্শনিক চিন্তায় সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছিলেন। ভাঙ্গা-গড়াই পৃথিবীর অমোঘ নিয়ম। তিনি এর ব্যতিক্রম হবেন কি করে। দু'দিন আগে আর দু'দিন পরে।

শামুক চলে যাওয়ার পর তিনি কোনও নার্স পাননি। ঝিনুক যে মেয়েটির কথা বলেছিল সে আসেনি। বলেছিল, যেখানে শামুকদি থাকতে পারেননি সেখানে সে যাবে না। সুতরাং তিনি বাধ্য হয়ে স্ত্রীকে হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন। হাসপাতালে কেবিনের দৈনিক যা খরচ তা বহন করবার ক্ষমতা সম্ভবত তাঁর ছিল না। তাই তাঁকে সাধারণ ওয়ার্ডে ভর্তি করতে হয়েছিল তাঁর স্ত্রীকে।

আজকাল অনেক হাসপাতালে সাধারণ ওয়ার্ড মানে নরক। ইংরেজরা চলে গিয়ে আমরা যে কি স্বরাজ পেয়েছি তা বোঝা যায় ওই হাসপাতালগুলোর অবস্থা দেখলে। যে ওয়ার্ডে মিসেস সেন ভর্তি হয়েছিলেন সে ওয়ার্ডে কয়েকদিন আগে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। একটি বৃদ্ধা রোগিণী বাব বার জল চাইছিল নার্সের কাছে, তাঁর নিজের কাছে জলের কুঁজো ছিল না। নার্সটি তার কাছে সম্ভবত কোনো পয়সা পায়নি। (এসব হাসপাতালে কাছারির মতো প্রতি পদক্ষেপে পয়সা দিতে হয়)— তাই বারবার চাওয়া সত্ত্বেও সে জল দিচ্ছিল না। তার এক ছেলে অসুস্থ মাকে দেখতে এসেছিল। ছ'ফুট লম্বা বলিষ্ঠ-গঠন আহির গোয়ালা সে। বারবার চেয়েও তার মা যখন জল পেল না, তখন রক্ত গরম হয়ে উঠল গোয়ালাব। সে হঠাৎ ছুটে গিয়ে সুঁটকো নার্সটির (দেশী নার্স) চুলের ঝুঁটি ধরে দিল এক আছাড় মেঝের উপর। তারপর তাকে চড়িয়ে লাথিয়ে যে কাণ্ড করতে লাগল তা ভযাবহ। ছুটে এলেন হাসপাতালের ঘুষ-খোর কর্তৃপক্ষরা, ফোন করতে গেলেন থানায়। সে এক লাথিতে চুরমার করে ফেললে ফোনের যন্ত্রটা, তারপর হুঙ্কার দিয়ে উঠল— সব শালে কো মারকে শুতা দেংগে হিঁয়া (সব শালাকে মেরে শুইয়ে দেব এখানে।) ভয়ঙ্কর ব্যাপার, হুলুস্থূল কাণ্ড! তার বুড়ি মা-ই থামাল শেষকালে তাকে।

"মারপিট নেই কর বেটা। হিঁয়া অব নেই রৈব। ঘর চল।"

(মারামারি কোরো না বাবা! এখানে আর থাকব না। বাড়ি চল।)

মাকে পাঁজা-কোলা করে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে। আর আশ্চর্যের বিষয়, এ নিয়ে আর বিশেষ কোনো হৈ চৈ হল না। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষরাও চেপে গেলেন ব্যাপারটা কি জানি, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে যদি সাপ বেরিয়ে পড়ে।

এই হাসপাতালের সাধারণ ওয়ার্ডে মিস্টার সেন তাঁর স্ত্রীকে ভরতি করেছিলেন। এর জন্যও নানারকম 'পৈরবী' করতে হয়েছিল তাঁকে।

বেশিদিন নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি ভদ্রমহিলাকে। কয়েকদিন পরেই মারা গেলেন তিনি।

শ্মশান থেকে ফিরে এসে চুপ করে বসে ছিলেন মিস্টার সেন। নানারকম দার্শনিক চিন্তা মনে উদয় হচ্ছিল। শ্মশান-বৈরাগ্যের উদাস বিষণ্ন ছায়ায় অভিভূত হয়ে বসেছিলেন তিনি।

অনেকক্ষণ পরে তাঁর মনে হল— এবার কি করব! পৃথিবীতে আর তো কোনও অবলম্বন রইল না। বাকি জীবনটা কি নিয়ে, কাকে নিয়ে কাটানো যাবে? তনিমা আর ফিরবে বলে মনে

হয় না। তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ হয়েছে, তার সবগুলোর সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি। সুতরাং চাকরিও আর বেশিদিন নেই। এমনিই তো পেন্সনের সময় হয়ে এসেছে। একস্টেনশন আর পাওয়া যাবে না। বিমূঢ়ের মতো বসে রইলেন তিনি। কি করা যায় এখন।

তারপর মিস্টার সেনের হঠাৎ মনে পড়ল রঙ্গানন্দ স্বামীর কথা। লোকটি বেশ নামজাদা সাধু। তাঁর চেনা-শোনা অনেকেই মন্ত্র নিয়েছে তাঁর কাছে। ভারত-বিখ্যাত লোক। বড় বড় লোকদের তিনি গুরু এবং সংসার-সমুদ্রে অনেক মহারথীরই কর্ণধার। মিস্টার সেনের মনে হল, এঁর কাছে মন্ত্র নিলে কেমন হয়? অনেকদিন আগে তাঁর কাছে প্রস্তাবটা করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন আরও কিছুদিন যাক, এখনও তোমার সময় হয়নি। এখন আর একবার প্রস্তাবটা করলে কেমন হয়। মিস্টার সেনের স্বভাব যখন যেটা করবেন ঠিক করেন তখনই সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলেন সেটা। তখনি চিঠি লিখতে বসে গেলেন। সেন মহাশয় কলেজ জীবনে বাংলায় ভালো ছাত্র ছিলেন। সুমার্জিত ভাষায় তিনি নিম্নলিখিত চিঠি লিখলেন।

শ্রীশ্রীচরণে শতকোটি প্রণামান্তে নিবেদন,

মহারাজজী, আশা করি সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন। অনেকদিন আপনার খবর লইবার অবসর পাই নাই। সংসারের অনিত্য মায়ায় জড়িত-বিজড়িত হইয়া আপনার নিত্যবাণীর কথা বিস্মৃত হইতেছিলাম। বিস্মৃত হইতেছিলাম বলিলে ভুল হইবে, প্রায় প্রত্যহই আপনার সৌম্য মূর্তি মানসচক্ষে প্রতিভাত হইত, কিন্তু আপনাকে চিঠি লিখিবার মতো অবসর পাইতেছিলাম না। আমি যে কাজে এখন নিযুক্ত আছি তাহা বড়ই দায়িত্বপূর্ণ। অসহায় রিফিউজিদের ভার গভর্নমেন্ট আমার স্কন্ধেই অর্পণ করিয়াছেন। সে দায়িত্ব কত বড়, কত মহান, কত গভীর, কত তাৎপর্যপূর্ণ, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। আপনার আশীর্বাদে সে কর্তব্য আমি যথাসাধ্য প্রতিপালন করিয়া চলিয়াছি। কিন্তু ভগবান আমার উপর আশানুরূপ দয়া করেন নাই। আমার স্ত্রী বহুকালাবধি দুরারোগ্য পক্ষাঘাত ব্যাধিতে শয্যাগত ছিলেন। কাল রাত্রে তিনি ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আমার একমাত্র কন্যা তনিমা পড়িবার জন্য লন্ডনে চলিয়া গিয়াছে। তাহার স্বামীই তাহাকে লইয়া গিয়াছে। আমি বিদেশি ডিগ্রীর, বিদেশি সভ্যতার মোহে মুগ্ধ নহি। আমি তাহাদের বারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা আমার বারণ শোনে নাই। পরিবর্তিত যুগের আবহাওয়া ভয়ঙ্কর, তাহার গতিও প্রলয়ঙ্করী। স্বীকার করিতেছি আমি তাহাদের কাছে হার মানিয়াছি। সংসারে আমি এখন সম্পূর্ণ একা। দূরসম্পর্কের যে দুই একজন আত্মীয় আছেন, তাঁহারাও আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। ত্যাগ করিবার কারণ আমি নাকি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সনাতন হিন্দুধর্মকেই আমি এই তথাকথিত প্রগতির যুগে আঁকড়াইয়া আছি। স্ত্রী-বিয়োগের পর তাই আজ অত্যন্ত অসহায়চিত্তে আপনাকেই স্মরণ করিতেছি। আপনি ছাড়া আজ আর আমার প্রকৃত আত্মীয় কেহ নাই। আমি কিছুকাল পূর্বে আপনার নিকট দীক্ষা চাহিয়াছিলাম, কেন জানি না, বহুকাল পূর্বেই আপনার প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলাম, এখনও সে আকর্ষণ তেমনি আছে। সম্প্রতি আমার আত্মাও আধ্যাত্মিক পিপাসায় কাতর হইয়াছে। পার্থিব সুখে সে তৃষ্ণা মিটিবে না জানি। ইহাও জানি আপনি ছাড়া সে তৃষ্ণার বারি আমাকে কেহ দিতে পারিবে না। তাই আপনার নিকট গললগ্নীকৃতবাসে সানুনয়ে আবার কাতর প্রার্থনা জানাইতেছি—আমাকে রক্ষা করুন। আমি একা, আমি শোকাহত, আমি

অবলম্বনহীন। আপনি ছাড়া আমাকে সান্ত্বনা দিবার, আমাকে পথ দেখাইবার, আমার অন্ধকার জীবনে আলোক-সম্পাত করিবার দ্বিতীয় লোক আর কেহ নাই। এবার আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না, শ্রীশ্রীচরণে স্থান দিয়া কৃতার্থ করুন। আপনার উত্তরের আশায় উন্মুখ প্রতীক্ষায় রহিলাম। আমার শতকোটি প্রণাম গ্রহণ করুন।

ইতি— সেবক
শ্রীনিতাইগোপাল সেন।

চিঠি পাঠাবার দু'দিন পরেই রঙ্গানন্দ স্বামীর উত্তর এল। চিঠিতে নয়, টেলিগ্রামে। Come at once —অবিলম্বে চলে এস। রঙ্গানন্দ তখন দেরাদুনে এক হোমরা-চোমরা বড়লোক শিষ্যের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। সাতদিনের ছুটি নিয়ে মিস্টার সেনও সেখানে চলে গেলেন। তিনি যখন কালেক্টার সাহেবের কাছে ছুটি নেবার জন্য গেলেন, তখন তিনি বললেন, 'ছুটি আপনাকে দিচ্ছি। কিন্তু ফিরে এসে আপনাকে ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। আপনার নামে কিছু কম্‌প্লেন এসেছে।'

।। চৌত্রিশ ।।

ছোট কাঁচপোকা যেমন প্রকাণ্ড আরশোলাকে অনায়াসে টেনে নিয়ে যায়, তেমনি করে ঝিনুক ডাক্তার ঘোষালকে নিয়ে টেনে টেনে বেড়াতে লাগল চারদিকে। তার দৃঢ় সঙ্কল্প পাসপোর্ট আর ভিসার ব্যবস্থা সে করবেই। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সাহায্য করলেন তাকে। পুলিশ সাহেব আর ইনকামট্যাক্স অফিসারের সঙ্গে ডাক্তার ঘোষালের আলাপ ছিল। তাঁরাও কোনও বাধা দিলেন না। বাধা ছিলও না তেমন কিছু। তারপর সে একদিনের জন্য ডাক্তার ঘোষালকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেল। সেখানেও তেমন কোনও বাধা হল না। বিলেতে যাঁর আপিসে ওরা চাকরি পেয়েছে তিনি মস্ত ধনী লোক। এক ডাকে সবাই চেনে তাঁকে। ঝিনুক গিয়ে আবিষ্কার করল এখানকার আপিসেও তিনি চিঠি লিখেছেন এবং তাঁর চিঠির সঙ্গে ভারত গভর্নমেন্টের বড় একজন অফিসারেরও চিঠি আছে। সুতরাং দুজনের পাসপোর্টই হয়ে গেল সহজে। ডাক্তার ঘোষাল সবই যন্ত্রচালিতবৎ করে যাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ইদানীং রগের শির দুটো বেশি ফুলে উঠেছিল, চোখ দুটোও যেন বাইরে ঠেলে আসছিল। মনে হচ্ছিল যেন দম-বন্ধ করে আছেন। ঝিনুকও এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কোনও আলোচনা করা নিরাপদ মনে করেনি। সে বুঝতে পারছিল আলোচনার সুযোগ দিলেই ডাক্তার ঘোষাল আবার ক্ষেপে উঠবেন, হয়তো বেঁকে দাঁড়াবেন। তাই সে চুপচাপ ছিল। তারপর আর এ নিয়ে আলোচনা করবার সুযোগও হল না। কারণ কলকাতা থেকে ফিরে ডাক্তার ঘোষাল নিজের কাজকর্মে আরও বেশি করে মেতে উঠলেন যেন। তাঁর রোগীর সংখ্যা আরও বাড়তে লাগল। ঝিনুকের মনে হল বিলেত যেতে তো এখনও অন্তত দেড়মাস দেরি আছে। হয়তো বেশি দেরিও হতে পারে, কারণ প্লেনে সীট পাওয়া মুশকিল। অনিশ্চিতও খানিকটা। ততদিনে সে ডাক্তার ঘোষালকে রাজি করে নেবেই। প্রেমে পড়লে স্ত্রীলোকেরা হয়তো বুঝতে পারে প্রেমাস্পদের উপর তার কতখানি জোর আছে। ঝিনুকের বিশ্বাস ছিল ডাক্তার ঘোষাল শেষ পর্যন্ত রাজি হবেনই। প্লেনে সীট বুক করে তারপর এ নিয়ে আলোচনা করলেই হবে। ঝিনুক বাইরের কোনো লোককে এ বিষয় কিছু বলেনি কিন্তু। সে এখন

ঘোরাফেরা করছিল তার কাকার একটা ব্যবস্থা করবার জন্য। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আশ্বাস দিয়েছিলেন এটাও হয়ে যাবে। এজন্য কাকারও একটা ফোটোর প্রয়োজন হওয়াতে ঝিনুক একদিন তাঁকে বললেন, "তোমার দেশে ফিরে যাবার জন্যে পাসপোর্ট ভিসার ব্যবস্থা করছি। তোমার একটা ফোটো তোলাতে হবে।"

বিস্মিত যতীশ জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি যাবে না?"

"আমি যাব না। তুমি দেশে ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছ, এখানে তোমার ভালোও লাগছে না, তুমি একাই চলে যাও।"

"সেখানে কোথায় থাকব! আমাদের ঘর তো পুড়ে গেছে।"

"নিধুকাকারা সেখানে এসে বসবাস করছেন খবর পেয়েছি। তাদের কাছেই থেক, মাসে মাসে কিছু খরচ পাঠাব তোমাকে।"

যতীশ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হল তাঁর পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। ইংরেজিতে যাকে 'কর্নার' করা বলে, ঝিনুক তাঁকে যেন তাই করেছে তাঁর মনে হল। তিনি প্রতিদিন বারবার বলে এসেছেন দেশে না গেলে তার শরীর টিকছে না, দেশে গেলেই তিনি শান্তিতে থাকবেন, দেশে গিয়ে মাছের ফলাও ব্যবসা করবেন, দেশে তাঁকে যেতেই হবে— কিন্তু এখন, যখন ঝিনুক দেশে যাবার সমস্ত বন্দোবস্ত করে ফেলেছে— তখন তাঁর প্রাণটা কেবল যেন হু হু করে উঠল। সে দেশে কি আর আছে? যে দাদার স্নেহচ্ছায়ায় এতদিন স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্তমনে স-প্রতাপে যা খুশি করে বেড়াতেন, সে দাদা তো আর নেই। সেখানে পর্বতের আড়ালে ছিলেন, পর্বত সরে গেছে। দাদা নেই, বাড়িও নেই। ঝিনুক, শামুক, সোনা কেউ সেখানে যাবে না, তিনি কি একা থাকতে পারবেন সেখানে? তাঁর হিন্দু বন্ধুরা কি কেউ বেঁচে আছে? মুসলমান বন্ধুরা কি তাঁকে ঠিক আগের মতো স্নেহভরে তাদের পাশে স্থান দেবে? তারা কি আগের মতোই আছে? বদলে যায়নি? এই ধরনের নানা চিন্তা তাঁর মাথায় ভিড় করে এল। তিনি দেশে যাবার কথা বলতেন নানা ছুতোয় টাকা আদায় করবার জন্য। হাতে কিছু টাকা না থাকলে তিনি স্বস্তি পান না। দেশে থাকতে কত আমোদে-প্রমোদ করতেন। এখানে সে সব কিছুই নেই। দশজনকে যখন তখন খাওয়ানো তাঁর একটা বাতিক ছিল। গ্রামের মহেশ ময়রার দোকানে খাওয়াতেন অনেককে। দাদা তাঁর দেনা শোধ করতেন। এখানেও অনেককে খাওয়াতে ইচ্ছে করে, দল-বেঁধে সিনেমায় যেতে ইচ্ছা করে—কিন্তু টাকা কই? ঝিনুক হাতখরচ হিসাবে যে টাকা দেয় তাতে তাঁর নিজেরই কুলায় না।

সুতরাং টাকার কথাই পাড়লেন।

"দেশে নিঃস্ব হয়ে থাকা যাবে না। বিশ ত্রিশ টাকা হাতখরচ নিয়ে সেখানে স্টাইলে থাকা অসম্ভব। যে স্টাইলে সেখানে বরাবর থেকেছি সে স্টাইলে না থাকতে পারলে দেশে কেউ আমাকে মানবে না। তাছাড়া সেখানে মাছের ব্যবসা যদি আরম্ভ করি— কিছু একটা নিয়ে থাকতেই হবে—তার জন্যেও টাকার দরকার—"

"আমি আপনাকে প্রতি মাসে আপনার নিজের খরচের জন্য পঞ্চাশ টাকা করে পাঠাব। তাছাড়া দেশে আমাদের বাগান, জমি, পুকুর আছে, তা-ও আপনি ভোগ করবেন। নিধুকাকার ওখানেই থাকবেন, আদর করে রাখবেন তিনি। তিনি লোক খুব ভালো। আমার বাবাই তাঁকে

মানুষ করেছিলেন এককালে, অভাবে পড়লে তাঁর সাহায্য আপনি নিশ্চয়ই পাবেন। মাছের টাকার জন্য এখুনি কত টাকা চাই আপনার?"

"অন্তত হাজার দুই না হলে তো আরম্ভই করা যাবে না। হাজার পাঁচেক যদি দিতে পারিস আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে পারি।"

লোভে যতীশবাবুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। ঝিনুক চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। মাখানিয়ার মাঠে তার চোরাই টাকা পোঁতা আছে হাজার কয়েক। টাকাটা সে রেখেছিল রিফিউজিদের বিদেশে পাঠাবার জন্যে। সুবেদার খাঁর কৃপায় তার জানাশোনা অনেকেই চলে গেছে. কিছুদিন পরে সে-ও চলে যাবে!

বলল, "বেশ পাঁচ হাজার টাকাই আপনাকে দেব। টাকাটা কিন্তু লুকিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পারবেন তো?"

"খুব পারবো।"

যতীশ বাবুর চেহারাটা বদলে গেল যেন। নাকের ডগাটা কাঁপতে লাগল।

"তাহলে চলুন ফোটোটা তোলাই গিয়ে।" যেতে যেতে মনে পড়ল সেইদিন রাত্রেই সুবেদার খাঁর সঙ্গে স্টেশনে দেখা করবার কথা আছে। টাইপ-করা চিঠিটা আবার বের করে পড়ল সে।

।। পঁয়ত্রিশ ।।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। স্টেশনের ঘড়িতে প্রায় দুটো বাজে। মেয়েদের ওয়েটিং-রুমে কোনো লোক ছিল না বলে ঝিনুক সেইখানে বসেই অপেক্ষা করছিল। ট্রেন 'লেট' আসছিল সেদিন। প্রায় দু'ঘন্টা লেট। স্টেশন মাস্টার পাণ্ডা এসে গল্প করছিলেন তার সঙ্গে বসে। পাণ্ডা ইদানিং ডাক্তার ঘোষালের আড্ডায় যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি চতুর লোক। তিনি যে নীতির অনুসরণ করেন, সে-নীতির নাম ধরি-মাছ না-ছুঁই-পানি নীতি। প্রচুর ঘুষ খান, কিন্তু গোঁফে, ঠোঁটে বা হাতে সামান্য দাগ পর্যন্ত লাগে না। প্রায় আলগোছে গিলে যান। তাঁকে যারা ঘুষ দেয় তারা জানতে পারে না যে কাকে ঘুষ দিচ্ছে। ঘুষ নেবার জন্য বেসরকারী লোক আছে। তারাই টাকা নেয় এবং সে টাকা লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করে। এজন্য ঘুষেরই একটা অংশ পায় তারা। সুবেদার খাঁর চোরা ব্যবসাতেও একজন অংশীদার তিনি। তাঁর কাজ সুবেদার খাঁকে আড়াল করা। তিনি আর কিছু করেন না। তাঁর সহযোগিতা না থাকলে সুবেদার খাঁ নির্ভয়ে মাল পাচার করতে পারতেন না। অনেকদিন তিনি টাকাকড়ির অংশ পাননি। তনিমার অন্তর্ধানের পর ভয়ে ভয়ে তিনি আর ডাক্তার ঘোষালের আড্ডায় যাননি। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে— শেষে তিনিও যদি জড়িয়ে পড়েন— এই ধরনের একটা ভয় হওয়াতে সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন তিনি।

অনেকদিন পরে ঝিনুককে হঠাৎ স্টেশনে দেখে তাই তিনি সাগ্রহে এগিয়ে এলেন। ওয়েটিং-রুমে আর কেউ না থাকাতে তাঁর সুবিধাই হল।

"এই যে! অনেকদিন পরে দেখা হল। কোথাও যাবেন না কি?"

"না, যাব না কোথাও। সুবেদার খাঁ এই ট্রেন নিয়ে আসছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

পাণ্ডা মুখ ফিরিয়ে অন্য দেওয়ালের দিকে চেয়ে বললেন, "সুবেদার খাঁ সৌভাগ্যবান লোক, ডাক্তার ঘোষাল তো সৌভাগ্যবান বটেই। আমিই অভাগা।"

মুচকি হেসে ঝিনুক বললে, "ঠিক বুঝতে পারলুম না। আপনার মতো সৌভাগ্যবান লোক ক'টা আছে এ শহরে। কাশীতে বাড়ি করেছেন, কলকাতায় করেছেন, এখানেও এক বিঘে জমি কিনেছেন শুনছি। আপনার ছেলে বিলেত গেছে, মেয়েদের ভালো বিয়ে দিয়েছেন—"

"ঠিক, সবই ঠিক। কিন্তু ওসব হচ্ছে বাইরের সৌভাগ্য, ওইটেই লোকে দেখতে পায়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি অভাগা, চিরবঞ্চিত চিরভিখারী। মুখ ফুটে এসব বলা যায় না, বললেও বোঝান যায় না। মন দিয়ে তা বুঝতে হয়, মনের কথা মনই জানতে পারে, যদি দরদী মন হয়—"

আবার দেওয়ালের দিকে চাইলেন।

বহুদিন আগে আর একবার তিনি ঝিনুককে একলা পেয়েছিলেন, তখনও এই রকম আবছা-আবছা রহস্যময় ভাষায় প্রণয় নিবেদন করবার চেষ্টা করেছিলেন। এবারও করলেন। কিন্তু ঝিনুকের তরফ থেকে কোনও সাড়াশব্দ এল না। সে চুপ করে রইল। পাণ্ডা বুঝলেন সুবিধা হল না। অন্য প্রসঙ্গে উপনীত হলেন।

"সুবেদার খাঁর আজ আসবার খবর কি করে পেলেন? চিঠি লিখেছিল না কি?"

"হ্যাঁ। দেখা করতেই লিখেছিলেন।"

"তার কারবারের খবর কি? বন্ধ হয়ে গেল নাকি! আমি তো ইদানীং কোনো খবরই পাইনি।"

"প্রায় বন্ধই। আজকাল আর বিশেষ কিছু হয় না। হলে আপনি নিশ্চয়ই খবর পাবেন।"

"অ—"

পাণ্ডা গলা চুলকুতে চুলকুতে আবার দেওয়ালের দিকে চাইলেন। তারপর সেইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বললেন, "ওকে একটু সাবধান করে দেবেন। পুলিশ থেকে দু'একটা এন্কোয়ারি এসেছিল ওর নামে। আমি অবশ্য চেপে দিয়েছি—"

"কি রকম এন্কোয়ারি?"

"তা বলা চলবে না, অফিশিয়াল সিক্রেট। আপনাকে একটু হিন্ট দিয়ে দিলাম শুধু।"

"আচ্ছা বলব। আপনার কি আজ নাইট ডিউটি?"

"না। আমি এসেছি আমাদের ডি. এস. আজ এই ট্রেনে যাচ্ছেন বলে। তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে হবে, তোয়াজ তদ্বিরও করতে হবে। চাকরি তো—"

একজন কুলী এসে বললে— "হুজুর, এক্ঠো ফোন আয়া।"

পাণ্ডাকে উঠতে হল।

"দেখি কোথা থেকে ফোন এল আবার। ট্রেনের দেরি আছে, আপনি ওই ইজিচেয়ারটায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুন। ঘুমে আপনার চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু করছে—"

মুচকি হেসে পাণ্ডা বেরিয়ে গেলেন। ঝিনুকের সত্যিই ঘুম পাচ্ছিল। সে ইজিচেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। তার প্ল্যান (Plan) ছিল স্টেশনের কাজ সেরে মাখানিয়ার মাঠে যাবে তার সেই টাকাটা তুলে আনতে। তার মনে হয়েছিল মাখানিয়ার টাকাটা এনে এখন কাছে রাখাই ভালো। কাকাকে সে পাঁচ হাজার টাকা দেবে ঠিক করে ফেলেছিল।

নানাকথা ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙল দেখল একটি পায়জামাপরা ফরসা ছিপছিপে লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা ক্যামেরা। ঝিনুক উঠে বসতেই লোকটি বেরিয়ে গেল। ঝিনুকও সঙ্গে সঙ্গে উঠে অনুসরণ করল তাকে। প্ল্যাটফর্মে

বেরিয়েই কিন্তু দেখতে পেল না কাউকে। এদিক ওদিক চাইতে চাইতে এগিয়ে গিয়েই পেল পুরুষদের ওয়েটিং-রুমে লোকটি বসে সাদা লম্বা একটি সিগারেট হোল্ডারে কালো একটি সিগারেট পরিয়ে নিবিষ্ট মনে ধরাচ্ছে। ঝিনুক ঢুকে পড়ল সেখানে। সবিস্ময়ে গিয়ে প্রশ্ন করল, "আপনিই কি একটু আগে আমার কাছে এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ, ভুল করে ফিমেল ওয়েটিং-রুমে ঢুকে পড়েছিলাম। ক্ষমা করবেন। আপনি ঘুমুচ্ছেন দেখে চলে এলাম।"

এরপর আর বলবার কি থাকতে পারে। ঝিনুক বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসেই নজরে পড়ল একটু দূরে একটা বাঁদরও বসে আছে চুপ করে। তাকে ঘিরে একদল প্যাসেঞ্জারও ভিড় করেছে। বাঁদরটা ঝিনুকের দিকে মিটিমিটি চাইতে লাগল, মনে হল যেন রহস্যের সমাধান সে জানে। ঝিনুকের হঠাৎ মনে হল এই লোকটাই কি ডাক্তার ঘোষালের ফোটো তুলেছিল? তার সঙ্গেও বাঁদর ছিল একটা। কিন্তু এ-নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামাবার সময় আর পেল না, কারণ ঢং ঢং ঢং ঢং করে ট্রেন আসবার ঘণ্টা পড়ে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে ইঞ্জিনের মাথার বড় আলোটাও দেখতে পেল সে।

ট্রেন এসে পড়েছে। সে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল, কারণ সুবেদার খাঁ ইন্‌জিনে থাকবেন। সুবেদার খাঁ ট্রেন আসার সঙ্গে সঙ্গে মুখ বাড়িয়ে দেখছিলেন ঝিনুক এসেছে কিনা। ঝিনুককে দেখতে পেয়েই তিনি বড় একটা কাঁঠাল বার করে প্ল্যাটফর্মের উপর রাখলেন। কাঁঠালটা সম্ভবত ফেটে গিয়েছিল, কারণ একটা দড়ি তার চারপাশে জড়ানো ছিল। ঝিনুক কাছে আসতেই বললে, "কাঁঠালটা ওইখানেই নাবিয়ে দিয়েছি। সাবধানে নিয়ে যেও। বাড়ি গিয়ে আড়ালে খুলো ওটা। কোয়া ছাড়া অন্য জিনিসও আছে।"

তারপর নিম্নকণ্ঠে বললেন, "সোনার বাট আছে গোটা দুই। তারপর এখানকার খবর কি—"

"এখানে আমাদের বাসা বোধ হয় আর থাকবে না। কাকাকে দেশে পাঠিয়ে দেব। কালেক্টার সাহেব সুপারিশ করেছেন। পাসপোর্ট-ভিসার কোনও অসুবিধা হবে না। আমি আর ডাক্তার ঘোষালও লন্ডন চলে যাচ্ছি।"

"লন্ডন? কেন!"

"সেখানে আমরা দুজনেই ভালো চাকরি পেয়েছি। ওখান থেকেই যতটা পারি রিফিউজিদের সাহায্য করব। এসব হীন কাজ আর ভালো লাগছে না। এদেশে আর থাকতেও পারছি না।"

সুবেদার খাঁর মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল।

"পাসপোর্টের কি হবে?"

"যাঁরা আমাদের চাকরি দিয়েছেন তাঁরাই সে ব্যবস্থা করবেন। আমরাও দরখাস্ত করেছি। মনে হয় ওর জন্যে আটকাবে না।"

"ডাক্তার ঘোষাল রাজি হয়েছেন?"

ঝিনুক মুচকি হেসে বললেন, "এখনও পুরো হননি, তবে মনে হয় শেষ পর্যন্ত হবেন।"

ঝিনুক আবার সুমিষ্ট হাসি হেসে অন্য দিকে মুখ ফেরাল। মুখ ফিরিয়েই চিৎকার করে উঠল সে। দেখল সেই বাঁদরটা এসে কাঁঠালটাকে ভেঙে ফেলেছে আর গপ্ গপ্ করে কোয়াগুলো খাচ্ছে। ছত্রাকার হয়ে পড়েছে সব চারিদিকে। ভিড় জমে গেছে। সুবেদার খাঁ

তড়াক করে নেবে এলেন ইন্‌জিন্‌ থেকে, উবু হয়ে কি যেন খুঁজতে লাগলেন কাঁঠালের কোয়াগুলো সরিয়ে সরিয়ে।

'নমস্কার। সুবেদার সাহেব যে। ও আর ঘাঁটবেন না। মাল আমি নিয়েছি—''

কাগজে মোড়া বাট দুটো খুলে দেখালেন। সুবেদার খাঁ সবিস্ময়ে দেখলেন পৃথিবীনন্দন।

পৃথিবীনন্দন সহাস্য মুখে এগিয়ে এলেন।

''আপনি তো সাহেবগঞ্জে যাচ্ছেন? চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাব। কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে। দরকারী কথা।''

প্রায় সেই সময়েই গার্ডের হুইস্‌ল শোনা গেল। সুবেদার খাঁ ইন্‌জিনে চড়ে বসলেন। পাশেই একটা খালি ফাস্টক্লাস ছিল, সেইটেতে পৃথিবীনন্দন উঠে বসলেন তাঁর বাঁদর নিয়ে।

ঝিনুক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সাহেবগঞ্জে গঙ্গার ধারে যে ফাঁকা মাঠটা ছিল সেইখানে গিয়ে বসেছিলেন সুবেদার খাঁ আর পৃথিবীনন্দন। বাঁদরটা কাছেই একটা পেয়ারা গাছে উঠে বসেছিল। স্টেশনে বা হোটেলে নির্জন জায়গা পাওয়া যায়নি বলেই তাঁরা এতদূর এসেছিলেন।

পৃথিবীনন্দন বললেন, ''আমার ইতিহাসটা তাহলে শুনুন। আপনার সঙ্গে যখন হোটেলে প্রথম দেখা হয় তখন আপনাকে বলেছিলাম আমি সার্কাসের লোক। ছেলেবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে সার্কাসে যোগ দিয়েছিলাম। সেই থেকে সার্কাসে সার্কাসেই ঘুরছি। হয়তো সারাজীবনটাই সার্কাসে কেটে যেত, কিন্তু জীবনের বন্ধন হঠাৎ ছিন্ন হয়ে গেল। ফুল্লরা বলে একটি মেয়ে আমার সঙ্গে সিংহের খেলা দেখাত। আমিই শিখিয়েছিলাম তাকে। আমার বাড়ি পূর্ববঙ্গে, ফুল্লরাও পূর্ববঙ্গের মেয়ে। পূর্ববঙ্গে ঐতিহাসিক 'রায়ট্‌' হবার অনেক আগেই ফুল্লরার বিধবা মা ফুল্লরাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়। কারণ একজন মুসলমান 'রইস' নজর দিয়েছিলেন ফুল্লরার উপর। দেশের লোক বলে আমার অনেক আগে থেকেই আলাপ ছিল ওদের সঙ্গে। ফুল্লরার মা কলকাতায় এক জায়গায় রাঁধুনী ছিল। আমিও তাদের কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করতাম। ফুল্লরার মা হঠাৎ একদিন মারা গেল। তখন আমি এলাহাবাদে সার্কাস করেছি। ফুল্লরা আমাকে চিঠি লিখল, 'আমি এখানে মায়ের চাকরিটা পেয়েছি। কিন্তু একা থাকতে ভয় করে। কারণ আমাদের গাঁয়ের সেই মুসলমান লোকটা এখানেও আমাদের বাড়ির আশে-পাশে ঘোরা-ফেরা করছে।' আমি তখন তাকে আমার কাছেই নিয়ে এলুম। সার্কাসের খেলা শেখাতে লাগলুম। খুব ভালো খেলোয়াড় হয়েছিল সে। ওর মতো সিংহের খেলা আর কেউ দেখাতে পারত না। কিন্তু সে-ই সিংহের হাতেই একদিন ওর প্রাণ গেল। একটা নতুন সিংহ এসেছিল, এক থাবায় ফুল্লরার ঘাড়টা বেঁকিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে মরে নি সে, দু'দিন বেঁচে ছিল। মৃত্যুকালে আমাকে বলে গিয়েছিল, আপনি আমাকে যে হারটা দিয়েছিলেন সেটা, আর মায়ের কিছু গয়না, আমার ছোট ক্যাশবাক্সে আছে। সে সব বিক্রি করে আপনি কোনও ভালো কাজে দান করে দেবেন। এই বলে সে মরে গেল। আমি তার ঘরে গিয়ে দেখি ক্যাশবাক্স নেই, চাকরটাও উধাও হয়েছে। আপনি আশা করি হাই-ব্রাও মরালিস্ট নন।''

সুবেদার খাঁ নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন। আচমকা প্রশ্নটা শুনে চমকে উঠলেন। তারপর হেসে বললেন, ''না আমি কোনো ব্যাপারেই হাই-ব্রাও নই।''

''গুড্‌। তাহলে শুনুন। ওই ফুল্লরা ছিল আমাদের চোখের আলো, মাথার মণি, জীবনের

একমাত্র অবলম্বন। ফুল্লরা মারা যাওয়াতে আমার আর সার্কাসে থাকতে ইচ্ছে হল না। যে সিংহটা ফুল্লরাকে মেরেছিল তাকে গুলি করে আর ওই বাঁদর ছানাটাকে নিয়ে আমি সার্কাস পার্টি ছেড়ে দিলাম। ছেলেবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম। বাড়ির কোনো খবর নিইনি। ইচ্ছে হল বাড়ি ফিরে যাই। খোঁজ করতে গিয়ে দেখি বাড়ি নেই, ভিটেতে মুরগি চরছে। আমার বুড়ো বাবা মা কলমা পড়ে মুসলমান হতে রাজি হয়নি বলে তাদের খুন করে গাজিরা নিজেদের বেহেস্ত যাওয়ার পথ প্রশস্ততর করেছেন। সুতরাং আমি কলকাতায় আবার ফিরে এলাম এবং অবলম্বনহীন হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। এক মাত্র সঙ্গী ওই মংক। ওকেই নানারকম খেলা শেখাতুম। এ এখন মানুষ হয়ে গেছে। এই ভাবেই চলছিল, এমন সময় একদিন বেন্টিংক স্ট্রীটে সেই চাকরটাকে দেখতে পেলাম, যে ফুল্লরার ক্যাশবাক্সটা নিয়ে সরেছিল। দৌড়ে গিয়ে ক্যাঁক করে ধরলাম তাকে। তার অঙ্গে খাকি পোশাক, মাথায় লাল পাগড়ি, বললে সে এখন কনেস্টবলগিরি করছে। আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বললাম 'তুমি ক্যাশবাক্স চুরি করে পালিয়েছিলে, তোমাদের উপরওলা সাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ আছে, ক্যাশবাক্স আর তার মধ্যে যে সব গয়না ছিল তা যদি ফেরত না দাও আমি এখনই তোমাকে সেই সাহেবের কাছে নিয়ে যাব। তিনি আমার দোস্ত। লোকটা দেখল বেগতিক। বলল, ক্যাশবাক্স হুজুর আমি লোভে পড়ে নিয়েছিলাম তা ঠিক, কিন্তু তা আমি বিক্রি করে দিয়েছিলাম চোরা-বাজারে একটা লোকের কাছে। বললাম, বেশ, আমাকে নিয়ে চল তার কাছে। সেও বললে, মাল তার কাছে নেই, পাচার করে দিয়েছে। কোথায় পাচার করেছে সে খবরও বার করলুম তার কাছ থেকে। পুলিশের কোনো বড় সাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না, কনস্টেবলটাকে ধাপ্পা দিয়েছিলাম। কিন্তু চোরা-বাজারের কারবারীদের সে কথা বললাম না। তাদের অন্য গল্প বললাম এবং টাকার লোভ দেখালাম। বললাম, ওই ক্যাশবাক্সের ভিতর গয়না ছাড়া একটা লোহার মন্ত্র-সিদ্ধ মাদুলী ছিল, সেইটিই আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। সেটা যদি তোমরা কেউ উদ্ধার করে দিতে পার তোমাদের বক্‌শিশ দেব। টাকার লোভে তারা আমাকে এক চোরের আড়ত থেকে আর এক চোরের আড়তে নিয়ে যেতে লাগল। চোর হলেই সব সময় খারাপ লোক হয় না, ক্রমশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল ওদের দু'একজনের সঙ্গে। তারা আমাকে নানা সন্ধান দিত। ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরছিলাম, জীবনে একটা নতুন অবলম্বন পেয়ে গেলাম। এইভাবে খোঁজ করতে করতেই শেষকালে আপনার নাগাল পাই। যে লোকটি আপনার সন্ধান দিয়েছিল সেই লোকটিই বলেছিল আপনি পাইকারী দরে চোরাই মাল কিনে হংকংয়ে বিক্রি করেন। সেই থেকে আমি আপনার পিছু নিয়েছি। তারপর ভাগলপুরের একটা হোটেলে মংকুর সহায়তায় আপনার সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে গেল। তারপর— যাক্ 'ডিটেলস্' শুনে লাভ নেই— এইটুকু শুধু জেনে রাখুন, আপনার এবং আপনার দলের সমস্ত খবর আমি জোগাড় করেছি প্রমাণ সমেত। আপনি যাদের সঙ্গে কারবার করেছেন তারা অনেকে আপনার বিরুদ্ধে লিখিত বিবরণ দিয়েছে আমার কাছে। আপনাদের প্রত্যেকের ফোটো, এমন কি ওই যে মেয়েটি কাল স্টেশনে এসেছিল তার ফোটো, ডাক্তার ঘোষালের ফোটো, স্টেশন মাস্টার পাণ্ডার ফোটো, এমন কি আপনার সেই হংকং কারবারীর ফোটোও— সব আমার কাছে আছে। আপনি তো আজ বমালসুদ্ধই ধরা পড়ে গেছেন। এই সব যদি পুলিশের কাছে ধরে দিই আপনি মহা বিপদে পড়ে যাবেন। আমি কিন্তু সেদিন আপনাকে বন্ধু বলে স্বীকার করেছিলাম, তাই আপনাদের কথা আমি পুলিশকে বলব না। কিন্তু দুটি শর্ত আছে ঃ প্রথম আপনি ফুল্লরার যে গয়না নিয়েছেন তার দাম

পাঁচ হাজার টাকা আমার চাই। সেটা কোনো হাসপাতালে দেব। ফুল্লরার শেষ ইচ্ছা আমাকে পূর্ণ করতে হবে। আমার দ্বিতীয় শর্ত ঃ আপনি যদি শুদ্ধি করে হিন্দু হতে না চান তাহলে আপনাকে পাকিস্তানে ফিরে যেতে হবে।"

সুবেদার খাঁ বিস্মিত হলেন।

"এ কথা বলছেন কেন!"

"কারণ আমি মনে করি প্রত্যেকটি মুসলমান হিন্দুস্থানের প্রচ্ছন্ন শত্রু।"

"আপনার এ রকম কুসংস্কার কেন? এটা প্রত্যাশা করিনি।"

"আপনি আমাকে চেনেন না, তাই প্রত্যাশা করেননি। আমার অনেক রকম কুসংস্কার আছে। আমি শনি-মঙ্গলবার মানি, ত্র্যহস্পর্শ মানি, গঙ্গা মানি, গয়া মানি— এটাও মানি। বাইরে যত ভালোই হোক এটা আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেক মুসলমান ভিতরে ভিতরে মুসলমানেরই ভালো চায়, হিন্দুর নয়। ওদের দিক থেকে বিচার করলে, এটা মহৎ, গুণ, কিন্তু আমাদের দিক থেকে এ মনোভাব সাংঘাতিক বিপজ্জনক। মৌখিক প্রেম-বিনিময়ের দ্বারা এ মনোভাব বদলানো যায় না। গান্ধীজীর মতো লোকও হিন্দু-মোসলেম প্যাক্ট্ করে কিছু করতে পারেননি। রাজনৈতিক দাবা খেলায় জিন্না সাহেবেরই জয় হয়েছে শেষকালে। দেশ যখন আলাদা হয়েই গেছে তখন যে যার দেশে থাকবে এইটেই বাঞ্ছনীয়। মুসলমানরা পাকিস্তানে গিয়েই থাক। আমি মশাই আপনার কাছে সরলভাবে স্বীকারই করছি আমার জীবনের ব্রত হচ্ছে এদেশ থেকে মুসলমান তাড়ানো। আমি পুলিশে গোয়েন্দাগিরির চাকরিও করি। অনেক মুসলমান গুণ্ডাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করেছি। আপনাকেও করব, কিন্তু আপনি যদি পাকিস্তানে চলে যেতে রাজি হন, তাহলে কিছু করব না।"

সুবেদার খাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চোখ দুটো জ্বলছিল জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো।

"আপনি যখন আমার সম্বন্ধে এত খোঁজ নিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই এ কথা জানেন যে হিন্দুরা আমার পরিবারবর্গকেও নিঃশেষ করে দিয়েছে। এ-ও নিশ্চয় জানেন যে আজ পর্যন্ত সৎ অসৎ যে কোনও উপায়ে আমি যত টাকা রোজগার করেছি তা খরচ করেছি হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্য—"

"জানি। কিন্তু এ-ও জানি যে আপনার চেতন লোকে কিংবা অবচেতন লোকে এর একটা কারণ আছে।"

"কি কারণ?"

"শ্রীমতী ঝিনুক।"

হঠাৎ সুবেদার খাঁ তাঁর প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফেললেন। পৃথিবীনন্দন এ বিষয়ে সতর্ক ছিলেন সম্ভবত। তিনি মার্জারের মতো ক্ষিপ্রগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সুবেদার খাঁর উপর এবং বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলেন তাঁর প্যান্টের পকেটে ঢোকানো হাতটা। একটু ধস্তাধস্তির পরেই প্যান্টের পকেটের ভিতর থেকে লোডেড রিভলভারটা বেরিয়ে পড়ল। পৃথিবীনন্দন ত্বরিত হস্তে সেটাকে তুলে নিয়ে লাফিয়ে দূরে সরে গেলেন। তারপর হেসে বললেন, "আমি, সার্কাসের লোক খাঁ সাহেব। আমাকে অত সহজে ঘায়েল করতে পারবেন না। হ্যান্ডস্ আপ্—"

সুবেদার খাঁ হাত তুললেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। রিভলভারটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে তাঁর মনে হল তিনি যেন সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। আত্মসমর্পণ করা ছাড়া এখন আর কিছু করবার নেই।"

"কোথায় যাব? থানায়?"

"না। আপনাকে যখন একদিন বন্ধু বলে স্বীকার করেছি তখন আপনাকে পুলিশের হাতে দেব না। এই সোনার বাট দুটোও আপনাকে ফেরত দেব, কারণ ওই হয়তো আপনার শেষ সম্বল। কিন্তু আমার ওই দুটি শর্ত ঃ আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে আর আপনাকে পাকিস্তানে চলে যেতে হবে। আমি আপনাকে নিজে গিয়ে বর্ডার্‌ পার করে দিয়ে আসব। এদেশে আপনার স্থান নেই।"

"কেন সংবিধানে তো আছে—"

পৃথিবীনন্দন থামিয়ে দিলেন তাঁকে— "আমি জানি, নানারকম উচ্চাঙ্গের উদারনীতি আছে। কিন্তু আমি উদার নই। আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বদমাশ পাজি লোক। এখন আপনি আমার পাল্লায় পড়েছেন, এখন আপনাকে আমার সঙ্গেই খানা খেতে হবে, আমার হুকুমেই চলতে হবে। হিন্দুস্থানে থাকা আপনার চলবে না, যদি থাকতে চান শুদ্ধি করে হিন্দু হয়ে থাকতে হবে, কিংবা জেলে থাকতে হবে। আশা করি আপনি আমাকে থানায় যেতে বাধ্য করবেন না। আসুন—"

সুবেদার খাঁ তবু দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি ভাবছিলেন কি করবেন। শেষে ঠিক করলেন রাবণের উপদেশ পালন করা ছাড়া উপায় নেই। অশুভস্য কালহরণং।

বললেন, "আপনি যখন এদেশ ছেড়ে যেতে বলছেন, অগত্যা তাই ছাড়ব। কিন্তু আমাকে সময় দিতে হবে। আমি চাকরি করি, চাকরি ছাড়্‌বার আগে তাদের নোটিস দিতে হবে। এখানে প্রভিডেন্ট ফান্ডে যে টাকা পাওনা আছে সেটা তুলতে হবে। ওই সোনার বাট দুটো ঝিনুককে দেব বলেছিলাম, আপনি যখন মেহেরবানি করে ও দুটো ফেরত দিচ্ছেন, তাহলে, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তার সঙ্গে দেখা করে ও দুটো দিয়ে আসব তাকে—"

"আর আমার পাঁচ হাজার টাকা?"

"সেটা আপনাকে এখুনি দিয়ে দিচ্ছি—"

কোটের ভিতরকার পকেট থেকে পাঁচখানি হাজার টাকার 'নোট' বার করে দিলেন সুবেদার খাঁ।

"এত টাকা আপনি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে বেড়ান?"

"তিনটে সোনার বাট পেয়েছিলাম। একটা বিক্রি করেছি।"

পৃথিবীনন্দন বললেন, "বেশ। সময় দিচ্ছি আপনাকে। কিন্তু এটা ঠিক জানবেন, যতক্ষণ আপনি এদেশে আছেন ততক্ষণ আমি আপনাকে চোখে চোখে রাখব, ততক্ষণ আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরব, এটা জেনে রাখবেন।" সুবেদার খাঁ আর একবার শেষ চেষ্টা করলেন। পৃথিবীনন্দনের হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বললেন, "আমার উপর দয়া করুন। এ দেশ ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। এই আমার দেশ। আমার আপনার লোক এই দেশেই আছে। পাকিস্তানে কেউ নেই। সেখানে পাঞ্জাবী, সিন্‌ধী, বেহারী মুসলমানে ভরে গেছে। তাদের আমি চিনি না। আমি এই দেশে থেকে হিন্দুদের সেবা করতে চাই। সেই সুযোগ আমাকে দিন। আপনিও আসুন আমার সঙ্গে। এই সোনার বাট দুটো থাকুক আপনার কাছে। ওইটে নিয়েই কাজ শুরু করি আমরা। সত্যি আমি এদেশের হিন্দুদের সেবা করতে চাই। আমাকে এর থেকে বঞ্চিত করবেন না।"

সুবেদার খাঁর গলার স্বর কাঁপতে লাগল। পৃথিবীনন্দন মুচকি হেসে বললেন, "আপনি যা বলছেন তা অতি উচ্চাঙ্গের কথা। আমাদের দেশের বড় বড় নেতারাও ওই ধরনের কথা

বলেছেন। কিন্তু আমি ও টোপ গিলছি না। ওইটেই হয়তো আদর্শ হওয়া উচিত। কিন্তু আপনাকে আগেই বলেছি,—আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অবুঝ, একবগ্‌গা লোক। আমার যেটা বিশ্বাস তার থেকে আমি একচুল নড়ি না। স্বকর্ণে ভূতের মুখ রামনাম শুনলেও আমার মনে হবে ভুল শুনছি, ওটা ইল্যুশন। আপনাকে এ দেশ ত্যাগ করিয়ে আমি ছাড়ব। সোনার বাট আমি চাই না। ঘুষ আমি নিই না।"

সুবেদার খাঁর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল, কিন্তু তিনি কিছু বলতে পারলেন না।

"চলুন, স্টেশনের দিকেই যাওয়া যাক্। মংকু এস।"

বাঁদরটা পেয়ারা গাছ থেকে নেমে এল লাফাতে লাফাতে। পৃথিবীনন্দন সুবেদার খাঁকে নিয়ে স্টেশনের দিকেই গেলেন।

।। ছত্রিশ ।।

গণেশ হালদারের বনস্পতি বিদ্যালয় খুব জমে উঠেছিল। জমে ওঠবারই কথা। কারণ এরকম স্কুল ও-প্রদেশে ছিল না। ওখানে শুধু পড়ানোই হত না। হাতের কাজও শেখান হত। একজন ছুতোর, একজন কামার, একজন কুমোর এবং একজন দর্জীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলেন তিনি। একজন ছাত্রকে তাদের কাছে প্রতিমাসে গিয়ে শিখে আসতে হত এবং এজন্য তিনি তাদের শেখাবার মজুরিরূপে মাসে দশ টাকা করে দিতেন। সুঠাম মুকুজ্যেও খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যে জমিটাতে মাস্টার মশাই স্কুল করেছেন, যার উপর ওই বড় গাছটা আছে, সেই জমিটা তিনি তাঁর মালিকের কাছ থেকে কিনে নেবার চেষ্টায় আছেন। জমিটা পরিমাণে দশ বিঘা। একটু বেশি টাকা দিলে জমির মালিক রাজি হয়ে যাবেন সম্ভবত। জমিটা নিজেদের দখলে এসে গেলে তখন তার একধারে তিনি একটা কারিগরি বিদ্যালয় করিয়ে দেবেন, একথাও বলেছেন। আর একধারে একটা ব্যায়ামশালা। সেখানে কুস্তি, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা প্রভৃতি শেখান হবে। সেকালে বাংলা দেশে একদা যে আদর্শে অনুশীলন সমিতি গড়ে উঠেছিল, সেই আদর্শেই বনস্পতি বিদ্যালয়কেও গড়ে তোলবার ইচ্ছা ছিল হালদার মশায়ের। তিনি ছেলেদের পড়াতেনও সেই আদর্শে। স্কুলের পড়াশোনা হয়ে গেলে তিনি ইতিহাসের গল্প করতেন নানারকম। দেশ-বিদেশের ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতেন। গ্যারিবল্‌ডি, মাৎসিনি, রানা প্রতাপ সিং, শিবাজী, গুরু গোবিন্দ সিং, রাণী লক্ষ্মীবাঈ, চাঁদ সুলতানা, অগ্নিযুগের বীরদের জীবন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন সেনগুপ্ত— এদের কারো না কারো কাহিনী রোজ বলতেন ছেলেদের। গান্ধিজী আর পণ্ডিত নেহরুর কথাও বলতেন। আমরা স্বাধীনতা পেয়েও কেন পেলাম না। আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেশ ভাগ করে কেন খণ্ডিত হয়ে গেল, আমাদের চরিত্রের কি কি দোষ আমাদের স্বাধীনতাকে পরাধীনতার নিগড়ের চেয়েও দুঃসহ করেছে, এসব তিনি সহজ ভাষায় বিশদ করে বলতেন। এখানকার রিফিউজিদের সুখ-দুঃখ নিয়েও আলোচনা হত এই বৈঠকে।

একদিন ব্যবসার প্রসঙ্গ ওঠাতে একজন রিফিউজি জেলেকে তিনি বললেন, "তোমরা তো ইলিশ মাছ ধরতে পার। এখানে ধর না কেন। এখানকার গঙ্গাতেও প্রচুর ইলিশ।"

সে বলল, 'মাস্টারবাবু, ইলিশ মাছ ধরতে জানি। ইলিশ মাছ ধরব বলে ধার করে নৌকো

আর জালও তৈরি করেছিলাম। কিন্তু পারলাম না। যাঁর জলকর তিনি মুসলমান। তিনি বললেন, তোমাদের লাভের অর্ধেক আমাকে দিতে হবে। আমরা তাঁর দাবি মিটিয়ে খরচে কুলোতে পারলাম না। বাধ্য হয়ে ও ব্যবসা ছাড়তে হল। এখন মাছ কিনে ফেরি করি। এদেশে এসেও মুসলমানের হাত থেকে আমাদের পরিত্রাণ নেই, মাস্টারমশাই।"

গণেশ হালদার অনেক জেলেদের কাছ থেকে সই করিয়ে উপরে একটি দরখাস্ত করেছিলেন যে, জলকরের মালিকেরা নির্মমভাবে জেলেদের শোষণ করছে, তাতে মাছের দাম অসম্ভব বেড়ে যাচ্ছে, যাদের পুঁজি কম তারা এ-ব্যবসায়ে নামতে পাচ্ছে না। কাগজে দেখা যাচ্ছে গভর্নমেন্ট নাকি নানারকম হোম ইন্‌ডাস্ট্রির উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হয়েছেন, এই অত্যাবশ্যকীয় ব্যবসাটির সম্মুখে যেসব অন্যায় বাধা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সেগুলিকে গভর্নমেন্ট যদি দয়া করে অপসারণ করেন, তাহলে অনেক গরিব লোকের উপকার করা হবে।

এ দরখাস্তের কোনও উত্তর পর্যন্ত আসেনি। এ সরকারের এটাও একটা বৈশিষ্ট্য। কোনো দপ্তরে চিঠি লিখলে উত্তর পাওয়া যায় না। কয়েকদিন পূর্বে এই বিভাগের কোনো মন্ত্রী এ-অঞ্চলে এসেছিলেন। শোনা গেল তিনি নাকি উক্ত জলকর ইজারাদারের বাড়িতে খানা-পিনা করেছেন। তা সত্ত্বেও গণেশ হালদার আর একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছেন ওপরওলার কাছে রেজেস্ট্রি করে। সেটারও কোনো জবাব আসেনি।

এই প্রসঙ্গে সেদিন তিনি বলছিলেন, "এইসব ছোটখাটো স্ফুলিঙ্গই শেষকালে বিদ্রোহের বিরাট অগ্নিকাণ্ডে জ্বলে ওঠে। দেশ পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এইসব বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে সিভিল-ওয়ারও শুরু হয়ে যায় অনেক সময়।"

"সিভিল-ওয়ার কি সার?"— জিজ্ঞেস করল একটি ছাত্র।

"সিভিল-ওয়ার মানে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ। আত্মকলহ।"

"আত্মকলহ করা কি ভালো সার?"

"মোটেই ভালো নয়। কিন্তু অনেক সময় ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য তা করতে হয়। একজন বিদেশি বড় লেখক বলেছেন— পৃথিবীতে সিভিল-ওয়ার বা ফরেন-ওয়ার বলে কিছু নেই। পৃথিবীর সব যুদ্ধেই ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ। তিনি যুদ্ধকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন— ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ, আর অন্যায়ের জন্য যুদ্ধ। তাঁর মতে যুদ্ধ যদি লাগেই তাহলে ন্যায়ের পক্ষেই থাকা উচিত। তোমরা মহাভারতেও ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধের কথা পড়েছ। পাণ্ডবরা ন্যায়ের পক্ষে ছিলেন, তাই তাঁদের জয় হল। আমাদেরও সর্বদা ন্যায়ের পক্ষে থাকতে হবে। প্রয়োজন হলে তার জন্য লড়তে হবে। যুদ্ধে জয় যে হবেই এমন কোনো কথা নেই। অনেক সময় ন্যায়-যুদ্ধেও পরাজয় ঘটে। পারসীরা যখন গ্রীকদের আক্রমণ করেছিল, গ্রীকদের পরাজয় ঘটেছিল, কিন্তু যুদ্ধ থামেনি। যখন বড় হয়ে তাদের ইতিহাস পড়বে তখন জানতে পারবে, কিরকম সর্বস্বপণ করে যুদ্ধ করেছিল গ্রীকরা। তারপর রোমানরাও এসে গ্রীস আক্রমণ করে। সে-ও প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। অনেক ভালো ভালো গ্রীক প্রাণ দিয়েছিলেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস মারা গিয়েছিলেন, একটা অসভ্য রোমান সৈন্য তাঁকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে হত্যা করে এসেছিল। আমাদের দেশেও বাইরের অত্যাচারী লুণ্ঠনকারী কম আসেনি। তৈমুর, নাদির প্রভৃতির কথা তোমরা বড় হয়ে পড়বে। আমরা তখন অসহায় ছিলাম। এখনও অসহায় আছি। কিন্তু মানুষ যখন সব দিক থেকে অসহায় হয়ে পড়ে তখনও তাদের ভিতরকার শক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। এর প্রমাণ ফ্রেঞ্চ

রেভল্যুশন। তারা দরিদ্র অসহায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তবু তাদের মধ্যেই এমন সব লোক জন্মেছিল যাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশনের বিদ্রোহ-অগ্নিকে জ্বালিয়ে রাখা। তারা তাদের রাজা-রানীকে আর দেশের শোষক-সম্প্রদায়কে কেটে নিঃশেষ করে দিয়েছিল। সেদিন রুশ দেশেও ঠিক এই কারণেই সারা দেশব্যাপী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। আমাদের দেশেও ইংরেজরা যখন ন্যায়ের পথ ত্যাগ করলেন, তাঁরা যে কিভাবে আমাদের শোষণ করে চলেছেন এটা যখন ধরা পড়ল, তখন দেশে জেগে উঠল শহীদের দল। মারাঠায়, বাংলায়, পাঞ্জাবে। বাংলা দেশেই বেশি। তারা প্রাণ তুচ্ছ করে ইংরেজদের উপর গুলি বোমা চালিয়ে দলে দলে ফাঁসি-কাঠে উঠেছিল। ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতার জন্য তারা মরতে ভয় পায়নি। সারা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছে তারা। আজ যা আমরা পেয়েছি তার জন্যে ওই শহীদের দলই প্রথম আন্দোলন করেছিল। বাংলা দেশে যারা করেছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল পূর্ববঙ্গের ছেলে। কিন্তু বিধাতার কি পরিহাস, স্বাধীন ভারতে আজ পূর্ববঙ্গ নেই। তাদের আত্মীয়স্বজনরা কুকুর বিড়ালের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে! আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসও এই। অকথ্য অত্যাচারই মানুষকে যুগে যুগে উদ্বুদ্ধ করেছে স্বাধীনতালাভের জন্য। সব দেশে সব যুগে, মানুষ ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য, সাম্যের জন্য প্রাণ দিয়েছে। সেই সব দধীচির অস্থিই বজ্র তৈরি করেছে অন্যায়-দৈত্যকে মারবার জন্য, অন্যায় অসাম্যকে ধ্বংস করবার জন্য।"

একজন জিজ্ঞেস করল— "সাম্য মানে কি? আমরা সবাই সমান হয়ে যাব?"

"ঠিক তা নয়। দূর্বাঘাস কখনও তাল গাছ হতে পারবে না। সাম্যের মানে হচ্ছে সবাই সমান সুযোগ পাবে। দূর্বাঘাস তাল গাছ দু'জনেই সমান সুযোগ পাবে আত্মোন্নতি করবার। নিজের নিজের যোগ্যতা অনুসারে সবাই বাড়বে। এরই নাম সাম্য। তোমাদের সকলেরই সমান শিক্ষা পাওয়ার অধিকার থাকবে, রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের সকলের ভোটের দাম সমান হবে, ধর্মের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের ধর্মমতকে সমান শ্রদ্ধা জানাতে হবে, শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষার পূর্ণ অধিকার পাবে। অন্য ভাষা কেউ যদি শিখতে চায় সে ব্যবস্থাও থাকবে। স্টেট সমানভাবে সকলের অন্ন-বস্ত্র শিক্ষার জন্য দায়ী থাকবে। জলকরের ইজারাদার কোনো পরিশ্রম না করে লাভের অর্ধাংশ গ্রাস করবে, এ অন্যায় ব্যবস্থা আদর্শ সাম্যবাদী স্টেটে থাকবে না। একটা কথা মনে রাখতে হবে কিন্তু। পরশ্রীকাতরতার উপর সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত নয়। যে সাম্যবাদে ধূর্ত মূষিক বা শৃগালের দল সিংহকে বিব্রত বা নির্বীর্য করবার চেষ্টা করে সে সাম্যবাদ আমাদের আদর্শ নয়। আমরা প্রত্যেককেই সমান সুযোগ দিতে চাই। সাম্যই সভ্যতার আদর্শ। কিন্তু সে সাম্যের মহিমা কি, তার আসল তাৎপর্য কি তা শিক্ষিত নাহলে বোঝা যায় না। তাই সবচেয়ে আগে দরকার শিক্ষা, সুশিক্ষা। এখন আমরা মূর্খতার অন্ধকারে আর স্বার্থপরতার পঙ্কে ডুবে আছি। তার থেকেই আমাদের সর্বপ্রথমে মুক্তি পেতে হবে। তাই আমাদের দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন অগ্নিযুগের নেতারা, যার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন, সর্বাগ্রে কর্মীদের শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। কারণ মূর্খের দ্বারা কোনো অগ্রগতিই সম্ভব নয়। ফরাসী দেশেও ফরাসী বিদ্রোহের আগে একদল শক্তিমান লেখক আবির্ভূত হয়েছিলেন— তাঁদের সবাই এন্‌সাইক্লোপিডিস্ট বলত। তাঁরা নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে সকলের মনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে, অন্যায় ট্যাক্‌সের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগাবার চেষ্টা করতেন। তাঁরা দেশের, সমাজের, রাষ্ট্রের সম্বন্ধে যে উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখতেন তা

সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেছিলেন সকলের মনে। তাঁরা দেশের জনসাধারণকে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন বলেই ফরাসী বিদ্রোহ সম্ভব হয়েছিল। আমাদের দেশে স্বাধীনতালাভের পর যে সংবিধান রচিত হয়েছে তা খুবই উচ্চাদর্শমূলক। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সব উচ্চাদর্শ কার্যক্ষেত্রে আর উচ্চ থাকছে না। প্রাদেশিকতার হলাহলে সব বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। সবাই সমান সুযোগ পাচ্ছে না। এর বিরুদ্ধে সবাইকে আবার লড়তে হবে। কিন্তু এ লড়াই জিততে হলে নিজেদের চরিত্রকে গড়তে হবে সকলের আগে। অপরের দোষ অনুসন্ধান করবার আগে নিজেদের নির্দোষ হতে হবে—''

এইসব বক্তৃতা শুনতে অনেক লোক আসত। শহরময় গণেশ হালদারের খ্যাতি বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল। খ্যাতি বিস্তৃত হলেই হিংসুটে লোকদের টনক নড়ে। যে স্কুল হালদার মশাই ছেড়ে এসেছিলেন সে স্কুলের কর্তৃপক্ষেরা কেউ সন্তুষ্ট ছিলেন না তাঁর উপর। তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হওয়াতে আরও অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁদের বুকে তুষানল জ্বলতে লাগল। তাঁদেরই প্ররোচনায় পুলিশের স্পাইও এসে বসতে লাগল তাঁর বক্তৃতা-সভায়। গণেশ হালদার অনেককেই চিনতেন না, স্পাইদেরও চিনতে পারলেন না।

।। সাঁইত্রিশ ।।

ইতিমধ্যে ঝিনুক, তনিমার আর একটা চিঠি পেল।

ঝিনুকদি,

অনেক বেড়িয়ে এলাম। সত্যি, পৃথিবী কত বড় আর মানুষ কত বিচিত্র! তুমি ঠিকই লিখেছ, বৃহৎ পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের পরিচিত হতে হবে। এরা অন্য গ্রহে যাবার তোড়জোড় করছে আর আমরা পৃথিবীরই খবর রাখি না। বৃহৎ মানবগোষ্ঠার বৃহত্তর জীবনদর্শনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাঁধতে হবে আমাদের বীণা। তবেই আমরা বিশ্বরঙ্গমঞ্চে জমাতে পারব ভারতবর্ষের চিরন্তন সুর। আমাদের দেশে বিশ্বপ্রেমের নলচে আড়াল দিয়ে প্রাদেশিকতা আর নেপটিজমের চর্চা করতে করতে অজ্ঞ দেশবাসীর ভক্তিগদগদ বা স্বার্থক্রীত ভোট-বাহুল্যের জোরে, যে নকল স্বাধীনতার পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে আমরা পোকামাকড় জড়ো করেছি, তা যে কত ভুয়ো, তা এদেশে কিছুদিন বাস করলেই বোঝা যায়। বাঙালী একদিন উপার্জনের তাগিদে নিজের মাতৃভূমি বাংলা দেশ ছেড়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ইংরাজ আমলের প্রবাসী বাঙালীদের কীর্তিকথা আজও স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। স্বামী বিবেকানন্দ বাংলার বাইরেই বেশি সমাদৃত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধেও একথা সত্য। কিন্তু এখন আমাদের মেকি স্বাধীনতার আবহাওয়ায় প্রাদেশিকতারই বাড়বাড়ন্ত। সুতরাং বাঙালী আর ভারতবর্ষে আত্মবিস্তার করবার সুযোগ পাবে বলে মনে হয় না। তাকে এবার ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশে বেরুতে হবে। বাইরেই তাদের যোগ্যতার পরীক্ষা হবে, সুবিচার হবে। প্রাচীনকালেও তো বাঙালী ভারতবর্ষের বাইরে বেরিয়ে অনেক কীর্তি স্থাপন করেছিল, স্বদেশী বিদেশি অনেকের মুখেই এ কথা প্রচারিত হয়েছে। আবার তাকে বেরুতে হবে। আমার সাধ্যে যতটুকু কুলোয় আমি নিশ্চয় তাদের সাহায্য করব। আমার সাধ্য অবশ্য আমার রূপ আর যৌবন। জানি না এর জলুস কতদিন থাকবে। তবে সেদিন আর একটা জিনিস আবিষ্কার করে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছি ঝিনুকদি।

আবিষ্কার করেছি উনি আমার রূপ-যৌবন দেখেই শুধু মুগ্ধ হননি বোধ হয়, আমার মধ্যে এমন একটা কিছু দেখেছেন যা আমার দেহেই নিবদ্ধ নয়। এদেশে টাকার গন্ধ পেলে অভিসারিকা-উপযাচিকারা এসে ছেঁকে ধরে পিঁপড়ের মতো। যারা এসেছিল, তাদের আমি দেখেছি। তাদের তুলনায় আমি সাধারণ বগি বা বিন্দি। কিন্তু আমি দেখলাম উনি সুকৌশলে তাদের এড়িয়ে গেছেন। আর একটা ঘটনা ঘটেছে। আমাকে উনি পাঁচ হাজার পাউন্ড দিয়ে একটি হীরের হার কিনে দিতে চেয়েছিলেন। আমি বললাম, অত টাকা খরচ করে হার কেনবার শখ আমার নেই। ও টাকা দিয়ে বরং আমাদের মধ্যে যারা এদেশে চলে আসতে চায়, তাদের আনবার ব্যবস্থা কর। তাদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করে দাও এখানে। উনি বললেন, তা আমি দেব, কিন্তু হারটা তোমায় নিতে হবে। বললাম, তুমি যখন অত করে বলছ, নিতে আর আপত্তি করব না। কিন্তু আমার সত্যিকার একটা অদ্ভুত শখ আছে সেটা মেটাবে? কি শখ, জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, দেশে ফিরে গিয়ে যত মাতাল আর চরিত্রহীন অফিসার আছে তাদের নিমন্ত্রণ করে বড় পার্টি দেব একটা। আর সে পার্টিতে থাকবে যত ভ্রষ্টা মেয়েমানুষের দল। ওদের নাচিয়ে একটু মজা দেখতে চাই। উনি রাজি হয়েছেন এতেও। একবার দেশে ফিরে গিয়ে কোনও নামজাদা শহরে এই পার্টি দেবার ইচ্ছে আছে। উনি তোমাদের পাসপোর্টের আর ভিসার ব্যবস্থা করেছেন। তোমরা কবে আসবে তা যদি আগে থাকতে জানতে পারি তাহলে এয়ারপোর্টে থাকব তোমাদের অভ্যর্থনা করে নেবার জন্য। তবে তোমাদের যদি দেরি হয় তাহলে আমরা থাকব না। আমাদের আপিসের ম্যানেজার যাবেন তোমাদের এরোড্রাম থেকে আনবার জন্যে। তোমাদের আসবার তারিখটা তাঁকে জানিয়ে দিও। আলাপ হলে দেখবে উঁচুদরের ভদ্রলোক তিনি। আমাদের বাড়ি আছে এখানে একটা। সেইখানেই তোমরা এসে উঠবে। কোনো অসুবিধা হবে না। আমাদের কোম্পানীতে তোমার এবং ডাক্তার ঘোষালের চাকরি হয়ে গেছে। যেদিন আসবে সেইদিনই জয়েন করতে পারবে। আমরা রাশিয়ার একটা পাসপোর্ট জোগাড় করেছি। সেখান থেকে দেশে ফিরব। দেশে ফেরবার আগে তোমাকে একটা চিঠি দেব। এত সুখে আছি, তবু আমার দুঃখ কি জানো ঝিনুকদি? আমার বাবা! লোকে পিতৃ-পরিচয় দিয়ে গর্ব অনুভব করে। কিন্তু আমার মাথা নুয়ে যায় লজ্জায়। তবু ওঁকে সব কথা বলছি। উনি বললেন, ভাঙা জিনিসকে জোড়া যায়, কিন্তু পচা জিনিস মেরামতের বাইরে। তোমার বাবার কথা যা শুনছি তাতে মনে হচ্ছে তিনি পচে গেছেন। তাঁকে যদি কিছু অর্থ সাহায্য করতে চাও, আমি আপত্তি করব না। বাবার খবর কি আমাকে জানিও একটু। শামুক এখানে এসে কাজ করছে। এর মধ্যেই আপিসে তার সুনাম হয়েছে। তোমার ভাইপোকে একটা স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি! তোমরা আমাদের ভালোবাসা জেনো। মিস্টার পাণ্ডা আর সুবেদার খাঁর খবর কি? তোমাদের বাড়িতে কি এখনও তাসের আড্ডা বসছে? সব খবর দিয়ে উপরের ঠিকানায় চিঠি দিও। ইতি—

তনিমা

ডাক্তার ঘোষাল অনেক আগেই কলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ঝিনুক বাইরের ঘরে একা বসে চিঠিটা পড়ছিল। চিঠি থেকে চোখ তুলেই দেখল সুবেদার খাঁ দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি কখন যে নিঃশব্দচরণে এসেছিলেন তা ঝিনুক বুঝতে পারেনি।

"আপনি কখন এলেন? বসুন।"

ঝিনুক তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠল। সুবদার খাঁ কিন্তু বসলেন না, দাঁড়িয়েই রইলেন।

"না, আমি বসব না। এখুনি চলে যাব।"

"আচ্ছা সেদিন রাত্রে সে ব্যাপারটা কি হল বলুন তো। কাঁঠালের ভিতর কি ছিল?"

"সোনার বাট।"

"আর ওই লোকটা কে! সঙ্গে বাঁদর—"

"পুলিশ স্পাই। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমরা ধরা পড়েছি।"

"সে কি!"

"আমি পাকিস্তানে চলে যাচ্ছি। ও লোকটা আমাকে এখানে থাকতে দেবে না।"

"সে কি! এখানকার চাকরি?"

"ছেড়ে দিচ্ছি। ইস্তফা দিয়ে দিয়েছি। তবে এখনও অন্তত মাসখানেক কাজ করতে হবে। তোমাকে একটা বিষয়ে সাবধান করতে এলাম। তুমি বলেছিলে বিলেত যাবার জন্য পাসপোর্টের দরখাস্ত করেছ। পাসপোর্ট পেয়েছ কি? স্পাইটা বাগড়া লাগাতে পারে। তার কাছে তোমার ফোটো আর ডাক্তার ঘোষালের ফোটো আছে দেখছি। আমাদের সমস্ত খবর জোগাড় করেছে লোকটা। আমাকে বলেছে আপনি যদি পাকিস্তান চলে যান আপনার নামে রিপোর্ট করব না। আমাদের বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ আছে তাও আমাকে দিয়ে দেবে বলেছে।"

"আমরা তো পাসপোর্ট পেয়েছি। এ মাসের শেষ সপ্তাহের সোমবার রাত্রের ট্রেনে আমাদের কলকাতা যাওয়ার কথা।"

"কথাটা বেশি প্রকাশ করো না। ট্রেনে চড়বার সময়েই যদি কোনো গোলমাল করে, যদিও সে কথা দিয়েছে তোমার কোনো অনিষ্ট করবে না। কিন্তু পুলিশের লোককে বিশ্বাস নেই।"

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে মনে মনে মুষড়ে পড়ল ঝিনুক। কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ হল না তেমন কিছু। দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠে চুপ করে রইল সে। কেবল চোখ দুটো জ্বলতে লাগল।

ক্ষণকাল পরে বলল, "খবরটা দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।"

সুবেদার খাঁ বললেন, "যেদিন তোমরা যাবে বলছ সেদিন আমারই ডিউটি। তোমরা যে ট্রেনে যাবে সে ট্রেন আমিই নিয়ে যাব। যদি বল গাড়ি ডিস্ট্যান্ট সিগনালের কাছে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি। স্টেশনে না উঠে সেইখানে ওঠাই নিরাপদ। একটু আগে গিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থেকো তাহলে—"

ঝিনুক যেন অকূলে কূল পেল।

"সে তো খুব ভালো হয়। কেউ আবার রিপোর্ট করবে না তো আপনার নামে।"

ম্লান হেসে সুবেদার খাঁ বললেন, "সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়! চাকরি ছেড়েই যখন চলে যেতে হচ্ছে তখন রিপোর্টে আর কি ভয়।"

"আপনি চলে যাচ্ছেন কেন? ও কি আপনাকে চলে যেতে বাধ্য করতে পারে?"

"ও বলেছে আমি যদি পাকিস্তানে চলে যাই তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে যত প্রমাণ আছে সব আমার হাতে দিয়ে দেবে। আমি এ ব্যাপারে একা জড়িত হলে পাকিস্তানে যেতাম না, মকদ্দমা লড়তাম। হেরে গিয়ে জেল হলেও জেল খাটতাম। কিন্তু এর সঙ্গে তুমিও জড়িয়ে আছ যে। তোমাকে নিয়ে আদালতে বা জেলে টানাটানি করবে এ আমি সহ্য করতে পারব না। তোমাকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই আমাকে পাকিস্তানে যেতে হচ্ছে। এটা ঠিক জেনো যখন যেখানে থাকব—"

সুবেদার খাঁ আর বলতে পারলেন না, বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল তাঁর কণ্ঠস্বর। পরমুহূর্তেই সামলে নিলেন নিজেকে।

"আচ্ছা, পরে আবার দেখা হবে। তোমার বিলেতের ঠিকানাটা কি—"

"এই যে দিচ্ছি—"

একটা কাগজে সে ঠিকানাটা টুকে দিল।

"চিঠি লিখবেন মাঝে মাঝে। আমার কাকাও পাকিস্তানে যাচ্ছেন। তাঁর ঠিকানাটা দিয়ে দিচ্ছি, যদি সুবিধে হয় তাঁর সঙ্গেও দেখা করবেন।"

"দাও, নিশ্চয় দেখা করব।"

ঝিনুক আর একটা কাগজে তার কাকার ঠিকানাটাও লিখে দিলে। সে অনুভব করতে লাগল সুবেদার খাঁর কাছে সে অসীম ঋণে ঋণী, কিন্তু সে ঋণ শেষ করবার উপায় নেই। উনি যা চাইছেন তা সে কিছুতেই দিতে পারবে না।

ঠিকানা পকেটে পুরে একটা ছোট চামড়ার থলি বার করলেন তিনি প্যান্টের পকেট থেকে।

"এই নাও, এই বোধহয় তোমাকে আমার শেষ উপহার।"

"কি আছে ওতে?"

"সেই সোনার বাট দুটো। পৃথিবীনন্দন ফিরিয়ে দিয়েছেন।"

"পৃথিবীনন্দন কে?"

"সেই স্পাই। স্পাই বটে, কিন্তু অসাধারণ লোক। আচ্ছা চলি এবার তবে।"

সুবেদার খাঁ চলে গেলেন।

সুবেদার খাঁ বেরিয়েই দেখতে পেলেন মংকু পাশের একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল। একটু দূরে পৃথিবীনন্দনও দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেদিনের পর থেকে তিনি সুবেদার খাঁকে একমুহূর্ত চোখের আড়াল করেননি।

।। আটত্রিশ ।।

ডাক্তার মুখার্জি যেখানে বসেছিলেন সে জায়গাটা অদ্ভুত। ফাঁকা অথচ ঘেরা। নানারকম গাছ দিয়ে ঘেরা একটা বড় উঠোনের মতো জায়গা। সামনে বেশ খানিকটা আকাশ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে একটা লতা-তোরণের ভিতর দিয়ে। দুটো গাছের ডাল যেন বাহু বাড়িয়ে পরস্পরকে সম্ভাষণ করছে আর তাদের উপর উঠেছে ঘনশ্যাম ত্যালাকুচো লতা, লাল লাল অনেক ফলও ধরেছে তাতে। সুন্দর একটা তোরণের মতো হয়েছে। নীচে দিয়ে দূরে আকাশ দেখা যাচ্ছে। সেইখানে দূর্বাঘাসের উপর বসেছিলেন সুঠাম মুকুজ্যে। সামনে একটা উঁচু ঘাসে-ঢাকা ঢিবির মতো ছিল তার উপর নিজের ফাইলটা রেখে লিখছিলেন ঃ

"আমি যেখানে আজ এসেছি সে জায়গাটা অতি পুরাতন। কিন্তু নাম নতুন ডাঙ্গা। কবে কে এর নাম নতুন ডাঙ্গা (এদেশের ভাষায় নঈ ময়দান) রেখেছিল তা জানি না, কিন্তু এটা জানি, এখানে এসে যখনই বসেছি তখনই নূতন একটা প্রেরণা পেয়েছি। আজ আপনাকে যে কথা বলতে যাচ্ছি তার জন্যে একটা নূতন প্রেরণাই দরকার। সত্য কথাও অনেক সময় অসঙ্কোচে বলা যায় না। বিশেষত সে সত্যটা যদি ভয়ানক সত্য হয়। আর একটা কথাও

আপনি ন্যায়ত জিজ্ঞাসা করতে পারেন— একথা আপনাকে এতদিন বলিনি কেন। এর কারণ প্রথমে অনেকদিন আমি কথাটা জানতেই পারিনি। তারপর যখন জানলুম তখন যার সম্বন্ধে কথাটা সে-ই সেটা প্রকাশ করতে বারণ করে দিলে। মাত্র কাল তার অনুমতি পেয়েছি।

গোড়া থেকেই শুনুন। আমি বিলেতে অনেকদিন কাটিয়ে যখন দেশে ফিরলুম তখন কোথায় বসব ঠিক করতে না পেরে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। দেশ তখন পাকিস্তান হিন্দুস্থানে ভাগাভাগি হয়ে গেছে, রায়ট্ চলছে চারিদিকে। তখন পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত, ধর্ষিত, লুণ্ঠিত হিন্দু বাঙালীর দল পিলপিল করে পালিয়ে আসছে পশ্চিমবঙ্গে। আমি তখন হিন্দুস্থান পাকিস্তান বর্ডারে এক হাসপাতালে আমার এক বাল্যবন্ধুর বাসায় ছিলাম। হাসপাতালটা হিন্দুস্থানে আর আমার বন্ধু সেই হাসপাতালের মেডিকাল অফিসার। একদিন গভীর রাত্রে একদল লোক হৈ হৈ করে একটি রক্তাক্ত মেয়েকে নিয়ে হাজির হল এসে। মেয়েটিকে পাকিস্তানে ধর্ষণ করে তার স্তন দুটি কেটে তাকে পাকিস্তান বর্ডার পার করে হিন্দুস্থানে ফেলে দিয়ে গেছে গুণ্ডারা। দেখে শিউরে উঠলাম। পাশবিকতার এরকম চেহারা আর দেখিনি। মেয়েটি রূপসী এবং যুবতী। ধর্ষণের চিহ্ন তখনও তার সর্বাঙ্গে। কিন্তু তখনও সে মরেনি। আমরা দুই ডাক্তারে তখন লেগে পড়লুম। মেয়েটির জীবনীশক্তি প্রচুর ছিল, আমরাও চেষ্টার ত্রুটি করিনি, কোলকাতা থেকে ব্লাড এনে ট্রান্সফিউশনও করেছিলাম। আজকাল অ্যান্টিবায়োটিকের যুগ, মেয়েটি শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেল। তারপরই হল সমস্যা। শুনলাম মেয়েটি ভদ্র ব্রাহ্মণ ঘরের কন্যা। এতেই আরও মুশকিল হল। চারদিকে যেসব উদ্বাস্তু-কলোনী হয়েছিল, তার একটাতেও সে থাকতে পারল না। তার অঙ্গ-হীনতার জন্য সবাই তাকে নিয়ে ঠাট্টা করত। একদিন আমাকে সে বলল, "আপনারা আমাকে না বাঁচালেই পারতেন। নরককুণ্ডে পচে মরার চেয়ে মৃত্যুই ভালো ছিল।" আমার স্বভাবের মধ্যে একটা একগুঁয়েমি আছে, আপনি হয়তো লক্ষ করে থাকবেন। আপনি একাধিকবার আমার বাড়ি থেকে চলে যেতে চেয়েছেন, কিন্তু আমি যেতে দিইনি। এই মেয়েটির সম্বন্ধেও আমার তেমনি একটা মনোভাব জেগে উঠল। জিদ চড়ে গেল। মনে হতে লাগল— একে যমের মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে সত্যিই কি লাভ হল যদি একে মানুষের মতো বাঁচবার সুযোগ না দিতে পারি? একে কোনো উদ্বাস্তু-কলোনীতে রেখে গেলে সত্যিই তো এর আরও শোচনীয় মৃত্যু হবে। ওর অতীত লুপ্ত হয়ে গেছে, দেশে ফেরবার উপায় নেই, ওর মা-বাবাকে গুণ্ডারা হত্যা করেছে, ওদের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। ও যাবে কোথায়? ওর ভবিষ্যৎ কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? কে এগিয়ে এসে বলবে ওর দায়িত্ব আমি নিলাম? তারপরই মনে হল এসব প্রশ্ন কাকে করছ তুমি। নদীতে একটা লোক ডুবে যাচ্ছে, অসহায় হাত দুটো তুলে সাহায্য প্রার্থনা করছে, আর তুমি তীরে দাঁড়িয়ে ভাবছ কে ওকে গিয়ে তুলবে? তুমি তো গিয়ে তুলতে পারো। মনস্থির করে ফেললাম একদিন। তাকে বললাম, "এ নরককুণ্ড থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে পারি, যদি তুমি রাজি থাক।"

"কি করে উদ্ধার করবেন আপনি"— বিস্মিত দৃষ্টি তুলে প্রশ্ন করল সে।

বললাম, "তোমাকে বিয়ে করব। আমিও ব্রাহ্মণের ছেলে। আমার এখনও বিয়ে হয়নি। তোমার আপত্তি না থাকলে তোমাকেই বিয়ে করতে পারি আইন অনুসারে।"

খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইল সে। তারপর বলল, "আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমার

মতো একটা মেয়েকে বিয়ে করতে আপনার ঘৃণা হচ্ছে না? আপনার আত্মীয়স্বজন নেই? তাঁরা কি আমাকে ঘৃণা করবে না?''

বললাম, ''না, আমার কেউ নেই। ঘরও কোথাও বাঁধিনি এখনও। তোমাকে সত্যি আমার খুব ভালো লেগেছে। তুমি যদি আপত্তি না কর, তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধি।''

কয়েকদিন পরেই রেজিস্টার্ড বিবাহ হয়ে গেল। তখন এখানে আমি বাড়িটা কিনেছি বটে কিন্তু গৃহস্থালী স্থাপন করিনি। ওকে এখানে নিয়ে এলাম। তারপরই সমস্যা শুরু হল। দেখলাম ও কিছুতেই যেন নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না, আলাদা আলাদা থাকতে চায়। রাত্রে আলাদা ঘরে, আলাদা বিছানায় শোয়। দিনের বেলা বেশির ভাগই ঠাকুর-ঘরে বসে থাকে আর কাঁদে। মুখে হাসি নেই, সর্বদাই কেমন যেন একটা বিমর্ষ বিষণ্ণ ভাব। তখন আমি এখানকার স্কুল কমিটিতে ছিলাম। সেই সময় একজন শিক্ষক নিযুক্ত করবার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। দরখাস্তগুলো যখন এল তখন স্কুল কমিটি আমার উপর ভার দিলেন, কাকে নেওয়া হবে তা ঠিক করবার। আমি দরখাস্তগুলো বাড়ি এনে আমার স্ত্রীকে দিলাম। বললাম, তুমি ঠিক কর, কে যোগ্যতম লোক। তাকে একটা কাজ দিয়ে একটু অন্যমনস্ক করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। সে আপনাকেই যোগ্যতম লোক বলে নির্বাচন করল। আমিও পরে দরখাস্তগুলো পড়ে দেখলাম নির্বাচন ঠিক হয়েছে। তারপর আপনি এলেন। আপনি যখন আমার বাড়িতে এলেন তখন আমার স্ত্রীই আমাকে অনুরোধ করল, ওঁকে এখানেই থাকতে বল, এখানেই উনি খাওয়া-দাওয়া করবেন। ওঁকে আলাদা বাসা করতে দিও না। তাই হল, আপনি আমাদের বাসায় থেকে গেলেন। আপনার সঙ্গে ক্রমশ আমার একটা ভালোবাসার বন্ধন গড়ে উঠল। আমিও আপনার সঙ্গে ক্রমশ যেন একটা একাত্মতা অনুভব করতে লাগলাম। আপনি যে বাইরের লোক, আমার কেউ নন— এ কথা আমার মন থেকে তিরোহিত হল ক্রমশ। এইভাবে চলছিল, তার পর আপনার সঙ্গে স্কুল কমিটির বিরোধ বাধল। আপনি এখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হলেন। ঠিক তার আগের দিন আমি সত্য ঘটনাটা শুনেছি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে। কথাটা আমার কাছে এতদিন প্রকাশ করতে ইতস্তত করেছে সে, কিন্তু মনে মনে এজন্য সে-ও কম অস্বস্তি ভোগ করেনি। আমাকে বলল, ''একটা কথা তোমাকে আজ বলব, রাগ করবে না তো?''

আমি বিস্মিত হলাম। এভাবে সে আমার সঙ্গে আর কোনোদিন কথা বলেনি।

বললাম, ''না, রাগ করব কেন। কি কথা?'' সে একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, ''যে মাস্টারমশাই আমাদের বাড়িতে আছেন, তিনি আমার দাদা। রায়টের সময় উনি বিলেতে ছিলেন। দরখাস্তগুলোর মধ্যে ওঁর নাম দেখেই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল ইনি আমার দাদা। তারপর যখন এলেন তখন আর সন্দেহ রইল না। ওঁকে তুমি বলো একদিন সব কথা খুলে। বলো তোমার বোন বুলিই আমার স্ত্রী।

আমি একথা সেদিন আপনাকে বলতে পারিনি। কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকছিল। আপনার সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা আত্মীয়তা বেরিয়ে পড়ল এটা খুবই সুখের কথা, আপনার উপর আমার আর একটা দাবি বাড়ল। এটাও খুবই আনন্দের, কিন্তু মাত্র এই দাবিটার উপরই আমি জোর দিতে চাই না, আপনাকে আমার ভালো লেগেছে, এই জোরেই আমি আপনাকে আমার সঙ্গে রাখতে চাই। আপনি যা করছেন তা নিশ্চিন্ত মনে করুন। আপনার সঙ্গে এ আত্মীয়তা যদি না-ও বেরুত, তাহলেও আমি আপনাকে ছাড়তুম না। এসব কথা সেদিন মুখে আপনার সামনে

আমি বলতে পারিনি, কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছিল, ভয় হচ্ছিল প্রকাশ পেলে একটা মেলোড্রামাটিক গোছের কাণ্ড না হয়ে পড়ে। কিন্তু বলতে না পেরে অস্বস্তিও ভোগ করছিলাম। এখন তার অবসান হল। একটা লতা-তোরণের ভিতর দিয়ে সামনে খানিকটা নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে, উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটা বাঁশপাতি পাখি। ঝিরঝির করে সুন্দর হাওয়া বইছে। দূরে কোকিল ডাকছে। আশেপাশের ঘাসে সবুজ শোভা। আমাদের জীবনও এমনি সহজ ও সুন্দর হোক। আপনাদের যে পারিবারিক জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল তা আবার নবনব শোভায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক নূতন পরিবেশে— এই এখন আমার অন্তরের কামনা।"

গণেশ হালদার এ চিঠিটা পড়ে যখন শেষ করলেন তখন রাত্রি প্রায় এগারোটা। ডাক্তারবাবু তাঁকে রোজ যে লেখা টুকতে দিতেন তা তিনি শোওয়ার আগে টুকে তবে শুতেন। সেদিন লেখাটা পড়ে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন। তারপর ছুটে বেরিয়ে গেলেন। ডাক্তারবাবুর বাড়িটা অন্ধকারে বিরাট একটা দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে যেন। ছুটে বেরিয়ে গিয়ে গণেশ হালদার বাড়িটার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। ওই বাড়ির মধ্যে বুলি আছে? এতদিন ছিল? এ যে বিশ্বাস করা শক্ত। তবু এ সত্যি। নিশ্চয় সত্যি, ডাক্তার মুখার্জি যখন লিখেছেন তখন এ মিথ্যা নয়। হতবাক আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। রকেটের চিৎকারে তাঁর আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। রকেট সর্বদা সজাগ প্রহরী। রকেটের সঙ্গে তাঁরও ভাব হয়ে গিয়েছিল। তিনি ডাকলেন, রকেট, রকেট, কাম হিয়ার। রকেট তবু ডাকতে লাগল। চেনা-লোককেও এ রকম সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে সে সহ্য করতে প্রস্তুত নয়।

কপাট খুলে ডাক্তার মুখার্জি বেরিয়ে এলেন, "কে, কে, ওখানে—"

"আমি।"

এগিয়ে এলেন গণেশ হালদার।

"ও, আসুন।"

"এখুনি আপনার লেখাটা পড়লাম। বুলি কই?"

"আসুন, ভিতরে আসুন, সে জেগেই আছে।"

গণেশ হালদার অনুভব করলেন, তাঁর পা দুটো থরথর করে কাঁপছে।

বুলি বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়েছিল।

গণেশ হালদার ঘরে ঢুকতেই সে 'দাদা' বলে প্রণাম করবার জন্য ঝুঁকল, কিন্তু মূর্ছিত হয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

।। উনচল্লিশ ।।

সন্ধ্যার পর ঝিনুক দুটো নূতন বড় স্যুটকেস নিয়ে ঢুকল।

ডাক্তার ঘোষাল সবিস্ময়ে বললেন, "হঠাৎ দুটো স্যুটকেস কিনলে যে?"

"এই দুটোতেই আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে যাব।"

"কোথায় যাবে?"

"বিলেত। বাঃ সব ভুলে গেলেন। প্লেনের টিকিট কাটা হয়ে গেছে।"

"আমি যাব না।"

"আপনাকে যেতেই হবে। আমার একটা অনুরোধ আপনি রাখবেন না।?"

"এ অনুরোধ রাখা যাবে না। আমি জীবনে টো টো করে অনেক ঘুরেছি। আর ঘোরবার ইচ্ছে নেই। ইউলিসিস্ শেষকালে বাড়ি ফিরে এসেছিল। I too want to settle down, আমিও শান্তিতে থাকতে চাই কোথাও।"

"বিলেতেই ঘর বাঁধব আমরা।"

"না, বিদেশে যেতে চাই না।"

"একবার ঘুরে বেড়িয়ে আসতে ক্ষতি কি। ভালো না লাগে চলে আসবেন।"

ডাক্তার ঘোষাল কোনো জবাব দিলেন না। ফস্ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলেন।

তারপর বললেন, "না, আর experiment করার সময় নেই।"

আবার সিগারেটে টান দিতে লাগলেন। ঝিনুক তখন এ-নিয়ে আর আলোচনা করা সমীচীন মনে করল না।

বলল, "আপনি কি রাত্রে কোথাও বেরুবেন?"

"না।"

"তাহলে গাড়িটা নিয়ে বেরুব আমি একটু পরে।"

"কোথা যাবে?"

"পরে বলব, জরুরী দরকার আছে একটা।"

ঝিনুক মাঝে মাঝে এরকম বেরিয়ে যায়। ডাক্তার ঘোষাল পছন্দ করেন না এটা। আজকাল এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেও সাহস হয় না তাঁর। তিনি জানেন প্রতিবাদ করলে ফল হবে না, ঝিনুক নিজের পথে নিজের মতে চলবেই। সুতো বেশি টেনে ধরলে সুতো ছিঁড়ে মাছ পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। অভিজ্ঞ মৎস্য-শিকারীর মতো তাই তিনি আজকাল সুতোটা ঢিলে করে দেন যখনই দরকার হয়।

সেদিন রাত্রে ঝিনুক মাখানিয়ার মাঠে গিয়েছিল তার পোঁতা টাকা তুলে আনতে। দুটো বড় বড় ফাঁক-মুখো শিশির মধ্যে টাকাগুলো পুরে শিল করে সে দুটো একটা চিহ্নিত জায়গায় পুঁতে রেখে এসেছিল। সবসুদ্ধ কুড়ি হাজার টাকা ছিল। হাজার টাকার কুড়িখানা নোট। আগে ন'হাজার ছিল, পরে গণেশ হালদারের কাছ থেকে যে এগারো হাজার টাকা এনেছিল সেটাও এখান রেখে গিয়েছিল। টাকা নিয়ে কি করবে তার হিসাবও ঠিক করে ফেলেছিল সে। পাঁচ হাজার টাকা যতীশবাবুকে দেবে, আর পাঁচ হাজার টাকা কাউকে। কাউ সম্বন্ধে একটা দুর্বলতা তার বরাবরই ছিল। সে যে ডাক্তার ঘোষালের ছেলে, ন্যায়ত ডাক্তার ঘোষালের সমস্ত সম্পত্তির এবং মনোযোগের সে-ই যে একমাত্র উত্তরাধিকারী এ কথাটা ঝিনুক একদিনও ভোলেনি। তাই সে কাউকে বরাবরই পুত্রবৎ স্নেহ করত। ডাক্তার ঘোষাল তাকে তাড়িয়ে দিয়ে যে অন্যায় করেছেন, এটা সে ডাক্তার ঘোষালকে বরাবরই বলেছিল। বলেছিল তাকে খুঁজে-পেতে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু ডাক্তার ঘোষাল একরোখা লোক, একবার বেঁকে বসলে সোজা করা শক্ত। ঝিনুক তবু মনে মনে আশা করেছিল শেষ পর্যন্ত তাঁকে সোজা করবে। কিন্তু কাউয়ের কোনো ঠিকানা সে খুঁজে

পাচ্ছিল না। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ বিলেত যাওয়ার সুযোগ এসে গেল। কাউকে খুঁজে নিয়ে আসার প্রশ্ন আর রইল না। এখন সে ঠিক করেছে যাবার আগে কাউকে যতটা পারে নগদ টাকাই দিয়ে যাবে আর বিলেত গিয়ে যদি সুবিধা করতে পারে তো কাউকেও নিয়ে যাবে সেখানে। মনে মনে ঠিক করল কাউকে খুঁজে বার করতে হবে যেমন করে হোক। হরসুন্দর কি খুঁজে আনতে পারবে তাকে?

ঝিনুক জানত না যতীশবাবু কাউয়ের ঠিকানায় যাতায়াত করেন। কথায় কথায় সেদিন রাত্রেই কিন্তু কথাটা বেরিয়ে পড়ল।

ঝিনুক প্রথমেই ফিরল ডাক্তার ঘোষালের বাসায়। সেখানে গিয়ে শুনল ডাক্তার ঘোষাল পাশের বাড়িতে তাস খেলতে গেছেন। ডাক্তার ঘোষালের বাসায় তাসের আড্ডা ভেঙে যাবার পর থেকে তিনি প্রায়ই পাশের বাড়িতে তাস খেলতে যান। পাশের বাড়িটি একটি মেস। নানারকম লোক থাকে সেখানে।

ঝিনুক টাকাগুলি বার করে লুকিয়ে রেখে দিলে আলমারির মধ্যে। তারপর বাড়ি গেল। যতীশবাবু জেগে বসেছিলেন। ঝিনুককে দেখেই তিনি বললেন, "দেশে ফিরবার সরকারী অনুমতি আজ এসে গেছে। টাকার যোগাড় করেছ? টাকা না পেলে কিন্তু আমি কোথাও যাব না।"

'টাকার যোগাড় হয়ে গেছে। কাল তোমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব।"

"কাল?"

"হ্যাঁ, কারণ তারপরই আমাদের বিলেত যাওয়ার আয়োজন করতে হবে। এসময় কাউ থাকলে ভালো হত। সে সব গুছিয়ে-টুছিয়ে দিত। তাকেও কিছু টাকা দিয়ে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু কোথায় সে যে আছে—"

'তাকেও কিছু টাকা দিয়ে যাব'— এ কথায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন যতীশ। কাউ তাঁকে বলেছিল, সে যদি কোথাও থেকে হঠাৎ কিছু টাকা পায় সে টাকাটা তাকেই দেবে।

"কাউ কোথা আছে আমি জানি। টাকাটা তুমি আমাকেই দিতে পার, আমি গিয়ে দিয়ে আসব।"

"না, আমি তার হাতেই টাকাটা দিতে চাই। ঠিকানাটা আমায় বলুন।"

"সে কি তুমি যেতে পারবে? মনসুরগঞ্জের এক জঘন্য বস্তির মধ্যে। রহমতুল্লা লেন দিয়ে ঢুকতে হয়।"

"আপনি একটা কাগজে এঁকে দিন—"

কাগজ পেন্সিল এগিয়ে দিলে ঝিনুক। নিরুপায় হয়ে যতীশবাবুকে রাস্তার ছকটা এঁকে দিতে হল। কাউ তাঁকে তার ঠিকানা কারও কাছে প্রকাশ করতে বারণ করেছিল। যতীশবাবু কিন্তু ঝিনুকের কথা অমান্য করতে সাহস করলেন না।

এঁকে দিয়ে বললেন, "মনসুরগঞ্জের বড় মসজিদটা পার হয়ে পশ্চিম দিকে মিনিট পনেরো হাঁটলেই ডান দিকে রহমতুল্লা লেন পাবে। লেনে নাম লেখা নেই। ভাঙ্গা একটা ডাস্টবিন আছে তার সামনে। ওখানে গিয়ে দু'-একজনকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে কোন্‌টা রহমতুল্লা লেন। সেই লেনে ঢুকে কিছুদুর গেলেই কালুর চায়ের দোকান দেখতে পাবে।"

"আচ্ছা, সে আমি খুঁজে নেব'খন।"

"তুমি টাকাটা কখন দেবে তাকে?"

"তুমি চলে যাওয়ার পর।"

যতীশবাবু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

।। চল্লিশ ।।

গণেশ হালদার সেদিন বনস্পতি বিদ্যালয়ে স্কুলের পড়াশোনার পর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তাঁর জীবনের সুর বদলে গিয়েছিল এবং তা আভাসিত হচ্ছিল তাঁর আচরণে, মুখমণ্ডলে এবং তেজোদ্দীপ্ত বক্তৃতায়।

তিনি বলছিলেন ঃ আমরা যেন না মনে করি যে যেন তেন প্রকারেণ ইংরেজকে দূর করে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। আমরা একথা যেন মুহূর্তের জন্য না ভাবি যে এখন আমাদের আর কিছু করবার নেই। একথাও আমরা যেন ভুলে না যাই যে এ স্বাধীনতা আমরা বুকের রক্ত দিয়ে অর্জন করিনি। নেতাজীর আই-এন-এ সৈন্য যখন এদেশে ফিরে এল, নৌবহরের জঙ্গী সৈন্যরা যখন বিদ্রোহ করল, এখানকার সৈন্যদের মধ্যেও যখন বিদ্রোহের আভাস দেখা দিল তখন চতুর ইংরেজ বুঝল এদেশে আর তারা রাজত্ব করতে পারবে না; যুদ্ধে তারা হীনবল হয়ে পড়েছিল, মিলিটারির জোরে এ-দেশ শাসন করবার শক্তি আর তাদের ছিল না। তাই চতুর ইংরেজ দেশটাকে ভাগ করে, স্বদেশসেবী বাঙালীদের আর মিলিটারি পাঞ্জাবীদের সর্বনাশ করে স্বাধীনতা নামক একটা ভুয়ো মাল আমাদের নেতাদের হাতে তুলে দিয়ে চলে গেল। ইংরেজ যায়নি, সে দেশে বসে আমাদের কাছে চড়া দামে জিনিস বেচে আগেকার মতোই আমাদের শোষণ করছে আর মজা দেখছে। ইংরেজ যখন এদেশে ছিল, তখন আমরা বরং কিছু স্বদেশী ছিলাম, ইংরেজ চলে যাওয়ার পর সে পাট একেবারে চুকিয়ে দিয়েছি। রাস্তার দিকে তাকালেই সেটা বোঝা যায়। আগে এত সাহেবী-পোশাক-পরা লোক রাস্তঘাটে দেখা যেত না। এখন সবাই আমরা সাহেব সেজেছি। এখনও আমরা বিদেশের দুয়ারে হাত পেতে আছি টাকার জন্যে, কলকব্জার জন্যে, জ্ঞানের জন্যে। আমরা স্বাধীন হয়েছি একথা বলবার সময় এখনও আসেনি। বরং আমাদের পরাধীনতা যেন আরও বেড়েছে মনে হয়। মনে হয়, আমাদের ভবিষ্যৎও যেন ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে। কারণ যে-শিক্ষা পেলে আমাদের বুদ্ধি ও মনুষ্যত্ব সংগঠিত হবে, সে-রকম শিক্ষা আমরা পাচ্ছি না। বাইরে যা দেখছি বা শুনছি তা লোক-দেখান আড়ম্বর মাত্র। দেশে আর মানুষ তৈরি হচ্ছে না। স্বাধীন ভারতের বলিষ্ঠ নাগরিক হতে হলে চরিত্রে যে-সব গুণাবলী থাকা দরকার সে-সব গুণাবলী অর্জন কববার সুযোগ আমাদের ছেলেমেয়েদের নেই। অনেক পয়সা খরচ করে তারা যে ডিগ্রী পাচ্ছে তা একেবারে মূল্যহীন, কারণ ডিগ্রীর পিছনে যে বিদ্যা থাকলে তা সার্থক হয়, সে বিদ্যা তাদের নেই। মিথ্যা মুখোশপরা কতকগুলো গণ্ডমুর্খ তৈরি হচ্ছে কেবল। আমরা ক্রমশ ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছি। ইংরেজ আমলের পূজনীয় নেতারা, স্বামী বিবেকানন্দ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, সকলেই বলে গেছেন মানুষ হওয়াই সবচেয়ে আগে দরকার। আত্মসম্মান-ভূষিত শিক্ষিত ধার্মিক মানুষ চাই। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধতঃ, এ বাণীর মর্ম আমাদের এবার বুঝতে হবে। মিথ্যা স্বাধীনতার মোহে মুগ্ধ থেকে আসল জিনিস আমরা হারিয়ে ফেলছি। আজকাল অবশ্য অনেকের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিকতার ভড়ং দেখা যায়। কুকুর-পোষার মতো গুরু-পোষাও অনেক বড়লোকদের আজকাল ফ্যাশন হয়েছে। কিন্তু সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পশুত্বকে ঢেকে রাখবার

মুখোশ মাত্র। আমাদের সত্যবাদী হতে হবে, নির্ভীক হতে হবে, সৎকর্মে সোৎসাহে এগিয়ে যেতে হবে, তাহলেই ভগবানকে পাওয়া যাবে। এইগুলিই আধ্যাত্মিকতালাভের প্রথম সোপান। আমরা এখানে যারা সমবেত হয়েছি, আমরা যদি আজ থেকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই যে, মিথ্যা কথা বলব না, কোনও অলীক ভয়ে ভীত হব না, অলস জীবন যাপন করব না, তাহলেই দেখবে আমাদের চারপাশে একটা অদৃশ্য বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হচ্ছে। সেই বিদ্যুৎ কালক্রমে জ্যোতির্ময়লোকে নিয়ে যাবে আমাদের। যে আধ্যাত্মিকতা মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য, সেই আধ্যাত্মিকতার প্রধান অবলম্বন সত্য,— মিথ্যা নয়, অকপটতা— ভণ্ডামি নয়। আমরা যে-জীবন যাপন করছি তা পশু-জীবনের চেয়েও খারাপ। পশুরা অন্তত নিজেদের চেষ্টায় আহার সংগ্রহ করে, জীবনধারণের অনিবার্য আবেগে জীবনটা অন্তত ভোগ করে। আমরা কি তা-ও পারি? আমরা অলস, নির্বীর্য, পরমুখাপেক্ষী, তামসিকতার জড়পিণ্ড মাত্র। এই তামসিকতার কবল থেকে উদ্ধার পাও আগে। জীবনকে ভোগ করতে শেখ, রাজসিক হও, আধ্যাত্মিকতার কথা তার পর ভেবো। স্বামী বিবেকানন্দ এই কথাই বার বার বলে গেছেন। বরফ গলে আগে জল হয়, তারপর তা বাষ্প হয়ে আকাশে যাওয়ায় যোগ্যতা লাভ করে। আমরা এখন বরফ হয়ে আছি, তামসিকতার জড় বরফ। কিন্তু আমাদের জাগতে হবে। এত বড় একটা জাত তামসিকতার অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে না। আমরা সত্য কথা বলব। আমরা ভয় পাব না, আমরা কাজ করব—এই তিনটেই আমাদের মূলমন্ত্র হোক। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি এই আশ্বাসে অলস হয়ে বসে থাকলে চলবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা আজও পরমুখাপেক্ষী ভিক্ষুক, আমাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই। আমরা কতকগুলো লুণ্ঠনকারী ব্যবসায়ীর হাতে ক্রীড়নক মাত্র, তারা আমাদের লুটছে, শুষছে। ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে যে ধরনের শোষণ আর অত্যাচারের কথা আমরা ইতিহাসে পড়েছি, তারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে আবার। নূতন ধরনের ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এসে গেছে আবার দেশে। এখন আমাদের কর্তব্য কি? আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতেই হবে— এ কলঙ্ক আমরা মোচন করব। তা করতে হলে আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে আমরা চরিত্রবান হব, সত্য কথা বলব, ভীরু হব না, কাজ করব, যা হাতের কাছে পাব তাই করব।"

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলল, "কাজ তো আমরা করতে চাই মাস্টারমশাই। কিন্তু কাজ পাই কোথায়?"

"কাজ সর্বত্র আছে। কুলির কাজ কর, মজুরের কাজ—"

"তাও মেলে না সব সময়। যে কাজ করতে পারি সে কাজ পাই না। সে কাজের কোনও ব্যবস্থা নেই, সুযোগ নেই—"

"তাহলেই চুপ করে বসে থাকবে? তোমরা কি পাথর? কিছু না পাও তো বিদ্রোহ কর, সেটাও একটা কাজ, কিন্তু তা করতে হলে যে চরিত্রবল দরকার তা কি তোমাদের আছে?"

গণেশ হালদার দেখতে পাননি, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে একজন পুলিশ অফিসার সাধারণ পোশাকে বসে ছিলেন। তিনি উঠে এসে বললেন, "মাস্টারমশাই, এ বক্তৃতা আপনাকে আমি দিতে দেব না। আপনি আমার সঙ্গে থানায় চলুন।"

"থানায়?"

গণেশ হালদার যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

"হ্যাঁ, আপনি জনতাকে অকারণে ক্ষেপিয়ে তুলছেন। এরকম আরও রিপোর্ট আমাদের

কাছে আগে এসেছে, তাই আজ আমি নিজে এসেছিলাম। স্বকর্ণে শুনলাম আপনি এদের বিদ্রোহ করতে বলছেন। আমি এখানকার থানার অফিসার-ইন-চার্জ। আপনাকে আমি অ্যারেস্ট করলাম। চলুন আমার সঙ্গে।"

ক্ষুব্ধ জনতা হৈ হৈ করে উঠল। সবাই এসে ঘিরে দাঁড়াল গণেশ হালদারকে। দু'চারজন যুবক এগিয়ে এসে বলল, "ওঁকে থানায় নিয়ে যেতে দেব না। ছেড়ে দিন ওঁকে—" মারপিট হবার উপক্রম।

গণেশ হালদার তখন বললেন, "তোমরা স্থির হও। এরকম বে-আইনী কাজ করতে যেও না। আমি এঁর সঙ্গে থানায় যাচ্ছি। আমাদের স্বাধীন দেশের গণতন্ত্রে স্বাধীনভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করবার অধিকার দেওয়া আছে। দেখা যাক্ সে অধিকার মেকি না সত্য।"

গণেশ হালদার পুলিশ অফিসারের সঙ্গে থানায় চলে গেলেন।

।। একচল্লিশ ।।

যতীশবাবুকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ঝিনুক ভেবেছিল কাউয়ের খোঁজে বেরুবে। কিন্তু বাড়ি ফিরেই সে তনিমার একটা টেলিগ্রাম পেল যে সে কলকাতায় এসেছে, ঝিনুকও যেন অবিলম্বে কলকাতায় চলে আসে। সুতরাং কাউকে খুঁজে বার করবার আর অবসর সে পেল না সেদিন।

ডাক্তার ঘোষালকে গিয়ে বলল, "আমি আজ কলকাতা যাচ্ছি।"

"কলকাতা! কেন?"

"একটু দরকার আছে।"

তনিমা এসেছে এ কথাটা ইচ্ছা করেই চেপে গেল সে। কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে মিস্টার সেন যদি এ নিয়ে কিছু গোলমাল করেন, এই ভয়ে তনিমার আসার সংবাদটা সে গোপন করাই শ্রেয়ঃ মনে করল।

"দরকার? কিসের দরকার?"

"কিছু জিনিসপত্র কিনব। আমার ভালো গরম জামা নেই। আপনার জন্যেও অন্তত গোটা চারেক ভালো স্যুট করান দরকার। এখানে ভালো হবে না।"

"আমি বিলেত যাব না।"

"কি যে এক কথা বলেন বার বার। প্লেনে সীট বুক করা হয়ে গেছে। ভালো না লাগে, ফিরে আসবেন।"

ডাক্তার ঘোষাল মুখ গোঁজ করে চেয়ে রইলেন ঝিনুকের দিকে খানিকক্ষণ। তাঁর চোখের দৃষ্টি দিয়ে আগুনের হল্‌কা বেরুতে লাগল। তারপর হঠাৎ তিনি চিৎকার করে উঠলেন— "আমাকে কি মনে করেছ তুমি— What do you take me for ? আমি কি তোমার হাতের পুতুল? Am I puppet in your hands? I am not."

Not কথাটির উপর জোর দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। ঝিনুক মুচকি হেসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সেইদিনই সন্ধ্যেব ট্রেনে কলকাতায় চলে গেল ঝিনুক। তনিমার সঙ্গে দেখা হতেই তাকে জড়িয়ে ধরল সে। সত্যিকার আবেগভরে জড়িয়ে ধরল। ঝিনুক দেখল তনিমা আরও রূপসী হয়েছে। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে রূপের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেন।

"অমন করে কি দেখছ ঝিনুক-দি!"

"তোমাকে। এক সঙ্গে এত রূপ আগে কখনও দেখিনি।"

"এই রূপই আমাকে নরকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, আবার এই রূপই আমাকে স্বর্গে নিয়ে এসেছে। বাবার খবর শুনেছ?"

"না। আসবার আগে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেখলাম তাঁর ঘর বন্ধ। চাকরটা বললে ছুটিতে গেছেন।"

"তাঁর চাকরি গেছে। তাঁর নামে এত রকম কমপ্লেন এসেছিল যে গভর্নমেন্ট তাঁকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি আছেন এখন তাঁর গুরুর কাছে হরিদ্বারে। আমি তাঁকে চিঠি লিখেছি যে মাসে মাসে তাঁকে দু'শ টাকা করে দেব। চিঠিতে ঠিকানা দিয়েছি লন্ডনের সেখানে ফিরে গিয়ে উত্তর পাব আশা করি।"

"তুমি এখানে এসেছ কেন?"

"মজা করতে। তোমাকে যে পার্টির কথা লিখেছিলাম সেই পার্টি দেব এখানে আজ। একটা বড় হোটেলে এলাহি ব্যবস্থা হচ্ছে।"

"তোমার স্বামী কই?"

"তিনি এসেই বম্বে চলে গেছেন। কাল আমাকেও ফিরে যেতে হবে। তুমি কবে যাবে?"

"এ মাসের শেষে। প্লেনে সীট বুক করা হয়েছে।"

"তখন আমরা বোধহয় লন্ডনেই থাকব। আজ পার্টিতে এস কিন্তু। এই নাও কার্ড।"

"কি উপলক্ষে পার্টি?"

"উপলক্ষ অবশ্য আমাদের বিয়ে। কিন্তু ওটা বাইরের উপলক্ষ, সেইজন্য উনি এখানে রইলেন না। কারণ, আমারই খেয়ালে পার্টি দেওয়া হচ্ছে, আমিই পার্টির প্রোগ্রাম ঠিক করেছি। এসো তুমি।"

"কি হবে পার্টিতে?"

"নাচ গান, খানা পিনা। হোমরা-চোমরা লোক সব আসবে। আমার স্বামীর নামে নিমন্ত্রণ-পত্র গেছে, না এসে কেউ পারবে না। ওই নামটা নাকে দড়ি দিয়ে টেনে আনবে সবাইকে। এঁরা মুখে যদিও বলেন জনতাই গভর্নমেন্ট চালাচ্ছে, কিন্তু মনে মনে জানেন গভর্নমেন্ট চালাচ্ছে এদেশের এবং বিদেশের ধনকুবেররা। সুতরাং কোনও ধনকুবের 'তু' করে ডাকলেই ছুটে আসবে সবাই। তুমি এস, মজা দেখতে পাবে।"

যে বিখ্যাত হোটেলে পার্টিটা হয়েছিল এবং যাঁরা যাঁরা সেই পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন তাঁদের পরিচয় ইচ্ছে করেই গোপন রাখলাম। গোপন রাখাই সমীচীন। খবরের কাগজের পাতায়, সভায়, জলসায় এঁদের নাম প্রায়ই চোখে পড়ে আপনাদের। বাজারে এঁরা বিদগ্ধ-সমাজের অলঙ্কাররূপে গণ্য। সুতরাং এঁদের নাম প্রকাশ করে এঁদের খেলো করবার ইচ্ছে নেই।

যা হয়েছিল তা সংক্ষেপে বলছি।

সাধারণ খাবার তো ছিলই নানারকমের, কিন্তু মদ এবং মাংসের আয়োজন হয়েছিল প্রচুর। রাঁধা মাংস ছাড়া, কাঁচা মাংসও ছিল। এত বিভিন্ন রকমের নারী-সমাবেশ এবং এতরকম উলঙ্গ-ধর্মী নারীসজ্জার রঙীন প্রদর্শনী সাধারণত দেখা যায় না। বহুমূল্য মদ এসেছিল বহু প্রকারের এবং তা পরিবেশিত হচ্ছিল দরাজ দাক্ষিণ্যে। সুতরাং একটু পরেই মাতাল হয়ে পড়লেন সবাই।

তনিমা এবং ঝিনুকই কিছু খায়নি। মদ তো নয়ই, খাবাব পর্যন্ত নয়।

সবাই যখন খুব মাতাল হয়ে টলছে তখন তনিমা টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠে বলল, ‘‘আমার ইচ্ছে এবার নাচ হোক। আমি আপনাদের জন্য ভালো মুখোশ আনিয়েছি, তাই পরে আপনারা নাচুন এই আমার অনুরোধ। একজন পুরুষের সঙ্গে একজন মেয়ে নাচবে। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।’’

টেবিল থেকে নেমে একগাদা মুখোশ নিয়ে এলো। ভালুকের মুখোশ। প্রত্যেক পুরুষের মুখে তাই পরিয়ে দিলে। বাঁদরের মুখোশও ছিল, সেগুলো পরিয়ে দিলে মেয়েদের মুখে। মুখোশ পরে সবাই কৃতার্থ হয়ে গেল যেন। মুখোশ পরার জন্যে সে কি হুড়োহুড়ি। একটু পরেই মাতাল বাঁদরদের গলা জড়িয়ে মাতাল ভালুকদের নাচ শুরু হল।

তনিমা আবার পাশের ঘরে চলে গেল। বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড একটা চাবুক নিয়ে। সার্কাসে রিং মাস্টারদের হাতে যেমন চাবুক থাকে তেমনি চাবুক। তনিমা সেই চাবুকে চটাং করে একটা শব্দ করে কলকণ্ঠে বলে উঠল— Go on darlings, don't stop (বন্ধুরা থেমো না চালিয়ে যাও)।

অবর্ণনীয় এই নাচ চলল খানিকক্ষণ ধরে। তারপর সবাই শুয়ে পড়ল। বমি করতে লাগল কেউ কেউ। ঝিনুক ‘হলে’ ঢোকে নি। সে উপরের ঘরের একটা জানালা দিয়ে সব দেখছিল। হঠাৎ একটা উচ্চ তীক্ষ্ণ হাসি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল বিরাট ‘হলে’। ঝিনুক উঁকি দিয়ে দেখল তনিমা কোমরে হাত দিয়ে হাসছে। তার মনে হল হাসির বেগে একটা তলোয়ার কাঁপছে যেন।

।। বিয়াল্লিশ ।।

গণেশ হালদারকে পুলিশ আটকাতে পারেনি বেশিক্ষণ। সুঠাম মুকুজ্যে খবর পেয়েই চলে গিয়েছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সেকালের উচ্চশিক্ষিত আই. সি. এস.। তিনি সব শুনে গণেশ হালদারকে ছেড়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি পুলিশ অফিসারটি ডেকে বললেন, স্বাধীন ভারতে বক্তৃতা দেওয়া অপরাধ নয়। সে অধিকার সকলেরই আছে। গণেশবাবুর বক্তৃতার যে সব সারাংশ আপনারা আমার কাছে দাখিল করেছেন তাতে এমন কিছুই দেখলাম না যার জন্যে ওঁকে শাস্তি দেওয়া যায়। উনি গভর্নমেন্টের সমালোচনা করেছেন, সমালোচনা করবার অধিকার প্রত্যেক স্বাধীন নাগরিকেরই আছে, আর উনি যা বলেছেন তা নিতান্ত শূন্যগর্ভ কথা নয়। সুতরাং ওঁকে ছেড়ে দেওয়া হোক। ওঁর বক্তৃতা শুনে কোথাও যদি বিশৃঙ্খলা বা বে-আইনী হট্টগোল হয় তাহলেই পুলিশ তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে। তা যখন হয়নি তখন পুলিশের হস্তক্ষেপ অনাবশ্যক।

গণেশ হালদার কিন্তু আর একটা সমস্যায় পড়েছিলেন, যার সমাধান ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বা সুঠামবাবু দ্বারা সম্ভব ছিল না। তিনি যেদিন আবিষ্কার করেছিলেন যে সুঠামবাবু তাঁর বোনকে বিয়ে করেছে এবং বুলি এই বাড়িতেই আছে, সেদিন তিনি যতটা উল্লসিত হয়েছিলেন, বুলির কাছে যে আবেগে ছুটে এসেছিলেন, তা যেন অনেকটা কমে গেছে। তাঁর মাঝে মাঝে এ কথাও মনে হয়েছে বুলিকে এভাবে ফিরে না পেলেই যেন ভালো হত। এ বুলি যেন সে বুলি নয়। হাসিখুশিতে যার সর্বাঙ্গ ঝলমল করত সে এখন বিষাদের প্রতিমা। জীবন্ত মাছরাঙ্গার

মৃত্যু হয়েছে, তার জায়গায় বসে আছে একটা শোলার প্রাণহীন পাখি। এই যে শোচনীয় রূপান্তর, রাজনৈতিক দাবাখেলার এই যে বীভৎস পরিণতি, এর কি কোনো চারা আছে? নেহরুর বক্তৃতাবলী পড়লে কি এ দুঃখের উপশম হবে? কোন বিধানসভায়, কোন লোকসভায়, কোন বিচারশালায় আবেদন করে কি এর প্রতিকার হবে? কে ফিরিয়ে দেবে সেই বুলিকে?

গণেশ হালদার আজকাল বুলির কাছে খানিকটা সময় রোজ কাটান। ছেলেবেলার সব গল্প করে তাকে প্রফুল্ল করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বুলির প্রফুল্লতা ফিরে আসে না। তার মুখটা যেন মুখোশের মতো হয়ে গেছে। তাতে ভাবের কোনো তরঙ্গ ওঠে না। গণেশ হালদার নানারকম বই থেকে নানারকম গল্প পড়ে শোনান তাকে মাঝে মাঝে। তিনি যতক্ষণ পড়েন বুলি চুপ করে বসে থাকে। তারপর একটু ফাঁক পেলেই উঠে চলে যায়, ঠাকুরঘরে গিয়ে খিল দেয়। কথা প্রায় বলেই না। প্রশ্ন করলে 'হাঁ' কিংবা 'না' বলে। এ যেন সে বুলি নয়, এ যেন অন্য লোক। কোন অদৃশ্য দৈত্য যেন এর ভিতরকার প্রাণরস শুষে নিয়েছে। বাইরে পড়ে আছে ছিবড়েটা। এই প্রাণহীন বুলিকে নিয়ে কি করা যাবে, এই সমস্যার সমাধান কে করবে? গণেশ হালদারও ক্রমশ যেন বিমর্ষ হয়ে পড়ছিলেন।

সুঠাম মুকুজ্যে বাড়িতে ছিলেন না। গত রাত্রে বুড়ো জাম্বু কুকুরটা মারা গিয়েছিল। তিনি তাকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গিয়েছিলেন। যখন ফিরলেন তখন বেলা একটা। মুখে কোনও বিষাদ বা শোকের চিহ্ন নেই। হাসিমুখে গণেশ হালদারকে বললেন, "জাম্বুকে মা গঙ্গার কোলে দিয়ে এলাম। বাঁচল বেচারা। ইদানীং বড়ই কষ্ট পাচ্ছিল। আজ তো আপনার ছুটি? চলুন তাহলে দোরাবগঞ্জে যাওয়া যাক। সেখানে একটা নূতন ধরনের কৃষ্ণচূড়া গাছ আছে জমিদারদের বাগানে। খবর পেলাম তাতে ফুল ধরেছে। অপূর্ব ফুল। সাদা আর গোলাপী মেশানো। মনে হয় এক ঝাঁক পরী নেবেছে। এর একটা জিনিসও দেখাব। লজ্জাবতী লতা। দেখেছেন কখনও? ওখানে প্রচুর আছে। আর আছে কেষ্ট পাগলা। তাকে বললেই সে নাচ দেখায়। অদ্ভুত নাচ। আপনার বোনকেও রাজি করুন না, কেষ্টর নাচ তার ভালোই লাগবে।"

সুঠাম ডাক্তার বালকের মতো উৎসাহে কেষ্ট পাগলার নাচের বর্ণনা করতে লাগলেন। সে তো হাত পা দিয়ে নাচেই, মাথা দিয়েও নাচতে পারে!

একটু পরে দোরাবগঞ্জের বাগানে গিয়ে হাজির হলেন তাঁরা। বুলিও সঙ্গে ছিল। গণেশ হালদার লক্ষ করছিলেন সে যেন ঠিক সুরে সুর মেলাতে পারছে না। কেমন যেন সশঙ্কিত হয়ে আছে। সুঠাম মুকুজ্যে কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। এক অদৃশ্য আনন্দের হিল্লোল যেন চঞ্চল করে তুলছিল তাঁকে ক্ষণে ক্ষণে। সেই অভিনব কৃষ্ণচূড়ার ডাল নুইয়ে নুইয়ে দেখাতে লাগলেন ফুলগুলো। সাদার সঙ্গে গোলাপী যে কি অপরূপ হয়ে মিশেছে তা দেখিয়ে বললেন, "গোলাপী গোলাপীই আছে, সাদাও সাদা আছে। কেউ কারও স্বাতন্ত্র্যও নষ্ট করেনি, তবু দুজনে মিলে কি চমৎকার শোভার সৃষ্টি করেছে, না? সমাজেও আমাদের ওইটেই বোধহয় আদর্শ হওয়া উচিত। কেউ রং বদলাতে পারে না, কিন্তু ভদ্রভাবে পাশাপাশি থাকতে পারে। কি বল?"

বুলির দিকে সহসা দৃষ্টি মেলে চাইলেন তিনি। বুলি সসঙ্কোচে একটু হাসল শুধু।

ঠিক সেই সময় একটা সুরের পিচ্‌কিরি যেন ছুঁড়ে দিলে কে পাশের একটা ঝোপ থেকে।

"কে বলুন তো?"

ডাক্তার মুখার্জি হেসে জিগ্যেস করলেন গণেশ হালদারকে।

"আমি ঠিক বলতে পারছি না।"

বুলি একধারে ঘাড় ফিরিয়ে মুচকি হেসে বললে, "টুনটুনি—"

গণেশ হালদার বললেন, "ও অনেক পাখি চেনে। ছেলেবেলায় বাগানে বাগানে ঘুরত যে।"

"তাই না কি!"

আরও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ডাক্তার মুখার্জি। "ওটা কি বল তো?"

"ছাতারে।"

"ওই তারের উপর!"

"নীলকণ্ঠ।"

"বাঃ! বল তোমাকে আরও পাখি চিনিয়ে দেব। বাঁশপাতি চেন? দোয়েল? কুলো পাখি?"

ডাক্তার মুখার্জি সত্যিই শিশুর মতো প্রগল্‌ভ হয়ে উঠলেন।

একটু পরেই কিন্তু বুলির মুখে আবার সেই মুখোশ নেবে এল। আবার গম্ভীর হয়ে গেল সে। মানুষটা বদলে গেল যেন।

তারপর সুঠাম মুকুজ্যে গেলেন লজ্জাবতী লতার খোঁজে। একটু দূরে একটা মাঠে দু'চারটে লজ্জাবতী খুঁজেও বার করলেন। তাদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখালেন কেমন ছোঁওয়া মাত্র পাতাগুলো মুড়ে মুড়ে যাচ্ছে। ভেবেছিলেন এ-দেখে বুলি হয়তো কৌতুক বোধ করবে। হয়তো সে-ও ছুঁয়ে দেখবে পাতাগুলো। কিন্তু সে কিছুই করল না, সে যেন আরও গম্ভীর হয়ে পড়তে লাগল।

কেষ্ট পাগলার নাচও দেখা হল। সত্যিই নানারকম নাচ দেখাল সে। শীর্ষাসন করে লাট্টুর মতো ঘুরতে লাগল। নাচের শেষে বগল বাজিয়ে গানও ধরল। সে গানের ধুয়া ঃ এই দুনিয়ার মরণ বাঁচন, জানি না ভাই কাহার নাচন, নেচে গেয়ে আমি দাদা সেই কথাটাই বুঝতে চাই। তোমরা কেন হাসছ ভাই।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল।

ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "চল, ওই উঁচু টিলাটায় গিয়ে বসা যাক। ওখানে অনেক দূর পর্যন্ত আকাশ দেখা যায়।"

পশ্চিম আকাশে মেঘ ছিল না। দেখা গেল সপ্তর্ষি নক্ষত্রমণ্ডল অস্ত যাচ্ছে। ডাক্তার মুখার্জি বশিষ্ঠ নক্ষত্রটাকে দেখিয়ে বললেন, "সপ্তর্ষির ল্যাজের ওই মাঝের নক্ষত্রটার নাম বশিষ্ঠ, আর তার ঠিক পাশেই দেখ ছোট্ট অরুন্ধতী। ওই যে খুব ছোট্ট, টিপ টিপ করছে, ঠিক বশিষ্ঠের পাশেই—"

তারপর একটু হেসে বললেন, "আমাদের অবশ্য মনে হচ্ছে বটে ঠিক পাশে, কিন্তু আসলে ওদের মধ্যে ব্যবধান অনেক।"

এর পরই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। বুলি হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

"কি হল হঠাৎ!"

ডাক্তার মুখার্জি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু বুলি কোনো উত্তর দিল না। হালদারমশাই অনেক জিজ্ঞাসা করবার পর সে অশ্রুসজল কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, "আমি উচ্ছিষ্ট, আমি উচ্ছিষ্ট, আমি দেবতার ভোগে স্থান পাবার যোগ্য নই। আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা, দূর করে দাও, আমি আর পাচ্ছি না।"

এ কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন সুঠাম মুকুজ্যে।

"আমরা কেউ দেবতা নই। সবাই মানুষ। আর মানুষ কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না। কোনও জীবন্ত জিনিসই হয় না। প্রকৃতির স্পর্শে আমরা নিত্য-নূতন হই। যে বিরাট স্রোতে আমরা ভাসছি তাতে কোথাও কোনো ময়লা জমতে পায় না। ও-সব কথা ভাবছ কেন! ছি, ছি, তুমি কখনও উচ্ছিষ্ট হতে পার?"

গণেশ হালদার যদিও পাশে বসেছিলেন তবু তিনি স-স্নেহে বাঁ-হাত দিয়ে বুলিকে জড়িয়ে ধরলেন। বুলি তাঁর কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।

।। তেতাল্লিশ ।।

ঝিনুক জিনিসপত্র গুছিয়ে বসে ছিল। আজ রাত্রের ট্রেনেই তাদের কলকাতা যাওয়ার কথা। তারপর সেখান থেকে প্লেন ধরবে। ডাক্তার ঘোষাল কিন্তু সমানে 'না' বলে যাচ্ছেন। তবু ঝিনুক আশা করে আছে শেষ মুহূর্তে হয়তো রাজি হয়ে যাবেন। ট্রেন রাত বারোটার পর। সকালে দশটার সময়ই তিনি একটা দূরের কলে বেরিয়ে গেছেন। বলে গেছেন সন্ধের মধ্যেই ফিরবেন। ঝিনুক ভাবল এই সুযোগে কাউয়ের খোঁজটা নেওয়া যাক। তাকে টাকাটা দিতে হবে। এতদিন এত বিবিধ গোলমালের মধ্যে ছিল সে, যে কাউয়ের খোঁজ নিতে পারেনি।

বেরিয়ে পড়ল ঝিনুক। অনেক খুঁজে খুঁজে অনেকক্ষণ পরে সে কাউয়ের ঠিকানাটা বার করল বটে, কিন্তু কাউয়ের সঙ্গে দেখা হল না। অন্য কোনও লোকেরও দেখা পেল না যে তার খবর বলতে পারে। সবাই তখন বেরিয়ে গেছে। সামনে দেখল একটা বড় ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সিতে কেউ নেই। দূরে একটা বারান্দায় এক কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত বুড়ি বসে বসে চাল বাছছিল। মুখটা সিংহের মতো, চোখে ডাইনির দৃষ্টি। তার কাছে যেতে ভয় করে। তবু ঝিনুক গেল। সে বলল, 'ট্যাক্সিটা রমেশের। রাত্রে সে ট্যাক্সি চালায়। কাউ বাজার করতে বেরিয়েছে, ফিরবে সন্ধ্যের পর। কালীপুজোর বাজার করতে গেছে। সে আজ কালীপুজো করবে এখানে!"

ঝিনুক তাকে বলে এল— "কাউ এলে তাকে বোলো তোমার মাসিমা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি আজ রাত্রের গাড়িতে কলকাতা চলে যাবেন। যদি সময় করতে পারে যেন সন্ধ্যার সময় আমার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করে, একটা জরুরী দরকার আছে। আমার ঠিকানা সে জানে।"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ঘর-বার করছে ঝিনুক। ডাক্তার ঘোষাল তখনও ফেরেননি। কাউও আসেনি। ঘড়িতে যখন আটটা বাজল তখন রীতিমতো চঞ্চল হয়ে উঠল সে। ডাক্তার ঘোষাল রোহিণীপুর গেছেন। এখান থেকে ষোল মাইল। যেতে-আসতে দু'ঘন্টার বেশি লাগা উচিত নয়। মাঝে খানিকটা অসমতল জঙ্গুলে রাস্তা আছে। সবসুদ্ধ তিন ঘণ্টাই লাগুক। রোগীর বাড়িতে একঘণ্টা। বেরিয়েছেন দশটার সময়, তিনটে নাগাদ তাঁর নিশ্চয় ফেরা উচিত ছিল। এত দেরি হবার মানে কি? কঠিন রোগী? রাত্রে সেখানে থেকে যাবেন না তো! অনেক সময় কঠিন রোগী হলে থেকে যান তিনি রোগীর বাড়িতে। ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবল খানিকক্ষণ সে। তারপর তার আর একটা কথাও মনে হল। রাস্তায় মোটর খারাপ হয়ে যায়নি তো। মোটরটা মাঝে মাঝে বিগড়ে যায়। এক্সিডেন্ট হয় নি তো? কাউও ত এখনও এল না। শহরের পূর্ব দিক দিয়ে যে রাস্তাটা

মফস্বলের দিকে চলে গেছে সেইটেই রোহিণীপুর যাওয়ার রাস্তা, এইটুকু শুধু ঝিনুক জানে। কাউ এসে পড়লে সাইকেল করে তাকে পাঠানো যেত সেখানে। কেউ আসছে না, কি আশ্চর্য! খানিকক্ষণ ঘর-বার করে ঝিনুক শেষে ঠিক করে ফেলল ন'টার মধ্যে কাউ যদি না এসে পড়ে তাহলে নিজেই সে বেরিয়ে পড়বে। ততক্ষণ কি করা যায়? গ্রামোফোনটা পেড়ে রেকর্ড বাজাতে লাগল। ন'টা বেজে গেল। একটা মোটরের শব্দ শোনা যাচ্ছে, না? উৎকর্ণ হয়ে রইল। বেরিয়ে চলে গেল মোটরটা। কাউও এল না। আসবে না বোধহয়। উঠে পড়ল ঝিনুক। একটা কথা তার মনে পড়ল। কাউয়ের বাড়ির কাছে সে একটা ট্যাক্সি দেখেছিল। কাউকে নিয়ে সেই ট্যাক্সিটা ভাড়া করে ডাক্তার ঘোষালের খোঁজে বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়? এ ছাড়া তো অন্য কোনো উপায় নেই। ট্যাক্সিটা পাওয়া যাবে কি? না পাওয়া গেলেই মুশকিল। এই মফস্বল শহরে ট্যাক্সি বেশি নেই, যা দু'একটা আছে তা প্রায়ই পাওয়া যায় না। ওই ট্যাক্সিটা যদি পাওয়া যায়। তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল ঝিনুক। কাউ যে বস্তিতে থাকে তা-ও কাছে নয়। হেঁটে গেলে এক ঘণ্টার উপর লাগবে। ঝিনুক রিক্‌শা খুঁজতে লাগল। অনেক রিক্‌শাওলাই রাত্রে ও-অঞ্চলে যেতে রাজি হল না। বলল, ও পাড়ায় এত রাত্রে যাওয়া নিরাপদ নয়। অনেকক্ষণ পরে একটা রিক্‌শাওলাকে পয়সার লোভ দেখাতে রাজি হল সে। তাতেই চড়ে বসল ঝিনুক। রিক্‌শায় চড়ল বটে, কিন্তু রিকশাটা ভালো নয়, কিছুদুর গিয়েই থামে, চাকাটা মেরামত করে নিয়ে আবার এগোয়। অনেকক্ষণ পরে অনেক দেরিতে সেটা অবশেষে পৌঁছাল কাউয়ের বস্তির কাছে। রিক্‌শাওলা আর যেতে চাইলো না, বলল, ও বস্তিতে আমি ঢুকব না মাইজি। তার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে হেঁটেই গেল ঝিনুক। তার মনে হল যদি ট্যাক্সিটা না পাওয়া যায় তা হলে আর যাওয়াই হবে না আজ। সুবেদার খাঁ অনর্থক দাঁড়িয়ে থাকবেন ডিসট্যান্ট সিগনালের কাছে। কাউ কি কিছু ব্যবস্থা করতে পারবে না? কাউকে দেবার জন্যে টাকাটাও সে এনেছিল সঙ্গে করে। যতীশবাবুকে দেবার পর যা বেঁচেছিল তা সবই সঙ্গে ছিল তার। সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে বেড়াচ্ছিল টাকাটা। সোনার বাট দুটো বাক্সে রেখে দিয়েছিল। তনিমা তাকে বলে গিয়েছিল যা-কিছু টাকা বাঁচবে তা কলকাতায় তার স্বামীর দোকানে যেন জমা দিয়ে যায়, তাহলেই বিলেতে গেলে সে টাকাটা তাকে দিতে পারবে। বেশি টাকা সঙ্গে থাকাটা বে-আইনী। তাই করবে ঠিক করেছিল ঝিনুক। আত্মরক্ষার জন্য সে একটা ছোরাও কিনেছিল। ছোরাটাও সঙ্গে ছিল তার। কিছুক্ষণ পরে সে যখন বস্তির ভিতর ঢুকল তখন পাড়া নিস্তব্ধ। একটা ভয়াবহ নীরবতা থমথম করছে চতুর্দিকে। আর একটু ঢুকেই সে অবাক হয়ে গেল ডাক্তার ঘোষালের মোটরটা দেখে। ডাক্তার ঘোষালও এখানে এসেছেন কি? কেন? আরও ভিতরে ঢুকে পেট্রোম্যাক্সের আলো দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে প্রকাণ্ড এক কালীমূর্তি। তার সামনে বলি দেবার হাড়-কাঠ। পাশেই কাউয়ের সেই প্রকাণ্ড খাঁড়া চক্‌চক্ করছে। আশেপাশে কেউ নেই।

"কাউ---"

ঝিনুকের নিজের কণ্ঠস্বরই অদ্ভুত শোনাল নিজের কানে। কাউয়ের সাড়া পাওয়া গেল না। পাশের একটা ঘর থেকে গোঁ গোঁ শব্দ শোনা গেল একটা। সেই দিকে এগিয়ে গেল ঝিনুক। গিয়ে যা দেখল, তাতে চক্ষু স্থির হয়ে গেল তার। ডাক্তার ঘোষালের হাত-পা-মুখ বেঁধে একটা বস্তার মতো ফেলে রেখেছে তাঁকে এক কোণে। এ কি! তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে তাঁর কাছে বসে পড়ল ঝিনুক বাঁধন খুলে দেবে বলে।

"কে—"

কর্কশ কণ্ঠের চিৎকারে চমকে ঘাড় ফিরিয়ে রমেশকে দেখতে পেল সে।

"কে আপনি? ওর গায়ে হাত দেবেন না।"

"আমি কাউয়ের মাসিমা। এঁকে এমন করে বেঁধে রেখেছেন কেন।"

"ওকে মা-কালীর কাছে বলিদান দেওয়া হবে। ও মানুষ না, পশু।"

অগ্নিস্ফলিঙ্গ ছুটে বেরুল ঝিনুকের দৃষ্টি থেকে।

"কি যা-তা বলছেন আপনি! উনি যে কত বড় মানুষ, তা আপনার ধারণা নেই। উনি পশু নন, দেবতা। পূর্ববঙ্গে রায়টের সময়, যখন সবাই আমাদের ফেলে পালাচ্ছিল, তখন উনি নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে আমাদের বাঁচিয়েছিলেন। উনি পশু? ওঁকে বলিদান দেবেন? আমার প্রাণ থাকতে তা হবে না।"

হঠাৎ সে শাণিত ছোরাটা বার করে বসল ডাক্তার ঘোষালের কাছে। তার তেজোদীপ্ত মূর্তি দেখে ঘাবড়ে গেল রমেশ।

"কাউ কোথা?"

"ভিতরে আছে।"

"তাকে গিয়ে বলুন, তার মাসিমা এসেছে দেখা করতে। আমরা আজ চলে যাচ্ছি এখান থেকে, যাবার আগে তাকে কিছু টাকা দিয়ে যেতে চাই।"

রমেশ ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইল তবু।

"সত্যি, ইনি রায়টের সময় আপনাদের বাঁচিয়েছিলেন?"

"উনি না থাকলে আমরা কেউ বাঁচতুম না। আমাকে না মেরে ওঁর গায়ে আপনারা কেউ হাত দিতে পারবেন না। এঁর বাঁধন খুলে দিন, আর কাউকে খবর দিন।"

রমেশ বুঝল তারা ভুল করেছে। ভিতরে চলে গেল। একটু পরেই কাউ এল।

"এ কি করেছ তুমি! পিতৃহত্যার আয়োজন করেছ? এতে কি মা-কালী সন্তুষ্ট হবেন? তুমি তোমার মাকে টুঁটি টিপে মেরেছিলে, কত টাকা খরচ করে উনি তোমাকে ফাঁসি থেকে বাঁচিয়েছিলেন, তার এই প্রতিদান? ছি, ছি, ছি—"

কাউ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর বলল, "উনি আমাকে অপমান করে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। উনি আপনাকে যাদু করে রেখেছেন, আপনাকে আমি উদ্ধার করতে চাই।"

"আমাকে উদ্ধার করতে তুমি পারবে না। আমরা আজই এ দেশ থেকে চলে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে আমাদের আর দেখা হবে কি না সন্দেহ। যাবার সময় তাই তোমাকে কিছু টাকা দিতে এসেছি, যাতে তুমি ভালোভাবে সৎপথে থাকতে পার—"

ঝিনুক ব্লাউসের ভিতর থেকে নোটের বাণ্ডিলটা বার করে ছুঁড়ে দিলে কাউয়ের দিকে!

"গুনে নাও, পাঁচ হাজার টাকা আছে। আর এঁকে ছেড়ে দাও এখুনি। আমি আশ্চর্য হচ্ছি এঁকে এভাবে ধরলে কি করে তোমরা!"

রমেশ আবার এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, "আমরাই ওঁকে কল দিয়েছিলাম রোহিণীপুরে। একটা সাজানো রোগীও অবশ্য ছিল। আমরা লুকিয়ে বসেছিলাম রোহিণীপুরের জঙ্গলে। রাস্তার উপর দু-তিনটে গরুর গাড়ি কাত করে রেখেছিলাম। ফেরবার সময় যখন গাড়ি সরাবার জন্য হর্ন দিচ্ছিলেন, তখন আমরা বেরিয়ে এসে ধরে ফেললাম ওঁকে। সহজে

হয় নি ব্যাপারটা। আমাদের দু'জনকে ঘায়েল করেছেন উনি। তবে আমাদের লোকবল বেশি ছিল, উনি পারলেন না শেষ পর্যন্ত। ওঁকে বেধে ওঁর মোটরে করেই এনেছি এখানে।''

''ওঁকে দয়া করে ছেড়ে দিন এখন।''

রমেশ মাথা চুলকে বলল, ''কাউ না বললে আমরা ছাড়তে পাচ্ছি না। আমরা কাউয়ের কথাতেই এ-কাজ করেছি। তবে আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ভুলই করেছি। কাউ কি বল তুমি?''

কাউ হঠাৎ ভেঙে পড়ল। ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগল সে। ঝিনুকের পায়ের উপর উপুড় হয়ে বলল, ''আমায় ক্ষমা করুন মাসিমা। আপনি দেশ ছেড়ে যাবেন না। আমি সারাজীবন আপনার সেবা করব।''

এই বলে কাঁদতে কাঁদতে সে ভিতরে চলে গেল। রমেশও গেল তার পিছু পিছু। একটু পরেই ফিরে এল রমেশ।

''কাউ বলছে ওঁকে ছেড়ে দিতে। কিন্তু আমরা এখানে ওঁর বাঁধন খুলতে চাই না। খুললেই উনি তেড়ে আসবেন। ওঁর গায়ে সাংঘাতিক জোর। ঝাবরা এক ঘুঁষিতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। কাটরার পেটে এক লাথি মেরেছিলেন, সে এখনও কথা কইতে পারছে না। তাই এখানে ওঁর বাঁধন খুলব না। যেমন বাঁধা আছে, তেমনি অবস্থাতেই নিয়ে যান ওঁকে।''

ঝিনুকেরও মনে হল, বাঁধন খুলে দিলে উনি এখানে সত্যিই হয়তো মারপিট করতে লেগে যাবেন। তার চেয়ে ওঁকে এমনি নিয়ে যাওয়াই ভালো। আর-একটা কথাও মনে হল। উনি বিলেত যেতে এখনও রাজি হননি। ওঁকে বাঁধা অবস্থাতেই ট্রেনের কাছ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাক। একবার টেনে ট্রেনে তুলতে পারলে, অন্তত কলকাতা পর্যন্ত গেলে হয়তো ওঁর মত বদলাবে।

''বেশ তাহলে তুলে দাও ওঁকে।''

গাড়ির পিছনের সীটে শুইয়ে দেওয়া হল ডাক্তার ঘোষালকে। তাঁকে নিয়ে ঝিনুক সোজা বাড়ি চলে গেল।

ট্রেনের আর বেশি দেরি ছিল না। ঝিনুক বাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি নতুন স্যুটকেস দু'টো আর টিফিন কেরিয়ারটা তুলে নিলে গাড়ির পিছনে। আর হরসুন্দরকে বলে গেল— ''কম্পাউন্ডারবাবু এখানকার যা ব্যবস্থা করার করবেন। তাঁকে আমি টাকা দিয়ে দিয়েছি।''

ঝিনুক সোজা চলে গেল ডিস্টান্ট সিগন্যালের দিকে।

সুবেদার খাঁ ট্রেন দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। ট্রেনের হুইশল্ দীর্ণ করে দিচ্ছিল নৈশ অন্ধকারকে। ঝিনুক ট্রেনের কাছে এসে তাড়াতাড়ি ডাক্তার ঘোষালের বাঁধনগুলো কেটে দিলে।

''উঠুন চলুন,—''

ডাক্তার ঘোষাল ছাড়া পেয়েই তড়াক করে নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে, তারপর মাঠামাঠি ছুটতে লাগলেন। ঝিনুক স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর একবার খুব জোরে হুইশল্ বাজল। ঝিনুক জিনিসপত্র নিয়ে উঠে পড়ল ট্রেনে। সুবেদার খাঁ ইনজিন থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখছিলেন। ঝিনুক উঠতেই ট্রেন ছেড়ে দিলেন তিনি।

গভীর রাত্রি। কাউদের বস্তি নিঝ্‌ঝুম হয়ে গেছে। কালীপুজো হয়নি। প্রতিমা একা দাঁড়িয়ে আছে। ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করলেন ডাক্তার ঘোষাল।

''কাউ, কাউ, কাউ—''

হাঁপাতে হাঁপাতে চিৎকার করতে লাগলেন তিনি। কাউ বেরিয়ে এল।

''এ কি আপনি ফিরে এলেন? মাসিমা কোথা?''

''সে চলে গেল। আমি ফিরে এলুম তোমার কাছে আমাকে মারতে হয় মার, কাটতে হয় কাট। যা তোমার খুশি।''

বলেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

পৃথিবীনন্দনের জীবনেও একটা বিপর্যয় ঘটল। তিনি পুলিশে চাকরি করতেন, তাঁর উপর-ওলা একজন পদস্থ মুসলমান পুলিশ অফিসার তাঁকে ডেকে পাঠালেন একদিন।

বললেন, ''শুনছি, আপনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানারকম অপ-প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। আপনার রেকর্ড দেখলাম, আপনি যতগুলি লোককে জেলে পচিয়েছেন সবগুলিই মুসলমান। হিন্দু ক্রিমিনাল আপনার চোখে পড়েনি?''

''আমি মুসলমান ক্রিমিনাল খুঁজে বেড়াই।''

''আপনার কি মুসলমান-বিদ্বেষ আছে না কি?''

''অস্বীকার করব না, আছে।''

''আপনার এরকম মনোভাব কিন্তু আইনসঙ্গত নয়, তা আপনি জানেন?''

''জানি। আইনের প্যাঁচেই ওদের কাবু করবার চেষ্টা করি।''

পুলিশ অফিসারটি সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন তার মুখের দিকে। তারপর বললেন, ''আমার মনে হচ্ছে আপনার মস্তিষ্কে কোনও গোলমাল হয়েছে। আপনাকে আমি সাস্‌পেন্ড করলাম। আপনি আমার এই চিঠি নিয়ে সিভিল সার্জনের কাছে যান। তিনি যদি আপনাকে সুস্থ বলে মনে করেন তাহলে ভেবে দেখব আপনাকে চাকরিতে রাখা যাবে কি না। আমার মনে হচ্ছে আপনি পাগল, মনো-ম্যানিয়াক্ (mono-maniac) । আমি সিভিল সার্জনকে ফোন করছি। আপনি এই চিঠি নিয়ে তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন।

ঝিনুক নির্বিঘ্নে বিলেত পৌঁছল গিয়ে।

পৌঁছবার মাসখানেক পরে নিম্নলিখিত চিঠিটিও পৌঁছল তার হাতে।

সবিনয় নিবেদন,

পাগলা গারদ থেকে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। আপনার চিঠিটা পেয়েছিলাম সুবেদার খাঁর কাছ থেকে। আপনি আমাকে চেনেন না। মাত্র এক মুহূর্তের জন্য আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল এক স্টেশন প্ল্যাটফর্মে। কিন্তু আপনার সব খবর আমি জানি। একটি সংবাদ দিচ্ছি। পাকিস্তানে আবার একবার রায়ট হয়ে গেছে। সেই রায়টে আপনার কাকা যতীশবাবু মারা গেছেন। আর তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন সুবেদার খাঁ। হয়তো খবরটা আপনার কাজে লাগতে পারে তাই জানিয়ে দিলাম। সঙ্গে খবরের কাগজের কাটিং (cutting) পাঠালাম। দেখবেন খবরটা মিথ্যা নয়। নমস্কার জানবেন।

ইতি— পৃথিবীনন্দন

।। চুয়াল্লিশ ।।

সুঠাম মুকুজ্যে ঠিক গঙ্গার ধারে একটা নির্জন জায়গায় বসে লিখছিলেন ঃ

"যাঁদের দূরদৃষ্টি আছে, যাঁরা ভবিষ্যতের বিবিধ সুখদুঃখ আগে থাকতে কল্পনা করে সেই রকম ব্যবস্থা করতে পারেন তাঁদের আমরা প্রশংসা করি। তাঁরা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তাঁরা কতদূর দেখতে পান? কতদূর দেখতে পাওয়া সম্ভব? তাছাড়া সুখদুঃখও কি এমন অপরিবর্তনীয় যে তাদের স্বাদ চিরকাল একরকম থাকে? আজ যেটাকে সুখের হেতু বলে মনে হয় দু'দিন পরেই বিস্বাদ হয়ে যায় তা। ছেলেবেলায় একটা সামান্য ঘুড়ি বা পুতুলের জন্য প্রাণ দিতাম, ওইগুলোকেই চরম সুখেব হেতু বলে মনে হত। এখন কি হয়? নীতি বা প্রিন্সিপল (Principle) সম্বন্ধে ওই একই কথা খাটে। আজ যেটা সুনীতি কাল সেটা দুর্নীতি হয়ে যেতে বাধা নেই। এমন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হতে পারে যখন সত্য কথাও অসঙ্কোচে বলা যায় না। যুধিষ্ঠিরের মতো ধার্মিক লোককেও 'হত ইতি গজ' করতে হয়েছিল। পরিস্থিতির সঙ্গে আমরাও বদলাচ্ছি, বদলানোটাই নিয়ম। আজকে যে টাকাটা বাজারে চলছে, কাল তা চলবে না। তার চেহারা বদলে যাবে। মিউজিয়মে ওরকম কত অচল টাকার নমুনা আছে। ইতিহাসে আছে, অচল নিয়মের আর নীতির। ভবিষ্যতে কি হবে তা বলা বড় শক্ত। কঠিন জমাট বরফকে (Iceberg) যদি শিলা বলতে আপত্তি না থাকে তাহলে শিলার জলে ভাসাও অসম্ভব ব্যাপার নয় কিছু। দক্ষিণ মেরু, উত্তর মেরুতে স্বাভাবিক ব্যাপার ওটা..."

প্রায় তিনমাস কেটেছে। ডাক্তার ঘোষালের উদ্দাম স্বভাব আরও উদ্দাম হয়ে উঠেছে। দিবারাত্রি মদ খান আজকাল। কাউ ফিরে এসেছে তাঁর কাছে। সে যতটা সম্ভব তাঁকে সামলে রাখতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না।

সেদিন ডাক্তার ঘোষাল অত্যন্ত বেশি মদ খেয়েছিলেন। তার উপর জ্বর হয়েছিল। খুব বমি করে শুয়ে হাঁপাচ্ছিলেন। কাউ হাওয়া করছিল শিয়রে বসে। ভাবছিল কোনো ডাক্তার ডাকবে কি না, এত রাত্রে পাওয়া যাবে কি কাউকে? হঠাৎ একটা প্যাঁচা ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। হু হু করে হাওয়া উঠল একটা। হঠাৎ ডাক্তার ঘোষাল চেঁচিয়ে উঠলেন— "ভগবান আমাকে নিচ্ছ না কেন! নচ্ছার কোথাকার, damned swine, নরকে ঠেলে দাও না বাবা, আর যে পারা যায় না।"

বলেই চুপ করে গেলেন। কাউ বড়ই অসহায় বোধ করতে লাগল। এমন সময় একটি ছায়ামূর্তি ঘরে ঢুকল।

"কে—" জিজ্ঞাসা করলে কাউ।

"আমি ঝিনুক।"

তড়াক করে উঠে বসলেন ডাক্তার ঘোষাল।

"Get out, get out, get out— বেরিয়ে যাও এখান থেকে।"

ঝিনুক নড়ল না, দাঁড়িয়ে রইল।

অলঙ্কারপুরী

।। এক ।।

বিরাট রাজ্য অলঙ্কারপুরী রাজার নাম সমূহগুণ। রাজকন্যার নাম রত্নাবলী। রত্নাবলীর জন্মের সময় তার মা মারা গিয়েছিলেন। সমূহগুণ আর বিবাহ করেননি। রত্নাবলীকে মানুষ করছেন তিনি। রত্নাবলী তাঁর নয়নের মণি। শুধু তাঁর নয়, রাজ্যের সকলের।

অলঙ্কারপুরী সত্যিই নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। নদী আছে, ঝরনা আছে, বন আছে, উপবন আছে, পাহাড় আছে, উপত্যকা আছে। ফুল আছে নানা রঙের, ফল আছে নানা স্বাদের। অলঙ্কারপুরীর আকাশ যেন নীলা দিয়ে তৈরি। সে আকাশে মেঘেরা যখন ভাসে মনে হয় যেন স্বপ্নের দল ভেসে বেড়াচ্ছে। সে আকাশের ঊষা যেন রঙিন জাগরণ, সন্ধ্যা বর্ণময় অন্ধকার। সে আকাশে চাঁদ যখন ওঠে মনে হয় কৃষ্ণসায়রে শ্বেত কমল ফুটল বুঝি।

চাঁদ যখন মেঘে ঢাকা পড়ে যায় অধীর হয়ে ওঠে রত্নাবলী। বাবাকে বলে—বাবা, মেঘকে সরে যেতে বল চাঁদের সামনে থেকে।

তার ধারণা তার বাবার হুকুম অমান্য করবার সাধ্য কারো নেই।

বাবাও সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দেন—সেনাপতি, মেঘকে এখুনি সরে যেতে বল। যদি না যায় গুলি ছোঁড়।

সেনাপতি গুলি ছোঁড়ে মেঘকে লক্ষ্য করে। মেঘ একটু পরে আপনিই সরে যায়।

রত্নাবলী ভাবে, বাবার হুকুমেই সরে গেল মেঘটা।

মেয়েটা বাবা-অন্ত প্রাণ। বাবারও একমাত্র বন্ধু মেয়ে।

রাজা সমূহগুণও একটু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। তিনি সমস্ত দিন ঘুমোন, জেগে থাকেন রাত্রে। সারারাত নক্ষত্র-চর্চা করেন। নিশাচর পাখিদের সঙ্গেও আলাপ করেন। মাঝে মাঝে প্যাঁচার পিঠে চড়ে মা-লক্ষ্মীও নাকি দেখা দেন তাঁকে। বাদুড়েরা দিয়ে যায় দেশ-বিদেশের খবর। জোনাকিরা নিয়ে আসে লুকানো আলোর খবর। ঝিঁঝিঁ পোকারা শোনায় সেই সঙ্গীত যার স্বরলিপি কোনও গানের খাতায় লেখা হয়নি। গভীর রাত্রে ফিঙে পাখি মাঝে মাঝে গান গেয়ে ওঠে—মেকি, মেকি, মেকি। সমূহগুণের কোলের উপরও থাকে ছোট একটি দিলরুবা। তিনিও মাঝে মাঝে দিলরুবাতে রাগ-রাগিণী আলাপ করেন চোখ বুজে। তাঁর মনে হয় নক্ষত্রলোক থেকে শ্রোতা আর শ্রোত্রীর দল যেন নেমে এসেছে তাঁর বাজনা শোনবার জন্য। ঘিরে বসেছে তাঁকে। স্ফটিকের তৈরি বিরাট রাজপ্রাসাদের প্রকাণ্ড ছাতে প্রায় সমস্ত রাত একা থাকতেন সমূহগুণ। রত্নার ঘরে থাকত তার দুই সহচরী— নীরা ও তীরা। আর তার পাশের ঘরে থাকত সশস্ত্র প্রহরিণীরা। পাহারা দিত রত্নাকে। প্রহরে প্রহরে প্রহরিণী বদল হত। কিন্তু আসল প্রহরিণী থাকতেন রত্নার ঘরেই স্বর্ণবেদির উপর—রত্নার পরলোকগতা মা কমলাঙ্গিনীর স্বর্ণ-প্রতিমাটি। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন তিনি। মনে হত তিনি যেন জীবন্ত। সমূহগুণ প্রতিদিন সকালে ছাত থেকে নেমেই একটি পদ্মের মালা পরিয়ে দিতেন তাঁর গলায়। রাত্রে ছাতে যাওয়ার আগে সেই পদ্মের মালাটি খুলে নিয়ে পরিয়ে দিতেন গোলাপের একটি মালা। এই দুটি ফুলই খুব ভালোবাসতেন কমলাঙ্গিনী। পদ্মফুলের জন্য বিরাট বিরাট পুকুর এবং

গোলাপফুলের জন্য বিরাট বিরাট বাগান করিয়েছিলেন সমূহগুণ। মাঝে মাঝে স্বর্ণ-প্রতিমাটি খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠত। মনে হত তার সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন জ্যোতি ঠিকরে বেরুচ্ছে। তখন রাজা বুঝতে পারতেন রানী তাঁকে কিছু বলতে চান। তিনি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ঘাড় নেড়ে মৃদুস্বরে বলতেন শুনব, রাত্রে ছাতে এস। রানী যেতেন কি না, গেলেও তাঁর সঙ্গে কোনো কথা হত কি না একথা রাজা ছাড়া আর কেউ জানত না!

।। দুই ।।

রাজার একমাত্র মেয়ে রত্নাবলী যে কত আদরিণী ছিল তার কিছু পরিচয় শোন। এক রকম খাবার রোজ খাবে না। রোজ আলাদা বকম খাবার চাই। একরকম পোশাক দুদিন পরবে না, রোজ আলাদা পোশাক চাই। গয়নাও তাই। রোজ চাই নূতন ধরনের। ফুলের গয়নাই বেশি পছন্দ। রত্নাবলীর খাবার করবার জন্যে দেশ-দেশান্তর থেকে রাঁধুনি এসেছিল, তার পোশাকের বৈচিত্র্যও করবার জন্য এসেছিল দেশ-বিদেশ থেকে দরজি। গয়নার নূতনত্ব করবার জন্য স্যাকরার দল সর্বদা মাথা ঘামাতো। আর মালী-মালিনীরা রোজ নূতন নূতন ধরনের ফুলের গয়না করবার জন্য ধর্না দিত রূপশ্রীর কাছে। রূপশ্রী মন্ত্রী ভানুনাথের মেয়ে। তার রং কালো, দেখতে তেমন ভালো নয়। ভানুনাথ তার নাম রেখেছিলেন লবঙ্গ। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল লবঙ্গ বাইরেই কালো— অন্তরে তার রূপের উৎস অফুরন্ত। খুব উঁচুদরের শিল্পী সে। মহারানী কমলাঙ্গিনীর স্বর্ণমূর্তি সে-ই গড়েছিল। যেদিন মহারাজের অপরূপ তৈলচিত্রখানি এঁকে মহারাজকে উপহার দিয়ে এল সে, সেই দিনই মহারাজ সমূহগুণ তার নাম বদলে দিলেন। বললেন— আজ থেকে তোমার নাম দিলাম রূপশ্রী, আর তোমার শিল্পচর্চার জন্য আলাদা একটা বাড়িই বানিয়ে দেব আমি। সেখানে তোমার শিল্পচর্চার যে কোনও জিনিস তুমি চাইলেই পাবে। আর তোমার তৈরি জিনিসগুলি যদি অন্য রাজ্যের বাজারে পাঠাতে চাও তারও ব্যবস্থা করে দেব আমি। এর থেকে যা রোজগার হবে তা তোমার হবে, আর যে সব জিনিস বিক্রি হবে না তা আমি কিনে নেব।

রূপশ্রীর তাই অবসর নেই। দেশ-বিদেশের খদ্দের সর্বদা ভিড় করে থাকে তার বাড়ির সামনে। রূপশ্রী কিন্তু সকালে উঠেই রত্নার জন্য ফুলের গয়না গড়তে বসে। নিত্য নূতন রকম ফুলের হার, ফুলের চুড়ি, ফুলের বাজু আর ফুলের মুকুট তৈরি করে সে। করে তার সহকর্মিণীরা. কিন্তু কি করে তা নিত্য নূতন রকমের হবে কৌশলটি রূপশ্রী বলে দেয়। ফুলেব গয়নায় শুধু ফুলই থাকে না, থাকে সোনা-রুপোর জরি আর নানা বঙের রেশমী সুতো।

রত্নাও খুব ভোরে ওঠে। উঠেই নীরা আর তার তীরাকে নিয়ে সে বেরিয়ে যায় তার নিজের বাগানে। বাগানটি বাড়ির পাশেই আর সে বাগানে আছে দেশ-বিদেশের নানা রকম ফুল। রত্না গিয়ে ফোটা ফুলগুলির কাছে দাঁড়ায় আর কুঁড়িগুলিকে চুম খায়। তার ধারণা, তার চুম না খেলে কুঁড়িদের ঘুম ভাঙবে না। তীরা আর নীরার হাতে থাকে গোলাপজলে ভরা রুপোর ঝাঁঝরি পিচ্‌কিরি। তাদের পিছনে থাকে বাগানের মালী ভরদ্বাজ হাতে একটি কারুকার্য-খচিত সোনার বালতি নিয়ে, বালতিতে থাকে গোলাপজল। বালতি থেকে গোলাপজল নিয়ে নিয়ে তীরা আর নীরা নাইয়ে দেয় গাছগুলিকে।

রত্নার পাখি পোষার শখ ছিল না। বনের জন্তুদের ধরে এনে চিড়িয়াখানা বানানোর শখও না। স্বাধীন জন্তুদের এনে বন্দী করে রাখার পক্ষপাতী ছিল না সে। তার শখ ছিল হাতি পোষার আর ঘোড়া পোষার। কিন্তু তাদের স্বাধীনতা সে হরণ করেনি। হাতিরা থাকত পাহাড়ের ধারে একটা জঙ্গলে, ঘোড়ারাও তাই। তাদের জন্য নদীর ওপারে আর একটা জঙ্গল ছিল। সেটাও আর একটা পাহাড়ধারে। তাদের দেখাশোনা করবার জন্য অনেক লোকজন ছিল। রত্না কিন্তু রোজ সকালে এদের কাছে যেত। সঙ্গে নিয়ে যেত প্রচুর ভালো ভালো খাবার। নানা রকম ঘাস, পাতা, ডাল, কাঁচা তরি-তরকারি, বহু রকম ফল, তা ছাড়া সন্দেশ, রসগোল্লা, জিলাপি, বোঁদে, মিহিদানা।

রত্নার সাড়া পেলেই হ্রেষায় হর্ষধ্বনি করে বেরিয়ে আসত ঘোড়ার দল। রত্নাকে দেখে কেউ পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠত, কেউ তাকে ঘিরে বনবন করে ছুটত, কেউ এসে মাথা ঘষত তার গায়ে। হাতির দল বন থেকে বেরিয়ে হাঁটু গেড়ে বসত রত্নার সামনে, আর মাথার উপর শুঁড় তুলে অভিবাদন করত তাকে। সকালটা এইভাবে কেটে যেত রত্নার। দুপুরে ঘুমুত না সে, লেখাপড়া করত গুরুদেব ভট্টজীর কাছে। বিকেলে নদীতে গিয়ে বাচ খেলত। রত্নার নিজের একটি আলাদা ছিপ ছিল। সে ছিপে তার সঙ্গে থাকত তীরা, নীরা, হীরা আর পান্না। তারা ইচ্ছে করলে সব্বাইকে হারিয়ে দিতে পারত। কিন্তু রত্না তাদের জোরে বাইতে দিত না। সে ইচ্ছে করে হেরে যেত। হেরে গিয়ে বেশি আনন্দ পেত সে। যে জিতত তাকে পুরস্কার দিত মুক্তার মালা।

সন্ধ্যায় সময় এসে স্নান করত গোলাপজলে। নতুন করে সাজত নতুন ধরনের পোশাকে—গয়নায়। তারপর প্রণাম করত মায়ের প্রতিমাকে, আর বলত— মা, তুমি আবার এসো। আবার এসো।

নির্বাক প্রতিমা চেয়ে থাকত নিষ্পলক দৃষ্টিতে। সে দৃষ্টির দিকে চেয়ে থাকত রত্নাও তন্ময় হয়ে। ভাবত এত সুন্দরী ছিল তার মা! রূপশ্রী দিদির কি ভাগ্য, সে দশ বছর তার মায়ের নিত্যসঙ্গিনী ছিল! মাকেও সে রোজ ফুলের গয়না পরিয়েছে। মাঝে মাঝে রত্নার মনে হয়, রূপশ্রী দিদির বয়স কত? দেখলে মনে হয়, ষোলো-সতেরো বছরের বেশি নয়। তীরা একদিন বলেছিল ওঁর বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি আর নীরা বলেছিল, ও নাকি মন্ত্রীমশায়ের আপন মেয়ে নয়—পালিতা কন্যা। ওকে মন্ত্রীমশাই নাকি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন মুক্তি নদীর তীরে এক তমালগাছের তলায়। মন্ত্রী ভানুনাথ নাকি চিরকুমার। রূপশ্রীও চিরকুমারী। এই সব কথা মনে হয় তার মায়ের মুখের দিকে চেয়ে। একটু পরে নূপুরের গুঞ্জন শোনা যায়। উঠে পড়ে রত্না সমুখ থেকে। পাশের ঘরে গিয়ে প্রণাম করে সভা-কবি মুকুন্দদেবকে। মুকুন্দদেবের মাথার চুল সাদা, গায়ের বর্ণ গৌর, গোঁফ-দাড়ি কামানো। তাঁর বয়স যদিও ষাট, মুখে জরার চিহ্ন নেই, চোখের দৃষ্টি প্রাণবন্ত। তিনি শুধু বড় কবি নন, বড় গায়ক এবং প্রসিদ্ধ নর্তকও। রত্নাকে তিনি গান বাজনা আর নাচ শেখান। পায়ে তাঁর রুপোর নূপুর, হাতে একটি ছোট এস্রাজ। মুকুন্দদেব কিন্তু মহারাজের বেতনভুক্ ভৃত্য নন। তিনি স্বেচ্ছায় বিনা পারিশ্রমিকে রত্নাকে নাচ, গান শেখান। মহারাজের আমন্ত্রণ পেলেই সভায় গিয়ে স্বরচিত কাব্য শোনান বা রাগরাগিণী আলাপ করেন। মহারাজ সমূহগুণ অনেক অনেক সাধ্যসাধনা করেও তাঁকে কোনও পারিশ্রমিক দিতে পারেননি। তিনি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির আয় থেকে সামান্যভাবেই সংসার নির্বাহ করেন। তিনি

স্বাধীন, তাই তিনি অত বড় শিল্পী। তিনি রত্নাকে পৌত্রীবৎ স্নেহ করেন— তাই তাকে যত্ন করে নাচ গান শেখান। তিনি শুধু বড় সুরশিল্পীই নন— তিনি একজন বড় জ্যোতিষীও।

এইভাবে দিন কাটে রত্নার। রাত্রে সে অঘোরে ঘুমোয়।

সমূহগুণ ছাতে জেগে থাকেন।

॥ তিন ॥

বিরাট রাজ্য অলঙ্কারপুরী। মহারাজ সমূহগুণ নিশাচর। সমস্ত দিন ঘুমোন। রাজ্য চালান মন্ত্রী ভানুনাথ। তিনিই সর্বেসর্বা। কিন্তু তাঁর মতো বিনয়ী, নিরীহ, সজ্জন লোক অলঙ্কারপুরীতে আর কেউ নেই। অনাড়ম্বর নিরহঙ্কার সুপণ্ডিত ভানুনাথ ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করে পূজায় বসতেন।

অলঙ্কারপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মহালক্ষ্মীর ধ্যান করতেন তিনি। কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকতেন চুপ করে। পদ্মাসনা মহালক্ষ্মীর জীবন্ত ছবি ভেসে উঠত তাঁর মনের আয়নায়। তাঁকে প্রণাম করে শুরু করতেন দিনের কাজ।

ভানুনাথ বাস করতেন চন্দনা নদীর তীরে ছোট একটি মাটির বাড়িতে। খড়ের চাল, চারিদিকে বারান্দা। বাড়ির চারপাশে অনেক জমি। সে জমিতে নানা রকম শাক-সবজি, তরি-তরকারি ফলত। ফলের গাছও ছিল অনেক। এদের দেখাশোনা করবার জন্য যে মালীরা বাগানের মধ্যে ছোট ছোট পর্ণ কুটিরে থাকত, তারাই ছিল তাঁর প্রতিবেশী। তাঁর চারিদিকে প্রায় একশ' বিঘে জমি ছিল। ভানুনাথের মাটির বাড়িটিতে তিনটি ঘর। একটি শোবার ঘর, একটি প'ড়ার ঘর, আর একটি রান্নাঘর। তিনি দিনে একবার স্বপাক খান। রাত্রে খান দুধ আর ফল।

ব্রাহ্মমুহূর্তে মহালক্ষ্মীকে প্রণাম করে তিনি চন্দনায় স্নান করতে যান। স্নান করেন অনেকক্ষণ ধরে। স্নান করতে করতে মনে মনে অনেক স্তব পাঠ করেন। তারপর যখন আকাশ ঊষার রঙে লাল হয়ে যায় তখন জলের মধ্যেই হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। তারপর সূর্যদেব যখন চারিদিকে আলো ছড়াতে ছড়াতে চক্রবাল রেখায় দেখা দিতেন তখন তাঁকে প্রণাম করে নদী থেকে উঠে আসতেন তিনি।

নিজের কাপড়, গামছা নিজে কেচে শুকনো কাপড় পরে যখন রাস্তায় আসতেন, তখন প্রায় কারো সঙ্গে দেখা হত না তাঁর। তখনও বাড়ি ছেড়ে পথে বেরোয়নি কেউ। এই সময় ভানুনাথ পালিতাকন্যা লবঙ্গর সঙ্গে দেখা করতেন। মহারাজ যদিও তার নতুন নামকরণ করেছিলেন রূপশ্রী, কিন্তু ভানুনাথ লবঙ্গ বলেই ডাকতেন তাকে। লবঙ্গ তাঁকে প্রণাম করে কপালে পরিয়ে দিত চন্দনের টিপ একটি। তারপর ভানুনাথকে চন্দনের পিঁড়েয় বসতে হত। রূপশ্রী রুপোর থালায় করে যে ফল আর মিষ্টান্ন আনত তা খেতেন তিনি। তারপর রূপশ্রীর কপালে চুমও খেতেন একটি। রূপশ্রীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখা হত ভাণ্ডারীদের সঙ্গে। সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত তারা। তাদের প্রত্যেকের কাঁধ থেকে ঝুলছে একটি করে থলি। কোনও থলিতে ধান, কোনও থলিতে ডাল, কোনও থলিতে খই, কোনোটাতে মুড়ি, কোনোটাতে বোঁদে, কোনোটাতে ছোট ছোট নিম্‌কি। ভানুনাথ নিজের বাড়ির দিকে অগ্রসর হতেন আর ভাণ্ডারীরা সেই সব খাবার চারিদিকে মুঠো মুঠো ছড়াতে ছড়াতে যেত। নেমে

আসত পাখির দল। খেত মহানন্দে হুড়োহুড়ি করে। এইটেই ভানুনাথের বিলাস। তিনি যখন বাড়িতে গিয়ে পৌঁছতেন তখনও পাখির দল খাচ্ছে— রোজ দশ মণ খাবার ছড়ানো হয় চারিদিকে।

বাড়িতে পৌঁছেই দেখতে পান গুপ্তচররা তাঁর অপেক্ষায় বসে আছে। তিনি প্রত্যেক গুপ্তচরের সঙ্গে আলাদা আলাদা একা দেখা করেন। গুপ্তচররা খবর আনে রাজ্যে কোথায় কোন অভাবগ্রস্ত প্রজা আছে। এখানে সব প্রজাই ভদ্রলোক। অভাবে পড়লে তারা ভিক্ষা করতে পারে না। তাদের খবর পেলেই ভানুনাথ রাজভাণ্ডার থেকে তাদের প্রচুর উপঢৌকন পাঠান। অলঙ্কারপুরীতে চোর নেই, ডাকাত নেই, জেলখানা নেই, ফাঁসীকাঠ নেই। এখানে দরিদ্রলোকও নেই। কেউ যদি দরিদ্র হয়ে পড়ে রাজভাণ্ডার থেকে তার দারিদ্র্য মোচন করবার ব্যবস্থা আছে। আর তার দারিদ্র্যের খবর গোপনে সংগ্রহ করে গুপ্তচররা।

অলঙ্কারপুরীর প্রজারা কেউ চাষী, কেউ শিল্পী। নানারকম শিল্পের ছোট ছোট কারখানায় বহু রকম জিনিস তৈরি করে তারা। সব জিনিস মহারাজই কিনে নেন, মহারাজই বিদেশে চালান দেন সে সব। চাষীদের খাজনা দিতে হয় না, তারা ফসলের এক-দশমাংশ রাজভাণ্ডারে দান করে। নিজেই এসে দিয়ে যায় তারা। সে সব ফসলও বিদেশের হাটে পাঠান ভানুনাথ। অলঙ্কারপুরীতে বারো মাসে তেরো পার্বণ। উৎসব লেগেই আছে। ভানুনাথের প্রধান কাজ এই সব নিয়ে। বিকেলে রাজসভা বসে। রাজ্যের বিদ্বান বুদ্ধিমান, জ্ঞানী-গুণীরা এই সভায় আমন্ত্রিত হয়ে আসেন রোজ। সে সভায় প্রধানত কবিতা পাঠ আর গান হয়। মুকুন্দদেব মাঝে মাঝে নাচও দেখান। তাঁর তাণ্ডব নাচ দেখবার মতো।

সমূহগুণের প্রচুর খরচ। কিন্তু অভাব নেই। লক্ষ্মী যেদিন পেঁচায় চড়ে তাঁর সঙ্গে রাত্রে দেখা করেন, তার পরদিনই দেখা যায় রাজভাণ্ডার মোহরে পরিপূর্ণ। সুখের রাজ্য অলঙ্কারপুরী। কারও অভাব নেই, কাউকে অনাহারে থাকতে হয় না। মহারাজের ভোজনশালা রাত দিন খোলা। যে যখন যায় তখনই খেতে পায়।

।। চার ।।

একদিন একটি গুপ্তচর একটি অদ্ভুত খবর নিয়ে এলো। বলল— একটি লোক দেখলাম আমাদের বকুলকুঞ্জে একটি গাছতলায় বসে আছে। লোকটিকে আগন্তুক বলে মনে হল। মনে হল ক্ষুধা-তৃষ্ণাতেও কাতর সে। তাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম। সে উত্তর দিল না, পালটা প্রশ্ন করল আমাকে— বলতে পারেন, আপনাদের রাজ্যে টাক দাড়ি আছেন? বেঁটে কালো টাক দাড়ি?

বলেই গুপ্তচরটি সলজ্জভাবে মাথা হেঁট করলে। ভানুনাথ কালো বেঁটে। তাঁর মুখে কাঁচা-পাকা চাপ দাড়ি, আর মাথায় প্রকাণ্ড টাক। ছোট ছোট চোখ দুটি মণির মতো উজ্জ্বল। শুকচঞ্চু নাসা।

মৃদু হেসে তিনি গুপ্তচরকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি বললে?'

বললাম, 'আমি কাল এসে খবরটা দেব। মনে হচ্ছে আপনি আগন্তুক, আমাদের অতিথিশালায় চলুন। লোকটি চুপ করে রইল। তারপর বলল—যতক্ষণ খবর না পাচ্ছি ততক্ষণ আমি জলস্পর্শ করব না।'

বকুলকুঞ্জ ভানুনাথের বাড়ি থেকে প্রায় চার ক্রোশ দূরে। তিনি গুপ্তচরকে বললেন—'তুমি সারথিকে খবর দাও। আমার রথ আনুক, আমি এখনি তার কাছে যাব।' একটু পরেই থপ্ থপ্ থপ্ শব্দ করতে করতে চারটি প্রকাণ্ড কালো ঘোড়া একটি সুদৃশ্য রথকে নিয়ে হাজির হল মন্ত্রীমশায়ের বাড়ির সামনে। এসেই ঘোড়া চারটি ডেকে উঠল সমস্বরে।

সারথি নেমে এসে প্রণাম করে জানাল রথ এসেছে।

গুপ্তচরকে সঙ্গে নিয়ে ভানুনাথ রথে উঠলেন।

বকুলকুঞ্জে গিয়ে দেখলেন একটি দিব্যকান্তি লোক একটি গাছের তলায় বসে আছে।

ভানুনাথ প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি আমাকেই খুঁজছিলেন?'

লোকটি ভানুনাথকে আপাদমস্তক দেখলেন একবার। তারপর বললেন, 'আপনার টাক, দাড়ি দুই-ই আছে। কিন্তু আমি যাঁকে খুঁজছি আপনি সেই লোক কিনা বুঝতে পারছি না। আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে পারি?'

'করুন।'

'আপনি কি কখনও এক তমালগাছের তলা থেকে একটি মেয়েকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন?'

'পেয়েছিলাম। তাকে আমি কন্যার মতো পালন করেছি। কেন, ব্যাপার কি?'

'মেয়েটি আমার সহোদরা বোন। আমরা গন্ধর্ব। আমার মা বোনকে নিয়ে তমালবনে গিয়েছিলেন তমালফুল আনতে। আমার বোনের গায়ের রঙ একটু ময়লা ছিল। তমালফুলের সঙ্গে চন্দন আর মাখন বেটে তার গায়ে লাগালে সে ফরসা হবে বলেছিলেন গন্ধর্ব সিদ্ধিশেখর। তিনি আমাদের চিকিৎসক। আরও বলেছিলেন, তুমি নিজে গাছে উঠে তমালফুল পাড়বে আর মেয়েকে শুইয়ে দেবে গাছের তলায়। এ না করলে সুফল ফলবে না। মা তাই করেছিলেন। কিন্তু তমালগাছের উপর ছিল এক বিষধর সাপ। মায়ের কপালে সে দংশন করবামাত্র মা পড়ে গেলেন গাছ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হল তাঁর। মা বাড়ি ফিরলেন না দেখে আমরা সবাই খোঁজ করতে বেরুলাম। গিয়ে গাছতলায় মায়ের মৃতদেহ পেলাম। বোনকে কিন্তু পেলাম না।

ভানুনাথ বললেন—'আমি তোমার মাকে দেখতে পাইনি। তমালগাছের ওধারে খানিকটা জঙ্গল মতো ছিল। তিনি হয়তো তারই ভিতর পড়ে গিয়েছিলেন। আমি অসহায় মেয়েটিকে আমার রথে তুলে নিলাম। তাকে ভালোভাবে মানুষ করেছি। আপনি কি তার সঙ্গে দেখা করতে চান?

আমি তাকে নিয়ে যেতে চাই।

ভানুনাথ চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর প্রশ্ন করলেন— 'আপনার বোন যে এখানে আছে তা আপনি খবর পেলেন কার কাছে?'

'খবর দিয়েছেন যাদুকর মহর্ষি ময়ালভুক্।'

'ময়ালভুক্? তিনি কি ময়াল সাপ খান?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বছরে দুটি ময়াল সাপ খান তিনি। আর কিছু খান না।'

'তিনিও কি গন্ধর্ব?'

'তিনি কি তা আমরা জানি না। শুধু জানি তিনি খুব বড় তপস্বী ও যাদুকর একজন। মরা মানুষকে বাঁচাতে পারেন। পাথরকে জীবন্ত করতে পারেন। অসীম ক্ষমতা তাঁর। পৃথিবীর

সমস্ত খবর তাঁর নখদর্পণে। অসাধারণ লোক তিনি। নানা রূপ ধারণ করতে পারেন। তাঁর খবর পেয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। অতিকষ্টে গিয়েছিলাম দুর্গম পথ অতিক্রম করে।'

'কোথায় থাকেন তিনি?'

'থাকেন বিরাট শিলাকণ্টক নদীর তীরে গজসিংহ্ অরণ্যে। শিলাকণ্টক নদী ছোট বড় সূচগ্র পাথরে পরিপূর্ণ। সেখানে নৌকো চলে না। আমি সাঁতরে গিয়েছিলাম। আমি অত কষ্ট করে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম বলে খুব খুশি হয়েছিলেন তিনি। আমাকে অলঙ্কারপুরীর ঠিকানা বলে দিলেন, আর এও বলে দিলেন, যার কাছে আমার বোন থাকে তার টাকও আছে দাড়িও আছে।'

'আমার নাম বলেননি?'

'না। জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বললেন, পরিচয় না হলে নাম জানা যায় না। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি কখনও। তাঁর চেহারাটা আমি দেখতে পাচ্ছি— বেঁটে, কালো, মাথায় টাক, মুখে চাপদাড়ি। তুমি গেলেই চিনতে পারবে। আমাকে একটা মন্ত্রও শিখিয়ে দিলেন যাতে আমি শিগ্‌গির এখানে পৌঁছতে পারি।'

'কি রকম মন্তর?'

'সে মন্তর মনে মনে তিনবার বললেই আমি পাখি হয়ে যেতে পারি। আমি গজসিংহ জঙ্গল থেকে পাখি হয়ে এখানে উড়ে এসেছি। আমার বোনকেও আমি সেই মন্তর শিখিয়ে দেব। তারপর দুজনে পাখি হয়ে ফিরে যাব নিজেদের দেশে।'

ভানুনাথ বললেন— 'সে যদি তোমার সঙ্গে যেতে রাজি হয়, আমি আপত্তি করব না। কিন্তু তার বিনা সম্মতিতে তাকে নিয়ে যেতে দেব না আমি। আমার সঙ্গে চল, দেখি সে কি বলে। আর একটা কথা জানতে চাই। ও যে তোমার বোন তা তুমি প্রমাণ করবে কি করে? সে তো তোমায় চিনতে পারবে না। তাকে যখন আমি এনেছিলাম তখন সে অতি শিশু ছিল। তার দেহের কি এমন কোনও চিহ্ন তোমার মনে আছে যা দিয়ে তাকে চিনতে পারবে তুমি?'

'পারব। আমরা গন্ধর্ব পদ্মচরণের বংশধর। আমাদের প্রত্যেকের পায়ের তলায় ছোট একটি পদ্ম আঁকা আছে। আমার বোনের পায়েও আঁকা আছে সে পদ্ম। আমার পায়েও আছে। এই দেখুন—'লোকটি শুয়ে পড়ে পা দুটি উঁচু করে ধরে রইল। ভানুনাথ সবিস্ময়ে দেখলেন— হাতে যেমন রেখা আঁকা থাকে তেমনি রেখা দিয়ে নিখুঁত কমল আঁকা রয়েছে তার দুটি পায়ের চেটোর মাঝখানে।

লোকটি উঠে বলল— 'যাকে আপনি পালন করেছেন সে যদি আমার বোন হয় তাহলে তার পায়ের তলাতেও এই কমল আঁকা আছে।'

ভানুনাথ বললেন— 'চল তবে। রথে ওঠ—'

রূপশ্রীর বাড়িতে যখন তারা পৌঁছল তখন রূপশ্রী রত্নাবলীকে লতা, পাতা, ফুল দিয়ে সাজাচ্ছিল। রত্নাবলী সখীদের নিয়ে বনভোজনে যাবে। ভানুনাথ সেই লোকটিকে নিয়ে হাজির হলেন যখন তখন রূপশ্রী ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

'লবঙ্গ, তুই ওঘরে একটু চল তো।'

পাশের খালি ঘরে নিয়ে গেলেন তাকে।

'পা ছড়িয়ে বোস তো।'

'কেন?'

'বোস না, তোর পায়ের তলাটা দেখব।'

'আমার পায়ের তলা? কেন?'

'দরকার আছে, বোস না তুই।'

বসতে হল রূপশ্রীকে।

ভানুনাথ সবিস্ময়ে দেখলেন তার দুটি পায়ের তলাতেই ছোট ছোট দুটি পদ্ম আঁকা রয়েছে। আর সন্দেহ রইল না তাঁর। বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। লবঙ্গ যদি তার ভাইয়ের সঙ্গে চলে যায় তাহলে তো অলঙ্কারপুরী অন্ধকার হয়ে যাবে।

'কি দেখলে বাবা আমার পায়ে?'

'একটা চিহ্ন। তোর পায়ে পদ্ম আঁকা আছে। তার মানে গন্ধর্ব পদ্মচরণের বংশে তোমার জন্ম হয়েছিল। তুমি তো জান তোমাকে আমি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম। আমার সঙ্গে যিনি এসেছেন তিনি তোমার ভাই। তিনি তোমাকে নিয়ে যেতে চান। তুমি যদি যেতে চাও আমি আপত্তি করব কেমন করে?'

ভানুনাথের চোখ দুটি ছলছল করতে লাগল।

লবঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গলা জড়িয়ে বলল— 'আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না বাবা।'

'তোমার ভাইকে তাহলে বলে দাও সেকথা।'

পাশের ঘরে গেলেন দুজনে।

গিয়ে দেখলেন, রত্নাবলী মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রূপশ্রীর ভাইয়ের দিকে। রূপশ্রীর ভাইও নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখছে সুন্দরী রত্নাবলীকে।

রূপশ্রী পাশের ঘরে ঢুকে বিনা ভূমিকাতেই তার ভাইকে বলল—'আপনি আমার ছোট ভাই না বড় ভাই?'

'বড় ভাই।'

এগিয়ে গিয়ে তাকে প্রণাম করল রূপশ্রী।

'আপনি আমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি যাব না।'

'যাবে না?'

'না।'

'যাবে না?'

'না।'

'যাবে না?'

'না।'

'বেশ চললাম তাহলে—'

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল লোকটি।

ভানুনাথ বললেন— 'লবঙ্গ, যাও তুমি ওঁকে ফিরিয়ে আন। উনি তোমার দাদা। ওকে সমুচিত সম্বর্ধনা করা উচিত।'

লবঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল। কিন্তু রাস্তায় কাউকে দেখতে পেল না। তার দাদা তখন পাখি হয়ে আকাশে উড়ে চলে যাচ্ছে।

।। পাঁচ ।।

সেদিন রত্না আর তার সহচরীরা যে বনে বনভোজন করবার জন্য গেল সেটি পাহাড়ের গায়ে একটি অপরূপ বন। তাল, তমাল, পলাশ, পিয়াল, শিশু, শাল, দেবদারু, শিরিষ, বট, অশ্বত্থ, অর্জুন অনেক রকম গাছ সে-বনে। অনেক গাছের গায়ে লতাও উঠেছে। পাহাড় থেকে ঝরনা নেমে ঢুকেছে ওই বনের মধ্যে। বসন্ত কাল। ফুল ফুটেছে চারিদিকে। পাহাড় বেয়ে ঝরনা যেখানে বনে ঢুকেছে তার একধারে অসংখ্য পলাশগাছে ফুল ফুটেছে। লালে লাল হয়ে গেছে সে-দিকটা। মনে হচ্ছে, পাহাড়ের গায়ে কে যেন আবির মাখিয়ে দিয়েছে। রত্নারা ঝরনার ধারে নাচ গান শুরু করেছিল। তাদের খাবার তৈরি করছিল একজন কাশ্মীরী রাঁধুনি। ভালো রুদমি চাল, সোনা মুগের ডাল, বাদাম পেস্তার খিচুড়ি, কিশমিশ দিয়ে আলুরদম, আর খুবানির অম্বল।

নাচ-গান শেষ হতে রত্না বলল— 'তীরা, একটা গল্প বল না ভাই।'

তীরা বলল— 'রাজার গল্প শুনবি না খাজার গল্প শুনবি?'

'রাজার গল্প অনেক শুনেছি। খাজার গল্পই বল। যে খাজা আমরা খাই তার গল্প?'

'আরে না না। এ একটা খাজা মূর্খের গল্প—'

'খাজা মূর্খ মানে? খাজা তো একটা ভালো মিষ্টান্ন, সে মূর্খ কি খাজার মতো মিষ্টি?'

'ঠিক ধরেছিস। লেখাপড়া কিছু জানত না, বুদ্ধিসুদ্ধিও ছিল না বিশেষ। কিন্তু ভারি মিষ্টি মানুষ ছিল সে। পয়সার অভাব ছিল না তার। খেটে খেতে হত না। সকালে উঠে রাস্তায় বেরিয়ে প্রথম যার সঙ্গে দেখা হত একমুখ হেসে এগিয়ে যেত তার দিকে আর বলত চল ভাই, তোমার সঙ্গে আজ দিনটা কাটাই। এমনি করে নিত্য নূতন লোকের সঙ্গে ভাব করত সে। আর তার সঙ্গেই দিনটা কাটাত সে। গরিব লোক হলে তাকে মোহর দিত একটি। গুণী লোক হলে প্রণাম করত। আর ধনী লোক হলে বলত, আপনাকে টাকা দেবার স্পর্ধা নেই, প্রণাম করবার ইচ্ছা নেই— আপনি আপনার হাতটি বাড়িয়ে দিন, আমি সেখানে একটি চুম খাই।

একদিন সকালে উঠেই তার দেখা হয়ে গেল প্রকাণ্ড একটা ষাঁড়ের সঙ্গে। বিরাট ষাঁড়। খাজা এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কি ভাই , কোথা যাচ্ছ?' ষাঁড় উত্তর দিল, ফোঁস্। খাজা দমল না। দোকান থেকে জিলিপি কিনে ষাঁড়ের দিকে ঠোঙা নিয়ে এগিয়ে গেল। বলল, রাগ করছ কেন ভাই? খাও না কিছু। ষাঁড় ঠোঙাসুদ্ধ সব খেয়ে ফেলল। শেষ করে এগোল খাবারের দোকানটার দিকে। খাজা দোকানদারকে বলল, এ যা খেতে চায়, দাও একে। দাম আমি দেব। ষাঁড় দোকানে যত খাবার ছিল, সব খেয়ে ফেললে। খাজা সব দাম মিটিয়ে দিয়ে ষাঁড়ের পিছু পিছু চলতে লাগল। ষাঁড় হঠাৎ মানুষের ভাষায় বলে উঠল, 'বেঁচে থাক। তোমার উপর খুশি হয়েছি। আমার সঙ্গে যাবে?'

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'কৈলাসে। মহাদেবের কাছে। আমি তাঁর সেবক নন্দী। তিনি আমাকে দুনিয়ার হালচাল

দেখতে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে ভালো খবর দিতে পারব একটা। আমার সঙ্গে যাও যদি তিনি তোমাকে হয়তো বরই দিয়ে দেবেন একটা।'

খাজা বলল— 'এইভাবে কি যেতে পারবে?'

ষাঁড় বলল— 'না, উলঙ্গ অবস্থায় যেতে হবে। ছাই মাখতে হবে সর্বাঙ্গে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরতে হবে, একটা জটা যদি পরতে পার, আরও ভালো হয়—'

ভয় পেয়ে গেল খাজা।

বলল— 'না বাপু, ওসব আমি পারব না।'

গল্প এই পর্যন্ত এগিয়েছে, এমন সময় চমৎকার সুর একটা ভেসে এল। থেমে গেল গল্প। তারা চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ চোখে পড়ল লাল পলাশবনের উপর সবুজ রঙের একটি ফানুস উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, আর তার ভিতর থেকেই বেরুচ্ছে সাহানা সুরের একটি গান। রত্না বলল— 'এমন চমৎকার সাহানা গাইছে কে?'

সবাই উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ফানুসকে ডাকতে লাগল— 'ওগো, তুমি এদিকে এসো, এদিকে এসো—'

ফানুস কিন্তু উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগল। তখন রত্না আলাপ করতে লাগল সাহানা রাগিণী। মুকুন্দদেবের ছাত্রী সে। দেখতে দেখতে তার আলাপও জমে উঠল খুব। তখন সবুজ ফানুসটি ভেসে ভেসে এল তাদের কাছে এবং তার থেকে বেরুল সুন্দরী একটি কুমারী।

রত্না প্রশ্ন করল—'কে আপনি?'

'আমি সাহানা রাগিণী।'

'ফানুসে চড়ে বেড়াচ্ছেন কেন?'

'মহর্ষি ময়ালভুকের আদেশে। তিনি ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীকে নানা রঙের ফানুস বানিয়ে দিয়েছেন। আমরা উড়ে উড়ে গান গেয়ে ময়ালসাপদের গানে মুগ্ধ করে নিয়ে যাই গজসিংহ অরণ্যে। তিনি তাদের খান।'

'ময়ালসাপ খান তিনি?'

'হ্যাঁ। তিনি বলেন, ময়ালসাপ নিষ্ঠুর সাপ। জীবনকে নিষ্পিষ্ট করে তার শ্বাসরোধ করে অনেক যন্ত্রণা দিয়ে আগে তাকে হত্যা করে, তারপর খায়। তাই খাদ্য হিসাবে তিনি ওই ময়ালসাপকেই বেছে নিয়েছেন।'

'সাপকে কামড়ে কামড়ে খান?'

'না। তাকে আগে সুখাদ্যে রূপান্তরিত করেন, তারপর খান। অদ্ভুত যাদুকর তিনি।'

'সুখাদ্যে পরিণত করেন কিভাবে?'

'মন্ত্রবলে। সাপটিকে একটি ঘরের মধ্যে পুরে কপাট বন্ধ করে দেন। তারপর মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকেন। খানিকক্ষণ পরে কপাট খুললে দেখা যায়, সাপ নেই। প্রকাণ্ড এক কড়াই দুধ, কিছু মিহি চাল, কিছু চিনি আর এক কড়াই গাওয়া ঘি রয়েছে। তখন তিনি দুধের কড়াটা উনুনে চড়িয়ে দেন। দুধ ফুটে উঠলেই চাল আর চিনি ছেড়ে দেন তাতে। তারপর সেটাকে চন্দন কাঠের হাতা দিয়ে নাড়তে থাকেন ক্রমাগত। দুধটা যখন খুব ঘন হয়ে যায়, চালগুলো যখন সিদ্ধ হয়ে যায় তখন সমস্ত ঘিটা ঢেলে দেন তাতে। আর একটু ফুটিয়ে নামিয়ে নেন। এর

নাম নাকি চরু। একটু পরে জমে শক্ত হয়ে যায় সেটা। অনেকদিন থাকে। এরই এক গুলি সকালে আর এক গুলি সন্ধ্যেবেলা খান তিনি।'

'চরু কে রান্না করে দেয়—?'

'উনি নিজেই সব করেন। উনি স্বাধীন সর্বশক্তিমান। কারো সাহায্য নেন না।'

'দেখতে কেমন?'

'অপরূপ। সর্বদা মুচকি মুচকি হাসছেন। সদানন্দময়। শুনেছি স্বয়ং বিশ্বকর্মা নাকি ওঁর গুরু। অদ্ভুত ক্ষমতা দিয়েছেন ওঁকে। এই দেখ না, আমাদের জন্যে এমন ফানুস বানিয়ে দিয়েছেন যা জলে ভেজে না, আগুনে পোড়ে না। এত হাল্কা অথচ ঝড়ে উড়ে যায় না। আমরা যেমন বেগে যেতে চাই ঠিক তেমনি বেগে চলি।'

নীরা জিগ্যেস করল— ''ক্ষিদে পেলে কি কর? ওর মধ্যে খাবার এসে যায়?'

'রাগ-রাগিণীদের ক্ষিদে পায় না।'

রত্না জিজ্ঞেস করল, 'তিনি যে বনে থাকেন সে বনের নাম গজসিংহ কেন? অনেক হাতি আর সিংহ আছে নাকি?'

'প্রচুর। বিরাট জঙ্গল, আর অনেক রকম জানোয়ার আছে সেখানে।'

'ময়ালভুক ওখানে থাকেন কেন?'

'তপস্যা করছেন। তিনি এমন একটা জীব সৃষ্টি করতে চান যার বদমাইশি বুদ্ধি নেই।'

'তিনি জীব সৃষ্টি করতে পারবেন?'

'অসম্ভব নয়। জীবের রূপান্তর তিনি ঘটাতে পারেন। মানুষকে পাখি করে দিতে পারেন। গজসিংহ জঙ্গলে হাতি আর সিংহ প্রায়ই লড়াই হত। উনি বললেন—যে ঝগড়া করবার জন্য প্রথম আক্রমণ করবে তাকে আমি পিঁপড়ে করে দেব। করেও দিয়েছিলেন একটা হাতিকে পিঁপড়ে। তারপর থেকে আর টুঁ শব্দটি করে না কেউ—'

'সে হাতিটা পিঁপড়ে হয়েই আছে?'

'না। সে তাঁর পায়ের উপর পড়ে অনেক কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। আবার হাতি করে দিয়েছেন তাকে— খুব দয়ালু লোক। আমি ভাই, এবার উঠি। আমার গান শুনে একটা ময়ালসাপ আমার পিছু পিছু আসছিল, গান বন্ধ হয়ে গেছে, ওই দেখ পাহাড়টার উপর এদিক ওদিক ঘুরছে।'

সবাই দেখল পাহাড়ের উপর থেকে এক বিরাট ময়াল আস্তে আস্তে নামছে।

'যাই ওকে গান গেয়ে গেয়ে শিলাকণ্টক নদীর দিকে নিয়ে যাই।'

'শিলাকণ্টক নদীর ধারে গজসিংহ বন নাকি?'

'হ্যাঁ, সে নদী নৌকা করে পার হওয়া যায় না, সাঁতরে পেরুতে হয়। আমি এবার চলি ভাই—'

রত্না বললে— 'তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। আবার কবে দেখা হবে ভাই?'

'তুমি যদি আকাশের দিকে চেয়ে সাহানা আলাপ কর, আমি শুনতে পাব। শুনতে পেলেই চলে আসব তোমার কাছে। চমৎকার গলা তোমার। যাই ভাই।'

সবুজ ফানুসে চড়ে সাহানা উড়ে গেল। সাহানা রাগিণীতে পূর্ণ হয়ে উঠল চারদিক। ময়ালসাপটা আস্তে আস্তে নামতে লাগল পাহাড় থেকে।

।। ছয় ।।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ছাতে যাবার আগে মহারাজ সমূহগুণ কমলাঙ্গিনীর স্বর্ণপ্রতিমায় মালা পরাতে গিয়ে দেখলেন, প্রতিমার সর্বাঙ্গ দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ছে। স্পর্শ করে দেখলেন, একটু উত্তপ্ত হয়েছে যেন। মৃদুকণ্ঠে বললেন—ছাতে এস আজ। ছাতে তিনি গিয়েছিলেন কি না, কিছু বলেছিলেন কি না, তা কেউ জানে না। তারপর কিন্তু তিনি আর ঘুমুতে গেলেন না। সোজা চলে গেলেন ভানুনাথের বাড়ি। তাকে ডেকে বললেন— ''আমাদের একটা বড় ভুল হয়ে গেছে। রত্নার যে বিয়ের বয়স হয়ে গেছে তা আমরা খেয়াল করিনি। তুমি আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে প্রচার করে দাও যে, আমরা রত্নার জন্য স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করব। রাজপুত্রদের মধ্যে যদি কেউ রত্নাকে বিবাহ করবার অভিপ্রায়ে সে সভায় আসেন তাঁদের যথোচিত সম্বর্ধনা করব আমরা।'

ভানুনাথ বললেন— 'যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা করছি। আমাদের পাঁচটি বড় প্রতিবেশী রাজ্য আছে। সেখানে আমি নিমন্ত্রণ পাঠাব। তাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করলে আমাদের মর্যাদাহানি হবে না। মল্ল, বর্মণ, সিংহ, কৌশিক, সভ্যশীল— এরা পাঁচজনেই অভিজাত ক্ষত্রিয় রাজা। এঁদের পুত্রেরা বিবাহযোগ্যও হয়েছে। মল্লের বড় ছেলে ক্ষেত্ররাজ, বর্মণের কনিষ্ঠপুত্র তারাবর্মন সিংহের বড় ছেলে বজ্রসিংহ, কৌশিকের ভ্রাতা ছন্দ, কৌশিক আর সভ্যশীলের একমাত্র পুত্র ভদ্রশীল, প্রত্যেকেই সৎপাত্র। এঁদের প্রত্যেককেই আমি পদ্ম বনোৎসবে নিমন্ত্রণ করছি। কিন্তু আমার একটি নিবেদন আছে।'

'কি বল—'

'সেকালে যে স্বয়ম্বর সভা প্রচলিত ছিল সে-রকমটা না করাই ভালো। সেকালে কন্যা মালা নিয়ে প্রত্যেক রাজপুত্রের সামনে দাঁড়াতেন, রাজপুত্রের অনুচর রাজপুত্রের গুণকীর্তন করতেন—রাজকন্যার পছন্দ হলে তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিতেন, পছন্দ না হলে প্রণাম করে চলে যেতেন আর এক রাজপুত্রের সামনে। এ যুগে এটা অশোভন। যে রাজপুত্রদের রত্না প্রত্যাখ্যান করবে, অপমানিত বোধ করবেন তাঁরা। আমাদের উপর হয়তো রুষ্ট হবেন। প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়াটা ঠিক নয়। আমাদের যোজন দীঘি এক যোজন লম্বা এক যোজন চওড়া। তার মাঝখানে স্ফটিকের যে বিস্তৃত মঞ্চটি আছে সেইখানেই রাজপুত্রদের নিমন্ত্রণ করি। রত্না তার সহচরীদের নিয়ে সেখানে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করুন। লবঙ্গ সাজিয়ে দেবে মঞ্চটি। রত্নার যদি কাউকে পছন্দ হয় তখন আমার বিধিমতো বিবাহের প্রস্তাব পাঠাব।'

মহারাজ বললেন—'বেশ, তাই হোক।'

।। সাত ।।

রূপশ্রীর ভাই—তার নাম ছিল শুদ্ধসুর— যখন তার বোনকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারল না তখন বড়ই হতাশ হল সে। শুধু হতাশ নয়. বিব্রতও হল মনে মনে। শুদ্ধসুর গন্ধর্বদের রাজা। কিন্নররাজ পুষ্পেন্দ্র তার প্রিয়তম বন্ধু। পুষ্পেন্দ্র তাকে বলেছিল, তোর বোনকে যদি

ফিরিয়ে আনতে পারিস, আমি তাকে বিয়ে করব। আমার রাজ্যের রানী হবে সে। শুদ্ধসুর বলেছিল, নিশ্চয় তাকে ফিরিয়ে আনব আর নিশ্চয় তোর সঙ্গে বিয়ে দেব।

রূপশ্রী কিন্তু এল না।

শুদ্ধসুর তখন উড়তে উড়তে আবার গজসিংহ জঙ্গলে ফিরে গেল ময়ালভুকের কাছে। গিয়ে দেখল, ময়ালভুক নেই, তার শিষ্য পঞ্চুক রয়েছে।

পঞ্চুক বলল— 'প্রভু এখন ধ্যানে বসেছেন।'

'কোথা তিনি?'

'এই যে—'

শুদ্ধসুর দেখল, একটি প্রকাণ্ড লম্বা গাছ আকাশের দিকে সোজা উঠে গেছে। নীচের দিকে তার কোনো ডাল নেই। উপর দিকে প্রকাণ্ড দুটি ডাল প্রসারিত হয়ে আকাশের দিকে চলে গেছে। আর সেই ডাল দুটির মাঝে ঊর্ধ্বমুখী বিরাট ফুল একটি। ফুলটি ধপধপে সাদা। মনে হচ্ছে, যেন একজন ঊর্ধ্ববাহু তপস্বী তপস্যা করছেন, তাঁর মাথার চুলগুলি ধপধপে সাদা। পঞ্চুক বলল— 'উনি তপস্যার সময় রূপান্তরিত হয়ে যান। পাহাড় হন মাঝে মাঝে—'

'কতক্ষণ ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকবেন উনি?'

'সাধারণত দুদিনের বেশি থাকেন না। তিনদিন পার হয়ে গেছে। একটু পরেই বোধহয় ধ্যানভঙ্গ হবে। আপনি বসুন।'

অপেক্ষা করতে লাগল শুদ্ধসুর।

একটু পরেই ধ্যানভঙ্গ হল ময়ালভুকের, দেখতে দেখতে গাছটি ছোট হয়ে গেল। মিলিয়ে গেল তারপর। ময়ালভুক সামনে এসে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

'কি খবর হে শুদ্ধসুর? বোনের দেখা পেয়েছ?'

'দেখা পেয়েছি। কিন্তু সে আসতে চাইল না। আপনি এর একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিন।'

'এর ব্যবস্থা করা যাবে না। ওর স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করা শক্ত। তোমার বোনও শক্তিময়ী তপস্বিনী। পূর্বজন্মে ও ময়দানবের মেয়ে ছিল। ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না।'

'তাহলে আমি কি করব?'

'তুমি অলঙ্কারপুরীতেই ফিরে যাও। ফিরে গিয়ে তোমার বোনকে রাজি করাও আগে। তার অমতে তাকে আনা সম্ভব নয়।'

এই বলে চেয়ে রইলেন তার দিকে। হেসে বললেন— 'আর একটি মেয়ে তো তোমার মনে ঘুরঘুর করছে দেখছি। রাজকন্যা রত্না। অলঙ্কারপুরীতেই ফিরে যাও তুমি—' বলেই ময়ালভুক গাছের পাতা হয়ে একটি গাছের ডালে গিয়ে লেগে রইলেন। শুদ্ধসুর বুঝতে পারল উনি আর কথা বলবেন না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর গজসিংহ বন থেকে চলে এল সে।

।। আট ।।

গুপ্তচররা একদিন একটি অদ্ভুত লোককে নিয়ে এল ভানুনাথের কাছে। মিশমিশে কালো চেহারা, যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, থ্যাবড়া ভুঁড়ো নাক। গালের মাংস আর ভুরুর চুল চোখ

দুটোকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। মাথার লম্বা চুল চুড়ো করে বাঁধা। পরনে কাপড় নেই, প্যান্ট নেই, আছে একটা ঘাগরা তাও হাঁটুর উপর পর্যন্ত। ঘাগরা কাপড়ের নয়, ঘাসের। ঘাস কাপড়ের মতো বোনা। ভানুনাথ প্রশ্ন করলেন— 'কে তুমি?'

'আমার নাম ভল্লু।'

'বাড়ি কোথা?'

'জম্বী দ্বীপের কাছে ছোট একটা হম্বু দ্বীপ ছিল। সেইখানেই আমি থাকতাম। একাই থাকতাম। আমার বাবা, মা, ভাই, বোন সব মরে গেছে। ভীষণ ভূমিকম্প হয়ে হম্বু দ্বীপটাও সমুদ্রে ডুবে গেছে। অনেক কষ্টে আমি বেঁচেছি। ক্রমাগত সাঁতার কেটেছি দশ দিন। তীরে পৌঁছে আপনাদের খুব সুনাম শুনলাম। তাই আপনাদের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করতে এসেছি।'

'তুমি কি কাজ করতে পার?'

'খেতে পারি আর ঘুমুতে পারি।'

'হম্বু দ্বীপে কী করতে?'

'সেখানে প্রচুর নারকেল গাছ ছিল। আমি রোজ দশ-বারোটা নারকেল পেড়ে খেতাম। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতাম, তারপর ঘুমুতাম।'

'তোমার বন্ধুরা কোথায়?'

'তারা মরে গেছে বোধহয়। কিম্বা হয়তো সাঁতরে কোথাও উঠেছে। আমার বন্ধুরা মানুষ ছিল না, ছিল কয়েকটি হাতি আর ঘোড়া। তাদের কথা আমি বুঝতে পারি। বলতেও পারি।'

এই বলে ভল্লু একবার হাতির ডাক তারপর ঘোড়ার ডাক শুনিয়ে দিল ভানুনাথকে।

ভানুনাথ বললেন, 'আমাদের রাজকন্যা রত্নার হাতি আর ঘোড়া পোষার শখ আছে। তার হাতিরা আর ঘোড়ারা পাহাড়ের ধারে দুটো জঙ্গলে থাকে। তুমি সেইখানেই থাক তাহলে। ওদের ভাষা যখন তুমি জানো তখন ওদের সুখ-দুঃখ অনুযোগ-অভিযোগ আমাদের জানিও। সেখানে আরও অনেক লোকজনও আছে। সেইখানেই তোমার থাকবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমি।'

ভল্লু একবার হাতির ভাষায়, আর একবার ঘোড়ার ভাষায় ধন্যবাদ জানাল। তারপর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল তাঁকে। তারপর দুহাত তুলে বলল, 'কেঁক্ কেঁক্ কোঁথা কোঁথাক্ গাঁ গাঁ গাঁক হ্রে হ্রে চিঁহি চিঁহি গর গর গরাট।

প্রথম ছত্র হাতির ভাষা, দ্বিতীয় ছত্র ঘোড়ার। দুটিরই অর্থ— হে মন্ত্রিমশায়, আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল হোক!

।। নয় ।।

যোজন দীঘি বিরাট দীঘি। হাজার হাজার পদ্মফুল ফোটে তাতে। চার ক্রোশ লম্বা চার ক্রোশ চওড়া। কাকচক্ষুর মতো কালো জল টলটল করছে। সে দীঘির মাঝখানে স্ফটিক পাথরের যে মঞ্চটি আছে সেটিও বেশ বড়। পাঁচশ লোক অনায়াসে বসতে পারে তাতে। ছাত নেই। প্রয়োজন হলে নীল মখমলের স্বর্ণখচিত চন্দ্রাতপ টাঙিয়ে দেওয়া হয়। চারিদিকে মর্মর পাথরের পাতলা পাতলা থাম আছে।

রূপশ্রী সাজায় সেই মঞ্চকে। সে একদিন ছোট একটি পানসি নিয়ে যোজনা দীঘিটি ঘুরে ঘুরে দেখল। তার মনে হল, যে রাজপুত্ররা আসবেন তাঁদের যোজন দীঘিটির পাড় থেকে মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হবে কেমন করে? পানসি করে? তার খুঁতখুঁত মন সায় দিল না এতে। যোজন দীঘির পাড় থেকে মঞ্চ পর্যন্ত সোনার পাত দিয়ে প্রকাণ্ড একটা পুল তৈরি করে দিতে হবে। তা না করলে মহারাজ সমূহগুণের মর্যাদাহানি হবে। সোনার পুলটিকেও মনোমত করে সাজাবে সে।

রূপশ্রীর এই প্রস্তাব শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন মন্ত্রী ভানুনাথ। এক ক্রোশ লম্বা সোনার সেতু তৈরি করতে যে অনেক সোনা লাগবে। অত সোনা কি রাজভাণ্ডারে আছে? আছে কি না তিনি তাও ঠিকমতো জানেন না। শুধু জানেন রাজভাণ্ডার মাঝে মাঝে আপনিই ভরে যায় সোনায়। ঘড়া ঘড়া মোহর কে যেন রেখে যায়। তিনি বিশ্বাস করেন মা লক্ষ্মীর কৃপাতেই হয় এটা। কিন্তু এক ক্রোশ লম্বা একটা সোনার পুল তৈরি করবার মতো সোনা কি মা লক্ষ্মী দেবেন? ভাবনায় পড়লেন ভানুনাথ। রূপশ্রীকে কিন্তু তিনি 'না' বলতে পারলেন না। তাকে মনে মনে ভয় করেন তিনি। বললেন— 'অনেক সোনা লাগবে তো। ভাণ্ডারে কত সোনা আছে দেখি। সোনার না করে চন্দনকাঠের করলে কেমন হয়?'

রূপশ্রী জবাব দিল— 'চন্দনকাঠ তো থাকবেই সোনার সঙ্গে। সোনা আর চন্দন কাঠ দিয়ে কয়েকটি বড় তোরণ করব ভেবেছি।'

ভানুনাথ মাথার টাকে একবার হাত বুলোলেন কেবল। কোনও উত্তর দিলেন না।

পরদিন ভোরবেলা উঠে মহালক্ষ্মীর ধ্যানে বসলেন তিনি। মহালক্ষ্মীর মূর্তি মনে মনে যখন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল তখন তিনি বললেন— 'লবঙ্গের আবদার না রাখলে ও যে কি করবে তা জানি না। বড় আদুরে মেয়ে—বড় ভাবনা হচ্ছে।'

ভানুনাথ মহালক্ষ্মীর কাছে কখনও কিছু চাননি। আজও চাইলেন না। কেবল হাত জোড় করে নীরবে চেয়ে রইলেন মহালক্ষ্মীর মুখের দিকে। মহালক্ষ্মী মৃদু হাসলেন একটু। তারপর মিলিয়ে গেলেন।

তার পরদিন ভোরের দিকে মহারাজ ভৈরব রাগ আলাপ করছিলেন ছাতে বসে। তাঁর মুদিত চোখের সামনে ভৈরব রাগ যেন মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল সে মূর্তির উপর যেন ছায়া পড়ল কার। চোখ চেয়ে দেখলেন স্বয়ং মহালক্ষ্মী দাঁড়িয়েছেন এসে। পাশে তাঁর পেঁচাটি। সামান্য সাধারণ পেঁচা নয়। ধপধপে সাদা প্রকাণ্ড লক্ষ্মীপেঁচা। গায়ের পালক যেন মখমল, চোখ দুটি যেন চুনি, ঠোঁটটি প্রবাল। গৌরবর্ণা সুরূপা সর্বালঙ্কারশোভিতা মহালক্ষ্মী মুগ্ধ নিস্তব্ধ হয়ে শুনছেন ভৈরব রাগের আলাপ। স্বর্ণপ্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তাঁর সবুজ শাড়িটি জ্যোৎস্নালোকে অপরূপ দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে একটা অপূর্ব গানের সুরই বুঝি জড়িয়ে ধরেছে তাঁকে।

সমূহগুণ প্রণাম করলেন মহালক্ষ্মীকে।

মহালক্ষ্মী বললেন— 'শুনে সুখী হলাম তুমি রত্নার বিবাহের আয়োজন করছ। আরও খুশি হলাম রূপশ্রীর মঞ্চ সাজাবার ভার নিয়েছে শুনে।'

'ওরাই তো আমার সহায়। আমি তো কিছু করতে পারি না।'

'শুধু ওরা কেন, সবাই তোমার সহায়। তুমি যে ভালো লোক। সব ঠিক হয়ে যাবে।

পেঁচার পিঠে চড়লেন মহালক্ষ্মী। তিনি কিছুদূর আকাশে যখন উঠেছেন, তখন মনে হল জ্যোতির্ময় কি একটা যেন ছিটকে পড়ল তাঁর পায়ের তলা থেকে আর নামতে লাগল অলঙ্কারপুরীর দিকে । কিছু পরেই কিন্তু মানুষের মতো হয়ে গেল সেটা। সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন মহারাজ। তারপর ভাবলেন দেবতাদের কত খেয়াল, কত লীলা। প্রত্যেকটির অর্থ কি আমরা বুঝতে পারি? কিছুক্ষণ পরেই ভৈরোঁ রাগিণীতে মন দিলেন তিনি।

।। দশ ।।

রূপশ্রী সমস্ত স্যাকরা আর ছুতোরকে ডেকে পাঠাল। ছুতোররা বলল—চন্দনকাঠ প্রচুর আছে। আপনার ফরমাসমতো চন্দনকাঠের দশটি তোরণ বানিয়ে দিতে পারবো আমরা। রূপশ্রী বলল— 'প্রত্যেক তোরণের উপর সোনার কলসি থাকবে। আর কলসিতে থাকবে পদ্মফুলের গোছা।'

'তাও হবে। তোরণের মাথার উপর কলসি বসাবার মতো খাঁজ বানিয়ে দেব আমরা।'

গোলমাল বাধাল কিন্তু স্যাকরারা।

তারা বলল—'আপনি বলছেন রাজভাণ্ডারে প্রচুর মোহর আছে। কিন্তু সেতু বানাতে হলে তক্তা চাই। মোহর পিটিয়ে তো তক্তা হবে না। মোহর গলিয়ে তক্তার মতো হতে পারে। ঢালাই করতে হবে। কিন্তু অত বড় ঢালাই করবার ব্যবস্থা আমাদের তো নেই। তাছাড়া, সোহাগাও বেশি নেই আমাদের। ম্লেচ্ছ বণিকদের কাছ থেকে আমরা সোহাগা কিনি বছরে একবার। তারা বছরে একবারই আসে সমুদ্র পার হয়ে। সে সোহাগা দিয়ে রাজকন্যার জন্য নিত্য নূতন গয়না তৈরি হয়। তক্তা করবার মতো সোহাগা তো আমাদের ভাঁড়ারে নেই।' রূপশ্রী বলল— 'ম্লেচ্ছ দেশে লোক পাঠাতে হবে তাহলে। সোনার সেতু করতেই হবে।'

'নমস্কার মা ঠাকরুন!'

রূপশ্রী পিছু ফিরে দেখলে একটি অচেনা লোক দাঁড়িয়ে আছে। সে যে কখন এসে দাঁড়িয়েছে তা টের পায়নি রূপশ্রী।

'নমস্কার! কে আপনি?'

'আমি সেতু তৈরি করি। শুনলাম, আপনি একটি সেতু তৈরি করাবেন, তাই এসেছি যদি আপনাকে সাহায্য করতে পারি—'

'কি ভাবে সাহায্য করবেন?'

'আপনি যেমন চান ঠিক তেমনি সেতুই নির্মাণ করে দেব আমি।'

'আমি এক ক্রোশ লম্বা একটি সোনার সেতু চাই।'

'বেশ, তাই হবে। কত দিনের মধ্যে চাই?'

'আপনিই বলুন না, কত তাড়াতাড়ি হতে পারে। যত শীঘ্র সম্ভব চাই।'

'আপনার এখানে লোহার মিস্ত্রী কত আছে?'

'প্রচুর আছে। কিন্তু আমার সেতু হবে সোনার।'

'সোনার সেতুই দেব আপনাকে, কিন্তু তার আগে লোহার সেতু তৈবি করব একটা। মিস্ত্রী যদি বেশি থাকে এক মাসের মধ্যে হয়ে যাবে।'

‘সোনার সেতুই হয়ে যাবে।’

‘হ্যাঁ। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।’

‘‘কিন্তু আপনি যদি প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত পালন না করেন তখন আমি কি করব?’

‘আমাকে নজরবন্দি করে রাখুন। এক মাস পরে যদি আপনার নির্দেশমতো সোনার সেতু তৈরি করে দিতে না পারি, আমার প্রাণদণ্ড দেবেন।’

‘অলঙ্কারপুরীতে প্রাণদণ্ড হয় না।’ লোকটি তখন নিজেব পকেট থেকে একটি ছোট কাপড়ের পুতুল বার করে বলল— ‘এই পুতুলটি আপনার কাছে রেখে দিন, সোনার সেতু যদি তৈরি না করে দিতে পারি এটি পুড়িয়ে ফেলবেন, তাহলেই মৃত্যু হবে আমার। আমার কথার জামিনস্বরূপ এই আংটিটিও আপনাকে দিচ্ছি। এতে যে মণিটি রয়েছে সেটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈদূর্যমণি।’

রূপশ্রী অবাক হয়ে দেখল লোকটির মুখের দিকে দেখলে, তার চোখ দুটিও যেন মণির মতো। সর্বাঙ্গ দিয়ে আলোর আভা বেরুচ্ছে।

রূপশ্রীর হঠাৎ বিশ্বাস হয়ে গেল লোকটাকে। বলল— ‘বেশ, বিশ্বাস করলাম আপনার কথায়। আপনার পুতুল আর আংটি আমি চাই না। আপনার কথাই আমি বিশ্বাস করলাম। আপনাকে কত পারিশ্রমিক দিতে হবে?’

‘আগে সেতু তৈরি হোক। তখন চেয়ে নেব।’

রূপশ্রী মৃদু হেসে তখন বলল— ‘ও, আচ্ছা। এখন আপনাকে কি করতে হবে তাহলে বলুন।’

‘লোহার মিস্ত্রীদের দিয়ে আপনার মনের মতো লোহার সেতু আগে করিয়ে ফেলুন, ছুতোররাও তোরণগুলো বানিয়ে ফেলুক।’

রূপশ্রী বলল—‘আমার কাছে দশটা এক রকম সোনার কলসি আছে। তোমরা এসে তার মাপ নিয়ে যাও। সেই মাপে তোরণের উপরে খাঁজ কোরো।’’

সেই আগন্তুক লোকটির দিকে চেয়ে রূপশ্রী বলল—‘আপনি এখানে কোথায় আছেন?’

‘আপনাদের অতিথিশালায়। রাজার হালে আছি।’

‘কোন্ দেশের লোক আপনি?’

লোকটি হেসে বলল— ‘আমার দেশ-টেশ নেই। যখন যেখানে থাকি সেখানেই আমার দেশ।’

আর একটু হেসে সে চলে গেল অতিথিশালার দিকে।

।। এগারো ।।

সেদিন রত্না, তীরা আর নীরা কবিতা-কবিতা খেলছিল। প্রথম লাইন বলছিল রত্না, দ্বিতীয় লাইন তীরা, তৃতীয় লাইন নীরা, তারপর আবার রত্না।

রত্না। হাওয়া বয় ফুর ফুর
তীরা। চল খাই চানাচুর
নীরা। খাব এখন? দূরদূর

রত্না। গানে আয় তুলি সুর
তীরা। কিম্বা যাই মধুপুর
নীরা। হাতে পরি রতনচূড়
কানে পরি নতুন দুল
রত্না খোঁপায় গুঁজি বেল ফুল
তীরা। ফুরফুরে এই বায়ে
নীরা। আতর মাখি গায়ে
রত্না। ওড়না দিয়ে গায়ে
তীরা। বৈঠা বেয়ে ঠায়ে
নীরা। চড়ি গিয়ে নায়ে
রত্না। যাই রুপোলি গাঁয়ে
তীরা। সেথা সোনা হীরা নেই
আছে শুধু মুক্তো
নীরা। চমৎকার রাঁধতে পারে সুক্‌তো।
রত্না। তার ভাই আলতা
তীরা। ভালোবাসে পান্‌তা
নীরা। পান্‌তায় দই চাই
রত্না। ডিম-ভরা কই চাই
তীরা। সোনা রং ঝাল তার
নীরা। ভারি প্রিয় আলতার
রত্না। চলুক পানসি ফের
তীরা। যাক দেশে বেহাগের
নীরা। বেহাগ রাতের সুর
রত্না। এখন অনেক দূর
তীরা। এখন যে চারদিকে
কাঠ-ফাটা রোদ্দুর
নীরা। নদী বয় তর তর
রত্না। তাহলে সারং ধর
তীরা। আকাশেতে ওই শোন
নীরা। সারঙের ঝন ঝন
রত্না। কেঁপে ওঠে প্রাণমন
তীরা। থর থর থর থর
নীরা। আকাশ স্বয়ম্বর
হচ্ছে কি আজ লো
রত্না। তাই কি লো বাজলো
ঝন ঝন ঝঙ্কার

তীরা। আশার আশঙ্কার

তাদের কবিতা-খেলা চলছিল, এমন সময় ভীষণ একটা শব্দ শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল তারা। কপাট খুলে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দেখে—একি কাণ্ড। সারি সারি হাতির দল হাঁটু গেড়ে শুঁড় তুলে বসে আছে আর তাদের সিংদরজার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়ার দল, পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে। আর সবাই চিৎকার করছে।

একটি বড় হাতির পিঠে বসে আছে ভল্লু। সে হাত জোড় করে বললে—"রাজকন্যা এরা আপনার কাছে একটি আবেদন জানাচ্ছে। এরা সবাই আপনাকে ভালোবাসে। এরা বলছে এদের আপনি এত সুখে রেখেছেন, রোজ এত ভালো ভালো খাবার খেতে দেন, এত আদর করেন— অথচ এদের কোনও কাজে লাগান না। এরা আপনার জন্যে কিছু কাজ করতে চায়। কোনও কঠিন কাজ— যা আর কেউ সহজে পারবে না—সেই রকম একটা কঠিন কাজ দিলে এরা ভারি খুশি হবে। এরা যে জঙ্গলে আছে সেই জঙ্গলে বড় বড় গাছ আছে অনেক। আমি সেই গাছগুলো কেটে এদের দিয়ে স্তূপীকৃত করছি এক জায়গায়। এসব করছি এদের কাজ দেওয়ার জন্য। আপনি এদের একটা কাজ দিন।"

রত্না হেসে বললে— "ওদের আমি ভালোবাসি। ওরাও আমাকে ভালোবাসে। এই তো যথেষ্ট। কোনও কঠিন কাজ করে সে ভালোবাসার প্রতিদান দেবার কোনও দরকার নেই। কোনও কঠিন কাজও তো নেই। এখন ওরা যেমন আছে থাকুক। তুমি বরং যে গাছগুলো কেটেছ সেগুলো জুড়ে জুড়ে বড় মেজের মতো তৈরি করে ফেল। বন্দনা নদীতে সেগুলো ভাসিয়ে নাচগান করতে পারব।"

"যে আজ্ঞে—"

হাতি ও ঘোড়ার দলকে নিয়ে ভল্লু চলে গেল। তাদের কলরব থামতেই আর এক রকম কলরব ভেসে এল। চং চং ঘড়াং ঘড়াং। লোহার মিস্ত্রীরা পুল তৈরি করতে শুরু করেছে। হাজার হাজার মিস্ত্রী কাজে লেগে গেছে। হই হই পড়ে গেছে চারদিকে।

।। বারো ।।

গজসিংহ বন থেকে শুদ্ধসুর আর অলঙ্কারপুরীতে গেল না। তার আত্মসম্মানে কেমন যেন বাধতে লাগল। হাজার হোক, সে-ও একজন রাজপুত। গন্ধর্ব পদ্মচরণের বংশধর। তার কি ওরকম হ্যাংলার মতো সেখানে আবার যাওয়া উচিত? মন কিন্তু যেতে চাইছিল। রত্নাকে সত্যি খুব ভালো লেগেছিল তার। তবু সে নিজের রাজত্বেই ফিরে গেল। সেখানে সপ্তশিবের বিরাট মন্দির ছিল। সেখানেই গিয়ে ধর্না দিল। ভাবল শিব যা আদেশ করবেন তাই করবে সে। শিবমন্দিরের চত্বরে শুদ্ধসুর অনাহারে পড়ে রইল চোখ বুজে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। অনড় অচল হয়ে পড়ে রইল শুদ্ধসুর। তার পণ মহাদেবেরে আদেশ না পেলে সে কিছুতেই উঠবে না। একদিন ঝড়-বৃষ্টি হল খুব। জলের ঝাপটায় মন্দিরের চত্বর জলে জলময়। আপাদমস্তক ভিজে গেল শুদ্ধসুর। কিন্তু অনড় হয়ে রইল সে। মনের পটে সারি সারি সপ্তশিবের মূর্তি, কেউ নীলকণ্ঠ, কেউ ধূর্জটি, কেউ পিনাকপানি, কেউ গঙ্গাধর, কেউ উমাপতি, কেউ ভুজঙ্গভূষণ, কেউ নন্দীবাহন। এদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল সে মনে

মনে। একদিন খুব বরফ পড়ল। সে বরফে প্রায় চাপা পড়ে গেল। তবু তার একাগ্র ধ্যান ভঙ্গ হল না। তারপর রোদ উঠল। কট্‌কটে রোদ। বরফ গলে গেল, গায়ের জল শুকিয়ে গেল, শেষে রোদের তাপে ঝলসে গেল তার গা। শুদ্ধসুর তবু অনড়। মহাদেবের আদেশ না নিয়ে সে কিছুতে উঠবে না। শেষে ভয়ানক কাণ্ড হল একটা। প্রকাণ্ড একটা গোখরো সাপ তার গায়ে মুখে মাথায় পেটে বুকে চলে বেড়াতে লাগল। শুদ্ধসুর মড়ার মতো পড়ে আছে। বাহ্যজ্ঞানশূন্য। খুশি হলেন মহাদেব। তিনিই পরীক্ষা করে দেখছিলেন তার একাগ্রতা কত দূর।

অবশেষে আবির্ভূত হলেন তিনি তার সম্মুখে। সে দেখল রজতকান্তি একটি জ্যোতির্ময় পুরুষ নীরবে তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। অবশেষে তিনি কথা বললেন। "গন্ধর্ব শুদ্ধসুব, তোমার একাগ্রতায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি অলঙ্কারপুরীতে যাও। কিন্তু সেখানে যদি তারা সাগ্রহে তোমাকে আহ্বান না করে সেখানে থেকো না। মনে রেখো তুমি রাজপুত। তোমার বোন রূপশ্রীকে আনবার চেষ্টা কোরো না। সে সরস্বতীর বরপুত্রী, তোমার মা বাগ্‌দেবীর অর্চনা করেছিলেন বলেই তাকে পেয়েছিলেন। সে যাঁর কাছে মানুষ হচ্ছে সেই ভানুনাথও একজন পূণ্যবান জ্ঞানী লোক। তাকে ছেড়ে রূপশ্রী কিছুতেই আসবে না। তাকে আনবার চেষ্টা কোরো না। রাজকন্যা রত্নাও গুণবতী, সে যদি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয় তুমি তাকে বিয়ে করতে পার। কিন্তু মনে রেখো সে মানবী, তুমি গন্ধর্ব। মহর্ষি ময়ালভুক যদি এ বিবাহে পৌরোহিত্য করেন তবেই এ বিবাহ সিদ্ধ হবে তাঁর অলৌকিক তপোবলে, তা না হলে হবে না—"

শুদ্ধসুর বলল— "মহর্ষি ময়ালভুক কি অত দূরে গিয়ে পৌরোহিত্য করতে রাজি হবেন?"

"হবেন— যদি অলঙ্কারপুরীর মহারাজা স্বয়ং গিয়ে অনুরোধ করেন। মহারাজ যদি সেখানে গিয়ে তাঁকে বলেন, তিনি নিশ্চয় যাবেন। আমি তাঁকে যেতে অনুরোধ করব। তাঁর সঙ্গে আমার রোজ যোগাযোগ হয়।"

এই বলে, মহাদেব অন্তর্হিত হলেন। তপস্যা করে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল শুদ্ধসুর। এতদিন অনাহার, তার উপর শরীরে কম ধকল যায়নি। সে ধীরে ধীরে প্রাসাদে ফিরে গেল। মন্ত্রীকে ডেকে বলল—"আমার জন্যে ভাবছিলেন নিশ্চয়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এতদিন কোথায় ছিলেন?"

"সপ্তশিবের মন্দিরে তপস্যা করছিলাম। এখন ঘুমুব। গন্ধর্বী দ্রৌপদীকে বলুন আমাকে কিছু খাবার আর এক ভৃঙ্গার সোমরস যেন অবিলম্বে দিয়ে যায়। গন্ধর্বীকে বলুন আমার শয্যা প্রস্তুত করতে। এখন আমি কারো সঙ্গে দেখা করব না। রাজ্যের খবর ভালো তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সব ভালো। তবে আমাদের খবর সরবরাহকারিণী পতঙ্গিনীকে কয়েক দিন থেকে দেখতে পাচ্ছি না।"

"কোথাও উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছেন হয়তো খবর সংগ্রহ করবার জন্য। ও অমর—ওর জন্যে চিন্তিত হবেন না।"

গন্ধর্বী পতঙ্গিনী পবনদেবের কনিষ্ঠা কন্যা। ইন্দ্রাণী শচীদেবীর কথা শোনেনি বলে তিনি রেগে তাকে গন্ধর্বী করে দিয়েছেন। বহুবর্ণা এক পতঙ্গিনীর বেশে সে হাজির হয়েছিল শুদ্ধসুরের কাছে।

"আপনি আমাকে কোনও কাজ দিন। ইন্দ্রাণী রেগে আমাকে গন্ধর্বী তো করে দিয়েছেনই, পতঙ্গিনীও করে দিয়েছেন। আমি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছি। যখন খুশি যেখানে পারি। উড়তে উড়তে আপনার কাছেই এলুম, আপনি তো গন্ধর্বরাজ।"

শুদ্ধসুর সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন— "বেশ, যতদিন ইচ্ছে থাকো।"

"আমাকে কি করতে হবে বলুন—"

"কিছু করতে হবে না। আমার বাগানে উড়ে উড়ে বেড়াও।"

"আমি যে এক জায়গায় থাকতে পারি না। দেশ-বিদেশে উড়ে বেড়াব।"

"বেশ, তাই বেড়িও।"

পতঙ্গিনী শুদ্ধসুরকে দেশ-বিদেশের খবর এনে দিত। সেই তাকে গজসিংহ জঙ্গল আর মহর্ষি ময়ালভুকের খবর এনে দিয়েছিল।

শুদ্ধসুর খাওয়া-দাওয়া শেষ করে পালঙ্কের বিছানায় শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম। ঘুম ভেঙে দেখল পতঙ্গিনী ঘরের চারদিকে গুনগুন করে উড়ে বেড়াচ্ছে।

"কি পতঙ্গিনী, তুমি আবার শোবার ঘরে কেন?"

"আপনি সাত দিন সাত রাত ঘুমিয়েছেন। আজ অষ্টম দিন। মন্ত্রীমশাই বললেন, ওকে উঠিয়ে দাও, উনি সাত দিন সাত রাত কিছু খাননি। ওঁকে উঠিয়ে দাও। তিনি দ্রৌপদীকে বলেছেন আপনার জন্য খাবার আনতে। যদি আরও ঘুমতে চান খেয়ে নিয়ে ঘুমুন।"

"না, আর ঘুমুব না। ক্ষিধে পেয়েছে খুব। তুমি কোথা গিয়েছিলে?"

"গিয়েছিলাম অলঙ্কারপুরীতে। সেখানে শুনলাম রাজকন্যা রত্নার বিয়ের আয়োজন হচ্ছে। পাঁচজন রাজপুত্রকে নিমন্ত্রণ করেছেন মহারাজ। তাঁদের মধ্যে রত্না যাকে পছন্দ করবে তার সঙ্গেই বিয়ে হয়ে যাবে তার।"

"সত্যি না কি?"

"পতঙ্গিনী কখনও মিথ্যে খবর আনে না।"

"তুমি তাহলে আবার সেখান যাও। রাজপুত্রেরা কবে আসবেন সে খবরটা যোগাড় করে নিয়ে এস।"

"বেশ।"

পতঙ্গিনী উড়তে উড়তে বেরিয়ে গেল।

॥ তেরো ॥

সেতু নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হব-হব। একক্রোশ-ব্যাপী লোহার বিরাট সেতু তৈরি করেছে লোহার কারিগররা। রূপশ্রীর নির্দেশমতো লোহার লতা-পাতা ফুল তৈরি হয়েছে সেটিতে। রূপশ্রী কিন্তু ভাবনায় পড়েছে একটু। যে লোকটি সোনার সেতু করে দেবে বলেছিল সে লোকটি প্রথম দিন থেকেই নিরুদ্দেশ হয়েছে। কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাকে। লোকটি কি তাহলে জুয়াচোর? ধাপ্পাবাজ? কিন্তু তার মুখ দেখে তো তা মনে হয়নি। রূপশ্রী তার চেহারা দেখে বিশ্বাসই করেছিল তাকে। সে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল কেন? অতিথিশালায় খোঁজ করে জানা গেল তার প্রতি কোনও রকম অসৌজন্য করা হয়নি। হঠাৎ সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কোথা

গেল, কেন গেল? রূপশ্রীর সত্যিই বড় ভাবনা হতে লাগল। শেষে কি লোহার সেতুর উপর দিয়েই নিয়ে যেতে হবে রাজপুত্রদের? লোহার সেতুকে অবশ্য ফুল দিয়ে সাজিয়ে সুন্দর করে দেবে সে। রেলিঙের দু'ধারে মোহরের হার গেঁথে ঝুলিয়ে দেবে, নানা রঙের রেশমের পতাকা উড়িয়ে দেবে। কিন্তু সে যা চেয়েছিল তা তো হল না। লোহার সেতু আর সোনার সেতু তো এক নয়। ছি, ছি, লোকটা এমনভাবে ঠকিয়ে গেল তাকে? ঠকিয়ে তার লাভটা কি? এই সব ভাবছে, এমন সময় লোহার কারিগরদের প্রধান অয়স্কান্তি এসে প্রণাম করে বলল— 'মা, আমাদের কাজ শেষ হয়েছে। মঞ্চে বসবার জন্য আমরা একশটি লোহার সিংহাসনও তৈরি করে দিয়েছি। আপনি কি এখন দেখবেন?'

রূপশ্রী বলল— 'এখন তো সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কাল সকালে যাব।'

অয়স্কান্তি প্রণাম করে চলে গেল।

তার পরদিন সকালে উঠে কপাট খুলেই বিস্মিত হয়ে গেল রূপশ্রী। সেই লোকটি দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই নমস্কার করে বলল—"আপনার সেতুটি চমৎকার হয়েছে। আপনার শিল্প-প্রতিভা দেখে বিস্মিত হয়েছি আমি। সমস্ত রাত আমি আপনার মনোরম সেতুর উপর বেড়িয়েছি। মঞ্চের উপর যে আসনগুলি তৈরি হয়েছে সেগুলিও অতি সুন্দর।"

রূপশ্রী বলল— "আপনি বলেছিলেন সোনার সেতু তৈরি করে দেবেন—"

"সোনারই তো হয়েছে। দেখবেন চলুন।"

"সোনার হয়ে গেছে? কি রকম?"

"আসুনই না আমার সঙ্গে!"

যোজন দীঘিতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল রূপশ্রী। সমস্ত সেতুটা ঝলমল করছে— সোনার হয়ে গেছে সবটা। এমন কি, মঞ্চের সিংহাসনগুলো পর্যন্ত।

"কি করে এ অসম্ভব সম্ভব হল?"

লোকটি হেসে বললে, "কাল সারারাত আমি এই সেতুর উপর ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার স্পর্শে সব সোনা হয়ে গেছে।"

"কে আপনি? কোথা থাকেন?"

"আমি স্পর্শমণি। থাকি লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে। তিনিই আমাকে একদিন ঝাঁপি থেকে বার করে বললেন, তুমি মানুষের রূপ ধরে অলঙ্কারপুরীতে যাও। রূপশ্রীর লোহার সেতুকে সোনার সেতু করে দিয়ে এস। আমার কাজ শেষে হয়েছে। এবার আমি চললাম।"

সহসা দেখল সে একটা জ্যোতির্ময় আলোর রেখা আকাশের দিকে চলে গেল।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রূপশ্রী।

।। চোদ্দ ।।

মহারাজ সমূহগুণের স্বাক্ষরিত পাঁচটি আমন্ত্রণলিপি নিয়ে ভানুনাথ স্বয়ং গেলেন পাঁচটি প্রতিবেশী রাজ্যে অলঙ্কারপুরীতে অলঙ্কৃত রাজরথে চড়ে। আমন্ত্রণলিপিগুলি রুপোর পাতে সবুজ রঙ দিয়ে লিখেছিল রূপশ্রী। সেগুলি ছোট স্বর্ণ-পেটিকায় পুরে গোলাপী আতর মাখিয়ে

সুগন্ধিও করে দিয়েছিল সে। চিঠিতে লেখা ছিল—যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর সবিনয় নিবেদন, আগামী পূর্ণিমায় আমাদের যোজন দীঘির মঞ্চে আমাদের পদ্মবনোৎসব পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। আপনি তাতে এসে যোগদান করলে আমি কৃতার্থ হব।

অলঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করবার বিরাট তোরণ ছিল একটি। পূর্ণিমার দিন সকাল থেকে মহারাজ সমূহগুণ সেই তোরণের পাশে একটি তাঁবু খাটিয়ে সেখানেই বসে রইলেন। রাজপুত্রেরা এলে স্বয়ং তিনি তাদের অভ্যর্থনা করবেন। তোরণের দু'পাশ দাঁড়িয়ে রইল অলঙ্কাপুরীর রূপসী কন্যারা। কারো হাতে শাঁখ, কারো হাতে খইয়ের ডালা, কারো হাতে ফুলের মালা। ভোর থেকেই নহবৎ বসেছে তোরণের উপর। নর্তকীরা ফুলের সাজে সেজে প্রত্যেকেই লীলায়িত ভঙ্গিতে নৃত্য করছে পথের দু'ধারে। প্রত্যেকের মাথার খোঁপায় বা বেণীর ডগায় পদ্মফুল। পিচকিরি করে আতর ছিটানো হচ্ছে চারিদিকে। বৈতালিকেরা সবুজ পোশাক পরে গলায় পদ্মফুলের মালা দুলিয়ে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে পথে পথে। রূপশ্রী রত্নাকে এমন ভাবে সাজিয়েছে যে মনে হচ্ছে সে যেন নিজেই একটি পদ্মফুল। তীরা নীরা হীরা পান্নাও সেজেছে খুব। রত্নার হাতি-ঘোড়াদেরও নূতন পোশাক পরানো হয়েছে। প্রত্যেকের মাথায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে পদ্মফুলের গোছা। তারাও অলঙ্কারপুরী-প্রবেশের পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে। রাস্তার ধারে ধারে সবুজ রঙের সারি সারি টবও রয়েছে। প্রত্যেক টবে মাটির তৈরি পাতাসুদ্ধ পদ্মফুল, এমন চমৎকার যে মনে হচ্ছে যেন জীবন্ত। সমস্ত অলঙ্কারপুরীই আনন্দে যেন পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। সকলের চোখে-মুখে আনন্দ যেন ঝলমল করছে। যোজন দীঘি পদ্মে পদ্মে ছেয়ে গেছে। তাদের ফাঁকে ফাঁকে ভেসে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট রঙিন পানসি। প্রত্যেক পানসিতে রয়েছে গায়িকা। তারা পদ্মফুলকে সম্বোধন করে গান গাইছে ঃ

ওরে রোদ-সোহাগী ফুল
        তুই গন্ধে যে ভুর ভুর
                মধুতে টুল টুল।
তোর মিষ্টি হাসি
রং-বাহারী বাঁশির যেন সুর
        তুই গন্ধেতে ভুর ভুর
                তুই কাছে থেকেও দূর
                তুই মধুতে টুল টুল।
ওরে রোদ-সোহাগী ফুল।।

সবার মুখের এই একই গান। যোজন দীঘি জুড়ে একটা গানের গুঞ্জন ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

অবশেষে রাজপুত্রেরা আসতে আরম্ভ করলেন। চারিদিকে শাঁখ বেজে উঠল। তোপখানা থেকে তোপ পড়তে লাগল। ক্ষেত্ররাজ এলেন শ্বেত হস্তীর পিঠে চড়ে, তারাবর্মন এলেন চমৎকার একটি পালকিতে, বজ্রসিংহ এলেন বিরাট অশ্ব-পৃষ্ঠে, ছন্দ-কৌশিক এলেন মনোরম একটি স্বর্ণরথে, ভদ্রশীল এলেন চন্দনকাঠের মণিমাণিক্য খচিত চতুর্দোলায়।

সমূহগুণ প্রত্যেককে আহ্বান জানালেন সমাদরে। ভানুনাথ তোরণের ভিতর পাঁচটি

মখমলমণ্ডিত রথ রেখেছিলেন। তিনি তাঁদের আহ্বান করে রথ থেকে নামালেন, হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন সমূহগুণ। মেয়েরা খই আর ফুল বর্ষণ করতে লাগল তাদের মাথায়। রত্নার সহচরীরা গিয়ে তাঁদের কপালে চন্দনের টিপ আর গলায় মালা পরিয়ে দিল। রাজকুমাররা এসে ভানুনাথের রথগুলিতে চড়লেন। রথগুলি চলল যোজন দীঘির সোনার সেতুর দিকে। চারিদিকে নানা রকম বাজনা বেজে উঠল।

সোনার সেতু অপরূপ সাজে সেজেছে। তার দু'পাশে যে সোনার রেলিং—সেগুলিতে পদ্মফুল তো আছেই, আরও আছে মণি মুক্তা মাণিক্য পান্নার মালা, মাঝে মাঝে চুনির ঝালর। দশটি চন্দনকাঠের তোরণও চমৎকার সেজেছে। প্রত্যেক তোরণের গায়ে রূপশ্রীর আঁকা ছবি ঝুলছে। পদ্মফুল তো আছেই।

রাজপুত্রেরা রথে করে এই অপরূপ সেতু পার হয়ে স্ফটিক মঞ্চে উঠলেন। স্ফটিক মঞ্চে একশত স্বর্ণ-সিংহাসন ছিল। পঁচানব্বইটি সিংহাসনে অলঙ্কারপুরীর গণ্যমান্য আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা বসেছিলেন। মাঝখানে পাঁচটি সিংহাসন আলাদা করা ছিল রাজপুত্রদের জন্য। প্রত্যেকটি সিংহাসন পদ্মফুলে সুশোভিত। রাজপুত্ররা আসতেই সকলে উঠে দাঁড়ালেন। স্বাগতম্ বলে সম্বর্ধনা করলেন তাঁদের। শঙ্খধ্বনি হতে লাগল আবার। রাজপুত্ররা আসন গ্রহণ করলেন। তারপর পণ্ডিত ভট্টজী উঠে বললেন— "যাঁর নাম শতদল, যার নাম কমল, যার নাম অরবিন্দ, যার নাম সরোরুহ, যার সাধারণ নাম পদ্ম, যে পদ্মের উপর লক্ষ্মী-সরস্বতী উভয়েই অধিষ্ঠিতা, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার নাভিমূলের শোভা যে পদ্ম, সেই পদ্মকে কেন্দ্র করে আমাদের এই উৎসব। রাজকন্যা রত্নাবলী এই উৎসবের প্রাণকেন্দ্র, মন্ত্রীকন্যা রূপশ্রী ও উৎসবের শিল্পনেত্রী। মহারাজ এবার তাদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন।"

মহারাজ সমূহগুণ রত্না আর রূপশ্রীকে নিয়ে এগিয়ে এলেন। বললেন— "এইটি আমার কন্যা রত্না, আর এইটি ভানুনাথের কন্যা রূপশ্রী।"

রত্না ও রূপশ্রী দু'জনেই একে একে গিয়ে প্রণাম করলেন রাজপুত্রদের, তারপর তাঁদের হাতে দিলেন কমলফুলের গুচ্ছ।

তারপরই নৃত্য-গীত খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ হল। রত্না ও রূপশ্রী তাদের সহচরীদের কাছে গিয়ে বসল।

হঠাৎ রত্না দেখতে পেল স্ফটিক মঞ্চের উপর একটি চমৎকার পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। তার বুকটা সাদা কিন্তু স্বর্ণাভ, তার ডানা দুটি সবুজ, ঠোঁট দুটি টক্‌টকে লাল, মাথাটি ধপধপে সাদা, চোখ দুটি নীল। এরকম পাখি রত্না কোথাও কখনও দেখেনি। রত্না যেখানে বসেছিল তার সামনে ছিল স্ফটিকের একটি থাম। তার উপর এসে বসল পাখিটা। রত্না একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল পাখিটির দিকে।

।। পনেরো ।।

সভা শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

রাজপুত্ররা চলে গেছেন সবাই।

পাখিটি কিন্তু উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে তখনও।

রত্নার ঘরে বসে আছে তীরা আর নীরা।

তীরা জিজ্ঞেস করলে—"কোন রাজপুত্রকে পছন্দ হল তোর?"

"কাউকে না।"

"কাউকে না?"

"কাউকে না? বলিস কি!"

"না। ক্ষেত্ররাজ নেউলমুখো, বজ্রসিংহ যেন একটা দারোয়ান, ভদ্রশীল লিকলিকে রোগা, ছন্দ-কৌশিকের ঝাঁকড়া চুল আর গোঁফ-দাড়ি সিংহের মতো, আর তারাবর্মণের খোঁচাখোঁচা কাটা গোঁফ, মুখটি বেড়ালের মুখের মতো।"

"একজনকেও পছন্দ হল না?"

"এতো খুঁতখুঁতে তুই! আমার তো ছন্দ-কৌশিককে বেশ ভালো লাগল। পুরুষমানুষের গোঁফ-দাঁড়ি তো থাকবেই।"

রত্না বলল— "একজনকে কিন্তু আমার পছন্দ হয়েছে— ওই চমৎকার পাখিটিকে।"

"সে তো এখনও উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে তোর ঘরের চারিদিকে।"

"তাই না কি?"

রত্না বারান্দায় বেরিয়ে দেখল তার বাগানের একটি গাছের উপর বসে আছে পাখিটি।

একদৃষ্টে চেয়ে আছে তার ঘরের দিকে।

তীরা বলল— "খুব শান্ত পাখি মনে হচ্ছে।"

নীরা লাফিয়ে উঠল—"চল ভরদ্বাজকে বলি গিয়ে—ও এখ্‌খুনি জাল ফেলে ধরে ফেলবে।"

রত্না বলল— "আমি খাঁচাতে পাখি পুষব না।"

"পরে না হয় ছেড়ে দিস। দেখি ধরতে পারা যায় কি না।"

তীরা নীরা দু'জনেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বেরিয়ে যাওয়ার পরই আশ্চর্য কাণ্ডটি ঘটল। পাখিটি সোজা উড়ে এসে রত্নার ঘরে ঢুকল এবং সঙ্গে সঙ্গে গন্ধর্ব শুদ্ধসুর রূপান্তরিত হয়ে নমস্কার করল রত্নাকে।

"আমি রূপশ্রীর দাদা। আমি যখন তাকে নিতে এসেছিলাম তখন আপনি আমাকে দেখেছেন। রূপশ্রী আমার সঙ্গে গেল না, কিন্তু আমি সেই থেকে অহরহ আপনার কথাই ভাবছি। খবর পেলাম আজ আপনার বিবাহের আয়োজন হচ্ছে, পাঁচজন রাজপুত্র এসেছিলেন। কাউকে কি আপনি পছন্দ করেছেন?"

বিস্ময়ে রত্না নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

চোখের সামনে একটা পাখি মানুষ হয়ে গেল। এ কী কাণ্ড!

তারপর শুদ্ধসুরের কথা শুনে লজ্জা হল তার। মাথা নত করে মৃদুকণ্ঠে বলল, "না, কাউকে পছন্দ করিনি। আপনি কোথা থেকে এসেছেন?"

"আমি আমার রাজ্য গন্ধর্বলোক থেকে উড়তে উড়তে আসছি। আমি মন্ত্রবলে নিজেকে পাখি করে ফেলতে পারি।"

ক্ষণকাল নীরব থেকে রত্না প্রশ্ন করল—"আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন?"

"বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, আমি আপনার বাবার কাছে এ প্রস্তাব করব। তাঁর সঙ্গে কোথায় দেখা হবে?"

"কাল সকালে তিনি যাবেন মুকুন্দদেবের বাড়িতে দিলরুবা নিয়ে। প্রত্যেক পূর্ণিমার পরদিন তিনি তাঁর কাছ থেকে একটি সুর শেখেন!"

"আপনি যদি অনুমতি দেন আপনার বাবার সঙ্গে সেইখানেই দেখা করব।"

রত্না কিছু না বলে মাথা হেঁট করে পাশের ঘরে চলে গেল। লজ্জায় তার তখন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল।

।। ষোলো ।।

পরদিন খুব ভোরে যখন শুদ্ধসুর কবি মুকুন্দদেবের বাড়ি গেল তখন বাইরে থেকেই শুনতে পেল ভিতরে ভৈরবী আলাপ হচ্ছে। সে আর ভিতরে ঢুকল না। বাইরে বারান্দায় বসে সেও গুন গুন করে ওই ভৈরবীই আলাপ করতে লাগল। সমূহগুণ অনেকক্ষণ আলাপ করে অবশেষে থামলেন। থেমেই সবিস্ময়ে লক্ষ করলেন বাইরে থেকে অপূর্ব কণ্ঠে কে ভৈরবী আলাপ করছে। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন একটি দিব্যকান্তি যুবক চোখ বুজে তন্ময় হয়ে ভৈরবী আলাপ করে যাচ্ছে। মুকুন্দদেবও উঠে এলেন। দু'জনেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এ রকম অসামান্য অপূর্ব কণ্ঠ তাঁরা আর শোনেননি। এ যেন মানুষের কণ্ঠ নয়—এ যেন বীণা বাজছে। যতক্ষণ শুদ্ধসুর গান গাইল ততক্ষণ মুগ্ধ হয়ে নীরব দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁরা।

গান শেষ করে চোখ খুলেই শুদ্ধসুর দেখতে পেল তাঁদের। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল ঃ "আমি মহারাজ সমূহগুণের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

"ইনিই মহারাজ"— বললেন মুকুন্দদেব।

মহারাজকে প্রণাম করে শুদ্ধসুর বলল, "আমি আপনার সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই।"

"আপনার পরিচয় দিন।"

"গন্ধর্বরাজ শুদ্ধসুর।"

দু'জনেই বিস্মিত হলেন।

"আসুন তাহলে পাশের ঘরে যাই।"

শুদ্ধসুরকে নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন মহারাজ। উৎসুক উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মুকুন্দদেব। একটু পরে কথা কইতে কইতে বেরিয়ে এলেন সমূহগুণ ও শুদ্ধসুর।

সমূহগুণ— আপনি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চান? কিন্তু তার অমতে কোথাও তো বিয়ে হবে না। সে কালই পাঁচজন রাজপুত্রকে অপছন্দ করেছে।

শুদ্ধসুর— আমার সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়েছে। তাঁর অনুমতি নিয়েই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

সমূহগুণ—ও! আর একটা কথাও মনে হচ্ছে আমার। গন্ধর্বের সঙ্গে মানুষের বিয়ে হবে কি করে?

এই সময় বাধা দিলেন কবি মুকুন্দদেব।

মুকুন্দদেব— মহারাজ, রত্নার সঙ্গে গন্ধর্বেরই বিয়ে হবে। আমি ওর হাত দেখেছি। আর সেই জন্যেই বিশেষ করে ওকে নাচ-গান শেখাচ্ছি।

সমূহগুণ—তাই না কি? আচ্ছা ভেবে দেখি তাহলে!

শুদ্ধসুর—আমি তাহলে একমাস পরে দেখা করব আপনার সঙ্গে।

সমূহগুণ—বেশ।

শুদ্ধসুর প্রণাম করে চলে গেল। রত্নার সঙ্গে একা দেখা করার আর সুযোগ হল না তার। সেই দিনই পাখি হয়ে উড়ে গেল নিজের দেশে। অলঙ্কারপুরী ছেড়ে তার চলে যেতে ইচ্ছে করছিল না। অন্তত আর একবার রত্নাকে দেখবার লোভ হচ্ছিল খুব। কিন্তু তার মনে হল সেটা মোটেই শোভন হবে না। সে গন্ধর্বরাজ। অশোভন অশালীন কিছু করবে না সে। মহারাজ বিবাহে মত দেবেন কি না এটা জানতেও সে আর নিজে আসবে না। পাঠাবে মন্ত্রী নিখাদকে।

রত্না কিন্তু আশা করেছিল শুদ্ধসুর আর একবার আসবেন তার কাছে। তীরা নীরা ফিরে এসে বলল—"পাখিটা বাগানে নেই। কোথাও খুঁজে পেলাম না।"

রত্না বলল— "ও আকাশের পাখি, আকাশে উড়ে গেল।"

পরদিন মহারাজ সমূহগুণ রত্নাকে এসে জিজ্ঞেস করলেন— "গন্ধর্ব দেশের রাজার সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল না কি?"

"হয়েছিল। যেদিন রাজপুত্রেরা এসেছিলেন সেদিন তিনিও এসেছিলেন। তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি বলে সভায় যাননি।"

মহারাজ বললেন— "তিনি আমার কাছেও এসেছিলেন। তোকে বিয়ে করতে চান। তোর পছন্দ হয়েছে তাঁকে?"

রত্না মাথা হেঁট করে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। সমূহগুণ বুঝলেন, তার পছন্দ হয়েছে।

মহারাজ মহারানী কমলাঙ্গিনীর স্বর্ণপ্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন— "একজন পরম রূপবান গন্ধর্বরাজ রত্নাকে বিয়ে করতে চাইছেন। তিনি শুধু রূপবান নন, গুণবানও। খুব উঁচুদরের গায়ক তিনি। এ বিয়েতে তোমার মত আছে?"

কমলাঙ্গিনীর সর্বাঙ্গ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চোখ দুটি যেন হাসতে লাগল।

মহারাজ বুঝলেন, মত আছে।

তারপর তিনি গেলেন কুলগুরু অম্বুজানন্দ বাচস্পতির কাছে। তিনি বললেন— "কোনও মহাযোগী যদি এ বিবাহে পৌরোহিত্য করেন তাহলেই এ বিবাহ সিদ্ধ হবে। গন্ধর্বের সঙ্গে মানুষের বিবাহ দিতে পারেন এরকম মহাযোগী তো অলঙ্কারপুরীতে নেই। প্রকৃত মহাযোগীরা মহাশক্তিমান। তাঁরা সব করতে পারেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে তাঁরা সুলভ নন। প্রায়ই আত্মগোপন করে থাকেন। আপনি একজন মহাযোগীর সন্ধান করুন। মুকুন্দদেব বড় জ্যোতিষী। তিনি হয়তো গণনা করে কোনও সন্ধান পেতে পারেন।"

মুকুন্দদেব সত্যিই বড় জ্যোতিষী।

বিশেষ করে প্রশ্ন-গণনায় তিনি খুবই নিপুণ। প্রশ্ন গণনা করে কিন্তু তিনি যে উত্তর পেলেন

তাতে হতাশ হলেন একটু। উত্তর পেলেন— আজকাল সত্যই কে মহাযোগী, কোথায় তিনি থাকেন, এর উত্তর স্বয়ং ভৈরব ছাড়া আর কেউ জানেন না। দুর্ভাবনায় পড়লেন মুকুন্দদেব। ভৈরবের দেখা পাওয়া যায় কি করে? অনেক ভেবে শেষে ঠিক করলেন ভৈরব-রাগ আলাপ করে তিনি ভৈরবকে আহ্বান করবেন। গানের সুরে ভৈরব কি সাড়া দেবেন? তবুও একবার চেষ্টা করে দেখবেন তিনি। রত্নাকে সত্যি তিনি খুব ভালোবাসতেন। সেদিন গন্ধর্বরাজ এসেছিলেন। তিনিও গুণবান এবং রূপবান। এদের বিবাহ দিতেই হবে। রোজ গভীর রাত্রে উঠে তানপুরা নিয়ে ভৈরবরাগ আলাপ করাও শুরু করলেন তিনি। সমুহগুণকে কিছু বললেন না। ভাবলেন একথা বললে মহারাজ চিন্তিত হয়ে পড়বেন। তাঁকে অনর্থক চিন্তিত করে লাভ কি?

প্রত্যহ গভীর রাত্রে উঠে ভৈরব-রাগ আলাপ করতেন নির্বিঘ্ন চিত্তে। সে আলাপে গাছের ঘুমন্ত পাখিরাও জেগে উঠত। মুক্ত বাদুড়ের দল চক্রাকারে ঘুরে বেড়াত তাঁর বাড়ির উপর। রাত্রির অন্ধকারে শিহরন জাগত, ফুটে উঠত গাছের মুকুলগুলি, থেমে যেত বন্দনা নদীর গতিবেগ। সমস্ত প্রকৃতি মুগ্ধ হয়ে শুনত তাঁর আলাপ। ভৈরবের কিন্তু দেখা নেই। শিবই ভৈরব। তিনি কি আসবেন আমার কুটিরে? এ সন্দেহ রোজই জাগত মুকুন্দদেবের মনে। একদিন হঠাৎ তাঁর মনে হল সন্দেহ করছি বলেই আসছেন না তিনি। সেদিন রাত্রে তিনি যখন তানপুরা তুলে আলাপ শুরু করলেন, তাঁর মনে সন্দেহের ছায়া মাত্র নেই।

তিনি ভাবলেন, আজ তিনি আসবেন, আসবেনই, নিশ্চয় আসবেন, তাঁকে আসতেই হবে। চোখ বুজে শুরু করলেন আলাপ। করতে করতে তন্ময় হয়ে গেলেন। তারপর বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়ে গেল তাঁর। মনে হল তিনি যেন সুরের নৌকোয় বিরাট একটা সমুদ্র পার হচ্ছেন। আর সমুদ্রের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন আকাশচুম্বী প্রকাণ্ড সাদা পাহাড় একটি। বরফের পাহাড়। কাছে যেতেই সেই পাহাড় কথা ক'য়ে উঠল মানুষের ভাষায়ঃ "মুকুন্দদেব, তুমি যে মহাযোগীর সন্ধান করছ তিনি থাকেন শিলাকণ্টক নদীর তীরে গজসিংহ জঙ্গলে। তাঁর নাম মহর্ষি ময়ালভুক্।"

সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র, পাহাড় সব মিলিয়ে গেল। মুকুন্দদেব চোখ খুলে দেখলেন তিনি নিজের ঘরে বসে আছেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি খবরটি মহারাজকে দিতে গেলেন। মহারাজ তখন কমলাঙ্গিনীর গলায় পদ্মের মালাটি পরিয়ে নীচে নেমে এসেছেন বৈঠকখানায়। বৈঠকখানার পাশেই রত্নার বাগান। রত্নাও সেইখানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। মুকুন্দদেব যখন খবরটি দিলেন তখন রত্নার কানেও গেল সেটি।

মহারাজ বললেন— "গজসিংহ জঙ্গল কোথায়? শিলাকণ্টক নামও তো শুনিনি। মহর্ষি ময়ালভুক নামটিও বড় অদ্ভুত শোনাচ্ছে।

"আমি যা শুনেছি তাই বললাম। তখন অবশ্য আমি আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম। এটা কিন্তু স্বপ্ন নয়— সত্য।"

"চলুন তাহলে ভানুনাথের কাছে যাওয়া যাক। তিনি হয়তো জানেন।"

তাঁরা চলে গেলেন ভানুনাথের কাছে।

সব শুনে ভানুনাথ বললেন— "রূপশ্রীকে নেবার জন্যে যে গন্ধর্বটি এসেছিল তার মুখে আমি এই নামগুলি শুনেছি। মহর্ষি ময়ালভুক্ যে একজন মহাশক্তিমান যোগী, একথাও সে বলেছিল। কিন্তু শিলাকন্টক নদী, গজসিংহ জঙ্গল কোন দেশে তা জানি না।"

"আমি গুপ্তচরদের ডেকে পাঠাচ্ছি, তারা হয়তো কেউ জানতে পারে।" একে একে সব গুপ্তচরকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু কোনও গুপ্তচরই শিলাকণ্টক নদী বা গজসিংহ জঙ্গলের নাম শোনেনি। সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন খুব।

রাজা গম্ভীর হয়ে গেলেন। ভানুনাথ বার বার হাত বুলোতে লাগলেন তাঁর টাকে, মুকুন্দদেব আবার ভৈরব-রাগ আলাপ করতে লাগলেন। ভাবলেন, মহাদেব যদি আবার দেখা দেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন গজসিংহ জঙ্গল কোথায়। কিন্তু মহাদেব আর দেখা দিলেন না। বিপদের অন্ধকার নেমে এল অলঙ্কারপুরীতে। মহারাজ ভাবতে লাগলেন, একমাস পরে যখন গন্ধর্ব-রাজকুমার আসবেন তখন কি উত্তর দেবেন তাঁকে? মহর্ষি ময়ালভুকের সন্ধান না পেলে তিনি বিবাহে মত দেবেন কেমন করে?

রত্না্র কানেও কথাটা গেল। তারপর একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার। সাহানা রাগিণীর কথা। তারা যখন বনভোজন করতে গিয়েছিল তখন সবুজ ফানুসে চড়ে ভাসতে ভাসতে এসেছিল সাহানা রাগিণী। সে তো গজসিংহ জঙ্গলের রাস্তা জানে। সে-ই তো বলেছিল আমি যদি সাহানা রাগিণীতে তাকে ডাকি তাহলে সে আসবে আমার কাছে।

পরদিন সকালে রত্না একাই চলে গেল সেই বনের মধ্যে। বসল গিয়ে সেই নদীর ধারে। দূরের পাহাড় পলাশফুলে তেমনি লাল হয়ে আছে। একটি পাথরের উপরে বসে আকাশের দিকে চেয়ে রত্না শুরু করে দিল সাহানা রাগিণীর আলাপ। একটু পরেই দেখতে পেল সবুজ ফানুসটি ভাসতে ভাসতে আসছে। কাছে আসতেই থেমে গেল সেটি। তার থেকে বেরিয়ে এল সাহানা। "আমাকে ডাকছিলে ভাই?"

"হ্যাঁ। গজসিংহ জঙ্গলে যাবার রাস্তাটা বলে দিতে পার?"

"খুব পারি। কেন, সেখানে যাবে নাকি?"

রত্না লজ্জিত মুখে চুপ করে রইল। তারপর বলল—"তুমি একটি উপকার করবে আমার? আমাদের মন্ত্রীমশাই কাছেই থাকেন। তাঁকে গিয়ে রাস্তাটা বলে দেবে?"

"আমি কি বলে নিজের পরিচয় দেব তাঁর কাছে?"

"পরিচয় দেবার দরকার কি? গিয়ে শুধু বল, শুনলাম, আপনারা গজসিংহ জঙ্গলের রাস্তাটা জানতে চান। আমি জানি। তাই আপনাকে জানাতে এসেছি।"

মুচকি হেসে সাহানা বলল— "বেশ তো, চল, বলে দিচ্ছি তাঁকে।"

পরদিনই ভানুনাথ দশজন অশ্বারোহীকে পাঠালেন রাস্তাটির খবর নিতে। দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চড়ে রওনা হয়ে গেল তারা। দশদিন পরে ফিরে এসে তারা বলল—"শিলাকণ্টক নদী পর্যন্ত পথ খুব ভালো। কিন্তু তা পার হওয়া অসম্ভব। অনেক ছোট ছোট পাথরে নদীটি পরিপূর্ণ, আর প্রত্যেকটি পাথরের মুখ খুব সূঁচালো। নদীর ঠিক ওপারেই গজসিংহ জঙ্গল। এপার থেকেই দেখা যায়।"

তারা যখন এই সব বর্ণনা করছিল তার একটু আগে এসেছিল ভল্লু। সে বলল—"ওই

নদীর ওপারে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে নাকি?" ভানুনাথ উত্তর দিলেন— "বিশেষ প্রয়োজন এবং যত শীঘ্র সম্ভব। মহারাজ স্বয়ং গজসিংহ জঙ্গলে যাবেন।"

"ও, তাই নাকি? তা এর জন্যে এত ভাবছেন কেন? নদী যখন বেশি চওড়া নয় তখন বড় বড় কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ঢেকে দেব সে নদীকে। বনে আমি বড় বড় গাছ কাটিয়ে সেগুলো জমা করে রেখেছি। ছুতোরদের দিয়ে কিছু তক্তাও চিরিয়ে রেখেছি। রাজকন্যা বন্দনা নদীতে একটা কাঠের পাটাতনের উপর নাচ-গানের ব্যবস্থা করে দিলে, আমি হাতির পিঠে করে সব নিয়ে যাব, সেখানে।"

ভানুনাথ বললেন—"তুমি এখুনি রওনা হয়ে যাও।"

সঙ্গে সঙ্গে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। সারি সারি হাতি বড় বড গাছের গুঁড়ি পিঠে করে বেরিয়ে পড়ল। ঘোড়ার পিঠে চাপল অনেক লোক আর ছুতোর। সবার পিছনে ভল্লু একটা বড় ঘোড়ার পিঠে গান গাইতে গাইতে চলল।

প্রায় কুড়িদিন কেটে গেল ভল্লু তবু ফিরল না। গজসিংহ জঙ্গলে গিয়ে ফিরে আসতে দশদিন লাগবে। মহারাজ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একমাস পরে শুদ্ধসুর আসবে। সে এসে যদি তাকে দেখতে না পায়— তাহলে কি হবে? সে কি ফিরে যাবে? তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ওই গন্ধর্ব-রাজকুমারকে রত্নার খুব ভালো লেগেছে। ওর সঙ্গে বিয়ে হলে সত্যিই ও খুব খুশি হবে। তিনি নিজেও খুব খুশি হবেন। কিন্তু এ বিয়েতে বাগড়া লাগিয়েছেন অম্বুজানন্দ বাচস্পতি। তাঁর কথা অমান্য করা শক্ত। অবশেষে তিনি একদিন আবার গেলেন মুকুন্দদেবের কাছে। "একবার গুনে দেখুন তো, বিয়েটা হবে কি না।"

গণনা করলেন মুকুন্দদেব। বললেন, "এ বিয়ে অভাবিত উপায়ে হবে। ভল্লু আর পাঁচদিন পরে ফিরবে।"

"ভল্লু যদি পাঁচদিন পরে ফেরে আর সেই দিনই যদি আমি রওনা হই তাহলেও তো যেতে-আসতে দশদিন লাগবে। কিন্তু শুদ্ধসুর যে তার আগেই এসে পড়বে। আমাকে দেখতে না পেলে সে ফিরে যাবে না তো? বিয়ে যদি না হয়?"

মুকুন্দদেব বললেন—"আমি বলছি মহারাজ, এ বিবাহ একটু অভাবিত উপায়ে হবে।"

ঠিক পাঁচদিন পরেই ভল্লু ফিরে এল। এসে বলল—"কাঠ দিয়ে আমরা শিলাকণ্টক নদী ঢেকে দিয়েছি। এইবার কিন্তু সেটার উপর মখমলের একটা গদি বিছিয়ে দিতে হবে তা না হলে মহারাজ সেই এবড়ো-খেবড়ো কাঠের উপব দিয়ে যেতে পারবেন না। তিনশ হাত লম্বা আর পঁচাত্তর হাত চাওড়া একটা গদি হলেই চলবে।"

ভানুনাথ বললেন—"আমাদেব সভায় যে গদি পাতা হয় সেটা ওর চেয়েও বড়। সেইটে সঙ্গে নিয়ে গেলেই হবে।"

সমূহগুণ মহারানী কমলাঙ্গিনীর স্বর্ণপ্রতিমার সামনে গিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তাঁর চোখের দিকে। তারপর বেরিয়ে এসে ভানুনাথকে বললেন, "আমি আজই যাত্রা করব। ব্যবস্থা করুন।"

বিরাট রাজহস্তী অদ্রিকে রাজবেশে সাজানো হল। সোনার হাওদা, হাওদার উপর মখমলের স্বর্ণখচিত রাজছত্র, অদ্রিকের সর্বাঙ্গে চন্দনের চিত্র-লেখা। মহারাজ কিন্তু বেরিয়ে এলেন নগ্ন গাত্রে, খালি পায়ে। অবাক হলেন ভানুনাথ।

"মহারাজ, এই বেশে যাবেন।"

"হ্যাঁ। আমি যাচ্ছি একজন মহাযোগীর কাছে প্রার্থী হয়ে। রাজবেশ পরে যাওয়াটা হাস্যকর হবে। আমি সমস্ত পথটা হেঁটেই যেতাম, কিন্তু গজসিংহ জঙ্গল যে অনেক দূর। তাই হাতির পিঠে যাচ্ছি। হাতিকে শিলাকণ্টক নদীর এপারেই দাঁড় করাব। গজসিংহ জঙ্গলে হেঁটেই যাব আমি।"

ভল্লু বলল— "আমি তাহলে মখমলের গদিটা নিয়ে এগিয়ে যাই। বদরি আমার পিছনে পিছনে আসুক।"

বদরি অদ্রির মাহুত। পুরোনাম বদ্রিবিশাল। বিরাটাকায় লোক সে। সে কিন্তু পাগড়ি আর জমকালো জোব্বা পরেই হাতিতে উঠল।

তাদের পিছনে আরও কয়েকটি হাতি গেল। খাবার আর তাঁবু নিয়ে গেল তারা। দশদিন পথে থাকতে হবে। তাই এমন ব্যবস্থা।

গজসিংহ জঙ্গলে মহারাজ যখন প্রবেশ করলেন তখন কাউকে দেখতে পেলেন না। দেখলেন, দূরে একটি পাঁচ ছ'বছরের শিশু নদীর ধারে বসে বালি দিয়ে বাড়ি তৈরি করছে। আর সে-বাড়ি ভেঙে পড়ছে বার বার। তারই কাছে গেলেন মহারাজ।

"খোকা, মহর্ষি ময়ালভুক কোথায় থাকেন বলতে পারো?"

"কেন, তাকে কি দরকার আপনার?"

"আমার মেয়ের বিয়েতে তাঁকে পৌরোহিত্যে বরণ করব।"

সঙ্গে সঙ্গে শিশু রূপান্তরিত হয়ে গেল দিব্যকান্তি মহর্ষি ময়ালভুক-এ। মহারাজ তো অবাক।

"ও, আপনিই অলঙ্কারপুরীর মহারাজ সমূহগুণ? মহাদেব আপনার কথা বলেছিলেন আমাকে। আমি নিশ্চয় যাব। কবে বিয়ে?"

"দিন এখনও স্থির হয়নি। আপনিই দিন স্থির করে দিন একটা।"

"আগামী পূর্ণিমায় চন্দ্র রোহিণী নক্ষত্রে থাকবেন। সেই দিনেই গোধূলি লগ্নে ব্যবস্থা করুন।"

।। সতেরো ।।

সেদিন সকালে রত্না, তীরা আর নীরা তাদের বাগানে ঘুরে ঘুরে গাছে গাছে গোলাপজল ছিটোচ্ছিল। ভরদ্বাজ মালী গোলাপজলে ভরা বালতি নিয়ে ঘুরছিল তাদের পিছু পিছু। এমন সময় একটি পাখিওলা এসে হাজির হল। রত্নাকে বলল— "আজ খুব ভোরে একটি চমৎকার পাখি আপনার বাগানে চন্দনগাছের উপর চুপ করে বসেছিল। আমরা সেটাকে জাল ফেলে ধরেছি। নেবেন আপনি?"

"নিয়ে আয়, দেখি কেমন পাখি?"

পাখিওয়ালা ছুটে চলে গেল। একটু পরে লোহার খাঁচায় করে নিয়ে এল পাখিটাকে।

তীরা বলল— "এ যে সেই পাখিটা যাকে আমরা ধরতে পারিনি!"

নীরা বলল— 'অবিকল সেই রকম।"

রত্না চিনতে পেরেছিল শুদ্ধসুরকে। পাখিওলাকে দুটি মোহর দিল সে। তারপর তীরা আর নীরাকে বলল— "তোরা রূপশ্রী দিদির কাছে যা। তিনি কিছুদিন আগে সুন্দর একটি বড় সোনার খাঁচা বানিয়েছিলেন, সেই খাঁচাটা নিয়ে আয়।"

পাখিওলা মোহর পেয়ে খুশি হয়ে চলে গেল। তীরা-নীরাও ছুটল রূপশ্রীর বাড়ির দিকে। তখন রত্না বলল— "তোমাকে চিনেছি। এখন কয়েকদিন বন্দী হয়ে থাকতে হবে। বাবা এখনও ফেরেননি।"

"কোথায় গেছে তিনি?"

"গর্জসিংহ জঙ্গলে মহর্ষি ময়ালভুককে আমাদের বিয়েতে পৌরোহিত্যে বরণ করতে। তিনি যতদিন না ফিরছেন ততদিন তোমার মুক্তি নেই। যে খাঁচায় তোমাকে রাখব সেটি আমার দিদির তৈরি ছোটখাটো একটি সোনার প্রাসাদ। তোমার কষ্ট হবে না।"

"বেশ, থাকব।"

"কি খাবে?"

"যতক্ষণ পাখি হয়ে থাকি আমার ক্ষিদে পায় না।"

একটু পরেই চারজন লোক সোনার খাঁচাটি বয়ে নিয়ে এল। সত্যিই সেটি মণিমাণিক্যখচিত ছোট্ট একটি রাজপ্রাসাদ। তার চারদিকে সোনার অলিন্দ আছে, খাওয়ার ঘর আছে, দোলবার জন্য চমৎকার একটি দোলনা আছে, বসবার জন্য একটি দাঁড় আছে। তার ভিতর ছোট্ট একটি বাগান আছে, স্নান করবার জন্য ঝরনা আছে। সমস্তটা কিন্তু সোনার জাল দিয়ে ঢাকা। তীরা-নীরা এল নানারকম ফল নিয়ে।

।। আঠারো ।।

যথাসময়ে সমূহগুণ ফিরে এলেন গজসিংহ জঙ্গলে থেকে। এ খবর পাওয়া মাত্র রত্না লুকিয়ে ছেড়ে দিল পাখিটিকে। তীরা-নীরাকে বলল—"ওর কষ্ট হচ্ছিল, তাই ছেড়ে দিলাম।"

পাখি খাঁচা থেকে বেরিয়েই রূপান্তরিত হয়ে গেল শুদ্ধসুরে। মহারাজাকে গিয়ে প্রণাম করল। মহারাজ বললেন,—"ও— তুমি এসে গেছ? তোমার হাতেই রত্নাকে সম্প্রদান করব আমি। মহর্ষি ময়ালভুক এ বিয়েতে পৌরোহিত্য করবেন। তিনিই বিবাহের দিন স্থির করে দিয়েছেন। আগামী পূর্ণিমায় গোধূলি লগ্নে বিয়ে হবে।"

শুদ্ধসুর আবার প্রণাম করল তাঁকে। বলল—"আমি তাহলে এখন চলি। আগামী পূর্ণিমায় দুপুর বেলা আসব। আমার সঙ্গে কিছু গন্ধর্ব বরযাত্রীও আসবে।"

শুদ্ধসুর ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। সমূহগুণ ভানুনাথকে বললেন— "ওর সমুচিত সম্বর্ধনার ব্যবস্থা কর।"

ভানুনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে কিন্তু আর দেখতে পেলেন না কাউকে।

বিয়ের দিন ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল। নানা সাজে সাজতে লাগল অলঙ্কারপুরী। রাস্তার দু'পাশে সারি দিয়ে সাজানো হতে লাগল সোনার মঙ্গলঘট। স্বর্ণসেতুর তোরণগুলো

রাস্তায় রাস্তায় বসানো হল। চারিদিকে টাঙানো হতে লাগল রূপশ্রীর আঁকা বড় তৈলচিত্র। কোনও ছবিতে একটি ডালে দুটি পাখি পাশাপাশি বসে আছে, কোনও ছবিতে পদ্মের উপর ভ্রমর এসে বসেছে, কোনো ছবিতে চাঁদের পাশে রোহিণী, কোনও ছবি শিব-দুর্গার, কোনও ছবি লক্ষ্মী-নারায়ণের। আরও কত ছবি। কত রঙিন পরদা। চমৎকার পতাকাও উড়তে লাগল চারদিকে। মুকুন্দদেব একটা অভ্যর্থনা সঙ্গীত লিখে দিলেন। নর্তকীর দল পথে পথে নেচে নেচে বেড়াতে লাগল। প্রত্যেক পথের তোরণে তোরণে নহবৎ। হাতির দল আর ঘোড়ার দলও নানা সাজে সজ্জিত হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল চারিদিকে টহল দিয়ে। মহারানী কমলাঙ্গিনীর স্বর্ণমূর্তি থেকে বিচ্ছুরিত হতে লাগল অপূর্ব জ্যোতি। মহারাজ রোজ রাত্রে ছাদে উঠে আলাপ করতে লাগলেন বাগেশ্রী।

বিয়ের দিন কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়ল সবাই। মহর্ষি ময়ালভুক দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও এলেন না। বর আর বরযাত্রীদেরও পাত্তা নেই। মহারাজ বিষণ্ণ হয়ে চটে গেলেন। কুলপুরোহিত অম্বুজানন্দ বললেন, "আমরা মানুষ গন্ধর্ব-কিন্নরদের সঙ্গে আত্মীয়তা করা কি আমাদের পোষায়? সাদামাঠা একটা রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দিলেই হত।" মন্ত্রী ভানুনাথ মহালক্ষ্মীর ধ্যানে বসলেন। রূপশ্রী একটা ছবিই এঁকে ফেলল শুদ্ধসুরের। বললে—"সে যদি না থাকে এই ছবির সঙ্গেই গোধূলি লগ্নে রত্নার বিয়ে দেব আমরা। সে পরে এসে বৌ নিয়ে যাবে। সে আসবে ঠিক।"

রূপশ্রী ছবিটি শেষ করে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছে, এমন সময় বাইরে কে একজন জিজ্ঞেস করলেন— "এইটাই কি অলঙ্কারপুরী? যে রকম সাজগোজ, বাজনা-টাজনার ধুম তাতে মনে হচ্ছে এখানে কোনো উৎসব হচ্ছে।"

রূপশ্রী কপাট খুলে দেখলে একটি স্বর্ণ-পেটিকা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছেন আগন্তুক।

"হ্যাঁ, এইটেই অলঙ্কারপুরী। আমাদের রাজকন্যার বিবাহ। আপনি কে?"

"আমার নাম ময়ালভুক, আমি তার বিবাহে পৌরোহিত্য করতে এসেছি। আপনাদের কুল-পুরোহিতের বাড়িটা আমাকে দেখিয়ে দিন।"

রূপশ্রী তাঁকে কুল-পুরোহিতের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ইতস্তত করে একটু হেসে বলল, "বর কিন্তু এখনও আসেনি।"

"তারা বেরিয়েছে আসবে বলে। এখুনি এসে পড়বে।"

কুল-পুরোহিতকে তিনি বললেন, "বিবাহের সব কাজ আপনিই করবেন শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে। বিবাহ শেষ হয়ে গেলে আমি সেটা সিদ্ধ করে দেব। যা দিয়ে সিদ্ধ করব তা এই স্বর্ণ-পেটিকায় আছে। মহাদেবের অনুরোধে স্বয়ং শচীদেবী পাঠিয়েছেন এটি।"

যদিও বর আসেনি তবুও চারদিকে সাড়া পড়ে গেল একটা।

তার একটু পরেই, গোধূলি লগ্নের কিছুক্ষণ আগে যে কাণ্ডটা হল তা অবর্ণনীয়। সমস্ত আকাশ জুড়ে আসতে লাগল সাদা রাজহংসের দল। যেন বিরাট একটা সাদা মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল আকাশ। সবচেয়ে আগে যে হাঁসটা ছিল তা শুধু ধপধপে সাদাই নয়, আকারেও বড়। যেন একটা নৌকো। তার মাথাটা যেন প্রকাণ্ড একটা শাঁখ, . সেই শাঁখের উপর বসানো রয়েছে প্রকাণ্ড একটি হীরে। অন্য হাঁসগুলি এত বড় নয়, কিন্তু প্রত্যেকের মাথায় একটি করে মণি। হাঁসের দল

অলঙ্কারপুরীতে নেমেই দিব্যকান্তি গন্ধর্বে পরিণত হল। বড় হাঁসটি হল শুদ্ধসুর। আর অন্য হাঁসগুলি হয়ে গেল গন্ধর্বের দল। কী সুন্দর তাদের রূপ। পতঙ্গিনীও এসেছিল। বহুবর্ণ বিরাট পতঙ্গ দেখে অবাক হয়ে গেল সকলে। সে গুনগুন করে চারিদিকে উড়ে বেড়াতে লাগল।

বিবাহ নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। অম্বুজানন্দ নিষ্ঠাভরে মন্ত্রপাঠ করালেন। ময়ালভুক তার পানে তাকিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন শুধু। বিবাহ যখন শেষ হয়ে গেল তখন তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন— "এইবার আমি বিবাহটা সিদ্ধ করে দিই। মহাদেবের অনুরোধে ইন্দ্রাণী শচীদেবী নন্দন কানন থেকে দুটি পারিজাতের মালা পাঠিয়েছেন। সেই মালা দুটি আমি ওদের গলায় পরিয়ে দিচ্ছি। সেই মালা দুটি ওরা সকলের সামনে বিনিময় করুক। তাহলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়ে যাবে। আপনারা সব জয়ধ্বনি করুন।"

তাই হল।...

বিবাহের পর বরবধূ কমলাঙ্গিনীর স্বর্ণপ্রতিমাকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখল তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। মেয়েকে বিদায় দিতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর।

রত্না বলল—"মা, আমরা তোমাকে ছেড়ে যাব না। রোজ সমস্ত দিন, সন্ধ্যা পর্যন্ত, তোমার কাছে-কাছেই থাকব। সন্ধ্যার পর চলে যাব।"

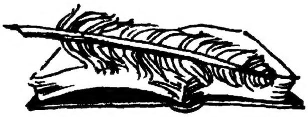শুদ্ধসুর গন্ধর্বলোকের সবাইকে পাখি হবার মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছিল। রত্নাকেও শিখিয়ে দিল। বিয়ের পর তারা সারাদিন অলঙ্কারপুরীতেই থাকত। সন্ধ্যা হয়ে গেল দু'জনে পাখি হয়ে উড়ে চলে যেত গন্ধর্বলোকে।